

# প্রবাসী

## সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

---

অসোদশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২০ সাল, কার্তিক—চৈত্র

---

প্রবাসী কার্যালয়

২১০৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২০ কার্তিক-চৈত্র,  
১৩শ ভাগ ২য় খণ্ড,  
বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
অক্ষের কাহিনী ( গল্প )—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫	একটি মন্ত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫৫
অবিচারের শেষ বিচার ( নাটক )— শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রের	৭	কৃষ্টিপাথর ( সচিত্র )	২৪, ১০৩, ৩১২, ৪১৬, ৫৩৮
অরণ্যবাস ( উপন্যাস )—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল ২৬, ১৭১, ২৮৭, ৩৮৫, ৪৮৪, ৬১৩	৪৪৩	কানাড়ীয় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ( সচিত্র )	১৬৮
অলঙ্কার ( কবিতা )—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৪৪৩	কীটজীবনী ( সচিত্র )—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১০২
আগুনের ফুলকি ( উপন্যাস )—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ১২, ১২৩, ৩১২, ৪০৮, ৪৪৬, ৫৮৩	২৩০	করোণী—শ্রীমহোদয় বাকালী ( সচিত্র )— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২২৬
আত্মায়িক ( কবিতা )—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৩০	গবেষণা—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি	২৭৫
আমেরিকার প্রজাতন্ত্র— অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন সেন, এম-এ	৩৭৫	গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬২
আলোচনা [ পুত্রকণ্ঠা জন্মের কারণ ও অসুপাত—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যো- পাধ্যায়, ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস সি; বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ ইত্যাদি; আক- বরের সত্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ]	৪২০	গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র- নারায়ণ রায়	৩৭১
আলোচনা [ ভোজবর্ণার তাত্ত্বশাসন ]— শ্রীবিনোদবিহারী রায়	১৫৫	গীতাপাঠ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
আলোচনা	৩৩৫	গোত্র—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি	...
আলোচনা—শ্রীকালীপদ মৈত্র	৪৭৮	গোলাপের জন্ম ( কাহিনী )—শ্রীনরেন্দ্র দেব	৭৭
ইউরোপে বাঙ্গালী পলোয়ান ( সচিত্র )	১৭৭	চিকিৎসা ( গল্প )—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
ইন্দ্রজিতের জন্ম ( কবিতা, সচিত্র )— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩৮	চিত্র-পরিচয়—শ্রীঅক্ষয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	...
ইন্দ্রজিতের নূতন রাজকবির কবিতা (পাপিরা, গান, সাং)—শ্রীসত্যেন্দ্র- নাথ দত্ত	৭৬	চিরন্তনী ( কবিতা ) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৭৮
উৎসাহের জয়—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২২	ছাতা ( গল্প )—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০২
উষোধন—শ্রীকিত্তিমোহন সেন, এম-এ	৪৭৩	ছোট ও বড়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৫
উত্তিরের অসুভব-শক্তি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৫	জরি-শম্মা-চুমকি-মঞ্জিলা ( সচিত্র )— শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	...
একতাধিকারের উপায়—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস	৩৬৪	জলম্বর কণ্ঠা-বিদ্যালয়—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস	...
একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস	২৬২	ঝড়ো হাওয়া ( গল্প )—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল	...
		দরিদ্র ডিউক—শ্রীঅতসী দেবী	...
		দানতত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীবনমালী বেদাস্ত- তীর্থ, এম-এ	...
		৭দীনবন্ধু মিত্র ( কবিতা )—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...
		হুর্ভিক্ষ নিবারণ—অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ	...
		দেশের অশান্তি ও আশঙ্কার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়—শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী	...
		দেহ ও মস্তিষ্ক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস	...
		দোল ( গান )—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
		দ্বিপদী ( কবিতা )—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
		ধরণী ( কবিতা )—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল	...
		ধানের উৎকর্ষা যোগ ( সচিত্র )—শ্রীদেবেন্দ্র- নাথ মিত্র	...

পরসামিত (সচিত্র) —	
হন রায়চৌধুরী	২৭৬
-অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল	
সিদ্ধান্ত, এম-এ	৩৬৯
(কবিতা) — শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৭
পত্রিকা — মুদ্রারাক্ষস ও শ্রী দ্বিজদাস	
দত্ত এম-এ, প্রভৃতি	১৬৩, ৩১২, ৪৪৩, ৬৬৪
পুস্তিকা (কবিতা) — শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	৫৮৯
সেই বর্ণনা-বচিত্র্য — শ্রী তেজেশচন্দ্র সেন	১১০
সংস্কৃত — শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যো-	
পাধ্যায়	৪৮০
প্রাচীন ঐতিহ্য ও উদ্ভিদতত্ত্ব — শ্রী জ্ঞানেন্দ্র-	
সেন	১১৪
পুস্তিকা (সচিত্র) — শ্রী হরি প্রসন্ন	
দাস বিদ্যাভিনোদ	৪৬৭
বিদ্যাভিনোদ — শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ	২৭২
পত্রিকা — শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	৬৫০
সেন — শ্রী রেজনাথ চৌধুরী, এম-এ	৪৬০
সংস্কৃত (সচিত্র) — শ্রী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র	১৫৯
সংস্কৃত — আকার — শ্রী রাসবিহারী	
সংস্কৃত, এম-এ, বি-এল	৮৬
সংস্কৃত (সমালোচনা) —	
শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	৬৩২
সংস্কৃত পুস্তিকা (গল্প) — শ্রী চারুচন্দ্র	
বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
সংস্কৃত ও বরপণ — শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ	
চৌধুরী, এম-এ	৬১৯
সংস্কৃত ভাষা-সংস্কৃত ও হিন্দু-	
সংস্কৃত — শ্রী পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল	১৩৩
(গল্প) — শ্রী ভুবনমোহন সেনগুপ্ত	৫১
	২০৮, ৪৩২, ৫৪৪, ৫৫৫
সংস্কৃত	
সংস্কৃত (সচিত্র) — শ্রী দেবেন্দ্র-	
সেন, এম-এ, বি-এল	৬৫২
জাতিভেদ — শ্রী বিজয়চন্দ্র	
বি-এল	
সংস্কৃত ও নবীন — শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ	
এম-এ	১১৭
সংস্কৃত — শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত	৫৯৮
অধ্যাপকের	
সংস্কৃত — অধ্যাপক শ্রী নিবারণচন্দ্র	
এম-এ	৩৪৯, ৫১৬, ৫৫৯

শ্রী রমা প্রসাদ চন্দ্র	
ভাস্কর্যে শিল্পচিত্র (সচিত্র) — শ্রী অশ্বিনী-	
কুমার বর্মন	...
মণিহার (গান) — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা — শ্রী জ্যোতি-	
রিজনাথ ঠাকুর	২৪, ১২০, ৩৩০, ৩৯৭
মালা ও নির্মালা (সমালোচনা) — শ্রী মহেশ-	
চন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি	
মিত্রমূর্ত্তি (সচিত্র) — শ্রী হরি প্রসন্ন দাসগুপ্ত	
মিয়াকো ওদোরি (সচিত্র) — শ্রী সুরেশ-	
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০৬
মূর্ত্তি (সচিত্র) — শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
সি-আই-ই	
মূর্ত্তি-সংগ্রহ — শ্রী রমা প্রসাদ চন্দ্র	
মৃত্যুশয্যার (কবিতা, সচিত্র) — শ্রী সত্যেন্দ্র-	
নাথ দত্ত	...
যাওয়া আসা — শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	৪৪৩
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি —	
শ্রী অমলচন্দ্র হোম	২৭৭
রাজর্ষি রামমোহন (কবিতা) — শ্রী সত্যেন্দ্র-	
নাথ দত্ত	...
রিয়্যার চাষ — শ্রী গণপতি রায়	
লাঙ্কিতা (গল্প) — শ্রী শরৎচন্দ্র ঘোষাল,	
এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ, ভারতী,	
সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ	...
শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয় ভারতীয়	
পণ্ডিতগণের মত — শ্রী শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	৬৭২
শুশুনিয়া (সচিত্র) — শ্রী রাধালদাস বন্দ্যো-	
পাধ্যায়, এম-এ	৪২৪
সতীন (গল্প) — শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	
সমাজ বা দেশাচার (সমালোচনা) —	
ডাক্তার শ্রী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,	
এল এল-ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত	৪৭২
সমালোচনা — শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী	৪৬৩
সুখমৃত্তা (কবিতা) — শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	৩৯৭
স্পর্শ (কবিতা) — শ্রী কালিদাস রায়, বি-এ	
হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী (সচিত্র) —	
শ্রী বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, এ	
হিন্দুবিবাহে পাত্রী নির্বাচন — অধ্যাপক	
শ্রী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	
বি-এসসি	

## লেখকের নাম ও তাঁহাদের মতনা

শ্রীমতী দেবী—	
দরিদ্র ডিউক ...	৩৮২
শ্রীঅন্নীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই—	
কৃষ্টি ( সচিত্র ) ...	২১৩, ৩৪১
বাওয়া আসা ...	৪৪৫
চিত্রপরিচয় ...	৫৫৪
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল—	
পুস্তক-পরিচয় ...	১৬৩
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল—	
অরণ্যবাল (উপন্যাস)—২৬, ১৭১, ২৮৭, ৮৫, ৪৮৪, ৬১৩	
শ্রীঅমলচন্দ্র হোম—	
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি	২০৫
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত—	
ভবিষ্যতের ধর্ম	৫৯৮
শ্রীঅনুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
প্রতিহিংসার যুদ্ধক	৪৮০
শ্রীঅখিনীকুমার বর্মা—	
ভাষ্যে শিশুচিত্র ( সচিত্র ) ....	১৮৬
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রের—	
অবিচারের শেষবিচার ( নাটক ) ..	৭
শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ—	
জরী, শমা, চুমকি, মঞ্জিলা ( সচিত্র )	৬২
শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ—	
স্পর্শ ( কবিতা ) ...	৭০
শ্রীকালীপদ মৈত্র—	
ব্যুৎপত্তি-রহস্য ..	৪৭৮
শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী—	
দেশের অশান্তি ও আশুকার কারণ ও তন্নিকারের উপায়	৪২২
শ্রীকিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত—	
রঙের লুকোচুরি	৩৩১
শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস—	
জলধীর কন্যাবিদ্যালয়	৫৩৪
শ্রীকিত্তিমোহন সেন, এম-এ—	
পুস্তক-পরিচয়	১৬৩
উদ্বোধন	৪৭৩
শ্রীকমলপতি রায়	
বিদ্যালয়	

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—	
আশ্বনের ফুলকি (উপন্যাস)—১২, ১২০, ৩১২,	
৪০৮, ৪৪৬, ৫৮৩	
বায়ুবহে পূর্ববৈষ্ণৱী ( গল্প ) ...	৩৯
সতীন ( গল্প ) ...	১৪২
বাল্মীকি-শব্দকোষ ( সমালোচনা ) ...	৩৩২, ৬৬২
পঞ্চশস্য	৭১, ২৩৭, ৩৯৮, ৫০৮, ৫৭৭
কষ্টিপাথর	২৪, ১০৩, ৩১২, ৪১৬, ৪৩৮,
বরপণ ( গল্প )	৬৫০
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—	
মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা, ২৪, ১২০, ৩৩০, ৩৯৫, ৪৫৯	
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস—	
দেহ ও মস্তিষ্ক ...	৮০
পঞ্চশস্য ...	১০১
পুস্তক-পরিচয় ...	
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়—	
প্রাচীন ঋষিগণ ও উদ্ভিদতত্ত্ব ...	১১৪
গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী ...	৩৭১
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—	
কেরোলী রাজ্যে বাল্মীকি ( সচিত্র )	২৯৬
শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন—	
প্রাকৃতিক বর্ণ বৈচিত্র্য ...	১১০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র—	
কীটজীবনী ( সচিত্র ) ...	১৫২
ধানের উফরা রোগ ( সচিত্র ) ...	৪৬৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি-এল	
বিংশশতাব্দীর বর ( কবিতা, সচিত্র )	৬৫২
শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ—	
পুস্তক-পরিচয় ...	৪৬৯
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—	
গীতাপাঠ ...	৫২২
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—	
প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র্য ...	৩৩৭
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ—	
ব্রহ্মবাদ, প্রাচীন ও নবীন	
বর্ণাশ্রম ...	১১৭
বর্ণাশ্রম	৪৬৪
বর্ণাশ্রম ও বরপণ	

শ্রীনরেন্দ্র দেব—		শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—	
গোলাপের জন্ম ( কাহিনী )	... ১৭৭	ষিপদী ( কবিতা )	... ১০৩
শ্রীশ্রীমোহন রায়চৌধুরী—		মণিহার ( গান )	... ১৬৮
পতিতজাতি-উদ্ধার সমিতি ( সচিত্র )	২৭৬	ছোট ও বড়	... ১০০
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—		গান	... ১৭২
ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক		একটি মন্ত্র	... ৬৫৬
কারণ	... ৩১৯, ৫১৬, ৫৮৯	দোল ( গান )	... ১৮২
শ্রীপারেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল—		শ্রীমণীমোহন ঘোষ, বি-এল—	
বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ	... ১৩৩	ধরনী ( কবিতা )	... ৩২
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—		শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ, বি-এ—	
পুত্রকন্ঠা জন্মের কারণ ও অক্ষুপাত	... ৪৯	মূর্ত্তিসংগ্রহ	... ৯২
উদ্ভিদে অক্ষুভবশক্তি	... ৪৫৫	ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা ( সচিত্র )	... ১২২
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ—		শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ—	
সুখমৃত্যু ( কবিতা )	... ৩৯৭	শুশুনিয়া ( সচিত্র )	... ৪৯১
অলক্ষ্য ( কবিতা )	... ৪৪৬	শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ—	
পূর্ণতা ( কবিতা )	... ৫৮৯	দুর্ভিক্ষ নিবারণ	... ১৭৯
শ্রীবনমালী বেদাস্ততীর্থ, এম-এ—		পল্লীচর্যাবিধান	... ৩৬৯
দানতত্ত্ব	... ১০১, ২৫৩	শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র—	
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস—		বহুরূপী নক্ষত্র ( সচিত্র )	... ১৫৯
বৈদিক যুগের জাতিভেদ	... ১	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি-এল—	
একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি	... ২৬৯	বাঙলা ভাষার আকার	... ৮৬
একতাবিধানের উপায়	... ৩৬৪	শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ,	
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়—		ভারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ—	
বৈজ্ঞানিক উপায়ে হৃদয় নির্মাণ	... ১৩১	বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ	... ৪৯
সাহারী মরুভূমি	... ১৩১	লাহিতা ( গল্প )	... ১৩৬
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী—		শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস, বি-এল—	
সমালোচনা	... ১৬২	ব্যবসায়ের প্রকৃতির ভারতম্যে যুগ্ম ও	
শ্রীবিনোদবিহারী রায়—		আয়ুর ভারতম্য	... ১৩২
ভোজবর্ষার তাত্ত্বশাসন	... ১৫৫	শ্রীশরৎচন্দ্র শাস্ত্রী—	
শ্রীবিধুশেখর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, এল এল-বি—		শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয়	
হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী(সচিত্র)	... ৬১৫	পণ্ডিতগণের মত	... ৬৭২
শ্রীভুবনমোহন সেনগুপ্ত—		শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—	
বিহ্যুভের ভয় ( গল্প )	... ৫১	বঙ্গের বিবাহসংখ্যা	... ২৭২
শ্রীভুবনমোহন সেন, এম-এ—		শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এল এল-ডি,	
আমেরিকার প্রজাতন্ত্র	... ৩৭৫	প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত—	
শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—		সমাজ বা দেশাচার ( সমালোচনা )	... ২৭৯
গোত্র	... ৩৩	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এস সি—	
পবেষণা	... ২৭৫	পুত্রকন্ঠা জন্মের কারণ ও অক্ষুপাত	... ৪৯
পুস্তক-পরিচয়	...	হিন্দুবিবাহে পাত্ৰীনির্বাচন	... ৬১১
শ্যাল্য ও নির্খাল্য ( সমালোচনা )	... ২৮১	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চন্দ্র—	
শ্রীমতীজনাথ মজুমদার—		পুরীর চিঠি ( কবিতা )	... ৩৭
শ্রীমতীজনাথ মজুমদারের সত্যের মীরা ( আলোচনা )	... ১৩৯	ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি কবিতা ( কবিতা )	... ১৭৬
		রাজর্ষি রামমোহন ( কবিতা )	... ১৩৮

৮দীনবন্ধু মিত্র ( কবিতা )	
চিরস্বনী ( কবিতা )	
আত্মদায়িক ( কবিতা )	
ইচ্ছান্তের অক্ষর ( কবিতা )	
মৃত্যুশয্যায় ( কবিতা )	
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল—	
উৎসাহের জয়	
মিয়াকো ওদোরি ( সচিত্র )	

১২২	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন যুথোপাধ্যায়, বি-এল—	
২০৭	ঝড়ো হাওয়া ( গল্প )	৩০২
২৩০	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
৩৩৮	অন্ধের কাহিনী ( গল্প )	৫৫
৬৪৮	ছাঁতা ( গল্প ) — চিকিৎসা	৪০২ ৬০৮
	শ্রীহরপ্রসাদ দাসগুপ্ত বিদ্যাভিনোদ—	
৩২২	মিত্রমূর্ত্তি ( সচিত্র )	৩৪
৬০৫	বন্দে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা ( সচিত্র )	৪৬৭

চিত্রসূচী

অক্ষুণ্ণ ও তাহার আকার ...	২৫১	গোপন কথাটি ...	১২০
অভিভঙ্গ ...	৩৫৫	গোলাম আলি চাগলা, ...	৪৩৩
অধর ও তাহার আকার ...	২৩৫	ঘুমপাড়ানো বন্ধুকের-গুলি ...	৪১০
অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ	৫৬৫	চিত্রকর—শ্রীচাক্রচন্দ্র রায় কর্তৃক অঙ্কিত	২১
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সী, ভী, রামন	৫৬৫	চিত্রি—	২১
অধ্যাপক হেজার	৫১০	চিত্তামণি ঠাকুর	৪৬৮
আকাশ প্রদীপ ( রঙিন )—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ		চলি চলি পা পা	১৮৭
ঠাকুর সি-আই-ই কর্তৃক অঙ্কিত—প্রচ্ছদপট		জগদ্ধাত্রী ( রঙিন )—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে	
আভঙ্গ ...	৩৪৫, ৩৪৭	কর্তৃক অঙ্কিত	১১৬
আমেরিকার লাল লোক ও সাইবেরিয়ার		জজ্বা, জাহ্নু ও তাহার আকার	২৫৭
লোক ...	৭৫	জরি, শম্মা, চুমকি, মঞ্জিলা প্রস্তুত-প্রণালী ...	৬২-৬৮
আসমান-ঝোলায় কাশ্মীর যাত্রা	৬৮১	জাপানের ভূমিকম্প প্রতিবেদক মন্দির ...	৪০৮
ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি ...	৭৬	জাপানী চা-উৎসবে চা প্রস্তুত করিবার	
উত্তম নবতাল মূর্ত্তি ...	২১২	প্রণালী ...	৬০৬
উরু ও তাহার আকার ...	২৫৫	জাপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল	৪০৭
এডিনবরায় যতীন্দ্রচরণ গুহ	১৭৭	জাপানী নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গী	৬০৭
কঠ, চিবুক ও তাহার আকার	২৩৯	ঝরণায় স্নান	১৮৭
কর, পদ ও তাহার আকার	২৫২	তামাক ধাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার	
কর্ণ ও তাহার আকার ...	২৩১	চিকিৎসা	৬৭৮
কালীদেবীর পাড়ে ইন্দিরা ( রঙিন )—		তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন শিশুমূর্ত্তি	৪০০
শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত	২৬২	ত্রিভঙ্গ ...	৩৫১, ৩৫৩
গজদন্তনির্মিত পুতুল ইত্যাদি	৬২৬	ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ...	২১৫, ২১৭
গজদন্তপ্রতিবন্দন করা দারুশিল্প	৬২৭	দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তায়বিরোধী বীর	
গজদন্তনির্মিত হাওলা-সওয়ারী হাতী	৬২৮	ভারতনারী বাঁহারা প্রথমে কারারুদ্ধ	
গজদন্তনির্মিত দুর্গাপ্রতিমা	৬২৯	হইয়াছিলেন	৩৩২
গজদন্তনির্মিত ময়ূরপঙ্কজী	৬৩০	দেবশিশু ( রঙিন )—সার যশুয়া রেনল্ড্‌স	
গজদন্তনির্মিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা	৬৩১	কর্তৃক অঙ্কিত	৪৮৫
গজদন্তনির্মিত শিকারদৃশ্য	৬৩২	ধানের উফরাপোকা	৪৭৫
গোবরের পাথরের হাঁসুলি	১৭৮	ধানের উফরা রোগ	৪৭৫
গোরুর মূর্ত্তি ও তাহার আকার	১৭৮	ধ্বংসপ্রাপ্তিকার	৪৭৫

ধুমপ্রতিকারের যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ	৫১৫	মাননীয় হরচন্দ্র রায় বিদ্যাদাস	৪৩৬
নবপরশু নক্ষত্রের নিকটস্থ নীহারিকা	১৬২	মানব-সন্তানের সার্কজনিক-সংঘের প্রস্তর-	
নয়ন ও তাহার আকার ...	২২৭	খিলান মন্দিরে উপাসনা	১৯৮-১৯৮
নারায়ণ সিং, নন্দসিং সিং, বলবন্ত সিং	১৬২	মায়ের পেটের ভাই	১২০
নাসা, নাসাপুট ও তাহার আকার	২৩৩	মিত্রমূর্তি	৩৫
পালঘাট পতিতজাতির স্কুল স্থাপন	২৭৭	মুখ ও তাহার আকার	২২৩
পালঘাট পতিতজাতির স্কুলের প্রথম		যমুনার পথে ( রঙিন )—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে কর্তৃক অঙ্কিত	১
ছাত্রদল ..	২৭৮	রথের পাশে রাখারানী মালা গাঁথিতেছে ( রঙিন )—	
প্রচ্ছদপট ( রঙিন )		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত	৩২২
প্রজাপতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা	১৫৩	রাও বাহাদুর, দেওয়ান কোরামল চন্দনমল	৪৩২
প্রবাসী—প্রচ্ছদপট		রাও বাহাদুর দেওয়ান তারাচাঁদ শৌকিরাম	৪৩৩
প্রবাসীর স্বদেশ যাত্রা ( রঙিন )—শ্রীসুকুমার		রাও বাহাদুর বলচাঁদ দয়ারাম	৪৩৬
রায়, বি-এসসি কর্তৃক গৃহীত ফটো-		রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	২২৭
গ্রাফ হইতে—প্রচ্ছদপট		রাও বাহাদুর দেওয়ান হীরানন্দ কেম সিং	৪৩৫
ফড়িংএর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ...	১৫৪	রামের কৌশল্যাকে স্বীয় বনবাস-সংবাদ	
ফিলিপিনোদিগকে ব্যাটবল খেলিতে		প্রদান—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক অঙ্কিত	৩
শেখানো হইতেছে	৬৭২	শরীর ও তাহার আকার	২৪১
ফিলিপিনোদিগকে কলের গান শুনাইয়া		শান্তির মন্দির	৫০৮
শিক্ষাদান	৬৮০	শাল ৬ত্রস্তে	৫১০
বক্ষ, কটি ও তাহার আকার	২৪৩	শাল ৬ত্রস্তের প্রণয়লিপি	৫১১
বড়োদার রাজকুমারী ইন্দিরা ও কুচ-		শুশুনিয়া পর্কতের বিষ্ণুচক্র	৪২৩
বেহারের মহারাজকুমার জিতেন্দ্র-		শুশুনিয়া পর্কতের বিষ্ণুচক্রের খোদিত লিপি	৪২৫
নারায়ণের বিবাহ ও মাল্যবন্ধন	২১২	শেষ বোকা ( রঙিন )—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ	
বতাদায়	২৪-২৫	ঠাকুর সি-আই-ই অঙ্কিত	৪৪৫
বহুরূপী নক্ষত্র	১৬১	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৫৫৩
বিমল বয়স ( রঙিন )—সার জগন্নাথ রেনল্-		শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র	৫৫২
ডস কর্তৃক অঙ্কিত	২৪	শ্রীমতী ননীবাঈ	৫৫৩
বিশ্বস্ততা ( রঙিন )—জে, বি, গ্রিউজ	৫৭৮	শ্রীমতী যমুনাবাঈ সক্রই	৫৫৪
বিংশশতাব্দীর বর	৬৫৩	শ্রীমতী সেধ-মহতাব-পন্নী দক্ষিণ আফ্রি-	
বিষ্ণু	১২৭	কায় অত্যাধিকারী কারাবন্ধুতা বীর	
বেয়াত্রিচে চেকী ( রঙিন )—গীদো রেনি		মুসলমানমহিলা	৩৪০
কর্তৃক অঙ্কিত	১৩২	শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	৬৪২
বোলপুরে রবীন্দ্র-সঙ্গমে গত ৭ই অগ্র-		শ্রীযুক্ত গান্ধি, তাঁহার সেক্রেটারী কুমারী	
হায়ণে উপস্থিত জনমণ্ডলী	৩৩৩	স্নেসিন্, এবং তাঁহার প্রধান সহকারী	
ব্যাবিলনের প্রাচীন প্রাসাদপ্রাচীরে ইটে		মিঃ ক্যালেনব্যাক	৪৩১
গাঁথা ঘোটকমূর্তি	৩২৮	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১
ব্যাবিলোনীয় ভূগর্ভোখিত প্রস্তরের		শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( রঙিন )—শ্রীঅব-	
সিংহমূর্তি	৩২২	নীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে	২১৩
ব্রহ্মা	১২৭	সমভঙ্গ	৩৪৩
ভাগ সিং এবং তাঁহার পরিবার	১৭০	সায়ংসন্ধ্যা ( রঙিন )—শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়	
ক্রমুগ ও তাহার আকার	২২৫	কর্তৃক অঙ্কিত	৩৪১
মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর	৪৩৪	সেতু-শিলাগার	৫১৩
মাননীয় লালুভাই শামলদাস	৪৩৫	স্বক ও তাহার আকার	২৪৭

হাকিম সিং ও তাঁহার আশ্রয়  
হাকিম সিংহের পরিবার  
হাকিমরাম বিবিগদাস

সূচীপত্র

১৭০	হস্ত ও তাহার আকার	২৪৯
১৬৯	হিরণ্ময়ী নিকট পুস্তকের বিদায় গ্রহণ	৫৫৫
৪৩৪	(রঙিন) — শ্রীমুরেশ্বমাধ কর	...







# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৩শ ভাগ  
২য় খণ্ড

কার্তিক, ১৩২০

১ম সংখ্যা

## বৈদিক যুগের জাতিভেদ

কেহ বা বলিতেছেন, জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং কেহ বা বলিতেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। ইহাদের কাহারও সহিত ইতিহাসলেখকের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। জাতিভেদ তুলিতে হয়, তোল; রাখিতে হয়, রাখ। ইতিহাসলেখককে কেবল নিষ্কামভাবে জাতিভেদের উৎপত্তি, পরিবর্তন এবং প্রকৃতির কথা যথার্থ বর্ণিত হইবে, এবং লিখিতে হইবে। যে জিনিষটি যেমন ছিল বা আছে, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিতে হইবে; এই প্রকার সত্য-প্রদর্শনের ফলে কাহার স্বার্থসিদ্ধি হইবে বা কাহার স্বার্থনাশ হইবে, সে কথার প্রতি ভ্রমের পক্ষে পাপও

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন যুগের সামাজিক রীতির সর্বপ্রথম সাহিত্যিক সাক্ষী হইল—(১) সামবেদের মন্ত্র এবং (২) ঋগ্বেদের সামান্তিরিক্ত প্রাচীন অংশ। সামবেদের সকল মন্ত্রই যখন ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তখন বিচার করিয়া কেবল ঋগ্বেদের সাক্ষ্য দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

জাতিভেদ বলিলে আমরা এ কালে যাহা বুঝি, সেই-রূপ ভাব বুঝাইবার মত কোন শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্ত ছাড়িয়া দিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে আর্যদের মধ্যে

কোন প্রকার প্রভেদের কথাই ধরিতে পারা যায় না। স্বদেশ-বিদেশের সকল পণ্ডিতই এখন স্বীকার করিতেছেন যে, যদি কেবল ভাষা লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে অতি সাধারণ বুদ্ধির লোক পর্যাস্তও নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে, মূল ঋগ্বেদের মন্ত্র যে-ভাষায় রচিত পুরুষ-সূক্তটি সে-ভাষায় রচিত নহে; এবং উহার ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের বলিয়া সকলেরই মনে হইবে। অন্য পক্ষে আবার একথাও বিচার করিতে হইবে যে, এই পুরুষ-সূক্ত প্রভৃতি অংশ যত আধুনিকই বলা যাক, বেশ পুরাতন। যে সময়ে প্রাচীন কালের মন্ত্রগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া ঋক্ সংহিতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেই সংগ্রহের সময় নিশ্চয়ই ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত সংগৃহীত হইতে পারিয়াছিল। প্রাচীন ঋক্ সৃষ্টির যুগ কত প্রাচীন তাহা আমরা জানি না। যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঋক্গুলি সংহিতারূপে একত্র সংবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আধুনিক কালের প্রাচীনতা কত, তাহাও আমরা জানি না। কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষ-সূক্ত যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্ব-শূদ্র যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে ঋগ্বেদের অন্য অংশে ব্রাহ্মণাদি ঐ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যে সময়ে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল, তখন যে-ঋগ্বেদের বহু পরবর্তী যজুর্বেদের সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, তাহা ঐ সূক্তের ৯ম ঋকে উল্লিখিত ঋক্, যজু প্রভৃতি নাম হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। এই পুরুষ-সূক্তটিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণাদি

বর্ণের কথা যে ১২শ ঋকে পাওয়া যায় (ঋ ১০ম-১০, ১২), তাহাই অবিকল অথর্ক বেদে (১৯অ-৬, ৬), যজুর্বেদে (বাজ ৩১, ১১) এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩-১২, ৫) পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মধ্যে লোকবিভাগে পাওয়া যায়—এক আৰ্য্য দল এবং অত্র আৰ্য্যোত্তর দল। আৰ্য্যোত্তর দলের কথা পরে বলিব। এখানে কেবল বলিয়া রাখি যে শূদ্র, বৈশ্ব এবং রাজত্ব শব্দগুলি পুরুষসূক্ত ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। “বিশ্ব” বলিলে ঋগ্বেদে সর্বত্রই আৰ্য্যদিগের দল বুঝায়। আৰ্য্যদিগের লোকসাধারণের নামই হইল “বিশ্ব” (৬ ম.—১, ৮; ৬ ম.—২৬, ১ ইত্যাদি)। যে হস্তাগিনী নারী পতিতা হইয়া সর্বজনভোগ্যা হইত। বৈদিক ভাষায় তাহার নাম ছিল “বিশ্বা” অর্থাৎ বিশ্ব বা লোকসাধারণ-ভোগ্যা। এই শব্দটিই অর্ধাচীন সংস্কৃতে “বেশ্বা” হইয়াছে; এবং বেশভূষা হইতে উহার ভুল উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে রাজাকেই “বিশ্ব-পতি” বলা হইত; রাজার সর্বসাধারণ আৰ্য্য প্রজামাত্রই বিশ্ব নামে উল্লিখিত হইত (ঋ৪-৫০, ৮; ৬-৮, ৪ প্রভৃতি; অথর্ক ৩-১; ৪-৮, ৪ প্রভৃতি)। আৰ্য্যদিগের জনবিভাগের সময়েও (ঋ২-২৬, ৩) বিশ্ব শব্দ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আৰ্য্যদিগের এক দলের সহিত অত্র দলের যুদ্ধের কথায় “বিশ্বং-বিশ্বম্” (ঋ১০-৮৪, ৪) পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ বলিতে পারি যে, বিশ্ব কথার উল্লেখ মাত্রই সমগ্র আৰ্য্যদল সূচিত হইত; কাজেই ঋষিই হউন, আর যিনিই হউন, সকলকেই বিশ্বশ্রেণী-ভুক্ত বা বৈশ্ব বলা যাইতে পারিত। ঋগ্বেদের ভাষায় অথবা প্রাচীন বৈদিক ভাষায় ঋ+ত্ অর্থ হইল সম্পৎ; এবং উহার উত্তর র প্রত্যয় দ্বারা নিদ্র “ঋত্র” অর্থ হইল ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ক্ষমতাশালী (ঋ১-২৪, ১১; ১-১৩৬, ১; ৪-১৭, ১; অথর্ক ৩-৫, ২; ৫ ১৮, ৪ ইত্যাদি)। প্রভূতা অর্থে এবং সম্পত্তি দান করিবার ক্ষমতা অর্থে দেবতাকেও বহু স্থানে ঋত্র বলা হইয়াছে। এ অর্থে ঐশ্বর্য্যশালী আৰ্য্যদলের যে-কেহ ঋত্রপদবাচ্য হইতে পারিতেন এবং হইতেন।

ব্রাহ্মণ শব্দের সাধারণ অর্থ মন্ত্র; তবে দুই এক

স্থলে এই শব্দ হইতে পুরোহিত অর্থও ধ্বনিত হয়। ঋহারা ঋষি হইতেন অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইতেন, তাহাদেরই নাম হইতে পারিত “বিপ্র”। বিপ্ অর্থ মন্ত্র; এবং উহার সহিত র যোগ করিলে মন্ত্রযুক্ত বা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থ হইত। যিনি বিপ্র হইতেন, তাহার পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোক অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন, বেদে একরূপ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা, ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদ ছিল না, কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় বলিয়া, ইহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখিতেছি না। এ কালের সকলেই জানেন যে পুরুষ বা প্রভূতি রাজারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন; এবং তাহাদের রচিত মন্ত্র সকল বেদেই স্থান লাভ করিয়াছে। রাজা বলিয়া কিংবা স্ত্রী-লোক বলিয়া ঋষি হইবার পক্ষে কাহারও বাধা ছিল না। রাজা না হইয়াও ঋহারা খাঁটি ঋষি, তাহারাও রাজত্ব পাইবার জন্ম দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এবং যুদ্ধে স্বয়ং সেনানায়ক হইয়া সৈন্যগণের সংখ্যা ও বলবৃদ্ধির জন্য দেবতা-দিগের স্তুতি করিয়াছিলেন (ঋ ১ম—৮ম এবং অন্যান্য সূক্ত)। আৰ্য্যারমণীরাও তখন যুদ্ধে যাইতেন; খেলের স্ত্রী বিশ্বপলার একখানি পা যুদ্ধে কাটা গিয়াছিল; এবং দেবতারা তাহার লোহার পা গড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ঋষি কক্ষীবান্ বর্ণনা করিয়াছেন (ঋ ১ম—১১৬, ১৫)। সকল শ্রেণীর আৰ্য্যনারীরাই যে দ্রুত গমনে এবং পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিতে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পটু ছিলেন, এই কথাই ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে দেখিতে পাই। আৰ্য্যনারী যদি তখন মন্ত্র গমনে প্রশংসিতা হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিবার ক্ষমতার কথা একটি বিশেষ দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইত না।

ঋষিগণ যেমন ধনরত্নের জন্ম প্রার্থনা করিতেন, রাজা হইবার জন্ম প্রার্থনা করিতেন, শতবর্ষ পরমায়ু প্রার্থনা করিতেন (ঋ ২-২৭, ১০ ও অন্যান্য), তেমনি শ্রেষ্ঠতম পাত্রীরূপে রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেন (ঋ ৫-৬১র সায়ণটীকা বিশেষ দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ-ঋত্রিয়-বৈশ্ব বলিয়া শ্রেণী-



রামের কোশলাকে স্বীয় বনবাস সংবাদ প্রদান । •  
( শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ঙ্গাহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত )

বিভাগ হইবার পরেও ঐ তিন শ্রেণী যে দ্বিজ-পদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। দ্বিজশব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আৰ্য্য-দলের সকল লোকই নিজে নিজে যজ্ঞ করিবার অধিকারী ছিলেন। ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন ভাষায় অগ্নিকে প্রথমতঃ “দ্বিজন্মা” বা “দ্বিজ” বলা হইত। তাহার কারণ এই যে অগ্নি দুইখানি কাঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন হইত (ঋ ১-৬০, ১এর সায়ণ-টীকা দ্রষ্টব্য)। অগ্নি-লইয়া-যজ্ঞকারীগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে অগ্নির দ্বিজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কার দ্বারা দুইবার জন্ম হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া দ্বিজ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা সুসাধ্য নয়।

উপরে ঋষিবর্গে রাজাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। উহা দেখিয়া কেহ কেহ অতি অস্বাভাবিক যুগের পৌরাণিকী কথা লইয়া বলিতে গারেন যে, কোন কোন ব্যক্তি হয়ত বা তপস্বী করিয়া ক্ষত্রিয় হুচাইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে কথা আদৌ সত্য নহে। বিশেষভাবে এ বিষয়ে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে;—এবং কেহ কেহ অতি ঐ শব্দরূপে বিশ্বামিত্র নামের “মিত্র” অংশটুকু বাঙ্গালী কায়স্থের মিত্র উপাধির সঙ্গে মিলাইতে চাহেন। বিশ্বামিত্রের ঋগ্বেদিক গল্প হইতেই পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, ইচ্ছা করিলে যে-কেহ আজ রাজার কার্য্য, কাল প্রজার কার্য্য ও অপর দিন মন্ত্রবাবসায় অবলম্বন করিতে পারিত। এই বিষয়ের দুইটি ঋগ্বেদিক উপাখ্যান বৈদিক গ্রন্থ হইতে দিতেছি।

বেদে বিশ্বামিত্র এবং দেবাপির যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাহা আমরা একালে ভুল বুঝিতে পারি; কিন্তু সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণসাহিত্য এবং বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, সমস্ত তাহার অমুসরণ করিয়া এই গল্প দুইটি পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

সূক্তপাঠের ফলশ্রুতি দেখাইতে গিয়া বৈদিক বৃহদ্দেবতায় লিখিত হইয়াছে যে, গাধিপুত্র (গাধি নহে) বিশ্বামিত্র প্রথমে রাজকাৰ্য্য করিতেন; এবং পরে ঋষিব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন পালি গ্রন্থেও ঠিক এইরূপ দেখিতে পাই যে, কোন কোন রাজা কেবল

নিজের ইচ্ছায় “ইসি পবজ্জা” (ঋষি হইবার জন্য প্রব্রজ্যা) করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র জাতিতে ছিলেন ক্ষত্র, পরে ব্রাহ্মণ হইলেন, এ কথা ঠিক নহে। বৃহদ্দেবতার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায় ঠিক এইরূপ লিখিত আছে—

প্রশাস্য গাং বস্তুপসাত্যগচ্ছং  
ব্রহ্মবিতামেক শতং চ পুত্রান্  
স গাধিপুত্রস্ত অগাদ সূক্তং  
সোমস্যামেতাগ্নেয়ং পরে ত।

ঋষিব্রত অবলম্বন করিয়া ইনি অনেক মন্ত্রের দ্রষ্টা বা সূক্তের দ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিবার পরই সুদাস রাজার কুলপুরোহিত হইয়াছিলেন; এবং বশিষ্ঠকুলের সহিত ইহার বিবাদ ছিল।

দেবাপির আখ্যান হইতে এই ভাবটি আরও পরিষ্কার হইবে। ঋগ্বেদের দুইটি পুত্র ছিল, যথা—(১) দেবাপি এবং (২) কৌরব শস্তনু (শান্তনু নহে)। জ্যেষ্ঠ দেবাপির চন্দ্ররোগ (ভগদোষ) ছিল বলিয়া, ঋগ্বেদে তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিলেও, তিনি রাজা হইলেন না। পরে প্রজারা শস্তনুকে রাজা করিল। শস্তনু রাজা হইবার পর ১২ বৎসর অনারুণি হয়; প্রজারা তখন এই দুর্নিমিত্ত জ্যেষ্ঠাতিক্রম কারণেই ঘটিয়াছে, স্থির করিল। শস্তনু প্রজাবর্গ সহিত দেবাপির নিকটে গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবাপি কহিলেন—“আমি ভগদোষী; রাজা হইব না। কিন্তু রাজা শস্তনুর পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ করিয়া বৃষ্টি করাইব।” দেবাপি পুরোহিত হইয়া যে যে ঋক্ উচ্চারণ করিয়া বৃষ্টি করাইয়াছিলেন, তাহা লিখিত আছে। ঐ ঋক্গুলি বৃষ্টি নামাইবার মন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন কালে আৰ্য্য বলিয়া যে একটি দল ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বহুপ্রকারের ব্যবসায়ভেদসত্ত্বেও জাতিভেদ ছিল না। তবে সেই যুগে আৰ্য্য এবং আৰ্য্যেতর দলের মধ্যে কি প্রকার প্রভেদ এবং সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

ঋগ্বেদে বর্ণ অর্থে সর্ষদাই ব্রহ্ম, বুঝা যায়; তবে

কয়েকটি স্থলে আর্যোত্তর লোক হইতে আপনাদিগকে বিভিন্ন করিতে গিয়া “আর্য্যবর্ণ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—ঋ ৩-৩৪, ৯। আর্য্যবিরোধী বা আর্য্য হইতে স্বতন্ত্র লোকদিগের নাম সর্বত্রই “দস্যু” এবং কোন কোন স্থলে “দাস” পাওয়া যায়। রক্তের বিভিন্নতা অনুসারে জাতির নাম, অর্থাৎ বর্ণভেদের কথা, কেবল এইরূপ স্থলেই পাওয়া যায়; অন্যত্র নাই। অতি অর্কাচীন বৈদিক যুগের কাঠকসংহিতায় ( ১১, ৬ ) বৈশ্বের গুরুবর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে; এবং কালক্রমে আর্য্যসমাজে আগত রাজ্যকে ধুব্রবর্ণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। বুকিতে পারা যায় যে, ক্ষমতাসালী দ্রবিড়বংশীয়েরা পদমর্যাদার বলে আর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ঋণী জাতিসাধারণ বা বৈশ্বের মধ্যে তখনও সম্ভবতঃ অন্য জাতি অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত অধিক পরবর্তী যুগেই শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ, বৈশ্বের পীতবর্ণ, রাজন্যের রক্তবর্ণ এবং ব্রাহ্মণের গুরুবর্ণের কথা পাওয়া যায়।

দস্যু এবং দাস বলিতে বৈদিক যুগে কাহারো সূচিত হইত, তাহার বিচার করিতেছি। দস্যু শব্দের আদিম অর্থ কোন জাতিবিশেষ বলিয়া মনে হয় না; কেবল শব্দ অর্থেই দস্যু শব্দ ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বৈদিক পণ্ডিত (Zimmer) জিয়ারের মন্তব্য এবং (Macdonell) ম্যাকডোনেলের সমালোচনা দ্রষ্টব্য ( Vedic Mythology, p. 158)। ঈরাণের ভাষায় দস্যুর অপভ্রংশ “দনুহ” শব্দ শব্দরূপে অধিকৃত প্রদেশ অর্থে ব্যবহৃত। দস্যু-মাত্রই এক জাতির লোক নহে বলিয়া কোথাও কোথাও এ শব্দে অতিমানব শব্দে সূচিত হইয়াছে (১-৩৪, ৭ ও অন্যান্য), কোথাও বা আপনাদের লোকের মধ্যে যাহারা যজ্ঞবিরোধী বা দেববিরোধী ( ১০-২২, ৮ ; ৮-৭০, ১১ ও অন্যান্য ), তাহাদিগকে দস্যু বলা হইয়াছে; কোথাও বা ঐ শব্দ দ্বারা অনাস বা ধর্ম্মনাস লোকের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের সকল শ্রেণীই আর্য্যের নিকট মূর্খবাক ছিল না; অর্থাৎ সকলেরই যে ভাষা তাঁহারা বুকিতে পারিতেন না, এমন নহে! ঋণী আর্য্যও যে বৈদিক দেবতাদিতে অবিশ্বাসী বলিয়া হীনভাবে উল্লিখিত

হইয়াছেন, তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে ( ঋ ১০-৩৮, ৩ )। আর্য্যোত্তর শব্দশ্রেণীর মধ্যে অনেককে “শিশুদেবোঃ” বা লিঙ্গপূজক বলা হইয়াছে ( ঋ ৭-২১, ৫ ; ১০-২৯, ৩ )।

“দাস” শব্দটি স্থলে স্থলে “দস্যুর” মত শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, সুস্পষ্টভাবে ঐ শব্দ দ্বারা একটি ক্ষমতাসালী জাতিকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাহাদের “পুর” ছিল, লৌহময় দুর্গ ছিল (ঋ ২-২০, ৮; ১-১ ৩, ৩; ৩০ ১২, ৬; ৪ ৩২, ১০ ইত্যাদি)। তাহারা বিশ্ব বা লোকসাধারণ লইয়া রাজ্য করিত (১-১২, ৪); এবং সামাজিক উন্নতির প্রভাবে এই দাসেরা একেবারে আর্য্য হইয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যাইত (ঋ ৫-৩৪, ৬)।

একালে কেহ কেহ “দাস” শব্দের উপর চটিয়া “দাস” স্থলে “দাশ” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটা সুবিধার কথা মনে করি না; কারণ বৈদিক “দাস” অনেক স্থলেই ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, দাসরমণী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদাহৃত কবচের মত অনেক ব্রাহ্মণ-বংশের জন্মদাত্রী হইতেন। কিন্তু “দাশ” যজুর্বেদেও মৎস্রজীবী ধৈবর জাতি ( ধীবর নহে ) অর্থে ব্যবহৃত।

বৈদিক যুগের শেষভাগে এ কালের জাতিভেদের মত জাতিভেদ সৃষ্ট না হইলেও, যখন কর্ম্ম বা ব্যবসায়ের হিসাবে ব্রাহ্মণ ও রাজ্য এবং বৈশ্ব শ্রেণীর বিভাগ হইয়া গিয়াছিল, তখন সামাজিক সম্মানে কে বড় ছিল, কে ছোট ছিল, তাহা বুকিয়া উঠা বড় সহজ নয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা মন্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, অর্থাৎ যাহারা পূজাপাঠ করিতেন, তাহারা দৈববিপত্তি অতিক্রম করিতে পারিতেন বলিয়া খুব সম্মানিত ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কৃত্রিম-বৈশ্ব-অভেদে যাহারা বিচারবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহাদের সম্মানও খুব কম ছিল না। বংশ-পরম্পরায় মন্ত্রের গ্রন্থ যাহাদের অধিকারে ছিল, এবং ঐ মন্ত্র মুখস্থ রাখিয়া যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাহারা যে মোক্ষবিষয়নিরপেক্ষ (secular) সাহিত্যের সেবাকারীদিগের সম্মান একেবারে ডুবাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা মনে হয় না। বেদ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দিব। দেবতাপূজার মন্ত্র-উচ্চারণকারীরা বৈদিক

যুগে ঋষি হইতেন; আর ঋষিগণ দশ জনের চিন্তাবিনোদনকারী, সাহিত্যরচনা করিতেন, বা লৌকিক কথার কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদের নাম হইত “কারু”। যে কারণেই হউক, ধর্ম-সাহিত্য বা ঋষিসাহিত্য রহিয়া গিয়াছে; এবং সুপ্রাচীন কারুসাহিত্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঋষিগণের বিজ্ঞা কেবল নির্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রের বাধ্যায় আবদ্ধ ছিল না, বরং সর্ব বিষয়ের আলোচনায় রত ছিল, তাঁহারা ভয়ের পাত্র ছিলেন না বটে; কিন্তু বেশ আদর ও ভক্তির পাত্র ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ক্ষমতাসালী রাজাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইতে না পারিলে যখন ধনরত্নলাভ করা সহজ হইত না, তখন রাজত্ববর্গের সম্মানও খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণের মন্ত্রশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এবং গৌরবের কথাই রক্ষিত থাকিবার কথা। কিন্তু লোকসাধারণের প্রাচীন সাহিত্যের অভাবে বৈদিক কতকগুলি উক্তি পরিদর্শন করিয়াই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী ব্রাহ্মণবর্গ আপনাদের কথা যতই বাড়াইয়া বলুন না কেন, অর্কাচীন যুগের শ্রেণী-বিভাগের দিনেও ঋত্বিয়ের প্রভাব অধিকতর বলিয়া স্বীকৃত হইত। দৃষ্ট হইতেছি।

অথর্ব বেদের পঞ্চম কাণ্ডে “ব্রাহ্মজায়াদেবতা” সূক্তে ব্রাহ্মণ-পত্নীর কথা আছে। ঐ সূক্তের প্রথম ঋকে মাতরিষার দোহাই দিয়া, এবং দ্বিতীয় ঋকে ব্রাহ্মণ-পত্নীর প্রতি সোম, বরুণ, মিত্র এবং অগ্নির বাবহারের কথা বলিয়া, তৃতীয় ঋকে কথিত হইতেছে—ব্রাহ্মণ যে রমণীর “হস্ত” ধারণ করিবেন, সকলে সেই রমণীকে ব্রাহ্মণের জায়া বলিয়া জানিবেন; তাঁহার প্রতি যদি কোন অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে রাজত্বের রাজা সুরক্ষিত রহিবে; কেহ তাঁহাকে কোন দৌত্যে প্রেরণ করিবেন না। চতুর্থ হইতে সপ্তম ঋকে আছে—যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পত্নীর অবমাননা হয়, বা তাঁহার প্রতি হীনীতিজনক কাণ্ডা কৃত হয়, সে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে।

অষ্টম এবং নবম ঋকে আছে—যে রমণী পূর্বে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরিক্ত অল্প দশটি পতিও লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ যখন সেই রমণীর হস্ত ধারণ করিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের জায়া হইলেন; এবং তখন ব্রাহ্মণই কেবল

তাঁহার পতি; অল্প কেহ তাঁহার পতি হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণই যে তাঁহার পতি,—কিন্তু রাজত্ব বা বৈশ্ব নহেন, এ কথা পঞ্চ জনের সকল মানবকেই সূর্যস্বয়ং বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তাঁহার পর দশম ঋকে একটি নজির দেখাইয়া, পরবর্তী কয়েকটি ঋকে ব্রাহ্মণপত্নী হরণের কুফলের কথা উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ-জায়াকে দেবতারা হরণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজারাও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা সকলেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন (১০)। রাজারা ব্রাহ্মণপত্নী প্রতাপণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং বিস্তৃত ( উরুগায় ) পৃথিবী সন্তোগ করিয়াছিলেন। যিনি ব্রাহ্মণপত্নী ফিরাইয়া না দিয়া বন্ধ করিয়া রাখেন, তাঁহার পত্নী বন্ধা হয়; তিনি শত সন্তানদায়িনী ( শতবাহী ) সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন না। তাঁহার পুত্রে যে পঞ্চ পর্য্যন্তও ফুটিবে না, এ কথাও ১৬ ঋকে আছে।

সূক্তটির শেষ ঋক বা অষ্টাদশ ঋকে আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীটি না পাইয়া অপহরণকারীর দ্বারে এক রাত্রিকাল দুঃখে অতিবাহিত করেন, তবে ঐ ব্যক্তির দোহা গাই পর্য্যন্ত দুধ দিবে না। এ অভিসম্পাত সে কালে খুব কঠোর ছিল।

ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজন্যাদিগের অমঙ্গল ঘটবার কথা আছে। কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষমতায় মত্ত হইয়া ঋষিদিগের পত্নী হরণ করিতেন, এবং পরে ফিরাইয়া দিলে ঋষিরা যে সে পত্নী গ্রহণ করিতেন, এবং অপহৃত পত্নী পাইবার জন্য রাজার দ্বারে প্রার্থী হইয়া যে দুঃখ-ভোগ করিতেন, এ সকল কথা পরিষ্কার বুদ্ধিতে পারা যায়। আরও অর্কাচীন যুগের ( কিন্তু আমাদের পক্ষে বেশ প্রাচীন ) অনেক সাহিত্যেই এই শ্লেষাত্মক কথা পড়িয়া থাকি যে, লোক অর্থেই বলবান্ হইয় এবং অর্থ থাকিলে মুর্থও পণ্ডিত হয়।—কথা এই—প্রাচীন কাল হউক; বা অর্কাচীন কালই হউক, চিরকালই অতি স্বাভাবিক নিয়মে রাজন্যবলই শ্রেষ্ঠ বল হইয়া আসিয়াছে। অর্থবলের জন্য মানসম্মতটা এই হীন কলিযুগেরই বিশেষ ধর্ম নহে। ঐ প্রকার সম্মান ভাল কি মন্দ, সে কথার



বিচারের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। বৈদিক যুগে যে-শ্রেণীর আভিভেদ এবং ক্ষমতাত্বেদ প্রচলিত ছিল, বলিয়া প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

## অবিচারের শেষবিচার \*

( চীন নাটক )

পাত্র-পাত্রী।

টৌঙাকৌ—চীন রাজ্যের সমরসচিব।

চীঙীং—যুত বিচারসচিব চাউতানের পুত্র যুত চাউছোর দ্বারকবিবাজ।

হান্গুয়া—টৌঙাকৌর অধীনস্থ সৈনিক কর্মচারী।

কোংলুন—চাউতানের প্রিয়বন্ধু এবং অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজসভাসদ।

চীং পৈ—চাউছোর পুত্র।

ইয়ফঙ—বিচার বিভাগীয় উচ্চতম কর্মচারী।

রাজকন্যা—চাউছোর পত্নী।

ছিয়াংছি বা পূর্বাভাষ।

চীন রাজসভায় যুবক টৌঙাকৌ বৃদ্ধ চাউতানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। এমন কি, ত্রিযুক্ত গুণ্ডঘাতকও বার্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

• চিন্‌রাজ লিও কোং ইউরোপীয় কোনো নরপতির নিকট হইতে চিংগাও নামক একটি দুর্দান্ত কুকুর উপহার পান এবং টৌঙাকৌকে তাহা রাজপ্রসাদস্বরূপ দান করেন। সে তাহাকে কাপ্লাডোসিয়ার সেন্ট জর্জের প্রক্রিয়ায় † শিক্ষিত করিতে লাগিল।

• অবশেষে, একদা টৌঙাকৌ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চিন্‌রাজকে সংবাদ দিল, চিংগাও কুকুর জনতার মধ্য হইতে বিশ্বাস-জাতককে টানিয়া বহিষ্কার করিতে পারে; এবং রাজসভাতেও সেরূপ দুষ্কৃত ব্যক্তির অভাব নাই।

রাজ-অনুজ্ঞায় ইন্দিতপ্রাপ্ত বুদ্ধিত কুকুরটি লিও কোংএর পার্শ্ব চাউতানের দিকে প্রধাবিত হইল। তন্মুহূর্তেই যদি সে পলাইয়া গাড়ীতে না উঠিত, চিংগাও তাহাকে কোনো ক্রমেই আশু রাখিত না।

\* চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মূলগ্রন্থ চাউ-চি-কৌ-এল (চাউবংশের অনাথ শিশু) চীন ভাষায় প্রণীত হয়। Jesuit missionary Du Halde সাহেব ইহার অনুবাদ করেন। তৎপরে ১৮২৬ আনুয়ারী মাসে নাটকখানি লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।

† শত্রুর আকৃতি অনুযায়ী অবিবর্তন ফাঁপা একটি চর্চামুষ্টি নির্মাণ পূর্বক পশাদির রক্ত ও অঙ্গ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সেইটির দিকে উপবাসী কুকুরকে লেলাইয়া দেওয়া হইত।

অনন্তর ধূর্ত টৌঙাকৌ রাজ্যের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে চাউতানের বংশ নিপাত করিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। ইহার পরেই রাজ্যে আদেশে চাউছো এবং তৎপত্নী রাজকন্যা ব্যতীত চাউতান সহ তাহার বংশের প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। দুর্ভাগ্য ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লিও কোংএর নাম জাল করিয়া রক্ত, বিষাক্ত মদ্য এবং একখানি ভুজালী চাউছোর নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার পছন্দমতো মৃত্যু-বাবু প্রার্থনা করিতে আদেশ করে।

• চাউতানের পুত্র চাউছো ভুজালী দ্বারা আশ্রয়িত্য করিবার পর, রাজকন্যা এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টৌঙাকৌর প্রাসাদ।

( টৌঙাকৌ আসীন )

টৌ। ভয় হ'চ্ছে, যদি চাউছোর ছেলেই হয়!—

যৌবনে সে যে প্রবণ শত্রু হ'য়ে উঠবে আমার!—রাজকন্যাকে বন্দী রাখাই ঠিক। রাত হ'য়ে এলো, লোকটা আসচে না কেন!

( সৈনিকের প্রবেশ )

সৈ। ঠিক—ছেলেই। সব্বাই বল্চে এই বাপহারা শিশুই চাউদের বংশধর।

টৌ। বটে!—এ-ই চাউদের—; আঃ গর্ভস্রাব হয়েও মরল না!—কী বিপদ! আচ্ছা, ঠিক হ'য়ে যাবে এখন—তা' দ্যাখ, হান্গুয়াকে খবর দে, আমার ছকুম, বিধবার সদর দরজার ওপর সে অনবরত যেন নজর রাখে। যদি কোনো রকমে ছেলেটা খোয়া যায়, হান্গুয়ার সমস্ত বংশের কাটা মাথাগুলো আগুন দিয়ে পোড়ানো হবে। সমস্ত সহরময় এই কথা রটিয়ে দিগে যা!—কারো কোনো ছল চাতুরী, কিছু খাটবে না; তা যদিই হয়, সব এক সাপটা হ'য়ে যাবে—হাঁ!

( প্রস্থান )

দ্বিতীয় দৃশ্য :—চাউ-কুঠী।

( বিধবা রাজকন্যার প্রবেশ )

রাজ-ক। বুক না ফেটে কি হৃদয় ফাটে না গো? ওঃ—অসহ! সব্বসেরে ফেলেছে, একটি মাত্র বৈচে, সবে মাত্র একটি, কোলের সেটি। যাবার কালে তিনি বলে গেলেন, দেখো, যদি ছেলে পাও, তাকেই চাউবংশধর বলে জেনো। মনে রেখো, উপযুক্ত বয়সে সে এই নীচ হিংসার

প্রতিশোধ নেবেই।—কী করে, ছেলেটাকে বাঁচাই!—  
কে আপনার লোক আছে, এ-কে রক্ষা করে? চিঙীং?  
—সে কি—?—বিশ্বাস করো? সে না তাঁর বড়  
আত্মীয় ছিল! বলি তো।

( ঔষধের বাগ্ন সহ চীঙীংএর প্রবেশ )

চী। ডেকেছিলেন? কেন মা!

রাজকুমারী। চীঙীং—! না, কাঁদবার সময় নেই;—  
দেখছ, বংশটাকে? কী করে লোপ পেতে বসেছে,  
বুঝছ? এ-ই একমাত্র পুঁজি; এর বাবা, কোনো মতে  
একে বাঁচাতে বলে' গেছেন; এর পরেই প্রতিশোধের  
ভার রয়েছে। কিছুতেই কি এ-কে বাঁচাতে পারো না  
চিঙীং?

চী। শোনেন নি বুঝি সে? সমস্ত সহরের দরজায়  
দরজায় হুকুম-নামার কাগজ লটকিয়ে দিয়ে টৌঙাক্কৌ  
রটিয়েছে, চাউ-শিশুকে বাঁচিয়ে কারুরই নিস্তার নেই,  
তা'কে সবংশে নির্মূল হ'তে হবে।—কী করে কি  
করি, মা?

রাজ-কু। কথায় বলে না, বিপদেই বন্ধ, চীঙীং?  
সমস্ত বংশটার এক ফাঁটা রক্ত এ, এ-কে বাঁচাও—এ-কে  
বাঁচাও বন্ধ!

( জাহ্নু পাতিয়া )

চীঙীং, দয়া কর, দয়া কর চীঙীং! তিন শো নরনারীর  
আশা এ, ভরসা এ,—এর দিকে চেয়ে এই প্রতিনিধিকে  
বাঁচাও!—অপত্যস্নেহে এ-কে বাঁচিয়ে দিতে বলছি,  
ভেবোনা।

চী।—না-না, উঠুন মা, উপায় ভাবুন! নিয়মে যেন  
গেলুম,—যখন টের পাবে সে—? ধনে প্রাণে ধ্বংস হ'য়ে  
যাব যে, মা!

রাজ-কু। ভেবো না।—বুঝেছি চীঙীং! এই সব  
গোল পরিষ্কার হয়ে যাবে। যতক্ষণ এ একেবারে নিরাশ্রয়  
অসহায় না হচ্ছে, ততক্ষণ এ-কে কেউ দেখবে না। আমার  
চোখে এই অশ্রু দেখ, আর, বিশ্বাস কর।

( আত্মহত্যা )

চী। আগে এ অনুমান করিনি। যা'ক, অনিবার্য—  
হ'য়ে গেল। এখন? পালাই!

( পেট্রায় শিশুকে লুকাইত করিয়া গ্রহণ )

ঈশ্বর, করুণা করো!—এই মাত্র বেঁচে,—সব গেছে।  
ধরা পড়ি যদি,—জানি, মৃত্যুই। না, বাঁচতেই হবে;—  
নইলে কিছুতেই চক্বে না। স্বর্গ মর্ত্যের কোনো সুখ  
চাইনে প্রভু, এ-কেই বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

( প্রস্থান )

তৃতীয় দৃশ্য :—চাউকুঠীর বহির্ভাগ।

( সৈন্য সহ হাঙ্কয়ার প্রবেশ )

হা। এই দিকে, ওদিকে, সে দরজাটায়,—ঐ গাছ-  
তলাতে সব দাঁড়িয়ে, সজাগ থেকে পাহারা দাও! সাবধান,  
ছেলেটা যেন স'রে না যায় মনে রেখো,—মাথা উড়ে যাবে  
তা' হ'লে ব'লে রাখছি—এই-ই হুকুম।—টৌঙাক্কৌ!  
বড়ই বেড়ে উঠেছে তুমি দেখছি; সইবে কি? আকাশের  
ভালো ভালো টানগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে—এ তুমি কি  
করছ, মূর্খ?—কে?—

( ভিতর হইতে বাগ্ন সহ চীঙীংএর প্রবেশ )

আটক কর এ-কে!—কে তুমি?

চী। কব'রজকে চেনো না হাঙ্কয়া

হা। এ ধারে, কোথেকে?

চী। ওষুদ দিয়ে এলুম এ বাড়ীতে।

হা। কী সে?

চী। যেমনটী বুঝেছি।

হা। —যা'ক, ও বাস্তবে কি?

চী। ঐ ওষুদ পত্তর।

হা। শুধু ওষুদ পত্তর?

চী। নয় তো কি?

হা। কিছু নেই আর?

চী। দেখতে চাও?

হা। না, যাও তবে চ'লে যাও।

( চীঙীংএর প্রস্থান )

শোনো চীঙীং!

( আহ্বান ও চীঙীংএর পুনঃ প্রবেশ )

সত্যিই বলছ কিছু নেই তোমার বাস্তবে!

চী। খুলে দেখিয়ে দিই।

হা। দেখো, শেষটার আবার—

চী। বলছি, দেখে নাও—

হা। আচ্ছা, যাও।

( চীঙীং প্রশ্নানোমুখ )

না, দাঁড়াও ;—চীঙীং, আমি তোমার নাক দেখতেই চাই। নিশ্চয় তুমি ছেলেটাকে নিয়ে চলেছ। দাঁড়াও। আমায় ঠকিয়ে যাবে ?—আমি জানি তুমি চাউদের নিমকুখোর। তোমার দৃষ্টি অমন কেন ? পালাচ্ছ, যেন দৌড়ের ঘোড়া ;—কিন্তু ফিরেছ, যেন চীনের পুতুলটা !

চী। আমি স্বীকার করি, হাঙ্কুয়া, আমার প্রতি চাউদের হাম্বামমতা ছিল। দয়া কর, আমায় সুবিধে দাও বন্ধু !

হা। কি ক'রে তা' হবে ?—প্রাণ বাঁচিয়ে তবে না তা' ?—তাই বা তুমি পারছ কৈ ?

( পার্শ্বচরের প্রতি )

স'রে যাও এখন, আমি ডাকুব।

( চীঙীংএর বাগ্ন খুলিয়া )

সুন্দর ওষুধ, চিঙীং—এ শিশু !

চী। ( সভয়ে নতজানু ) হাঙ্কুয়া, হাঙ্কুয়া,—নরকের বৃত্তান্ত কি কানে পৌঁছে নি ?—চাউতান কি প্রভুভক্ত ছিল না গো ? চিংগাওর দাঁতের পাটা থেকে নিষ্কৃতি পানবার জন্তে লিংচার \* সাহায্যে সে পাহাড়ে পালিয়ে গেল ; খোঁজই হ'ল না আর তা'র ;—জল-জলাট সংসারটা রাজরোষে উড়ে পুড়ে গেল, —একমাত্র —বন্ধু, —একমাত্র এই শিশু, বংশের প্রদীপটা নিভিয়ে দেবে ?—মানুষেরই প্রাণ তো তোমারও হাঙ্কুয়া !

হা। তুমি যদি জান্তে চীঙীং, কী অতুল ধনসম্পত্তি এই শিশুর মূলে টোঙাকৌ আমায় দেবে ! না, চীঙীং, হাঙ্কুয়াও মানুষ। সাবধানে এ-কে নিয়ে চলে যাও ভাই, দেবার মতো জবাব আমি দেবো তখন—যাও !

চী। বর্ধিত—চিরবাধিত হলাম, হে হাঙ্কুয়া, আমার হৃদয় তোমার নিকট পরম কৃতজ্ঞ হ'য়ে রইল।

( প্রশ্নান ও প্রত্যাবর্তন )

হা। ( চীঙীংকে নতজানু হইতে দেখিয়া ) ফিরেছ কেন ? ওঠ, যাও, চ'লে যাও,—খুব জোরে ছুটে চলে'

চাউতানের অমুগ্ধ-জীবিত জনৈক নগরবাসী।

যাও। না, না, হাঙ্কুয়া মিথ্যাবাদী নয় ; সে ছলনা করে না ; হাঙ্কুয়া,—প্রতি বাক্য তার প্রাণপণেই বলে।

চী। চমৎকার লোক তুমি হাঙ্কুয়া !

( প্রশ্নান ও পুনরাগমন )

হা। আবার—? বিশ্বাস করছ না বুঝি ?—ছি-ছি ! মনের বল কৈ তোমার ?—সাহসেরই যে খুব দরকার এখানে।—নইলে, কী ক'রে করবে এ গুরুতর কাজ ? আশ্চর্যসজ্জনে দৃঢ়তা নেই তোমার, আর ঐ ছেলেকে তুমি বাঁচাতে চাও ?—কে দিয়েছে এ কাজ তোমায় ? প্রয়োজন হ'লে, মরতেও হবে ;—পার ?—শিখেছ ? নইলে এ কাজ তোমার নয়কো ; যাও, প্রাণ-দানে নির্ভীকতা অভ্যাস কর গে, চিঙীং !—যাও !

চী। হাঙ্কুয়া ! হাঙ্কুয়া !—যদি ধরা পড়ি, মরব ;—কিন্তু এই অনাথটার কি হবে তখন, তাই ভেবে আকুল হচ্ছি ভাই ! না, আমায় ধর, নিয়ে চল, এতে তোমার যথেষ্ট পাওনা রয়েছে, হতভাগাকে নিয়ে একসঙ্গে ম'রে জঞ্জাল মিটিয়ে দিই।

হা। বিশ্বাস হচ্ছে না এখনো তোমার ? তবে প্রমাণ গ্রহণ কর বন্ধু. প্রাণের বিনিময়ে তোমায় নিশ্চিত ক'রে গেলুম।

( ছুরিকায় আত্মহত্যা )

চী। বড্ড জিতে গেলে হাঙ্কুয়া ! না, কেউ দেখে ফেলবে। তৈপীং গাঁ'র দিকে পালাই ;—সেখানে গিয়ে যা হয় ঠিক ক'রে ফেলব।

( নতজানু হইয়া হাঙ্কুয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রশ্নান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টোঙাকৌর কক্ষ।

( রক্ষী সহ টোঙাকৌর আগমন )

টো। ব্যস্ত কি !—হ'য়ে এল ? হাঙ্কুয়াকে পাঠিয়েছি—নিশ্চিত থাক ! আকাশে পালাবে ? হাসির কথা ?—কি জেনে এলি ?

( চরের প্রবেশ )

চর। খবর খুব খারাপ, ধর্ম-অবতার।

টো। খারাপ !—কি—সে, কী ?

চর। "রাজকন্যা, হাঙ্কুয়া, নিজে নিজে খুন হ'য়ে—

চৌ। এইও—চুপ! হাঙ্কুয়া!—আত্মহত্যা! অর্থ কি? আর গর্ভস্রাব সেই ছেলেটা? ম'রে গেছে? কী খবর নিয়ে এলি, কম্বল! এখন? দ্যাখ্ এই নে—হুকুম! রাজার নাম-সই?—এই;—দেখেছিস?— প্রতি গলির প্রতি প্রাণীর কানে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে দে, সবাইকে তাদের কোলের ছেলেগুলিকে নিয়ে আমার বাড়ী হাজির হ'তে হবে। না মেনে নিস্তার নেই, গোষ্ঠীকে গোষ্ঠী ধ্বংস ক'রে ছাড়ব। এইবারটা ঠিক হবে।—

(চরের প্রস্থান)

রাজার নাম জ্বাল করেছি। এক-একটা ক'রে সমস্ত ছেলেগুলোর মাথা উড়িয়ে দিয়ে—তবে অন্য কথা। নিশ্চয়ই, এদের মধোই, হতভাগাটা আছেই আছে।— ব্যস, এই ঠিক। কোপের মুখের পাথরকুচি সব—তুলোর মতো উড়বে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—তৈপীং পল্লী।

(তোমার সন্ধে চীঙীংএর প্রবেশ)

চৌ। ভয় খাচ্ছ চীঙীং?—সাবধান চৌঙাকৌ! নিজের প্রতি তোমার নিজেরই ঘৃণা হয় না?—জঘন্য! কী সাম্ভাব্যতক পাপ সে প্রচার করেছে;—নিরীহ শিশু-গুলিকে একে একে কেটে কেটে উড়িয়ে দেবে! খোকা, —খোকা,—কি ক'রে তোরে বাঁচাই। এই যে, তৈপীং পল্লী;—কোংলুনের বাড়ী এখানেই। রক্ত এখন অবসর নিয়ে বাড়ী ব'সে রয়েছে। চাউতানের বন্ধুতা—না, নিশ্চয়ই সে ভোলে নি। সে চাষা নয়।

(নিকটবর্তী অশ্বখবৃক্ষের পত্রাঙ্কুরালে বাগ্গটি রাখিয়া)

এইখানে থাক, খোকামণি।—এই যাব, আর ফিরব!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য :—কোংলুনের গৃহ।

(কোংলুন ও চীঙীংএর প্রবেশ)

কোং। .....না, আর কিছু দরকার আছে তোমার আমার এখানে চীঙীং?

চৌ। বাড়ী এসে বসেছেন, আর তো দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাই একবারটা নমস্কার করতেই আসা গেল।

কোং। খবর সব বেশ ভাল তো? ওঃ, বহুদিন ওদিকে যাই নি।

চৌ। কই আর ভালো! সেদিন আর নেই মশাই। চৌঙাকৌর দাপটে একদম সব অদল বদল হ'য়ে গিয়েছে।

কোং। রাজা কি আজকাল খুব ঘুমিয়ে পড়েছেন?

চৌ। আপনি ভুলে যান, দেখতে পাই! ইএকুনের সময়েও ধারাপ লোকের অভাব ছিল না, আর এত লিঙ্কোং। মন্দ যে, সে, দীশ্বরের পাশ কাটিয়ে চলে।

কোং। জানি চীঙীং, সব বুঝি; চাউতানের দুর্দৃষ্ট আমার অজানা নয়। হায়, একটা বিস্তীর্ণ বংশ লুপ্ত হ'য়ে গেল।

চৌ। রাজা ঘুমতে পারেন,—পুণ্য তা পারেন না। আপনার চোখে অশ্রু দেখছি, আর আশ্বাস করি না—দয়া করে' চাউএর ভিটার প্রদীপটুকু রক্ষা করুন।

কোং। কি বলছ পাগল?—গুছিয়ে সোজা ক'রে বল। অত বড় সংসারটা,—রক্তের নীচে তাদের কবর হ'য়ে গেল,—কেউ আছে কি বলতে পার?—চীঙীং—!

চৌ। দেখছি শেষটুকুই জান্তে পান নি। আমি সরিয়েছি—না, না, আমি পারি নি,—হ্যাঁ আমি লুকিয়েছি; পায়ে ধরি—চুপ করুন। ঐ গুন্বে—একুনি ঘসড়িয়ে টেনে নিয়ে গিয়েই টুকুরো টুকুরো ক'রে ফেলবে। শেষ—সর্বশেষ বেঁচেছে সেই শিশু;—হামাঙড়ি দিতে জানে না, এত ছোট্ট সে—

কোং। স্থির হও। কোথায় রেখে এসেছ তা'কে?

চৌ। রাজকন্যা মরে গেল। ব'লে গেল, একে বাঁচিও চীঙীং, নইলে একটা ব্যর্থ প্রতিহিংসা হা-হা ক'রে আকাশে আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। ছেলেটাকে নিয়ে বের হচ্ছিলুম, হাঙ্কুয়া ধ'রে ফেললে। শেষে নিজে আত্মহত্যা ক'রে আমায় ছেড়ে দিলে। আমি জানি আপনিই এদের আসল বন্ধু ছিলেন;—তাই, আপনার চরণেই আশ্রয় নিয়েছি।

কোং। ছেলে কোথায়, উত্তর দাও।

চী। সে—সে,—আচ্ছা, আমি তা'কে নিয়ে আসি।  
কোং। ঘাবড়াচ্ছ কেন ? যাও, নিয়ে এস।

চী। না, যাই, এই চল্লুম। ঈশ্বর ! তোমারই এই  
মানুষ ! এতক্ষণ হয় তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

(প্রস্থান)

কোং। তোমায় প্রশংসা করতুম চীণীং !—লাভ  
নেই ; আর তা ভূমি চাও-ও না। আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই  
টৌঙাক্কো ! মোহপাশের মতো, মহা পাপের মতো—  
উৎকট, আর কদাকার ! ছিঃ, জনসমাজে কেন জন্মেছিল !

(চীণীংএর প্রত্যাবর্তন)

চী। না, সে কথা শুনিয়াই যাই। সয়তান মন্ত্রী  
ছকুম জারি করেছে—

কোং। ও !—জানি। সব জানি !

চী। জানেন তবে। আপনি বলুন, নিশ্চিত হ'য়ে  
ছেলেটাকে আপনার কাছে দিয়ে মাই। এ দিকের ঋণ  
থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি অল্প কাজে যেতে পারি। খোকার  
অত-বড়ই আমার নিজেরও এক খোকা আছে।  
চাউদের বংশ রাখবার জন্তে আমি তা'কে বলি দেবো।  
নিরীহ শিশুদের বাঁচাবার জন্তে, ছেলের সঙ্গে সঙ্গে  
নিজের মাথাটাও এগিয়ে দেবো ;—খোকাকে লুকিয়ে,  
মান, টৌঙাক্কোকে খবর পাঠান, চাউপুলকে আমি  
লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু শতবার পায়ে পড়ি আমি  
আপনার, দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই পুণ্যের,—চাউ-  
'কুমারকে বড় করবার ভার আপনার ;—তাকে দিয়ে  
নিহত বংশের প্রতিশোধ তুলতে আপনিই রইলেন।—  
বলুন, স্বীকার করুন।

কোং। তোমার বয়স ?

চী। ৪৫এর এদিকে নয়।

কোং। তবে বোঝো। এখনও কুড়ি-টী বছর চাই  
তোমার, এ ছেলেকে দিয়ে প্রতিশোধ তুলতে। আমার  
বয়স তখন হবে ৯০ ; সে বয়সে কিছু করা আমায় দিয়ে  
সম্ভব মনে কর ?—ক্লেপেছ ?—শোন, ছেলে দিতে চাইছ  
তুমি ত, বেশ, নিয়ে এস তা'কে এখানে আমার এই  
বাড়ীতে। আমাকে ধরিয়ে দাও, তোমার ছেলেকে  
নিষ্ক্রে আমি চরম শাস্তি লাভ করি ;—এদিকে তুমি চাউ-

সন্ততিক পালন ক'রে মানুষ ক'রে তোলো। সুন্দর  
এই অবসর, এই সুযোগ। আর, ৬৫, সে ৯০এর চেয়ে  
ঢের যুবা ; নয় কি, চীণীং ?

চী। তা হোক, কৃতজ্ঞতার এত বেশী মূল্য আপনি  
দেবেন না, প্রু.—আমাকেই ধরিয়ে দিন।

কোং। মরা একটা বেশী কিছু নয়, বন্ধু,—ভেবে  
দেখ, কী গুরুতর কর্তব্য তোমায় নিয়োজিত ক'রে  
গেলুম। যাক—বাধা দিওনা ; আমি যা মনে করি,  
তা' করিই। ভবিষ্যৎ-বাণী করছি চীণীং, মনে রেখো,  
২০ বছর পরে আমাদের এই প্রতিহিংসার বিজয়দ্বন্দ্বি  
ঠিক—ঠিক বেজে উঠবে। আর, এ শরীরে, অত  
সুদীর্ঘ পরমাণু আমার, আশা করছ কি ক'রে, ভাই !

(চীণীং রক্তধাসে নীরব)

কোংলুনকে আসন্ন-পৃথিবীতে বিখ্যাত করেছিলুম, এ  
গর্ব্ব আমি করতে পারি। তা'র সন্ধান জানে, কী ছিলুম !  
নিয়তির ঝড়ে, একেবারে ভেঙে পড়েছি চীণীং,—কি  
করব ? এখন যা' এ দেখছ—খালি মলাট ; এর  
আসল আসল সব পাতাগুলো ঝড়ে ছিঁড়ে উড়ে  
গিয়েছে।—যাক,—

(দীর্ঘশ্বাস)

যা' বলি, পালন কর। এখনও যেটুকু পারি তা  
থেকে নিজেকে জুয়োচুরি ক'রে ছিনিয়ে সরিয়ে  
নেব না।

চী। ঈশ্বর ! একটি সুমহান্ আত্মা তোমার করুণার  
শাস্তি-ছায়ায় নীরবে তোমাতে ম'জে ছিল, নিরোধের  
মতো এখানে এসে আমি এ কী কর্তব্য !

কোং। চূপ কর উন্মাদ ! সত্তর আর কত এগুত ?  
হৃদনের আঙু পিছুতে আমার ভারী ব'য়ে যাচ্ছে !

চী। ভাবুন, ভেবে দেখুন আর একটা বার, কি  
সাম্বাতিক উত্তর দেবার জন্তে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই কাজ  
আপনি তুলে নিলেন !

কোং। ভুলে যাচ্ছ কোংলুনকে চীণীং ! বাতুল !  
তা'কে কি প্রতিজ্ঞা বল, যা সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই  
ভিতরে ভিতরে কাজ আরম্ভ না করে ?

চী। যাই হোক, ছেলেটাকে বাঁচানই চাই। কিন্তু

আপনি বেশ জানেন, সে দুর্ভাগ্য কি ভীষণ;—তা'র অত্যাচার সহ করতে পারবেন? সওয়াল জবাবের বেলা, যদি কোনরূপে আমার নাম প্রকাশ হ'য়ে পড়ে—সব মাটি হবে, সবাই নিপাত যাব, কোনো কাজই হবে না।

কোং। না বুঝে প্রতিজ্ঞা করাই আমার চির রোগ, ভাবি, পরে। যতই বিপদ দেখি, ততই তাকে পা'র তলায় চেপে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলতে থাকি। এই ক'রে সাড়ে তিন কুড়ি বছর গেল;—আজ ছোটো 'বুড়ো গাধা' 'সাদা চুলো সয়তান' সম্বোধনে পিছু লাফ দিয়ে অপঘাতে আত্মহত্যা করুব?—ছোঃ! কিছু চিন্তা করতে হবে না,—কর্তব্য ক'রে যাও, বুদ্ধের নীতিবাক্যই এই।

চৌ। তবে আর সময় নেই দেবতা। পুত্রদের নিয়ে আসি। পৃথিবীতে আমি না তুমি,—কে মানুষ, তার বিচার একদিন হবেই; তুমি জিতে আমাদের জিতিয়ে নেবে, এ স্পষ্ট-দেখতে পাচ্ছি।

(নতজান ও প্রস্থান)

### তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য:—টৌঙাক্কোর প্রাসাদ।

(পার্শ্বের সহ টৌঙাক্কোর প্রবেশ)

টৌ। হাতছাড়া হ'য়ে পালালই শেষটায়! টৌঙাক্কো? —সে আঙন জালায়। তা' দিয়ে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে। পৃথিবীকে পুড়িয়ে, সাদা ছাই তৈরী ক'রে, হাসতে হাসতে শূন্যে মুঠোয় মুঠোয় উড়িয়ে দিয়ে রগড় দেখে!—কাল-বৈশাখীর ভৈরবী শক্তিতে তা'র প্রতি-লোমকূপ অনুপ্রাণিত.—অথচ গোপন, অথচ নির্ঝাঁক, মৌন সে। আর তিন দিন। আর, তিন দিন। এর পরেই আমি শত্রুশূন্য হব। ছেলেটা যদি চাউদের একটা ছেলে মা'ত্রই হ'ত—ভাবতুম না। ওর মধ্যে বিরাট একটা সংসারের বিশাল প্রতিহিংসা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠছে। হতে দেওয়া হবে না, ছিনু রাজ্য শিল্পশূন্য ক'রে আমি নিষ্কণ্টক হব।—কে?

(চৌঙাংএর প্রবেশ)

চৌ। (আপন মনে) ছোট সেই খাতাখানা। এক পৃষ্ঠাও লেখা হয়েছে কি না—হয়েছে, অমনি সেটা শেষ হয়ে

গেল, বাস! সে একখানা ক্ষুদ্র ইতিহাস; আমার ছেলেটার।

(দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে)

কর্তব্যের বরদান যাই হোক, তা'র পূজা যে বড় মন্থস্তদ তর্কিত আর সন্দেহ নেই।

(চিন্তা ও দীর্ঘশ্বাস)

যাক, রেখে এলুম তা'কে। এখন, স্থির হও আকাশ, শান্ত হও বায়ু, কোংলুনের জামায় আগুন লাগিয়ে দিই।

(প্রকাশ্যে)

কে তুমি সৈনিক, জানাও, আমি হারাণো ছেলের খবর পেয়ে এসেছি।

সৈ। সে কি! কে তুই সয়তান? ও, আপনি? দাঁড়ান।—হুজুর, ইনি কি বলবেন।

টৌ। গ্যা? কে?—কি?

চৌ। গরীব—তৈমজাজীবী। নাম আমার চৌঙাং। চুপ্ কর সৈনিক। বন্দাবতার, আমি চাউশিগুর উদ্দেশ পেয়েছি।

টৌ। কী, কী বলছ?—তা'র খবর এনেছ?—কোথায় সেই শত্রুর শেষ?

চৌ। বুড়ো কোংলুন—!—আঃ, চুপ্ কর সৈনিক। লিউ-লিউ-তৈপীং গাঁর নাম শুনেছেন অবিশ্রি বোধ হয়। আর, কোংলুনকেও আপনি খুব ভালই চেনেন,—নয় কি?

টৌ। যাক,—আচ্ছা,—কি ক'রে তুমি এ টের পেয়েছ?

চৌ। তিনি আমার পরিচিত। একটা পরামর্শ নেবার জন্তে সেদিন আমি তাঁর ওখানে যাই। তাঁর শোবার ঘরে একটি শিশুকে দেখতে পেয়ে ভাবলুম, নিঃসন্তান বুদ্ধের কে এ? এল কোথেকে? সন্দেহ হ'ল, এই সেই চাউদের ছেলেটা নয় তো! জিজ্ঞেস করলুম;—আর, অমনি তাঁর মুখশ্রী বিবর্ণ হয়ে উঠল, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীরবেই রইলেন তিনি।—সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল—

টৌ। নিকালো সয়তান!—এ শত্রুতা তোমার! কোংলুনকে আমি খুব ভালো জানি।—না-না, সত্যি বল, নইলে মনে রেখো, তুমি আর জীবন্ত থাকবে না।

চৌ। রাঙন! আমি বলব,—সত্যিই বলব।

কোংলুনের সঙ্গে আমার কেন, কা'রো কোনো শক্রতা নেই। তবুও এলুম,—কর্তবোর দায়ে। তারপরে আমার স্বার্থ রয়েছে এ-তে। আমি নিঃসন্তান নই। সমগ্র রাজ্যের শিশুগুলির হত্যার আর্তনাদ আমি কল্পনা করে শিউরে উঠছি।—পারি নি আমাকে সম্বরণ করতে।—ছুটে এসেছি—ছুটে এসেছি প্রভু! হয় তো সে হতভাগা আপনার কাছে একদিন বে'র হয়ে পড়বেই, কিন্তু, আজ আমার যা ক্ষতি হয়ে যাবে, পৃথিবী-সমুদ্র ওলট পালট করেও তা আর পূরণ করতে পারব না।

টৌ। (সোল্লাসে) ঠিক, তোমার অনুমান ঠিকই চাঁড়ীং। হাঁ, সে একদিন চাউতান কুকুরেরই বন্ধু ছিল বটে, মনে পড়ে গেল।

(পারিপার্শ্বিকের প্রতি)

সৈন্ত;—কোংলুন না পালায়।

• দ্বিতীয় দৃশ্য :- কোংলুনের আশ্রম।

(কোংলুনের প্রবেশ)

কোং। বেঁচেও পারতুম। তবু মরাছি। কৈফিয়ৎ? —নাই! আমি স্বাধীন জীব। সে, কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না। তাঁর উদ্দেশ্য রহস্যময়ই থাকুক। ধুলো উড়ছে, না?—বাস্,—এল। হাঁ, প্রস্তুত। মৃত্যু! চিরদিবসের মতো আমি তোমায় উপহাসই করি।

(সৈন্ত সহ টৌগাকৌ ও চাঁড়ীংএর প্রবেশ)

টৌ। এই বাড়ী, চাঁড়ীং?

চাঁ। এই বাড়ী।

টৌ। এই যে তুমি সেই ধূর্ত গাধা কোংলুন। কোংলুন, তোমার সাহস ও স্পর্ধা হাশ্বোদ্দীপক।

কোং। (স্বগতঃ) অভিনয় করতে হবে। (প্রকাশ্যে)

কি বলছেন আপনি, সচিব!

টৌ। সুন্দর পছন্দ এই বুড়ো শেয়ালটার!—রাজ-প্রতাপকে ঠেলে ফেলে মরা চাউতানের বন্ধুতাকে সম্মান দিয়েছে। প্রেতলোকে সে তোমায় এর প্রতিদান দেবে, নিও। কেন তুমি চাউছোর শিশুটিকে লুকিয়েছ মর্কট?—স্বাভাব দাও।

কোং। কি বলছেন প্রভু? আমি ঘাড়ের উপর একটা মাথা নিয়েই ঘর করি।

টৌ। স্তব্ধ হও ভণ্ড!—এই তুমিই স্বীকার করবে জানি, কিন্তু সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয় না।

(সৈন্তের প্রতি)

চাবুক।

(শাস্তি চলিতে লাগিল)

কোং। হে ধর্ম—হে ধর্ম—বিনা প্রমাণে শাস্তিলাভ করি সাক্ষী হও। হে আকাশ—হে মৃত্তিকা—মহাপ্রলয়ের দিনে ইশাদী তোমরাই, দেখ, বিনা বিচারে আমার শাস্তি হয়।

টৌ। চাঁড়ীং মিথ্যা বলেছে?—বিনা প্রমাণে!

কোং। চাঁং—ইং?—তুমি!—রাজসচিব, ওর কথা আপনি শুনেছেন!—ও ছুনিয়ায় একটি অদ্ভুত চিহ্ন। আর, এত পিপাসা আপনার মন্ত্রী মহাশয়, যে, তিন শত ব্যক্তির রক্তেও তা নিবারিত হয় নি, এই কচি প্রাণটা—

টৌ। মুখ বন্ধ কর চাষা, শুনতে আসি নি তোমার ঐ উন্নতের প্রলাপ—মুম্বুর বিকার-উক্তি। লুকিয়েছ ঠিক। বাঁচবার আশা থাকে, বে'র কর, ছেলে চাইই আমি।

কোং। না-না, আমি জানিনে, লুকুই নি, কেউ দেখেনি, কাউকে বলিনি,—যে খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা রটিয়েছে।

টৌ। তবুও!—চাবুক—খুব জোরে চাবুক!—বল কি না দেখছি।

(শাস্তি)

চাঁড়ীং, তুমি অভিযোগ করেছ, তুমিই ঐ পাকা মেড়াকে চাবুকে স্বীকার করাও।

চাঁ। বৈদ্যকে এ আদেশ দেবেন না প্রভু; সে, লাঠি নয়, ঔষধ প্রয়োগই শিখে এসেছে এতদিন।

টৌ। চাঁড়ীং কোংলুনকে ভয় কর? তবে ওকে ধরিয়ে দেবার এত সখ হয়েছিল কেন? টৌগাকৌর পরিচয় অতি সহজ চাঁড়ীং!

চাঁ। (স্বগতঃ) শেষটায় এও হবে! নিরুপায় আমি; সামনে কর্তব্য; অনেক এগিয়েছি, আর ফিরবার জো নেই।

(প্রকাশ্যে)

—কি করব বলুন !

( ষষ্টি গ্রহণ )

টৌ। ওতে হবে না, শক্তখানা নাও--বড় দেখে।  
আমি বলছি, কোনো ভয় নেই তোমার।

চৌ। এবার ?—

( মুণ্ডর গ্রহণ )

টৌ। কী আরম্ভ করেছ এ ? ঐ মুণ্ডরের এক  
আঘাতও কি সহ করতে পারবে ঐ জীর্ণ সয়তান ?—  
কা'কে স্বীকার করাবে তা হ'লে ?

চৌ। তবে করতে বলেন কি আমায় ?

টৌ। না-ম'রে-না-ম'রে অস্বভাব করবে এবং টৌঙা-  
কৌকে ভালো ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে বুঝবে  
—এই আমি চাই। বুড়ো গাধা, আমি টৌঙাকৌ।

চৌ। (স্বগত) আকাশের দেবতা তা'কে দয়া করুক।  
( প্রকাশে ) কোংলুন ! দোষ মেনে, ছেলে দিয়ে ক্ষমা  
নেওয়াই কর্তব্য ; এ খামকা কষ্ট পাচ্ছ।

( শাস্তি )

কোং। (মুদ্রিত নেত্রে স্বগতঃ) ছিঁড়ে গেল, ছিঁড়ে গেল,  
বুদ্ধ জীবনের শিথিল গ্রন্থিগুলি, টুকুরো টুকুরো হয়ে' খুলে  
খুলে যাচ্ছে। এত শেষ ভবিষ্যৎ—অন্তিম নিয়তির জন্ম  
আজীবন প্রতীক্ষা ক'রে ছিলুম !—না না, কর্তব্য যেন  
না হারাই ;—অভিনয়ই সম্পূর্ণ হোক ! ( প্রকাশে ) কে  
তুমি আমার পেছনে লেগেছ ?

টৌ। চৌঙীংকে তুমি খুব ভালো করেই জানো বোধ  
করি।

কোং। কী—! ( চক্ষুরান্মীলন ) চৌঙীং।—সুন্দর !

( বসিয়া পড়িল )

চৌ। শুনবেন না প্রভু, এ সব বজ্জাতি।

কোং। কী শক্রতা ছিল, কী করেছিল এ বুদ্ধ  
তোমার চৌঙীং, যে, তুমি—

চৌ। হুরসৎ নেই, শীঘ্র বল, তুমি স্বীকার কর।

কোং। করতেই হবে সব—! তবে স্বীকার করি।

চৌ। হাঁ প্রাণ মহার্ঘ ; তা'কে বাঁচাও,—স্বীকার কর  
—কর !

কোং। টৌঙাকৌ, স্বীকারই যখন করছি, তখন বলি,  
আমরা দুজনেই লিপ্ত।

টৌ। ধন্যবাদ দিই তোমায়। জীবন মঞ্জুর করব,  
সত্য বল তোমার অন্ত সাথী কে ?

কোং। বলব ? না, সে আর কি ক'রে বলি ?

টৌ। ইতস্ততই করছ তবু ?

চৌ। ' বুড়ো শকুন, আঃ, কী সব শুরু করে দিয়েছ ?  
সে সম্পূর্ণ নিরীহ।

কোং। আমি কোংলুন চৌঙীং ! আমায় কারো ভয়  
নেই, মনে রেখো।

টৌ। কে দুইজন ?—পাজি ! বল না !—একি !

কোং। চূড়ান্ত শাস্তিতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ,  
দেখছ না টৌঙাকৌ সাহেব ! সবুর—সবুর !

টৌ। খালি বাজে সময় নষ্ট। নাঃ, ও হবে না।  
তোমার শাস্তি যত্ন। মেরে ফেলে দাও গাধাটাকে।

সৈন্ত। জয়—জয়—জয় প্রভু ! খুঁজে খুঁজে আঁশের  
কুঠুরীটাতে সেই ভয়ঙ্কর ছেলেটার পাতা হয়েছে।

টৌ। ( লক্ষ্যে ) বটে !—এই সে ! —বাঃ !—  
নিয়ে আয়ত সয়তানের বাচ্চাটাকে দেখি। ওর গরম  
গরম তাজা রক্ত দিয়ে, আমার জুতো জোড়াটা থেকে মাথার  
টুপীটা পর্যন্ত লাল রঙে রাঙিয়ে খুসী হই ! ভণ্ড ষাঁড় !  
এখন এ কী দেখছ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে ?—বলোছিলে  
কি ? বা—, বাহবা—তোফা, তোফা—এই এক, দুই,—  
তিন—

( ভুজালী দ্বারা শিশুর হৃদয়ে তিনবার আঘাত )

চমৎকার, শেষ !

( চৌঙীং এই সময় দুই হাতে সবলে স্বীয় বক্ষ

চাপিয়া ধরিয়া রহিল )

কোং। টৌঙাকৌ ! চণ্ডাল ! অদ্বুত প্রেত তুমি ;  
কিন্তু সাবধান সয়তান মনে রাখো, কালো শতায় অগ্নি-  
বর্ণের কালীতে পাপ লেখা প'ড়ে গেল তোমার। ক্ষমা  
নেই তোমার, মার্জনাও নেই। বাঁচবার আশ্রয় রেখে  
একাজে হাত দিইনি, তাও বলে রাখি। পথ বেছে  
নিইছি নিজেই,—বসো, আসি।

সৈন্ত। কোংলুন আয়তহত্যা ক'রে প'ড়ে গেল।

টৌ। রসাতলে যাক্ সে, মরুক। শুনিয়া তা'র  
কোনো কথা আর। খুব করেছ চৌঙীং তুমি আমাব,  
চলুতই না কিছুতে তুমি না হলে।



চী। • পূর্বেই বলেছি দয়াময়, কারো সঙ্গে শক্রতায় আমি এ কাজে হাত দিই নি। রাজ্যের ছেলেগুলোকে, আর, • আমার নিজের বাছাকে বাচাবার জন্যেই আমার এত চেষ্টা।

টৌ। বিশ্বস্ত বন্ধু তুমি চীণীং, এস, আমার বাড়ীতে তোমার স্থান। আমার প্রতি সম্মান—তোমার। ছেলেকেও নিয়ে চল। সে লেখাপড়া শিখবে। যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হবে। এ বয়সেও আমি অপুলক কি না, • তাকেই পোষা গ্রহণ ক'রে আমার পদে প্রতিষ্ঠিত করব ;—চল।

চী। অযোগ্যের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহে আমি কৃতজ্ঞ ; হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিই আপনাকে।

• টৌ। চুপ্। চল এস। আমি এখন বড় ঠিক নেই। একটা ভীষণ ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

( সকলের প্রস্থান )

### চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টৌঙাক্কোর প্রাসাদ।

( টৌঙাক্কোর প্রবেশ )

• টৌ। চাউদের শেষ শিখা নিভিয়ে দিয়েছি—আজ কুড়ি বছর। চীণীং ছেলে দিয়েছে। নাম রেখেছি, টৌচিঙ্। সে শিখছে। যুদ্ধের আঠারো রকম কৌশলেই সে এমন সুদক্ষ হয়ে উঠেছে, আমার নীচেই সে এখন। সুন্দর বড় হ'য়ে পড়েছে এরই ভিতরে। হাঁ, লিঙ্কেংকে সরাতেই হবে ; সিংহাসন আমারই। আর, টৌচিঙ্কে তা' স্বৈচ্ছায় অবলীলাক্রমে দান ক'রে সুখী হব, অভিপ্রায় করেছি। এ নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ আমার। কে ওন্টাবে? টৌচিঙ্ বুদ্ধি এখন লেখাপড়ায় ব্যস্ত। আচ্ছা ফিরে আসুক ; সে সব সবুরে হব।

' ( প্রস্থান। কিয়ৎকাল পরে অনাদিক দিয়া এক বাণ্ডিল কাগজ হস্তে চীণীংএর প্রবেশ )

চী। কেমন টুক ক'রে সময় চ'লে যায়! টৌঙাক্কৌ এই কুড়ি বছর ছেলেটাকে ভারী আদর করে' শিখিয়ে পড়িয়ে বাড়িয়ে তুলছে। আসল ঢাকা পড়ে আছে,

এ সেও জানে না, ওও জানে না। বুড়ো হয়ে এলুম, যদি মরি, সব নষ্ট হবে ! মুস্কিল ! আগাগোড়া সকল বাপার এই কাগজে আমি আঁকিয়েছি ; দেখে সে যখন নিশ্চয় পুছবে—সব খুলে বলব তা'কে আজ। পারে না সে প্রতিহিংসা ভুলতে, যদি শোনে,—ঠিক ভুলবে না। পাঠ-মন্দিরে গিয়ে একটু প্রতীক্ষা ক'রে বাস।—হাঁ।

( প্রস্থান। কিয়ৎকাল পরে অদিক দিয়া রক্ষীবেষ্টিত টৌচিঙ্ নামধারী-চিংটৈপের প্রবেশ )

চীণ্। ঘোড়া নিয়ে যা—বাবা কোথায় ?

সৈন্। তিনি পড়ছেন।

চিং। বল, আমি এসেছি।

সৈন্। ( প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশান্তর ) আসুন।

( প্রস্থান )

দ্বিতীয় দৃশ্য :—পাঠ-মন্দির।

( চীণীং )

চী। কত দামী জিনিস সঙ্গে ক'রে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছ তুমি চাউ-পরিবার ! আমার একমাত্র সম্মান—হোঃ—সে কথা আর না, এখন দেখি খুঁয়োর নীচে আঙুন কতটুকু আছে।

( চিংটৈপের প্রবেশ )

চিং। এইমাত্র এসে পৌঁছেছি বাবা !

চী। খাবার খেয়ে এস গিয়ে, যাও।

চিং। বাবা ! রোজ ফিরে এসে আপনাকে ভারী খুসী-খুসী দেখি, আজ আপনার স্বর দুঃখপূর্ণ, চক্ষু অশ্রুবহ—কী এ ? কোথাও কি কিছু অবমান পেয়েছেন ?—বলুন !

চী। তা'র উৎস যে কোথায়— তা' বলতুম এবং বলবও। যাও আগে খাবার খেয়ে এস।

( চিংটৈপের প্রস্থান )

আর পারিঁনা—

( দীর্ঘশ্বাস )

এইবার শেষের আদ্যারস্ত। হৃদয়—ওরে হৃদয় ! আমি তোমায় জানি।

( অদুলী হার্ন বকে আঘাত )

টোঙাকোঁ! ঈর্ষায় ঈর্ষায় একটা অস্বাভাবিক চর্গকের মতো হয়ে উঠেছ তুমি। দানবী পাপের জমানো বরফও তোমার ন্যায় আরক্ত উত্তপ্ত নয়। তুমি, কি?—তুমি, কি?

( চিংপের পুনঃ প্রবেশ )

চিং। না, আপনি বলুন, কে আপনার অবমান করেছেন?—আমি কেমন একটা অশাস্তি ভোগ করছি;—বলুন!

চী। আসছি এক্ষুনি, এসে বলছি সব, বস বৎস।

( প্রস্থান )

চীং। বাণ্ডিলটাতে কি আছে! ছবি। এ কি ছবি সব!

( থলিয়া দেয়ালে রক্ষা )

কী—কী ছবি এ সব—! রক্ত-বস্ত্র পরে' কে ঐ লোকটি কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে কালো পোষাকপরা ভদ্রলোকটির দিকে? কে এ? টোঙাকোঁ না? কুকুরটাকে মেরে ফেলে' এ-ই বা কে ভাঙ্গা চাকার গাড়ী ধরে রয়েছে? এ সবে মানে কি! কিচ্ছু লেখাও নেই যে। আবার, এ ভদ্রলোকটি কে?—রজ্জু, বিষাক্ত মদা, ভুজালী তাঁর সামনে,—কে? ঈস, আত্মহত্যা ক'রে ফেলেন! ঐ যে বৈদ্যের পা'র তলায় নতজানু বিধবা মহিলা, ছেলে কোলে,—এ কেন?—কি প্রহেলিকা! ইনিও আত্মহত্যা কল্লেন!—উঃ! যাক্,—সমস্ত ঘটনার মূল কে শুনতেই হয়েছে আমার।

( চীংএর প্রত্যাবর্তন )

চী। পুত্র, আপন মনে কি ব'কে যাচ্ছ?

চিং। দয়া করে বলুন পিতা, কি এ সমস্ত ছবিতে? আমি ভারী ব্যগ্র হয়েছি।

চী। বলি। শোনো, এই ঐতিহাসিক ছবির সঙ্গে তোমার সমগ্র জীবন ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ রয়েছে,—শোনো। রক্তবস্ত্র পুরুষটিকে দেখছ, ঐ? ও একজন বোকা।

( ইত্যাদি পূর্ব ঘটনা বর্ণন )

চিং। ( নীরব। নানাভাবে প্রবুদ্ধ )

চী। ক্ষুধিত হিংসা এবার শুষ্ককণ্ঠে ফুসফুস হয়ে উঠল। রক্ত চাই—মাংস চাই, এ চীৎকার কত

ভীষণ! সম্মুখে যা'-যা' পড়ল, সব ফেটে চূর্ণমার হয়ে গেল; প্রলয়ের পর প্রলয়,—প্রলয়ের পর প্রলয়,—সে কি শুনবে? শুনতেই চাও কি?—বিপুল পরিণয়,—উড়ে গেল! নক্ষত্রসমষ্টি ভেঙ্গে ছিঁড়ে পড়ল! রইল, না—সে কথা থাক। হাঙ্কুয়া কোংলুন আত্মদান ক'রে তা'কে রেখেছে; সে ঘুমাক্। শান্তিতে আছে সে,—না, সে ঘুম তার ভেঙ্গে কাজ নেই।

চিং। না-না, বলুন—'চীংগীং' কে?—আপনিই কি?

চী। কত চীংগীং আছে!

চিং। আছে। কিন্তু, এমন চীংগীং? এ কি মানুষ?—মানুষের সংজ্ঞা কি, পিতা?

চী। সংজ্ঞা নাই—সংজ্ঞা নাই—তা'র হৃদয়ই নাই যখন, তখন কী আছে তা'র? এক কড়ার বিশ্বাস করি না তা'কে! বিকট, জঘন্য সে!—জ্বলন্ত অদ্বুত!

চিং। আপনি বলুন, খুলে বলুন, আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছি; কি ক'রে ফেলব এখন, সাবধান! বলুন, কোথায় সেই ছেলে?

চী। না-ই! সে ছেলে নাই, সে ছেলে নাই! অথচ সে ছেলে আছেই! কুড়ি হ'ল বয়স তা'র, পুরো চার হাত উঁচু সে, লেখা পড়ায় পণ্ডিত, শাস্ত্রবিজ্ঞানে সুনিপুণ,—আর, তা'র মা, বাপ, ভরা সংসারের সবখানি নিষ্ঠুর হত্যা-মৃত্যুতে একেবারে বিলুপ্ত;—জড়, কাঠের পুতুল সে সন্তান, চিংপৈ!—তবু সে আছেই?—আছে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, ম'রে, প'চে আছে।—ইস, অপমানিত বংশ, উৎসাদিত পূর্বপুরুষ,—আর, দক্ষভাগ্য সেই সন্তানের, সে আত্মবিস্মৃত, পরানুগৃহীত। চিংপৈ! চিং! সে মহা হত্যার প্রতিশোধ এখনো বাকী আছে। কাজ নেই তা'র স্বাভাবিক অবস্থাতে থেকে;—সে পুত্র ক্ষেপে খুনে ডাকাতির দলের মতো দপ্ ক'রে একেবারে অ'লে উঠুক! হতায় হতায়, সংহারে ধ্বংসে মহাপ্রলয়ের তুমুল ঝটিকা তুলে দিক! পাহাড়ে সাগরে ঠোকাঠুকি লেগে ছীন্ সাম্রাজ্য গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাক্! শত্রুর রক্ত দিয়ে এই পটের প্রতিমূর্তির ঠোটে ঠোটে হাসি আঁকিয়ে দেখাক্!—তবেই কর্তব্য তা'র চরিতার্থ;—তবেই পুত্র সে পিতার!

চিং। শরীরে বিদ্যৎকনা অনুভব করছি পিতা, স্পষ্ট বনুন,—কা'কে লক্ষ্য করে এ কী বনুছেন ?

চৌ। কুন্ডে পার নি!—বুঝতে পার নি, কি বলছ পাগল! চৌঙাকৌকে জান ন? পিতামহ চাউ-তানের নীম শোন নি?—পিতা চাউছো?—মাতা রাজকণা? ক্ষুদ্র চীড়ীং? সকলের চাইতে এই কথাটা বুঝতে পার নি কি, যে চিংপৈ, সেই চাউদের এক মাত্র বংশদুলাল, তিনশত পিপাসিত আত্মার পানীয় শোণিত দিবার জন্যে কেবল রয়েছে—তুমি—?

• চিং। • কী?—কী বনুছেন ?

( বসিয়া পড়িল )

চৌ। ওঠো! জাগো! প্রবুদ্ধ হও!—ভুলো না তোমার প্রতিহিংসা রয়েছে। ওঠো! জাগো! প্রবুদ্ধ হও! শোনো, প্রেত-আত্মা-সমূহ ঐ অনবরত ডাকে, তোমারেই! ওঠো! জাগো! প্রবুদ্ধ হও!—

• চিং। (প্রতি উচ্চারণে আন্তে আন্তে উঠিয়া দাঁড়াইল) আজ—নূতন নহে; সত্য-জীবনের সন্তোগ আরম্ভ আমার। বাক্যব্যয় নিষ্ফল। আমি আপনাকে প্রণাম করি।

( নতজানু হইয়া সম্মান প্রদান )

চৌ। মনে রেখো, তুমিই শেষ—আর নেই। মরবার ক্ষমতাও রইল না তোমার, যতদিন না প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হবে। বৎস! প্রতিপদে তোমার নিজের দিকে চেয়ে দেখো, নিজেকে স্মরণ রেখো!

চিং। যখন জেগেছি, নিজেকে চিনেছি, তখন আর আমায় অবিশ্বাস করি না।—আসি।

( প্রস্থান )

চৌ। আগে সরকারী আইন লঙ্ঘন না ক'রে দেখো, চিংপৈ!—না, অনুসরণ করি,—ও একলাটী,—যদি গয়োজন হয়!

( প্রস্থান )

• পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্যঃ—রাজবস্ত্র।

( চিংপৈর প্রবেশ )

চিং। সুন্দর নিশ্চিত রয়েছে পাপী চৌঙাকৌ

৩

চৌঙাকৌ! আজ চাউ-প্রেত-আত্মাদের আহ্বান! এই— এই সে। আশ্চর্য্য পাপী!

( রক্ষী সহ চৌঙাকৌর প্রবেশ )

চৌ। ( স্বগত ) তবু, কাজ! শেষ নেই। বিশ্রাম নেই!—তবে এ কী করলুম সব! না, মিথ্যা এ দেবী হ'য়ে যাচ্ছে। চৌচিং আমায় বিরাম দিক্। দেখি।

চিং। সন্নতান!

চৌ। কে? চৌচিং। তুমি যে এখানে, পুত্র!

চিং। পুত্র—? তুমি কা'কে পুত্র বলছ? কুড়ি বছর পূর্বে চাউদের প্রতি তোমার ব্যবহার স্মরণ কর। আমি পুত্রই—হাঁ, চাউছোর। সুখী হ'লুম, তুমি এত শীঘ্র আপনা হ'তেই আমার প্রতিহিংসার কবলে এসে পড়েছ।

চৌ। কে তোমায় আমার বিরুদ্ধে এতখানি বিবাক্ত ক'রে তুলেছে চৌচিং!—এ মিথ্যা রচনা।

চিং। চূপ কর পিশাচ! সত্যকে চিরকাল চেপে চেপে চলবে, এতই বলশালী তুমি—!—হুঃ!

চৌ। ( ক্রকুটি পূর্বক ) অকৃতজ্ঞ!—

( প্রস্থানোমুখ )

চিং! দাঁড়াও! তুমি বন্দী।

( চৌঙাংএর প্রবেশ )

চৌ। ধন্য ভগবানকে, যে, চৌঙাকৌ, তুমি স্বচ্ছন্দে ধরা পড়েছ। আশুনকে চাপতে চাও?—অত্যন্ত খেয়ালী!—আশুনে পুড়ে ছাই হয়—এ হবেই, যা'বে কোথা না হ'য়ে? মানুষকে কি ধুব বীর ঠাউরিয়ে রেখেছিলে চৌঙাকৌ? সে যে সসীম! মানবষের অপমান ও বাস্তিচারে, যখন ভাবি জিতে গেলুম, তখন অন্তর্যামী হাসেন—নিশ্চয়, এ নিশ্চয়।

চিং। রক্ষিগণ, এই রাজআজ্ঞা।

( প্রদর্শন )

এই আমার নির্দিষ্ট শত্রু। আমার হুকুন, এ-কে হাতে পায়ে বেঁধে দরবারে নিয়ে যাও। আর, আসুন, বৈদ্যরাজ!

( প্রস্থান )

দ্বিতীয় দৃষ্ট :- দরবারের পার্শ্ববর্তী বিচার-মণ্ডপ ।

( যৈকণ্ঠ ও সৈন্যগণের প্রবেশ )

যৈ । ধর্মশাস্ত্র বলে—পাপ একটি অনন্ত কলস্তগাছের ফল । সে বাড়ে ; কেবলই বড় হতে থাকে । কিন্তু ১ দিন পাকে, বোঁটাও নরম হয়, ধপ্ ক'রে প'ড়ে পৃথিবীকে নড়িয়ে দেয়—এতটা সাজ্বাতিক !—চৌঙাক্কৌ ক্রমাগত উঠছিল ।—মূর্খ ! প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলা, সে কি মুখের কথা ? মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে । টেনে নামিয়ে আনে ।—যা'ক্ ।

( চিংটৈপ চীঙীং ও বন্দী চৌঙাক্কৌর প্রবেশ )

চিং । রাজ-আজ্ঞা চিরজয়ী হউক ।

( নতজাহ্নু )

যৈ । চৌঙাক্কৌ ! তোমার বিচার হবে । বলবার আছে কি তোমার কিছু ?

চৌ । সাম্রাজ্য ও ছিনরাজের হিতার্থে আমি অনেক কাজ যা ভাল মনে করতুম তা'র অনুষ্ঠান করেছি । এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই ।

যৈ । কোনো কথা রাজার আর শুনতে বাকী নেই চৌঙাক্কৌ । তে'র অপরাধ-সংক্রান্ত প্রচুর কাগজপত্র রাজদরবারে আলোচিত হয়ে গিয়েছে । তুমি আত্মসমর্পণ করছ না । তবে শোনো । রাজ-আজ্ঞা—মৃত্যুদণ্ড ;—তোমায় মরতে হবে ।

চৌ । চৌঙাক্কৌকে ভীত করবার মতন লোক প্রলয়েরও অনন্তকাল পরে জন্মাবে—আজ্ঞ না । আমি বীর । মরণ আসে, আশুক—দাঁড়িয়ে মরুব,—নিজের পা'র উপর দাঁড়িয়ে মরুব । লোকে দেখবে—প্রকৃত বীরত্বের আশ্চর্য্য মহিমা ।

যৈ । জালিয়াৎ ! 'বীরত্বের বড়াই কর ? তুমি লজ্জাহীন ।

চিং । হজুর আমরা সুবিচার চাই ।

যৈ । ধূর্ত চৌঙাক্কৌ ! তুমি দাঁড়িয়ে মরুতে চেয়েছ । আচ্ছা, তাই হবে । প্রকাশ্য রাজপথে, উচ্চ হত্যামঞ্চে তোমার বক্ষ অবধি রুলিয়ে দেওয়া হবে । কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত আগুনে পুড়বে ;—এদিকে ক্ষুধিত বন্য কুকুর তোমার উপরের আধখানা শরীর ছিঁড়ে খাবে ।—তবু

মনে হচ্ছে, তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি মনুষ্য-মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত হ'তেই পারে না ;—এ যা' হ'ল, অতি লঘু—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ।

চী । বৎস আমার, এস, বিচার-আসনতলে প্রণত হই । রাজকন্যা—তোমার গর্ভধারিণী স্বর্গীয়া মাতার উদ্দেশে প্রণত হও । হাঙ্কুয়া ও কোংলুনের পবিত্র আত্মার স্মৃতিকে সন্মান দান কর !

( চিংটৈপ তাহা করিল )

চিং । আর, বৈদ্যরত্ন চীঙীং, তুমি ?

চী । চুপ্ । আমার কত আনন্দ আজ, ,সে, সত্যের এক টুকরা ক্ষুদ্র শক্তি, রহৎ অধর্মের সঙ্গে প্রাণপণে ল'ড়ে—জিতেছে । এই জয়ই তো ধ্রুব । যাক্, প্রিয় চিংটৈপ ! তোমার প্রতিবিধিৎসা পূর্ণ হ'ল ; তোমার নিহত বংশ আজ সম্পূর্ণ মনস্কাম ! আমি— ! না, আমি কিছু না । আবেগ কমা করো ঈশ্বর !

যৈ । সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ছিনরাজের ধোষণা শ্রবণ কর । হৃৎকৃত চৌঙাক্কৌর আচরিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে হ'য়ে গেল । চিংটৈপ, তুমি সরকার থেকে 'চাউভন' উপাধি লাভ করেছ ।

( চিংটৈপ নতজাহ্নু )

তোমার পিতৃপিতামহের নাম সসন্মানে সরকারী কাগজপত্রে লেখা হ'য়ে রইল । হাঙ্কুয়া ও কোংলুনের আদর্শ আমরা শিক্ষার জন্ত অনুমোদন করি । তাদের সমাধির উপর সরকারী খরচে সমুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে । চীঙীং, সরকার তোমায় নামমাত্র মূল্যে বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রদান করছেন ।

( চীঙীং নতজাহ্নু )

রাজা স্বয়ং নিজ ক্ষতি তুচ্ছই মনে করেন ;—অতএব এস, সকলে তাঁর পুণ্যোচ্চারণ করি ।

( সকলের নতজাহ্নু হইয়া তথা করণ )

( ষবনিকা )

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রের ।

## আগুনের ফুলকি

[ পূর্বপ্রকাশিত অংশের চূষক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কসিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সেঁ ন্যূবক একটি কসিকারাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম করিতেছিল; কিন্তু বন্ধ কসিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সেঁ তাহার পিতার ধনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সেঁর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কসিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলের উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সেঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সেঁ লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে তুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার ধোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; পাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও করমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুক্ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একট বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সেঁ ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সেঁকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সেঁ ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুকিতে পারিল যে অর্সেঁ তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সেঁকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আশ্রয় দিতে চাহিল না।

অর্সেঁ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সেঁকে তাঁহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে ধুন হইয়াছিল সে সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদলিন পিয়েত্রী অর্সেঁর পিতা ধুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সেঁর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ]

( ১৪ )

মৌতের গান গাহিয়া কলোঁবা ক্লান্ত ও বেদম হইয়া পড়িয়াছিল, কথা বলিবার শক্তিও তাহার অবশেষ ছিল না। তাহার দাদার কাঁধের উপর তাহার মাথা

রাখিয়া দুই হাতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সে পথ চলিতেছিল। অর্সেঁ যদিও ভগিনীর গানের ভাবে, কথায় ও ইঙ্গিতে অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে ভগিনীকে একটিও তিরস্কারের কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। সে তাহার ভগিনীর এই উত্তেজনার অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া থাকিয়াই বাড়ী পৌঁছিল এবং দরজার আসিয়া দরজায় ধা দিল। সাভেরিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া ভয়পাংশুল মুখে বলিল— “ম্যাজিষ্টার সাহেব!” এই কথা শুনিয়াই কলোঁবা সোজা হইয়া দাঁড়াইল—নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া, আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া একখানা চেয়ারের পিঠের উপর হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইল—চেয়ারখানা তাহার হাতের তলে স্পষ্টই কম্পিত হইতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মামুলি ভদ্রতার বাঁধা গৎ আওড়াইয়া এমন অসময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসার জন্য গৃহস্থের মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কলোঁবাকে অনুযোগের ভাবে তীব্র আবেগের বিপদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলেন এবং মৃত্যুশোকের বিলাপ লইয়া এত বাড়াবাড়ি করার প্রথার নিন্দা করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, মামুলি মরে, সেই শোকই ত অসহ, তাহার উপর মৌত-গায়িকার গানের উত্তেজনা বাতাস দিয়া অগ্নি উদ্দীপনের জ্বাল বিধম অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। অবশেষে ধুব সম্বন্ধে কলোঁবার শেষ গানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সম্বন্ধে সামান্য একটু অনুযোগ করিয়া সম্বরণ কথা পাটাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—রেবিয়া মশায়, আপনার সেই ইংরেজ বন্ধুরা আমায় আপনাকে প্রীতিসন্তাষণ জানাতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন; মিস নেভিল আপনার ভগিনীকে বন্ধুত্বের শত শত সন্তাষণ জানিয়েছেন, আর আপনার জন্য একখানা চিঠিও দিয়েছেন।

অর্সেঁ বলিয়া উঠিল— মিস নেভিল চিঠি দিয়েছেন? ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল— হৃর্ভাগ্যক্রমে সে চিঠি এখন আমার সঙ্গে নেই, কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা পাবেন। তাঁর বাবার অশ্রুত করেছিল; আমাদের ভয় হয়েছিল হয়ত বা তাঁকে আমাদের দেশের কাল-

অরেই ধরল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভাগে ভাগে তাঁর বিপদ কেটে গেছে ; এখন তিনি কেমন আছেন তা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন—তাঁরা বোধ হয় শিগ্গিরই এখানে আসছেন।

—মিস নেভিল খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ?

—ভাগে ভাগে বিপদ কেটে গেলে পরে তিনি বিপদের পরিমাণ টের পেয়েছিলেন। মিস নেভিলের মুখে আপনাদের ভাই বোনের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

অসেঁ মাথা নত করিল।

—আপনাদের হৃদয়ের ওপর তাঁর খুব টান। তাঁর বাহ্যিক ভাবটা একটু হালকা রকমের হলেও তার মধ্যে খুব একটি মহিমা আছে, আর তার অন্তরালে লুকানো আছে চমৎকার বুদ্ধি।

অসেঁ বলিল—আঃ তা আর বলতে ! সোনার মেয়ে ! দেখলে চক্ষু জুড়ায় !

—আমি ত একরকম তাঁর অনুরোধেই এখানে এসেছি। যে সাংঘাতিক সম্ভাবনা এখানকার সকলের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে সে-সব কথা আপনার সামনে উল্লেখ করতে এখন আমি চাইনে। কিন্তু বারিসিনি সাহেব গাঁয়ের দারোগা আর আমি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে সে রকম ভয়ের একটুও কারণ ত আমি দেখতে পাই না। আমি শুনেছি কতকগুলো মাথাপাগলা গুণাগোছের লোক আপনাকে নাচিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু আপনি বিরক্ত হয়ে সে-সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি সব শুনেছি—আপনার মতন লোকের এইই ত কর্তব্য।

অসেঁ চেয়ারের মধ্যে ঝল হইয়া উঠিয়া বলিল—কলোঁবা, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তুমি শুতে যাও।

কলোঁবা ঘাড় নাড়িল। সে তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তাহার কৌতূহলী চোখদুটিতে একদৃষ্টে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিতে লাগিলেন—বারিসিনি সাহেবের ইচ্ছে যে, এই রকম শক্ততা ... অর্থাৎ কি না পরস্পরের প্রতি একটা যে অবিশ্বাসের ভাব আছে সেটা, আপোসে

মিটিয়ে ফেলে।... আপোসে আপনাদের একটা সমিটমাট হয়ে গেলে আমিও...

অসেঁ কথার মাঝখানেই একটু ব্যথিত স্বরে বলিল—আমি বারিসিনি দারোগার উপর কখনো আমার বাবার খুন চাপাইনি। কিন্তু তবু তার সঙ্গে সম্ভাব করা আমার কিছুতেই পোষাবে না। সে একটা গুণ্ডার নামে এক-খানা চিঠি জাল করেছিল—নিজে না জাল করুক, সেই জাল চিঠির দোষ আমার বাবার ঘাড়ে চাপিয়েছিল। সেই চিঠিই হয়ত আমার বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আপনার মতন লোকের এমন অন্ধ বিশ্বাস বড় দুঃখের কথা। ভেবে দেখুন, ওরকম চিঠি জাল করা বারিসিনির মতন লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি তার চরিত্রের কথা বলছি... যদিও আপনি তার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তবু আপনার মন তার বিরুদ্ধ হয়ে আছে... কিন্তু তার মতন একজন আইনজ্ঞ লোক...

অসেঁ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দেখুন মশায়, একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবেন। সে চিঠি বারিসিনি জাল করেনি বললে আমার বাবাকেই জালিয়াত বলা হয়। তাঁর অসম্মানে আমারই অসম্মান !

ম্যাজিস্ট্রেট বলিল—কর্ণেল রেবিয়ার সততার পরিচয় আমার চেয়ে কেউ বোধ হয় বেশি জানে না।...কিন্তু ... সেই চিঠির জালিয়াত কে তা এখন জানা গেছে।

কলোঁবা ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে সরিয়া গিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল—কে সে ?

—সে একটা মহা বদমায়েস পাজি লোক—তার সে বদমায়েসি আপনারা কসিকেরাও ক্ষমা করবেন না, সে চোর। তার নাম তোমাজে বিয়াঁশি। সে এখন বাস্তিয়ার জেলে আছে, সে স্বীকার করেছে যে সে-ই ঐ চিঠি জাল করেছিল।

অসেঁ বলিল—সে কে ? তাকে ত আমি চিনি ? তার কোন্ দেশে বাড়ী ?

কলোঁবা বলিল—সে এই দেশেরই লোক ; আমাদের একজন পুরোণো কলুর ভাই। সে পাজি ত বটেই, অধিকন্তু মিথ্যাবাদী। তার কথা মনে হলেও রাগ হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতে লাগিল—আপনারা তার চিঠি জাল করার উদ্দেশ্যে বুঝতে পারছেন না বোধ হয়। যে কল্পের কথা আপনার ভগিনী বললেন, তার নাম ছিল বোধ হয় থিরোডোর ; সে আপনার বাবার কাছে খাজনা করে' একটা কল জমা নিয়েছিল ; সেই কলটা যে-জলের স্রোতে চলত, সেটা দখলস্বত্ব নিয়ে বারিসিনি আপনার বাবার সঙ্গে মকদ্দমা আদালত করে। কর্ণেল খুব সাদা লোক ছিলেন, নাম মাত্র খাজনায় কলটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমাজো ভাবলে যে যদি কলটা বারিসিনির দখল করে তাহলে ত খাজনা টের বেড়ে যাবে, বারিসিনি ত আর ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয় ; তখন সে ঐ জাল চিঠি পাঠিয়ে বারিসিনিকে জব্দ করার মতলব করলে। আপনি পুলিশ কমিশনরের এই চিঠিখানা পড়লেই সব ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

অসৌ চিঠি পড়িতে লাগিল ; কলোঁবাও ভাইয়ের কাঁধের উপর দিয়া পড়িতে লাগিল। চিঠিতে তোমাজোর জবানবন্দি বিস্তারিত ভাবে লেখা রহিয়াছে।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া কলোঁবা বলিয়া উঠিল—এ সব ওলন্দিসিয়ো বারিসিনির কারসাজি। সে মাসখানেক হ'ল, যেমন শুনেছে দাদা আসছে অমনি ছুটে বাস্তিয়াতে গিছিল, সেই তোমাজোকে ঘুষ দিয়ে জপিয়ে ভিজিয়ে নিজে সাফাই হবার জন্তে এই কৌশলটি করেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া বলিল—আপনার দেখছি সকলতাতেই সন্দেহ ? এমনি করে কি সত্যনির্ণয় হয় ? মশায়, আপনি বলুন ত, আপনার ত রক্ত ঠাণ্ডা আছে, আপনি কি মনে করেন ? আপনিও কি শ্রীমতীর মতো মনে করেন যে একজন লোক যাকে চেনে শোনে না তার খাতিরে জালসাজির দোষটা নিজের ঘাড়ে ধামখা নিতে পারে ?

অসৌ পুলিশ কমিশনরের চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ তৌল করিয়া করিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিল ; কারণ, যেদিন হইতে সে বারিসিনিকে দেখিয়াছে সেদিন হইতে তাহাকে বিশ্বাস করা অসৌর পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তবুও চিঠি পড়িয়া অবশেষে সে বলিতে

বাধা হইল যে এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ হইতেছে।

কিন্তু কলোঁবা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—তোমাজো বিয়াশি মহা ফেরেব-বাজ ! তার কি ? সে জেল খাটবার ভয় রাখে না ; জেল হলেও সে জেল থেকে পালাবে ; এ ত জানা কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া গা-ঝাড়া দিয়া কলোঁবার কথা গ্রাহ না করিয়া অসৌকে বলিল—দেখুন মশায়, আমি ওপর থেকে যে রকম খবর পেয়েছি তা আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে জানিয়ে শুনিয়া আমি খালাস। এখন আপনার কর্তব্য আপনার কাছে। আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা আপনি কারু কথায় আচ্ছন্ন হ'তে দেবেন না, আশা করি ; আরো আশা করি যে আপনার বিবেচনা আপনার ভগ্নীর... অনুমানের মতন অমন নিজের মনগড়া হবে না।

অসৌ তাহার ভগ্নীর ব্যবহারের জন্ত দুই চারিটি কথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল যে তোমাজোই যে একমাত্র দোষী সে বিষয়ে তাহার আর কোনো সন্দেহ নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রস্থানের জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যদি বেশি রাত হয়ে গেছে মনে না করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে চলুন না আমার সঙ্গে, মিস নেভিলের চিঠিখানা নিয়ে আসবেন... আর এখন আমায় যে কথা বললেন সেই কথাটা বারিসিনিকেও আপনি নিজের বলে' আসবেন। তা হ'লেই সব গোল চুকে যাবে।

কলোঁবা ব্যস্ত হইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—অসৌ দে-লা রেবিয়া কখনো বারিসিনির বাড়ী মাড়াতেও যাবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিল—শ্রীমতীই দেখছি এ বাড়ীর কর্তা—

কলোঁবা দৃঢ়স্বরে বলিল—আপনাকে সবাই ঠকাচ্ছে। আপনি দারোগাকে চেনেন না। সে একটি আস্ত সয়তান, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। আপনাকে, আমি মিনতি করে' বলছি, অসৌ দে-লা রেবিয়াকে দিয়ে এমন কাজ করাবেন না, যার জন্তে তার মাথায় লজ্জা-অপমানের বোঝা চেপে বসবে।

অসৌ তীব্রস্বরে বলিল—কলোঁবা, রাগের ঝোঁকে তুই কি আবোল তাবোল বলছিস ?

—দাদা ! দাদা ! তোমার বাবার রক্তের নিশান সেই পেটারী তোমায় দিয়েছি—তার কথা মনে কর। সেই পেটারীর দোহাই—আমার কথা রাখ—তোমার আর বারিসিনির মধ্যে তোমার বাপের রক্তের গণ্ডি আঁকি রয়েছে—সেই রক্তগণ্ডি ডিঙিয়ে তুমি বারিসিনির বাড়ীতে যেয়ো না !

—ছি, লক্ষ্মী বোনটি আমার !

—না দাদা না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি যদি যাও আমি এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারব না, তুমি আর আমায় দেখতে পাবে না।...দাদা দাদা, আমায় তুমি দয়া কর।

কলোঁবা দাদার পায়ের উপর উবুড় হইয়া পড়িল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—শ্রীমতীর এমন অল্পবুদ্ধি দেখে আমি ভারি হুঃখিত হচ্ছি। রেবিয়া মশায়, আপনি ঠুঁকে বুঝিয়ে স্নুজিয়ে ক্রমশ ঠিক করে নেবেন, আশা করি।

ম্যাজিষ্ট্রেট দরজা খুলিয়া একটু আগাইয়া অসৌ অল্প-সরণ করিতেছে বিনা দেখিবার জন্ত ধমকিয়া দাঁড়াইল।

অসৌ বলিল—আমি ত এ-কে ছেড়ে এখন যেতে পারছিনে।... কাল সকালে যদি...

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আমি খুব ভোরে চলে যাব।

কলোঁবা হাত দুখানি জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—দাদা, অন্তত কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আজ রাত্তিরটা আমায় সময় দাও, আমি বাবার কাগজপত্রগুলো আর একবার দেখি। আমায় এইটুকু অবসর দিতে অস্বীকার কোরো না।

—আচ্ছা ! আজ রাত্রে তোর যা দেখতে হয় দ্যাখ। কিন্তু এর পর তোর এই লজ্জাজনক বাড়াবাড়ি নিয়ে আমায় আর দক্কাস নেই বলে রাখছি।... ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আমায় কমা করবেন, আপনার কাছে আমি হাজারোবার কমা চাই।... আমি ভারি অস্বস্তি অশান্তি ভোগ করছি। আজকের রাতটা পোহালে যেন ঝাঁচি।

ম্যাজিষ্ট্রেট যাইতে যাইতে বলিল—রাত্তিরটা বিশ্রাম

করুন। আশা করি সকালবেলা আপনার মনে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে না।

কলোঁবা উচ্চস্বরে বলিল—সাভেরিয়া, লঠন, নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে যা। দাদার জন্তে একখানা চিঠি উনি তোর হাতে দেবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেলে অসৌ বলিল—কলোঁবা, তুই আমাকে বড়ই আলাতন করে' তুলেছিস। তুই কি বরাবর প্রমাণ অগ্রাহ করেই চলবি ?

—তুমি ত আমাকে সকাল পর্য্যন্ত সময় দিয়েছ দাদা। আমার হাতে সময় অতি অল্প। 'তবু আমি এখনো আশা ছাড়ি নি। —বলিয়া কলোঁবা এক খোলো চাবি কইয়া উপরের তলায় ছুটিয়া উঠিয়া গেল। যে আলমারি দেওয়াজে কর্নেল রেবিয়া তাহার কাগজপত্র রাখিতেন সেই দেওয়াজ তাড়াতাড়ি খোলা ও কাগজপত্র হাঁটকানোর শব্দ সেখান হইতে শোনা যাইতে লাগিল।

( ১৫ )

সাভেরিয়া অনেকক্ষণ হইল গিয়াছে, এখনো ফিরিল না। অসৌ অপেক্ষা করিয়া করিয়া যখন একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া ছটফট করিতেছে তখন সাভেরিয়া এক-খানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে বালিকা শিলিনা। সে কাঁচা ধূম হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, তখনো তাহার ঘূমের ঘোর কাটে নাই, সে চোখ রগড়াইতেছিল।

অসৌ বলিল—খুকি, এত রাত্রে তুমি কি করতে এসেছ ?

শিলিনা বলিল—দিদিঠাকরণ ডেকে পাঠিয়েছেন।

অসৌ মনে মনে ভাবিল—এ-কে নিয়ে আবার কি সময়তানি খেলা হবে ?

অসৌর তখন আর বেশি কিছু বলিবার অবসর ছিল না, সে তাড়াতাড়ি লিভিয়ার চিঠি খুলিতে লাগিল। শিলিনা সেই অবসরে কলোঁবার সন্ধানে প্রস্থান করিল।

অসৌ চিঠি খুলিয়া দেখিল চিঠির আরম্ভে কোনো পাঠ নাই, শেষেও শুধু নামটি সই। অসৌ চিঠি পড়িতে লাগিল—

“আমার বাবার একটু অসুখ করেছিল। তাতে কয়ে’



তিনি এমন লিখকুঠ হয়ে গেছেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর প্রতিনিধির কাজ করতে হচ্ছে। সেই সেদিন আমরা যখন সুমুদ্রতীর্থে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ অন্তমনস্ক হয়ে তিনি তখন পা ভিজিয়ে ফেলেছিলেন, আপনি ভ জানেনই। আপনাদের চমৎকার দেশের জ্বর তার বেশি ছলছুতার অপেক্ষা রাখেনি। আপনার দেশের এই ব্যাজস্বতি শুনে আপনার মুখের যে কি রকম ভাব হচ্ছে, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি; আপনি নিশ্চয় আপনার ছোরা হাতড়াচ্ছেন; কিন্তু ঝাটোয়া, যে, আপনার বোধ হয় আর দ্বিতীয় ছোরা নেই। যে একখানা ছিল সেখানা কলেঁবা ঠাকরুণ আমায় দিয়ে ফেলেছেন। আপনার বোধ হয় তার জন্তে এখন পস্তানি হচ্ছে! যাক, মোট কথা, আমার বাবার জ্বর অল্প আর আমার ভয় বিষম রকমেরই হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভারি চমৎকার অমায়িক লোক, তিনি তাঁরই মতন অমায়িক একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি দুদিনে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। বাবার আর জ্বর হয়নি; বাবা শিকারে যেতে প্রস্তুত; আমিই তাঁকে কোনো রকমে আটকে রেখেছি।

“আপনার পাহাড়ে আস্তানা লাগছে কেমন? আপনার বাড়ী ত অনেক-কলে পুরোণো? ভূত আছে? আপনাকে এত সব জিজ্ঞাসা করছি কেন জানেন?— আপনি বাবাকে ছাগল, হরিণ, বরাহ প্রভৃতি শিকার জুটিয়ে দেবেন বলে’ গিয়েছিলেন তাই। আমরা বাস্তিয়া যাবার পথে হয়ল, আপনার আতিথ্য স্বীকার করতেও পারি। রেবিয়া-বংশের পুরাতন জীর্ণ বনিয়াদী-বাড়ী বনিয়াদ সমেত আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে না আশা করি।

“ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আপনাদের সব কথা শুনেছি। তিনি ত কথা বলতে আলেন না—ভালো কথা মনে পড়ল, তিনি কথায় কথায় শুনিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা দেখে নাকি তাঁর মাথা ঘুরে গেছে!—তাঁর কাছে শুনলাম যে বাস্তিয়ার পুলিশ তাঁকে খবর দিয়েছে যে একটা কয়েদী বদমায়েস নাকি তার দোষ স্বীকার করেছে; তাতে করে’ আপনার পুরাতন সন্দেহ অম্-

লক হয়ে যাবে। আপনাদের শক্রতা আমাকে ভারি চিন্তিত করে’ রেখেছিল, এখন সব মিটমাট হয়ে গেলে আমি ঝাটি। আপনি বুঝতে পারবেন না যে এতে আমার কেন আর কতখানি আনন্দ হচ্ছে। আপনি সেদিন যখন সেই সুন্দরী খুনের-চাপান-গাইয়ের সঙ্গে নন্দুক হাতে নিয়ে মুখ ভার করে’ বিদায় নিলেন সেদিন আপনাকে দস্তুর-মত কর্তিক বলেই মনে হয়েছিল।

“বাস! ঝোঁকের মাথায় আমি অনেকখানি লিখে ফেলেছি দেখছি। আপনি হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চলে যাচ্ছেন—আমার মনটা তাই ভালো নেই কিনা!

“আমরা যখন আপনার পাহাড়ে দেশের পথ ধরুব, তখন শ্রীমতী কলেঁবা ঠাকরুণকে আমি চিঠি লিখে খবর দেবো। ইতিমধ্যে তাঁকে, বুঝলেন, তাঁকে আমার হাজার হাজার প্রণয়-সন্তাষণ জানাবেন। আমি তাঁর-দেওয়া ছোরাখানার খুব সদ্যাবহার করছি—নভেলের পাতা কাটছি; কিন্তু সেই উগ্রচণ্ড ভয়ঙ্কর চিহ্নটি এই সামান্য কাজ করতে বিষম আপত্তি করছে, এবং প্রতিবাদ-স্বরূপ আমার বইখানির এমন দুর্দশা করেছে যে দেখলে কষ্ট হয়।

“বিদায়, তবে বিদায়! বাবা লিখে দিতে বললেন যে ‘আমার (অর্থাৎ তাঁর) ভালোবাসা জানবেন।’ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ শুনবেন, তিনি লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার মনে হয়, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে’ আপনাকে সব বলবার জন্তেই তিনি তাঁর শফর-যাত্রায় ঘুর-হলেও আপনাদের ওখানে যাবেন। উনি কোথায় একটা কিসের ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছেন; বাপারটা খুব সমারোহ করেই হবে অনুমান হচ্ছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমি মজলিসের জলুস বাড়িতে সেখানে উপস্থিত থাকব না। জরির পোষাক, রেশমী মোজা, সাদা কোমরবন্দ পরে’ হাতে রূপোর কর্নিক নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ভিত্তি স্থাপন করবেন তখন তাঁকে খুব জমকালোই দেখাবে!—তার ওপর আবার বক্রতা আছে! তারপরে হাজার কণ্ঠে রাজার জয়ধ্বনি আর লক্ষ হাতের করতালি সর্ভাটা নিতান্তই সরগরম করে’ তুলবে।

“আমাকে দিয়ে দেখতে দেখতে চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আপনার মনে মনে খুব অহঙ্কার হচ্ছে, না? আমি কিন্তু হায়রান ও হালাকান হয়ে উঠেছি। এই দুঃখের শোধ নেবার জন্মেই আমি আপনাকে সুদীর্ঘ জবাব লেখবার অমুমতি দিচ্ছি। ভালো কথা, আপনি ত পিয়েত্রানরা দুর্গে নিরাপদে পৌঁছানো খবরটাও আমায় কৈ লেখেন নি? বেশ লোক যা হোক। “লিডিয়া।

“পুনশ্চ—আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কথা শুনে তাঁর পরামর্শ-মত কাজ করবেন। আমাদের সকলেরই এই মত: এতে আমি বিশেষ সুখী হব।”

অর্সো তিন চার বার চিঠিখানি পড়িল। এক-এক-বার পড়ে আর মনে মনে প্রত্যেক কথার শতক রকম টীকা ভাষা ব্যাখ্যা করে। তারপরে সুদীর্ঘ এক জবাব লিখিল। একজন লোকের ভোরে আজাকুসিয়ো যাইবার কথা ছিল। অর্সো সেই রাতেই সাভেরিয়াকে দিয়া সেই চিঠি তাহার কাছে পাঠাইয়া দিল। তখন আর বারিসিনির দোষ সত্য কি মিথ্যা তাহা লইয়া ভগিনীর সহিত বাকবিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা রহিল না, লিডিয়ার চিঠি তাহার চোখে যে- গোলাপী নেশা লাগাইয়া দিয়াছিল তাহাতে সে সমস্ত জগৎ আনন্দের হাসিতে মধুময় দেখিতেছিল, তাহার মনে তখন না ছিল সন্দেহ আর না ছিল ঘৃণা। কিছুক্ষণ ভগিনীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া যখন দেখিল যে সে আর আসে না, তখন অর্সো শুইতে গেল—আজ তাহার অন্তর আনন্দের ফুৎকারে স্ফীত লঘু হইয়া যেন নাচিতেছে—এমন খোলসা মন তাহার জীবনে কখনো হয় নাই।

কলোঁবা শিলিনাকে কতকগুলি গোপন উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া সমস্ত রাত বসিয়া পুরাতন কাগজপত্র পড়িতে লাগিল। ভোর হব-হব সময়ে গুটিকত কঁকর-কুমুই তাহার জানলার উৎসর আসিয়া পড়িল; এই সঙ্কেত পাইয়া সে নামিয়া বাগানে গেল এবং একটা চোরা দরজা খুলিয়া দুজন দুঃমন-চেহারার লোককে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

[ De La Mazeliere র ফরাসী গ্রন্থ হইতে ]

( পূর্বানুবর্তি )

\*\*\*

যোগল-সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইদেশে তখন সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল; সুতরাং যোগলসাম্রাজ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সামন্ততন্ত্রের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করিলে সুবিধা হইবে।

প্রাথমিক অভিযানাদির সময়, সর্দারেরা বিজিত ভূমিতে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে; উহারা একসঙ্গে শাসনকর্তা, রাইয়ৎ (vassal), অশ্বারোহী সেনার সর্দার, দস্যুদলের সর্দার ছিল। বহুদিন পরে,—যখন দিল্লির রাজাদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হিন্দু-স্থান হইতে প্রথমে তাহারা যে সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সৈন্যকে পরাভূত করিবার জন্য উক্ত সর্দারের দল হইতে আর এক সৈন্যদল গঠিত হয়। ঐ সর্দারেরা সকল দেশের ভাগ্যাবেশীদিগকে আহ্বান করিল! কিন্তু তখন রাজস্ব ভাল আদায় হইত না বলিয়া,—নির্দিষ্ট-সংখ্যক কতকগুলি সৈনিক পোষণ করিবার সর্তে, এই ভাগ্যাবেশীগণ জায়গীর প্রাপ্ত হইল। উহাদিগকে “আমীর” ও মনসব দার—এই খেতাব দেওয়া হইল।

বদাওনি লিখিয়াছেন:—

রাজার শাসনকালের অধি (খালিসা) ব্যতীত, সমস্ত দেশটিই আমীর গণের জায়গীর-ভূমি। উহারা দুঃবুদ্ধি, বিজ্ঞোহিতার জন্ম সত্ত্বেই প্রস্তুত, নিজ লভের জন্ম রাজকর হইতে অর্ধব্যয় করিত; সৈন্য পরিদর্শনের জন্ম উহাদের সময় হইত না, এবং প্রজাদিগের হিত-কল্পে উহাদের অংমাত্র দৃষ্টি ছিল না। রাজ্যের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, উহারা স্বয়ং কতকগুলি ক্রীতদাস ও যোগল-অনুচর সঙ্গে করিয়া আসিত, কিন্তু উহাদের উৎকৃষ্ট সৈনিকগণকে সঙ্গে আনিত না। (খিলিজিগণ ও শের-শাহ কতক স্থাপিত বিধিব্যবহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আকবর এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক আমীর প্রথমে বিংশতি অশ্বসৈন্যের নায়কপদ লাভ করিত। তাহার পদোন্নতি ক্রমানুসারে হইত এবং এই সর্তে হইত যে, প্রতি সৈন্যপ্রদর্শনের সময় উহারা স্বকীয় পদমর্যাদার অনুরূপ আপন-আপন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে আনিবে। সেই সময়, তাহাদের অশ্বদিগকে চিহ্নিত করিয়া রাখা হইত,—সুতরাং সর্দারেরা ঐ অশ্বগুলি পরে কাহাকেও ধার দিতে



বিমল বয়স ।

সার জগুয়া রেনল্ডস কর্তৃক অঙ্কিত ।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY  
E. HAY & SONS, CALCUTTA.



পারিত না, বা বিক্রয় করিতেও পারিত না।) এই-সকল রাজ-বিধি সত্ত্বেও আমীরেরাই অশ্বসৈন্তের প্রকৃত সর্দার ছিল, এবং সৈন্তদিগের অবস্থাও খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। সৈন্তপ্রদর্শনের সময়, আমীরের স্বীয় ভৃত্যদিগকে কিংবা দরিদ্র লোকদিগকে সৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিত এবং জায়গীর পাইবার পর তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্যে পুনঃ প্রেরণ করিত। কিন্তু সীমাই দেখা গেল, চারিদিক হইতে সওদাগর, তক্তবায়, কার্পাস-পল্লিকারক, সূত্রধর, গন্ধবণিক—কতক মুসলমান, কতক হিন্দু—ইহারা ধার-করা ঘোড়া সঙ্গে আনিয়া তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া লইত, এবং এইরূপে উহারা হয় মনসব নয় “ক্রোড়ী”, “অহদি”, ও “দাখিলি” হইত। কিছুদিন পরে, ঘোড়াও দেখা যাইত না, ঘোড়ার জিন্তও দেখা যাইত না, সেই লোকগুলো পদাতিকের কাজ করিত। (১)

তদ্বিপরীতে আবুল-ফজল বলেন :—

সকল যুগের আমীরাই একই কথা বলেন এবং এই এক-বিষয়ে সকলেরই মধ্যে একা দেখা যায় :—সামন্তস্ববিহীন সংখ্যা জিনিসটা কি?—না, উহা সেই ধূলারাশি যাহা বিশ্বখলা হইতে সমুখিত হয়,—উহা কেবলই গোলযোগ, উহা অরাজকতা। এইরূপই পঞ্চভূত... এইরূপই জীবজন্তু,—যাহারা আত্মরক্ষার জন্তু সম্মিলিত হয়... এইরূপই মনুষ্যগণ। দুইবুদ্ধি ও উদ্ভাসপ্রবৃত্তির বশীভূত মনুষ্যদিগের কর্তব্য যে তাহারা একজন সর্দারের আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত এই বস্তুতার উপর নির্ভর করে; কেননা, তাহাদের ষড়বুদ্ধি, তাহাদের কুপ্রবৃত্তিসমূহ অবিরত তাহাদিগকে নূতন নূতন পাপ-পথে ধাবিত করে। এমন কি অনেক সময়, তাহাদের কৃত অপরাধ ও কুকর্ম দৈববিধান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অজ্ঞান-মেঘ অপসারিত করিবার উদ্দেশে, ঈশ্বর একজন মানুষকে নির্বাচন করিয়া তাহাকেই তিনি সুপরিমাণ প্রদান করেন, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখেন...কিন্তু যেহেতু কোন এক মানবের শক্তি এই কার্য-সাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, অতএব ঈশ্বরের সেই নির্বাচিত ব্যক্তি নিজের সাহায্যের জন্তু কতকগুলি লোক নির্বাচন করিবেন, আবার ইহাদের সাহায্যের জন্তুও অল্প কতকগুলি লোক নির্বাচন করিবেন। এই জন্তুই সম্রাটবাহাদুর কতকগুলি মনসব-দারকে মনোনীত করিয়াছেন। তাহাদের উপরেই তিনি অশ্বসৈন্তের ভারার্পণ করিয়াছেন; এই অশ্বসৈন্তের সংখ্যা পাঁচহাজার পর্যন্ত উঠিতে পারে; দশহাজার সৈন্তের নেতৃত্ব কেবল সম্রাটের পুত্রদিগের জন্তুই নির্দিষ্ট হইয়াছে। (২)

আবুল-ফজল যাই বলুন না কেন, আকবর অনিচ্ছাক্রমেই এই মনসবের প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিয়াছিলেন। উহার অন্তর্ভুক্ত যতটা পারেন তিনি কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে, তিনি সামন্ত-আমীরদিগকে রাজদরবারের আমীর করিয়া তুলিলেন; যে-সকল বিশ্বস্ত মন্ত্রী ঐকান্তিক রাজসেবার দরুন পুরস্কারলাভের যোগ্য বিবেচিত হইত তাহাদিগকে তিনি মনসবদারী দিয়া অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। কিন্তু এখন আর

কাহারকেও জায়গীরদারের আধিপত্য দেওয়া হইত না। তাহারা সম্রাটের প্রাণ্য রাজকর (যাহার সহিত বার্ষিক খাজনাও মিশ্রিত ও একীভূত) ছাড়া অল্প কর প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিত না। উহাদের পদ বংশগত ছিল না; এমন-কি জীবনকাল পর্যন্তও ঐ পদ কেহ অধিকার করিতে পারিত না। সম্রাট প্রায়ই মনসবদারদিগকে স্বীয়পদ হইতে বিচূত করিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে, তাহাদের পদোন্নতি করিয়া দিতেন। ফলত মনসবদারদিগের পদমর্যাদার একটা সোপান ছিল; ইহাকে রুশদেশের “চিন” (Tchin) বলা যাইতে পারে; কেননা, এই রুশীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান— উভয়ই মোগলদিগের মধ্যবর্তিতামৃত্রে—চীনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয়। এই প্রত্যেক পদমর্যাদার অমুরূপ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের উপর নেতৃত্বভার দেওয়া হইত। কিন্তু এই-সকল পদ অবৈতনিক ছিল। মনসব-দারের নিয়োগপত্রে যত জনের উপর নেতৃত্ব উল্লিখিত হইত, মনসবদার তাহার চতুর্থ বা পঞ্চম অংশের ভরণ-পোষণভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপ বায়সংক্ষেপ করিয়া যে টাকা বাঁচিত তাহাই অভিজাতা-সম্মুখিত আয় বলিয়া বিবেচিত হইত। দশসহস্র বা ততোধিক লোকের সর্দারগণ আমীর নাম গ্রহণ করিত (আমীরের বহুবচনে ‘উমরা’— যুরোপীয়েরা এই উমরাকে “Omrah” করিয়াছেন)। আবুল-ফজল বলেন, আমীরের সংখ্যা ৬৬ জন ছিল; কিন্তু ১৫৯৬ অব্দের তালিকায় ত্রিশজনের অধিক নাম পাওয়া যায় না; ঐ সময়ে নিম্নতর পদবীর ১৩৪৪ মনসব-ছিল। কোন কোন সর্দার “আমীর-উল্-উমরা” (আমীর-রের আমীর) এই উপাধি ধারণ করিতেন। কিছুকাল পরে, মনসবদার ও আমীরগণের সংখ্যা আরও বর্ধিত হয়। আইন-ই-আকবরীতে হিন্দু আমীরদের নাম অল্পই প্রদত্ত হইয়াছে, যথা :—অম্বরের রাজপুত্র রাজা বিহারী মল্ল, ও প্রখ্যাত সেনাপতি ও কৌশ-সচিব তোদর-মল্ল। কিন্তু সমস্ত রাজপুত্র রাজারাই বসন্ত সম্রাটের ‘অধীন-নৃপতি এবং মনসবদারের সমকক্ষ পদধারী সেনানায়ক ছিলেন। (৩)

(১) বদাওনি (Blochmann)

(২) আইন-ই-আকবরী।

(৩) আমীর নহে—এইরূপ মনসবদারদিগের মধ্যে হিন্দুর

পক্ষস্বত্রে, আকবর একটি চিরস্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। এই সৈনিকেরা সাক্ষাৎভাবে সরকার হইতে তাহাদের অশ্ব ও বেতন প্রাপ্ত হইত; উহারা “অহদি”, “দাখলি” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি—যাহা মোগল-রাজত্বকে রক্ষা করিয়াছিল—সমাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

আকবরের রাজত্বকালে, দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও ৪০ হাজার পদাতিক, বন্দুকধারী বা গোলন্দাজ লইয়া সৈন্যমণ্ডলী গঠিত হয়। এই অক্ষ কাগজেই দেখা যাইত, শান্তির সময়ে উক্ত অক্ষের অন্তর্গত কার্যকরী সৈন্য উহার পঞ্চমাংশেও উপনীত হইত না। কিন্তু ঔরংজেবের পশ্চাতে সর্বদাই পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও ১৩০টা কামান থাকিত; যুদ্ধের সময় রাজপুতসৈন্য ও আমীরদিগের সৈন্য লইয়া সবস্বত্রে দেড়লক্ষ যোদ্ধা তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর, অধঃপতনের আরম্ভ হয়। আমীরেরা পুনর্বার স্বাধীন রাজাদিগের তায় ব্যবহার করিতে লাগিল। উচ্চতম ও নিম্নতম বিচারের অধিকার উহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিল এবং নিজ লভ্য উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজকর আদায় করিতে লাগিল।

যুদ্ধ হইতেই জন্ম, পুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য বরাবর সামরিক রাজশাসনেরই পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। সাত সত্ৰাট অধিকতম সৈন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন, তাবৎ অস্ত্র সেনাপতির তাহাকে সম্মান করিত। কিন্তু সত্ৰাট যখনই সৈনিক ও দলপতিসুলভ গুণগুলি হারাইলেন, তখনই তাহার অধীন সেনানায়কেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিল এবং প্রত্যেকেই আপন-আপন ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। (৪) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংখ্যা আরও বেশী ছিল। আমীর কিংবা আমীর নহে—এইরূপ দুইশত অশ্বারোহী-নায়ক মনসব্দারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিল।—Blochmann.

(৪) ঔরংজেবের রাজত্বকালেও মনসবের পদ বংশগত হয় নাই। Bernier লিখিয়াছেন,—সত্ৰাটই সমস্ত ভূমির অধিস্বামী; তিনিই সমস্ত অভিজাতবর্গের উত্তরাধিকারী। আমীরদিগের পুত্র পৌত্রেরা প্রায়ই ভিক্ষু-দণ্ডায় উপনীত হইত, উহারা বাধ্য হইয়া কোন আমীরের অশ্বসৈন্যের অন্তর্গত সামান্য সৈনিকের পদ গ্রহণ করিত...তথাপি, কোন কোন আমীর স্বীয় জীবদ্দশাতেই, তাহাদের সম্মান-সম্মতিক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিত। অধিকাংশ ওমরাই নীচকুলোদ্ভব এবং সর্বদেশীয় ভাগ্যান্বেষীদের লোক। মোগল-সত্ৰাট স্বকীয় ইচ্ছানুসারে উহাদের পদোন্নতি বা পদাবনতি করিয়া থাকেন। (Colbert এর প্রতি লিখিত পত্র—দ্রষ্টব্য)

Blochmann শা-জাহানের সৈন্যসম্বন্ধে “পাদশা-নামা” হইতে

## অরণ্যবাস

[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বিঃ এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক অরণ্যবাস করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া যানভূম জেলার অন্তর্গত পার্কতা বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকার্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ঋণ পাকিয়া উঠিলে, পরিত হইতে হরিণের পাল নামিয়া ঋণ নষ্ট করিতে থাকায়, হরিণ তাড়াইবার জন্ত ক্ষেত্রনাথ মাটা বাধিয়া রাত্রিতে পাহারার ব্যবস্থা করিলেন ও কলিকাতা হইতে তিনটি বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক টোটাটার বন্দুক দেখিতে অস্মিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বন্দুক ছোড়া শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রকার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বন্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ শুনিয়া বলিলেন, আগে শস্ত সব খামারে উঠুক তারপর বিবেচনা করা যাইবে।

মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে খাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ]

## বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র শস্তক্ষেত্র ও পাহাড় দেখিবার জন্ত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। উভয়ে

এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—“বর্তমান সত্ৰাটের আমলে, বেতন-ভোগী অশ্বসৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ; এই অশ্বসৈন্যের চতুর্থাংশ পরিচিহিত হইয়া থাকে। পরপণার শাসনকার্যের জন্ত ফৌজদার, ফ্রোড়ী, ও শিক্ষকেরা যে ত্রুপ-সোয়ার সংগ্রহ করে, তাহা উক্ত অক্ষের অন্তর্ভুক্ত নহে। (এই ত্রুপ-সোয়ারেরা পুলিশের কাজ করে)। এই দুইলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এইরূপে বিভক্ত, যথা :— আট হাজার মনসব্দার, সাত হাজার অহদি ইত্যাদি; একলক্ষ পঁচাত্তিশ হাজার সৈনিক,—রাজা, আমীর ও অন্যান্য মনসব্দারের আনীত সৈন্যদলভুক্ত। তাছাড়া, চল্লিশ হাজার পদাতিক, বন্দুকধারী, গোলন্দাজ, পলিতা-বাহক।” দুইলক্ষ অশ্বারোহীর মধ্যে,— তাহাদের অশ্ব পূর্বে পরিচিহিত হইয়াছে এইরূপ কেবল পঞ্চাশ-হাজার অশ্বারোহী প্রথম আহ্বানেই তাহাদের সৈন্যদলে আসিয়া মিলিত হইতে পারিত। Bernier ঔরংজেবেরও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দুইলক্ষ নির্দেশ করিয়াছেন।

গোলন্দাজসৈন্য। বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তাহার সহিত ১০০ মেঠো কামান ছিল। (বাবরের স্মৃতিলিপি ও “তারিখ-ই-রশিদি” দ্রষ্টব্য)। আইন-ই-আকবরীতে এরূপ বহু সহস্র কামানের উল্লেখ আছে, যাহার মধ্যে কতকগুলি কামান হইতে ১২-মন ওজনের গোলা নিক্ষেপ হইত। মোগলদের আমলে, ভারত আগ্রয়ে অশ্ব গঠনের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল।

দুইটা বন্দুক ও কিছু টোটা সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে লখাই সর্দারও চলিল।

কাপাসক্ষেত্রে কাপাসবৃক্ষের অবস্থা দেখিয়া সতীশচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি অড়হর, গম, যব, আলু প্রভৃতিরও আবাদ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। লখাই সর্দার পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একদিনও পর্বতে আরোহণ করেন নাই। পর্বতারোহণ করা অতীব শ্রমসাধ্য হইলেও, গিরিজাত অরণ্যানীর শোভা দেখিয়া উভয়ে অতিশয় পুলকিত হইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র উদ্ভিদশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; এই কারণে, তিনি একটা নূতন বৃক্ষ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে পর্বতারোহণ করিতে করিতে তাহারা একটা গুহার নিকটবর্তী হইলেন। গুহাটি এরূপ প্রশস্ত যে, তন্মধ্যে দুই শত লোক স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া থাকিতে পারে। একটা অখণ্ড সুরহৎ প্রস্তর সেই গুহার ছাদস্বরূপ হইয়াছে। দাঁড়াইলে, ছাদ মস্তক স্পর্শ করে না। গুহার দুইদিকে প্রবেশ ও নির্গমের জন্য স্বাভাবিক দুইটা দ্বার আছে। গুহার তলদেশ অসম ও উন্নতানত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তররাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই গুহার মধ্যে উপবেশন করিলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়, এবং এক অনির্কচনীয় ভাবে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। কোনও বিষয়ে চিন্তকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত এরূপ স্থান আর নাই। কিন্তু গুহার অভ্যন্তর হইতে সহস্রা একটা বিজাতীয় দুর্গন্ধ উথিত হওয়ায়, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র উভয়ে লখাই সর্দারকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল যে বাহুড়ের বিষ্ঠা চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই দুর্গন্ধ উথিত হইতেছে। কিন্তু এই দুর্গন্ধটি ঠিক বাহুড়ের বিষ্ঠারও নহে। সম্ভবতঃ কোন হিংস্র জন্তু এই গুহার মধ্যে বা নিকটে অবস্থান করিতেছে। তাহারই গাত্র বা বিষ্ঠা হইতে এই বিজাতীয় দুর্গন্ধ উথিত হইতেছে। লখাই সর্দারের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সেইস্থানে অধিকক্ষণ থাকি নিরাপদ মনে করিলেন না এবং

তৎক্ষণাৎ গুহা ত্যাগ করিলেন। তাহারা পার্শ্বতাপথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে পর্বতশৃঙ্গে উপনীত হইলেন।

পর্বতশৃঙ্গে শেফালিকা পুষ্পবৃক্ষের বন। এই সময়ে শেফালিকা পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে রাশি রাশি পুষ্প পড়িয়া ছিল এবং তাহাদের সুমধুর গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সহসা এইস্থানে উপস্থিত হইয়া মনে করিলেন, তাহারা যেন কোনও দেবরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। পর্বতশৃঙ্গে একটা সুরহৎ অখণ্ড শৈল ছিল। সেই শৈলের পার্শ্বে একটা বৃহৎ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া শৈলের উপর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া প্রদান করিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র পর্বতারোহণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন; এইজন্য উভয়ে সেই পরিচ্ছন্ন শৈলমূলে উপবেশন করিয়া শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন।

এই পর্বতশৃঙ্গ হইতে পশ্চিমদিকে বল্লভপুর গ্রামটি শশ্যশ্রামল ক্ষেত্রসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া একটা মনোহর চিত্রপটের আয় দৃষ্ট হইতেছিল। পূর্বদিকে বহুদূর-ব্যাপিনী সশৈলকাননা উপত্যকাভূমি নিজ বিস্তৃত বক্ষের উপর স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। সেই সুরহৎ উপত্যকার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা লোকালয় নাই। তন্মধ্যে কোথাও অরণ্য, কোথাও কানন, কোথাও বিসপিণী তটিনী, কোথাও সকানন শৈল, কোথাও তৃণাচ্ছন্ন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এবং কোথাও স্বভাবখাত কমলশোভিত প্রকাণ্ড সরোবর। সরোবরের নিম্নল জলে বহুহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে মৃগপাল বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা শিখিদল বিহার করিতেছে। সেই মনোহারিণী উপত্যকাভূমি হইতে নানাবিধ সুকণ্ঠ পক্ষীর সুমধুর রব সেই পর্বতশৃঙ্গে অস্পষ্টভাবে উপনীত হইতেছে। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র প্রকৃতিদেবীর এই চমৎকারিণী শোভা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ কিম্বদন্তিবিমুগ্ন হইয়া রহিলেন,

কাহারও মুখ হইতে একীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র বলিলেন “ক্ষেত্র, স্বর্গের নন্দন কাননের রত্নান্ত পাঠ ক’রেছ; কিন্তু তাও বুঝি সৌন্দর্য্যে এই উপত্যকার তুল্য হ’বে না। আমি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি; কিন্তু এমন সুন্দর স্থান কোথাও দেখেছি ব’লে মনে হ’চ্ছে না। সংসারের অসার কোলাহল ত্যাগ ক’রে, এই স্থানেই জীবনযাপন করতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য, এত বড় উপত্যকা, আর এই উপত্যকা এমন উর্বরা, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও জনমানুষের বাস বা সঞ্চার নাই। ভারতবর্ষের কত স্থানে যে কত উর্বরা ভূমি প’ড়ে আছে, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপত্যকাটি আবাদ করতে পারলে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হ’তে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রতি কেহ মনোনিবেশ করতে চায় না। সকলেই চাকরীর জন্ত লালায়িত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, চাকরী বাকরী ছেড়ে এই রকম স্থানে এসে বাস করি, আর কৃষিকার্য্য করি। এদেশের জমিদারগুলিকেও নিতান্ত নিরোধ ব’লে মনে হচ্ছে। বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্ত তাঁদের কোনও চেষ্টা নাই। আর তাঁদেরই বা দোষ কি? প্রকৃত শিক্ষার অভাবই তাঁদের অবনতির কারণ। এই যে উপত্যকার সৌন্দর্য্য দেখে তুমি আমি মুগ্ধ হচ্ছি, তাও আমাদের যৎসামান্য শিক্ষার গুণে। তুমি কি মনে কর, এদেশের আদিম অধিবাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে তোমার আমার মতন মুগ্ধ হয়?”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, “সেরূপ মুগ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কথা। তবে প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হ’য়ে, তাঁদের মনেও যে একটা সামান্য ভাবতরঙ্গ না উঠে, তা নয়। আমি সেদিন মুণ্ডারীদের একটা গান শুনে ভারি চমৎকৃত হয়েছিলাম। গানটি এই :-

এসা সাকাম্-জিলিপ্ জিলিপ্।

বড় সাকাম্ জুলুপ্ জুলুপ্,

আরি লিকাম্ পাওরি হে,—

‘আকি লিকাম্ পাওরি।

এর অর্থ এইরূপ :- অশ্বখ গাছের পাতাগুলি চিক্

চিক্ করছে; বটগাছের পাতাগুলি চক্ চক্ করছে। বটগাছের পাতাগুলি খালার মত চোড়া। ইত্যাদি। সুতরাং অসভ্য লোকেও যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয়, তা নয়। তবে কথা এই যে, তাদের মন মার্জিত নয় ব’লে, তাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্যক্রূপে প্রতিভাত হয় না। যেমন সূর্য্যের আলোক। সূর্য্যের আলোক সকল বস্তুতেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়; কিন্তু স্বচ্ছ জল বা স্বচ্ছ কাচের উপর তা যেমন প্রতিফলিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সৃষ্টি না পেল, চিত্ত মার্জিত হয় না, সুতরাং শিক্ষাটা যে জীবনের সকল কার্য্যে ও বিভাগেই নিতান্ত আবশ্যিক, তার আর কোনও সন্দেহ নাই।”

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “চিক্ কথাই বলেছ। আমিও ঐ কথাই বলছিলাম। এই কৃষিকার্য্যের জন্তও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমি বিশেষভাবে কৃষিকার্য্যটি শিখিচ্ছি ব’লে, এই উপত্যকাটি দেখে এর অদ্ভুত লোকপালিকা শক্তির কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু জমিদার মশাই তা না বুঝতে পেরে এটি ফেলে রেখে দিয়েছেন। আমি পাহাড়ে উঠতে উঠতে কত স্থানে যে কত প্রকার সুন্দর মৃত্তিকা দেখেছি, তা তোমাকে বলি নাই। সেই মৃত্তিকার মধ্যে সুন্দর কেওলীন্ দেখলাম, লালরংয়ের আর হলুদেরংয়ের এলামাটি (red and yellow ochre) দেখলাম। এই সব মাটি এক এক স্থানে কোটা কোটা মণ পাওয়া যেতে পারে। এইগুলি কলকাতায় রপ্তানী করলে বহু অর্থলাভ হ’বে। এই সামান্য স্থানটুকু ভ্রমণ করেই আমি এদেশে প্রকৃতি দেবীর সঞ্চিত যে প্রভূত ধনরত্ন দেখতে পাচ্ছি, তা’তে বিস্মিত হ’য়ে পড়েছি। না জানি, এই সমস্ত প্রদেশে কতই ধনরত্ন সঞ্চিত আছে! ক্ষেত্র, তুমি এদেশে বাস ক’রে খুব ভাল কাজই করেছ। তুমি এ অঞ্চলে যত ভূমিসম্পত্তি পাও, কিনে ফেল। আর একটা কাজ কর। তোমার তিনটি ছেলের মধ্যে একটিকে বৈজ্ঞানিক কৃষি ও ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা দাও। তোমার বড় ছেলে নগেন্দ্র তোমার দক্ষিণ হস্ত; তা’কে তুমি ছেড়ে দিতে পারবে না। তোমার ছোট ছেলে, নরু ভারি চমৎকার লোক হ’বে,



কিন্তু সে নিতান্ত শিশু। তোমার মেজ ছেলে সুরেন্দ্রটির প্রকৃতি কিছু গস্তীর। লেখাপড়া শিখতেও তার যথেষ্ট যত্ন আছে। তুমি ঐ ছেলেটিকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাও। এখানে স্কুলকলেজ কিছু নাই। তুমি তোমার সুরেন্দ্রকে আমার সঙ্গে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দাও। আমি তা'কে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেব, আর নিজে তা'কে লেখাপড়া শেখাব। যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হ'লে, তোমার ঐ ছেলেকে আমি পাকা এগ্রিকালচারিষ্ট ও ইঞ্জিনিয়ার করব। তুমি কিছু টাকা কড়ি জমিয়ে ফেল। সুরেন্দ্র বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী, ও ইঞ্জিনিয়ারীং সম্বন্ধে উত্তম শিক্ষা পেল, সে তোমাকে ক্রোড়পতি ক'রে ফেলবে, তা আমি তোমায় অনশয় বলছি। কিন্তু তুমি এই অঞ্চলে নিকটে নিকটে উর্বর মৌজা পেলেই তা খরিদ ক'রবে। আমি এই প্রদেশের যে রত্নখর্ষা দেখতে পাচ্ছি, তা তুমি পাচ্ছ না। যদি পার, এই উপত্যাকাটি সর্ব্বাঙ্গে জমীদারের কাছে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে হাত কর। আর এর নাম 'নন্দন-কানন' রেখো। নন্দন-কাননই বটে! কি চমৎকার! কি চমৎকার!"

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি কখনও এই পর্ব্বতশৃঙ্গের আরোহণ করেন নাই বা এই উপত্যাকাটি দেখেন নাই। সুতরাং ইহা কোন্ জমীদারের সম্পত্তি, তাহা তিনি জানিতেন না। শৈলের অদূরে এক বৃক্ষতলে লখাই সর্দার বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লখাই, এই মৌজাটি কার?"

লখাই সর্দার প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা বলিল। তার মন্ত এইরূপঃ—পূর্বে ইহা গৌরসিংহ জমীদারের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সাঁওতালী হাঙ্গামার সময় উক্ত জমীদার সাঁওতালগণের সঙ্গে যোগ দিয়া পুরুলিয়া লুণ্ঠন করিতে যাওয়ায়, সরকার বাহাদুর তাহাকে ধরিয়া কাঁসী দেন। ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া খাস করিয়া লয়েন। সেই অবধি ইহা সরকার বাহাদুরের খাস সম্পত্তি। এখানে কাহারও গাছ কাটিবার বা এক কোদালি মাটি উঠাইবার হুকুম নাই। এখানে কেহ কোন্ও জন্তকে শীকার করিতে পায় না। সরকার

বাহাদুরের তহশীলদার কখনও কখনও এই মৌজায় জঙ্গল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করেন মাত্র।

ক্ষেত্রনাথ লখাইকে মৌজার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল "ইটোর নাম নন্দনপুর বটে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্র, তোমার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই জঙ্গলদেশেও কবি আছে। এই মৌজার নাম আর 'নন্দনকানন' রাখতে হ'বে না। 'নন্দনপুর' নামটিই বেশ। তোমার কোনও চিন্তা নাই। যখন এটি গভর্ণমেণ্টের খাস মহাল, তখন আমি এটি তোমার হাতে এনে দিচ্ছি। তুমি কাপাসের চাষটায় বেশ সফলতা দেখাও। একবার ডেপুটী কমিশনার সাহেবকে খুশী করতে পারলেই হ'ল।"

সেই সময়ে পর্ব্বতশৃঙ্গের অপর পাশে এক পাল হরিণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া, লখাই সর্দার বন্দুক লইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহাকে বলিলেন "লখাই, ওদিকে আর কেন যাচ্ছ?"

লখাই হাত নাড়িয়া বলিল, "তুই অত নাই চেষ্টাস, গলা। হরিণগুলান্ মাঝুষের সাড়া পালো পালাবোক।"\* এই বলিয়া লখাই সর্দার মুহূর্তমধ্যে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

### একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

লখাই সর্দারের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "লখাইয়ের কথাবার্তা ঐরূপ বটে; কিন্তু তার হৃদয়টি ভাল। আমি তার মত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত লোক অতি অল্পই দেখেছি। হরিণের পাল যেদিন থেকে আমার ধান নষ্ট করেছে, সেই দিন থেকে তাদের উপর তার ভয়ানক রাগ। সে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে হরিণ শীকার করিতে যায়; কিন্তু একদিনও হরিণ মারতে পারে নাই। আজও, দেখ না, হরিণ দেখেই বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন।

\* এতু, অর্থাৎ অত উচ্চস্বরে কথা বলিবেন না। মাঝুষের কঠ-স্বর শ্রুতিতে পাইলে হরিণগুলি পলাইবে।

সেই সময়ে ঠাহাদের মস্তকের উপরিভাগে ধূক্ষ-শাখায় বসিয়া একটা পক্ষী তাহার সুমধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল “বউ, কথা কও।” সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই পক্ষীর সেই সুমধুর স্বর শুনিয়া চমকিত ও আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন “ক্ষেত্রনাথ, তোমার এখানে চিরবসন্ত বিদ্যমান দেখছি। আজ ভোরের সময় কোকিলের কুহুরব শুনতে শুনতে ঘুম থেকে উঠেছি। ঐ উপত্যকাভূমি হ’তে মাঝে মাঝে পাপিয়ারও ডাক শুনতে পেয়েছি। আবার মাথার উপর এই বউ-কথা-কও পাখী মধুর অথচ করুণ স্বরে প্রণয়িনীর মান ভাঙাচ্ছে। ব্যাপার কি হে? এ দেশ যে সত্যসত্যই নন্দন-কানন!”

পাখী আবার ডাকিল “বউ, কথা কও।” সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “ওহে পক্ষিবর, আমায় কেন আর ওকথা শোনাও? ক্ষেত্রনাথ ভায়াও বোধ করি মানভঞ্জন পাল্লা এতদিন শেষ করেছেন। আর আমায় তো ইহজীবনে সে পালার অভিনয় কখনও করতেই হ’ল না। সুতরাং তুমি এখান থেকে সরে পড়।”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “আমি মানভঞ্জন পাল্লা প্রায় এক রকম শেষ করেছি বটে; কিন্তু তোমায় যে সে পালার অভিনয় করতে হবে না, তা কে বললে? আচ্ছা সতীশ, তুমি বিয়ে ক’রুলে না কেন? বিয়ে ক’রে ঘর সংসার ফাঁদতে কি ইচ্ছা হয় না?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন, “তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিয়ে আমি করি নি কেন, তা অনেক সময় আমি নিজেও ভালরূপে বুঝতে পারি না। বিয়ে করবার ইচ্ছা যে কখনও হয় নি, তাও নয়। তবে সে ক্ষণিক ইচ্ছা। এ আমি এক রকম বেশই আছি। দেখ, কারুর জন্ম কোনও ভাবনা চিন্তা নাই। যা পাই, তা নিজের জন্ম ও ইচ্ছামত খরচ করি। মা ষতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বিয়ে করবার জন্ম তিনি আমাকে মাঝে মাঝে জেদ করতেন বটে; কিন্তু এখন জেদ করবার আর কেউ নাই, আর আমিও বেঁচেছি।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, “তা বুঝলাম। কিন্তু তোমার ভাইভগ্নী তো আর কেউ নাই। সংসারে তুমি একাকী।

এদিকে তুমি মোটা বেতনও পাও। আর তোমার কিছু অভাবও নাই। এরূপ স্থলে, বিয়ে করলে কি কোনও দোষ হ’ত?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “তবে তোমায় বলি, শোন। আমি ব্রাহ্মণ-পাঁওতের ছেলে; তার উপর কুলীন ব্রাহ্মণ লেখাপড়াও কিছু শিখেছি। বিয়ে করব মনে করলে আমি কত বিয়ে করতে পারতাম বিয়ে করতে আমার আদৌ মন উঠে না তো আমি কি করব, বল-? যখন কলেজে পড়ি, তখন একটা ক’নে দেখতে গিয়েই বিয়ের উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়। সেই অবধি বিবাহে আর রুচি নাই।”

ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন “কি রকম?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলছি, শোন। তখন আমরা চাঁপাতলার মেধে থাকি। এক ঘটকী সন্ধ্যা আমাদের মেধে যাওয়া আসা করত। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, এইটি অবগত হ’য়ে সে আমাদের মেধে এক কুলীন কন্ঠার সন্ধান এনে রোজই আমার কাছে আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেই মেয়ের রূপগুণের বর্ণনা করত। মেয়ের বাপ বীডনু ষ্ট্রীটে থাকতেন, আর ছোট লাটের দপ্তরে কি একটা বড় কাজ করতেন। তিনি একদিন আমার অজান্তসারে আমাদের মেধে এসে আমাদের দেখে যান, আর বোধ করি আমাদের পছন্দও করেন। কেননা, ঘটকী তার পর আমাদের মেধে ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে লাগল, আর নগদ টাকা ও গহনা ইত্যাদির লোভ দেখাতে লাগল। বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমাদের বললে ‘চল, মেয়ে দেখে আসি।’ আমিও কতকটা তাদের অনুরোধে প’ড়ে, আর কতকটা কৌতূহলপরবশ হ’য়ে তাদের সঙ্গে একদিন রবিবারে মেয়ে দেখতে গেলাম। মেয়ের বাপ আগে থেকেই আমাদের যাওয়ার কথা জানতেন। আমরা তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ব’সলাম। মেয়েটি প্রায় পনের বছরের; দেখতেও নেহাৎ নন্দন নয়। তার বাপ তাকে হালফ্যাশানে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। মেয়েটির কথাবার্তায় কেমন একটা নিকৃষ্ট ধরণের ফিরিঙ্গীয়া ভাব লক্ষিত হ’ল।

সে ভাবটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ বালিকারও ভাব নয়, আর আমাদের দেশের উন্নতিশীল বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মার্জিত-রুচি বালিকাদেরও ভাব নয়। সেই কারণে, প্রথমেই তোমাকে ব'লে রাখি যে, মেয়েটিকে দেখে আমার মনে কোনও অসুরাগ বা উল্লাসের উদয় হয় নাই। আমি যেন একজন নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের মত তার কথা-বার্তা শুন্তে লাগলাম। আমার মনে হ'তে লাগল, এই মেয়েটি যেন আমাদের সংসারে ও আমার জীবনে বেশ মানানসই হ'বে না—যেন খাপ ছাড়া হ'বে। আমার মনে হ'তে লাগল, আমি তাদের বাড়ী থেকে শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচি বাস্তবিক, যখন মেয়ে দেখা শেষ হ'ল, আর আমরা হেঁদোর ধারে বেড়াতে লাগলাম, তখন আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! মেয়ের সেই বিজাতীয়,—ও তোমায় বলতে কি—সেই কেমন-এক-রকম অদ্ভুত ভাব দেখে আমার মন বিরক্ত হ'য়ে উঠল। আমি মনে করলাম, স্ত্রীর নয়না যদি এই রকম হয়, তা হ'লে আমি জীবনে কখনও বিয়ে করব না। সেই কারণে, আমি আর কখন কোথাও মেয়ে দেখি নাই, আর বিবাহ করতেও সম্মত হই নাই।”

ক্ষেত্রনাথ সতীশের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “আমি তোমার মনের ভাব বুঝলাম। হিন্দু পরিবারের একটা হিন্দুয়ানী ভাব আছে, তাহাই হিন্দুর বিশিষ্টতা বা জাতীয়ত্ব। সেই জাতীয়ত্বের সঙ্গে যমিশ্ খায় না, সেইটি আমাদের ভাল লাগে না, বা তা কখনও আমাদের নিজস্ব হ'তে পারে না। যেমন হিন্দুর গৃহপ্রাক্শে ক্রোটন অপেক্ষা তুলসী গাছের অধিকতর শোভা, আর বিলাতী পুষ্পরক্ষ অপেক্ষা একটা যুঁইঝাড়ের অধিকতর সার্থকতা! এ সব কথা সত্য বটে; কিন্তু তোমার গৃহপ্রাক্শে তুমি যদি ক্রোটন রোপণ করিতে না চাও, তা হ'লে একটা তুলসী গাছ তো অনায়াসে রোপণ করিতে পার? তুলসী গাছের তো অভাব নাই; সন্ধান করলেই পাবে।”

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “সন্ধান করলে তুলসী গাছ যে পাওয়া যেত না, বা এখনও পাওয়া যায় না,

তা নয়। তবে আমি সর্বিশেষ কোনও চেষ্টা করি নাই, আর চেষ্টা করবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখি না।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা, তুমি বল্লভপুরে যে ‘সচল স্থলপদ্ম’টি দেখেছ, সেটিকে তোমার গৃহপ্রাক্শে রোপণ করলে কি রকম হয়? তুমি যেমনটি চাও, ইনি ঠিক তেমনটি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে; কুলীনকন্যা; প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে লালিতা পালিতা; স্বভাবচরিত্রে কোনও কৃত্রিমতা নাই; ঠিক সচল স্থলপদ্মই বটে। ইংরাজী না জানলেও, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে; প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে গৃহিনীকে বাগ্মীকির মূল রামায়ণ পাঠ ক'রে শোনায়। আর শুনেছি, প্রত্যহ শিবপূজা না ক'রে জলগ্রহণও করে না। আজ ছয় মাস আমরা তাকে দেখছি, এমন মধুরস্বভাবা, মধুর-ভাষিনী আর সলজ্জা মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নাই। শুভ্র পুষ্পের গায় ইনি নিশ্চল ও পবিত্র। আমি তোমাদের মেলটেলের কথা জানি না। কিন্তু তুমি ও ভট্টাচার্য্য মশাই যখন এক গোত্রের নও, তখন আদান প্রদানে কোনও আপত্তি হ'বে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।”

ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “তুমি যে চমৎকার ঘটকালী করিতে পার, দেখছি! আচ্ছা, এখন ওসব কথা যাক। তোমাদের ‘সচল স্থলপদ্ম’ সম্বন্ধে, আর তাঁদের বংশ-সম্বন্ধে আরও পরিচয় জানা আবশ্যিক। আমাদেরও পরিচয় ভট্টাচার্য্য মশাইকে জানতে হ'বে। আমাদের হিন্দুসমাজটি অষ্টবন্ধনে বাধা; এ সমাজের মধ্যে অবাধ প্রেমের স্থান নাই। সংঘমের উপরেই হিন্দুসমাজের স্থিতি, গতি ও উন্নতি। সংঘমের অভাব হ'লেই হিন্দুর হিন্দু থাকবে না।”

পাখী আবার ডাকিয়া উঠিল, “বউ, কথা কও।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “ক্ষেত্র, তোমার এই পাখীটা বড় জ্বালাতন করলে, দেখছি। চল, এখান থেকে স'রে পড়া যাক।”

সেই সময়ে লখাই সর্দার মৃগয়ায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আবার একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, “চোখ্ গেল, চোখ্ গেল।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “এ যে আবার পাপিয়াও এসে পড়ল, দেখতে পাচ্ছি। সত্যসত্যই এরা আমাদের এখান থেকে তাড়ালে। অসময়ে বসন্তের আবির্ভাব! লক্ষণ বড় ভাল নয়।”

লখাই সর্দার বলিল, “ইটোর নাম পাপিয়া নাই বটে! ইটো দেওরা।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন, “দেওরা? দেওরা নাম কেমন ক’রে হ’ল?”

লখাই বলিল “পাখটো কি রাকাড়্ছে, তুই নাই শুন্তে পাচ্ছুস? ঐ যে পাখটো ব’ল্ছে ‘খন্তর হে—খন্তর হে—দেওর কে হয়? দেওর কে হয়?’”

সতীশ ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই উঠেঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, “এইজগত্ই বুঝি পাখীর নাম দেওরা হয়েছে? আচ্ছা, লখাই, আর একটা পাখী ঐ যে ডাক্ছে, ওর নাম কি?”

লখাই বলিল, “উটোর নাম আকু-পাকু হে। ঐ পাখটো জোড় হারায় আকু-পাকু কর্ছে কি না?”†

আবার উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন, “ক্ষেত্র, কে বলে এদেশে কবি নাই? এই পাখীটির আকু-পাকু নামই ঠিক। আর আমার যখন কোনও ভাই নাই, আর তুমিও তামুর হ’বার দাবী রাখ, তখন দেওর কে হ’বে, তার মীমাংসার ভার তোমার উপরেই রইল।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## ধরণী

নবমুকুলের গন্ধে আকুল—অধীর  
বসন্ত-পবন,  
কলকণ্ঠ-কুহরিত মাদলিক গীতে  
মুখরিত বন।

\* “পাখীটি কি বলে ডাক্ছে, তা আপনি শুন্তে পাচ্ছেন না? ঐ যে পাখীটি ব’ল্ছে “খন্তর হে, দেওর কে হয়? দেওর কে হয়?”

† “এই পাখীর নাম আকু-পাকু। পাখীটি জোড় অর্থাৎ সঙ্গিনী হারিয়ে আকু-পাকু বা ছটকট্ কর্ছে কি না, তাই ওর নাম ‘আকুপাকু’ হ’য়েছে।”

মোহিনী ধরণী—আজি  
নব পুষ্পভারে সাজি’  
হেরিছে হৃদয়ে নব  
প্রণয়-স্বপন।

স্কন্ধ বৈশাখের বায়ু আতপ্ত—প্রথর  
রবির কিরণ,  
বিকশিত পুষ্পবনে ক্ষান্ত ভ্রমরের  
অলস গুঞ্জন।

মানিনী ধরণী—আজ  
ছিন্ন করি’ ফুল-সাজ  
ভূতলে বিছায় তা’র  
অঞ্চল-শয়ন।

দালিত অঞ্জননিভ পুঞ্জ মেঘ দলে  
মেঘুর অঘর,  
ঋধারিয়া দশ দিশি বরষার ধারা  
ঝরে ঝরঝর।  
শূন্যগৃহে একাকিনী  
কাঁদে ধরা-বিন্ধিহিনী,  
দিগন্ত-বিলীন ঋধি,  
কাতর অন্তর।

খচিত - উজ্জ্বল নীল শারদ আকাশ  
শুভ্র মেঘস্তুরে;  
সরোবরে শতদল—শুভ্র বন ফুল  
শ্রামল প্রান্তরে।  
ধরণী—সৌভাগ্যবতী  
পতিসোহাগিণী সতী,  
মিলন-মধুর হাসি  
প্রফুল্ল অধরে।

মলিন ফুলের শোভা, সিক্ত দুর্বাদল  
হিম-বরিষণে;  
হেমন্তের শস্ত্রক্ষেত্র রঞ্জিত বিমল  
সুবর্ণ বরণে।

জননী ধরণী—স্নেহে  
সস্তানে ডাকিয়া গেহে,  
ভাণ্ডার খুলিয়া রত  
অন্ন-বিতরণে।

স্বরূপ যত গীতগান, তুহিন-শীতল  
বহে সমীরণ,  
ঝরিয়া গিয়াছে জীর্ণ পত্র পুষ্পরাশি—  
বিশীর্ণ কানন।  
তুচ্ছ আভরণ যত ;  
বাসনা-বন্ধন গত,—  
তাপসী ধরনী—আজি  
ধ্যানে নিমগন।

শ্রীরমণীমোহন দোষ।

## গোত্র

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভাষা হইতে অনেক নূতন  
শব্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাষা প্রকৃতপক্ষেই  
রত্নগর্ভা—ইহাতে অনেক রত্ন নিহিত রহিয়াছে। আমরা  
অনেক কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার অর্থ  
প্রতিধান করিয়া দেখি না এবং অনেক সময়ে ভুল অর্থে  
সেই সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রাচীন ভাষা  
আলোচনা না করিলে বর্তমান ভাষা সব সময়ে পরিষ্কার  
বুঝা যায় না। আমরা অল্প ঋগ্বেদের সাহায্যে ‘গোত্র’  
শব্দটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আলোচনা করিলেই  
বুঝিতে পারিব ভাষার অন্তরালে কত তত্ত্ব লুক্কায়িত  
রহিয়াছে।

‘গোত্র’ একটি প্রচলিত কথা; কিন্তু ইহার অর্থ-  
বিষয়ে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। প্রকৃতিবাদ  
অভিধানে লিখিত আছে, “গোত্র = গু ( শব্দকরা ) + ত্র,  
সংজ্ঞার্থে; যে পূর্বপুরুষদিগকে উক্ত করে।” কেহ কেহ  
বলেন গোত্র = গো ( = পৃথিবী ) + ত্র ( ত্রাণ করা ) +  
ত্ৰ = যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করেন বা পালন করেন অর্থাৎ  
ঋষি। এ সমুদয় অর্থই মনঃকল্পিত বলিয়া  
মনে হয়। যেখানে সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে কোন-  
কোন মাল হয় না বরং অর্থ পরিষ্কার হয় সেখানে সাধারণ  
ই গ্রহণ করা উচিত। গোত্র = গো + ত্রৈ + ড; এখানে  
‘গো’ এবং ‘ত্রৈ’ শব্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিলেই

“গোত্র” শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হইবে। গো = গোরু  
এবং ত্রৈ = ত্রাণ করা; যাহা গোরুকে রক্ষা করে তাহাই  
গোত্র অর্থাৎ গোশালা, ‘গোয়াল’। আমরা যে সিদ্ধান্তে  
উপনীত হইয়াছি ঋগ্বেদ পাঠ করিলে সেই সিদ্ধান্তকেই  
প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে  
কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

১। একস্থলে ( ১৫১৩ ) আছে—হে ইন্দ্র! তুমি  
অঙ্গিরাদিগের জন্ত ‘গোত্র’ খুলিয়া দিয়াছিলে (ত্বম্ গোত্রম্  
অঙ্গিরোভ্যঃ অরুণোঃ)।

২। “সোমরসের মত্ততায় ইন্দ্র দৃঢ় ‘গোত্র’ ভগ্ন  
করিয়াছিলেন”—গোত্রা সহসা মদে সোমশ্চ দৃগ্হিতানি  
ত্রৈরয়ৎ। ২। ১৭। ১।

৩। “তুমি গো সমূহের ‘গোত্র’কে খুলিয়া দিয়াছিলে”  
গবাম্ গোত্রম্ উৎ অশ্বজঃ। ২। ২৩। ১৮।

৪। “‘গোত্র’ বিদৌর্ণ করিয়া আমাদেরকে গো দান  
কর, উপভোগযোগ্য দানাদি আমাদের নিকট আগমন  
করুক, হে মগবন্! তুমি আমাদেরকে গো দান কর”  
(আ নঃ গোত্রা দদৃহি—ইত্যাদি ৩। ৩০। ২১)।

৫। “হে ইন্দ্র! আমাদেরকে যে পিতৃগণ গো  
সমূহের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহাদিগের  
নিন্দক কেহ নাই। মহিমাবান্ পরাক্রমশালী ইন্দ্র ইহা-  
দিগের জন্ত দৃঢ় ‘গোত্র’ খুলিয়া দিয়াছিলেন” (ইন্দ্র এষাম্  
দৃগ্হিতা মাহিনবান্ উত গোত্রাণি সমৃজে দংসনাবান্  
৩। ৩৯। ৪)।

৬। “তুমি আমাদেরকে নেতা; অঙ্গিরাগণ কর্তৃক  
স্বত হইয়া তুমি ‘গোত্র’ ভেদ করিয়া ( গোত্রা রুজন্ ) বহু  
ধন প্রদান করিয়াছিলে।” ৪। ১৬। ৮।

৭। “হে উষা! এখন অঙ্গিরাগণ তোমার গো সমূহের  
‘গোত্র’কে প্রশংসা করিতেছে। গোত্রা গবাম্ গৃণন্তি।  
তাহারা মন্ত্র দ্বারা গোত্র ভেদ করিয়াছিলেন ( বিভিহুঃ )  
৬। ৬৫। ৫।

এখানে কিরণকে ‘গো’র সহিত তুলনা দেওয়া  
হইয়াছে।

৮। একস্থলে বলা হইয়াছে যে স্তোত্রগণ গোত্র  
লাভের জন্ত ( গোত্রশ্চ দাবনৈ ) স্তুতি করিতেছে ( মোক্ষ-  
মূলারের সংস্করণে ৮। ৬৩। ৫; বোধাই সংস্করণে ৮। ৫২। ৫ )।

৯। “আমাকে ‘গোত্র’ অর্পণ কর” (ময়ি গোত্রম্) ৮।১০।১০।

১০। “তুমি অঙ্গিরাদিগের জন্ম ‘গোত্র’ উন্মুক্ত করিয়াছিলে” গোত্রম্ অঙ্গিরোভ্যাঃ অরণোঃ অপ। ৯।৮।২৩।

১১। “আমি দধীচি ও মাতরিশ্বাকে ‘গোত্র’ প্রদান করিয়াছিলাম (আদদে গোত্রা) ১০।৪।২।

১২। একস্থলে ইন্দ্রকে ‘গোত্রভিদম্’ ‘গোবিদম্’ বলা হইয়াছে ১০।১০।৩৬। যিনি গোত্র ভেদ করেন তিনি গোত্রভিৎ।

১৩। অপর একস্থলে বৃহস্পতির রথকে ‘গোত্রভিদম্’ বলা হইয়াছে ২।২৩।৩।

রথে আরোহণ করিয়া শক্রদিগের ‘গোত্র’ হইতে গাভী আনয়ন করা হয় এইজন্ম এখানে রথকেই ‘গোত্র-ভিদ’ বলা হইয়াছে।

১৪। একস্থলে বলের সহিত গোত্রে প্রবেশ করিবার (অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানঃ) কথা বলা হইয়াছে। ১০।১০।৩৭ এবং অথর্কবেদ ১৯।১৩।৭।

এই সমুদয় পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ‘গোত্র’ = ‘গোশালা’, যেখানে গোরুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

প্রাচীনকালে পশুই—বিশেষতঃ গোরুই—লোকের প্রধান সম্পত্তি ছিল। পাশ্চাত্য ভাষাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজী Pecuniary = অর্থ সম্বন্ধীয়; লাতিন Pecus হইতে নিম্ন এবং এই শব্দের অর্থ পশু।

গোরু দল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে, হিংস্রজন্তু গোরুবাছুর লইয়া পলায়ন করিতে পারে এবং শক্রগণও এই সমুদয় অপহরণ করিতে পারে। এই সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম গোরুবাছুরকে একটি স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; ইহারই নাম গোত্র বা গোষ্ঠ। প্রাচীনকালে গোরু লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ঋগ্বেদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে—মহাভারতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা দুর্বল কিম্বা একাকী বাস করিত তাহাদের পক্ষে এসব রক্ষা করা মহা বিপদ হইয়াছিল। সেইজন্ম সকলকেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইত। দল হইলেই নেতা থাকা চাই; যাহারা গুণে,

জ্ঞানে, ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকেই নেতৃত্বে বরণ করা হইত। বশিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপে দলপতি হইয়াছিলেন। এক এক দলের এক এক ‘গোত্র’ ছিল। গোত্রপতির নাম হইতেই গোত্রের নাম হইত; এইরূপে বশিষ্ঠ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, কাশ্যপ গোত্র ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহারা অত্রির দলে থাকিত তাহারা বলিত ‘আমরা অত্রি গোত্রের লোক; যাহারা ভরদ্বাজের দলে থাকিত তাহারা বলিত ‘আমরা ভরদ্বাজ গোত্রের লোক;—পরিচয় দিবার সময় লোকে গোত্র দ্বারাই পরিচয় দিত।

যাহারা কোন একটা গোত্রে বাস করিত তাহারা যে সকলেই এক রক্তের সম্পর্কীয় লোক তাহা নহে—বিভিন্ন পরিবারের লোক দলবদ্ধ হইয়া এক গোত্রপতির আশ্রয় গ্রহণ করিত। এপ্রকারও ঘটিত যে একজন এক সময়ে এক গোত্রে রহিয়াছে, কালে হয়ত সে অপর গোত্রে চলিয়া গেল। গৃৎসমদ অঙ্গিরা-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ভৃগুবংশে যোগ দিয়াছিলেন।

প্রথমে ‘গো’ লইয়াই ‘গোত্র’ রচিত হইয়াছিল। সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে ‘গো’ সম্পর্ক চলিয়া গেল—কিন্তু দল ও দলপতি রহিয়াই গেল। পূর্বে যেমন লোকে ‘গোত্র’ দ্বারাই পরিচিত হইত, ‘গো’-সম্পর্ক চলিয়া যাইবার পরও সেই পূর্বের নামেই পরিচিত হইতে লাগিল। তাহাদের বংশধরগণ এখনও সেই গোত্র দ্বারাই পরিচিত হইতেছেন কিন্তু এখন সে ‘গো’ও নাই—সে ‘গোত্র’ও নাই।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

## মিত্রমূর্তি

বঙ্গদেশে অদ্যাপি যে-সকল মূর্তি-শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বিষ্ণু, বুদ্ধ ও সূর্য্য পর্য্যায়ের মূর্তির সংখ্যাই বহু পরিমাণে বিদ্যমান। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে মূর্তি শিল্পের উৎকর্ষ-কালের মধ্যে, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং সৌরধর্ম সমধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

উল্লিখিত ত্রিবিধ মূর্তির প্রতি পর্য্যায়, বিভিন্ন নামধের বিভিন্ন গঠনের এবং বিভিন্ন অবস্থার মূর্তিগুলি ভাস্করগণ কর্তৃক

তক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বুদ্ধ ও বিষ্ণু পর্যায়ের মূর্তি-গুলির বিভিন্ন অবস্থা ও আখ্যা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু সূর্য্য-মূর্তির পাথকা সম্বন্ধে ততদূর আলোচনা অত্যাধিক হইতেছে না। ইহার ফলে আমরা উপকন্য-পরিহিত এবং সপ্তাশ্ব-যোজিত মূর্তিমাত্র-কেই এক সাধারণ সূর্য্যমূর্তি আখ্যা প্রদান করিয়া নিশ্চিত থাকি :

মূর্তি-শিল্প সম্বন্ধে অল্পসংখ্যার ফলে এ পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সূর্য্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিষ্ণু ও বুদ্ধ-মূর্তির ত্যায় ঐ-সকল মূর্তির মধ্যেও পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ মূর্তি সমূহের কোনোটিতে দ্বাদশা-দিত্যের মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, কোনোটিতে বা দ্বাদশা-দিত্যের মূর্তির স্থলে একাদশটি মূর্তি তক্ষিত হইয়া মূলমূর্তি-দ্বারা দ্বাদশাদিত্যের সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। কোনো-টিতে বা দ্বাদশাদিত্যের মূর্তি একেবারেই তক্ষিত হয় নাই। অল্পসংখ্যার মূর্তির সংখ্যাও কোনোটিতে অল্প এবং কোনোটিতে অধিক। এই-সমস্ত বৈলক্ষণ্য যে ভাস্করগণের খামখেয়ালী, এইরূপ বিবেচনা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাণে ভগবান্ ভাস্করের দ্বাদশমূর্তির উল্লেখ আছে। উহাই দ্বাদশাদিত্য নামে খ্যাত দ্বাদশাদিত্যের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে “শঙ্করব্রহ্মসংহিতা” নামক অভিধানে পুরাণ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে;— “ব্রহ্ম, কণ্ঠা সংজ্ঞা আদিত্য-পত্নী আদিত্যায় তেজঃ সোচুমসমর্থঃ অতস্তস্তাঃ পিতৃকৃতাদিত্য-দ্বাদশখণ্ডা দ্বাদশাদিত্যাঃ। তেষাং দ্বাদশ মাসেষু কৈকশ্চোদয়ঃ।”

ব্রহ্মার কণ্ঠা, আদিত্য-পত্নী সংজ্ঞা, আদিত্যের তেজঃ সহ করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার পিতা ( ব্রহ্ম ) আদিত্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহারই এক একটী এক এক মাসে উদ্দিত হন।

উক্ত দ্বাদশাদিত্য বৈশাখাদি মাস ভেদে কি কি নামে উদ্দিত হ'ন কুশ পুরাণের ৪০ অধ্যায়ে তাহা নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

বরুণো বাষ মাসেতু সূর্য্যপূষাতু ফাল্গুনে।  
চৈত্রে মাসি ভবেদীশো ধাতা বৈশাখ-ভাপনঃ ॥  
জ্যৈষ্ঠমূলে ভবেদিস্ত্র আষাঢ়ে সবিতা রবিঃ।  
বিবশ্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্ম ভগন্যুতঃ ॥

পর্জন্তোহন যুক্তিঃ কাৰ্ত্তিক মাসি ভাস্করঃ।  
মার্গশীর্ষে ভবেদিত্র পৌষে বিষ্ণু সনাওনঃ ॥”

সূর্য্যদেব মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুন মাসে পূষা, চৈত্র মাসে ঈশ, বৈশাখ মাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইস্ত্র, আষাঢ় মাসে সবিতা, শ্রাবণ মাসে বিবশ্বান, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে ব্রহ্মা, কার্ত্তিক মাসে ভাস্কর, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র এবং পৌষ মাসে বিষ্ণু নামে আখ্যাত



মিত্রমূর্তি।

কোনো না কোনো পুরাণগ্রন্থে সূর্য্যদেবের এই দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ প্রকার মূর্তির বর্ণনা বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নহে। অধুনা বহু পুরাণগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অনেক পুরাণ আমাদের বঙ্গদেশে হস্তপ্রাপ্য। বিগত ১৩১৮

বঙ্গদেশের ৩য় সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” “চুঁচুড়ার সূর্যামূর্তি” নামক প্রবন্ধের শেষে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়, “বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্র” হইতে দ্বাদশাদিত্যের অন্তর্গত মিত্রদেবের মূর্তির পূর্ণ পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এই গ্রন্থে দ্বাদশাদিত্যের অন্তর্গত মিত্রমূর্তি ব্যতীত অপর একাদশ আদিত্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ভরসা করি প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রে মিত্রমূর্তির পরিচয় নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

“একচক্রং সপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্ ।  
হস্তদ্বয়ং পদদ্বয়ং কঙ্কুক-চর্ম্ম-বক্ষসম্ ॥  
অকুঞ্চিত স্কেশস্ত প্রভামণ্ডল-মণ্ডিতম্ ।  
কেশ-বেশ-সমায়ুক্তং স্বর্ণরত্ন-বিভূষিতম্ ॥  
নিকুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
সর্বাভরণ-সংযুক্তা কেশহার-সমুজ্জ্বলা ॥  
এবমুক্ত রথস্তম্ভ মকরধ্বজ ইবাতে ।  
মুকুটকাপি দাতব্যমণ্ডলং সর্বং সমণ্ডলম্ ॥  
একবক্ত্রাঙ্কিং গা দণ্ডো স্কন্দশ্বেজো করাসুজ্জম্ ।  
কৃত্বাত্ত্ব স্থাপয়েৎ পূর্বং পুরুষাকৃতিরূপিণী ॥  
হয়ারুচস্ত কুস্বীত পদদ্বয়ং বাচনামকম্ ।  
স দিব্যমানবপুষং সর্বলোকৈকদীপকম্ ॥  
জাতিহিঙ্গুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ।  
চতুর্দ্বারহিহস্তোবা রেখামণিবিভাজনা ॥  
দ্বিহস্তস্বরোজয় সবলান্বরথস্থিতঃ ।  
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌচ খড়্গগিনৌ ॥”

( বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প )

( মিত্রদেব ) সপ্তাশ্ব ও সারথিযুক্ত একচক্র মহারথে অধিষ্ঠিত। দুই হস্তে পদ এবং বক্ষে কঙ্কুক ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কেশগুলি অকুঞ্চিত এবং প্রভা মণ্ডল-মণ্ডিত। কেশ সুবেশযুক্ত এবং স্বর্ণ-রত্ন-বিভূষিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিকুভা, বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী। উভয়ে সর্বাভরণসংযুক্তা এবং কেশহার-সমুজ্জ্বলা। উক্ত রথ মকরধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেরই মণ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। মিত্রদেবের সম্মুখ ভাগে পুরুষরূপী দুইটা মূর্তি করিতে হইবে, তন্মধ্যে দণ্ড বা যদের এক বক্ত্র এবং স্কন্দ তেজোকরানুজ হইবেন। দিব্যদেহধারী এবং

সর্বলোকের আলোকদানকারী বাচকে হয়ারুচ পদ্মের উপর স্থাপন করিবে। সূর্য্যের মণ্ডল জাতি-ও-হিঙ্গুল-বর্ণবৎ হইবে। চতুর্ভুজই হউক আর দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বারা সুশোভিত, দ্বিহস্তোপরি পদ ও সবলান্বরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পিঙ্গল নামক খড়্গধারী দুইটা দ্বারপালকেও রাখিতে হইবে। \*

উল্লিখিত মূর্তির পরিচয়ে, মিত্রদেব ও তাঁহার অনুযঙ্গীগণের পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় চুঁচুড়ার-সূর্য্যামূর্তি এবং ময়ূরভঞ্জের দুর্গম জঙ্গলে প্রাপ্ত সূর্য্যামূর্তি, এতদুভয়কেই মিত্রমূর্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উক্ত প্রবন্ধে ঐ মূর্তিদ্বয়ের চিত্র সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ঐ মূর্তিদ্বয় মিত্রমূর্তি হইলেও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। বর্তমান প্রবন্ধে মিত্রমূর্তির যে চিত্র সংযোজিত হইল, পাঠকগণ তাহার সহিত উল্লিখিত পরিচয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন।

মিত্রদেবের দুই হস্তে সনালবিকশিত পদ। বক্ষস্থল-কঙ্কুক দ্বারা আবদ্ধ। মস্তকে সুশোভন মুকুট। হস্তে কেয়ুর ও কর্ণে কুণ্ডল। বামস্কন্ধ হইতে নাভির উপরিভাগ পর্য্যন্ত মালাকারে গ্রীষিত উপবীত। পরিধেয় বসন সুবিগ্ৰহ। পশ্চাৎদিক হইতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্কুল-মালা দোহুল্যমান। পদদ্বয় উপানত-পরিহিত। পদতলে বিকশিত বৃহৎপদ, তন্নিম্নে সপ্তাশ্ব যোজিত। ঠিক মধ্যস্থলের অশ্বটির পৃষ্ঠে উত্তত হস্তে সারথি অরুণ উপবিষ্ট। মিত্রদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে নিকুভা এবং বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী দণ্ডায়মানা; তাঁহারা সর্বাঙ্গকার-ভূষিতা। সম্মুখের দুই পার্শ্বে দুইটা পুরুষমূর্তি; তাঁহাদের মধ্যে বাম পার্শ্বেরটা দণ্ড অর্থাৎ যম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অসি। দক্ষিণ পার্শ্বেরটা স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিকেয়। স্কন্দের একহস্তে বিকশিত পদ ও অপর হস্তে ঘৃতভাণ্ড, তাঁহার উদর স্কুল এবং বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু বিরাজিত। মিত্রদেবের ঠিক সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া—বাচ অর্থাৎ বক্রণ। দণ্ড ও স্কন্দের দুই পার্শ্বে খড়্গধারী দুইটা দ্বারপাল শোভা পাইতেছে। উহাদের মধ্যে একের

\* নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ।



নাম দণ্ড এবং অপরের নাম পিঙ্গল। উভয়েই মল্ল বেশে  
দণ্ডায়মান।

পাঠক-দেখিলেন, বিশ্বকর্মীয় শিল্পশাস্ত্রোক্ত মিত্রমূর্তির  
পরিচয়ের সঙ্গে আলোচ্য মূর্তির কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য  
রক্ষিত হইয়াছে! ভাস্কর যেন উক্ত গ্রন্থ সম্মুখে খুলিয়া  
রাখিয়া মূর্তিখানা তক্ষণ করিয়াছে! স্বীয় শিল্পের উৎকর্ষ  
সাধনের নিমিত্ত ভাস্কর বেশভূষা বিষয়ে বিশেষ আড়ম্বর  
করিয়াছে বটে কিন্তু মূল বিষয়ে উল্লিখিত পরিচয়ের  
কোনো প্রকার অপলাপ সংসাধিত হয় নাই। শাস্ত্রোক্ত  
পরিচয়ে, কানুষ্কীগণের সংখ্যা সার্থক সহ নয়টি। আলোচ্য  
মূর্তিতেও ঠিক তাহাই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

মূর্তিখানির শীর্ষদেশে কীর্তিমুখ-চিহ্ন বিরাজমান  
রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই উহার প্রাচীনত্ব স্বীচত হইবে।  
শিল্প হিসাবেও যে মূর্তিখানি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত,  
তাহাতেও সন্দেহের কোনো কারণ নাই।

এই সৌরযুগের অবসানে এখনো আমাদের দেশে  
মিত্রসপ্তমীতে (অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে উপ-  
বাসাদির নিয়ম প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। মিত্রসপ্তমী  
সদকে “সম্বৎসর-কৌমুদী” নামক গ্রন্থে, ভবিষ্য পুরাণ  
হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে;—

- অদিত্যেঃ কণ্ঠপাঙ্কজে মিত্রো নাম দিবাকরঃ।  
মার্গশীর্ষস্ত মাসস্ত শুক্রেপক্ষে শুভেতিথৌ ॥  
সপ্তম্যাং তেন সাখ্যাতা লোকেহস্মিন মিত্রসপ্তমী।  
তত্রোপবাস কর্তব্যো ভক্ষ্যানথ ফলানি বা ॥

এই মূর্তিখানি ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের রাজ-  
কুমার “ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার” নামক  
ইতিহাস-গ্রন্থ-প্রণেতা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকিশোর রায়  
চৌধুরী মহোদয়ের পুস্তকাগারে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।  
তিনি এই মূর্তির পরিচয় প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিয়া  
এবং শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ইহার  
আলোকচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমাকে বিশেষ  
সহায়তা করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

## পুরীর চিঠি

ধূ ধূ বালির বিথার যেথা মিলায় পারাবারে  
আমি এখন রয়েছি সেই পাতাল-পুরীর দ্বারে।  
সম্মুখে নীল জলের রাশি নেই কিনারা কূল,—  
ফোটেনা এই কালীদেহে বাঙা কমল ফুল।  
হীরাকষের কষ মেতেছে তুঁতের রসে রসি'  
গড়ায় যেন বিশ্বলোকের ললাট-লিপির মসী।  
আস্মানী নীল রঙের সাথে জলঙ্গা নীল মেশে,—  
জগৎ যেন মিলিয়ে যাবে প্রলয়-মেঘের দেশে!

\* \* \* \*

নীল কাজলের তুলি আমার চোখে বুলায় কে রে!  
যে দিকে চাই নিবিড় নীলে নয়ন আসে ভেরে!  
মায়া-কাজল মন্ত্র-পড়া—ভুল কিছু নেই তায়,—  
মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি আমার ডাহিন বায়।  
পাতাল-পুরীর সিং-দরজায়, উছল চেউয়ের পাশে,  
ময়াল-সাপের ছড়কা ঠেলে নাগবালারা আসে;  
মুক্তা-ঘেরা ঘোমটা তুলে চোখ মেলে যেই তারা,  
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী চেউ—ফেনা ফটিক-পারা।

\* \* \* \*

ফেরৎ চেউয়ের পথ আঙলে দাঁড়ায় 'বাঘা' চেউ,  
সাপটে তিমি গিলতে পারে এমনি বৃহৎ কেউ!  
বলের গর্বে পর্বে পর্বে সাগর ওঠে ফুলে  
দিগ্দিগন্তে অঙ্গ মেলে অটুহাসি তুলে!—  
সরিৎ-পতির হস্তামলক শুক বসুন্ধরা,  
তিমি-গেলা তিমিঙ্গিলা আতকে আধ্মরা।—  
চৌদ্ধ মাদল বাজে হঠাৎ,—হৃদয় ওঠে মেতে,—  
হরধনুর্ভঙ্গ-খেলা ভঙ্গ-তরঙ্গিতে।

\* \* \* \*

দক্ষিণের এই দ্বারে স্বয়ং মৃত্যু আছেন বুঝি  
চারদিকে তাই যমের মহিষ চেউয়ের যোঝাযুঝি,  
চারদিকে তাই হাপর চলে, কাঁপর হ'য়ে দর্শি,  
চারদিকে তাই মাথা কোটে স্বর্গলোভী ঢেঁকি!  
চেউয়ের পরে চেউ চলেছে শুধু চেউয়ের মেলা,  
চেউয়ের সাথে ওলায় কৃত সাগরিকার ভেলা।

কঙ্কাবতীর নৌকা—তাও—এড়ায়নি এই চোখ,—  
নেবু-ফুলের ডোর জড়ানো গলুইটা ইস্তক !

লাধ্ হাতীর ওই হলুকা বেরোয় কার শোভা-যাত্রাতে ?  
বরুণ-পুরীর বাড়ব-ঘোড়া ছুটছে সাথে সাথে !  
এরাই বুঝি বাধা ছিল কপিল-গুহা-তলে  
ছাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘৃষ্টি-মালা গলে ।—  
কোন্ দিকে ধায়, নেই ঠিকানা, — ঠিক লেগেছে 'ভুলো'  
ভিড় করে তার পিছন নেছে দ্রবিড় কতকগুলো !  
ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণান্ত হয় তরঙ্গ-সঙ্কটে,—  
জলোৎকা আর সঙ্কটা মাছ আছড়ে পড়ে তটে ।

\* \* \* \* \*  
কতই কথা লিখ্ছে সাগর লিখ্ছে, বারো মাস  
উতলা ঢেউ লিখ্ছে সাগর-মথন-ইতিহাস ;  
দেখ্ছি আমি মুহূর্তে জাগ্ছে দিকে দিকে  
সাপের রশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;  
উঠ্ছে সূখা, ফুট্ছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা  
আড়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা ।  
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালা ;—চল্ছে অভিনয়  
দেবাসুরের দ্বন্দ-লীলা—দুরন্ত দুর্জয় ।

ঝড়ের বেগে কাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে  
নীল-জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে !  
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্টে গেল পট  
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার খট !  
তারে ঘিরে অঙ্গুরীরা তয়ফা নেচে যায়  
ফেনার চারু চিকণ কারু ছল্ছে পায়ে পায় ।  
কালীদহের কমল-কলি কালিপেটা পাখী  
চরণে তার শুভ্র ফুলের অঞ্জলি দেয় ঝাঁকি ।

\* \* \* \* \*  
এই সমুদ্র—ভীষণ, মধুর ;— কাছে থেকেও দূর ;  
জগৎ-পতির গোপন ছবির রহস্য-মুকুর ।  
এই তো হরি-বাসর-রাতের শয্যা সুবিস্তার,  
শেষ-তোলানি সোনার মোহর—উষার কিরণভার ।  
জ্যোৎস্না-রাতে এই সমুদ্র আনন্দ-ফোয়ারা ;—  
কাল অঙ্কুরর পাত্রে ঝরে চন্দনেরি ধারা ।

ঢেউয়ের হাজার কুজা হেথায় করছে টেলাঠেলি  
কুজায় সোজা করে যে তায় দেখবে নয়ন মেলি ।

এই সমুদ্র বিশ্বরাজের বিমুক্ত রাজপথ,  
জগৎ-জয়ের শক্তি-সাধন-মার্গ স্মমহৎ ।  
কঠোর পণের কুঠার দিয়ে মোদের ভৃগুরাম  
হঠিয়ে এরে, গড়েছিলেন নগর অভিরাম !  
এই সমুদ্রে বশে এনে বঙ্গ-সুবরাজ  
বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটেরি তাজ ।  
শ্রীমন্ত এ পার হয়েছেন ভয়-ভাবনা ভুলে  
অগস্ত্য এ পান করেছেন অঞ্জলিতে তুলে !

\* \* \* \* \*  
এই সমুদ্র,—কাস্ত, রুদ্র,—বিরাগ এবং স্পৃহা  
অঘোর-শয়ান স্বয়ম্ভূদেব— তাঁর প্রতিমা ইহা ।  
এই সমুদ্র চতুর্ন্থ খের মতন চতুর্দিকে  
মারণ ঘোষে অধর্কের আর শাস্তি সামে ঝকে ।  
এই সমুদ্র অগাধ অকূল দুরন্ত দুর্গম,—  
শক্তিমানের সঁতার-পানি, দুর্বলের এই যম,—  
এই সমুদ্র—গণ্ডুষে এ পান ক'রেছি মোরা,  
পার হ'তে আজ পাঁতি খুঁজি—অগস্ত্যের আব-খোরা ।

\* \* \* \* \*  
এই সমুদ্র রক্ষা করে আপন বক্ষ-নীড়ে  
বুদ্ধদেবের পুণা-পুত ভিক্ষা-পাত্রটিরে ।  
মৈত্রী-মস্ত্রে হ'বে যেদিন দীক্ষা সবাকার  
মৈত্রের দেব বুদ্ধ হবেন—বিশ্বে অবতার ;  
যুদ্ধ যেদিন লুপ্ত হ'বে শুদ্ধ হবে মূর্খ  
সেদিন সাগর ফিরিয়ে দেবে গচ্ছিত সেই ধন ;  
চতুম্বাহদেশের লোকে তুলবে বরণ ক'রে  
প্রেমের কণায় রাজ-ভিখারীর পাত্রখানি ভ'রে ।

\* \* \* \* \*  
এই সমুদ্র !—কুক্ষিতে এর আঙন আছে, নলে,  
আমি জানি আঁধারে এর জলে জোনাক জ্বলে ।  
ভেলার আঁঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁধি—  
ঘরে যখন ফিরেছে লোক কুলায়-মাঝে পাখী—  
তখন জলে ঢেউয়ের মালায় জলের জোনাক পোকা  
তটের সীমায় চূর্ণ সীরা—নেইক লেখা জোখা ;

লুইছি সেই সাপের মানিক ভয় করিনি কণা  
ধরেছি দুই হাতে লুফে বাড়ব-শিখার কণা ।

এই সমুদ্র—খাম-খেয়ালি,—খেয়ালের এই খাম,—  
পাতাল-পুরীর দ্বারে লেখায় 'স্বর্গ-দুয়ার' নাম !  
এই সমুদ্র,—মুদ্রা তো ঢের, - রত্ন আছে পেটে,  
পেলাম মাত্র রঙীন ঝিহুক—বেলার বালি ঘেঁটে ।  
এই সমুদ্র,—সমূহ ঘুম আছে ইঁহার হাতে,—  
পাচ্ছি প্রসাদ যখন তখন দিনে এবং রাতে ।  
এই সমুদ্র কর্তী স্বয়ং কাজ-ভুলানোর রাজা  
ত্রিসীমায় এঁর যে এসেছে কাজ-ভোলা তার সাজা ।  
লিখিব কোথায় পুরীর কথা,—হ'লনা তার লেশ  
সাগরের সাত কাহণ কথায় পুরীর চিঠি শেষ ।  
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

## বায়ু বহে পূর্ববৈয়

( গল্প )

( ১ )

মেয়ে-স্কুলের গাড়ীর সহিস আসিয়া হাঁকিল—“গাড়ী  
আয়া বাবা !”

অমনি কালো গোরো মেটে শ্রামল কতকগুলি ছোট  
বড় মাঝারি মেয়ে এক-এক মুখ হাসি আর চোখভরা  
কৌতুকচঞ্চলতা লইয়া বই হাতে করিয়া আসিয়া দরজার  
সম্মুখে উপস্থিত হইল । একটি ছোট মেয়ে একমাথা  
কোকড়া কোকড়া ঝাঁকড়া চুল ময়ূরের পেখম-শিহরণের  
মতন কাঁপাইয়া তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে  
পড়িতে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান একটি কিশোরী  
সুন্দরীকে বলিল—“দেখ ভাই বিভা-দি, এ আবার কি  
রকম সহিস !”

বিভা তাহার সুন্দর চোখ দুটি নূতন সহিসের মুখের  
উপর একবার বুলাইয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—“কি  
রকম সহিস আবার ? অত হাসছিস কেন মিছিমিছি ?”

ছোট মেয়েটি তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—  
“কত বড় ঘোড়ার কতটুকু সহিস !”

ঐতরুণে তাহার হাসির কারণ বুঝিতে পারিয়া সব  
মেয়ে ক'টিই হাসিয়া হাসিয়া বার বার তাহাদের স্কুল-  
গাড়ীর ছোট নূতন সহিসের দিকে চাহিতে লাগিল ।

সহিস বেচারী একেবারে নূতন, তাহাতে বালক ;  
এই সব ফুলের মতো মেয়েদের পরীর মতো বেশ  
দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গিয়াছিল ; এখন তাহাদের  
হীরক-ঝরা হাসির ধারা দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া  
পড়িল ; সঙ্কোচে লজ্জায় থতমত খাইয়া সে একবার ঈষৎ  
চোখ তুলিয়া অপাঙ্গে মেয়েদের দিকে তাকায় আবার  
পরক্ষণেই চক্ষু নত করে ।

বিভার মনে পড়িল রবিবাবুর ইয়ুরোপের ডায়ারির  
কথা । ইটালিতে আঙুরের মতো একটি ছোট মেয়ে-  
প্রকাণ্ড একটা মোষকে দড়ি ধরিয়া চরাইয়া লইয়া  
বেড়াইতেছে দেখিয়া চশমা-পরা দাড়িওয়ালী গ্রাজুয়েট  
স্বামীর ছোট নোলক-পরা বৌএর উপমা তাহার মনে  
পড়িয়াছিল । বিভারও তাই ভারি হাসি পাইল । সে  
হাসিমুখে তাহার সঙ্গিনীদের ধমকাইয়া বলিল—“নে নে  
খাম, শুধু শুধু হাসতে হবে না । চা”

পশ্চাৎ হইতে পুরাতন সহিস চীৎকার করিয়া উঠিল  
—“আস না বাবা ! বহুত দেবী হচ্ছে যো !”

মেয়েগুলি কাহারো শাসন না মানিয়া তেমনি  
হাসিতে হাসিতে লজ্জিত কুণ্ডিত বালক সহিসের হাতে  
নিজেদের বই শেলেট খাতা চাপাইয়া দিয়া চলন্ত ফুল-  
গুলির মতো আপনাদের চারিদিকে একটি রূপের মোহের  
আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া একে একে গিয়া গাড়ীতে  
উঠিল—কোনোটি হুটুস্ত, কোনোটি ফোটো-ফোটো,  
কোনোটি বা মুকুল কলিকা । সহিস হুজন গাড়ীর পিছনে  
পা-দানের উপর চড়িয়া দাঁড়াইল । গাড়ী দূরের মেঘ-  
গর্জনের মতো গুরু-গভীর শব্দে পাড়াটিকে উচ্চকিত  
করিয়া অপর পাড়ায় মেয়ে কুড়াইতে ছুটিয়া চলিতে  
লাগিল ।

যে মেয়েটি প্রথমেই হাসির ফোয়ারার চাবি খুলিয়া  
দিয়াছিল সে লম্বা গাড়ীর অন্ধকার জঠরের তিতর হইতে  
গাড়ীর পিছন দিকের চৌকো জানলার ঘুলঘুলির মুখের  
কাছে সেই নূতন সহিসকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

আবার হাসিতে কুটিকুটি হইয়া বলিল—“দেখ বিভাদি  
• দেখ, ওর মাথায় কি টোকা-পানা চুল!”

বিভা গাড়ীর পিছনের জানলার মুখের কাছেই  
বসিয়া ছিল। সে একবার যেন বাহিরের দিকে  
চাহিতেছে এমনি ছলে নূতন সহিসকে দেখিয়া লইল।  
তাহার একমাথা বাবরি চুল রুম্ব জটায় এলোমেলো  
হইয়া মুখের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে।  
তাহার নাকখানে যেন কালো পাথর কাটিয়া কুঁদিয়া-  
বাহির-করা কিশোর সুকুমার মুখখানি একটি নীল  
পদ্মর মতো, রমণীর হাসির সম্মুখে লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া  
উঠিয়াছে।

বিভা সংক্রামক হাসি কষ্টে চাপিয়া চোখ দুটিতে  
তিরস্কার হানিয়া হাসির রাণী সেই মেয়েটিকে বলিল—  
“দেখ ভিমরুল, ফের হাসলে মার খাবি।”

এ শাসনে কেহই বশ মানিল না। এক-এক বাড়ী  
হইতে এক-একটি নূতন মেয়ে আসিয়া গাড়ীতে চড়ে  
আর হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া হাসির প্রবাহ আর থামিতে  
দেয় না। গাড়ীর ভিতরে ভিড়ও যত বাড়ে, ঠাসাঠাসির  
মধ্যে হাসিও তত জমাট হইয়া উঠে।

কিশোর সহিসটি সেই ঘুলঘুলির মুখের কাছে ঠায়  
দাঁড়াইয়া নিরাশ্রয় অসহায় ভাবে কিশোরীদের হাসির  
সূচীতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে আপনাকে লুকাইতে  
চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার লুকাইবার জো ছিল না।  
তখন সে যথাসম্ভব এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিভার  
আড়ালে আপনাকে গোপন করিল। সে ছাতুখোর  
মেড়ো এবং একেবারে গঁওয়ার হইলেও এটুকু সে বুঝিতে-  
ছিল যে যে-মেয়েটি জানলার মুখের কাছে বসিয়া  
আছে সে মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া না-হাসিতেই চাহি-  
তেছে; সে সকলের হাসির হাত হইতে তাহাকে  
বাঁচাইতে পারিলে বাঁচাইত। সে একবার করুণ নেত্রে  
বিভার দিকে ঝনিকের জন্ম তাকাইয়া, কুণ্ঠিত নত নেত্রে  
দাঁড়াইয়া রছিল।

মেয়েস্কুলের বিশ্বম্ভর দীর্ঘ গাড়ী পথ কাঁপাইয়া, পথিক-  
দের ব্যগ্রী সচকিত করিয়া, হাজার দৃষ্টির উপর অতৃপ্তির  
ঝিলিক হানিয়া, বিরাট অবহেলার মতন, একবুক

আনন্দ-প্রতিমা বহিয়া স্কুলে গিয়া পৌঁছিল। কিশোর  
সহিস অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

( ২ )

সে মুচির ছেলে! তাহার নাম কাবুল।

ছেলে হাকিমের দপ্তরে নোকরি পাইবে আশায়  
তাহার বাপ তাহাকে ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল।  
প্রথমে যে স্কুলে সে ভর্তি হইতে গেল সেখানে সে মুচির  
ছেলে বলিয়া স্কুলের কর্তারা হইতে ছাত্রেরা পর্যন্ত আপত্তি  
তুলিয়াছিল। শেষে আরা শহরে এক সাহেব মিশনারির  
স্কুলে স্থান পাইয়া সে বছর ছয়েক ইংরেজি ও নাগরী  
শিক্ষা করিয়াছিল। তারপর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে  
গ্রামের মাতব্বরেরা বলিল কাবুলের লিখা পঢ়ি শিখিয়া কোনো  
কায়দা নাই; তাহার বাপদাদার পেশা অবলম্বন করাই  
তাহার উচিত। তখন বেচারী বইয়ের দপ্তর ফেলিয়া  
জুতা সেলাইয়ের খাল বাড়ে করিল। তাহার হাকিমের  
দপ্তরে নোকরি করিয়া মাতব্বর হওয়ার কল্পনা বাপের  
মৃত্যুর সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। তবু তাহার জাতভাই  
বিরাদরীর মধ্যে কাবুল খাতির হইল যথেষ্ট—সে  
তুলসীকৃত রামায়ণ পড়িতে পারে; সে বিরাদরীর পঞ্চায়েৎ  
মজলিসে তোতা-কাহিনী, বেতাল পচিশী, চাহার দরবেশ  
পড়িয়া শুনাইতে পারে; খত চিঠি বাচাইতে পারে;  
এবং সাড়ে সাত রুপেয়া তনখা হইলে এক রোজের  
মজহুরী কত, বা শতকরা দশ রুপেয়া সুদ হইলে এক  
রুপেয়ার সুদ কত মুখে মুখে কথিয়া দিতে পারে।

এইরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ও প্রণয়নসমধুর বিচিত্র-  
ঘটনাপূর্ণ কেতাব পড়িয়া কাবুল কিশোর চিত্ত পৃথিবীর  
সহিত পরিচিত হইবার জন্ম উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সে  
আর তাহার গাঁয়ে গঁওয়ার লোকদের মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তি  
পাইতেছিল না। সে স্থির করিল একবার কলকাত্তা  
যাইতে হইবে; সেখানে তাহার চাচেরা ভাই বহুত  
টাকা কামাই করে।

কাবুলকে বাধা দিবার কেহ ছিল না; সে জগৎ-  
সংসারে একা। আপনার বাপের হাতিয়ারগুলি থলিতে  
ভরিয়া সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার ভাই বলিল যে রাস্তায় রাস্তায় রোদে বৃষ্টিতে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুতা সেলাই করিয়া বেড়াইতে তাহার বড় তকলিফ হইবে; তাহার চেয়ে কান্না স্থলে নোকরি করুক। স্থলে একটি নোকরি খালি আছে।

স্থলে নোকরি গুনিয়া কান্না উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চাই কি সেখানে নিজের বিদ্যাচর্চারও সুবিধা করিয়া লইতে পারিতে পারে। তাহার পর যখন গুনিল যে সেটা জনানী স্থল, তখন তাহার কল্পনাপ্রবণ মন সেখানে পদ্মাবতী, শাহাজাদী ও পরীবানুদের স্বপ্নে ভরপুর হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরীবানুদের সহিত প্রথম দিনের পরিচয়ের সূত্রপাত তাহার তেমন উৎসাহজনক মনে হইল না। পরীর মতো বেশভূষায় মণ্ডিত ফুলের মতো মেয়েগুলি যেন হাসির দেশের লোক!

কান্না ঘোড়ার সাজ খুলিয়া দানা দিয়া উদাস মনে আসিয়া আস্তাবলের সামনে একটা শিশু-গাছের ছায়ায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েগুলো তাহাকে দেখিয়া অমন করিয়া মিছামিছি হাসিয়া খুন হইল কেন? তাহার চেহারার মধ্যে হাসি পাইবার মতো এমন কি আছে? তাহার গাঁয়ের বাচ্চী, আকালী, পবনী ত তাহাকে দেখিয়া কৈ এমন করিয়া হাসে না! কিসমতিয়া ইঁদারা হইতে কলসীতে জল ভরিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিত বটে, কিন্তু তাহার হাসি ত এমন খারাপ লাগিত না—তাহার সেই দিল্ল-লগীতে ত দিল্ল প্রসন্ন হইয়া উঠিত! যত নষ্টের গোড়া ঐ কোঁড়া-চুল-ওয়ালী ছোঁড়ী! ভিমরুলের উপর তাহার ভারি রাগ হইতে লাগিল—সেইই ত প্রথমে হাসি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সব মেয়েগুলোই খারাপ—কেবল—কেবল—ঐ গোরী বাবা ভারি ভালো! সে তাহাকে দেখিয়া হাসে নাই, সকলকে হাসিতে মানা করিয়াছে, ভিমরুলকে মারিতে পর্যন্ত চাহিয়াছিল! ঐ বাবা বহুত নিক! বহুৎ খাপসুরৎ!

কান্না বসিয়া বসিয়া যত ভাবে ততই তাহার বিভাকে বড়ই ভালো লাগে। সে তাহার দৃষ্টিতে কেমন করুণা ভরিয়া একবার উহার দিকে তাকাইয়াছিল! সে কেমন

করিয়া উহাকে সকলের হাসির আঘাত হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেছিল! বহুত নিক! বহুত খাপসুরৎ! সেই গোরী বাবা!

( ৩ )

এইরূপে সে দিনের পর দিন ধরিয়া কত মেয়েকে দেখিতে পায়, কত মেয়ের হাত হইতে সে বই গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো মেয়েই তাহার প্রাণের উপর তেমন আনন্দের ছটা বিস্তার করে না, যেমন হয় তাহার বিভাকে দেখিলে। আর সকলের কাছে সে তৃত্য, গাড়ীর সহিস, সে অস্পৃশ্য মুচির ছেলে—কুণ্ডিত সঙ্কুচিত অপরাধীর মতন; কিন্তু বিভাকে দেখিলেই তাহার অন্তরের পুরুষটি তারুণ্যের পুলকে জাগিয়া উঠে, মনের মধ্যে আনন্দের রসের শিহরণ হানে, তাহার দৃষ্টিতে কৃতার্থতা করিয়া ঝরিয়া বিভার চরণকমলের জুতার ধূলায় লুপ্ত হইতে থাকে। বসন্তের অলঙ্কিত আগমনে তরুণরীতে যেমন করিয়া শিহরণ জাগে, যেমন করিয়া নবকিশলয়দলে তাহার অন্তরের তরুণতা বিকশিত হইয়া পড়ে, যেমন করিয়া ফুলে ফুলে তাহার প্রাণের উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মধুতে গন্ধে যেমন করিয়া ফুলের প্রাণে রসসঞ্চার হয়, বিভাকে দেখিয়া কিশোর কান্নুর অন্তরের মধ্যেও তেমনি একটি অবুঝ যৌবনের বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। তাহার অন্তরের পুরুষটি প্রকাশ পাইবার জগ মনের মধ্যে আকুলিবাকুলি করিতে লাগিল। তাহার শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যবর্তী অপটু অক্ষম মন চাহিতেছিল সেও তেমনি করিয়া আপনার অন্তরবেদনা তাহার আরাধিতার চরণে নিবেদন করে যেমন করিয়া বজ্রমুকুট পদ্মাবতীকে তাহার হৃদয়বেদনা নিবেদন করিয়াছিল, যেমন করিয়া শাহজাদা পরীজাদীকে তাহার মর্ত্যমানবের মনের ব্যথা বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে অক্ষম, অতি হীন, তাহার মনের কোণের গূঢ় গোপন প্রণয়বেদনা সে কেমন করিয়া এই অল্পমণ মহীয়সী রমণীর চরণে নিবেদন করিবে। সে যদি তাহাদের গ্রামের কিসমতিয়া হইত, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না; কিন্তু ইহার ত কিসমতিয়ার সহিত কোনোই মিল নাই! এনা পরে চিলি চুহুরি লাহেজা, না পরে ঝাটি আঙিয়া;

না যায় ইদাঁরায় জল আনিত্তে, না সে কাজরী গীত গাহিয়া তাহাকে সাহসী করিয়া তোলে! এ যে এজগতের জীব নয়! এর পরণের শাড়ীখানি বিচিত্র মনোরম ভঙ্গিতে তাহার কিশোর সুকুমার তনু দেহখানির উপর সৌন্দর্যের স্বপ্নের মতন অনুলিপ্ত হইয়া আছে; ইহার গায়ের ঝালর-দেওয়া ফুলের-জালি-বসানো জামা-গুলির ভঙ্গি যেন কোন্ স্বর্গলোকের আভাস দেয়; ইহার পায়ে জুতা, চোখে স্নেহরী চশমা! ইহার কাছে সে কত হীন, কত অপদার্থ, কি সামান্ত! সে আপনার মনের ভাবলীলার বিচিত্র মাধুর্যের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতায় নিজেই কুণ্ঠিত লজ্জিত সঙ্কচিত হইয়া পড়িতেছিল, সে পরের কাছে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না!

এমন কি বিভার সামনে দাঁড়াইতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে যেন অপবিত্র অশুচি, দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভয়ে সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া উঠে। আপনার দেহ মন শিক্ষা সহবৎ জন্ম কর্ম কিছুই তাহার বিভার উপযুক্ত নহে।

তবুও সে অন্তরের যৌবন-পুরুষের তাড়নায় আপনাকে যথাসাধ্য সংস্কৃত বর্নন করিতে চাহিল। সে রাস্তার ধারে একখানি ইট পাতিয়া বসিয়া দেশওয়ালী হাজামের কাছে হাজামত করাইল; কপালের উপরকার চুল খাটো করিয়া ছাঁটিয়া মধো অর্ধচন্দ্রাকার ও দুই পাশে দুই কোণ করিয়া খর কাটিল। তার পর বাজার হইতে একখানি টিন-বাঁধানো আয়না ও একখানি কাঠের কাঁকই কিনিয়া দীর্ঘ বাবরি চুলগুলিকে প্রচুর কড়ুয়া তেলে অভিষিক্ত করিয়া শিশু-গাছের তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া ঘণ্টা খানেক ধরিয়া কাঁধের উপর কুণ্ঠিত সুবিণ্ডিত ফণাকৃতি করিয়া তুলিল। সেদিন সে নাহিয়া ধুইয়া মাজিয়া ঘসিয়া আপনাকে চকচকে সাফ করিয়া যথাসাধ্য নিজের মনের মতন করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার সহিসের পোষাকটা তাহার মোটেই রুচি-রোচন হইতেছিল না। নীল-রং-করা মোটা ধুতির উপর হলদে পটি লাগানো নীল রঙের খাটো কুর্তা ও নীল পাগড়ী তাহাকে যে নিতান্ত কুৎসিত করিয়া তুলিবে, ইহাতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি ও লজ্জা

অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, সেই কুৎসিত উর্দি পরিয়াই তাহাকে বিতার সম্মুখে বাহির হইতে হইবে। তখন সেই পোষাকই অগত্যা যথাসম্ভব শোভন সুন্দর করিয়া পরিয়া সেদিন সে গাড়ীর পিছনে চড়িয়া বিভাকে স্কুলে আনিত্তে গেল।

কিন্তু তাহাতেও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার চক্ষুশূল সেই ভিমরুল মেয়েটা তাহাকে দেখিয়াই আবার হাসিয়া গড়াইয়া বলিয়া উঠিল—“বা রে, আবার কাশান করে' চুল কাটা হয়েছে!”

তাহার সেই বিশৃঙ্খল রুক্ষ চুলই মেয়েদের চোখে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহাকে নব বেশে দেখিয়া তাহাদের আবার ভারি হাসি আসিল। বিভা ঈষৎ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া যখন চক্ষু ফিরাইয়া ভিমরুলকে বলিল—“কি হাসিসা!” তখন কালুর চোখদুটি আগুনের ফুলকির মতন ভিমরুলের দিকে চাহিয়া জ্বলিতেছিল। ভিমরুল হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—“দেখ দেখ বিভা-দি, ও কেমন করে' তাকাচ্ছে!” বিভা যেই তাহার দিকে দ্রিষ্ট মুখে তাকাইল অমনি তাহার দৃষ্টি কোমল প্রসন্ন হইয়া যেন বিভার চরণে আপনার জীবনের কৃতার্থতা নিবেদন করিয়া দিল। বিভা ভিমরুলকে ধমক দিয়া বলিল—“কৈ কি করে' তাকাচ্ছে আবার!” ভিমরুল বলিয়া উঠিল—“না বিভা-দি, ও এমনি করে' কটমট করে' তাকাচ্ছিল, তুমি ফিরে চাইতেই অমনি ভালো মানুষটি হয়ে দাঁড়াল!”

ক্রমে তাহার নূতন বেশও মেয়েদের চোখে সহিয়া গেল। একজন পুরুষ তরুণ যে নিত্য তাহাদের সেবা করিতেছে এ বোধ তাহাদের মনে আর জাগ্রত রহিল না। কিন্তু সেই তরুণ সহিসের মনে তরুণী একটি নারীর ছাপ দিনের পর দিন গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার মনে হইত সে একদিন বিভার চরণতলের ধূলায় পড়িয়া যদি বলিতে পারে যে সে একেবারে সাধারণ নয়, নিতান্ত অপদার্থ নয়, সেও তাহাদেরই মত স্কুলে ইংরেজি পড়িয়াছে, এখনো দু চারটা ইংরেজি বাত

সে পড়িতে পারে, সে রামায়ণ পড়িতে পারে, কাহানিয়া পড়িতে পারে!—তবে তাহার জীবন সার্থক হইয়া যায়। কিন্তু পুরিত না সে কোনো দিন বিভাকে একলা পাইত না বলিয়া, পারিত না সে ভিমরুলের হাসির ছলের ভয়ে! স্তর্ধন সে ভাবিত, মুখের কথা যাহাকে খুসি শুনানো যায়, আর মনের কথা মনের মানুষটিকেও শুনানো যায় না কেন? মনের মন্দিরে সে যে-সব পবিত্র অর্ধা সাজাইয়া সাজাইয়া তাহার আরাধ্যা দেবতার আরাতির আয়োজন করিতেছিল, তাহা যদি তাহার দেবতা অন্তর্ধ্যায়ী হইয়া অনুভব করিতে পারিত! দেবতা যদি অন্তবের মুখের ভাষা না বুকে, তবে মুক মুখের ভাষায় সে ত কিছুই বুঝাইতে পারিবে না!

তবু একদিন সাহসে বুক বাধিয়া সে বিভার হাত হইতে বই লইতে লইতে উপরকার বইখানির নাম যেন নিজের মনেই পড়িল—লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস অ্যাণ্ড রোম!

ভিমরুল অমনি হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিল—“বিভাদি, বিভাদি, তোমার সহিস আবার ইংরিজি পড়তে পারে! এইবার থেকে তুমি ওর কাছে পড়া বলে নিয়ো!” ভিমরুলের চেয়ে বড় একটি মেয়ে সরযু হাসিয়া বিক্রপের স্বরে বলিল—“লিগেণ্ডস্! লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস অ্যাণ্ড রোম! লেজেণ্ডস্কে ভাই লিগেণ্ডস্ বলছে!” বিভা হাসিমুখে কালুর দিকে চাহিয়া বলিল—“তুই ইংরিজি পড়তে পারিস?” কালুর মনের সমস্ত বিক্রপগানি লজ্জা সঙ্কোচ বিভার হাসিমুখের একটি কথায় কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—“হাঁ বাবা, হাম ত কয়ইক বরষ ইংলিশ পঢ়া থা!” বিভা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। কালু সাহস পাইয়া বলিল যে, সে গোরীবাবার পড়িয়া-চুকা পুরাণা-ধুরাণা একখানা কেতাব পাইলে এখনো পড়ে। বিভা হাসিয়া বই দিতে স্বীকার করিল। গর্কের আনন্দে কালুর মন ফুলিয়া উঠিল। আজ সে বিভার কাছে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছে! বিভা আজ তাহার সহিত কথা বলিয়াছে! বিভার প্রথম দান আজ সে পাইবে! ভিমরুল যে তাহাকে ‘পণ্ডিত সহিস’ বলিয়া ঠাট্টা করিয়া কত হাসিল, আজ আর সেদিকে সে কানই দিল না।

সেই দিন হইতে সে অপবার পাঠে মন দিল। বিভা তাহাকে একখানা ইংরেজি বই দিয়াছে; সেইখানি পাইয়া সে ভরা মনে শিশু-গাছের তলায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিল। প্রথমে বই খুলিয়াই সে খুঁজিতে লাগিল বইয়ের কোথাও গোরী বাবার কোনো নাম লেখা আছে কি না; কোথাও কোনো নাম খুঁজিয়া সে পাইল না। সে শুনিয়াছে ভিমরুল তাহাকে বিভাদি বলিয়া ডাকে। বিভাদি আবার কি রকম নাম? তাহাদের গায়ে একটি মেয়ের আবাদীয়া নাম আছে, একটি ছেলের নাম আছে বিদেশীয়া; পার্বতীয়া, পর্বতীয়া নামও হইতে পারে। কিন্তু বিভাদি, সে কি রকম নাম? সে মনে মনে ভাবিয়া ঠিক করিল উহার নাম ছলারী ঠিক পিয়ারী হইলে বেশ মানায়। সে স্থির করিল গোরী বাবাকে সে পিয়ারী নামেই নিজের মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এই বইখানি পিয়ারী পড়িয়াছে; বইয়ের স্থানে স্থানে পেন্সিলের দাগ ও ছই-একটা কথার মানে লেখা আছে—সেগুলি পিয়ারীই লিখিয়াছে, তাহার সোনার মতো আঙুলগুলি এই বইয়ের বকের উপর বুলাইয়া বুলাইয়া গিয়াছে! বইখানি তাহার কাছে পরম অমূল্য নিধি হইয়া উঠিল। সে সমস্ত দিনের অবসরের সময় সেখানিকে খুলিয়া কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া থাকে; কদাচিত্ এক আধ লাইন পড়ে, শুধু বইখানিকে কোলে করিয়াই তাহার আনন্দ। রাত্রে সে বইখানিকে বকের কাছে লইয়া শোয়। যখন বইখানি আস্তাবলে তাহার কাপড়ের বোচকার মধ্যে বাধিয়া রাখিয়া বইখানিকে ছাড়িয়া ছবেলা মেয়েদের আনিতে ও রাখিতে যাইতে হয়, তখন তাহার মন সেই বইখানির কাছেই পড়িয়া থাকে। তখন সে অবাক হইয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবে।

একদিন তাহাকে ঐরূপে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভিমরুল বলিয়া উঠিল—“বিভাদি, বিভাদি, দেখ, সহিসটা তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখ!” বিভা একবার চকিতে কালুর দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া হাসিমুখে বলিল—“তুই ভাবি • ছষ্ট হচ্ছিস ভিমরুল!”

কালু বিভাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া ব্যথিত অন্তঃস্থ হইয়া নিজের অসাবধান দৃষ্টি নত করিল। সেইদিন হইতে সে এক মুহূর্তের বেশি বিভার দিকে আর চাহিতে পারিত না। সে যে হীন, সে যে মূর্খ, সে যে ঘোড়ার সহিস—সে যে বিভার দিকে তাকাইতে সাহসী এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবারও যোগ্যতা তাহার যে নাই!

এই ক্ষণিকের চকিত দর্শনই তাহার জীবনের আনন্দ-প্রদীপ! যেদিন ছুটি থাকে, সেদিন তাহার সহকর্মীরা ছড়ুক, খঞ্জনী ও করতাল খচমচ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে টেটাইয়া গোলমাল করিয়া ছুটি উপভোগ করে, আর কালু গাছতলায় বইখানি কোলে করিয়া উদাস মনে আকাশের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া থাকে। কেহ তাহাকে গানের মজলিসে যোগ দিতে ডাকিলে সে ওজর করিয়া বলে—“জী বহৎ সুস্ত্ হ্যায়, আচ্ছী নেহি লাগতা!” প্রাণ আজ তাহার বড় অসুস্থ, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। যেদিন বিভাদের বাড়ী হইতে স্কুলে অপর সকল মেয়ে আসে, কেবল বিভা আসে না, সেদিন সকলের বইয়ের বোঝা হাতে করিয়া কালু বিভার আগমনের প্রতীক্ষা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে—“উয় বাবা জায়েগী নেহি?” যখন শুনে আজ সে যাইবে না, তখন সে একবার বাড়ীর দিকে একটি চকিত দৃষ্টি হানিয়া গাড়ীর পিছনে গিয়া উঠে, এবং চলন্ত গাড়ী হইতে যতক্ষণ সেই বাড়ী দেখা যায় ততক্ষণ বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যায় যদি কোনো জানলার ফাঁকে একবার পিয়ারীর খাপসুরৎ মুখখানি তাহার নজরে পড়ে! দীর্ঘ অবকাশের সময় তাহার দেশওয়ালী সকলেই বাড়ী চলিয়া যায়, ঘোড়া তখন কুকের বাড়ীতে পোষানি থাকে, সহিসদের ছুটির দরমাহা মিলে না। কিন্তু কালু নিজের সঞ্চিত অর্থে একবেলা দুটি চানা ও একবেলা একটু ছাতু খাইয়া দীর্ঘ অবকাশ কলিকাতাতে পড়িয়াই কাটায়। পিয়ারী যে-শহরে আছে সে-শহর ছাড়িয়া সে দূরে যাইতেও পারে না। দিনের মধ্যে একবারও অন্তত বিভাদের গলি দিয়া সে বেড়াইয়া আসে, সেই গলিটাতে গিয়াও তাহার আনন্দ, যে বাড়ীর মধ্যে পিয়ারী আছে তাহার দর্শনেও তাহার পবন মুখ! ছুটির সময়কার

উদাস দীর্ঘ কর্মহীন দিনগুলি কোনো রকমে কাটাইয়া রাত্রে কেরোসিনের ডিবিয়ার প্রচুর ধূমোদগম দেখিতে দেখিতে কালু ভাবিতে থাকে সেই কিভারই কথা। কবে সে তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়াছিল, কবে সে তাহার সহিত দয়া করিয়া কি কথা বলিয়াছিল, কবে তাহার হাত হইতে বই লইতে গিয়া আঙুলে একটু আঙুল ঠেকিয়াছিল! তাহার নিকবের মতো কালো দেহে সেই সোনার মতো আঙুলের ঈষৎ স্পর্শ লাগিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে সোনার রেখা আঁকিয়া দাগিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাই সে বিভার প্রভাতারুণরশ্মির গায় সমুদ্রল হাসির আলোকে এক মনে মুগ্ধ নয়নে বসিয়া বসিয়া দেখিত! দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত অন্তর প্রভাতের পূর্বা-কাশের মতো একেবারে সোনায় সোনায় মণ্ডিত হইয়া সোনা হইয়া উঠিত! পূজা ও হোলিতে সহিসেরা সকল মেয়ের নিকট হইতেই কিছু কিছু বক্শিশ পায়; কালু বিভার কাছ হইতে যে সিকি-দুয়ানিগুলি পাইয়াছিল সেগুলিকে একটি গৌঁজেয় তরিয়া কোমরে লইয়া ফিরিত, বিরহের দিনে গৌঁজে হইতে সেগুলিকে বাহির করিয়া হাতের উপর মেলিয়া ধরিয়া সে দেখিত যেন রক্তখণ্ডগুলি বিভারই শুভ্র সুন্দর দস্তপংক্তির মতন তাহাকে দেখিয়া হাসির বিভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে!

এমনি করিয়া দিনের পর দিন গাঁথিয়া বছরের পর কত বছর চলিয়া গেল। কত মেয়ে স্কুলে নূতন আসিল, কত মেয়ে স্কুল হইতে চলিয়া গেল। কালুর চোখের সামনে তিল তিল করিয়া কিশোরী বিভা যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ সুন্দরী হইয়া উঠিল। কেবল কোনো পরিবর্তন হইল না কালুর মনের এবং অদৃষ্টের। কিন্তু তাহার কর্মের পরিবর্তন হইয়াছে। বিভা এম-এ পাশ করিয়া স্কুলে গড়াইতেছে; কালু লেখাপড়া জানে বলিয়া বিভা তাহাকে দুপ্রহরের জগু বেহারা করিয়া লইয়াছে। সকাল বিকাল সে সহিসের কাজ করিয়া দুপ্রহরে গোরী-বাবার বেহারার কামও করে। ইহাতে তাহার পাওনা বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেশেরও পরিবর্তন ও পারিপাটা হইয়াছে। এখন সে অদ্ভুতঃ দুপুর বেলাটা চুড়িদার পায়জামার উপর ধোয়া চাপকান পরিতে পায়;



মাংখার চুলগুলিকে সেই কাঠের কাঁকইথানি দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার উপর শাদা কাপড়ের পাগড়ী বাঁধে। আর গোরী-বাবার আপিস ঘরের দরজায় সে পাষণমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া হুকুমের প্রতীকায় দাঁড়াইয়া থাকে। এখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পিয়ারীকে দেখিতে পায়। তাহার দিল এখন পূরা ভরপুর আছে!

এই সময়ে একজন বাবু বড় ঘনঘন কাঙ্গুর গোরী-বাবার কামরায় আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সহিত বিভার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। তাহার গালের রং এমন সুন্দর যে সোনার চশমা যে তাহার নাকে আছে তাহা সহসা বুঝিতে পারা যায় না; সুন্দর সুগঠিত শরীর; দেখিবার মতো তাহার মুখখানি। কিন্তু ইহাকে কাঙ্গুর মোটেই দেখিতে পারিত না। ইহাকে দেখিলেই কাঙ্গুর মাথায় খুন চড়িত, তাহার চোখ দুটা কয়লার মালসায় ছুখানা জ্বলন্ত আঙারের মতন জ্বলিয়া উঠিত।

প্রথম যেদিন এই সুন্দর যুবকটি আসিয়া হাসিহাসি মুখে পরদা-টানা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নিষ্পন্দ কাঙ্গুর হাতে একখানা কার্ড দিয়া বলিল—“মেম সাহেব কো সেলাম দেও।” তখনই তাহার হাসিবার ভঙ্গিটা কাঙ্গুর চোখে কেমন-কেমন ঠেকিল। সে কার্ড লইয়া সম্ভরণে পর্দা সরাইয়া বিভার হাতে গিয়া কার্ডখানি দিল। কার্ড পাইয়াই বিভা যেমনতর হাসিমুখে উৎফুল্ল হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“বাবুকো সেলাম দেও।”—বিভার তেমনতর উৎফুল্ল আনন্দমূর্তি কখনো কাঙ্গুর দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তাই গোরী-বাবার এইরূপ আনন্দের আতিশয্য কাঙ্গুর মনে কেমন একটা অশুভ আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। তারপর যখন সে পর্দাটা একপাশে সরাইয়া ধরিয়া যুবকটিকে বলিল--“যাইয়ে।” এবং পর্দার ঈষৎ কাঁক দিয়া কাঙ্গুর দেখিতে পাইল যুবকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিভা হন হন করিয়া আঁগাইয়া আসিল ও যুবকটি দুই হাতে বিভার দুই হাত গাপিয়া ধরিয়া মুক্‌ নয়নে বিভার দিকে চাহিয়া রহিল, এবং বিভারও চোখদুটি আবেশময় বিহ্বলতায় ও স্তম্ভের লজ্জায় ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল, তখন কাঙ্গুর অস্ত-রাঙ্গা অশুভব করিল সেই আগস্কর যুবক—ডাকু হায়!

সে কাঙ্গুর সর্ব্বদা অপহরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে। সেইদিন হইতে তাহার মন যুবকটির প্রতি হিংসায় ও ঘণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দিনের পর দিন যত সে বিভার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল ততই কাঙ্গুর নিফল ক্রোধ তাহার অন্তরে আগুন লাগাইয়া তাহার চোখদুটাকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার বুকের মধ্যে যখন ধকধক করিয়া উঠিত তখন মনে হইত সে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতের দশ আঙুলের নখে করিয়া তাহার বুকটাকে ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া রক্ত খাইতে পারিলে তবে শান্ত হয়। সে শক্ত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিত, কিন্তু সে এমন করিয়া চাহিত যে তাহার অন্তরের সকল জ্বালা যেন দৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই ডাকুটাকে দগ্ধ ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। আজ সে কত বৎসর ধরিয়া রূপণের ধনের মতন যে-বিভাকে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ দিয়া ঘিরিয় আঁগলাইয়া রাখিয়াছে, সেই তাহার পলে পলে সঞ্চিত সর্ব্বশুখ এই কোথাকার কে একজন হঠাৎ আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে, শুধু একখানা গোরা চেহারা ও একজোড়া স্নেহ-হরী চশমার জোরে! কাঙ্গুর কালো কুৎসিত মুচি, কিন্তু তাহার অন্তরে পিয়ারীর প্রতি যে একটি ভক্তি পুঞ্জিত পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছু কি ঐ বাবুটার অন্তরে আছে? যদি থাকিত তবে কি সে বিভার সম্মুখে অমন করিয়া বকবক করিয়া বকিতে পারিত, অমন হো হো করিয়া হাসিতে পারিত, অমন করিয়া পা ছড়াইয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িতে পারিত! লোকটার মনে এতটুকু সন্দেহ নাই, এতটুকু সন্দেহ নাই, এতটুকু দ্বিধা ভয় আশঙ্কা নাই! সে যেন ডাকাত, জোর করিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে!

কাঙ্গুর শুনিয়াছিল যে কয়লার মধ্যে হীরা হয়। সে যদি কয়লার মতো কালো তাহার বুকের মধ্যে হীরার মতো উজ্জ্বল বিভাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিত! যদি সে কালো মেঘ হইয়া বিহ্বলতার মতো এই তরুণীটিকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই ডাকাত লোকটার মাথায় বজ্রের মতো গর্জন করিয়া তাড়িয়া পড়িয়া এক

নিমেষে তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া থাক করিয়া ফেলিতে পারিত! কিন্তু যতই সে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যতই সে নিজের যে কি দাবী তাহা নিজের কাছেই সাবাস্ত করিতে পারিতেছিল না, যতই সে নিজেকে অসহায় মনে করিতেছিল, ততই তাহার অস্বস্তি বাড়িতেছিল, ততই তাহার অন্তর জ্বলিয়া চোখ দুটাতেও আগুন ধরাইয়া তুলিতেছিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার চোখ দুটা বুনো মহিষের চোখের মতো যেন আগুন হানিতে থাকে; কিন্তু তখনই যদি বিভা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহার সেই অগ্নিদৃষ্টি অমৃতে অভিষিক্ত দুটি ফুলের অঞ্জলির মতো তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে!

একদিন কালু পর্দার কাঁক দিয়া দেখিল সেই সয়তানটা বিভার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া, নিজের হাত হইতে একটা আংটি খুলিয়া বিভার আঙুলে পরাইয়া দিল! তাহারই চোখের উপরে!

আজ কালুর সর্বাঙ্গে একেবারে আগুন ধরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের পুরুষ উন্মত্ত হইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত পীড়িত বিদলিত কারণে লাগিল! তাহার পায়ের তলা দিয়া মাটি সরিয়া চলিতে লাগিল, তাহার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাগলের মতো টলিয়া টলিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল! কোথায় তাহার আশ্রয়? কোথায় তাহার অবলম্বন?

কতকণ সে এমন ছিল সে জানে না। অকস্মাৎ দেখিল তাহার সম্মুখে সেই যুবকটি দাঁড়াইয়া হাসিমুখে দুটি টাকা ধরিয়া বলিতেছে—“বেয়ারা, এই লেও বক্-শিশ!” কালু দেখিল সেই যুবকের ঠোঁটের উপর ও ত হাসি নয়, ও যেন আগুনের রেখা! তাহার হাতে ও ত টাকা নয়, ও যেন দুখণ্ড উক্সা! আর সেই লোকটা ত মানুষ নয়, সে সাক্ষাৎ সয়তান! ইহারই কথা সে মিশনরী সাহেবদের কাছে পড়িয়াছিল, আজ একেবারে তাহার সহিত চাক্ষুস সাক্ষাৎ! তাই উহার বর্ণ অমন আগুনের মতন! তাই উহাকে দেখিলে কালুর অন্তরে অমনতর অগ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠে! কালুর মাথায় খুন

চাপিয়া গেল, তাহার চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইতে লাগিল, তাহার দশাঙ্গুলের নখের মধ্যে রক্তপিপাসা বন্ধনা হানিয়া গেল! এমন সময় তাহার কানে গেল কোন্ স্বর্গের পরম দেবতার অমোঘ আদেশ “কালু, বাবু বকশিশ দিচ্ছেন, নে!” কালু বজ্রবশ মর্পের মতো মাথা নত করিয়া তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিল, যুবকটি তাহার হাতের উপর টাকা দুটি রাখিয়া দিল।

কালুর মনে হইতে লাগিল টাকা দুটা তাহার হাতের তেলো পুড়াইয়া ফুটো করিয়া অপর দিক দিয়া মাটিতে ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া যাইবে। সে-ঝনঝনকার তাহার কাছে বজ্রবিদারণ-শব্দের স্থায় মনে হইল। সে প্রাণপণে টাকা দুটাকে চাপিয়া মুঠি করিয়া ধরিল, হাত পুড়িয়া যাক কিন্তু টাকা দুটা মাটিতে পড়িয়া অটুত্ব করিয়া না উঠে!

যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইল এই অগ্নিখণ্ড দুটা সেই সয়তানটার মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ হইত। তাড়া-তাড়ি ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে টাকা ছুড়িতে গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই, সে একা দরজার একপাশে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

কালু মুস্কিলে পড়িয়া গেল এই টাকা দুটা লইয়া সে কি করিবে! এ সে লইল কেন, এ ত সে লইতে পারে না! কি করিবে, কি করিবে সে এই টাকা দুটা লইয়া! তাহাকে ধরিয়া চারিদিকে যেন টাকার মতো চাকা চাকা আগুনের চোখ জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল—সেগুলো যেন সেই আগুনের নেকটোর চশমাপরা চোখ দুটার হাসিভরা ক্রুর দৃষ্টি!

কালু টাকা দুটাকে মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সে কোথায় ফেলিবে এই বিষের চাকতি দুটা! যেখানে পড়িবে সেখানকার সকল সুখ সকল আনন্দ সকল শুভ সকল হাসি যে জ্বলিয়া পুড়িয়া থাক হইয়া যাইবে!

তাহাকে টাকা হাতে করিয়া ভাবিতে দেখিয়া একজন ভিখারী তাহাকে বলিল—“এক পয়সা ভিখ মিলে বাবা!” কালু হঠাৎ যেন অব্যাহতি পাইয়া বাচিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি দুটা টাকাই সেই পঙ্কুর হাতে দিয়া

ফেলিল। অনন্তা উড়ে তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল—  
“কি রে কাল্ল, তু কল্পতরু হউচি পারা!” স্থলময় রটিয়া  
গেল কাল্লর মুনিবের বিয়ে হইবে বলিয়া কাল্ল মনের  
আনন্দে একটা ভিখারীকেই দুটা টাকা দান করিয়া  
সিঁকাছে।

( ৫ )

আজ বিভার বিবাহ। সেখানে কত লোকের  
নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কাল্লর হয় নাই। তবু তাহাকে সেখানে  
যাইতে হইবে। স্থলের বোর্ডিঙের মেয়েদের নিমন্ত্রণ  
হইয়াছে; তাহাদের গাড়ীর সঙ্গে কাল্লকে বিনা নিমন্ত্রণেও  
যাইতে হইবে। আজ তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়ের দিন।  
যেখানে আজ আলোক-সমারোহের মধ্যে সুসজ্জিত হইয়া  
হাসিমুখে সেই সয়তান ডাকাতটা চিরজন্মের মতো তাহার  
পিয়ারী গোরী বাবাকে আশ্রয় করিতে আসিবে,  
সেখানে আজ কাল্লকে সহিসের নীল রঙের কুৎসিত উর্দ্ধি  
পরিয়াশ্রান মুখে বিনা আছ্রানে যাইতে হইবে, কিন্তু  
তাহার ভিতরে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না, তাহাকে  
দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

তবু তাহাকে যাইতে হইল। তাহার চোখের সামনে  
সেই সয়তানটা নিজের হাতে বিভার হাত ধরিয়া ফুলের  
মালায় ঝাশিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্ত দখল করিয়া  
লইল। তখন সে পুষ্পবিভূষণা আলোকসমুজ্জ্বলা সভা  
হইতে আপনার অন্ধকার দুর্গন্ধ আস্তাবলে আসিয়া  
বিচালির বিছানায় শুইয়া বিভার দেওয়া বইখানি বুকে  
চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

সেই দিন হইতে স্থল তাহার কাছে শূণ্যকার  
অন্ধকার। শতক বালিকা যুবতীর হাসি সৌন্দর্য্য আনন্দ-  
লীলা সম্বন্ধে একজনের অভাবে সেস্থান নিরানন্দ অসুন্দর।  
সে গাড়ীর পিছনে চড়িয়া বিভাদের বাড়ীতে যায়, কিন্তু  
সেখান হইতে বিভা আর স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিয়া  
তাহার হাতে বই দেয় না; গাড়ীর জানলাটির কাছে  
বিভার সোনার কমলের মতন অপক্লপ সুন্দর মুখখানি  
আর হাসিতে ঝলমল করে না। সেই বাড়ী হইতে বাহির  
হয় কাল্লর চক্ষুশূল সেই ভিমরুলটা, আর সে-ই গাড়ীর  
মুখের কাছে বসিয়া বসিয়া তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসে।

এ রকম জীবন কাল্লর অসহ হইয়া উঠিল। সে  
একদিন ছুটির দিনে বিভার নৃতন বাড়ীতে গিয়া গোরী  
বাবার সহিত দেখা করিয়া বলিল, যে, গোরী বাবা “যদি  
তাহাকে কোনো নোকরি দেয় ত তাহার পরবস্তী হয়।  
বিভা জিজ্ঞাসা করিল—“কেন কাল্ল, স্থলের চাকরী ছাড়বি  
কেন? ওখানেই ত বেশ আছস।”

কাল্লর বুক এই প্রশ্নে যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম  
হইল, তাহার অশ্রুসাগর যেন উথলিয়া পড়িতে চাহিল।  
পিয়ারী, তুই, তুই এমন বাত পুছলি! এতটুকু দয়া তোরা  
হইল না! এতটুকু বুদ্ধি তোরা ঘটে নাই! সে কি বলিবে,  
কেমন করিয়া বলিবে, যে, স্থলের নোকরি কেন আর  
তাহার ভালো লাগিতেছে না। কাল্ল মাথা হেঁট করিয়া  
নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিভা আবার জিজ্ঞাসা করিল—“কেন, স্থলের চাকরী  
ছাড়বি কেন?”

কাল্ল ধীর স্বরে বলিল—“জী নেহি লাগতা!” এর  
বেশী আর সে কি বলিবে! প্রাণ তাহার সেখানে থাকিতে  
চাহিতেছে না, সেখানে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া  
উঠিয়াছে।

বিভা বলিল—“আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি একবার  
বাবুকে বলে’ দেখি।”

বাবুর নামে কাল্লর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। যে  
সয়তান তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, ভিক্ষার জন্ত  
হাত পাতিতে হইবে তাহার কাছে! কাল্ল বলিয়া উঠিল  
—“গোরী বাবা, হাম নোকরি নেহি.....” কাল্ল চাহিয়া  
দেখিল বিভা তখন চলিয়া গিয়াছে।

বিভা গিয়া স্বামীকে বলিল—“ওগো শুনছ, দেখ,  
আমাদের স্থলের সেই যে সহিসটা আমার বেয়ারার কাজ  
করত, সে আমার এখানে কাজ করতে চায়। তাকে  
রাখব? তাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, বড় ভালো  
লোক সে।”

বিভার স্বামী সর্চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“কে,  
সেই কালো কুচকুচে সয়তানটা? সে ভালো লোক!  
তুমি দেখনি তার চোখের চাউনি—যেন কালো বাঘের  
চোখ! তাকে রেখো না রেখো না, সে কোন্ দিন ঘাড়  
ভেঙে রক্ত খাবে, আমার সে খুন করবে!”

বিভা হাসিয়া বলিল—“অনাছিষ্টি ভয় তোমার !  
সবাই ত আর তোমার মতো সুন্দর হ'তে পারে না ।  
ভগধান ওকে কালো করেছে তা এখন কি হবে ?”

বিভার স্বামী ভয়ে চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া বলিল—  
“শুধু কালো রং নয়, তার ঐ ছুরির নখের মতো জ্বলজ্বলে  
চোখ দুটো যেন একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে । ওকে  
বাড়ীতে ঠাই দেওয়া ! সে কিছুতেই হবে না ।”

বিভা স্বামীর স্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া আর কিছু বলিল  
না । আশু আশু বাহির হইয়া গিয়া ঢাকিল—“কালু !”

কালু আর সেখানে নাই । কালু চলিয়া গিয়াছে ।

বিভা মনে করিল তাহার স্বামীর কথা শুনিতে পাইয়া  
কালু বোধ হয় বাধিত আহত হইয়া চলিয়া গিয়াছে ।  
বিভাও ইহাতে একটু বেদনা অনুভব করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল ।  
আহা গরীব বেচারী !

কালু স্কুলে গিয়া কণ্ঠে ইশুফা দিল । তাহার আলা-  
পীরা বলিল, তুই কাজ ছাড়িয়া করিবি কি ? কালু বলিল,  
সে জুতা সেলাই করিবে । ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা  
স্থির করিল কালু নিশ্চয় বাউরা হইয়া গিয়াছে, নতুবা  
কাহারো কি কখনো এমন নোকরি ছাড়িয়া জুতা সেলাই  
করিবার সখ হয় ? তাহারা কত বুঝাইল, কালু কোনো  
উপদেশই কানে তুলিল না ।

কালু বিভার নিকট হইতে যে সিকি-দুয়ানিগুলি বক-  
শিশ পাইয়াছিল তাহাতে কৌড়া ঝালাইয়া পাটোয়ারকে  
দিয়া রেশম ও জরি জড়াইয়া গাঁথাইয়া লইয়াছিল ।  
সেই মালাটিকে সে আজ গলায় পরিল । তারপর সেলাই  
বুরুশের সরঞ্জামের সঙ্গে বিভার-দেওয়া বইখানি খলিতে  
ভরিয়া খলি কাঁধে উঠাইয়া স্কুল হইতে সে বাহির হইয়া  
পড়িল । পথে তাহার দেখা হইল ভিমরুলের সঙ্গে ।  
ভিমরুল হাসিয়া বলিয়া উঠিল—“বা রে, সহিস আবার  
সেলাই ক্রম সেজেছে ! লা-ক্রম !” কালু একবার তাহার  
দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া গেট পার হইয়া পথের জনস্রোতে  
ভাসিয়া পড়িল ।

বিভা হঠাৎ জানলার কাছে গিয়া দেখিল তাহাদের  
বাড়ীর অপর দিকের ফুটপাথের উপর কালু তাহার জুতা  
সেলাইয়ের তোড় জোড় লইয়া বসিয়া আছে । বিভাকে

দেখিয়াই তাহার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । সে  
হাসিয়া বুঝাইয়া দিল সে স্কুলের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া  
এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং সে বেশ সুখেই আছে ।  
কিন্তু বিভা কেন অকারণে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, সে আর  
জানলার দাঁড়াইতে পারিল না ।

তারপর হইতে রোজই বিভা দেখে সকাল বিকাল  
দুবেলাই কালু সেই ঠিক এক জায়গাতেই বসিয়া থাকে—  
রোজ নাই বৃষ্টি নাই সে বসিয়াই থাকে, কোনো দিন তার  
কামাই হয় না । অতিরিক্তির সময়ও সে নড়ে না, জুতার  
তলায় হাকসোল দিবার চামড়াখানি মাথার উপর তুলিয়া  
ধরিয়া সে ঠায় বসিয়া বসিয়া ভিজে; দারুণ রৌদ্রের  
সময়ও সে নড়ে না, গামছাখানি মাথার পাগড়ির উপর  
ঘোমটার মতন করিয়া বুলাইয়া দিয়া সে বসিয়া বসিয়া  
দরদর করিয়া ঘামে ! বর্ষা ঘনাইয়া আসিলে সে আনন্দে  
কাজরীর গান গাহে—

পিয়া গিয়া পরদেশ,  
লিখত নাহি পাঁতি রে ;  
রোয় রোয় আঁখিয়া,  
ফাটত মেরি ছাতি রে !

উৎসবের দিন সুসজ্জিতা বিভাকে গাড়ী চড়িয়া  
কোথাও যাইতে দেখিলেও তাহার গান পায়, সে গাহে—

কার উজ্জর শিঙার

তু চললু বাজার,

তেরি কাজর নয়না

ছাতি তোড়ত হাজার !

তাহার গানে শুধু ছাতি টুটিবারুই সংবাদ সে ছুতায়  
নাভায় প্রকাশ করিত । পথের লোকে এই রসপাগল  
মুচির কাছে জুতা সেলাই করাইতে কতাইতে এমনি  
সব গান শুনিত—

নৈয়া ঝাঁঝরি,

অন পরি মউজ ধারা,

বায়ু বহি পূরবৈয়া,

অব কস মিলন ভ'য়ে হ' হামারা ।

রহি গো পংখ, পাগর পবনা,

সুনহর ঘুংঘট কাজর-নয়না ।

পার করো গৌসাইয়া ।

তাহার টটা নৌকা, তাহার উপর অনিবার্য বর্ষণ, এবং প্রবল পবন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কাজল-নয়না মেঘ সোনারি বিছাতের গোমটা টানিয়া রহিয়াছে। পথ এখনো অনেক বাকি। মিলনের আশা তাহার আর নাই। তাই তাহার ব্যথিত অন্তর হায় হায় করিয়া দেবতার শরণ মাগিতেছিল—ওগো স্বামী, ওগো পুত্র, তুমিই আমার এই ভগ্ন জীবনতরুনীকে পাড়ে ভিড়াইয়া দাও, ওগো পাড়ি জমাইয়া দাও!

চারু বন্দোপাধায়।

## আলোচনা

### পুত্রকণ্ডা জন্মের কারণ ও অনুপাত।

গত জ্যৈষ্ঠমাসের “প্রবাসীতে” মাননীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় “পুত্রকণ্ডা জন্মের কারণ ও অনুপাত” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে Westermarck-এর মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন “পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশী হইবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মেয়ের সংখ্যা অধিক হইবে।” Westermarck-এর কথাই আবার অনুপাত হিসাবে Hofacker-Sadler Law বলিয়া প্রসিদ্ধ :—

(১) পিতা মাতার অপেক্ষা বয়সে বড় হইলে প্রতি ১১০ পুত্রে ১০০ কন্যা।

(২) পিতা মাতা সমবয়স্ক হইলে প্রতি ৯০ পুত্রে ১০০ কন্যা।

(৩) পিতা মাতার অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলে প্রতি ৮২ পুত্রে ১০০ কন্যা।

এই Hofacker-Sadler Law লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন সর্বত্রই এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ঠিক এই অনুপাতে পুত্র কন্যা জন্মে না। আবার কাহারও মত যে Hofacker-Sadler-এর নিয়ম একেবারে ভুল। আবার নিকট ভারতবর্ষের সেঙ্গাস বিবরণ না থাকায় আমি আশা-দেহে এই নিয়ম খাটে কিনা মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। সতীশবাহু এ সম্বন্ধে মিলাইয়া দেখিয়া ফলাফল জানাইলে বাধিত হইব।

এই ত গেল অনুপাতের কথা। এখন জন্মের কারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

বাস্তবিক পুত্রকণ্ডা জন্মের কারণ লইয়া নানা মূনির নানা মত আছে। কেবল জন্মমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া পুত্রকণ্ডা জন্মের কারণ ও জীবনীশক্তি (vitality) আলোচনা করিলে বিশেষ কোনও ফল ফলিবে না। সম্প্রতি জীবতত্ত্ববিদগণ স্ত্রী-পুরুষ জন্ম-বার কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই মত, ডিম্বের (ovum) গুণেই স্ত্রী ও পুরুষ জন্মিয়া থাকে। ইহারা বলেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উৎপাদনকারী দুইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ডিম্ব আছে। তাঁহাদের মতের অনুকূলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়টি প্রমাণ উদ্ধৃত করেন :—

প্রথম। কতকগুলি পোকের (যেমন Dinophilus) দুইপ্রকার ডিম্ব হইয়া থাকে—কতকগুলি বড় আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড়গুলি হইতে চিরকালই স্ত্রীজাতির উৎপত্তি আর ছোটগুলি হইতে পুংজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। Hyditina নামক জন্তুরও এইরূপ দুই প্রকার ডিম্ব (ovum) দেখা যায়।

দ্বিতীয়। মেরুদণ্ডহীন (invertebrates) জন্তুদের মধ্যে পুরুষের সংসর্গ বাতীত বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় (Parthenogenesis)। অনেক স্থলে ইহাই বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপে উৎপাদিত বংশের প্রত্যেকটিই স্ত্রীজাতীয়। আবার কোন কোন জন্তু কখনও বা পুরুষের সংস্রব ব্যতিরেকে (Parthenogenetically) কখনও বা সাধারণ নিয়মে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। শেষোক্ত জীবগণের কখনও কখনও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ জন্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ডিম্বের (ovum) লিঙ্গনির্ণয়কারী ক্ষমতা বর্ধমান থাকে।

তৃতীয়। মানুষের যে যমজ জন্মাইয়া থাকে তাহাতে কখনও কখনও একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা জন্মিতে দেখা যায়। ইহাকে false twins বলে। মাতার জরায়ুর মধ্যে দুইটি পৃথক পৃথক ফুল (placenta) অবলম্বন করিয়া জীব দুইটি বর্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ স্থলে একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা জন্মিতে পারে বা দুইটিই কন্যা বা দুইটিই পুত্র জন্মিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি ডিম্ব হইতে দুইটি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন একটিমাত্র ডিম্ব দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় তখন জরায়ুর মধ্যে একটি ফুল অবলম্বন করিয়া যমজ সন্তান জন্মিয়া থাকে। ইহাকে Identical বা True twins বলা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে দুইটি জীব চিরকালই এক লিঙ্গের হইয়া থাকে। অর্থাৎ হয় দুইটিই পুত্র না হয় দুইটিই কন্যা হইবে, কখনও একটি পুত্র অপরটি কন্যা হইবে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্ত্রী-বা পুরুষ লিঙ্গ ডিম্বের উপরই নির্ভর করে।

কিন্তু এসকল তর্ক মানিয়া লইলেও বীর্ষাণুর (Spermatozoa) যে কোনও কার্যকারিতা নাই একথা বলিলে চলিবে না। যখন স্ত্রী ও পুং ডিম্ব (ovum) থাকিতে পারে, তখন স্ত্রী ও পুং বীর্ষাণুর থাকিবে না কেন? যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম্ব ও বীর্ষাণুর মিলনেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে তখন বীর্ষাণুর কার্যকারিতা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আরও কথা, পুত্রকণ্ডার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির কতক পিতার মত ও কতক মাতার মত হইয়া থাকে। বীর্ষাণুর কার্যকারিতা অস্বীকার করিলে Heredity অস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু এরূপ করিতে কেহই স্বীকৃত নহেন। কাজেই পুরুষের বীর্ষাণুর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আরও দেখা যায় যে-মৌমাছি পুরুষের সহিত সংস্রম না করিয়া বংশবৃদ্ধি করে তাহার সকলগুলিই পুংজাতীয়, কিন্তু যেগুলি সাধারণ নিয়মে জন্মিয়া থাকে তাহার সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয়।

১৯০৬ সালে Wilson অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্ত্রী ও পুং ডিম্বের ত্যায় কোনও কোনও পোকের স্ত্রী ও পুং বীর্ষাণু (Spermatozoa) আছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে কতকগুলি বীর্ষাণুতে অযুগ্ম chromosome \* থাকে; তিনি এইরূপ অযুগ্ম chromosomeকে X chro-

\* প্রত্যেক cell-এর একটি করিয়া কেন্দ্র বা nucleus থাকে,

mosome নামে অভিহিত করেন। এইরূপে X chromosome দ্বারা মিলিত হইলে ডিম্ব হইতে পুংজাতির উদ্ভব হয়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন কতকগুলি পোকাতে X chromosome আছে, আর অপর কতকগুলিতে ঠিক এইরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট chromosome আছে। এইগুলিকে তিনি chromosome নামে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে যে ডিম্বগুলি X chromosomeযুক্ত বীর্ষাণুর সহিত মিলিত হয় সেগুলি হইতে স্ত্রী, আর যেগুলি chromosomeএর সহিত মিলিত হয় সেগুলি হইতে পুংজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অপর কতকগুলি জন্ত আছে যাহাদের বীর্ষাণুতে একপ্রকার বিশেষ chromosomeএর অস্তিত্ব আছে। ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎজীবের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়া থাকে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ভবিষ্যৎ জীবের লিঙ্গ কেবল ডিম্ব বা বীর্ষাণু বা উভয়ের মিলনের উপর নির্ভর করে। ১৯১০ সালে আমেরিকার বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ Morgan প্রমাণ করেন যে মিলিত ডিম্ব এবং বীর্ষাণুর লিঙ্গের উপরই ভবিষ্যৎ জীবের লিঙ্গ নির্ভর করিয়া থাকে। কখন কখন আবার এই ডিম্ব বা বীর্ষাণুর মধ্যে যেটি অধিক শক্তিসম্পন্ন (of relative higher potency) তাহারই অনুযায়ী শাবকের লিঙ্গ নির্ণীত হয়।

নিম্নশ্রেণীর জীবজগতে যেমন দুই প্রকার ডিম্ব ও বীর্ষাণুর অস্তিত্বের পরিচয় পাই মামুষের যদি এইরূপ একটা পার্থক্য পাই তবে সব গোল চুকিয়া যায়। তাহা না হইলে সন্দেহ হইতে এই সমস্ত বিষয় সীম্যাংসা করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

### উত্তর।

জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত “পুলকত্তা জন্মের কারণ ও অনুপাত” নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছিল। তাহাতে কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছেন। তজ্জন্ত দুই একটি কথা লিখিতেছি।

পুলকত্তা জন্মের সমুদায় কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। পুরুষ ও স্ত্রী বীজ (sex-cells) হইতে কি প্রকারে ছেলে বা মেয়ে জন্মিয়া থাকে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিদগণ অনুবীক্ষণ সহযোগে যে-সকল পবেষণা করিতেছেন তাহার সাহায্যে আপাততঃ কোনও সত্য নির্ণয়ের আশা নাই। তাই statistical method অবলম্বন করিয়া আমরা যতটা অগ্রসর হইতে পারি আমি তাহাই চেষ্টা করিয়া দেখিতেছিলাম। আচার্য্য টমসন অনেকগুলি কারণের মধ্যে তিনটি কারণই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, (১) পিতামাতার বয়সের তারতম্য, (২) পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ যখন একত্র হয় তখন তাহাদের বয়সের তারতম্য।

ইহার মধ্যে কতকগুলি জড়ান স্মৃতির ন্যায় জব্য দেখা যায়, এই গুলিকে Chromosome বলে। যখন একটি cell দুই ভাগে বিভক্ত হয় তখন এই Chromosomeগুলি ঠিক অর্ধেক ভাগে প্রত্যেকটিতে থাকে। Chromosomeএর সংখ্যা ২ হইতে ২০ পর্যন্ত হইতে পারে। পূর্বে ধারণা ছিল Chromosome যুগ্ম অর্থাৎ ২ দিয়া ভাগ করা যাইতে পারে।

(৩) বংশানুক্রম। \* আমি ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কারণটির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য statistics সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করি, কেননা দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে পবেষণা এক্ষেত্রে অসম্ভব। প্রথমটির জন্য সেলস অধ্যয়ন করি এবং তৃতীয়টির জন্য নিজেই সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাকি। বহুবক্তিকে কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীর ৬৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তালিকাখানি পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি।

এখনও কার্য্য শেষ হয় নাই—তবে এপর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে বংশানুক্রম একটা কারণ বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। বহুসংখ্যক পরিবারের সংবাদ গৃহীত হইলে যদি দেখা যায় শতকরা ৯০ বা ৯৫ স্থলে বংশানুক্রমের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বংশানুক্রম অত্যন্ত কারণ—অপর্যাপক কারণের প্রভাবে বাকি পাঁচ কি দশ স্থলে অসঙ্গতি হইতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

### বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ।

বৈশাখের প্রবাসীতে আশুবাবুর ‘বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ’ নামক প্রবন্ধে একস্থলে একটি ভুল ছিল। ভুলটি এই, আশুবাবু বলিয়াছেন “ইহাতে ( অর্থাৎ ছন্দঃ-কুম্ভ নামক কাব্যে ) পাণ্ডব-চরিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে।” ললিতবাবু জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন “গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ও পাণ্ডবচরিত নহে, কৃষ্ণলীলা মানভিকোপন্যাস।” ললিতবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, কিন্তু আশুবাবুর ভ্রমের উৎপত্তি বোধ হয় এইরূপে হইয়াছে।

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একখানির নাম ছন্দঃকুম্ভ ও অপরখানির নাম পাণ্ডবচরিত। এই দুইখানি গ্রন্থের কিছু বিবরণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে একখানি গ্রন্থের মলাটের বিজ্ঞাপন হইতে প্রদত্ত হইতেছে। “ছন্দঃকুম্ভ কাব্য।... ইহাতে ছন্দোমঞ্জরী-গ্রন্থোক্ত যাবতীয় ছন্দের মূল লক্ষণ, সংস্কৃত উদাহরণ ও তন্নিম্নে তত্তৎসংক্রমে নিবন্ধ সাধুভাষায় বিরচিত কবিতাবলী বর্ণসংখ্যানুসারে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।...সমগ্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মানভিকোপন্যাস ও যুগল-শিলন বর্ণিত হইয়াছে।” “পাণ্ডব-চরিত কাব্য।...ইহাতে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ, অন্তর্নিকা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।”

আশুবাবু উক্ত গ্রন্থ দুইখানির একখানিও দেখেন নাই। সংস্কৃত-চন্দ্রিকা নামক মাসিকপত্র উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা পাঠ করিয়া তাহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমালোচনাতেই ছন্দঃকুম্ভ ও পাণ্ডবচরিত যে পৃথক গ্রন্থ তাহা বুঝিবার উপায় আছে। যথা “ছন্দঃকুম্ভং তৎসাহিত্য-স্বরূপং পাণ্ডবচরিতঞ্চ”, “পুলকত্তা”, “পুলকত্তাং পঠিত্বা” ইত্যাদি [ সংস্কৃত-চন্দ্রিকা ১৮০৬ শাক জ্যৈষ্ঠ ]।

ললিতবাবু অবশ্য ‘ছন্দঃকুম্ভ’ই দেখিয়াছেন। পাণ্ডবচরিত সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নাই। “ছন্দঃকুম্ভ ও পাণ্ডবচরিতঃ”

নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে ইহা জানিলে আর পূর্বোক্ত গোলমালের অবকাশ থাকে না।

রচয়িতার যথার্থ নাম ভুবনমোহন রায়চৌধুরী। কিন্তু হেমবাবু মাইকেলসের সমালোচনায় ভুবনচন্দ্র লিখিয়াছেন। তাহা ভুল। আশু বাবু “ভুবনমোহন চৌধুরী” লিখিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে সমালোচনা টাহার অবলম্বন, তাহাতে আছে “শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন চৌধুরী কৃতম্।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

### আকবরের সভায় মীরা।

১৩২০—ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে “ভারতীয় সঙ্গীত” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে মীরা-বাই-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—“ইনি উদয়পুরের রাজার পত্নী। আকবরের সভায় ইনি গান করিয়াছিলেন।”

“বিদ্যাসাগর” বলিলেই যেমন আমরা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝি, “মীরাবাই” বলিলেও তেমনি মিবরপতি রাণা কুস্তের সহধর্মিণী রাজ্ঞী মীরাবাইকে মনে হয়। অতএব “ভারতীয় সঙ্গীতের” উদ্ধৃত অংশ পাঠে কিছু গোলে ঠেকিয়াছি।

প্রথম গোল এই যে, ঐতিহাসিক হিসাবে মীরাবাইয়ের স্বামী রাণা কুস্তের রাজত্বকালে উদয়পুরের অস্তিত্ব ছিল না। কুস্তের উত্তর পুরুষ রাণা উদয়সিংহ উদয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। মিবর-রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিতোর নগর মোগল বাদশাহ কর্তৃক অধিকৃত হইলে, উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া উদয়পুর নামে নগর নির্মাণ পূর্বক তথায় রাজধানী স্থাপিত করেন। কিন্তু তাহা রাণাকুস্তের বহুদিন পরে। সুতরাং মীরাবাই “উদয়পুরের রাজার পত্নী” কিরূপে হইতে পারেন?

কিন্তু ইহা ত সামান্ত কথা। প্রধান গোলযোগ লেখকের দ্বিতীয় উক্তি—“আকবরের সভায় ইনি ( মীরাবাই ) গান করিয়াছিলেন।” এই কথা শুনিতেই মনে হয়,—যেন মিবরের রাজ-বল-বু পেশোয়ারাজ পরিয়া মোগলসম্রাটের দরবার আশে নাচ-পানের মহলা দিয়াছিলেন। পরন্তু ইহা মিবর-রাজবংশের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা নহে। বিজ্ঞ লেখক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে উপরি উদ্ধৃত কথা কহিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

বস্তুতঃ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইতিহাসে আমরা লেখক মহাশয়ের উক্তির প্রতিকূল প্রমাণই পাইতেছি। প্রথমতঃ রাণা কুস্ত ও আকবর সমসাময়িক নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষের ব্যবধান। বৃহৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মানবলীলা সম্বরণ করেন, আর আকবর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মোগলসম্রাজ্য লাভ করেন। এমত অবস্থায়, রাণা কুস্তের মহিলা গান গাহিবার জন্য আকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত কি?

“ভক্তমাল” নামক প্রাচীন গ্রন্থে অনেক আঙ্গণবী গল্পের অবতারণা আছে। ঐতিহাসিক তথ্যে অনভিজ্ঞ “ভক্তমাল”-কবি আকবর নামকে মীরার সমকালিক বলিয়া লিখিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, মীরার সঙ্গীতকুশলতার খ্যাতি শুনিয়া আকবর তাহার গান শুনিবার অভিপ্রায়ে, তানসেনকে সঙ্গে লইয়া হুগুবেশে চিতোরে অগমন করেন; এবং বৈকুণ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজাস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক রাণী মীরার সঙ্গীত শ্রবণ করেন। “ভক্তমাল”-কবির কল্পনাও আকবরকেই মীরার ‘সভায়’ আনিয়াছেন, মীরাকে ‘আকবরের সভায়’ লইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই।

রাণী মীরাবাই সম্বন্ধে রাজস্থানের-ইতিবৃত্ত-লেখক মহাশয় টড সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উপলব্ধ হয় যে, রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী মীরাবাই সৌন্দর্যময়ী, ধর্মশীলা, বিদ্যাবতী ও কবিত্বশালিনী ছিলেন। অদ্যাপি তাহার রচিত দৌহাসকল তাহার ধর্মামুরাগ ও কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজ্ঞী যে সঙ্গীতামুরাগিনী এবং সঙ্গীতকুশলা ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দৌহা কবিতা মাত্র, গান নহে। “ভক্তমালে”র বর্ণনাত্তে বিশ্বাসস্থাপনও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিরাপদ নহে। অতএব কেমন করিয়া বলিব যে, মীরাবাই ‘আকবরের সভায়’—অথবা অন্য কাহারও সভায়—‘গান করিয়াছিলেন’? টড মহোদয় আরও বলিয়াছেন যে, মীরাবাই যমুনাসৈকত হইতে দারকাধাম পর্য্যন্ত সমুদয় বৈকুণ্ঠ মন্দির সন্দর্শন করিয়াছিলেন। মীরার আকবর-সভায়—কিন্তু অন্য কাহারও সভায়—গমমের বৃত্তান্ত সত্য হইলে, টড সাহেব সে কথাও লিপিবদ্ধ করিতে কখনই বিরত থাকিতেন না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুমদার।

### বিদ্যাতের ভয়

( মার্ক টোয়েনের গল্প ইহাতে )

মিঃ মার্ক উইলিয়ম্ বলিতে লাগিলেন—লোকে বিদ্যাতের ভয়ে বেরূপ ভীত হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। যদিও কখন কখন কুকুর, ও কদাচিত্ দুই একজন পুরুষ মানুষকেও বিদ্যাতের ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়, তবুও স্ত্রীলোকেই ইহাকে বেশী ভয় করে। স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ সয়তানের ও কখন কখন নেংটি ইঁদুরের সামনেও নির্ভয়ে যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাৎ দেখিলেই একেবারে কাবু হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের দুর্দশা দর্শন করিলে হাসিও পায়, হুঃখও হয়। আমি একরাশি ‘মটিমার, মটিমার’ শব্দে জাগ্রত হই, ও অতিকষ্টে ঘুম ভাঙ্গাইয়া শুনিতে পাই যে, আমার স্ত্রী কাতর স্বরে আমায় ডাকিতেছেন। তখন আমাদের দুজনে এইরূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল—

‘ইতি, তুমি কি ডাকছিলে? কি হয়েছে? তুমি কোথায়?’

‘আমি জুতা ও আলো রাখবার ছোট ঘরে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে তোমার ওখানে শুয়ে ও রকম করে’ ঘুমাতে লজ্জা করে না!’

‘লোকে ঘুমালে কিরূপে লজ্জিত হ’তে পারে? ঘুমালে কি লজ্জা থাকে যে লোকে লজ্জিত হবে?’

‘তুমি বেশ লোক, মটিমার, তোমার কি ছাই লজ্জা আছে!’

সেই সময়ে আমি স্ত্রীর ক্রন্দন সংবরণের শব্দ শুনিত্তে পাইলাম ও সেই শব্দ শুনিয়াই আমি কড়া উত্তর না দিয়া বলিলাম, ‘আমি বড় দুঃখিত হলাম; এরূপ ব্যবহার ইচ্ছা করে করি নাই। ফিরে এস, ইতি, আর—’

‘মটিমার...’

‘কি হয়েছে?’

‘তুমি এখনও বিছানায় আছ নাকি?’

‘নিশ্চয়; কেন তাতে...’

‘শীঘ্র বিছানার বাহির হও। তুমি তোমার নিজের জন্ত যদিও সাবধান না হও, আমার আর ছেলেদের জন্তও সাবধান হওয়া তোমার উচিত।’

‘কিন্তু, ইতি, আমি...’

‘আমার সঙ্গে এখন তর্ক করিও না, মটিমার। তুমি নিজেরও বেশ জান, আর সমস্ত বইতেও আছে, যে, বড়-বৃষ্টির সময় বিছানার মত বিপদজনক স্থান আর নাই। তুমি কেবল তর্ক করবার জন্ত জীবনটাকে নষ্ট করবে দেখছি।’

‘কি আপদ, আমি এখন বিছানায় নাই। আমি...’ (এই সময়ে বিছাতের আলোয়, বজ্রাঘাতের শব্দে ও স্ত্রীর ভয়ব্যঞ্জকস্বরে আমার কথা শেষ হইতে পাইল না)।

‘দেখ, কিরূপ পরিণাম হয় দেখ। এরূপ সময়ে তুমি শপথ করলে কিরূপে, মটিমার?’

‘আমি শপথ করি নাই, আর এ আমার কথা কইবারও কাল নয়। ইতি, তুমি বেশ জান—অন্ততঃ তোমার জানা উচিত—যে আমি কথা না কইলেও ঠিক এইরূপ হ’ত। আকাশ যখন বিছাতে ভরা থাকে...’

‘বেশ, তর্ক কর, তর্ক কর; কেবল তর্কেই পটু; কর, কর, তর্ক কর। তুমি বেশ জান যে এখানে একটিও লোহার শিক্ নাই, আর তোমার স্ত্রী ও ছেলেরা পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে’ আছে। একথা জেনে শুনেও তুমি কি করে ও রকম কথা বল? আবার কি করছ? দেশলাই জ্বালছ? মটিমার, তুমি পাগল নাকি?’

‘ভাল জ্বালা বটে, আলো জ্বালাতে ক্ষতি কি? এই ঘরটি ত ঠিক নরকের মত অন্ধকার। আর...’

‘নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, শীঘ্র নিবিয়ে দাও। তুমি দেখছি আমাদের সকলকেই সারবে। তুমি বেশ জেনো আলো বিছাতকে যেমন আকর্ষণ করে, এমন আর কোন জিনিষই করে না। (গুড়—গুড়-ড-র-কড়-কড়) ঐ শোন। কি করছ দেখ।’

‘কি দেখব, কি করেছি? আলো বিছাতকে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আলো কখন বিছাত জন্মায় না। এবারেও...’

‘লজ্জাও করে না? মৃত্যু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আর এসময় তুমি এই রকম কথা কইচ। যদি তোমার... মটিমার!’

‘কেন?’

‘তুমি কি আজ উপাসনা করেছিলে?’

‘না। আমি করব মনে করেছিলাম, কিন্তু ১২ × ১০ কত হয় তাই হিসাব করতে...’

( গুড়-গুড়-গুড়-কড়-ড-র-চড়াৎ )

‘হায়, হায়, হায়, আর আমাদের রক্ষা নাই। এরূপ সময়ে তুমি উপাসনা করতে ভুললে, মটিমার? তোমার দোষেই আমরা সবাই মরছি, এরূপ সময় উপাসনা ভোলে’ মানুষে?’

‘কিন্তু তখন ‘এরূপ সময়’ ছিল না। আকাশে এতটুকুও মেঘ ছিল না; আর আমি কি করে জানব যে বড়বৃষ্টি হ’বে। এ ত প্রায় হ’; এ নিয়ে তোমার গোল করা বড় অত্যাচার। চার বৎসর পূর্বে যখন আমি উপাসনা না করার ভূমিকম্প হয়, তখন থেকে আজ অবধি আমি একদিনও ত উপাসনা করতে ভুলি নাই।’

‘মটিমার, কি বলছ? তুমি কি জ্বরের কথা ভুলে গেলে?’

‘তুমি জ্বরের কথা প্রায়ই বল। এ তোমার বড় অত্যাচার! এ কথা না বলে’ তুমি কোন কথা কইতে পার না? আমি সব সহিতে পারি, কিন্তু যদি তুমি ফের...’

( ক্রম-ক্রম-কড়-ড-র-গুম-গুম-হুম )

‘হায়, হায়, হায়। বজ্রাঘাত বাড়িতেই হয়েছে।’



আজ রাত্তিতেই আমাদের শেষ হ'বে। আমরা মারা গেলে মটিমার যদি তুমি কখন এই সব কড়া কথা ভাব, যদি কখন মনে পড়ে..... মটিমার।'

'আঃ! আবার কি?'

'তোমার কথায় বোধ হয়..... মটিমার, তুমি কি সত্যিই আগুন রাখবার জায়গার ( fire-place ) সামনে?'

'হ্যাঁ, সেই দোষই এখনু করেছি বটে। তারপর?'

'শীঘ্র সরে এস, শীঘ্র সরে এস। তুমি আমাদের সকলকেই মারবে দেখছি। তুমি কি জাননা যে খোলা চিম্বি যেমন বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে সেরূপ আর কিছুই করে না।..... এখন আবার কোথায় গেলে?'

'জানালায় সামনে।'

'তুমি কি পাগল? সরে যাও, সরে যাও। কোলের ছেলেরা অবধি জানে যে ঝড়ের সময় জানালার মত বিপদজনক স্থান আর নাই। আর তুমি, বুড়ো মিসেস, ছেলের বাপ হয়েও ওখানে গেলে! হায়, আজ দেখছি মারা যেতে হ'বে। এখন..... মটিমার!'

'কেন? কি করুব?'

'ও কে খস্ খস্ করছে?'

'আমি।'

'কি করছ?'

'আমার ইজেরের উপর-দিক কোন্টা তাই ঠিক হ'।'

'শীঘ্র ওসব দূরে ফেলে দাও, ফেলে দাও। পশম ও বুনাতির মত বিদ্যুৎ আকর্ষণ করতে কোনো জিনিষ আর নাই জেনো। যখন তুমি এইসব পরছ, তখন আমার বিশ্বাস যে তুমি ইচ্ছা করেই জীবন নষ্ট করতে চাও। আমাদের জীবন ত সর্বদাই স্বাভাবিক বিপদে পরিপূর্ণ; তা'র উপর তুমি আবার ইচ্ছা করে বিপদ বাড়াচ্ছ! আবার গান গাইছ? কি ভাবছ তুমি, গায়?'

'কেন গান গাইতে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কি? বিলক্ষণ! আমি তোমাকে শত সহস্র বার বলেছি যে গানের শব্দতরঙ্গ আকাশে বিদ্যুৎ সঞ্চারণে বাধা দেয়, আর..... মটিমার দরজা খোলা হচ্ছে কি জন্ত?'

'কেন তাতেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি মৃত্যু আর কি! দরজা খুললেই ঘরে বাতাস ঢোকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঢোকে, এ কথা সকলেই জানে। বন্ধ কর, বন্ধ কর; আরও চেপে বন্ধ কর। এ সময়ে তোমার মত পাগলের সঙ্গে থাকা কি ভয়ানক! মটিমার আবার ওখানে কি করছ?'

'কিছু নয়, কেবল জলের কল খুলছি। বরটা ভয়ানক গরম; আমি মাথাটা একবার ধুয়ে নিতে চাই।'

'তোমার নিশ্চয়ই বুদ্ধি লোপ হয়েছে দেখছি। যদি বিদ্যুৎ অণু জিনিষে এক বার লাগে, তবে জলে পঞ্চাশ বার লাগে। কল বন্ধ কর বলাচ্ছ। হায়! আমাদের আর কেউ বাঁচতে পারবে না! তুমিই আমাদের বাঁচতে দেবে না! আমরা, বোধ হয়..... মটিমার ওটা কি পড়ল?'

'ও একখানা ছবি।'

'তুমি বুঝি দেয়ালের কাছে গেছ। দেয়ালের মত আর কিছুই বিদ্যুৎ আকর্ষণ করতে পারে না, এও জান না ছাই! সরে এস, সরে এস! আবার শপথ কচ্ছ? তোমার পরিবারে একরূপ বিপদের সময় তুমি কি করে শপথ কর বল দেখি? আমি যে তোমায় পালকের বিছানার কথা বলেছিলাম তা'র কি হল?'

'সে ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছি! তা ভুলবে বৈকি! আজ যদি সে বিছানা ঘরের মাঝখানে পাতা থাকত, তবে আমরা সকলেই নিরাপদ হতাম। শীঘ্র তুমি আমার কাছে এস।'

আমি তখন সেই ঘরের ভিতরে গেলাম। কিন্তু ঘরটি নিতান্ত ছোট ও বন্ধ থাকতে হুজনে থাকিতে বড় কষ্ট হইল। আমি বাহিরে আসিলাম, কিন্তু গৃহিণী বলিলেন—

'তুমি যে মরবে মনে করেছ, সেটি আমি হ'তে দিচ্ছি না; তোমায় রক্ষা আমি করবই। আমার টেবিলের উপর হ'তে সেই জাম্বান বইখানা আর বাতি ও দেশলাই দাও। কিন্তু ঘরের ভিতর আলো জ্বলো না যেন।'

আমি সেই ঘোর অন্ধকারে কয়েকটা ফুলদানী ও অন্যান্য আসবাব ভাঁজিয়া, বই, বাতি ও দেশলাই

গৃহিনীকে দিলাম। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন ও আমিও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাইলাম।

‘মটিমার ও কিনের শব্দ?’

‘ওটা বিড়াল।’

‘বিড়াল! ওটাকে শীঘ্র ধরে’ হাত ধোবার যায়গায় পুরে রাখ। বিড়ালগুলো কেবল বিদ্যুতে ভরা। কি সর্বনাশ!’

আমি আবার কান্নার শব্দ শুনিলাম। তাহা না হইলে আমি এক পাও নড়িতাম না।

যাহা হউক আমি অনেক টেবিল ও চেয়ার উন্টাইয়া কিঞ্চিৎ শারীরিক আঘাত পাইয়া বিড়ালটিকে ঘরে পুরিলাম। আমি দুই শত টাকার জিনিষ ভাঙ্গিলাম। তার পর গৃহিনী বলিতে লাগিলেন—

‘মটিমার, এই বইয়ে লেখা আছে যে ঘরের মাঝখানে চোয়ারে দাঁড়ানই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু দাঁড়াবার আগে চেয়ারখান অপরিচালক (nonconductor) দ্বিজে তাতে বিদ্যুৎ পরিবাহন বন্ধ (insulate) করতে হবে। চারটা কাচের গেলাসের উপর চেয়ারের চারটা পা রাখ ত! (ককড়-কড়-ডুর-ব্যাং-গুম-গুডুম) ঐ শোন। শীঘ্র কর মটিমার শীঘ্র কর।’

আমি তখন সমস্ত কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া অনেক কষ্টে চারিটা সংগ্রহ করিয়া চেয়ারের চারিটা পায়া গ্লাসের উপর রাখিয়া স্থির ভাবে উপদেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

‘মটিমার, এ কথাগুলোর মানে কি? Während evies gwellers etc. আমরা ধাতু-নির্শিত দ্রব্য আমাদের নিকটে রাখব? না—দূরে রাখব?’

‘দেখ, ইতি, এখানটা একটু গোলমালে ঠেকছে; আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে ধাতু-নির্শিত দ্রব্য আমাদের অতি নিকটে রাখাই কর্তব্য।’

‘আমারও তাই বোধ হয়, কারণ তা হলে আমাদের চারিদিকে ঐ জিনিষগুলো শিকের কাজ করবে! তুমি শীঘ্র তোমার পিতলের টুপিটা পর।’

আমি অগত্যা সেই গরমে সেই বৃহৎ ভারি টুপি পরিলাম। তখন গৃহিনী আবার বলিতে লাগিলেন—

‘মটিমার, তোমার শরীরের মধ্যভাগ এইবার রক্ষা করা উচিত। তুমি তোমার পিতলের কোমরবন্দ ও তলোয়ার পর।’

‘এখন তোমার পায়ের দিক বাঁচান উচিত। মটিমার এইবার তুমি ঘোড়ায় চড়বার কাঁটা পায়ে পর।’

আমি নিঃশব্দে আদেশ প্রতিপালন করিলাম ও যত দূর পারিলাম মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিলাম।

‘মটিমার, এর অর্থ কি? Das lantern ist etc. ঝড় বৃষ্টির সময় ঘণ্টা বাজান উচিত কি না?’

‘আমার বোধ হয়, ইতি, ঘণ্টাবাজান উচিত। আর প্রতি কথার মানে করতে গেলেও.....’

‘সে কথা থাক। আর দেরী করো না তবে। মটিমার, দালানে আমাদের বড় ঘণ্টাটা আছে। শীঘ্র সেইটা নিয়ে ঐ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে খুব জোরে বাজাও। আঃ! এইবার আমরা রক্ষা পেলাম; এ যাত্রা আমরা বেঁচে যাব মটিমার।’

আমি সেই চেয়ারে উঠিয়া যথাসাধ্য জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। ৮৯ মিনিট পরেই আমার জানালার ফাঁক হইতে ভিতরে আলো প্রবেশ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—‘কি হয়েছে? কি ব্যাপার? শীঘ্র দরজা খোল।’

জানালার বাহিরের লোকেরা আমার রাত্রিবাস পোষাকের উপর যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

আমি তখন ঘণ্টা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে নামিয়া বলিলাম, ‘কিছুই নয়; পাছে আমাদের বাড়ীতে বজ্রঘাত হয় এই ভয়ে আমি বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছিলাম। আজকার রাত্রিটা কি ভয়ানক—কেবল ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রঘাত আর বৃষ্টি!’

‘ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রঘাত, বৃষ্টি! মিঃ ম্যাকউইলিয়ামস্, তুমি পাগল হয়েছ না কি? আজ ত অতি পরিষ্কার রাত্রি।’

আমি তখন জানালা খুলিয়া দেখিয়া এত আশ্চর্য হইলাম যে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম ‘সে কি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি

না। আমি জানালায় ভিতর হ'তে বিছাতের আলো ও বজ্রের শব্দ ঠিক শুনেছি।'

আমার কুখ্যাত শেখ না হইতেই প্রাণ ভরিয়া হাসি-বার জন্ত একটির পর একটি করিয়া সমাগত ভদ্র-লোকেরা মাটিতে শুইতে লাগিল—হাসিতে হাসিতে দুইজন দম্ আটকাইয়া মারা গেল। জীবিতদের মধ্যে একজন বলিল, 'তুমি যদি কিছু পূর্বে জানালা খুলিতে! তুমি বিছাতও দেখে নাই, বজ্রাঘাতের শব্দও শোন নাই, কেবল কামানের আলো দেখেছ ও শব্দ শুনেছ। অনেক রাত্রিতে গারফিল্ড প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন এই খবর আসে, সেই জন্ত এই সব আড়ম্বর।'

এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, এত রকম বাঁচিবার উপায় সত্ত্বেও লোকে যে কল্পে বজ্রাঘাতে মরে ইহাই আশ্চর্যের বিষয়!

শ্রীভুবনমোহন সেনগুপ্ত।

## অন্ধের কাহিনী

( গল্প )

( ১ )

সে জন্মাক!

বেচারী দৃষ্টিহীন চক্রে মাতার স্নেহ-করণ মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিত—কি দেখিত তা সেই জানে!

লোকে বুদ্ধি উঠিতে পারিত না,— কেন, কি দোষে সে জন্মাক হইল। মাতা ভুবনমোহিনীর ভাসা ভাসা টানা চোখ ছুটির সুখ্যাতি করিত না এমন লোকই ছিল না; তাহার গোলাপ ফুলের মত নিখুঁত ফুটফুটে রঙ লোকে উপমার মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিল। তাহার জায় সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী বড় সুন্দর নহে,—ইহাই সাধারণের অভিমত ছিল। পিতা জমিদার তারাশঙ্কর বাবুও নিতান্ত কেমনা ছিলেন না। কিন্তু তবু তাহাদের পুত্র মনোহর জন্মাক হইল কেন তাহা কে বলিয়া দিবে? সকলি প্রাস্তন!

সে যাহা হউক মনোহর যে জন্মাক এ কথা ঠিক সত্য!

সোঁনালী রঙের সূর্য্যকিরণ সে শুধু উজ্জ্বল বলিয়াই জানিত; নানা রঙের ফুলগুলি তাহার নিকট কেবল সুগন্ধের আধার বলিয়াই মনে হইত। যাহারা তাহাকে স্নেহ করিত তাহাদিগকে সে সেই স্নেহ-কোমল স্বরের আধার বলিয়া জানিত; তাহাদিগের স্নেহচূষন ও অশ্রুই তাহাদিগের একমাত্র পরিচয়চিহ্ন ছিল!

সংসার,—পৃথিবী—বলিলে সে বুকিত কতকগুলি নিষ্ঠুর আঘাতের সমষ্টি; পদে পদে সে তাহাতে আহত হয়, আর বেদনাপ্লুত অন্তরের স্মৃতিপটে সেগুলি সে মুদ্রিত করিয়া রাখে; সংসার সম্বন্ধে তাহার মনে এইরূপ সংস্কারই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল! আলো-ছায়া, দিন-রাত্রি, সৌন্দর্য্য-আকৃতি, দুরত্ব-ব্যবধান, সুন্দর-কুৎসিত—এসব কথাগুলোর কুহেলিকাপূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ সে একদিনও পায় নাই!

লোকের বিশ্বাস, একটা অন্ধহীন হইলে অল্প অল্পে কার্য্যকারী ক্ষমতা সাধারণের অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। কথাটা সত্য। সকল অন্ধ অসাধারণ ক্ষমতাবান না হউক অন্ধের অনুভব ও শ্রবণ করিবার শক্তিটা যে অসাধারণ হইয়া উঠে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অন্ধ মনোহরের টাকার অভাব ছিল না। পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী একমাত্র সেই! কিন্তু তাহা অপেক্ষা সে অধিক মূল্যবান মনে করিত জননী ও ভগ্নী লীলার স্নেহ! পিতা বড় আশা করিয়াছিলেন তাহার স্নেহের ধন মনোহর মানুষ হইলে তাহার মুখোজ্জ্বল হইবে; কিন্তু যখন দেখিলেন সে জন্মাক, তাহার আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে পরলোকের পথে অগ্রসর হইলেন।

দিনের পর দিন বহিয়া চলিল, মনোহরও বালা হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিল। তাহার অসম্পূর্ণ অন্ধ প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। উন্নত তাহার হৃদয়খানি ভদ্রজনোচিত বিনয়ে নত হইল।

অন্ধজীবনে তাহার একমাত্র সখল ছিল গীত; তাহাই তাহার তৃপ্তি, তাহাই তাহার সাধনা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গাহিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল; বীণার কোমল বন্ধারের জায় তাহার সুমধুর, কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রাগিনীর করুণ

বন্ধার দিকে দিকে সুধা-বৃষ্টি করিত ; সে স্বরে কত সময় সে আপনিত্ত মুগ্ধ, তন্ময় হইয়া পড়িত। বীণা এসরাজ প্রভৃতি বাজাইবারও তাহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। অনেক সময় সুলিখিত পুস্তকপাঠ শ্রবণ করিয়াও সময় অতি-বাহিত করিত।

সাগরের বেলাভূমির নিকটে তাহার একখানি উদ্যান-বাটিকা ছিল। জীবনের অধিকাংশ সময়ট সে সেই স্থানে অতিবাহিত করিত। উর্শ্বিমালার গভীর গর্জন তাহার নিকট দূরগত সংগীতের মূর্ছনা বলিয়া বোধ হইত। সে স্থানে থাকিলে তাহার হৃদয়ে যে অপূর্ব শান্তির ছায়া-পাত হইত সেরূপ নির্মল, প্রশান্ত ভূমি তাহার আর কিছুতেই লাভ হইত না। সহরে বাস করিতে সে বড় নারাজ ! সহরে বাস করিতে যে তাহার ভয় হয় একথা কাহারও নিকট স্বীকার না করিলেও সহরে বাস করিতে সে একেবারেই সম্মত ছিল না।

কখন কখনও সে পর্কতের সান্নিধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইত ; প্রথমে সেই উদার গান্ধীয়া তাহার হৃদয়ে শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়া দিত, কিন্তু ক্রিয়াক্ষণ থাকিবার পর আর সেই নীরব প্রদেশে বাস করা সুখকর মনে হইত না। তখন অগত্যা সঙ্গীর হস্ত ধরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত।

এইরূপে ক্রমে তাহার বৈচিত্র্যবিহীন অন্ধজীবনের চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু বৈচিত্র্যময় পৃথিবী সাগর ও আকাশ দেখিবার অবকাশ তাহার একদিনের জন্মও ঘটয়া উঠিল না।

অগাধ ধনের অধিকারী মনোহরের চক্ষু আরাম করিবার জন্ম দেশ বিদেশ হইতে বহু ঋাতনামা চিকিৎসক আসিতে লাগিলেন। মনোহর নীরবে তাহাদের আদেশ পালন করিয়া অটুট ধৈর্যের সহিত চিকিৎসাধীন রহিল, কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইলনা, সকলেই নিরাশ অন্তরে প্রত্যাবর্তন করিল। অসীম ধৈর্যশালী মনোহর একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া আবার আপনার অবস্থায় মগ্ন রহিল। সে একদিনের জন্মও দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবে এ ছুরাকাজ্জা করে নাই ; কাজেই নিরাশার ক্রম যবনিকা আসিয়া তাহার অন্তরের শান্তি ঢাকিয়া ফেলিতে পারিল না।

নরেশ তাহার অন্ধজীবনের একমাত্র সুহৃৎ ও সঙ্গী ছিল। আপন সহোদরের স্থায় দিবারাত্রি সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া মনোহরের মরুময় নিঃসঙ্গ দিনগুলি মধুময় করিয়া তুলিত। একদিন নরেশ আসিয়া বলিল,—“মন্তু, এতদিন বাদে বৃষ্টি তোমার চোখ সারবে। আমি একজন হাকিমের সন্ধান পেয়েছি। দিল্লিতে তার বাড়ী ; শুনেছি চোখের অসুখ সারাতে সে একেবারে ধনস্তুরী ! কি বল—আনব তাকে একবার ?”

“কতি কি, দেখতে পার, আমার কিম্ব ভাই বিশ্বাস হয় না।”—মনোহরের মুখে একটু নৈরাশের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সেদিন আর সে সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। পরদিন প্রথম টেনেই নরেশ হাকিমের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

\* \* \* \* \*

যথাসময়ে নরেশ দিল্লি হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনোহরের মাতাকে বলিল,—“কাজ শেষ ক’রে এসেছি বড়-মা ! লোকটার চেহারা তেমন ভাল নয়, কিন্তু ক্ষমতা একেবারে আশ্চর্য। আমি নিজে চোখে হোসেনের অদ্ভুত কাজ দেখে এসেছি।” নরেশ মনোহরের মাতাকে বড়-মা বলিত, তাহার জননী শৈশবেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মাতৃহারা যুবক নরেশ মনোহরের মাতার নিকট হইতেই মাতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। হাকিমের কার্যের বিস্ময়কর বিবরণ মনোহরের মাতার নিকট বর্ণনা করিয়া সে বলিল,—“হাকিম হোসেন মনোহরের চিকিৎসা করতে রাজী হয়েছে, তবে একটা কথা—”

উৎকণ্ঠিত ভাবে মনোহরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কথাটা আবার কি ?”

“লোকটা গোড়া বেঁধে কাজ করতে চায়। সে বলে মনোহর যদি জন্মান্ন হয় তা হ’লে স্বর্গের ধনস্তুরী স্বয়ং এসেও আর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবেনা।”

জননীর স্নেহ-করণ প্রাণ দমিয়া গেল। গভীর উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—“কিন্তু মনোহর ত জন্মান্ন !”

“হোসেন মনোহরকে দেখেনি বটে কিন্তু তার বিশ্বাস ও জন্মান্ন নয় ; জন্মের পর অন্ততঃ ঘণ্টা কতকও ওর দৃষ্টিশক্তি ছিল। সে বলে জন্মান্ন লোক স্ততকরা একজনও আছে কি না সন্দেহ।”

“কই বাবা আমার তা ত’ মনে হয় না। জন্মে অবধি অমনি দৃষ্টিহীন চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমিও বরাবর লক্ষ্য করেছি কিন্তু কখনও ওর দৃষ্টিশক্তি আছে ব’লে মনে হয়নি ত’।”

সে কথা এখন থাক। দেখাই যাক না একবার শেষ চেষ্টা করে। আমরা যখনই ডাকব তখনই সে আসবে বলেছে; তবে লোকটার পয়সার খাঁই কিছু বেশী। আগে বোধ হয় অনেক দিন দুঃখকষ্ট পেয়েছে, তাই পয়সাটা এখন চিনেছে ভাল।”

“তা হোক, বাছাকে আমার যদি সে ভাল ক’রে দিতে পারে তবে আমিও তাকে পরিতোষ করব,—আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে যদি সে মনোহরের চোখ ফিরিয়ে দিতে পারে তাতেও স্বীকার আছি আমি। তুমি বাবা অনেক করেছে, আর একবার দিল্লি গিয়ে লোকটাকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে এস।”

“তার জন্তে ভাববেন না। আমি আজই রাস্তিরের ট্রেনে চ’লে যাব।”

সেই দিবসই নরেশ দিল্লিযাত্রা করিল।

( ২ )

নরেশ যখন হাকিম হোসেনকে সঙ্গে লইয়া মনোহরের দিকট উপস্থিত হইল, মনোহর তখন একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল,—“আবার একজন এসেছেন? আমি মনে ক’রেছিলুম ডাক্তারের হাত এড়িয়েছি।”

নরেশ বলিল,—“ক্ষতি কি আর একবার চেষ্টা করতে? ফল কিছু না হ’লেও অনিষ্ট হবে না কোন, একথা নিশ্চয় জেনো।”

মনোহর আর কোন কথা কহিল না বা আপত্তি করিল না, নীরবে হোসেন সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

হোসেন প্রথম দর্শনেই বলিলেন,—“নরেশ বাবু! আশা আছে এখনো;—খুব সম্ভব আরাম হবেন।”

তাহার পর তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্বে একবার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। মনোহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার বোধ হয় বেশ মনে সাহস আছে?”

“কি রকম সাহস?”

“অর্থাৎ যাকে বলে সহ্যণ। মনে করুন যদি……”

“হ্যাঁ, তা আর বলতে হবে না। চিকিৎসায় কোন ফল না হ’লে আমি বিশেষ বিস্থিত হই না। তার কারণ আমি যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব এ দুঃখাকাজ্জ্বল কখনও মনে স্থান দিই না।”

“না, আপনি যে আরোগ্যলাভ করতে পারবেন না তা আমি বলছি না। তবে হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে নাও হ’তে পারে, তাই বলছি।”

“তার জন্য ভাববেন না, এমন আমায় অনেক বার সহ্য করতে হয়েছে। এতদিন যত ডাক্তার দেখেছেন সবাই নিরাশ হ’য়ে ফিরে গেছেন, কাজেই এ ব্যাপার আমার কাছে নতুন নয়।”

“বেশ। কিন্তু আমার একটু কথা আছে। আগে বেশ ক’রে বুঝে দেখুন, তার পর কাজ আরম্ভ করা যাবে। মনে করুন আপনি আরোগ্যলাভ করলেন, পৃথিবীর শোভা দেখলেন, লোক দেখলেন, জগতের সৌন্দর্যের এক অংশ দেখলেন, কিন্তু তার পরই আবার যে অন্ধ সেই অন্ধই হলেন; দৃষ্টিশক্তি কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক মিনিট পরেই আবার নিভে গেল। এরকম অবস্থায় আরাম হবার আর কোন আশাই থাকে না। একবার এসে যদি দৃষ্টিশক্তি চ’লে যায় তা হ’লে পীরেরও সাধা নেই তাকে ফিরিয়ে আনে।”

বহুক্ষণ ধরিয়া মনোহর নীরবে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—“তাতে আঘাতটা একটু বেশী লাগবে বটে। কিন্তু তা হোক।”

“ভেবে দেখুন, ভাল ক’রে ভেবে দেখুন, এ ক্ষণিক দৃষ্টিলাভের অর্থ কি! তার ফল কি হবে! আপনি এখন অন্ধ, পৃথিবীর সৌন্দর্য, রমণীর রূপ আপনি অনুভব করতে পাননি, কাজেই একরকম বেশ আছেন। কিন্তু সে সব একবার দেখার পর আবার যদি আপনি অন্ধ হন তখন অস্তুরে কতটা আঘাত লাগবে একবার বুঝুন। অনুশোচনায়, অনুতাপে, হৃদয় তখন পূর্ণ হ’য়ে উঠবে, অন্ধজীবনের ওপর তখন দারুণ ঘৃণা জন্মাবে, তাই বলছি আবার ভেবে দেখুন, হঠাৎ একটা কাজ ক’রে পরে তার জন্তে সারা জীবনটা বিসর্গ ক’রে তুলবেন না।”

“তা হোক আপনি যখন বলছেন আরোগ্য লাভের আশা আছে তখন আমি চিকিৎসা করাবই—তা ভবিষ্যতে যদি তার জন্মে দারুণ অমুতাপ করতে হয় তাও স্বীকার। এভাবে আর দিন কাটাতে পারি না!”

“হ্যাঁ, আপনার আরাম হবার আশা আছে—বিশেষ আশা আছে;—অন্ততঃ আমার অল্প বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি তাতে আমি কিরা ক’রে বলতে পারি আপনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তবে সেটা কতক্ষণ থাকবে তা বলতে পারি না। এখন আপনি যা বলেন।”

“আমার আর বলাবলি কিছু নেই, আপনি চিকিৎসা আরম্ভ করুন।”

সেই দিবস হইতেই হাকিম সাহেব চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনোহর একটা খন্ডকার কক্ষে বন্দী হইল; তাহার চক্ষের পল্লবের উপর ঔষধের প্রলেপ দিয়া পটি ঝাধিয়া দেওয়া হইল। অধিক বাক্যবায় বা কোন প্রকার ব্যায়াম করা নিষিদ্ধ হইল। বেচারা একেবারে বেকার ভাবে দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। সে যে আরোগ্য লাভ করিবে, এ কথা সে তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তবে মনের মধ্যে যে একটুও আশা হয় নাই এ কথাও বলা যায় না। আশা তাহার কানে কানে বলিয়া দিত,—“নিশ্চয়ই ভাল হবে তুমি! আমার কথা নিশ্চয় কর, কেন মিছে নিরাশ হচ্ছ; অবিশ্বাসকে জোর ক’রে মন থেকে তাড়িয়ে দাও;—আমি বলছি তুমি ভাল হবেই হবে!” মন সে কথা বিশ্বাস করিত না।

এমনি ভাবে প্রায় দুই মাস অতীত হইয়া গেল। হাকিম তাহারই বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে ছিলেন, অল্প কোথাও যাইতে পান নাই। নিত্যই তিনি মনোহরকে আশা দিতেন,—“আর কি, আপনার সময় ত হ’য়ে এসেছে, আর একটা মাস বই ত না; মনে জোর আনুন, বেশ উৎসাহে দিনগুলো কাটিয়ে দিন।”

চক্ষের পটি কিন্তু সেই প্রথম দিন হইতে আর খোলা হয় নাই। হাকিম বলিয়াছিলেন পূর্ণ তিন মাস সেটা এমনি ভাবে ঝাধা থাকিবে।

প্রথম প্রথম মনোহরের দিনগুলি বেশ নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইত; কিন্তু চক্ষু খুলিবার দিন যত নিকট হইতে

লাগিল তাহার চিন্তাও তত অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। “যদি না ভাল হই! যদি মিনিট কতক পরেই আবার অন্ধত্ব ফিরে আসে! হা ভগবান! একি করলে! হৃদয়ে বল দাও নাথ!”—এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার চিন্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

তখন চোখ খুলিবার আর পাঁচদিন মাত্র বাকী! সেদিন আর হাকিম সাহেব আসিলেন না। মনোহরের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। “তবে বোধ হয় কিছু মন্দই হয়েছে! চোখ বোধ হয় একেবারেই নষ্ট হ’য়ে গেল। হা ভগবান! কেন এ দুর্শ্রুতি দিলে আমায়! এ আমার কি হ’ল নাথ!”

দ্বিপ্রহরে নরেশ আসিয়া যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল তখন আকুল কণ্ঠে মনোহর তাহাকে একবার হাকিমের কক্ষে যাঠিতে বলিল।

নরেশ ফিরিয়া আসিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল,—“হাকিম হোসেন ঘরে নেই, তার জিনিষপত্রও কিছু নেই, একখান কেবল তোমার নামে চিঠি ছিল।”

মনোহর সাগ্রহে বলিল,—“পড় ত, পড় ত চিঠিখানা, কি লিখেছে শুনি।”

নরেশ পড়িতে লাগিল,—

মহাশয়

নসিবপুরের জমিদার মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমি এখনি তথায় যাইতে বাধ্য হইলাম। আপনি মনে করিবেন না। আপনাকে একবার বলিয়া গেলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। জমিদার মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের চক্ষে ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে;—সে রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি আমার আশাতীত পুরস্কার দিবেন লিখিয়াছেন—এ সুযোগ আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আপনার ভয় পাইবার বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; আমার যাহা করিবার তাহা ইতিপূর্বেই করিয়াছি; এখন আমার থাকায় না-থাকায় সমান। আপনার নসীবে থাকিলে ও খোদার মরজি হইলে উহাতেই আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন আর পাঁচ দিন পরে আপনার চোখের বন্ধন খুলিয়া

ফেলিবেন। ভাগ্যে যদি দৃষ্টিশক্তি লাভ লেখা থাকে তবে তখনই উহা লাভ করিবেন ; তবে আমার ভয় হয় শক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। সেই সময়ের জন্মই আমি বিশেষ চিন্তিত রহিলাম ; আবার দশ দিনের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব।

অনুগৃহীত—হোসেন আলি।

চিঠি শুনিয়া মনোহরের মনে আবার আশা হইল। তবে আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব ! তবু ভাল, আমি ত ভেবেছিলুম বুঝি আর চোখ আরাম হ'ল না ! আচ্ছা, যদি ঘণ্টা কতক পরেই আবার দৃষ্টিশক্তি চ'লে যায় ! ওঃ সে কি ভয়ানক, কি নিষ্ঠুর ! যাক সে কথা, তা ভেবে ত' কোন ফল নেই, মিথো মনে কষ্ট পাওয়া, যথ অদৃষ্টে আছে তা হবেই, আমি আর ভেবে কি ক'রব ?

( ৩ )

আজ মনোহর চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিবে। কিন্তু সে জন্ম বেচারার মনে একটুও উৎসাহ ছিল না, বরং কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার সারা হৃদয়টা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সে চেষ্টা করিয়াও বন্ধন খুলিতে পারিল না। এই সৌন্দর্যাময় জগৎ প্রথম দর্শন করিয়া সে কি ভাবে আশ্চর্য করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাহার আরও ভয় হইল চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া যদি দেখে যে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই আসে নাই তবে..... তবে কি হ'বে.....

মনোহরের পাশ্বে তাহার জননী ভুবনমোহিনী এবং ভগ্নী লীলা উৎকর্ষার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনোহরের এই বিলম্ব তাহারা আর সহ করিতে পারিতেছিলেন না।

“না মা ! আমার সাহস হ'ছে না—কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না ; বড় ভয় করছে ! আঃ কি ককাজই করেছি ! লোকটাকে চিকিৎসা করতে না দিলেই হ'ত ভাল, এত ঝগাট ভোগ করতে হ'ত না। কি যে দুর্ঘটনা হ'ল তখন ! বেশ সুখে ছিলাম আগে—মনে বেশ শান্তি ছিল,—কিন্তু এখন এই এত কাণ্ডের পরও যদি

চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের যবনিকা ধ'সে না যায় তা' হ'লে আর জন্মে যে সে শান্তি পাবনা।

“আরও ভয়ের কারণ কি জান ? এই তোমরা,— তুমি আর লীলা ! আমার কথার মানে বুঝতে পারছনা ? তা কি ক'রেই বা পারবে ? কত দিন তোমরা পাখী, ফুল, নানারঙ, কত সচল পদার্থ, শিশু, সূর্য্য চন্দ্র তারা, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতির কথা ব'লে আমার মনকে প্রলুব্ধ করেছ। এখনও আমি আমার পুরাতন বন্ধু সমুদ্রের গর্জন শুনেতে পাচ্ছি,—তার গন্ধ ভেসে আসচে.....সমুদ্র দেখে কিন্তু আমি কখনও আশ্চর্য্য হব না.....কিন্তু মা, ভাব দেখি .....হয়ত—হয়ত এসব দেখে আমি আশ্চর্য্য করতে পারব না.....কিন্তু যদি পারি তা আমি একা থেকেই পারব—তোমরা থাকলে হয়ত হবে না !”

“তুমি একা থাকবে মনু ?”

“আশ্চর্য্য হচ্ছ ? ভগবানের পূজার সময় একাই ত' থাকি উচিত ! আমার তাই ভাগ্যলিপি.....একাই আমি সে বিধিলিপি ভোগ করব। তোমরা এখন বাইরে যাও। তা নইলে হয়ত আমি চোখ খুলতেই পারব না !”

জননী ও লীলা বহু অনুনয় বিনয় ও মান অভিমান করিয়াও যখন তাহার নিষ্ঠুর সংকল্প দূর করিতে পারিলেন না তখন অগত্যা বাহিরে গমন করিলেন।

মনোহর দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিল,—“আমি তোমাদের স্নেহকরণ মুখ দেখবার মত মনকে সবল না ক'রে দোর খুলব না। তোমরা কিন্তু আমি না বললে এস না। জোর ক'রে যেন দোর খুলতে চেষ্টা কর' না ! আচ্ছা রোস, আমি চাবি দিয়ে সে পথ বন্ধ করছি। আর একটু সবুর কর—আচ্ছা ভাবাদিকি আমি কতদিন কি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করেছি ! তোমরা এইটুকু ধৈর্য্য ধরতে পারছ না ?”

মাতা একবার শেষ অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—“কিন্তু মনু !.....”

“না মা ! আর কিন্তু নয় ! এতে একটুও কিন্তু নেই !”—তাহার স্বরই দৃঢ়তা ছিল। অগত্যা জননী নিরস্ত হইলেন। মনোহর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। যাইবার

সময় আবার বলিল,—“মনে থাকে যেন না ডাকলে এস না।”

শেষে যখন মনোহর আপন ঈপ্সিত নির্জনতা পাইল তখন সে একবার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একি হাত এরূপ কাঁপে কেন! তাহার মনের মধ্যে একটা কি অনিশ্চিত ভয় আসিয়া দেখা দিল;—যতই বিলম্ব হইতে লাগিল সেও তত অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে আতি সন্তপণে চক্ষুর বন্ধন মুক্ত করিয়া ফেলিল!

বিশ্বয়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি তাহার অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। ঐ যে সে দেখিতে পাইতেছে!

নয়ন-পল্লবে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কি! স্বাভাবিক ভাবেই তাহা উঠানামা করিতে লাগিল। তাহার নয়ন-সমক্ষে স্বপ্নের ছবির মত অস্পষ্ট কি কতক-গুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; ক্রমে সেগুলি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ঐযে ওটা কি? সমুদ্রের একটা ক্ষুদ্র চেউয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিশ্বয়বিমুক্ত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে বিশ্বয় ভয়ে পরিণত হইল। তাহািত এ আবার কি?

ক্রমে উত্তরোত্তর সে ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সে-গৃহে আর একা থাকিতে তাহার সাহস হইল না। মনে করিল ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে,—তখনি ছুটিল; কিন্তু যায় কোথা? দ্বার কোথায় তাহা সে স্থির করিতে পারিল না! কি করিয়া স্থির করিবে? দ্বারের আকার ত' সে কখনও দেখে নাই! ভয়ে তাহার সর্ব শরীর অবশ হইয়া আসিল; আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে না পারিয়া নিকটেই একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া মাতা ও লীলাকে ডাকে। তাহার আসিয়া দ্বার ঠেলিলেই কোনটা দ্বার তাহা সে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু দৈব তাহাকে সে কার্যও করিতে দিল না। ভয়ে সে এতদূর অভিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে, ‘বছ চেষ্টা’ করিয়াও কথা কহিতে পারিলনা। কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া

বসিয়াছিল। অগত্যা বেচারী চেয়ারে বসিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

অদূরে সমুদ্রের উপর পালভরে একখানি নৌকা যাইতেছিল, বিশ্বয়-মুক্ত মনোহর সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ওটা আবার কি? যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে! তবে ঐ বুঝি পাখী? তাই হবে! কিন্তু তাহা হইলে সাদা মত ওটা কি উহার দেহের সহিত লগ্ন রহিয়াছে? পূর্বে সে পুস্তকে নৌকার বিবরণ বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু এক্ষণে তাহা চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

পার্শ্বে একখানি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল। সমুদ্রের চঞ্চলবায়ু চুপি চুপি চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানি নাড়িয়া দিয়া গেল। বিস্মিত মনোহর তাহাকে মানব বলিয়া ভ্রম করিয়া চমকিয়া উঠিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁচিমালা বায়ুবিক্ষুব্ধ হইয়া বেলাভূমে গীতের মূর্ছনার গায় করুণ আর্তনাদ করিয়া আসিয়া পড়িতেছিল; সেই চিরপরিচিত শব্দে চক্ষু তুলিয়া মনোহর আবালা-স্বহৃদ সমুদ্রকে দেখিল—চিনিল! কিন্তু এইখানে সে আবার একটু গোলে পড়িল। যতদূর দৃষ্টি চলে নীল সমুদ্র কেবল অসীম বলিয়াই মনে হয়; ক্রমে তাহা চক্রবাল রেখার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। মনোহর ভাবিল,—“তবে কি উচ্চের ঐ নীল অংশও সমুদ্র?” সে কখনও আকাশ দেখে নাই; কাজেই আকাশকেও সমুদ্র বলিয়া ভ্রম করিল।

বেলাভূমের উপর দিয়া অর্ধনয়ন একটা শিশু ছুটিয়া গেল। মনোহর তাহা কি হইতে পারে তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। তবে কি ঐ মানুষ নাকি? আবার তাহার সারা দেহখানি কাঁপিয়া উঠিল।

এই ভাবে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

শ্বেহ-ব্যাকুল জননীর আর ধৈর্য্য রহিল না; তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন; চকিত দৃষ্টিতে মনোহর দ্বার দেখিয়া লইল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আবার তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন মনোহর বলিল,—“এখন না; আমি ভাল হয়েছি—বেশ দেখতে পাচ্ছি সব!”



জননী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—“তবু এখনো দোর খুলবি না?”

মনোহর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু অধিক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ভূমে পড়িয়া গেল। অগত্যা হস্ত পদে ভর দিয়া অতিকষ্টে পুনরায় গিয়া চেয়ারে বসিল।

ক্রমে আরও দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্নেহবাকুল জননী আরও দুইবার আসিয়াছিলেন কিন্তু মনোহর দ্বার খুলে নাই; অবশেষে তাঁহার আগ্রহ-তিশয়া দেখিয়া সে বলিল,—“এবারে যখন আসবে সেই সময় দোর খুলব!”

আবার সে আকাশ ও সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একি? ক্রমে যে সব অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে! সমুদ্রের সে নীলবর্ণ যে কালো হইয়া যাইতেছে! তবে একি হইল? তবে.....তবে বুঝি!

সে আর ভাবিতে পারিল না, অজ্ঞাত ভ্রাসে তাহার সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মনে পড়িল হাকিম বলিয়া গিয়াছে,—দৃষ্টিশক্তি হয়ত ঘণ্টাকতক পরেই চলিয়া যাইবে! সে মনে করিল তবে বুঝি আবার তাহার পূর্ব অন্ধত্ব ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে! তাহার মনে হইল,—এখন যদি আবার দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায় তাহা হইলে আর বাঁচিব না—বাঁচিলেও মনে একটুও শাস্তি থাকিবে না! হায় হায়! কেন এ দুঃস্বপ্ন করিল সে! ইহার অপেক্ষা যে তাহার অন্ধজীবন শতগুণে ভাল ছিল!

ক্রমেই তাহার নয়নের সমক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। নিরাশায় তাহার সারা প্রাণখানি ভরিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। মস্তকপিড়িত মনোহর দুই হস্তে বন্ধ চাপিয়া ধরিয়া পাগলের ঞ্চায় দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। করুণ আর্তনাদে সারা বাটীখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া সে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূ-লুপ্ত হইল।

যখন পুনরায় তাহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইল বুঝি সে পৃথিবী ছাড়িয়া পরলোকের নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

কারণ তখন সে চতুর্দিকের বস্তুগুলি বেশ স্পষ্ট পৃথকিত হইতেছিল। গৃহের বায়ুর মধ্যে একটা কিসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখের উপর একখানি স্নেহবাকুল মুখ বাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মনোহরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই তাঁহার স্নেহময়ী জননী!

“মহু! দেখতে পাচ্ছিস?”

“হ্যাঁ; এখন যে ম'রে গোছ, এখন আর দেখতে পাব না!”

জননী স্নেহে পুত্রের কপোল চূদন করিয়া কহিলেন,—“বানাই, মরবি কেনরে পাগলা! আগে যেখানে ছিল এখনো সেই পৃথিবীতেই আছিস! শোন শোন, আগে আমায় বলতে দে, তার পর তুই বা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করিস। এখন সেই পৃথিবীতেই আছিস—বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিস; শুধু আমাদের দৌমেই তুই আজ এই কষ্টটা পেলি; তা বাবা কি ক'রে জানব বল.....”

“জ্যাস্ত বেলায় ক্ষণিকের জ্ঞে মনে হয়েছিল যেন দেখতে পাচ্ছি তার পরই আবার অন্ধত্ব ফিরে এল।”

“ওরে পাগল না না, এখনো তোর দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে।”

ঠিক সেই সময়ে নরেশ আসিয়া বলিল,—“আর আজীবন তা থাকবেও।”

“হ্যাঁ;—আর তোর দৃষ্টিশক্তি যাবে না। তুই যাকে অন্ধত্ব মনে করেছিলি সে অন্ধত্ব নয়, সন্ধার অন্ধকার। রোজ সেই সময় একটু একটু ক'রে দিনের আলো নিভতে থাকে, তার পর রাত্রি আসে, বুঝেছিস পাগল!”

কিন্তু বহুকণ তর্ক চলিলেও মনোহর সে দিন আর কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।\*

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

\* একটি ইংরেজি গল্প অবলম্বনে।

## জরি শল্মা-চুমকি মঞ্জিলা

জরি-শিল্পের সৃষ্টি ঠিক কোন সময়ে হইয়াছে তাহা নির্দেশ করা কঠিন হইলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উহার প্রচলন ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, বিবাহের সময়ে সীতাদেবী জরিয়ুক্ত গোলাপী রঙের একখানি শাড়ী পরিয়াছিলেন। মিশর দেশের সুরক্ষিত শব্দগুলিকে 'সপুরট' পরিচ্ছদে আবৃত করা হইত এবং টয়নগর অবরোধের সময়েও এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।



জরির তার তৈরী করিবার যন্ত্র বা যন্ত্রী—পৈরা ও পৈরী

মূল জরি-শিল্পের প্রাচীনত্বের দাবী-সমর্থন-পক্ষে উক্তরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও, উহার অন্তর্গত শল্মা, চুমকি ও মঞ্জিলা কাণ্ড সূদূর অতীতে প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতে ইহার প্রচলন মুসলমানদের আমদল হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভারতের যে-সকল নগর বিভিন্ন

সময়ে মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল এই শিল্পের কাণ্ডা সেই-সকল স্থানেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান কারিগরই ইহার পরিচালক—মুসলমান যুগের সহিত এই শিল্পের সুদৃষ্টি নির্ণয়ের ইহাও একটা কারণ বটে।

পাটনা ও কলিকাতা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইয়াকুব বা জ্যাকবের পুত্র যুসুফ বা জোসেফ এই শিল্পের আবিষ্কর্তা। জোসেফ স্বয়ং অবসরমত রুমালের উপর এই শিল্পের চর্চা করিতেন। এই প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি এ দেশের

জরি-ব্যবসায়ীগণ মুসলমান বর্ষের শেষ বৃধবাস জোসেফের উদ্দেশে নিয়াজ অর্থাৎ পূজা দিয়া থাকে; এবং অগ্রে ঐরূপ পূজার অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ এই শিল্প-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না।

শল্মা চুমকি ও মঞ্জিলা কাণ্ডে তেমন বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। এই কার্যের প্রধান যে অঙ্গ তাহা কারিগরের হাতের কৌশলেই সম্পন্ন হয়। তার উপর সাধারণ একটা টেবিল, গোটা দুই টেকুয়া, একটা চরকা, ছোট একটা হাতুড়ী, একখানা কাঁচি, একটা ছোট চিমটা, একটা নেহাই, দুচার টুকরা লোহা ইত্যাদি সামান্য রকমের কয়েকটা উপকরণ হইলেই যথেষ্ট।

মঞ্জিলা সাদা ও হল্‌দে এই দুই রকমের হয়। সাদা মঞ্জিলা রৌপ্যানির্মিত এবং হল্‌দে মঞ্জিলা রূপার উপর সোনার গিল্‌টী-করা। সময়ে সময়ে দস্তার তারের উপর রূপার হল করিয়াও সাদা মঞ্জিলা তৈরী করা হয়

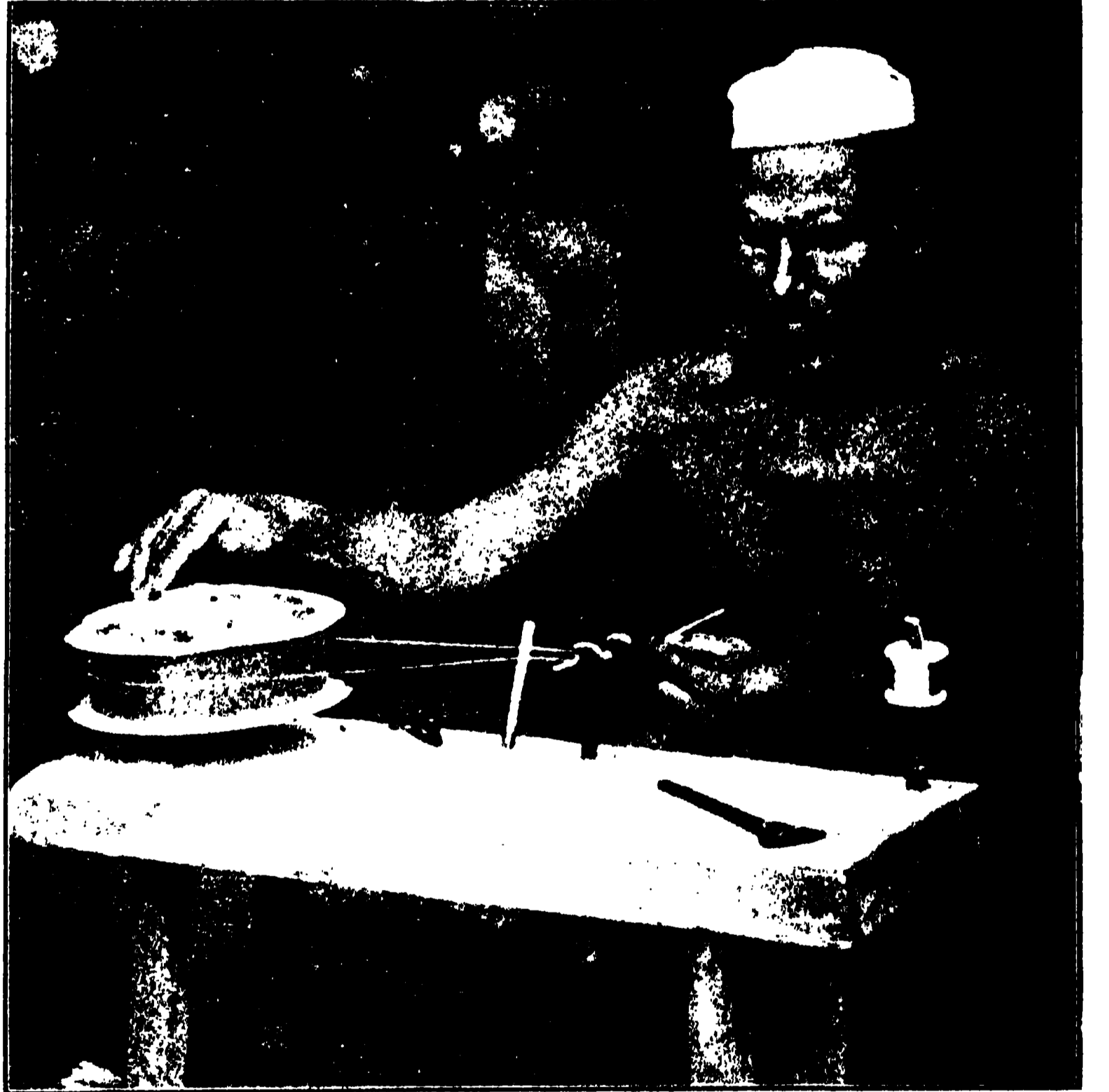
এই শ্রেণীর মঞ্জিলাকে বুটা এবং বিশুদ্ধ রৌপ্য মঞ্জিলাকে সাঁচ্চা পর্যায়ে অভিহিত করা হয়।

রূপার তারের উপর সোনার গিল্‌টী করার প্রক্রিয়া এইরূপ :—৪০ হইতে ৬০ তোলা পর্যন্ত ওজনের রূপা গলাইয়া একটা ছাঁচে ঢালিতে হয়। ঐ ছাঁচটী সরু শলাকার ঝায় এবং উহার একদিক মোমবাতির অগ্র-

ভাগের ঝায় শুষ্কাকৃতি। গলিত রৌপ্য ইহার মধ্যে জমিয়া শুষ্ক শলাকার অবয়ব ধারণ করে। এই শলাকার গায়ে অতি পাতলা সোনার পাত মুড়িয়া উহাকে রেশমী সূতায় আবৃত করিয়া অগ্নির উপর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলেই সোনার পাত রূপার গায়ে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়া গিল্টির কার্য করে। সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৬০ তোলা পর্য্যন্ত রূপা গিল্টি করিবার জন্য দশবার আনা সোনার প্রয়োজন হয়। সোনার পরিমাণ ইহার কম-বেশী হইলে গিল্টির রংও তদনুসারে পরিবর্তিত হইবে।

গিল্টি করিবার জন্য রৌপ্যানিশ্চিত যে শলাকাটা ছাঁচে প্রস্তুত করিতে হয়, মঞ্জিলা মূল উপদানই তাহা। এই শলাকাটিকে পাসা বা কাঁদলা বলে এবং যাহারা কাঁদলা তৈরী করে তাহাদের নাম কাঁদলা-কশ। সাদা মঞ্জিলা, সাঁচা বা বুটা কাঁদলার রূপান্তর, এবং হলুদে মঞ্জিলা মূল সোনার-গিল্টি-করা কাঁদলা। মঞ্জিলা প্রস্তুত করিবার পূর্বে ঘাওয়া নামক একটা যন্ত্রের সাহায্যে ইম্পাত-নিশ্চিত পাত্র-বিশেষের গাত্রস্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ছিদ্রের মধ্য দিয়া পর্য্যায়ক্রমে পরিচালনা করিয়া কাঁদলাটিকে যথেষ্ট সফল করিয়া লইতে হয়। অতঃপর ইহার রিল-সূতার টেকুয়ার ঝায় একটা টেকুয়া গায়ে জড়ানো হয়। এই টেকুয়াটা ফুটখানেক উচ্চ একটা টেবিলের এক প্রান্তে সংলগ্ন থাকে। ইহার বিপরীত প্রান্তে লোহার-হাতলযুক্ত আর একটা বড় টেকুয়া অরুস্থিত থাকে। এই টেকুয়া দুইটির বৃত্ত যথাক্রমে তিন ও ছয় ইঞ্চি এবং ইহার পৈরী ও পৈরা নামে পরিচিত। পৈরী ও পৈরার ব্যবধান-পথের মধ্যদেশে টেবিলের উপর খাঁজের মধ্যে বসানো ইম্পাতনিশ্চিত একটা পাত্র থাকে, উহাকে যন্ত্র বা যন্ত্রী বলে।

এই যন্ত্রটির গায়ে ক্ষুদ্র রূহৎ নানা পরিসরের কতকগুলি ছিদ্র আছে। পৈরীর গায়ে জড়ানো কাঁদলাকে মঞ্জিলা আকারে পরিবর্তিত করিবার সময়ে উহার এক প্রান্ত এই ছিদ্রগুলির কোনটির মধ্য দিয়া প্রসারিত করিয়া লইয়া পৈরার উর্দ্ধভাগে ঝাটিয়া দিতে হয়। পরে পৈরার হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে উহা যেমন পৈরীর গায়ের পাঁচ খুলিয়া পৈরার গায়ে জড়াইতে থাকে, তেমনি যন্ত্রের যে ছিদ্র দিয়া উহা বিসর্পিত হয় তদনুরূপ পরিসরের মঞ্জিলা রূপ



কোরা শলা প্রস্তুতের যন্ত্র ও প্রণালী।

ধারণ করে। সূক্ষ্মতম মঞ্জিলা প্রস্তুত করিবার সময়ে ঐ কাঁদলাকে পর্য্যায়ক্রমে যন্ত্রের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ছিদ্র-মুখে গলাইয়া আনিতে হয়। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে চাপ দিয়া চুলের ঝায় সূক্ষ্মতম মঞ্জিলাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন যন্ত্রের ছিদ্র-পথের চাপে উহা শঙ্ক হইয়া উঠে, অন্যদিকে উহার ঔজ্জ্বল্যও অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।



দোব্কা শম্মা বা বাদলা বা লামেটা এবং চুম্বকি প্রস্তুত-প্রণালী।

সাধারণতঃ এক তোলা ওজনের ধাতুনির্মিত কাঁদলা দ্বারা মোটা ৬০০ গজ ও সরু ১২০০ গজ লম্বা মঞ্জিলা প্রস্তুত হইতে পারে। যাহারা এই তারতৈরী করে তাহা-দিগকে 'তারকীশ' (ফার্সী তার, কশীদন-টানা) বলে।

পূর্বে এ দেশের সমস্ত কারিগরই মঞ্জিলা তৈরীর জন্ত দেশী যন্ত্র ব্যবহার করিত। অদ্যাপি কলিকাতায় উহারই প্রচলন আছে। কিন্তু পাটনা সহরে উহার বদলে 'বিলাতী' যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতী যন্ত্র টাকার ঝায় পুরু এবং এক ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ইহার গাত্রস্থ ছিদ্রগুলি উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতররূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। ইহা দেখিতে

একটু সুন্দর এবং ইহার বহির্ভাগ সোনার হালকরা। এই বাহ্যিক চাকচিক্যই মুগ্ধ হইয়া দরিদ্র শিল্পীগণ ঘরের টাকা পরের পায়ে বিলাইয়া দিতে ব্যস্ত, অথচ ইহাদের ঘরের জিনিস কার্যকারিতায় ইহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে এবং দামেও অনেক সস্তা।

শম্মা মঞ্জিলার সংস্করণ-বিশেষ। মঞ্জিলার ঝায় ইহার রংও সাদা ও হাল্ধে হইয়া থাকে। অধিকন্তু পাকানো পাকানো গোল মঞ্জিলা দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহার নাম হয় কোরা শম্মা, এবং চ্যাপ্টা মঞ্জিলা দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহাকে দোব্কা শম্মা বলে।

কোরা শম্মা প্রস্তুতের জন্ত যেসকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তন্মধ্যে একটি চাকা ও লৌহনির্মিত গোল চরকা প্রধান। চাকাটি একটি টেবিলের এক প্রান্তে এবং চরকাটি তৎসন্নিকটে সংস্থিত থাকে। চাকাটির কিঞ্চিৎ দূরে দুইটা ডাঙার মাথায়, ছিদ্রমধ্যে, একটি লৌহশলাকা আড় করিয়া রাখা হয় এবং তাহার সহিত একটি সরু বাঁশ বাঁধিয়া চরকার একাংশের সহিত একগাছা সূতা গাঁটিয়া চাকাটির সংযোগ বিধান করা হয়। যে মঞ্জিলা হইতে শম্মা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা চাকাটির বিপরীত দিকে টেবিলের অপর প্রান্তে একটি রিল-টেকুয়ার গায়ে জড়ানো এবং উহার এক মুখ চরকার সহিত সংযুক্ত থাকে। শম্মা তৈরী

করিবার সময়ে শুধু চাকাটি ধরিয়া ঘুরাইলেই উহার বেগে লৌহশলাকাটি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চরকাটিও ঘুরিতে থাকে। উহার টানে রিল-টেকুয়ার গাত্রস্থ মঞ্জিলা খুলিয়া গিয়া চরকার গায়ে জড়াইয়া গিয়া কোরা শম্মার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন আকারের শম্মা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেক রকম কাজের জন্ত এক-একটি বিভিন্ন নম্বার চরকা ব্যবহার করিতে হয়।

দোব্কা শম্মার প্রস্তুতপ্রণালী কোরা শম্মারই অনুরূপ। তবে কোরা শম্মা তৈরীর সময়ে যেমন গোল মঞ্জিলার আবশ্যক হয়, ইহার জন্ত তেমনি চ্যাপ্টা মঞ্জিলা ব্যবহার করিতে হয়। চ্যাপ্টা মঞ্জিলা বাদলা হইতে

সৃষ্ট এবং বাদলাও সাধারণ মঞ্জিলার উপাদানে প্রস্তুত। দুই তিনটি ছিদ্রবিশিষ্ট লৌহময় ডালাবিশেষের ছিদ্রপথে সাধারণ মঞ্জিকা গলাইয়া আনিয়া তৎসম্মুখস্থ মসৃণ নেহাইর উপর হাতুড়ি দ্বারা উহা পিটাইলেই বাদলা প্রস্তুত হয়। ছিদ্রযুখে গলাইবার সময় একদিকে যেমন কারিগরগণ ক্ষিপ্ৰভাবে তারের মুখ পিটাইয়া চ্যাপ্টা করে, অন্যদিকে বায়ু হাতের অঙ্গুলী দ্বারা ঐ তার সূচারূপে চালনা করিতেও থাকে। ক্ষিপ্ৰতার সহিত তার সরাইয়া সরাইয়া দিলেও এমন হিসাব করিয়া সরায় যাহাতে তারের সরীনা অংশের সমস্তটাই হাতুড়ির এক আঘাতে চ্যাপ্টা হইয়া যায়।

দেওয়ালী, কাশর ও কামদানী, এই তিন পুৰ্য্যায়ে বাদলা বিভক্ত। দেওয়ালী বাদলা অপেক্ষাকৃত একটু চ্যাপ্টা রকমের, কিন্তু কাশর সরু ও হালকা। কামদানী বাদলা সূতী বা রেশমী কাপড়ের উপর কারচুবির কার্যে ব্যবহৃত হয়।

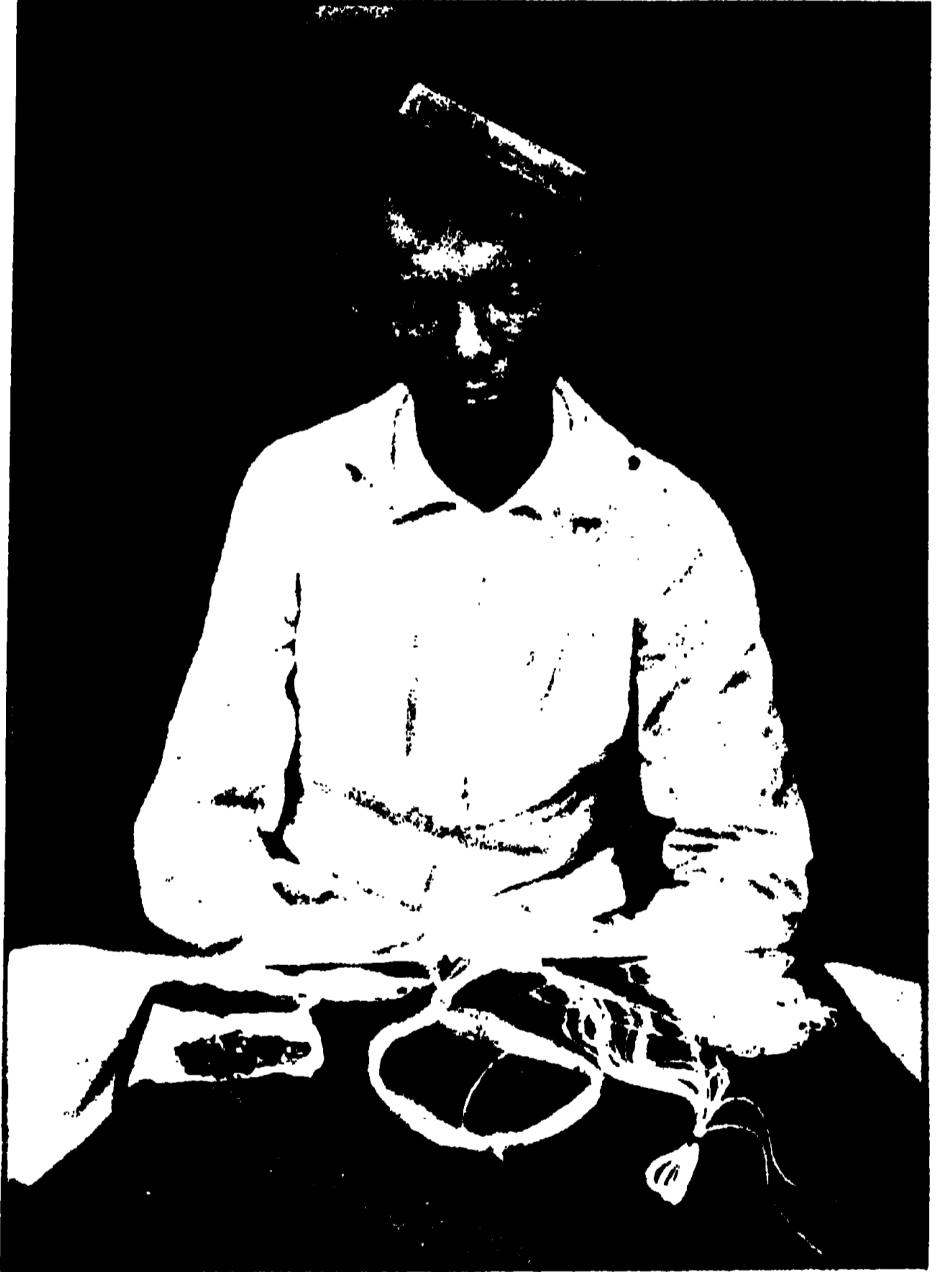
দোব্কা শল্মা ব্যতীত, কাঙ্কনী বা মোতি তার, কল্লাবাতুন ও সোনা রূপার খাল প্রস্তুতের নিমিত্তও বাদলার আবশ্যক হয়।

কাঙ্কনীর প্রস্তুত-প্রণালী কোরা শল্মার ন্যায়। তবে ইহার জন্ত যে চরকার আবশ্যক হয় তাহা কোরা শল্মার চরকার ন্যায় গোল না হইয়া নাটুয়ার ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি বা সমকোণ হওয়ার প্রয়োজন। সোনারূপার খালের কার্যে সূজাকৃতি বাদলা লাগে। এইরূপ বাদলা তৈরীর জন্ত যন্ত্রের ছিদ্র মধ্যে একগাছি গোল মঞ্জিলা আঁটিয়া রাখিয়া পরে তন্মধ্য দিয়া বাদলার উপাদান সাধারণ মঞ্জিলা গলাইয়া আনিতে হয়; তাহাতে এই মঞ্জিলার একদিক চাপ পাইয়া অর্ধচন্দ্রাকার হইয়া উঠে। এইরূপ অর্ধচন্দ্রাকার মঞ্জিলা দ্বারাই সোনারূপার খাল তৈরী হয়।

রেশমী সূতার সহিত সোনা বা রূপার তার জড়াইয়া কল্লাবাতুন তৈরী হয়। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নরূপ :—

প্রথমতঃ রেশমী সূতা সামান্য রকম একটু পাকাইয়া লইতে হয়। পরে উহা চরকায় জড়াইয়া উহার এক

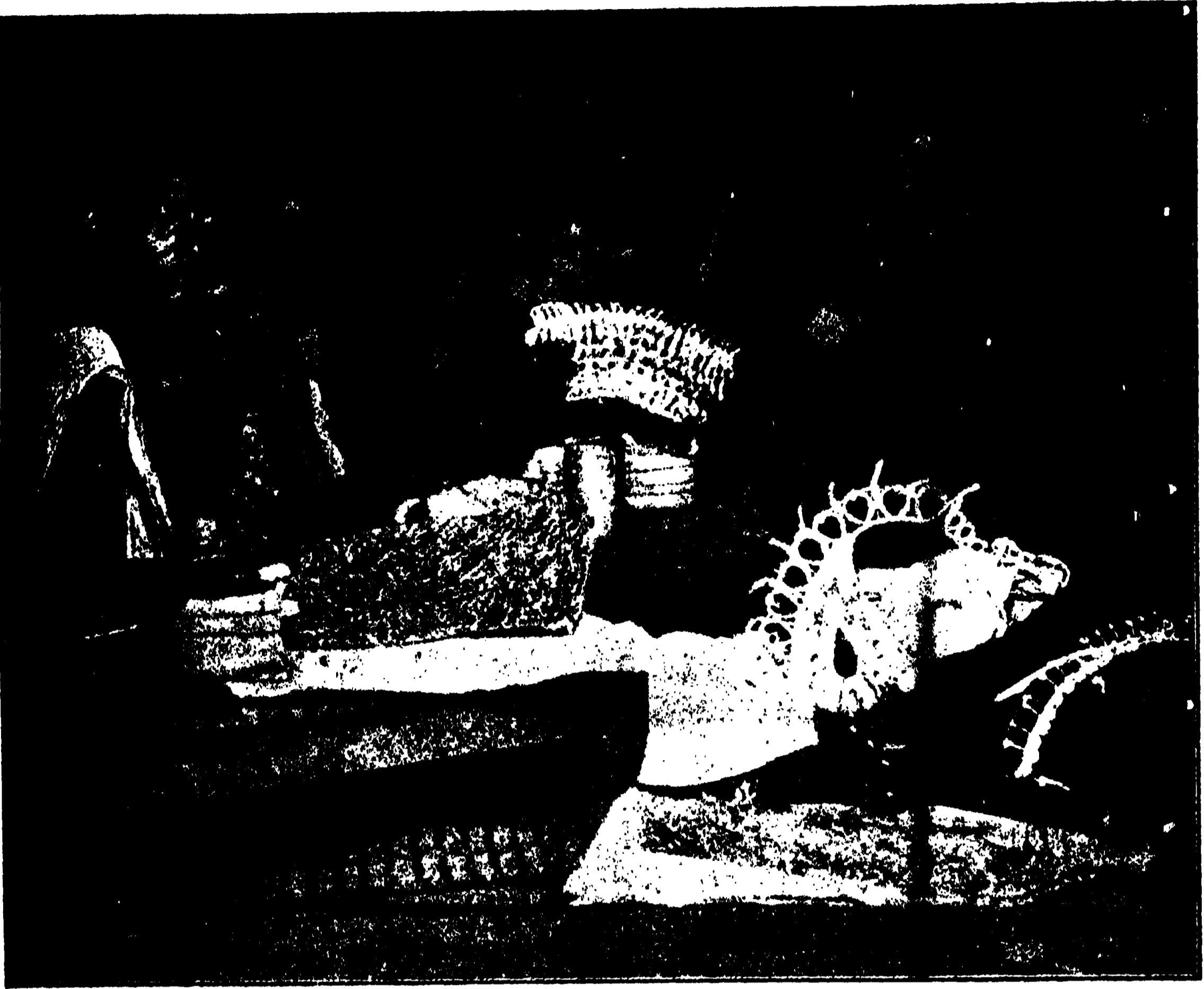
প্রান্ত কড়িকাঠে সংলগ্ন আংটার মধ্য দিয়া আনিয়া একটা টেকুয়ার সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। ঐ অবস্থায় টেকুয়াটা হাঁটুর উপর রাখিয়া পাক দিলে উহার সহিত সংলগ্ন সূতায় যেমন পাক পড়িতে থাকে, তেমনি সল্লিকটস্থ আর একটা চরকায় জড়ানো সোনা বা রূপার মঞ্জিলার একদিক উহার নিম্নভাগে লাগাইয়া ধরিলে তাহাও উহার সহিত পাক পাইয়া জড়াইয়া পড়ে। এই কার্যের



কল্লাবাতুন বা জরি-জড়িত রেশম।

সময়ে মঞ্জিলা আঙ্গাভাবে ছাড়িয়া না দিয়া হাত দিয়া উঁচু করিয়া রেশমী সূতার গায়ে লাগাইয়া ধরা দরকার। কারিগরগণ এই উভয় কার্য এক সময়ে দুই হাতে অতি দ্রুতভাবে করিতে থাকে। এবং এক পাকে যতটা কল্লাবাতুন তৈরী হয় তাহা টেকুয়ার এক অংশে জড়াইয়া রাখিয়া পরে আবার কার্যে প্রস্তুত হয়।

সোনা বা রূপার তারের আংটা হইতে চুমকি প্রস্তুত



প্রতিমার ডাকের সাজ তৈরী।

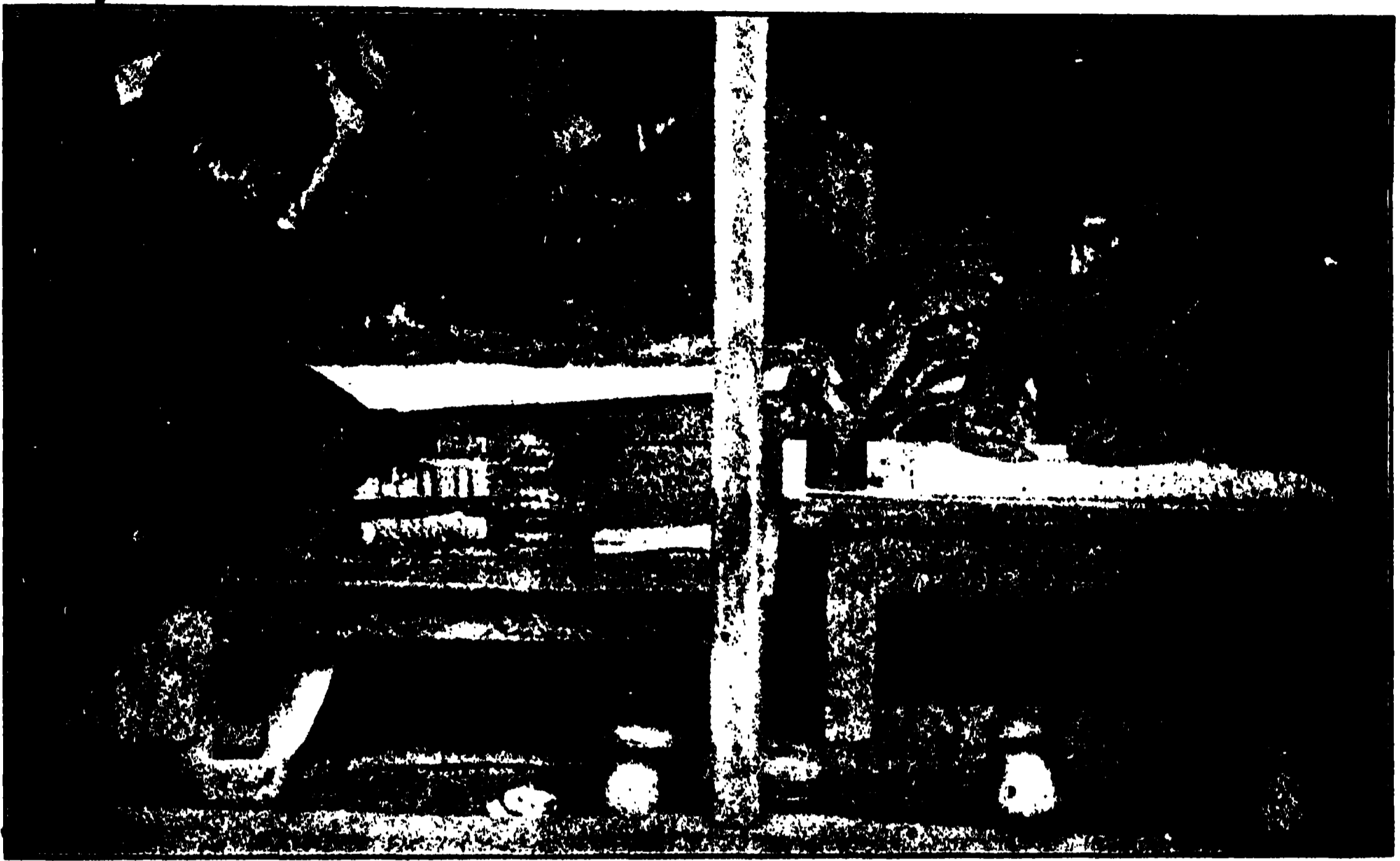
হয়। এক ইঞ্চির বারো বা ষোল ভাগ আকারের গোল একটা লৌহশলাকার গায়ে সোনা বা রূপার তার জড়াইয়া রাখিলে উহা লক্ষমান ক্ষুদ্র আংটিশ্রেণীতে পরিণত হয়। এই আংটিগুলির এক একটা কাঁচি দ্বারা কাটিয়া পৃথক করিয়া চিমটার সাহায্যে নেহাইর উপর ফেলিয়া হাতুড়ি-পেটা করিলেই চুমকি প্রস্তুত হইল।

শঙ্খা, চুমকি ও মঞ্জিলা পূর্বে এদেশের অনেক কাজে লাগিত। প্রতিমার ডাকের সাজ, হাতীঘোড়ার জিন, বুল, সাজ প্রভৃতি তৈরীর জন্ত এবং ধনীলোকের ব্যবহার্য জুতা, টুপী, পাগ, পোষাক পরিচ্ছদে এবং রেশমী ও পশমী বস্ত্রে নানাবিধ কারচুবি করিবার নিমিত্ত সর্বত্রই ইহার অবাধ প্রচলন ছিল। ঐসকল কার্যে অত্য়পি উহার ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে যাত্রা-থিয়েটারের পোষাক ও নাচওয়ালীর সাজসজ্জা প্রস্তুতের নিমিত্ত ইহার পসার স্থলবিশেষে কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিও পাইয়াছে।

এদেশে ডাকের সাজের প্রচলন কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই। তবে দুই শতাব্দীর পূর্বেও যে ইহার ব্যবহার ছিল, প্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের একটি সঙ্গীত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সঙ্গীতে ঋষি মহামায়ার বিশ্ব-মাতৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে 'তুচ্ছ ডাকের সাজে' সাজাইতে নিষেধ করিতেছেন।

পূর্বে এই ডাকের সাজ প্রস্তুত করা মালাকরণের জাতীয় ব্যবসায় ছিল। অধুনা উহা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সর্বসম্প্রদায়েরই অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার কুমারটুলী ও মেছুয়াবাজার মহলায় ডাকের সাজের অনেকগুলি কারখানা ও ভবানীপুরেও একখানি দোকান আছে। এই-সকল কারখানায় প্রায় ১২৫ জন পুরুষ ও ৩০০ স্ত্রীলোক কাজ করে। এই কার্যে ইহাদের প্রত্যেকের আয় মন্দা বাজারেও দৈনিক



প্রতিমার ডাকের সাজ তৈরী।

চারি পাঁচ আনার কম নহে; পূজার সময়ে ঐ আয়ের পরিমাণ দশ বারো আনাও হয়। যে-সকল স্ত্রীলোক এই কার্যা করে তাহারা অধিকাংশই মধ্যশ্রেণীর হিন্দু। ইহারা ঘরে বসিয়া অবসরমত ইহার কোন কোন অংশের কায্য করিয়া বেশ ছুপয়সা রোজগার করে। কোন কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোকের পক্ষে এই কার্যই উপজীবিকার মূল। তাহারা ইহার সাধারণ অংশের কায্য করিয়া প্রত্যহ দেড় হইতে আড়াই আনা পর্যন্ত উপার্জন করে।

ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও সেরপুরেও ডাকের সাজের উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

প্রতিমার কাঠাম সাজাইবার সরঞ্জাম—গস্তীরা, লপট ও কল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট, আঁচলা, বাজু, হার, তাবিজ, কঙ্কণ প্রভৃতি প্রতিমার অঙ্গের যাবতীয় ভূষণ ডাকের সাজের অন্তর্ভুক্ত। মুকুট, আঁচলা ও অলঙ্কারাদি প্রতিমার আকারানুযায়ী বিভিন্ন মাপের, এবং গস্তীরা, কল্লা প্রভৃতি ১২।১৪ ইঞ্চি চওড়া করিয়া তৈরী হয়। নানারূপ চিত্রের ছাঁচে রাঙের পাত ফেলিয়া চাপ দিয়া কল্লা ও গস্তীরা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ গস্তীরা হইতে কল্লার উপর কারুকার্য অনেক বেশী থাকে।

মোম ও গন্ধবিরজার সহযোগে উৎপন্ন একপ্রকার

লেই দিয়া কাপ, আংটা, রাং, চুমকি, জামিরা, বিছাচাকী বসাইয়া আঁচলা প্রস্তুত হয়।

কাপ শোলা হইতে প্রস্তুত। মালাকরেরা ধারাল ছুরি দ্বারা শোলা পাতলা করিয়া কাটিয়া ইহা তৈরী করে। আংটা বাদলাজড়িত লোহার গোলাকার তার বিশেষ। লাল, সবুজ ইত্যাদি বিবিধ রঙের ধাতুর পাতকে জামিরা বলে; এবং ঐ জামিরাকে চুমকির নক্সায় কাটিলেই বিছাচাকী হয়।

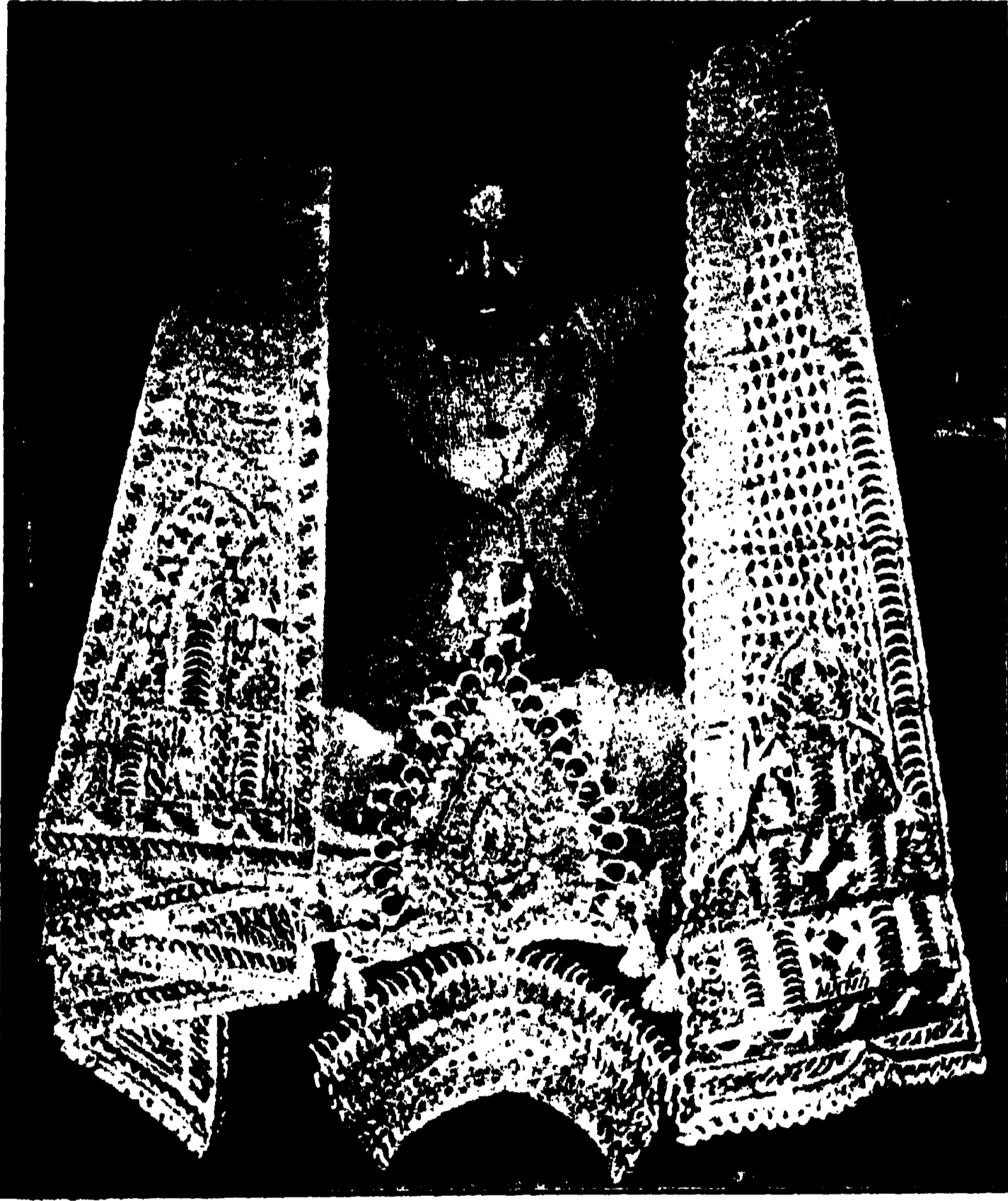
আঁচলার উপর যে প্রকার কারুকার্য করার প্রয়োজন কাপের গায়ে তাহার নক্সা টানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ কাপগুলিতে লেই মাখাইয়া একটা তুলার গদির উপর রাখিয়া কণুই বা পা দ্বারা চাপ দিতে হয়। তারপর আংটা দ্বারা রচিত আবশ্যকীয় পরিকল্পনার দাগ উহার উপর লওয়া হয়। স্ত্রীলোকগণ ঐ দাগ অনুসারে কাপের কোন কোন অংশ নরুন দ্বারা কাটিয়া ফেলে এবং উহার নীচে জামিরা লাগাইয়া ফাঁকগুলিকে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট করিয়া তোলে। অতঃপর উপরের দিকে প্রয়োজনানুরূপ চুমকি, বিছাচাকী, রঙীন কাগজ ইত্যাদি লাগাইয়া আঁচলার অবয়ব সম্পূর্ণ করে।

মুকুট তৈরীর জন্য যে সকল জিনিস লাগে, তন্মধ্যে

নিম্নলিখিত উপকরণগুলিই প্রধান :—(১) লোহার তারের ফ্রেম। (২) জামিরা। (৩) রাং। (৪) চুমকি। (৫) বিছাচাকী। (৬) বকুল। (৭) কিরকিরা।

বকুল—বাদলা দ্বারা আবৃত ডিম্বাকার শোলার খণ্ড-বিশেষ; এবং কিরকিরা—রেসা অর্থাৎ মোড়ানো বাদলা দ্বারা বন্ধমুখ ইঞ্চিপ্রমাণ আংটি।

উপরি-উক্ত লোহার তারের ফ্রেমটা বাদলা দ্বারা



প্রতিমার ডাকের সাজের মুঠ ও আঁচলা।

আবৃত করিয়া তদুপরি বকুল, কিরকিরা, বিছাচাকী, চুমকি, জামিরা ও রাঙের পাতের যথাযথরূপ সন্নিবেশ মুঠ তৈরী হইয়া থাকে।

বাজু, হার, কঙ্কণ প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীও উক্তরূপ। উহার ফ্রেম লোহার বদলে শোলা দ্বারা তৈরী হইয়া থাকে এবং তদুপরি বিবিধ বর্ণের লেই রাখিয়া তাহা ধাতুর পাত দ্বারা আবৃত করা হয়।

শঙ্খা, চুমকি, কাঙ্কনী, বাদলা ইত্যাদির দ্বারা টুপী, পাগ, জুতা, জ্যাকেট, কোমরবন্ধ ইত্যাদির উপর জরির কার্য করা হয়। মখমল, রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি উহা দ্বারা ভূষিত হইলে তাহাকে জরদোজী বলে। যাহারা জরদোজীর কার্য করে তাহারা জরদোজ নামে পরিচিত। জরদোজগণের প্রত্যেকেই প্রত্যহ ১০ পর্য্যন্ত রোজগার করে।

মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় কল্লাবাতুন দ্বারা উৎকৃষ্ট জরির কার্য করা হয়। হাতীঘোড়ার সাজ, কালরযুক্ত সামিয়ানা, পালফীর ঘেরাটোপ, উপাসনা-মন্দিরের কার্পেট, কোমরবন্ধ, মণিব্যাগ, জুতা, টুপী, বডিস, জ্যাকেট, গাউন প্রভৃতির উপর কারচুবি সাধারণ জরি দ্বারা করা হয়। এই-সকল জরির কার্য তাঁতে এবং সূচী দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে। উৎকৃষ্ট জরির কার্য মখমল বা বনাতির উপর করাই প্রশস্ত। তুলার বস্ত্রের উপর জরি বসানো হইলে তাহাকে কামদানী বলে। যে-সকল বস্ত্রে সোনার জরি অধিক ব্যবহৃত হয় তাহা কিংখাব নামে পরিচিত। কোন কোন কিংখাবে সোনা রূপার জরির সহিত রেশমী সূতাও মিশানো থাকে।

কোন কোন রেশমী কাপড়ের উপর উঁচু করিয়া জরি বসাইয়া একপ্রকার কারচুবি করা হয়। আহম্মদাবাদ, আও-রঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, মুলতান, সুরাট, পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ প্রকার

জরিযুক্ত, রেশমী শাড়ী যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। বেনারসী শাড়ী রেশমের উপর জরি তোলায় আর একপ্রকার দৃষ্টান্ত। বঙ্গদেশের জমিদারগণ এই শাড়ীর যথেষ্ট আদর।

হাতীঘোড়ার সাজ ও টুপীর উপর কারচুবির নিমিত্ত সোনারূপার জরি ব্যবহৃত হয়। মাননীয় কলিন্ সাহেবের ১৮৯০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ—পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই কার্যে দক্ষ বহু শিল্পী আছে, এমন কি



একমাত্র পাটনাই এই ১০০০ কারিগর এই কার্য করিতেছে। এই কার্যের জরি (কল্লাবাতুন) পাটনা ও মুর্শিদাবাদে তত বেশী তৈরী হয় না; উহার অধিকাংশই বারাণসী ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানী হয়।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদাদি, গোটা, কিনারা, গাঁচলা, ফিতা, পাড় প্রভৃতি অনেকাংশ জরিয়ুক্ত থাকে। উহা পৃথক পৃথক ভাবে বহু নক্সায় তৈরী হয়। ইহার টানা ও পড়েনে জরি ও রেশমী সূতা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা, পাটনা, বারাণসী ও মুর্শিদাবাদ এই কার্যের প্রধান স্থল।

কলিকাতায় বিবাহ উপলক্ষে বরের বাবহায়া এক প্রকার জরির পোষাক পাওয়া যায়, উহার অন্তর্গত জুতা, শিরপেচ, চাপকান প্রভৃতি সমস্তই শল্লা, চুমকি ও মঞ্জিলা দ্বারা শোভিত। উহার প্রস্তুত-প্রণালী যাত্রা বা থিয়েটারের পোষাকেরই অনুরূপ। বিবাহের টোপরও সোলারী উপর শল্লা চুমকি দিয়া তৈরী হয়।

শট্কা অর্থাৎ গড়গড়ার নল জরি-শিল্পের আর একটি উদাহরণ। এই-সকল নল কল্লাবাতুন ও বুটা মঞ্জিলা উভয় দ্বারাই খচিত করা হয়। এবং জরির তারতম্য অনুসারে ইহাদের মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

পশ্চিম দেশীয়া দরিদ্রা স্ত্রীলোকগণ উৎসব ও তামাসাদি দেখিবার সময়ে এক প্রকার রঙীন কাপড় পরিধান করে। উহাতে কারচুবির নিমিত্ত সাধারণ শল্লাদি ব্যবহৃত হয়।

• সোনারূপার পাতা এই শিল্পের এক প্রকার-ভেদ। ইহা আসল ও নকল উভয় রকমেরই হইতে পারে। নকল পাতার একটা কারখানা পূর্বে কলিকাতার মাণিকভাঙ্গা স্ট্রীটে ছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু কলে প্রস্তুত ঐ জাতীয় বিলাতী পাতার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা জয়লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া বহুদিন হইল ফেল পড়িয়াছে।

আসল পাতার চারিটা কারখানা চিৎপুরে আছে। পাটনা-নিবাসী নাজির হোসেন ও তাহার কুর্শ্চারী মহম্মদ তকী ইহার কার্যে বিশেষ নিপুণ। নাজির হোসেনের দোকান লোয়ার চিৎপুর রোডে স্থিত।

মহম্মদ তকী এই দোকানে ২০ বেতনে কার্য করিতেছে।

আসল সোনারূপার পাতা বিশুদ্ধ সোনারূপা দ্বারা প্রস্তুত হয়। এক তোলা সোনা বা রূপার পাত ১৬০ বা ১৪০ অংশে বিভক্ত করিয়া ঐ সংখ্যক তালাযুক্ত ৬" x ৪" আকারের যুগচর্শ্বনির্মিত একটা ব্যাগের প্রত্যেক খোপে এক এক টুকরা পাত রাখিয়া তাহা হাতুড়ি দ্বারা পিটাইলেই ৪" x ৫" পরিসরের সোনা বা রূপার পাতা তৈরী হয়। ঐরূপ পাতার স্বর্ণনির্মিত এক একটা ১৮ দরে ও রৌপ্যনির্মিত এক একটা ১১০ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এইরূপ সোনা রূপার পাত স্তবকে স্তবকে সজ্জিত থাকে বলিয়া চলিত কথায় তাহাকে সোনার তবক বা রূপার তবক বলে; এই তবক সৌখীন মিষ্টান্ন বা পানের গায়ে মুড়িয়া সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকারভেদে জরি-শিল্পের বাবহার ও প্রয়োজনীয়তার এতগুলি দার মুক্ত থাকা সত্ত্বেও ইহার বর্তমান অবস্থা দেশীয় অগ্রাণু শিল্পের গায় দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় শিল্পের এইরূপ অধোগতি দেখিয়াই পাটনার ডিপ্লোম্যাট গেজেটীয়ার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

পাটনায় হস্তনির্মিত শিল্পের যেরূপ দুর্দশা দেখা যাইতেছে, অন্য কোন ক্ষেত্রে সেরূপ দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে প্রায় সকল রকম শিল্প-কর্মই পরিচালিত হইয়া থাকে; কিন্তু উহার কোনটাই তেমন খ্যাতি কি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। এই-সকল শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও বড় একটা দেখা যায় না।

পূর্বে জরি-শিল্প পাটনাবাসী অনেকের বংশগত বাবসায় ছিল। কিন্তু অধুনা ঐ-সকল বাবসায়ীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে।

পাটনায় ১৯১০ সালে যেসকল ব্যক্তি জরি-শিল্পের এবং শল্লা-চুমকি-মঞ্জিলার কার্য করিতেছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

নাম	ঠিকানা
কজ্জুমিঞা	
আলি আহম্মদ	
হাজী আকবর	কসাহাত কা ময়দান।
হাজী মহম্মদ ইসমাইল	
আবদুল রহমান (হাজী)	
তগীরামের পুত্র	

নাম	ঠিকানা
দৌলত মিঞা	মোগলপুর।
সুপন মিঞা	কালু খাঁ কা বাগ।
আবুহুস্না	সদর গলী।

এই স্থানের বাবসায়ীগণ জনসাধারণের উৎসাহের অভাবকেই এই শিল্পের অধোগতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করে। “জনসাধারণের উৎসাহ” অর্থে ইহারা এই বুঝে যে, সকলে ইহাদিগকে যেমন জিনিসাদি তৈরীর যথেষ্ট ফরমাস দিবে তেমনি তজ্জন্ত অগ্রে টাকা দানও দিবে। এইরূপ অভিনব “উৎসাহ” দিয়া এই শিল্পের পুনরুদ্ধার করা জনসাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, তাহার বিচার পাঠক-সাধারণ সহজেই করিতে পারেন। শিল্পজীবীগণের দারিদ্র্য ও শ্রমকুঠাই তাহাদিগকে এইরূপ ধারণার বশবর্তী করিয়া তুলিয়াছে। এই স্থানের শিল্পের এহেন দুর্দশার আরো একটি কারণ এই যে, জনসাধারণ বারাগসীতে সর্বদা তৈয়ারী মাল পাইতে পারে এবং সেস্থানের জিনিসের কারুকার্যও উৎকৃষ্ট। পাটনায় এই শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণও যেমন অল্প, তেমনি একমাত্র বিহার বাতীত অল্প কোন স্থলে তাহার রপ্তানীও হয় না।

পাটনার স্থায় কলিকাতায়ও জরি-শিল্পের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ৩০১৩৫ বৎসর পূর্বেও ইহা বিশেষ উন্নত ছিল। তখন একমাত্র মেছুয়াবাজারেই ইহার নয়টি সুবহুৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ-সকল দোকানের প্রত্যেকটিতে ২০১২৫ জন সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত ছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকেই দৈনিক ২ হইতে ৫ পর্য্যন্ত উপার্জন করিত।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে একজন জার্মান বণিক কলিকাতায় আসিয়া ঐ-সকল দোকান হইতে এই শিল্পের বিবিধ নমুনা চাহিয়া লইয়া যায়। ইহার পর বৎসরই ঐরূপ দ্রব্য কলে প্রস্তুত হইয়া জার্মানী হইতে এদেশে আমদানী হয়। হস্ত-প্রস্তুত এদেশীয় দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় ঐ জাতীয় জার্মানীর জিনিস সস্তা হইলেও তখন পর্য্যন্ত জার্মানীর প্রস্তুত সামগ্রী সর্বদা সুন্দর না হওয়ায় ঐ সময়ের প্রতিযোগিতায় শিল্পের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। কিন্তু

তৎপর বৎসরই জার্মানগণ এ বিষয়ে “চরম” উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করায় দেশীয় শিল্পের অধোগতি হইতে আরম্ভ করে।

১৯১০ সালে মেছুয়াবাজারে তিনখানি মাত্র জরি দোকান ছিল। উহার এক দোকানের মালিক সেখ কালু ও তাহার কর্মচারী মোসাহেব আলী এই কার্যে বিশেষ দক্ষ। কিন্তু তাহাদের অশেষ নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহারা তখন আর তেমন কাজকর্মের ফরমাস পাইতে-ছিল না। জার্মানীর দৌলতে এদেশের মঞ্জিয়ার কারবার একরূপ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু চুম্বিকির কার্যে জার্মানগণ এখনও তেমন কৃতকার্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ না হওয়ায়, উপরি-উক্ত দোকানগুলি উহারই কার্য লইয়া কায়ক্লেশে কোন প্রকারে বর্তিয়া ছিল। এখন কোনো দোকান আছে কিনা আমরা জানি না।

জার্মানীর জরি-শিল্প দামে ও কাটতিতে এদেশের শিল্পকে পরাভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে জিনিসের গুণের পরীক্ষায় জয়ের বিচার হইতে পারে, সেস্থলে উহা ভারতজাত দ্রব্যের কাছেও দেসিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ডব্লিন সহরের মেলায় প্রদর্শিত সোনারূপার জরিযুক্ত পশমী বস্ত্রের নমুনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐরূপ নমুনা লইয়া জার্মানীর যে-সকল শিল্পী মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের জিনিস ২৪ দিন বাদে মরিচা ধরায় নমুনা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করিতে হইত; কিন্তু ভারতজাত ঐ বস্ত্র মেলার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তুল্যরূপ ওজ্জ্বলা ও বর্ণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সভ্য জগতের সমক্ষে ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছে।

ত্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

### স্পর্শ

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দন পল্লবরস সঞ্চে  
নিঙাড়ি ইন্দুকিরণাসুর মরি মরি মোর সঞ্চে ।  
কে দিল মানস-পরিভরণ জীবনৌষধিবিন্দু  
সুধায় সিক্ত করিল, তিক্ত তাপজর্জর চিত্ত ।  
সঞ্জীবন এ পরিমোহন যে পুরাপরিচিতস্পর্শ  
অঙ্গে অঙ্গে প্রেমতরঙ্গে আগায় নবীন হর্ষ ।  
সস্তাপজাত মূর্ছা ঘূচায় আকুলানন্দবন্তা  
বিবশ করিছে প্রাণ, আনি পুনঃ জড়তা পুলকজন্তা

## পঞ্চশস্য

কবির শারীর-ক্রিয়া ( British Medical Journal )—

ডাক্তার ডেভিড এ আলেকজান্ডার নামক এক ব্যক্তি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল পত্রিকায় এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন যে, সিকোর পাত্রিণি যেমন বাগ্মীর শারীর-ক্রিয়া সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন, সেইরূপ যদি কবির সম্বন্ধে করিতেন তাহা হইলে মন্দ হইত না। কবিতা ও সঙ্গীত কেন আমাদের ভাল লাগে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাবকে ছন্দের নিগড়ে বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিটা মানুষের কেন হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা অসূচিত বলিয়া মনে হয় না। একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়—এ প্রবৃত্তিটা জগৎ-নিয়মের একটি ধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বের সকল প্রকার শক্তির প্রকাশের মধ্যে সঙ্গীতের যাহাকে ভাল বলে, সেইরূপ একটা ভাল থাকিতে দেখা যায়। প্রকৃতির বিপুল জ্বপিওটা যেন জীবের জ্বপিওেরই মত তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে। লেখক প্রস্তুত করিতেছেন—খাসগতির সহিত কবিতার ছন্দের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা কি একবারেই অসম্ভব? Hexameter কবিতার সহিত যে খাসগতির সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। Hexameter (ষট্‌শব্দিক) কবিতার আবৃত্তিকালে তাহা হাতে-হাতেই টের পাওয়া যাইতে পারে।

মেরী হ্যালক গ্রীনওয়াল ১৯০৫ সালের জুন মাসের Poet Lore এর পুনর্মুদ্রণ করিয়া তাহার একখণ্ড ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তির কোন একটা সঙ্গীতকে বিশ্লিষ্ট করিলে, তাহার মধ্যে রাগরাগিণী, তাল লয়, স্বরের উত্থান পতন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। শুধু গেয় কবিতাতেই যে এ-সকল থাকে তাহা নহে—অশ্লীল কবিতাতেও ইহার অভাব লক্ষিত হয় না। অনেক সময় আবার এ-সকল এমন একটা বাধাবোধ নিয়মে থাকে যে, অক্ষপাত দ্বারা তাহা প্রকাশ করাও অসম্ভব নয়। লেখিকার কথার ভাবে এই মনে হয় যে নাড়ীর গতিই কবিতার ছন্দের নির্দেশ করিয়া থাকে। তিনি বলেন এ সঙ্গীত বিশ্বের যেন একটা জ্বপিও রহিয়াছে। ইহার স্পন্দনের তালের সঙ্গে প্রকৃতি তাল মিশাইয়া চলিতেছে। মধুপের গুণ্ণু গুণ্ণে; ময়ূরের কলাপ বিস্তারপূর্বক নৃত্যে, ব্যাঘ্রের বম্পে, বিশ্বের সকল জীবের সকল ক্রিয়ার মধ্যে এই বিশ্বজনীন তাল রক্ষিত হইতেছে। চৈতন্যের আধার এই যে মস্তিষ্ক, ইহার ধমনীগুলি জ্বপিওের স্পন্দনের সহিত নৃত্য করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভাবের তরঙ্গের উত্থান ও পতন হইতেছে। লেখিকা প্রসঙ্গটি এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন যে ইংরাজি ভাষার সকল দীর্ঘ ছন্দের কবিতা এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র ছন্দের কবিতা জ্বপিওের লাব্ ডাপ্ লাব্ ডাপ্ (lubb dup, lubb dup) ধ্বনির সহিত তাল মিশাইয়া লিখিত হইয়াছে।

একবার একটি জার্মান এই প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে সকল ভাষায় পান সম্বন্ধে যত কবিতা আছে, ভোজন সম্বন্ধে তাহা নাই কেন? গ্রীষ্মী গ্রীনওয়াল তাহার উত্তর দিয়াছেন। ইনি

বলেন পানকালে জ্বপিওের উদ্দীপনা হয়—এইজন্যই পান সম্বন্ধে এত কবিতার বাহুল্য।

খাসগতি না নাড়ির গতি কোনটা কবিতার ছন্দকে অনুশাসন করে তাহা physiologist (শারীরক্রিয়াবিদ্যাবিদ) বলিতে পারেন। কেবল তাঁহারা ইহার বিচার করিতে সমর্থ। অনেকেই বলেন সঙ্গীত আর ললিত কবিতা ইহার ঠিক যেন এক মায়ের পেটের ভাইবোন। ইহাদের অনৈক্য হওয়া সম্ভবপর নয়। কার্লাইল একস্থানে বলিয়াছেন—কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই যে কবিতা লেখা যায়, তাহা নহে। ইহার জন্ম সঙ্গীতের রসবোধও থাকা চাই। যে ব্যক্তি গান বোঝেনা তাহার পক্ষে কবিতা লেখা একেবারে অসম্ভব। কথাটা পুরাপুরি সত্য বলিতে পারা যায় না। এমন অনেক কবির নাম করিতে পারা যায় যাহারা সঙ্গীত বুঝিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আবার খুব ভাল সঙ্গীতজ্ঞ কবি এমন কবিতা লিখিয়াছেন, যাহাতে মধুর্য ও সৌন্দর্যের একান্ত অভাব। ট্রাউনিং ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহার মত সঙ্গীতজ্ঞ কবি খুব অল্পই দেখা যায়—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহার মত বাহু-আকারে কর্কশ (ragged) কবিতা অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন।

কবির শারীর-ক্রিয়ার বিশেষত্ব কি তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কাবানিস বলেন কবিতা লেখা, ও তো এক রকম পেটের গোলযোগ বই আর কিছুই নয়! বলা বাহুল্য পেট অর্থে এখানে যকৃতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীরেরা যকৃতকেই ভাববৃত্তি বা passion এর উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে কবির শারীরক্রিয়ার বিশেষত্ব যে কি তাহার আজ পর্য্যন্ত সুসীমাংসা হইয়া উঠে নাই। কোন্ অজ্ঞাত শক্তি কবিকে কবিতা লিখিতে নিযুক্ত করে—তাহা চিরকালই অজ্ঞেয় রহস্যগর্ভে নিহিত থাকিবে।

ডাক্তার।

তামাকের অপকারিতা ( The Literary Digest )—

কিছুদিন পূর্বে আমেরিকান মেডিসিন পত্রিকায় তামাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছিলেন—তামাক অপরিণত বয়স্কদিগের পক্ষেই অনিষ্টকর—বয়স্ক ব্যক্তিদিগের তামাক সেবনে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে লেখক তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কথাটা কিন্তু ওড্ হেল্থ পত্রিকার সম্পাদকের ভাল লাগে নাই। তিনি ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন লেখকের উক্তির প্রথম অংশের সহিত তাঁহার কোনই মতবিরোধ নাই—কিন্তু ইহার শেষ অংশের সহিত তিনি কিছুতেই একমত হইতে পারেন না। তামাক সে পরিণত বয়স্কদের কোন ক্ষতি করে না—একথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। অধিক তামাক সেবনে অক্ষতা রোগ জন্মাইতে পারে, এ কথাটিও যে লেখকের প্রতিপত্তি হয় নাই তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। পারী নগরীর বিখ্যাত ডাক্তার Bonchard জুদুরোগ ও ধমনীরোগের প্রধানতম কারণ বলিয়া এই তামাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। এমনি কেবল তাঁহার একাধিক মত তাহা নহে—তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক চিকিৎসকও ঐরূপ অভিমত

প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সৈন্তবিভাগে প্রবেশপ্রার্থীদের মধ্যে বাহাদুরের আবেদন অগ্রাহ করা হয়, তাহাদের শতকরা ৯০ জনের "tobacco heart" নামক হৃদরোগ থাকিতে দেখা যায়। ডাক্তারদের মতে ৭ম এডওয়ার্ড (Edward VII) ও মার্ক টোয়েন্ট (Mark Twain) এর মৃত্যুর কারণ এই tobacco heart নামক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা দুজনেই যে অতিরিক্ত ধূমপান করিতেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। গত দশ বৎসর মধ্যে হৃদরোগ ও ধমনীরোগে মৃত্যুসংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময় মধ্যে তামাকের ব্যবহারটাও যে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। অতএব তামাক যে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যাহানি করেনা একথা আর কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বাহারা কৃষ্টি শিখিতে যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি ধূমপানাসক্ত থাকে, বিজ্ঞ ওস্তাদ তাহাকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহেন না। সম্পাদক মহাশয় বলেন—(Yale Harvard Boat-race) ইয়েল ও হারভার্ডের প্রতিযোগী নৌকা বাচ খেলার সময় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এই বাচ ইয়েলের পরাজয় অবশ্যস্বাভাবী; তাহার কারণ ইয়েলের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের ছাত্রদের ধূমপান-অভ্যাসটাকে দোষের বলিয়া মনে করেন না।

তামাক যে কিডনী বা বৃক্ক নামক মূত্রযন্ত্রের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে—একথা চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, যে, ধূমপায়ীদের মধ্যে অন্ততঃ দশজনের মূত্রে এলুবুমেন নামক পদার্থ থাকিবেই থাকিবে।

তামাকের বীর্ষ্যকে নিকোটিন্ বলে। এযে একটা ভয়ানক বিষ, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ১৩ গ্রেন নিকোটিন্ দ্বারা একটা ছাগলকে অনায়াসে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। লণ্ডন নগরের বিখ্যাত চিকিৎসক, ডাক্তার রাইট স্থির করিয়াছেন, ধূমপায়ীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ ত সহজে হইতে পারে, এমন আর কাহারও নহে। অতএব তামাক যে বয়স্কদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যাহানিকর নয়, এ কথা মূলে কোনই সত্য নাই। তামাক জীব, উদ্ভিদ, শিশু, বৃদ্ধ, সকলেরই পক্ষে, সকল অবস্থাতেই অনিষ্ট উৎপাদন করিতে সমর্থ।

ডাক্তার।

### রাসায়নিক খাদ্য (The Literary Digest) —

এতদিনে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন সত্যসত্যই কার্যে পরিণত হইতে চলিল। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন "মানুষ, আর তোমাকে খাদ্যের অল্প কৃষিকার্য, কি পশুপালন করিতে হইবে না। এখন হইতে রসায়নশালা হইতেই তোমার দেহের পরিপোষণের উপযোগী পদার্থ সমূহ সরবরাহ হইতে থাকিবে।" কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যজন্ম প্রস্তুতের চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিতেছিল। দুই একটি বিষয়ে সকলভাৱ লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। শর্করা ও চর্বি এ দুটা জিনিস রসায়নশালায় কৃত্রিম উপায়ে বহুদিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছে। শুধু ইহারা যে ইক্ষুজাত শর্করা ও শুকরবেদ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শুধু শর্করা ও বেদ খাইয়া ত মানুষ বাচিয়া থাকিতে পারে না। জীবনধারণের অল্প এলুবুমেন বা প্রোটিন্ খাদ্যের একান্ত আবশ্যক। ইহা না হইলে, দেহের পোষণ ও ক্ষয়পূরণ কোন মতেই হইতে পারে না। দুধে, ডিম্বে, বৎস্ব মাংসে এবং দাইলে

ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই এ-সকল না হইলে আমাদের কোন মতেই চলিতে পারেনা। বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্যন্ত ইহাদের তুল্য কোন খাদ্যই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই—কখনও যে পারিবেন তাহার আশাও নাই; কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে ডাক্তার এল্ডারহাল্ডেন যে একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে প্রোটিন্ (proteid) না হইলেও আমাদের চলিতে পারে। তিনি বলেন প্রোটিন্ খাদ্যের আদর্শ হইতেছে ডিম্ব। ডিম্বটি খাওয়ার পর পাকায় মধ্য পাকায়ের পাচক রস দ্বারা উহা এমিনো এসিডে বিভক্ত হয়। এই এমিনো এসিড অস্ত্রের গাত্র দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং সেই সময় উহা আবার নূতনতর প্রোটিন্ রূপান্তরিত হয়। এবং এই রূপান্তরিত প্রোটিন্ দ্বারা দেহের পরিপোষণ ও ক্ষয়পূরণ ক্রিয়া সাধিত হয়। কোন অস্ত্রকে প্রোটিন্ খাইতে না দিয়া, যদি এমিনো এসিড দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রোটিন্ খাদ্যের 'ফল'ই বা না হইবে কেন? ডাক্তার এল্ডারহাল্ডেন কুকুরকে প্রোটিন্ না দিয়া এমিনো এসিড দিয়া সমান ফল পাইয়াছেন। কুকুরের বেলায় যদি এমিনো এসিড দ্বারা ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের বেলায় বা তাহা না পাওয়া যাইবে কেন? মানুষের উপর এ বিষয়ে এখনও কোন পরীক্ষা হয় নাই—শীঘ্রই য়ে হইবে এমন আশা করা যায়। শর্করা, চর্বি ইতিপূর্বেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, প্রোটিন্ যদিচ হয় নাই বটে কিন্তু কুকুরের বেলায় অন্ততঃ দেখা গিয়াছে যে এমিনো এসিড দ্বারা প্রোটিন্দের কাষ অনায়াসেই চলিতে পারে। তাহা হইলে খাদ্যের আর কোন উপকরণেরই অল্প কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপর নির্ভর করিতে হইবে না—রসায়নশালা হইতেই সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু সম্ভব হইলেও ইহাদের বিস্তারিত ভাবে ব্যবহারের সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই—শীঘ্র হইবে তাহারও সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। কিন্তু রোগ-বিশেষে এই কৃত্রিম রাসায়নিক খাদ্যের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার আশা করা যায়। এই মনে করুন, পাকায়ের ক্ষত (gastric ulcer) রোগে। এই রোগে অনেক সময় অস্ত্রচিকিৎসা করার আবশ্যক হয়। অস্ত্রচিকিৎসার পর স্থানটির বাহাতে বিশ্রাম ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা না করিতে পারিলে আরোগ্যের আশা থাকে না। পাকায়ের বিশ্রাম মানে—এমন কিছু না-খাওয়া যাহাকে জীর্ণ করিতে পাকায়ের কোন সাহায্য আবশ্যক করে। এরূপ হলে রোগীকে অনাহারে রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু অনাহারেই বা রোগীকে কতদিন রাখা যাইতে পারে? রোগীর পরিপোষণের একটা উপায় করা ত চাই। ডাক্তার এল্ডারহাল্ডেন বলেন—এমিনো এসিড দ্বারা এ কাযটি উত্তমরূপে চলিতে পারিবে। ইহাকে জীর্ণ করিতে পাকায়কে মোটেই খাটিতে হইবে না—তাহার বিশ্রামের কোনই বাধা উৎপন্ন হইবে না, অথচ দেহের পরিপোষণ কাযটি উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে।

ডাক্তার।

### খাদ্যাতঙ্ক (The Literary Digest) —

অধ্যাপক এম্ নাইল্ (M. Niles) মেডিক্যাল রেকর্ড্ পত্রিকায় খাদ্যাতঙ্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন খাদ্যাতঙ্ক একপ্রকার বায়ুরোগ-বিশেষ। ইহার ল্যাটিন্ বৈজ্ঞানিক

নাম "Sitophobia" (সিটোফোবিয়া)। এই রোগের বিশেষত্ব এই যে রোগী মনে করিয়া থাকে কোন একটা বিশেষ সাধারণ খাদ্য অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইলেও, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ দোষাবূহ, এমনকি প্রাণনাশকও হইতে পারে। সিটোফোবিয়া বা খাদ্যাতঙ্কের স্থায় আরও অনেক বিষয়ে ফোবিয়া বা আতঙ্ক থাকিতে পারে। এক-একটা লোক আছে তাহার কোনমতেই কোন বন্ধ স্থানে যাইতে পারে না। এরা মনে করে সেরূপ স্থলে গেলেই তাহাদের প্রাণবায়ু শেষ হইয়া যাইবে; এইরূপ আতঙ্কে লাতিন ভাষায়—"Agoraphobia" (এগোরোফোবিয়া) কহে। আবার ইহার বিপরীত ফোবীয়া বা আতঙ্কও না থাকিতে পারে এমন নহে। এক এক ব্যক্তি দ্বিবারাত্রি সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ স্থানেই থাকিতে ভালবাসে। মুক্ত খোলা যায়গায় কিছুতেই যাইতে পারে না। এরূপ আতঙ্কে "Claustrophobia" (ক্লস্ট্রোফোবিয়া) কহে। এই রকম কত ফোবিয়াই যে আছে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সকল ফোবিয়া বা আতঙ্কেই চিকিৎসকগণ বায়ুরোগের সামিল মনে করিয়া থাকেন। খাদ্যাতঙ্ক নামক ফোবিয়াতে কোন একটা বিশেষ খাদ্য সম্বন্ধেই রোগীর চিত্তবিকার দেখা যায়; অন্যত্র বিষয়ে সে অপরা দশজনেরই মত সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

এক ফেরিওয়ালার মাখনের উপর বিজ্ঞাতীয় ভয় ছিল। বেচারী যেখানেই যাইত তাহার খাদ্য যাহাতে মাখন না দেওয়া হয়, তাহার জন্ত রাধুনীকে তাহার কষ্টার্জিত অর্থ হইতে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত। আর এক ব্যক্তির রক্তনের উপর বড় ভয় ছিল। সে একটা হোটেলে বাস করিত। হোটেলে মাংসের মধ্যে রক্তন না দিলে চলে না। এই কারণে বেচারাকে বাধা হইয়া মাংস খাওয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। একদা এক ডাক্তারের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সে ব্যক্তি মাংস আহার করিয়াছিল—কিন্তু আহারের পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে সে ডাক্তারকে এক পাও নড়িতে দেয় নাই। ইহার পর হইতে লোকটার রক্তনাতঙ্কটা কাটিয়া গেল। অনেক স্থলেই ভয়টা যে অহেতুক তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু স্থল-বিশেষে ভয়ের জিনিসটা জোর করিয়া খাওয়াইলে যে কোনই অনিষ্ট হয় না একথা বলা যাইতে পারে না। ইহার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও যে না আছে এমন নহে। সকলেই জানেন প্রবৃত্তি ও রুচিপূর্বক খাইলে পাচক রস যেরূপে নিঃসরণ হয়—এমন ভয়ে ভয়ে খাইলে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পরিপাক-ক্রিয়ার যে বিঘ্ন ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ডাক্তার নাইল্‌স্‌ বলেন খাদ্যাতঙ্ক অনেক স্থলে রোগীর স্বভাববৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে—আবার ইহা ব্যক্তিগত শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও বড় অল্প নির্ভর করেনা। এক ব্যক্তি জুন মাসের আপেল ফল খাইতে পারিত না। তাহাদের আস্তাবলের নিকট একটা জুন-আপেলের গাছ ছিল। এই ঘটনা হইতে তাহার ঐ ফলের উপর অসম্ভব ঘৃণা জন্মিয়াছিল। আর এক ব্যক্তি Galfish নামক এক প্রকার মাছ খাইতে পারিত না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, একটা মলমূত্র-পূর্ণ নদীর জলে বিস্তর Galfish থাকিতে দেখিয়া তাহার উক্ত মৎস্যের উপর অসম্ভব ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এ-সকল কারণ ছাড়া খাদ্যাতঙ্কের আরও একটা প্রবল কারণ থাকিতে দেখা যায়। খাদ্যবিশেষের নিন্দা করিয়া সময় সময় সংবাদপত্রাদিতে লেখা বাহির হয়। এই-সকল লেখা পাঠ করিয়া কাহারো কাহারো মনে কোন একটা বিশেষ খাদ্যের প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মায়। আমিষ খাদ্যের প্রতি এইরূপ অজ্ঞায় কটাক্ষ হওয়ায়, অধুনা অনেকেই

মৎস্য মাংসাদি ত্যাগ করিয়া ঘোরতর নিরামিষাশী অথবা ফলাহারী হইয়া পড়িতেছেন।

এখন এই খাদ্যাতঙ্ক নিবারণের উপায় কি? ইহা অবশ্য মনের রোগ, সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে দেহ অপেক্ষা মনের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাধার দোষে অনেক খাদ্য রোগীর সহ হয় না—এরূপ স্থলে এগুলিকে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে রোগীর পেটে অনায়াসে সহ হইতে পারে। রোগীর মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করাই এ রোগ অপনোদনের প্রধান উপায় মনে করিতে হইবে। তাহার অজ্ঞাতসারে জ্বাতি খাওয়াইয়া পরে তাহার ভুল ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা মন্দ উপায় নহে। ডাক্তার নাইল্‌স্‌ বলেন খাদ্যাতঙ্ক যতক্ষণ কোন একটা তুচ্ছ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ইহার চিকিৎসা না করিলেও চলে; কিন্তু ইহা যদি আবার কোন একটা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে আর উপেক্ষা করিলে চলিবে না—সেরূপ স্থলে কালবিলম্ব না করিয়া অকারণ অজ্ঞায় ভয়টা দূর করার চেষ্টা করা কর্তব্য। এস্থলে শারীরিক প্রশম (যতক্ষণ ক্রান্তি না দেখা দেয়) ইহার অপনোদনের একটা উত্তম উপায়। ইহাতে খুবই ক্ষুধার উদ্রেক হয়—এবং বাস্তব খাদ্য বশতঃ রোগীর মনে চিন্তা ভয় প্রভৃতির তেমন সুযোগ ঘটিতে পায় না। এ অবস্থায় শরীরের জন্ত যে জ্বাতির একান্ত আবশ্যক সেটা আপনা হইতেই রোগীর অভ্যাস হইয়া যায়।

ডাক্তার।

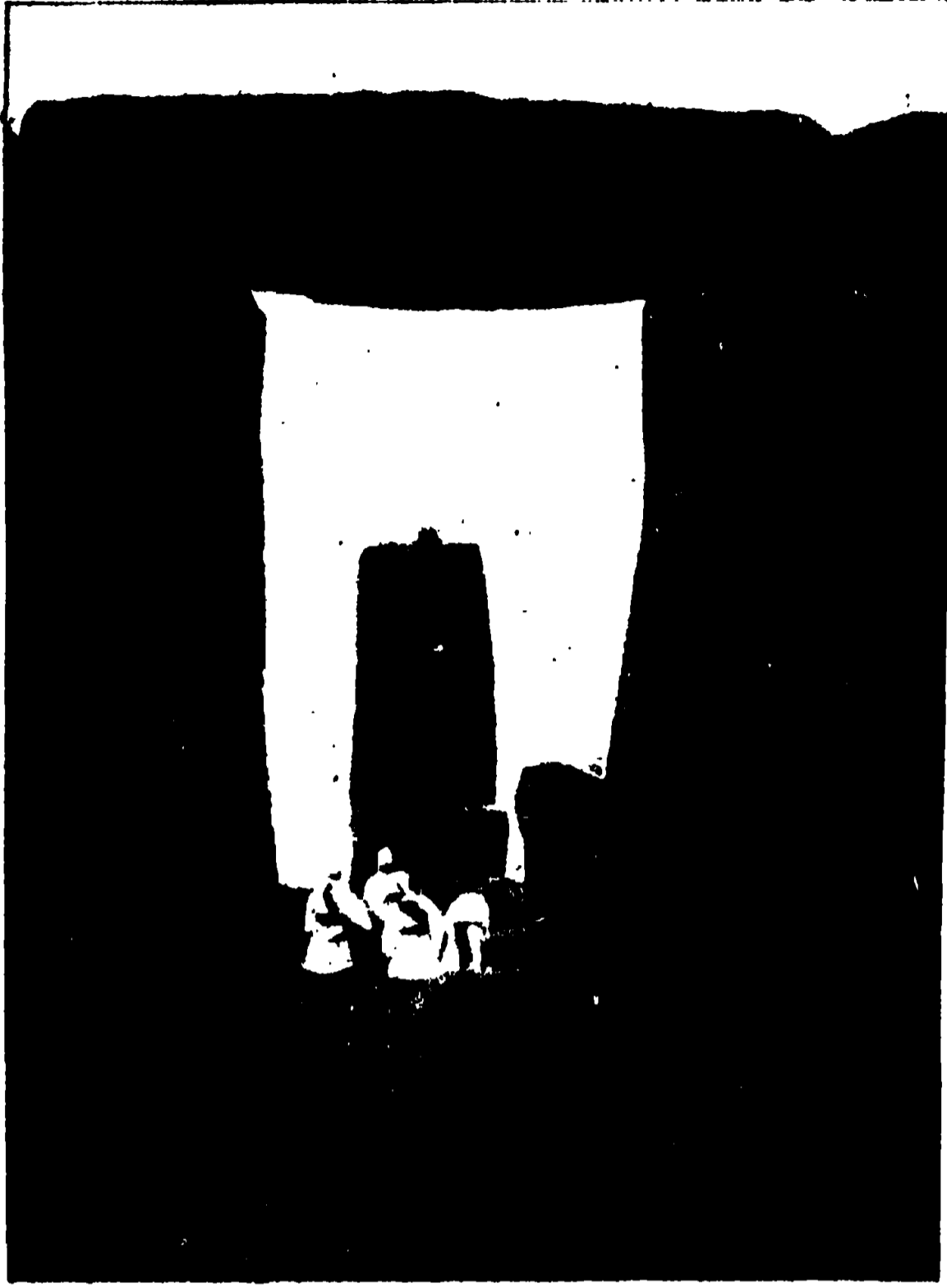
নৃতন ধর্ম (Les Documents du Progres):—

এই ধর্মের আদি জন্মস্থান তিব্বতে, ধর্মের নাম "মানব-সন্তানের সার্বজনিক সংঘ"। এই ধর্ম এখন ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করিতেছে। এই ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে ইংলণ্ড-প্রবাসী হিন্দু, পারসী, আরবী, ও ইংরেজ প্রভৃতি তিন চার হাজার লোক আছে; ইহাদের উপাসনা-মন্দির ইংলণ্ডের প্রাচীন প্রস্তর-খিলান



প্রস্তর-খিলানের মধ্যস্থ বেদি-শিলার নিকটে "মানব-সন্তানের সার্বজনিক সংঘ"-ভুক্ত উপাসকেরা উপাসনা করিতেছে।

(Stonehenge); এইগুলিকে উহার স্বর্গামন্দিরের প্রতিনিধি মনে করিয়া লইয়া এইখানেই পূজাচর্চনা করে। এই-সমস্ত

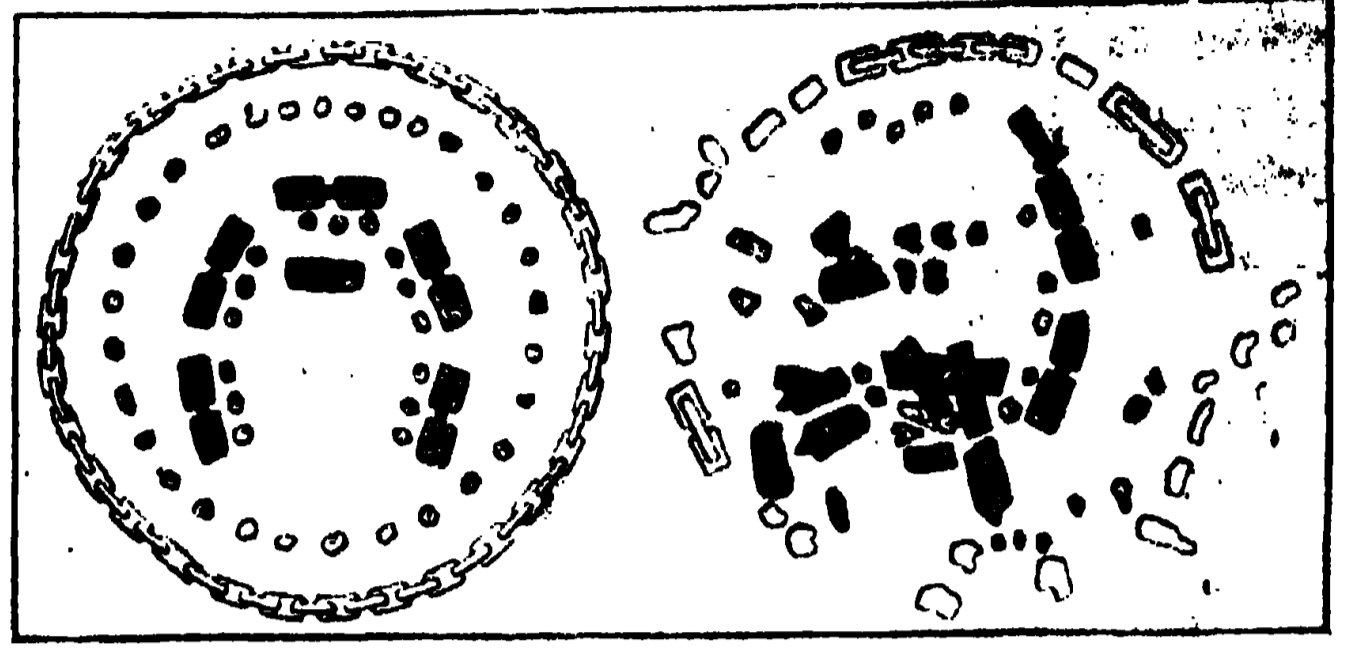


“মানব-সন্তান সংঘ” প্রাচীন  
সূর্যামন্দিরে উপাসনা করিতেছে।

প্রস্তর-খিলান অতি আদিম যুগে, যখন মানুষ পিতলের অন্তর্গত ব্যবহার করিত, লোহার পরিচয় যখন পায় নাই, তখনকার তৈয়ারী। চুখানা অথও প্রস্তর খাড়া করিয়া তাহার মাথায় একধানা প্রস্তর আড়াআড়ি শোয়াইয়া দিয়া এই খিলান তৈয়ারী। এইরূপ খিলানের চক্রে একটি বৃত্তাভাস রচনা করিয়া মধ্যস্থলে পাঁচটি প্রকাণ্ড খিলানে বৃত্তাক্ষরিত হইত, তাহার মধ্যস্থলে একটি অতিকায় প্রস্তর প্রোথিত হইত, তাহাকে বেদি-শিলা বলিত। “মানবসন্তানের সার্বজনিক সংঘ”-ভুক্ত লোকেরা প্রত্যবে এই বেদিশিলা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সূর্যাস্তব করে— “যাহা কিছু আছে, হইতেছে ও হইয়াছে তাহার মধ্যে এক দিবা দেবতার বিরাট উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। জগৎ-প্রকৃতিতে কিছু অমঙ্গল বা অশোভন নাই। সমস্ত বিশ্বসংসার এক অনির্কচনীয় পূর্ণমঙ্গলের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে— তাহার কলে সমস্ত বস্তু সুন্দর হইতে সুন্দরতর, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর হইতেছে। এই বিরাট বিশ্বস্তার পশ্চাতে যে বিশ্বশক্তি বিরাজমান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহারই মহিমা প্রতিকলিত করিয়া প্রকাশমান। যিনি বিশ্বশক্তি তিনি অনন্ত অথও, তিনি সত্য, তিনি সুন্দর, তিনি প্রেমময়, তিনি আমাদের হৃদবিহারী।”

তারপর যখন প্রথম সূর্যরশ্মি বেদিশিলা চূষন করে তখন “পবিত্র পঞ্চ” পুরোহিতেরা সমাগত পূজকদিগকে প্রণয় করে— “ভাইসব, কেন আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়াছি?” তখন সকলে একবাক্যে বলে— “অনন্ত দেবের মহিমা ও সত্য

স্বরূপ, অপরিমেয় প্রেম ও শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য, তাহারই প্রতিনিধি মহাপ্রাণ পবিত্র পঞ্চকের অনুশাসন অনুসারে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি।”



প্রস্তর-খিলানের বৃত্তের নক্সা।

বাম দিকের নক্সায় আদিম শৃঙ্খলা, এবং ডাহিন দিকের নক্সায় তাহার বর্তমান ভগ্নদশা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তারপর সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এবং এক এক দিন এইরূপ পূজার্চনা সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলিতে থাকে।

চক্র।

আমেরিকার লাল লোক কি এশিয়ার মঙ্গোলিয়ান ?

( The Scientific American )—

সাইবেরিয়ার অনেক জাতির রীতিনীতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত আমেরিকার লাল লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়; তাহাদের শরীর ও মনের গঠনও প্রায় একরূপ। ইহাতে অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন যে এশিয়ার উত্তরাংশে হিমপ্রলয়ের সময় কতক লোক আমেরিকায় পলায়ন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং এশিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা খুব নিকট জাতি।

এই সাদৃশ্য-অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া য়েনিসি ও সেলেঙ্গা নদীর তীরবর্তী প্রাচীন শবসমাধি “কোরগা” অনুসন্ধান ও খনন করিয়া প্রস্তরযুগের মানবের যে-সমস্ত কঙ্কাল ও কেরাটিক পাওয়া যাইতেছে, তাহাও এই অনুমান সমর্থন করিতেছে।

যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্ত্বেও একই জাতি-পরিবারের লোক দেশ ও কালে অত্যন্ত তফাৎ হইয়া পড়িয়াও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যেও নিজেদের দেহের গঠন, মনের প্রকৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতিনীতি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও একই রূপ রাখিতে পারিয়াছে।

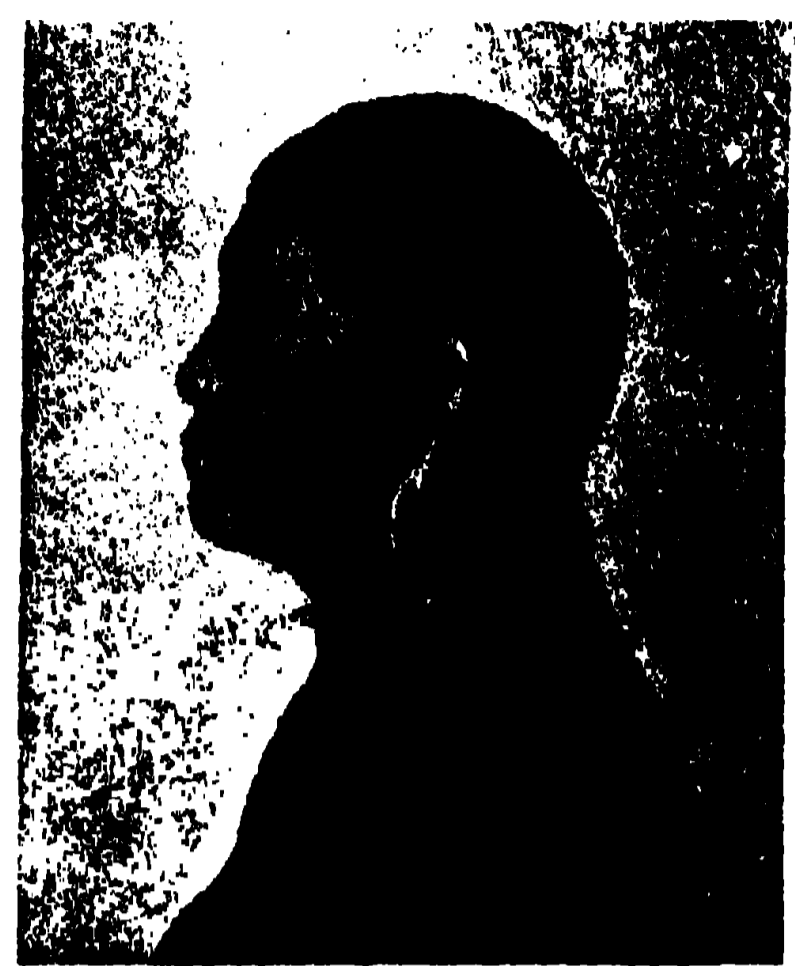
চক্র।



সাইবেরিয়ার লোক ।



আমেরিকার আদিমঅধিবাসী লাল লোক ।



সাইবেরিয়ার লোক ।

### ইংলণ্ডের রাজকবি (The Literary Digest):—

ইংলণ্ডের রাজকবি আলফ্রেড অষ্টিনের মৃত্যুর পর কে সেই পদ পাইবার যোগ্য তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে খুব একটা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রাজকবি টেনিসনের পর সুইনবার্ণকে ঐ পদ লইবার জ্ঞান সাধিলে সুইনবার্ণ বলেন যে “আমি রাজা থাকাই পছন্দ করি না, আমি রাজকবি হইব কি?” সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া অক্ষম কবি অষ্টিনকে সেই পদে বরণ করা হয়। টেনিসনের পরেই রাজকবি হওয়াতে অষ্টিন মহাকবি টেনিসনের কবিত্বপ্রতিভার আওতায় পড়িয়া গিয়া আর নিজেকে বিখ্যাত করিবারও সুযোগ পান নাই। সতের বৎসর অষ্টিন সেই পদে ছিলেন; সুতরাং এই সতের বৎসর লোকের মনের সম্মুখে রাজকবির অস্তিত্বটা তেমন স্পষ্ট হইয়া ছিল না। রাজকবির পদ শূন্য হওয়াতে সাধারণের মন আবার সজাগ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের বর্তমান রাজা যখন অভিমত প্রকাশ করিলেন যে আজকাল মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কাব্যকলার মধ্যেও এমন বিচিত্র ভাবলীলা দেখা যাইতেছে, যে, এখন একজন কোনো লৌকিকে রাজকবি বলিয়া চিহ্নিত করা অসম্ভব, সুতরাং অশ্রায়।—তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল যে রাজকবির পদটা এইবার বোধ হয় উঠিয়া যাইবে।

তবু সাধারণের মধ্যে নানা জনকে উক্ত পদের যোগ্য বলিয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। এই পদ যে সর্বদাই দেশের তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিকে দেওয়া হয়, তাহা নহে—এই পদ রাজভক্তির পুরস্কার মাত্র; এই পদ ড্রাইডেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র তাঁহাদের কবিপ্রতিভার পুরস্কারের জন্মই সে পদ পান নাই। রাজভক্তির পুরস্কার হইলেও, ত্রায়ে অত্রায়ে রাজকার্যের সমর্থন করিতে হইবে এরূপ একটা ধারণা রাজার পক্ষে থাকিলেও, লোকে ঐ পদের জন্ম শ্রেষ্ঠ কবির দিকেই তাকাইতে থাকে। এইজন্য অনেকেই আঁচিয়াছিল যে আলফ্রেড নোয়েস ঐ পদ পাইবেন—পর পর তিন আলফ্রেড, আলফ্রেড টেনিসন, আলফ্রেড অষ্টিন, আলফ্রেড নোয়েস—রাজকবি হইবেন। নোয়েসের

কবিপ্রতিভার কাছে ইংলণ্ডের অপরাপর প্রসিদ্ধ কবি উইলিয়াম ওয়াটসন, কিপলিং, স্টিফেন ফিলিপ্‌স্, অষ্টিন ডবসন, জন মেজকিন্ড, ক্রীম্‌টী মেনেল প্রভৃতির কবিপ্রতিভা ম্লান বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল যখন মহাশয়ী একুইথ বরমালা দিরা রবার্ট ব্রিজেসকে বরণ করিলেন। কেহ তাঁহার নাম মনেও ভাবে নাই। তাঁহার বয়স হইয়াছে ৬৯ বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় তিনি কোনো নূতন সুর বা বিশেষ বাণী জগতে প্রচার করেন নাই। এক অক্ষম কবির উত্তরাধিকারী আর এক অক্ষম কবি। তাঁহার অক্সফোর্ডের শাস্ত্র নির্জ্ঞান বাসভবনের মতন তাঁহার কবিতাও নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের। তবে তাঁহার মধ্যে চার্লসকপ্তদশীদের আনন্দের সহিত ষষ্ঠপন্থীদের আত্মনিবেদনের বিষমতার যে অপকৃপা মিলন নির্দোষ ছন্দে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্ম তিনি কতকটা এই পদের দাবী রাখিতে পারেন। তাঁহার কবিতায় সূক্ষ্ম রঙিন বিচিত্র উজ্জ্বল কিছু নাই; তাঁহার কবিতায় জীবনের গতিশক্তির পরিচয় নাই, আছে পরিচয় শাস্তির; প্রেমের উন্মাদনা নাই, আছে প্রেমের শিক্ষা; প্রকৃতির কলকণ্ঠ নাই, আছে প্রকৃতির শাস্ত্র মৌনতা।

রবার্ট ব্রিজেস নবনিযুক্ত রাজকবি, যৌবনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের জন্ম ইটন ও অক্সফোর্ডে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ক্রিকেট খেলায় ও দাঁড় বাহিতে দক্ষ। তিনি অক্সফোর্ডের ডাক্তার। ১৮৮২ সালে তিনি বিবাহ করিয়া আপনার কোলাহল-শূন্য নির্জ্ঞান আবাসে কাব্য-ও-সাহিত্যচর্চাতেই জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ছন্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁহার Milton's Prosody বইখানি ইংরেজি কাব্যের ছন্দ সম্পর্কীয় পুস্তকের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। তিনি প্রাচীন ছন্দে অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন—সেগুলি এমন কঠিন যে গ্রীক ছন্দের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান না থাকিলে তাহা উপভোগ করা যায় না। এজন্য তিনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত বা সমাদৃত কবি নহেন।

London Sphereএর মতে ব্রিজেসের রচনা সম্পূর্ণ কবিত্বময়। তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেহ থাকে ত ইয়েটস্। তাঁহার গীতিকবিতাগুলির মধ্যে প্রচুর কলানৈপুণ্য আছে।

রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস খ্যৈ পুত্রকে লইয়া আশ্বাদের কবি



ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি ডাক্তার রবার্ট ব্রিজেস।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ; এবং আমাদের কবির সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হওয়াটা তাঁহার সৌভাগ্য ও সম্মান বোধ করিয়াছেন।

টাইমস পত্রে ইংলণ্ডের রাজকবি নিয়োগের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা ইংলণ্ডের রাজকবিদের নাম ও তারিখ দিলাম :—

নাম	জন্ম	নিয়োগ	মৃত্যু
জিওফ্রী চসার	১৩৪০ ?	১৩৬৮	১৪০০
জন গাওয়ার	১৩২৫ ?	১৪০০	১৪০৮
হেনরী স্ক্লেগান	১৩৬১ ?	.....	১৪০৭
জন কে	.....	.....	.....
এণ্ড্রু বার্ণার্ড	.....	১৪৮৬	১৫২৩
জন স্ক্লেটন	১৪৬০ ?	১৫১৩	১৫২২
রিচার্ড এডওয়ার্ডস্	১৫২৩ ?	১৫৬১	১৫৬৬
এডমণ্ড স্পেন্সার	১৫৫৩	১৫২০	১৫২২
সামুয়েল ডানিয়েল	১৫৬২	১৫২২	১৬১২
বেন জনসন	১৫৭৩	১৬১২	১৬৩৭
সার উইলিয়াম ডেভেনাণ্ট	১৬০৫	১৬৩৬	১৬৬৮
জন ড্রাইডেন	১৬৩১	১৬৭০	১৭০০
টমাস শ্যাড্‌ওয়েল	১৬৪০	১৬৮৮	১৬৯২
নেহাম টেট	১৬৫২	১৬৯২	১৭১৫
নিরোলাস রো	১৬৭৩	১৭১৫	১৭১৮
রেভারেন্ড লরেন্স এউসডেন	১৬৮৮	১৭১৮	১৭৩০
ফিলি কিবার	১৬৭১	১৭৩০	১৭৫৭

নাম	জন্ম	নিয়োগ	মৃত্যু
উইলিয়াম হোয়াইটহেট	১৭১৫	১৭৫৭	১৭৮৫
টমাস ওয়ারটন	১৭২৮	১৭৮৫	১৭৯০
হেনরী জেম্‌স্‌ পাই	১৭৪৫	১৭৯০	১৮১৩
রবার্ট সাদে	১৭৭৪	১৮১৩	১৮৪৩
উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ	১৭৭০	১৮৪৩	১৮৫০
আলফ্রেড লর্ড টেনিসন	১৮০৯	১৮৫০	১৮৯২
আলফ্রেড অস্টিন	১৮৩৫	১৮৯৬	১৯১৩

এই-সমস্ত কবির মধ্যে অনেকেরই রচনা কিছুই বাঁচিয়া নাই, কেবল তাহাদের নাম হয় সরকারী দপ্তরে ন্যত শক্তিশালী সমসাময়িক অপর কবির বাঙ্গ কবিতার মধ্যে মাত্র আছে।

রবার্ট ব্রিজেসের কবিতার কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—  
চাক।

## ইংলণ্ডের নূতন রাজকবির কবিতা

( ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্‌ বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সপুত্রক আসিয়া সাক্ষাৎ করেন ; এবং বলেন “আমি নব্য ইংলণ্ডের সহিত প্রতিভা-প্রতিমা বিদেশী কবিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।” )

### পাপিয়া

কোথেকে, বল, আসিস্ তোরা, কোন্ পাহাড়ে ঘর ?  
না জানি সেই পাহাড় হবে কতই মনোহর !

কোন্ নদীটির তরল তানে শিখিস্ তোরা গান ?—  
কোথায় সে বন জোনাকু-জালা ?—বলে দে সন্ধান ;  
সেই বনে সেই ফুলের বনে ফিরতে আমার আশ,—  
ফুরুরে বায় ভুরুরে ফুল যেথায় বারমাস।

—না গো না—সে ধূসর পাহাড় উষর অতিশয়,  
ক্ষীণ নদীটি লুপ্তধারা,—নদী সে আর নয়।  
গান আমাদের ত্বার ভাষা—কাদাক স্বপনে,  
অশ্রু-আঁখির ঝাপনা আলো - দুখের গহনে ;  
মূর্ছাহত মূর্ছনা তার ছন্দে না ফোটে,  
বিমুখ আশার গভীর ভাষা নিশ্বাসে টোটে।  
অন্ধকারের ঘেরা-টোপে আমরা একাকী,—  
উচ্ছ্বসিয়া উচ্ছে গাহি,—কিছুই না ঢাকি ;  
রাত্রে শুধু যায় যা' বলা সেই কথা বলি,—  
মর্ত্যজনের শ্রবণ মনে পুলক উথলি।

ভোর হ'লে ফের নয়ন মুদি স্বপন-সুখাতুর,  
ডালে পালায় হাজার গলায় ওঠে যখন সুর।



গান

যে ফুল ঝরে পরশ ভরে  
 তাতেই আমার মন,  
 পাপড়ি-ঠাবুর বাসরে যার  
 রঙের আলাপন !  
 পূর্বরাগের অধিক স্মৃতি,—  
 মিলন-রাতের মধুর রীতি,—  
 এক নিমেষে এক নিশাসে  
 যুগের অভিনয় ;  
 গান যেন মোর এমনি ধারা  
 ফুলের মত হয় ।

মূর্ছনাতে মূর্ছে যে সুর  
 ভালবাসি তার,—  
 আকাশে না লিখতে লেখা  
 বাতাসে মিলায় !  
 দীপ্ত প্রাণের তপ্ত শিখা—  
 আগুন-আখর রক্ত-লিখা,—  
 এক নিমেষে উদয়, আবার  
 এক নিমেষেই লয় ;  
 গান যেন মোর এমনি ধারা  
 সুরের মত হয় ।

ঝরে' যা গান ! ফুলের মতন  
 মরে' যা তুই, হায়,  
 ডরাস্ নে রে ফুলের মরণ,—  
 মূর্ছা মূর্ছনায় ।  
 উড়ে যা তুই দূরে যা আজ,—  
 এখানে তোর ফুরিয়েছে কাজ,—  
 ফুরিয়েছে রে বাঁচিয়ে রাখা  
 অমৃতে প্রণয় ;  
 রূপের আঁধি ভরুক জলে,  
 এসেছে সময় ।

সাধ

মৃত্যু যখন আসবে মোদের ঘরে  
 প্রথম যেন আমার কাছেই আসে,  
 তুমি থেকে এমনি আলো করে  
 কঁড়েয় আমার ক্ষুদ্র-কঁড়োদের পাশে ।  
 খুসী থেকে, মনটি রেখো খাসে,—  
 খুসী থেকে খোকায় বুকে ধরে ;  
 ভুল না গো গাইতে মূহু ভাষে—  
 যে গান শুধু গাঁথা তোমার তরে ।  
 শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

গোলাপের জন্ম

(ঐষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনী)

রোজ্জোতা কুবকদের কন্যা । এক বৃদ্ধা পিতামহী  
 ব্যতীত ইহ সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর  
 কেহ ছিল না । রোজ্জোতার মুখখানি অতি সুন্দর ।  
 কালো কালো ডাগর দুটি চোখের তারা ; ফুলের পাপড়ীর  
 মত ক্রীণ দু'খানি অধরপুট । সূচিকন রেশমী চুল  
 তাহার সুন্দর মুখখানি বেষ্টন করিয়া বন্ধে ও পৃষ্ঠে  
 চলিয়া পড়িয়াছে ।

রোজ্জোতা প্রতিদিন ঝরণায় জল আনিতে যাইত ।  
 একদিন সে তাহার পূর্ণ কুণ্ড লইয়া ঝরণার তীরে  
 একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বারোহণে  
 এক সুকুমার যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন  
 এবং রোজ্জোতার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত একটু  
 জল চাহিলেন । রোজ্জোতা তৎক্ষণাৎ অতি যত্নের সহিত  
 আপনার পূর্ণ কলস হইতে ঝরণার সেই স্বচ্ছ শীতল  
 জল অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহাকে পান করাইল ।

তৃষ্ণার্ত যুবক সেই দেশের রাজকুমার ; তিনি  
 রোজ্জোতার এই সরল শিষ্ট ব্যবহারে ও তাহার অপূর্ণ  
 রূপমাধুরীতে একান্ত মুগ্ধ হইলেন ; রোজ্জোতার সেই  
 বারিপূর্ণ প্রসন্নরূপ আপনি বহন করিয়া তাহাদের  
 কুটীরে পৌঁছাইয়া দিলেন । রোজ্জোতা একজ্ঞ অতি  
 বিনীত কন্যে কুমারকে বহু ধন্যবাদ দিল ।

কুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোজ্জোতাকে

আর ভুলিতে পারিলেন না। রোজেতার কোমল কণ্ঠের সুমিষ্ট ধ্বনি কুমারের কানে যেন বীণার মত নিয়ত বাজিতে লাগিল। শরতের স্নিগ্ধ সন্ধ্যার অক্ষুট চন্দ্রালোকে, প্রকৃতির শ্রাম শোভায় সুশোভিত কলসনা নিঝরিণীর তটে, প্রথম-যৌবন-স্পর্শে-সমুজ্জ্বল যে এক রূপসী কৃষক বালিকাকে তাহার প্রস্তুতকৃত লইয়া ধূসর শিলাতলে অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন, কুমার সে অভিনব চিত্রপানি কিছুতেই তাঁহার চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

তারপর প্রতিদিনই যুবরাজকে সেই নিঝরিণীর সমীপে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি রোজেতার নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেন। বালিকার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইতেন। রোজেতার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার জলের কলস প্রতিদিনই তাহাদের কুটীরপ্রাঙ্গণে পৌঁছাইয়া দিতেন। ক্রমে তিনি রোজেতার পিতামহীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং বৃদ্ধাকে তাহার মনের মত কথা বলিয়া ধুসী করিতে লাগিলেন। এই রকমে দিন যায়।

কিছুদিন পরে রাজকুমার একদিন রোজেতার পিতামহীকে জানাইলেন যে তিনি বৃদ্ধার ঐ ভ্রমরনয়না নাতিনীটিকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছেন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। বৃদ্ধা শুনিয়া অত্যন্ত ধুসী হইল এবং তাহার নাতিনী যদি প্রস্তুত থাকে তবে তাহার নিজের এ বিবাহে কোন অমত নাই জানাইল। রোজেতা কিন্তু এই নব পরিচিত যুবককে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে তাহাদের সেই দ্রাক্ষাপত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীরখানিকে আর তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে এতদূর ভালবাসিত যে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া সে কোথাও যাইতে রাজি নহে।

যুবরাজ তখন আপনার প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তিনিই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী; রোজেতাকে দেশের রাণী করিবেন ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিবেন ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখাইলেন; রোজেতা তথাপি সম্মত হইল না। তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সংসারের মধ্যে ঐ নাতিনীটী ভিন্ন আর অন্য কোনও অবলম্বন ছিল না। সে কাহার কাছে তাহার এই অশীতিপর

পিতামহীকে রাখিয়া যাইবে? সে কাছে না, থাকিলে যে, তাহার ঠাকুরমার একদণ্ডও চলিবে না! রোজেতা রাণী হইবার প্রলোভন হেলায় পরিত্যাগ করিল।

যুবরাজ রোজেতার এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। একজন সামান্য কৃষকহুহিতা তাঁহার এই অযাচিত অগাধ প্রেম, তাঁহার রাজসিংহাসনের অর্দ্ধাংশ এত অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিল! রাজকুমার ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং এই অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তারপর কিছুদিন যায়। রোজেতা এখন নিজেই আপনার জলের কলসটী বহিয়া একাকী বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পথে আসিতে আসিতে এক-একদিন সেই অজ্ঞাত যুবরাজকে তাহার মনে পড়ে; সেদিন তাহার কক্ষের সে পাষণ কলসটী যেন কিছু অধিক ভারি বলিয়া মনে হয়। রোজেতার ক্ষীণ কটীতট সেদিন সে পূর্ণকুন্তের গুরুভার যেন আর বহন করিতে চায় না!

একদিন রোজেতা এইরূপ কাতরভাবে তাহার জলের কলস বহিয়া কুটীরে ফিরিতেছে। সেদিন ঝরণায় তাহার একটু অধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; ভরা সন্ধ্যায় নিবিড় অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠিতেছে—এমন সময় জনকয়েক বলিষ্ঠ লোক হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া রোজেতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। রোজেতা কত কাঁদিল, কত চীৎকার করিল, কিন্তু কেহই তাহার উদ্ধারের জ্ঞান আসিল না।

রোজেতাকে যাহারা লইয়া গেল তাহারা সেই যুবরাজের অমুচর। রোজেতাকে আনিয়া তাহারা যুবরাজের প্রাসাদের এক সুদৃঢ় কক্ষে বন্দি করিয়া রাখিল। যুবরাজ নানা উপায়ে তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রোজেতা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তখন কুমারের অমুচরেরা তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, রোজেতা নীরবে তাহাদের সকল অত্যাচার সহ করিয়া রহিল। তখন সেই নিষ্ঠুর অমুচরবর্গ নিরুপায় হইয়া রোজেতাকে নগরের ধর্মমন্দিরে লইয়া গেল ও বহু নগরবাসীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া

রোজেতার নামে একটা ছরপনের মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া দিল। ধর্মমন্দিরের পুরোহিতেরা রোজেতার অপরাধের বিচার করিলেন এবং তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া—জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

যেদিন রোজেতা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্ত নগরের মধ্যস্থলে আনীত হইল সেদিন যাবতীয় নগরবাসী সেই বাঁভংস দৃশ্য দেখিবার জন্ত সেখানে সমবেত হইয়াছিল। চারিপার্শ্বে গুরু কণ্টকতরু সজ্জিত করিয়া রোজেতাকে তরুপরি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিতের দল তখনও রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার জন্ত আদেশ করিতেছেন। রোজেতা স্থির অবিচলিত কণ্ঠে তখনও বলিতেছে “ঈশ্বর জানেন, আমি নির্দোষী! আমি কোনও অপরাধে অপরাধী নহি।” কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্ত অনেকের হস্তের দীর্ঘ মশালগুলা তখন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা শেষবার রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার সুযোগ দিলেন—রোজেতার মুখে তখনও সেই এক কথা, যে, সে নির্দোষী। নিষ্ঠুর পুরোহিত-সম্প্রদায় তখন রোজেতাকে মহাপাপিয়সী স্থির করিয়া তাহাকে বহু অভিসম্পাত দিলেন ও সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন।

ধূ ধূ করিয়া রোজেতার চারিপার্শ্বে রাশিকৃত গুরু কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অগ্নির ভীষণতার সহিত সহস্র নগরবাসীর একটা পৈশাচিক অট্ট উল্লাস-রোল মিশিয়া চারিদিকে একটা ক্রিকট প্রতিধ্বনি তুলিল।

কিন্তু সে প্রলয়ধ্বনি দিগন্তে বিলীন হইতে না হইতে উন্নত জনতার শ্রবণ-কুহরে যেন সহসা স্বর্গের কোন অশ্রুতপূর্ব্ব বীণা বাজিত হইয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ঝিকারু রোজেতা যুক্ত করে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে জননী মেরীর স্তুতিগান করিতেছে।

“মাগো! জগজ্জননী! এ নিখিল-বিশ্ব-রচয়িতা ধাতার ধাত্রী তুমি!—তোমার অজানিত কি দোষ আছে মা?—তোমার ঐ ছুটি রাজ্য চরণতলে নিত্য চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়। তোমার ঐ কনকপ্রতিমা ঘিরিয়া ঘিরিয়া সপ্ত

গ্রহতারা নৃত্য করে!—তোমার অগোচর কি পাপ আছে জননী? তুমি ত জান গো মা! তোমার সান্ত্বন সম্পূর্ণ নির্দোষী! তবে এস মা! নেমে এস! সন্তানকে অভয় দাও! এই ভীষণ অনলতাপ অপেক্ষাও অসহ কলঙ্কতার হ’তে তোমার নিরপরাধিনী কণ্ঠকে রক্ষা কর জননী!”

তখন প্রবল বায়ু বহিতেছিল। কোটা কোটা অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া উর্ধ্বে উঠিতেছিল। যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ক্রমে দূরে সরিয়া বাইতেছে! হৃদি-লগ্ন-যুক্তকর,— একাগ্রতায়-নিমীলিত-আঁধিযুগ—রোজেতার সেই ভক্তি-অনুপ্রাণিত সুন্দর মুখখানি অনলতাপে রক্তাভ হইয়া যেন তখন একটা অনৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছিল। চারিদিকের সমবেত জনতা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিশ্বয়ে ক্ষণেকের জন্য তাহাদের মস্তক অবনত করিয়াছিল।

সহসা যেন কাহার মৃদু কোমল কর-স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া রোজেতা চক্ষু উন্মীলন করিল—সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সুরলোকের এক মহীয়ান দেবদূত তাহার পার্শ্বে নামিয়া আসিয়াছেন। তাহার বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত পক্ষ বিস্তার করিয়া—রোজেতাকে গভীর মমতার সহিত বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহার বেদনাতুর আঁধিপল্লবে তদীয় স্নিগ্ধ শান্তিময় কোমল করপুট স্নেহে বুলাইয়া দিতেছেন। হর্ষ-বিস্ময়ে পুলকিত রোজেতা অতি সঙ্কোচের সহিত একবার আপনার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সে লেলিহান অগ্নিশিখা আর সেখানে নাই! তৎপরিবর্ত্তে তাহার চারিপার্শ্বে বিবিধ বর্ণের এক অপূর্ণ স্বর্ণীয় কুসুমরাশি স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে! আর তাহারই বিচিত্র সৌরভে দশ দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে!

সেদিন সেই প্রথম গোলাপ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল! সেই প্রথম সেদিন বিশ্বমানব ভক্তের পবিত্র আত্মার মত স্নিগ্ধ অভিরাম গোলাপ কুসুমের দিব্য সৌরভের আশ্রয় পাইল! রোজেতার নামে তাহার নাম হইল রোজ!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

## রাজর্ষি রামমোহন

( গ্রীক bumos বা বেদীভূমক ছন্দে অমুসরণে )

তোমারে অরণ করে পরম শ্রদ্ধায়

তব শ্রাদ্ধদিনে বজ্র । চিন্ত তার ধায়—

তোমার সমাধিতীর্থে ; হে মনস্বী ! নিত্য-অরণীয় ।

নবা বক্ষে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ ! ওহে সত্যপ্রিয় !

আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,

অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ—

করিলে, বাঁচালে বহু প্রাণী,

যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি' ;

বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে

মিলালে তুমি হে অবহেলে ;

নবযুগ প্রবর্তিলে তুমি

উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি ;

উচ্ছে ধরি' তর্ক-তরবার

বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার !

কীর্তি তব কীর্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত !

বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত ;—

যুগ-যুগের রাজা ! রাজ-পূজা—প্রাপ্য সে তোমার ;—

মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসামে চিত্ত বাক্সালার ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

## দেহ ও মস্তিষ্ক

কয়েক বৎসর পূর্বে, উইন্ডসর ম্যাগাজিন ( Windsor Magazine ) পত্রে, ডাক্তার টমসন্ “দেহ ও মস্তিষ্ক” নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । তাহাতে, তিনি বলেন যে, বহুদিন ধরিয়া লোকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোনই ধারণা ছিল না । প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মস্তিষ্ক বা তদর্থাচক কোন শব্দই থাকিতে দেখা যায় না । এরিস্টটল ( Aristotle ) যদিচ মস্তিষ্কের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার যে-ধারণা ছিল, তাহা আজকালকার দিনে, আমাদের নিকট নিভাস্তই হান্তকর বলিয়া বিবেচিত হয় । তাঁহার মতে মস্তিষ্কের কাষ,

শরীরের গরম রক্তকে ঠাণ্ডা করিয়া হৃৎপিণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে । দেহের অন্যান্য যন্ত্রের যে-সকল কাষ তাহা আমরা কতকটা স্পষ্ট দেখিতে পাই—কিন্তু মস্তিষ্ক এমনি নীরবে কাষ করিয়া থাকে এবং তাহা এত অসুমানসাপেক্ষ, যে, এখন পর্যন্ত ইহার সকল ক্রিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইতে পারে নাই । মনোবী গ্যালেন্ ( Galen ) ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে মস্তিষ্ক ( Conscious mind ) চিন্ময় আত্মার আধারমাত্র । ইহার পর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বহুদিন আর কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই । ডাক্তার টমসন্ যে-বৎসর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন সে সময় পর্যন্ত তাঁহার অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহই জানিতেন না যে, চিন্তার সহিত মস্তিষ্কের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে । তাঁহাদের ধারণা—মস্তিষ্ক মনের ইঞ্জিয় মাত্র । ফুস্ফুসে যে-সকল বায়ুকোষ ( air cells ) আছে, তাহাদের সকলেরই যেমন একই কাষ—মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশেরও তেমনি একই কাষ । দর্শন, শ্রবণ, অসুভব, চিন্তা প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্ম মস্তিষ্কে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে,—এই সহজ সত্যটিও সে সময় তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । এ ভ্রমটি দূর হইতে কিছুকাল বিলম্ব ঘটয়াছিল । ইহার প্রধান কারণ এই যে, মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইয়াছিল, সেগুলি বাদর কুকুর প্রভৃতির মস্তিষ্কের উপর ; মানব-মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা করার সে সময় কোনই সুযোগ ছিল না । ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার জন্ম, মস্তিষ্কে-যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে, এ ব্যাপারটি সর্বপ্রথমে ডাক্তারগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন । রোগবিশেষে, কিম্বা মস্তিষ্কে কোনরূপ গুরুতর আঘাত লাগিলে, মানসিক ক্রিয়ার যে-সকল ক্রান্তিক্রম ঘটে, সেগুলি পর্যালোচনা করিবার কালে, তাঁহারা উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন । দৃষ্টান্তরূপ বাক্যোচ্চারণ ব্যাপারটির উল্লেখ করা যাক । কথা কহিতে একা মানুষই সমর্থ, অন্য জীবের এ শক্তি থাকিতে দেখা যায় না । চিন্তার সহিত বাক্য নিয়ত সম্বন্ধ । মানুষ যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, বাক্যের দ্বারা তাহা করিয়া থাকে । সন্ন্যাস ( Apoplexy ) রোগে, স্থলবিশেষে, বাক্য-

উচ্চারণের ক্ষমতাটি লোপ পাইতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে বাক্যোচ্চারণ করিবার শক্তিটি নিহিত থাকে, ইহাদের সে স্থানটি জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়।

একদিন হাঁসপাতালে একটি রোগী আসে। এ ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। ইহার শ্রবণশক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় নাই—এ ব্যক্তি মনে মনে পুস্তকাদি পাঠ করিতে এবং তাহা বুঝিতেও সমর্থ ছিল। ইহার বন্ধুরা বলে—এক দিবস, সুরাপানে প্রমত্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি ইহার চক্ষুর মধ্যে তাহার ছাতার অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহাতে তাহার চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই বটে—কিন্তু ছাতার অগ্রভাগ মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। ইহা মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে কথন-কেন্দ্র (uttering speech centre) নিহিত ছিল। এই স্থানটিই যে কথন-কেন্দ্র, তাহার প্রমাণ এই যে, যেখানেই মস্তিষ্কের ঐ স্থলটির অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেখানেই রোগীর বাকশক্তি বিলুপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আবার এই স্থলটি ছাড়া মস্তিষ্কের অত্র কোন অংশের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও, রোগীর বাকশক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব মনে কর, মস্তিষ্কটি বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একটি অট্টালিকা-বিশেষ। এই অট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে যেন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে—এবং ইহার প্রতি-প্রকোষ্ঠে জলবহা নালী গিয়াছে। এখন কোন কারণে কোন একটি প্রকোষ্ঠের নালী যদি কমজোর হয়, তাহা হইলে ভিতরের জলের চাপে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে এবং উক্ত প্রকোষ্ঠের দ্রব্যগুলি জলের স্রোতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে অত্রান্ত প্রকোষ্ঠ-স্থিত দ্রব্যাদির কোনই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মস্তিষ্কের মধ্যে যে-সকল রক্তবহা ধমনী আছে—তাহারা কতকটা জলবহা নালারই সদৃশ। মস্তিষ্কের কার্যের জন্য বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যক। এই-সকল ধমনী মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে

দিয়া যে-সময় রক্ত গমন করে, সে-সময় উহাদের গাত্রে একটা বিশেষরূপ চাপ (pressure) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন কারণে ধমনীর গাত্র কমজোর হয়, তাহা হইলে, রক্তের চাপে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে। পুরাতন কিডনি (Kidney) রোগে, এবং গাউট (Gout) রোগে এরূপ প্রায়ই হইতে দেখা যায়। ধমনী ফাটিয়া গেলে নিকটস্থ মস্তিষ্কপদার্থ রক্তস্রোতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ইহার ফলে, মস্তিষ্কের ঐ অংশের যাহা ক্রিয়া, তাহার বিলোপ অথবা ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য মস্তিষ্কে তিনটি কেন্দ্রের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রথমটি শ্রবণকেন্দ্রের সন্নিকট; শব্দসমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়া এখানে নীত হইয়া সংরক্ষিত হয়; দ্বিতীয় স্থলটি দর্শনকেন্দ্রের সন্নিকট—চক্ষুদ্বারা শব্দসমূহ এই স্থলে নীত হয়। আর তৃতীয় স্থলটি দ্বারা স্বরযন্ত্র (larynx), গিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতির পেশীসমূহের সংকুঞ্জন ও প্রসারণ হওয়ায়, বাক্যোচ্চারণ হয়। পূর্বেবর্ণিত রোগীর ছত্রাগ্রভাগ দ্বারা এই শেষোক্ত স্থলটির অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, সেই কারণেই সে কথা কহিতে পারিতেছিল না।

#### পাঠশক্তির লোপ।

উচ্চারণকেন্দ্র ও পাঠকেন্দ্র যে এক নহে তাহা নিম্নের রোগিনীর বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়। একটি রমণী এক দিবস প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি সংবাদপত্র বা পুস্তক কিছুই পড়িতে পারিতেছেন না। তিনি মনে করিলেন বুঝি তাহার চক্ষুর কোন-রূপ দোষ ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু পরে বুঝিলেন তাহার দৃষ্টিশক্তির কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই—গৃহের তাবৎ পদার্থই তিনি দেখিতে সমর্থ। তাহার শ্রবণশক্তিরও কোন গোলযোগ ঘটে নাই—বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তিও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্ভবতঃ নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মস্তিষ্কের middle cerebral artery নামক ধমনী, যাহা পাঠকেন্দ্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহার অবরোধ বশতঃ ঐরূপ ঘটিয়া থাকিবে! সন্ন্যাস (apoplexy) নামক রোগে, বাক্যোচ্চারণের বিভিন্ন কেন্দ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একটি ভদ্রলোকের উচ্চারণ ও পাঠশক্তি সহসা বিনষ্ট

হইয়া যায়—কিন্তু তাঁহার শ্রবণশক্তি পূর্বের তায় বলবতী থাকে। এ ব্যক্তি আর-একটি রহস্য পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সে রহস্যটি হইতেছে যে, বাক্য ও অক্ষর এ দুইটি বিষয়ের জন্ম মস্তিষ্কে স্বতন্ত্র স্থল নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই ভ্রমলোকটী কথা কহিতে ও লিখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অক্ষর লিখিয়া দিলে পড়িতে তাঁহার কোনই গোলযোগ হইত না। বড় বড় হিসাব নিকাশ তিনি অবাধে করিতে ও বুঝিতে পারিতেন।

বাক্যের বিভিন্ন কেন্দ্র।

সঙ্গীতের জন্ম আমাদের মস্তিষ্কে আবার স্বতন্ত্র কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া গেলে, খুব সুনিপুণ সঙ্গীতবেত্তাও কোন গানেরই স্বরলিপি পাঠ করিতে পারেন না, যদিচ পুস্তকাদি পাঠ করিতে তাঁহার কোনই গোল ঠেকে না। আবার এমন ঘটনাও ঘটিতে দেখা গিয়াছে, কোন ব্যক্তির স্বরলিপি পাঠ করিবার শক্তিটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিন্তু স্বরলিপি ছাড়া অন্য বিষয় পাঠ করার ক্ষমতাটি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগে মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হইলে, বাক্য উচ্চারণ বিষয়ে যে-সকল ব্যতিক্রম ও বৈলক্ষণ্য ঘটে সেগুলি পর্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, কোন পুস্তকাগারে ভিন্ন ভিন্ন শেল্ফে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাবলি সজ্জিত থাকে, আমাদের মস্তিষ্কেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাক্যের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন স্থল নির্দিষ্ট আছে। কেহ যখন কোন একটি নূতন ভাষা শিখিতে থাকেন, সে সময় উক্ত ভাষার জন্ম তাঁহার মস্তিষ্কে একটি নূতন স্থান নির্দিষ্ট হইতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন ইংরাজ, যিনি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজি ব্যতীত, ফরাসী, ল্যাটিন গ্রীক ভাষায় ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছেন—তাঁহার কথা উল্লেখ করা যাক। এমন ঘটিতে দেখা গিয়াছে—মস্তিষ্কের রোগবিশেষে, অথবা গুরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হইলে, এ ব্যক্তি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, ফরাসী ভাষা নির্ভুল না হইলেও কতকটা পড়িতে পারেন, ল্যাটিন তদপেক্ষা নির্ভুল পড়িতে পারেন, গ্রীক পড়িতে তাঁহার একটিও ভুল হয় না। এই ঘটনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অবাধে

করিতে পারা যায় যে, ইহার মস্তিষ্কে যে শেল্ফে ইংরাজি ভাষা ছিল, সেটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ফরাসী ভাষার শেল্ফখানির কতকটা, ল্যাটিন ভাষার অনিষ্ট ঘটিয়াছে, আর গ্রীকভাষার শেল্ফখানির মোটেই অনিষ্ট হয় নাই। আর-একটি কথা এই যে, মস্তিষ্কে যে-সকল ভাষার শেল্ফ আছে, তাহাতে ক্রিয়াপদসমূহ সর্বপ্রথমে সজ্জিত, সর্বনাম ও বিশেষণপদসমূহ তাহার পর সজ্জিত এবং বিশেষ্যপদ সকলের পরে সজ্জিত হয়। নিম্নের ঘটনাটিতে কথাটা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে। একব্যক্তি কথা কহিতে অসমর্থ বলিয়া, হাঁসপাতালে আসে। ডাক্তার টমসন্ তাহার কারণ এইরূপ স্থির করেন যে, মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে কথন-কেন্দ্র (speech centre) অবস্থিত, এ ব্যক্তির মস্তিষ্কের সেই স্থানটিতে একটি অর্কুদ (tumour) জন্মাইয়া তাহার বাঁকশক্তির তিরোধান ঘটাইয়াছে। পটাশিয়াম আইয়োডাইড (Potassium Iodide) নামক ঔষধ সেবনে এরূপ অর্কুদ দূর হইয়া থাকে। ডাক্তার টমসন্ রোগীকে তাহাই ব্যবস্থা করিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন, যে, ঔষধ সেবনে রোগীর যদি উপকার হয়, তাহা হইলে, সর্বপ্রথমে সে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে পারিবে, বিশেষ্য পদ সর্বশেষে পারিবে। ১৫ দিন ঔষধ সেবন করার পর রোগী যখন পুনরায় হাঁসপাতালে আসে, ডাক্তার টমসন্ তাহার সম্মুখে একখানি ছুরিকা ধরিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বল তো এটা কি ?” সে উত্তর করিল “তুমি কাটবে।” অতঃপর একটি পেনসিল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করায় কহিল “তুমি লিখবে।” বহুদিন অতীত হইলে তবে এ ব্যক্তি বিশেষ্যপদ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার একটু কারণও যে না আছে এমন নহে। মানবশিশু যখন প্রথম কথা কহিতে শিখে তখন সে ক্রিয়াপদগুলিই শিখা করিয়া থাকে। ক্রিয়াসমূহ আমাদের ভিতরের জিনিস—বাহিরের নয়। দেখা, শুনা, করা প্রভৃতি ক্রিয়া আমাদের নিজস্ব, আর যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, কি করা যায় তাহা বাহিরের পদার্থ; ইহাদের নামকরণ আমরা পরে করিতে শিখি। যে-সকল বিশেষ্যপদের সহিত আমরা সর্বশেষে পরিচিত হই, ভুলিবার সময়, সেইগুলিই আগে ভুলিতে

আরম্ভ করি। এই কারণেই বুদ্ধর' লোকের নাম করিবার সময় প্রায়ই ভুল করিয়া বসেন।

মানুষ ও বানরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

জীবজগতে মানুষে ওরাংওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরগুলির সহিত একশ্রেণীভুক্ত। মানুষের সহিত এই-সকল বানরের যে খুবই সাদৃশ্য আছে, একথা সকলেই জানেন। মানুষ ও বানরের দেহস্থ যন্ত্রসমূহ অনেকটাই একরূপ। অধ্যাপক হাক্সলি (Huxley) প্রতিপন্ন করিয়াছেন মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কে বাহ্যতঃ কোনরূপ অসাদৃশ্য নাই তথাপি মন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটা শিম্পাঞ্জিকে যতই শিখাও না কেন, সে কিছুতেই সাহিত্যের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—আফিসের হিসাব রাখিতে সমর্থ হইবে না। মানুষকে শিখাইলে সে সব কাজই করিতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যাপ্তি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন বানরই সহস্র চেষ্টায় এ-সকল শিখিতে সমর্থ হয় না। এই তো গেল মানুষ ও বানরের মধ্যে একরূপ পার্থক্য। আবার এক হিসাবে মানুষকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে, বানরকে তাহা বলা যায় না। মানুষের সৃজন-ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষের যদি এ ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে জগতে আমরা কয়টা পদার্থ দেখিতে পাইতাম? নদীর উপরকার সেতুটি মানুষের আশ্চর্য্য সৃষ্টিমহিমা কীর্তন করিতেছে। মানুষ ও বানরের কার্যাবলি আলোচনা করিলে, এই মনে হয় যে, মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকিলেও গুণগত পার্থক্য যে খুব বেশী মাত্রায় আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

অধুনা স্থির হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক চিন্তাবৃত্তির আধার নহে। ইহা চিন্তাকারীর চিন্তার যন্ত্র মাত্র। সে কেমন? যেমন বেহালাখানি বাদকের সুর বাহির করিবার যন্ত্রমাত্র। বেহালায় নিজের সুর বাহির করিবার শক্তি নাই। মস্তিষ্কেরও সেইরূপ নিজের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। যাহার মস্তিষ্কের ওজন যত বেশী, সে তত বুদ্ধিমান—এ কথা মূলে কোন সত্য নাই। বর্তমানকালে হেল্ম-

হোল্টজ্ (Helmholtz)-এর তুলা বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কে জন্মাইয়াছে? আশ্চর্য্য এই যে, ইহার মস্তিষ্কের ওজন, একটি সাধারণ ব্যক্তির মস্তিষ্কের অপেক্ষা অনেক কম। অধুনা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আর একটি অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; সে তত্ত্বটি হইতেছে—চিন্তা করিবার সময় আমরা সমস্ত মস্তিষ্কটাকে কায়ে নিযুক্ত না করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্রকে নিযুক্ত করিয়া থাকি। হস্ত পদাদির যেমন দক্ষিণ বাম আছে, মস্তিষ্কেরও তাহা আছে। ইহাদের একটাই চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কায়ে ব্যাপ্ত হয়, অপরটা অলসভাবে বসিয়া কাটায়। অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখা যায়, মস্তিষ্কের অর্দ্ধাংশ একবারে নষ্ট হইয়াও রোগী বহুদিন জীবিত আছে—তাহার মানসিক ক্ষমতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এস্থলে অলস মস্তিষ্কটাই নষ্ট হয়—যেটি চিন্তা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয়—সেটি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অবস্থিতি করে।

প্রত্যেকের মাথায় একটি করিয়া অলস মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কই যদি চিন্তা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কারণ হয়, তাহা হইলে, যাহার মাথা যত বড় সে তত চিন্তাশীল হইবে—কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। মানুষের দুটি চক্ষু আছে বলিয়া সে কোন জিনিসকে দুটা না দেখিয়া একটাই দেখে, আবার এক চোখে দেখিলেও সেই একটাই দেখে। দুটি মস্তিষ্ক আছে বলিয়া মানুষ দ্বিগুণ চিন্তা করেনা। এখন প্রশ্ন এই যে, চিন্তা করিবার কালে আমরা দুইটি মস্তিষ্ক (দক্ষিণ ও বাম) নিয়োজিত না করিয়া একটাই বা করি কেন? আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সে সময়, আমাদের দক্ষিণ, বাম, কোন মস্তিষ্কটাই চিন্তা করিবার উপযোগী থাকে না। মানসিক ক্ষমতা সমূহ আমাদের স্বোপার্জিত জিনিস। ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেহ বাক্য উচ্চারণ করেনা। নবজাত শিশুর চক্ষু কর্ণাদি থাকিয়াও না-থাকার সায়িল বলিতে হয়; কেননা এ-সকল দ্বারা সে কোন পদার্থেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা শিশু ক্রমে ক্রমে জ্ঞান উপার্জন করিতে থাকে। শিক্ষার দ্বারা তাহার মস্তিষ্কের স্থান-বিশেষের

পরিবর্তন সাধিত হইয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কেন্দ্র বিরচিত হয়। এই কারণেই যতদিন অনুশীলন ও অভ্যাস দ্বারা তাহার মস্তিষ্কে বেহালা বাজাইবার জ্ঞান একটি বিশেষ কেন্দ্রের উদ্ভব না হয় ততদিন কেহ সুনিপুণ বেহালাদার হইতে পারে না। মস্তিষ্কে কার্যোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, সময় ও অনুশীলনের আবশ্যক। একটি মস্তিষ্ক দ্বারা যখন কায় চলিতে পারে, তখন উভয় মস্তিষ্কে কার্যোপযোগী করিবার জ্ঞান দ্বিগুণ পরিশ্রমের আবশ্যক কি? এই অকারণ কালক্ষয় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার জ্ঞানই, মানুষ একটা মস্তিষ্কেই পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এখন কথা এই—দক্ষিণ ও বাম এই দুইটা মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ মস্তিষ্কটা চিন্তা প্রভৃতি কার্যের উপযোগী হয়? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যাহারা প্রধানতঃ দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের বেলায় বাম মস্তিষ্ক, আর যাহারা বাম হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ মস্তিষ্কটি পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানই বাক্য-উচ্চারণ-কেন্দ্র এবং অগ্ৰাণ জ্ঞানকেন্দ্র-সমূহ প্রধানতঃ বাম মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু কথা কহিতে শিখিবার পূর্বে ইসারায় মনোভাব ব্যক্ত করে। সঙ্কেত ও ইঙ্গিত একরূপ অক্ষুট ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের মস্তিষ্কে হস্ত-সঞ্চালনের-কেন্দ্র-সমূহ যেস্থলে অবস্থিত, তাহার অব্যবহিত পরেই বদন, ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতির পেশীগুলির কেন্দ্র সংস্থাপিত। ইহার ফলে এই হয় যে, শিশু হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে করিতেই ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি নাড়িতে আরম্ভ করে। ওষ্ঠ জিহ্বা, বদন প্রভৃতি নাড়িলে ধ্বনি প্রকাশ হয়। এবং এই ধ্বনিই কালক্রমে বাক্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে, শিশুর মস্তিষ্কে বাক্যোচ্চারণের কেন্দ্রের আবির্ভাব হওয়ার পর হইতে, কালক্রমে চিন্তা-কেন্দ্রের এবং তাহার পর জ্ঞান-কেন্দ্রের সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহা হইলে, আমরা এই দেখিতেছি যে, বয়সের সহিত আমরা আমাদের বাম মস্তিষ্কে কতকগুলি করিয়া কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়া লই। এ সকল ব্যতীত আমাদের মস্তিষ্কে আরও কতকগুলি করিয়া কেন্দ্র থাকে; এগুলি সহজাত অর্থাৎ আমাদের জন্মকাল

হইতেই বর্তমান থাকে। এ কেন্দ্রগুলি আবার আমাদের মস্তিষ্কের বাম দক্ষিণ উভয় অংশেই সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে। এ কেন্দ্রগুলির কি কাজ? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দর্শন-কেন্দ্রের উল্লেখ করা যাক। চক্ষুকে দর্শনে-দ্রিয় বলে বটে, কিন্তু চক্ষুর নিজের দেখিবার কোন শক্তি নাই। মস্তিষ্কেরই একা দেখিবার শক্তি আছে। চক্ষুর রেটিনা (retina) নামক পর্দায় পদার্থের যে প্রতিবিম্ব পড়ে Optic nerve (দর্শন-স্নায়ু) দ্বারা তাহা মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে নীত হয় এবং ঠিক সেই সময় পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। আমাদের যেমন দক্ষিণ ও বাম দুইটা দর্শনেদ্রিয়, তেমনি মস্তিষ্কের দক্ষিণ ও বামে দুইটা দর্শন-কেন্দ্র আছে। যদি কোন ব্যক্তির দক্ষিণ ও বাম মস্তিষ্কস্থিত দর্শন-কেন্দ্র দুইটি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে, চক্ষু থাকিয়াও সে ব্যক্তি অন্ধ হয়। দর্শন-কেন্দ্র সঙ্কেত যাহা যাহা বলা হইল, শ্রবণ, আত্মাণ প্রভৃতি সঙ্কেতও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। দর্শন, শ্রবণ, আত্মাণ, অনুভব প্রভৃতির জ্ঞান যে-সকল কেন্দ্র আছে, সেগুলি ছাড়া আমাদের দক্ষিণ ও বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আর কতগুলি কেন্দ্র আছে। আমাদের দেহে যে-সকল ইচ্ছাধীন পেশী আছে—এই কেন্দ্রগুলি সে-গুলিকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। এই-সকল কেন্দ্র হইতে স্নায়ুসমূহ উৎপন্ন হইয়া নিম্নে আসিতে আসিতে এক স্থানে পরস্পর কাটাকাটি করে—ঠিক যেমন ইংরাজি X অক্ষরের বাহু দুটি পরস্পর কাটাকাটি করিয়াছে সেইরূপ আর কি। ইহার ফলে দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পেশী-সমূহ বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র-দ্বারা এবং বাম পার্শ্বস্থ পেশী-সমূহ দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্র-দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কারণে কোন ব্যক্তির দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত, আর বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র নষ্ট হইলে দক্ষিণ অঙ্গের গক্ষাঘাত হয়।

একটি অতিরিক্ত মস্তিষ্কের আবশ্যক কি?

চিন্তা-কার্যের জ্ঞান যদি একটিমাত্র মস্তিষ্ক হইলেই চলে, তবে দুইটা মস্তিষ্ক রহিয়াছে কেন? এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের দৈহিক ক্রিয়াগুলির



জন্ম দক্ষিণ বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আবশ্যিকতা আছে। অনুভব করিবার জন্ম ও পেশী-সমূহের সঞ্চালনের জন্ম দুইটি মস্তিষ্কই, তুল্য আবশ্যিক। আর একটি কথা এই যে, শৈশবে কোন কারণে কাহারও যদি চিন্তা এবং অজ্ঞান মনসিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত মস্তিষ্কটি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অপরটিকে ঐ-সকল কার্যের উপযোগী করিয়া না তুলিতে পারা যায় এমন নহে।

উভয় মস্তিষ্ককে চিন্তাদি কার্যের উপযোগী

করা উচিত কি না ?

অনেকে মনে করেন, আমাদের উভয় মস্তিষ্ককেই যদি চিন্তাদি কার্যে অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে খুবই সুবিধা হইবার কথা। ইহাদের বিশ্বাস মস্তিষ্কের যত বেশী অংশ চিন্তাদি কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে, ততই ভাবের আধিক্য হইতে থাকিবে। ইহারা জানেন না যে মস্তিষ্কের ভাব-সৃষ্টির কোনই শক্তি নাই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য করিতে চেষ্টা করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। একটি বালিকা দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার না করিয়া সকল কাজেই বাম হস্ত ব্যবহার করিত। এই কারণে তাহার বাম হস্তখানি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহার ফল এই হয় যে, উক্ত বালিকার বাক্য উচ্চারণের কেন্দ্রগুলি সম্যক পরিণত হইতে পারে নাই।

মস্তিষ্কে কেন্দ্রের স্মৃটন।

মস্তিষ্কে কোন একটা নূতন কেন্দ্রের উদ্ভব করিতে হইলে, রীতিমত সাধ্য সাধনার আবশ্যিক। একটি বয়স্ক ব্যক্তি যদি কোন বিদেশীয় ভাষায় পারদর্শী হইতে চাহেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া উক্ত ভাষার শব্দাদি, অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাতে ঐ-সকল শব্দ তাঁহার মস্তিষ্কের উচ্চারণ-কেন্দ্রে স্থানলাভ করিবে এবং আবশ্যিকমত মুখে আসিতে সমর্থ হইবে। এ ব্যাপারটি নিতান্ত সহজ নয়—ইহাতে যথেষ্ট ইচ্ছা-(Will)-শক্তির প্রয়োগ আবশ্যিক করে।

ইচ্ছা (Will) নির্দিষ্ট পদার্থ বিশেষ।

কুস্তকার যেমন একতাল কাঁদা লইয়া তাহা হইতে তাহার ঈষ্মিত পদার্থ নির্মাণ করে, মানুষের ইচ্ছাও (Will)

তেমনি মস্তিষ্কে গঠিত করিয়া তুলে। সূর্য্যরশ্মি যেমন চকুর রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তেজিত করে, মানুষের ইচ্ছাও তেমনি মস্তিষ্ক পদার্থকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সূর্য্য-রশ্মির ঞায় ইচ্ছাও (Will) নির্দিষ্ট ভৌতিক পদার্থ বিশেষ। সূর্য্যরশ্মির যেরূপ physical chemical ও physiological কার্য দৃষ্ট হয়, ইচ্ছারও তাহা না থাকিবে কেন ?

মনের লাগাম।

ইচ্ছাকে মনের লাগাম বলিতে পারা যায়। চিন্তাকালে ইচ্ছা মনকে সংযত করিয়া রাখে ; মন আবার দেহকে সংযত করে।

জীবনে নিফলতার কারণ।

চিন্তাকালে যতটা সংযমের আবশ্যিক এমন আর কোন কালে নহে। চারিদিক হইতে ভাবস্রোত আসিয়া চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা যতই দুর্বল হইব, ভাবস্রোত ততই প্রবলতর হইতে থাকিবে। কয়রোগে রোগী যখন একান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন আমরা এই দেখি যে, রোগীর চিন্তার ও ভাবের যেন কূলকিনারা নাই। শেষে ইহা অসঙ্গত প্রলাপে পরিণত হয়। মানবজীবনে অসংযম, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা দ্বারা কোনই ফল হয় না। বরঞ্চ অনর্থ যথেষ্টই হইতে দেখা যায়। সকলেরই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যিক। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকিলে, ভাবের আধিক্যে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই না। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যানুযায়ী কথা কহে, চিন্তা করে, কার্য করে, সেই যথার্থ মানুষ। এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের মানসিক শক্তি খুবই বেশী, কিন্তু এক ইচ্ছাশক্তির অভাবে, তাহাদের এ-সকল গুণ কোনই কাজে লাগে না—তাহাদের জীবন একবারে নিফল হইয়া যায়। এই কারণে সকলেরই আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। যাহাদের আত্মসংযম নাই, তাহাদের দশা অনেকটা ভগ্নপ্রাকার-নগরীর তুল্য—বেষ্টন-প্রাচীরের অভাবে নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

## ‘বাঙলা ভাষার আকার

গত কয়েকমাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী “ভারতীতে” বাঙলা ভাষার আকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলা কথাবার্তার ভাষা ও ছাঁদ আরও অধিকভাবে সাহিত্যের মধ্যে প্রচলনের জন্ত তিনি এমন অনেক কথা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার অভিমতগুলি কিছু অতিরিক্ত ও অসংলগ্ন বোধ হয়, তবে তিনি যখন নিজেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত তিনি ‘ওকালতি’ করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিস্পয়োজন। বিশেষ মূলে যখন তাঁহার সহিত আমাদের ঐক্য রহিয়াছে, তখন খুঁটিনাটি লইয়া বাদা-হুবাদ না করিয়া, আমাদের বক্তব্য নিজের ভাবেই বলিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতভাষা ও ‘আলালি’ ভাষার বিবাদ বন্ধিমচন্দ্রই একরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সেই বিবাদের ছায়া লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটা বড়রকম বিতর্ক তোলার তেমন সঙ্গত কারণ দেখি না। বন্ধিমচন্দ্র অতিমত ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত-নিষ্পন্ন শব্দের সহিত চলিত কথার যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে যে ভাষা, তাহাই যথার্থ সাধুভাষা। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা এই সূত্র অবলম্বনেই লিখিয়া আসিতেছেন, তবে অবশ্য বিষয়, রুচি ও যোগ্যতা ভেদে, ও ভাষার স্বাভাবিক পরিণতির সন্ধে, নানা শ্রেণীর রচনার বিকাশ হইতেছে। বন্ধিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় নূতন সুর, লয় ও মূর্ছনা দিয়াছেন, এবং কত বিচিত্র শিল্পসম্পদে উহাকে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের মূল কাঠামু এখনও বজায় আছে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের ধারণা, চূর্ণ ও সংহত, গন্তীর ও সরস, সুষ্ঠু ও সতেজ, এক কথায় সর্কার্থসাধক, সর্কাংশে ‘কাটাল’ গদ্যের যে-আদর্শ বন্ধিমচন্দ্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, এবং যদি আমরা বন্ধিমচন্দ্রের রচনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হই তাহা হইলে আজ-কালকার লেখার

হু একটি যে প্রধান দোষ তাহা অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে চলিত শব্দ এবং বিশেষতঃ ক্রিয়াপদগুলি লেখা উচিত কি না? — আমাদের বিবেচনায় এই তর্কটি তেমন গুরুতর নয়। প্রমথ বাবু বলেন এইরূপই লেখা উচিত। কিন্তু আমরা অকুণ্ঠিতভাবে এ মতে সায় দিতে পারি না। লিখিতভাষা সকলেই বুঝে, সকলেই ব্যবহার করিতে পারে, কাহারও অভিমানে আঘাত করে না। একরূপ অবস্থায় কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে লিখিত ভাষার অবাধ পরিবর্তন করিলে নাহক্ জ্বরদস্তি করা হইবে। কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার সংযোগ বেশী তফাৎ হইয়া পড়িলে, লিখিত ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়ে যথার্থ কথা। কিন্তু বাঙলাদেশের বারআনা লোক যখন কলিকাতার dialect ব্যবহার করে না, প্রত্যুত এমন বাঙালী বিরল নয় যাহাদের নিকট কলিকাতার dialect বাস্তবিকই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্বোধ, তখন প্রমথবাবু যে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন, যেদিক দিয়াই হউক, তাহার হাত তিনি একেবারে এড়ানু কি করিয়া?

সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা ভাষায় উচ্চারণতত্ত্বের বিশেষ দৌরাত্ম্য নাই। আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, আমরা স্ব-ইচ্ছায় সে উৎপাত যেন ডাকিয়া না আনি। স্বরবর্ণের দু-একটা বক্র উচ্চারণ (যেমন ‘কেন’র ‘এ’কার), ব্যঞ্জনবর্ণের দু-একটি জটিল উচ্চারণ (যেমন S, Z), ইহা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু অভাব দেখি না। দুই চারিটি সাক্ষেতিক চিহ্নের সাহায্যে উপস্থিত বর্ণমালার দ্বারাই সে অভাব পূরণ হইতে পারে। আমাদের ভাষায় লুপ্ত অক্ষর প্রায় নাই। অকারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হসন্ত উচ্চারণ একটা ব্যতিক্রম স্থল বটে, তবে উহার নিয়ম সোজা। যুক্ত অক্ষরের কৃত্রিম উচ্চারণও নাই বলিলেই হয়। যা কিছু গোলযোগ রহিয়াছে চলিত বা প্রাদেশিক শব্দের বানান লইয়া, এবং বাস্তবিক ভাষার যদি কোন আশু সংস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে, ত’ সে এইখানে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, বন্ধ, গন্ধের নিয়ম সাধারণতঃ সংস্কৃত-নিষ্পন্ন পদের সম্বন্ধেই খাটে। তন্ত্রিণ অপর সকল

শব্দের বানান ষ্ঠি সরলভাবে হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়, এবং সূত্রের বিষয় আমাদের ভাল লেখকদের ঝোঁকও সেই দিকে। যে-সকল প্রাদেশিক শব্দের বানান ব্যবহারে একরূপ বিধিবদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাদের স্বতন্ত্র কথা। তবে চলিত শব্দ ও প্রত্যয়ের বানান সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সূত্র নির্ধারিত হইলে বড় ভাল হয়। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দমালা একেবারে সংগৃহীত ও অভিধানভুক্ত হউক, একরূপ বলি না। তবে সাধারণ চলিত শব্দের ও প্রত্যয়ের গঠন ও উচ্চারণপ্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, সাহিত্যের আদর্শে উহাদিগকে যথাযথ বানান করিবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম থাকিলে সুবিধা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ, অথবা সেইরূপ কোন প্রামাণ্য কেন্দ্র হইতে, যথোচিত প্রকাশ্য আলোচনার পর, যদি এইরূপ কতকগুলি সূত্র প্রচারিত হয়, এবং দেশের বিশিষ্ট সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রগুলি যদি সেগুলি মানিয়া চলেন, এবং নিজেদের প্রকাশিত রচনায় উহাদের ব্যতিক্রম ঘটতে না দেন, তবে অচিরে সাহিত্যের মধ্যে একটা অতি আবশ্যকীয় শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে।

বহিরবয়বগত ঐক্য ভাষার একটা প্রধান জিনিস, সূত্রাং ব্যাকরণের কোন ধরাধা নিয়ম না থাকিলেও সাহিত্যে যে শিষ্টরীতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার সহসা ব্যতিচার করা উচিত নয়। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ যে পরিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক স্থলে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ উচ্চারণের অনুমায়ী বিকৃত বানান সাহিত্যে চলাইতে গেলে, ইষ্টের বদলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বল, কলিকাতা অঞ্চলে 'অ'কারান্ত শব্দ মাত্রই 'ও'কারান্ত করিয়া উচ্চারণ করা একটা রোগের মধ্যে। উহা যে প্রাদেশিকতা তাহার আর সন্দেহ নাই, এবং সাহিত্যে কখনই অনুকরণীয় হওয়া উচিত নয়। সূত্রাং 'ভালো' 'কালো', 'খাবো', 'যাবো', এইরূপ লেখার আমরা পক্ষপাতী নহি। শুধু 'অ'কারান্তই খা বলি কেন, কলিকাতা অঞ্চলে আদিত্তে 'অ'কারান্ত ও সাংস্কৃতঃ স্বরান্ত পদেরও নানারূপ বিকৃত উচ্চারণ দেখা যায়; যথা, 'প্রতি' ( 'প্রতির' স্থানে ), 'প্রিস্তি',

বা 'প্রোসিষ্ট', 'প্রোবাস', 'সতি', 'মিথো', 'দিশী', 'বোন', 'মোন', ইত্যাদি। মিশ্র স্বরবর্ণের উচ্চারণ ত একেবারেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; যেমন, 'দেওয়াল' বা 'দেয়াল' স্থানে 'দেল', 'দোয়াত' স্থানে 'দোত', 'ওয়াল' স্থানে 'ওলা' ( 'সন্দেশওলা', 'কাপড়ওলা' ), ধোঁয়া স্থানে 'ধোঁ', 'বিয়ে' 'বেহাই' ( বা 'বেয়াই' ), 'বেহান' ( বা 'বেয়ান' ) স্থানে যথাক্রমে বে, 'বেই' 'বেন্' ইত্যাদি। কয়েকটি এইরূপ অপভ্রষ্ট পদ প্রমথ বাবুর রচনায়ও স্থান পাইয়াছে দেখিয়া হৃৎখিত হইয়াছি; যথা, 'হয়তো', 'বোঝানো', 'হিসেব', 'বিদো' ( বাপছলে ? ), 'রক্ক'। এমন কতকগুলি কথা আছে যেগুলি 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করা উচিত কি না সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে\*। সেগুলি না হয় ছাড়িয়া দিই। মোট কথা 'অ'কারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ আমরা সাধারণতঃ হসন্ত ভাবে উচ্চারণ করি। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন 'ঐ'কার কি 'ওঁ'কার যুক্ত শব্দ হইলে, অথবা উপাস্তে 'ত' বা যুক্ত অক্ষর থাকিলে, আমরা স্বরান্ত ভাবে উচ্চারণ করি, যেমন, 'কৃত', 'পঠিত', 'মোন', 'শৈল', 'ফর্দ', ইত্যাদি। ক্রিয়াপদগুলির অবশ্য স্বরান্ত উচ্চারণই হইয়া থাকে। যেখানে স্বরান্ত উচ্চারণ হয়, কলিকাতা অঞ্চলে সেখানে 'ও'কারের টান থাকে।—অথচ সেখানে লিখিত 'ও'কার ঠিক পূরা উচ্চারণ করিলে বেয়াড়া শুনায়। অনেক সময়ই কলিকাতা অঞ্চলের এইরূপ শব্দের যে উচ্চারণ হয়, তাহা 'অ'কার এবং 'ও'কারের মাঝামাঝি রকমের একটা। এই জন্ত 'অ'কারান্ত শব্দ 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করিয়া অনর্থক বৈষম্য সৃষ্টি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। এইরূপ কৃত্রিম phoneticsএর উত্তম নমুনা 'মতো' ও 'কী' এই দুইটি শব্দ। সৌধীন সাহিত্যের বাজারে আজকাল ইহাদের পূরা কাটতি। অথচ এইরূপ বানানের কোন সার্থকতা দেখি না। 'মত' 'অভিমত' অর্থে, বিশেষ্য শব্দ, উহার উচ্চারণও হসন্ত। 'মত' বিশেষণ অর্থে, ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি শব্দের জায়

\* যেমন, 'উণ্টো' 'বেমুরো'। সাবেক রীতি অনুসারে লিখিলে 'উণ্টা' 'বেমুরা' এইরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু উহা সকলে না পছন্দ করিতে পারেন। একরূপ হলে 'উণ্ট' 'বেমুর' এইরূপ লিখিয়া 'অ'কারান্ত ভাবে উচ্চারণ করিলে হানি আছে কি?

(যেমন, 'এত', 'তত', 'যত', 'কত') স্বরাস্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ইহার উপর না-হক্ একটা 'ও'কার যুড়িয়া দিবার কি তাৎপর্য? কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে হইলে, 'মতো'-তেও ত কুলার না, 'মোতো' লিখিতে হয়। 'কি'র স্থান ও অর্থভেদে দীর্ঘ উচ্চারণ হয় সত্য। কিন্তু উহা ত মাত্রা বা ঝাঁক বা Emphasisএর কথা। এই নিয়মে বানান পরিবর্তন করিলে, অনেক স্থলেই ত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ লিখিতে হয়। এ-সব খেয়ালের বেশী প্রাদুর্ভাব সাহিত্যের পক্ষে হিতকর নয়। উচ্চারণ উড়ন্ত, অশরীরী শক্তি, কত স্বল্প কারণে মুখে মুখে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই জন্তই সাহিত্যে বানানের বাধ দেওয়া আবশ্যিক। নচেৎ এমন বর্ণমালা এপর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই, যাহার দ্বারা মুখের ভাষার সূক্ষ্মসূক্ষ্ম টানটান সম্যক্রূপে লিখিত আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। করিবার বিশেষ দরকার আছে বলিয়াও মনে হয় না।

এখন কথা রহিল ক্রিয়ার রূপ লইয়া। আমরা স্বীকার করি কতকগুলি লিখিত ক্রিয়াপদ কিছু বেশী 'লতান' বা লম্বা, এবং অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিবার বিশেষ আবশ্যিক বোধ হয়। ভাষার গতি ক্রিয়াতে, সূত্রাং ক্রিয়াগুলি 'লড়বড়ে' হইলে ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ হয় না। লিখিত ভাষার একটা অভ্যস্ত লয় আছে, সেজন্য লিখিত ভাষা পড়িবার সময় এ অভাব তত ধরা পড়ে না, কিন্তু যখন আমরা বক্তৃতা করিতে উঠি, তখন উহা সহজে ধরা পড়ে। এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙলায় বক্তৃতার প্রসারের ও কথা-বার্তার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াগুলি লিখিত ভাষায় ক্রমশঃ প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তবে এ সম্বন্ধে আমরা রক্ষণশীল নীতির কিছু পক্ষপাতী। ক্রিয়া-পদগুলি ভাষার currency বা চলিত মুদ্রা। ইহার দ্বারাই দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, বাঙলার সকল প্রদেশের মধ্যেই লিখিত ভাষা সহজবোধ্য ও সুখসেব্য হইয়াছে। ভাষার currency ঠিক রাখিতে পারিলে, ভাষার উপর 'আর্য্য আক্রমণ'ই হউক 'বা' 'মুসলমান আক্রমণ'ই হউক, কিছুতেই তেমন ভীত হইবার কারণ

দেখি না। কারণ যে-সকল শব্দই 'বাঙলা ভাষায় চোকাইবার চেষ্টা করা হউক না কেন, যেগুলি বাঙলার প্রকৃতির সহিত মিশ্ থাকিবে, সেইগুলিই থাকিয়া যাইবে। অপরগুলি কৃত্রিম উদ্ভেজনার অবসানে উপযুক্ত রসের অভাবে মরিয়া যাইবে। বর্তমান ক্রিয়ার রূপগুলি বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চারণ-বৈষম্যের মধ্যে কতকটা মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সূত্রাং সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার রূপগুলি যাহাতে কতকটা সেই স্থান রক্ষা করিতে পারে এবং কালে সকলের গ্রাহ হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের যাত্রী, কথকতায় (থিয়েটারের কথা ধরিব না, কেননা উহা খাঁটি কলিকাতার জিনিস), এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, যাহা খুব দীর্ঘও নয় অথচ খুব হ্রস্বও নয়। সেইরূপ একটা আদর্শ আমাদের সামনে থাকিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত ক্রিয়ার রূপ লিখিত ভাষার অভ্যস্ত লয়ের উপর অনেক দিন আধিপত্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সূত্রাং, আপাততঃ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ক্রিয়ার উভয়বিধ আকারই প্রচলিত থাকুক, ইহার বেশী বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। লেখকের রুচি ও প্রয়োজন ভেদে যখন যেমন ভাল মনে করিবেন, ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় একটা সামঞ্জস্য হইয়া কালে একপ্রকার আকারই অবশ্য প্রবল ও গ্রাহ হইবে। তবে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা উচিত মনে করি, তখন যেম তাহার মধ্যে অনাবশ্যিক গ্রাম্যতা না চোকাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি সুপরিজ্ঞাত নিয়ম \* থাকিলে ভাল হয়। প্রথম বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কলিকাতা অঞ্চলের 'উম্'-ভাগান্ত ক্রিয়ার রূপ কোন কালে দেশময় গ্রাহ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

\* আমরা ব্যাকরণের সূত্র প্রণয়নের স্পর্শা রাখি না, তবে সং-ক্রিয়া রূপের একটা সাধারণ ধসুড়া দেওয়া যাইতে পারে—

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি—

'ইয়া' স্থানে 'এ' বা 'য়ে'—ক'রে ('কোরে' নয়), খেয়ে।  
'অকারান্ত ক্রিয়া একারান্ত। ইতে স্থানে তে—ক'রুতে ('কোরুতে নয়), খেতে, হ'তে ('হোতে' নয়)। 'ইলে' স্থানে 'লে'—ক'রুলে ('কোরুলে নয়), ইঃ।

অধচ তিনি উহা অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি কিছু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় না ?

লিখিত ভাষার যে সংকীর্ণতা বা আড়ষ্টতাবের কথা প্রমথ বাবু বলিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ যে মুখের ভাষার সহিত উহার কম সংযোগ এমন নয়, আর একটা

২। সমাপিকা ক্রিয়া—বর্তমান-কাল—‘ইতেছে’ ‘ইতেছ’ ‘ইতেছি’ প্রভৃতি বিভক্তির ‘ই’ বা ‘ইতে’-র লোপ

করতেছে (পূর্ববঙ্গ), করছে (পশ্চিম বঙ্গ), ইঃ। স্বরাস্ত ক্রিয়া, হইলে বিভক্তির ‘হ’-র স্থানে ‘ছ’; খাচ্ছে, দিচ্ছি ‘(খাচ্ছে’, ‘দিচ্ছি, নয়)। অগ্রথা, খেতেছে যেতেছে, ইঃ (পূ, ব)।

৩। সমাপিকা ক্রিয়া—অতীতকাল (১) ‘ইল’, ‘ইলে’, ‘ইলাম’ বিভক্তির ‘ইকারের লোপ’ এবং ‘অ’কারান্ত খাতু ‘এ’কারান্ত।

করল, খেল ইঃ। করলাম, কিন্তু ‘কোরলাম’ বা—‘কোরলুম’ নয়।

(২) ‘ইয়াছে’, ‘ইয়াছ’, ‘ইয়াছি’ এই-সকল বিভক্তির স্থানে ‘এছে’, ‘এছ’, ‘এছি’ (ক্রিয়া স্বরাস্ত হইলে ‘য়েছে’ ‘য়েছ’ ‘য়েছি’।)

করেছে, খেয়েছে ইঃ। ‘করেচে’, ‘খেয়েচে’ নয়।

(৩) ‘ইয়াছিল’, ইঃ স্থানে ‘এছিল’ বা ‘য়েছিল’

ক’রেছিল খেয়েছিল ইঃ।

(৪) ‘ইতেছিল’ প্রভৃতির স্থানে ‘ই’, বা ‘ইতে’র লোপ--

করতেছিল বা করছিল, ইঃ। কিন্তু ‘কচ্ছিল’ নয়। স্বরাস্ত ক্রিয়া—খেতেছিল বা খাচ্ছিল, দিচ্ছিল, ইঃ।

৫। সমাপিকা ক্রিয়া ভবিষ্যৎকাল ‘ইব’-র ‘ই’-র লোপ

ক’রব, খাব (‘কোরবো’, ‘খাবো’ নয়।

৬। অনুজ্ঞা (ভবিষ্যৎ) ‘ইও’-র ‘ই’-র লোপ, ‘অ’কারান্ত-খাতু ‘এ’কারান্ত।

করিও, ধরিও, খাইও স্থানে ক’রো, ধ’রো, খেয়ো। এক্ষেত্রে ‘কোরো’, ‘ধোরো’ এরূপ লেখাও সম্ভব কিনা বিবেচনার স্থল।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে মূল পরিবর্তন অসমাপিকা বিভক্তির ‘ই’-কার লইয়া। কোথায় ‘ই’-কারের লোপ, কোথায় রূপান্তর হয়। আর সব পরিবর্তন আনুসঙ্গিক ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য। সমাপিকা ক্রিয়াগুলি প্রায়ই অসমাপিকা ক্রিয়া ও ‘আছ’ খাতু লইয়া গঠিত, সুতরাং একই নিয়ম অনুসরণ করে।

আদিত্যে ‘অ’কারযুক্ত ক্রিয়ার সংকীর্ণ আকারে প্রায়ই ‘অ’কারের একরূপ ‘এডান’ উচ্চারণ হয়, তাহা ‘অ’, ‘ও’, ‘ই’ লইয়া মিশ্রিত। এরূপ হলে ‘অ’-কারের পরে (’) এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের যে প্রথা আছে তাহা মন্দ না; যেমন ক’রে, ধ’রে ইত্যাদি।

গুরুতর কারণ এই যে আমাদের সভ্য সমাজের মুখের ভাষাই বড় দুর্বল। আমাদের কথাবার্তা শিথিল, বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো, এবং নানাবিধ ইংরাজির বুকনিতে কণ্টকিত। একজন ভদ্র ইংরাজ কি হিন্দুস্থানীর কথাবার্তার সহিত একজন সমান অবস্থার বাঙ্গালীর কথাবার্তা তুলনা করিলেই আমরা এ প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যখন প্রকাশসভায় মুখোমুখি করিয়া কিছু বলিতে হয়, তখনই আমাদের এ দারিদ্র্য সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের ভাষার সমস্ত অভাব ও দোষ একমাত্র সাধুভাষার উপর চাপান সম্ভব নয়। আবার চলিত ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও ঢের মেকী চলে। ভাষা ক্ষিপ্ত ও চটুল হইলেই জোরাল ও অর্থবোধক হয় না, এবং আশ্চালনপরায়ণ হইলেই ক্ষুণ্ণ হয় না। আমরা যে কথোপকথনের ছাঁদের লেখার সময় সময় এত বড়াই করি, অনেক সময়ই কি উহা ইংরাজদিগের জোর করিয়া কথা বলার যে একটা ধরণ আছে, উহার ক্ষীণ ও কষ্টকর প্রতিধ্বনি নয়? সুতরাং এ দিকেও কোন কৃত্রিমতা না আসিয়া পড়ে, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যিক। যেমন চলিত শব্দ সাধু শব্দের সহিত এক পঙক্তিতে বসাইতে হইবে, সেইরূপ সাধু শব্দগুলির আরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দরকার। ব্যবহারের অভাবে আমরা সাধু শব্দগুলিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সাধু ভাষার যে আড়ষ্টতাব ইহাও তাহার এক কারণ। সাধারণ কথাবার্তায় সাধু শব্দ ব্যবহার করা আমরা জেঠামি মনে করি। ইহা নিতান্ত ভুল। শব্দ ব্যবহারেই উজ্জ্বল ও মোলায়েম হইয়া উঠে। প্রমথ বাবু ‘সাহিত্যিক’ শব্দটি বিশেষণ অর্থে ব্যবহার করিতে নারাজ। কিন্তু যদি সমান অর্থবোধক ঐরূপ একটি শব্দ সহজে না মিলে, তবে উহাই সাহসের সহিত ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহার করিতে করিতেই উহা কানে আর তত বেশুর লাগিবে না। এই যে ইংরেজিতে নিত্য নূতন নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন নূতন জীবনের অবস্থার সহিত পরিচয়ের ফলে, রাশি রাশি নূতন শব্দ উদ্ভাবিত ও আদৃত

হইতেছে, উহার সকলগুলিই কি ব্যাকরণসঙ্গত না সকলগুলিই সাধারণ ইংরাজের জিহ্বা, কর্ণের সহিত পূর্ব হইতে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসে? অথচ ব্যবহারের গুণেই সে সমুদয় সাহিত্যের সহিত অবাধে মিলিয়া যায়। লোকে কথায় বলে, ব্যবহারের গুণে পরও আপন হয়। ভাষার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। এইরূপ হয় না বলিয়াই আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দমালা পোষাকি কাপড়ের মত বিশেষজ্ঞের সিন্দুকে তোলা থাকে, এবং অব্যবহারে পোকায় কাটে। মূল কথা, আমাদের ভাষার প্রধান দরকার, উহার আভ্যন্তরীণ পুষ্টি। আমাদের প্রধান দোষ, কৃত্রিম সৌষ্ঠব-প্রয়াস ও বাহুল্য বচসা। আমাদের লেখায়, অনেক সময়, অর্থ কথার ভিড়ে পথ দেখিতে পায় না। সত্য কথা পরিমিত ভাষায় বলার জ্ঞান যে শিক্ষা, সংস্কার ও (প্রমথ বাবু মাপ করিবেন) 'সাহিত্যিক' উপলক্ষির প্রয়োজন সে দিকে আমাদের তেমন আস্থা লক্ষিত হয় না। ভাষা, অন্ততঃ গদ্যভাষা, যেরূপ হওয়া উচিত, প্রায় তাহা হয় না। অর্থাৎ, উহা সাক্ষাৎ প্রয়োজন-মুখে সজোরে নিজের খাত কাটিয়া লয় না। আমাদের ভাষা, আঁকিয়া বাঁকিয়া, বাধা বিঘ্ন এড়াইয়া, সহজ অথচ ঘুর পথ খুঁজিয়া লইতে চায়। প্রমথ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন—“আসল সর্ব্বশেষে ভাষা হচ্ছে 'চন্দ্রাহত' সাহিত্যিকরা ইংরাজি বাক্যের যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করেছে, সে ভাষা।” \* অবশ্য কোন শ্রেণীর রচনা উল্লিখিত-রূপ 'ত্রিদোষ'-আশ্রিত হইলে, তাহার উদ্ধারের আশা বড় অল্প। কিন্তু সাহিত্যিক হইলেই 'চন্দ্রাহত' হইবে এমন নয়, অনুবাদেরও ভাল মন্দ আছে, রান্না ভাল হইলে 'খিচুড়ি'ও সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য। অনুবাদের কথা যদি আসিল, তবে একথা বলিতে হইবে, যে, বর্তমান অবস্থায় অনুবাদ—ভাষা, ভাব ও আদর্শের অনুবাদ—আমাদের একটা প্রধান সমস্যা। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলের কৃতিত্ব এক বা অপর

\* বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন যে খিচুড়ি ভাষার যদি নমুনার আবশ্যক হয়, ত উপরিউক্ত বাক্যটি তাহাই। কিন্তু আমরা বাস্তবিক মনে করি যে এইরূপ সাহস করিয়া লিখিতে লিখিতেই কথাবার্তায় সহজ সুরটি সাহিত্যের মধ্যে ধরিতে পারিব।

শ্রেণীর অনুবাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এ অনুবাদ যে শুধু ইংরাজি ও সংস্কৃতে নিবদ্ধ থাকিবে এমন নয়। আমাদের উপচয়নের ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রস্তুত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের, বিশেষ হিন্দী ও উর্দুর সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যিক। শেষোক্ত কারণে প্রমথ বাবুর কথিত 'মুসলমান আক্রমণ' হইতে একেবারে যে সুফলের অপ্রত্যাশা করি এমন নয়। যিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরাজিতে তর্জমা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে উহা অনেক সময় কত সুন্দর ভাবে, কথায় কথায় তর্জমা হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জ্ঞান উপনিষদ অনুবাদ করিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ এই-সকল রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বারা এমন ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে যে উহা বাঙালা ভাষার একান্ত নিজস্ব জিনিস। অনুবাদের কথায় কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে আমরা প্রতিভার অগৌরব করিতেছি। কেননা তাহা হইলে এ প্রসঙ্গে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম করিতাম না। নব্য বাঙালার লেখকদের মধ্যে যদি কাহারও প্রতিভা অবিসম্বাদীরূপে কীর্তিত হইতে পারে ত এই তিন জনের। আমাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান অবস্থায় নানা ভাষা হইতে আমাদের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে বাঙালা ভাষাতে লেখকগণের নিকট আমাদের সনির্ভর অনুৰোধ যে তাহারা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রীতি ও শিষ্ট আদর্শের প্রতি যেন বীতশঙ্ক না হন। কেননা উহারা শিল্পের জায় সাহিত্যের প্রাণ। যদি শিষ্টরীতির যথোচিত মর্যাদা না থাকিত তাহা হইলে ইংরাজি ভাষা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া, ও নানারূপ প্রাদেশিকতা, অপভাষা ও উচ্চারণবৈষম্য সত্ত্বেও, কখন সাহিত্যের এমন একটা অথবা আদর্শ বজায় রাখিতে পারিত না—সুতরাং যদি আমরা ২৫২৬টি জিলার মধ্যে লিখিত ভাষার একটা সমন্বয় স্থাপিত করিতে না পারি, এবং যাহার যাহা ইচ্ছা সেইরূপভাবে লিখি, তবে তাহা একটা বিশেষ পৌরুষের কথা নহে। ভাষার শৈশবে প্রতিভা-



চিত্রকর।



না জানি কারে দেখিয়াছি,  
দেখেছি কার মুখ,  
আজ সকালে পেয়েছি তার চিঠি

শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র রায় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি-ক্রমে।

শালী লেখক বা dialect বিশেষের অনেকটা আধিপত্য খাটিতে পারে। কিন্তু ভাষা একরূপ গড়িয়া উঠিলে, ততটা স্বাধীনতা থাকে না, থাকা বোধ হয় উচিতও নয়। অবশ্য যখন আমরা বাঙলা ভাষার শিষ্ট আদর্শ রক্ষা করার কথা বলিতেছি, তখন কেহ যেন আমাদের কথা ভুল না বুঝেন। আমরা বাঙলা ভাষাকে 'বাবু' করিতে চাই না, ইহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে প্রমথ বাবুর সহিত আমাদের সম্পূর্ণ এক মত। আমাদের বিশ্বাস আমরা বাঙলা সাহিত্যকে প্রাত্যহিক সহস্র প্রয়োজনের সহিত ভাল করিয়া মিলাইতে পারি নাই। জীবনের বিচিত্র কর্মশালার অনেক প্রকোষ্ঠের দ্বারই আমাদের সাহিত্যের নিকট রুদ্ধ। একদিকে যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, সুকুমার সাহিত্য, রাজনীতি ও সভ্য জগতের নানা উচ্চতর ব্যবসায়ের নিমিত্ত সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই হাট, বাজার, মাঠ, পথ, ঘাট, আসর, আখড়া, অন্তঃপুর, এক কথায় আমাদের সনাতন দেশীয় জীবনের সহস্র আচার ব্যবহার ও মেলামেশার মধ্য হইতে সজীব, চলিত ভাষার বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, সাহিত্যের শিষ্টরীতি বজায় রাখিলে, বাঙলার সকল প্রদেশ হইতেই, শুধু শব্দ নয়, অনেক সজীব idiom, সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। আমাদের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা শুধু কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকিবে এরূপ কোন কথাই নাই।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বলিয়া সাহিত্যের কোন সোনার কাঠি, রূপার কাঠি নাই। ইংরাজির দোখিলেই বুঝা যায়, মাসিক প্রকৃতির রুচি ও বিষয় অনুসারে, কোন লেখক সাধু শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন, কোন লেখক চলিত শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন। কৃত্তী লেখকের হাতে উভয়বিধ রচনাই সজীব হইয়া উঠে। মূলে দুইটি জিনিসের প্রধান আবশ্যক। লিখিবার মত একটা বিষয় থাকা চাই ও লিখিবার একটা নিষ্ঠা থাকা চাই। এই দুটি জিনিস থাকিলে, শিক্ষিত লেখক যেরূপ ভাষায়ই লিখুন না কেন, তাহা কখনই অকিঞ্চিৎকর হইবে

না। তবে ভাষায় যথার্থ ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার যুঁ মূল মন্ত্র, তাহা স্বতন্ত্র। উহার নাম প্রতিভা। নব্য বঙ্গভাষায় দুই চারিটি প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যতে আরও হইবে। আমাদের সাধারণের কর্তব্য যে ভবিষ্যতের প্রতিভাবান লেখকের জন্য আমরা ভাষার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি। কাল পূর্ণ হইলে যখন সেইরূপ প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইবে, তখন দেখিতে পাইব যে তাহার হস্তে এই আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গভাষা পুরাণ-বর্ণিত মন্ত্রপূত দৈবাজ্ঞের গায় গর্জিয়া উঠিবে, এবং তাহার লিখিত বা কথিত বাণী, সাধুচলিত শব্দ নির্বিশেষে, খেত পল্লযুক্ত নিশ্চিত সায়কের গায় বাঙ্গালীর মন্ত্রস্থান বিদ্ধ করিবে।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

## মৃত্তি সংগ্রহ

“পরেষামুপকারার্থং যম্জীবতি সজীবতি।”

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-কলাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহোদয় আশ্বিনের “প্রবাসী” পত্র “পল্লব” নামক প্রস্তাবে, অধ্যাপক হেভেলের নবপ্রকাশিত “ভারতীয় স্থাপত্য” নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতের যে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি ঠিক আমাদের, সেইগুলিকেই ফাণ্ডামেন্টাল বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে মত দিয়া আমরা কতকাল আমাদের নয় বলিয়া বেশ নিশ্চিত আছি;—আর আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়, ইহাই একজন সাহেব আমাদের হইয়া জগতে ঘোষণা দিতেছেন। ইহার পর আমরা যেন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন করিতে না চলি।” (১০১ পৃষ্ঠা)

“আমরা” বলিতে যদি যে দুই একটি লোক প্রাচীন শিল্পের দিকে সময় সময় দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন শুধু তাঁহাদিগকেই বুঝায়—অপর সাধারণ ত “কেবা আধি মেলে” বলিয়া নিষ্পন্দ—তাহা হইলে উক্ত বাক্যের প্রথমংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ৮ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফাণ্ডামেন্টাল বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আর এক হিসাবে “আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়” বলিয়া অনেকদিন পূর্বেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হেভেলের অভ্যুদয়ের পূর্বে যে দুই একজন বাঙ্গালী এ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেন না। আমার স্মরণ হয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ বোধি রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিয়া, বোম্বাইএর “ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট” পত্র ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফাণ্ডামেন্ট হউন, মিত্রই হউন, আর হেভেলই



হউন, আমরা অজ্ঞভাবে কাহারও অনুসরণের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাদ দিয়া, শুধু ফাগুসনপ্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণকে এবং অধ্যাপক হেভেলকে লইয়া, ভারতীয় স্থাপত্যের আলোচনার “পত্তন” সমীচীন মনে হয় না।

উক্ত উ বাক্যের উপসংহারে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারও যুক্তিযুক্ততা সন্দেহ সংশয় হয়। হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে আমাদের ( ভারতবাসীগণের ) নয়কে হয় বলিয়া ঘোষণা দিতেছেন বলিয়াই কি কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী আর নিজেকে “বিশ্বকর্ম্মার পোরোহিতোর” অধিকারী ভাবিতে পারিবেন না? “বিশ্বকর্ম্মার পোরোহিতো”র অর্থ কি? বিশ্বকর্ম্ম ভারতের আদর্শ শিল্পী। প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন-নিচয়ের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান, তাহাই উপকথায় বিশ্বকর্ম্মার কৃত বলিয়া কথিত। সুতরাং “বিশ্বকর্ম্মার পোরোহিতো” অর্থ ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের মহিমাপ্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে তৎপ্রতি ভক্তি সঞ্চারিত করা। হেভেল সাহেব পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়াই কি এদেশের লোকের “নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পোরোহিতোর অধিকারী” ভাবিবার অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে? শুধু তাহাই নয়, “পত্তনের অনুসন্ধান সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন”ও নিষেধ। এখানে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ খলিফা ওমারকেও পরাহৃত করিয়াছেন। খলিফা ওমার, কোরান থাকিতে অল্প কোন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া, এলেকজেন্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার পোড়াইবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভবিষ্যতে নূতন গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে তিনিও নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। হেভেল সাহেবের নূতন গ্রন্থ হাতে পাইয়া অবনীন্দ্রবাবু ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে গ্রন্থরচনার কল্পনা বা তজ্জগ্ৰ উপকরণ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উপাদান সংরক্ষণের আয়োজন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। খলিফা ওমারের অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও মুসলমানেরা খ্রীস্ট ও রোমের দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়েন নাই; পরন্তু যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দীক্ষায় যুরোপবাসীর গুরুগিরি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রবাবুর “পত্তন” পড়িয়া অক্ষয়াম্বার মৈত্রেয়, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যে বিশ্বকর্ম্মার পোরোহিতোর অধিকার সম্বন্ধে সহসা দাবী ত্যাগ করিবেন, এরূপ মনে হয় না।

“পত্তন”প্রবন্ধে “অনুসন্ধান সমিতির” ও “মূর্ত্তিভবনের” পাণ্ডা-দিগের সম্বন্ধে ব্যবহার পত্তন করিয়া যুগপৎ অপর একখানি পত্রিকায়—আম্বিনের “ভারতীতে” ( ৫৮৮—৫৯১ পৃঃ ) অবনীন্দ্র বাবু “প্রাণ প্রতিষ্ঠা” করিয়াছেন। “প্রাণ প্রতিষ্ঠা” প্রাণের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। যথা

“এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে Havell সাহেবের Indian Architecture নামক পুস্তকের সমালোচনা অসম্ভব এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। কিন্তু মূর্ত্তিভবন-স্থাপন এবং যাদুমন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ানোতে স্ত্রে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা সেই কথাই বলিতে চাহি।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে কথাটা “পত্তনে” এবং “প্রাণ প্রতিষ্ঠায়” আলামণী ভাষায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হেভেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বে হইতেই অবনীন্দ্রবাবুর প্রাণে জাগরুক ছিল। অবনীন্দ্রবাবুর চায় স্বনামধন্য ভাব-নায়কের কথা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে। ঐহাদিগকে একরূপ প্রাণে বধ করিবার অল্প “প্রাণপ্রতিষ্ঠা” প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের কর্তব্য, তাঁহারা

( অবনীন্দ্র বাবুর ) প্রত্যেকটি কথা বিশেষ রূপে বিচার করিয়া, যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করেন, এবং যাহা বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সাধারণের নিকট তাহার সম্বন্ধে একটি কৈশিয়ৎ দেন। এই হিসাবেই এই প্রস্তাবে “প্রাণ প্রতিষ্ঠা”ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ—মূর্ত্তি-অনুসন্ধানকারীদিগের নিকটে অবনীন্দ্র বাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন

“যে দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধার করিতেছি, সেই দীঘির ধারেই হয়ত মূর্ত্তি-রচয়িতার কোন বংশধর উপবাসে মরিতেছে, তাহার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি কোন দিন পড়িয়াছে?”

“ভাঙা মূর্ত্তির প্লা আড়িয়া তত লাভ নাই, যত লাভ যাহারা মূর্ত্তিকে গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের প্লা, শীর্ণ মুখের মলিনতা দৃশ্য হইয়া দেওয়াতে।”

“যাহারা মূর্ত্তি গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের প্লা, শীর্ণ মুখের মলিনতা দৃশ্য হইয়া দেওয়া” মনুসা মাজেরই কর্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহা করিবে কে? যাহার শক্তি আছে সেইত করিবে। যাহারা এখন মফস্বলে নিয়মমত মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকের সজ্জিতই আমার পরিচয় আছে। ভাস্কর বা চিত্রকরগণের কথা দূরে থাক, নিকট আশ্রয়গণের “জীর্ণদেহের প্লা এবং শীর্ণ মুখের মলিনতা” দৃশ্য হইয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁহাদের নাই। তাহার উপর সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য অতুল অনুসন্ধান-স্পৃহা তাঁহাদের জীবনকে ভারবহ করিয়া রাখিয়াছে। অবনীন্দ্র বাবু তুলি হাতে করিয়া, বাস্তব মানব-আকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, যে ভাবে চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, লেখনী লইয়াও এবার মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সেইরূপ উদাসীন্ম দেখাইয়াছেন। “যদি সাহেবের যত মূর্ত্তি সংগ্রহেরই বাস্তবিক আমাদের সম্পূর্ণ চাপিয়া উঠে” এই নিচুর ভাষা যখন তিনি প্রয়োগ করিতেছিলেন, তখন কি তাঁহার স্মরণ ছিল না যে, বেসরকারী মূর্ত্তি সংগ্রাহকগণের আর্থিক বিশেষ কোন সুবিধা হওয়ার আশা নাই। তাঁহারা যে ভাবের প্রেরণায় কষ্টলব্ধ অবসর সময়টুকু কষ্টকর মূর্ত্তি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যয় করেন, সেই ভাবে “বাস্তবিক চাপা” বলিয়া উপহাস করা চিত্তবৃত্তির আলেখ্য-রচয়িতা শিল্পীর মুখে শোভা পায় না।

মূর্ত্তি-অনুসন্ধানকারীগণের মধ্যে যাহারা “দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধারের” “যত্ন করেন” তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনকে জানি, যিনি ধনী বলিয়া কথিত হইতে পারেন এবং যাহার দুই চারিখানা দামী ছবি কিনিয়া দু'একজন ভাস্কর বা চিত্রকরকে কিছু উৎসাহ দানের শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন রুচি আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় সে রুচি পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে। যুরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালা এবং শিল্পশালা দর্শনের ফলে তাহা পরিমার্জিত হইয়াছে। ইহার উপরে একটি জিনিসে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে—সেটা ইতিহাস। অবনীন্দ্র বাবু “পত্তনে” বা “প্রাণ প্রতিষ্ঠায়” ইতিহাসের নামও করেন নাই। যাহারা শিল্পী বা শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদের অল্প যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্মুক্ত, যাহারা ঐতিহাসিক বা ইতিহাসানুরাগী তাঁহাদের অল্পও কর্ম্মক্ষেত্রে তেমন উন্মুক্ত। উচ্চ অঙ্গের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণ কখনও ইতিহাসে অবজ্ঞা করেন নাই। রন্ধিনের Stones of Venice নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম অংশের নাম Foundation বা “পত্তন”। এই “পত্তনে”রও আলোচ্য বিষয় ইতিহাস। যাহারা ইতিহাসের উপাদান জানে মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া জনসমাজে তাঁহাদিগকে খাটো করিয়া শিল্পের



সিটিক গজের ছাত্তেরা আমতার বহুপীড়িত লোকদের সাহায্য করিতেছে। ( হিন্দু পেট্রি যট হইতে )।

বিশেষ যে কিছু উপকার হইবে তাহা মনে হয় না। বরং তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, আধুনিক শিল্পীদিগের কিছু সুবিধা করা যাইতে পারে। যাঁহারা “রমেশ ভবনের” উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা বোধ হয় অবনীন্দ্র বাবুর মনোমত মন্দির গড়িতে রাজি হইবেন। যাঁহারা ইতিহাস-চর্চার সুবিধার জন্ত “মূর্ত্তি-ভবন” প্রতিষ্ঠার কল্পনা রাখেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্ত যে-সকল নিদর্শন নাই তাহাদের প্রতিকৃতি রাখিতে বাধ্য হইবেন এবং প্রতিকৃতি-গঠন-নিপুণ শিল্পী নিয়োগ করিতেও বাধ্য হইবেন। সুতরাং “মূর্ত্তি-ভবন” প্রতিষ্ঠার স্পৃহা যদি কোথাও জাগিয়া থাকে, তবে তাহাকে অভিসম্পাত না করিয়া, আশীর্বাদ করাই কর্তব্য। তাহাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ। মূর্ত্তি সংগ্রহের ফলে কিরূপে জাতীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বারাস্তরে দেখাইব।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

## কষ্টিপাথর

ভারতী ( আশ্বিন )

বহাদায়—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

দামোদরের উদরে আজ এ কী দুখা সর্বগ্রাসী!  
বাধ ভেঙে, হায়, হস্তা হয়ে বহা এল সর্বনাশী।

রাঙামাটির মূলকে আর রাঙামাটির নাই নিশানা,  
চারিদিকে অকূল পাথর—চারিদিকে জলের হানা।  
দেউল-গুলোর ছয়োর ভেঙে চেউ চুকেছে হল্লা ক'রে  
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুং দাঁড়ায় নি কেউ কবাট ধ'রে।  
নীচ হওয়ার নানান্ ছঃধ—থুলে কি আর বল্ব বেশী,  
বর্ষা হ'ল কোন্ পাহাড়ে—ডবল নাবাল বাংলা দেশই।

\* \* \*

এ দামোদর গোবিন্দ নয়,—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে  
হাজার পর ডুবিয়ে মারে,—ধংস করে স্রষ্ট চিতে !  
জগৎ-হিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকূল ধারা,  
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা,  
এই মহিষের বাঁকা হু শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,  
চু সিয়ে চলে ডাইনে বামে সোনার দেশের পীজর খসে !  
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যেজন পালন করে;  
লম্বোদরী জন্তলা এ—গজ গিলেছে দস্ত ভরে।

\* \* \*

মুছে দেছে গ্রামের চিহ্ন চেটে নেছে ভিটের মাটি,  
মরণ-টানে টান্ছে ডুরি সাতটা জেলায় কান্নাহাটি।  
ধনে গ্রাণে ঢের গিয়েছে,—হিসাব তাহার কেউ জানেনা,  
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—খবর তাদের কেউ আনে না।  
আল্গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে  
পুড়ছে রোদে উপবাসী ভিজছে বল-রুষ্টিধারে,



আমতার নিকটস্থ বালুচরের বন্যাপীড়িত লোকেরা সাহায্যলাভার্থ আর এক গ্রামে আসিয়াছে । ( হিন্দু পেট্রি যট হইতে ) ।

হারিয়েছে কেউ পুত্রকন্যা হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়,  
আজকে আধা-বাংলাদেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায় ।

- \* \* \*
- অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায় নি দিশা,  
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা ;
  - কত নারী বিধবা অন্ধ, অনাথ কত সদা-বধু,  
কত যুবাব অস্বাদিত রইল জগৎফুলের মধু ।  
বর-ক'নেতে ভাসুছে জলে হলুদ-বরণ সূতা হাতে,  
ফুল-শেষে কার কাল এসেছে, বান এসেছে বিয়ের রাতে ।  
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার ফোকর মৌচাকিতে,  
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক' খেতে ।

\* \* \*

বট-পাকুড়ের ফেঁকড়িগুলো অবশ হাতে পাকুড়ে ধরে  
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত করে ।

- অবাক হ'য়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,  
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে ।  
'হাল' পুছিলে,—জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,  
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধি-হত ।  
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,  
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবী,—আজকে এদের বন্যাদায় ।

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে  
ভেসে ভেসে একলা এল কোন্ গাঁ হ'তে জলের তোড়ে ।  
তুলতে ধরে ঠেকল ভারি তক্তপোষের একটি পায়,  
আঁকড়ে পায় জলের তলে মরা মায়ের অমর মায় ।  
পুত্র আজি পীযূব-ধারা সূতাহত মায়ের বুকে,  
দুধের ছেলের ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুক মুখে ?  
এক রাতে কার স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায়,  
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ ? আজ অভাগার বন্যাদায় ।

\* \* \*

বানের মুখে সাতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়,  
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাতারে যে ফের ফিরল গাঁয়ে  
বাঁধা-গরুর খুলতে বাঁধন তুলতে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি,  
ফিরতে সে আর পারে নি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি' ;  
নেই বেঁচে'সেই চামার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,  
আছে তাহার কোলের ছেলে আছে তাহার আতুর পতি ;  
তাদের কে আজ পথা দেবে আজকে তারা নিঃসহায়,  
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায় ।

\* \* \*

আঁসল গেছে ফসল গেছে দেশের মুখের ভাত,  
সাধনে 'পূজা'—নূতন পৃথিবীর সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত ।

কোথায় গেছে হালের বলদ কোথায় গেছে দুধের গাই,  
কায় ভিটেতে কে বসেছে,—কিছুই খোঁজ খবর নাই।  
উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূণ্য-হওয়ার শোকে,  
শুন্ছে না সে কিছুই কানে দেখেছে না সে কিছুই চোখে ;  
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,  
বন্ধাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

\* \* \*

অনুজ-সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য করে,—  
দেশের কাজে অগ্রে চলে,—স্বচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।  
আজ কে যেন প্রলয়-বুকে স্তম্ভ জ্যোতির্লেক্ষা হাসে  
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে ;  
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,  
দুঃখভি তাঁর উঠল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা ?  
সর্বভূতের অন্তরাখ্যা আজকে শোনো উঠছে কেন্দ্রে ;—  
বধির হ'য়ে থাকবে কে আজ ব্যর্থ জীবন বন্ধে বৈধে ?  
এ দায় নহে ব্যক্তিগত,—যেমন ধারা কণাদায়,  
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্ধাদায়।

\* \* \*

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটির,  
উঁদের পুণ্যে লক্ষপ্রাণী দেখবে ফিরে সুবৎসর ;  
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়,—সপ্তকোটির এদেশটিতে।  
ভরতে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।  
শাক্যের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আশার ধরে  
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে।  
ভুক্তিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট দুর্ভাসারও ক্ষুধা হরে,  
তাঁর নামে দান মুষ্টি ভিক্ষা জয়-হবে দুর্ভিক্ষ প'রে।  
গরীব-সেবাই তাঁর সেবা,—ভারতবাসী ভুলছ তাও ?  
বন্ধাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

\* \* \*

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা-জলের দেশে থাকে—  
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে ধরম রাখে ;  
তারাও আজি মর্ত্যে বসি চিত্ত-আরাম স্বর্গ লভে,  
দুঃস্থ-শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সপৌরবে।  
সার্থকতা ঘারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,  
মরম দিয়া মরম বোঝ ঘূচাও মনের দরিদ্রতা ;  
ঘূচাও কুণ্ডা ওগো বন্ধু ! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,  
হিম হ'তে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বণ্ডা হয়।  
যুগে যুগে পুণ্যে খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,  
শূণ্য হাতে ফিরিয়ে নাগো ; রক্ষা কর বন্ধাদায়।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবীড়ী উপাদান—শ্রীবিজয়চন্দ্র  
মজুমদার।

সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা আৰ্য্য এবং দ্রবীড় সভ্যতার মিশ্রণে  
বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার উপর দ্রবীড় জাতীয়দিগের  
ভাষার প্রভাব কতখানি কেবলমাত্র বৃহদভাষার উপস্থিতির ইতিহাসের  
জন্ম এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। আৰ্য্য-সভ্যতা-  
বিজ্ঞানের পূর্বে বঙ্গদেশে যে-সকল দ্রবীড়-জাতীয়েরা বাস

করিত, তাহাদের ভাষা এখন বাঙ্গালা। কাজেই পূর্বকালে  
কোন জাতির কি ভাষা ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না।  
অন্ধ্র দেশের রাজারা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজাধি-  
রাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আৰ্য্য-  
ভাষার উপর তাহাদের ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়াছে যে, যে-সকল আৰ্য্যোত্তর প্রচলিত  
শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, চেষ্টা করিয়া সে-সকল  
শব্দের অর্থ দ্বিবার জন্ম আমরা আদিম শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়া,  
সংস্কৃত শব্দের কাছাকাছি করিয়া তুলিয়াছি। বঙ্গদেশে এমন  
অসংখ্য গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা একালে আশাদের কাছে  
সম্পূর্ণ অর্থশূণ্য। সকল নামেরই যে অর্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত।

দ্রবীড় জাতির সহিত অত্যধিক পরিচয়ের পর সংস্কৃত ভাষা-  
তেও উহাদের অনেক শব্দ কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছিল।  
(১) প্রাচীন সংস্কৃতে অশ্বের “ঘোটক” নাম ছিল না। তেলেগু  
ভাষার “গুরা-মু” : “মু” সকল বিশেষ্য শব্দেই প্রায় লাগে) অন্ধ্র-  
রাজাদের আমলে “ঘোড়া” হইয়াছিল ; গুজরাটে “ঘোড়া” পাওয়া  
যায়। “ঘোড়া” ক্রমে “ঘোটক” হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও বরি-  
শাল-অঞ্চলে “ঘোড়া”র উচ্চারণ তেলেগুর “গুরা”র অনুরূপ।  
(২) মলয়ালম্ এবং তামিল ভাষায় পাহাড়ের নাম “মলৈ”।  
“মলৈ”কে (উহার “গিরি” অর্থ থাকা সত্ত্বেও) “গিরি” শব্দের  
যোগে “মলয়গিরি” করিয়া তুলিয়াছি। (৩) “মীন” পাণ্ড্য-জাতি-  
দিগের কুলদেবতা। বৈদিক যুগেরও বহু পরবর্তী সময় পর্যন্ত মৎস্যর  
“মীন” নাম পাওয়া যায় না ; তাহার পর কিন্তু মৎস্য-দেবতারের  
নাম একেবারে “মীন অবতার”, ওড়িশার কঙ্কদিগের ভাষাতেও  
মাছের নাম “মীন” এবং কানাড়ার ভাষাতেও ঐ অর্থে “মীন্স”রূপ  
পাওয়া যায়। (৪) “কপ্পুর” জিনিসটা দক্ষিণ দেশে উৎপন্ন এবং  
সেখান হইতে আৰ্য্যাবর্তে আসিয়াছিল। তামিলের “করপ্পু”  
সংস্কৃতে “কপ্পুর” হইয়াছে। ষষ্ঠপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে টিসিয়াস্  
ভারতবর্ষ হইতে আমদানি এই পদার্থকে ঠিক “করপ্পু” বলিয়াই  
লিখিয়াছিলেন।

আৰ্য্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশের ভাষাতেই তামিলের “কু”  
প্রত্যয় “কা,” “কে,” “ক” প্রভৃতিরূপে হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ওড়ি-  
য়ায় প্রচলিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল শব্দকোষের কথা নয়,  
ভাষার বিশেষত্ব যে ব্যাকরণে, তাহাতেও দ্রবীড়ী প্রভাব দেখিতে  
পাইতেছি।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত কয়েকটি আৰ্য্যোত্তর শব্দ—

১। আকালি (তামিল) — ক্ষুধা = আকাল ( বাঙ্গালা = দুর্ভিক্ষ ।  
শব্দটির “কাল” কথার সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। ২। কোকা  
ও কোকি ( ওরাও ) — ছোট ছেলে ও মেয়েকে বলে ; যথা—  
কোকাই-হাড়, কুক্কি-হাড় = খোকা ও খুকী ( বাঙ্গালা ) ; পূর্ববঙ্গে  
কোকা ও কুকি ঠিক অবিকল প্রচলিত আছে। ৩। গোড়া  
( তেলেগু ) — ঘরের ভিত ও দেওয়াল—বাঙ্গালায় ঘরের ভিত অর্থে  
ব্যবহার না থাকিলেও ভিত্তি বা মূল অর্থে ‘গোড়া’ কথার ব্যব-  
হার আছে, যথা—আগাগোড়া ; দ্বিতীয় অর্থাৎ দেওয়াল অর্থের  
‘গোড়া’, ‘গোড়া ডিক্রিয়ে ঘাস খায়’ কথায় পাওয়া যায়। ৪। চাপা  
( তেলেগু ) — তেলেগু এবং তামিল ভাষাতে ‘চ’ এবং ‘শ’এর  
এক উচ্চারণ ; তাহাছাড়া ‘চপ’ লিখিলে ‘চাপা’ উচ্চারণ করিতে  
হয়। বাঙ্গালায় উহা ‘শপ’ উচ্চারিত হইবে ; ইহার অর্থ ‘মাদুর’।  
৫। চক্কনি ( তেলেগু ) — সুন্দর অর্থে, যেমন, সুন্দরী স্ত্রী তেলেগুতে

হইবে “চক্কনি” স্ত্রী। এই “চক্কনি” হইতে বাঙ্গালার চিকণ; দৃষ্টান্ত—“চিকণ কালা”। সুন্দর অর্থে “চিকণ” বাঙ্গালায় খুব ব্যবহৃত। ৬। “ঝিঙ্গা” (মুঙা)—এই তরকারির ফলের সংস্কৃত নাম “জ্যোৎস্নী”। ৭। তা-লা (তেলেণ্ড)—তাইল (তামিল) = মাখন, বাঙ্গালার “মাখার তেলো”তে এই “তা-লা” রহিয়াছে। এতদিন সংস্কৃত ‘তালু’ হইতে ‘তেলো’ আসিয়াছে, মনে হইত। ‘তালু’ কিন্তু বহনবিবর-মধ্যগত ‘টাকুরা’ নামক স্থান। ৮। তাল্লি (তেলেণ্ড)—তায় (তামিল) = মা; বাঙ্গালার “তালই” (“তাওয়ই”) সম্পর্কে এই পিতৃ-মাতৃবৎ শব্দের চিহ্ন আছে। ৯। তোটা (তেলেণ্ড)—তোট্টম (তামিল) = বাগান; অনেক গাছ একসঙ্গে থাকিলে, ওড়িয়াতে “তোটা” বলে, যেমন “আমতোটা” শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। ১০। নালু, নালুকা (তামিল) = জিত; বাঙ্গালায় “নোল্ল”। ১১। নি-জ (তামিল) = সত্য; বাঙ্গালার নিজ্জস (সত্য ও ঠিক)। মালদহের “নিচোড়”। [ নিজ্জস কি নির্ঘাসের অপভ্রংশ নহে? ] ১২। পালু (তেলেণ্ড)—পাল (তামিল) = দুধ; বাঙ্গালায় “পালান” কথায় উহার চিহ্ন রহিয়াছে। ১৩। পট্টু (তেলেণ্ড ও তামিল) = রেশম ও রেশমের কাপড়। আমাদের “পাট” এবং সংস্কৃতের “পট্টবস্ত্র” এই পট্টু হইতে। [ পট্টু নামক পশুস্বী বস্ত্রও আছে। ] ১৪। পিল্লাই (তামিল)—পিল্লা (তেলেণ্ড) = ছেলে; ওড়িয়াতে ঠিক “পিলাই” আছে; পূর্ববঙ্গে “পোলা” ব্যবহৃত; বাঙ্গালায় “ছেলে-পিলে”। ১৫। পুলই বা বুলই (তামিল)—বিল্লি (তেলেণ্ড)—বিলেই (ওড়িয়া)—প্রাচীন পালিতে, বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতের “মার্জ্জারকে” “বিলার” এবং “বিড়াল”-রূপে পাই, “বিড়াল” শব্দ অর্কাচীন সংস্কৃতেই ব্যবহৃত। [ মালদহে বিড়ালকে বিলাই বলে। ] ১৬। পৈয়ন্ (তামিল)—পৈয় (তেলেণ্ড) —পুখ (ওড়িয়া) = পো (বাঙ্গালার)। ১৭। বানা (তেলেণ্ড) = বৃষ্টি; ইহা হইতে আমাদের বৃষ্টি বা বৃষ্টিজনিত জলবৃষ্টি বা “বান” হইয়াছে। [ বন্যা হইতে নহে কেন? ] ১৮। বা-না (তামিল) = ধজা; ওড়িয়াতে ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত, চণ্ডীদাসেও এই অর্থের ব্যবহার পাই। ১৯। বেদুরু (তেলেণ্ড) = বাঁশ; এই বাঁশের রজ্জ্ব হইতে সংস্কৃত “বৈদূর্য্য”। ২০। ব্জি (মুঙা)—মুঙাদের কেবল এই জব্য-নামটি বাঙ্গালার দেশে গৃহকর্ণের অন্তর্বিশেষে পাওয়া যায়। ২১। বিটি (তামিল) —অন্তর্ “ব”এর উচ্চারণ করিতে হইবে; ইহার অর্থ “ঘর”; ইহা হইতে আমাদের “ভিটে”। [ পূর্ববঙ্গে ভিটি বা বিটিই বলে। ] ২২। মাখন (তামিল) = পুত্রের আদরের ডাক; বাঙ্গালার আদরের “মাখনলাল” প্রভৃতি কথায় ঐ অর্থই মনে পড়ে। [ ? ] ২৩। মো-ট (তামিল)—উচ্চারণ “মোটা” = বোঝা বা তুল্পি; মন্বলপুর অঞ্চলে ঠিক তামিল ধরণে “মোটা” উচ্চারিত হয়। ২৪। যিটু (তামিল)—ইটু—ঠিটু = বাজ; পূর্ববঙ্গে “বাজ” শব্দ কোথাও কোথাও “ঠা-ঠা” ব্যবহার আছে (“সধবার একাদশী”)। ২৫। গুল (তামিল)—এটি শব্দ নহে; বহুবচন-বোধক প্রত্যয়। বাঙ্গালার এবং ওড়িয়া ভাষায় তামিলের গুল (গুলি) বহুবচন বুঝাইবার জন্ত “গুলি” “গুলি” প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। আসামের সীমানার কাছে এই “গুলি” “গিলা”রূপে ব্যবহৃত হয়। আসামের ভিতরে এই “গিলা” আবার “গিলাক” হইয়াছে। খাঁটি আসামে “গিলাক” পাওয়া যায় না; কিন্তু “বিলাক” পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত মূল-হারানো শব্দ—

- ১। উসাসু—হালুকা। ২। ওলা—নামা। ৩। কাড়ে—বাহির করে। ৪। কাথ—দেওয়াল। ৫। কৈরোয়াল—বৈঠা, দাঁড়।

৬। কোয়ালি—গান। ৭। খুরি—ছোট বাটা। ৮। গোহারি—দোহাই দেওয়া। ৯। ছেলি—ছাগল। ১০। টাবা—লেবু বিশেষ। ১১। নেউটিয়া—ফিরিয়া। ১২। পাড়ড়া উত্তরীয়। ১৩। বাট—পথ। ১৪। বুলা—বেড়ান। ১৫। বানা—ধজা। ১৬। খড়ড়া—ফেরা। ১৭। বাজ সুদ। ১৮। লদা—বোঝাই করা। (চণ্ডীদাস)। ১৯। উছর—বিলম্ব। ২০। কাছাড়—এখনকার কাছাড় অর্থে; ওড়িয়াতে “কচারি হেবা” রূপে আছে। ২১। খাড়া ডাটা। ২২। জোহার—প্রণাম। ২৩। পেলাপেলি—ঠেলাঠেলি। (ধর্ম্মজল)। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি প্রচলিত দেশী বা অনার্য্য শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—(১) আঁটকুড়িয়া—বা আঁটকুড়ে; (২) কিরিয়া বা দিবি, শপথ, কিরা; (৩) ও—প্রত্যাহারজ্ঞাপক; (৪) ওগো, গো—সম্বোধন-জ্ঞাপক; (৫) থরা (সর্ব্বোপর তাপ)—এই অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল; এখনও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে; (৬) গাছ; (৭) গাড়ু; (৮) গুঙা—বা গুঁড়া; (৯) গোটা—এক; অথবা এক; (১০) কছার—যেখানে বন বেশী নাই, কিন্তু অল্প অল্প আছে, অথচ চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম; অনেক স্থলে উদ্ভিদ বিশেষের ঋণ জঙ্গলকে ‘কসাড় বন’ বলে। এই অর্থে আসামের প্রান্তস্থিত “কছার” বা কাছাড় দেশের নামের উৎপত্তি; (১১) পাতিল—ছোট হাড়ি; (১২) পিঙা—পিঁড়ে, দাওয়া; (১৩) বেঁৎৎ—সাবধান করিয়া ধরার নাম; পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের ভাষায় ব্যবহৃত আছে; (১৪) পেঁঠি বা পঁঠি; পঁঠি শব্দ ওড়িয়ায় নাই; (১৫) পোক—পোকা; (১৬) ভড়ুপ—বাঙ্গালার রাত অঞ্চলে [ ও পূর্ববঙ্গে ] এক শ্রেণীর ঢালভাজাকে “ভড়ুপ” বলে।

কতকগুলি অত্যন্ত লীড়নাগ্নক স্ত্রীল শব্দ ওড়িয়ায় এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই। কোন কোন ঐরূপ স্ত্রীল ওড়িয়া শব্দ নিকটবর্তী বঙ্গদেশ ডিঙ্গাইয়া মালদহে অথবা পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে। এমন অনেক অনার্য্য শব্দ একদিকে ওড়িয়ায় প্রচলিত আছে এবং অন্যদিকে আবার একেবারে আসামে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আউ (চালদা), জুই (খাণ্ডন) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। শুনিয়াছি, জুই কথটি নাকি কাশ্মীরেও ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুলির কাঙ্ক্ষনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি সময়ে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, এবং প্রতিবেশী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া যথার্থ ব্যুৎপত্তি স্থির করা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইবে।

### ভারতী ( আশ্বিন )

আর্য্য-নারীর প্রাচীন অবস্থা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল “নারী”; এই নারী শব্দ “নর” শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই। যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্ত “নারী” শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী। যাহারা পুরের বা গৃহের কাঁধাটী আপনাদের মনের মত করিয়া স্বাধীনভাবে চালাইতেন, তাহাদের নাম ছিল “পুরং-ধি”।

নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না। ঋগ্বেদের দিনের নারীরা ফুলের মাঝে মুচ্ছা হইতেন না। দ্রুতগমনের বিশেষ দৃষ্টান্ত দিবার জন্ত ঋগ্বেদে ( ১, ৫৬, ২ ) উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা যেমন

ক্রতপদে পর্কতে' আরোহণ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, স্তোত্রসাহায্যে স্তোতাও সৈইরূপ ক্রতপদে ইন্দ্রের স্বর্গে আরোহণ করুন।

বৈদিক যুগে বালাবিবাহ ছিল না এবং আর্ধানারীরা যে ইচ্ছামত অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে চিরকাল কুমারী থাকিতে পারিতেন, বহু পরবর্তীকাল পর্য্যন্তও যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হয়। সকলেই জানেন যে পূর্বকালের স্মৃতির বিধানে ব্রাহ্মণ-ক্ৰত্বিয়-বৈশ্যাদির কাহারও "গোদান" নামক সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ বিবাহ হইতে পারিত না। বৈদিক ভাষায় গোদান শব্দটির অর্থই হইল দাড়ি-গোফ; দাড়ি-গোফ উঠিবার পরের সংস্কারটি কখনও পুরুষের পক্ষে অল্প বয়সে হইতে পারিত না। বিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গৃহসূত্রাদিতে যে-সকল বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ভিন্ন সে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

খাঁটি বৈদিক ভাষায় "বর" অর্থই হইল wooer। বয়স্ক পত্নী সংগ্রহ করিতে হইলেই পুরুষকে বর হইতে হয়।

বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকটসম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। পরবর্তী যুগের ধর্মশাস্ত্রেও কোন্ কোন্ স্থলে বিধবা-বিবাহ হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এবং বৈদিক সাহিত্যে ঋষিদিগের পারিবারিক জীবনের ঘটটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে একপত্নী-গ্রহণই সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল এবং আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণের বহু পত্নী থাকিলে প্রমটিই খাঁটি পত্নীপদবাচ্য হইতেন, এবং তিনিই যজ্ঞের অধিকারিণী হইতেন। প্রথম পত্নী বক্ষ্যা হইলে পুত্রবতী অথবা কোন ভাৰ্যা পত্নীসংজ্ঞা লাভ করিতেন। পত্নী ব্যতীত অথবা বিবাহিতা স্ত্রীরা কেবল জায়া নামে আখ্যাতা হইতেন।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র ছিল। কুমারী অবস্থায় নারী নিজে যাহা উপার্জন করিতেন, এবং বিবাহের পর তিনি যে-সকল উপহার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল, এবং তিনি সেই সম্পত্তি যথেষ্টভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন। নারীরা যখন মন্ত্র রচনা করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাব ছিল, এ কথা বলা চলে না। নারীরা সকলেই নৃত্য এবং গীত শিক্ষা করিতেন।

বৈদিক যুগে পুত্রকন্যাদিগের নিকট মাতার সম্মান বড় অধিক ছিল। কোন পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ না থাকিলে ভগিনীকে জাতার রক্ষণাধীনে থাকিতে হইত; ভ্রাতা না থাকিলে "ভ্রাতৃবোরা" রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এ যুগে Cousin অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ প্রচলিত নাই বলিয়া বৈদিক ভাষায় ভ্রাতৃব্য কথটির প্রচলন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সত্য যুগের কথা হইলেও বৈদিক যুগে পতিতা রমণী ছিল; এবং তাহারা বড় বড় ঋষিদিগের অস্পৃশ্যা ছিল, এ কথা বলা চলে না। পতিতারা বিশ্ বা আর্ধ্যশ্রেণীর লোকসাধারণের ভোগ্য ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছিল "বিশ্বা"। শব্দটির ব্যুৎপত্তির কথা বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শব্দের ই-কার স্থানে এ-কার হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বার অর্থ নাম ছিল "নামা" এবং "ন-গ্না"। "গ্না" শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল সম্মানিতা মহিলা, এবং পরে অর্থ হইয়াছিল দেব-পত্নী। যাহাদিগের পক্ষে গ্না হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহারা হইত ন-গ্না। কালক্রমে ব্যবহারের নিলজ্জতার হিসাবে নগ্না অর্থ লজ্জাহীন হইয়াছিল, এবং ঐ শব্দের একটি পুংবাচক নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়া পরিচ্ছদশূন্য অর্থে "নগ্ন" শব্দ রচিত হইয়াছিল।

কফিয়ৎ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—

( Terza Rima ছন্দে )

শুনাব নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,  
কেমনে হইলু আমি শেষকালে কবি।  
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস ॥

যৌবনে বাসনা ছিল ছনিয়ার ছবি  
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।  
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি ॥

ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি হৃদয়ে  
আকাশের নীল আর অরণের লাল।  
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একজো ॥

দলিত-অপ্পন কিম্বা আবীর গুলাল,  
অথচ ছিলনা বেশি অন্তরের ঘটে।  
এ কবি ছিলনা কভু রাণীর হুলাল ॥

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,  
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।  
চলিলু শিথিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে ॥

হেথায় হয়না কভু গুরুর আকাল।  
পড়িলু কত না জানি বিজ্ঞান দর্শন,  
ভক্ষণ করিলু শত কাব্যের মাকাল ॥

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ,  
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব অঙ্গ জুড়ে,—  
এ ভবসিদ্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ।

বন্ধ হল পতিবিধি কল্পনার উড়ে,  
গড়িলু জ্ঞানেতে যেরা শাস্তির আলয়,—  
সহসা পড়িল বালি সে শাস্তির গুড়ে।

নেত্রপথে এসে দুটি সুবর্ণ বজর  
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে,—  
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিলু প্রলয়।

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,  
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি।  
এ সত্য সহজে বোঝে ছনিয়ার মেয়ে ॥

ফলকথা কালক্রমে তাজি বীণাপাণি,  
ছাড়িলু হবার আশা সাহিত্যে অমর।  
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি।

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর  
সমাজের কর্মক্ষেত্রে করিলু প্রবেশ,  
সুফল হল সেই হতে সংসার-সমর ॥

পরিমু সবারি মত সামাজিক বেশ,  
কিন্তু তাহা বসিলনা স্বভাবের অঙ্গে।  
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ ॥

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,  
স্বৈচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানে হৃদিকেশ।  
কৰ্মক্ষেত্র ধৰ্মক্ষেত্র এক নয় বন্ধে!

এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,  
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—  
হইল মনের দফা প্রায়শঃ নিকেশ ॥

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,  
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,  
চরিত্রে হইল বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক।

এ সব লক্ষণ দেখে হইলু কাতর,  
না জানি কখন আসে বুজে চোখ কান,  
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর ॥

হাবানো প্রাণের ফের করিতে সজ্ঞান,  
সভয়ে চলিলু ফিরে বাণীর ভবনে  
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান ॥

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,  
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ।  
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে ॥

এদিকে স্তম্ভে হেরি সময় সংক্ষেপ,  
রচিতে বসিলু আমি ছোটখাট তান,  
বর্ণ স্তর একধারে করিয়া নিক্ষেপ ॥

আনিলু সংগ্রহ করি বিঘ্ন-প্রমাণ  
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,  
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ ॥

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,  
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদা,  
প্রকৃতি বাহার “জেঠ”, আকৃতি “কনেঠ” ॥

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,  
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,  
বারো কিস্বা তেরো নয়, পুরোপুরি ‘চোদ্দ’।

### বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ—বীরবল—

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নব সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহলে যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই নব সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অত্র দেশের শ্রায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্য-রাষ্ট্রো রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা

প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বঙ্গজগতের শ্রায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য নয়।

পুরাকালে মানুষ যে যা কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলাগা করা, দুচারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা,— কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, একরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। বহু শক্তিশালী স্বপ্নসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বপ্নশক্তিশালী বহু-সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের বোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়, কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো—কি যে বেরলো তাতে বেশি কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয় লিখতে হয়। আমাদের নব সাহিত্যে কোনরূপ “শ্রম বিভাগ” নেই— তার কারণ যে ক্ষেত্রে “শ্রম” নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সেহেতু তার বিভাগ আর কি করে হ’তে পারে? তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশ কাল পাত্রের সম্বন্ধে এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন তার উপর লেখাটি যদি কাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই।

লেখকেরা বৈষ্ণবভক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা কর্তে নিবৃত্ত না হলে বঙ্গসরস্বতীকে পথে দাঁড়াতে হবে। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে “বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী”। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণ্য লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে— দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না।

ছবি ফাউ দিয়ে মেকী মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। নর্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করিতে তার পদমর্যাদা বাড়ে না। যেদিন থেকে বাঙ্গালাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবং এই মতবৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। আমার বিশ্বাস এদেশে একালে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ এবং আলেখ্য ব্যাখ্যানে

নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে স্কুলের প্রবেশ নিবেদ। যতদূর আমি জানি, নব্যচিন্তকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনার বর্ণে বর্ণে বাবান ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ ভুল দৃষ্ট হয়। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুলকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুলকরণের অনুলকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্তব্য। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। আর্টের ক্রিয়া অনুলকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহুবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, প্রতিভার চরণে শিকলি পরাণে। আর্টে অবশ্য যথেষ্টাচারিতার কোনও অবসর নাই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্ত-সামান্ত কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যান্টি কিংবা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বলতে পারেন, যে, “চিত্রে আমরা গণিত শাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।” প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আসছে, তার কারণ অঙ্কের হস্তদর্শন স্তায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যজ্ঞেই হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। একটি কোন স্কুলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য নামক সত্যটি তেমন ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে সে সম্বন্ধে কোনরূপ অকাটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসীকৃতাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার মত অস্ত্র বাঞ্ছনীয় না; এবং চিত্রের ষোড়া ঠিক ষোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উঠত না। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যস্বাভাবী। যা চিত্রকলার দোষ বলে গণ্য, তাই আমার আজকাল এদেশে কাব্যকলার গুণ বলে মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনও রূপ পরিচয় থাকত তাহলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না, এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্চা-চক্র পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনস্কর হ্রস্বে খাড়া করে দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডর্য তাঁরা করতেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্য বস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন,—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলার অর্জনীয় এবং কাব্যকলার বর্জনীয়। ইঞ্জিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অজ্ঞানতার পরিচায়ক নয়। চুরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালুনে ধরা নয়। যার ইঞ্জিয় সচেতন এবং সজাগ

হয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতিসত্ত উপাদান নিয়েই মন বাকাচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করার, বাছাই করার, এবং ভাবায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিত্ব-কল্পনা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা, প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্ত-বশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারিনে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহুবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক তেমনি অহুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের মনে যে-সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ণ এবং মহার্ঘ, যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্ত যুগে না। তাই আমরা অহিনিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। এই ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্গল মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনো-ভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব বাক্যে একটুখানি ভাবায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মূর্খরোচক হয় না। মানুষ মাত্রেই মনে দ্বি-রাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাবায় স্থির করার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্ভেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত থেকে কবির নিজের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলা-ক্রমে রচনা করা এক জিনিষ নয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেও যে মহত্ব আছে, আমাদের নিত্য-পরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে লৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যক এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহমনকে বাহু-জগৎ এবং অন্তঃজগতের নিয়মাবলী করা। যার চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শন লাভের অস্ত্র শিবনেত্র হন; এবং যার মন নেই, তিনিই মনস্থিতা লাভের অস্ত্র অস্ত্রমনস্ততার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার অস্ত্র ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক অস্ত্রতঃ নিজের উপকার করা হবে।

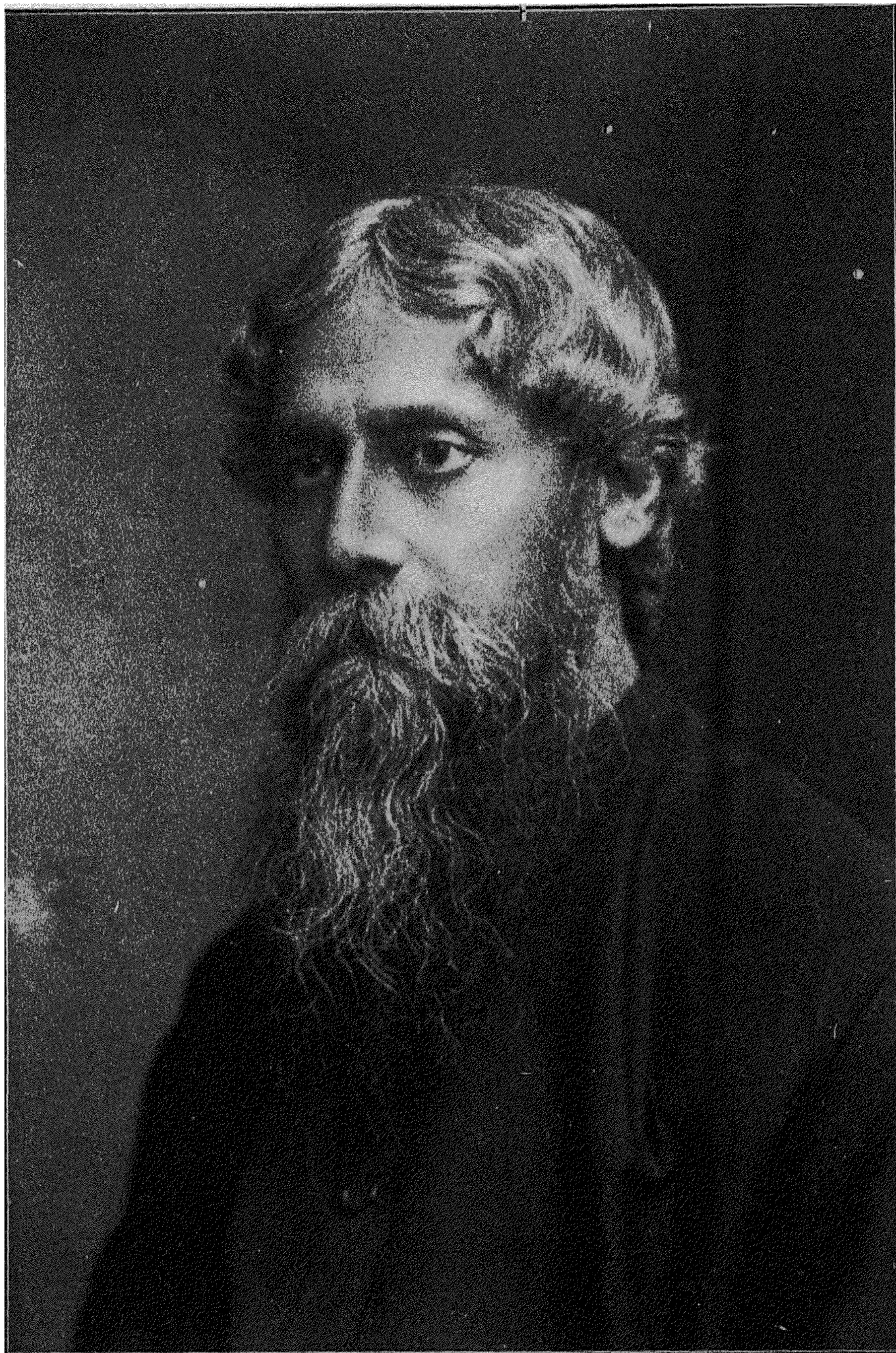
## বিশেষ উল্লেখ্য।

প্রবাসী কার্যালয় ১৯শে অক্টোবর, ৫ই অক্টোবর হইতে ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ব্রাহ্মমন্দির প্রেসে প্রিন্ট করা হইবে সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।







শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Photograph by Elliot & Fry, London.

ENGRAVED AND PRINTED BY  
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৩শ ভাগ

২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২০

২য় সংখ্যা

## দানতত্ত্ব

নাস্তি দান সমো নিধিঃ ।

এই দানতত্ত্ব প্রবন্ধটি মদীয় “সনাতনধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থের দানখণ্ডের একাংশ। “সনাতনধর্মতত্ত্ব” একখানি ধর্ম-শাস্ত্রনিবন্ধ। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতমের অনুকরণে উহার নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ নিবন্ধগ্রন্থের রচনায় যেরূপ ধর্মপ্রাণতা, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। কিন্তু যোগ্যতর ব্যক্তির এই গুরুতর কার্যে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া, অগত্যা আমিই এ কার্যে হাত দিয়াছি, এবং মাসিকপত্রে উহার অংশ প্রচার করিয়া সবিনয়ে সমালোচনা ভিক্ষা করিতেছি।

এইরূপ নিবন্ধ কিরূপ আদর্শ লইয়া বিরচিত হওয়া উচিত, তাহার আভাস মদীয় Sanskrit Learning in Bengal নামক ইংরাজি পুস্তিকার ৩১-৩৮ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধের বোধসৌকর্য্যার্থে উপক্রমণিকা স্বরূপ উহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

With a set of *Smārtas* educated on the lines indicated above, it would be quite possible to compile a new Code of the Hindu Religion, which would unify all the divergent sects of the Hindu Community. The age of *Raghunandana* is gone. Let the *Smārtas* try to produce a new Code, a Code that would be in keeping with the liberal spirit of the ancient scriptures,

a Code that would effectively enlarge the roomy fold of Hinduism and include in it such sects as the *Brāhmas* and the *Arya-samājists*. Hinduism has survived many rude shocks, because it has always known how to adopt itself to its changed environment. Is it too much to expect that the future *Smārtas* would be able to compile a Code that would effectively contain all that is good in the new Religions?

প্রতিগ্রহ দান ও ভরণ দান।

হিন্দুশাস্ত্রে মোটামুটি দুইরকম দানের উল্লেখ আছে, (১) প্রতিগ্রহ-দান, ও (২) ভরণ-দান। পূর্ণিমায়ে ভোজ্য-দান, গ্রহণে দান, তীর্থে দান, শ্রাদ্ধে দান প্রভৃতি প্রতিগ্রহ দান; ইহার পাত্র সূত্রাক্রম। আর বর্ণনিবিশেষে গরীব দুঃখীকে দান ভরণ-দান। যেমন গরীবের ভরণ বা প্রাণধারণের ব্যবস্থা প্রত্যেকের কর্তব্য, তেমনি শ্রাদ্ধাদিতে সূত্রাক্রমে দানও শাস্ত্রবিহিত। “ধর্মসমাজ ও স্বাধীন চিন্তায়” (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা) সূত্রাক্রমের লক্ষণ কতক দেখান হইয়াছে।

শ্রীমৎ পরমহংস ভোলাগিরির মুখে এই কথাই আভাস এই বৎসরই প্রথম পাইয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় এ তত্ত্বটী এমন ভাবে বলিয়াছিলেন যেন ইহা একটা সর্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত।

ভরণ-দানের পাত্র।

মাধবাচার্য্যস্বকীয় পদ্মশরভাষ্যে (১ম খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা) বলিতেছেন—

পশু বধিরা মুকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে ।  
ভর্ষব্যান্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ ॥

যাঁহারা পশু অক্ষ বধির মুক বা ব্যাধিপীড়িত, তাঁহা-  
দিগের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে, কিন্তু হে মহারাজ,  
তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ দিবে না।

প্রতিগ্রহদানের পাত্র।

প্রতিগ্রহ একমাত্র শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ  
ব্যক্তিকেই দিতে হইবে। ইঁহারাই প্রতিগ্রহের অধিকারী।  
মহাভারতের অশুশাসনপর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে—

অক্রোধনা ধর্মপরা সত্যনিত্যা দমে রতাঃ ।  
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রান্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৩ ॥  
অমানিনঃ সর্বসহা দৃঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।  
সর্বভূতহিতা মৈত্রান্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৪ ॥  
অদুঃখাঃ শুচয়ো বৈদ্যা ইীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ ।  
স্বকর্মনিরতা যে চ তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৫ ॥  
প্রজ্ঞাশ্রুতাভ্যাং বৃন্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ । ৩৬  
গামখং বিত্তমন্নং বা তাদৃশে প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৩৯

যাঁহারা ক্রোধবিমুখ, ক্রিয়াপরায়ণ, প্রতিজ্ঞাপালক,  
দমযুক্ত, তাঁহারা সুব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে  
মহা পুণ্য হয়। যাঁহারা অমানী, সর্বসহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,  
জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূতের হিতকারী ও স্নেহবান, এবং যাঁহারা  
লোভহীন, শুচি, বিদ্বান, লজ্জাযুক্ত, সত্যবাদী, ও স্বকর্ম-  
পরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল হয়। (এক  
কথায়) যাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে এবং যাঁহার স্বভাব  
ভাল ও যিনি ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এমন  
লোককে গরু, ঘোড়া, টাকাকড়ি, ভাত প্রভৃতি দান  
করিবে।

দানের অপাত্র—(১) অনুষ্ঠানরহিত পরোপদেশক।

যাঁহারা লোককে ধর্মের উপদেশ দিতে পটু, কিন্তু  
নিজেরা উহা পালন করেন না, তাঁহারা দানের যোগ্যপাত্র  
নহেন। যথা—মহাভারতের অশুশাসনপর্বের দ্বাবিংশ  
অধ্যায়ে—

যে তু ধর্মং প্রশংসন্তশ্চরন্তি পৃথিবীমিষাম্ ।  
অনাচরন্ত শুকর্মং সঙ্করেৎভিরতাঃ প্রভোঃ ॥ ২০  
তেভ্যো হিরণ্যং রত্নং বা গামখং বা দদাতি যঃ ।  
দশবর্ষাণি বিষ্ঠাং স ভূক্তে নিরয়মাশ্বিতঃ ॥ ২১

যাঁহারা ধর্মের কেবল প্রশংসা করিয়াই এই পৃথিবীতে  
বিচরণ করেন, কিন্তু নিজেরা উহার অনুষ্ঠান করেন  
না, তাঁহাদিগকে সোনা, রত্ন, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দিলে

দারকে যাইতে হয় অতএব প্রতিগ্রহদান এবংবিধ  
ব্যক্তিকে দিতে নাই।

(২) সঞ্চয়ী,

যাঁহারা টাকা জমানের জন্ত, বড় লোক হইবার জন্ত,  
দান গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেও দান করিতে নাই।  
বুদ্ধমনু বলিয়াছেন—

সঞ্চয়ং কুরুতে যশ্চ প্রতিগ্রহ সমস্ততঃ ।

ধর্মার্থং নোপযুক্তে ট ন তং তস্মন্নমচ'য়েৎ ॥

অপর্যাক ২৮৬ পৃষ্ঠা, পরাশরভাষ্য ১ খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।

যিনি চারিদিক হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া ধন সঞ্চয় করেন,  
কিন্তু ধর্মকার্যে ঐ ধনের ব্যয় করেন না, তিনি চোর;  
তাঁহাকে প্রতিগ্রহদান দ্বারা সম্মানিত করিতে নাই।

(৩) অসৎকারী,

যিনি অসৎকার্যে ব্যয় করেন, তিনিও দানের পাত্র  
নহেন। বুদ্ধমনু বলিয়াছেন

পাত্রভূতোহপি যো বিপ্রঃ প্রতিগ্রহ প্রতিগ্রহম্ ।

অসৎস্ব বিদ্যুঞ্জীত তস্মৈ দেয়ং ন কিঞ্চন ॥

অপর্যাক ২৮৬ পৃষ্ঠা; পরাশরভাষ্য ১ খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।

যে ব্রাহ্মণ দানপাত্রের অগ্ন্যাগ্ন গুণের অধিকারী হইয়াও,  
প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া ধারণ কাজে উহার ব্যয় করেন,  
তাঁহাকে কিছুই দিতে নাই

অপাত্রে দানে রাজদণ্ড।

অসৎপাত্রে দান করিলে হিন্দু রাজারা কোনও কোনও  
স্থলে তজ্জন্ত দাতাকে দণ্ড পর্য্যন্ত দিতেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ( ৩১৫ ) ও অত্রি (২২ শ্লোক) বলিয়াছেন

অব্রতান্ধানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ ।

তং গ্রামং দণ্ডয়েজ্জাজ্ঞা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥

অধ্যয়নবিমুখ ব্রতহীন দ্বিজেরা যে গ্রামে ভিক্ষা গায়,  
রাজা সেই গ্রামকে দণ্ডিত করিবেন, কেননা ঐ গ্রাম  
চোরের অন্নদাতা। যে ভিক্ষা বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের  
সহায়রূপে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই ভিক্ষা দ্বারা  
যদি মুর্খের ও ভণ্ডের পোষণ হয়, তবে যে দেশের  
অমঙ্গল হইবে, এবং ঐরূপ ভিক্ষাদাতারা; যে দেশের  
শত্রু বলিয়া রাজার দণ্ডাহ হইবেন, তাহা সহজেই অনু-  
মেয়। অধাশ্রিতকে কোন বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও  
উহা দেওয়া অগ্নায়। এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞাতন্ত্রের  
পাপের কোনও আশঙ্কা নাই। মহর্ষি গোতম  
বলিয়াছেন (৫১২৩)

• প্রতিক্রমপি অধর্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ ।

পূর্বে স্বীকার করিয়া থাকিলেও অধাৰ্মিককে দান করিতে নাই । ( মিতাক্ষরা ১।২০।১ দেখুন ) । মহাভারতের অনুশাসনপর্বে আছে

কৃশায় কৃতবিদ্যায় বৃত্তিকীণায় সীদতে ।

অপহৃত্যাং ক্ৰুধাং যন্ত ন তেন পুরুষঃ সমঃ ॥ ৫৯ । ১১

বিদ্বান গরীব কৃশ ক্ৰুধিতের ক্ৰুধা যে দূর করে, তাঁহার সমান পুরুষ আর নাই ।

প্রতিগ্রহ-দানের উদ্দেশ্য ।

এই-সকল শাস্ত্রবচন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিগ্রহদানের অত্যন্ত উদ্দেশ্য ধাৰ্মিক বিদ্বানের বৃত্তিবিধান করা । যাহারা দেশের মধ্যে ধর্ম ও বিদ্যার চর্চায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে “ভূতক” বা মাহিনার চাকর করিয়া দেওয়া শাস্ত্রের অনভিপ্রেত ।

ভূতক যাজক ও অধ্যাপকের দোষ ।

• ইংলণ্ডে ধর্মযাজকেরা মাহিনার চাকর এবং তাঁহাদের বিস্তর আসবাব ও ধন আছে । আমাদের যেন উহার অনুচীকির্ষা না হয় । সেখানে সব ভাল, আমাদের সব মন্দ—এইরূপ ভাবিবার কারণ নাই । অবশ্য আমরা বাল্যকাল হইতে ঐ কথা অভ্যাস করি, কিন্তু উহা ভুলিতে হইবে । ইংলণ্ডের পাদরিরাও যে আর বহুদিন রাজকর্ম-চারী থাকিবেন তাহা বোধ হয় না । ইংলণ্ডে শিক্ষকেরা অনেকে মাহিনার চাকর, তাই আমাদের দেশেও ভূতকাধ্যাপকের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় । আজ যে আমাদের দেশে বিদ্যালোচনার ফলে, লোকের জীবন উন্নত হইতেছে না, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, ইদানীন্তন অধ্যাপকেরা ভূতকাধ্যাপক । তাঁহারা মাহিনা পান এবং পড়ান । প্রত্যেক ছাত্রকে “মানুষ” করা যে তাঁহাদের কর্তব্য, এদেশে শিক্ষাদানের অপরাধ নাম যে “মানুষ করা,” তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ছাত্রের পাশের সুবিধা করিয়া দেন, তাঁহাদিগকে “মানুষ” করিতে, এমন কি বিদ্বান করিতেও, চেষ্টা করেন না । এই জন্ত শাস্ত্রে ভূতকাধ্যাপকের এত নিন্দা আছে । স্বাধীনভাবে, নিজের মনোমত করিয়া, ছেলেদের গঠন

করার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিলে, তাঁহারা শিক্ষাদানে সমস্ত মনপ্রাণ নিযুক্ত করিতে পারিতেন । কিন্তু এখন তাহা হইবার যো নাই । এখন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা বা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যেরূপ চালান, শিক্ষকেরা সেইরূপ চলিতে বাধ্য । একদিন দুইজন অধ্যাপকের মধ্যে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল । একজন বলিতেছিলেন “আমরা ছাত্রদিগকে বিদ্যাবান বা মানুষ করিতে চেষ্টা করি না, এবং অনেকের উহা করিবার সামর্থ্যও নাই । আমাদের মধ্যে কয়জনে তাঁহাদের অধ্যাপিত বিদ্যায় প্রকৃত পারদর্শী, প্রকৃত হৃদয়গ্রাহী ? অনেকেই ত এম-এ পাশ করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন, এবং আর কিছু শিক্ষিতব্য আছে, এমন মনেও করেন না । ইহা ছাড়া, কেবল জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা দ্বারা শিক্ষকদের কৃতার্থতা হয় না । শিক্ষকদিগকে সর্বোপরি শুদ্ধাচারী ও শীলবান হইতে হইবে । বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরাও এ বিষয়ে দোষী । তাঁহারা কেবল ভাল পাশ-করা অধ্যাপক চান ; তাঁহারা প্রকৃত মানুষ বা প্রকৃত পণ্ডিতের আদর করেন না ।” দ্বিতীয় অধ্যাপক গভীর নৈরাশ্রের সহিত উত্তর করিলেন “আমরা কি ঐ জন্ত নিযুক্ত হইয়াছি ? আমাদের উদ্দেশ্যই ছেলে পাশ করান । ঐ উদ্দেশ্য আমরা যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছি, তদ্রূপ আর কেহই পারিবে না । মানুষ করা বা বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মানের প্রয়োজন হইলে অবশ্য শীলবান ও বিদ্যাবান শিক্ষকের দরকার হয়, কিন্তু আজকাল উহা আমাদের নিকট প্রত্যাশিত বলিয়া গণ্য হয় না ।”

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, শিক্ষকদিগকে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে । প্রথম, শিক্ষকনিয়োগের সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । একমাত্র সুশীল শুদ্ধাচারী ও বহুশ্রুত ( learned ) লোককেই শিক্ষক করিতে হইবে । এইরূপ লোকেরা সাধারণত স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবেন না, আর শতের মধ্যে দুই চারি জনে করিলেও, তাঁহাদিগকে নিগৃহীত করা কঠিন হইবে না । শিক্ষকদিগকে পদে পদে বেড়িয়া রাখিলে, দেশের অশেষ অকল্যাণ হয় ।

বৃত্তিকর্ষিত শিক্ষক।

ইহা ছাড়া, বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণীতে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের মাহিনা অতি কম। তাঁহাদের জীবিকা ঐ টাকায় চলে না। কাজেই তাঁহারা সর্বাভ্যুৎকরণের সহিত শিক্ষাদানব্রতে নিযুক্ত হইতে পারেন না। প্রাচীন ভারতে এই দুই বিষয় বিপদ ছিল না। যাহাতে ভূতকাধ্যাপক বা বৃত্তিকর্ষিত অধ্যাপক না থাকে, তখন তজ্জন্ম বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক মানুষকে দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করিতে হইত। ঐ-সকল কার্য্যে বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিরাই দান গ্রহণ করিতে পারিতেন (প্রতিগ্রহদান)। তাঁহারা সংকার্য্যে প্রতিগ্রহার্জিত বিত্তের ব্যয় করিতেন, টাকা জমাইতে পারিতেন না। একবার জমাইতে আরম্ভ করিলে, লোকে তাঁহাদিগকে আর “সুপাত্র” বলিয়া মনে করিতেন না, প্রত্যুত তাঁহারা তস্কর বলিয়া গণ্য হইতেন।

সঞ্চয়ং কুরুতে যশ্চ প্রতিগ্রহ সমস্ততঃ।

ধর্ম্মার্থং নোপযুক্তং চ ন তং তস্করমচ য়েৎ ॥

টাকা-জমান-রোগ যে-দেশের শিক্ষক-শ্রেণীতে প্রবেশ করে, সে দেশের কোন উন্নতিই হইতে পারে না। শিক্ষকেরা পবিবারের ভরণ-পোষণের জন্ত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্ত প্রতিগ্রহ করিতেন। লোকে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আদরের সহিত দান করিতেন। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়া অবশ্যতর্কব্য পোষ্যবর্গের জন্ত এবং পরোপকারার্থ ব্যয় করিতেন। অসং লোকের দান গ্রহণ করিতেন না। রাজারাজড়ারা ক্রুর কর্ম্ম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া দান করিতে চাহিলে, সুব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহে অস্বীকৃত হইতেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে আছে

ন তু পাপকৃতাং রাজাং প্রতিগ্রহস্তি সাধবঃ। ৬১।৫

এইরূপে, প্রতিগ্রহ-দানের সুনিয়মে, দেশের ধর্ম্মযাজকেরা ও শিক্ষকেরা নিজেরাও ভাল কাজ করিতে বাধ্য হইতেন এবং দেশের সাধারণ লোকেও ভাল কাজ করিতে বাধ্য হইতেন।

শাস্ত্রে বিত্ত্বক ব্রাহ্মণকে দান করার যে শত শত বচন আছে, উহার অন্ততম উদ্দেশ্য এই যে, দেশের শিক্ষক এবং যাজক মহাশয়েরা যেন অন্নবস্ত্রের জন্ত হা হা করিয়া

বেড়াইতে বাধ্য না হন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষক ও যাজকেরা একদিকে যেমন অন্নবস্ত্রের জন্ত ভাবিতেন না, অপর দিকে তেমনই তাঁহারা টাকা জমাইতে বা অপব্যয় করিতেও পারিতেন না।

ভরণ-দানের পাত্র।

দ্বিতীয় প্রকার দানকে ভরণ-দান বলিয়াছি। যাঁহারা পক্ষু অন্ধ বধির বা ব্যাধিত, বলিয়া উপার্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণ প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য

পণ্ডু যজ্ঞবধিরা মুকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে।

ভর্তব্যান্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ ॥ ১

গরীবেরা ধনীর পোষ্য।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন

দেয়ানাথকেহবশ্চং বিপ্রাদীনাঞ্চ ভেষজম্ ॥১।৬

অনাথদিগকে দান করা এবং ব্রাহ্মণদিগকে ঔষধ দেওয়া সকলের কর্তব্য। মহর্ষি দক্ষ ( ২।৩৬—৪২ ) দীন অনাথ ক্ষীণ আশ্রিত প্রভৃতিকে ধনীর অবশ্যপালনীয় পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

মাতা পিতা গুরুর্ভাৰ্যা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতঃ।

অভ্যাগতোহতিথিষ্টিষ্টিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

জাতিবন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ।

অন্যোহপি ধনযুক্তস্ত পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

ভরণং পোষ্যবর্গস্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।

নরকঃ পীড়নে চাস্ত তস্মাদ্ যত্নেন তচ্চরেৎ ॥

দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।

অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্ত্রী, সন্তান, গরীব, আশ্রিত, অতিথি, অভ্যাগত, অগ্নি, জাতি, বন্ধু, ক্ষীণ, অনাথ বা অশ্রিত ( ? ) ইহারা ধনীর পোষ্যবর্গ। পোষ্যবর্গের ভরণ প্রশংসাজনক এবং উহাতে স্বর্গ হয়। পোষ্যবর্গের পীড়নে নরক হয়। যত্নের সহিত পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করিবে। যাঁহারা সম্পত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীন, অনাথ এবং সংপাত্রকে ( ? ) দান করিবেন। যাঁহারা এ জন্মে দান করেন না, তাঁহারা পরজন্মে পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ভরণ-দানের শ্রেষ্ঠতা।

শাস্ত্রে এই ভরণ-দান বা পোষণ-দানের ভূরি প্রশংসা

আছে। দক্ষ বলিয়াছেন—

দয়ামুদ্দিষ্ট যদানমপাত্রেভ্যোহপি দীয়তে।

দীনাঙ্ক কৃপণেতাশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

অপর্য্যাক ২৮৩ পৃষ্ঠা।

দীন, অন্ধ এবং অগ্ন্যান্য কৃপার পাত্রগণ প্রতিগ্রহ-দানের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও দয়াবশত উহাদিগকে যে দান করা হয়, তাহার ফল অনন্ত দেবল বলিয়াছেন (অপরাক ২৮৯ পৃষ্ঠা)

অনুক্ৰোশবশাদন্তং দানমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ।

দয়াবশত যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

সারসংগ্রহ ।

মোটের উপর দুই রকম দান দাঁড়াইল । ( ১ ) প্রতিগ্রহ দান, ইহার পাত্র দেশের গরীব ধার্মিক শিক্ষক ও যাজকগণ । ইহার ফলে তাঁহারা নির্বিঘ্নে, সর্বান্তঃকরণের সহিত, লোক-শিক্ষা ও যাজনে নিযুক্ত হইতে পারেন । ( ২ ) ভরণ-দান—ইহা গরীবের প্রাপ্য । ইহার ফলে, যাহারা ব্যাধি প্রভৃতির দরুণ স্বকীয় জীবিকা-উপার্জনে অক্ষম, তাঁহারা অনবদ্বাভাবে মারা পড়েন না ।

দানবিধির মূলসূত্র—ভূতহিত বা মনুষ্যহিত ।

উপরিলিখিত এবং অন্যান্য দানবিধির মূলসূত্র বেদব্যাস-স্মৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে

দাতা ভূতহিতে রতঃ ।

যিনি ভূতহিতে রত তিনিই প্রকৃত দাতা ভূতহিতই দানের উদ্দেশ্য । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ( ৭।১।১০ )

অন্নাদেশ্চ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্থতঃ ।

তেষাম্মদেবতাবুদ্ধিঃ স্মতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥

শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট সনাতন ধর্মের সার্বজনিক অঙ্গগুলির উল্লেখ করিতে করিতে বলিয়াছেন “ভূতদিগকে অন্নাদি যথোপযুক্তরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে ও বিশেষত মনুষ্যদিগকে উপাস্তদেবতা ও নিজআত্মা বলিয়া মনে করা” সনাতন ধর্মের অঙ্গ । দানের মুখ্য উদ্দেশ্য ভূতহিত, বিশেষত মানুষের হিত । যে-দানে মানুষের বা প্রাণীর যত উপকার হয়, সে দান তত পুণ্যজনক, ইহাই দান-বিধির প্রধান-সূত্র । এই জগুই মহাভারত ( ১৩।৬৯ অধ্যায় ) গোদানের প্রশংসা করিতে গিয়া গরুর, এবং নন্দিপুраণে ( অপরাক ৩৯৬ পৃঃ ) বিদ্যাদানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে গিয়া বিদ্যাব, উপকারিতা বুঝান হইয়াছে । এই জগুই বিষ্ণুধর্মোক্তরে আছে ( পরাশরভাষা ১ খ, ১৯২ পৃঃ )

যস্তোপযোগি বদ্রব্যং দেয়ং তশ্চৈব তদ্ ভবেৎ ।

এবং নন্দিপুраণে আছে ( অপরাক ৩৯৯ পৃষ্ঠা )

উপযোগ্যং চ যদ্ যস্ত তৎ তস্ত প্রতিপাদয়েৎ ।

যে দ্রব্য যাহার উপকারে আসিবে, সে দ্রব্য তাঁহাকে দিবে । এই জগুই

শ্রাস্তস্ত যানং ত্বিত্তস্ত পানম্

অন্নং ক্ষুধার্তস্ত “সদা প্রদেয়ম্” ।

শ্রাস্তকে যান, পিপাসিতকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে অন্ন দিবে । গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে অক্ষয়তৃতীয়ায় এবং বৈশাখ মাসে জলদান সুপ্রচলিত । শীতপ্রধান কাশ্মীরে শীতকালে তাওয়া ( কাঙরি ) ও অগ্নিদান প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রে অগ্নিদানের বিধান আছে

ইচ্ছনানি চ যো দদ্যাদ্ বিপ্রৈভ্যাঃ শিশিরাগমে ।

নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়ামুক্তস্ত দীবাতে ॥

সংবর্তস্মৃতি ৫৮ শ্লোক ।

এইরূপ দুর্ভিক্ষে অন্নদান ( অত্রি ৩৩২ শ্লোক ), রোগীকে ঔষধ-পথা-দান ( যাজ্ঞবল্ক্য ১।২০৯ ; আপস্তম্ব ৬ ; সংবর্ত ৫৮ শ্লোক ও ৮৫ শ্লোক ), দেশবিপ্লবে যাহাদের সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দান ( মহাভা ১৩।২৩।৫৪, ৫৭ ), প্রভৃতি সকল দানেরই অগতম স্পষ্ট উদ্দেশ্য ভূতহিত বা মানবহিত ।

স্বজনকে উপেক্ষা করিয়া পরজনে দান অধম্ম ।

স্বজনকে বা নিকটস্থ ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া দূরস্থ ব্যক্তিকে দান করাও এই জগুই নিষিদ্ধ ।

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে হৃৎখণ্ডীবিনি ।

মধ্বাপাতো বিশ্বাস্যদঃ স ধর্মপ্রতিক্রমকঃ ॥

মহু ১১।২

তন্মান্নাতিক্রমেৎ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণান্ প্রাত্বেশ্বিকান্ ।

ভবিষ্যপুраণ, অপরাক ।

গরীব হৃৎখী আত্মীয়দিগকে সাহায্য না করিয়া পরজনে দান করিলে, সে দানে পুণ্য হয় না । যে-সকল বাদামী বরিশালখুলনা শীমার পুড়িয়া লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি-নাশে কোনও রূপ হৃৎখপ্রকাশ বা আর্থিক সাহায্য করেন নাই, কিন্তু বিলাতি জাহাজ টিটানিকের ধ্বংসে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, তাঁহারা কাজটা তত ভাল করেন নাই । বিদেশীয়ে হিতও অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু নিজের গ্রামের ও দেশের হিত না করিয়া বিদেশে হিত করিতে যাওয়া অবিহিত, কেননা ঐরূপ করিলে প্রকৃত পক্ষে

অহিতই বৈশী হয়। এইরূপে বৃত্তিরহিত পুত্র বর্তমান থাকিতে সর্বস্বদানও প্রকৃতপক্ষে ভূতহিতের পরিপন্থী বলিয়া নিষিদ্ধ ( দক্ষ ৩।১৯ ; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৫ )। অতএব সকল দানেরই উদ্দেশ্য মানুষের বা ভূতের হিত এই মূলমন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দান করিতে হইবে।

ঋব, আজস্রিক, কাম্য ও নৈমিত্তিক দান।

এখন দেখা যাউক শাস্ত্রে দানের কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং আধুনিক সমাজে ঐ-সকল ব্যবস্থা কতদূর শুভাবহ।

মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন

ঋবমাজস্রিকং কাম্যং নৈমিত্তিকমিতি ক্রমাৎ।

বৈদিকো দানমার্গোহয়ং চতুর্ধা বর্ণ্যতে বৃধৈঃ ॥

অপারামতড়াগাদি সর্বকাম \* ফলং ঋবম্।

তদাজস্রিকমিত্যাছদীয়তে যদ্ দিনে দিনে ॥

অপত্যবিজয়ৈশ্বৰ্য্যাক্রীবার্থং যদিষ্যতে।

ইচ্ছাসংস্থং তু তদানং কাম্যমিত্যাভিধীয়তে ॥

কালাপেক্ষং ক্রিয়াপেক্ষমৰ্থাপেক্ষমিতি স্মৃতম্।

ত্রিধা নৈমিত্তিকং প্রোক্তং সহোমং হোমবর্জিতম্ ॥

( অপারক ২৮৯ পৃঃ ; পরাশরভাষ্য ১।১৮২ পৃঃ )

দান চারি প্রকার—( ১ ) ঋব ( ২ ) আজস্রিক ( ৩ ) কাম্য ( ৪ ) নৈমিত্তিক। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দানের চতুর্ধা বিভাগ বেদসিদ্ধ। ( ১ ) প্রপা আরাম তড়াগ প্রভৃতি ঋব, উহা সর্বকামপ্রদ ; ( ২ ) যাহা রোজ রোজ দেওয়া যায়, তাহাকে আজস্রিক বলে। ( ৩ ) অপত্য বিজয় ঐশ্বৰ্য্য প্রভৃতির কামনা করিয়া যে দান করা হয়, তাহা কাম্য। ( ৪ ) নৈমিত্তিক দান তিন রকম, কোনটা কালাপেক্ষ, কোনটা ক্রিয়াপেক্ষ, কোনটা অৰ্থাপেক্ষ ; ইহার প্রত্যেকটিতে হোম থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

'ঋবদান।

এই চারিরকম দানের মধ্যে, ঋবদানের দিকে হিন্দু-সমাজের তত দৃষ্টি নাই। কিন্তু উহাই শাস্ত্রে সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

\* বোধ হয় প্রকৃত পাঠ সর্বকালফলম্। এই-সকল দানের নাম ঋবদান, কেননা ইহাদের ফল ঋব অর্থাৎ চিরস্থায়ী। আজ একটা তড়াগ খনন করিয়া উৎসর্গ করিলে, তাহার জল বহুবৎসর লোকের ভোগে আসে। অবশ্য মেরূপ পাঠ আছে, তাহাতেও বেশ অর্থ হয়।

জলদান।

গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাব হইতেছে, অথচ ধনীরা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতেছেন না। পূর্বে বলা হইয়াছে, যে-জিনিস যত উপকারী, তাহার দানে তত পুণ্য হয়। মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন

যদ্ যত্র দুর্লভং দ্রব্যং যস্মিন্ কালেহপি বা পুনঃ।

দানার্হো দেশকালৌ তৌ স্যাতাং শ্রেষ্ঠৌ ন চান্যথা ॥

( পরাশরভাষ্য ১।১৮১ পৃঃ )

যে স্থানে এবং যে সময়ে যে দ্রব্য দুর্লভ, সেই স্থানে ও সেই সময়ে সেই দ্রব্যের দান শ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশের সর্বত্র এখন পানীয় জল দুর্লভ ; পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলদান করা এখন শ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্ম। মহাভারতে আছে ( ১৩।৬৫।৩ )

পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মহুন্নরবীৎ।

পানীয়দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান, ইহা মনু বলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে যে-সমস্ত প্রাচীন পুষ্করিণী ভরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়ার উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের সংস্কার চাই। শাস্ত্রে বলে

বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।

পতিতান্যাক্ষরেদ্ যস্ত স পূর্ভফলমশ্নুতে ॥

( লিখিত সংহিতা ৪ শ্লোক )

কুপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।

পুনঃসংস্কারকর্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥

( বিষ্ণুস্মৃতি ৯১ অধ্যায় )

বাপী, কূপ, তড়াগ এবং দেবমন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া দিলে, নূতন তৈয়ার করার ফল হয়।

বিদ্যাদান।

দেশের লোক ঘোর অজ্ঞানে ডুবিয়া আছে। ভারত-বর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, এবং সামান্য পাটীগণিত বা জ্যামিতি, ইহাও সাধারণে জানে না। উচ্চশিক্ষা দেশে নামত বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু কার্যত যত বিএ, এম এ বা তর্কতীর্থ স্মৃতিতীর্থ জন্মিতেছে, ততটা বিদ্যা বাড়িতেছে না, বিদ্যাহুরাগ বাড়িতেছে না। দেশে বিদ্যাবিস্তারের প্রয়োজন। শাস্ত্রে বলে

বিদ্যা চ মুখ্যং দানানাম্।

বিদ্যাদান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁহার ইংরাজি বা সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই উচিত বিদ্যাবিস্তারের সহায়তা করা ; আর যাঁহার অধ্যা-



পনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের উচিত লোককে বিদ্যাশুরাগী করিতে চেষ্টা করা।

অবিদ্যান ও অধনীও বিদ্যাদান করিতে পারে।

“বিদ্যাদান” অর্থ কেবল অধ্যাপনা নহে। তাহা হইলে একমাত্র সুশিক্ষিত অধ্যাপকেরাই বিদ্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতেন। যে-কোনও প্রকারে বিদ্যাপ্রচারের সহায়তার নাম বিদ্যাদান। অপরার্ক বিদ্যাদান প্রকরণে আলমারী দান, দোয়াত দান, কলম দান, পাতা দান \* পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা যে, অবিদ্যান ও ধনহীন ব্যক্তিও বিদ্যাদানের পরম পুণ্যলাভে বঞ্চিত নহেন, কেননা সকলেই অগত্যা একটা দোয়াত বা একটা কলম দান করিতে সমর্থ।

যথাবিভবতো দদ্যাদ্ বিদ্যাং শাঠ্যবিবজিতঃ।

যেহপি পত্রমসীপাত্রলেখনীসম্পূটাদিকম্ ॥

দদ্যাঃ শাস্ত্রাভিযুক্তায় তেহপি বিদ্যাপ্রদায়িনাম্।

যাস্তি লোকান্ শুভান্ মর্ত্যাঃ পুণ্যালোকা মহাধিয়ঃ ॥

(নন্দিপুরণ, অপরার্ক ১৪০৩ পৃঃ)

যাঁহার যেক্রম সম্পত্তি আছে, তিনি সেইক্রম বিদ্যাদান করিবেন, বিস্তাশাঠ্য করিবেন না। যাঁহারা পাতা, দোয়াত, কলম, আলমারী প্রভৃতি বিদ্যানিরত ব্যক্তিকে দান করেন, সেই-সকল মহাশয় ব্যক্তির বিদ্যাপ্রদায়ীদিগের প্রাপ্য শুভলোক লাভ করেন।

ঋব ও আজস্রিক বিদ্যাদান।

অত্যাণ্ট দানের ঋয়, বিদ্যাদানও ঋব, আজস্রিক, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই চারিভাগে বিভক্ত। বোধাইর বণিক্ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যে দুইলক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন, উহা ঋবদান। উহার দ্বারা শত শত বর্ষ ধরিয় লোকের বিদ্যালান্তের সুযোগ হইবে। শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয়ের দান (১৫ লক্ষ), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের দান (১০ লক্ষ), শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহা-রাজের দান (২১০ লক্ষ), ৩ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দান (মাসিক ১০০০), ৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দান (১১ লক্ষ), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দান (আর

\* তখন তাল-পাতায় ও ভোজপাতায় গ্রহ লিখিত হইত। এখন পত্রদান কাগজদান করিতে হইবে।

কত উল্লেখ কবিব ?) এ সমস্তই ঋবদান। ভারতীয়েরা বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য প্রাচীনকালে খুবই বুঝিতেন, এখনও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ঋব উপাধ্যায় নিয়োগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋব উপাধ্যায় নিয়োগ ( Endowing Professorships ) বিলাতী আমদানি নহে। শাস্ত্রে আছে—

বৃত্তিং দদ্যাদুপাধ্যায়ে ছাত্রাণাং ভোজনাদিকম্।

কিমদত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থদর্শিনা ॥

অগ্নিপুরণ ২১১৫৫

যিনি উপাধ্যায়কে বৃত্তি এবং ছাত্রদিগকে ভোজনাদি দেন তাঁহার সর্বদানের ফল হয়; তিনিই যথার্থ ধর্ম্মকামার্থ-দর্শী।

উপাধ্যায়স্ত যো বৃত্তিং দদ্যাদুপাধ্যায়তে বিজান্।

কিং ন দত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থদর্শিনা ॥

ভবিষ্যত্তর পুরাণ, অপরার্ক ১৩৯১ পৃঃ।

যিনি উপাধ্যায়ের বৃত্তি দিয়া অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার সর্বদানের ফল হয়। মুলাজোড়ের সংস্কৃত পাঠ-শালা, বর্ধমানের বিজয়-চতুষ্পাঠী, রাজসাহীর হেমন্ত-কুমারী টোল, কাশীর রণবীর পাঠশালা, শ্রীগোপালবসু মল্লিকের ফেলোশিপ্, প্রভৃতি এই শ্রেণীর দান।

গরীব ছাত্রদিগকে অন্নবস্ত্রদান।

গরীব ছাত্রদিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিলে, বিদ্যাদানের মহাপুণ্য লাভ হয়।

ছাত্রাণাং ভোজনাভ্যঙ্গং বস্ত্রং ভিক্ষাধাপি বা।

দদ্যা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সর্বকামানসংশয়ঃ ॥

যাঁহারা ছাত্রদিগকে ভোজন, অভ্যঙ্গ, বস্ত্র, অথবা ভিক্ষা দেন, তাঁহাদের সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। এই দানও ঋব বা আজস্রিক, নিত্য বা নৈমিত্তিক হইতে পারে।

বলাইচাঁদ ও নিস্তারিণী দাসীর ঋববিদ্যাদান।

কলিকাতায় ৩ নিস্তারিণী দাসী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দুঃস্থ সংস্কৃতাপ্যায়ী পাঁচশজন ছাত্রের খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ঋববিদ্যাদান। গ্রামে গ্রামে লোকে যে, বাড়ীতে নিঃসম্পর্কিত ছাত্র রাখিয়া পড়ান, উহা আজস্রিক বিদ্যাদান। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি।

সুবর্ণবণিক, সাহা, যোগী প্রভৃতির সামাজিক সম্মানলাভের প্রকৃত পন্থা।

আজকাল সুবর্ণবণিক, সাধু, যোগী প্রভৃতি জাতি নিজেদের জল চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্ম বিগত আদমসুমারির সময় কেহ কেহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতদিগের পাতি লইয়াছেন। এ-সকল বেশ হইয়াছে। ইহার ফলে, সরকারি জাতিবিবরণে এই-সকল জাতি উচ্চতর স্থান লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কাগজে উচ্চ হইলে কি হইবে? কোনও ব্রাহ্মণ, এমন কি যাঁহারা পাতি দিয়াছেন তাঁহারাও, তাঁহাদিগের দান গ্রহণ করিবেন কি? তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল খাইবেন কি? পাতি পাইলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হওয়ার পথ স্বতন্ত্র। সাধু জাতি (সাহা জাতি) ও সুবর্ণবণিক জাতি বন্ধের বৈশ্য। তাঁহাদের অর্থ আছে। তাঁহারা সুবর্ণবণিক-কুলভূষণ ও বলাইচাঁদ ও নিস্তারিণীর পদাঙ্কাসুরণ করুন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহুতর অশুভ-প্রতিগ্রাহী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের দত্ত বাড়ীতে বাস করিয়া, তাঁহাদের দত্ত অন্তে উদরপূর্তি করিয়া, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই-সকল অধ্যাপকেরা যখন দেশের নেতা হইবেন, তখন কি ইঁহারা সুবর্ণবণিকের পদমর্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবেন? এই হইল বড় হওয়ার প্রকৃত পথ। হিন্দুসমাজ কাহাকেও চাপিয়া রাখে না। ভারতীয় আর্থ্যেরা কোনও জাতির ধ্বংস করেন নাই, সকলকেই টানিয়া উপরে তুলিয়াছেন। অবশ্য গত ৪৫ শত বৎসরের ইতিহাসে ভারতীয় আর্থ্যদিগের এই মহত্ব তত পরিষ্কৃত নহে। কিন্তু বরাবর এমন ছিল না। এই সে দিনও আসামে গিয়া বাঙ্গালী পর্ভতীয়া গোসাঞির কি না করিয়াছেন?

সাধু-মঠের প্রস্তাব।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের সাহা-বণিকেরা দেশের গৌরব। তাঁহারা কলিকাতায় ব্রাহ্মণছাত্রদিগের সংস্কৃত পড়ার জন্ত অনায়াসে লক্ষ টাকা দান করিতে পারেন। ঐ টাকায় একটা সাহামঠ (বা সাধুমঠ) প্রতিষ্ঠিত হউক। উহাতে সংস্কৃত কুলেজের ঠোল বিভাগের এবং কলিকাতার অন্যান্য টোলের পঁচিশজন গরীব

ব্রাহ্মণ ছাত্রের বাসস্থান এবং প্রত্যেক ছাত্রকে খোরাকি ব্যবদ মাসে ১০টাকা দেওয়া হউক। ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে, সাহাজাতির মান বাড়িবে। পাতি লইয়া বড় হয় না, দান করিয়া বড় হয়। এইরূপ বিদ্যাদানের ফলে সাহাজাতি তাহার ঞ্চ্য দাবি অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন, দেশেরও ধর্মবুদ্ধি জ্ঞানবুদ্ধি হইবে।

বড়ত্বের মানদণ্ড।

বঙ্গদেশে কোন্ জাতি কত বড়, তাহার একটা পরীক্ষা এই যে, কোন্ জাতি পরার্থে কত কাজ করিয়াছেন? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শ্রেষ্ঠ ছিলেন কেন? তাঁহারা পরার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তাঁহারা পরোপকার-ত্রত গ্রহণ করিয়া অর্থকে অবহেলা করিতেন, তাই তাঁহারা বড় হইয়াছিলেন। স্বার্থত্যাগই বড়ত্বের একমাত্র মানদণ্ড। বঙ্গে আর বলাইচাঁদ নিস্তারিণী নাই?

লাইব্রেরী স্থাপন।

গ্রামে গ্রামে সাধারণের জন্ত পুস্তকালয় স্থাপন করিতে হইবে। শাস্ত্রে পুস্তকদানের ভূরি প্রশংসা আছে।

সম্পূর্ণয়িত্বা তচ্ছাত্রং দেয়ং গুণবতে তথা।  
সামান্যং সর্বলোকানাং স্থাপয়েদথ বা মঠে ॥ \*  
অনেন বিধিনা দত্তা যৎফলং প্রাপ্নুন্নাম্নরঃ।  
তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ মে।  
যৎ ফলং তীর্থযাত্রায়াং যৎফলং যজ্ঞযাজিনাম্।  
কপিলানাং সহশ্রেণ সম্যগ্ দত্তেন যৎ ফলম্।  
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পুস্তকৈকপ্রদানতঃ ॥

ভবিষ্যোত্তর, অপরাধ ১।৩৯০ পৃঃ।

গ্রন্থ লিখাইয়া উহা গুণবান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। অথবা সর্বলোকের ব্যবহারের জন্ত উহা মঠে রাখিয়া দিবে। এই বিধি অমুসারে একখানি পুস্তক দান করিলে,

\* এই বচনে মঠে বা দেবালয়ে সাধারণের জন্য পুস্তকদানের ব্যবস্থা আছে। এটা অতি শোভন ব্যবস্থা। বিদ্যা ও ধর্মের অনুশীলন একত্র হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় “দৌলতপুর একাডেমি” দেবালয়ের সংস্রবে স্থাপন করিয়া স্বকীয় সনাতনধর্ম জ্ঞয়গ্রাহিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।

আজকাল দেশে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গিলনের ফলে, সর্বধর্মের লোকের জন্ত ধর্মসম্পর্কবর্জিত সাধারণ লাইব্রেরি অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হিন্দুরা দেবালয় স্থাপন করিয়া, তথায় বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিলে, সাধারণ হিন্দুরা ঐ জন্ত আত্মাদের সহিত অধিকতর অর্থ দিতে পারিবে।

তীর্থযাত্রার, যজ্ঞের ও সহস্র গরুদানের ফল হয় অগ্নি-  
পুরাণে আছে—

• বিদ্যাদানমবাগ্নোতি প্রদানাং পুস্তকশ্চ তু ।

পুস্তক দান করিলে বিদ্যাদানেরই পুণ্য হয় ।

প্রাচীন দেবালয়ের সংস্কার ও উহাদিগকে বিদ্যামন্দির  
করণের প্রস্তাব ।

গ্রামে গ্রামে যে-সকল সাধারণ প্রাচীন দেবালয়  
আছে, তাহার সংস্কার করিতে হইবে। তাহার ফটোগ্রাফ  
তুলিয়া, মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজে ছাপিয়া, ঐতিহাসিক  
গবেষণা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না; উহাদের  
উদ্ধার করিতে হইবে। উহারা শিল্পের ক্ষুদ্র নিদর্শন  
মাত্র নহে। উহারা মহত্তর ভারতীয় ধর্মের, প্রাণের,  
ভাবের নিদর্শন। যদি সেই ধর্ম, সেই প্রাণ, সেই  
ভাব দেশে পুনরায় না আসে, তবে রুখা ছবি তোলা,  
রুখা গলাবাজি, রুখা গবেষণা। শাস্ত্রে আছে

• • কুপারামতড়াপেষু দেবতায়তনেষু চ ।

• • পুনঃসংস্কারকর্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥

বিষ্ণুস্মৃতি, ১১ অধ্যায় ।

কুপ, আরাম, তড়াগ এবং দেবালয়ের পুনঃসংস্কারকারী  
মূলনিষ্ঠাতার পুণ্য লাভ করে। শাস্ত্রের এই পরিষ্কার  
নির্দেশ সত্ত্বেও নূতন দেবালয় স্থাপনে বেশী পুণ্য হয়  
মনে করা উচিত নহে। যাহা আছে তাহার রক্ষা  
করিয়া পরে নূতনের সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরাতনের  
উপেক্ষা করিয়া, নিজের বা নিজকুলের নাম রক্ষা করিবার  
জন্ত নূতন মঠ স্থাপন করিলে ক্ষণস্থায়ী নাম হইবে, কিন্তু  
কাম হইবে না। গ্রামের সাধারণ দেবালয়ে গ্রামস্থ  
লোক-সকল সমবেত হইয়া যাহাতে প্রত্যহ ধর্মালোচনা  
করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।  
উহা মঠের অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে

সামান্তং সর্বলোকানাং স্থাপয়েদথবা মঠে ।

অর্থাৎ সঙ্গ্রহস্থ মঠে সর্বসাধারণের জন্ত রাখিয়া দিবে ।

কেবল তাহা নহে ।

শিবালয়ে বিষ্ণুগৃহে সূর্যাস্ত ভবনে তথা ।

সর্বদানপ্রদঃ স স্তাৎ পুস্তকং বাচয়েত্তু যঃ ॥

অগ্নিপুরাণ ২১১।৫৭ ।

শিব, বিষ্ণু বা সূর্যের মন্দিরে যিনি পুথি দেন, তিনি  
সর্ব দানের ফল লাভ করেন ।

শিবালয়ে বিষ্ণুগৃহে সূর্যাস্ত ভবনে তথা ।

যঃ কারয়তি ধর্মাত্মা সদা পুস্তকবাচনম্ ?

গোভূহিরণ্যবাসাংসি শয়নাশ্রাসনানি চ ।

প্রত্যহং তেন দত্তানি ভবন্তি পুরুষর্ষভ ॥

ধর্মধর্মো ন জানাতি বিদ্যাবিরহিতঃ পুমান্ ।

তস্মাৎ সর্বত্র ধর্মাত্মা বিদ্যাদানরতো ভবেৎ ॥

ভবিষ্যোত্তর, অপার্ক ১।৩৯১ পৃষ্ঠা ।

শিবমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে বা সূর্যামন্দিরে যে ধর্মাত্মা  
রোজ পুস্তক পাঠ করান, তাহার গো, ভূমি, সুবর্ণ ও  
বস্ত্রাদি দানের ফল হয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি ধর্মধর্ম  
জানেন না, অতএব ধর্মিকেরা সর্বদা বিদ্যাপ্রদানে  
রত হইবেন। কেবল দেবালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত  
হইবে না। দেবালয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে  
হইবে। সে স্থান সকলের মিলন-ভূমি, সাধারণের  
বিদ্যাপীঠ।

মঠ দেওয়া ।

অনেকে মাতাপিতার চিত্তার উপর ইষ্টকপিও স্থাপন  
করিয়া মনে করেন, মঠ-স্থাপনের ফল হইল। উহা  
সম্পূর্ণ ভুল। মঠে প্রত্যহ দেব-পূজার বিধান থাকিবে,  
প্রত্যহ বিদ্যার আলোচনা হইবে; তবেই উহার মঠ  
রক্ষা হইবে। কেবল ইষ্টকপিও মঠ হয় না। অমর  
বলিয়াছেন “মঠশ্ছাত্রাদি-নিলয়ঃ”—যেখানে বিদ্যার্থীরা  
থাকে, যেখানে বিদ্যার আলোচনা হয়, তাহাই মঠ।  
মাতাপিতার স্মৃতির জন্ত বিদ্যালোচনাবিহীন, দেবপূজা-  
বিহীন কেবল ইষ্টকপিওস্থাপন দেহাত্মবাদীরই শোভা  
পায়। মৃত আত্মীয়দিগের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন-  
স্বরূপ ঐরূপ মঠাদিরও মূল্য আছে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধান  
এই যে স্মৃতিচিহ্ন কেবলমাত্র জড়পিও বা আলোখে  
পর্যাবসিত না হয়। উহার সংস্রবে বিদ্যাদানের ও  
দেবপূজার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মানুষ স্বভাবত  
যাহা চায়, তাহারই মধ্য দিয়া ধর্মকে পাইবার বিধান  
হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব

শাস্ত্রে-বিদ্যাদান ।

শ্রাদ্ধাদিতে বিদ্যাদানে বিশেষ পুণ্য আছে। এখনও  
অনেকে শ্রাদ্ধে গীতা-পুস্তক দান করেন। তা ছাড়া শ্রাদ্ধে  
গীতা বিরাট উপনিষদাদি পাঠের বিধি ও রীতি আছে।  
কেবল আবৃত্তিতেই ঐ বিধি চরিতার্থ হয় না। ঐ-সকল

পড়িয়া বা পড়াইয়া লোককে গুনাইতে হইবে, বুঝাইতে হইবে। তবেই গীতা-পাঠ, বিরাট-পাঠ, উপনিষৎ-পাঠ সার্থক হইবে।

মাতাপিতার চিতার উপর ইষ্টকপিও মঠ স্থাপন না করিয়া, সে টাকাটা শ্রদ্ধ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে দান করা বিধেয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্ম। সামর্থ্য থাকিলে প্রকৃত মঠ অর্থাৎ দেবালয়-বিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই ভাল, কিন্তু সেরূপ সামর্থ্য অল্প লোকেরই আছে। উহা বহু ব্যয়সাধ্য।

বিদ্যাদানের অর্থ কেবল ধর্মশাস্ত্রীয় বিদ্যাদান নহে।

এতক্ষণ বিদ্যাদানের কথা লিখিলাম। কেহ যেন মনে না করেন যে শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাদান কেবল বেদ স্মৃতি পুরাণাদির দান। নন্দিপুর্বাণে আছে

কলাবিদ্যাসুখা চাশ্চাঃ শিল্পবিদ্যাসুখাপরাঃ ।  
শস্ত্রবিদ্যা চ বিততা এতা বিদ্যা মহাকলাঃ ॥  
আয়ুর্বেদপ্রদানেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি ।  
শ্লোকং প্রহেলিকাং গাথামথাস্ত্রদ্বা স্তভাষিতম্ ।  
দত্ত্বা শ্রীতিকরং যাতি লোকমপ্‌সরসাং শুভম্ ॥  
( অপরাধ ১৩২৬—৩২২ পৃ )

ভবিষ্যোক্তরে আছে

শস্ত্রশাস্ত্র কলাশিল্পং যো যমিচ্ছেদুপাজিভম্ ।  
তস্তোপকারকরণে পার্থ কার্য্যং সদা মনঃ ॥  
বাজপেয়সহস্রশ্চ সম্যগ্নিষ্টশ্চ যৎ ফলম্ ।  
তৎফলং সম্বাপ্নোতি বিদ্যাদানান্ন সংশয়ঃ ॥

যুক্তবিদ্যা, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, আয়ুর্বিদ্যা, এমন কি শ্লোক প্রহেলিকা গাথা, যিনি যে বিদ্যা উপার্জন করিতে চান, তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতে হইবে। সহস্র বাজপেয় যাগ ভাল করিয়া করিলে যে ফল হয়, বিদ্যাদানে সেই ফল হয়।

জিলায় জিলায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। সাধারণতঃ কালেজে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা ছাড়াও কলাবিদ্যা ( Fine Arts ), শিল্পবিদ্যা ( Mechanical Arts ), শস্ত্রবিদ্যা ( Agriculture ), আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শিক্ষিয়া দেশের লোক ধন্য হউক।

( ক্রমশ )

শ্রীবনমালী চক্রবর্তী।

## প্রকৃতিতে বর্ণ বৈচিত্র্য

কবিগণ যেখানে কেবলমাত্র সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিয়া আনন্দলাভ করেন বৈজ্ঞানিক তাহার ভিতর হইতে কোন-না-কোন প্রয়োজনের অর্থ বাহির না করিয়া ছাড়েন না। জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কবিগণ ও সাধারণ মানব এতদিন কেবলমাত্র সৌন্দর্যের বিকাশই দেখিয়া আসিতেছিলেন; মানবমাত্রই মনে করিত প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র্য কেবলমাত্র মানবের আনন্দের জন্মই প্রকৃতিতে স্থান পাইয়াছে। তাহা বাতীত ইহাদের আর কি অর্থ থাকিতে পারে? আমাদের আনন্দ বাতীত ইহাদের অণু কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে, ইহা পূর্বে মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের কৃপায় আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে! তাঁহারা ইহার ভিতর হইতে কত অদ্ভুত তত্ত্বই না বাহির করিয়াছেন? কালে হয় তো আরো কত তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইবে।

বিধাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডারউইন সাহেব সর্বপ্রথমে আমাদের এই ভ্রম দূরীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি পৃথিবীর নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা নিয়মের শৃঙ্খলা দেখিতে পান। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সহিত অধিকাংশ প্রাণিদেহের বর্ণের সহিত একটা মিল আছে, তিনি তাহা লক্ষ্য করেন। শুভ্র মেরুপ্রদেশের অধিকাংশ প্রাণীই তাহাদের চতুর্দিকস্থ উষ্ণারের ঞ্চায় শুভ্র; মরুভূমির পশু ও পাখীদের বর্ণ সাধারণতঃ মরুভূমির বালুকারাশিরই ঞ্চায় ধূসর; কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীর বর্ণ কাদারই ঞ্চায় মেটে; যে যে প্রজাপতি যে যে বিশেষ পুষ্পের মধুপান করে তাহাদের পাখার বর্ণ সেই সেই পুষ্পেরই অনুরূপ; যে-সকল কীট পতঙ্গ কচিপাতা অথবা ডাঁটা প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের গায়ের বর্ণ কচিপাতা অথবা ডাঁটারই ঞ্চায় সবুজ; ঝিঁঝিঁ পোকা গাছের ডালে থাকে, তাহাদের বর্ণও গাছের বাকলের ঞ্চায়; দাম অথবা পানা-পচা জলাশয়ের মৎস্যের দেহ কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু

পরিষ্কার জল অথবা প্রবাল-দ্বীপের নিকটবর্তী স্থানের মৎশের দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল। এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এমন কি পাখীদের ডিমের মধ্যেও তাহাদের চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির সঙ্গে মিল রক্ষা করিবার একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বর্ণ-শৃঙ্খলার অর্থ কি? মহামনস্বী ডারউইন সাহেব সর্বপ্রথমে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। ইহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়াই তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের একটি নিগূঢ় ও গভীর তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিলেন আমরা তাহা হইতেই জানিতে পারিলাম উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষা প্রধানতঃ তাহাদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করিতেছে, আমাদের আনন্দের কারণ হওয়াই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা নহে।

এমন কতকগুলি জন্তু আছে, যাহারা সময় বিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেদের দেহের বর্ণ পর্য্যন্ত পরিবর্তন করিতে পারে। বহুরূপী (Chameleon) বর্ণ পরিবর্তন তো প্রবাদরূপেই পরিণত হইয়াছে। কয়েক শ্রেণীর তেক ও গিরগিটি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ যে-কোন সময়ে যে-কোন বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এমন আরো অনেক জন্তু আছে, যাহারা বিপদের সময় নিজেকে রক্ষা করিবার জন্তু নিজেদের ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্তন করিয়া শত্রুদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে।

ডারউইন ও তাঁহার শিষ্যগণ এইরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাদের এই কথাটিকে যথাসাধ্য দৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এতদিন পর্য্যন্ত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদের এই কথায় সায় দিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ সম্বন্ধে যতই পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চলিতেছে ততই তাহাদের এই কথা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। সন্দেহের কারণ—আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষার জন্তু প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য সকল স্থানে তো খাটে না! যে যে স্থানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদদের আত্ম-রক্ষা ও বংশবৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,

সেখানে আমরা কি বলিব? শুধু দুই এক স্থলে এইরূপ অর্থশূন্য বোধ হইলে কোন কথাই ছিল না। অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের বংশরক্ষার পক্ষে কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকের মধ্যে যখন একটা ত্রুটি লক্ষিত হয় তখনই আমরা তাহাকে একটা নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিরই মূলগত কারণ এই ব্যাখ্যাটিকে এখন আর একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যিক।

সূর্যের শুভ্ররশ্মির মধ্যে যে রামধনুর সাতটি বর্ণ নিহিত আছে একথা এখন আর কাহারো নিকট অপরি-জ্ঞাত নহে। সূর্য্যকিরণের এই সাতটি বর্ণ ভূতলের সকল পদার্থের উপরই আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সকল পদার্থেরই সূর্য্যকিরণের এই সাতটি বর্ণকে একসঙ্গে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; কেহ হয় তো একটি, কেহবা দুইটি, কেহবা তিনটি, কেহবা চারিটি, পাঁচটি, ছয়টিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, বাকিগুলিকে দিরাইয়া দেয়। যে পদার্থের যে বর্ণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই আমরা সেই পদার্থের সেই বর্ণ দেখিতে পাই। ভূতলের সকল পদার্থের প্রকৃতি একরূপ নহে, সুতরাং প্রকৃতিতে যে বিচিত্র বর্ণের স্থান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবে কে? কাহার নিকট হইতে আমরা ইহার যথাযথ উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। বিজ্ঞানের মতে সূর্য্যেরই শুভ্ররশ্মি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের উপর পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ সূর্য্যের শুভ্ররশ্মি ও আকাশের নীল বর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। অগ্ন্যন্ত বর্ণ সম্বন্ধেও বিজ্ঞান এই কথাই বলে।

বিজ্ঞান ঐতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু তবু তো ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। বিজ্ঞানের এই

ব্যাখ্যা' কি সকল স্থানেই খাটে? একই বৃক্ষের একই ফুলের মধ্যে অথবা একই জন্তুর গায়ের লোমের মধ্যে কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সার্থকতা কি? বিজ্ঞান বর্ণ-বৈচিত্র্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাতে কি এই প্রশ্নের সমাধান হয়।

যে-সকল স্থানে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বর্ণ-বৈচিত্র্যকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সহায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সকল স্থানেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। উত্তরমেরু প্রদেশের প্রাণিদেহের বর্ণ শুভ্র হওয়ায় আমরা স্থির করিয়া লইয়াছি ইহা তাহাদের আত্মরক্ষারই প্রয়াস। বিজ্ঞানের নিকট হইতে কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান বলে উত্তাপ ও আলোকের অভাবই উত্তরমেরুতে এইরূপ শুভ্রবর্ণের কারণ।

কতক অংশে বিজ্ঞানের এই কথা সত্য হইলেও সর্বস্থানে ইহার মিল কোথায়? শীতমণ্ডলে উজ্জলবর্ণের উদ্ভিদ ও প্রাণীরও তো অভাব নাই।

এই তো গেল সাধারণ ভাবে দেখা; বিশেষ বিশেষ উদাহরণ উদ্ধৃত করিলে আমাদের আরো বিপদে পড়িতে হয়। শুভ্র পালকবিশিষ্ট পাখীদের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য নিয়ম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। অধিকাংশ শুভ্র পাখীই জলচর; বিশেষতঃ সামুদ্রিক পাখীদের মধ্যে এই জাতীয় পাখীর সংখ্যাই বেশী। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে শুভ্রবর্ণের স্থলচর পাখী খুব অল্পই দৃষ্ট হয়—এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য যদি একমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ও বংশবৃদ্ধির জন্তই হইয়া থাকে তাহা হইলে এই নিয়মটি সামুদ্রিক পাখীদের বেলায় কতদূর খাটিতেছে তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

সত্য সত্যই কি শুভ্র পালক তাহাদিগকে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে? কই তাহা তো মনে হয় না। শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে প্রতি-বৎসরই তো অসংখ্য অসংখ্য গাংশালিক নিহত হয়। স্থলচর পাখীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি পূরাপূরীভাবে

খাটিতেছে বলিয়া তো মনে হয় না। মানুষ অথবা অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে, কেবলমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মরক্ষার জন্ত এত বিচিত্র বর্ণ প্রকৃতিতে স্থান পাইয়াছে, তাহা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়?

সূর্য্যকিরণই প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ ইহা মানিয়া লইয়াও আমাদের নিষ্কৃতি পাইবার জো নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতু এবং বহুমূল্যবান উজ্জল প্রস্তর প্রভৃতির জন্য মৃত্তিকা-গর্ভে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে খনন করিয়া বাহিরে আনিবার পূর্বে সূর্য্যের আলোক অথবা উত্তাপের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু উজ্জলতায় ধরণীপৃষ্ঠের কোন পদার্থ ইহাদের সমকক্ষ? সমুদ্রের অতলগর্ভে এমন অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করে যাহারা উজ্জলতায় ধরণীপৃষ্ঠের কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে; অথচ তাহাদের বাস স্থানে কোন দিনও সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের প্রবেশ লাভ ঘটে নাই।

বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদ্ভিদজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদের কান্দে গোলমালে পড়িতে হয় না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে কোন কোন বিশেষ ফুল অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ ঋতুতেও পুষ্পমধ্যে কোন জুই একটি বিশেষ বর্ণের আধিক্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এবং আমাদের ঋায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই নিয়মটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, আমাদের দেশে বর্ষায় ও শরতে, বনে ও বাগানে শাদা ফুলের বাহারই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, উদাহরণ স্বরূপে বেল, জুঁই, মালতী, মল্লিকা, টগর, গন্ধরাজ, করবী, রজনীগন্ধা, কাশ, শিউলি প্রভৃতি ফুলের নাম করা যায়। বসন্তকালের অধিকাংশ ফুলই হলুদে অথবা হলুদে শাদায় মিশানো; বহুপুষ্পের অধিকাংশই হলুদে। অন্যান্য বর্ণের ফুল যে এ সময়ে একে-

বারেই প্রক্ষুটিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু এই সময়ের অধিকাংশ পুষ্পই এই দুইটি বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ।

ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এক এক জাতীয় ফুলকে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। জুই জাতীয় ফুলকে একমাত্র শাদা ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণের হইতে দেখা গিয়াছে কি? জবা জাতীয় ফুল সাধারণতঃ লাল অথবা শাদায় লালে মিশানো। জুইকে জবার ঞায় লাল অথবা জবাকে জুইয়ের ন্যায় খাঁটি শাদা হইতে সম্ভবতঃ কেহ কখনো দেখে নাই। গোলাপ ফুলের মধ্যে প্রায় সকল বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু খাঁটি নীলবর্ণ কোন গোলাপের মধ্যে মোটেই দেখা যায় না। বিজ্ঞান অথবা প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না।

উদ্ভিদরাজ্য সম্বন্ধেও এই কথা; প্রাণিজগতেও বর্ণ-বৈচিত্র্যের জটিলতার অভাব নাই। জন্তু-জানোয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; একশ্রেণী মাংসাশী ও অন্যশ্রেণী নিরামিষাশী। বর্ণ সম্বন্ধে এই দুই শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। মাংসাশী জানোয়ারদের অধিকাংশেরই গায়ে ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল গোল চক্র আঁকা। উদাহরণ স্বরূপে কুকুর, বিড়াল, বাঘ, চিতা, হায়েনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; শৈশবাবস্থায় সিংহের শরীরেও ডোরা ডোরা দাগ দেখা যায়। কিন্তু তৃণভোজী জানোয়ারদের মধ্যে কদাচিৎ এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে যে এই ডোরাকাটা অথবা গোল চক্রবিশিষ্ট জন্তু একেবারে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। জেব্রা, জিরাফ এবং কয়েকজাতীয় হরিণের গায় এইরূপ ডোরা ডোরা দাগ এবং গোল গোল চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এই ডোরা ডোরা দাগ সম্বন্ধেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় আছে। মাংসাশী জানোয়ারদের গায়ের দাগ সাধারণতঃ কোন উজ্জ্বল বর্ণের উপর কালো ডোরা আঁকা, কিন্তু তৃণভোজী জন্তুদের ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ

বিপরীত। পাখীদের মধ্যেও এই ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল চক্রের অভাব নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপ পাখীদেরও অধিকাংশই শিকারী পাখী। মাছের মধ্যেও এইরূপ চিত্র-বিচিত্র বর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

পশুদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে আরো একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। পশুদের সমস্ত শরীর ভিন্ন ভিন্ন লোমে আবৃত হইলেও মেরুদণ্ডের উপরিভাগ সাধারণতঃ দীর্ঘ কালো এবং বক্ষঃস্থলের লোম সাধারণতঃ দীর্ঘ শুভ্র হইতে দেখা যায়। মৎস্যের বেলায় কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই স্থানে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রয়াসই ইহার মূলগত কারণ বলিয়া মনে হয়। মৎস্যের নিয়মিত হইতে বিপদের আশঙ্কা বেশী, সুতরাং ইহাদের নিম্ন অংশ দীর্ঘ কৃষ্ণ হওয়ায়, জলের মধ্যে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার সঙ্গে ইহারা সহজেই মিশিয়া যায়। কিন্তু পশুদের উপরিভাগ হইতে বিপদের আশঙ্কা বেশী, সেইজন্য ইহাদের মেরুদণ্ডের উপরিভাগ কালো লোমে আবৃত হওয়ায় ইহারা সহজেই সবুজ বনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারে।

বন্যজন্তুদের মধ্যে গৃহপালিত জন্তুদের মতো এত চিত্রবিচিত্র জন্তু খুব অল্পই লক্ষিত হয়। এইরূপ হইবার একটি কারণ এই মনে হয়, যে, গৃহপালিত জন্তুদের যেরূপ চিত্র-বিচিত্র জন্তুর সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয় বন্যজন্তুদের সেরূপ হয় না। পাখীদের মধ্যেও এই বিশেষত্বটুকু আছে। পায়রার নাম উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যায়।

পাখীদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও কয়েকটি নিয়ম লক্ষ্য করিবার মতো আছে। অধিকাংশ সঙ্গীতকারী পাখীদের বর্ণ ফেকাসে; উজ্জ্বল পালকবিশিষ্ট পাখীদের কঠোর সাধারণতঃ কর্কশ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি দাগ কেবল মাত্র কুহুটজাতীয় পাখীর মধ্যেই লক্ষিত হয়।

এইবার পতঙ্গরাজ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই স্থানেও জটিলতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। ডাসের (moth) পাখার বর্ণ সাধারণতঃ ফেকাসে। অনেকের মতে দিনের বেলায় সূর্যালোকে বাহির না হওয়াই এইরূপ ফেকাসে হই-

বার কারণ। কিন্তু সর্বস্থানে তো এই নিয়মটি খাটে না। এমন অনেক ডাঁস আছে যাহারা দিনে মোটেই বাহির হয় না অথচ তাহাদের পাখার বর্ণ যথেষ্ট উজ্জ্বল; আবার যাহারা দিনে ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়ায় তাহাদের পাখার বর্ণ ফেকাসে। এ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম প্রবর্তিত করিবার জো নাই; বরঞ্চ প্রজাপতির যে পাখাগুলি অগ্ন্যাগ্নি পাখার ভাঁজের মধ্যে থাকে সেই গুলিই সাধারণতঃ অগ্ন্যাগ্নি পাখা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর।

এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এপর্যন্ত ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারেন নাই। কোন দিন ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে কি না কে জানে? তবে বিজ্ঞান যেরূপ আশ্চর্য্যাকর্ষী তাহাতে একেবারে নিরাশ হইবারও কারণ নাই।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

## প্রাচীন ঋষিগণ ও উদ্ভিদতত্ত্ব

ইংরাজী উদ্ভিদবিদ্যা পাঠকালে মনে হইত পত্র-পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ শস্যশ্রামল ভারতভূমিতে বাস করিয়া প্রাচীন আৰ্য্যঋষিগণ লিনিয়স (Linnaeus), ডি ক্যান্ডোল (De Candolle) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় উদ্ভিদশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন কি না? যাহারা বাল্যকাল হইতে পুষ্পচয়ন ও তাহার দ্বারা পরম-পিতার পূজা করিতেন, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা নির্জন অরণ্যে বসবাস করিতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যাহাদিগের বালিকারাও আশ্রমস্থিত বৃক্ষাদির জীবন রক্ষার জন্ত সযত্নে আলবালে জলসেচন করিতেন, কখন বা রসাল বৃক্ষের সহিত মাধবীলতার বিবাহ দিয়া সখীগণ মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহারা যে চিরসহচর উদ্ভিদদিগের বিষয়ে আলোচনা করিতেন না এংরূপ অশুমান করা যায় না; নতুবা কবিরাজী শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল কিরূপে? কি উপায়ে তাহারা অবগত হইলেন যে অনেক উদ্ভিদ মানবের রোগ দিবারণে সক্ষম? বিশল্য-করণীর রক্তস্রাব নিবারণ করিবার ক্ষমতা, গোয়ালে

লতার পৃষ্ঠত্রণ প্রভৃতি হৃষিকিৎসায় ক্ষত আরোগ্যের শক্তি কখনই বিনা পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

ফলতঃ অতি প্রাচীনকালেও আৰ্য্যঋষিগণ উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিলেন বলিয়াই উদ্ভিদকে স্থাবর জীব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বৃক্ষাদির উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ জীবেরই ন্যায় কালসাপেক্ষ। ইহাদিগের মধ্যেও শৃগালাদি জীবের ন্যায় মাংসাশী উদ্ভিদের অভাব নাই। মাংসাশী বৃক্ষের বিষয় অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। বেদেরা আঠার সাহায্যে যেরূপে পক্ষী শিকার করে, 'sundew' নামক উদ্ভিদ সেইরূপে পিপীলিকা শিকার করিয়া থাকে। মধুর লোভে হতভাগ্য পিপীলিকা পত্রস্থিত আঠায় আটকাইয়া জীবন হারায়। Pitcher Nepenthus নামক উদ্ভিদের পত্রে ঘটের ন্যায় পাত্র জন্মে। ঐ-সকল পত্রের অভ্যন্তরে মধুর ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহার লোভে হতভাগ্য মক্ষিকা যেই উহার মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি ঘটের ঢাকুনি বন্ধ হয় এবং মক্ষিকাটি ঐ রসে জীর্ণ হইয়া যায়। আবার যে কোশলে জীবপ্রবাহ রক্ষা পাইয়া থাকে, উদ্ভিদ-বংশ রক্ষার জন্ত প্রকৃতিদেবী সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। জীবের মধ্যে যেরূপ স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, উদ্ভিদরাজ্যেও সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। পুষ্পের পরাগ-নিষেকক্রিয়া, বীজোৎপত্তি, বংশবিস্তার, আত্মরক্ষার কোশল প্রভৃতি আলোচনা করিলে জীব ও উদ্ভিদে যে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, জগতের সর্বত্রই যে একই বিরাট নিয়ম কার্য্য করিতেছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। দারুণ গ্রীষ্মের সময় উহাদিগের মৃতপ্রায় অবস্থা, আবার বর্ষা সমাগমে সতেজতাব ও পুষ্পাদির উদ্ভব, অগ্নিদাহে অকাল-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় অবলোকন করিয়া কে না স্বীকার করিবেন যে উহারাও জীবের ন্যায় সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে? ফলতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জীবের ন্যায় উদ্ভিদের সুখদুঃখ-বোধ প্রমাণ করিয়াছেন। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন ঋষিগণ যে উদ্ভিদদিগকে জীব-



মধ্যে গণ্য করিবেন—গতিশক্তিবিহীন একপ্রকার জীব বলিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তাঁহারা জানিতেন “সকল ভূতের মধ্যে তিন প্রকার বীজ রহিয়াছে :— অণুজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ।

“তেষাং ধ্বংসাং ভূতানাং ত্রীণোব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজঃ

জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ।” ছান্দোগ্যোপনিষদ্ । ৬।৫

“বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ শ্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি ।” ঐতরেয় উপনিষদ্ । ৫।৩।

“কাল-পর্য্যায়ে যাহা পৃথিবী ভেদ করিয়া উদ্ভিত হয় উহাকে উদ্ভিজ্জভূত বলা যায়” ) ।

“ভিত্ত্বাত্ত পৃথিবীং যানি জায়ন্তে কালপর্য্যায়ঃ ।

উদ্ভিজ্জানি চ তাগ্ৰাহ ভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ —মহাভারত ।

ভগবান্ মনু উদ্ভিদজাতিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—

ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান ও বল্লী । সমুদায় উদ্ভিদই স্থাবর ( জীব ) । তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে ও অন্য কতকগুলি রোপিত কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাহারা বহুপুষ্পযুক্ত ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায় উহারা ওষধি ( যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি ) । যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয় তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্পিত হউক বা ফলবন্ত হউক উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ কহে ( যেমন বট, ডুমুর ইত্যাদি ) ।

“উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ড প্ররোহিণঃ ।

ওষধাঃ ফলপাকান্তাঃ বহুপুষ্প ফলোপগাঃ ॥

অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পত্যয়ঃ স্মৃতাঃ ।

পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষা স্ত্ৰ ভয়তঃ স্মৃতাঃ ॥

গুচ্ছ গুল্মস্ত বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ ।

বীজকাণ্ডকহাণোব প্রতানা বল্ল্য এব চ ॥

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ণহেতুণা ।

অন্তঃসংজা ভবন্ত্যেতে স্ত্ৰধ্বংস-সমবিতাঃ ॥ মনু ১।৪৬-৪৯ ।

বাস্তবিক বট বা ডুমুরের যে ফুল হয় না তাহা নহে । যাহাকে বটের ফল বা ডুমুর বলা হয় উহার অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প জন্মিয়া থাকে । সেই-সকল ফুল হইতে অসংখ্য বীজ উৎপন্ন হয় । রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির পুষ্পগুচ্ছকে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু বট বা ডুমুরের পুষ্পগুচ্ছ সাধারণ লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না । ফলের আকৃতিবিশিষ্ট একটা আবরণের মধ্যে লুকায়িত থাকে । এই

জনাই বটাদিবৃক্ষকে পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত বলিয়া মনে করা হইয়াছে । গোলাপাদির শাখা হইতে নুতন উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে । নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবকে (amoeba) বহুঅংশে বিভক্ত করিলেও নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে । ফল পাকিলে অর্থাৎ সস্তান উৎপন্ন হইলে ধানা যবাদি ওষধি যেরূপ মরিয়া যায়, কাঁকড়া, মাকড়শা প্রভৃতি অনেক জীবও সেইরূপ সস্তান প্রসব করিয়াই জীবলীলা সাজ করে । সুতরাং জীব ও উদ্ভিদের মূলতঃ পার্থক্য কোথায় ?

গুচ্ছ ( মল্লিকাদি ) ও গুল্ম ( বংশাদি ) নানা প্রকার । তৃণজাতিও বহুবিধ । প্রতান ( লাউ কুমুড়া ইত্যাদি ) ও বল্লী ( গুড়চাদি ) বহু প্রকার । ইহারা বহুরূপ কর্ম্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন । ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহারা সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ! একই পিতামাতার সস্তান হইয়াও কেহ উন্মাদ, কেহ বা জগৎবিখ্যাত কবি, কেহ মুর্থ, কেহ পণ্ডিত, কেহবা চিরক্লম্ব, আবার কেহবা স্তম্ভদেহ ; এক ভাই রাজার পালিতপুত্র ও চিরসুখী, আবার অন্য ভাইয়ের দিনান্তে শাকারও যোটে না । সেইরূপ একই বাড়ি হইতে উৎপন্ন একখানা বাঁশ হইতে দেবপূজার জন্য পুষ্পপাত্র ( সাজি ) ও অপর বাঁশ হইতে মেথরের কাঁটা প্রস্তুত হইতেছে । এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া যাহারা জীবের ইহ-জীবনের সুখদুঃখ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা যে উদ্ভিদদিগকে কর্ম্মফলে তমোগুণযুক্ত চলৎশক্তিবিহীন জীব বলিয়া মনে করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

বৃহৎ-শাকর্ধর-কৃত পাদপ-বিবক্ষা-প্রকরণেও উদ্ভিদ-দিগকে গুণানুসারে বনস্পতি ( বট, ডুমুর ইত্যাদি ), ক্রম ( আম, জামাদি ), লতা, ও গুল্ম এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে । কিন্তু কৃষিশাস্ত্রানুসারে উদ্ভিদ-জাতি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—১। অগ্রবীজ অর্থাৎ যাহাদের আগা কাটিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয় । ইহার অপর নাম কাণ্ডজ বলা যাইতে পারে, যেমন গোলাপ, বট ইত্যাদি । ২। মূলজ অর্থাৎ যাহাদের মূল পুঁতিলে গাছ জন্মে অর্থাৎ কন্দজ ( কচু, পদ্ম ইত্যাদি ) ।

৩। পরুষোনি অর্থাৎ যাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ জন্মে (আখ)। ৪। স্বকৃৎ অর্থাৎ যাহারা অন্য-গাছের গুঁড়ির উপর জন্মে (epiphyte or parasite, যেমন আলোকলতা, রান্না, ধেয়ো orchids, ইত্যাদি)। ৫। বীজরূহ অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে যাহাদের গাছ জন্মে (নারিকেল, আম ইত্যাদি)। ৬। সম্মুচ্ছ্র—ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ পরস্পর সমাহিত হইয়া কর্দম-মৃত্তিকাকে পাক করিলে এবং তাহা হইতে যে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে তাহারাই সম্মুচ্ছ্র।

আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ উদ্ভিজ্জের জাতি, শ্রেণী, নাম ও লক্ষণ সকল উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বীজ, অঙ্কুর, মূলাদির উৎপত্তির বিষয় বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায়ই অবগত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণ অপেক্ষাও সমধিক জানিতেন—আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ পর্যালোচনা করিলেই উহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। রাখবভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন—

“তত্র সিদ্ধা জলৈভূমিরন্তরুন্ম বিপাচিত।  
বহুনা ব্যাহমানা কৃ বীজতং প্রতিপাদ্যতে ॥  
তথাব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তাশ্চক্ষমা পুনঃ।  
উচ্ছ্রজতং মূহুত্বক মূলভাবং প্রয়াতি চ ॥  
ভস্মলাদঙ্কুরোৎপত্তি রক্ষুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।  
পর্ণাঙ্ককং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ ॥”

“জলসিক্ত ভূমি অভ্যন্তরস্থ উন্মা দ্বারা পচমান হইলে সেই পাকজনিত বিকার বিশেষ যখন বায়ু কর্তৃক গৃহীত বা সংঘাততাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিদ-জন্মের বীজ অর্থাৎ উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। ঐ অব্যক্ত বীজ হইতে প্ররোহ জন্মে। সেই প্ররোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজ উৎপন্ন হয়। ব্যক্ত বীজসকল জলে আর্দ্র হইলে প্রথমে ফুলিয়া উঠে ও মূহুত্ব বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে তাহাই ভবিষ্যৎ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ হইয়া উঠে। সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের পরিণামে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে উহার আত্মা বা দেহভাগ (কাণ্ড) আবার কাণ্ড হইতে প্রসব (পুষ্প ফলাদি) জন্মে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উদ্ভিদের তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেন—মূল, কাণ্ড ও পত্র; ফুল, ফল বা বীজ পত্রেরই পরিণাম বলিয়া থাকেন। এমন দিন হয়ত আসিবে

যখন তাঁহারাও আর্ষা ঋষিদিগের ন্যায় বলিবেন যে পত্র হইতেই কাণ্ডেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। পত্র বিনা যে উদ্ভিদ দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না, পত্রই যে প্লক-স্থলীর কার্য করে ও খাস প্রখাসের প্রধান উপায় তাহা যখন প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তখন পত্রের একান্ত অভাবে যে উদ্ভিদদেহ অর্থাৎ কাণ্ড থাকিতে পারে না ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই অর্থাৎ পত্রই কাণ্ড ও ফুল ফলাদির কারণ বলিতে পারা যায়।

এতদ্বিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে ত্বক্‌সার, অন্তঃসার, মিসঃসার প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। এইহেতু সুহর্জেই স্বীকার করিতে হয় যে প্রাচীন ঋষিগণ উদ্ভিদতত্ত্ব অবশ্যই অবগত ছিলেন। কৃষিপরাশর, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। চরক-মুনির নিম্নলিখিত বচনটিও প্রাচীন উদ্ভিদ-তত্ত্বের পরিচায়ক :—

“মূলত্বক সারঃ নির্যাস নাল স্বরস পল্লাবাঃ।  
ক্ষীরা ক্ষীরং ফলং পুষ্পঃ ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।  
পত্রানি গুন্মাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদোগণঃ।

তবে প্রাচীন আর্ষা প্রণালী বর্তমান কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অবলম্বিত পন্থা হইতে অনেকটা পৃথক ছিল। তাঁহারা কোন ব্যক্তির পরিচয় দিবার সময় জীবনী লিখিবার সময়—আধুনিক কালের ন্যায় পুঙ্কানুপুঙ্ক হিসাব করিয়া ঘড়ি ধরিয়া সন তারিখ বেলা ঘণ্টা মিনিট লিখিতেন না, জন্ম তারিখের হিসাবই থাকিত না। ব্যক্তিটির জীবনের মূল ঘটনা ও গুণাবলী বিশদভাবে প্রদর্শন করিতেন মাত্র। কারণ পাঠকের পক্ষে—সমগ্র মানবের পক্ষে—উহাই প্রকৃতপক্ষে জানিবার—শিখিবার বিষয়। জন্মের এক আধ ঘণ্টা বা দিনের ইতর বিশেষে বিশেষ কিছু যায় আসে না। উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা কালেও সেই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা Roxburghর উদ্ভিদবিদ্যার ন্যায় পত্রপুষ্পাদির পুঙ্কানুপুঙ্ক বর্ণনায়ুক্ত গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হইতে পারি নাই। ইহাতে যে বাস্তবিকই আমাদের কিছু ক্ষতি হয় নাই তাহা নহে, কবিরাজী গ্রন্থে কাকলী, ক্ষীরকাকলী, প্রভৃতি এমন অনেক উদ্ভিদের নাম উল্লেখ আছে যে উহা-দিগকে নিঃসংশয়ে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। ডাক্তারী



## ଜଗନ୍ନାତ୍ରି ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ହିତେ ତାହାର ଅନୁମତିକ୍ରମେ ମୁଦ୍ରିତ ।



পরীক্ষোত্তীর্ণ কবিরাজ মহাশয়েরা যদি দেশীয় উদ্ভিদগণের আকারাদির বর্ণনা পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে করিয়া উহার সহিত স্পষ্টরূপে দোস্ত গুণাবলী যথাক্রমে সংযোজিত করেন তবে বাস্তবিকই একখানি অপূৰ্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জীব ও উদ্ভিদের সাম্য, আঘাত পাইলে উভয়েরই একইরূপ সাড়া দিবার প্রণালী, সুখদুঃখ বোধ ইত্যাদি জটিল বিষয় আধুনিক প্রণালীমতে প্রমাণ করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। যাহারা শৃগালাদি নিকৃষ্ট জীবের আত্মা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন সেই সকল পণ্ডিতদিগের পক্ষে অবশ্য পরমাত্মার সর্ব্বশেষে বিদ্যমানতা বিশ্বাস করা বা অনুভব করা বাস্তবিকই কষ্টকর। দূর হইতে দেখিলে যাহাদিগকে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি বলিয়া মনে হয় এইরূপ অপূৰ্ণ মনোহর ঋতুপুষ্প-পরিপূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল উদ্ভিদদিগকেও এইজন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্যঋষিদিগের ত্রায় স্বাবর জীব বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। সুন্দরশী প্রাচীন ঋষিদিগের এইখানেই বিশেষত্ব বুদ্ধিতে হইবে।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

## ব্রহ্মবাদ—প্রাচীন ও নবীন

ভারতীয় ব্রহ্মবাদ অতি প্রাচীন বস্তু। “একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি” বলিয়া ঋগ্বেদে যে একেশ্বরবাদের সূচনা হইয়াছিল, জাহাই উপনিষদে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রহ্মতত্ত্ব আর কোথাও প্রচারিত হইয়াছে কি না তাহা জানি না। জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত এই সভ্যতার যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রও এই উপনিষদ-সকল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জিনিষ আর জগতের শাস্ত্রভাণ্ডারে পাওয়া যায় নাই। তাই বলিয়া এই ব্রহ্মবাদের আনুষ্ঠানিক যাহা কিছু সকলই যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। এই দুই তিন হাজার বৎসর জ্ঞানবিজ্ঞানাদিতে যে মহা বিপ্লবকর

উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আজ সহসা সেই উপনিষদ-যুগে যাইয়া উপনীত হইতে পারি না। তাহার মত অসম্ভব ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই বর্তমান সময়ের উপযোগী হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। নতুবা তাহা কোনও কাজে লাগিবে না; যুতজীবের কঙ্কাল যেমন যাহুনের থাকে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মজ্ঞানকে যদি আমরা তেমনি পুস্তকাগারের এক কোঠায় আবদ্ধ করিয়া না রাখিতে চাই, তাহা হইলে উহাকে জীবনে সাধন করিতে হইবে। তবেই উহা জীবন্ত হইয়া জগতের কাছে আত্ম-প্রকাশ করিবে। এই কার্য সাধনের পথে দুইটি বিষয় আছে—বিষয় দুইটি হইতেছে সন্ন্যাস ও দেববাদ—উভয়ই বর্তমান যুগের শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী, উভয়কেই পরিহার করিতে হইবে।

ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার সঙ্গে জাতিভেদের অহি-নকুল সম্বন্ধ—উভয়ে একসঙ্গে থাকিতেই পারে না। পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে ভ্রাতার সঙ্গে বাদ চলে না। গৃহে ব্রহ্মজ্ঞান আনিলে জাতিভেদ থাকে না, অধচ বর্ণাশ্রম ছাড়াও সমাজ চলে, এ জ্ঞান পরিপুষ্ট হইবার সুযোগও তখন হয় নাই, এবং যাহা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতনের সম্মুখীন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তখন জাগে নাই; তাই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাকে চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। তখন দেখা গেল ইহা বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলেই সব ছাড়িয়া ফকীর হইয়া যাইতে হইবে? এরূপ স্থলে হয় ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে; না হয়, গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যাহা, মানব-সভ্যতা ও সাধনার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ যাহা, যাহারা এই বিকাশ লাভ করিতেন, তাঁহাদের সম্মানসম্মতিগণ সকলেই সেই সম্পদ লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে, তাহা

হইতেই পারে না। তাই তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন যতক্ষণ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া উপাসনা করা হইবে ততক্ষণ কেহ জাতিভেদ মানিতে পারিবে না, মানিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মচক্রে মহেশানি জাতিভেদং বিবর্জয়েৎ। কিন্তু চক্রের বাহিরে আসিলেই জাতিভেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। অর্থাৎ স্থলে গোল হইলেও পৃথিবীটা বাড়ীতে যে-চ্যাপ্টা সেই চ্যাপ্টা। এ নিতান্তই বিরোধী ব্যাপার। এমন করিয়া মানবজীবন চলে না, অথও মানবজীবনকে এমন করিয়া ধও খণ্ড করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই, ব্রহ্মজ্ঞান স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সব জাতি একত্র আহার করিতে পারে, না করিলেই অপরাধ। স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি, পাপ হইবে এই ভয়ে পাণ্ডার মুখে ভাত তুলিয়া দিলেন বটে কিন্তু সমস্ত শরীর কম্পিত হইল, একবারের বেশী ছ'বার হস্ত উঠিল না।

আমাদের ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বত্রই তিনি রহিয়াছেন। আমাদের প্রতি-চিন্তা, প্রতি-বাক্য, প্রতি-কার্য্য তাঁহারই সত্তাতে পরিপূর্ণ। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, “যৎ যৎ কৰ্ম্ম প্রকুর্ষীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ”—আমাদের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা, সুতরাং আমাদের ব্রহ্মচক্র পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদ অনুশীলন করিবার অবসরই থাকিতেছে না। অতীতকালে আবার এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হিন্দুর ঈশ্বর-নির্দিষ্ট মিশন্। আমরা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম জগৎকে বিলাইতে যাইতে পারি না। যে ধর্ম্ম আমরা নিজেরাই ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছি, তাহা জগৎকে বিলাইতে যাইব কোন্ লজ্জায়? তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবে এ ধর্ম্ম তোমার কি উপকারে আসিয়াছে তখন কি চক্ষুস্থির হইবে না! বিশেষতঃ, যাহারা সংসারে থাকিয়া পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান কি তাহাদেরই বেশী উপকারে আসিবে না? ইহা সন্ন্যাসীর ভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সংসারীর অত্যাবশ্যকীয় নিত্য অবলম্বনীয় বস্তু। ইহা না বুঝিয়াই আমরা আমাদের

জাতীয় জীবনের মহা সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা আর এখন সন্ন্যাসীদিগকে আমাদের জীবনের সার বস্তু হরণ করিয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে দিতে রাজী নহি। সকলেই জানেন, স্পেন এক সময়ে কেমন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন নিভিয়া গেল। কেন? সুপ্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত গ্যান্টন বলেন যে Inquisition তাহার কারণ। হুকুম হইল, যিনি প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তাহাকেই হত্যা করা হইবে। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার ফল হইল এই, যাহারা প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারিল না, তাহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ইহাদের দ্বারা যে-সমাজ গঠিত হইল তাহা যে অবনতির দিকে যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহারা ধর্ম্ম ছাড়িল না তাহারা হয় দেশত্যাগ করিল না হয় স্বত্বকে আর্লিঙ্কন করিল। এইরূপে মহত্বকে উপড়াইয়া ফেলিলে সমাজ যে কেবল অগাছার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর কি কোন সংশয় থাকিতে পারে? যুগযুগান্ত ধরিয়া আমাদের সমাজের এই দশাই ঘটিয়াছে। যিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন, হয়, তিনি তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন; না হয়, সংসারের খাতিরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। যদি চলিয়া গেলেন, তো শিক্ষা ও বংশানুক্রম দুই দিক হইতেই সমাজ এই উচ্চ সাধনার সুফল হইতে বঞ্চিত হইলেন। আর যদি থাকিয়া গেলেন তবে তিনি বুঝিলেন এবং বুঝাইলেন উচ্চ ধর্ম্ম সংসারীর জন্ত নহে। ইহার বিষময় ফল সমাজের উপর বিশেষ ভাবেই ফুটিয়াছে। কোন উচ্চনীতির কথাও শুনিলে লোকে বলে, সংসারে থাকিয়া ওসব চলে না। ধর্ম্ম ও সংসার এই দুইএর মধ্যে একান্ত বিরোধ ঘটাইয়া মানবজাতির যে অনিষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনিষ্ট আর কোনও একটা বিষয়ের দ্বারা হইয়াছে কি না সন্দেহ। জাতীয় জীবনের যাহারা মঙ্গলাকাজ্জী, তাহারা আর এই অমঙ্গলের পথ অবরোধ না করিয়া পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক সাধনা এই গৃহেই

করিতে হইবে। অতএব জাতিভেদের অবসর-গ্রহণ অনিবার্য।

দ্বিতীয় কথা দেববাদ। উপনিষদের সময়ে পৌত্তলিকতা ছিল না। পৌত্তলিকতা ভারতীয় ধর্মে বৌদ্ধধর্মের যুত্থাকালীন দান। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মও এত সূক্ষ্ম ও নিগূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে উপাসনার জন্ত মূর্ত্তিপূজা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম তো আদৌ উপাস্ত্র বাদ দিয়াই আরম্ভ হয়। পরে যখন উপাস্ত্র গৃহীত হইলেন তখন বহু মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। উপাসনার প্রথমেই তাঁহারা মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। কেন না, অমূর্ত্তের সঙ্গে আদিতেই যাহাদের পরিচয় নাই পরিণামে ভগ্নদশায় তাহারা তাঁহাকে পাইবে কোথা হইতে। ইহাই এদেশে মূর্ত্তিপূজার ইতিহাস। এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরোপাসনা বাদ দিয়া মানুষকে তাহার নিজশক্তির উপর দাঁড় করাইয়া ধর্ম গড়িতে যাইলে যে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। এত বড় উচ্চ নীতিতত্ত্বের উপরে যাহার ভিত্তি, বর্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার দিনে আবিভূত হইয়া যেরূপ পূজা আর কোন মানুষই পাইতে পারে না সেইরূপ পূজার অধিকারী বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব যাহার নেতা এবং অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি যাহার রক্ষা ও পরিপোষণে ব্যয়িত, সেই ধর্ম ভীষণ তাত্ত্বিক বামাচারে দেশকে ডুবাইয়া অন্তর্হিত হইল, সে কথা ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সাক্ষ্য পাইয়াও যাহারা আবার ঈশ্বরবিহীন নীতির উপরে মানব-সমাজ গড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজেরাও বিনাশকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন আর সমাজকেও বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, ঋষিগণ দেবতাদের অস্তিত্ব মানিতেন এবং তাঁহাদের পূজারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপভাবে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মবাদের কোনও হানি হয় না। তাঁহারা দেবতাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা মানিতেন না। দেবতার শক্তি ব্রহ্মশক্তিরই প্রকাশ। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার আধ্যাত্মিকার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে,

যে, মানুষ আগে যাহাই মনে করুক না কেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারে দেবতাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বে যদি ব্রহ্মবাদের কোনও হানি না হয়, তবে মানুষের অপেক্ষা কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবের অস্তিত্বে ব্রহ্মবাদের হানি হইবে কেন? আর দেব-পূজার যে ব্যবস্থা, সেরূপ পূজা উচ্চ শ্রেণীর জীবকে আমরাও করিয়া থাকি। লাট বড়লাট রাজরাজড়ারা কোন উপকার করিলে আমরা কি তাহাদের স্তুতিবাদ করি না? না, প্রত্যাশকারের আশায় উপঢৌকনাদি দেই না? মানুষের দ্বারা যে, দেবতার পূজা, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দেবতার জলরূপ দ্বারা তোমাদের শস্য উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তোমরা যজ্ঞধূমের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা কর, নতুবা দান গ্রহণ করিয়া প্রতিদান না করার জন্ত প্রত্যাশায়গ্রস্ত হইতে হইবে। নিতান্ত চোরের স্থায় তাহাদের দান গ্রহণ করিও না।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ সাথ ॥ ৩।১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্ত্বানপ্রদায়েতো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥

৩।১২ গীতা।

কিন্তু তাঁহাদের এই দেববাদের মধ্যে মানবজাতির শৈশবের পরিচয় মাত্র পাই। শিশু যেমন সকল বস্তুকেই স্বানুরূপ ব্যক্তিত্বের আরোপ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে, মানব জাতি শৈশবেও তাহাই করিয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে দেবী হয় না। আমরা এই প্রাকৃতিক শক্তিসজ্জের কাছে যেরূপ অসহায়, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী অসহায় ছিলেন। এক দিকে হঠাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া সব বিনাশ করিয়া দিল, আবার কাজের বেলায় সাধ্য সাধনা করিয়াও পাওয়া গেল না। তখন উপহার লইয়া উপস্থিত হওয়ার মত স্বাভাবিক আর কি আছে? আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া এই শক্তিসমূহ কার্যে লাগাইতেছি। সুতরাং আমাদের কাছে দেবতাদের নিকট উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা

চলিয়া গিয়াছে। আমরা শারীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহযন্ত্র (Organism) ছাড়া কোনও পরিমিত ব্যক্তিত্ব বাস করিতে পারে না, এবং কোনও বৈজ্ঞানিক চাতুরীর দ্বারা জল বায়ু অগ্নিকে দেহযন্ত্র বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং বর্তমান যুগের ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতাগণ কাজেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা দেবতা মানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অল্পই নৈতিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। এবং দেবোপাসকদের ধর্মভাবের প্রতিও বিশেষ সমীহা করিতেন না। উভয় দলের মধ্যে বিশেষ শ্রীতির বন্ধন ছিল না। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, যে, যিনি দেবতার উপাসনা করেন তিনি দেবতার পশু। মানুষ যেমন চায় না তাহার পশুর সংখ্যা কমুক, তেমনই দেবতারাও চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হউক। কেননা, তাহাতে দেবতার পশু কমিয়া যায়। ঋষিরা দেবতা ও দেবোপাসক উভয়কেই নিতান্ত রূপার পাত্র মনে করিতেন। ঋষিরা দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বরং তাঁহাদের উপহাসেরই বস্তু ছিলেন—কোন কাজেও আসিতেন না, কোন বাধাও দিতেন না। যেন বিশ্বাস করিতে হয় বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম নহে! এ বিশ্বাস যেন ছিল কতকটা প্রাচীনকালের স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন। তাঁহাদের কাছে দেবতার অস্তিত্ব কার্যতঃ অনস্তিত্বের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং যখন পূর্বমীমাংসাকার তর্ক তুলিলেন ইন্দ্র বলিয়া যদি কোন দেবতা বাস্তবিকই থাকিতেন তবে তোমাদের আস্থানে তিনি ঐরাবত সহ ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট তো চুরমার হইয়া যাইবার কথা; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র; তখন দেবতাদের মহা প্রস্থানের ঘণ্টা পড়িল। তিনি দেবতা বাদ দিয়া যজ্ঞ রাখিলেন। কিন্তু উত্তরমীমাংসা দেবতা রাখিয়া যজ্ঞের হীনতা সম্পাদন করিলেন। সুতরাং দুই মীমাংসার অধিকারী আমাদের কাছে যজ্ঞ ও দেবতা উভয়েই বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্মের বিকাশের ইতিহাসের

ইহা একটা ছিন্নপত্র মাত্র। আজ যে ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই ঋষিনির্দিষ্ট বিবর্তন-পথেই হইতেছে। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ এই দেবতাবর্গকে কম নাস্তা-নাবুদ করেন নাই। তাঁহারা আদেশ করিয়াছিলেন যে দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা অর্চনা করিবেন,—সর্ব্ব দেবা তং বলিমাবহন্তি। তাই নবীন ব্রহ্মোপাসক দেবতাদিগকে আপনার উপাসনার উপকরণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া সমস্ত রজনী কাটাওয়া দিতেন, দাবানলে ভগবানের বহুৎসব দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেন, আবার বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের সেই ভীষণ গর্জন, “মহত্তয়ং বজ্রমুত্তমের” চরণে উপহার দিতেন। সাধারণ জীব যেখানে ভয়ে ভীত হইয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মবাদী সেখানে “দেবতানাং পরমং দৈবতমের” লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন। কেননা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, সর্ব্ব দেবা স্তং বলিমাবহন্তি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

## মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

( De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে )

( পূর্বানুবর্তি )

মোগলদিগের রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এবং উহাদের সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশ—এ-দুই একই জিনিস। কিন্তু গোড়ায় যে-সকল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর সামরিক চিহ্নের ছাপ ছিল, সে-সকল হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া মোগলসাম্রাজ্য ও জনসমাজ ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

মুনসবদার ও রাজপুত্রদিগের উপর নজর রাখিবার জন্ম, এবং তাহাদের হস্ত হইতে যে-সকল কাজ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই-সকল কার্য সম্পাদনার্থ আকবর কতকগুলি পরিদর্শক বা সুবাদার (রাজপ্রতিনিধি) নিযুক্ত করিলেন।



উত্তর-ভারতে ১২টি সুবা এবং দাক্ষিণাত্যে প্রথমে তিনটি, পরে ছয়টি সুবা গঠিত হয়।

আবুল-ফজল, সুবাদারের কাজের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

“সুবাদার, বাদশাহর স্থলাভিষিক্ত। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের সৈন্য ও প্রজাবর্গ তাঁহার আজ্ঞাধীন এবং তাঁহার আয়ানুগত শাসন-কার্যের উপর তাহাদের মুখসম্মুখি নির্ভর করে। সুবাদার এরূপ কখনই মনে করেন না যে তাঁহার পদ চিরস্থায়ী, প্রভূত ইচ্ছিত যাজ্জেই রাজদরবারে হাজির হইবার জন্ত তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।” (১)

সুবাদারের নীচেই ফৌজদার বা প্রদেশের সেনাপতি।

আবুল-ফজল বলেন :—

সম্রাট-বাহাদুর সাম্রাজ্যের মুখসম্মুখির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশের জন্ত এক এক সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন; এইরূপে, অনেকগুলি পরগণার ভার কতকগুলি বিশ্বস্ত ও অনঃস্বার্থ কর্মচারীর হস্তে স্থাপন করিয়া তাঁহার সুবিবেচনা ও রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই কর্মচারীগণ, ‘ফৌজদার’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাদের পদ সুবাদারের ঠিক নীচে। যদি কোন ভূস্বামী, কোন রাজস্ব-সংগ্রাহক, কোন ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হয়, ফৌজদার প্রথমে মিষ্ট বাক্যে তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন; তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রধান কর্মচারীদিগের লিখিত জবানবন্দী সংগ্রহ করিবেন এবং বিদ্রোহীর শাস্তি দিবার জন্ত বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। (২)

আকবরের উত্তরাধিকারীদিগের আমলে, বিপুল পরিমাণে ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায়, কর্মচারীদিগকে জায়গির দেওয়া হইত। জায়গিরের উপসত্ত্ব তাহারা ভোগ করিত, কেবল তাহার পঞ্চমাংশ রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইত। আরও একশতাব্দী পর্য্যন্ত, মোগল সম্রাটেরা, সুবাদার-দিগকে কর্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা, ও তাহাদের পুত্র-দিগকে ঐ পদে স্থাপন করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ পদগুলি পৈতৃক হইয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি সুবাদার অসংখ্য প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়া পড়িল;—যেমন বঙ্গদেশে, ও অযোধ্যায়। বিশেষতঃ নিজাম; নিজাম প্রথমে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তিনি শীঘ্রই রাজ্যাধিপতি হইয়া উঠিলেন।

বড় বড় কালিফদিগের রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া, আকবর শাসনকার্য হইতে বিচারকার্যকে পৃথক করিয়া

(১) আইন-ই-আকবরী।

(২) আইন-ই-আকবরী।

দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন,—কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি শিয়া, কি সূন্নি সকলেই সমানভাবে ও পূর্ণ-মাত্রায় আয়বিচার প্রাপ্ত হয়। “সদর” নির্ধারিত হইল। যাহাদের বিচারসিদ্ধান্ত আইন রূপে গৃহীত হইত সেই উলেমারা নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বড় বড় নগরের নিজস্ব বিচারপতি ছিল (মীর-আদি বা কাজি)। মেদিনা ও বোম্বাদের ব্যবহারতত্ত্ববাগীশগণকর্তৃক নির্ধারিত মুসলমান আইন অনুসারেই এই-সকল বিচার-পতি বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। কিন্তু আকবর দণ্ডশালার কঠোরতা একটু কমাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুরা স্বকীয় প্রাচীন বিধিব্যবস্থা ও বর্ণভেদগত প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মেকদমাসকল নিয়মিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ঐ-সকল কার্যে মুসলমানদিগের কোন দরদ ছিল না।

কতকগুলি কোতোয়ালের হাতে পুলিশের ভার ছিল। “আইন-ই-আকবরী” হইতে এই চিন্তাকর্ষক অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

“কোতোয়ালের সুরক্ষকতায় এবং রাত্রিতে পাহারাওয়ালাদিগের টহল-পাহারায় নাগরিকেরা বিশ্রাম লাভ করে ও নিরাপদে অবস্থিতি করে। চুবুত্তেরা নিজ নিজ আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে বাস করে। কোতোয়াল, বাড়ীর ও লোক-চলতি রাস্তার একটা সংখ্যা-তালিকা রাখিবেন; নাগরিকেরা যাহাতে পরস্পরের সহায়তা করে, সাধারণের সৌভাগ্য ও দুঃভাগ্য প্রত্যেক নাগরিক আপনার বলিয়া মনে করে, কোতোয়াল এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। কতকগুলি আবাস-গৃহ লইয়া এক একটি অঞ্চল গঠিত হইবে, এক-একজন কর্মচারী তাহার পরিদর্শন করিবেন এবং তিনি প্রতিদিন তাঁহার পরিদর্শনকার্যের বিবরণ দাখিল করিবেন।”

আরও দুইটি শাসননীতি হইতে মোগলশাসনের একটা লাক্ষণিক পরিচয় পাওয়া যায় :—প্রথমত—ইহা পিতৃশাসনতন্ত্র; কোতোয়াল সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন, লোকের পারিবারিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, দরিদ্রদিগকে কাজ করিবার জন্ত বাধ্য করিবেন, এবং ধনীদিগের অতিব্যয় নিবারণ করিবেন। দ্বিতীয়ত—ইহা গুপ্তচরশাসনতন্ত্র; এমন কোন জাতিবর্ণ নাই, এমন কোন ব্যবসায় নাই, যাহার মধ্যে কোতোয়ালের নিযুক্ত লোক না থাকে। আবুল-ফজল যে রাজনীতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছেন এবং যে-ভাবে পরা-

মর্শ দিয়াছেন তাহার মধ্যে চানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোগলদের মধ্যে এই প্রভাবই প্রবল ছিল।

আইনের চোখে সবাই সমান—এই নীতিসূত্রটি আকবর স্থাপন করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহ-জাহান এই নীতি অনুসারেই চলিতেন; কিন্তু আরংজেবের আমল হইতে জোর-জবর্দস্তি-নীতির সূত্রপাত হইল। আরংজেবের মৃত্যুর পর যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন শাসন ও বিচারের পার্থক্যও আর রক্ষিত হইল না। অবশ্য তখনও প্রত্যেক নগরের এক একটি নিজস্ব কাজি ছিল; কিন্তু পল্লীগামে, মনসবদার প্রভৃতি কর্মচারী ক্রমে জায়গীরদার হইয়া উঠিল, রাজস্বের ইজারাদার হইয়া উঠিল; জমিদারেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার আপন হস্তে অগ্নায়পূর্বক গ্রহণ করিল।

যে সাম্রাজ্যের মধ্যে, জায়গীরদারদিগের মধ্যে সমস্ত ভূমি বিভক্ত ছিল, যেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হইবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিত, সেখানে সম্রাটের কোষাগারে খাজ দাখিলের কথাটাই সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা। আকবর সুবাদার ও ফৌজদারদিগের হস্ত হইতে কর-সংগ্রহের ভারটা বলপূর্বক উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সুবাদারের পার্শ্বে তিনি রাজস্বসচিব দেওয়ানকে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রদেশের সমস্ত বিভাগেই (“ক্রোড়ী”) দেওয়ানের প্রতিনিধি থাকিত। বিশৃঙ্খল সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ও সমস্ত কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের মধ্যে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ হেতু ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, প্রাদেশিক সুবাদারগণ আপনারাই রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করে। সেই আদায়ী রাজস্বের কেবল পঞ্চমাংশ মাত্র তাহারা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইত। সম্রাটের খাস-মহলে, প্রতিবৎসরেই রাজস্বের আদায় উত্তরোত্তর কমিতে লাগিল; তখন রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইল। জমিদার ও মনসবদারের মধ্যে পার্থক্য আর বড় রহিল না। সে পার্থক্য শীঘ্রই উঠিয়া গেল। আবার সুবাদারদিগেরও কতকগুলি নিজস্ব জমিদার ছিল। সুবাদারেরা যেরূপ সম্রা-

টের রাজস্ব অপহরণ করিত, সম্রাটের অর্থশেষন করিত, ইহারাও সেইরূপ সুবাদারের রাজস্ব অপহরণ করিত, সুবাদারের অর্থশোষণ করিত।

রাজ-কর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদিকে, রাজস্বের সহিত ভূমির খাজনা এক-সামিল হইয়া গিয়াছিল; কেননা, সমস্ত ভূমিই সরকারের নিজস্ব ছিল। হুমায়ূনের সফল প্রতিদ্বন্দ্বী শের-শাহ ইতিপূর্বে একটা গায়া ভিত্তির উপর এই ভূমি-কর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত রাজ্যের একটা জরিপ-চিঠা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ফসলের পূর্বে রাজস্বের কর্মচারী খাস-মহলের ফসলের মূল্য স্থির করিতেন, ফসলের যে অংশ সরকারের প্রাপ্য এবং যে মূল্যে কৃষকেরা ঐ অংশ ক্রয় করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। কতকগুলি প্রদেশে, দশ বৎসরের জন্য একটা বার্ষিক খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। ভূমি-করও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের আমলে সমস্ত রাজস্ব ৫০ কোটি ফ্র্যাঙ্ক ( প্রায় ২৭ কোটি টাকা ) ও আরংজেবের আমলে প্রায় ১০০ কোটি ফ্র্যাঙ্কে উঠিয়াছিল।

অগ্নান্য করসম্বন্ধে প্রত্যেক সম্রাটের আমলে কিছু-না-কিছু তারতম্য ও ইতর-বিশেষ ছিল। আকবরের পূর্বে, বিধর্মীদের উপর স্থাপিত জিজিয়া-কর, হিন্দু তাঁথযাত্রীদিগের উপর শুল্ক, আত্যন্তরিক শুল্ক ( তম্ঘা ) প্রভৃতি ছিল। বিরক্তিজনক বালিয়া প্রথমোক্ত দুইটি কর এবং বাণিজ্যের অনিষ্টকর বালিয়া তৃতীয় করটি আকবর রাহিত করেন। কিন্তু আরংজেব জিজিয়া পুনঃস্থাপন করেন। আকবরের আমলে, যে দুই প্রধান কর আদায় হইত তাহার মধ্যে একটি অস্থায়ী সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ, আর একটি দারুণাত্যের দেয় বার্ষিক রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। এই অর্থের দ্বারা আরংজীবের দিগ্বিজয়ের বৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর যে শুল্ক ছিল, অনেক সময়ে তাহার নূতন বন্দোবস্ত হইত, এবং পরিবর্তনও হইত। সুরাট নগরী পণ্ডুরূপ সম্রাটকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া আত্মবিক্রয় করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ব-পরিমাণ পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীরই সমতুল্য ছিল। আকবরের আমলে উহা এক শত কোটি

ফ্র্যাঙ্ক ও আরঞ্জীবের সময়ে দুই শত কোটি ফ্র্যাঙ্কে উঠিয়াছিল।

আরঞ্জীবের মৃত্যুর পর সুবাদারেরা স্বাধীন হইয়া পড়িল; সম্রাটের সরকারী কোষাগারে প্রতি বৎসরেই উহার কাম-কাম করিয়া খাজনা দাখিল করিতে লাগিল। এই সুবাদারেরা নিজ নিজ খেয়াল-অনুসারে প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আর দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই যদৃচ্ছাক্রমে কর সংগৃহীত হইতে দেখা যায়।

ইহাই মোগল-প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের স্থূল রেখা-চিত্র। প্রথম ঐতিহাসিকগণ যাহারা এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহারা উহার সুন্দর বন্দোবস্ত এবং উহার কার্যোপযোগিতা ও সফলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন ঐসিয়িক রাষ্ট্রের আয় দুইশত কোটি ফ্র্যাঙ্ক হইতে পারে—ইহা তাহাদের অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা বলা আবশ্যিক, মোগলেরা চীনাঁয়দিগের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পারস্য, রোম ও বৈজ্ঞানশিয়া হইতে গৃহীত কালিফদিগের প্রতিষ্ঠানসমূহ অবগত ছিল—সুতরাং বড় বড় সাম্রাজ্যের শাসনসম্বন্ধীয় সমস্ত প্রচলিত প্রথাই অবগত ছিল। আর, শাসনসম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে :—প্রথমে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের উপর জয়লাভ করে; আবার এই রাজতন্ত্র—যাহা প্রথমে প্রবল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, পরে ইহা অরাজকতায় পরিণত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## আগুনের ফুলকি

[ পূর্বপ্রকাশিত অংশের চূষক—কর্ণেল নেভিল ও তাহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কসিকা ঘীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অসেঁ নামক একটি কসিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ায় প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বহু কসিকের প্রতি লিডিয়ায় মন বিকল্প হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অসেঁ তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কোতূহলের ফলে লিডিয়ায় মন ক্রমে অসেঁর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কসিকার বন্দনে গিয়া সকলে এক হোটেলেরে উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ায় সহিত অসেঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অসেঁ লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া অসেঁ তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবায় গ্রামা সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাধিয়া পাওয়ার শক্তি লিডিয়া তাহার প্রতি অসুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুক্ত কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্ত একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অসেঁ ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ায় সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অসেঁকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এটা আংটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগামে জর্ষী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অসেঁ ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ দুঃখিত পারিল যে অসেঁ তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অসেঁকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অসেঁ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অসেঁকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদলিন পিয়েত্রী অসেঁর পিতা খুন হওয়ার পর তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মোতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অসেঁর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অসেঁর বাড়ীতে গিয়া অসেঁকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অসেঁ তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধু করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অসুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ]

( ১৬ )

সকাল ছটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন চাকর অসেঁর বাড়ীর দরজায় আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল। কলোঁবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে বলিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রওনা হইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া

কলোঁবার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের জন্ত অপেক্ষা করিতে-  
ছেন। কলোঁবা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বেশ সহজ  
ভাবেই বলিয়া দিল যে তাহার দাদা সিঁড়ি উঠিতে  
গিয়া পড়িয়া যাওয়াতে তাহার পা মচকাইয়া গিয়াছে ;  
এক পা চলিবারও তাহার সামর্থ্য নাই ; ম্যাজিষ্ট্রেট  
সাহেব যেন অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করেন ; এবং যাইবার  
পথে যদি এই বাড়ী হইয়া যান তাহা হইলে অর্সো  
অত্যন্ত বাধিত হইবে।

ইহার অল্প পরেই অর্সো নীচে নামিয়া আসিয়া ভগ্নীকে  
জিজ্ঞাসা করিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার খোঁজ করিতে কোনো  
লোক পাঠাইয়াছিল কি না।

কলোঁবা দিব্য সহজভাবে বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট বলে  
পাঠিয়েছিলেন যে তিনি এখানেই তোমার সঙ্গে দেখা  
করিতে আসছেন।

আধ ঘণ্টা খানেক বারিসিনিদের বাড়ীর দিকে  
কোনোই সাড়া শব্দ শুনা গেল না। তখন অর্সো  
কলোঁবাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে কিছু নূতন খেই  
আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কি না। কলোঁবা বলিল  
সে একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই তাহার যাহা বলি-  
বার আছে তাহা বলিবে।

কলোঁবা খুব শাস্তভাবে ধারণ করিয়া থাকিবার ভান  
করিলেও তাহার চোখে মুখে তীব্র উত্তেজনার আভাস  
ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অবশেষে বারিসিনিদের বাড়ীর ফটক খুলিল ; ম্যাজি-  
ষ্ট্রেট ভ্রমণের বেশ পরিয়া প্রথমে বাহির হইল, তাহার  
পশ্চাতে বৃদ্ধ বারিসিনি দারোগা এবং তাহার পশ্চাতে  
তাহার দুই পুত্র। সূর্যোদয়ের সময় হইতে পিয়েত্রানুরার  
অধিবাসীরা সেই জেলার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিদায়-  
যাত্রা দেখিবার জন্ত পথের ধারে কাতার দিয়া দাঁড়া-  
ইয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; তাহারা যখন দেখিল যে  
ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া বরাবর রেয়িয়া-  
দের বাড়ীর দিকেই চলিল, তখন তাহাদের বিশ্বাসের  
আর অবধি রহিল না। গাঁয়ের মাতব্বর লোকেরা  
বলাবলি করিল—উহারা আপোশ করিতে যাইতেছে।

একজন বৃদ্ধ বলিল—আমি ত তোমাদের আগেই

বলে চুকেছি, যে, অর্সো আস্তনিয়ো যখন যুরোপে  
অতকাল থেকে এল, তখন তার আর একটা সাহসের  
কাজ করবারও মুরোদ নেই—ওটা একেবারে বয়ে গেছে !

একজন রেবিয়া-ভক্ত লোক বলিয়া উঠিল—বারি-  
সিনিরাই ত তার কাছে সাধতে যাচ্ছে, সে ত আর  
এদের বাড়ী সেধে আসে নি ? এরাই ত দাঁতে কুটো  
করে' ক্ষমা ভিক্ষে করতে চলেছে !

বৃদ্ধ বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেটই ত এদের সকলকে এমন  
করে' পাক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা সাহস  
করে কিছু বলতেও পারছে না ; ছেলে দুটো চোখের  
সামনে বাপের অপমান দেখেও কিছু বলতে পারছে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে দিব্য  
সোজা হইয়া অক্লেশে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া  
অল্প আশ্চর্য হইল না। দু কথায় কলোঁবা তাহার মিথ্যা  
কথার জন্ত ক্ষমা চাহিয়া বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব,  
আপনি যদি অত জায়গায় থাকতেন, তা হ'লে আমার  
দাদা কালকেই আপনাকে সেলাম করতে যেত।

অর্সো আমতা আমতা করিয়া খতমত খাইয়া ক্ষমা  
প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বার বার করিয়া বুঝাইতে  
চাহিল যে এই-সব মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভিতরে তাহার  
কোন যোগ সাজোস নাই, এ-সমস্ত তাহার অজ্ঞাতসারেই  
হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বৃদ্ধ বারিসিনি অর্সোর ব্যাকুল  
মিনতি ও ভগিনীকে তিরস্কার-করা দেখিয়া তাহার কথা  
বিশ্বাস করিয়াই লইতেছিল, কিন্তু বারিসিনির ছেলেরা  
এ কথা গ্রাহ্যই করিল না। অলুর্নিকুসিয়ো বলিল—  
আমরা কচি খোকা ত নই, মর্শায়ের রসিকতা বিক্রপ  
একটু আধটু বুঝবার বয়েস হয়েছে আমাদের !

ভ্যাঁসাস্তেলো বলিল—আমার বোন যদি আমাকে  
নিয়ে এমন প্রবঞ্চনা করত, তা হ'লে আমরা তার ফিরে  
ওরকম করার ঝোঁক তুরন্ত ঝাড়িয়ে দিতাম !

এই রকম কথা যে-রকম স্বরে বলা হইল তাহাতে  
অর্সো অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক শান্ত  
ভদ্রতা আর রক্ষা করিতে পারিল না। সে বারিসিনি-  
দের দিকে এমন করিয়া তাকাইল যে তাহারা সে দৃষ্টিতে  
বন্ধুতার এতটুকুও চিহ্ন সন্দেহ করিতে পারিল না।

যাহাই হোক সকলেই বসিল, কেবল কলোঁবা রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কথা শুরু করিয়া প্রথমে সেই দেশের কুসংস্কার সম্বন্ধে দুই চারিটা মামুলি কথা বলিয়া শেষে বলিল যে রেবিয়া ও বারিসিনির মধ্যে যে বন্ধুত্ব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ কেবল মাত্র ভুল আর সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর দারোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, অর্সো কখনো বারিসিনি-পরিবারের কাহাকেও তাহার পিতার পনের জন্ম দায়ী বা দোষী করেন না; এই দুই পরিবারের মধ্যে যে মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছিল সেই সম্বন্ধে অর্সোর মনে কিছু সন্দেহ ছিল বটে; সেরূপ সন্দেহ হওয়া কিছু অশ্চর্য্যের কথাও নহে, কারণ অর্সো বহুকাল দেশ-ছাড়া, লোকে যেমন বুঝাইয়াছে তেমনি তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতিকার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার মন খোলসা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মনে আর এতটুকু সন্দেহ বা বিরাগ নাই, তিনি দারোগা বারিসিনি ও তাঁহার ছেলেদের সহিত প্রতিবেশীর যোগ্য আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক ও উৎসুক।

অর্সো কেমন আড়ষ্টভাবে বিরক্তি ও অনিচ্ছার সহিত মাথা নাড়িল; দারোগা বারিসিনি বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিল তাহা কেহই শুনিতেও পাইল না; তাহার পুত্রেরা ছাদের কড়িকাট গণিতে মন দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবারে পান্টা অর্সোকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় কলোঁবা তাহার ওড়নার নীচে হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া গম্ভীরভাবে বন্ধুত্বস্থাপনপ্রয়াসী উভয় দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমাদের এই দুই পরিবারের মধ্যকার বিরোধ বিবাদ মিটে যাচ্ছে, এতে আমার মন খুসি হয়ে উঠেছে; যাতে করে এই মিলন বেশ আন্তরিক হয়, আব এতটুকু সন্দেহ ও অবিশ্বাস অবশেষ না থাকে, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা... ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তোমাজো বিয়াশির একরার আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি, সে যে-রকম বদ লোক, তাকে সহজে বিশ্বাস করাও ত যায় না। .. আমি বলেছিলাম যে হয়ত দারোগা

সাহেবের ছেলেরা তার সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করেছিল...

অর্লান্দিকুসিয়ো বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—মিথো কথা! আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি!

কলোঁবা তাহার দিকে ঘৃণাতরা দৃষ্টি তানিয়া খুব শান্ত ভাবেই বলিতে লাগিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাজো দেশের ডাক-সাহিটে গুণ্ডার বেনামিতে দারোগা সাহেবকে যে ভয় দেখিয়েছিল তার আসল উদ্দেশ্য ও কারণ কি। যে কলটা আমার বাবা নামমাত্র খাজনায় তোমাজোর ভাই থিয়োডোরকে জমা দিয়েছিলেন সেই কলটা হাত-ছাড়া না হয়, এই না তার উদ্দেশ্য ছিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—ঠিক তাই।

অর্সো তাহার ভগিনীর বাহ্যিক শান্ত ভাব দেখিয়া ঠকিয়া গিয়া বলিয়া বসিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বিয়াশি লোকটা যে-রকম বদমায়েস, সে যখন এই কাণ্ডে লিপ্ত আছে জানা গেল, তখন ত সব পরিষ্কার হয়েই গেল।

কলোঁবার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—সেই জাল চিঠিখানার তারিখ ছিল ১১ই জুলাই। তোমাজো তখন তা হলে ভাইয়ের বাড়ীতেই ছিল।

দারোগা বারিসিনি একটু ত্রস্তবাস্ত হইয়া পতমত খাইয়া বলিল—হঁ।

তখন কলোঁবা জয়ের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—তবে তোমাজো বিয়াশির স্বার্থ কি ছিল চিঠি জাল করায়? তার ভাইয়ের পাটার মেয়াদ ত তখন দুরিয়ে গেছে; আমার বাবা তাকে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত জমা দিয়েছিলেন। এই আমার বাবার হিসেবের খাতা; এই পাটা, আর কবুলিয়ৎ; আজাকুসিয়োর একজন লোকের এই চিঠি, সে নতুন বন্দোবস্তের জন্ম দরখাস্ত করেছিল।

এই বলিয়া কলোঁবা তাহার হাতের সমস্ত কাগজ-পত্রগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

সকলেই ঐক মুহূর্ত্ত জবাক হইয়া রহিল। দারোগা স্পষ্ট বিবর্ণ হইয়া উঠিল; অর্সো কাগজগুলি দেখিবার

জগৎ ক্র কুঞ্চিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল ; কাগজগুলি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট গভীর মনোযোগ করিয়া পড়িতেছিল।

‘অলান্দিক্সিয়ো রাগে লাল হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমাদের ঠাট্টা করা হচ্ছে! বাবা, এখান থেকে চলে চলুন। আমাদের এখানে আসাটাই উচিত হয়নি।

বৃদ্ধ বারিসিনির প্রকৃতিস্থ হইতে কিছুক্ষণ লাগিল। সে কাগজগুলি দেখিতে চাহিল ; ম্যাজিষ্ট্রেট কোনো কথা না বলিয়া কাগজগুলি তাহার দিকে আগাইয়া দিল। দারোগা তাহার সবুজ রঙের চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া দিয়া, নিতান্ত অগ্রাহের ভাবে কাগজগুলির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল ; শাবকের গুহা হইতে হরিণকে বাহির হইতে দেখিলে বাঘিনী যেমন করিয়া তাকায় কলোঁবা তেমনি করিয়া চোখ পাকাইয়া দারোগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দারোগা বারিসিনি তাহার চশমা কপাল হইতে নাকের উপর নামাইয়া দিয়া কাগজগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল—কিন্তু স্বর্গীয় কর্নেল সাহেবের দয়ার খবর জান্ত ব’ল’ তোমাজো মনে করেছিল... স্বভাবতই তার মনে হইয়াছিল যে...কর্নেল সাহেব তার জমা খারিজ করে’ তাকে উদ্বাস্ত করবেন না..কাজেও হইয়াছিল তাই, সে কলের দখলীকার হইয়াছিল... তবে...

কলোঁবা তাহার কথায় বাধা দিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল—সে ত আমি তাকে কলের দখলীকার রেখেছিলাম। বাবা মারা গেলে, আমাদের বিষয় আশয়ের বিলি ব্যবস্থা ত আমিই করেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—যাই হোক, এই তোমাজো স্বীকার করেছে যে, সে এই চিঠি লিখেছিল...এটা ত স্পষ্ট শাদা কথা।

অর্সো বাধা দিয়া বলিল—হ্যাঁ আমার কাছে এটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই-সমস্ত কাণ্ডটার তলে তলে একটা প্রকাণ্ড জোচ্ছুরি লুকনো আছে।

কলোঁবা বলিল—আমার আরো একটা কথার প্রতিবাদ করতে বাকি আছে।

সে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং ব্রান্দো, তাহার সঙ্গী পণ্ডিত মশায় এবং কুকুর বিস্কো হল-ঘরে প্রবেশ করিল। ফেরারী দুজন নিরস্ত হইয়াই আসিয়াছিল। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া খুব সম্বন্ধের সহিত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের অকস্মাৎ আবির্ভাবে সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দারোগা চেয়ার-মুদ্র চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল ; তাহার ছেলেরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া পিতার সামনে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেটে হাত ভরিয়া ছোরা মুঠি করিয়া ধরিল ; ম্যাজিষ্ট্রেট তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুট দিল ; এবং অর্সো লাফাইয়া ব্রান্দোর উপর পড়িয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—পাজি বদমায়েস কাইঁকা! এখানে কেন মরতে এম্বেছিঁস ?

—এ সব আপাগোড়া ষড়যন্ত্র! গুপ্ত আক্রমণ!— বলিতে বলিতে দারোগা দরজা খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মাভেরিয়া বাহির হইতে ডবল খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্রান্দো বলিল—আপনারা যখন সকলেই ভালো মানুষ, তখন আমাদের দেখে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমাদের যেমন ভাবেন আমরা তেমন বদ লোক নই। আমরা কোনো রকম কু মতলবে এখানে আসিনি। ম্যাজিষ্ট্র সাহেব, আমরা আপনার গোলাম। লেফটেন্যান্ট সাহেব, আস্তে, এন্টু আস্তে ঘাড়টা টিপবেন, নইলে দম আটকে যাবে যে।—আমরা এখানে সাক্ষী দিতে এসেছি। এস পণ্ডিতজী, তুমিই বল তোমার বলা-ক’ওয়া আসে ভালো।

পণ্ডিত ফেরারী বলিতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার নাম গিয়োকান্তো শাস্ত্রী, আমি পণ্ডিতজী নামেই সমধিক পরিচিত। ... আমাদের এই দিদিমণি, তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই, তিনি আমাকে তোমাজো বিয়ঁশি নামক একজন লোকের সন্ধানে আমি কি জানি তাই বলতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেই লোকটার সঙ্গে হুপ্রা তিনেক বাস্তিয়ার জেলখানায় বাস করে’ এসেছি। তার সন্ধানে আমি এই জানি যে.....

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিল—থাক, তোমার কষ্ট করতে হবে না। তোমার মতন লোকের কাছ থেকে আমি কিছু শুনতে চাইনে।.....রেবিয়া মশায়, আমার বিশ্বাস, এই সব জঘন্ত ষড়যন্ত্রে আপনি কিছুমাত্র লিপ্ত নন। কিন্তু আপনার বাড়ীর মালিক কে? আপনি? এই দরজাটা খুলিয়ে দেওয়ান। আপনার ভগ্নী যে এই-সব দাগী বদমায়েসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, এর জবাবদিহি তাঁকে করতে হবে।

কলোঁবা জ্বরে বলিয়া উঠিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, এই লোকটি কি বলে তা অনুগ্রহ করে আপনাকে শুনতে হবে। সকলের প্রতি ঞায়াবিচার করাই আপনার দক্ষ, সত্য নির্ণয় করাই আপনার কর্তব্য! বলুন আপনি, গিয়োকাস্ত্রো শাস্ত্রী।

বারিসিনিরা তিন বাপবেটায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—  
• হুজুর, ওর কথা শুনবেন না।

ফেরারী পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—যদি সকলে একসঙ্গে অমন করে' চেষ্টায়, তবে শোনা না-শোনা সমানই হবে। জেলখানায় উক্ত তোমাজো আমার সঙ্গী ছিল—বন্ধু নয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন খুব ঘন ঘন এই অর্লান্দিক্‌সিয়ো মশায়।.....

বারিসিনি পুত্রেরা দুই ভাই সমস্বরে চেষ্টাইয়া উঠিল—  
মিথ্যা কথা! কখনো না, কখনো না!

পণ্ডিতজী গম্ভীর ভাবে বলিল—দুই 'না' এক 'হাঁ'র সমান। 'দ্বিপ্রতিষেধে একং কার্যং'—ব্যাকরণের বচন। তোমাজো ঘুষ খেয়ে—মিঠাই ও মদ খেয়েছে প্রচুর। ভালো রকম খাওয়াটায় আমার বেজায় রকম রুচি আছে—ওটা আমার একটা বদরোগের সামিল। ঐ মুখখু লোকটার সঙ্গ আমার নিতান্ত অরুচিকর হলেও, তার দেওয়া ভোজ বেশ মুখরুচি হবে মনে করে' আমি অনেকবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দস্তুর মতো খ্যাট দিয়ে মজা মেরেছি। তার নিমক খেয়েছিলাম বলে' আমি তাকে আমার সঙ্গে পালিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। .....একটি তরুণী.....তার সঙ্গে আমার একটু ভাবসাব ছিল.....আমাকে জেল থেকে পালাবার তোড়জোড় জোগাড় করে' দিয়েছিল। তোমাজো

পালাতে অস্বীকার করলে—সে বললে যে দারোগা বারিসিনি পুলিশের বড় সাহেবকে পর্যাপ্ত সুপারিশ করে' বেড়াচ্ছে; সে বেকসুব খালাস হয়ে বরফের মতো নির্মল খ্যাতি আর পকেটপোরা টাকা নিয়ে যখন শিগগিরই বেরুবে, তখন সে আর পালাতে যাবে কোন্‌ দৃশ্যে? আমি আর কি করি, একলাই মুক্ত হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লাম। বাহুলোনালম্।

অর্লান্দিক্‌সিয়ো জ্বরে দিয়া বলিয়া উঠিল—এই লোকটার কথা আগাগোড়া মিথ্যা। আমরা যদি বন্ধ না থাকতাম, আর আমাদের হাতে বন্দুক থাকত, তবে কোনো বেটার যুরোদ হত না এমন সব যা-তা কথা বলে।

ব্রান্দো বলিয়া উঠিল—মিথো বড়াই করে' পণ্ডিতজীকে ঘেঁটিয়ো না বলছি অর্লান্দিক্‌সিয়ো। মজাটি টের পেয়ে যাবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট অর্ধাধা ভাবে দরজায় লাথি মারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রেবিয়া, আমাদের আপনি বেরুতে দেবেন কি না?

অর্সো চীৎকার করিতে লাগিল—সাভেরিয়া, সাভে-  
রিয়া, দরজা খোল সয়তানী, দরজা খোল।

ব্রান্দো বলিল—আর একটু অপেক্ষা করুন। আমরা আগে চম্পট দি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, উভয় পক্ষের বন্ধুর বাড়ীতে যদি শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তবে দুর্বল পক্ষকে আধ ঘণ্টা ছুটি দেওয়া রীতি চলিত আছে, এ অবিশিষ্ট আপনি জানেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঘণাব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়া তাহাকে যেন বিদ্ব কহিতে চাহিতেছিল।

ব্রান্দো বলিল—আপনাদের সকলকার খিদ্‌মদ্‌পার সেলাম করছে।

তারপর ড়ান হাতখানা সটান লথা করিয়া তাহার কুকুরকে বলিল—ব্রিন্দো, আও, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকো সেলাম করো!

কুকুর লাফাইয়া দুই পায়ে দাঁড়াইয়া সেলাম করিল, ফেরারী আসামীরা এক লাফে রান্না-বরে গিয়া নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র উঠাইয়া লইল, এবং বাগানের খিড়কি দরজা দিয়া

নিমেষ মধ্যে অন্তর্ধান করিল, এবং তৎক্ষণাৎ কাঁচ করিয়া শব্দ করিয়া যেন কোন্ বাতুমন্ত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল।

অসৌ প্রগাঢ় ঘনীভূত ক্রোধবিষ্ফুর্ত স্বরে বলিল—  
বারিসিনি সাহেব, জ্বাল জুয়াচুরী মিথ্যা কারসাজীর  
জন্তে দোষী আপনি। আমি আপনার বিরুদ্ধে জজ  
সাহেবের কাছে আজই নালিশ দায়ের করব। হয়ত  
জ্বাল জুয়াচুরীর চেয়েও বড় রকমের নালিশও রুজু হ'তে  
পারে, জেনে রাখবেন।

দারোগা বলিল—আর আমিও ছেড়ে কথা কইব  
মনে করবেন না রেবিয়া মশায়। আপনার বিরুদ্ধে  
জবরদস্তি অবরোধ করে রাখা, আর গুণ্ডা বদমায়েসের  
সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার নালিশ করব। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব  
আপনাকে পুলিশের হেফাজতে রেখে দেবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কড়া স্বরে বলিল—ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর কর্তব্য  
অবশ্য করবেন। পিয়েত্রানরায় শান্তিভঙ্গ না হয় আর  
অায়বিচার হয় এও তিনি অবশ্য দেখবেন। আমি আপনা-  
দের সকলকেই এ কথা বলছি জেনে রাখবেন।

দারোগা আর ভায়াসান্তেলো ঘর হইতে বাহির হইয়া  
পড়িয়াছিল, এবং অলান্দিক্‌সিয়োও পিছু হঠিয়া হঠিয়া  
সরিয়া পড়িতেছিল, তখন অসৌ ভারি গলায় তাহাকে  
বলিল—তোমাদের বাবা বুড়ো মানুষ, এক ঘুষিতে গুঁড়িয়ে  
যাবে বেচার। তোমাদের দু ভাইয়ের জন্তে ও জিনিসটা  
তোলা রইল।

এ কথার জবাবে অলান্দিক্‌সিয়ো একেবারে ছোরা  
খুলিয়া ক্ষেপার মতো অসৌর ঘাড়ে ঝাপাইয়া গিয়া পড়িল।  
কিন্তু সে তাহার অস্ত্র চালাইবার পূর্বেই কলোঁবা তাহার  
হাত ধরিয়া ফেলিল এবং জোর করিয়া ছোরাখানা ছিনা-  
ইয়া লইল, আর অসৌ তাহার মুখের উপর গোটাকত  
ঘুষি কষাইয়া দিতেই সে কয়েক পা পিছু হঠিয়া টাল  
খাইয়া দরজার উপর গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ইহা  
দেখিয়া ভায়াসান্তেলো নিজের ছোরা খুলিয়া ছুটিয়া ঘরে  
টুকিল, কিন্তু কলোঁবা এক লাফে একটা বন্দুক উঠাইয়া  
লইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে এ বন্দু সমানে সমানে নহে।  
এবং ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট ছুটিয়া আসিয়া উভয় পক্ষের  
মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

—আচ্ছা দেখে নেব অসৌ আন্তো!—বলিয়া  
অলান্দিক্‌সিয়ো ছুটিয়া বাহির হইয়া ধড়াম করিয়া দরজা  
বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, যাহাতে  
অসৌ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বাহির হইতে না পারে,  
এবং তাহারা প্রাণে প্রাণে বাড়ী পৌঁছিতে পারে।

অসৌ এবং ম্যাজিস্ট্রেট হলঘরের দুই প্রান্তে দুজন চুপ  
করিয়া বসিয়া রহিল ঝাড়া পনের মিনিট; আর কলোঁবা  
যে বন্দুকটা আজকার স্বন্দে জয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছে  
তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একবার একে একবার  
ওকে বিজয়গর্ভভরা দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া  
উঠিয়া বলিয়া উঠিল—কী সর্বনেশে দেশের বাবা, কী  
সর্বনেশে দেশ! দেখুন রেবিয়া মশায়, আপনারই দোষ  
হয়েছে। আমি আপনার জবানী মুচেলকা চাই যে  
আপনি কোনো রকম বে-আইনী কাজ করবেন না, আর  
এই বিলী ব্যাপারটার মীমাংসা আদালতে যা হ'বে তাই  
মেনে চলবেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঐ হতভাগা গর্দভটাকে মেরে  
অন্ডায় করেছি বটে, কিন্তু আমি শেষে ওকে মেরেছি।  
যাই হোক যে আমাকে শাসিয়ে গেল তার জবাব না  
দেওয়াটা আমার পক্ষে অন্ডায় হবে।

—না না, সে আপনার সঙ্গে মারামারি করবে না!...  
তার যা পাওনা ছিল সে ত তা বেশ পেয়ে গেছে।

কলোঁবা বলিল—আচ্ছা সে আমরা দেখে নেব।

অসৌ বলিল—অলান্দিক্‌সিয়ো আমাকে কচি  
খোকা ঠাওরেছে; আমি তাকে টেরটি পাইয়ে ছাড়ব যে  
সাহসে শক্তিতে আমি নেহাৎ খোকা নই। সে চোধের  
পলকে ছোরা খুলে কেবল লাফিয়ে পড়েছিল, আমি হ'লে  
ঐ সময়ের মধ্যেই ছোরার কাজও নিকেশ করে ফেলতাম!  
আমার মনটা খুব খুসি হয়ে উঠছে যে আমার বোনটির  
হাতের কসু নেহাৎ বিলাসিনী অবলার মতন নয়!

ম্যাজিস্ট্রেট জোরে বলিয়া উঠিল—আপনারা মারা-  
মারি করবেন না, আমি আপনাদের বারণ করছি!

—হুজুর আমাকে মাপ করবেন, যেখানে নিজের  
সম্মানের কথা সেখানে আমার মন ছাঁড়া আমি আর  
কারো হুকুম মানিনে।



—আমি আপনাকে হুকুম করছি আপনারা মারামারি করতে পারবেন না।

—আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন..., অর্থাৎ যদি আমি নিজেকে ধরতে দি। কিন্তু তাতে করে' অবশ্যতাবী ঘটনায় শুধু বিলম্ব ঘটানো হবে মাত্র। আপনি নিজে মামী লোক, আপনি বেশ জানেন যে আত্মসম্মান রক্ষা করতে হ'লে আমার আর গত্যন্তর নেই।

কলোঁবা বলিল—যদি আমার দাদাকে আপনি গ্রেপ্তার করেন, তা হ'লে আধখানা গাঁয়ের লোক ক্ষেপে উঠে বেশ একটু গোলন্দাজী করবে।

অসেঁা বলিল—দেখুন মশায়, আমি আপনাকে মিনতি করে' নিবেদন করছি যে আমাকে আপনি একটা ক্ষৌয়ারগোবিন্দ মনে করবেন না। কিন্তু এ কথাও আমি আপনাকে বলে রাখছি যে দারোগা বারিসিনি যদি শুধু দারোগার ক্ষমত জাহির করবার জন্তে বে-আইনী ভাবে আমায় গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করে, তাহলে আমি কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আজ থেকে বারিসিনি দারোগাকে আমি সসপেও করলাম; আজ থেকে সে আর দারোগা নয়। .....দেখুন মশায়, আপনাকে আমার বেশ লাগছে। এই জন্তে আমি আপনার কাছে এই সামান্য অগুরোধ করছি যে, আমি সফর সেরে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি বাড়ীতে একটু চুপচাপ করে' থাকবেন। আমি তিন দিনের বেশি দেরি করব না। আমি জজ সাহিবকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসব, আর আমরা এই আপশোষের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত মীমাংসা করে ফেলব। এ কদিন আপনি কোনো রকম ঝগড়া বিবাদ করবেন না, স্বীকার করছেন ত ?

—আমি স্বীকার করতে পারছি নে মশায়, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে অর্লান্দিক্‌সিয়ো আমাকে হৃদয়বৃত্তি আহ্বান করবে, আর তাহ'লে আমি চুপ করে থাকতে পারব না।

—এ কী রেবিয়া মশায়! যে বোকাটাকে আপনি মিথ্যাবাদী জালিমাত মনে করেন আপনি ফরাশী সেনানী হয়ে তার সঙ্গে লড়াই করবেন ?

—আজ্ঞে, আমি তাকে মেরেছি।

—কিন্তু একটা ছোটলোককে যদি আপনি মারেন, আর সে আপনার সঙ্গে লড়াইতে চায়, তাহলে কি আপনি তার সঙ্গেও লড়াইবেন নাকি ? যাক। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে আরো সামান্য অগুরোধ করছি—অর্লান্দিক্‌সিয়োর সঙ্গে চেষ্টা করে দেখা করবেন না। ... সে যদি আপনাকে হৃদয়বৃত্তি আহ্বান করে তবে আপনি লড়াইবেন, আপনাকে আমি অমুমতি দিচ্ছি।

—সে আমাকে লড়াইতে ডাকবেই, আমার এতে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে লড়াইয়ে ডাকবার জন্তে আমি তাকে আর দু'ঘণ্টা ঘাঘাটা দেবো না।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন লদা লদা ডেগ ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—কী ভয়ানক দেশের বাবা, কী সর্ব্বনেশে দেশ! এখন কবে যে ফ্রান্সে পৌঁছে হাঁপ ছাড়ব!

কলোঁবা তাহার মধুর স্বরে মধু চলিয়া দিয়া বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, বেলা হয়ে গেছে, একটু কিছু জগ খেয়ে গেলে আমরা সম্মানিত হব।

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া ফেলিল।—আমি অনেকক্ষণ এখানে আছি.....; এটা যেন পক্ষপাতের মতন দেখাচ্ছে।.....আমার এখন যাওয়াই উচিত।.....দেখুন কলোঁবা, আজ আপনি মহা একটা দুর্দ্দেবের সূচনা করে' তুললেন হয়ত।

অসেঁা বলিল—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, এটুকু অন্তত আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার ভয়ীর মনের ধারণাটা কি রকম সত্য আর ঠাট। আমারও মনের সকল সন্দেহ এখন দূর হয়ে গেছে; আপনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে দোষী যে কে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট হাতের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—এখন চলুন মশায়। মনে রাখবেন যে পুলিশের জমাদারকে হুকুম দিয়ে যাচ্ছি সে আপনাদের সমস্ত চাল চলনের ওপর নজর রাখবে!

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেল।

কলোঁবা বলিল—দাদা, এ তোমার ইউরোপ নয় ; অলান্দিকনিয়ো জানেই না যে ডুয়েল লড়বার নিয়ম কি । আর তাকে মেরে ফেললে যে খুব একজন সং আর সাহসী লোককে মারা হবে, তাও নয় ।

—কলোঁবা, তুই ভয়ানক শত্রু মেয়ে । তুই আমাকে ছোরার মুখ থেকে বাঁচিয়েছিস, এর জন্তে আমি তোঁর কাছে কৃতজ্ঞ । তোঁর হাতখানা আমায় দে, আমি তোঁর চুম্ব খাব । কিন্তু দেখ, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে ; যা কিছু করতে হয় তা আমি নিজেই বুঝে শুনে করব । তুই কি জগৎ-সংসারের সব জিনিস জানিস না বুঝিস । এখন আমায় কিছু খেতে দে ; তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট রওনা হয়ে চলে গেলে, শিলিনা মেয়েটাকে একবার ডেকে দিস, সে দূতের কাজে খুব পাকা দেখেছি । আমার একখানা চিঠি পাঠাবার জন্তে তাকে দরকার হবে ।

যতক্ষণ কলোঁবা জলখাবারের জোগাড় করিতেছিল, ততক্ষণে অসেঁঁ উপরে নিজের ঘরে গিয়া নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিল—

“আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে জেদ করেছিলেন ; এ সম্বন্ধে আমারও ঔৎসুক্য বড় কম নয় । কাল সকালে ছটার সময় জলার ধারে আমাদের সাক্ষাৎ হবে । আমি পিস্তল ছোড়ায় ওস্তাদ, এজন্য আপনাকে পিস্তল-খুন্দে আমন্ত্রণ করতে চাইনে । শুনলাম যে আপনি গোলন্দাজ ভালো ; তাই সই ; আমরা দুজনেই দুনলা বন্দুক নিয়ে যাব । আমি গাঁয়ের একজন কাউকে সালিসী করবার জন্তে সঙ্গে নিয়ে যাব । যদি আপনার ভাই আপনার সঙ্গে যান, তবে আর একজন দ্বিতীয় সালিস অগ্রহ করে সঙ্গে নেবেন, এবং আমাকেও আগে একটু খবর দেবেন, কারণ তা হলে আমাকেও দুজন সালিস জোগাড় করে’ নিয়ে যেতে হবে । ইতি—

অসেঁঁ আস্তনিয়ো দেলা‘রেবিয়া ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট ঘণ্টাখানেক পুলিশের জমাদারের সহিত কথাবার্তা কহিয়া মিনিট কয়েকের জন্ত বারিসিনিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একজন আরগালী চৌকীদার সঙ্গে লইয়া কৎ যাত্রা করিল । মিনিট পনের পরে শিলিনা

অসেঁঁর লেখা চিঠিখানা লইয়া গিয়া অলান্দিকসিয়োর হাতে দিয়া আসিল ।

সমস্ত দিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যার সময় চিঠির জবাব আসিল । সে চিঠিতে বৃড়া বারিসিনির দস্তখত, এবং তাহার মর্ম্মকথা এই, যে, অসেঁঁ তাহার পুত্রকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা সে জজ সাহেবেদ-নিকট পেশ করিবে । ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়িয়া এমন সহজে অসেঁঁর বদমায়েসির শাস্তির সুবিধা করিয়া দিল তাহাতে বারিসিনিদের সততা ও সাধুতাই প্রমাণিত হইবে ।

ইতিমধ্যে পাঁচছয়জন পাইককে ডাকাইয়া কলোঁবা নিজেদের বাড়ীতে চৌকী দিবার ব্যবস্থা করিল । অসেঁঁর নিষেধ অগ্রাহ করিয়া তাহারা সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা বাড়ীতে সমস্ত জানলা দরজা হইতে বন্দুক আওয়াজ করিতে লাগিল এবং দেহাতের অনেক লোক আসিয়া অসেঁঁকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । পণ্ডিত ফেরারীর পর্য্যন্ত একখানা চিঠি আসিয়া হাজির ; সে তাহার নিজের ও ব্রান্দো উভয়ের হইয়া লিখিয়াছে যে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ দিয়া অসেঁঁকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে তবে তাহারা পুলিশকে একবার দেখিয়া লইবে, অসেঁঁ যেন নিশ্চিন্ত থাকে । সে চিঠিতে পুনশ্চ লিখিয়াছে—ভালো কথা, আপনি কি জানেন, আমার বন্ধু ব্রান্দো তার কুকুরকে যে হিকমৎ শিখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেদিন দেখাইয়া আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের মত কি ? শিলিনা ছাড়া আমি ত আর দ্বিতীয় কোনো ছাত্র ছাত্রী দেখি নাই যে ব্রান্দোর কুকুরের অপেক্ষা অধিক নম্র এবং আনন্দিত ভাবে নিজের শিক্ষিত বিদ্যা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে ।

( ক্রমশ )

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পঞ্চশস্য

বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ নিৰ্মাণ (Les Documents du Progres) :—

মাংসাগরী মানব “think not of morrow” ( আগামী কলার জ্ঞান চিন্তা করিও না ) এই সহজপালা উপদেশটি বর্ণে বর্ণে এত দিন খালন করিয়া আসিয়াছে। ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া আহাৰ করিতে কিছুই বাকি রাখে নাই। কিন্তু কপাটা হইতেছে এই যে, এই-সকল গৃহপালিত পশুদিগকে ভক্ষণ ভিন্ন আমাদের অল্প কাজেও ইহারা বিশেষ ভাবে লাগিয়া আসিতেছিল। ঘোড়ার ঙ্গস ভক্ষণ করিতে করিতে। বিশেষতঃ জার্মানিতে) দেখা গেল গাড়ীচালনা ইত্যাদির জ্ঞান ঘোড়ার অভাব ঘটতেছে। ভাগিন্স বিজ্ঞান ছিল, তাই বিদ্বাং ও বাষ্পকে ঘোড়ার খাটুনি খাটাইয়া ঘোড়ার অভাব অনুভব করিতে দেওয়া হইল না। এবার পরিশ্রমী গাভীকে নিঃশেষ করিতে গিয়া পয়োধারার অভাব কল্পনায় মানবজাতিকে বিশেষ শক্তি হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতে গোয়ালিনী সভা ইত্যাদি করিয়া সে অভাব নিবারণ করিবার প্রয়াস হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি মাংসভক্ষণ-নিষেধক কোন প্রকার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া এবারও বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইয়াছেন। সম্প্রতি তিন জন জার্মান রসায়নবিৎ দুগ্ধ গঠনের উপকরণ-সকল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশ্লেষণ করিয়া রসায়নাগারে দুগ্ধ নিৰ্মাণ করিয়াছেন। ইহারা সর্বপ্রথমে গোদুগ্ধকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে কি কি উপকরণ কি পরিমাণে আছে তাহা সম্যক নির্ণয় করিয়াছেন। গরুর খাদ্যমধ্যে সেই সামগ্রী কি পরিমাণে আছে তাহাও দেখিয়াছেন। তৎপর রসায়নাগাররূপ গাভীকে সেই খাদ্য আহাৰ এবং হজম করাইয়া অর্থাৎ গাভীর উদ্ভিঞ্জ খাদ্য হইতে দুগ্ধের উপকরণ-সামগ্রী নিষ্কাশিত করিয়া সেই সামগ্রীর যথাপরিমাণ সংমিশ্রণে দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়াছে।

ক্রোসেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিগলার ( Rigler ) একটি কৃত্রিম দুগ্ধ তৈয়ারীর কল নিৰ্মাণ করিয়াছেন। কলটির কার্য-প্রণালী খুব সহজ, এক দিকে কতকগুলি ঘাসপাতা পোল ভূমি দিয়া কল ঘুরাইলেই অপর দিকে বোতলে দুগ্ধ ভরিয়া উঠে। এই দুগ্ধের রং শুভ্র, স্বাদ মিষ্ট, এবং বিশেষ গুণ এই যে ইহাতে জঙ্ঘর গায়ের বোটকা গন্ধ থাকে না। সম্পূর্ণ উদ্ভিঞ্জ-জাত বলিয়া ইহা নিরামিষাশীরও খাদ্য। ইহা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা চের সম্ভা।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বলিয়া এই দুগ্ধ স্বভাবতঃই বীজাণু মুক্ত ; সুতরাং এই দুগ্ধ পান করিলে কোনোরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই।

অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর হাঁসপাতাল-সমূহে এই দুগ্ধ রোগীদিগকে পান করাইয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করা হইতেছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্মার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ প্রমুখ অনেকানেক বৈজ্ঞানিকেরা এই দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ইহা খাঁটি গোদুগ্ধ-তুল্য গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ, ও আশ্বাদ ও আহাৰ করিয়া স্বাস্থ্য ও বলপুষ্টিকারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই দুগ্ধ লণ্ডন সহরে প্রতি কোয়ার্ট ( প্রায় তিন পোয়া ) তিন পেনিতে ( তিন আনায় ) বিক্রয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সাহারা মরুভূমি (The American Machinist):

সাহারা মরুভূমি লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে গুড়ীর গবেষণা চলিতেছে। সাহারার বিস্তৃতি ১৮,০০,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ প্রায় আমাদের ভারতবর্ষের সমান; যুরোপ হইতে কিছু ছোট। পৃথিবীর এত বড় একটা জায়গা এমন অকাঙ্ক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে, স্বভাবতঃই ইহার প্রতি মানবের চক্ষু আকৃষ্ট হয়। শুধু যে নিরীহ বেচারার মত অকাঙ্ক্ষে পড়িয়া আছে তাহাও নহে, ইহার আশে পাশে যে-সমস্ত জায়গায় মানবের বসতি আছে সেখানকার লোকদের অনেক সময় এই বিরাটকায় দানবপ্রায় মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসের জ্বালা নীরবে সহ্য করিতে হয়। তাহাতে ক্ষতি বিস্তর।

সাহারার অধিকাংশ স্থান সাগরবক্ষ হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। কিন্তু তাহার চারি পাশের জমী উচ্চ থাকায় সমুদ্রের জল সাহারাতে প্রবেশ করিতে পারে না। একটা প্রস্তাব এই যে ভূমধ্যসাগর অথবা এটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে একটা নালা কাটিয়া যদি সাহারার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে সাহারা মরুভূমি সাহারার সাগরে পরিণত হইয়া যাইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বের অধিক দেশ-সকল সুফলা হইয়া উঠিবে এবং নৌচালন সুগম হইয়া মানবের পতয়াত ও বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। কিন্তু এই প্রকার কার্য নিরাপদ কিনা তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ভূমধ্যসাগর এই ভাবী সাগর হইতে পরিমাপে অনেক ছোট। যদি ভূমধ্যসাগর হইতে এই প্রস্তাবিত নালা কাটা হয় তবে সাহারার এক চুমুকে ভূমধ্যসাগরের সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে, এবং ভূমধ্যসাগর, এটলাণ্টিক ও লোহিতসাগর ইত্যাদি হইতে নিঃস্রব ক্ষতিপূরণ করিতে থাকিবে। ভূমধ্যসাগরের চারিদিক হইতে জলের এই আকর্ষণের ফলে সেখানে জলের একটা সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদী লোকে বলিতেছেন যে নালাটা ছোট করিয়া কাটা হইলে তাহা দ্বারা অকস্মাৎ এত অধিক জল স্থানান্তরিত হইবে না যাহার ফলে এই প্রকার কোনো জলবিপ্লবের আশঙ্কা আছে। যাহা হউক যদি এটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত সাহারাকে যুক্ত করা হয় তবে এই আশঙ্কা বিশেষ থাকিবে না। কিন্তু যে দিক দিয়াই নালা কাটা হউক না কেন, আর একটা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে অনেকে বলিতেছেন। সকলেই জানেন আমেরিকার মেগ্নিকো উপসাগর হইতে একটা উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত বহিয়া ইংলণ্ডের পূর্বদিক দিয়া উত্তর দিকে কিছু দূর গিয়া শেষ হইয়াছে। এই উষ্ণ স্রোত ইংলণ্ডকে দারুণ শীত হইতে রক্ষা করিতেছে। সাহারার অন্তিম জলের আলোড়নে এই উষ্ণ স্রোতের নির্দিষ্ট পন্থার ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি এই স্রোত ইংলণ্ডের পথ ছাড়িয়া অল্প কোথাও দিয়া প্রবাহিত হয় তবে ইংলণ্ড প্রবল শীতের প্রকোপে পড়িয়া জমিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভীতি যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা শুধু ইংলণ্ড প্রভৃতি দু-চারিটা দেশ সংক্রান্ত নহে, তাহা সমগ্র পৃথিবী সংক্রান্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে পলিত তরল পদার্থ অবস্থিত আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এই তরল পদার্থের উপরে চতুর্দিকের চাপ প্রায় সমান; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ সকল দিকেই সমান শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া আছে। তাই পৃথিবীটা যথাযথ হইয়া আছে। কিন্তু একটা সুপক্ক আগ্নেয় ফলের একদিকে

বেশী তাপ পড়িলে যেমন তাহার ভিতরকার তরল রস এক দিক দিয়া না হয় অল্প দিক দিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি বৎসর-বৎসর ঝড়-বৃষ্টি নদ-নদী দ্বারা স্থানান্তরিত মৃত্তিকাদির ভারের পরিবর্তনে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের একদিকে অধিক তাপ পড়ে এবং অল্পদিক ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ উদ্ভিন্নপূর্ণে পুনরায় চতুর্দিকের ওজন সমান হইয়া পড়ে। এই সঙ্গে ভূমি-কম্প হইয়া কোনো জায়গা বসিয়া গিয়াও এই ভার-সম্বন্ধের সহায়তা করে। অনেক বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন যে সাহারার উপরে যদি হঠাৎ এই প্রভূত পরিমাণ জলরাশির ভার চাপাইয়া দেওয়া হয়, এবং তৎক্ষণাত্ সেই সঙ্গে অল্প সাগরের উপরের ভার কমিয়া যায় তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত তরল পদার্থ এই ভার-বৈপন্নীত্যে এমন প্রবল শক্তিতে, প্রভূত পরিমাণে এবং ভীষণ ভাবে কোনো আগ্নেয়গিরি দিয়া বাহির হইবে যে সেই গলিত পদার্থের নির্গমনে বহু দেশ দক্ষ এবং সেই সঙ্গে ভূমি-কম্পের প্রবল স্পন্দনে প্রায় সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আর একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, সাহারাকে সাগরে পরিণত না করিয়া অল্প এক প্রকারে ইহাকে অধিক আবশ্যকীয় কার্যে লাগান যাইতে পারে। ঠাহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৬,০০০,০০০,০০০ টন কয়লা পোড়াইলে ষত উত্তাপ হয়, প্রতিদিন সাহারার উপরে সেই পরিমাণ সূর্যের তাপ পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর এক বৎসরে উৎপন্ন সমস্ত উত্তাপ ওজন করিলে ৩২০০০০০০০০ টন হয়, এবং তাহা পুড়াইলে যে তাপ হয় তাহা ১৮০০০০০০০ টন কয়লা পোড়ানো তাপের সমান। এই তাপ যদি কোনো প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারা যায় তবে তাহা দ্বারা অসংখ্য কলকারখানা চালানো যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই-সকল কলকারখানায় চুল্লী, চিমনী বা ডাইনামো (dynamo) কিছুই থাকিবে না, থাকিবে শুধু কতকগুলি বিবিধ ধরণের এবং পরিমাপের আয়না ও আঁতস কাচ (lense)।

কালে পৃথিবী হইতে পাথুরে কয়লা লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিতেছেন যে সূর্য্যতাপ হইতে যখন উত্তাপ জন্মে ও পুষ্টিলাভ করে, তখন সাহারার একেজো তাপ হইতে এত উত্তাপের পুষ্টি ও নূতন উত্তাপের সৃষ্টি হইতে পারিবে যে উত্তর-কালের মানব কয়লার অভাবে কিছুই কষ্ট পাইবে না।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ বাক-বিতণ্ডা চলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ কার্যটি করা হইবে এখনও ঠাহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই—সৃষ্টি, স্থিতি, না প্রলয়।

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়।

জব্বলপুর বাঙ্গলা লাইব্রেরী।

### ব্যবসায়ের প্রকৃতির তারতম্যে মৃত্যুর ও আয়ুর তারতম্য—

পেল্‌মেল্‌ গেজেটের পারীসগরস্থ সংবাদদাতা বলেন যে ফরাসি দেশের সীন্ ডিপার্টমেন্টের তথ্যসংগ্রাহক (Statistician for the Department of the Seine) ডাক্তার জ্যাকোয়েস্ বাটিলন্ সাহেব সম্প্রতি কতকগুলি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন—তদ্বন্ধে কোন্ কোন্ ব্যবসায় বা কার্যাবলীদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা কত জানা যায়। ঠাহার মতে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ—অমিতাচার, মাদক-দ্রব্য সেবন, এবং বুক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও স্নায়ু সংক্রান্ত ব্যারাম, বহুমূত্র রোগ, আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনা (accidents)।

উন্মুক্ত বাতাস সেবন করিতে করিতে যে-সকল ব্যাধ্যায় বা কার্যে করা যায়—সেইগুলিই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যকর; কিন্তু ইহাতে চলা ফেরার বিশেষ আবশ্যক, নতুবা অল্পে নিয়ত বাতাস ইত্যাদি লাগিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। এ অল্পই পশুপক্ষীরক্ষক, এবং উদ্যানরক্ষক প্রভৃতি দীর্ঘজীবী হয়, পক্ষান্তরে শকট প্রভৃতি চালকগণ (যাহাদের শরীরে বাতাস ইত্যাদি লাগে, অথচ চলাফেরার ব্যাপার নাই) অধিক দিন বাঁচে না।

বার্টলন্ সাহেবের তালিকা দৃষ্টে প্রকাশ—এন্‌জিন্‌ চালক কাটকাটা কার্যে এবং ময়দা প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত লোক, শিক্ষক, আইন-ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্মযাজক শ্রেণী সর্বাঙ্গের দীর্ঘজীবী। চিকিৎসক, রসায়নবিৎ, স্থপতিবিদ্যাবিৎ আইন-ব্যবসায়ীদের কেরাণী, পোষ্টাপিসের কর্মচারী, ভ্রমণশীল সওদাগর, মুদী, ফল-বিক্রেতা, টুপিওয়াল এবং ঘড়ী প্রস্তুত এবং চামড়া পরিষ্কারকারী কার্যে ব্যাপৃত লোকগণের মধ্যে মৃত্যুর হার অল্প। বাটার চাকর এবং কোচম্যানের মধ্যেও তদ্রূপ।

সাধারণ বড় কর্মচারী, ট্রাঙ্কয়ে ও গ্যাসের কার্যে নিযুক্ত লোক, মৎস্য ও পোষাজন্তু ইত্যাদি ফিরিওয়াল, বস্ত্রাদি বিক্রেতা, জিন্‌ নির্মাতা, রুটিওয়াল, শস্ত্রপেষণ-যন্ত্রাধ্যক্ষ, কসাই, মাঝি, গাড়ওয়ান, নাবিক এবং সাইকেল্ গাড়ি ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে মৃত্যুর হার গড়পড়তা অপেক্ষাকৃত বেশী। জন-মজুরেরা, স্বল্পায়ু; চিকিৎসক, স্বনির কার্যে ব্যাপৃত লোক, প্রস্তুত-খোদক দোকানের কর্মচারী, শকটাদি চালক, সহিস্, খোড়দোড়ের খোড়সওয়ার, খবরের-কাগজ-বিক্রেতা, প্রস্তুত-সওদাগর, মুদ্রাকর, কামার, পত্রবাহক, ধূমপানী-মার্জ্জক, নাপিত এবং গায়কদের মধ্যেও তদ্রূপ।

আইন-ব্যবসায়ীগণ কেন দীর্ঘজীবী এবং গায়কেরা কেন অল্প বয়সে মরে? উকীষ-নির্মাতা কেন শীঘ্র ভবলীলা সাঙ্গ করে?—এ-সকল জটিল প্রশ্ন—এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

আত্মহত্যা এবং বহুমূত্র—মৃত্যুর দুইটি প্রধান কারণ। সাধারণতঃ, সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদেরই এই ব্যাধি হইয়া যায়—যথা, সাধারণ বড় কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, মদ্যবিক্রেতা, কৃষক এবং ধর্ম্মযাজক শ্রেণী। সকল শ্রেণীর মধ্যেই আত্মহত্যা দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে ইহা বেশী এবং কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে কম। মুদী, লোহালকড়ওয়াল, বস্ত্রাদি বিক্রেতা, পিপানির্মাতা, পাঞ্জিওয়াল; তামাকবিক্রেতা, আইনব্যবসায়ীর কেরাণী এবং স্থপতিবিদ্যাবিদগণের মধ্যে ইহা অধিকতর দেখা যায়; এবং পশমী-কাপড়-বিক্রেতা, দোকানের কর্মচারী ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ব্যবসায়ী, উকীষনির্মাতা, বাড়ীর চাকর, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও রসায়নবিদগণের মধ্যে আত্মহত্যা নিয়ত ঘটে। কিন্তু মদ্যপায়ী ও তাহাদের কর্মচারীগণ, ধূমপানী-মার্জ্জক, কসাই, ফলবিক্রেতা, এবং সঙ্গীতশাস্ত্রালাপীদের মধ্যে আত্মহত্যা সর্বাঙ্গের সচরাচর দেখা যায়।

শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি; এল।

### বাগ্মীর শারীরক্রিয়া, The Physiology of the Orator (British Medical Journal):

বিশ্লেষণ ও পরিমাপক্রিয়াকেই অনেকে (Science) বিজ্ঞানের প্রধানতম অঙ্গ মনে করিয়া থাকেন। এখন বৈজ্ঞানিক যুগ।



বেয়াত্রিচে চোপ ।  
গিদো রেণী কর্তৃক অঙ্কিত ।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY  
U. RAY & SONS, CALCUTTA.



এ সময় মানুষের সকল কাব, সকল বৃত্তিকে বিলিষ্ট করিয়া, বীজপণ্ডিতের অথবা রসায়নের সঙ্কেত চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ব্যালজাক্ (Balzac) গ্রন্থের নায়ক নীচখাত্ত হইতে উচ্চখাত্ত প্রস্তুত করিতে দিয়া সর্ব্বশক্তি হইয়া পড়েন। অবস্থার পরিবর্তনে তাঁহার ক্রীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তিনি এই বলিয়া মনে সাধনা পাইয়াছিলেন যে অক্ষ কি দিয়া প্রস্তুত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। সে দিন হাউস্ অফ্ কমন্স্ (House of Commons) মহাসভায় টমাস্ ওয়েকলী (Thomas Wakely) কি করিয়া কবিতা লিখিতে পারা যায়, তাহার একখানি (Prescription) ব্যবহাপনের উল্লেখ করিয়া শ্রোতাদের বেশ একটু আনন্দ দিয়াছিলেন।

সিগ্‌নর এল্. এম্. প্যাট্রিজি (Signor L. M. Patrizi) ইতালীর একজন নামকরা লেখক। তিনি বাগ্মীর শরীরতত্ত্ব বিষয়ে সম্প্রতি একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। প্যাট্রিজি বলেন বাগ্মিতা কতকগুলি (physical laws) ভৌতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বক্তার বকের আয়তন, তাহার দম ও নিশ্বাস প্রবাহের (rhythm) ছন্দের উপরই বক্তৃতাটির পদবিদ্যাস প্রভৃতি নির্ভর করে। যে ব্যক্তি ক্লান্ত, বাহার বন্ধদেশ তেমন প্রশস্ত নহে, তাহার নিকট দীর্ঘপদ-ও-বাক্যযুক্ত বক্তৃতার আশা কোন মতেই করা যায় না। ইহাদের বক্তৃতা প্রায়ই ভাঙ্গাভাঙা ও ক্লান্ত গোছ হয়। বিশালবন্ধ ব্যক্তিদের বক্তৃতা সচরাচর খুবই গুরুগম্ভীর ও স্তম্ভী হয়। বক্তৃতাকালে বক্তার দেহমধ্যে রক্তসঞ্চালন কেমন হয়, প্যাট্রিজি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। একটা বক্তৃতায় বক্তার দেহে কতখানি ফস্ফরাস (Phosphorus) কতখানি অকার্বন (Carbon) হয়, তিনি তাহারও নির্দেশ করিয়াছেন। প্যাট্রিজির মতে বক্তৃতা দিতে বক্তার কতখানি শক্তির ব্যয় হয়, তাহা মাপ করিয়া কিলোগ্রাম্ (Kilogram) নামক রাসায়নিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব নয়। তিনি সকালের ও একালের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বাগ্মীর কথা দ্বারা আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্যাট্রিজি বলেন—বাগ্মীপুরুষ সাধারণতঃ পুষ্টদেহ ও মাংসল হয়। মনের সম্বন্ধে ইহাদিগকে দার্শনিকদের সহিত তুলনা করা করিয়া সৈনিকপুরুষদের সহিত তুলনা করাই অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের বিচার ও চিন্তাশক্তি চিরদিনই অপরূপ থাকে। বুদ্ধিও ইহাদের যে খুব বেশী থাকে তাহাও নহে। কিন্তু অরণশক্তি বিলক্ষণই থাকিতে দেখা যায়। প্রতিভাবান্ পুরুষের জায় ইহাদের কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবার শক্তি নাই। সাধারণ কন্মীপুরুষের যে-সকল দোষগুণ থাকে বাগ্মীর সে সকলই থাকিতে পারে। কোন প্রসিদ্ধ বাগ্মীর বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাঠ করিলে তাহাতে সার কথা, মূতন কথা অতি অল্পই থাকিতে দেখা যায়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী জন্ ব্রাইট্ (John Bright) সম্বন্ধেই কেবল একখাটি পাঠে না। বাগ্মী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের উপর কাব করে—আবার শ্রোতার দলও বাগ্মীর হৃদয়ে কাব্য করিয়া থাকে। শ্রোতার করতালি, ও উৎসাহ-নাদে বক্তার রক্ত গরম হইয়া উঠে—তিনি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠেন। বক্তৃতা করার বিপদই এখানে। সিগ্‌নর প্যাট্রিজি বক্তাকে ঘেরপভাবে বিলিষ্ট করিয়াছেন, শ্রোতাকেও যদি সেইভাবে বিলিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে বক্তা ও শ্রোতা ইহাদের, কে কাহার হৃদয়ে কতটা কাব করে, তাহা জানিবার পক্ষে আশাদের খুব সুবিধা

হইত। বক্তৃতায় যে বিশেষ কোন বুদ্ধির ধরচ হয় প্যাট্রিজি তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না।

প্যাট্রিজির সকল কথাই যে সত্য ও যুক্তিযুক্ত আশাদের ডাহা মনে হয় না। তবে তাঁহার কথায় যে কোন সত্য নাই এ কথা কেহই বলিতে পারেনা। বাগ্মী খুবই সাধারণ ভাবে এমনি ভাবে প্রকাশ করেন যে তিনি যেন প্রত্যাদিষ্ট (inspired) হইয়া একটা নূতন সত্য প্রকাশ করিতেছেন। বক্তৃতায় শব্দের আড়ম্বর যতটা থাকে, ভাবের আড়ম্বর তাহার এককড়াও থাকে কিনা সম্বন্ধে। বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মাতিয়া উঠে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বক্তৃতাটি ছাপা হইয়া বাহির হইলে তাহাতে মাতিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শূন্যগর্ভ বাক্যে ও অসংযুক্ত যুক্তিতে লোকে কি করিয়া বিচলিত হয়, তাহাই আশ্চর্য্য।

ডাক্তার।

## বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ

কয়েক বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের কতিপয় ব্রাহ্মণ উকিল ও মোক্তারের উদ্যোগে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' স্থাপিত হয়। বর্তমান লেখক তৎকালে মুন্সীগঞ্জে বাস করিতেন। যে কারণে ও যে ভাবে ব্রাহ্মণসভার উৎপত্তি হয়, তাহার অমুসন্ধান অনাবশ্যক। কিন্তু বিশ্বনিরস্তা মানুষের দুর্বলতাকেও স্বীয় ইচ্ছার সাধনযন্ত্র করিয়া থাকেন। তাই বুঝি আজ এই ব্যবহারাজীবনষ্ট ধর্মসভার প্রকৃতপক্ষেই সমাজমঙ্গল-হেতু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর সম্মুখে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালী তাহার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অমানিশার অন্ধকারে বিভ্রান্ত পথিকের জায় সঙ্গত ও সচকিত হইয়া পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। আজ উচ্চনীচ, ভদ্রেতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদয় বাঙ্গালীরই এই অবস্থা। ঈদৃশ সময়ে যিনি অজুলিসঙ্কেতে গস্তব্য নির্দেশের আশাও প্রদর্শন করেন, তাঁহাকেই লোকে বহুভাবে গ্রহণ করে। এই কারণেই বিপন্ন, বিভ্রান্ত, সঙ্গত ব্রাহ্মণগণ অতি দ্রুত ব্রাহ্মণসভার প্রত্যাশিত সূন্যায়কত্বের অধীনে আপনাদিগকে স্থাপন করেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণসভার পতাকাতে যে সামাজিক শক্তিসমবায় ঘটে, তাহা উদ্যোক্তাগণের প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়া বিগত ৫১৬ বৎসরকাল পরিচালিত হইতেছিল। আজিও হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হয় নাই, আজিও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণ কথঞ্চিৎ নেতৃত্ব করিতেছেন। তাই অপরাপর বর্ণের উন্নতি-চেষ্টা-প্রসূত সমিতিসমূহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণসভার গুরুত্ব অধিক, একথা অস্বীকার করা যায় না। এস্থলে একটি বৃহত্তর ব্যাপারের সহিত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণসম্মিলনের তুলনা অমার্জনীয় না হইতে পারে। পলাশিক্ষেত্রে বঙ্গরাজলক্ষ্মী ইংরেজ রাজশক্তিকে বরমাণ্য প্রদান করেন। তৎপর দিল্লীশ্বরের ইংরেজকে বস্তুতঃ দেয় কিছুই ছিল না। তথাপি রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ সুচতুর ক্লাইব দিল্লীশ্বর হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনন্দ গ্রহণ করেন। হতশ্রী, শক্তিহীন, হতরাজ্য বাদসাহ শাহ আলমের সেই কলমের খোঁচার মূল্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। সুবা বাঙ্গালার বার্ষিক রাজস্বের প্রায় দশমাংশের বিনিময়ে তাহা ক্রীত হইয়াছিল। সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ পূর্বগৌরবভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদের সমবেত ফুৎকার অদ্যাপি হিন্দু সমাজে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ব্রাহ্মণসম্মিলনের আনুপূর্বিক অবস্থা দৃষ্টে তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারিদিক হইতে আমরা যতই সংবাদ পাইতেছি, ততই বুঝিয়াছি সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের' নির্ধারণ সমূহের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' অত্যল্প কালমধ্যে বিক্রমপুর-বাসীর গভীর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণেতর বিদেশ-প্রত্যাগত যুবক সমাজে পুনর্গৃহীত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণসভার নিকট আবেদন করেন। অন্যান্য অনেক সামাজিক বিষয় ব্রাহ্মণসভায় মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণসভাও সহৃদয়তার সহিত এই-সকল বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণসভা দূরবর্তী স্থানসমূহেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। বর্তমান বর্ষে প্রধানতঃ কাশী-প্রবাসী কয়েকজন বিক্রমপুরবাসী ও স্বনামখ্যাত বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর জমিদারীর ম্যানেজার

সুপরিচিত বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে ও উদ্যোগে বিগত ২রা ও ৩রা কার্তিক তারিখে মুন্সীগঞ্জে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের' অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

'মহাসম্মিলন' বস্তুতঃই মহাসম্মিলন হইয়াছিল। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন ও সত্যচরণ শাস্ত্রী, বাবু শ্রীমসুন্দর চক্রবর্তী, ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহের উকিল বাবু হরিহর চক্রবর্তী, ধামগড়ের বাবু সতীশচন্দ্র রায়, বিক্রমপুরের পণ্ডিত মোক্ষনাচরণ সামাধায়ী ও বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাস্ত্রপারদর্শী বাবু আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য, কাশীর ব্রাহ্মণসভাসম্পৃষ্ট বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন বাবুর অনুবর্তী কাশীর কণ্ট্রাক্টর বাবু কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়, এবং নবদ্বীপ, মৈমনসিংহ, ত্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন এবং বিক্রমপুরের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সাকল্যে প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের তুলনায় পণ্ডিতসংখ্যা অতি অল্প হইয়াছিল।

সভাস্থলে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনুপস্থিত বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজা মহারাজা প্রভৃতি এবং অপরাপর লোকের সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রাম পঠিত হয়। কংগ্রেস বা কনফারেন্স তদপেক্ষা অনেক অল্পসংখ্যক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, সমুদয় বঙ্গবাসী মহাসম্মিলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

অনেক বক্তা তাঁহাদের পূর্বপুরুষের চরণধূলিপূত বিক্রমপুর সম্বন্ধে যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুরবাসীগণ গৌরববোধ না করিয়া পারেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন বিক্রমপুর সেনরাজগণের রাজধানী, কোলীচের উৎপত্তিস্থল, এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ-গণের এক অতি প্রধান কেন্দ্র, অতএব বিক্রমপুরই ব্রাহ্মণ-সভার উপযুক্ত জন্মস্থান। বিদেশাগত বক্তাগণের বিক্রমপুর



সম্বন্ধে ঐদৃশ্য ভাব ও উক্তি বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়গত কৃতজ্ঞতার উদ্বেক করিতেছে।

বিদেশাগত ভ্রমলোকদিগের উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা ও সৎকার করিতে অসমর্থতা হেতু বিক্রমপুরবাসী আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইতেছি। স্বাশা করি তাঁহারা নিজগুণে আমাদের ক্রটি মার্জনা করিবেন।

বন্ধের নানা-স্থান-বাসী বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গসমাজের ভ্রমলোকান্ত্রে প্রণোদিত হইয়া মহাসম্মিলনে পরস্পরকে সৌহার্দ জ্ঞাপন করিলেন, একই হিতচিকীর্ষা সকলের হৃদয় আন্দোলিত করিল, এবং সভাস্ত্রে সকলে সেই গুণসম্মিলনের স্মৃতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে সম্মিলনের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইহাই সম্মিলনের বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব। এই অধিবেশনের এতদতিরিক্ত আর কোনও প্রশংসা করা যায় না।

সম্মিলনে যেসকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী বা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নই সভাপতিত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের ব্রাহ্মণ নায়কগণের নয়ন ও মন ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা ধনবত্তা দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিল। অগুণা শাস্ত্রী ও তর্করত্ন মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজোপাধিক শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়কে তাঁহারা কদাপি সভাপতি মনোনীত করিতেন না। রাজা বাহাদুর আমাদের ক্ষমা করিবেন। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে কিছুই বলিতেছি না। তাঁহার শিষ্টাচার এবং অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সম্মিলনে তাঁহার উপস্থিতি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের বিষয়। অধিকন্তু যদিও তিনি শেষকালে মনোমোহন বাবু ও তাঁহার অনুবর্তীগণ দ্বারা ক্রিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণ-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তাঁহার জ্ঞান রাজনীতিকুশল, বিচক্ষণ ব্যক্তি সভাপতির আসনে উপবিষ্ট না থাকিলে বর্তমান একদেশ-দর্শী সম্মিলনের কার্যপরিচালন সুকঠিন হইত। কিন্তু

সমাজের মদলোদ্দেশ্যে আমাদের বলিতে হইতেছে যে, যে সভায় সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতি সঙ্ঘেও ধনপতির সভাপতিত্ব অপরিহার্য হয়, সে সভাকে ব্রাহ্মণ-সভা আখ্যা প্রদান শকার্ধের বাস্তিচার মাত্র। রাজা বাহাদুরের নিজ ভাষায় বলিতে গেলে ধনীগণ ক্ষাত্রশক্তির অদ্বীভূত দিল্লীদরবারের জায় 'ঘোষণা' সভার অথবা বণিকগণের 'বনবনা' সভার উপযুক্ত সভাপতি হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের 'মন্ত্রণা' সভায় ধনীর সভাপতিত্ব নিতান্তই অশোভন, অনুপযোগী ও স্বস্থানাতি-ক্রমী। ব্রাহ্মণসভার উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী। সুতরাং তাঁহাদের আহুত সভায় ধনীর সভাপতিত্ব বিশেষতঃ নিন্দনীয়।

সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের যুগোচিত ব্রাহ্মণপ্রীতি বণিকগণেরও লোভনীয়। যে ব্রাহ্মণকুলতিলক সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠের গুরুভার স্মীয় সঙ্কে বহন করিয়া সম্মিলনকে ধন্য করিয়াছেন, তিনি সভাস্থলে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের পত্রের প্রতি যে গুরুত্ব স্থাপন করেন, অনেক ব্রাহ্মণ রাজার পত্রের প্রতিও তাদৃশ গুরুত্ব স্থাপন করেন নাই। সভাস্থ সকলেই তাহা লক্ষ্য করেন এবং একটুক কানাকানিও হয়। ব্রাহ্মণপ্রবর নাকি স্মিতমুখে জনান্তিকে বলিয়া-ছিলেন, 'রাজা শ্রীনাথকে আমাদের পক্ষে কমিট (commit) করাইয়া লইলাম।'

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন সভাস্থ কোন প্রস্তাব সম্বন্ধেই ভোট লওয়া হইবে না। নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের মন্ত্রণা-সভায় কোন্ মত গৃহীত বা অনুমত হইবে, তাহা নির্দ্বিগত মধ্যস্থ নির্দেশ করিতেন। কলির ব্রাহ্মণ-সভায়ও সেই প্রাচীন রীতির অনুকরণে ইংরেজী ভোটপ্রথা \* 'একঘরে' হইল। 'একঘরে' কিন্তু নিতান্ত গৃহশূন্য নহে; কারণ ভোটের জন্ম মহা-সম্মিলনও একটুক স্থান রাখিয়াছিলেন—সভাপতি ও

\* ভোটপ্রথা ইংরেজি বা যুরোপীয় প্রথা নহে; ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও ভোটপ্রথা প্রচলিত ছিল। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কানীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রমাণ করিয়াছেন (An Introduction to Hindu Polity) যে, প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র শাসন বিশেষ প্রচলিত ছিল; এবং ভোটের নাম ছিল "যে-

তৎকালীন মধ্যস্থ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাবু অধিকাচরণ উকিল ও অগ্ন্যাণ্ড সভ্যগণ সভাপতির এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত না হইলে সভাপতি মহাশয় সভাপতিত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রতিবাদকারীগণ তুফীজ্জাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

শুনিয়াছি সভাপতিবেশনের পূর্বে কয়েকটি বিএ, এমএ, উপাধিধারী 'বালক' নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ দ্বারা মনোমোহন বাবুর অনুচরগণের বড়ই বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন! অন্তোপায় হইয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত তিনটি অপূর্ব নীতি অনুসরণের প্রস্তাব করেন :—

১। সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ ইতিপূর্বে যে-সকল প্রস্তাব মুসাবিদা করিয়াছেন, সেই সেই প্রস্তাব বিনা আলোচনায় সম্মিলনের গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ সম্মিলন তো আলোচনার স্থান নহে।

২। 'বালকদের' কথা শুনা যাইবে না।

৩। সভায় ভোট লওয়া হইবে না; সভাপতির ঘোষণা দ্বারা প্রস্তাবগুলি গৃহীত বা অগ্রাহ হইবে।

যদিও তৎকালে এই-সকল নীতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মনঃপূত হয় নাই, তথাপি পরিণামে এই-সকল নীতি অনুসারেই সভার কার্য নির্বাহিত হইয়াছিল। মনোমোহন বাবুর বিরুদ্ধমতাবলম্বী ২।১ জন মাত্র অতি কষ্টে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির সামান্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; সময়ভাবের উজ্জ্বলিতে আর সকলেরই কণ্ঠরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহন বাবুর অনুকূল বক্তাদের বক্তৃতা-কালে কোনও সময়ভাব হয় নাই।

যাঁহারা ঈর্ষ ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সভা আহ্বান না করাই সঙ্গত। নির্জনে ও নীরবে স্ব স্ব কর্তব্য সাধনই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্ব্য পন্থা।

বহুতরা" বা "বে-ভুয়সিকম"; ballot-votingকে বলিত "শলাকা-গ্রহণ"। "পঞ্চজন্য" মধ্যে "গণরায়ণি" শাসনপ্রথা এদেশে যুরোপের আয়দানি নহে।

বর্তমান সময়েও অনেক জাতির সামাজিক মীমাংসা পঞ্চায়ত সভায় ভোট লইয়া করা হয়।—সম্পাদক।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢাকে ঢোলে সভা 'না' করিলে জিদও বজায় থাকে না, নেতৃত্বাভিমানেরও আছতি হয় না।

যবনিকার অন্তরালে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছে; তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যিক। অন্তথা কালক্রমে ব্রাহ্মণ-সভা বিদ্রোহ-সভা মাত্রে পরিণত হইতে পারে।

মনোমোহন বাবুর কোনও সুযোগ্য অনুবর্তী আমা-দিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'আপনারা সভায় আসিয়া প্রতিবাদ ও গোলযোগ করিবেন; সেইজন্যই আমরা ইচ্ছা-পূর্বকই আপনাদিগকে ও আপনাদের মতাবলম্বী পণ্ডিত-দিগকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনারা অনাহুত আসিয়াছেন। অতীর্ণা সভা (অর্থাৎ তিনি ও তৎপন্থীগণ) ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে বলিতে না দিতে পারেন।' ইহা হইতেই পাঠকগণ সভাতে পণ্ডিত-সংখ্যার আপেক্ষিক অল্পতার কারণ বুঝিবেন। বস্তুতঃ উদ্যোক্তাগণ জাতসারে কোনও রক্ষণশীলতা বিরোধী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তথাপি উপস্থিত সভ্যগণের অনেকাংশ উদার-মতাবলম্বী ছিলেন।

উদ্যোক্তাগণ নির্দার্য প্রস্তাবসমূহের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে তিনটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি ছিল। সংক্ষেপতঃ সেই প্রস্তাব তিনটির মর্ম এই—

১। আচারভেদ ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রপাঠ করিতে দেওয়া হইবে না।

২। কায়স্থগণকে উপবীত ধারণ করিতে বা অপরা-পর নিম্নবর্ণসমূহকে উচ্চবর্ণের অনুকরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

৪। বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে পুনঃগ্রহণ করা হইবে না।

উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন হিন্দু আচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিতান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আচার কি, তাহা কি তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? মনোমোহন বাবু কি তাঁহার চাকুরী ও চাকুরীস্থলবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে গমনপূর্বক অজিনাসনে শয়নোপ-বেশন ও প্রভৃগৃহের চর্ক্যা চোষা লেহ পেয়ের পরিবর্তে

স্বচ্ছন্দ বনধীত দ্বারা ক্ষুণ্ণিভুক্তি করিবেন ? ব্রাহ্মণ ডাক্তার-গণ কি তাঁহাদের জীবনোপায় পরিত্যাগপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজনযজ্ঞ আরম্ভ করিবেন ? অপর হিন্দুসাধারণ কি ডাক্তারদের অন্ন ত্যাগ করিবেন ? চিকিৎসক সম্বন্ধে মহামুনি পরাশরের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাগণ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? শামলা-শোভিত, চাপকানারত-দেহ উদ্যোক্তাদিগের কূটবুদ্ধিপরিচালনবৃত্তি বারত্ৰয় সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ দ্বারাই ব্রাহ্মণোচিত আচারে পরিণত হইবে কি ? তাঁহারা কি মুসলমানী শামলা ও চাপকান এবং ইংরেজী জুতা, সাবান, নরফ, সোডা, লেমনেড, চা, বিস্কুট, ঔষধ, কলেরজল ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবেন ? যে-সকল পুত্র মেধাহীন তাহাদিগকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণপূর্বক ব্রাহ্মণ-পিতা সভাস্থলে স্বীয় বৈদিকধর্মপ্রীতি ঘোষণা করিয়া আসর জাঁকাইতে পারেন, কিন্তু যে পুত্র ইংরেজী স্কুলে প্রতিবৎসর পাশ করিয়া প্রমোশন পায়, বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহাকে স্কুল বা কলেজ ছাড়াইয়া কোন পিতা চতুষ্পাঠীতে পাঠাইবেন কি ? যে স্কুল বা কলেজে ইংরেজ মুসলমান বা শূদ্র শিক্ষক বা অধ্যাপক আছেন, তথায় তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রগণকে প্রেরণে বিরত হইবেন কি ? অথবা ব্রাহ্মণসন্তান ও অন্ত্যজবর্ণের ছাত্রদের আসনের পার্থক্য সাধন করা যাইবে কি ? ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নিরপেক্ষ ইংরেজের দণ্ডবিধির পরিবর্তে মকুর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করিতে পারিবেন ? বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ কি কুসীদ-লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন ? অর্থাৎ যদিই সে অঘটক সংঘটিত হয়, তবে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান ইন্সিওর্যান্স কোম্পানী প্রভৃতির কি দশা হইবে ?

জগত্তারা, জগদম্বা, ভগবতী, ক্ষেমকরী প্রভৃতি আমাদের মাতা মাতামহীগণ প্রসবান্তে অগ্নি সেকেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আধুনিক ধর্মধ্বংসী ব্রাহ্মণ বারুগণের ননীবালা, পারুলবালা, স্কুমারী, স্নেহলতা প্রভৃতি গৃহিণীগণের প্রসবান্তে ব্রাণী সেবন কি সেই বারুগণই প্রবর্তন করেন নাই ? যদি ইংলেণ্ডে কুক্কটমাংস ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব হয়, তবে পঞ্চমহাপাতকের অগতম এই সুরাপানের কি বাবস্থা হইবে ? আর

যাঁহাদের ইংলণ্ডযাত্রার শক্তির অভাব, তাঁহাদের গজাজল-পক্ক কুক্কটমাংস সেবনের প্রায়শ্চিত্ত রঘুনন্দন বাবস্থা করিয়া থাকিলে টেম্‌স্‌ নদীর জলের প্রায়শ্চিত্তাতীত মহাপাতককে কোন স্মৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও আমরা জানিতে চাই।

গৃহে অতিথি-সমাগম হইলে স্বয়ং অতিথিপর ব্রাহ্মণবাবু স্বয়ং অন্ন খাকিয়া অতিথির আহারান্তে অন্নগ্রহণ পূর্বক এগারটার পর আপিসে যাইতে পারিবেন কি ? রজনী যোগে সকলের আহারান্তে বামনঠাকুর স্বাভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করার পর ব্রাহ্মণবাবুর অট্টালিকা অতিথিপদধূলিপূত হইলে গৃহিণীবাবু হৃৎফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক মৃদাঙ্গারধূমে স্বীয় হরিণনয়ন অরুণ করিয়া হাশ্বোদ্ভাসিত মুখে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-সংস্কার করিবেন কি ? আর ননীবালাকে তাদৃশ অশনি-সম্পাত-সম কঠোর আদেশ প্রদান করিতে ব্রাহ্মণবাবুর সাহসে কুলাইবে কি ? ননীবালার সেই ঘোর বিপৎকালে অনাচরণীয় অন্ত্যজের হস্তপক্ক মিষ্টান্নই কি বাবুর একমাত্র ভরসাশূল হইবে না ?

আর অধিক লিখা নিষ্পয়োজন। যদি আচারহীন ব্রাহ্মণের শাস্ত্র পাঠ নিবারণ করিতে হয়, তবে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ হইতে শাস্ত্র পাঠ উঠিয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহাও বাঞ্ছনীয় হয়, তবে তাহা সাধন করিবার শক্তি ব্রাহ্মণসম্মিলনের আছে কি ? সম্মিলন কি ভারতবর্ষ হইতে মুদ্রায়ত্ত বিতাড়িত করিতে পারিবেন ? অথবা ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের পোষ্ট্যাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন ? আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কেন, কোন্ হিন্দু বা অহিন্দুর শাস্ত্রশাঠ ব্রাহ্মণসম্মিলনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ? যাহা অসম্ভব, তাহা প্রস্তাব করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র লাভ।

তারপর কায়স্থগণের উপনয়নের বিষয়। কায়স্থ-গণের উপরীত ধারণের চেষ্ঠা আমরা নিতান্তই দৃশ্যীয় মনে করি। কায়স্থগণ আমাদের মার্জনা করিবেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ত্রিদণ্ডীস্থলে ত্রিগুণিত ত্রিদণ্ডী গ্রহণ করিলেও আমরা আপত্তি করিব না বা তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে

বুলিতে হয়, তাঁহারা দূষিত অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিশ-দিনের-স্থলে-দশদিন-অশৌচপালন-জনিত নহে, অথবা ব্রাহ্মণ-ও-কায়স্থের-বাহুপার্থকালোপাশঙ্কা-জনিত কল্পনা মাত্রও নহে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কোনও অসমতা নাই। শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার, জীবনোপায় ও জীবনযাত্রা-প্রণালী বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ। সুতরাং বাস্তবিক বৈষম্যের অভাবহেতু বাহু বৈষম্য লোপ কোনও সহৃদয় ব্যক্তিকে ব্যথিত বা ভীত করিতে পারে না। কিন্তু কায়স্থগণের উপনয়নপ্রবৃত্তি অদ্বিতীয় রক্ষণশীলতাপ্রসূত, এই সম্মুখোন্মুখী উন্নতির যুগে পশ্চাত্তনুখী স্থিতিশীলতা অবনতির ছায়া।

কায়স্থগণ এ বিষয়ে ভেদবুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইতেছেন। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ উপনীত হইতেছেন; কিন্তু যাহাদিগকে অণ্ডে শূদ্র বলে এবং যাহারা নিজেরা কায়স্থনামে পরিচিত হইতে চাহে, সেই দে-দত্ত-প্রভৃতি-বংশোপাধিক কায়িকশ্রমজীবী ব্যক্তিগণের উপনয়ন-লিপ্সার প্রতি কায়স্থগণ নিরতিশয় বিদ্বেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সে বিদ্বেষ অসুদার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থের বিন্দুমাত্র নূন নহে।

কায়স্থগণ তাঁহাদের উপনয়নাধিকারের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের জন্তও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ইহা বালকোচিত আত্মপ্রতারণা মাত্র। কায়স্থের উপনয়ন শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তদ্বিময়ে পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। বঙ্গসমাজ অনতিমত স্থলে কদাপি শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কায়স্থগণ ইহা নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের উপনয়নাধিকার শাস্ত্রপ্রসূত নহে, পরন্তু তাঁহাদের আত্ম-শক্তিজনিত। 'শূদ্র'গণ এখনও তাদৃশ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই তাহাদের উপনয়নাধিকার নাই। যেদিন তাহারা আবশ্যকীয় শক্তিলাভ করিবে, সেদিন তাহাদের উপনয়নও শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

যে বর্ণে প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, সীতারাম, সূর্য্যকান্ত, কেদাররায়, রামচন্দ্ররায়, এবং লালাবাবু, রাণী কাত্যায়নী, রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, তরুদত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র

দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নীলরতন সরকার, শ্রীফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং অগণিত অন্য বহু কীর্ত্তিমান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বর্ণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন, সেজন্ত কীটদষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক আওড়াইবার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। শক্তিমান চিরকালই সম্মানাহ। যখন ভারতবর্ষে 'হিন্দু-সূর্য্য মধ্যাহ্ন কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, তখনও 'এই বর্ণভেদ-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ-বন্ধে অবস্থান করিয়া অন্ধুবংশীয়গণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের উপবীত ধারণের বৈধতা প্রতিপাদনের শক্তি সংস্কৃত শ্লোকের নাই, কিন্তু তাঁহাদের আত্মশক্তির আছে।

যাহা হউক জাতীয়তার হিসাবে দুষণীয় হইলেও কায়স্থগণ যখন উপবীত ধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার অধিকার কাহারও নাই; জিদ বজায় ও স্বার্থপরতা ব্যতীত বিঘ্ন জন্মাইবার কোন কারণও দেখি না। ব্রাহ্মণগণ পরিপন্থী হইলে শুধু নিজেরা অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত ও হাশ্বাস্পদ হইবেন মাত্র।

কায়স্থরা ব্রাহ্মণের নিকট কোন বিষয়েই নির্ভরশীল নহেন; আমরা তাঁহাদের বাড়ী না গেলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীতই চলিতে পারিবেন ও চলিতে অভ্যস্ত হইবেন। কিন্তু কায়স্থ ও অপরাপর জাতির সাহায্য ব্যতীত কয়জন ব্রাহ্মণের জীবনোপাধিকার হইতে পারে? মনোমোহন বাবুর ত্রায় কয়েকজন ভাগ্যবান চাকুরীজীবী ও কয়েকজন উকিল, মোক্তার ইত্যাদি দ্বারাই কি ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত? অগাণ্ড অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ-প্রধান বিক্রমপুরেও পণ্ডিতগণ এবং কায়স্থযাজী বহুব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের জাতিসমূহের সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কি কায়স্থগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, না করিতে পারিবেন? কায়স্থগণের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের পৌরাহিত্যাধীনেই হইতেছে না? বস্তুতঃ কায়স্থের উপনয়ন নিবারণ ব্রাহ্মণসমাজের শক্তির

ীত।

হিন্দুসমাজে এ পর্যন্ত যত বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছে, প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, দেবীবর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ। আমেরিকার আর্য্যগণ তত্ত্বতা অনার্য্যদিগকে যে ভাবে স্বসমাজ-বহির্ভূত ও নিষ্কূল করিয়াছেন, তৎপরিবর্তে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বতা অনার্য্যদিগকে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত ও রক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে সভাসমাজভুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব। আজিও ব্রাহ্মণগণ অর্দ্ধসভ্য অনার্য্যদিগকে আর্য্য ঋষিদিগের বংশধর কল্পনায় নূতন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুসভ্য হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা চক্ষুগ্ৰাহ্য ইংরেজগণও স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজ বর্ণ সমূহকে নির্যাতন করিতেন বলিয়া যিনি যাহাই বলুন, চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান, তাহাদের উন্নতি বিধানই ব্রাহ্মণশাসনের একমাত্র ঈর্ষ। আজ কি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সেই গৌরবান্বিত অধিকার ও কর্তব্য বিস্মৃত হইবেন? তাহারা কি উপনয়নপ্রয়াসী কায়স্থগণের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্মান ও সমাজ-নেতৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন না? কায়স্থের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের গৌরব ও ব্রাহ্মণ-বিহিত সমাজ-পদ্ধতির সার্থকতা নহে? মধ্য ভারতের গৌড়গণ কি ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বাধীনেই উপবীত-ধারী রাজপুতে পরিণত হয় নাই? অনার্য্য গৌড়কে উপবীত প্রদান করুর পর আর্য্যবংশসমূহ কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

যাহা হউক মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ প্রতিপক্ষের দৃঢ় প্রতিবাদের আশঙ্কায় শাস্ত্রপাঠ-নিবারণ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী সাহস করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করেন নাই। কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী এই পরিবর্তিত আকারে সম্মিলনের সম্মুখে উপস্থিত হয়—

‘ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্তব্য নির্ধারণের জ্ঞান সেই সেই জাতির বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শপূর্বক ধর্ম্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা।’

ইহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই;

বরং ব্রাহ্মণগণ অপরাপর বর্ণের মঙ্গলানুধ্যানে ত্রুটি হইতেছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইবেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রোমান্ ব্রাহ্মণ কেটোর কার্ণেজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতার দ্বারা সম্মিলনের প্রস্তাবক মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তদুপলক্ষেই কায়স্থের উপনয়ন ও তদ্বৎ অন্যান্য বিষয়ে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অর্মান চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় তখন বলিতে বাধা হইলেন ‘এ সকল সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক’। মনোমোহন বাবুর অনুচরগণ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। একজন বলিয়া উঠিলেন ‘তবে এত টাকা বায় করিয়া সভা করিলাম কেন?’ অপর একজন বলিলেন ‘এই প্রস্তাবে এসব কথা আসে না, তাহা আমরা পূর্বে বুঝি নাই।’ প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ‘যদি আপনারা কথা না বুঝিয়া বিষয়-নির্বাচন-কমিটীতে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া থাকেন, তবে আমি তার কি করিব?’

রক্ষণশীল উদ্যোক্তাগণের তৃতীয় আপত্তিজনক প্রস্তাব বিলাতফেরতদিগকে সমাজে পুনগ্রহণ না-করা সম্বন্ধে। বাবু অধিকাচরণ উকিল প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ‘এই বিষয় এই সভায় মীমাংসা হইতে পারে না; এ বিষয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তির জ্ঞান এক স্বতন্ত্র কমিটী গঠিত হওয়া সঙ্গত।’ তাহাতে উদ্যোক্তাগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ঐ সভাতেই ভোট-গ্রহণ-নিষেধের সুযোগে আপনাদের মনোমত প্রস্তাব পাশ করাইয়া লওয়াই তাহাদের আত্মান্তিক চেষ্টা হইল। তখন বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘চারি বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণ-সভার কোলার অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে লওয়া হইবে। তদনুসারে আমি বিলাতফেরতদিগের সঙ্গে আহার করিয়াছি, এবং কোন কোন বিলাতফেরত ব্যক্তির কন্যা হিন্দুসমাজে বিবাহিত হইয়াছে। যদি আজ বিলাতফেরত বর্জন বিহিত হয়, তবে আমার ও যাহারা বিলাতফেরতদের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে?’ বিপদ গণিয়া মনোমোহন বাবু বলিলেন, ‘হাঁ, কোলা-সভায় বিলাত-

ফেরতদিগকে গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইছাপুরা সভায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।' অল্প কোন কোন ব্যক্তিও কম্পিতকণ্ঠে ক্ষীণ স্বরে শ্রীশবাবুর স্পষ্ট বাক্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোলাসভার নির্ধারণ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সম্মিলনস্থলে শ্রীশবাবুর সহিত আহার করিতেও কেহ কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই।

যখন বিষয়-নির্বাচন-কমিটিতে সমুদ্রযাত্রা সদক্ষীয় প্রস্তাবটি আলোচিত হয়, তখন একজন ব্রাহ্মণ করজোড়ে সভাপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! একটা দুঃখের কথা বলিতে চাই। শিষ্যবাড়ী আহার করিতে গিয়াছিলাম। ঐ শিষ্য জাপানপ্রবাসীর বাড়ী আহার করিয়াছে বলিয়া এই পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকে আমাকে আটক দিলেন; সমস্তদিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যাকালে বিবন্দি হইতে ( শিষ্যের বসতিগ্রাম ) ফিরিয়া আসিলাম। আরো দুই দিন এইরূপ হইয়াছে। তৎপর বালাসুর গ্রামে এক বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া দেখিলাম এই পণ্ডিত মহাশয়গণ ( এস্থলে বক্তা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইতে লাগিলেন ) আমার সেই শিষ্যদের সহিত আহার করিতে বসিয়াছেন। পোড়া কপাল! আমিও বসিয়া গেলাম। মহারাজ! তিন দিন অভুক্ত রহিলাম, আমার শিষ্যও আমাকে ছাড়িয়া গেল; শেষে এই পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে পরের বাড়ীতে সেই শিষ্য লইয়া পংক্তিভোজন করিলাম! এই দুঃখের কথা কাহাকে বলি ?'

যাহা হউক বিপন্নের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দেখিয়া উদ্যোক্তাগণ একটুক নরম হইলেন। শেষে প্রস্তাবটি যে আকারে গৃহীত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে উভয়মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের এক কমিটি গঠিত হইবে। তাঁহারা যে মীমাংসা করেন, তাহাই গৃহীত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের নিষ্পত্তি প্রকাশের পূর্বে বিক্রমপুরবাসীগণ বিলাতফেরতদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীশবাবুকে নিজমতের পোষকতার বক্তৃতা করিতে দেন নাই; শ্রীশবাবুর মতাবলম্বী অল্প কাহাকেও মুখ খুলিতেও দেন নাই। সভাপতি মহাশয়

বলেন শ্রীশবাবু একাকী প্রতিবাদী আছেন, একথা লিপিবদ্ধ হইবে। অমনি চারিদিক হইতে 'আমরা প্রতিবাদী, আমরা প্রতিবাদী' এই ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যাহারা প্রতিবাদী আছেন, তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রতিবাদকারীর তালিকায় লিখিত আছে।

রাজা বাহাদুর, গ্রামসুন্দর বাবু প্রভৃতি কাহাকেও বিলাত যাওয়ার বিরোধী দেখিলাম না; এমন কি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মনোমোহন বাবু প্রভৃতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন বিলাত গিয়া শিক্ষালাভ কর, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু দেশে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র-বাসরূপ সুখটুকু পরিত্যাগ কর; সমাজের বাহিরে বাস কর। অর্থাৎ, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।" তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের যুবকদের মধ্যে কি এমন স্বার্থত্যাগী নাই যে দেশের জন্ত বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এই সুখটুকু পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বাস করিয়া স্বদেশের সেবা করিতে পারে?' হিন্দুজাতি ধর্ম্মগতপ্রাণ, একথা বাল্যকাল হইতে শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়াছে। যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ হয় তবে মনোমোহন বাবু প্রভৃতি বিলাত যাইতে ব্যবস্থা দেন কি প্রকারে? আর যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ না হয়, তবে বিলাত-প্রত্যাগতগণ কেন সমাজে গৃহীত হইবেন না? বিলাত যাওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু বিলাত-প্রত্যাগতের সমাজে গৃহীত হওয়া দোষ, মনোমোহন বাবু প্রভৃতির এই ব্যবস্থার রহস্তোদ্ভেদ কে করিবে? ইহা ডিপ্লোম্যাসি হইতে পারে। কিন্তু ইহা ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণোচিতও নহে।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা সম্ভব কি? বিক্রমপুরে বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর 'চল' হইতেছেন, এই প্রত্যক্ষ সত্যটাও কি মুদিতনয়ন সম্মিলনের-উদ্যোক্তাগণ দেখিবেন না? মুকবধির-বিদ্যালয়ের যামিনী বাবুর গৃহে হাসাড়া, ডেওটশালী প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ প্রকাশ্যভাবে পংক্তি-ভোজন করিয়াছেন এবং যামিনী বাবুর কন্যাগণ হিন্দুসমাজে বিবাহিত হইয়াছেন।

সোনারঙ্গের বৈদ্যগণ মুন্সীগঞ্জের উকিল বাবু রত্নেশ্বর সেনের বিলাত-প্রত্যাগত পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রকে চল করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের অগ্রতম উকিল বাবু উমেশচন্দ্র দাসের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাস, আমেরিকা হইতে আসিয়া দীর্ঘকাল মুন্সীগঞ্জে উমেশবাবুর গৃহে বাস করিয়াছিলেন; অথচ উমেশবাবুর গৃহে মুন্সীগঞ্জের আত্রাঙ্গণ সকলে রত্নেশ্বর বাবুকে লইয়া আহার করিয়াছেন। সম্প্রতি মালখানগরের সুপ্রসিদ্ধ বাবুগণ প্রকাশ্যভাবে বিলাত-প্রত্যাগতের সহিত আহার করিয়াছেন। শুনিয়াছি বঙ্গযোগিনীতেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

ওধু তাহাই নহে। বিক্রমপুর হইতে প্রতি বৎসর সর্বজাতীয় বহু যুবক আজকাল সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আজ বিক্রমপুরের পণ্ডিতের পুত্র পর্য্যন্ত বিলাত প্রবাসী। যে-সকল দীর্ঘশিষ্য ব্রাহ্মণপ্রবর স্বীকৃতক্লে সন্মিলনে ব্রাহ্মণের গৌরব ঘোষণায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবারস্থ যুবকগণও প্রধানতঃ অর্থাভাবে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তাহাও আমরা অনবগত নহি। আর ঐ যুবকদের পিতা, পিতৃবা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিও যে তাঁহাদের বিদেশগমনে নিতান্ত নারাজ তাহাও নহে। তবে কথাটা এই যে নিজপুত্র অর্থাভাবে বা মেধাহীনতা বশতঃ যদি ব্যারিষ্টারীর অযোগ্য হয়, তবে প্রতিবেশীর পুত্র ব্যারিষ্টার হইলে তাহা কেমন করিয়া সহ করা যায়? একদা কোন ব্যবহারাজীব ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'যতদিন নিজ পরিবারের কেহ বিলাত না যায়, ততদিন কিছুতেই বিলাত যাওয়ার সমর্থন করিব না।' এবারকার সন্মিলনের গতিও আমাদের নিকট এইভাবে প্রসূতই বোধ হইল।

যাহা হউক উপরে আমরা যে-সকল তীব্র সমালোচনা করিলাম, তাহা সত্ত্বেও পুনরায় বলিতেছি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন বস্তুতঃই নিরতিশয় সার্থকনাম হইয়াছিল। সন্মিলন আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেস ইত্যাদিতে দেহি দেহি রবে গগন বিদীর্ণ করিয়াও আমরা আমাদের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ উন্নতি সাধন করিতে পারি নাই; প্রকৃত লক্ষ্য

ও গন্তব্য পন্থাও নিশ্চয় করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের নেতৃত্বেও কংগ্রেস ও তদ্বৎ সভাসমূহ ভারতীয় প্রকৃতি-পুঞ্জকে প্রত্যক্ষভাবে স্বকীয় পতাকাওলে সাজিত করিতে পারে নাই। আর আজ পূর্ববঙ্গের নগণ্যস্থান মুন্সীগঞ্জের অজ্ঞাতনামা ও ক্ষুদ্রশক্তি সামান্য কয়েকজন উকিল মোক্তারের আস্থানে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রবদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন, আর ব্রাহ্মণের বর্ণসমূহ তাঁহাদের নিজেদের কণ্ঠের স্বীকৃতির শব্দের জল উদ্‌গীর হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ও আশার কথা আর কি হইতে পারে? যাহারা জীবনে কদাপি স্ব স্ব পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহির্ভূত কোন বিষয়ের কোন তত্ত্ব রাখেন না, আজ তাঁহারা ব্রাহ্মণসভার আস্থানে সমাজের মঙ্গললোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। ব্রাহ্মণসভা আত্মনিবন্ধকে সমাজনিষ্ঠ করিবার উপায় সন্ধান হইতেছে।

স্বল্পদর্শী সমাজনায়কের পক্ষে ইহা অতি শুভ মুহূর্ত্ত। ব্রাহ্মণসন্মিলনের নামমাহাত্ম্যের স্রাবলক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ এবং তৎ সহ সমগ্র বঙ্গসমাজের উন্নতি বিধানের এই প্রশস্ত সময় ও উপায়। ব্রাহ্মণ সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কংগ্রেসে বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঞ্চায় ব্রাহ্মণসভায় একজন সুদক্ষ ও স্বার্থত্যাগী নেতার আবির্ভাব হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে সংবিধান ও সুপরিচালনা দ্বারা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সোপান নিৰ্ম্মাণ করিতে পারিবেন।

এবার মহাসম্মিলনে কলিকাতা, বীরভূম, ও মৈমনসিংহ হইতে তদ্বৎ স্থানে আগামী অধিবেশনের জল নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। আগামী শীতঋতুতে কলিকাতায় মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপে বঙ্গের প্রত্যেক জেলা বা বিক্রমপুরের ঞ্চায় প্রধান প্রধান পরগণার বিভিন্ন গ্রামে প্রতি বৎসর একটা স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সভা ও বিভিন্ন জেলার সদরে বা অগ্র প্রধান প্রধান স্থানে প্রতিবৎসর সমগ্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের একটা মহাসম্মিলন অধিবেশিত হইলে অচিরকালমধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বঙ্গসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণসভা এ পর্যন্ত রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া চলিয়াছেন, পরিণামেও তদ্রূপই চলিবেন; অতীথা ব্রাহ্মণসভার হিতকারিতা বিনষ্ট হইবে।

স্বার্থের হিসাবেও ব্রাহ্মণগণের মহাসম্মিলন রক্ষা ও পুষ্ট করা কর্তব্য। বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভার অনতিদীর্ঘ জীবনকালেই আমরা দেখিতেছি কায়স্থ, সুবর্ণবণিক এবং অন্ত্যজ জাতি সমূহের অনেক সামাজিক প্রণয়ের মীমাংসার ব্রাহ্মণসভার প্রতি অপিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণগণের গৌরব বটে।

ইদানীং আমরা নিম্নবর্ণসমূহের উন্নতি চিন্তা করিতেছি। যদি তাহারা ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন হইতে অনুকূল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে অতি সহজে অনেক জটিল সামাজিক সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারিবে; নমঃশূদ্রগণের গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় আমরাদিগকে আর ভীত করিতে পারিবে না। কিন্তু মহাসম্মিলন ব্যতীত ব্যাঙগত ভাবে কোন ব্রাহ্মণই এই-সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম নহেন।

উপসংহারে আমরা ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের উদ্যোগাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই-তেছি। মুন্সীগঞ্জের যে-সকল উকিল মোক্তার প্রথম ব্রাহ্মণসভা আরম্ভ করেন, তাহারাও আমাদের হৃদ্যগত ধন্যবাদের পাত্র। ব্রাহ্মণসভার সুদূরগামী হিতকারিতা তাহারাই আমরাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবান্ তাহাদের হস্ত দ্বারা স্বীয় কার্য সাধন করিতেছেন।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

উকিল,

ঈশ্বরদাস লেন, ঢাকা।

## সতীন

( গল্প )

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে-কোলে পূজা দিবার মানত করিয়া, মাছুলি কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া, নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইল না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিয়া গুনিয়া

স্বামীর আর একটি বিবাহ দিল। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর সংসার মানায়!

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তখন সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর যে স্বামী তাহার ছিল, যাহার জীবনের সতিত তাহার সুখ দুঃখ জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই স্বামীকে নৃত্যকালী হাসিমুখে প্রশান্ত মনে তরঙ্গিনীকে দান করিয়া, সেই নবীন দম্পতির সেবা ও যত্নের ভার গ্রহণ করিল। নৃত্যকালী তরঙ্গিনীকে ছোট বোনটির মতন যত্ন করে, স্বখীর মতো তরঙ্গিনীকে প্রণয়ের দীক্ষা দেয়, নবযৌবনা তরঙ্গিনীর বৃদ্ধ স্বামীকে লইয়া রঙ্গ রসিকতা করে, তাহাদের দুজনের নূতন প্রণয়ের ভাবলীলা ও কুষ্ঠিত গোপন মিলন-প্রয়াস দেখিয়া কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করে।

তরঙ্গিনীও বাপের বাড়ী হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিদির যত্ন মমতায় একদিনের তরেও মুখ মলিন করিবার অবসর পায় নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্যকালী তাহাকে “দিদি আমার, বোনটি আমার, লক্ষ্মী আমার” বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া বার বার বিবিধ সামগ্রী খাওয়ায়; সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহার নিজের হাতে বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচ বার পাঁচ রকম করিয়া সাজায়; নৃত্যকালী নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিয়া, আলতা পরাইয়া, তরঙ্গিনীকে জেদ করিয়া জোর করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয়।

সংসারের এতটুকু কাজও তরঙ্গিনীকে করিতে হয় না। সংসারের সমস্ত সেবা ও কর্মের ভার নৃত্যকালীর; হাসি আনন্দ ও সন্তোগের জন্মই যেন তরঙ্গিনীর জীবন।

তাহার পর যখন তরঙ্গিনীর সন্তান-সন্তাবনা হইল তখন নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাহার এত দিনের সাধ এইবার তরঙ্গিনী হইতে পূর্ণ হইবে। সে একটি সোনার চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার ঘর সংসার উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিনীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া রাখে, অনুরাগ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে



টিক টিক করিয়া বেড়ায়, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজর না লাগে ; স্ব-ভালাভালি দুজন দুর্গাই হইয়া গেলে সে বাঁচে । তরঙ্গিনী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে বা এঘর ওঘর করিবার সময় মাথায় একটা খড়কুটা জুঁজিয়া না রাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিনীকে বলে—পেটের কাঁটাটা আমার কোলে একবার ফেলে দে, তারপর তোর যা খুসি তাই করিস, আমি আর তোকে স্তখন কিছু বলব না ।

যেদিন তরঙ্গিনী প্রসবেদনায় কাতর হইয়া নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি, আর আমি বাঁচব না।—সেদিন নৃত্যকালীও সুখে ও দুঃখে তাহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিল। এই বেদনার ভিতর দিয়া তাহাদের উভয়ের মাতৃহ আঙ্গ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে ।

তরঙ্গিনীর একটি পুত্রসন্তান হইল। নৃত্যকালী সেই ঝাঁতুড় ঘরেই একরাশ করবীফুলের মতো শাদা ধবধবে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রু-সজল হাসিমুখে তরঙ্গিনীকে বলিল—তরি, দেখ দেখ, আমার কেমন খোকা হয়েছে !

তরঙ্গিনী সুখের গর্জতরা হাসিমুখে বলিল—দিদি, খোকা ত তোমারই !

সেই দিন হইতে নৃত্যকালীর কাজ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এতদিন সে একটি বন্ধ খোকা ও একটি তরুণী খুকিকে পরম যত্ন ও আত্নহে মাহুষ করিতেছিল, এখন আর একটি নূতন শিশু খোকার ভার তাহার উপর পড়িল। খোকাকে তেল-মাখানো, সেক দেওয়া, নাও-য়ানো, ধোয়ানো, দুধখাওয়ানো, কাজল-পরানো সমস্ত তাহারই ভার। খোকা সমস্ত দিনরাত তাহারই কাছে থাকে, একএকবার কেবল মাই দিবার জন্ত সে খোকাকে

জ্বলীর কোলে দেয়। তখন তরঙ্গিনী হাসিয়া বলে—দিদি, তোমার খোকাকে আমি মাই দেবো কেন ?

নৃত্যকালী সুখের হাসিতে দুঃখ ঢালিয়া দিয়া বলে—কি করব বোন, বিধাতা আমায় বঞ্চিত করেছেন ! নইলে কি আমি তোকে এ কষ্টটুকুও দিতাম ! আমায় বিধাতা

দুধ দেন নি, তাই তোকে আমার খোকার দুধমা রেখেছি !

নৃত্যকালীর স্বামী একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিল—খোকাকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে ? আমাদের দিকেও একটু দেখো ?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তোমায় দেখবার জন্তে ত তরিকে এনে দিয়েছি।

স্বামী লজ্জিত হইয়া প্রশ্রুণ করিল।

তরঙ্গিনী একদিন হাসিয়া বলিল—দিদি, খোকা হয়ে অবধি তুমি আর আমার খোঁজও কর না, যে, তরি মরুল কি বাঁচল !

নৃত্যকালী তরঙ্গিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলি চূষন করিয়া বলিল—ঘাট ঘাট, অমন কথা মুখে আনতে আছে ! তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের সুখ ! তুই আমাকে সোনারটাদ খোকা দিয়েছিস, আমাদের এই গাঁটকুড়ো নিরানন্দ সংসারে হাসি এনেছিস ! তুই যে আমার ছোট বোন তরি ! তোর ঘরসংসার তুই এখন চিনে শুনে নে—চিরকাল কি দিদির হাততোলা নিয়ে থাকবি ? আমায় ছুটি দে, আমি আর সংসারের কেউ নই, আমি আর খোকা এখন দুজনে মিলে খেলা করবার ছুটি নিয়েছি, কাজ করবার অবসর এখন আর আমার নেই। আমি দেখতে শুনতে পারিনে, তুই এখন সব দেখ শোন। নিজের শরীরের যত্ন করিস, আর যে বুড়োটাকে তোর হাতে দিয়েছি, সেটাকেও একটু যত্ন করিস।

তরঙ্গিনী লজ্জিত হইয়া বলিল—না দিদি, সে আমি পারব না। তোমার কাজ আমি করতে যাব কেন ? তুমি আমায় না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না !

তরঙ্গিনীকে আবার চিবুক স্পর্শ করিয়া চূষন করিয়া নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তুই এখন বড়সড় হয়েছিস, এখনও দিদির হাততোলা হয়ে থাকলে লোকে বলবে কি ? বলবে, তোর ঘরসংসার আমি তোকে ঠকিয়ে দখল করে বসে আছি। •

তরঙ্গিনী দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া নৃত্যকালীর দিকে

তাকাইয়া বলিল—দিদি, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি ! ফের ওরকম কথা বললে আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করব কিন্তু বলে রাখছি ।

বলিতে বলিতেই তরঙ্গিনীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অভিমান গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ।

নৃত্যকালী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গালে কপালে চুঘন করিয়া সজল চোখে হাসিয়া বলিল—ছি পাগলী, এই তুচ্ছ কথায় কাঁদিলি !

তরঙ্গিনী নৃত্যকালীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-বাধিত স্বরে বলিল—কেন তুমি আমাকে অমন কথা বললে ? বল আর কখনো বলবে না !

নৃত্যকালী তরঙ্গিনীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর । আমি আর কখনো বলব না । কিন্তু কখনো যদি তোর সংসারের ভার হাতে নেবার ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে আমায় বলতে লজ্জা করিস নে । তুই বলবা মাস্তুর তোর ঘরকন্না তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে একপাশ হব । কেবল খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিসনে ।

তরঙ্গিনী অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া নৃত্যকালীর দিকে বেদনাতুরা কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দিদি, আবার ঐ কথা ! আমি যে তোমার ভালোবাসায় কেনা দাসী ! আমাকে ও সব কী বলছ ?

নৃত্যকালী তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—তুই আমার বোন, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই আমার খোকার দুধমা ! তোকে আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি । তবু কথাটা বলে রাখলাম !

এমনিতর সুখের মিলনে হাসি আনন্দে তাহাদের তিনটি প্রাণীর সংসার একটি শিশুকে ঘিরিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল । খোকা দিনে দিনে তাহার নব নব আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়া সংসারটিকে আনন্দে হাসিতে সুখে ভরিয়া তুলিতে লাগিল ।

খোকার যখন বছর দেড়েক বয়স ; যখন সে চারটি ধবধবে সাদা দুধের দাঁত বাহির করিয়া নৃত্যকালীকে বলে—জি, এবং তরঙ্গিনীকে তা-তি বলিয়া ডাকে ;

যখন সে দুধ খাইতে ও কাজল পরিতে বিষম আপত্তি জানাইতে শিখিয়াছে ; এবং যখন সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের শিশি-বোতল ভাঙিয়া মধু ও তেল একত্র মিশাইয়া পেটে মাথায় মাখিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছে ; তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্যকালী দালানে বসিয়া খোকার সহিত চাঁদামামার পরিচয় করিয়া দিতেছিল এবং চাঁদামামাকে খোকার কপালে একটি টি দিয়া যাইবার জন্ত ধান ভানিলে কুঁড়ো, মাছ কুটিলে মূড়ো, ও উড়কি ধানের মূড়কির মোয়া দিবার লোভ দেখাইতেছিল ; খোকা তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত হুখানি বিস্তারিত করিয়া কচি কলার ছড়ার মতো আঙুলগুলি ঘন সঞ্চালিত করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিতেছিল—আ আ চি !—এবং একএকবার মাতা নৃত্যকালীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—জি ! চি !—আরবার তরঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—তা-তি ! চি !

এমন সময় উঠান হইতে কে একজন রমণী বলিয়া উঠিল—গেরস্তুরা বাড়ী আছ গো ?

নৃত্যকালী বলিল—কে গা ?

আগন্তুক রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—আমরা কুটুম গো !

নৃত্যকালী তরঙ্গিনীকে বলিল—তরি, দেখ ত কে ?

তরঙ্গিনী উঠিয়া দালানের ধারে গিয়াই বলিয়া উঠিল—ওমা, বামা যে ! তুই কোথেকে এলি ?

বামা হাসিয়া গলায় আঁচলের খুঁটটা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এইচি ।

তরঙ্গিনী বলিল—মাসিমার সঙ্গে ! কৈ মাসিমা কোথায় ?

বামা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—মা ঠাকরুণ, কৈ গো, এস না গো ।

আর একটি রমণীমূর্তি অন্ধকার আবছায়া হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল । তরঙ্গিনী তাড়াতাড়ি দালান হইতে উঠানে নামিয়া গিয়া দ্বিতীয় রমণীর পদধূলি লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—দিদি, আমার মাসিমা এসেছেন

নৃত্যকালী খোকাকে কোলে করিয়া দালানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তরঙ্গিনীর আহ্বানে উঠানে নামিয়া গিয়া তরঙ্গিনীর মাসিমার পদধূলি লইয়া বলিল—  
এস মা এস !

মাসিমা নৃত্যকালীকে লক্ষ্য না করিয়াই তরঙ্গিনীকে বলিল—তরু, এই বুঝি তোর খোকা ?

এই প্রশ্নে তরঙ্গিনীর কেমন লজ্জা বোধ হইল। খোকা কেবল তাহার, এ কথা সে নৃত্যকালীর সম্মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? খোকা যে তাহার অপেক্ষা তাহার দিদিরই বেশি, ইহাও বা সে কেমন করিয়া একজন আগন্তুক বাহিরের লোককে বুঝাইবে? তাহারা দুই সতীন স্নেহ ও সখিহের যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া নিরুপদবে খোকাকে লইয়া আনন্দে আছে তাহার মধ্যে একজন অপর লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তরঙ্গিনীর মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তি বোধ হইল। তরঙ্গিনীর মনে হইল তাহারা বেশ ছিল, তাহাদের এই সুখনৌড়ের মধ্যে তাহার মাসিমা কেন আসিয়া পড়িল, তাহার মাসিমা কি তাহাদের ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে? তরঙ্গিনী আর মাসিমার দিকে চাহিতে পারিল না। সে কোনো কথা না বলিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া রহিল।

মাসিমা এই সলজ্জ নীরবতা তরঙ্গিনীর নব মাতৃহের লক্ষণ মনে করিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে বলিল—  
এস দাদা বাবু, এস !

খোকা দুইহাতে নৃত্যকালীর বুকের ও পিঠের কাপড় মুঠি করিয়া ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যকালীর বুকের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া লাগিয়া গিয়া বলিল—জি, ভ !

নৃত্যকালী খোকাকে একটু ঠেলিয়া মাসিমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, যাও ! উনি দিদিমা !

খোকা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—ভ !

বামা একমুখ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—আমার ঠেঞে এসবে খোকাবাবু ?

খোকা তেমনি ভাবে নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভ ! ভ !

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—অচেনা লোকের কাছে যায় না বুঝি ? এই নেও দাদামণি দেখ !

মাসিমা দুটি টাকা বাহির করিয়া খোকার সম্মুখে ধরিল। খোকা টাকা লইতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল—ভ ! ভ !

তখন নৃত্যকালী তরঙ্গিনীকে বলিল—তরি, তুই নে ত ! তোর কাছে গিয়ে যদি মাসিমার কাছে যায়।

তরঙ্গিনী হাত পাঁতল।

খোকা নৃত্যকালীকে জড়াইয়া থাকিয়াই তরঙ্গিনীকে বলিল—তা-তি, ভ !

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া তরঙ্গিনীকে বলিল—তরু, তোর ছেলে ও বাছা আমার কাছে আসবে না। এই নে তোর বেটাকে সন্দেহ কিনি খাওয়াস। মিষ্টিমুখ হ'লে যদি আমায় মিষ্টি চোখে দেখে !

তরঙ্গিনী একবার নৃত্যকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

নৃত্যকালী বলিল—আবার টাকা কেন মাসিমা ! পায়ের ধুলো দিয়ে অমনি আশীর্বাদ কর, আমাদের এই কত দুঃখের ওঁড়োটুকু বেঁচে থাক ! খোকা আমার কোল কাছে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ বাপু, ও মুখই দেখতে পাচ্ছে না। এস দালানে এস। তরি, একখানা কিছু পেতে দে বসতে।

মাসিমা নৃত্যকালীর কোনো কথায় সাড়া না দিয়া তরঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—জামাই কোথায়, ওদিকে জামাই নেই ত ?

মাসিমা যে নৃত্যকালীর সহিত কথা কহিতেছে না ইহা তরঙ্গিনীর মোটেই ভালো লাগিতেনি। কাজেই সেও মাসিমার কোনো কথায় জবাব দিতে পারিতেনি না।

নৃত্যকালী বলিল—না, উনি বাড়ীতে নেই। এস মাসিমা। তরি, মাসিমার পা ধোবার জল দে, ওর গরদ-খানা দে। মাসিমা কাপড় ছেড়ে জপ করে নিন, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে জলখাবার করে আনি।

তরঙ্গিনী মাসিমার কাছ হইতে সরিয়া পড়বার সুযোগ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু যখন নৃত্যকালী জলখাবার আনিতে গেল তখন তরঙ্গিনীকে একাকী তাহার মাসিমার কাছে থাকিতে হইল। ইহাতে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মাসিমা বলিল—তরু, ঐ নাকি তোর সতীন ?

সতীন শব্দটা তরঙ্গিনীর কানে বাজিল। সে মুহূর্ত্তে বলিল—উনিই দিদি।

—তোকে খুব কষ্ট দ্যায় দেখছি।

তরঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—না মাসিমা, দিদি আমায় খুব ভালো বাসেন।

মাসিমা বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল—আ নেকি, তুই তেমনি নেকিই আছিস এখনো! একটা মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যাস! মিছরীর ছুরী মুখে মিষ্টি লাগে বলে মনে করিস যে বুকে যখন বেঁধে তখনও তেমনি মিষ্টি লাগে? ঐ বুঝি তোর ভালোবাসা। এসে বাড়ীতে পা দিতেই ত বুঝতে পারছি, তুই বাড়ীর দাসী, আর বাড়ীর গিন্নি ঐ ডাইনি মাগী! তরি যা পা ধোবার জল দে, তরি যা কাপড় দে, তরি যা বসতে দে! আর, আমি যাই জলখাবার দি! তুই দাসীর খাটনা খেটে মরবি, কিন্তু সংসারটি ওর মুঠোর ভেতর! তোর সংসারে তুই পরের হাততোলায় কেমন করে আছিস! আমরা হ'লে ত একদণ্ড থাকতে পারতাম না!

তরঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—এর আর হাততোলা থাকি কি? দিদি যদি অযত্ন করতেন ত কষ্ট হ'ত। দিদি নিজে না খেয়ে আমায় খাওয়ান, নিজে না পরে আমায় পরান, দিদি আমার ছেলেকে মায়ের বাড়ী যত্ন করেন!

মাসিমা হাসিয়া বলিল—ওরে তাইত কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তারে বলে ডা'ন! ঐ ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে নিয়াস! ছেলেকে অত গাওটো করচে কেন তাও বুঝি বুঝতে পারিসনে হাবা মেয়ে! ছেলে ওর গাওটো হ'লে তোকে নাথি কাঁটা কোস্তা বাড়ন মারলেও তুই ওর কিছু করতে পারবিনে; ছেলের জন্তে তোকে সব সয়ে থাকতে হবে। ছোটো মিষ্টি

কথা আর লোক-দেখানো আস্তি, এই দেখেই তুই ভুলেছিস! সতীন সম্পর্ক কি কখনো ভালো হয়রে নেকি! শক্ত হ, শক্ত হ, এখনো সময় আছে, ছেলেটাকে ডাইনীর মায়া থেকে বাঁচা! কথায় না বলে, বাঁকার আস্তি বাঘিনীর পথি! তাতে এ আবার বাঁকা সতীন!

তরঙ্গিনী লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার মাসিমাকে কেমন করিয়া বলিবে যে, যেদিন হইতে সে এবাড়ীতে আসিয়াছে সেই দিন হইতে স্বামী সম্পূর্ণ তাহার, দিদি তাহার সতীন নয়। তরঙ্গিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—দেখি জলখাবার হ'ল কি না।

মাসিমা খুসি হইয়া বলিল—হ্যাঁ, নিজের ঘরকন্না নিজে দেখ শোন, এই ত চাই!

তরঙ্গিনী মনে করিল সতীন সম্পর্কটা বড় খারাপ, সহজেই গোকে ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া বসে। মাসিমা দুদিন থাকিলেই বুঝিতে পারিবে দিদি তাহার কেমন মানুষ!

দুদিন ছাড়িয়া চারদিন গেল, মাসিমার ধারণার কোনো পরিবর্তন সে বুঝিতে পারিল না। মাসিমা ও তাহার সহচরী বামা নিরন্তর তাহার কানে বিষ উদ্ভারণই করিতেছে।

তরঙ্গিনী অতিষ্ঠ হইয়া একদিন নৃত্যকালীকে বলিল—দিদি, ওরা কবে যাবে? যোগ ফোগ ত চুকে বুকে গেল; আর কতদিন গঙ্গা নাইতে হ'বে?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—কেন তরি, মাসিমা দুদিন আছেন তাতে তুই বাজার হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিনী নৃত্যকালীর হাসির সঙ্গে হাসিতে পারিল না। সে গভীর ভাবে বলিল—না দিদি, আমরা দুটিতে নিরিবিলি বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এক যোগ নয়ত গোলযোগ এসে জুটল! দিদি, পাজি পাঁজিগুলো এত গোলযোগও বাধাতে জানে!

নৃত্যকালী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। মাসিমা শুনতে পেলে কি ভাববেন? তোর বাড়ীতে ত আর ওঁরা চিরকাল থাকতে আসেন নি। তুই অত বাস্ত হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিনী কেমন করিয়া বলিবে সে কেন বাস্তব হইতেছে। তাহার যে দুঃখ তাহা সহিবারও নয় বলিবারও নয়। তরঙ্গিনী বলিল—বাস্তব হব না? খোঁকা হয়ে অবধি তুমি আমায় আগের মতন যত্ন কর না; তার ওপর মাসিমা এসে ততোমায় একদণ্ড কাছে পাওয়াই ভার হয়েছে। তুমি আর কারু বেশি যত্ন করলে আমার বড় রাগ হয়।

• নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্ত চূষন করিয়া বলিল—হিংসুটে, ভয় নেই রে ভয় নেই, তোমার দিদিকে তুমি না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইহার পর তরঙ্গিনী নৃত্যকালীকে আর কিছু বলিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া মাসিমার কাছে বসিয়া বলিল—মাসিমা, তুমি কবে বাড়ী যাবে?

—বাড়ী ত শিগগির যাওয়া দরকার। বাড়ীতে সব 'অবিলি' করে' ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছি ইঁদুরে ঝাঁদরে কি করছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোমার ঘর-কন্নারও ত একটা বিলিবন্দেজ না দেখে আমি গড়তে পারছি।

—আমার ঘরকন্নার বিলিবন্দেজ আমি করে নেব; তার জগে তোমার ঘরকনা অবিলি করে থাকতে হবে না মাসিমা।

—কেন, আমাকে তুমি তাড়াতে পারলে যে বাঁচিস দেখছি!

তরঙ্গিনী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না তা কেন। তবে জামাইবাড়ী এতদিন এসে আছ, আমার ভারি লজ্জা করছে।

—জামাই কি কিছু বলেছে?

—না।

—তবে ঐ ডাইনী মাগী কিছু বলেছে বুঝি! যাই দেখি একবার মাগীর ধুকুড়ী ধুয়ে দিয়ে আসি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি কি তার বাপের বাড়ীতে এসেছি?—এ আমার আপনার বোনঝির বাড়ী! খুব করব আসব! একবার কেন একশ বার আসব! কোথায় সেই শতকথোয়ারী হারামজাদী মাগী!

তরঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ মাসিমা, কি কর? দিদি কিছু বলে নি।

বামা হাসিয়া পরম বিজ্ঞ ভাবে বলিল—মুখে না বলুক, মনে মনে বলেছে। গুণ করে' নিজের মনের কথাটা অ্যার মনে চালান করে দিইচে।

মাসিমা বলিল—বামা, আজকে ত শনিবার আছে। আজ সকালবেলা তোর সেই জলপড়াটা তরুকে দিস ত। খণ টুন গুণো কেটে যাবে।

বামা বলিল—তাই খেয়ো দিদিমাণ, তাই খেয়ো। বড় জ্বর জলপড়া। এ আমাদের গায়ের বিন্দে হাড়ি তুষ্টু গয়লাকে শাখিয়েছিল; তার ঠেঙে মোর শিক্কে। এর ফল পেরশক্ষ হাতে হাতে দেপে নিয়ো। যেমন জলটুকু খাবে অমান এক এগুক হিম হয়ে যাবে, প্রাণডা যেন জড়াবে। আর যে নোক গুণ ওষুধ করেছে তাকে একেবারে বিষ নজরে দেখবে।

দিনের পর দিন অহরহ ও অনুক্ষণ এইরূপ মস্ত জপ শুনিতে শুনিতে ক্রমশ তরঙ্গিনীর মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সতাই ত সতীন তাহাকে কেন ভালো-বাসিবে, সতীনকে কি কখনো ভালো বাসা যায়? যে স্বামীর ভাগ কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে ভালো বাসা কি সোজা কথা? আর একজন মেয়ে যদি নোলক পরিয়া আসিয়া মল বাজাইয়া এখন তাহার স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসে তবে কি তরঙ্গিনী তাহাকে একদণ্ডও বরদাস্ত করিতে পারে? সে তাহাকে নখে টিপিয়া মারিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়! নিজের ছেলে হয় নাই বলিয়া নৃত্যকালী তরঙ্গিনীকে ঘরে আনিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ছেলেটি দখল করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে। ছেলে হওয়ার পর হইতে নৃত্যকালী ত বাস্তবিকই তাহাকে আর তেমন যত্ন করে না, তাহার খাওয়া পরা সন্ধে আগের মতো খোঁজ খবর লয় না। সমস্ত সংসার তাহার মুঠার ভিতর, সে হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তরঙ্গিনীর। পাছে তরঙ্গিনী নিজের সংসার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লয় তাই তাহাকে নৃত্যকালী সংসারের একখানা কুটা ভাঙিয়া ছুঁখানা করিতে দেয় না। তরঙ্গিনীকে একটিও কাজ করিতে না দিয়া নৃত্যকালী যে একাই খাটিয়া মরে, ইহা

ত তাহার মমতা নহে, পূরাদম্বর স্বার্থপরতা ! তরঙ্গিনীকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিবার ফন্দি ! সমস্তর না হোক, সে অর্দ্ধেকের ভাগী ত ? অর্দ্ধেকেরই বা কেন ? নৃত্যকালীকে অশ্রদ্ধা করিয়া ত্যাগ করিয়াই না তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছে ? তাহার স্বামীর যে পুত্রধনের অভাব নৃত্যকালী হইতে মিটে নাই তাহা সেই না মিটাইয়াছে ? সমস্ত তাহার—স্বামী তাহার, খোকা তাহার, ঘরকন্যা তাহার ! অথচ তাহার যেন কিছুই নয়—স্বামী যেন নৃত্যকালীর দয়ার দান, খোকা বাজেয়াপ্ত, ঘরকন্যা বেদখল ! ইহার প্রতিকার তাহাকে করিতেই হইবে।

এত কথা তরঙ্গিনী নিজে গুছাইয়া মনে ভাবিতে পারে নাই। তাহার মাসিমা ও মাসিমার সহচরী বামা বিনাইয়া বিনাইয়া গুছাইয়া গুছাইয়া তাহার মনের সম্মুখে এই-সমস্ত কথা দিনের পর দিন সাজাইয়া ধরিতেছিল।

তরঙ্গিনী মুখ ভার করিয়া থাকে। নৃত্যকালী যদি জিজ্ঞাসা করে—তরি, তোর হ'ল কি ? অমন করে থাকিস কেন ?

তরঙ্গিনী বলে—না, কিছু ত হয়নি। শরীরটা ভালো নেই।

প্রথম প্রথম নৃত্যকালী মনে করিত যে মাসিমা এতদিন আছে বলিয়া বোধ হয় তরঙ্গিনী কুণ্ঠিত ও বিরক্ত হইতেছে। কিন্তু সে অল্প লক্ষ্য করিয়াই বুঝিল যে তাহার অনুমান যথার্থ নয় ; এখন তরঙ্গিনী সদাসর্বদাই তাহার মাসিমার কাছে কাছেই থাকে ; তিনজনে মিলিয়া সর্বদাই ফিসফিস গুজগুজ হয়, নৃত্যকালীকে দেখিলেই চুপ করে। নৃত্যকালী বুঝিল যে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু সে তরঙ্গিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

তরঙ্গিনীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে নৃত্যকালী এতদিন তাহাকে নিছক ঠকাইয়া আসিয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার নিজের হাতে না লইলে নয়। তখন তাহার মনে পড়িল যে নৃত্যকালী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল যে যেদিন তাহার ইচ্ছা হইবে মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে সংসার হইতে সরিয়া যাইবে।

তরঙ্গিনী আশ্তে আশ্তে গিয়া নৃত্যকালীর কাছে বসিল। নৃত্যকালী একবার তাহার গন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তরি, এতদিনে দিদিকে মনে পড়ল ? এখন আর দিদির কাছে থাকতে ভাল লাগে না, না ?

তরঙ্গিনী বা হাতের বালা ডান হাত দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—দিদি, ভাঁড়ার-ঘরের আর সিন্দূকের চাবিগুলো আমাকে দাও।

নৃত্যকালী তাহার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বলিল—কেন, কি নিবি ?

তরঙ্গিনী মাথা নত করিয়া বলিল—কিছু নেব না।

—তবে ?

—চাবিগুলো আমার কাছেই রাখব।

—তা হ'লে সংসার থেকে আমায় এতদিনে ছুটি দিচ্ছিস ?

—হ্যাঁ।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিনীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—আঃ ! বাচলাম তরি ! তোর ঘরকন্যা তোরই ত দেখা উচিত। এই নে চাবি। কিন্তু খোকাকে কেড়ে নিসনে, লক্ষ্মী বোন আমার !

নৃত্যকালীর চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তরঙ্গিনী সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িল। সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল—তরি, চাবি যে পড়ে রইল !

তরঙ্গিনী বলিল—না দিদি, চাবি আমার চাইনে। ও তোমারই থাক।

কোথা হইতে মাসিমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চাবিগুলি হস্তগত করিয়া বলিল—তরু, বড় মেয়ে তোকে চাবি দিচ্ছে, নে। কেমন মেয়ে বাছা, বড় মেয়ে চাবি রাখবে না, তুই রাখবি নে, ত রাখবে কে ? থাক তবু আমারই কাছে।

মাসিমা চাবিগুলি লইয়া তরঙ্গিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল। নৃত্যকালী অবাক হইয়া মাসিমার গমন-পথের দিকে চাহিয়া ধসিয়া রহিল।

মাসিমা গিয়া তরঙ্গিনীকে ভৎসনা করিয়া বলিল—  
শাকা মেয়ে কোথাকার! ডাইনী চোখের মায়া-কান্না  
দেখে অমনি পড়ে' গেলেন! ভাগিস আমি কাছাকাছি  
ছিলাম!

বামা বলিল—সব ত লিলে, কিন্তু মাগীর প্যাটরাটা  
ত দেখলেনি। ঐটার মধ্যে ও সব লুকিয়ে রেখে  
দিইচে।

মাসিমা বলিল—ভালো বলেছিস বামা! দেখ তরু,  
মাগীর প্যাটরা একবার খুলে দেখে নিগে যা।

তরঙ্গিনী জোরে ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—সে  
আমাকে দিয়ে হবে না মাসিমা।

—তবে আমি বলিগে।

—না মাসিমা, খবরদার ও রকম করে' দিদিকে  
অপমান করলে আমি মাথায় কাটারী মেরে রক্তগঙ্গা হব।

মাসিমা অমনি নাকি কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন—  
ওমা, কি সব্বনেশে কথা বলিস তরু! যার জন্মে চুরি করি  
সেই বলে চোর! কি জবর ডাইনী ও মাগী! তোকে  
একেবারে বশ করে' ভেড়া করে রেখেছে! তোর যা-খুসি  
করগে যা; কালকে আমি বাড়ী চলে যাব। কেন রে  
ধাপু নিজের সব বইয়ে ছইয়ে পরের জন্মে বুকের রক্ত জল  
করা!

মাসিমা ক্রমশ ফৌস ফৌস করিতে করিতে চক্ষে  
অশ্রু আরোপ করিল। বামাও চোখ মুছিতে লাগিল।

তরঙ্গিনী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একটিও  
সাস্তনার কথা বলিল না।

পরদিন মাসিমার বাড়ী যাইবার কোনো উদ্যোগই  
দেখা গেল না। বরং উন্টা মাসিমা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি  
হাতে পাইয়া সংসারের বিলি বন্দেজ করিতে মনঃসংযোগ  
করিল। রোজ দুখ লওয়া হয় দুই সের এক সের খোকা  
খায়, আধ সের খোকার বাবা খায়, বাকি আধসের  
নৃত্যকালী ও তরঙ্গিনী খাইত। মাসিমা আসার পর  
নৃত্যকালীর ছুধের ভাগ মাসিমার বরাদ্দ হইয়াছিল। সেই  
বরাদ্দই কায়েমি হইয়া গেল। রাত্রে সকলেই লুচি  
খাইত; এখন নৃত্যকালীর জন্ম ভাতের বরাদ্দ হইল—  
এয়োত্রী মাহুষের ছবেলা ভাত খাওয়াই ত উচিত!

মাসিমা বিধবা মাহুষ তাহার লুচি ত না খাইলেই নয়।  
বছরে চারখানা কাপড়ের বেশি কেনা বাজে খরচ, ফোতো  
নবাবী—নৃত্যকালীর বাস্তবতা কাপড় আছে, পুজার সময়  
তাহার আর নূতন কাপড় কেনার দরকার নাই। নৃত্য-  
কালী দোক্তা খায় বলিয়া তাহার পানের খরচ বেশি—  
নেশা ভাঙ যাহার করিতে হয় সে নিজের খরচে করুক,  
সংসার হইতে সে বাজে খরচের জন্ম পয়সা কেন পাইবে?  
বাড়ীতে দুজন দাসী ছিল, একজন সংসারের ঘরকন্নার  
কাজ করিত, আর একজন দুই বৌএর কাজ করিত—  
এখন একজন ঘরকন্নার কাজ করিয়াই ছুটি পায় না,  
অপরজন তরঙ্গিনীর কাজ করিয়া মাসিমার বাতে তেল  
মালিশ করিয়া ও মাথার পাকা চূণ তুলিয়া সময়  
পায় না।

নৃত্যকালী কিন্তু হাসিমুখেই এ-সমস্ত সহ করিতেছিল;  
সে একদিনে দোক্তা আর পান খাওয়া ছাড়াইয়া দিল;  
নিজের কাপড় সে নিজে কাচে; অশ্রু দানও সে  
হাসিমুখে গ্রহণ করে। কেহ তাহাকে কাজ করিতে  
দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে—বাড়ীতে দুটি বৈ  
ত কি নেই, কুঁচ মাহুষ বাড়ীতে, পাছে তাঁদের কষ্ট হয়  
তাই ঝিয়েদের ওঁদের কাছে কাছেই থাকতে বলে'  
দিয়েছি।

এইরূপ বিলি বন্দেজ করিয়া মাসিমা যখন দেখিল যে  
নৃত্যকালী কোনো আপত্তি তুলিল না, জামাইয়ের কানেও  
এ কথা উঠিল না, তখন সে সাহস পাইয়া তরঙ্গিনীর  
কানে মন্ত্রজপ করিতে শুরু করিয়া দিল—দেখ তরু তুই  
কি ভাবছিস জানিনে, আমি তোরই ভালোর জন্মে  
সংসারের খরচ কমিয়ে আনছি—যে ছপয়সা বাঁচবে সে  
তোরই, আমার কি বলনা! কিন্তু মাগী কি সয়তান,  
টু শব্দটি করছে না! ও কি তুকতাক করবার মতলবে  
আছে। তোর সোয়ামীর কাছে তোর যে আদর সে  
তোর খোকার জন্মেই না? নইলে ও হ'ল গিয়ে ওর  
সময়ের বৌ, ওর ওপর সোয়ামীর যতখানি টান হবে  
ততখানি কিছু আর তোর ওপর হবে না। এখন খোকার  
কোনো রকম ভালো মন্দ করতে পারলেই ওর মনস্বামনা  
সিদ্ধ হয়। এখন খোকাকে ত ওর ত্রিসীমানায় যেতে

দেওয়া ঠিক হবে না। দেখিসনে খোকাকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে হাঁ করে' কেমন তাকিয়ে থাকে।

তরঙ্গিনীর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বাস্তবিক ত সে দেখিয়াছে নৃত্যকালী খোকাকে সামনে বসাইয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখে। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—অমন করে' তাকিয়ে থাকলে কি হয় ?

বামা বলিল—বুকের রক্ত শুষে লেয় গো বুকের রক্ত শুষে লেয় ! মস্তুর পড়ে' সাত দিন তাকালেই হাতি মালট খায়, ও ত একরত্তি বাচ্চা ! আমাদের গাঁয়ের ইচ্ছে বুড়ী অমনি করে' আমার ভাসুর-পোর পেরাণ্ডা শুষে খেয়েছিল—না গা মা ঠাকরুণ, তুমি ত সব জান !

মাসিমা মুখ অত্যন্ত স্নান করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ মা জানি বলেই ত ভাবনা ! কিন্তু তরু ত কথা শুনবে না। জামাইকে বলে' ওকে এক্ফুনি বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেওয়া উচিত !

মাসিমার অবিশ্রাম মস্ত জপে তরঙ্গিনীর মন নৃত্য-কালীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেও সে একবার ঝাঁকিতে-ছিল, একএকবার দিদির প্রাণ-ঢালা স্নেহ স্বরণ করিয়া সমস্ত বিরূপ ভাব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু যখন তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে তাহার সৌভাগ্যের নিদান বুক-চেরা ধন খোকাকে প্রাণে মারিবার জন্ত নৃত্যকালী চেষ্টায় আছে, তখন তরঙ্গিনীর মন নৃত্যকালীকে একেবারে বিষের মত বোধ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তরঙ্গিনী স্বামীকে গিয়া বলিল—ওগো শুনেছ, বড় গিল্লি আমার খোকাকে রোজ তুক করে .....

নৃত্যকালী কিছু না বলিলেও তাহার স্বামী অল্পমানে বুকিতে পারিতেছিল যে মাসিমার ব্যবহার নৃত্যকালীর প্রতি বিশেষ হৃদ্য ত নহেই, বরং নৃত্যকালী যেন কিছু উৎপীড়িত হইতেছে। মাসিমা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের সুখের সংসারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে তরঙ্গিনীর স্বামী তরঙ্গিনীর উপরও একটু বিরক্ত হইয়াই ছিল, মনে করিতেছিল সেই বোধ হয় মাসিমাকে ধরিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাই এখন তরঙ্গিনীকে নৃত্যকালীর নামে লাগাইতে শুনিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া রাগ

করিয়া বলিয়া উঠিল—যাও যাও যাও, ওসব দোটলোকের মতন কথা শুনতে চাইনে। ও বুকের রক্ত জল করে' তোমার ছেলে মানুষ করেছে কিনা, তার এই পুরস্কার ! কে তোমাকে এসব শেখাচ্ছে ? আগে ত তুমি এমন খোলো ছিলে না। ফের ও রকম কথা মুখে আনলে ঝাড়ে মূলে সবাইকে একদিনে একসঙ্গে দূর করে' দেবো !

সূত্রপাতেই স্বামীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া তরঙ্গিনী কাঁদিয়া গিয়া মাসিমার কাছে পড়িল। মাসিমা সব শুনিয়া বলিল—এ-সমস্তই ঐ ডাইনী মাগীর খেলা ; ও মস্তুর পড়ে' তোর ওপরে জামাইয়ের মন ঢটিয়ে নিচ্ছে। হয় নয় তুই ভেবে দেখ—জামাই কি কখনো তোকে এমন করে' একদিনও বকেছে ?

তরঙ্গিনী দেখিল, সত্যই ত, স্বামী শুধু সোহাগই করিয়াছে, তিরস্কার আজ এই প্রথম এবং অভি অকস্মাৎ ! তখন তরঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাইত মাসিমা, তবে কি হবে ?

মাসিমা গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি ত বাচ্চা কবে থেকে পয় পয় করে বলছি যে বিষদাঁত চেপে বসবার আগে সাবধান হ। এখন ও কামড়ে ধরেছে—তোর কপাল ভাঙতে আর দেরি নেই। সোয়ামীর মন কেড়ে নিলে, ছেলে কেড়ে নিলে, তোর আর থাকল কি ! আহা ছেলে নয়ত যেন রাজপুস্তুর ! রোগে ভোগে মরে, সহ হয়, এ আলটপকা গিলে খাবে গা !

সর্বনাশের সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিয়া তরঙ্গিনী কাঁদিয়া মাসিমার পায়ে পড়িয়া বলিল—মাসিমা, আমার খোকাকে তুমি বাঁচাও !

মাসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাঁচাই আর কেমন করে' মা—মাগীর চোখের আড়াল না করলে শিবের সাধ্য নেই যে বাঁচায়। একেবারে মক্খম কামড় কামড়েছে ! ছেলে দিনকের দিন একেবারে নীলমূর্ত্তি হয়ে উঠছে দেখছিস নে ?

তরঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তবে মাসিমা আমি খোকাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই চল।

মাসিমা হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মা, তাতেই কি নিস্তার আছে ! খোকার নাড়ী পৌঁতা যে



এখানে! নাড়ীর টানে ঐ প্রাণপুরুষকে টেনে বার করে আনবে!

তরঙ্গিনী ভয়ে একেবারে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া বলিল—  
মাসিমা তবে উপায়?

—উপায় এক-মাস্তুর ঐ মাগীকে সরানো।

—কেমন করে' সরাব? ওঁকে বলতে গেলাম...

বামা বলিয়া উঠিল—লা লা, অমন করে' লয়। ডাই-  
নৌকে কি অমন করে' সরায়? তুক তরিবৎ করে' সরাতে  
হয়।

তরঙ্গিনী শাস্ত হইয়া বলিল—তুই কিছু জানিস বামা?

বামা ঘাড় কাত করিয়া আতার বৌচির মতো মিশ-  
দেওয়া কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিল—  
হিঁ! তেরো'স্পর্শ দিনে তেমাথা পথের ওপর ঘেঁটকল  
আর নিষ্কিষ্বী দিয়ে ঘেঁটঠাকরণের পূজো করতে  
হবে; উপোষ করে তরসকোবেলা ঠিক যেই একটি তারা  
উঠেছে অমনি একটা আফলা শিমুল গাছের কাছে  
এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাতটা পাতা তুলতে হবে, আর  
মস্তুর বলতে হবে—

শিমুল, শিমুল, শিমুল!

শত শতুর নিশূল!

আঠায় কাঁটায় ভরা গা,

শত শতুরের মাথা খা!

আঠায় আঁটো

কাঁটায় বেঁধো,

যে আমার স্কন্ধ শতুরতাই সাধে

তার সঙ্গে শতুরতাই সেধো!

তারপর সেই সাতটি পতুর মাথায় করে নিয়ে গিয়ে  
উলুঙ্গ হয়ে জলে যমের ছয়োর দক্ষিণমুখো হয়ে একটা  
ডুব দিতে হবে। পাতা সাতটি ভেসে উঠলেই বুঝবে যে  
নিষ্কিষ্বী হয়েছে; আর, একটি পাতাও যদি মাথায় লেগে  
থাকে তবে বুঝবে যে কামড় তখনো ছাড়ে নি!

মাসিমা তাড়াতাড়ি বলিল—তোমার সেই পাগলাকালীর  
ওঁড়োটা তরুকে দিস না? যতবড়ই ডাইনী হোক, মা-  
কালীর কাছে ত অ্যুর বড়াই খাটবে না?

বামা বলিল—হ্যা দ্যাখ! ডাকিনী যোগিনী হল গে

মা-কালীর দাসী, মা-কালীর কাছে তাদের আবার  
বড়াই কি? বড়িড মনে করেছ মাঠাকরণ! সেই ওঁড়োর  
একরত্তি দিলেই যত বড় ডাইনি হোক চোখ উন্টে পড়-  
তেই হবে। সে ওঁড়ো কি আমি কম কষ্টে জোগাড় করে-  
ছি? গয়েসপুরের কালীর মোহন্তকে এক বোতল মদ  
দিয়ে ছিদাম মোড়ল এনোছিল—বল্লে না পেতায় যাবে,  
অমাবসোর রাতে চাঁড়ালের মাথার খুলিতে চিতার  
আঙুনে মদ দিয়ে ঐ ওষুধ তৈরি! ওর কি কম মাহিস্তির!

এই বলিয়া বামা করজোড়ে উদ্দেশে কি জানি  
কাহাকে প্রণাম করিল। দেখা-দোখ মাসিমাও প্রণাম  
করিল। ভয়ে ভয়ে তরঙ্গিনীও করিল।

তরঙ্গিনী বলিল—সে কি ওঁড়ো? বিষ টিষ নয় ত?

বামা বলিল—আরে রাম রাম! বিষ লয়, বিষ লয়।  
মা-কালীর পেরসাদ, চরণধূলি!

স্তির হইয়া গেল বামার উপদেশ অনুসারে তরঙ্গিনী  
নৃত্যকালী ডাইনাকে ঝাড়াইয়া ভিটেছাড়া করিবে।

একাদশার দিন সমস্ত তুকতাক করিয়া তরঙ্গিনী এক  
বাটি ছুধের সঙ্গে একটা শাদা ওঁড়ো মিশাইয়া রাখিল।  
রাতে নৃত্যকালীকে খাইতে দিবে, সকালে সে চক্ষু  
উন্টাইয়া পড়িয়া থাকিবে। তরঙ্গিনী বার বার করিয়া  
জিজ্ঞাসা করিল—হ্যা বামা, ও বিষ টিষ নয় ত?

বামা বলিল—বিষ কেনে হবেক গো? আমরা কি  
মানুষ খুন করি?

তরঙ্গিনী ভয়ে বিবর্ণ মুখে বলিল—দেখিস বামা, হিত  
করতে যেন বিপরীত না হয়।

বামা জোর দিয়া বলিল—লা গো লা, তোমার  
কিছু ভয় লেই।

সন্ধ্যার পর নৃত্যকালী রান্নাঘরে খোকার ছুধ  
আনিতে গেল। তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেখিয়াই  
তরঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, কি নেবে?

—খোকার ছুধ।

—খোকার ছুধ ঐ ক্ষিতুরে বাটিতে আছে। ঐ সর-  
কুলে বাটির ছুধ নিয়ে না যেন, ও ছুধ তোমার জন্যে  
আছে।

নৃত্যকালী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিল—আমার  
জন্মে! আমি কি ছুধ খাই?

তরঙ্গিনী খতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—  
মাসিমার আজ একাদশী কিনা, তাই একটু রেখেছি।

নৃত্যকালী আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া দু-  
বাটির দুধ এক করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল।

তরঙ্গিনী দেখিল যে নৃত্যকালী জগন্নাথী বাটিতেই  
দুধ লইয়া গেল। কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া  
উঠিল। সেই শাদা গুঁড়ো মা-কালীর চরণরেণু বলিয়া  
এতক্ষণ মনকে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, ভুলক্রমে  
খোকার তাহা খাওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া তরঙ্গিনী ব্যস্ত  
ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই শাদা গুঁড়া যে বিষ, ইহা  
এখন সে নিজের মনের কাছে কিছুই অস্বীকার  
করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল সাদা গুঁড়া  
মিশাইয়াছিল সরফুলে বাটিতেই ত ঠিক? শ্রী-  
ক্ষেত্রের বাটিতে ত নয়? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত  
গোলমাল ঠেকিতে লাগিল—একবার মনে হয় শ্রীক্ষেত্রের  
বাটিতে গুঁড়া মিশাইয়াছে, একবার মনে হয় সরফুলে  
বাটিতে। সে ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে যে বাটি আছে  
তাহাতে আঙুল দিয়া দেখিতে গেল তলায় গুঁড়া  
খিতাইয়া আছে কি না। বাটিতে আঙুল দিতেই দেখিল  
বাটিতে দুধ নাই, বাটির তলায় গুঁড়া কিচকিচ করি-  
তেছে! তরঙ্গিনী একেবারে পাগলের মতো হইয়া  
ঝড়ের বেগে ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার  
করিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি দিদি, ও দুধ খোকাকে  
খাইয়ো না, খোকাকে ও দুধ খাইয়ো না!

তরঙ্গিনী দালানে উঠিয়া দেখিল নৃত্যকালী খোকাকে  
ঝিনুকু করিয়া দুধ খাওয়াইতেছে। তরঙ্গিনী বাঘিনীর  
মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একহাতে নৃত্যকালীর হাত  
চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে বাটি তুলিয়া এক নিশ্বাসে  
সমস্ত দুধটা নিজে খাইয়া ফেলিয়া বাটিটা দূরে আছড়াইয়া  
ফেলিয়া দিল।

নৃত্যকালী হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে বলিল—আ মর  
পোড়ারমুখী, তুই দিনকের দিন পাগল হচ্ছিস নাকি,  
ছেলের দুধটা খেয়ে ফেলি, আমি এখন খোকাকে কি  
খাওয়াই বল ত?

এতক্ষণে তরঙ্গিনী নিশ্বাস লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া

কাঁদিয়া উঠিয়া নৃত্যকালীর পা ধরিয়া বলিল—দিদিগো,  
সয়তানীদের কথা শুনে হুধে আমি বিষ দিয়েছিলাম  
তোমায় খাওয়াব বলে। তার ফল আমি হাতে হাতে  
পেলাম। দিদি, তোমার খোকাকে তুমি বাঁচাও।

নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি খোকার গলায় আঙুল দিতেই  
খোকা যে দু ঝিনুক দুধ খাইয়াছিল তুলিয়া ফেলিল।  
সুস্থ সবল খোকা অল্পক্ষণ একটু অবসন্ন হইয়া থাকিয়া  
চাঙ্গ হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাভারের চেষ্টাতেও তরঙ্গিনী  
বাঁচিল না। তরঙ্গিনী অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পড়িতেও  
ক্ষীণকণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, খোকা  
বাঁচবে?

নৃত্যকালী তরঙ্গিনীর ভূমিহুষ্ঠিত মস্তক কোলে  
তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাঁচবে তরি  
বাঁচবে। তুইও ঝেঁচে উঠে তোর খোকাকে তুই নে, আমি  
আর তোর খোকার ভাগ নেব না।

তরঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—  
আঃ! দিদি, তোমার খোকা, তোমারই রইল! আমার  
অপরাধ ক্ষমা করো! পায়ের ধুলো দেও দিদি! এক-  
বার ওঁকে ডাক, পায়ের ধুলো নেব!

এমন সময় মাসিমা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া আসিয়া  
পড়িল—ওরে তরু রে, এ কি সর্বনাশ হল রে!

তরঙ্গিনী নৃত্যকালীর দিকে বিষাবিষ্ট ম্লান দৃষ্টি ফিরা-  
ইয়া বলিল—আঃ দিদি! ওদের এখান থেকে দূর করে  
দাও!

চক্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## কীটজীবনী

কতকগুলি পোকা আমাদের ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি  
করে; বহু আয়াসে জমি প্রস্তুতের পর উপযুক্ত সার  
প্রয়োগ করিয়া, বিশ্বাসযোগ্য স্থানের বীজ বপন করিয়া  
অনেক কৃষককে পরে হতাশ হইতে হয়; কোথা হইতে  
পালে পালে পোকা আসিয়া ফসলকে একেবারে নষ্ট  
করিয়া ফেলে এবং কৃষকগণ জমিদারের খাজনা দেওয়া  
তদূরের কথা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পোকার উৎপত্তি



প্রজাপতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

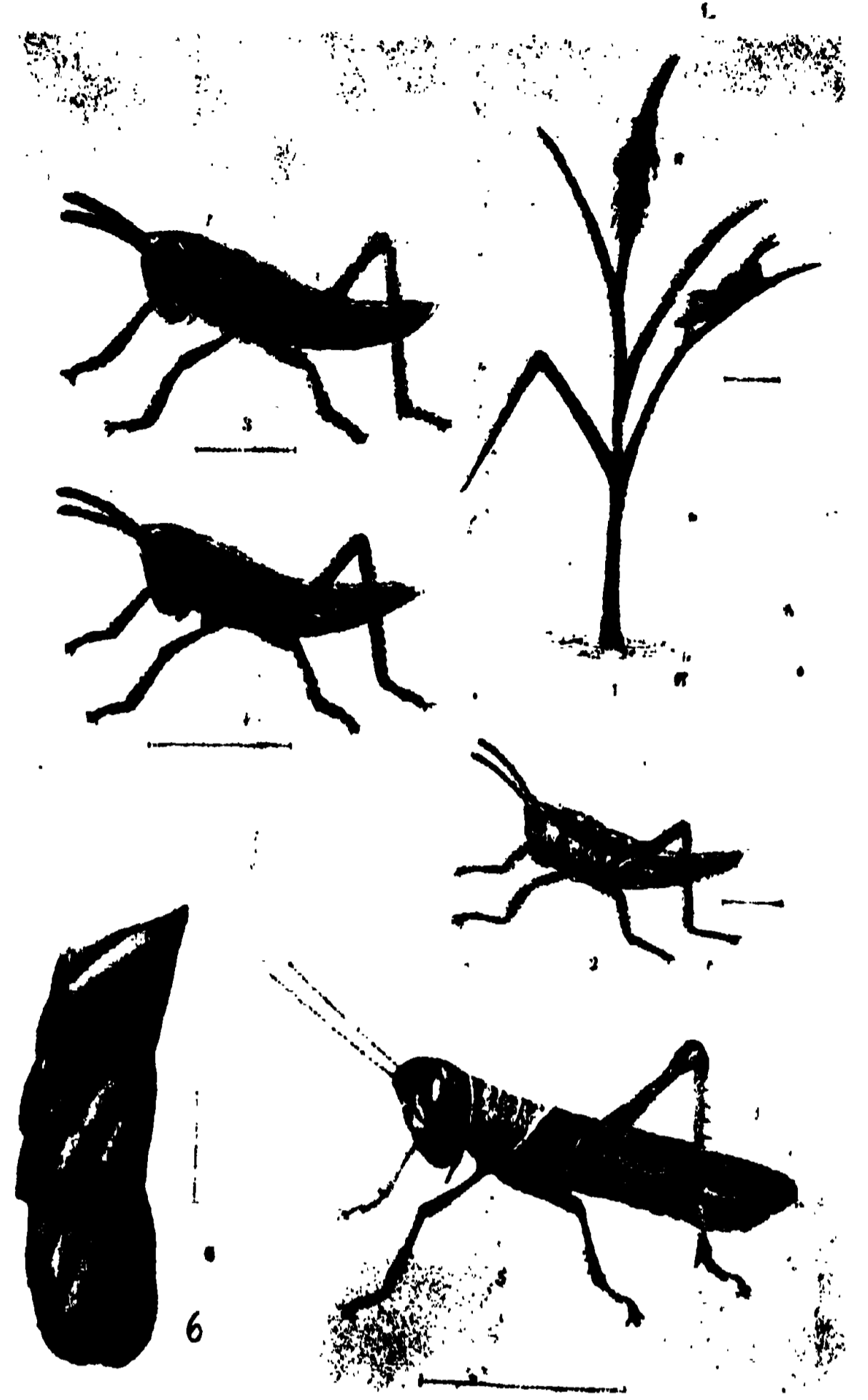
- ১—পাতার উপর ডিম। ২—একটি ডিম বর্ধিতাকার। ৩—কীড়া  
পাতা খাইতেছে। ৪—কীড়ার বর্ধিত অবস্থা। ৫—কীড়ার  
পুত্তলি হইবার পূর্বাৱস্থা। ৬—পুত্তলি। ৭—পুত্তলি  
হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গিয়াছে।  
৮ ও ৯—প্রজাপতি।

সম্বন্ধে আমাদের কৃষকদিগের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার আছে এবং ইহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়া এইরূপ বন্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে কীট নিবারণের পরীক্ষিত উপায়গুলি তাহারা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করে না। এইরূপ কুসংস্কার থাকাতে কৃষকেরা ফসলের পোকা নিবারণের জন্ত সময়ে সময়ে যে সকল অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে তাহা একেবারে অনর্থক, এবং উহা কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কৃষকের ধারণা যে কোন প্রকার উচ্চ জমিতে চাষ করিবার সময় যদি

উহাতে একটি ভাঁটগাছের ডাল রবিবার সকালে পুঁতিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ জমির ফসলে কখনও উই লাগবে না। এইরূপ কুসংস্কারের সংখ্যা এত প্রচুর যে উহা এখানে তালিকাভুক্ত করিয়া এই প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার অনেকের ধারণা এই যে ঝড়ের সঙ্গে পোকা আসে কিম্বা মাটি অথবা আকাশ হইতে পোকার উৎপত্তি হয়। কীটজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনভিজ্ঞতাই এইরূপ কুসংস্কারের প্রধান কারণ। সারাচর আমরা যে ভূমিপোকা দেখিতে পাই তাহার জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করিতে চান না। কীটজীবনী অতি অদ্ভুত, এবং গৃহপালিত অথ কোন প্রাণীর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। বর্তমান প্রবন্ধে (Sepidoptera) প্রজাপতি ও (Orthoptera) কাঁড়ংএর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বাখ্যা করিয়া কীটজীবনী বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রজাপতির জীবনে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে— ইহা চতুর্জন্ম। ডিম, কীড়া, পুত্তলি ও পতঙ্গ। পাখীর মত জ্ঞানপ্রজাপতিও ভিন্ন পাড়িয়া থাকে—ইহার ডিম ছোট ছোট, ও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, ভিন্ন পাড়িবার ধরণও অন্তরূপ; ছোট ছোট ডিমগুলি পাতা কিম্বা ফুলের উপর একএকটি করিয়া পাড়িয়া যায়। অনেক ডিম এত ছোট যে শুধু-চোখে দেখাই অসম্ভব। পাখীরা ডিমকে কিম্বা ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে উহা-দিগকে যেরূপ যত্ন করে প্রজাপতির তাহার কিছুই করে না এবং উহাদের জন্ত খাওয়ারও কোনও ব্যবস্থা রাখে না। গাছের ডালে পাতায় ফুলে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। তবে এরূপ স্থানে ডিম পাড়ে যে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা যেন অন্যায়সে খাদ্য পাইতে পারে। কীড়া ডিম হইতে বাহির হইয়াই কচিপাতা কিম্বা গাছের তিতরের শাঁস খাইতে আরম্ভ করে এবং অপরিমিত পরিমাণে খাইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই বর্ধিত হইয়া উঠে; কীড়ার আকৃতিতে মায়ের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য থাকে না; মায়ের জায় ইহার ডানা কিম্বা শুঁড় (Proboscis) কিছুই

থাকে না, মোটে উড়িতে পারে না। ইহার ৫ হইতে ৮ জোড়া পা থাকে ; ৮ জোড়া পায়ের মধ্যে মাথার নিকটস্থ তিনজোড়া পায়ের গিরা আছে। দেহের মধ্যস্থলের ৪ জোড়া ও লেজের কাছে এক জোড়া পা আছে—এই ৫ জোড়া পায়ের সাহায্যেই ইহারা চলিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ কীড়ার দেহই মসৃণ, কোন কোন কীড়ার গায়ে লোম আছে, এবং ইহাদিগকেই আমরা শুঁয়াপোকা বলিয়া থাকি। শুঁয়াপোকা সকলেই দেখিয়াছেন, ইহার আকৃতির বিশদ বিবরণ দিবার আবশ্যিক নাই। কিছুদিন খাইয়া কীড়া প্রথম খোলস (moult) ছাড়ে এবং পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং আকৃতিরও বিভিন্নতা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত কীড়া সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কিছুকাল অন্তর অন্তর খোলস ছাড়ে ; ৫৬ বার খোলস ছাড়িবার পরই ইহার পূর্ণাবস্থা আসে। প্রত্যেক খোলস-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীড়ার রং ও আকৃতির বিশেষ প্রভেদ হয়। কীড়া অবস্থাতেই ইহা ফসলের ক্ষতি করে। শেষ খোলস ছাড়ার পরই কীড়াটা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং ২৩ দিন পরেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি অবস্থায় কিছুই খায় না এবং চূপ করিয়া নড়ন-চড়ন-রহিত হইয়া থাকে। এখন পাতার উপর নিজের মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া তাহার সহিত পিছনকার পা জড়াইয়া নীচের দিকে মাথা করিয়া ঝুলিতে থাকে ; কোন কোন পোকা মাটির নীচে গুটি প্রস্তুত করে। কীড়ার এই পরিবর্তিত আকৃতিকে পুত্তলি কহে। এখন ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখ চোখ প্রভৃতি স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল বায়ুপথ (spiracles) দৃষ্ট হয়। পুত্তলি ডিম্বাকার ও নানাবিধ রংএর হইয়া থাকে। অল্পদিন পরে পুত্তলি হইতে একটা প্রজাপতি বাহির হয় ; ইহা কিয়ৎক্ষণ মন্দ গতিতে চলিয়া বেড়ায়, পরে বড় বড় ডানা বর্দ্ধিত, বিস্তৃত ও দৃঢ় হইয়া উঠে। প্রজাপতির চারিটা বড় বড় ডানা ও ছয়টা পা আছে। কীড়ার ঞায় কামড়াইবার মুখ নাই, ইহার পরিবর্তে দীর্ঘ শুঁড় আছে ; এই শুঁড়ের সাহায্যেই ইহারা ফুলের মধু চুমিয়া খায় এবং তাহাই প্রজাপতির



ফড়িংএর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

- ১—পাতার উপর সদ্যপ্রসূত ফড়িং। ২—ফড়িংএর প্রথমাবস্থা।  
 ৩, ৪—ফড়িংএর দ্বিতীয় অবস্থা। ৫—পরিণতবয়স্ক ফড়িং।  
 ৬—ডিম্ব-সমষ্টি (আবরণসহ)। [ চিত্রগুলি পুষার চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। ]

খাদ্য। প্রজাপতির দেহে লোম আছে, ইহার ডানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইসে ঢাকা। ইহাই কীড়ার পতঙ্গ অবস্থা ; এই অবস্থাতেই পোকা পরিণত হইল এবং এখন স্ত্রী-পতঙ্গ ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতেই পুনরায় কীড়া বাহির হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে চতুর্জন্ম পোকার চারি জন্মের অবস্থার আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ডিমের সহিত কীড়ার আকারের কোন মিল নাই, কীড়ার সহিত পুত্তলির ও পুত্তলির সহিত পতঙ্গের আকারের কোনও সাদৃশ্য নাই। প্রজাপতি, মশা, মাছি, ধামসা পোকা, চেলে পোকা, সাপের মাসিপিসি, মৌমাছি, বোলতা, পিপড়ে, শসাকুমড়ার হলদে পোকা

ইত্যাদি চতুর্ভুজ। প্রথম চিত্রে প্রজাপতির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে।

সকল প্রকার কীটের জীবনবৃত্তান্ত ঠিক প্রজাপতির মত নহে। অত্যাণ্ড কীটের জীবনে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা ফড়িংএর জীবন আলোচনা করিলে কতকটা বোধগম্য হইবে। স্ত্রী-ফড়িং মাটির উপর কিম্বা নীচে একস্থানে রাশীকৃতভাবে অনেকগুলি ডিম প্রসব করিয়া তাহার অঙ্কণ পরেই মরিয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে এই ডিম হইতে ছোট ছানা (nymph) বাহির হয়। ইহা আকারে ডিমের দ্বিগুণ হইয়া থাকে এবং বেশ কার্যাত্মক (active) হয়। ইহার সাধারণ আকৃতি মায়ের মতই হয়, লম্বা লম্বা পা এবং পিছনের পা দুইটা খুব দীর্ঘ হয় এবং পূর্ণাবয়ব ফড়িংএর গায় মস্তক ও তাহাতে দুইটা শৃং (Antennae) ও মুখ প্রভৃতি সমুদায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে ইহার ডানা থাকে না, সুতরাং ইহা কেবল লাফাইতেই পারে, উড়িতে পারে না। এই সময় গায়ের রংও বেশ পরিষ্কার থাকে। বড় ফড়িংএর গায় ইহা গাছের ডাঁটা ও পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। প্রজাপতির কীড়ার গায় ইহাও খোলস ছাড়ে এবং প্রত্যেক খোলস-পরিবর্তনের পর ইহা আকৃতিতে পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রংএরও বদল হয়। চতুর্থবার খোলস ছাড়িবার পর দেহের উপরি-ভাগে, বক্ষের (thorax) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের (segment) উপর দুইটা গোলাকার অংশ (lobes) দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পর প্রত্যেক খোলস-পরিবর্তনের সঙ্গে এই গোলাকার অংশ দুইটা কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে ষষ্ঠ বা সপ্তমবার খোলস ছাড়িবার পর পূর্ণায়তন ডানার আকার ধারণ করে—ইহার জননেন্দ্রিয়ও এই সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই ফড়িংএর পরিণত অবস্থা (adult stage), এখন ইহা আর খোলস ছাড়ে না। অল্প কিছুদিন পরেই স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে, আবার ডিম হইতে ছোট ফড়িং বাহির হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ফড়িংএর জীবন প্রজাপতির জীবন হইতে বিভিন্ন এবং ইহা ত্রিজন্য। ত্রিজন্য পোকার পুস্তলি-অবস্থা নাই। ডিম

হইতে বাহির হইলেই ছানা মায়ের মত দেখিতে হয়, ইহার মা যেরূপভাবে আহার করে ইহাও ঠিক সেই প্রকারে খায়, বস্তুতঃ ইহার জীবন মায়ের জীবনেরই অনুরূপ; ইহা সকল সময়েই খাইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ ফড়িং ক্রমশঃ বর্দ্ধি পাইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রজাপতির জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যায়। গজা ফড়িং, আরম্বলা, উচ্চিংড়ে, গাক্কি, ভোমাপোকা ইত্যাদি ত্রিজন্য। দ্বিতীয় চিত্রে ফড়িংএর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে।

পোকা সমস্ত বৎসর ধারণা তাহার বংশ বর্দ্ধি করিতে পারে না। প্রধানতঃ তিনটা কারণ ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, যথা, শীতের প্রাচুর্য, অর্থাৎ উত্তাপ, ও খাদ্যের অভাব। দেখা গিয়াছে যে অধিক সংখ্যক পোকের শীতকালে কাম্পপটুতা থাকে না এবং তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পোকের এই নিশ্চল অবস্থার নাম নিদ্রাবস্থা (hibernation)। পোকের নিদ্রার কোনও সাধারণ (universal) নিয়ম নাই। কোন কোন পোকের শীতকালেই বংশবর্দ্ধি হয়, এই সময়েই ইহারা খাইয়া বৎসরের অবশিষ্ট কাল নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। পোকা কতকাল নিদ্রা যাইবে তাহা স্থানীয় জল-বায়ু, খাদ্য, ও পোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কোন শ্রেণীর পোকা একস্থানে নিদ্রিত থাকে, আবার অপর স্থানে সেই শ্রেণীরই পোকা ফসলের সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। পোকেরা ডিম, কীড়া, পুস্তলি ও পতঙ্গ অবস্থাতে নিদ্রা যাইতে পারে। পোকের নিদ্রা সম্বন্ধে সঠিক করিয়া এখন অধিক কিছু বলা যায় না। কীট-তত্ত্ববিদেরা ইহার বহু অন্তসন্ধান ও গবেষণা করিতেছেন।

ক্রমিকলেজ, }  
সাবোর, ভাগলপুর } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

## আলোচনা

### ভোজবর্ষার তান্ত্রশাসন।

ডিসেম্বর মাসের "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় আমি হরিবর্ষার তান্ত্রশাসন, ভবদেবের প্রশস্তি, শ্যামলবর্ষার তান্ত্রশাসন, ভোজবর্ষার তান্ত্রশাসন এবং বলজী গ্রন্থের সাহায্যে "বঙ্গে বর্ষা রাজবংশের"

ইতিহাস উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর চাহিয়াছেন। পুরাতন সম্বন্ধে বত বাদ প্রতিবাদ হয়, ততই প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের পথ পরিষ্কৃত হয়।

বঙ্গের বর্ষা রাজবংশের যে তিনগানি তান্ত্রশাসনের সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে নবাববৃত্ত ভোজবর্ষার তান্ত্রশাসন প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি নাই। ঈশ্বরদাস তান্ত্রশাসনখানির অধিকাংশই অগ্নিদাহে নষ্ট হওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যানুসন্ধান মহাশয় যথাসাধ্য ইহার একটী পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। রাখাল বাবু নাকি এই পাঠ তান্ত্রশাসনের সহিত মিল করিয়া দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবুর সমস্ত পাঠ তান্ত্রশাসনে নাই। তান্ত্রশাসন পাঠে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাখাল বাবুর বিস্তৃত পাঠ কোন কাগজে প্রকাশ হইয়াছে কি না আমি জানি না, তজ্জন্মই নগেন্দ্র বাবুর পাঠের উপর নির্ভর করিয়াছি। আশা কর রাখাল বাবু তাঁহার সংশোধিত পাঠ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ইতিহাস আলোচনার সুবিধা করিয়া দিবেন।

শ্রামলবর্ষার তান্ত্রশাসনখানি পাওয়া যায় নাই। নগেন্দ্র বাবু ২০০ বৎসরের হস্তলিখিত বৈদিক কুলপঞ্জিকায় ইহার অনুলিপি পাইয়াছেন। একে এই তান্ত্রশাসন কেহ দেখে নাই, তাহাতে আবার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবার অযোগ্য কুলপঞ্জিকায় তাহার অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাই রাখাল বাবু এই তান্ত্রশাসনের পাঠ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে “এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেন বংশীয় বিশ্বরূপের তান্ত্রশাসনের পাঠ দেখিলেই সহজে জানিতে পারা যায় যে, উভয়ই এক ছাঁচে ঢালা। অনুলিপিটী দেখিবামাত্র বোধ হয় যে ইহা বর্ষাবংশীয় কোন রাজার খোদিত লিপি হইতে পারে না। লেখক বিশ্বরূপ সেনের তান্ত্রশাসন হইতে এই অংশ নকল করিয়া লইয়াছেন। কেবল “সেনকুল-কমল” স্থানে “বর্ষকুল-কমল” লিখিয়াছেন। নকল প্রাণী বর্ণনা বোধ হইতেছে না। কেশব সেনের বা বিশ্বরূপ সেনের তান্ত্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই অংশ বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থে প্রাক্ষুণ্ড হইয়া থাকিবে। এই তান্ত্রশাসনে রচয়িতা শ্রামলবর্ষার পিতার নাম দেন নাই কি জ্ঞান? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে, তখনও শ্রামলবর্ষার পিতার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই এবং রচয়িতা ভরণী করিয়া শ্রামলবর্ষার পিতার নাম সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।”

রাখাল বাবুর এই কথাগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়—

(ক) শ্রামলবর্ষার তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে—

“ইহ খলু বিক্রমপুর-নিবাসি কটকপতে: শ্রীশ্রীমত: জয়স্বক্কা-বারাং স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত সতত বিরাজমানাশপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি বর্ষকুলকমল-প্রকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক পরম মৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-(১) বৃষভ-শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রামল বর্ষদেব পাদবিজয়িন:।”

(খ) কেশব সেনের তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে—

“ইহ খলু জম্মুগ্রাম-পরিসর শ্রীমজ্জয়স্বক্কাবারাং সমস্ত সুপ্রশ-স্ত্যাপেত অরিরাজ-সুদন শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ-সুদন শঙ্কর গোড়েশ্বর

(১) রাখাল বাবুর “অধিরাজ” পাঠ ভুল।

শ্রীমজ্জয়সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অশপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন দান-কর্ণ সতাত্ত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম মৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-ঘাতুক শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন দেব পাদবিজয়িন:।”

(গ) বিশ্বরূপ সেনের তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে—

“ইহ খলু জম্মুগ্রাম-পরিসর সোমবংশ শ্রীমজ্জয়স্বক্কাবারাং সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ-সুদন-শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্ বল্লালসেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অশপতি গজ-পতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সতাত্ত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম মৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-সুদন-শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমজ্জয়সেন পাদানুধ্যাত অশপতি গজপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সতাত্ত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম মৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিশ্বরূপ সেন পাদবিজয়িন:।”

কেশবসেন যঁহাকে “অরিরাজ-সুদন” লিখিতেছেন, বিশ্বরূপ তাঁহাকে অরিরাজ লিখিতেছেন—কেশবসেন যঁহাকে শঙ্কর গোড়েশ্বর করিয়াছেন, বিশ্বরূপ তাঁহাকে “বৃষভ-শঙ্কর গোড়েশ্বর” করিয়াছেন। বল্লালসেন দাননাগর গ্রন্থে “নিঃশঙ্ক শঙ্কর গোড়েশ্বর” লিখিয়াছেন, বিশ্বরূপ “অরিরাজ নিঃশঙ্কর গোড়েশ্বর” লিখিয়াছেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন কেহই আপনাদিগকে স্ব-স্ব তান্ত্রশাসনে অরিরাজ বা অরিরাজ-সুদন অথবা শঙ্কর গোড়েশ্বর বা বৃষভ-শঙ্কর গোড়েশ্বর ইত্যাদি লিখেন নাই, কেশব ও বিশ্বরূপ এই উপাধি পাইলেন কোথায়? পাইলেই বা উভয়ে মিল নাই কেন? ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, কোন একখানি তান্ত্রশাসন অবলম্বন করিয়া এই দুইখানি তান্ত্রশাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেশবসেনের তান্ত্রশাসনে “নাবব” কাটিয়া “কেশব” করা হইয়াছে, তাহাতেও কি সন্দেহ হয় না?

শ্রামল বর্ষার তান্ত্রশাসনে অরিরাজ এবং কেশবসেনের তান্ত্রশাসনে অরিরাজ-সুদন, অরিরাজ-ঘাতুক দেখিয়া কি বুঝা যায় না যে, শ্রামল বর্ষার তান্ত্রশাসন দেখিয়া এই তান্ত্রশাসন লেখা হইয়াছে? শ্রামলবর্ষা কেশবসেনের পূর্বের না হইলে তিনিই বা অরিরাজ-ঘাতুক হইলেন কিরূপে? বিশ্বরূপসেনের তান্ত্রশাসনে যে “অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর গোড়েশ্বর” লিখা হইয়াছে তাহাও শ্রামল-বর্ষার তান্ত্রশাসনের নকল। একই বিজয়সেন কেশবসেনের তান্ত্রশাসনে অরিরাজ-সুদন শঙ্কর গোড়েশ্বর, আবার বিশ্বরূপের তান্ত্রশাসনে অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর গোড়েশ্বর হইতে পারেন না। অতএব এই দুই তান্ত্রশাসনই শ্রামলবর্ষার তান্ত্রশাসন দেখিয়া যে জাল করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। “অশপতি, গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি” প্রভৃতিও শ্রামলবর্ষার তান্ত্রশাসন দেখিয়া লিখিয়াছে। শ্রামলবর্ষার মাতামহ কর্ণগাঙ্গেয় তাঁহার তান্ত্রশাসনে এই-সকল উপাধি লিখিয়াছেন। শ্রামল মাতামহের উপাধি আত্মসাৎ করিতে পারেন, কিন্তু কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের ঐ উপাধি গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং রাখাল বাবু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন শ্রামলবর্ষার তান্ত্র-শাসন জাল নহে। যে কেশব ও বিশ্বরূপের তান্ত্রশাসন

তিনি ষাঁটি বলিয়া ঞ্চামলবর্মার তাম্রশাসন আল বলিয়াছেন সেই হই তাব্রশাসনই ঠিক নহে।

২। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে এমন কোন কথা নাই যদ্বারা বুঝা যায় যে, জাতবর্মার রাজা ছিলেন। রাধাল বাবু “সার্কভৌমশ্রী” অর্থে “স্বাধীন রাজা” করিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজা থাকিলে তাঁহার নামের পূর্ক রাজত্বজ্ঞাপক, রাজা, ভূপতি, নরপতি ইত্যাদি কোন শব্দ থাকিত। বরং লিখিত আছে—

জাতবর্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শাস্তনোঃ ।

দয়াব্রতং রণঃক্রীড়া ত্যাগো যশ মহোৎসবঃ ॥ ৭

অর্থাৎ “শাস্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ বজ্রবর্মা হইতেও জাতবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল।”

ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে জাতবর্মা ভীষ্মের জ্যেষ্ঠ ছিলেন অর্থাৎ ভীষ্মের জ্যেষ্ঠ দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, ভীষ্মের জ্যেষ্ঠ যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল এবং ভীষ্মের জ্যেষ্ঠ রাজা জয় করিয়া জাতবর্মা তাহা ত্যাগ করতঃ চিরকাল কেবল সেনাপতি হই করিয়াছেন। আর কত স্পষ্ট চান? আরও প্রমাণ আছে। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্মদেবঃ

শ্রীমাজ্জগৎ-প্রথম-মঙ্গল নামধেয়ঃ ।

কিশল্লয়ামাখিল-ভূপ-গুণোপপন্নো

দোমৈ ( শ্রী ) নাগপি পদং ন কৃতঃ প্রভূর্মে ॥ ৯

অর্থাৎ “জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান ঞ্চামলবর্মদেব বীরজীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অধিক কি বর্ণনা করিব? অখিল-নরপাল-গুণ-বিভূষিত আমার প্রভূতে দোমসমূহ কিয়ৎ-পরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।”

এই “প্রথম মঙ্গল নামধেয়” অর্থ প্রথম রাজা হওয়া। অখিল নরপালই জাতবর্মার ভাগ্যে ঘটয়াছে এমন প্রমাণ তাম্রশাসনে একটীও নাই। অতএব ভোজবর্মার তাম্রশাসনে আমরা পাইলাম— বজ্রবর্মার বংশে ঞ্চামলবর্মাই প্রথম রাজা।

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকাতেও তাহাই লেখা আছে—

“বেদ গ্রহ গ্রহমিতে স বভূব রাজা গোড়ে স্বয়ং নিজবসেঃ পরিভূয় শক্রনু।” অর্থাৎ “ঞামল বর্মা ৯৯৪ শকে ( ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ) নিজ বীলে শক্রকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।” সুতরাং ঞ্চামল বর্মা যে নিজ ভূজবলে রাজা হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কুলজী ও তাম্রশাসন একমত হইতেছে। ( এই কারণে ৯৯৪ শকও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ) অতএব জাতবর্মা রাজা ছিলেন না, তাই “সার্কভৌমশ্রী” অর্থ “সার্কভৌমকীর্ত্তি” মাত্র। ঞ্চামলবর্মাও তৎকালে স্বীয় তাম্রশাসনে পিতার নাম দেন নাই।

কোন তাম্রশাসনে “কুলকমলের” উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পিতার নাম না দেওয়াই ঞ্চামলবর্মার কুলকমল লিখিবার কারণ। তাহাই দেখিয়া কেশব ও বিশ্বরূপ সেন স্ব স্ব তাম্রশাসনে “বর্মকুল-কমল” স্থানে “সেনাকমল” করিয়াছেন। ঞ্চামল বর্মার পিতার নাম আবিষ্কার না হওয়াই যদি পিতার নাম উল্লেখ না করিবার কারণ হয় তবে যিনি কুলপঞ্জিকা দেখিবেন তিনিই মূনিত্তে পারিবেন, তাম্রশাসনে পিতার নাম উল্লেখ না থাকিলেও কুলপঞ্জিকাকারণ বিজয় সেনকে তাঁহার পিতা করিয়াছেন। সুতরাং যদি ঞ্চামল বর্মার তাম্রশাসন কোন ব্যাকরণ কর্তৃক কৃত্রিম করা

হইত তবে তাহাতে বিজয় সেনের নাম এবং সেনকুল-কমলই দেখা যাইত, বর্মকুলকমল লেখা থাকিত না।

৩। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে ৬ শ্লোকে লিখিত আছে—

অভবদথ কাদাচিদ্যাদবীনাং চমুনাং

সমর-বিজয়-যাত্রা-মঙ্গলং বজ্রবর্মা ।

শমন ইব রিপুনাং সোমবদু বাকবীনাং

কবিরপিচ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং ॥ ৬

অর্থাৎ “কোনও এক সময়ে যাদব সেনার সমরবিজয়-যাত্রা-মঙ্গলরূপী বজ্রবর্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বাকবালের পক্ষে চন্দ্র, কবালের মধো শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতকুলের মধো প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।”

ইহাতে বুঝিলাম বজ্রবর্মা বীর ছিলেন; কাবশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ছিলেন একটা কোন কথা ইহাতে নাই। “যাদব সেনার সমর-বিজয়-যাত্রা মঙ্গলরূপী” অর্থ কি? যাদব সেনা বঙ্গদেশ জয়ের জন্ত যাত্রা করিয়াছিল, তিনি সেই সেনাদলে রাজা ছিলেন না, সেনাপতিও ছিলেন না, কেবল মঙ্গলরূপী ছিলেন অর্থাৎ বজ্রবর্মা সঙ্গে থাকতেই তাহারা যেন জয়ী হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিলাম তিনি যাদব সেনা সহ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

৪। এই যাদব সেনা লইয়া কে আসিয়াছিল? ভোজবর্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—বজ্রবর্মা “হরিরবাকবা” অর্থাৎ হরির জাতি। এই হরি কে? ভবদেবের প্রশস্তিতে দেখিতে পাই, হরিবর্মা বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। হরিবর্মার তাম্রশাসনে জানিতে পাই, বিক্রমপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম জ্যোতিবর্মা। মহারাজাধিরাজ-শব্দ দ্বারা জানা যাইতেছে, জ্যোতিবর্মা রাজা ছিলেন। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে জানা যায় তাঁহার যদুবংশজাত। তাহা হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—জ্যোতিবর্মা যাদব সেনা লইয়া বঙ্গ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, জ্যোতিবর্মা বজ্রবর্মা তৎসহ আসিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের পরে কোন প্রবল শত্রু বঙ্গ অধিকার করিবার প্রমাণ নাই, এই জন্তই লিখিয়াছি, জ্যোতিবর্মা রাজেন্দ্র চোল সহ আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল চলিয়া গেলে, জ্যোতিবর্মা তদধিকৃত উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় এবং বিক্রমপুরে রাজা হইলেন। ভূবেন্দ্রের পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভবদেবের প্রশস্তি তাহার প্রমাণ।

৫। হরিবর্মার ৯২ রাজ্যকে বঙ্গাকারে লিখিত “অষ্ট সাহস্রিকা প্রজাপারমিতা” নামক একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং হরিবর্মার তাম্রশাসনও ৪২ রাজ্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অতএব আমরা ৪২ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল ধরিতে পারি।

হরিবর্মার পরে তৎপুত্র রাজা হইয়াছিলেন, ইহা ভবদেবের প্রশস্তিতে পাওয়া যায়। ভবদেব হরিবর্মার ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রশস্তিতে জীবিত প্রভুর নাম না দিয়া মৃত প্রভু হরিবর্মার নাম দিলেন কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। ভোজবর্মার তাম্রশাসন, ভবদেবের প্রশস্তি এবং পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে বুঝা যায়, ঞ্চামল বর্মা হরিবর্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া অর্থাৎ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ভবদেবের প্রশস্তির পূর্বেই ঞ্চামল বর্মা রাজা হইয়াছিলেন, এই জন্তই ভবদেব স্বীয় প্রশস্তিতে তাঁহার কাপুরূপ

জীবিত প্রভুর নাম না দিয়া তৎপিতা পূর্বে প্রভুর নাম করিয়াছেন। হরিবর্মা, শ্যামলবর্মা ও ভোজবর্মার তাম্রশাসনে বিক্রমপুর তাঁহাদের রাজধানী থাকায় জানা যায়, একের অভাবেই অণ্ডে রাজা হইয়াছে, সুতরাং হরিবর্মার পরে তৎপুত্র, তৎপরে শ্যামল, তৎপরে ভোজ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন হরিবর্মার পুত্রের পরে “শ্রীচন্দ্র” বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন (সাহিত্য ১৩২০। শ্রাবণ ২২৮ পৃষ্ঠা)। তাহা হইতে পারে না। পৃথক প্রবন্ধে তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

৬। রাখাল বাবুর মতে “১০২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ১ম রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। তিনি যে ১০২০ খৃষ্টাব্দের রাঢ় জয় করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না।” ১০২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইলে ১০২০ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় আপত্তি কি? “পূর্বে” বলিলে সময় ঠিক বুঝা যায় না। কি প্রমাণে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও বলেন নাই। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসের “প্রবাসীতে” “লক্ষণ সেনের সময়” নামক প্রবন্ধে (৩৯৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন, ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন—

- খৃষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপালের মৃত্যু।  
 “ ১০৪০—নয়পালের মৃত্যু। ১৫ বৎসর রাজত্ব।  
 “ ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু। ১৬ বৎসর রাজত্ব।  
 “ ১০৫৫—২য় মহীপালদেবের মৃত্যু।  
 “ ১০৫৫—২য় শূরপালের মৃত্যু।  
 “ ১০৯৭—রামপালের মৃত্যু। ৪২ বৎসর রাজত্ব।  
 “ ১১০০—কুমারপালদেবের মৃত্যু।

ইত্যাদি।

তাঁহার এই সময় নির্ণয়ে আমার আপত্তি আছে, তথাপি এখানে তাঁহার হিসাবমতই দেখা যাউক। কুমারপাল স্বীয় মন্ত্রী বৈদাদেবকে কামরূপের সামন্ত রাজপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বৈদাদেব তাঁহার, “সং ৪ সূর্যগত্যা বৈশাখ দিনে ১” এবং “বৈশাখে বিষ্ণু (ব) ত্যাক স্বর্গার্থং হরিবাসরে” তাম্রশাসন দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আর্থার ভিনিস সাহেব দেখাইয়াছেন ১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪২ এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে একাদশী তিথিতে মেঘ সংক্রান্ত হইয়াছে। বৈদাদেবের নামের পূর্বে “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক” দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে মারপালের মৃত্যুর পর বৈদাদেব স্বাধীন হইয়া এই তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। সুতরাং ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈদাদেব তাম্রশাসন দিয়া থাকিলে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে কুমারপালের মৃত্যু ধরা যাইতে পারে। ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই পারে না। অতএব রাখাল বাবুর হিসাব ঠিক রাখিয়া সন পরিবর্তন করিলে—

- খৃষ্টাব্দ ১০৯৫—কুমারপাল দেবের মৃত্যু।  
 “ ১০৯২—রামপালের মৃত্যু।  
 “ ১০৫০—২য় শূরপালের মৃত্যু।  
 “ ঐ —২য় মহীপালের মৃত্যু।  
 “ ১০৪৮—তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু।  
 “ ১০৩৫—নয়পাল দেবের মৃত্যু।  
 “ ১০২০—মহীপাল দেবের মৃত্যু।

অর্থাৎ ১০২০ খৃষ্টাব্দে মহীপাল দেবের মৃত্যু স্থির হয়। সুতরাং রাখাল বাবু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ১০২০ খৃষ্টাব্দের পরে রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইতে পারে না। ইহা

আমার নূতন আবিষ্কার বটে কিন্তু কোন তাম্রশাসনের বলে নহে, তাঁহার অবলম্বিত সেই প্রাচীন গিরিলিপি অনুসারেই বটে। রাজেন্দ্র চোলের কোন তাম্রশাসন নাই। লিখিবার ভুলে গিরিলিপি স্থলে তাম্রশাসন হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এখন সম্ভবতঃ রাখাল বাবু ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হওয়া সম্বন্ধে আর আপত্তি করিবেন না।

৭। রাজেন্দ্র চোল সহ হরিবর্মার পিতা জ্যোতিবর্মার যাদব সেনা লইয়া বঙ্গে আগমন উপরে প্রমাণিত হইয়াছে। তদনুসারে ১০২০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিবর্মার বঙ্গে আগমন ধরিতে পারি। আরও প্রমাণ আছে—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে হরিবর্মা চন্দ্র বর্মার পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪৫৭ পৃঃ) তিনি বলেন, “ভোজবর্মার তাম্রশাসনে আভাসপ্রাপ্ত হরিবর্মা ভোজবর্মার প্রপিতামহ বজ্রবর্মারও কিয়ৎ পুরুষ উর্দ্ধতন, তাহা “হরবর্জবা” কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।” ইহাতেই কি প্রমাণ হইল, হরিবর্মা বজ্রবর্মারও পূর্বে? তাহা হইতে পারে না। তাম্রশাসনের ৬ শ্লোকে বজ্রবর্মার জন্ম লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই স্থির করা যাইতে পারেনা যে বজ্রবর্মার জন্মের পূর্বে হরিবর্মা ছিলেন।

হরিবর্মা জাতবর্মার সমসাময়িক। ৮ম শ্লোকের, “বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনশ্চ শ্রিয়ং” দেখিয়া বুঝা যায় যে এই গোবর্দ্ধন ভবদেব ভট্টের প্রশাস্তিতে লিখিত ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন। জাতবর্মা, হরিবর্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই, “বীরহুলীমধ্যে ভুজলীলা দ্বারা বসুমতীবর্দ্ধনকারী” (১) গোবর্দ্ধনও বিকল হন নাই। না হউন, কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে জাতবর্মা, গোবর্দ্ধন ও হরিবর্মা সমসাময়িক। জাতবর্মা কর্ণদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালও কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং জাতবর্মা ও তৃতীয় বিগ্রহপাল সমসাময়িক। তৃতীয় বিগ্রহপাল ১০৩৮-১০৫১ খৃষ্টাব্দ (মতান্তরে ১০৫৩-১০৬৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। অতএব জাতবর্মা, হরিবর্মা, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি ১০৩৮ হইতে ১০৬৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা “ভোজবর্মার পূর্বে হরিবর্মাকে স্থাপন করতে পারেন নাই”, (৪৫৭ পৃষ্ঠা) তাঁহারা কিছু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

হরিবর্মা বঙ্গদেশে রাজা ছিলেন, তাঁহার ৪৫৫০ বৎসর পরে ভোজবর্মার তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। বজ্রবর্মা ও জাতবর্মা রাজা ছিলেন না, তাই প্রথিতনামা হরিবর্মার নাম করিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হরিবর্মা শ্লোকের নবম অনুসারে বজ্রবর্মার পূর্বে নহেন, তাম্রশাসনের পূর্বে বটেন।

৮। আমরা উপরে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে শ্যামল বর্মা ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে নিজ ভূজবলে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু বলেন, “শ্যামল বর্মার তারিখ সম্বন্ধে মলগ্রন্থকারগণ একমত নহেন। ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার মতে ১১৬৪ শকে বা ১২৪২ খৃষ্টাব্দে কনৌজস্থিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন। অতঃপর কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নয়োজন।”

(১) ভবদেবের প্রশস্তি ১২ শ্লোক।



আমি ইতঃপূর্বে দেখাইয়াছি যে, পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জি-কার উক্তি সহ তাম্রশাসন ঐক্য হওয়ায়, ৯৯৪শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) যে শামলবর্মা রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। ঐশ্বর বৈদিকের মত ঠিক নহে, ভুল। ১১৬৪ শক অর্থাৎ ১২৪২ খৃষ্টাব্দ হইতেই পারে না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া এখানে বিশেষ আলোচনা করিলাম না, এই প্রবন্ধ সমস্ত পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

৯। জ্যোতিবর্মা ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সহ বা তৎপরে একাকী আসিয়া থাকিলে, শামল বর্মা পর্য্যন্ত ১০৭২-১০২০=৫২ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে হরিবর্মার তাম্রশাসনে লিখিত ৪২ রাজ্যাক্রম বাদ দিলে ১০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। হরিবর্মার পুত্র অধিক দিন রাজ্য করেন নাই, তাহা ভবদেবের প্রশস্তিতে জানা যায়। সুতরাং তাহার রাজত্ব বৎসরাধিক কাল ধরিলে জ্যোতিবর্মার রাজত্বকাল আট বৎসর ধরিতে কোন বাধা থাকে না। তাই আমি “বঙ্গ বর্মারাজবংশ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, জ্যোতিবর্মা ১০২০—১০২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, হরিবর্মা ১০২৯—১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তাহার পুত্র ১০৭১—১০৭২ খৃষ্টাব্দের কয়েক মাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপরে আমরা দেখাইয়াছি হরিবর্মা, জ্যোতিবর্মা ও গোবর্ধন ১০৩৮—১০৬৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ছিলেন। তৎসহ এই সময় ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। এখানে কুলপঞ্জিকায় বিশ্বাস না করিলেও ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শামলবর্মার রাজ্যপ্রাপ্তি অবিশ্বাস করিবার কোন সম্ভব কারণ দেখা যায় না। শামলবর্মা বিজয় সেনের করদ ছিলেন, এ কথাতেও কোন বাধা হয় না। কারণ বল্লাল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্বে বিজয় সেনের কাল। ১০৭২—১১১৯=৪৭ বৎসর হয়। এই ৪৭ বৎসর মধ্যে শামলের বিজয় সেনের করদ হওয়া অসম্ভব নহে। কাজেই কুলজীর এ অংশও অবিশ্বাস করা যায় না।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, কিলহর্গ সাহেব ভবদেব-প্রশস্তির অক্ষর বিচার করিয়া তাহা “খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে” উৎকীর্ণ বলিয়াছেন। আমরা ভবদেব-প্রশস্তির সময় ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছি, ইহা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা শেষ তৃতীয়াংশ বলা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দী বলিলে তাহার প্রথম ভাগ হইতে পারে, অষ্টভাগও হইতে পারে। যদি প্রথমভাগ ধরা যায়, তবে আমাদের গণনার সহিত ৪০।৫০ বৎসরের প্রভেদ মাত্র হইতেছে। যে যে প্রমাণে আমি সময় নির্ণয় করিয়াছি, কেবল অক্ষর বিচার করিয়া যে সময় পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাহার মূল্য বেশী। সুতরাং ৫০ বৎসরের প্রভেদ ধর্তব্য নহে। অতএব শামলবর্মা ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছেন ধরিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

১০। “শামলবর্মা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, বিজয় সেন সেই সময় দক্ষিণ বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গোড়েশ্বর পাল রাজার সহিত যুদ্ধে বাস্ত ছিলেন। এই সুযোগে শামলবর্মা বঙ্গদেশ জয় করিয়া নিজে স্বাধীন হইয়াছিলেন।” ইহা আমার নূতন আবিষ্কার বটে। বিজয় সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে করিতে বরেন্দ্রে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সকল ঐতিহাসিকেরই স্বীকৃত বিষয়। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন শামল বঙ্গদেশে বিজয় সেনের করদরূপে রাজত্ব করিয়াছেন, এই জন্যই আমি দেখাইয়াছি শামল তখন বিজয় সেনের করদ ছিলেন না, বঙ্গদেশ সুযোগমত জয়

করিয়া স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহার তাম্রশাসনে “বঙ্গ বিষয় পাঠান্তর্গত” লিখিয়াছেন। তাম্রশাসন দানের পরে করদ হইয়াছিলেন।

১১। বল্লাল সেনের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাহার রাজ্যের একাদশ রাজ্যাকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি বিক্রমপুর রাজধানী হইতে বঙ্গদানভূক্তির অন্তর্গত ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি বিক্রমপুর জয় করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। কারণ এই বিক্রমপুর ও বঙ্গ শামলবর্মার রাজ্য ছিল। বল্লাল সেন তাহা অধিকার না করিয়া দান করিতে পারেন না। বিক্রমপুরকেও রাজধানী বলিতে পারেন না। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে জানা যাইতেছে যে বিক্রমপুর ভোজবর্মার রাজধানী ছিল। সুতরাং শামলবর্মার পরে ভোজ রাজা হইয়াছিলেন, তৎপরে বল্লাল বিক্রমপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোজবর্মার তাম্রশাসন তাহার ৫ রাজ্যকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। পূর্বে দেখাইয়াছি, শামল বিজয়ের করদ ছিলেন। করদের ভূমিদান করিবার ক্ষমতা নাই। ভোজবর্মার তাম্রশাসনে স্বাধীনতাজ্ঞাপক মহারাজাধিরাজ ভোজ লিখিত আছে, সুতরাং ভোজবর্মা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন, জানা যাইতেছে। বল্লাল সেন যে ভোজবর্মা অপেক্ষা প্রবল, তাহা শামল বর্মার করদ হইতেই জানা যায়। সুতরাং একটা সুযোগ বা তাৎকালিক স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। বিজয়সেনের মৃত্যু, বল্লাল সেনের মিথলা জয় ইত্যাদি ব্যাপার এ সময় এত গুরুতর হইয়াছিল যে বল্লাল সেনের মৃত্যু ঘোষণা হওয়ায় সন্দেহাজাত বরেন্দ্র সেন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসেরই কথা। সুতরাং মূল রাজ্যে এইরূপ বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইলে সামন্তরাজপণ যে সেই সুবিধায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এ উদাহরণও বিরল নহে, সুতরাং এই সময়ে যদি ভোজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তাম্রশাসন দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। এই সময় ভোজের পঞ্চম রাজ্যাক্রম চলিতেছিল সুতরাং ১১১৯—৪= ১১১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন পাইয়াছেন ধরিয়া লইলে অসম্ভব হইবে না। সুতরাং এ তত্ত্ব আমার নূতন আবিষ্কার হইলেও অসম্ভব নহে, বরং তাম্রশাসনানুসৃত ঐতিহাসিক সত্য।

১২। শামলবর্মা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পাইয়াছেন এবং ভোজবর্মা ১১১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন পাইয়াছেন। সুতরাং ১১১৫—১০৭২= ৪৩ বৎসর অর্থাৎ ১০৭২—১১১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শামল বর্মা রাজত্ব করিয়াছেন। ইহা তাম্রশাসনানুসৃত সত্য এবং আমার নূতন আবিষ্কার বটে।

উপরে যাহা লিখিলাম তাহাতে আশা করি রাখাল বাবু আর বলিতে পারিবেন না যে, “কতকগুলি স্বপ্নলব্ধ তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছি (৪৫৭ পৃষ্ঠা)।”

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

## বহুরূপী নক্ষত্র

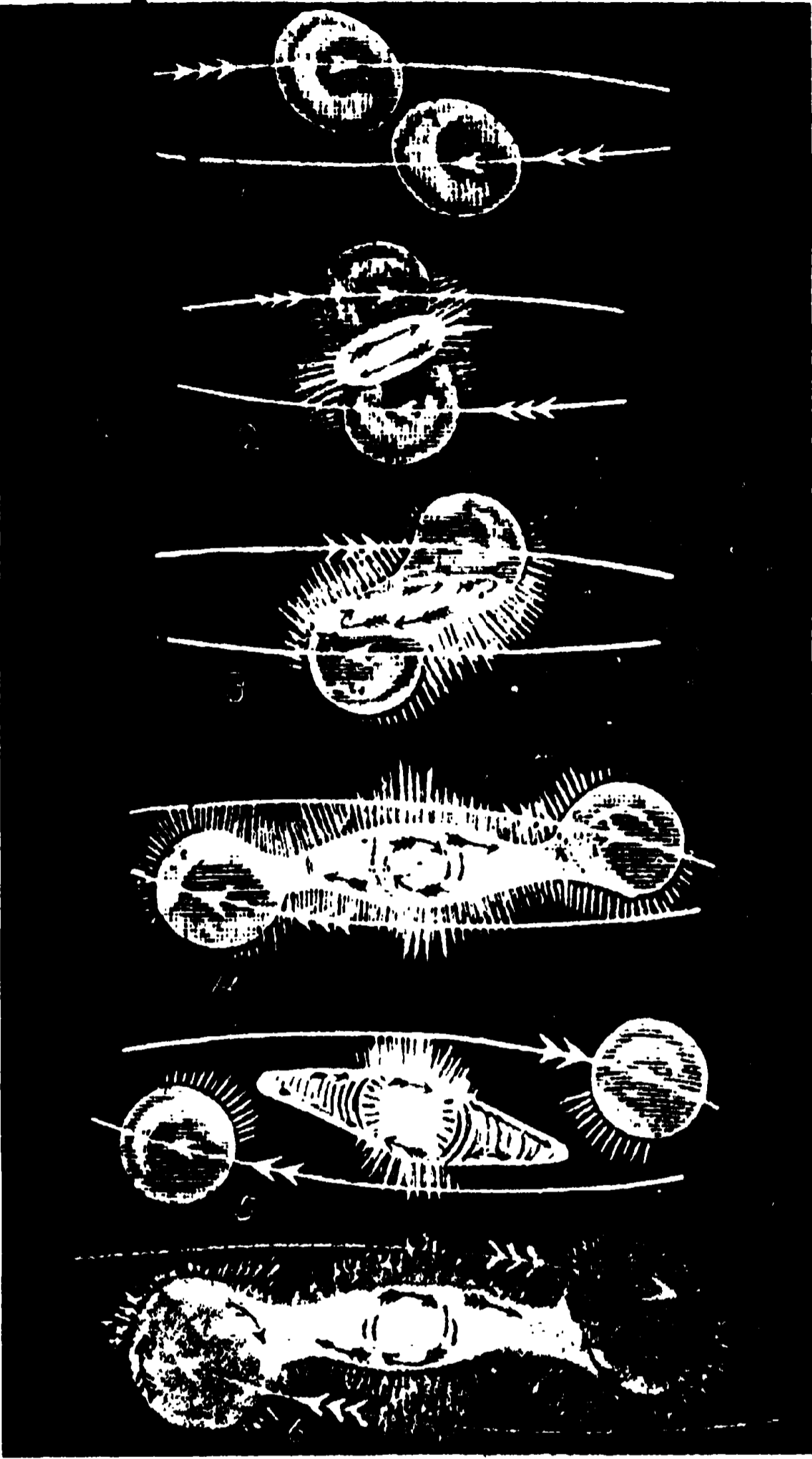
উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে কাল-সাগরে—অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বিংশ শতাব্দী বিবিধ জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, তাহার স্থান

অধিকার করিয়াছে। তড়িৎ ও তৈল হইতে উৎপন্ন বাষ্পচালিত যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিতে—মোটরকার, এরোপ্লেন Xয়ে প্রভৃতির আবিষ্কারে—জগৎ চমকিত হইয়াছে। জগদীশের বস্তুতত্ত্ব, প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক আবিষ্কার এবং অগ্ন্যাণু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা বহুপ্রকার অভিনব ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া লোককে বিস্ময়াবিভূত করিয়াছে। রেডিয়াম নামক ধাতুর আবিষ্কার হওয়ায় “সাত রাজার ধন মাণিকের” সন্ধান মিলিয়াছে। তাম্র লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা জানা গিয়াছে। এই-সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত তুলনায় জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও নিতান্ত কম উন্নতি হয় নাই। গণিতের সাহায্যে লক্ষকোটি যোজন দূরে স্থিত জ্যোতিষ্কগুলির পরস্পরের দূরত্ব নির্ণীত হইতেছে, তাহাদের স্বরূপ—তাহারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, কি উপাদানে তাহারা গঠিত, তাহাদের বর্ণ, আলোকের অবস্থা, গতির বেগ প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইতেছে। এমন সময়ে উত্তরাকাশে পরশু নামক নক্ষত্ররাশির মধ্যে একটি নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিকগণের হৃদয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। পরশু রাশিতে নূতন আবিভূত হওয়ায় ইহাকে জ্যোতিষীগণ নবপরশু নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নীলাশ্বরে আমরা যে-সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু নক্ষত্র ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে, এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইলেও উহাদের প্রত্যেকে এক একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য স্বরূপ, বহু লক্ষকোটি যোজন দূরে থাকায় আমাদের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক নক্ষত্রগুলি দৃশ্যতঃ স্থির বোধ হইলেও উহাদের গতি আছে। বহু দূরে স্থিত অদৃশ্য দুইটা নক্ষত্র এইরূপ গতিক্রমে পরস্পরের নিকট দিয়া যখন গমন করিতে থাকে, সেই সময়ে উহাদের মধ্যে নৈকট্য বশতঃ স্পর্শ-সংঘর্ষণ সংঘটিত হয়। এই প্রকার সংঘর্ষণের ফলে নূতন এবং বহুরূপী নক্ষত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এইরূপ সূর্য্য-সংঘর্ষণোৎপন্ন নব ও বহুরূপী

নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবের ঞ্চায় নভোমণ্ডলের আর কোন ঘটনাই মানুষের মনকে এরূপ বিস্ময়বিমুক্ত করিতে পারে না, যাহাতে তাহারা নীলাশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে যত্ন করে। এইরূপ একটি ঘটনাতে উদ্ভূত হইয়া হিপার্কাস ( Hipparchus ) নক্ষত্রগণের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ আর একটি ঘটনায় টাইকোব্রা ( Tycho Brahe ) বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিক আলোকাধার ও চুল্লী পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া নীলাশ্বরের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে শূন্যমাগে গ্রহ ও উপগ্রহগণের অবস্থানের বিবরণ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। গ্যালিলিও ( Galileo ) একটি সাময়িক নক্ষত্রের আবির্ভাব দর্শন করিয়া পৃথিবীর গতিবিষয়ক কোপর্ণিকাশের মতবাদ প্রচারে ত্রুটি হইয়াছিলেন।

বিগত ১৩১৮ সালে ( বঙ্গাব্দের ) গোধা ( Lucerta ) নামক নক্ষত্র রাশিতে, এসপিন ( Mr. Espin ) সাহেব একটি নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়া, পৃথিবীর সর্ব-দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলী এবং বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ছিলেন। এই-সকল সাময়িক নক্ষত্র সম্বন্ধে পরলোকগত পণ্ডিত নিউকম্ব ( Prof. Newcomb ) বলিয়াছিলেন “নূতন নক্ষত্রগুলি সময়ে সময়ে আবিভূত হইয়া আমাদের চমৎকারসম্বলিত বিস্ময়রসে নিমগ্ন করিয়া ফেলে; প্রকৃতিতত্ত্ব দার্শনিক পণ্ডিতগণও ইহাদের স্বরূপ সহজে অবগত হইতে পারেন না।” পরলোকগত Miss Agnes Clarke জ্যোতিষীগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন “এই-সকল নব নক্ষত্র পূর্বে কি ছিল, বর্তমানেই বা ইহাদের স্বরূপ কি এবং ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসহ। কিন্তু এই-সকল দুঃসহ প্রতাপাদ্যগুলির সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে আলোচনা করিলে উহাদের উৎপত্তির প্রণালীসম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না তাহা নহে। একটি বস্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে নিস্পন্দ ও অদৃশ্য ছিল, তাহা অকস্মাৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে দীপ্তিমান



বহুরূপী নক্ষত্র।

- ১। দুটি নক্ষত্র পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া বিকৃতাকার হইতেছে।
- ২। নক্ষত্র-সংঘর্ষ। ৩। সংঘর্ষণান্তে নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি।
- ৪। সংঘর্ষণস্থ নক্ষত্র-শরীরের বস্তুবিভাগ।
- ৫। নূতন মধ্যবর্তী নক্ষত্র। ৬। মধ্যবর্তী নক্ষত্র-শরীরের সম্প্রসারণ।

হইয়া নক্ষত্ররূপে প্রতিভাত হয়। এই পরিবর্তন কিরূপে হয়? কেই বা এই পরিবর্তন ঘটায়? এই-সমস্ত ব্যাপারের বিশালতা ধারণায় আনিতে মানুষের কল্পনা হার মানেন। আমাদের নিকট পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি আমরা কল্পনায় বা গণিতের সাহায্যে ইহার ওজন অবগত হইতে পারি। আমাদের সূর্য্য আবার পৃথিবী হইতে লক্ষগুণ বড়, কিন্তু ঐ-সকল অলস্ত অগ্নিগোলকের কোন কোনটা আমা-

দের সূর্য্য হইতেও লক্ষকোটিগুণ বড় হইয়া থাকে।” নব-পরন্তু তারাটি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য অবস্থা হইতে উজ্জ্বলতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিয়া, কয়েকমাস মধ্যে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে, তজ্জন্ত যখন উহাদের সংঘর্ষণ হয়, তখন পরস্পরে সম্মুখীন থাকি না দিয়া পাশাপাশি ঘর্ষিত হইয়া, উভয়ে উভয়ের গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। এই সংঘর্ষণকালে অর্থাৎ যখন উভয়ে উভয়ের গাত্রসংলগ্ন হয়, তখন উভয় সূর্য্য হইতে কতকটা অংশ জমাট বাধিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নূতন নক্ষত্র গঠন করে; এই নূতন নক্ষত্রটি জন্মগ্রহণ করিয়াই এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠে যে সে তখন তাহার জনক জননীর গমনপথ নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া নিয়মিত করে, তাহার জনক জননীও সন্তান-বাৎসল্য-প্রযুক্ত সেই নিয়মিত পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারা এই অবস্থাতেই যুগল নক্ষত্র, কামরূপ এবং বহুরূপ তারা, নীহারিকা, বৃক্ষকেশু প্রভৃতির আকার পরিগাহ করিয়া নীলাধরে বিচরণ করিতে থাকে।

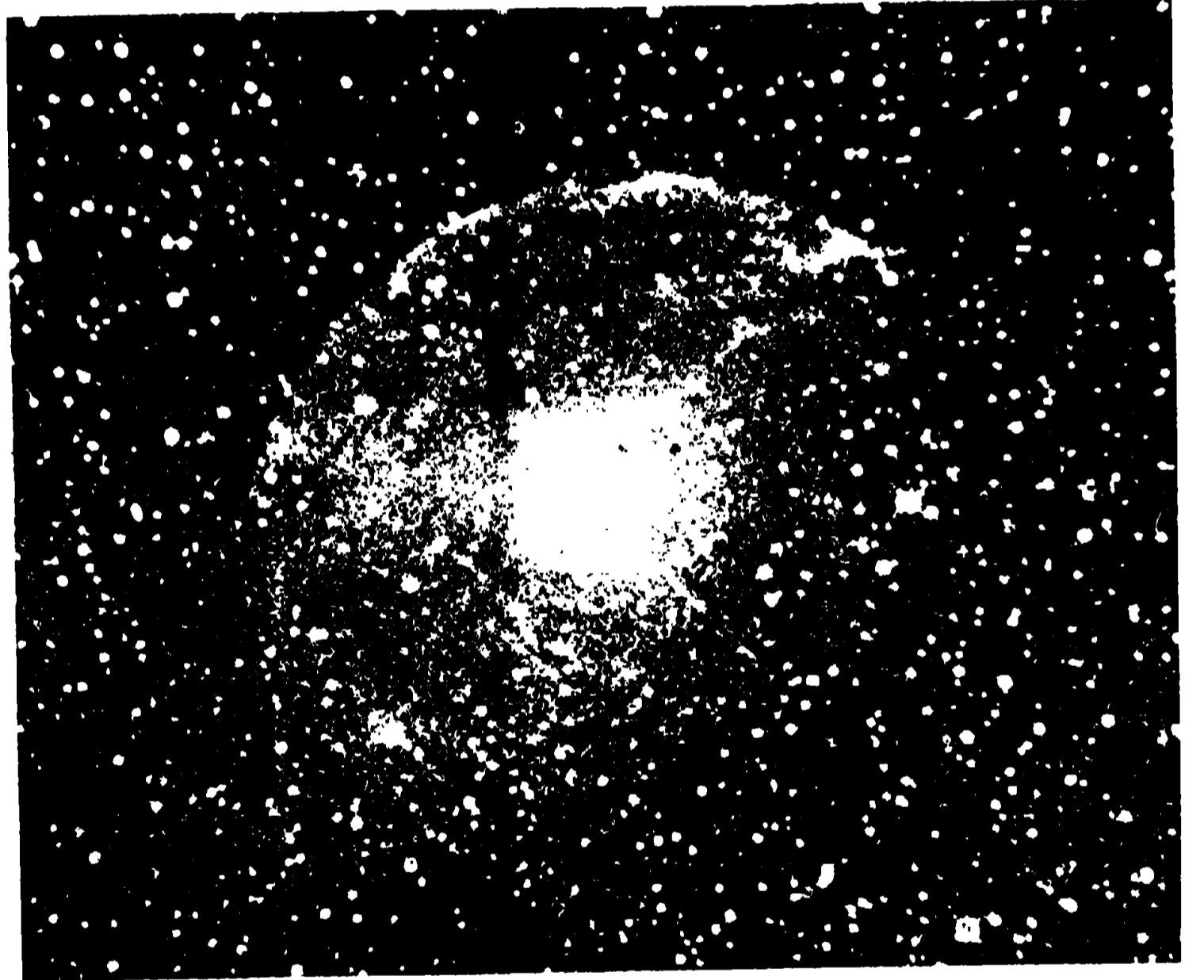
সূর্য্য-সংঘর্ষণোৎপন্ন নূতন নক্ষত্র, যাহারা দুইটা সূর্য্যের স্পর্শ-সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মলাভ করে, তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিপিলেটের আকার গ্রহণ করিয়া স্বীয় উষ্ণতার প্রভাবে ক্রমশই আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই-রূপে এক একটা নূতন নক্ষত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশের দশলক্ষ মাইল স্থান অধিকার করিয়া বসে। নূতন নক্ষত্রটি যৎপরোনাস্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে, পরন্তু উহার আয়তন বৃদ্ধির সহিত উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; নূতন তারাটি যত শীঘ্র তাহার চরম উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, উহার পরমাণুর সম্প্রসারণ তত সহর নিবারিত হয় না, উহা ক্রমশই অধিকতর প্রসারিত হইতে হইতে নীহারিকার-রূপে বিকশিত হইয়া পড়ে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে উহার উজ্জ্বলতা কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, উহার জ্যোতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমাণুর অন্তর্কর্ষন, অর্থাৎ তাহার সম্প্রসারণ ও

সঙ্কোচনশক্তি, সমস্ত বস্তুতে সমান থাকে না, পরস্তু পরমাণুর ইহা একটি স্বধর্ম যে, একই প্রকার উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অন্তর্কল সমান হয়। সীসকের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু হইতে দুইশত সাতগুণ বেশী ভারী, কিন্তু সমান উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে উভয়েরই অন্তর্কল সমান হইয়া থাকে। উহাদের একের অর্থাৎ সীসকের বস্তুর বা ভার বেশী, কিন্তু অপরের অর্থাৎ হাইড্রোজেনের বেগ বেশী। দুইটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ হওয়া মাত্রই তাহাদের সমস্ত উপাদান একই প্রকার গতিশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ নূতন নক্ষত্রটির জন্ম মাত্রই তাহার ভারীবস্তুর অসম্ভব উত্তপ্ত হয় এবং লঘুবস্তু শীতল থাকে, কিন্তু যখন ভারীবস্তুর সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন লঘুবস্তু, ভারীবস্তুর অন্তর্কল নষ্ট করে এবং অস্বাভাবিক গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। নবপরশু নামক নূতন নক্ষত্রটির হাইড্রোজেনের গতিবেগ অর্থাৎ সম্প্রসারিত হইবার শক্তি এক সেকেণ্ডে সহস্র মাইল পর্য্যন্ত জানা গিয়াছিল। এইরূপে লঘু এবং বায়বীয় পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুকে পশ্চাতে রাখিয়া দূরে চলিয়া যায়। লঘু উপাদানগুলি মণ্ডলাকারে বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর ভারী পদার্থগুলি বায়বীয় আকার ধারণ করিলেও সঙ্কুচিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিকিরণ-শক্তিহীন অত্যাঙ্কুল পিণ্ডাকারে পরিণত হইতে চেষ্টা করে। এদিকে এই সময়ে লঘু উপাদানগুলিও তাহাদের বাহিরের দিকে সম্প্রসারিত হইবার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া স্থিরভাবে অবলম্বন করে, কারণ বস্তুর সম্প্রসারিত হইবার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমায় উপনীত হইলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া কেন্দ্রাভুগ-শক্তিবলে পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাহার পূর্বের উজ্জ্বলতা—যাহাকে সম্প্রসারিত হইবার সময়ে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে আমরা উহাকে পুনরায় দেখিতে পাই। বহুরূপী

নক্ষত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই এবিধ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের নির্দিষ্ট সময় জানা গিয়াছে। এই সময়ে ইহাদের জ্যোতি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয়। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বহুরূপী নক্ষত্রের বিবরণ দিলাম। কৌতূহলী পাঠকগণ ইহাদের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

১। তিমিরাশির প্রথম তারা Oceti called also Mira) একটি রক্তবর্ণ বহুরূপী নক্ষত্র, ইহার পৌরাণিক নাম মার। তিনশত চৌত্রিশ দিনে এই তারাটি নানা রূপ ধারণ করে। পনের দিন দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুলন্ত ভোগ করিয়া তিন মাস যাবত ক্রমে কমিয়া কমিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং অদৃশ্য অবস্থায় পাঁচ মাস থাকে; তৎপরে ষষ্ঠ শ্রেণীর তারারূপে



নবপরশু নক্ষত্রের নিকটস্থ নীহারিকা।

দৃষ্টিগোচর হইয়া তিন মাস মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১৬৭২ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে এবং ১৬৭৬ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে এই তারাটি লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছিল।

২। পরশুরাশির দ্বিতীয় তারা Persee একটি বিচিত্র বহুরূপী নক্ষত্র, ৬৯ ঘণ্টার মধ্যে ৬২ ঘণ্টা এইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার স্থায় উজ্জ্বল থাকে, পরবর্তী সাত

ঘণ্টার মধ্যে ইহার রূপের পরিবর্তন হয়। এই সময়ে ইহা ৪র্থ শ্রেণীর তারায় পরিণত হয় এবং ২০ মিনিট এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় দ্বিতীয় শ্রেণীর আয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার এইরূপ অপরূপ পরিবর্তন দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ ইহাকে দানবচক্ষু (Algol) নাম দিয়াছেন। ইহার পৌরাণিক নাম মায়াবতী।

৩। বীণা রাশির তৃতীয় তারা Lyrae, ১২ দিন ২২ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার হ্রাস এবং বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়; একবার ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় তৃতীয় শ্রেণীর, আর ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় চতুর্থ শ্রেণীর আয় দৃষ্ট হয়। এই তারাটী আবার যুগল নক্ষত্র।

৪। শেফালী রাশির একটা তারা Scephei বহুরূপী যুগলনক্ষত্র, ৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ সেকেন্ডের মধ্যে ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে রূপ পরিবর্তন করে। ইহার মধ্যে ১ দিন ১৪ ঘণ্টায় ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে উপনীত হয় এবং ৩ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ছোট হইয়া ৫ম শ্রেণীতে পরিণত হয়।

৫। অর্ণবয়ান রাশির দ্বিতীয় তারা মারীচ Argus একটা বহুরূপী তারা। ১৬৭৭ খৃঃ অঃ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হ্যালী সাহেব ইহাকে ৪র্থ শ্রেণীর তারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭৪১ খৃঃ অঃ জ্যোতিষী ল্যাকেলী (Lacaille) ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়াছেন। তৎপরে ইহার ইতিহাস যতদূর জানা যায় লিখিত হইল। ১৮১১ খৃঃ অঃ হইতে ১৮১৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৪র্থ শ্রেণীর, ১৮২২ খৃঃ অঃ হইতে ১৮২৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ২য় শ্রেণীর এবং ১৮২৭ খৃঃ অঃ ইহা প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। পরে ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর হইয়া পুনঃ ১৮৩৮ খৃঃ অঃ প্রথম শ্রেণীর আকারে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ লুকক ব্যতীত আকাশে ইহার সমান উজ্জ্বল তারা আর কেহই ছিল না। আজকাল ইহার এমনই দুরবস্থা যে দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখিবার উপায় নাই। এই তারাটীর নিকটস্থ তারাস্তবকটীও (H 2167) বহুরূপী (variable)।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

## পুস্তক-পরিচয়

### সরল দাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—

কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের দাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীমুন্দরীমোহন দাস, এম্. বি প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ ২৪৮ পৃষ্ঠা। ছাপা বাধাই মন্দ নহে।

ডাক্তার মুন্দরীমোহন অনেকের নিকট সুপরিচিত। গী-রোগ চিকিৎসায় ও দাত্রীবিদ্যায় আমাদের দেশে যাহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, মুন্দরী বাবু তাঁহাদের অন্তর্গত। তিনি বহুদিন ধারিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের দাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন—সুতরাং উক্ত বিদ্যায় তাঁহার যে বিশেষ বুৎপত্তি ও দক্ষতা আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শুধু বুৎপত্তি থাকিলেই যে ভাল বই লেখা যায়, তাহা নহে—লিখিবার শক্তিও থাকা চাই। মুন্দরী বাবুর দেনিতেছি তাহারও অভাব নাই। তিনি সহজ ভাবে, সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কাগজে তাঁহার পুস্তকখান সফলমুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি একবার পাঠ করলে দাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে কতকটা যোগ্য জ্ঞান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি কথোপকথন-চ্ছলে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রধান পাত্রী বিমলা। ইনি “পাশ-করা” শিক্ষিতা দাত্রী এবং আদর্শ দাত্রী। গৃহিণী ও দাত্রীদের দোষে জন্মের আনন্দ যে আমাদের দেশে অনেক স্থলেই নিরানন্দে পরিণত হয়, একথা তিনি বিলক্ষণই অবগত আছেন এবং ইহা দূর করিতে হইলে, গৃহিণী ও দাত্রীদের অজ্ঞানতা ও অসতর্কতা বিদূরিত করা আবশ্যিক একথাও তাঁহার অবিদিত নহে। তাই ইনি গৃহিণী পাইলেই গৃহিণী মা-একেই সহজে এসব ও শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন আর দাত্রীগণ বাহাদুরী দেবাইতে গিয়া, অসুখি ও শিশুর যাহাতে অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে তাহাদের সতর্ক করিতে কিছুমাত্র যত্ন বোধ করেন না।

পুস্তকখান দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি বাঙ্গালী গৃহিণীদের জন্য লিখিত, দ্বিতীয় ভাগটি দাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। বক্তব্য বিষয় সহজে বুঝাইবার জন্য পুস্তকখানিতে বিস্তর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্বোৎকর্ষে বঙ্গললনা ও বাঙ্গালী দাত্রীদের উপযোগী হইয়াছে।

মুন্দরী বাবু (microscope) মাইক্রোস্কোপকে “দূরবীণ” বলিয়াছেন। এটা কি ঠিক হইয়াছে? আমরা ত (telescope) টেলিস্কোপকেই দূরবীক্ষণ বা দূরবীণ বলিয়া জানিতাম।

ডাক্তার।

### আহত জনের প্রথম প্রতিকার—

First Aid to the Injured (In Bengali). শিলচর মিলিটারী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীমহিমচন্দ্র জৌধরী প্রণীত। ১৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দ. আনা।

আকস্মিক দুর্ঘটনা সংসারে প্রতিদিনকার ব্যাপার বলিলেই হয়। হাত পা ভাঙা, জলে ডুবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি দৈব বিপদ আমাদের চাবিদিকে নিয়তই ঘটিতে দেখি। ইহাদের রীতিমত চিকিৎসার জন্য সুশিক্ষিত ডাক্তারের যে সাহায্য আবশ্যিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বে স্থানটিতে দৈববিপদ ঘটে, সেখানে যে ডাক্তার উপস্থিত থাকিবে এমন আশা কেহই করিতে পারেন না।

সুতরাং আহত অনেক প্রথম চিকিৎসার ভার ঘটনাঙ্কলে যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদেরই গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে কোন দুর্ঘটনায় কি করা উচিত—সে বিষয়ে সকলেরই একটু আধটু জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ছঃধের বিষয়, আশাদের দেশে, সাধারণের এ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। আমরা বিপদের সময়, রোগীকে লইয়া এমন সব ব্যাপার করিয়া বসি, যাহাতে অনেক সময় রোগীর সুবিধা না হইয়া বিশেষ অসুবিধাই হইতে দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবার সম্ভব। হঠাৎ মুচ্ছিত হইয়া পড়া খুবই সাধারণ বলিতে হইবে। মুচ্ছাবস্থায় রোগীকে উঠাইয়া বসাইতে বা দাঁড় করাইতে নাই, তাহাতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে—এহলে রোগীকে চিত করাইয়া শোয়াইয়া রাখিতে হয় এবং তাহার মাথাটা শরীর অপেক্ষা একটু নীচ করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি। মুচ্ছাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয়—দুর্বল হৃৎপিণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ঠেলিয়া মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ করিতে পারে না, এই কারণেই রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এরূপ হলে রোগীকে সোজা করিয়া বসাইলে, তাহার মুচ্ছা-অপনোদনের আর সম্ভাবনা কোথায়? এ-সকল বিষয় বুঝিতে হইলে, Physiology (শারীর-ক্রিয়া) বিদ্যায় সকলেরই একটু আধটু জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এ বিদ্যাটি চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বিলাতে কিন্তু অগুরূপ ব্যবস্থা, সেখানকার বাসিক পত্রাদিতে এবং শিশু বিদ্যালয়ে এ-সকল বিদ্যার ব্রীতিনত আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার ফলে, সে দেশের লোকদের আহতজনের প্রথম চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়। আমরা মহিমবাবুর এই চেষ্টাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি এই পুস্তক-খানিতে আহত ও পীড়িত জনের প্রথম প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টি বুঝাইবার জন্য পুস্তকখানিতে অনেকগুলি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার।

### যৌন-নির্বাচন—

শ্রীযুক্ত রাজা ও ফিউডেটরি চীফ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব প্রণীত।

আমরা ইতিপূর্বে একখানি গ্রন্থের সমালোচনায় কবির ওড়িয়া কবিতার বঙ্গানুবাদের পরিচয় দিয়াছিলাম। এখানি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত মূল কবিতাগ্রন্থ। যে প্রাকৃতিক আকর্ষণে sexual selection বা যৌন নির্বাচন হয়, তাহাতে কাব্যরস যথেষ্ট থাকিলেও, আমরা সে তত্ত্ব ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেই পড়িয়া থাকি; কিন্তু কবি জীব-অভিব্যক্তির ঐ রহস্যটুকু লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এই কবিতা-গ্রন্থে কবি একদিকে তাঁহার বিজ্ঞান-আলোচনার এবং অন্যদিকে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবির ভাষা সম্বন্ধে একটু কথা বলিবার প্রয়োজন। যে-সকল শব্দ সাধারণতঃ প্রচলিত ওড়িয়া সাধুভাষাতেও ব্যবহৃত নাই, এবং যে-সকল শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাতিয়া সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হইতে বাহির করিতে হয়, সে-সকল শব্দ কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। রচনা যত সরল এবং সুবোধ্য হয়, কবিতার ভাব ততই মধুর এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া থাকে। প্রেম-অভিব্যক্তির কবিতার অপ্রচলিত কঠোর শব্দ অনেক হলে কবিতার সৌন্দর্য

কথঞ্চিৎ মলিন করিয়াছে। আশা করি, রাজা বাহাঁদুর তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনায় প্রচলিত ওড়িয়া শব্দের প্রতি অসুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

শ্রী—

### সংস্কৃত-শিক্ষা—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাগ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ শর্মা প্রণীত। গ্রন্থকার পূর্বে মুরাদাবাদ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, এখন তিনি বৃন্দাবনস্থ গুরুকুলের সংস্কৃত-শিক্ষাপক।

এখন চারিদিকে Direct methodএ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষাপুস্তকখানিও খুব সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই বিরচিত। গ্রন্থখানি ভূমিকাশূন্য বলিয়া গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারা যায় না। কিন্তু পুস্তকের পাঠ-গুলির সমাবেশ দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে হিন্দী ভাষা হইতে সহজে Direct methodএ সংস্কৃত শিক্ষা দিতে গ্রন্থ কয়খানি রচিত হইয়াছে।

সে উদ্দেশ্যে যে বিশেষ সফল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কারণ প্রথম ভাগ ২৭ পৃষ্ঠাতে সমাপ্ত। তাহার শেষ অংশে পত্র-লেখন-প্রণালী দেওয়া আছে, ও বালকের পক্ষে বেশ একটু কঠিন একখানি পত্র লিখিত আছে। পাঠগুলি বালকদের শিক্ষার শক্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ছ ছ করিয়া শক্ত হইয়া চলিয়াছে।

ইহাকে Direct methodএ লিখিত সংস্কৃত-শিক্ষা বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকে Exercise সংযুক্ত করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাঠ বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং পাঠগুলির হিন্দী সংস্কৃত অনুবাদ আছে। পাঠগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে, অনেকটা বর্তমানের প্রয়োজনানুগত।

সংস্কৃতের ঞায় অপ্রচলিত ভাষাতে এরূপে গ্রন্থ রচনা করাও সহজ নহে। তবে যাহারা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের বহু উপকরণজাল ও পারিভাষিকতা হইতে অবশ্যজাতব্য সরল অংশটুকু বাছিয়া বাহির করিয়াছেন তাহারা সকল ছাত্রের ধন্যবাদার্থ। এইক্ষেত্রে একমাত্র মহাপুরুষ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর, আর সকলে তাহার পথানুবর্তী। হিন্দিতে পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগরের পন্থাই অনুগমন করেন। এই বন্ধুমান গ্রন্থখানিও প্রধানতঃ সেই ভিত্তির উপরেই স্থাপিত। বঙ্গদেশ হইতে উদ্ভাবিত সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী যে কতদূর পর্যাস্ত তাহার কৃতকার্য্যতা প্রমাণ করিয়াছে এই গ্রন্থেই তাহার সাক্ষী।

যাহা হউক Direct methodএ লিখিত নহে হইলেও ব্যাকরণ ও Exercise হিসাবে পুস্তকখানি বেশ ভাল হইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষ চমৎকারিত্ব তাহার তৃতীয় ভাগের সন্ধি-প্রকরণে। সন্ধিপ্রকরণটা গ্রন্থকার পাণিনীর Phonetic সূত্রগুলির দ্বারা খুব সহজে চমৎকার বুঝাইয়াছেন। বিষয়টি এত সরল করিয়াছেন যে, যে-কোন সংস্কৃতশিক্ষক শিক্ষার্থীকে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারেন—এবং সন্ধিপ্রকরণের সূত্রগুলি বেশ নিপুণতার সহিত বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার যে প্রাচীন প্রণালীর ব্যাকরণে বেশ সুপণ্ডিত তাহা তাঁহার সন্ধিপ্রকরণেই বোধ-করা যায়। তিনি যদি এইরূপ সুগম করিয়া লঘুকৌমুদী ও সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ দুখানি লেখেন তবে ছাত্রগণের অত্যন্ত উপকার হইবে। ভাল সূত্রব্যাখ্যার অভাবে লঘুকৌমুদী বা পাণিনী ছাত্রগণের শক্তির অতীত হইয়া রহিয়াছে।

কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা সহিত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল্য সাধারণ ছাত্রের শক্তির অতীত।

এই ব্যাকরণে তিগন্ত স্ববস্ত পদ সাধনের কোন সূত্র নাই। যদিও লিঙ্গ ও অস্ত বর্ণানুসারে শব্দসমূহের রূপ গুণ প্রকরণ অনুসারে ষাত্ত্ব সমূহের রূপ করা আছে, তবু তাহা সাধিব্যাকরণের কোন নিয়ম লেখা নাই। সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ, লিঙ্গ, প্রত্যয়, মত ও গহ বিধি একেবারেই নাই। তারপর প্রথম পাঠ হইতে ষাত্ত্ব ও শব্দরূপ ছাড়া একপা পথও অগ্রসর হইবার উপায় দেখান নাই। কৃৎ ও তদ্ধিত দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা যে কতকটা সোজা হয় এবং চলিত ভাষা হইতে সংস্কৃতে যাইবার যে দুইটি সেতু, গ্রন্থকার তাহা দেখান নাই। সংস্কৃতে Direct method উদ্ভাবন করিতে হইলে এই পথেই চলিতে হইবে, তাহা বলা নিম্নয়োজন।

তথাপি ব্যাকরণ ও Exercise সাজাইয়া হিন্দী-ভাষাভাষী ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যাকরণখানিকে অত্যন্ত উপাদেয় করা হইয়াছে। সন্ধিপ্রণালীটা ব্যাকরণানুযায়ী অথচ সরল করিয়া ছাত্রদের সংস্কৃতবোধ অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। তাহার নিকট এইরূপ মূলত অথচ সহজবোধ ব্যাখ্যা সমেত সুসম্প্রীত লণ্-কৌমুদী ও সিদ্ধান্তকৌমুদী পাইতে ইচ্ছা করি। তাহা দ্বারা তিনি ভারতের তান্ত্রিক সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়া রহিবেন।

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—

(তিনভাগ একত্রে) শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃ: ৫২৭; মূল্য ১।।০ (প্রাপ্তির স্থল শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা)।

আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তিনখণ্ড একত্রে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে :—(১) সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয় (২) মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না (৩) পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য (৪) সাকার ও নিরাকার উপাসনা (৫) ব্রহ্মোপাসনার বিষয়ে আপত্তি খণ্ডন (৬) প্রার্থনা-তত্ত্ব (৭) প্রকৃত শাস্ত্র (৮) আত্মার স্বাধীনতা (৯) পাপ কি? (১০) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (১১) মঙ্গল-ময়ের, রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (১২) অবতারবাদ, (১৩) অনাস্ত্র-বাদেব অনৌক্তিকতা (১৪) আত্মার অমরত্ব (১৫) স্বর্গ, নরক ও মুক্তি। বিষয়গুলি অত্যন্ত কঠিন এবং এই গ্রন্থে এ সমুদয়ের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সহজেই মনে হইতে পারে গ্রন্থ দুর্কোধ্য। কিন্তু তাহা নহে; দার্শনিক তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমরা পড়ি নাই। ইংরাজী ভাষাতেও এ প্রকার পুস্তক দুর্লভ। কেয়ার্ড (Caird) কিংবা মার্টিনো (Martineau) যদি এই গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলেও ইহা তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয় হইত। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার উপ-যুক্ত আদর হয় নাই। 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' যেমন সরল ও বিশদ, তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ। একদিকে যুক্তি অপরদিকে রসিকতা—উভয়ের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। এমন গ্রন্থ যে জনসমাজে বহুল প্রচারিত হয় না—ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। বাঙ্গালা পাঠকের মস্তিষ্ক কি এতই ক্ষীণ যে এ প্রকার দার্শনিক গ্রন্থও অধ্যয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে?

(১) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর দর্শন (প্রথম ভাগ)—

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম এ, প্রণীত। পৃ: ১১০।১২৩৬, কাগজের মলাট, মূল্য দুই টাকা।

(২) অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—

শ্রীশ্রীতানুশঙ্করভূষণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। পৃ: ১০০।২০৬, কাগজের মলাট, মূল্য এক টাকা।

উভয় গ্রন্থই দার্শনিক ও তত্ত্ববিষয়ক এবং উভয় গ্রন্থকারই চিন্তা-শীল ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

দ্বিজদাস বাবু ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—

“গুরুবয়সে, ক্ষীণ চক্ষু এবং ক্ষীণ মস্তিষ্ক লইয়া আমাকে একাকীই সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিতে হইতেছে। তবে আমার অনেক আত্মীয় এবং আত্মীয় দয়া করিয়া হস্তালিপি এবং পুস্তক সংশোধন দ্বারা আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন।...ভ্রমপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে। সারা জীবনের পরিশ্রম মাটি হইবে, এই ভয়ে “বাম-নের চন্দ্রে হাত” মনে না করিয়া আমি শঙ্করদর্শন দেশে সুপরিচিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কারণ শঙ্করদর্শন ভারতমাতার মণিষ্মরূপ। ভবিষ্যতে যখন উপযুক্ত লোক এই কাগাসাধনে ত্রুটি হইবেন, আমার এই পরিশ্রম দ্বারা যদি তাহার কোন সাহায্য হয়, তবেই আমার এই গুরুবয়সের যত্ন সকল মনে করিব।”

এই গ্রন্থের ছয় অধ্যায়; প্রথম অধ্যায়ে শঙ্করের জন্ম ও বাল-চরিত; দ্বিতীয় অধ্যায়ে শঙ্করের শিষ্যবর্গের অভ্যুদয়; তৃতীয় অধ্যায়ে শঙ্করের জন্মের চরিত্র এবং সম্রাস গ্রহণ; চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা; পঞ্চম অধ্যায়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত ও বিচার; ষষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্করের অপরামর্শ দার্শনিক সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিজদাসবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন “শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নামরূপাদি সর্ববিধ উপাধির অতীত, কেবল জাত্বরূপ।” এস্থলে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিবে না। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ‘জ্ঞানম্’ ইহাই সত্য। তাহাতে জাত্ব উপাধি করা যায় না (তৈ: ভা: ২।২)। গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—“অবিক্রিয় বিজ্ঞানস্বরূপে বিজ্ঞাত্ব উপচার করা হইয়াছে—বিজ্ঞাত্বদোষ-চারিৎ (১৩।৩।” আত্মার জাত্ব, কর্তৃত্ব, দৃষ্ট্বাদি সমুদয়ই উপ-চার বশত:;—‘কর্তৃত্বমুপচর্যাত আত্মন: (বৃ: ভা: ৪।৩।২), তেন কর্তৃত্বমুপচর্যাত ন স্বত: কর্তৃত্বম্ (৪।৩।৩); তেন উপচর্যাত জ্ঞেয়া ইত্যাদি (৩।৪।২)।

লেখক বলেন :—“বস্তুত: শঙ্করের উক্তির সহিত পঞ্চদশীর উক্তি-সকলের তুলনা করিলে, আমরা পঞ্চদশীর মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই বৈদান্তিক সংস্করণ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। যে অর্থে পঞ্চদশী মায়াবাদী, সেই অর্থে শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলিলে, শঙ্করের প্রতি অবিচার করা হইবে। এবং অবি-চার যে করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই” (পৃ:—১৯১)। দার্শ-নিক ক্ষেত্রে শঙ্কর মায়ালব্দ মুখ্য অর্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিচিহ্ন জগৎ-রচনা-কৌশল অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, শূন্যায়ক ঐশ্ব-জালিক রচনা বা ভ্রমদর্শনাদি গৌণ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন না। তিনি নিজে তাহার মতকে মায়াবাদ নাম প্রদান করেন নাই। এমন কি মাধবাচার্য্যও শঙ্করের মতকে—‘বিবর্তবাদ’ নামেই অভি-হিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে মায়াবাদ বলিতে

হইলে, মায়াশব্দের অর্থ “অষ্টন-ষটন-পাটয়সী ঐশীশক্তি” বা পরাশক্তি করিতে হয়।” পৃ: ১৯৯/২০০। অনেকে দ্বিজদাসবাবুর এ ব্যাখ্যাকেও প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

লেখক শব্দের সমুদয় মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই, দার্শনিক বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে তাঁহার সমুদয় মত গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ইহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থে তিন অংশ। প্রথম অংশে (পৃ: ১—১০২) বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ; দ্বিতীয় অংশে (পৃ: ১০৩—১০৮) সুলী অদ্বৈতবাদ; এবং তৃতীয় অংশে যুরোপীয় অদ্বৈতবাদ (পৃ: ১০৯—২০৬) আলোচিত হইয়াছে।

লেখকের মতে “জ্ঞানই আত্মার মূলস্বরূপ”—এবং এই মতের উপরই তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত। এবং এই মতের সাহায্যেই তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সময়ে যে-ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, যে-ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞাতরূপেই গ্রহণ করা হয়, সে ব্রহ্ম চিরদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না এবং এই প্রকার “জ্ঞানসর্বস্ব” ব্রহ্ম যে-দর্শনের ভিত্তি,—সে দর্শনও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। বর্তমান যুগের ধাত্যাপন্ন অধ্যাত্মবাদিগণও বুঝিতে পারিয়াছেন যে জ্ঞান সমুদয় অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেছে না; দর্শনের ভিত্তি এবং ব্রহ্ম—উভয়েরই প্রসার আবশ্যিক। সুখের বিষয় সীতানাথ বাবুর দর্শনের ভিত্তি কেবল জ্ঞানমূলক হইলেও—তাঁহার দর্শন ‘জ্ঞানসর্বস্ব’ নহে, সমগ্র আত্মাকেই তিনি দর্শনের বিষয় করিয়াছেন। তবে জ্ঞানমূলক দর্শন সমগ্র আত্মাকে নিজের বিষয়ীভূত করিতে পারে কি না তাহা বিচার্য। ‘বিষয় অশ্বতন্ত্র, জ্ঞানের আশ্রিত’—ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া সীতানাথ বাবু ঐতরের উপনিষৎ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং; প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম—“এই সমুদয় প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; লোক ‘প্রজ্ঞানেত্র’; প্রজ্ঞা সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা; প্রজ্ঞা ব্রহ্ম।” সীতানাথ বাবু বলিতে চাহেন সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞার “বিষয়” সূত্রাং জগৎ অশ্বতন্ত্র। আমাদের মনে হয় বিষয়ীর সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, এখানে সে সম্বন্ধের কথা বলা হয় নাই। যে অর্থে বলা হয় ‘সমস্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত’ ‘প্রাণে প্রতিষ্ঠিত,’ ‘আনন্দে প্রতিষ্ঠিত,’ সেই অর্থেই এখানে বলা হইয়াছে সমস্ত প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এ অংশের সহিত প্রাচীন কিম্বা নবীন অধ্যাত্মবাদের (Idealismএর) কোন সম্বন্ধ নাই। আর বিজ্ঞানবাদ কখনও বলে না যে বিষয়ী বিষয়ের ‘চালক’।

প্রাগোপনিষৎ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

হে সৌম্য! যেমন পক্ষিগণ বাসের জন্ত বৃক্ষ আশ্রয় করে সেইরূপ এই সমস্তই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। ৪।৭।

এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে “বিষয় অশ্বতন্ত্র, জ্ঞানের আশ্রিত।” এই প্রমাণিত হয় যে “সমুদয়ই অশ্বতন্ত্র এবং পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।”

উদ্ধৃত অপরাপর অংশও এই প্রকার।

সীতানাথবাবু বলিতে চাহেন শঙ্করাচার্য্য অধ্যাত্মবাদের বিরোধী নহেন কারণ তিনি বলিয়াছেন যে সমস্ত জগৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রিত। এ মত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে “জ্ঞান বস্তুতন্ত্র—পুরুষতন্ত্র নহে” ( বে: ভা:

৩২।২১ )। এবং বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইয়াও যে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে এ বিষয়ে অনেক যুক্তি দিয়াছেন (২২।২৮)। দ্বিতীয় কথা শঙ্কর পরব্রহ্মের ‘জাত্ব’ই স্বীকার করেন না, সূত্রাং এ জগৎ যে ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয় হইয়া আছে তাহা বলাই অসম্ভব।

দ্বিজদাসবাবু এবং সীতানাথবাবু উভয়েই পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করিয়াছেন। সীতানাথবাবুর গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সমর্থিত হইয়াছে; দ্বিজদাসবাবু ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। সীতানাথবাবু বলেন “কোন-না-কোন আবরণ ব্যতীত জীব-ব্রহ্মের ভেদ অসম্ভব।” আমরা ‘আবরণ’এর অর্থ বুঝি না। যাহাকে দেহ বলা হয় তাহাও আবরণ নহে, সমুদয়ই ব্রহ্ম কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট। একস্থলে বলিয়াছেন—“কোন-না-কোন প্রকার শরীর, স্নায়বিক যন্ত্রের আয় কোন-না-কোন জড়ীয় আশ্রয় একান্ত আবশ্যিক।” অপর একস্থলে লিখিয়াছেন—“স্থূল শরীর না থাকিলেও কোন-না-কোন প্রকার সূক্ষ্মশরীর জীবাশ্রয় পক্ষে চিরকালই অনাশ্রয়্যাবী বলিয়া বোধ হয়... সমীম জ্ঞান বলিলেই কোন-না-কোন বেষ্টন বুঝায়—সে বিষয় স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক।” অশরীরী আত্মা কি ভাবে কার্য্য করেন তাহা জানা সম্ভব না হইলেই কি কল্পনা করিতে হইবে ইহার পক্ষে একটা দেহ আবশ্যিক। আর ‘সমীম জ্ঞান’ বলিলেই ‘জড়ীয়’ বেষ্টন বুঝাইবে ইহার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। জ্ঞান যদি ‘গাস’এর মত কোন জিনিষ হইত তাহা হইলে বোতলের মত একটা বেষ্টন বরং স্বীকার করা যাইত। আর সমীম জড়েরই কি সব সময়ে বেষ্টন থাকে?

‘স্মৃতি নাই’ সূত্রাং পুনর্জন্মবাদ গ্রহণ করা যায় না—দ্বিজদাসবাবু এই যুক্তি দিয়াছেন। সীতানাথবাবুর নিকট এ যুক্তির কোন মূল্য নাই, কারণ তিনি বলেন বাল্যকালের স্মৃতিও ত আমাদের নাই। এখানে আমাদের বক্তব্য এই—মানবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার যে একত্ব—ইহার প্রমাণ একমাত্র স্মৃতিই। বাল্যকালের স্মৃতি না থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমান সময়ের ঠিক পূর্বে যে সময়—তাঁহার স্মৃতি ত আছে। এ স্মৃতিও যদি না থাকিত তবে আত্মার একত্বই থাকিত না। স্মৃতি নাই অথচ ‘পূর্বমুহূর্তের আমি’ এবং ‘বর্তমান মুহূর্তের আমি’—এই উভয় ‘আমি’ একই ‘আমি,’—ইহা বলাই যায় না। আর ইহাদের একত্ব স্বীকার করিয়াও কোন লাভ নাই। এই দুই ‘আমি’কে এক বলাও যাহা—‘পূর্বের আমি’ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ‘বর্তমান আমি’ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলাও ঠিক তাহাই—উভয়ের ফল একই।

আর পুনর্জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যিক কি? ইহা দ্বারা বৈষম্য প্রমাণিত হয় না। বৈষম্যকে কল্পফল বলিয়া মনে করা হয়। এখন প্রশ্ন এই :—আত্মার কি প্রথম জন্ম আছে? যদি বল আছে তাহা হইলে আবার সেই প্রশ্ন উঠিল—‘ঐ জীবনের কল্প’ কাহার ফল? আবার যদি বল প্রথম জন্ম নাই, আত্মার জন্ম অনন্ত—তাহা হইলে কোন মীমাংসাই হইল না। শেষে বলিতে হইল বৈষম্য অনন্তকালই আছে। প্রথম জন্ম স্বীকার করাও বিপদ আবার আবহমানকাল হইতে প্রত্যেকের জন্ম হইয়া আসিতেছে বলিলেও কিছু মীমাংসা হয় না। এ অবস্থায় পুনর্জন্ম কল্পনা করা আবশ্যিক।

বেদান্ত ব্যাখ্যা করিবার সময় সীতানাথবাবু সব সময়ে চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বেদান্ত সমর্থন করিবার দিকেই ইহার মনের গতি। ব্যাখ্যা দ্বারা বেদান্তের মতকে নিজের মতের অনুযায়ী করিয়া লইবার জন্ত গ্রন্থকার অনেক স্থলে চেষ্টা করিয়াছেন।



সীতানাথবাবু বিশ্বাস করেন মুক্ত আত্মারও ব্যক্তিগত থাকে—ইহা ত্রুষ্ণে বিলীন হইয়া যায় না, ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। উপনিষদে যে-সমুদয় স্থলে আত্মার জয় হইবার কথা আছে সে-সমুদয় অংশকেও গ্রন্থকার নিজের অন্তর অনুভবী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। উপনিষদের সব রকম মতই আছে। পাঁচটি অদ্বৈতবাদও আছে, আবার দ্বৈতমূলক অদ্বৈতবাদও আছে। মুক্ত আত্মার একত্ববোধের কথা আছে, আবার একত্ববোধের অতীত অবস্থার কথাও আছে। এ সমুদয় বিভিন্নভাবের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। সময় করিবার চেষ্টা করিলে মতের অপলাপ করা হয়। একটা ঐতিহাসিক সত্য আছে, এই ঐতিহাসিক সত্যকে চিরকালই বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাখ্যা করিবার সময় সব সময়ে একথাটা আমাদের মনে থাকে না। মতের একত্বে যত কল্যাণ, মতের বৈচিত্র্যে তদপেক্ষা কম কল্যাণ হয় না।

গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে শুকী অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।

তৃতীয়াংশের আলোচ্য বিদ্যে যুরোপীয় অদ্বৈতবাদ। ইহাও একটুকু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইলে ভাল হইত। তবে তাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও বেশ উপাদেয় হইয়াছে।

সীতানাথবাবুর সমুদয় মত ও যুক্তিপ্রণালী আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে তাঁহার গ্রন্থ গভীরচিন্তা-প্রসূত। এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে পাঠকগণ এই গ্রন্থ হইতে অনেক নতন তথ্য লাভ করিতে পারিবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

### পুরাতন প্রসঙ্গ—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, প্রবীত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই পুস্তকের রচয়িতা, পরম শ্রদ্ধাপন্ন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ মুখে বিবৃত কতকগুলি পূর্নস্মৃতি সঞ্চলন করিয়া লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থের অপ্রতুল নাই। Eckermann's Conversations of Goethe, Hazlitt's Conversations of Northcote, Coleridge's Table Talk, Roger's Table Talk, Boswell's Life of Johnson প্রভৃতি পুস্তকের আদর চিরকাল অক্ষয় থাকিবে। প্রাচীন ভারতেও আচার্য্যেরা অনেক স্থলেই শিষ্যদিগকে কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্য পরস্পরা সেই-সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে পরিণত করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় এ দেশের এই সনাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে এধরণের পুস্তক নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। আমাদের মত-দূর জানা আছে, বোধ হয়, শ্রীমংকথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা-মৃত" ছাড়া এরূপ প্রণালীর পুস্তক ইতিপূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কখনও রচিত হয় নাই।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল একজন দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁহার জ্ঞান অমায়িক, নিরহঙ্কার, সত্যপরায়ণ ও প্রেক্ষাবান্ মনীষী একান্ত চুল্লভ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে তাঁহার মেরুপ্রমাণ প্রগাঢ় ব্যাপ্তি ও অধিকার, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তিনি যদি মাতৃভাষার শ্রীকৃষ্ণনাথনে বঙ্গপরিষ্কার হইতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে অচিরে উচ্চতম আসন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, প্রথম যৌবনে

"বিচিত্রবীণা" নামক একখানি বীরসম্বন্ধক উপন্যাস রচনা করিয়া, তিনি তাঁহার উন্মেষোন্মুখী প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে তদনুরূপ কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। সাময়িক পত্রের মধ্যে মধ্যে তাহা কিছু লিপিয়াছিলেন এখন তাহা লুপ্তকল্প। আমাদের বেশ মনে পড়ে, বাল্যকালে "বিচিত্রবীণা" পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় এবং গ্রন্থের দেশাত্মবোধী নায়ক বীর বিচিত্রবীণার অগ্নিময় উৎসাহ ও বীরত্বপূর্ণ উত্তেজনারাবল্যে যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গ্রন্থটি এখন সব মনে নাই, কিন্তু একটি শব্দ এখনও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরুক আছে—“কান্দিশৌকতা” (poltroonery)। আচার্য্য কৃষ্ণকমল “শল-বর্জিনিয়া” নামক সুবিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস উক্ত ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া “অবোধ-বন্ধু” নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রের ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বর্তমান কবিগুলচন্দ্রামণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “জীবন-স্মৃতি” পাঠে জানা যায় যে, এই অনুবাদ তাঁহার কিশোর কল্পনাকে আকৃষ্ট ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীও প্রিয় কৃষ্ণকমলের নিকট সাহিত্যাত্মশীলনে সামান্য সহায়তা লাভ করেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যের সাহিত্য আচার্য্য কৃষ্ণকমলের সাক্ষাৎসম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয় বটে; কিন্তু তিনি যে দশবৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্রমদ্বয়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনায় বৃত্তি ছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ছাত্রবর্গের মনে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি তিনি কিরূপ অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিষ্যদ্বল্লাস করিয়া তাহারা বলি হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। রিপন কলেজেও তিনি বহুবৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এইরূপ গৌণ প্রভাবের পরিমাণ কে নির্ণয় করিতে পারে? তাহারা এখন আমাদের সমাজের নেতা এবং তাহারা বিবিধ বিধানে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শিষ্য বলিয়া স্মাখ্যা করিয়া থাকেন। জীবনের সায়াহ্নে শারীরিক দৌর্দলাবশতঃ, পূজাপাদ আচার্য্য মহাশয় সাহিত্যচর্চায় বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু এখনও তাঁহার ধারণিত ও মেধার অসামান্য ভাস হয় নাই। তাই আমরা আজ গুপ্তমহাশয়ের গুরুভক্তি ও অধ্যবসায়গুণে এই বয়ীয়ান্ মনীষীর পরিণত জ্ঞানের ও জ্ঞানোদর্শনের কলভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আলোচ্য পুস্তকখানি রচনা করিয়া গুপ্ত মহাশয় সমগ্র শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার রচনা সরস ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং তাঁহার বিশেষ গুণপনা এই যে, তিনি আচার্য্যের ভাব-নিচয় তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মতামতের বিস্তৃত উল্লেখ বা সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। এই গ্রন্থের ১০২—১১৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ভাষার রীতি-বিশুদ্ধ রচনা সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠককে তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। পূর্বে উক্ত কলেজে একজন-না-একজন বড়দের খোটা পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন। ঐ রামকমল ভট্টাচার্য্য যোগেশ্বর নামক একজন খোটা পণ্ডিতের কাছে “জীলাবত্তী” পড়েন। তিনি প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্ত গঙ্গাজল কলসে ভরিয়া কাঁধে করিয়া আনিতেন।

তুরানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন খোটাপণ্ডিত নাথুরামের নিকট গ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যে-সকল সংস্কার ও নিয়ম প্রবর্তিত করেন, আচার্য্য মহাশয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। যে-সকল মহাত্মারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান যুগের প্রথম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত, আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত “হতোম প্যাটার নগ্নার” বখোচিত প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের মূল আদর্শ টেকচাঁদঠাঁর (প্যারীচাঁদ মিত্র) কৃত “আলালের ঘরের দুলালের” তাদৃশ সমাদর করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তুরানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সার তরকনাথ পালিত, দ্বারকানাথ মিত্র ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আচার্য্যমহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শেখোক্ত দুই মনস্বীর সহিত তাঁহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তদনুরূপ তাঁহাদের পরস্পরের সাহিত্য-সংলাপ শুনিব বলিয়া যে আশা করিয়া-ছিলাম তাহা পূর্ণ হয় নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের বক্তা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার পেশাদারি থিয়েটারের পূর্বতন থিয়েটারের যে কৌতুক-পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন তাহা আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। বাল্যকালে প্রাপ্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা” নামক একখানি হাস্যরসাত্মক নাটক পাঠ করিয়া প্রীতলাভ করিয়া-ছিলাম। তাহার একটি কবিতা এখনও স্মরণ হয় :—

“শ্রীপাট খড়দার ঘাটে,            নিত্যানন্দ পাঁটা কাটে,  
অষ্টমত ধরেছে তার মুড়ি।  
যত সব নেড়ানেড়ি,            মুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি,  
চৈতন্য দেখেন ছড়াছড়ি ॥”

উপসংহারে একটি ভ্রমের উল্লেখ করিব। “পুরাতন প্রসঙ্গের” ১৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, “পণ্ডিত গিরিচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্বপ্রথম মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত শকুন্তলা প্রকাশ করেন।” সংস্কৃত পাঠক-বর্গের অবিদিত নাই যে মল্লিনাথ “অভিজ্ঞান-শকুন্তলের” কোনও টীকা করেন নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

### সহজ ফটোগ্রাফী শিক্ষা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। ফটোগ্রাফী শিক্ষা আজকাল এতই সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য কতগুলি মোটামুটি উপদেশ লাভ করিয়াই, যে কেহ, অন্তত কোনরকমে কাজ চালাইবার মত ফটোগ্রাফার হইতে পারেন। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ অথবা এই প্রণীত শিক্ষাপুস্তকের দ্বারা বাস্তবিক শিক্ষার্থীর কোন উপকার হয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভাষা-শৈথিল্যে গ্রন্থখানি অনেক স্থলেই বিশদ হয় নাই। বিষয়: নির্বাচন ও মুখ্য গৌণ বিচারে লেখকের মাত্রাজ্ঞানের বিশেষ অভাব লক্ষিত হইল। লেন্স এক্সপোজার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয় সামান্য দুচারি কথায় সারিয়া লেখক অনেক অবাস্তব বিষয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন। পুস্তকে অনেক অযৌক্তিক মত ও ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

মু।

## কানাডায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা

উত্তর আমেরিকায় কানাডা নামে যে ব্রিটিশ উপনিবেশ আছে, তাহাতে এখন প্রায় ৫০০০ ভারতবাসী বাস করে। ইহারা প্রায় সকলেই পুরুষ, স্ত্রীলোক ২৪ জন মাত্র আছে। চাষের কাজ ও অন্যান্য প্রকার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্ত ইহারা ১৯০৫-০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কানাডায় যাইতে আরম্ভ করে। ১৯০৭এর পর হইতে নানা কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে কানাডাবাসীর বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, এই বিদ্বেষ ভাব তাহাদের কোন দোষের জন্ত নহে। কারণ, তাহারা পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র, প্রভুভক্ত, বাধ্য এবং পানদোষাদিশূণ্য। অধিকন্তু, তাহারা জাপানী ও চীনা কুলিদের মত অল্প পয়সায় কাজ করে না, কানাডার শ্বেতকায় কুলিদের সমান মজুরীতেই তাহারা কাজ করে। সুতরাং এ কথা বলিবার যো নাই যে তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়া শ্বেতকায় মজুরদের বেতন কমাইয়া দিতেছে। সম্পন্ন কৃষক ও অন্যান্য যাহাদের মজুরের দরকার, তাহারা এই ভারতবাসী শ্রমজীবীদিগকেই পছন্দ করে। তাহারা যে সকলেই মজুর, তাহা নহে। অনেকেরই নিজের জমী জায়গা আছে, অনেকে জমী কেনা বেচার ব্যবসা করিয়া ৮১০ হাজার করিয়া টাকা জমাইয়াছে। এক জনের কারবারের মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

ইহাদের অধিকাংশই শিখ। কানাডার গবর্নমেন্ট কৌশল করিয়া এখন আর কোথাও ভারতবাসীকে তথায় যাইতে দিতেছেন না। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে এই ৫০০০ হাজার পুরুষকে হয় স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইবে, নয় কানাডায় থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে হইবে;—তাহাদের বংশবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের তথায় যাইবার কোনই উপায় নাই।

যে কৌশলে ভারতবাসীর কানাডা যাওয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই :—

কোনও যাত্রী যদি তাহার নিজের দেশ হইতে ক্রমাগত একই জাহাজে এক টিকিটে কানাডায় না



নারায়ণসিং, নন্দসিং সিংহা, বলবন্ত সিং ।

আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিতে দেওয়া হইবে না।

ভারতবর্ষ হইতে একায়েক কানাডা পর্য্যন্ত কোন জাহাজ যাতায়াত করে না। ভারতবর্ষ হইতে কানাডা যাইতে হইলে চীন দেশের হংকং দিয়া বা অল্প পথে যাইতে হয়। সুতরাং এই কৌশল দ্বারা ভারতবাসীদিগের কানাডা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

প্রতি বৎসর চারি শতের অনধিক জাপানী কানাডা যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৫০ টাকা থাকিলেই হইল। এই দুটি নিয়ম পালন করিয়া যেকোন জাপানী কানাডা যাইতে পারে, সেখানে নিজ পরিবার লইয়া যাইতে পারে, বা তথায় বিবাহ করিতে পারে। এই

সব জাপানীদের কানাডাবাসীদের মত সমুদয় রাজনৈতিক অধিকার জন্মে।

চীনারাও মাথাপিছু ১৫০০ টাকা দিলেই কানাডা যাইতে পারে। তাহারা প্রত্যেকে ইচ্ছা করিলে এক বা একাধিক পত্নী আনিতে পারে। জাপানীদের মত ইহাদেরও রাজনৈতিক অধিকার জন্মে।

কিন্তু ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হইলেও তাহাদের কানাডা যাইবার ক্ষেত্র নাই। ভারতবাসীদের প্রতি একপ অল্পগ্রহের একটি কারণ নিচে ইয়কের লটারেরী লাইভেট্ট নামক কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ হুড্রাস আমেরিকার একটি বৃটিশ উপনিবেশ। তথাকার গবর্নর সার এরিক্ জন্ অংগল্‌স্‌ সোয়েন এক সময়ে ভারতবর্ষে সেনানায়কের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, “কানাডায় ভারতবাসীরা স্বাধীন হইতে শিখে, জাতিভেদ রূপ সামাজিক প্রথাকে অবজ্ঞা করিতে শিখে। সুতরাং তাহারা যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া যায়, তখন তাহারা অসামঞ্জস্য ও অমিলনের হেতু হইয়া ভারত গবর্ন-মেন্টের সহিত প্রজাদের মনোমালিন্য জন্মায়, এবং এই প্রকারে ভারত গবর্নমেন্টের প্রায়ঃ সম্বন্ধে আশঙ্কার উদ্রেক করে।”



হাকিম সিংহের পরিবার ; কানাডায় যাইবার টিকিটের জন্য দুবৎসর রুখা হংকং অপেক্ষা করিতেছেন।



হাকিম সিং ( উপবিষ্ট ) ও তাঁহার ভাড়া জীবনসিং ( দণ্ডায়মান ) ।

সুতরাং ভারতের নিমকখোর এই গবর্ণর মহাশয়ের মত এই যে ভারতবাসী কোথাও একটু মাথা উঁচু করিয়া বাস করিবার সুযোগ পাইলেই ভারত গবর্ণমেন্টের বিপদ। অতএব ভারতবাসীদিগকে চির পরাধীন ভাবে ভারতবর্ষে বন্ধ করিয়া রাখাই ভাল।

যাহা হউক, ইহা হইতে দুটি বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটা উচিত। ( ১ ) আমরা বর্তমান অধিক সংখ্যায় স্বাধীন দেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হই, ততই মঙ্গল; সুতরাং আমাদের বিদেশ যাত্রার অধিকার যাহাতে লুপ্ত না হয়, তজ্জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। ( ২ ) জাতিভেদ আমাদের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের একটি অন্তরায়; যদি কোন ইংরাজ এই প্রথার প্রশংসা বা সমর্থন করে, তবে তাহার অভিসন্ধি সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্যে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাডা গবর্ণমেন্ট, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, স্থির

করেন যে কানাডাপ্রবাসী সমুদয় ভারতীয়কে বৃটিশ হুগুরাস্ নামক অল্পদূর, জলশূণ্য, আরণ্য প্রদেশে চালান করিয়া দেওয়া হউক। কানাডায় ভারতবাসীরা গড়ে জনপ্রতি মাসিক ১৮০ রোজগার করে। কানাডা গবর্ণমেন্ট হুগুরাসে তাহাদিগকে মাসিক নগদ ২৪ টাকা এবং আন্দাজ ১২ টাকার আটা, চাল, ডাল আদি সিধা দিতে অঙ্গীকার করেন। অধিকন্তু তাহাদিগকে কানাডার স্বাধীন মজুরীর পরিবর্তে তথায় চুক্তিবদ্ধ কুলির মত কাজ করিতে হইত। কানাডা গবর্ণমেন্টের কি দয়া, কি ঋণ-পরতা! আর আমাদের গবর্ণমেন্টই বা কেমন করিয়া একরূপ প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন, তাহাও বড় আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক, কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়গণ এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় তাহারা এখনও তথার স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ অবিচার হইতেছে, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হীরা সিং কানাডার ভ্যাঙ্কুবর সহরে প্রায় ৪ বৎসর



ভাগ সিং এবং তাঁহার পরিবার।

বাস করিয়া তাহার পর স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্ত দেশে আসেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই মন্টিগন্ নামক জাহাজে ভ্যাঙ্কবর পৌঁছেন। তিনি পূর্বে কানাডার অধিবাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিতে দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষে চালান করিবার চেষ্টা করা হয়। হীরা সিং ভারতবর্ষে ইংরাজ পণ্টনে থাকিয়া ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন;— তিনি ভাবিষ্ঠে লাগিলেন, রাজভক্তির বেশ পুরস্কার যাহোক। তিন হাজার টাকার নগদ জামিন দিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া তিনি আদালতে দরখাস্ত করিলেন। মোকদ্দমার ফল এই হইল যে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে আদালত “দয়া করিয়া” তাঁহার নিকট থাকিতে দিলেন।

ভাগ সিং ও বলবন্ত সিং দুজনেই ইংরাজ পণ্টনে সিপাহী ছিলেন। দুজনে ৩ বৎসরের উপর ভ্যাঙ্কবরে থাকিয়া স্ব স্ব স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আনিবার জন্ত দেশে যান। কলিকাতার জাহাজ-কোম্পানীরা তাঁহাদিগকে একায়েক কানাডা যাইবার টিকিট বিক্রী করিতে অসম্মত হয়। তিন মাস ধরিয়া কলিকাতায় টিকিট কিনিবার বিফল চেষ্টা করিয়া তাঁহারা শেষে ভারত গবর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত করেন। গবর্ণমেন্ট বলেন, “অবশ্য তোমরা যাইতে পার;—কেবল কানাডার আই মানিলেই হইবে।” কিন্তু সেটা যে অসম্ভব! তার পর তাঁহারা হংকঙ্গে আসিয়া তথা হইতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যস্থিত সান ফ্রান্সিস্কো সহরে জাহাজ হইতে নামিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তথাকার যাত্রী-কর্মচারীরা বলে, “তোমরা বৃটিশ প্রজা, বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত কানাডায় তোমাদিগকে নামিতে দেয় না, আমরা কেন তোমাদিগকে আমাদের দেশে নামিতে দিব?” অতএব তাঁহাদিগকে আবার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া হংকং ফিরিয়া আসিতে হইল। সেখানে তিন মাস থাকিয়া তাঁহারা আবার কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া ১৯১২ সালের ২২শে জানুয়ারী ভ্যাঙ্কবর পৌঁছিলেন। তাঁহারা দুজনেই

পূর্বে ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইল, কিন্তু তাঁহাদের পরিবারবর্গকে নামিতে দেওয়া হইল না। তখন ভাগ সিং ও বলবন্ত সিং ৬০০০ টাকার নগদ জামিন দিয়া কানাডা গবর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত করিলেন। মোকদ্দমায় বিস্তর টাকা খরচ হইল। তাহার পর “দয়া করিয়া” কানাডা গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের পরিবারবর্গকে তাঁহাদের নিকট থাকিতে অনুমতি দিলেন।

এইরূপ দুই এক স্থলে মাত্র কানাডাগবর্ণমেন্ট “দয়া” করিয়া ভারতবাসীর জ্ঞাপরিবারকে কানাডা প্রবেশ করিতে দিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহারা কানাডা যাইতে পারিতেছেন না।

হাকিম সিং উর্দাবংশ বেঙ্গল ল্যান্সার্স অখারোহী সৈন্যদলে ছিলেন। তিনি কানাডায় অনেক টাকা জমাইয়া পরিবারবর্গকে আনিতে দেশে যান। কিন্তু তাঁহার পরিবার এই দুই বৎসর হংকঙ্গে টিকিটের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু টিকিট পাইতেছেন না। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের একজন অমুরক্ত সিপাহীর প্রতি ইচ্ছা বড়ই অবিচার।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কয়েকমাস হইল, নারায়ণ সিং, নন্দ সিং সিং এবং বলবন্ত সিং কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের দুর্দশার কথা স্বদেশবাসীর গোচর করিতেছেন। তাঁহারা পথে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষকে বক্তব্য জানাইয়া আসিয়াছেন।

## অরণ্যবাস

[ পূর্বে প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ার কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্শ্বত্যা বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তদ্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বন্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের

জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অমুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।]

### দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্নান-হার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈঠকখানায় বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ইনিই আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—যাঁর কথা তোমাকে বলছিলাম।”

সতীশচন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ইনি আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; এক্ষণে গভর্ণমেন্টের পক্ষে পুরুলিয়া জেলার কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় সতীশবাবুর পরিচয় শুনিয়া আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবাজীবনের নিবাস কোথায়?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “বালী,—উত্তরপাড়া।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “বালী উত্তরপাড়া! ওঃ, উত্তরপাড়ার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় যে আমার ভগ্নীপতি ছিলেন।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “বটে? কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় আমাদের দূর জ্ঞাতি। তাঁকে আমরা ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। তাঁর তো অনেক দিন স্বর্গলাভ হয়েছে।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “হাঁ, প্রায় পঁচিশবৎসর হ'ল, তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমার বিধবা ভগ্নীটি এখনও জীবিত আছেন। তাঁর কোনও সন্তানাদি নাই। আপনার পিতার নাম?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “ও কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন “হাঁ, তাঁর নাম শুনেছি,

বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল না। আমি পেটের আলায় এই দূরদেশে প'ড়ে আছি, বাবা। ভগ্নীটি বিধবা হওয়ার পর থেকে আর আপনাদের দেশে যাওয়া আসা নাই। এই কুস্থানেই প'ড়ে আছি। যা হোক, আজ বাবাজীবনকে এখানে দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। বাবাজীবন কোথায় বিবাহ করেছেন?”

সতীশচন্দ্র একটু মুস্কিলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন “আমি বিবাহ করি নাই।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন “বিবাহ করেন নাই? সে কি কথা? আপনি কুলীন সন্তান—, আপনার আবার বিবাহের অন্তরায়? বিবাহ না করবার কারণ কি?”

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “কারণ বিশেষ কিছুই নাই। বাল্যকালে পিতৃহীন হই; তার পর কলেজে লেখা পড়া শিখছিলাম; তারপর জননীদেবীরও অভাব হ'ল। এই সব কারণে বিবাহ করি নাই।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন “সে কি কথা? সংসারে থাকতে গেলে, গার্হস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। আপনার আর সহোদর-সহোদরা কয়টি?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “একটিও নাই; আমিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন “বটে? তবে তো আপনার বিবাহ করা একান্ত কর্তব্য। এই তো আপনার ম্লান বয়স। আপনি বিবাহ না করলে আপনার বংশলোপ হবে যে! আপনার মত যোগ্যপাত্রেরে কন্যাদান করিতে কত শত ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন। আহা, কত স্থানে কত কুলীন কন্যা অনুচর রয়েছে! আপনি অবশ্যই বিবাহ করবেন। অসম্মত করবেন না।”

সতীশচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। সেই সময়ে কেহ সতীশচন্দ্রের অন্তর-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাইত, তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত বহুকালের প্রেমের বাঁধটি সহসা ভাঙিয়া গিয়াছে, এবং বহুর জলে মমসুই হাবুডুু খাইতেছে।

সতীশচন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় ক্ষেত্র-

নাথকে স্বেচছন্দে করিয়া বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, নগিন আমাদের বাড়ী গিয়ে আমায় বললে যে, আপনার বাড়ীতে আপনার একটু বন্ধু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তাই না শুনে, আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্ত বাস্তু হয়ে আসছি। এসে দেখি, বাবাজীবন আমাদেরই নিকট কুটুম্ব! আহা, আমার কি পরম সৌভাগ্য! আজ আমার কি সুপ্রভাত!” তার পর সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন “বাবাজীবন আমি তোমার সমুচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি অতিশয় দরিদ্র। তবে পরিচয়ে জানলাম, •তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে। তোমাকে শাকান্ন খাওয়াতে আমার কোনও সঙ্কোচ নাই। এখানে যে কয়দিন থাক, আমার বাড়ীতেই শাকান্ন ভোজন করতে হবে।” •

সতীশচন্দ্র বলিলেন “আপনি কি বলছেন? আপনার বাড়ীর শাকান্ন আমার পক্ষে রাজভোগের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তবে এখানে আমার কোনও অসুবিধা নাই। সঙ্গে পাচক-ব্রাহ্মণ আছে। ক্ষেত্রবাবু আমার বালাবন্ধু ও সহপাঠী। ক্ষেত্রবাবুর যত্নের কোনও ক্রটি নাই। তবে একদিন আপনার বাড়ীতে আমি যাব ও খেয়ে আসব। আপনি তজ্জন্ত বাস্তু হবেন না। যদি পারি, আগামী কল্যা আপনার বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন করব।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় আশ্চর্য্যে গদগদবিভোর-কণ্ঠে হইয়া বলিলেন “বাবাজীবন, এ তোমার যথেষ্ট উদারতার পরিচয়। তোমাকে আমার বাড়ীর আতিথ্যগ্রহণ করাতে পারি, এ ছুরাশা আমি করি না। তোমার সহৃদয়তা দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। আগামী কল্যা মধ্যাহ্নে বাবাজীবন অতি অবশ্য আমার বাড়ী আসবে। আর, ক্ষেত্রবাবু, আপনিও আপনার ছেলেদের সহিত আমাদের বাড়ী এসে মধ্যাহ্নভোজন করবেন। আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও আপনাকে নিমন্ত্রণ ক’রে খাওয়াতে পারি নাই।” এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার বাড়ী প্রসাদ পাব সে তো সৌভাগ্যের কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—

কাল মধ্যাহ্নে আমি সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ী যাব।”

সেই সময়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে স্মরণে বলিল “ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মা একবার আপনাকে বাড়ীতে ডাকছেন।”

ভট্টাচার্য্যমহাশয় অন্তঃপুরে গমন করিলে, ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “সতীশ, এখন কি বলছ ভায়া? আমি ঘটকালী করতে জানি কি না, তা দেখলে? আমি গোড়া থেকেই বুঝেছি, “সচল স্থলপদ্মটি” এবার আমাদের গ্রাম থেকে উৎপাটিত হবে।”

সতীশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন “আরে, চুপ্ কর, চুপ্ কর। তোমার যে একটুও মনুর নাই। তোমার কাছে আমার এখন বসা হচ্ছে না। আমি ঐ মাঠের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।”

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র আপনার বিশৃঙ্খল মনোরাজ্যের শৃঙ্খলা সাধনের জন্ত এবং আপনার মনের সহিত ভাল-রূপে বুঝাপড়া করিবার জন্ত একাকী নিভৃত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র মাঠ পার হইয়া নন্দাজোড়ের ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা, আর তাঁহার মনেরও কোনও সন্ধান নাই; হয়ত, প্রেমবন্তার সম্মুখে পড়িয়া সে তৃণখণ্ডের ঞায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! যখন মনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন বুঝাপড়া আর কাহার সঙ্গে হইবে? সতীশচন্দ্র তখন সে আশা ত্যাগ করিয়া প্রেমবন্তার রক্তভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বর্ষাসমাগমে উভয়কূলপ্রাবী গঙ্গাপ্রবাহের মত প্রেমবন্তা তাঁহার হৃদয়ের সর্বস্থল প্রাবিত করিয়াছে। চারিদিকে কেবল কলকল, ছলছল শব্দ! কোথাও জল উছলিয়া পড়িতেছে; কোথাও ঘূর্ণাবর্তসমূহে জলরাশি প্রচণ্ড শব্দে আধোড়িত হইতেছে; কোথাও উল্লাসময় তরঙ্গের পশ্চাতে উল্লাসময় তরঙ্গ ছুটিতেছে; আর কোনও তরঙ্গাভিধাতে কূল ধসিয়া পড়িতেছে! বন্তার যেমন বেগ, তেমনই উল্লাস; যেমন কল্লোল, তেমনই প্রচণ্ডতা।

জলরাশি হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, কলকল শব্দে যেন চারিদিকেই ছুটিতেছে।

‘হৃদয়ের এইরূপ অবস্থায় মনের উপর আধিপত্য থাকে না, এবং কোনও বিষয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তাও করা যায় না। সতীশচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন পাদক্ষেপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কি করিতেছেন, বা কি দেখিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কখনও একটী বৃক্ষতলে বসিলেন; কখনও দ্রুতপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কখনও মন্থরগমনে চলিতে লাগিলেন; কখনও স্থিরভাবে কোথাও দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে, সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি ধীর পদক্ষেপে কাছারী-বাটীতে উপনীত হইলেন। সেখানে উপনীত হইয়া অবগত হইলেন, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যামহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে কি উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

আবেগের পর অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে সতীশচন্দ্র অবসন্নমনে ও ক্লান্তদেহে নিস্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অন্তঃকথার পর তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন “সতীশ, আমি ভট্টাচার্য্যামশাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম; তোমার পরিচয় অবগত হ’য়ে অবধি, তাঁর মনে একটী দুরাশার উদয় হয়েছে। অনুঢ়া কন্যাদের পিতা মাত্রেই মনে এইরূপ দুরাশার উদয় হয়, তা’তে বিশ্বয়ের কোনও কারণ নাই। ভট্টাচার্য্যামশাইয়ের ইচ্ছা, তিনি তোমার হাতে সৌদামিনীকে অর্পণ করেন, এবিষয়ে তোমার মত কি?”

কোথা হইতে সতীশচন্দ্রের মনটি সহসা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বৃকে এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে চুপি চুপি বলিতে লাগিল “সতীশবাবু, চমৎকার প্রস্তাব! সুন্দরী সৌদামিনী—মধুরহাসিনী, মধুরভাষিনী, লক্ষ রমণীর শিরো-মণি সৌদামিনী—তোমার হ’বে। আর কি চাও? সৌদামিনী তোমার হৃদয়ের অভাব পূর্ণ করবে; তার

নিশ্বাসে সৌরভ ছুটবে; তার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হবে; তার মধুর হাস্যে তোমার গৃহ ঝঙ্কত হ’য়ে উঠবে; তার মৌন্দর্য্যে তোমার গৃহ আলোকিত হবে। এই প্রস্তাবে এখনই সম্মত হও। এমন মাহেন্দ্রযোগ তাগ ক’রো না।” সতীশচন্দ্র মনকে বলিলেন “আমি ইহজীবনে বিয়ে করব না বলেছিলাম, তার কি?” মন বলিল “ওরূপ কথা কেন বলেছিলে, তা তুমিই জান। আমার তো কিছু জানতে বাকী নাই! বিয়ে করবার ইচ্ছাটি তো বরাবরই ছিল; কেবল ভাল মেয়ে পাও নাই ব’লেই বিয়ে কর নাই। এখন তো পেয়েছ? তবে আর ইতস্ততঃ করা কেন? ঝাঁক’রে মত দিয়ে ফেল।”

সতীশচন্দ্রকে নিস্তর থাকিতে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “কি সতীশ, আমার কথা শুনে তুমি যে চুপ্ ক’রে রইলে?”

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নে সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন “চুপ্ না ক’রে থেকে আর কি করছি, বল? আমি বিষম সমস্যায় পড়েছি। কিছু স্থির করতে পারছি না।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “সমস্যা আর কি? ভাল মেয়ে পাও নাই ব’লে তুমি এতদিন বিয়ে কর নাই। এখন সৌদামিনীকে তুমি যদি পছন্দ করে থাক, তাহ’লে বিয়ে করতে বাধা কি? আর তাকে পছন্দ না করবারই বা কারণ কি? রূপে গুণে, স্বভাব চরিত্রে, শিক্ষা দীক্ষায়, কুলে মানে তুমি যেমন মেয়েটি চাও, সৌদামিনী ঠিক তেমনিটি। ... ভট্টাচার্য্যামশাই বলছিলেন, তোমার যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে—(আমি সে কথাটা তাঁকে প্রকারান্তরে বলেছি), তখন অন্ত কোনও আপত্তি না থাকলে এই যাত্রায় তুমি মেয়েকে আশীর্বাদ ক’রে যাও। কাল বেশ ভাল দিন আছে। আর কাল যখন তোমার মধ্যাহ্নভোজনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে, তখন তুমি আশীর্বাদের ব্যাপারটি সেরে গেলেই ভাল হয়।”

সতীশচন্দ্রের মন তাঁহার বৃকে আর এক ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল “বাঃ বেশ কথা। শুভস্ম শীঘ্রম্। সতীশ বাবু তুমি এ প্রস্তাবে অমত ক’রো না; এমন স্ত্রী



পাবে না। এমন অযাচিত দান তাগে ক'রো না। যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তখন আর দেবী করা কেন? আশীর্বাদ,—বিবাহ সব শীঘ্র সেরে ফেল!" সতীশ মনকে ধমক দিয়া বলিলেন "তুমি তো বড় উতলা হ'য়ে পড়েছ, দেখতে পাচ্ছি। তোমার যে একটুও সপুর নাই! তোমার যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কি কাজ হওয়া চাই! আমি কিন্তু তা করতে পারি না। আমি বিয়ে করব না ব'লে জীবনের যে একটা পথ নির্দিষ্ট করেছিলাম, সে পথটি হঠাৎ ছেড়ে দেব নাকি? আমি যদি বিবাহ না করি, তো কি হয়? এতদিন যে আমি বিবাহ করি নাই, তাতে আমি অমানুষ হ'য়ে গেছি নাকি? আমি যে-পথে যাব, সে পথে কি তুমি যাবে না?" মন আবার অবরুদ্ধ হইবার ভয়ে বলিল "যাব না কেন? আমায় যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাব। কোনদিন আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি! কিন্তু একটা কথা বলি, রাগ ক'রো না। তুমি যদি তোমার নির্দিষ্ট পথেই যাবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলে, তাহ'লে সৌদামিনী যে অনূঢ়া কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা এই কথাটি কেবল অনুমান ক'রেই তুমি একটু চঞ্চল হ'লে কেন? তাকে 'সচল স্থলপদ্ম' বলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে এত রসিকতা করলে কেন? তার পর যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুন্লে যে, তাঁরা তোমাদেরই পাল্টা ঘর, তখন আমার ঘরের কপাট একেবারে খুলে দিলে কেন? আমি তোমার ভাব বুঝতে পারলাম। বুঝতে পেরেই আমি বন্ধনযুক্ত হ'য়ে একেবারে সৌদামিনীর কাছে হাজির! তুমি নন্দার ধারে ধারে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে, আমায় খুঁজে বেড়ালে পাবে কোথায়? তুমি যাই বল, আমি তোমার হৃদয়ের ভাব জানি। তুমি যা চাও, আমি তাই খুঁজে পেয়েছি। আমায় তুমি আর আটক করে রাখতে পারবে না। আমি সৌদামিনীর কাছেই থাকব। তা যদি থাকি, তাহ'লে তুমি কাজ কর্ম করবে কিরূপে? সেই জন্ত বলছি, কুট তর্ক ছেড়ে দিয়ে, নির্দিষ্ট পথে চলবার বৃথা লোক-দেখানী প্রতিজ্ঞাটি ত্যাগ ক'রে সৌদামিনীকে আপনার কাছে নিয়ে এস; তাকে বিয়ে কর; আর বিয়ে করবার সূচনা স্বরূপ কাল তাহ'কে

আশীর্বাদ করে ফেল। তাহ'লে তুমিও নিশ্চিন্ত; আমিও নিশ্চিন্ত। সকলে মিলে মিশে বেশ সুখে ও শান্তিতে কাল কাটান যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি সতীশ? অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবছ আর মাঝে মাঝে একটু একটু হাসছ যে? আমার কথাই তো কোনও উত্তর দিলে না? কাল আশীর্বাদ করা সধকে তোমার মত কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আমার আর মত কি? আমি আশীর্বাদ টাশীর্বাদ করতে পারব। সে কাজটা তুমিই সেরে ফেল।"

ক্ষেত্রনাথ দন্তে দন্তে জিহ্বা পেথন করিয়া বলিলেন "আরে ছি, ছি, তুমি বলছ কি? তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণ, আর আমরা হলাম বৈষ্ণৱ! তুমি পাগল হ'লে না কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "পাগলই হয়েছি। যখন মনের উপর কোনও আধিপত্য রাখতে পারছি না, তখন পাগল হ'তে আর বাকী কি?" পরে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "মাহেঞ্জু ক্ষণেই আমি তোমাদের বল্লভপুরে পদাধীন করেছিলাম, দেখতে পাচ্ছি। পূজোর ছুটিটা কোথায় এই অরণ্যের মধ্যে শান্তিতে কাটান মনে করেছিলাম, না, এখানে আস্তে না-আস্তেই এক মস্ত ফাসাদ! তোমার সঠাক্করণটি গুলি স্থলপদ্ম-বনে দাঁড়িয়ে থাকবার আর সময় পেলেন না! এর আগে কত স্থানে কত সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়েছে; কিন্তু কখনও তো চোখ ভুলে তাদের দেখবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ কি সংযোগ? ভাগ্যবিধাতার একি লীলা? যে মন সহজে কখনও চঞ্চল হয় নাই, যাকে আজীবন কঠোর শাসনে দমন ক'রে রেখেছিলাম, সে আমাকে একটু অসাবধান ও অশক্ত দেখে একেবারে মনের কপাট ভেঙ্গে অদৃশ্য! এমন মনকে আর বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? এতদিনের সংযম, এতদিনের অভ্যাস—সব এক মুহূর্ত্তে বিফল হ'য়ে গেল? হতভাগ্য মন এখানে আমাকে একেবারে মাটি ক'রে ফেলেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আমাকে ত্যাগ ক'রে পরের গোলাম হ'য়ে গেছে! এমন বিশ্বাসঘাতক,—এমন নেমক্‌হারাম—আর দেখেছ কি?"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া তাহার মানসিক অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “দেখ, এখন আর আপশোষ করা বৃথা। মন যদি স্ফূটাকরণের গোলাম হ’য়ে থাকে, তা হ’লে আমার পরামর্শ হ’চ্ছে যে, তাকে তাব কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে আবার ফাটকে আটক কর। তা হ’লেই তার সমুচিত দণ্ড হ’বে।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “চমৎকার পরামর্শ দিয়েছ! আমি সে চেষ্টা কম করেছি নাকি? বরং ব্যাঘ্রীর মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে লওয়া সহজ, কিন্তু তোমাদের স্ফূটাকরণের কাছ থেকে আমার মনটিকে ছিনিয়ে লওয়া সহজ নয়। আমি আর ছেনাছিনি করতে পারব না, তা’তে মন আমার বশে থাকে আর নাই থাকে। মনের উপর আধিপত্যের আশা আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি।”

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন “চল, চল, সায়াংসন্ধ্যা ক’রে এখন কিছু জলযোগ করবে চল।”

সতীশচন্দ্র আপনার উপর যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন “জলযোগ তো হ’বে। কিন্তু, ক্ষেত্র, আমি এমন একটা কার্ট-খোঁটা, নীরস আর শুষ্ক লোক! আমি কাজের কথা ভিন্ন কখনও অণু কথা কই না, আর আমার মেজাজটাও কিছু কুড়া। সেই আমি কিনা একটা দিন তোমার এখানে এসে একেবারে বেহাল হ’য়ে পড়লাম! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কি ক’রে? না, না, না, না, তোমার এখানে আমার আর থাকা হ’বে না। আমি কালই চ’লে যাব।” এই বলিয়া সতীশচন্দ্র হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্ত স্নানাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## ইউরোপে বাঙ্গালী পালোয়ান

বাঙ্গালী পালোয়ান শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ ঙ্গহ গোবর বাবু বলিয়া পরিচিত। তিনি কয়েক মাস হইল ইংলণ্ড গিয়াছেন। গত ৩১শে মে তারিখের হেল্‌থ্‌ এণ্ড স্ট্রেন্‌থ্‌\* নামক লণ্ডনের কাগজে তাহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

\* “Health and Strength, the National Organ of Physical Fitness.”

বাহির হয়। প্রবন্ধটির নাম “ভারতবর্ষের বালক পালোয়ান গোবর, ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ ওজনের একটি কলার পরে।” † প্রবন্ধটির তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি। সম্পাদক লিখিতেছেন—

হাম্পট্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটি বাগানে আমি গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটা মাদুর বিহান; তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় ভারতবাসী প্রায় তারই মত প্রকাণ্ড ইংরাজ কুস্তিগীর ফিল লেনের সঙ্গে কুণ্ডি লড়ছিল। ফিল খুবই হাঁপাচ্ছিল, গোবরকে বেদম করতে খুব চেষ্টা করছিল; কিন্তু গোবর কোন ক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

গোবর সবে কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে; কিন্তু কি ভীষণ যুবা! দৈত্যের মত তাহার দেহ। সে একটা প্রকাণ্ড বালকের মত; চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা তার কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা, কেননা সে এমন বলবান, এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

গোবর আমাদের খুব ভারী ভারী ওজনদার কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়তে এসেছে। সম্ভবতঃ অজেয় জিমি এসন্ (“The unconquerable Jimmy Esson”) তার সঙ্গে লড়বে। কিন্তু গোবরের সকলের চেয়ে বড় শখ গচের সঙ্গে লড়া—সেই গচ্ (Gotch) যাকে এখনও পৃথিবীর কোন কুস্তিগীর ফেলতে পারে নাই।

গোবর যে ভাল পালোয়ান তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ তারা পালোয়ানের গোষ্ঠী। ১৮৯২ সালে কলিকাতায় তার জন্ম হয়। তার জ্যেষ্ঠা মহাশয় খুব বড় পালোয়ান ছিলেন এবং ঠাকুরদাদা তাঁর চেয়েও বড় কুস্তিগীর ছিলেন। সে ভারতের অনেক বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়েছে, কিন্তু কেউ তাকে হারাতে পারে নাই। কেউ পারবে কিনা সন্দেহ। গামার নাম শুনেছ ত? সেই গামা গোবরকে শিক্ষা দিত, কিন্তু তাকে কখনও ফেলতে পারে নাই। গোলামের ভাই যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিস্ নগরে দ্বিধ্বজ্যী হয়েছিল, তার সঙ্গেও গোবর লড়েছে।

যে বাড়ীতে আমি গোবরকে আবিষ্কার করলাম তাতে অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্র থাকে। গোবর বেশ সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ঐ ছাত্রাবাসে কোন চাকরাণী থাকে না। সুতরাং গোবর দেশের মত খোলা গায়ে কুস্তি করে।

সে বিলাতী খাদ্য ছোঁয়না। সব তাঁর চাকররা রেঁধে দেয়। খুব পক্ষীমাংস ও মাখন সে খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তাঁর এক রকম উপাদেয় জিনিস তার ভারি প্রিয়। সে মদ স্পর্শও করে না; সিগারেট মাসে হয় ত এক আধ বার একটা টানে।

তার দু জোড়া মুণ্ডর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫ সের; আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের। আমি তাকে দ্বিতীয় জোড়াটা ভাঁজতে দেখলাম।

সে বললে যে শরীরের সকল অঙ্গ চালনার জন্ত যখনসে কুস্তিগীরদের সঙ্গে আপোসে লড়ে, তখন কেহই তার বাড়টা ভাল করে ধরতে পারে না বলে, বাড়টার যথেষ্ট ব্যায়াম হয় না। সেই জন্ত

† “Gobar the 18 stone Boy Wrestler from India, who wears a collar 160 lbs. in weight.”

সে একটা দু' মণ ওজনের পাথরের হামুলির মত পরে। এই (Collar) কলারটা ফ্যাশানেবল হবো না, তা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি। এই হামুলিটা পরে, সে এই একটুখানি ব্যায়ামের জন্ত বাড়ীর সিঁড়িতে ঠাণ্ডানা করে। আমি দেখলাম তাকে এই ভাবে এক এলা দু' তলা উঠা নামা করতে। ঐ দ্রুতটি পরে বেশী মাইল দৌড়াবার সব আন্নার হবে না নিশ্চয়।

তাদের বাড়ীতে পুরুষাত্মক একটা খুব ভারী পাথর আছে। তার উপরে মাঝখানে হাতল স্বরূপ একটা লোহার ডাঙা লাগানো আছে। গোবর ছাড়া কেউ আর সেটাকে নড়াতে পারলে না। কিন্তু গোবর চিং হয়ে শুয়ে সেটাকে লোহার হাতলটা দিয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আনলে এবং তারপর সোজা নিজের শরীরের উপর তুললে।

এটা রাষ্ট্র হয়েছে যে গোবর কৃষ্টানু পালেসে এংলোজার্মান প্রদর্শনীতে লড়বে। যদি লড়ে, তাহলে তোমরা দেখতে যেতে ভুলো না। এই ভারতীয় হার্কিউলিসের চেহারাখানা দেখবার জন্মই যাওয়া সার্থক হবে। তার বিশাল শক্তি সত্ত্বেও তার মাংস-পেশী বেশ নরম এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে পুর সহজেই যে ভাবে যে দিকে ইচ্ছা চালাতে পারে।

গোবরের দৈর্ঘ্য ৬ফুট ১ইঞ্চি, ছাতির বেড় ৪৮ ইঞ্চিতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪০ ইঞ্চি, বাহুর গুলি ১৮ ইঞ্চি, কলুইয়ের নীচে ১৩।০ ইঞ্চি, কব্জি ৮ ইঞ্চি, জান্ত ৩০ ইঞ্চি, পায়ের ডিম ১৮ ইঞ্চি, গলা ১৮।০ ইঞ্চি, ওজন তিন মণ।

গোবর নামজাদা ইংরাজ কুস্তিগীর দুজনকেই হারাইয়া দিয়াছেন। গত ৩০শে আগষ্ট গ্লাসগো নগরে গোবর কাম্বেল (Campbell) সাহেবের সঙ্গে লড়েন এবং ৫০ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে তাহাকে পরাজিত করেন। তার পর এডিনবরার ওলিম্পিয়া নামক মল্লক্রীড়া-ক্ষেত্রে যখন গোবর “অজেয় জিমি এসনের” সঙ্গে লড়েন, তখন লোকে লোকারণ্য। এসনের ওজন গোবরের চেয়ে সাত সের কম। এসন খুবই শক্তির ও কৌশলের পরিচয় দেয়, কিন্তু গোবর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রায় ৩০ ত্রিশ মিনিট চাপিয়া রাখে; এবং এসন হাঁপাইতে থাকে।



এডিনবরায় যতীন্দ্রচরণ গুহ, ওরফে গোবর।

এসন অনেক নিমিত্ত কৌশল প্রয়োগ করায় তাহাকে মনো মনো সতর্ক করা হয়। যাহা হউক সে আবার উঠিয়া দাঁড়ায় কিন্তু গোবর ৩৯ মিনিট ৪ সেকেন্ডে তাকে প্রথম আছাড় দেয়। আর এক আছাড় দিলেই গোবরের জিত। কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না। এসন নিমিত্ত কৌশল প্রয়োগ করায় পুনঃ পুনঃ তাহাকে সতর্ক করাতেও যখন সে শুধরাইল না, তখন মধ্যস্থ মহাশয় তাহাকে লড়িবার

অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং গোবরের জয় হইল।

এদিনবরায় অন্ধ (তৈলঙ্গ) দেশীয় ছাত্রদের অঙ্ক-ব্রাহ্মণী নামক একটি সমিতি আছে। তাঁহারা গোবরকে ভোজ্য দিয়া, রেলওয়ে স্টেশনে বিদায় দিবার সময় মালাভূষিত করিলেন।



গোবরের পাথরের হাঁসুলি।

গোবর এখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে; কুস্তি দেখাইয়া সপ্তাহে দেড় হাজার টাকা উপার্জন করিতেছেন। শীঘ্রই গচের সঙ্গে লড়িবার জন্য আমেরিকা যাইবেন।

গোবরের ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় অধিকাচরণ গুহ অম্বুবাবু নামে বিখ্যাত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহও মস্ত পালোয়ান ছিলেন। তিনি অনেক সওদাগরী হোসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। অম্বুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু পাঞ্জাবী ও পাঠান পালোয়ানদের অজ্ঞাত অনেক নূতন প্যাচ আবিষ্কার করেন। পশ্চিমের অতি বড় পালোয়ানরাও কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু শিখিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইত না। অম্বুবাবুর পিতা অতয় বাবুর আয় বার্ষিক দুইলক্ষ টাকার উপর ছিল। এইজন্য অম্বুবাবু তাঁহার এই কুস্তির সম্বন্ধ মিটাইবার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিতেন। তাঁহার আখড়া একটা বিস্তৃত যায়গা

ছিল। তাহাতে গোটা চল্লিশ গাভী এবং গোটা ত্রিশ ছাগল ছিল। তাঁহার কুস্তির সাগরেদরা দৈনিক ব্যায়ামের পর ইহাদের দুধ খাইত। শতাছাড়া প্রিয় শিষ্যেরা প্রত্যহ খুব পুষ্টিকর ভাল ভাল খাদ্য পাইত।

ক্ষেত্রবাবু তাঁহার পিতা অম্বুবাবু অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক ভাবে কুস্তি শিখিয়াছিলেন। তা ছাড়া তিনি ঘুঁষি প্রয়োগেও খুব ওস্তাদ ছিলেন, এবং লাঠি ও ছোঁরা খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সামান্য সাধারণ খাদ্য ছাড়া প্রধানতঃ দৈনিক আট সের দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতেন।

গুহরা চারি পুরুষ ধরিয়৷ মুৎসুদ্দির কাজ করিতেছেন। গোবরের বাবা বাবু রামচরণ গুহ হোরমিলার কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। তিনিও হৃষ্টপুষ্টি বলবান দীর্ঘকায় পুরুষ।



গোবর মুগুর ভাঁজিতেছেন

গোবর প্রথমে তাঁহার জেঠা ক্ষেত্রবাবুর নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গামা, কালু, রহমানী, প্রভৃতি পালোয়ানের কাছে শিক্ষা পান। তাঁহাকে কেহই ফেলিতে পারে নাই। এই পালোয়ানের রোজ ৪ হইতে ৬ টাকা বেতন পাইত।

গোবর এন্টে স্ ক্লাশ পর্যন্ত ইংরাজী পড়িয়াছেন।

বাঙ্গালীদের সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ আহার করিতেন। তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আকৃনি, ৪০০ বাদাম ও এক ছটাক-ছোট ঝুলাচ, দেড় সের বেদানার রস, এক টাকার সোনার পাত ও দুই আনার রূপার পাত, বাদাম ও মশলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই, এক সের দুধ, এবং প্রত্যহ এক টাকার ফল।

## দুর্ভিক্ষ-নিবারণ

গ্রাসন দুর্ভিক্ষ।

সেদিন এক ভীষণ জলপ্লাবন বাংলা দেশের অনেকগুলি জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল। অসংখ্য গো-মহিমাদি পশু বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্বস্বান্ত হইল। অসংখ্য লোক এখনও অনাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠা অন্নের জন্ত হাহাকার করিতেছে। অতিরিক্তির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল। সকলেই বলিতেছেন, এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ তাহার করাল মুর্ডিতে দেখা দিবে, অজি-বিস্তার-বদনা, অসংখ্য নরকঙ্কাল-শোভিতা সে দামবী সমগ্র বাংলা দেশকে গ্রাস করিবার জন্ত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সকলেই একজন্ত ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ এদেশে যেনুতন, তাহা নহে। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অনেক লোক অনাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে এমন কি সৎসর ধরিয়াই দেখা যায়। বাস্তবিক যদি দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের

\* কলিকাতাে ঝালদুহ সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে পঠিত, ১০ই কার্তিক।

দুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই আধুনিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ অর্থে অনাভাবে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্ন-দাতার অভাব বুঝায় না। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলেই সকলেই শিহরিয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষের কারণ।

দুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্তব্য। অনেকেই বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণ দ্রবোর হ্রমূল্যতা। পূর্বে এক টাকায় এমন কি একমণ চাউল ক্রয় করিতে পারা যাইত। এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্রেরা চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, কেবলমাত্র ভারত-বর্ষে নহে, দ্রবাসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রবোর মূল্য নয়-দশগুণ পর্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু গ্রাহার জন্ত ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রবোর হ্রমূল্যতার সহিত দুর্ভিক্ষও জড়িত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাহা নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে কেবলমাত্র দ্রবোর হ্রমূল্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না।

আমাদের দেশে দ্রবোর হ্রমূল্যতা শুধু নহে, হ্রমূল্যতার সহিত দ্রব্যভাব দেখা দিয়াছে। দ্রব্যভাবই দ্রবোর হ্রমূল্যতার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে অল্প দ্রবোর সহিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অভাব।

(ক) কৃষিকার্যের অবনতি।

এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে—(ক) কৃষকগণ দুরিদ্ৰা হেতু উপযুক্ত সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) উপযুক্ত শিক্ষা

অভাবে তাহারা সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গ) গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখা যাইতেছে, (ঘ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে কৃষকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, (ঙ) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ হইতেছে না, (চ) মধ্যবিন্ত শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসাতে কৃষকদিগের উৎসাহ নাই। এই সমস্ত কারণে দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) বিশেষতঃ খাদ্য-শস্য চাষের অবনতি—পাট আবাদ।

দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহা নহে; যে-সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই-সকল ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। দেশবাসীগণের অন-সংস্থানের সহায় না হইয়া আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী যোগাইতেছে। বাংলা দেশে পর পর নীল তুঁত এবং পাটের চাষ ধাতুচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুঁত চাষ করিয়া কৃষকগণ মনে ভাবিয়াছিল তাহারা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। তাহারা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সত্য; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার-কাহিনী নীল এবং তুঁত আবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে—বাংলা দেশের কৃষকসমাজ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল এবং তুঁত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানি হয়; ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কার্ণওয়ালিস পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পাট আবাদের পরিমাণ

	১৯১২	১৯১৩
বঙ্গদেশে	২,৫৭৬,৫০৩	২,৭৫৫,১৬৬ + ১৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৮,৩৪৪	৩১৮,৩৫৮ + ২০,০১৪
আসাম	২৫,৬৪৭	২৬,০২০ + ৪৪৩
মোট	২,৯০০,৪৯৪	৩,১৬৯,৫১৪ + ১৯৯,১২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সর্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বিহারে পাটের আবাদ ক্রমশই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	...	...	২৪১,৪০০ একর
১৯১০	...	...	২৪৮,২০০ ”
১৯১১	...	...	২৫৮,১০০ ”
১৯১২	...	...	১৯৮,৩০০ ”
১৯১৩	..	...	৩৩৮,৪০০ ”

এখনকার পাটের সুবিধা আছে। কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মূখ্যভাবে পাটের চাষ পরিচালন করিতেছে না। পাটের চাষ পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বিস্তৃত হইতেছে; এবং এই বিস্তৃতির জন্ত কুঠিয়ালগণ অপেক্ষা দালাল পাইকারগণই অধিক দায়ী হইয়াছে, কাজেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীল এবং তুঁত আবাদের মত পাট আবাদের একটা প্রধান দোষ আছে। পাট খাদ্য-শস্য নহে। কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অবশ্য হ্রাস পাইবে। কোন দেশের শ্রমজীবীর শক্তি এবং মূলধনের পরিমাণ অসীম নহে, তাহা নির্দিষ্ট। অতএব বিদেশে রপ্তানির জন্ত যদি পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয় সেই জমিতে পাটও হয়, পাটের বাজার-দর অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজনা দিয়া জমিদারের নিকট হইতে চাউল আবাদ ছাড়িয়া পাট আবাদের জন্ত জোত লইয়া থাকে। এরূপে দেশে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট তিসি প্রভৃতি উপকরণ-শস্যের চাষ বাড়িয়া যাওয়া দেশের পক্ষে প্রভূত অনিষ্টকর। দেশে যে দুমূল্যতা দেখা গিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কমিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকাটা পাঠ করিলে আমরা হ্রাসের পরিমাণ বেশ বুঝিতে পারিব—

১। চাউলের চাষের পরিমাণ ( মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে )	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
	৭০	৭১.৬	৬৯.৬	৭৩.৫	৭৩.৪	৭৩.৫	৭৫.৯	৭২.৮	৭৮.৭	৭৮.৫	
২। গম চাষের পরিমাণ ( মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে )	১৮.৬	১৯.৬	২৩.৬	২৩.৫	২২.৪	২৫.১	১৮.৪	২১.২	২২.৭	২৪.৪	

এই কয় বৎসরে পাট এবং তুলার চাষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও নির্দেশিত হইল :—

১। পাটের চাষ ( মিলিয়ন একর )	— ২.২	২.১	২.৫	২.৯	৩.১	৩.৫	৩.৯	২.৮৫	২.৮৭	২.৯৩	৩.১
২। তুলার চাষ ( মিলিয়ন একর )	— ১০.৩	১১.১	১১.৯	১৩	১৩	১৩.৭	১৩.৯	১২.৯	১৩.১	১৪.৪	

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কেবলমাত্র ৭.১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পরিমাণ ঐ দশ বৎসরেই শতকরা ৫০.০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

• পাট ইত্যাদি উপকরণ-শস্য চাষের কৃকল।

• মুর্শিদাবাদ জেলায় একজন খুব ধনী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার বাটীতে একবার তাঁহার জমিদারির সমস্ত প্রজাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনের জন্ত সকলেই উপবিষ্ট হইলে জমিদার মহাশয় তাহাদিগের সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার পাচকগণের দ্বারা তাহাদিগকে পাটের কুচি পরিবেষণ করাইলেন। প্রজাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয় আমাদের জন্ত এ কি খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন?” জমিদার মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন “দেখ, তোমরা আমার জমিদারিতে যাহা উৎপন্ন করিবে তাহা ভিন্ন অপর খাদ্য আমি কোথায় পাইব? তোমরা ধাতু চাষ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সর্বত্রই পাট চাষ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব পাট ব্যতীত তোমাদিগের অপর কোন খাদ্য আশা করা অনুচিত।” প্রজাবৃন্দ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জমিদার মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর যখন তাহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন সকলেই জমিদার মহাশয়ের উপদেশ এবং কৌতুকপ্রদ শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসাবাদ করিতেছিল। সেই অবধি মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলে পাট চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া

গিয়াছে। জমিদার মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সত্য এবং স্পষ্টভাবে বলা। জেলায় জেলায় যদি খাদ্য-শস্যের চাষ কমিয়া যায় তাহা হইলে সে দেশে অনাভাব না হওয়াই আশ্চর্য। কৃষকগণ পাট প্রভৃতির চাষে যদিও কিছু অধিক নগদ টাকা লাভ করিতে পারে, কিন্তু চাউলের মূল্য ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। বিদেশী বণিক্দিগের প্রভাবে দেশীয় কৃষি বিদেশের প্রভূত ধনোৎপাদনের সহায় হইয়া যদি দেশবাসীগণের দারিদ্র্য আনয়ন করে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মূঢ় কৃষি-ব্যবস্থা স্বপ্নের অগোচর। আমরা কিন্তু এই মূঢ় ব্যবস্থা অক্লান্তে পুরুমানুক্রম ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছি।

(গ) খাদ্য-শস্য রপ্তানি।

শুধু খাদ্য-শস্যের চাষ যে কমিতেছে তাহা নহে, আমরা নিজেদের অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি। এস্থলেও বিদেশী বণিক্দিগের প্রভাব হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রদেশে ছুর্ভিক রহিয়াছেই। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে।

চাউল রপ্তানি	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
( মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে )—	৩৪	৪৭.৪	৪৫	৪৯.৪	৪৩	৩৮.৭	৩৮.২	৩০.২	৩৯.২	৪৮	৫২.৪
গম রপ্তানি											
( মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে )—	৭.৩	১০.৩	২৫.৯	৪৩	১৮.৭	১৬	১৭.৬	২.১	২.১	২৫.৩	২৭.২

এক মিলিয়ন cwt = প্রায় ১৩.৫ লক্ষ মণ।

১৮৯৫ সনে রুশিয়াতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু দেশে অনাভাব সত্ত্বেও অসংখ্য রেলগাড়ী শস্য বোঝাই করিয়া রুশিয়া হইতে বিদেশে যাইতেছিল। সেখানকার রাজসচিব হিলকফ ঐ রেলগাড়ী সমূহের বিদেশ যাত্রা নিষেধ করিয়া রুশিয়ায় উৎপন্ন সমস্ত শস্যের দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্ভিক্ষ ধামিয়া গেল। আমাদের দেশে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনায়াসেই সমস্ত প্রদেশের অনাভাব দূরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমরা বিদেশে বৎসর বৎসর শস্য রপ্তানি করিতেছি।\* কবি স্বদেশকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন, “চির কলাগময়ি তুমি ধন,—দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।” ধনবিজ্ঞানবিৎ এই প্রকার ব্যবস্থাকে দেশের পক্ষে ঘোর অকল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করেন,—নিজের ধন পরকে দিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করা দুর্ভিক্ষতার লক্ষণ। ইহা স্ততিবাদের বিষয় নহে। আর একজন কবির আক্ষেপে বাস্তবজীবনের প্রকৃত দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নিজ অন্ন পরে, করপণো দিলে,  
পরিবর্ত্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে।  
মখি অন্ন হরে, পর স্বর্গস্থখে,  
তুমি আজও হুখে, তুমি আজও হুখে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়।

(ক) কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা নহে। খাদ্য-শস্যের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, এবং উৎপন্ন শস্যের যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

\* শস্য রপ্তানি যে শস্যের দুর্ভিক্ষতার একটা প্রধান কারণ তাহা গবর্ণমেন্টের রিপোর্টেও নির্দেশিত হইয়াছে।

“Rice of which the exports have greatly increased during the last two years 1901—03 remains extremely dear,” \* \* \* “wheat in India proper, like rice in Burma, is being grown more extensively for export and the recent revival of the foreign demand has produced exports bearing a far larger proportion to the consumption than in the case of rice.”

Imp. Gazetteer of India, Vol. III. chap IX. p. 460.

কৃষিকার্যের উন্নতির উপায়,—কৃষিশিক্ষার বিস্তার এবং যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী এবং যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে কৃষিসায়নসম্বন্ধে সার এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিতে সাহায্য করা। যৌথ-মণ্ডলী স্থাপন করিলে গো-মহিষাদির উন্নতি এবং জীবন-বীমা সহজসাধ্য হয়। ঋণদানমণ্ডলীর লাভাংশ হইতে ষণ্ড ক্রয় করা যাইতে পারে, এবং গবাদির জীবন বীমার মাসিক টাঙ্গা লওয়া যাইতে পারে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ হইলে, ঋণদান-মণ্ডলী হইতে কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ গ্রহণ করিয়া, আহাৰ্যাদি, শস্য-বীজ এবং হাল বলদ ক্রয় করিতে পারে। কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইলে ব্যয় ও সময়সংক্ষেপকারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন হইবে, উপযুক্ত সার ব্যবহৃত হইবে, এবং পোকা ও অন্ত জন্তুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে গ্রামে গ্রামে কৃষিকার্যের সমবায়-প্রণালী সহজেই অবলম্বিত হইবে। বাস্তবিক আমাদের পল্লীগ্রামসমূহে দৈন্য দারিদ্র্য এরূপ গভীর এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে, সমস্ত বিষয়েই এক্ষণে সমবেত কার্য করা আবশ্যিক। গ্রাম্য কৃষিশিক্ষা পরিচালনার জন্ত, নদ নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও সংস্থারের জন্ত, শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থার জন্ত, নিয়মমত জল সরবরাহের জন্ত সমবেতভাবে কার্য করা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সব বিষয়েই সমবেত কার্যপ্রণালী কল্যাণপ্রদ হইবে। তাহার পর স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। এই জন্ত পল্লীগ্রামসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যিক। ম্যালেরিয়া-প্রদীড়িত গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রেল লাইন যেখানে খুলা হইয়াছে, সেখানে বাধের নীচে দিয়া যাহাতে জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা

“Of rice it may be said that present prices are as high as the famine prices of former years.”

“The demand for export has undoubtedly influenced the price of rice and wheat directly, and through them the prices of the commoner food grains.”

Imp. Gazetteer of India, Vol III. chap. IX. p. 461.



কর্তব্য। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ছোট রেলগাড়ী (Light Railway) অধিক উপযোগী। তাহাতে যাতায়াত এবং দ্রব্য আমদানির সুবিধা হয়, অথচ রেলগাড়ীর ভার অধিক না হওয়াতে বাধা নির্মাণ আবশ্যিক হয় না। তাহার জন্য রেল লাইন জল সরবরাহের ব্যাঘাত করে না। ইউরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে ছোট রেল লাইনগুলি বৈষয়িক উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে; অথচ জল সরবরাহের ব্যাঘাত না হওয়াতে নদনদীগুলি এবং তাহাদিগের শাখা প্রশাখাগুলির অবনতি হয় নাই এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি এখনও দেখা যায় নাই। আমাদের দেশে কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোট রেলগাড়ীর আবশ্যিকতা সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করেন নাই।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে এইস্থলে কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক। অনেকে মনে করেন, রেললাইনের বিস্তার আমাদের উন্নতির একটা প্রধান লক্ষণ। রেলগাড়ী মনুষ্যযাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করে সত্য, এবং রেলগাড়ী ভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া অসম্ভব তাহাও সত্য। কিন্তু রেলগাড়ী যে-সকল সুবিধা প্রদান করিয়াছে তাহাদিগের বিনিময়ে আমরা কি হারাইতেছি তাহাও কি একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য নহে? রেলগাড়ী কৃষিক্ষেত্রে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, উৎপন্ন শস্য লইয়া রেলগাড়ী তাহা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে মাত্র। গ্রামোৎপন্ন শস্য স্বদেশ অথবা বিদেশের সহরবাসীর আহাৰ্য্য হয়, এই মাত্র। রেলগাড়ী শস্য উৎপন্ন করে না, কৃষকই সমাজের অন্তঃস্থানের ভার লইয়াছে, রেলগাড়ী তাহার বাহন মাত্র। বাহনের কাজ প্রভুকে সেবা করা। কিন্তু বাহন যদি আরব্যোপস্থাসের দৈত্যের মত প্রভুর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সিদ্ধবাদের ভাগ্য এবং চতুরতা না পাইলে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন ঠিক সিদ্ধবাদ নাবিকের দশা হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায় রেল লাইন স্থাপিত হইবার পূর্বে রেলকোম্পানীর নিকট হইতে দেশবাসীরা অনেকগুলি সব আদায় করিয়া লয়। ঐ প্রদেশের শস্য ফসল ইত্যাদি অথবা শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী অল্প প্রদেশে রপ্তানি করিয়া বাহাতে দেশবাসীরা

লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কোম্পানী মাণ্ডল খুর কমাইয়া দেয়। সুতরাং রেলকোম্পানী ঐ প্রদেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির প্রধান সহায় হয়। আমাদের দেশে রেলকোম্পানীগুলি তাগদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাস্তব, কোন শিল্পবিশেষকে সুবিধা প্রদান করিবার জন্য মাণ্ডল কমাইয়া দেওয়া তাহাদিগের আলোচনার মধোই আসে না। তাহার পর, ইউরোপ আমেরিকার পল্লীগ্রাম সমূহেরও কৃষি- এবং শিল্প-শিক্ষা বিস্তার হওয়াতে অপরিমিত পরিমাণে শস্য রপ্তানি হয় না, গ্রামে গ্রামে শস্য সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং উপযোগী অমুঠান আছে এবং উপকরণ-শস্য উৎপন্ন হইলেও গ্রামবাসীগণ নিজেরাই কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে আপনাদিগের শিল্পশিক্ষার বলে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং রেলগাড়ী সেখানে কৃষক-কুলের ধনবৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের কৃষকগণ সেরূপ শিক্ষিত নহে। কাজেই তাহারা রেলগাড়ীর মন্দটুকু লইয়াছে, ভালটুকু লইতে পারে নাই। রেলগাড়ী সে জন্য সত্যতা নহে দৈত্যের লক্ষণ হইয়াছে। সমগ্র কৃষকসমাজ এক্ষণে বণিকদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আপনার অন্ন পরের হাতে অকুণ্ঠিত-চিত্তে তুলিয়া দিতেছে এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পরের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া গৌরব বোধ করিতেছে। তাই যখন রেল যাই তখনই সন্দেহ হয় আমরা রেলের সঙ্গে গুপুই কেবল শিক্ষার উন্নতি, ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা জাতীয়তা গঠন, এক কথায় কেবল কি সুবিধা, সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। একটা বেদনার সুর,—দৈন্য দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকসমাজের একটা করুণ কাহিনী তখন কি মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে না? যখনই এই করুণ সুরটির উদয় হয়, তখন মনে হয়, এই যে রেল লাইন ইহা পাথরের উপর নহে, দেশের ৩০ কোটি কৃষকের বক্ষের উপর পাতা আছে, আর ঐ যে গুরু গুরু শব্দ তাহা ৩০ কোটি নরনারীর বিদীর্ণ হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ,— কেবল

‘বুক-কুটা হুখে  
গুমরিছে বুক  
পড়ীর মরম-বেদনা।’

রেল-লাইন যতই বিস্তৃত হইতেছে ততই দেশের নদ-নদীগুলির প্রতি দৃষ্টি আমরা ঘুচাইতেছি। কৃষিপ্রধান দেশে নদনদীগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যিক। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া কৃষিকার্যের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। আমাদের দেশে নদনদীগুলির যেরূপ ক্রমাবনতি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের শস্যশ্যামল দেশ যদি কোন কালে মরুভূমিতে পরিণত হয় তবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। জলসেচন এবং বাণিজ্যের সুবিধা হেতু নদনদী-গুলির উন্নতি সাধন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ড্রেজার বসাইয়া নদীর মোহানার চর কাটিয়া দেওয়া এবং স্থানে স্থানে নদীতীর পাথর দিয়া বাধিয়া নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যিক। দেশের অরণ্যসমূহ ধীরে ধীরে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে, ইহা অনাবৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। অরণ্যসমূহকে রক্ষা করা কর্তব্য। অরণ্যসমূহ রক্ষিত হইলে দেশে অনাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা অধিক হয় না। সুবৃষ্টি হইলে এবং নদনদীগুলি সংস্কৃত হইলে, উহারা ছিয়মাণ হইবে না। নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনা তখন সহজসাধ্য হইবে এবং বৈজ্ঞানিক জল-সেচন এবং-জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকগণ অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিবে। কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতি তখন সম্ভবপর হইবে।

(খ) পাট ইত্যাদি চাষের পরিমাণ হ্রাস।

আমাদিগের কৃষকগণ যাহাতে বিদেশীর কুঠি-কারখানার জন্ত উপকরণ-শস্য উৎপন্ন করিয়া দেশীয় খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ কমাইয়া না দেয় তাহার জন্ত কৃষকদিগের মধ্যে উপকরণ-শস্য চাষের বিষময় ফল সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান আবশ্যিক। কৃষকগণ স্বভাবতই নিজেদের ব্যক্তিগত লাভকে কখনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে না; যেখানে ব্যক্তিগত লাভ সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় সেখানে তাহারা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। উপকরণ-শস্য চাষে তাহাদিগের কিছু নগদ টাকা আসিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেশবাসীর যে অমঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু, মানুষ কেবল মাত্র অর্থ দিয়া বাঁচিতে পারে না।

অর্থের বিনিময়ে যদি অনসংস্থান না হয় তাহা হইলে অর্থোপার্জন বিফল হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, গ্রামবাসীগণের অর্থ আছে, অথচ বাজারে চাউল নাই, যে, তাহারা অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে পারে। অতএব পাট ইত্যাদি চাষ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের নিজেদের যে স্বার্থসিদ্ধি হইবেই তাহাও নহে,—পাট বিক্রয় করিয়া একশত টাকা মজুত রাখা অপেক্ষা এক মরাই ধান গৃহস্থের অধিক "উপকারী। এই-সমস্ত কথা কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যিক। তবেই উপকরণ-শস্য চাষ দেশে আর দেখা যাইবে না।

(গ) অবাধ শস্য-রপ্তানির প্রতিরোধ।

তাহার পর খাদ্য-শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দেশে শস্যের ব্যবসায় যাহাতে বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন এ গুরুতর কার্যে সফলতা লাভ করা সুকঠিন,—এবং শিক্ষিতদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায় দ্বারাও এ কার্য সাধিত হইবে না। গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি যৌথভাবে চাউল গম ইত্যাদির ব্যবসাতে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গ্রামে গ্রামে শস্যআড়ৎ স্থাপন করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামের শস্যআড়ৎগুলি পরস্পরকে শস্য-আদান-প্রদান-ব্যাপারে সাহায্য করিবে, এবং জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে। জেলার বিচক্ষণ ব্যবসায়ীগণ ঐ কেন্দ্র-আড়ৎ পরিচালনের ভার লইবেন, এবং ঐ জেলার কোন গ্রামে খাদ্য শস্যের মূল্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ গ্রামে শস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক জেলাতেই কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে জেলায় জেলায় শস্যের আদান প্রদান চলিবে। কিন্তু কখনও বিদেশে রপ্তানির জন্ত শস্যের ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অসুপযোগিতা।

অনেকে বলেন বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করা

মনুষ্যের সাধাতীত, অথবা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিলে কুফল অবশ্যস্বত্বাধী ; বাণিজ্য সর্কাপেক্ষা সহজ এবং প্রশস্ত পন্থা স্বভাবতই অনুসরণ করে এবং ঐ পথ যদি রুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উহা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। জার্মানী এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র তাহাদিগের স্বাভাবিক গতির উপর নির্ভর করে না। জার্মানী এবং আমেরিকায় রাষ্ট্র ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে আপনার নিজের শক্তির দ্বারা রক্ষা ও পালন করিয়াছিল, এই কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সেখানে এত উন্নতি। বাস্তবিক ব্যবসা ও বাণিজ্যকে অবাধে আপনাদের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে অনেক সময়েই শ্রেয় নহে। ভারতবর্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে রক্ষণ-ও-পালননীতি অবলম্বনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহুকাল হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে ; কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রক্ষণনীতি অবলম্বন সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা হয় নাই। খাদ্য-শস্যের অবাধ রপ্তানি কোন দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসত্তার আমদানি করিয়া থাকে। যদি দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে স্বদেশের শস্য রপ্তানি করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের আমদানি দ্রব্যসমূহের তালিকা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতবর্ষ বাণিজ্য অথবা দ্রব্যবিনিময়ে লাভ করা দূরে থাক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে-সমস্ত দ্রব্যের অভাবে কোন দেশ অত্যাশঙ্কিত আহার্য্য পরিচ্ছদাদি হইতে বঞ্চিত হয়, সে-সকল দ্রব্যের রপ্তানি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাই আহারের বিনিময়ে আমদানি হউক না কেন, বিদেশ হইতে তা জীবন ফিরিয়া আসিবে না। আশঙ্ককীয় আহার্য্যাদি রপ্তানি করিয়া যদি সমাজ অরুচিতে জর্জরিত এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে

তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধনবৃদ্ধি হইলেও সে ধন কে ভোগ করিবে ?

বাণিজ্যের ডাকিনী মূর্তি।

একত্র এক্ষেত্রে বাণিজ্য ধনবৃদ্ধির কারণ হইলেও ডাকিনীর মত প্রলোভন দেখাইয়া একদিকে যেমন সমাজকে একবারে মোহাক্ষ করিয়া ফেলে অপর দিকে পলে পলে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লয় ; অথচ সমাজ তাহা অনুভব করিতে পারে না। বাণিজ্যের রূপ মাতৃমূর্তি, দানবীর রূপ নহে। বাণিজ্য সমাজ শিশুকে তাহার গুণ্ডাপিণ্ড পান করাইয়া, আপনার বক্ষে সতত ধারণ করিয়া স্নেহে পোষণ করে। বাণিজ্য রক্ত দান করিয়া পুষ্ট করে, শোষণ করিয়া হত্যা করে না। আমরা বাণিজ্যের মাতৃমূর্তি ত্যাগ করিয়া ডাকিনীর রূপকে সমাজ-সিংহাসনে প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং পলে পলে ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়িয়া আপনাদিগের জীবন বলিপ্রদান করিতেছি।

বাণিজ্যক্ষেত্রে অপরিণামদর্শিতা।

যতদিন না আমাদের এই মোহ দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষ পূর্বে বহির্বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু অতীত ইতিহাসে ভারতীয় বাণিজ্যসামগ্রী নিত্যপ্রয়োজনীয় শস্তাদি ছিল না। কার্পাস, রেশম কাপড়, মসলা, মসলিন্, হীরক প্রভৃতি তখন বিদেশে রপ্তানি হইত। অতীতকালে নিজ অন্ন পরকে বিলাইয়া-দিয়া ভারত ক্ষুধার তীব্র যাতনা অনুভব করিত না ; ভারতবাসীগণ নিজেদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া উৎকৃষ্ট ভোগ বিলাসের সামগ্রী বিদেশে প্রেরণ করিত এবং তাহার বিনিময়ে প্রত্যেক বৎসর অল্প পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি করিত।

সর্বপ্রথমে কৃষিশিল্প ব্যবসায় দ্বারা আভ্যন্তরিক অভাব মোচন, তাহার পর বিলাসভোগ এবং অবশেষে বাণিজ্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট বিলাস-সামগ্রীর বিনিময়ে স্বর্ণাদি ধাতুর আমদানি করিয়া ধন সঞ্চয়ের উপায় করা—ইহাই পূর্কের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে অনেক সময়ে ভারতীয় বাণিজ্য বিপরীত পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। স্বদেশের নিত্য অভাব মোচিত না হইয়া ভারতীয় শস্তাদি বিদেশে

প্রেরিত হইতেছে এবং তাহার বিনিময়ে বিলাস-সামগ্রী অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে। বিলাস-সামগ্রীর আমদানি এবং খাদ্যশস্যের রপ্তানি একদিকে অন্তর্কষ্ট অপরদিকে শ্রমজীবীগণের জীবিকার্জনের জ্ঞান বিদেশ গমনের কারণ হইয়াছে। অসংখ্য ভারতবাসী বৎসর বৎসর আফ্রিকা আমেরিকা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করিতেছে। অনাভাবে রোগাধিক্য হেতু সমাজের একদিকে শক্তিহীনতা এবং বিদেশ যাত্রা হেতু অপরদিকে শক্তিহীনতা হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে সমাজ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এক্ষণে ব্যবস্থা যে বিশেষ মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার ফল যে ভারতবর্ষ এক্ষণে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছে তাহা বলিতে হইবে না।

প্রতিকার।

ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক্ষণে গভীর চিন্তা, ধীর এবং সংযতভাবে অভাব বিশ্লেষণ এবং পরিণামদর্শিতার সহিত কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের অভ্যাস প্রয়োজন হইয়াছে। আর প্রয়োজনীয় হইয়াছে,—কেবল অভাববোধ নহে, অভাব-মোচনের জ্ঞান আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, সমবেত উদ্যোগ, অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

## ভাস্কর্য্যে শিশুচিত্র

ভাব বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কাবারূপে জনসমাজে প্রাণমাতান সঙ্গীতের অবতারণা করে। ভাস্কর্য্যে হউক আর দৃশ্যকাব্য হউক, উহা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া না উঠিলে, মানব-জীবনে সুফল ও কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

ভাস্কর্য্যে দৃশ্যকাব্য; ভাস্কর্য্যে ও বিজ্ঞানে ভেদের কল্পনায় গভীর অজ্ঞানাক্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

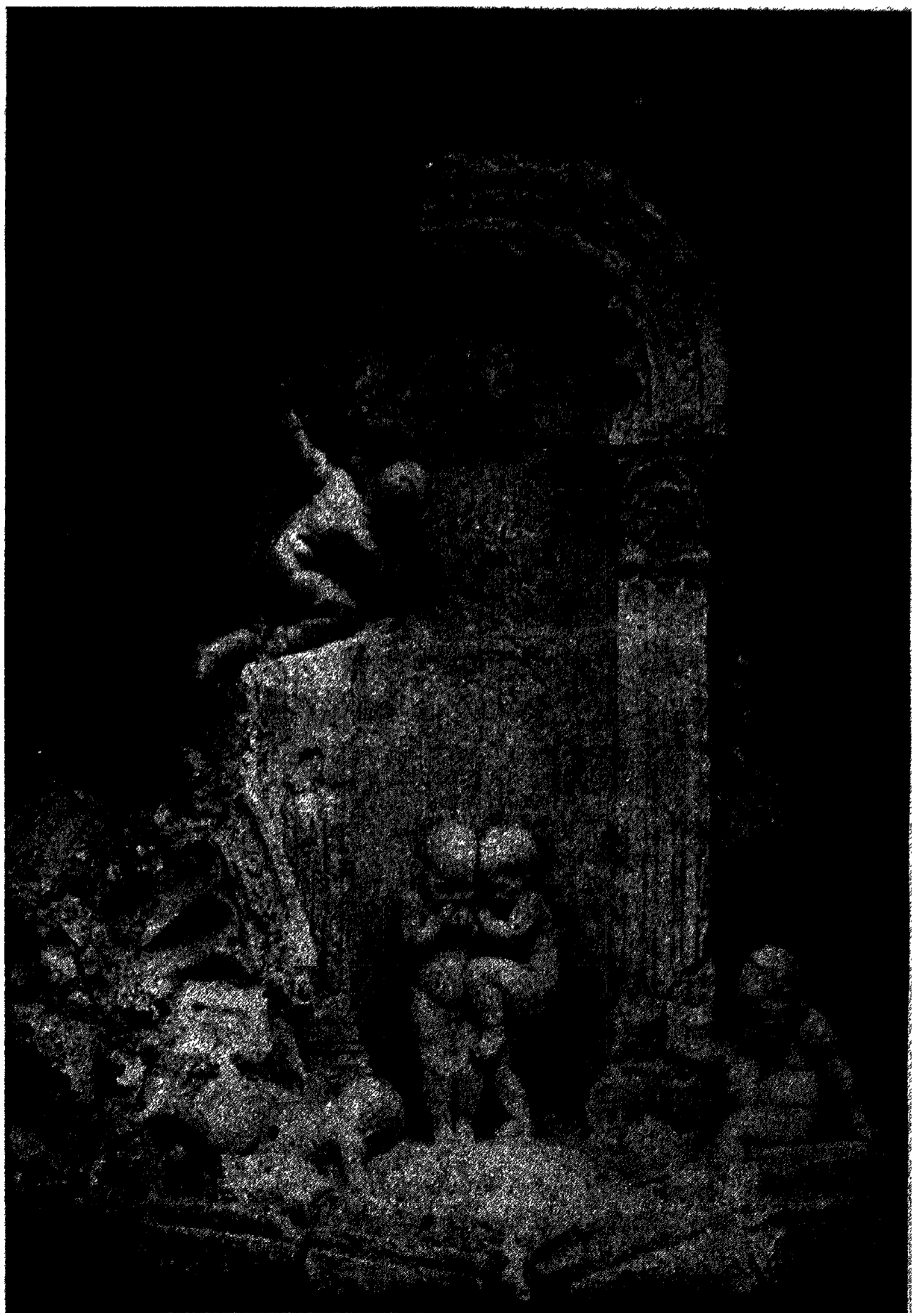
কল্পনার ভিতরে প্রাণটাকে সর্বদা ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে যে একটা আত্মারাম সমগ্র হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া বসে, উহার মমতা মানবপ্রাণে বড় প্রবল;

উহা মাকড়সার জালের মত মানুষের সকল কার্য্যকরী শক্তিকে তন্দ্রাময় মোহে জড়াইয়া ফেলে। সে মমতার স্রোতে সংসার ভাসিয়া যায়। সেই রস-মত্তাগের তুলনায় সংসারের সকল সুখ ও দীপ্তি অতীব স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং সংসারের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু প্রাকৃত ও সরল চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত সে সকলই অকাম্য ও অভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞান সুন্দরী অনাদৃতা অবলার মত মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কল্পনার কুজাটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে; এইরূপে মানবপ্রাণের সকল কর্মজ্ঞান ও মহৎভাব কল্পনার আকারে উঠিয়া উঠিয়া আকাশে বিলীন হয়—জনসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যায়। ভাব ও বিজ্ঞানের বিচ্ছেদের ইহাই বিষময় ফল। আমরা ভারতবাসী আজ সেই বিষের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া নীরবে কাঁদিয়া মরিতেছি।

বলিতেছিলাম ভাব ও বিজ্ঞানে ( Idea and technique) বিরোধ অসম্ভব কল্পনা। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের ফলে প্রতিপাদ্য বিষয়ে ভাবহানি ঘটে এক্ষণে ধারণা নিতান্ত অমূলক, সুতরাং অসত্য। মানবপ্রকৃতি মূলতঃ সকল দেশে ও সকল সমাজে এক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্নরূপ সাধনার ফলে সমষ্টিগতভাবে, বাহিরের দিক দিয়া মানবচরিত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে সবই এক। একমাত্র কবিই মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মানবের হৃদয়-বীণার তারে অঙ্গুলী সঞ্চালনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দৃশ্যকাব্যে কবির প্রতিভা অধিকতর সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়া প্রাত্যহিক হয়, সুতরাং দৃশ্যকাব্যে মানবসমাজে অশেষ ফলোপদায়ক সকল দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ভাস্কর্য্যে অগ্রতম।

এই প্রবন্ধান্তর্গত পাঁচখানি চিত্রে ভাস্কর্য্যে নিপুণ ভাস্কর শিশুজীবনের বিচিত্র ইতিহাস কেমন সুন্দর শোভন প্রাণস্পর্শী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

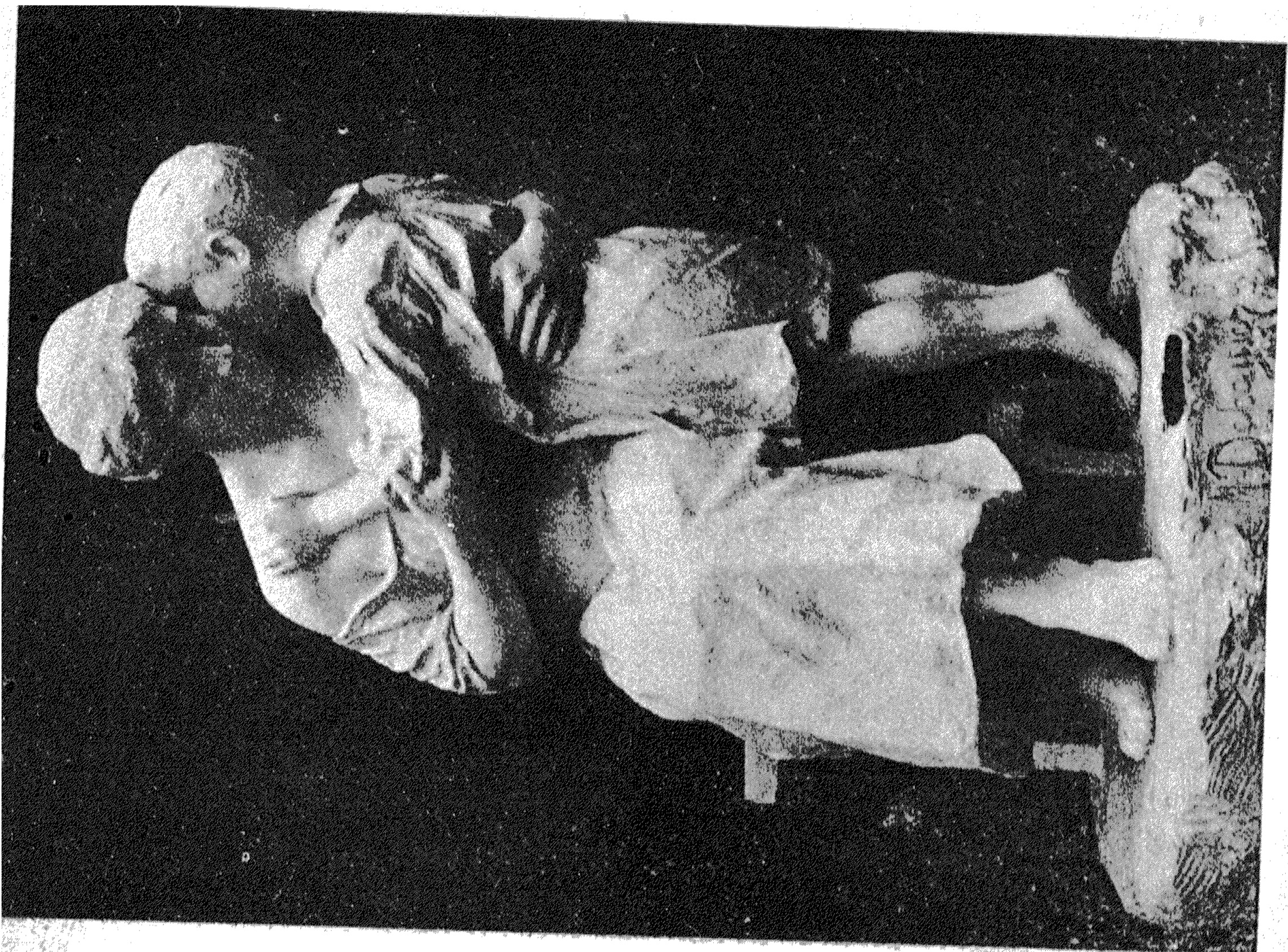
প্রথম চিত্রখানির (The First Steps) দিকে চাহিবা মাত্রই, পণ্ডিত মূর্খ, বালবুদ্ধ নির্বিশেষে সকলের প্রাণেই



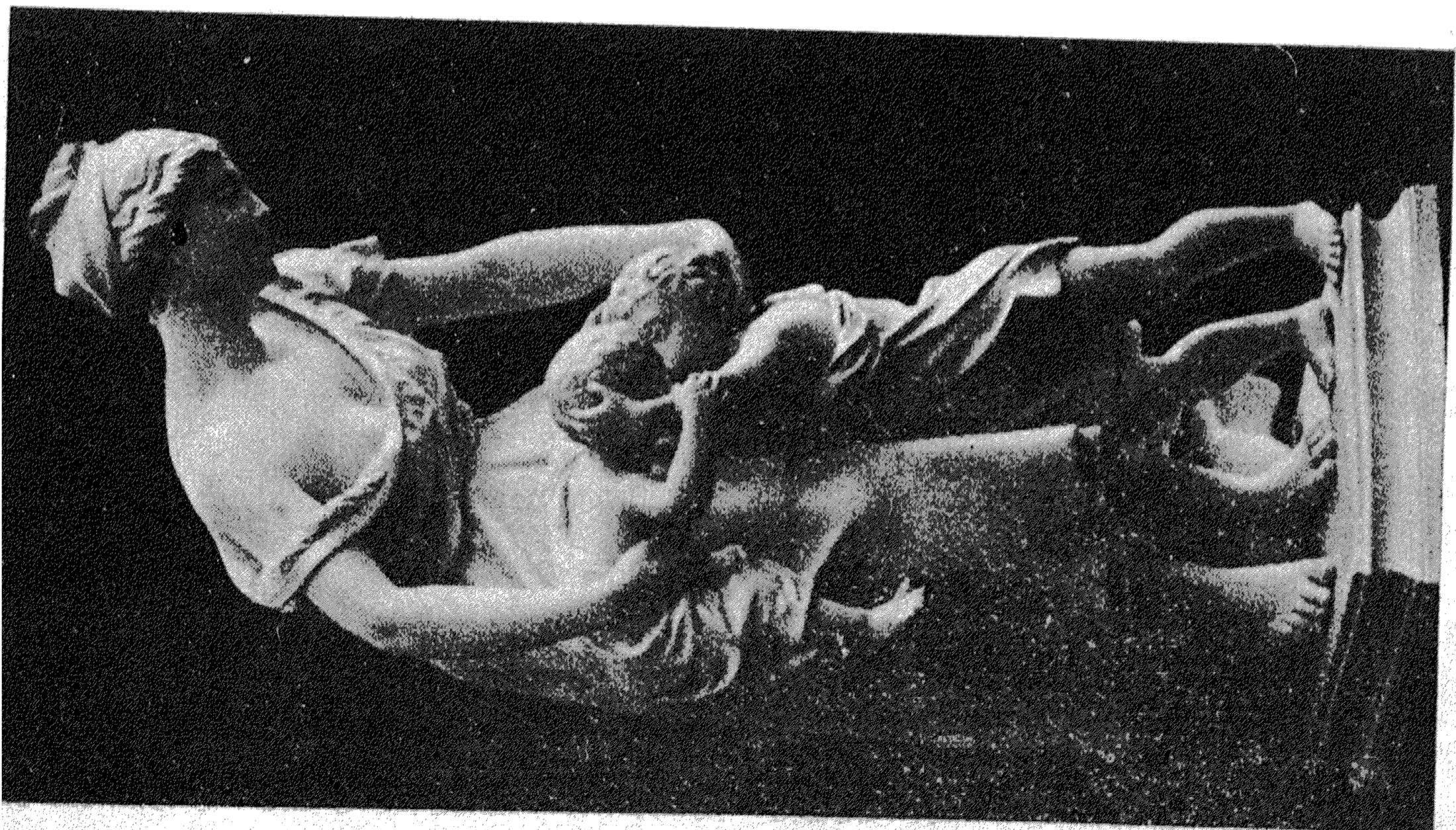
ଅମୃତାୟା ନାନ ।—Ch. R. Peyre କର୍ତ୍ତୃକ ଉତ୍କଳୀୟ ।

ଅମୃତାୟା ନାନ ।





“গোপন কথাটি” ।



“মায়ের পেটের ভাই” ।





ভাস্কর্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রস্তুতিত হইয়া উঠে। দৃশ্য-কাব্য স্বপ্রকাশ, টিকাটিপ্পনি দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; "ইহাতেই চিত্র ও ভাস্কর্য কিবা নাটকের সার্থকতা। "চলি চলি পা পা" বলিয়া মাতা শিশুসন্তানকে প্রথম চলিতে শিখাইতেছেন; এই প্রথম শিক্ষার আনন্দ ও সাবধান তন্ময়তা মাতা পুত্রের ভঙ্গীতে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মময় জীবন-শ্রোতে এমন সুন্দর কাব্যজবা যিনি স্নেহে ভাসাইয়া দিতে জানেন তিনিই ত যথার্থ কবি।

দ্বিতীয় চিত্রখানিতে ( Brother's Kiss ) "ভাইয়ের চুমু" খাওয়ার দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় ভাইটি হৈ হৈ করিয়া সারারাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কুল কুড়াইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, পুকুরের পাড়ে ঘাটের পথে ঘুরিয়া বেড়ান হইতেছিল; হঠাৎ কি মনে করিয়া ছুটিয়া আসিল মায়ের কাছে; নিজেও প্রকাণ্ড লম্বা বীর কিনা! মায়ের কোলে ভাইএর মুখখানি নাগাল পাওয়াও কঠিন, কাজেই টানিয়া ভাইএর কচি মুখখানি নীচুতে নাগাইয়া আনিয়া চুমো খাওয়া হইতেছে। মায়ের মুখেরই বা কি সুন্দর ভাব,—শিরীষ কুসুমের মত কোমল, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত নির্মল। যে মস্তবলে মানবপ্রাণের ভাব এমন সুন্দর করিয়া ভাস্কর্যে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়, সেই মস্তশক্তির সাধনকরে চিত্রকর বা ভাস্করের কোন্ স্বার্থ অপরিহার্য থাকিতে পারে, কোন্ ক্লেশ অবহনীয় থাকিতে পারে?

তৃতীয় চিত্রখানিও ( Shower Bath ) বড়ই সুন্দর। মাছস-মুছস হইয়া ভাইবোন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের খনি। লুক্কাইয়া স্বর্ণগায় স্নান করিতে আসিয়াছে। বোনটি পিছনদিক হইতে ঠেলিয়া ভাইটিকে জলের নীচে লইয়া যাইতেছে। কপালে হঠাৎ ঠাণ্ডাজল লাগাতে ভাইটির মুখখানিতে কেমন সুন্দর একটা ভাবের অবতারণা হইয়াছে। বোনটির সোহাগে-গলা মুখখানিই বা কি সুন্দর! ছবিখানির দিকে চাহিলেই স্নেহ ও আনন্দের পুতুল এই শিশু হইটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্ত হাত দুখানি যেন অলঙ্কিতে প্রসারিত হয়; দর্শকের হৃদয়ে এই আবেগময় স্নেহের অবতারণা করিতে স্মরণ

হওয়াতেই, ভাস্করের কবিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ চিত্রখানিও ( Children in the Fountain ) আপনার পরিচয় আপনিই প্রদান করে। শিশুরা জল কাদা লইয়া মাখামাখি, ছড়াছড়ি করিতেছে। শৈশবে নির্মল সরলতার সঙ্গে যখন প্রথম খেলা আরম্ভ হয়, সেই মুকুল জীবনের মধুময় স্মৃতি কর্মক্রান্ত জীবনে আগুরুক করিয়া যে ভাস্কর মানুষের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করেন, তিনি প্রশংসাতাজন।

পঞ্চম চিত্রখানি ( Confidence ) আরও চমৎকার। শিশু খেলা করিতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল মাকে কিছু বলিতে হইবে। কত যেন জরুরী গোপন কথা। তাই মায়ের কানে কানে বলা হইতেছে। মায়ের কান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গোপন কথাটা বলা দেহের দৈর্ঘ্যে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তাই ডিঙি মারিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া আকাশ-পাতাল বলা হইতেছে। গোপনীয় কথার মধ্যে ত "মা তুই যে বলেছিলি আজ আমায় খেলনা কিনে দিবি।" এমন প্রাণের কথাটা পশুপক্ষী, তরুলতা, নরকিন্নর কেহই শুনিতে পাইবে না! এমনি সুন্দর কত শত ভাবের অসংখ্য স্রোতধিনী মানবপ্রাণের উপর দিয়া নিরন্তর তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কবি তাহারই দুই একটিকে কখনও কখনও ধরিয়া আনিয়া, আকার দান করিয়া আমাদের আনন্দের জন্ত মজুত করিয়া রাখেন।

তাই বলিতেছিলাম ভাস্কর্যে বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের কথা। ভাস্কর্য বলিতে আমরা আকৃতি বা মূর্তি বুঝিয়া থাকি। মূর্তির ধারণা করিতে গিয়া আমাদেরকে অপরিহার্যরূপে একটা দেহের ধারণা করিতে হয়; দেহের কথা ভাবিতে গেলে অস্থি পঞ্জর, রক্ত মাংস ইত্যাদি দেহের সকল উপাদানের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে হয়। এ-সকল লইয়াই দেহ। ভাবকে আকার দানের কথা বলিতে গিয়া আকারের সঙ্গে যে দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই দেহের দেহের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে কিছুই

অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞানহীন ভাস্কর্য্য কল্পনার তন্ময় আনিতে পারে কিন্তু তাহা ছাড়া মানুষের আর কোনই কাজে লাগে না। ফুলটীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সুগন্ধের সন্ধানে সারা ফুলবন ঘুরিয়া বেড়াইলে ফুল-মালীকে যেমন হতাশ মনে ফিরিয়া আসিতে হয়, ভাস্কর্য্যের শিল্পাংশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া কবিত্বময় ভাস্কর্য্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও তেমনি শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। মানবের এই কর্ণের যুগে সকল চিত্তবৃত্তি কার্য্য-করনী-শক্তি হইতে প্রসূত না হইলে সমাজের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। প্রাকৃত এবং চক্ষুগোচর সুদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আমাদের চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নাটকের কাব্য-সৌধ গড়িয়া না উঠিলে আমাদের অন্তরের দৈন্য ও বাহিরের ক্লেশ কিছুতেই ঘুচিবে না। চিত্র ও ভাস্কর্য্যে ভাব ও বিজ্ঞান, যখন “দৌহে দৌহা লাগি” নিগূঢ় প্রেমে মত্ত হইয়া বন্ধ আলিঙ্গনে একীভূতপ্রাণে মূর্ত্তিময় হইয়া জনসমাজে দেখা দেয়, তখনই সমাজে সকল অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে।

লগুন

২৯শে আগষ্ট।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ষণ।

## ৩দীনবন্ধু মিত্র

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেন্য্য ! ছিলে না'ক নট,  
করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে ;  
সমাজ-শোধন-ত্রতে ত্রতী যারা ছিল কায়-মনে—  
নব্য-বন্ধে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে সুমঙ্গল ঘট—

তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট  
বীভৎস-কুৎসিত ভাষে। হে রসিক ! তব আলাপনে  
ক্ষুধ নহে পুণ্য-ধারা ; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে  
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।

অন্যায়ের বৈরী তুমি বিক্রমে বি'ধেছ অত্যাচার,  
হাস্তযুগ্মে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণা ;—  
নীলকর বিষধর করেছিল গরল উদগার,—  
নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ।  
বারিকের ভিত্তি গড়ি' নিমটাদ করি' আবিষ্কার  
হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

## ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা

যাহা দেখিলে বা শুনিলে, মানব-মতে উদ্দীপনা-সূচক আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহার নাম ললিত-কলা। ললিতকলা উপভোগের সত্ত্ব ফল, যোগ,—মনুষ্যের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা সত্য—শিব—সুন্দর তাহাতে [ অহং হইতে নিরুদ্ধ ] চিত্তবৃত্তির লয় ;—পরিণাম ফল, নবজীবন লাভ। ললিতকলানিচয়ের মধ্যে চিত্রকলার স্থান অতি উচ্চ। “হরিভক্তিবিলাসে” [ ১৮ শ বিলাসে ] গোপালভট্ট “চিত্রজ্ঞা প্রতিমার” মহিম্ময় শব্দকে “হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র” হইতে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

“কাণ্ডিভূষণ ভাবাত্যাশিত্রে যস্মাৎ স্মৃটং স্থিতাঃ।

অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনাঙ্গিনঃ ॥

তস্মাচ্চিত্রার্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বৃধৈঃ ॥

চিত্রং পুণ্ডরীকাকং সবিলাসং সবিন্দ্রমং ।

দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈ পুণ্ডরীকাকোটিষু সঙ্কিতৈঃ ॥

তস্মাচ্ছু ভার্গিভি ধীরৈর্মহাপুণ্য-জিগীষয়া ।

পটস্থঃ পূজনীয়স্ত দেবো নারায়ণঃ প্রভুরিতি” ॥ \*

“যেহেতু চিত্রে কাণ্ডি (শোভা), ভূষণ এবং ভাব প্রভৃতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত, চিত্রজ্ঞা প্রতিমানিচয়ে ভগবান (উপাসকের) নিকটে আগমন করেন (অর্থাৎ চিত্রজ্ঞা প্রতিমা দর্শন করিলে উপাসক ভগবানকে নিকটস্থ মনে করেন)। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ বলেন,—চিত্র পূজার শত গুণ পুণ্য। বিলাস (লালিত্য) এবং বিন্দ্রমসম্পন্ন চিত্রলিখিত নারায়ণকে দর্শন করিলে কোটি জন্মের সঙ্কিত পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। অতএব যাহারা ধীর এবং শুভ ইচ্ছা করেন, তাহারা মহাপুণ্য লাভ করিবার জন্ত পটে অঙ্কিত প্রভু নারায়ণকে পূজা করিবেন।”

শোভা এবং ভাবময় দেবতার চিত্র উপাসকের বা দর্শকের সালোক্য এবং সাযুজ্য লাভের সহায়তা করে। শোভাময় চিত্রমাত্রই চিত্তরঞ্জন করে এবং বিস্ময়ভাবময় চিত্র চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্রকলা লোকশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায় ; চিত্রকর সমাজের গুরু স্থানীয়।

\* শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক প্রথম উদ্ধৃত।  
Dav. n, April, 1912.

সুতরাং চিত্রকলার পরিপোষণ এবং উৎকর্ষসাধন উন্নতিশীল মনুষ্যসমাজের অবশ্য কর্তব্য।

ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সময় ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক ললিত-কলার স্থায় চিত্রকলাও অধঃপতিত জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, সরকারী কলা-বিদ্যালয়নিচয়ে, পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি প্রচলনের যত্ন হইয়াছিল। কিন্তু সে যত্ন সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না! বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই যুগের দেশীয় প্রবর্তক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদেশীয় পৃষ্ঠপোষক [ কলিকাতা স্কুল অব আর্টের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ] ই, বি, হেভেল মহোদয়। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠিত নব্যচিত্রকর সম্প্রদায়ের মূল সূত্র “পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি বুদ্ধিমান এবং প্রাচীন দেশীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন।” এই মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাদিগের সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া নাই, মুক্তহস্তে অর্থও ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু ফল বাহা এ পর্যন্ত ফলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশীয় লোকের মধ্যে মতভেদ আছে। “যে দিন থেকে বাঙ্গালাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকুল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবং এই মতবৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে।”<sup>\*</sup> সাহিত্য-সমাজে [ ষাঁহারা মাসিক পত্রের লেখক ও পাঠক তাঁহাদের মধ্যে ] এইরূপ মতবৈধ। সাহিত্য-সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণ [ ষাঁহারা আর্টস্ট ডিওর এবং রাজ্য রবিবর্ম্মার চিত্রের প্রতিলিপি ক্রয় করিয়া সাগ্রহে গৃহ সজ্জিত করেন, তাঁহারা ] এই নব্যতন্ত্রের চিত্রকর-গণের চিত্র সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এই মতবৈধের এবং উদাসীনের কারণ কি? ষাঁহারা নব্যচিত্রকলার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ অপর পক্ষের অজ্ঞতা; পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত অপকৃষ্ট চিত্রের

সহিত পরিচয়ে সজ্ঞাত রুচি-বিকৃতি। কেবল যে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকেই নব্যচিত্রকলার মাহায়া অমুতবে অসমর্থ এমন নহে, ষাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী, এমন অনেক লোকেও নব্য চিত্রকলাকে একরূপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা দেখিতে যাইবার সময়, হঠাৎ পথের মধ্যে ধামিয়া, লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“মহাশয়, একটি কথা। আজকাল ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির নমুনা বলিয়া যে-সকল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, আপনাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি ত সেই রকমের নয়?” এই শ্রেণীর লোকের মত উপেক্ষার বস্তু নয়।† প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি অনাদর করিবার লোক ইহারা নহেন। সুতরাং প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি কি তাহা সাবধানে আলোচ্য।

বিংশ শতাব্দীতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে-মতের পরিপোষণার্থ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, দেব প্রতিমা গঠন বা অঙ্কন সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর একজন বৈষ্ণব লেখকও সেই মতেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গোপালভট্ট ( “হরিত্তিক্তিবিলাস”, ৮৪ ) লিখিয়াছেন—

ভক্ত্যেব ভগবন্মূর্ত্তি প্রাদুর্ভাবোহপি চেত্তবেৎ।  
কর্তব্যোহুপাপ্যাপ্যোহুত্র পূর্বেঃ সন্তিঃ প্রদর্শিতঃ ॥

“যদিও ভক্তিবলেই ভগবানের মূর্ত্তি কল্পিত হইতে

† এই “সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত” মহাশয় “সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী” হইতে পারেন; কিন্তু “প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতি”র সহিত তাঁহার পরিচয় কতটুকু, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী হইলেই যেমন পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মে না, প্রাচ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা আর দশজনের মত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও তদ্বারা ইউরোপীয় চিত্রকলা বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করি নাই। ইংরাজী কাব্যনাটকের রসজ্ঞ হইতে হইলেও আমাদের মত সাধারণ লোকদিগকে টেম ডাউডেন আদি সমালোচকদের আশ্রয় লইতে হয়। অধঃ রসায়ন, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব গণিত প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত অনেক লোকও মনে করেন যে, চিত্রের রসজ্ঞ হইতে হইলে বিশেষভাবে কোন অধ্যয়ন, অনুশীলন বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না।—সম্পাদক।

\* “বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ” (বীরবল), ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০।

পারে, তথাপি পুরাকালের সাধুগণের প্রদর্শিত উপায়ই এক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্তব্য।”

এইরূপ ভূমিকা করিয়া গোপালভট্ট [ “হরিভক্তি-বিলাসের” ] “শ্রীমূর্ত্তি-প্রাহুর্ভাব” নামক অষ্টাদশবিলাসে প্রতিমা নির্মাণ সম্বন্ধে বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোপালভট্টের এই নিবন্ধ, বরাহমিহির প্রণীত “বৃহৎসংহিতা”র “প্রতিমা লক্ষণ” নামক ৫৭ অধ্যায় এবং তাহার টীকা এবং “মৎস্য পুরাণ” অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে প্রাচীন চিত্রকলারীতির পরিচয় প্রদান করিতে যত্ন করিব।

গোপালভট্টকৃত “মৎস্যপুরাণের” মতে প্রতিমা চারি প্রকার,—চিত্রজা, লেপ্যা (মৃগ্ময়ী), শাস্ত্রোৎকীর্ণা (পাষণ বা কাষ্ঠ নির্মিত) এবং পাকজা (ধাতুমূর্ত্তি)।

“পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা।”

“পটে, ভিত্তিগাত্রে এবং পাত্রগাত্রে অঙ্কিত প্রতিমাকে চিত্রজা প্রতিমা বলে।” প্রতিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রধান ব্যবস্থা,—প্রতিমার অবয়বের পরিমাণ। এই পরিমাণের মূল অঙ্ক (unit) প্রতিমার “স্বকীয় অঙ্গুল।” প্রতিমাকে যত দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়, সেই দৈর্ঘ্যকে ১০৮ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে “স্বাঙ্গুল” বা স্বকীয় অঙ্গুল বলে। এই ১০৮ স্বাঙ্গুল দৈর্ঘ্য কল্পনা-প্রসূত নয়, স্বভাবের অনুকরণ মাত্র। বরাহমিহির “পুরুষ-লক্ষণ” প্রসঙ্গে (বৃহৎ সংহিতা, ৬।১০৫) লিখিয়াছেন—

“অষ্টশতং বহুবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিত্তি পুংসাম্।

উত্তমসমহীনানামঙ্গুলসম্বা। স্বমানেন ॥ \*

“স্বকীয় অঙ্গুল অনুসারে উত্তম পুরুষের পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল, মধ্যম শ্রেণীর পুরুষের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল, এবং হীন পুরুষের পরিমাণ ৮৪ অঙ্গুল।”

টীকাকার ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন,—“ভূপাদসংযোগ” হইতে “শিরোমধ্য” পর্য্যন্ত সূত্র ধরিয়া, পুরুষকে মাপিতে হইবে। গোপালভট্ট স্বাঙ্গুলের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া “পুরাণ তন্ত্রাদি” গ্রন্থ হইতে প্রতিমার বিভিন্ন অবয়বের পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন—

\* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে এই বচনটি দেখাইয়া দিয়াছেন।

“অশ্চালিখিতং কার্যং লোকদৃষ্ট্যাহখিলং বৃথৈঃ।”

“এতদ্ভিন্ন যাহা এখানে লিখিত হয় নাই, পণ্ডিতগণ লোক-মধ্যে সেই সেই অঙ্গের সৌষ্ঠবাদি দেখিয়া, তাহা সম্পাদন করিবেন।” “হরিভক্তিরিলাসে”র টীকাকার “লোকদৃষ্ট্য”র অর্থ লিখিয়াছেন, “লোকেষু তত্তদঙ্গ-সৌষ্ঠবাদি দৃষ্ট্য।”

বরাহমিহির (৫।১৪) শাস্ত্রোৎকীর্ণা প্রতিমার মানের সহিত চিত্রজা প্রতিমার মানের কিরূপ প্রভেদ তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যথা—

“দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাচ্চতুর্দশায়ামতোহঙ্গুলানি শিরঃ।

দ্বাদশ তু চিত্রকর্ণণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যাঃ ॥”

“প্রতিমার মস্তকের পরিধি ৩২ অঙ্গুল এবং দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুল; চিত্রে পরিধির ১২ অঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, অপর ২০ অঙ্গুল অদৃশ্য থাকে।” চিত্রকরের জন্ত গোলাকার অবয়বের বিস্তার এবং ভাস্করের জন্ত পরিধির মান প্রদত্ত হইয়াছে। † প্রতিমার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং চাহনির ও হাসির ভঙ্গি সম্পাদন বিষয়ে গোপালভট্ট “হয়শীর্ষীয়ে”র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্য। হসিতাদি মিরীক্ষণং।

তথা তথৈব কর্তব্যমুহং যত্নেন দেশিকৈঃ ॥”

টীকা। “লক্ষণং অঙ্গসৌষ্ঠব-প্রকারং। যথা মুখশ্চ পূর্ণচন্দ্রাদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পদ্মপত্রৈণ সাদৃশ্যমিত্যাदि। তত্তদঙ্গংবা কিঞ্চ। নিরীক্ষণমবলোকনং হসিতাদি চ দৃষ্ট্য। তথা তেন লোকোত্তরবিষয়ক দৃষ্টলক্ষণ-প্রকারেণ বীপ্সা তদাচার্যার্থী তত্তলক্ষণঞ্চ সামুদ্রিকাদবুজং। সাক্ষাৎকন্মি-শ্চিৎ সুপুরুষে দৃশ্যমানঞ্চ জেয়ং।”

“লোকের অঙ্গসৌষ্ঠব বা অবয়বলক্ষণ এবং হাসির এবং চাহনির ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক ঠিক সেইরূপ গঠন করিবেন।”

ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা ধর্ম্মের অঙ্গ। শিল্পশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধের ত্রায় পুণ্য-পাপকর এবং কল্যাণ-অকল্যাণকর। প্রতিমা অঙ্কনে কি কি নিষিদ্ধ, তাহা “মৎস্যপুরাণে” (২৫৯।১৫-২১) এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে—

† বিস্তারের তিনগুণ পরিধি।

“নাথিকান্ধানহীনাঙ্গাঃ কর্তব্যং দেবতা কচিং ।

স্বামিনং যাতয়েন্নানা করালবদনা তথা ।

অধিকা শিল্পিনং হস্তাং কৃশা চৈবার্থনাশিনী ॥

কুশোদরী তু হৃর্তিকং নির্মাংসা ধননাশিনী ।

বক্রনাশা তু হুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী ॥

\* \* \* \* \*

সম্পূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুলক্ষ্মীপ্রদা সদা ॥”

“দেবতার প্রতিমা কখনও অধিকাক্ষী বা হীনাক্ষী করিবে না। প্রতিমার বদন যদি নূন বা ভয়ঙ্কর হয়, তবে স্বামীকে নাশ করে; অধিকাক্ষী প্রতিমা শিল্পীকে বধ করে, কৃশাক্ষী প্রতিমা অর্থনাশ করে। কুশোদরী প্রতিমা হৃর্তিকউৎপাদন করে এবং অস্থিচর্মসার (মাংস-হীন) প্রতিমা ধন নাশ করে। যে প্রতিমার নাসা বক্র তাহা হুঃখ উৎপাদন করে, এবং যে প্রতিমা সংক্ষিপ্তাঙ্গ তাহা ভয়োৎপাদন করে। \* \* \* যে প্রতিমা সম্পূর্ণাবয়বা তাহাই সর্বদী আয়ু এবং ধনবৃদ্ধি করে।”

প্রতিমাকে কান্তি-বিলাস-বিভ্রমময়ী করিতে হইলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এই-সকল শাস্ত্রবচনে তাহাই বিহিত হইয়াছে। হুইদিক দেখিয়াই এই-সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। একদিক, নিসর্গনিষ্ঠা (fidelity)—সুপুরুষের অবয়বে এবং মুখভঙ্গীতে যাহা কিছু শোভন তাহার অনুকরণ। কিন্তু সুপুরুষের সমুদয় সুলক্ষণ একাধারে কেবল সামুদ্রিক শাশ্ত্রেই দেখা যায়, লোক-সমাজে অতি বিরল। সুতরাং সর্বপ্রকার সান্ন্যেশের অবস্থাকেও কতকটা কল্পনার কার্য (ideality) বলিতে হইবে। নিসর্গনিষ্ঠা এবং কল্পনা (fidelity এবং ideality) এই উভয়ের সমন্বয় সাধনই আমাদের চিত্রকলার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শ, তাই শকুন্তলার বর্ণনা করিতে গিয়া, মহাকবি লিখিয়াছেন—

“চিত্রে নিবেশ্ত পরিকল্পিত সঙ্গযোগা”

“পটেতে লিখিয়া আগে বিধাতা করেছে পরে জীবন সঞ্চার।”

শিল্পশাস্ত্রে প্রতিমার অবয়ব-কান্তি-সম্পাদনের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, কি নিয়মে প্রতিমাকে “ভাবাঢ্য” করিতে হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই এবং থাকিতেও পারে না। ভাবাঢ্যতা বা সঙ্গযোগ-পরিকল্পনা সৃষ্টিকর্ম প্রতিভার কার্য। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সেরূপ প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। শিল্পী কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষা

সম্পন্ন হইবেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিবেন গোপালভট্টের মৎস্য পুরাণের নিয়োক্ত বচনে তাহা বিবৃত হইয়াছে—

“বিবিঞ্জে সংযুতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেঙ্গিয়ঃ ।

পূর্ব্ববৎ কালদেশজঃ শাস্ত্রজঃ গুরুভূষণঃ ॥

প্রযতো মিয়তাহারো দেবতাধ্যানতৎপরঃ ।

যজমানাত্মকুলোান বিদ্বান্ কর্ম সমাচরেৎ ॥

\* \* \* \* \*

গুরুর্গণৈশ্চ পুশ্পৈশ্চ দ্রব্যং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ।

স্বস্তিবাচনকং কৃৎয়া প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ ॥”

“সংযতেঙ্গিয়, দেশকালজ, শাস্ত্রজ, মিতাহারী, দেবতাধ্যানতৎপর, বিদ্বান, গুরুবসন শিল্পী (স্থপতি) যত্ববান হইয়া যজমানের কল্যাণের নিমিত্ত আবৃত নির্জন স্থানে কার্য্য করিবে। \* \* শ্বেতচন্দন এবং শ্বেত পুস্পের দ্বারা দ্রব্যকে (শিলা বা পটাদি উপাদান) ভক্তিভরে পূজা করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক প্রতিমাকে বিভাগ করিবে।”

ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম মাত্র প্রদত্ত হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলচিত্রকলার অভ্যুদয়ের সমসময়ে এই রীতিই যে যথাসম্ভব অনুসৃত হইত, গোপালভট্টের নিবন্ধই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই রীতির ফলে ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রমাণ দিব। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে প্রথম স্থান অঙ্কটার গুহা-চিত্রাবলীর। মিসেস হেরিংহাম (Mrs. Herringham) প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। ত্রীযুত অবনৌজনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে এবং তাঁহার নেতৃত্বে ত্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ত্রীযুত অসিতকুমার হালদার অঙ্কটার গুহা-চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মিসেস হেরিংহাম বলেন, অঙ্কটাচিত্রের, (the outline is in its final state firm but modulated and realistic) বাহুরেখা সমাপ্তিকালে দৃঢ়তার সহিত অঙ্কিত অথচ চলচল-ভাবময় এবং স্বভাবসঙ্গত। \* মিসেস হেরিংহাম ১৭নং গুহায় অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে বলেন †—

\* *Festival of Empire, Indian Section, Guide and Catalogues. P. 29.*

† Quoted in V. A. Smith's *A History of Fine Art in India and Ceylon*, Oxford, 1911, Pp. 293-294.

“Further, in Cave 17 there are three paintings by one hand very different from all the rest. They are (1) a hunt of lions and black buck ; (2) a hunt of elephants ; and (3) an elephant salaaming in a king's court—the companion picture to No. 2. These pictures are composed in a light and shade scheme which can scarcely be paralleled in Italy before the seventeenth century. They are nearly monochrome (warm and cool greys understood), except that the foliage and grass are dull green. The whole posing and grouping is curiously natural and modern, the drawing easy, light and sketchy and the painting suggestively laid in with solid brush strokes—in the flesh, not unlike some modern French painting. The animals—horses, elephants, dogs and black buck—are extremely well-drawn.”

অর্থাৎ ১৭ নং গুহার একই হাতের অঙ্কিত তিনখানি ছবি আছে। এই তিনখানি চিত্র অজ্ঞতার অজ্ঞাত চিত্র হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম চিত্রের বিষয় সিংহ এবং কৃষ্ণ-মৃগ শিকার ; দ্বিতীয়, হাতী শিকার ; তৃতীয়, একটি হাতী রাজদরবারে নমস্কার করিতেছে। এই চিত্রগুলিতে আলো ও ছায়া যথাবিধি পাশাপাশি রাখিয়া বর্ত্তলাকৃতি দেখান হইয়াছে। আলো ও ছায়ার এরূপ সমাবেশ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী ইতালীয় কোন চিত্রে দেখা যায় না। চিত্রিত বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ববিভাগসভঙ্গী এবং সমষ্টির সমাবেশভঙ্গী স্বাভাবিক এবং আধুনিক চিত্রকলা-সম্মত। অনেকানেক বিষয়ে এই সকল চিত্র আধুনিক ফরাসী চিত্রের সহিত তুলনীয়।”

এই তিনখানি চিত্র কোনও বিদেশীয় চিত্রকরের কৃত বলিয়া অনুমান করা যায় না, কেননা তৎকালে ভারতবর্ষের বাহিরে এরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই-সকল চিত্রের প্রধান গুণ স্বাভাবিকতা এবং তজ্জন্ম আলো ও ছায়ার সুসমাবেশ। শাস্ত্রে দেবতা অঙ্কনের রীতি বিহিত হইয়াছে, মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি অঙ্কনের রীতি উক্ত হয় নাই। দেবপ্রতিমা অঙ্কনের রীতি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ নিসর্গনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় লৌকিকচিত্র অঙ্কনে নিসর্গই চিত্রকরের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত। নিসর্গানুসরণরীতির চরমোৎকর্ষ অজ্ঞতার এই ১৭ নং গুহার তিনখানি চিত্রে দৃষ্ট

হয়। তৎকালে এইরূপ স্বভাবসম্মত-লৌকিকচিত্র-অঙ্কন-ক্রম অনেক চিত্রকরই যে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ভাস, কালিদাস, হর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের নাটকসমূহে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্” নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ভারতীয় লৌকিক চিত্রকলারীতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। দীবর হইতে প্রাপ্ত স্বীয় অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া, দুঃস্বপ্নের স্বরণ হইয়াছে, তিনি যথার্থই শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং নিরপরাধিনীর প্রত্যাখ্যানজনিত পশ্চাত্তাপ তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। দুঃস্বপ্ন স্বহস্তে চিত্রফলকে শকুন্তলার একখানি প্রতিবৃতি লিখিয়াছেন। তিনি বিদুষকের সহিত মাধবীমণ্ডপে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় চতুরিকা চিত্রফলকহস্তে প্রবেশ করিয়া “চিত্রগতা” শকুন্তলাকে দেখাইলেন। “অমনি বিদুষক বলিয়া উঠিলেন—

“সাদু বয়স্ ! মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবাননুপ্রবেশঃ । স্থলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে ।”

“সাদু সাদু ! সুবিক্রম অঙ্গে ভাবের অভিব্যঞ্জন সুন্দর হইয়াছে। (সমতল চিত্রফলকে) অবয়বের নিয়ম এবং উন্নত অংশগুলি এমন সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃত নিম্নোন্নত প্রদেশ দেখিবার সময় যেমন নেত্রগোলকের গতিস্থলন হয় এই চিত্রদর্শনের সময়েও সেইরূপ দৃষ্টিস্থলন হইতেছে।”

আলো ও ছায়ার সম্যক সমাবেশ ভিন্ন কি চিত্রের নিম্নোন্নত প্রদেশে দৃষ্টিস্থলন সম্ভব ? এই চিত্র বর্ণনা যে কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত নয়, অজ্ঞতার ১৭ নং গুহার তিনখানি চিত্র তাহার সাক্ষী। কালিদাস স্বচক্ষে ওরূপ অনেক চিত্র দেখিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছেন,—“স্থলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে !” বিদুষকের এই প্রশংসাবাক্য বিরহবিধুর দুঃস্বপ্নের হৃদয়ের ব্যথা যেন একটু অপসারিত করিল। দুঃস্বপ্ন সুনিপুণ শিল্পিসুলভ বিনয় সহকারে বলিলেন—

“যদ্যৎ সাদু ন চিত্রে স্তাৎ ক্রিয়তে তত্তদগ্ৰথা ।

তথাপি তন্ত্ৰ লাভণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদযিতম্ ॥”

“যাহা চিত্রে অবিকল অঙ্কিত করা যায় না তাহা অগ্র-প্রকারে অঙ্কিত করিতে হয়। তথাপি তুলিকার রেখার দ্বারা তাহার লাভণ্য কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে।”

চিত্রখানি অঙ্কলিখিত হইয়াছিল মাত্র। তাই দুঃস্বপ্ন চতুরিকাকে বর্ত্তিকা (তুলিকা) আনিতে পাঠাইলেন।

নিদ্রাক 'সেই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর কি লিখিতে বাকী আছে ?” রাজা উত্তর করিলেন—

“কার্ঘ্যম্ সৈকতলীনহংসমিথুনা শ্রোতবহা মালিনী ।  
পাদান্তামভিতো নিষরহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ ।  
শাখালম্বিতবক্ললশ্চ চ তরো নির্মাতুমিচ্ছামাধঃ  
শৃঙ্গে ক্লম্বগম্ভ বামনয়নং কণ্ডুয়মানাং যুগীষু ॥”

“হংসমিথুন-সুশোভিতা তটশালিনী মালিনী নদী লিখিতে হইবে; মালিনীর উভয়পার্শ্বস্থ যুগদলমণ্ডিত হিমাদ্রির পবিত্র পাদদেশ লিখিতে হইবে। যাহার শাখা হইতে ( মুনিজনের পরিধেয় ) বক্লল কুলিতেছে এইরূপ তরুর অধৌদেশে ক্লম্বগম্ভের শৃঙ্গে যুগী বামনয়ন কণ্ডুয়ন করিতেছে এইরূপ চিত্র নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।”

কালিদাস এস্থলে যেরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape অঙ্কনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যথাযথ অঙ্কিত করিতে হইলে, বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব এবং আপেক্ষিক আকার ( Perspective ) প্রদর্শন আবশ্যিক। কালিদাসের এই একটি শ্লোকই সাক্ষ্য দান করিতেছে, যথাযথ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখিবার জ্ঞান ভারতীয় চিত্রকর কিরূপ যত্ববান ছিলেন; কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, নিদর্শনভাবে, তাহা বলা কঠিন। চীনদেশীয় চিত্রকরণ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখনের নৈপুণ্য কতক পরিমাণে হয়ত ভারতশিল্পীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। চীনদেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়া সন্নিবেশের চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া চীনচিত্রকরের শিক্ষাগুরু ভারত-শিল্পীও সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে।

অজন্তার ১৭নং গুহার চিত্র এবং কালিদাসের শকুন্তলা প্রায় একই কালের সৃষ্টি। ভারতের শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র-সংস্থানের সেই গৌরবময় যুগের শেষ সীমায় ভবভূতি দণ্ডায়মান। ভবভূতির সময়ে কিরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র লিখিত হইত ‘উত্তররামচরিতের’ চিত্র-দর্শন-নামক প্রথম অঙ্কই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে সময়ে ভবভূতি প্রাহতুত হইয়াছিলেন তাহার পর শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে) গোড়াধিপ ধর্মপাল এবং দেবপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র দেশে ধীমান এবং বিতপাল নামক দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী প্রাহতুত হইয়া-

ছিলেন। বিতপাল ধীমানের পুত্র। উভয়ে পাকজা, এবং শাস্ত্রোৎকীর্ণা, এই ত্রিবিধা প্রতিমা নির্মাণেই পটু ছিলেন, এবং সারা বাঙ্গালা, মগধ, এবং নেপালের শিল্পীগণ ইহাদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। ধীমান এবং বিতপাল যে কলারীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বৌদ্ধ নরপালগণের সময় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল, বৈষ্ণব বর্ষ-বংশের এবং সেন-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের ফলে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাই তারানাথের প্রদত্ত বাঙ্গলার শিল্পইতিহাসের সার মর্ম।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ধীমানের ও বিতপালের প্রতিষ্ঠিত রীতিতে অঙ্কিত পাল ও সেন নরপালগণের সময়ের চিত্রজ্ঞা প্রতিমার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু শাস্ত্রোৎকীর্ণা অনেক পাষণ-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। এই-সকল প্রতিমা সম্পূর্ণাঙ্গ (statue in round) নহে, প্রস্তরফলকে আংশিকভাবে উৎকীর্ণ (relief sculpture) এক প্রকার অর্ধচিত্র (half drawing)। এইরূপ দুইখানি পাষণ-প্রতিমার চিত্র হইতে বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পরীতির কথঞ্চৎ পরিচয় দিতে যত্ন করিব।

প্রথম চিত্র, সর্কলোক-পিতামহ ব্রহ্মার প্রতিমা। প্রতিমাখানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিযুত যামিনীকান্ত মুন্সী রাজসাহী জেলার তানোর থানার অন্তর্গত বারোপুটা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। হেমাঙ্গির “ব্রতখণ্ডে” “বিষ্ণুধর্মোত্তর” হইতে ব্রহ্মার মূর্তির এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

“ব্রহ্মাণং কারয়েদ্বিদানু দেবং সৌমাং চতুর্ভুজম্ ।  
বক্ল পদ্মাসনস্তেং তথা কৃষ্ণাজিনাপরম্ ॥  
জটাধরং চতুর্বাঙ্গং সপ্তহংসরথস্থিতং ।  
বামে ঞ্চন্তেতরং করস্তৈকেন্দ্রোয়ুগং ভবেৎ ( ১ ) ॥  
এতস্মিন্ দক্ষিণে পাণাবক্ষমালা তথা শুভা ।  
কমণ্ডলুং দ্বিতীয়েচ সর্কীভরণধারিণম্ ॥  
সর্কলক্ষণযুক্তাশ্চ শাস্ত্ররূপশ্চ পার্শ্বব ।  
পদ্মপত্রদলীগ্রাভং ধ্যানসংমিলিতেকণম্ ।  
অর্চায়াক্ষারয়েদেবং চিত্রে বা বাস্তুকর্মণি ॥

“মৎস্য পুরাণে” ( ২৬০।৪০ ) ব্রহ্মার প্রতিমা নির্মাণের যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে, বাহন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, “হংসারূঢ় কচিৎকার্য্য, কচিচ্চ কমলাসন।” আমাদের

চিত্রের ব্রহ্মমূর্তি ঠিক শাস্ত্রানুরূপ নহে। শিল্পীর স্বাধীন রুচি এই বৈষম্যের কারণ। তথাপি চিত্রের ব্রহ্মায় শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার যাহাতে ব্রহ্মাত্ম তাহা আশ্চর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর অবয়ব-গঠন-কৌশল উচ্চ অপের না হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ নিম্ন হস্তের জপের মালা যেন চলিতেছে। সমগ্র প্রতিমায় সৌম্যতা এবং শান্তিরূপ সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিল্পীর প্রতিভার প্রধান পরিচয়স্থল তিনখানি মুখ (চতুর্থ অদৃশ্য)। তিনখানি মুখই “ধ্যানসংমিলিতেক্ষণ,” এবং অপার্থিব সুষমামণ্ডিত। এই তিনখানি মুখের দিকে তাকাইলে, মনে হয়,—

“ঐ দেখা যায় আনন্দধাম ভবজলধির পারে জ্যোতির্গয় ;  
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন”—

যেন সেই আনন্দধামের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুশিল্পী গ্রীক শিল্পীর মত পৌত্তলিক ছিলেন না। হিন্দু শিল্পীর নির্মিত প্রতিমা অজ্ঞানের উপাস্ত পুত্তলিকা নয়, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞান-পরিষ্কৃত প্রেমপুষ্পাঞ্জলি। ব্রহ্মার পারিপার্শ্বিক সাবিত্রী এবং সরস্বতীর মূর্তি গঠনে শিল্পী তেমন কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহন হংস স্বভাবসম্মত না হইলেও সু-কৌশলে উৎকীর্ণ, যেন ধীরে ধীরে হংস-গতি চলিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র, বিষ্ণুর প্রতিমা। এই প্রতিমাখানি ভগ্ন হইলেও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত যোগীওক্ষার মন্দিরে এখনও পূজিত হইতেছে। প্রতিমার জামুর নিম্নভাগ অঘটে উৎকীর্ণ, কারণ এই অংশ মন্দিরের বহির্ভাগস্থ দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইত না। এই বিষ্ণু-প্রতিমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে পদদ্বয় উপেক্ষা করিয়া উর্দ্ধভাগে চিত্তসংযোগ করিতে হইবে। প্রতিমার মুখ যেমন কান্ত তেমন ভাবাত্ম্য। এই প্রসন্ন গম্ভীর মুখমণ্ডলে জগৎমাতার বিশ্বজনীন প্রীতি এবং ত্রায়-পরতা সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হস্তচতুষ্টয়, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ গঠনে শিল্পী অত্যাশ্চর্য্য স্বভাবানু-করণসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অনুকরণে খুঁটি-নাটি উপেক্ষিত হইয়া প্রতি স্নেহে অপার্থিব কমনীয়তা সংক্রামিত করিয়াছে। শান্তিদ দক্ষিণনিম্ন হস্ত যথার্থই

যেন শান্তিধারা ঢালিতেছে। আজ্ঞামূলধিনী বনমালা বনফুলের মালার মতই এলাইয়া পড়িয়াছে। এই “সৌম্য-রূপঃ সুদর্শনঃ” প্রতিমায় শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেবুতাদ্যানতৎপর শিল্পী—

“লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদি নিরীক্ষণং  
তথা তথৈব”—

গড়িয়া তুলিয়াছেন।

হেভেলও ভারতীয় ভাস্করকলার মূলে এই নিসর্গনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহারা বলেন হিন্দুহৃদয়ে নিসর্গ-প্রেমের অভাব বশতঃ হিন্দুস্থানে ললিতকলা অভ্যাসের অবসর পায় নাই তাঁহাদের উত্তরে হেভেল বলেন—

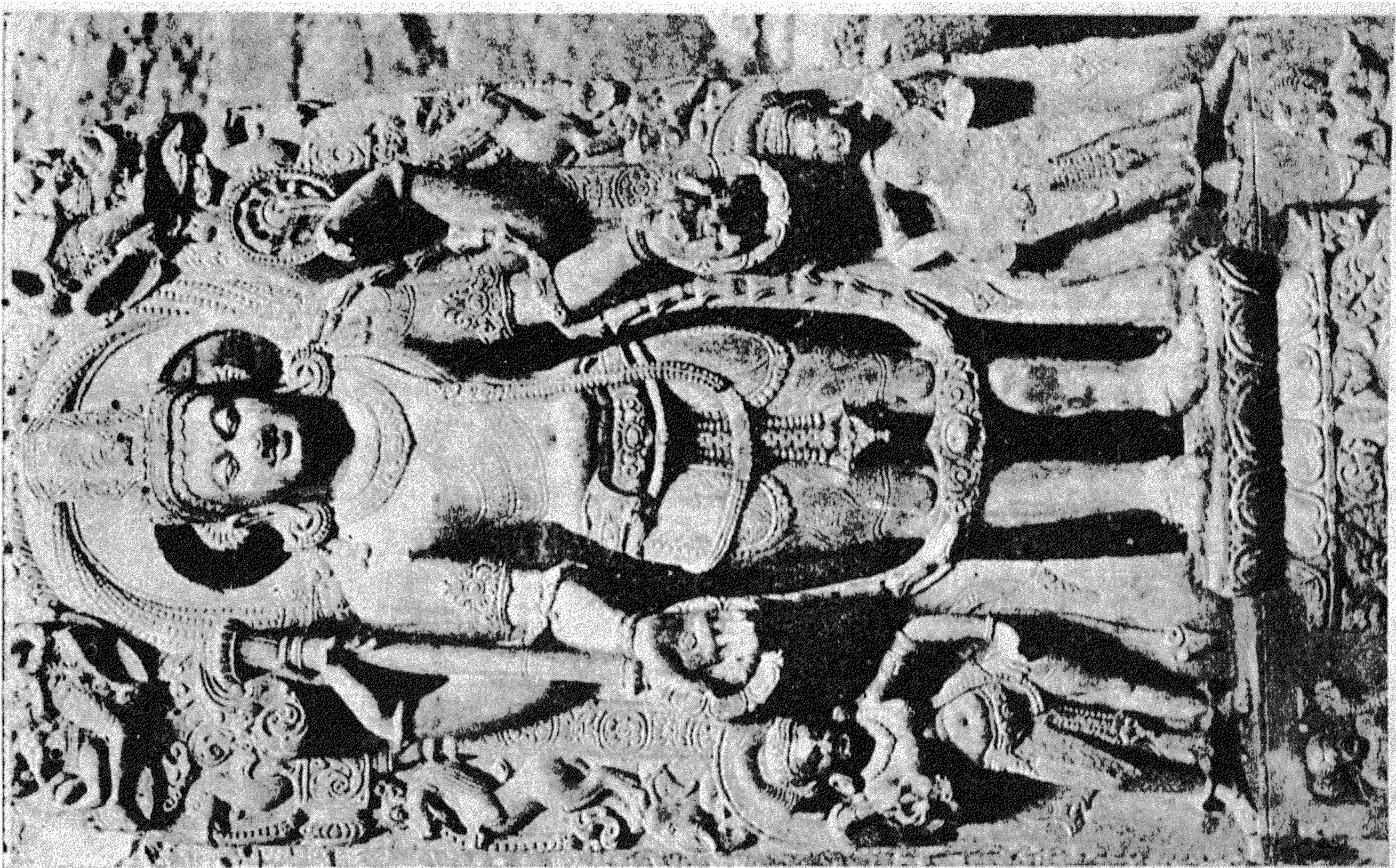
“The sculptor who carved the great bull at Mamallapuram and elephants at Kanarak were as perfect masters of their art as the Greeks. Both the realism of such works as these and the idealism of the sublime Buddha at Anuradhapura, of the four-armed Siva of the Madras Museum, or of the four-headed Brahma at Leyden proceed from a reverent and profound study of nature, and neither the one nor the other could have been achieved without it.”\*

“যে-সকল ভাস্কর মামল্লপুরের বৃহৎ বৃষ এবং কণা-রকের হস্তী উৎকীর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যে গ্রীকগণের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপ মূর্তির স্বাভাবিকতা এবং অমুরাধপুরের বুদ্ধমূর্তির, মাদ্রাজের যাহুবরের চতু-ভূজ শিবের, এবং লেডেনের চতুর্মুখ ব্রহ্মা-মূর্তির কল্পনা-কৌশল এতদূরই শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং গভীর নিসর্গনিষ্ঠার ফল। নিসর্গনিষ্ঠা ব্যতীত স্বাভাবিকতা অথবা কল্পনাকৌশল ছুটির একটিও আয়ত্ত করা যাইত না।”

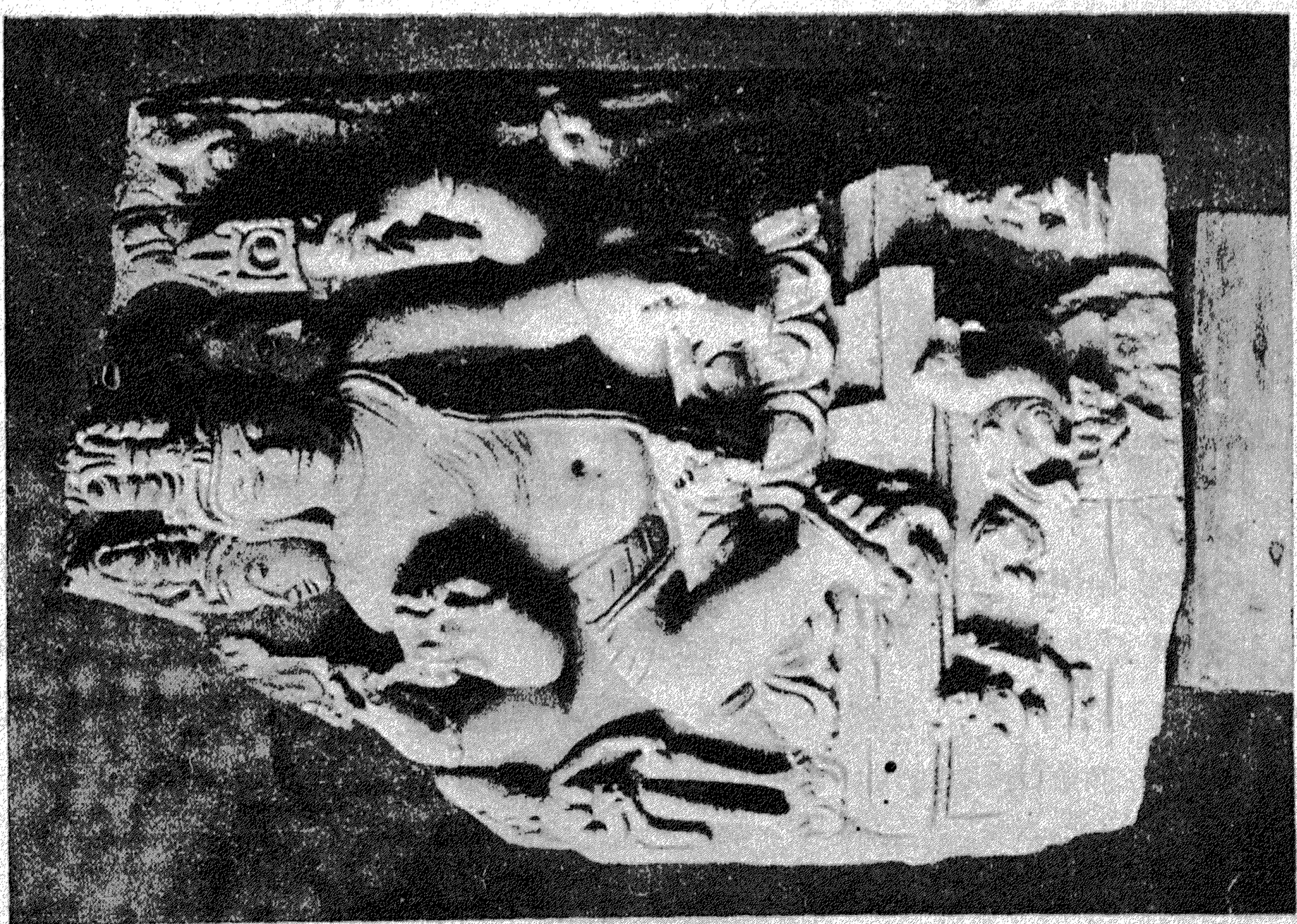
মুসলমানবিজয়ের পরবর্তী সার্ক তিনশত বৎসরের হিন্দুস্থানের চিত্রকলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সম্রাট আকবরের যত্নে ফলে মোগল চিত্রকলার অভ্যাস এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সাহজাহাঁর সময় ইহার পূর্ণ পরিণতি। মোগলচিত্রকলার আরণ্য এখন সর্বত্রই আদরলাভ করিয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন। মোগলচিত্রকলা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকরের আদর্শ হইতে পারে কি না ইহাই

\* Havell, *The Ideals of Indian Art*, London, 1911, pp. 162—163.





বিষ্ণু ।



—  
শ্রী



আলোচ্য। চিত্রকলা আমাদের কি উপকার সাধন করিতে পারে; হয়শীর্ষের ভাষায় চিত্র মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে (“অতঃ সান্নিধ্যমায়তি চিত্রজাসু জনার্দনঃ”)—মানুষের হৃদয়ে, নামে ভক্তি জীবে দয়া সঞ্চারিত করিতে পারে—অসম্পূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার দিকে চালিত করিতে পারে। কিন্তু মোগলচিত্রকলা বিলাসীর ভোগের বস্তু, ত্যাগীর বা যোগীর কেহ নয়; চিত্তহারী হইলেও উচ্চভাবোদ্দীপক নয়; ইহার ভিতর দিয়া উদ্দাম কল্পনা এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই।\*

তারপর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু চিত্রকলা। ডাক্তার কুমারস্বামী ইহার নাম রাখিয়াছেন “রাজপুত চিত্রকলা,” এবং ভাবাত্যতায় মোগল চিত্রকলা অপেক্ষা ইহাকে উচ্চতর স্থান দান করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতনের সহিত তুলনায় রাজপুত চিত্রকলার স্থান কোথায়? এ স্থলে হেভেলের মত উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা—

“From the sixteenth century the creative impulse in Hindu art began to diminish, though its technical traditions have maintained their vitality down to modern times.” †

“ষোড়শ শতাব্দী হইতে হিন্দু শিল্পের সৃষ্টিক্রমতা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যদিও হিন্দুশিল্পের বহিরঙ্গ-রচনা-রীতি-বিষয়ক সংস্কার অদ্যপি সজীব রহিয়াছে।”

\* “The dominant themes in the art of the Period (Mogul Period) were therefore not religions, but the romance of love and of war, the legends of Musalman and Rajput chivalry, the pageantry of state ceremonial and portraiture.”—*The Ideals of Indian Art*, p. 141

“On the whole, study of a multitude of examples of the outturn of Indo-Persian or Mughul school leaves the impression on my mind that its place in the art history of the world is that of a minor, not a major art. The best examples are charming, pretty, graceful, and so forth, but lack greatness. They are all too small to possess the dignity and breadth of large pictures, while they rarely display much imaginative power, and never, hardly ever, any serious religious emotion.” V. A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon*, p. 497.

† *The Ideals of Indian Art*, p. 140.

উপসংহারে বাঙ্গালার নব্য চিত্রকলার কথা। কিন্তু আশ্বিনের এবং কার্তিকের “প্রবাসী” ও “ভারতী” পত্র প্রকাশিত বাদামুবাদের পরে সকলে আমাকে নব্য চিত্রকলার নিরপেক্ষ সমালোচনার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ। আমিও এ প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। চিত্রকলা অশুভবের সামগ্রী। সুতরাং এ বিষয়ে আমি যাহা অশুভব করিয়াছি তাহা বলিলে ক্ষতি নাই। কলিকাতার ওরিয়েন্টেল আর্ট সোসাইটির একজন নব্যচিত্রকলাসুরাগী সদাশয় সাধক সদয়কে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বলুন ত, ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার এবং ভারতীয় চিত্রকলার মহিমা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নব্য চিত্রকলা বুঝিতে পারি না কেন?” যাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বচনবাগাশ নহেন, সুতরাং কথা কাহিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন না, কিন্তু ব্যথিত হইলেন। আমিও স্তম্ভনের প্রাণে ব্যথা দিয়াছি বলিয়া কিছু সমুদ্র হইলাম। তারপর “প্রাণপ্রতিষ্ঠা” (ভারতী, আশ্বিন, ১৮৮-১৯১ পৃঃ) পাঠ করিয়া নব্যচিত্রকলার প্রাণের কথা জানিতে পারিলাম। সে কথা, ‘বিষ্ণুর চার হাতের পরিচয় ততটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা বিষ্ণুমূর্তি-রচয়িতার দুই হাতের বরাভয়।’ এ যুগে বিষ্ণুমূর্তি রচিয়াছে কে যাহার বরাভয় মাগিতে হইবে? আমরা তাঁহার সন্ধান পাই নাই, হেভেলও তাঁহার সন্ধান পান নাই। তাই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের উপসংহারে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া লিখিয়াছেন— †

“For behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deep-rooted, in the ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and art-guilds of Europe; only waiting for the spiritual and intellectual quickening which will renew its old creative instinct. The new impulse will come, as Emerson has said, not at the call of a legislature: it will come, as always, unannounced, and spring up between the feet of brave and earnest men.

অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে শিল্পের সজীব বীজ

† *Ibid*, pp. 143-144.

নিহিত রহিয়াছে। সেই বীজ প্রাচীন সৃষ্টিক্রমতা পুনরায় লাভ করিবে—এখনও করে নাই—পুনরায় লাভ করিবে, কখন-না-কখন দেশের লোকের আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ জাগরিত হইবে। বাঙ্গলার এই জাগরণের উপায় কি? বাঙ্গালী যখন আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, সকল প্রকার বলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল—বাঙ্গলার প্রজা যখন অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজা নির্বাচন করিত, বাঙ্গলার রাজা যখন “ভোজ—মংস—কুরু—যহু—যবন—অবস্তী—গান্ধার—প্রভৃতি জন-পদের প্রণতিপরায়ণ নৃপতিপুঞ্জের গগনভেদী সাধু-বাদের মধ্যে কান্যকুঞ্জের রাজপাট হইতে এক রাজা তুলিয়া দিয়া আর এক রাজা বসাইত, বাঙ্গলার শ্রমণ যখন হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া মধ্য এশিয়ার অধিত্যকায় “ওঁ মণিপদ্মে হু” মন্ত্রের বীজ ছড়াইত, এবং যে কবিতাকুঞ্জের শেষ প্রতিধ্বনি জয়দেবের “গীতগোবিন্দ”, বাঙ্গলার সেই কবিতাকুঞ্জের পিকগণ যখন মধুর গম্ভীর স্বরে গান করিত—তখন বাঙ্গলার নিয়তাহার, সংযতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবতাদ্যানতৎপর শিল্পীগণ যে স্বর্গীয় সুসমায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সাত শত বৎসরের পলি ঝাড়িয়া তাহার উদ্ধার সাধন, মন্দিরে মন্দিরে তাহার প্রতিষ্ঠা, এবং তন্ত্রমন্ত্র যোগে তাহার উপাসনা এই জাগরণের উপায়। কিন্তু হায়! “তাহার কথা হেথা কেহ ত বলে না, করে মিছে শুধু কোলাহল।” \*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ্র ।

\* রমাপ্রসাদ বাবু অর্জুনের কয়েকখানি ছবি ‘স্বাভাবিক’ বলিয়া তাহার উল্লেখ ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার অধিকাংশ ছবির প্রতিলিপি পুস্তকে ও ফোটোগ্রাফে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সেগুলিকে ত কোন ক্রমেই ‘স্বাভাবিক’ বলা যায় না। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি সেগুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে শতশত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার অধিকাংশই ‘স্বাভাবিক’। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি যোগ্য সমালোচকগণ সেগুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন। যাহারা ললিতকলা বুঝিতে চান, তাঁহাদের এরূপ প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। হ্যাভেল প্রভৃতির প্রশংসা যদি এক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ অন্ততঃ বিবেচ্য হওয়া উচিত। এহলে ইহাও বলা উচিত যে হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা, প্রভৃতি, আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকরণের চিত্রের বিশেষ অনুরাগী।—সম্পাদক।

সম্পাদকের মন্তব্য। আমি যদি রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধটি বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে, তাঁহার মতে “স্বাভাবিকতা” (realism) মূর্ত্তির একটি উৎকর্ষলক্ষণ এবং তাঁহার উদাহৃত মূর্ত্তি দুটিও স্বাভাবিক। ঐ মূর্ত্তি দুটি (যাহাদের প্রতিলিপি প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হইল) যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে অবনীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার ছাত্রদের আঁকা এরূপ অনেক ছবির নাম করিতে পারি, যেগুলি এরূপ স্বাভাবিক।

আমি আমাদের দেশের আমার মত শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে দেশী ও বিদেশী ছবি কব খাটিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। দেশীয় আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন রীতির ছবি ছাপিয়া অর্থ—“নষ্ট” করিয়াছি এবং বিক্রপভাজন হইয়াছি সমুদয় ভারতবর্ষীয় সম্পাদকের চেয়ে বেশী। তাহাতে আমার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে এরূপ মনে হয় না। তবে, আমার ধারণা এই হইয়াছে যে অবনীন্দ্র বাবু ও তাঁহার ছাত্রেরা চিত্রকলার প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অনেকে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদের দু একটা মুদ্রাদোষে যেমন তাঁহার গুণ ঢাকা পড়ে না, তেমনি নবীন শিল্পীদের কোন কোন ছবিতে mannerismএর আতিশয্য থাকিলেও তাহা ধর্তব্য নয়; এবং এই mannerism সব ছবিতেই আছে এরূপ মনে করা ভুল। হ্যাভেল সাহেবের মত যদি অন্য বিষয়ে গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে, নবীন শিল্পীদের তিনি যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা অবজ্ঞায় না হইতে পারে।

আমি এক সময়ে রবিবন্দ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলাম। আমার লেখা তাঁহার সচিত্র ইংরাজি জীবনচরিত এখনও বাঙ্গারে বিক্রী হয়। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ৫১৬ বৎসর পূর্বে ছবি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত উত্তেজিত ভাবে চিঠি লিখিয়া রবিবন্দ্যর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তর্ক করিয়াছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে সেই মনস্বিনী বত্রিশ পৃষ্ঠা এক চিঠি লিখিয়া, একটু বিবেচনার পর, তাহা আমাকে পাঠান নাই; তাঁহার এই চিঠি বোধ হয় এখনও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট আছে। পরে স্বর্গীয়া লেখিকারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এই ভাবিয়া আমাকে ইহা পাঠান নাই যে আমি ছবি দেখিতে দেখিতে উহার মর্ম্মজ হইব, তর্ক দ্বারা আমার চোখ খুলিবে না। মর্ম্মজ হইয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু এখন, তাঁহার যেরূপ ছবি ভাল লাগিত, স্মারিণ্ড তরুণ ছবির অনুরাগী হইয়াছি।

আমার আর একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে যেমন ছন্দঃপতন না ঘটাইয়া পদ্য লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, বা ছন্দে ভুল থাকিলেই কবিতার উৎকর্ষ লুপ্ত হয় না; তরুণ প্রকৃত বস্তুর বা ইতর প্রাণীর বা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রূপ, আকার, রং, ইত্যাদি ঠিক রাখিয়া ছবি আঁকিতে পারিলেই ললিতকলাকুশল (আর্টিষ্ট) হওয়া যায় না, বা ঐসব বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম হইলেই চিত্রকলা হিসাবে ছবিধানা অপকৃষ্ট হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ছন্দঃপতনও উৎকৃষ্ট কবির লক্ষণ নয়, “স্বাভাবিকতা”ও উৎকৃষ্ট আর্টিষ্টের লক্ষণ নয়।

এ বিষয়ে কাহারও সহিত তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই। আমার যাহা অভিজ্ঞতা ও মত, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ বা বস্তুতন্ত্রতা যে আর্ট নহে, তাহা বুঝিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে।—সম্পাদক।

## দ্বিপদী

১

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা  
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা ?

২

ভালো যে করিতে চাহে ফেরে ঘারে এসে ।  
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে ।

৩

প্রেমেরে যে করিয়াছে কর্তব্যের অঙ্গ  
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ ।

৪

ফুল দেখিবারে যোগ্য চক্ষু যার রহে  
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্ধে নহে নহে ।

৫

চাঁও যদি সত্যরূপে দেখিবারে মন্দ,  
ভালোর আলোতে দেখ, হোয়োনাকো অন্ধ ।

৬

ধূলায় মারিলে লাখি ঢোকে ঢোকে মুখে ।  
জল ঢালো বালাই নিমেষে যাবে চুকে ।

৭

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে  
তারে যদি দয়া বল শোনায় না মিঠে ।

৮

হয় কাজ আছে তব, নয় কাজ নাই ।  
কিন্তু “কাজ করা যাক্” বলিও না ভাই ।

৯

কাজ সে ত মানুষের এই কথা ঠিক ।  
কাজের মানুষ কিন্তু দিক্ তারে দিক্ ।

১০

অবকাশ কর্ণে খেলে আপনারি সঙ্গে,  
সিঙ্গুর স্তরুতা খেলে সিঙ্গুর তরঙ্গে ।

১১

প্রাণেরে যুত্ব্যর ছাপ মূল্য করে দান,  
প্রাণ দিয়ে লড়ি তাই যাহা মূল্যবান ।

১২

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,  
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটা-গাছ বোঁচা ।

১৩

সব চেয়ে ভক্তি যার অস্ত্র-দেবতারে  
অস্ত্র যত জয়ী হয় আপনি সে হারে ।

১৪

দর্পণে যাহারে দেখি সে ত শুধু ছায়া,  
তারে লয়ে গর্বি করি অপূর্ব এ মায়া ।

১৫

আপনি আপনা চেয়ে বড় যদি হবে,  
নিজেরে নিজের কাছে নত কর তবে ।

১৬

একা এক শূন্যমাত্র, নাহি অবলম্ব,  
হুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ ।

১৭

প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে,  
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদ বৃদ্ধি হবে ।

১৮

যুত্ব্যর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা ।  
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা ।

১৯

ঐশ্ব্যর একেরে দেখে একাকার করে’ ।  
আলোক একেরে দেখে নানাদিকে ধরে’ ।

২০

হে প্রিয়, হৃথের বেশে আস যবে মনে  
তোমারে আনন্দ বলে চিনি সেই ক্ষণে ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

## কষ্টিপাথর

( ভারতী-কার্তিক )

উদ্ভিদাদির বৈদিক নাম—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

অতি প্রাচীন আর্ধ্যনিবাসে কি কি বৃক্ষলতাদি ছিল, সে-সকল কথা জানিতে পারিলে প্রাচীন আর্ধ্যনিবাসের ভৌগোলিক স্থিতি-বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয় ।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদ জাতি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত, যথা—(১) “বীজ্য” (plant) এবং (২) “বনস্পতি” (tree) ।

বীজবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন বিশেষ জ্বরের জন্য আদৃত হইত, তাহাদের নাম ছিল “ঔষধি”। বৃক্ষ বলিলে বীজ, বনস্পতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীকেই বুঝাইত।

বৃক্ষ-শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম :—শিকড়ের নাম ছিল “মূল” ; stem অর্থে “কাণ্ড” এবং “শাখা” ; “পর্ণ”, “পুষ্প” এবং “ফল” শব্দগুলিও সে যুগে উহাদের আধুনিক অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এবং একালে যাহাকে “পল্লব” বলে, তাহার নাম পাওয়া যায় “বল্গ”, এবং বৃক্ষের “কঙ্ক” corona অর্থজ্ঞাপক। ফলের জন্য নাম “বৃক্ষ্য” হইতে বেশ বুলিতে পারা যায় যে, বড় গাছ হউক, লতা হউক, ঔষধি হউক, সকলগুলিই বৃক্ষ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। বট প্রভৃতি বৃক্ষের বায়বীয় মূলের স্বতন্ত্র নাম ছিল “বয়া”। এই “বয়া” শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত নাই; অথচ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত “বয়া” বঙ্গদেশের কোন কোন প্রদেশে এখনও বট গাছের “বুরি” অর্থে ব্যবহৃত আছে। বয়া শব্দটি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে “ব” নামেও প্রচলিত আছে।

যে শ্রেণীর উদ্ভিদ ঝোপ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে bush বলে, তাহাদের বৈদিক নাম ছিল “স্তম্বিনীঃ”। বাঁশ, তাল, খেজুর, কচু প্রভৃতি যে-সকল গাছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি করিয়া পাতা বাহির হইবার পর সেই পাতাটিরই ঝাপ বা আবরণের মধ্য হইতে আর একটি পাতা বাহির হয়, কিন্তু একসঙ্গে দুইটি পাতা নির্গত হয় না, তাহাদিগের নাম ছিল “একশৃঙ্গাঃ”।

যদি একটি কাণ্ড বিভক্ত হইয়া বহু শাখায় পরিণত হইত, এবং শাখাগুলি আবার বিভক্ত হইয়া অনেক প্রশাখায় সৃষ্টি করিত তবে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষগুলির নাম হইত “অংশুমতীঃ”। অণু দিকে আবার যে গাছগুলির কাণ্ড শাখায় পরিণত না হইয়া উর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত সোজা উঠিয়া যাইত, তাহাদিগকে “কাণ্ডিনীঃ” বলিত। উদ্ভিদবিজ্ঞা-বিদেরা দেখিতে পাইতেছেন যে Deliquescent এবং Excurrent শব্দদ্বয়ের অনুবাদের জন্য দুইটি চমৎকার শব্দ পাওয়া গেল। আশা করি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উদ্ভিদবিজ্ঞা-বিষয়ক গ্রন্থে এই শব্দ দুইটি নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। “কাণ্ডিনী”র মধ্যে যে বৃক্ষগুলিতে নিম্ন হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনেক শাখা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল “বিশাখাঃ”।

গাছে ফুল ফুটিলে গাছগুলিকে “পুষ্পবতীঃ” বলিত বটে, কিন্তু যে-সকল গাছে ফুল ফুটে অর্থাৎ যাহারা flowering, তাহাদের নাম ছিল “প্রসুবরীঃ”। এখন এ অর্থে “সপুষ্পক” শব্দ চলিয়া গিয়াছে।

ডাঁটা বাহির হইয়া যখন ডাঁটার উপর ফুল ফুটে, তখন একটি অসংবদ্ধ প্রণালীতে ফুল ফুটিলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে panicle বলে। এই panicleএর খাঁটি বৈদিক নাম “তুল”।

লতা অর্থে সাধারণ শব্দ ছিল “প্রতবতীঃ” ; এবং যে লতা গাছ বাহিয়া না উঠিলে বাড়িতে পারে না, তাহার নাম ছিল ‘ব্রততিঃ’ এবং যাহারা সাধারণতঃ মাটিতেই বিস্তার লাভ করে, তাহাদের নাম ছিল “অলসালী”। বৈজ্ঞানিক প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য climber অর্থে ‘ব্রততি’ এবং creeper অর্থে “অলসালী” ব্যবহৃত হইলে মন্দ হয় না। শেবোক্ত শব্দটি কঠোর মনে হইলে অর্থ রক্ষা করিয়া “অলসালী” শব্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি ?

কাঠ বুঝাইবার জন্য “কুমুক”, “কুমুক” এবং “দারু” শব্দ

পাওয়া যায়। “পর্ণ” ভিন্ন পাতার অন্য কোন ‘নাম পাওয়া যায় না। বাকুলার নাম ছিল “বন্ধ”,—“বন্ধল” নহে। প্রাচীন প্রাকৃতে বর্ণব্যত্যায়ে “বন্ধ” “বন্ধ” উচ্চারিত হইত, এবং সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুইটি শব্দের খিঁচুড়িতে “বন্ধল” শব্দ হইয়াছিল। গাছের আঠা, রস প্রভৃতি সকলেরই নাম ছিল “নির্ঘাস”।

এখন বর্ণমালাক্রমে বীজ এবং বনস্পতিদিগের নাম দিতেছি। (১) অক্ষশৃঙ্গী (সম্ভবতঃ বাবলা), (২) অপামার্গ (আপাঙ্গ, ঔষধে ব্যবহৃত), (৩) অমলা (আমলা, আমলকী), (৪) অমূলী (গাছে বুলিত, শিকড় হইত না এবং শরের মুখ বিষাক্ত করিবার জন্য উহার রস ব্যবহৃত হইত বলিয়া অথর্ব বেদে উল্লিখিত আছে, একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই অমূলীকে Mithonica Superba বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন), (৫) অন্নটু (Colosanthus Indica—ইহার কাঠে গাড়ির চাকার “বুরো” প্রস্তুত হইত), (৬) অরাটকী (সম্ভবতঃ অক্ষশৃঙ্গী হইতে অভিন্ন), (৭) অরুজাতী (এই ঔষধি লতা বা ব্রততি বড় বড় গাছে উঠিত, এবং উহা “হিরণ্যবর্ণ” ছিল, এবং উহার ডাঁটার ছল থাকিত অর্থাৎ “লোমশবর্ণগা” ছিল বলিয়া অথর্ব বেদে উল্লিখিত; ইহাও লিখিত আছে যে, উহার রস গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বেশি দুধ দিত, এবং ঐ লতা হইতে লাক্স সংগৃহীত হইত), (৮) অর্ক (আকন্দ), (৯) অলাপু বা অলাবু (লাউ), (১০) অবকা বা শীপাল (গজকর্কেরা নাকি ইহার শাক খাইতেন; ইহা জলে অম্লিত। পরবর্তী সময়ে ইহাকে শৈবল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ ইহাকে Blyx Octandra সংজ্ঞা দিয়াছেন), (১১), অশ্বগন্ধা (উহার অর্থ এই যে ঐ ঔষধি প্রস্তুতগাছ; পরবর্তী সময়ে ইহারই নাম হইয়াছে অশ্বগন্ধা), (১২) অশ্বথ, (১৩) অশ্ববার (এক শ্রেণীর নলবিশেষ), (১৪) আণ্ডীক (পল্ল), (১৫) আদার (আমাদের আদা) (১৬) আবয়ু (অল্প নাম সর্ষপ বা সরিষা), (১৭) আল (শস্যক্ষেত্রের আগাছা), (১৮) উদুম্বর (ডুমুর), (১৯) উর্বারু (শসা) (২০) উশনা (শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, সোমলতা না পাইলে উহা হইতে সোমরস বাহির করা হইত), (২১) এরণ্ড (খাঁটি বেদে উল্লেখ নাই; অনেক পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই নামটি পাওয়া যায়), (২২) ঔক্ষগন্ধি—ষাঁড়ের গায়ের গন্ধাবশিষ্ট অর্থ হইলেও কোন সুগন্ধি ঔষধি বিশেষ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না, (২৩) কিয়াম্বু (কি প্রকারের শাক, তাহা জানা যায় না; তবে যেখানে শব্দ-দাহ হইত, সেখানে জলের মধ্যে লাগাইবার নিয়ম ছিল; মৃতের সংস্কারের ইহাও একটি অঙ্গ ছিল যে, কিয়াম্বু এবং (২৪) পাকদূর্কা (শশানে লাগাইতে হইত; পাকদূর্কা এ কালের জোয়ার), (২৫) কুমুদ, (২৬) কুষ্ঠ (ইহার আর এক নাম বিশ্বভেষজ, অর্থাৎ ইহা প্রায় সফল রোগেরই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত; এই বীজ হিমালয়ের উপরে পাওয়া যাইত, লেখা আছে), (২৭) জজিড় (ইহাকে Terminatia Arjuneya বলিয়া কেহ কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন)। (২৮) কর্কজু (কেহ কেহ ইহাকে রক্তবর্ণ বদর বা কুল বলিতে চাহেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহা লাল কুমড়া; ওড়িয়াতে কুমড়াকে “কথারু” বলে, এবং হয়-ত বা পূর্বে ছাঁচি কুমড়াকে কর্কজু বা কধু বলিত বলিয়াই লাউ ঐ “কধু” নামে আখ্যাত হয়), (২৯) কাকশীর কি বৃক্ষ, জানা যায় না। তৃণ এবং নলবর্গে কুশ, কাণ প্রভৃতি ব্যতীত (৩০) “কুশর” নামে একটি বড় নল-তৃণ উল্লিখিত দেখিতে পাই। এখন আক্কে অনেক স্থানে নলের মত তৃণ বলিয়া “কুশর” বলা হয়। অথচ এই বৈদিক কুশর শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত নাই। (৩১) কিংগুক, (৩২) খদির এবং (৩৩) ধর্ম্মর সম্বন্ধে কিছু বলিবার

নাই, তবে “কর্কর”এর দীর্ঘ-উকারটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। (৩৪) তিল। কিন্তু (৩৫) তিসিক কি, তাহা জানি না। একজন পণ্ডিত উহাকে Symplocos Racimos বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে না। (৩৬) তৌনী এবং (৩৭) জায়মাণ কি, তাহা জানা যায় না। (৩৮) নারাজী বলিয়া যে বিষাক্ত ওষধির নাম জানা যায়, শরে উহার প্রয়োগ হইত বলিয়াই হয়ত “নারাজ” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩৯) পাটা—এক প্রকারের জলজ শৈবল বলিয়া মনে হয়। এখনও ঐ নামে শৈবল বা শৈবাল তিনি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪০) পুতীক আমাদের পুঁই। (৪১) ক্রোধোষ আমাদের বটগাছ; (৪২) গলাপ। বেদে যে (৪৩) পিপ্পল শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ কুম্ভ ফল—পিপুল নহে। (৪৪) পীতুদারু অথবা পুতুঙ্গ হিমালয়-জাত সরল বৃক্ষ বা দেবদারু। (৪৫) পক্ষ হইল পাণ্ডু, (৪৬ ও ৪৭) বদর এবং বিষ্ণু। (৪৮) প্রসু কোন বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয় না। সাধারণের টীকার অর্থ ধরিলে চারা গাছ বা তেউড় প্রভৃতি অর্থ হয়। ইংরাজি shoot কথাটিকে ওড়িয়ায় “গজা” বলিতে পারা যায়; বাস্তবিক কি বলিব? (কোড় বা কোড়া?) (৪৯) বজ্র সম্ভবতঃ আমাদের এ কালের বট; (৫০) বিশ্ব ঠিক তেলাকুচ বা তিলককুচ বটে, এবং অথর্ক বেদের (৫১) ভঙ্গ ঠিক নেশা করিবার ভাঙ্গ। (৫২) মঞ্জিষ্ঠা; (৫৩) মদুথ (মধুথ নহে) কোন মদ্য উৎপাদক বৃক্ষের নাম ছিল। (৫৪) বিষাক্ত কি প্রকার বিষাক্ত গাছ, তাহা জানা যায় না। (৫৫) শন আমাদের শণ বা hemp; কিন্তু (৫৬) শকক কি, তাহা ধরিতে পারা গেল না। (৫৭) শালুক ঠিক পদ্মের গাছের অঙ্কুর বা তেউড়। (৫৮) শমী বৃক্ষের নাম বেদে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন পণ্ডিত-নির্দিষ্ট Mimosa Suma বলিয়া উহাকে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথর্ক বেদে উল্লিখিত আছে যে উহার পাতা চওড়া, এবং নির্ঘাস পান করিলে নেশা হয়। ধ্বংসরীয় নিষণ্ডিতে আছে যে, উহার রস মাথিলে শরীরের কেশ-বহুল স্থান সম্পূর্ণরূপে কেশশূন্য হয়। এই গাছের ডালেই অর্জুন তাঁহার গাণ্ডীব কুলাইয়াছিলেন। (৫৯) শালুজি (শালুলী নহে) বা শিশল ঠিক আমাদের “শিমুল”। প্রথম নামটিতে অতিরিক্ত আ-কার যোগ হইয়া সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় নামটি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের “শিমুল” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। (৬০) সোমলতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু উহা যে কি প্রকারের বীজ ছিল, তাহা এ পর্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই।

## রবীন্দ্রনাথের “নোবেল”- পুরস্কার প্রাপ্তি

কবি যখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

“জগৎকবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব  
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে ধর্ম”

তখন অনেকে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—“এ সব নিতান্ত বাড়াবাড়ি, মিথ্যা স্তুতি মাত্র।” তাঁহাদের সেই হাসি দেখিয়া, ও

কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে সুদূর ভবিষ্যতে জগৎসাহিত্যের কষ্টি-পাথরে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকষ-রেখা জলস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই বিজ্ঞেরা তাহা না দেখিতে পাইলেও, তাহাদের বংশ-ধরগণ তাহা দেখিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে যুরোপ ও আমেরিকা বিস্মিত ও আনন্দযুক্ত, তখন বুঝিলাম, একদিন যাহাকে সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই বর্তমান হইতে চলিল। যাহারা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়াছিলেন তাঁহারা তখন বলিলেন—“ও একটা ছজুগ মাত্র।” কিন্তু আজ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা শুনিয়া অতিবড় সংশয়ী জনও অবনতমস্তকে স্বীকার করিবে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

সকলেই হয়তো উৎসুক হইয়া ভাবিতেছেন সংবাদটি কি? সংবাদটি এই :—

(Reuter's Service)

London, Nov. 13, 1913.

The Nobel Prize for literature has been conferred on the Indian Poet Rabindranath Tagore.

অর্থাৎ—

“সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদত্ত হইয়াছে।”

কিন্তু “নোবেল পুরস্কার” জিনিষটা কি? “নোবেল পুরস্কার” বা “Nobel Prize” সমস্ত যুরোপ ও আমেরিকার মনস্বীগণের চরম সাধনার ও কামনার ধন,—সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। সেখানে নোবেল-পুরস্কারলাভ অমরতালান্তের নামান্তর মাত্র।

সুইডেনের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাইনামাইটের আবিষ্কারক আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল মৃত্যুকালে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ) কয়েকজন ট্রুপীর হস্তে তাঁহার সাক্ষত অর্থের অধিকাংশ ২,৬২,৫০,০০০ টুই কোটি বাষটি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, গুস্ত করিয়া এই মর্মে এক উইল করেন যে প্রতি বৎসর মানবচেষ্টার নানাবিভাগে বিশ্বমানবের কল্যাণার্থ যাহাদের কার্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাঁহাদের মধ্যে এই অর্থের আয় সমানভাবে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। পুরস্কারটি পাঁচভাগে বিভক্ত। পাঁচটি বিভিন্ন কর্ম-বিভাগের কর্মশ্রেষ্ঠকে পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা—(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (‘ফিজিক্স’) (২) রসায়ন শাস্ত্র (৩) চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ববিদ্যা (৪) সাহিত্য (৫) জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহনিবারণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা। কখনো কখনো দুইজন ব্যক্তি সমভাবে পুরস্কারযোগ্য

হইলে এই পুরস্কার দুই জনকেও দেওয়া হয়। এক একটা পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১২০০০০ একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা।

স্বীপুরুষ জাতিবর্ন নির্বিশেষে সকলেই পুরস্কার পাইতে পারেন। তবে সাহিত্যের পুরস্কার সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে এই যে, যে-পুস্তক বিচার করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় লিখিত হউক আপত্তি নাই—কিন্তু সেটির অন্ততঃ একটি যুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ থাকা প্রয়োজন। সুইডেনের “একাডেমী অফ লিটারেচার” বা সাহিত্য পরিষদের উপর সাহিত্যের জ্ঞান নির্দিষ্ট পুরস্কার প্রদানের বিচারভার গুস্ত আছে। পুরস্কারপ্রদাতা আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই পুরস্কার-প্রদান আরম্ভ হয়। সাহিত্যবিভাগে এ পর্যন্ত যে-সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যরথী পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।

১৯০১...সালী প্রুধোম (Sully Prudhomme)

ইনি ফরাসী কবি। ইঁহার সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “Stances et Poèmes” সমালোচক-শ্রেষ্ঠ সঁ্যাৎ-ব্যভ (Sainte-Beuve) কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁহার কাব্যখানি ফরাসী সাহিত্যজগতের একটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। জন্ম—১৮৩৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০২...থিওডোর মমসেন (Theodore Mommsen)

ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই এই প্রসিদ্ধ জার্মান ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ অবগত আছেন; ইঁহার রচিত রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিলেও অত্যাুক্ত হয় না। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের একত্র সমাবেশ কেবল ইঁহার ইতিহাসেই দেখা যায়। জন্ম—১৮১৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০৩...ব্যোর্ণষ্টার্ন ব্যোর্ণসন্ (Bjornsterne Bjornson)

অনেকের মতে ইনি নরওয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ছোটগল্প লিখনেও ইনি একজন ওস্তাদ ছিলেন। অভিনয়-কার্যেও ইঁহার পারদর্শিতা বড় অল্প ছিল না। জীবনের অধিকাংশভাগ ইনি নরওয়ের জাতীয় রক্ষালার অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মিত্যবলে ইনি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার রচিত নরওয়ের প্রাণোন্মাদকর জাতীয় সংগীত ফরাসী জাতীয় সংগীত “লা মার্শেইয়ের” মত এক অপূর্ব বস্তু। কবি সত্যোজ্ঞনাথ দত্ত তাঁহার “তীর্থসলিলে” এই সংগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুবাদ করিয়াছেন। জন্ম—১৮৩২, মৃত্যু—১৯১০।

১৯০৪...ফ্রেডেরিক মিস্ট্রাল (Frederic Mistral) ও

জোসে একেগ্যারে (Jose Echegaray)।

১। ফ্রেডেরিক মিস্ট্রালের জন্মভূমি ফ্রান্সের অন্তর্গত “প্রভেন্স” (Provence) প্রদেশ। ইনি সেই “প্রভেন্সের” প্রাদেশিক ভাষাকে (Provençal) ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জ্ঞান প্রভেন্সাল ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে অতি শীঘ্রই মিস্ট্রাল খ্যাতিনামা হইয়া পড়েন। এতদ্ভিন্ন তিনি “প্রভেন্সের” বহু ছড়া, ও কথা কাহিনী সংগ্রহপূর্ব্বক অনেকগুলি অতি মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ‘প্রভেন্সাল’ সাহিত্যকে অতি উচ্চস্থান দান করেন। জন্ম—১৮৩০।

২। জোসে একেগ্যারে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্পেনীয় নাট্যকার। জন্ম—১৮৩২।

১৯০৫...হেনরিক সিন্কাভিচ (Henryk Sienkiewicz) ইনি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস “কুও ভাডিসের” রচয়িতা। জাতিতে পোল। জন্ম ১৮৪৬।

১৯০৬...গিয়োসুয়ে কার্দুচি (Giosue Carducci) ইটালীর কবি ও পাণ্ডিত। ইঁহার ‘সয়তান’ সম্বন্ধে রচিত কবিতা ইটালীর কাব্য-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। জন্ম—১৮৩৬, মৃত্যু—১৯০৭।

১৯০৭...রাডিয়র্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) জাতিতে ইংরাজ, জন্মস্থান বোম্বাই। আধুনিক ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় কবি, ব্রিটিশ ‘ইম্পীরিয়ালিজম’ বা সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। জন্ম—১৮৬৫।

১৯০৮...রাডল্ফ্ অয়কেন (Rudolph Eucken) জাতিতে জার্মান; আধুনিক যুরোপের চিন্তারাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও পরিচালক। সরস ভাবে ও ভাষায় ধর্ম ও দর্শনের উচ্চতরপ্রচারে তাঁহার সমকূল দ্বিতীয় ব্যক্তি যুরোপে আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। এই মনীষী জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলি যুরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া চতুর্দিকে পঠিত হইতেছে।

১৯০৯...সেলমা লেজারলফ (Selma Lagerlof) ইনি জাতিতে সুইডেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। অসাধারণ প্রতিভাশালিনী। জন্ম—১৮৫৮।

১৯১০...পল্ হেয়সি (Paul Heyse) জার্মান ঔপন্যাসিক ও জার্মানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক।

১৯১১...মরিস মেটারলিন্ক (Maurice Maeterlinck) জাতিতে বেলজিয়ান। নাট্যকার ও দার্শনিক। আধুনিক যুরোপীয় সাহিত্যজগতে মেটারলিন্কের স্থান সকলের উপরে। তাঁহার নাটকগুলি মানবের অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্রনিগূঢ় অবস্থা ও অভিজ্ঞতার



বিবৃতি। মেটারলিকের একখানি symbolical বা বিগ্রহরূপী নাটক কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রবাসীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার “রক্তমল্লী” গ্রন্থে আছে। দার্শনিক প্রবন্ধাদি রচনাতেও মেটারলিক সিদ্ধহস্ত। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ গদ্যগ্রন্থগুলি চিন্তাশীলের খোরাক, ভাবুকের উপভোগ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১২...জেরহাট হপ্টম্যান (Gerhart Hauptman) আধুনিক জার্মানীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। যুরোপীয় সমাজের নানা জটিল সমস্যা ইনি নাট্যবস্তুর পরিণত করিয়াছেন। হপ্টম্যান বিখ্যাত সুইডেনীয় নাট্যকার ইবসেনের শিষ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১৩...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম—১৮৬১।

সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে যে-সকল মনোবী এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে রনজেন, অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরী, মার্কনি, স্যার উইলিয়ম র্যামজে, মেচনিকফ, রুজভেন্ট, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে যুরোপ যে কতদূর চমৎকৃত হইয়াছে, তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিই সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। পুরস্কারের সঙ্গে অর্থ আছে বটে, কিন্তু যে সম্মান ইহার সহিত জড়িত তাহার নিকট এক লক্ষ কেন এক কোটি মুদ্রাও অকিঞ্চিৎকর। আবার রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য সাহিত্যিকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রথমতঃ তিনি প্রাচ্যদেশবাসী। যদিও পঁজিপুঁথিতে প্রাচ্যদেশবাসীকে নোবেল পুরস্কার প্রদানে কোন নিষেধ কিম্বা বাধা নাই, তথাপি সে দিকে যে যুরোপের একটা কত বড় সংস্কারগত বাধা আছে তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু কবির প্রতিভার আলোকে সকল সংস্কার, সকল বাধা স্বর্ঘ্যোদয়ে কুজ্জটিকার মত দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ যুরোপের কেন, সমস্ত বিশ্বের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঐহারা নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বহুদিন ধরিয়া যুরোপীয় জগতে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সারাজীবন সাহিত্য-সেবার তনু মনু ধনু অর্পণ করিয়া জীবনের শেষভাগে এই গৌরবমুকুট লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক এক বৎসর পূর্বে যুরোপীয় সাহিত্য-জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনো কোন যুরোপীয় ভাষার এক ছত্রও লেখেন নাই। অথচ বিদেশী-

ভাষায় তাঁহার প্রথম রচনা যুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিল। যখন এ কথা ভাবি তখনই আনন্দে, গর্বে, বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এক শত বৎসরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান লাভ করিল। যিনি বাংলা ভাষাকে এই গৌরবমুকুট পরাইয়াছেন আজ তাঁহার গৌরবে সমস্ত বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব, সমস্ত প্রাচ্য ভূমির গৌরব। তিনি আজ সমস্ত এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ কে না বলিবে

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা ?

শ্রী অমলচন্দ্র হোম।

## চিরন্তনী

( Jean Lahor )

সকলি ক্ষণিক মোহ ; তবু আহা ! ভালবেস তবু ;  
ভালবেস—ক'র বাস কামনার স্বপন-ভুবনে ;  
স্পন্দিত হৃদয়খানি সঁপে দিয়ো—সঁপে দিয়ো কভু  
আকাঙ্ক্ষিত বেদনায়,—যে বেদনা শ্রেয় মান' মনে।

সব মিছে, সব মায়া ; প্রেমে তবু রাখিয়ো বিশ্বাস,—  
ভালবেস নিরন্তর,—বৈধ বাসা বাসনার দেশে ;  
প্রাণে যেন নিত্য জাগে অনুরাগ-অরুণ নিশ্বাস,  
জীবনের ক'টা দিন—ক'কে দাও শুধু ভালবেসে।

গানের প্রাণের রসে মাতালের মত উঠ মাতি'  
মনেরে উন্নত রাখি' উচ্চশিরে রহ দৃপ্ত ছবি ;  
চিন্ত হোক রাজোচিত রুচি চীনাংগুকে দিব্যভাতি  
দেবতা না হও ওগো হ'তে পার হুতাজয়ী কবি।

মিথ্যার জগতে, হায়, সত্য শুধু ভালবাসাবাসি,  
সত্য খেয়ালের খেলা ; ক্ষণপ্রতা-ক্ষণিক জীবন,—  
মুহূর্ত্তে জাগিয়া হায়, শূন্যে ছড়াইয়া রশ্মিরাশি  
মুহূর্ত্তেকে হয় হারা,—শূন্যতলে চির অদর্শন।

মত্ত বাসনার রাঙা রক্তভাতি মশালের আলো  
পুলকি' জ্বলিছে একা মর্ত্য মানবের আঁধি-আগে,  
সন্মুখে অনন্ত রাত্রি চারিদিক অন্ধকারে কালো,—  
মরণের অন্ধকার—প্রাণশিখা নিবাইতে মাগে।

জলে নাও প্রাণপণে,—জলে নাও আলো দিবে যদি,  
দাহ বিনা দীপ্তি নাই,—জলে নাও প্রাণপণ-বলে ;  
নিবিলে জীবন-বাতি ভাল মন্দ ভেব নিরবধি  
ধূলিতলে। অশুক কামনা-দীপ যতক্ষণ জলে

• গুপ্তধারা যুহানদী উচ্ছ্বসিছে গহ্বরে গহ্বরে  
কে জানে গো অতর্কিতে কে কখন ডুবিবে অতলে,  
নিঃশেষে পুড়িয়া নে রে নির্ঝাণের আগে প্রাণ ভরে'  
ভালবেসে কেঁদে হেসে কামনার মায়াতরুতলে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

## বিবিধ-প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে যদি কেহ নূতন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে তাহা নূতন কিনা এবং নূতন হইলে আবিষ্কারটির মূল্য কি, তাহা জানিবার জন্ত আমরা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হই। কারণ, আমাদের দেশে এরূপ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম যাহাদের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এখন এরূপ আশা হইতেছে যে আমাদের এই ছরবস্থা চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না।

সুকুমারশিল্পক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষতা করিয়া করিয়া এখন স্বাধীনভাবে লালিত কলার রস গ্রহণে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা করিবার প্রয়োজন বাঙ্গালীর বহুকাল হইতেই ছিল না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্বে হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝনার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মত বুঝিয়া সুঝিয়া জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করিবার, লোকের একান্ত অভাব বঙ্গদেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাই আজ তাঁহার নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দ্বারা জগতের সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হওয়ায়, আমরা অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি। “আমরা তাঁহাকে মোটেই চিনতে পারি নাই; বিদেশী তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, তবে চিনিলাম,” এরূপ চিন্তাপ্রসূত লজ্জায় ও ক্ষোভে আমরাইগকে মাথা হেঁট করিতে হইতেছে না। বাস্তবিক স্বদেশীয় মহৎব্যক্তির মহত্ব অনুভব করিতে না পারার মত হীনতা সেই দেশবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? সেই হীনতা হইতে ভগবান্ আমরাইগকে রক্ষা করিয়াছেন।

এ কথা কিন্তু বলিতে পারা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বঙ্গের “মাগুগণ্য” ব্যক্তিরও বুঝিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রশংসিত হইবার পর, তথায় ভারতের সহকারী সচিব

মন্টেগু সাহেব • তাঁহার গুণগান করার পর, বড়লাট সাহেব রবীন্দ্রনাথকে “Poet Laureate of Asia” বা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি বলার পর, কিছু দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature) উপাধি দিবেন। কিন্তু তিনি এবার বিলাত যাইবার পূর্বে তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্ত তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বালকদিগের উপযোগী করিয়া সম্পাদন করিয়া “পাঠসঙ্ঘ” নামে একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার জন্ত পাঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কিছা উহার লিখন-রীতির (style) মধ্যে কোন প্রকারের গুণ দেখিতে না পাইয়া উহা অগ্রাহ করেন। সেই নামঞ্জুর পুস্তকের লেখককে আজ বিশ্ববিদ্যালয় “সম্মানিত” করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কি উপাধি দিবেন বা না দিবেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু আমরাইগকে ইহা লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাহিত্যরসজ্ঞতা রাজপুরুষদের মোসাহেবীর সহিত হয় ত অভিন্ন, এরূপ সন্দেহ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে সত্য সত্যই বিশ্বপণ্ডিতদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদের প্রভাবেও যে বাংলা সাহিত্যের সম্মান হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ।

নোবেল জাতিতে সুইড্ ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সুইড্দিগের দ্বারা প্রদত্ত হয়। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করেন সুইডেনের বিজ্ঞানপরিষদ, চিকিৎসা বা শরীরতত্ত্ববিদ্যার বিচারক তদ্দেশের চিকিৎসক সমিতি, সাহিত্যের বিচার করেন সুইড্ সাহিত্যপরিষদ, এবং জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সম্ভাব বর্ধন এবং শান্তির স্থায়িত্ব বিধান কাহার দ্বারা অধিকতম পরিমাণে হইয়াছে, তাহা স্থির করেন পাঁচজন সুইডের এক পঞ্চায়েৎ। এই পাঁচ জন সুইডেনের ষ্টুর্থিং বা প্রতিনিধি সভা দ্বারা নির্বাচিত হন।

সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের জন্তই পুরস্কার দেওয়া হয় যাহা জীবনে ভাব ও সুকল্পিত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আসন দেয় (“the most distinguished of work an idealistic tendency in the field of literature,” “the most remarkable literary work dans le sens d'idealisme”)। অর্থাৎ কিনা ডাল-ভাত-পয়সা রূপী “বস্ততন্ত্র”তাটা না হইলেও চলে। কিন্তু গ্রন্থখানি

অলোকসামান্য হওয়া চাই, এবং সেরূপ গ্রন্থ লিখিতে সাধনারও প্রয়োজন হয়।

সুইডেন দেশজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত ব্যগ্র নহেন। সুইডেরা নিজেদের স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট; জ্ঞানার্জন, জ্ঞানোন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তার প্রকৃতি কার্যে তাঁহারা ব্যাপ্ত। কোন জাতির সঙ্গে তাঁহাদের রেষারেষি নাই। তাঁহাদের পুরস্কার দানের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব বা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি থাকে না। এই জন্ত এপর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জাতীয় লোকে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংরাজদের মধ্যে এপর্যন্ত সাহিত্যের জন্ত একজন মাত্র (কিপলিং) নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহারও জন্ম ভারতবর্ষে, বোম্বাইয়ে। পদার্থবিদ্যায় দুজন (Lord Rayleigh ও Prof. J. J. Thomson), রসায়নে একজন (Sir W. Ramsay), চিকিৎসায় একজন (Sir R. Ross), এবং শান্তিভাব বর্ধনে একজন (Sir W. R. Cremer) ইংরাজ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

• রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ভারতবর্ষ গৌরবাঙ্কিত হইল। মনুষ্যজাতির লাভ এই হইল যে সাহিত্যের মনোময় রাজ্যে কার্যতঃ জাতিবর্ণদেশনির্কীর্ণশেষে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল; মানবাত্মা স্বরূপে আশায় আকাজক্য যে সর্ব দেশে এক, তাহা আবার একবার নূতন করিয়া বুঝা গেল। বাঙ্গালী বৃত্তিতে পারিল, তাহার সাহিত্য প্রাদেশিক নয়, বিশ্ববাসীর আদরের জিনিষ তাহাতে আছে। এই বোধ যদি আমাদের সর্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আলস্য, পাশবতা, ভীকৃত্য এবং আশাহীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ করে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

কথায় বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এটাও জানা কথা যে অনেক সময় সূর্যের তাপ সহ হয়, কিন্তু সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির গরম সওয়া যায় না। তুমি যে জাতির বা যে রঙের লোক হও, লেখা পড়া জান বা না জান, বিলাত যাইতে পার, এবং যোগ্যতা থাকিলে যে কোন কাজ ইচ্ছা, করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে পালেমেন্টের সভ্য পর্যন্ত হইবার চেষ্টা করিতে পার, এবং যথেষ্ট যোগ্যতা থাকিলে ও অর্থব্যয় করিতে পারিলে সভ্য নির্বাচিতও হইতে পার। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলি ভারতবাসীকে চুকিতে দিতে চান না। অনেকে যাহারা চুকিয়াছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে বা নির্বংশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ ইংলণ্ডের সাহায্য ভিন্ন এই উপনিবেশগুলি আত্মরক্ষা পর্যন্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের অহঙ্কারটা ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী।

আমরা একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে কানাডায় ভারতবাসীর কিরূপ লাঞ্ছনা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি তদপেক্ষাও বেশী অত্যাচার হইতেছে। নেটাল তথাকার একটি প্রদেশ। সেখানকার ইঙ্কুন্ড্রে ও চিনির কারখানায়, এবং ধনি প্রভৃতিতে কাজ করিবার জন্ত বহু বৎসর অবধি ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ শত শত কুলি চালান হইত। সম্প্রতি আর নূতন চালান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আগেকার চালানের স্ত্রী ও পুরুষ কুলিদের চুক্তি ফুরাইয়া যাইবামাত্র তাহাদিগকে মাথা পিছু বার্ষিক ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। তা ছাড়া চুক্তিযুক্ত কুলিদের ছেলেমেয়েদের ১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবামাত্র তাহাদিগকেও ঐ ৪৫ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হয়। ছেলেমেয়ে স্ত্রী পুরুষ যে কেহ ট্যাক্স দিতে না পারে, তাহাকে জেলে যাইতে হয়। সেই ভয়ে অনেকে আবার চুক্তিবদ্ধ কুলি হইয়া দাসের মত হীন ও দুঃখময় জীবন যাপন করে। অনেকে জেলে যায়। তন্মধ্যে অসহায় বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত আছে। এরূপ সত্য ঘটনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ বার্ষিক ৪৫ টাকা অল্প কোন উপায়ে দিতে না পারিয়া অনেক স্ত্রীলোক ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে। ভারতবাসীর চান যে এই ট্যাক্স উঠিয়া যায়। শ্রীযুক্ত গোধলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন তখন তথাকার অল্পতম মন্ত্রী স্মিট্‌স্ উহা উঠাইয়া দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন যে এমন কথা বলেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নিয়ম হইয়াছে যে কোনও মানুষের একাধিক পত্নী তথায় যাইতে পারিবে না, এবং বহুবিবাহের সম্মানও যাইতে পারিবে না। কিন্তু বহু বিবাহের ব্যাধ্য হইয়াছে চমৎকার। কোনও হিন্দুর বা মুসলমানের যদি একটিমাত্র স্ত্রী থাকে, তাহা হইলেও সে বহুবিবাহিত! কেননা তাহাদের শাস্ত্রানুসারে হিন্দু ও মুসলমানেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে! অথচ ভারতবর্ষের আদমশুমারিতে প্রকাশ যে এদেশে বিবাহিত লোকের মধ্যে শতকরা একজনের বেশী বহুবিবাহিত নহে। এই আইনের ফলে অনেক স্বামীর একমাত্র স্ত্রী ও তাহার সম্মান তাহার নিকট যাইতে পারিতেছে না। শুধু তাই নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে হিন্দু ও মুসলমান বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই গণ্য করিতেছে না। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মপত্নী সে দেশের আইনের চক্ষে উপপত্নী মাত্র এবং হিন্দু মুসলমানের সম্মানেরা অবৈধ সম্মানের মত তাহাদের পিতামাতার উত্তরাধিকারী নহে। ভারতনারীর এই ঘোরতর অপমান সহ করিতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্রবধু, এবং অল্প অনেক

নারী এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাওয়া সম্বন্ধে যে নিষেধ-আইন আছে, তাহা ইচ্ছাপূর্বক ভঙ্গ করিয়া জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ আইন মানিবেন না স্থির করিয়াছেন।

পূর্বে নেটালবাসী ভারতীয়েরা অগাধে কেপ কলোনী প্রদেশে যাইতে পারিত। এখন সে অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তন্নিম্ন ফ্রীষ্টেট প্রদেশে ত কোন ভারতবাসীর যাইবারই যো নাই; সেখানে জমীর মালিক হওয়া বা চাষ বা ব্যবসা করারও অধিকার কোন ভারতবাসীর নাই।

ভারতবাসীরা ফুটপাথে চলিতে পায় না। গাভীরদের ট্রেনে বা ট্রামে যাতায়াত করিতে পায় না। অনেক সহরের নির্দিষ্ট নিকট অংশে ব্যতীত বাস বা ব্যবসা করিতে পারে না। বিশেষ লাইসেন্স বা অনুমতি ভিন্ন ব্যবসা করিতে পারে না। এই অনুমতি একবার লইলেই চুকিয়া যায় না। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার লাইসেন্স বা অনুমতি পুনর্গ্রহণের সময় তাহা পান না। তাহাতে একান্ত নিরুপায় ও সর্বস্বাস্ত হইয়া পড়েন।

এবধিব নানা অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত ভারতবাসীরা অনেক আবেদন নিবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন নেটালের খনির কুলিরা ধর্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া যে সকল স্থানে যাইবার আইন নাই, তথায় যাইতেছেন। শ্রীযুক্ত গাঁধির অধীনে অনেক পুরুষ স্ত্রীলোক বালক বালিকা ও শিশু যে সব স্থানে যাইবার ভারতবাসীর আইনসম্মত অধিকার নাই, তথায় যাইতেছেন। যেখানে ফেরি করিয়া জিনিষ বিক্রয়ের অধিকার ভারতবাসীর নাই, সেখানে সম্ভ্রান্ত মহিলারাও জিনিষ ফেরী করিতেছেন। গাঁধির দলের লোকেরা অর্দ্ধাশনে ট্রান্সভাল প্রদেশে যাইতেছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি শিশু মারা গিয়াছে। গাঁধি, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধু এবং আরও শত শত নরনারী জেলেগিয়াছেন। ২০০০ খনির কুলিকে জোর করিয়া নেটালেধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশে তাহাদের উপর জুমুম করিতেছে ও তাহাদিগকে শাসাইতেছে; কিন্তু তাহারা, ৪৫ টাকা ট্যাক্স রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

যাহারা জেলে গিয়াছে তাহাদের পরিবারের জন্ত এবং ধর্মঘট করিয়া যাহারা বেকার অবস্থায় আছে, তাহাদের জন্ত মাসিক অনূন ৭৫,০০০ টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সামান্ত কুলি রমণী পর্য্যন্ত যে বীরত্ব দেখাইতেছেন, আমাদের এখানকার বড় বড় নেতাদেরও সে সাহস ও আত্মসম্মান-জ্ঞান নাই। আমরা যদি সামান্ত অর্থ দিয়াও এই বীর

পুরুষ ও নারীদের সহায়তা করিতে না পারি, তাহা হইলে ধিক্ আমরাদিগকে। বোদাই, মাজাজ, পঞ্জাব, অযোধ্যা, সর্বত্র হাজার হাজার টাকা উঠিতেছে। বাঙ্গালীকেও যুক্তহস্ত হইতে হইবে।

মহারাজী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র এই ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব প্রজা জাতিবর্ণনির্কিশেষে সমান। কিন্তু এই সাম্য ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে রক্ষিত হইতেছে না। তাই আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ নিজে সমুদয় ক্রমকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দেখাইতেছেন যে তাঁহারা এই হীন অবস্থা কখনও মানিরা লইবেন না। ইহাতে কর্তৃপক্ষের চোখ খুলিবে। প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও আইন বেশী দিন টিকিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনও টিকিবে না।

আমাদেরও যেন চোখ খুলে। দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সি জৈন একই ভাবে কষ্ট সহ করিয়া একই ভাবে অত্যাচার ও অগ্নায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশবাসী ভারতবাসীর যদি ইহাদের মত বুদ্ধি বিবেচনা ও স্বজাতিপ্রেম থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের এত দলাদলি ও মারামারি হইত না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা আমরাদিগকে দল বাধিবার মন্তে দাক্ষা দিতেছেন, স্বার্থত্যাগ ও আত্ম বলিদান শিখাইতেছেন।

আর একটা বড় কথা শিখাইতেছেন—নেতৃত্ব কাহাকে বলে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যখন বঙ্গের নয় জন ভদ্রলোক নির্বাসিত হন, তাহার পর মাসের পর মাস ধরিয়া বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ নেতা তাঁহার অনুচরদের বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও একটিও স্বদেশী বক্তৃতা করেন নাই। অপেক্ষাকৃত আবিধাত লোকে কষ্ট করিয়াছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকায় কি দোখতোছ? গাঁধি কি নিজে ঘরের কোণে বসিয়া অথকে জেলে যাইতে উত্তেজিত করিতেছেন? তাহা নহে; নিজে পূর্বেও অনেকবার জেলে গিয়াছিলেন, এবারও গিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধুরাও জেলে গিয়াছেন। ইহাকেই বলে নেতৃত্ব;—অপরকে যাহা করতে বা সহিতে বলিব, সর্বাগ্রে নিজে তাহা করিব ও সহিব। এমন নেতার কথায় লোকে সর্বস্ব দিতে পারে, প্রাণপণ করিতে পারে।

এই বিবাদ খেতাজ ও কৃষ্ণাজের বিবাদ নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেতাজ পোলাক ও ক্যালেনব্যাক, ভারতবাসীদিগকে আইনভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করার অভিযোগে জেলে গিয়াছেন। আরও অনেক খেতাজ ভারতবাসীর পক্ষে আছেন। এদেশেও অনেক ইংরাজ আমাদের পক্ষে পাদার এণ্ড সন্স দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের



বড়োদার রাজকুমারী ইন্দিরা ও কুচবিহারের মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ ও মাল্যবন্ধন

সাহায্যার্থ ১০০০, আর একজন অজ্ঞাতনামা পাদরি ১৫০০ এবং আরও অনেক ইংরাজ টাকা দিতেছেন।

যিনি যাহা পারেন, দান করিয়া ধন্য হউন। ঠিকানা—  
কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, হারিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

বড়োদার মহারাজার কণ্ঠা এখন কুচবিহারের মহারানী শ্রীমতী ইন্দিরা। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহারে বড়োদা রাজ্যের উন্নত শাসন ও শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন হইবে বলিয়া দেশবাসী আশা করিতেছে। এই আশা যাহাতে ফলবতী হয়, মহারাজা ও মহারানী কি তাহার চেষ্টা করিবেন না ?

বর্ধমান বিভাগে জলপ্লাবন হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে এখনও লোকে কষ্ট পাইতেছে। কাঁথি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তজ্জগৎ এখনও অনেক হাজার টাকার প্রয়োজন। অনেক জেলায়, বিশেষতঃ বাঁকুড়ায়, গৃহহীন লোকদের গৃহনির্মাণের জগৎও অনেক টাকার দরকার। কেবল বাঁকুড়া জেলার জগৎই অনূন ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ৪।৫ হাজার টাকা মাত্র আছে। যিনি যাহা পারেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে অর্থের সদ্যবহার হইবে।

চিত্র ও মূর্তি স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক হইবে, এ তর্ক আজকালকার নয়। বাস্তবিক ছবি ঠিক স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ বিরোধ করিতেই হয়। এমন কি ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত ঠিক স্বাভাবিক জিনিষটির অবিকল নকল হয় না। পক্ষান্তরে ছবি অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিনটা হাত বা কপালে একটা শিং আঁকিতে পারে না। কিন্তু কেহ যদি বলেন যে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ ও গায়ের রং ঠিক স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে করমাইস্টা কিছু কঠিন রকমের হয় এবং মলিতকলার দিক্ দিয়া অনেকটা নিপ্রয়োজনও হয়। বাস্তবিক মানুষের কোন অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি, তাহা বলা বড় কঠিন। কোন ছদ্মের মাপ ঠিক এক নয়। মাইলোর বীন্দ্র (Venus of Milo) প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের সুন্দরতম নমুনা বলিয়া গৃহীত হয়। কিছুদিন হইল একখানি সচিত্র ইংরাজী কাগজে অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের সঙ্গে এই মূর্তির মাপের তুলনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে মূর্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ ঠিক মিলে নাই। বাস্তবিক বিজ্ঞপাতক ছবিতে যেমন হস্তরসের উদ্ভেকের অঙ্গ কোন না কোন অঙ্গ খুব বড় বা খুব ছোট করা হয়, তেমনি শাস্ত, দীর, প্রভৃতি রসের উদ্ভেকের অঙ্গ কিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষের সৌন্দর্য্য সূচনা (suggest) করিবার অঙ্গ, মাপ ও গঠনের কিছু ব্যতিক্রম করিলে কেন যে শিল্পের ব্যাকরণে ভুল হইবে, তাহা বুঝা যায় না। কবিদের উপর ত এরূপ কড়া আইন কেহ জারি করে না। সবাই জানে যে কোন মানুষের চোখ কাণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় না, বা আঙ্গুল ঠিক চাপার কলির মত হয় না, বা গায়ের রং প্রস্ফুটিত মল্লিকার মত হয় না। অথচ আকর্ষণবিশ্রাস্ত চক্ষু, চম্পক কলির মত আঙ্গুল, এবং মল্লিকার মত বর্ণের উল্লেখ ত কাব্যে দেখা যায়। তাহাতে ত কাব্য গুলিকে কেহ অস্বাভাবিক অতএব অপকৃষ্ট বলে না। ঠিক মানুষের গায়ের মত রংটিও কে কয়টি চিত্রে দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। অতএব শিল্পীদের উপর কড়া আইন জারি

করিয়া জুলুম করা উচিত নয়। আসল কথা শিল্পের প্রাণের ধবরটা লওয়াই আগে দরকার। আর সবও দরকারী, কিন্তু প্রাণের মত দরকারী নহে।

নবীন বঙ্গীয় চিত্রকরদের কতকগুলি সুন্দর ছবি বাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী প্রণীত সদ্যঃপ্রকাশিত হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ সম্বন্ধীয় ইংরাজী বহিধানি \* কিনিতে পারেন।

## চিত্রপরিচয়

### প্রচ্ছদপট।

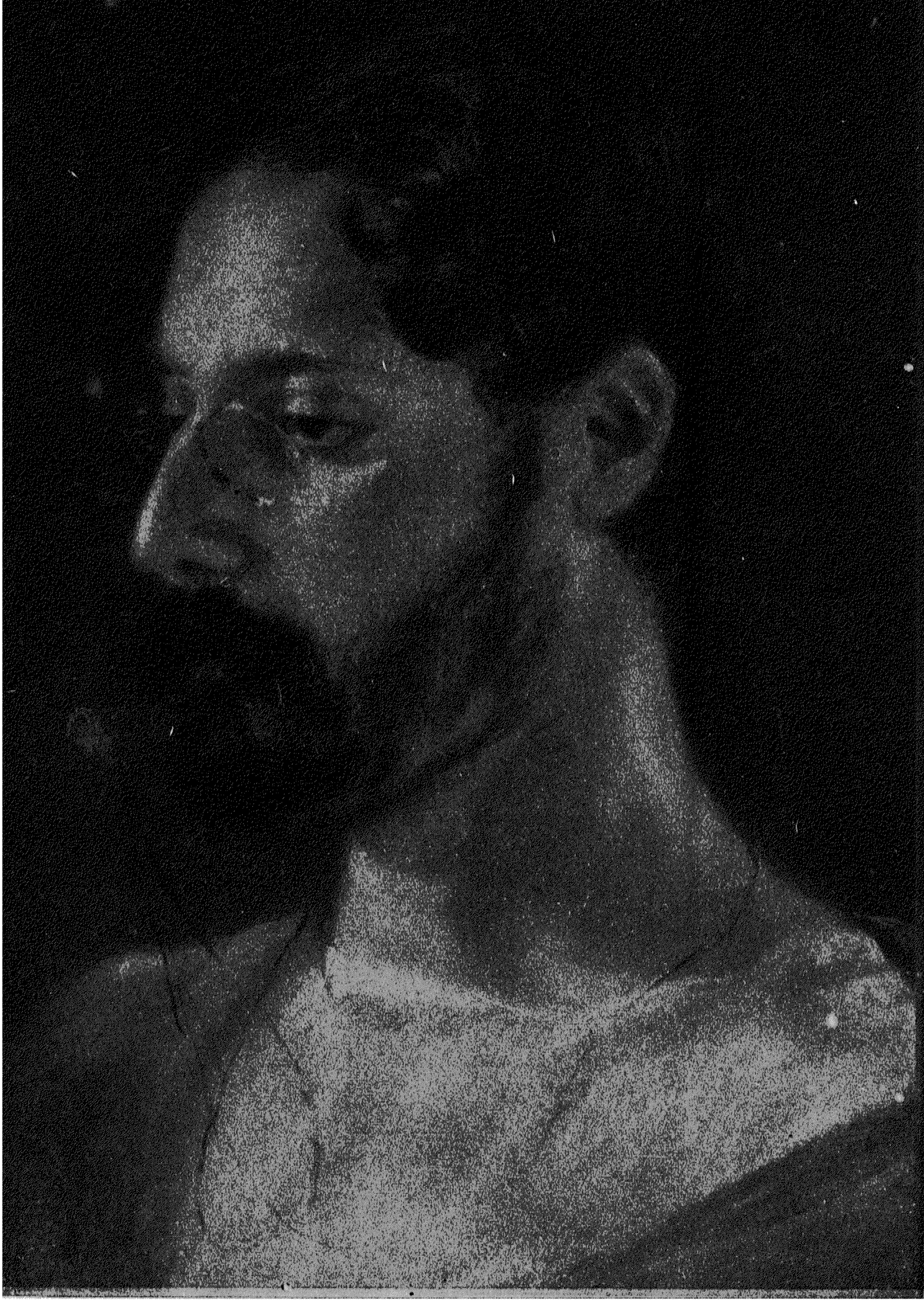
প্রচ্ছদপটে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রবাসী"র পরিকল্পনা সহস্ৰচিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসপুচ্ছচ্যুত লেখনী মানুষের হাতে পড়িয়া ক্রমাগত মুখে কালি মাখিতেছিল এবং কালি ছড়াইতেছিল। অকস্মাৎ একদিন আকাশপথে হংসকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল যে তাহার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে অমল শুভ্রতা, কালিমা-প্রলেপ তাহার কলঙ্ক। তাই সে কালি-ছড়ানো ও কালি-মাখা ছাড়িয়া শুভ্র সুবিনয় হংসরীর স্বীয় বাসস্থানের উদ্দেশে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে।

### বেয়াত্রিচে চেকী।

উচ্চইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিমাঝেই শেলীর চেকী নামক কাব্যের কথা অবগত আছেন। বেয়াত্রিচে চেকীর পিতা ক্রাসেস্কো তাহার উপর নানাবিধ পাশব অত্যাচার করার তাহার ভ্রাতা ও বিমাতার চক্রান্তে ক্রাসেস্কো নিহত হন; এই বড়ঘরে বেয়াত্রিচেও জড়িত আছেন এই সম্বন্ধে তাহার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। মশানে নীত হইবার সময় বেয়াত্রিচে যে একর নৈরাশ্র ও বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শকদিগের দিকে তাকাইয়াছিলেন, চিত্রকর গীদো রেনি তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রটি যথার্থ কাহার এবং কে আঁকিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। মূল ছবিখানি রোমনগরীস্থ বাবে'রিনি-প্রাসাদের সম্বন্ধ-রক্ষিত অন্ততম রত্ন। অনেক শিল্পমালোচক ইহাকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিষাদব্যঞ্জক চিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

\* Myths of the Hindus and Buddhists. By Sister Nivedita and Dr. Ananda Coomaraswamy. 15s. net. George G. Harrap and Company, 3 Portsmouth Street, Kingsway, London, W.C.



### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে।

# প্রবাসী

“সত্যম শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মা গা বলহৌনেন লভাঃ ।”

১৩শ ভাগ

২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২০

৩য় সংখ্যা

## মূর্তি

আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীশ্রু অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং তাঁহার যত্নে মাল্লাজ হইতে কলিকাতায় আনীত শ্রীগুরু-স্বামী স্থপতিকেকে এবং আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান বেঙ্গটাপ্পা ও শ্রীমান নন্দলাল বসুকে ধন্যবাদ দিয়া মূর্তি সম্বন্ধে এই সংগ্রহটি প্রকাশ করিবার পূর্বে পাঠক-বর্গকে এবং বিশেষ করিয়া নিখিল শিল্পমাগর-সম্মুখে আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে শিল্পশাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্তি-লক্ষণ ও তাহার মাপ প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ না করেন অথবা নিজের নিজের শিল্প-কর্ম্মকে চিরদিন শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃত-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত না করেন।

উড়িতে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি ততদিনই নীড় ও তাহার গণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিয়াই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়, তারপর একদিন বাধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাখা চাই যে আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্ম শিল্প নয়, শিল্পের জন্ম শাস্ত্র। আগে মূর্তি রচিত হয়, পরে মূর্তি-লক্ষণ, মূর্তি-বিচার, মূর্তি-নির্মাণের মান পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। বাধন, চলিতে শিথিলার পূর্বে

করিয়া দাঁড়াইতে শিথিলার অবসর দিবার জন্ম; চিরদিন পরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় বাঁদিয়া রাখিবার জন্ম নয়। মূর্তি ধার্মিকের, আর ধর্ম্মার্থীর জন্ম হচ্ছে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নাগপাশ; তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাধাবাধি হচ্ছে শিল্পশিক্ষার্থীর জন্ম, আর শিল্পীর জন্ম হচ্ছে তাল, গান, অঙ্কন, Light shade, perspective আর anatomyর বন্ধনমুক্তি।

ধর্ম্মশাস্ত্র কঠিন করিয়া কেহ যেমন ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা তাহার গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কি বিষম ভ্রান্ত যে মনে করে যে মাপিয়া ছুথিয়া শাস্ত্রসম্মত মূর্তি প্রস্তুত করিলেই শিল্পজগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্প-লোকের আনন্দবাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী যখন প্রথম জগবন্ধু দর্শনে চলে তখন পাণ্ডা তাহার হাত ধরিয়া উঁচা নীচা ডাহিনা বাঁয়া এইরূপ বলিতে বলিতে দেবতাদর্শন করাইতে লইয়া যায়; ক্রমে যত দিন যায় পথও তত সড়গড় হইয়া আসে এবং পাণ্ডারও প্রয়োজন রহে না; পরে দেবতা যেদিন দর্শন দেন সেদিন দেউল মন্দির পূর্বদ্বার পশ্চিমদ্বার ধ্বজা চূড়া উঁচা নীচা দেবতার পাণ্ডা ও অক্ষশাস্ত্রের কড়া গণ্ডা সকলই লোপ পায়।

নদী এক পাড় ভাঙে নূতন পাড় গড়িবার জন্ম, শিল্পীও শিল্পশাস্ত্রের বাধ ভঙ্গ করেন সেই একই কারণে। এটা যে আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকারগণ না বলিতেন তাহা



নয় এবং শাস্ত্র-প্রমাণের সুদৃঢ় বন্ধনে শিল্পীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধিলে শিল্পও যে বাধা নৌকার মত কোন দিন কাহাকেও আনন্দবাজারে পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে না সেটাও যে তাঁহারা না ভাবিয়াছিলেন তাহা নয়।

পাণ্ডিত্যের টীকা হাতে করিয়া শিল্পশাস্ত্র পড়িতে বসিলে শাস্ত্রের বাধনগুলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু বজ্র আঁটনির ভিতরে ভিতরে যে ফস্মা গেরোগুলি আচার্য্যগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা করিয়া সযত্নে সঙ্কোপনে রাখিয়া গেছেন তাহার দিকে মোটেই আমাদের চোখ পড়ে না। “সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমা-লক্ষণম্ স্মৃতম্” এ কথাই অর্থ কি শিল্পীকে বলা নয় যে, যখন পূজার জন্ত প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্য প্রকার মূর্ত্তি গঠনকালে তোমার যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পার। আমি এই প্রবন্ধে ৩নং চিত্রে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তির দুইটি পৃথক নমুনা দিয়াছি—একটি শাস্ত্রসম্মত মাপ জোখ ঠিক রাখিয়া, অন্যটি ভারতশিল্পীরচিত শত সহস্র ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি হইতে যে-কোন-একটি বাছিয়া লইয়া, শাস্ত্রীয় টান আর শিল্পীর টান, দুইটানে দুই ত্রিভঙ্গ কিরূপ ফুটিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্ত।

সৌন্দর্য্যকে দৈত্যগুরু গুক্রোচার্য্য যেদিন শাস্ত্রোক্ত মান পরিমাণ দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেদিন হয়তো সৌন্দর্য্য-লক্ষী কোন এক অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তিতে ধরা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন—আমার দিকে চাহিয়া দেখ! আচার্য্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন “সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমা-লক্ষণম্ স্মৃতম্”—লক্ষী, আমার শাস্ত্র ও প্রতিমা-লক্ষণ তোমার জন্ত নয়, কিন্তু সেই-সকল মূর্ত্তির জন্ত যেগুলি লোকে পূজা করিতে মূল্য দিয়া গড়াইয়া লয়। তুমি বিচিত্রলক্ষণা! শাস্ত্র দিয়া তোমায় ধরা যায় না, মূল্য দিয়া তোমায় কেনা যায় না!

সর্কাকৈ সর্করম্যোহি কশ্চিল্লক্কে প্রজায়তে।

শাস্ত্র-মানেন যো রম্য স রম্যো নাচ এব হি ॥

একেষামেব তদ্ রম্যং লগ্নং যত্র যন্ত হুৎ।

শাস্ত্রমান-বিহীনং যদ্ রম্যং তদ্ বিপশ্চিতাম্ ॥

পণ্ডিতে বলেন শাস্ত্রমূর্ত্তিই সুন্দর মূর্ত্তি, কিন্তু হায় পূর্ণ সুন্দর লাখে তো এক মিলে না। একে ধলে শাস্ত্রছাড়া সুন্দর কি? আরে বলে সুন্দর সে, যে হৃদয় টানে প্রাণে লাগে।

(১)

তাল—ও মান।

আমাদের প্রাচীন শিল্পকারগণ মূর্ত্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—নর, ক্রুর, আশুর, বালা এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্ত্তি গঠনের জন্ত বিভিন্ন পাঁচ প্রকার তাল ও মান নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

নরমূর্ত্তি = দশ তাল।

ক্রুরমূর্ত্তি = দ্বাদশ তাল।

আশুর মূর্ত্তি = ষোড়শ তাল।

বালা-মূর্ত্তি = পঞ্চ তাল।

কুমার-মূর্ত্তি = ষট্ তাল।

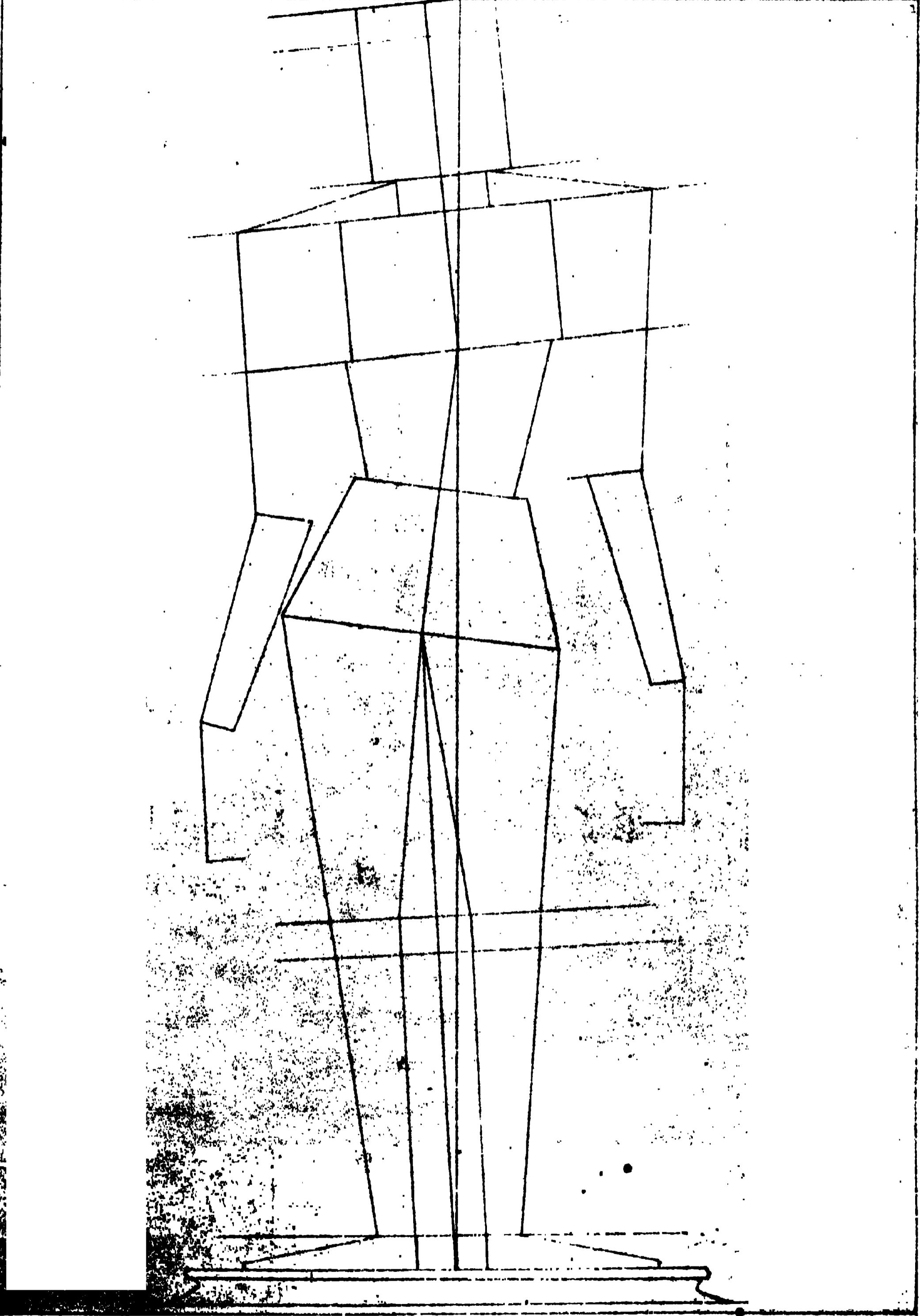
এক তালের পরিমাণ শিল্পকারগণ এইরূপ নির্দেশ করেন, যথা—শিল্পীর নিজ-মূর্ত্তির এক-চতুর্থাংশকে এক অঙ্গুলি কহে, এইরূপ দ্বাদশ অঙ্গুলিতে এক তাল হয়।

নর বা দশ তাল পরিমাণে নরনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বাণ, বলী, ইন্দ্র, ভার্গব ও অর্জুন প্রভৃতি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়। ক্রুর বা দ্বাদশ তাল পরিমাণে চণ্ডী, ভৈরব, নরসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়। আশুর বা ষোড়শ তাল পরিমাণে হিরণ্যকশিপু, ব্রহ্ম, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, নমুচি, নিগুস্ত, গুস্ত, মহিষ, রক্তবীজ ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠনীয়। বালা বা পঞ্চ তাল পরিমাণে শিশুমূর্ত্তি, যেমন বটকুম্ভ, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমার বা ষট্ তাল পরিমাণে শৈশবাতিক্রান্ত অথচ অতরুণ মূর্ত্তি, যেমন উমা, বামন, কুম্ভসখা ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়।

দশ, দ্বাদশ, ষোড়শ, ষট্ এবং পঞ্চ তাল ছাড়া মূর্ত্তি-গঠনে উত্তম নবতাল পরিমাণ ভারতশিল্পীগণকে প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই উত্তম নবতাল পরিমাণ অনুসারে মূর্ত্তির আপাদমস্তক সমান নন্নতাগে বিভক্ত করা হয় এবং এই এক এক ভাগকে তাল কহে। তালের

প্রিত্ব  
৩

Fig 3



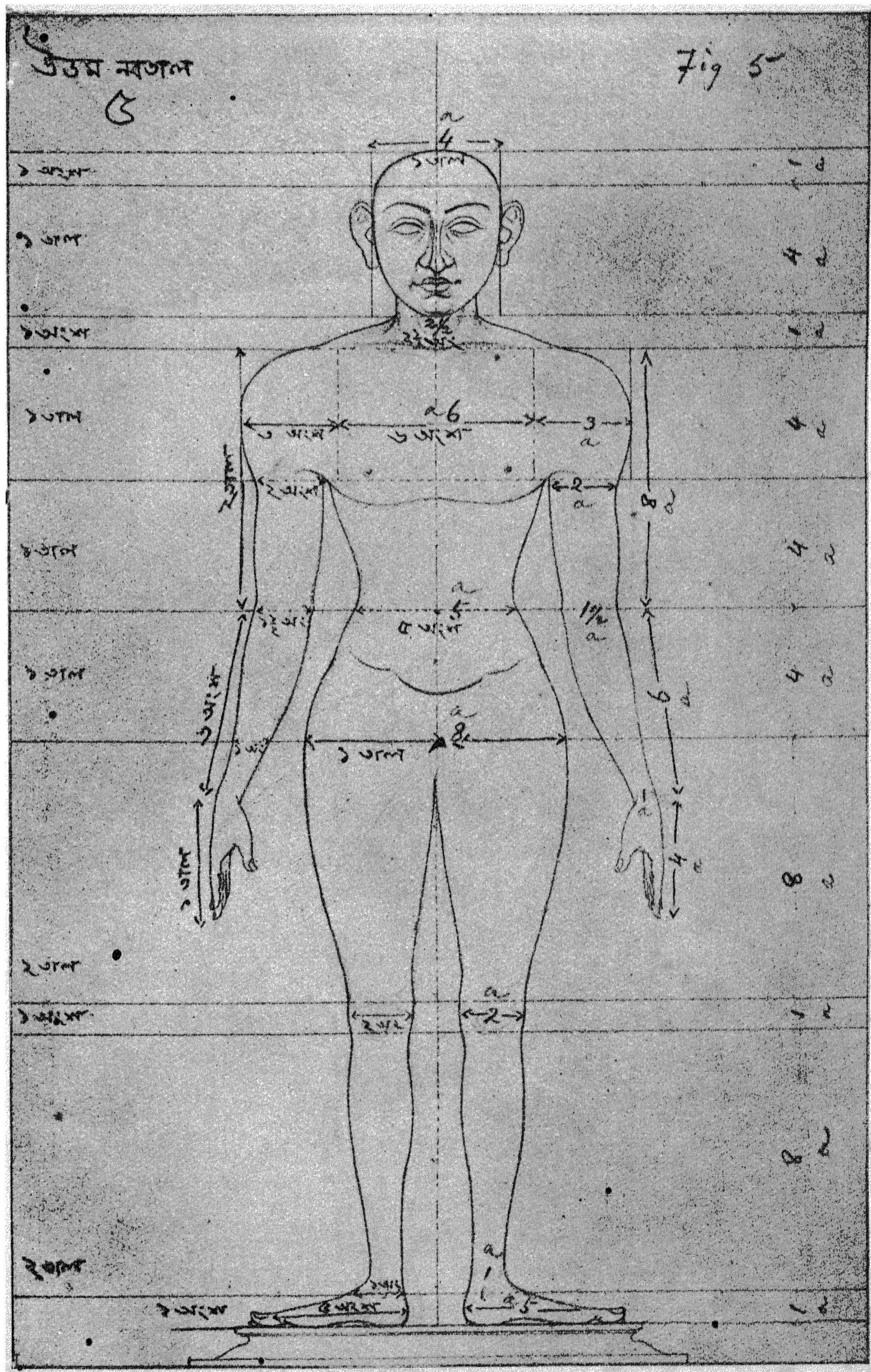






ઉડમ નજાલ  
5

Fig 5





একচতুর্ধ ভাগকে এক অংশ কহে। এইরূপ চারি অংশে এক তাল হয় এবং মূর্তির আপাদমস্তকের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই ৩৬ অংশ বা নয় তাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। **উত্তম চিত্রটি উত্তম নবতাল** পরিমাণে অঙ্কিত।

উত্তম নবতাল পরিমাণে মূর্তির দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা—ললাটের মধ্য হইতে চিবুকের নিম্নভাগ ১ তাল, কণ্ঠমূল হইতে বক্ষ ১ তাল, বক্ষ হইতে নাভি ১ তাল, নাভি হইতে নিতম্ব ১ তাল, নিতম্ব হইতে জাম্বু ২ তাল এবং জাম্বু হইতে পদতল ২ তাল, ব্রহ্মরজ্জ হইতে ললাট-মধ্য ১ অংশ, কণ্ঠ ১ অংশ, জাম্বু ১ অংশ, পদ ১ অংশ। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা—মস্তক ১ তাল, কণ্ঠ ২।০ অংশ, এক স্কন্ধ হইতে আর এক স্কন্ধ ৩ তাল, বক্ষ ৬ অংশ, দেহমধ্য ৫ অংশ, নিতম্ব ২ তাল, জাম্বু ২ অংশ, গুলফ ১ অংশ, পদ ৫ অংশ। **উত্তম নবতাল** পরিমাণে মূর্তির হস্তের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা—স্কন্ধ হইতে কফোণী (কনুই) ২ তাল, কফোণী হইতে মণিবন্ধ ৬ অংশ, পাণিতল ১ তাল। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা—কক্ষমূল ২ অংশ, কফোণী (কনুই) ১।০ অংশ, মণিবন্ধ ১ অংশ।

মূর্তির মুখ তিন সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ললাটের মধ্য হইতে চক্ষু-তারকার মধ্য, চক্ষুর মধ্য হইতে নাসিকার অগ্র, নাসাগ্র হইতে চিবুক, এই তিনভাগ।

শুক্লাচার্যের মতে নবতাল-পরিমিত মূর্তির প্রত্যঙ্গ সমূহের পরিমাণ, যথা—শিখা হইতে কেশান্ত ৩ অঙ্গুলি খাড়াই, ললাট ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, নাসাগ্র হইতে চিবুক ৪ অঙ্গুলি, গ্রীবা ৪ অঙ্গুলি খাড়াই। ক্রুর পরিমাণ লম্বা ৪ এবং চওড়া অর্ধ অঙ্গুলি, নেত্রের পরিমাণ লম্বা ৩ অঙ্গুলি, চওড়া ২ অঙ্গুলি। নেত্রতারকা নেত্রের তিন ভাগের এক ভাগ। কর্ণের পরিমাণ—খাড়াই ৪ অঙ্গুলি, চওড়া ৩ অঙ্গুলি। কর্ণের খাড়াই এবং ক্রুর দৈর্ঘ্য সমান হইয়া থাকে। পাণিতল দৈর্ঘ্যে ৭ অঙ্গুলি, মধ্যমাঙ্গুলির দৈর্ঘ্য ৬ এবং অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৩।০ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য তর্জনির প্রথম পর্ব পর্য্যন্ত ও অঙ্গুষ্ঠের দুইটিমাত্র পর্ব বা গাঁঠ এবং তর্জনি প্রভৃতি আর সকল অঙ্গুলির তিন তিন গাঁঠ হইয়া থাকে। অনামিকা মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা অর্ধ পর্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকা অপেক্ষা এক পর্ব, এবং

তর্জনি মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা এক পর্ব খাটো হইয়া থাকে। পদতল দৈর্ঘ্যে ১৪ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ ২, তর্জনি ২।০ বা ২ অঙ্গুলি, মধ্যমা ১।০, অনামিকা ১।০, কনিষ্ঠা ১।০।

স্ত্রীমূর্তির পরিমাণ পুরুষমূর্তি অপেক্ষা প্রায় এক অংশ খাটো করিয়া গঠন করা বিধেয়।

শিশুমূর্তির পরিমাণ, যথা—কণ্ঠের অধোভাগ হইতে পদ পর্য্যন্ত শিশুর দেহ তাহার নিজমুখের সাড়ে চার গুণ অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগ হইতে উরুমূল দুইগুণ এবং শিশু-দেহের বাকী অর্ধাংশ মস্তকের আড়াই গুণ। শিশুমূর্তির বাহু তাহার মুখের বা পদতলের দুই গুণ হইয়া থাকে। এবং শিশুর গ্রীবা খাটো, মস্তক বড় হয় ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর শরীর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মস্তক সেরূপ বৃদ্ধি পায় না।

( ২ )

## আকৃতি ও প্রকৃতি

সুগঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর শরীর জগতে দুর্লভ এবং এক মানবের আকৃতি প্রকৃতির সহিত অন্তের আকৃতি প্রকৃতির মোটামুটি মিল থাকিলেও ভৌল হিসাবে কোন একের দেহগঠন আদর্শ করিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। সকল মনুষ্যেরই দুই দুই হস্ত ও পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একইরূপ সত্য, কিন্তু মানব-জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা বিধায় নানা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে শিল্প-হিসাবে দেহ-গঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে, কিন্তু ইতর জীব জন্তু এবং পুষ্প পল্লব ইত্যাদির জাতিগত আকৃতির সৌসাদৃশ্য আমাদের নিকট অনেকটা স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, যেমন এক জাতীয় পত্র পুষ্প, হয় হস্তী, ময়ূর মৎস্যের গঠনের তারতম্য অধিক নাই, একটি অশ্বখপত্র অশ্ব পত্রগুলির মতই সূচ্যগ্র ও ত্রিকোণাকার; এক কুর্কটাও অশ্ব কুর্কট-ডিঘের মতই স্নুডোল সুগোল; এইজন্যই বোধ হয় আমাদের শিল্পাচার্যগণ মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভৌল অযুক মানুষের হস্ত পদাদির ভুল্য না বলিয়া অযুক পুষ্প অযুক জীব অযুক বৃক্ষ লতা



ইত্যাদির অক্ষরপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—“মুখম্ বর্জলাকারম্ কুকুটাণাকৃতিঃ” মুখের আকার কুকুট-ডিঘের ঞায় গোল। ৬ নম্বর চিত্রে ডিঘাকৃতি মুখ ও পানের মত মুখ দেখান হইয়াছে। চলিত কথায় আমরা যাহাকে পানপারা-মুখ বলি তাহার প্রচলন নেপালে ও বঙ্গদেশে দেবদেবীর মূর্তি-সকলে অধিক দৃষ্ট হয়। এখন মুখম্ বর্জলাকারম্ বলাতে বলা হইল যে মুখের প্রকৃতিই হচ্ছে বর্জলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ নয়; কিন্তু মুখের বা মুণ্ডের প্রকৃতিটা স্বভাবতঃ গোলাকার হইলেও মুখের একটা আকৃতি আছে যেটা বর্জলাকার দিয়া বোঝান চলেনা; সেইজন্যই বলা হইয়াছে “কুকুটাণাকৃতি” কুকুট-ডিঘের ঞায় বর্জল, ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে মস্তকের দিক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত মুখের গঠন কুকুট-ডিঘের মত স্থূল হইতে ক্রমশঃ কৃশ হইয়া আসিয়াছে এবং মুখ লম্বা ছাঁদের হউক বা গোল ছাঁদেরই হউক এই অণাকৃতিকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না। এই অণাকৃতিকেই টিপিয়া টুপিয়া কুন্দিয়া কাটিয়া নানা বয়সের নানা মানবের মুখাকৃতির তারতম্য শিল্পীকে দেখাইতে হইবে। তাত্রঘট নানা স্থানে টোল খাইলেও যেমন ঘটাকৃতিই থাকে, তেমনি নানা ছাঁদের মুখের ডৌল এই অণাকৃতির ভিতরেই নিবদ্ধ রহে। ঘটের প্রকৃতি যেমন ঘটাকার, মুণ্ডের প্রকৃতিও তেমনি অণাকার। পানের মত মুখ, পাঁচের মত মুখ, এমন কি পাঁচার মত যে মুখ তাহাও এই অণাকারেরই ইতর বিশেষ।

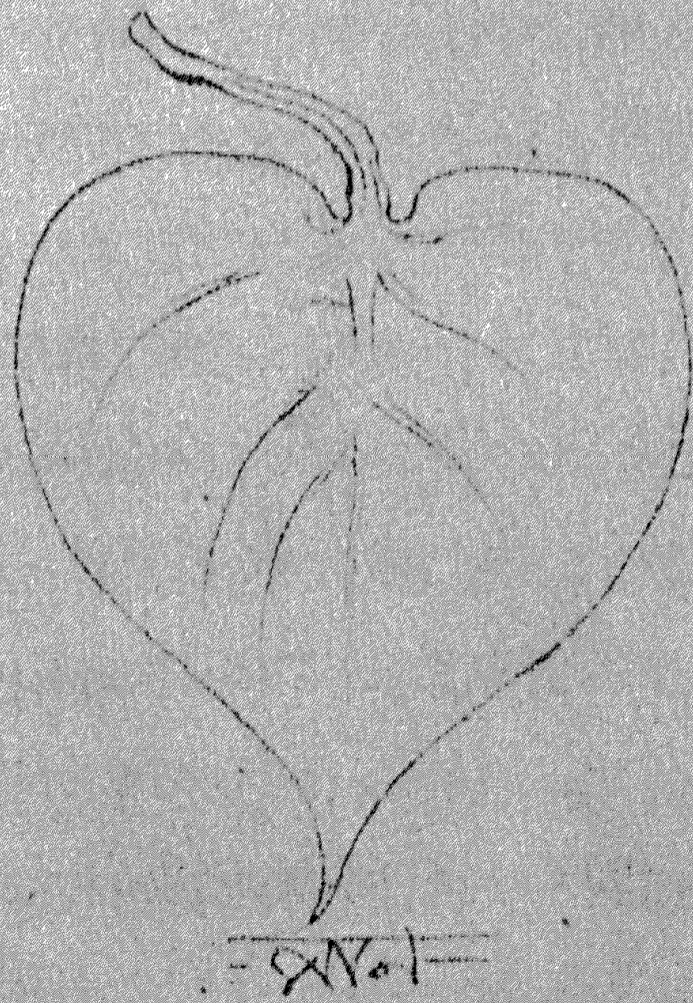
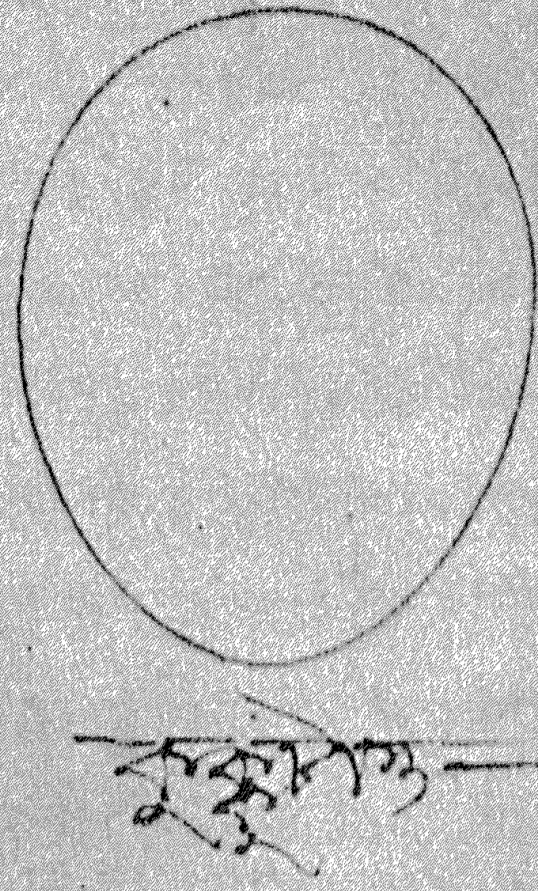
৭ নং চিত্র, ললাট, যথা—“ললাটম্ ধনুষ্কারম্” কেশান্ত হইতে ক্র পর্য্যন্ত ললাট, এবং ইহা ঈষৎ-আকৃষ্ট ধনুকের ঞায় অর্ধচন্দ্রাকার।

৮ নং চিত্র, ক্রমুগ—“নিষপত্রাকৃতিঃ ধনুষ্কারম্।” ক্রমুগের দুই প্রকার গঠনই প্রশস্ত—নিষপত্রাকার ও ধনুষ্কার। নিষপত্রের ঞায় ক্র প্রায়শঃ পুরুষমূর্তিতে এবং ধনুকের ঞায় ক্র প্রায়শঃ স্ত্রীমূর্তি-সকলে ব্যবহৃত হয়। এবং হর্ষ ভয় ক্রোধ প্রভৃতি নানা ভাবাবেশে ক্রমুগ ধনুকের ঞায় বা বায়ুবিচলিত নিষপত্রের ঞায় উন্নমিত, অবনমিত, আকৃষ্ট ইত্যাদি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৯ নং চিত্র, নেত্র বা নয়ন—“মৎস্যাকৃতিঃ”। নয়নের ভাব ও ভাষা যেমন বিচিত্র তেমনি নয়নের উপমারও অন্ত নাই। সেইজন্য সফরীর (পুঁটিমাছের) সহিত তুলনা দিয়া কান্ত হইলে ডাগর চোখ, ভাসা চোখ ইত্যাদি অনেক চোখই বাদ পড়ে, সুতরাং কালে কালে নয়নের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণন করিয়া নানা উপমার সৃষ্টি হইয়াছে যথা—খঞ্জন-নয়ন, হরিণ-নয়ন, কমল-নয়ন, পদ্মপলাশ-নয়ন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে খঞ্জন- ও হরিণ-নয়ন প্রায়শঃ চিত্রিত নারীমূর্তিতে ও কমল-নয়ন পদ্মপলাশ-নয়ন এবং সফরীর ঞায় নয়ন পাষণ- ও ধাতু-মূর্তি-সকলে কি দেব কি দেবী উভয়ের মূর্তি গঠনেই ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় যাহাকে বলে পটলচেরা-চোখ তাহার উল্লেখ শিল্পশাস্ত্রে কিম্বা প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু অজন্তা গুহায় চিত্রিত বহু নারীমূর্তিতে পটলচেরা চোখের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

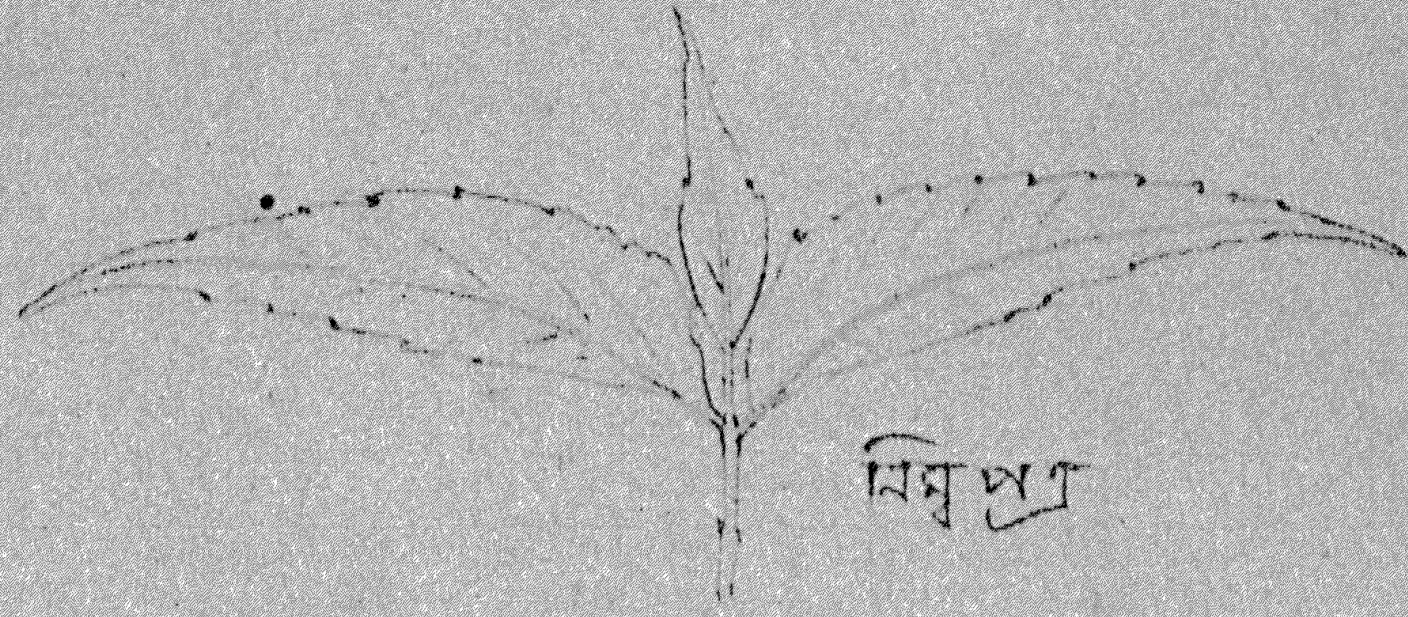
নারী-নয়নের প্রকৃতিই চঞ্চল; তাই মনে হয় যে শিল্পাচার্য্যগণ সফরী খঞ্জন এবং হরিণ এই তিন চঞ্চল প্রাণীর নয়নের সহিত উপমা দিয়া নারী-নয়নের কেবল প্রকৃতিটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা নয়, খঞ্জন হরিণ কমল পদ্মপলাশ সফরী ইত্যাদি উপমা বিভিন্ন নয়নের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নয়নের নানাভাব ও আকৃতিটাও আমাদের বুঝাইয়া দেয়। খঞ্জন-নয়নের সর্কোতুক বিলাস আর সফরী-নয়নের অস্থির দৃষ্টিপাতে এবং হরিণ-নয়নের সরল মাধুরীতে, পদ্মপলাশ-নয়নের প্রশান্ত দৃকপাতে এবং কমল-নয়নের আমিলিত চল চল ভাবে যেমন প্রকৃতিগত প্রভেদ তেমনি আকৃতিগত পার্থক্যও আছে এবং আকৃতির পার্থক্য নয়নের পৃথক পৃথক ভাব প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই মূর্তি গঠনে, চিত্র রচনায় ভিন্ন ভিন্ন আকারের নয়নের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

১০ নং চিত্র, শ্রবণ বা কর্ণ—“গ্রন্থলকারবৎ”—কর্ণের আকৃতি ল'কারের ঞায় করিয়া গঠন করিবে। যদিও ল'কারের সহিত কর্ণের সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু তথাপি মনে হয় কর্ণের গঠনটা ভাল করিয়া বুঝাইতে শিল্পাচার্য্যগণ অধিক মনোযোগী হয়েন নাই, ইহার একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে দেবীমূর্তির কর্ণ



५





निम्बपत्र

ललाटेऽम्बु-  
वैश्याकारम्

प्रभुः-  
निर्गम्यकृत्

१

Fig 7



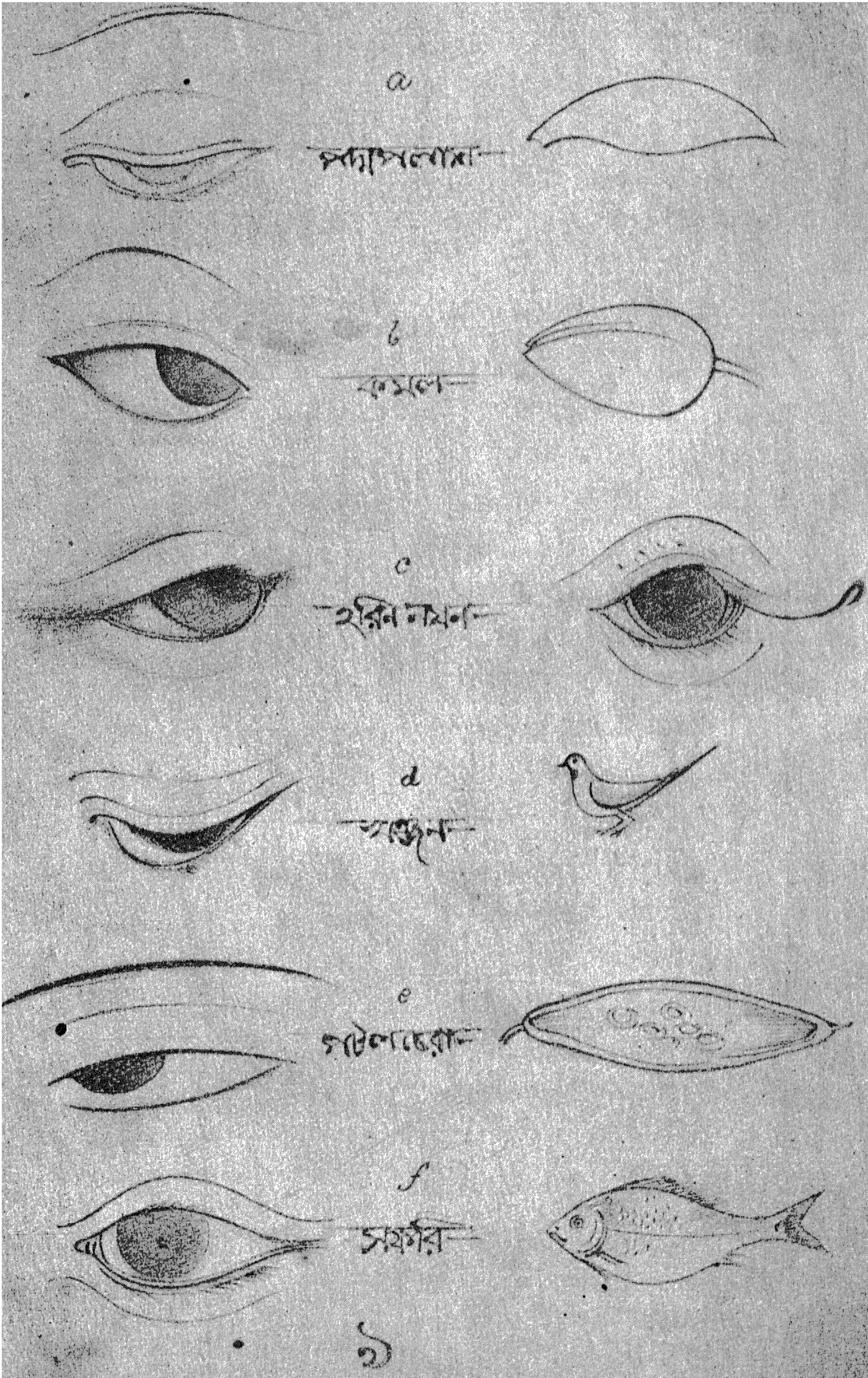
प्रभुः-  
वैश्याकृत्

८

Fig 8









কুণ্ডলাদি নানা অলঙ্কারে ও দেবমূর্তির কর্ণ মুকুটাদির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত বলিয়া কর্ণের আভাস মাত্র দিয়াই শিল্পাচার্য্যগণ কান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে গৃধিনীর সহিত কর্ণের তুলনা সুপ্রচলিত; কর্ণের বর্ধা আকৃতি ও প্রকৃতি গৃধিনীর চিত্র দিয়া যেমন স্পষ্ট বোঝান যায় এমন ল'কার দিয়া নয়।

১১নং চিত্র, নাসা ও নাসাপুট—“তিল পুষ্পাকৃতির্গাস পুটম্ নিষ্পাববীজবৎ”—নাসিকা তিলপুষ্পের ত্রায় এবং নাসাপুট দুইটি নিষ্পাব-বীজ অর্থাৎ বরবটীর বীজের ত্রায় গঠন করিবে।

তিল ত্রায় নাসা সচরাচর দেবীমূর্তিতে ও নারীগণের চিত্র রচনায় প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ গঠনে নাসা ক্রমধ্য হইতে নিটোল ভাবে লম্বমান রহে এবং দুই নাসাপুট কুসুম-দলের মত কিঞ্চিৎ স্ফুরিত দেখা যায়। শুকচক্ষু-নাসা প্রধানতঃ দেবতা ও পুরুষমূর্তিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ গঠনে ক্রমধ্য হইতে নাসা ক্রমোন্নত হইয়া নাসাগ্রের দিকে গড়াইয়া পড়ে এবং নাসাগ্র স্তম্ভ ও দুই নাসাপুট দুই নেত্র-কোণের দিকে উন্নত বা টানা দেখা যায়। শক্তিমান ও মহাত্মা পুরুষের নাসা মাত্রেরই শুকচক্ষুর আকারে গঠিত করা বিধেয়। স্ত্রীমূর্তিতে শুকচক্ষু-নাসা একমাত্র শক্তিমূর্তি-সকলেই দৃষ্ট হয়।

১২নং চিত্র, ওষ্ঠাধর—“অধরম্ বিষফলম্”—অধরের প্রকৃতি সরসু ও রক্তবর্ণ, সেই জন্ত বিষ (তেলাকুচা) ফলের তুলনা আকৃতিটা যত না হটুক প্রকৃতিটা—অধরের মসৃণতা সরসতা ইত্যাদি—বুঝাইবার সহায়তা করে এবং বন্ধুজীব বা বাঙ্গুলী ফুল (হলুদি বসন্ত, গলখোষের ফুল) অধর এবং ওষ্ঠ দুয়েরই আকৃতিটা সুন্দর রূপে ব্যক্ত করে।

১৩নং চিত্র, চিবুক—“চিবুকম্ আত্রবীজম্”—কেবল গঠনসাদৃশ্যের জন্তই যে আত্রবীজের (আমের কসি) সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়। মুখের আর-সকল অংশ অপেক্ষা তুলনার চিবুকের প্রকৃতি জড়, অর্থাৎ ক্র, নাসাপুট, নেত্র এবং ওষ্ঠাধর নানা ভাব-বশে যেমন সজীব হইয়া উঠে, চিবুক সেরূপ হয় না, সেই

জন্ত জড়পদার্থের সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, এবং নাসা, নেত্র, ও ওষ্ঠাধরের তুলনা পুষ্প পত্র মৎস্ত ইত্যাদি সজীব বস্তুর সহিত দেওয়া হইয়াছে। মুখের মধ্যে কর্ণও জড়, সুতরাং তাহার উপমা লকারের সহিত দেওয়া সুসঙ্গত।

১৪নং চিত্র, কণ্ঠ—“কণ্ঠম্ শঙ্খসমামৃতম্”—ত্রিবলী-চিত্রিত শঙ্খের উর্দ্ধ ভাগের সহিত মানব-কণ্ঠের সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে; ইহা ছাড়া শঙ্খের স্থান যখন কণ্ঠ তখন শঙ্খের সহিত তাহার আকৃতি প্রকৃতির তুলনা সুসঙ্গত।

১৫নং চিত্র, শরীর বা কাণ্ড—“গোমুখাকারম্”—কণ্ঠের নিম্নভাগ হইতে জঠরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত দেহাংশ গোমুখের ত্রায় করিয়া গঠন করিবে; ইহাতে বন্ধস্থলের দৃঢ়তা, কটিদেশের কৃশতা ও জঠরের লোল বিলম্বিত ভাব ও গঠন সুন্দর সূচিত হয়। শরীরের মধ্যভাগের সহিত ডমরুর ও সিংহের মধ্যভাগের তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে এবং দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্ত রুদ্ধ কবাটের সহিত পুরুষের বন্ধের তুলনা দেওয়া হয়, কিন্তু শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই গোমুখ দিয়া যেমন সূচারূপে বুঝান যায় সেরূপ অল্প কিছু দিয়া নয়।

১৬নং চিত্র, স্কন্ধ,--“গজতুণ্ডাকৃতিঃ”—বাহু “করিকরাকৃতিঃ”। গজস্কন্ধ আমাদের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গজমুণ্ডের সহিত মানব-স্কন্ধের সৌসাদৃশ্যটা অস্বীকার করা চলে না। বাহু এবং স্কন্ধ শিল্পীরা শুণ্ড-সমেত গজমুণ্ডের মত করিয়া চিরদিন গড়িয়া আসিতেছেন। কবি কালিদাস মানবস্কন্ধের উপমা বৃষস্কন্ধের সহিত দিয়াছেন সত্য, কিন্তু গজমুণ্ড যে বৃষস্কন্ধ অপেক্ষা আকৃতি প্রকৃতিতে মানবস্কন্ধের সমতুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করীণ্ডণ্ডের সহিত বাহুর যে কেবল আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তাহা নয়, দুয়েরই প্রকৃতিতে একটা মিল বেশ অনুভব করা যায়। পঞ্চশীর্ষ সর্প এবং লতার সহিত কবিগণ যে বাহুর উপমা দেন তাহাতে বাহুর প্রকৃতি যে জড়াইয়া ধরা, বন্ধন করা, সেইটুকু মাত্র প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকের বাহু ও তাহার উপমাধরের



স্বধর্ম যে নির্ভরশীলতা তাহাই সূচনা করে, কিন্তু করীকরের সহিত তুলনা দিলে বাহুর প্রকৃতি আক্ষেপ বিক্ষেপ বেষ্টন বন্ধন ইত্যাদি ও সঙ্গে সঙ্গে বাহুর আকৃতিটাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

১৭ নং চিত্র, প্রকোষ্ঠ,—“বালকদলীকাণ্ডম্”—কফোণ (কম্বুই) হইতে পানিতলের আরম্ভ পর্য্যন্ত ছোট কলাগাছের ঝায় করিয়া গঠন করিবে। ইহাতে প্রকোষ্ঠের সুগঠন এবং নিটোল অথচ সুদৃঢ় ভাব দুয়েরই দিকে শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

১৮ নং চিত্র, অঞ্জুলী—“শিখীফলম্”—শিম্ ও মটরমুঁটির সহিত অঞ্জুলীর তুলনা কবিসমাজে আদর লাভ না করিলেও অঞ্জুলীর গঠনের পক্ষে টাঁপার কলি অপেক্ষা শিখীফল অধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে।

১৯ নং চিত্র, উরু,—“কদলীকাণ্ডম্”—কলাগাছের ঝায় উরু, কি স্ত্রীমূর্তি কি পুরুষমূর্তি উভয়েতেই শিল্পীরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া করভোরু অর্থাৎ করীশিঙের শুঙের ঝায় উরু বহু দেবীমূর্তিতে দেখা যায়। কিন্তু উরু-যুগলের দৃঢ়তা ও নিটোল গঠনের সাদৃশ্য কদলীকাণ্ডেই সমধিক পরিস্ফুট। বাহুদ্বয় করীশিঙের মত নানাদিকে কার্যাবশে প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কারণেই কদলীকাণ্ড অপেক্ষা কোমল ও দোহুলামান করীশিঙের সহিত বাহুর তুলনা দেওয়া আকৃতি প্রকৃতি উভয় হিসাবে সুসঙ্গত হয়। উরুযুগল শরীরের সমস্ত ভার বহন করে বলিয়াই তাহার আকৃতি প্রকৃতি উভয় দিকটাই বুঝাইতে হইলে শুঙ অপেক্ষা কঠিনতর যে কদলীকাণ্ড তাহারই উপমা সুসঙ্গত।

২০ নং চিত্র, জানু,—“ককটাকৃতিঃ”—ককটের পৃষ্ঠের সহিত জানুর অস্থিটির তুলনা দেওয়া হয়।

২১ নং চিত্র, জঙ্ঘা,—“মৎস্তাকৃতিঃ”—আসন্নপ্রসবা বৃহৎ মৎস্তের আকৃতির সহিত মানবজঙ্ঘার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

২২ নং চিত্র, কর ও পদ,—“করপল্লবম্ পদপল্লবম্”—কমলের সহিত ও পল্লবের সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অজস্তাচিত্রাবলীতে

ও ভারতীয় মূর্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোন দেশের কোন মূর্তিতে নয়।

( আগামী বারে সমাপ্য )

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## আভ্যুদয়িক ❀

( শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের “নোবেল-প্রাইজ” প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে )

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,  
প্রতিভার এই পুণ্য-পূজায় সপ্ত সাগর মিলল আসি'।  
কোথায় শ্রামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—  
কি মস্তুরে মিলল তবু অন্তরে কে টানল ডুরী!  
কোলাকুলি কালায় গোয়ায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,  
রাজার পূজা আপন রাজ্যে কবির পূজা সব দেশে।

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,  
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,  
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত-লহর স্নিগ্ধবাহে  
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে;  
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,  
রঙীন করে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী আরোয়ায়।

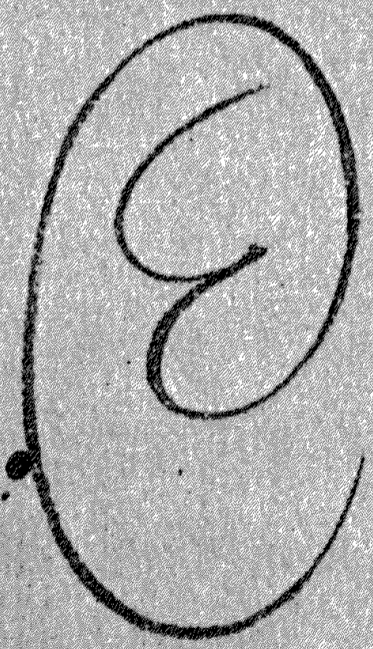
‘রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়’—  
চাণক্যের এই বাক্য প্রবীণ মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।  
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গ-সাগর থেকে,  
গল্ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে;  
বাতাসে আজ রোল উঠেছে “নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে!”  
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিঙ্হু-ঘোটক হাঁকে!

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—  
বাংলা আজি তাই করিল!...হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া!  
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—  
মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে!  
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,  
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্যহীন।

\* এই অগ্রহারণ তারিখে বোলপুরে “রবীন্দ্র-সঙ্গমে” পঠিত।



স্থিতির মত

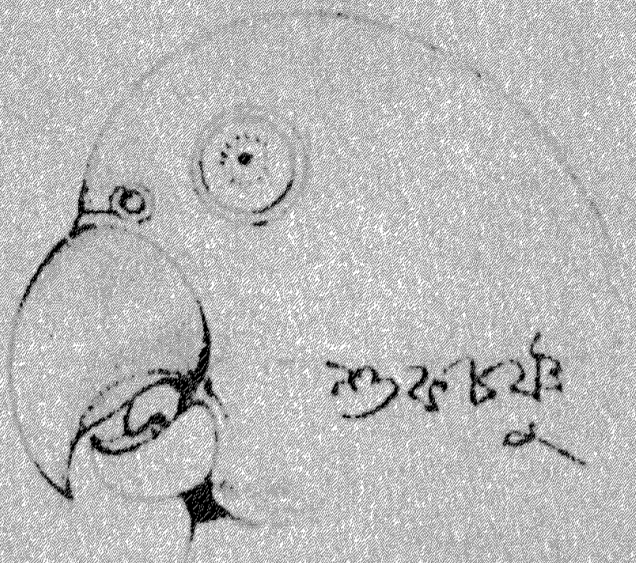
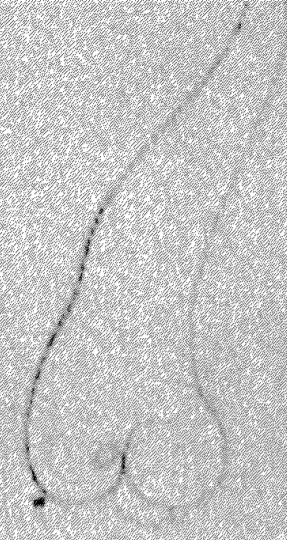


— গ্রন্থ লকার বহু —

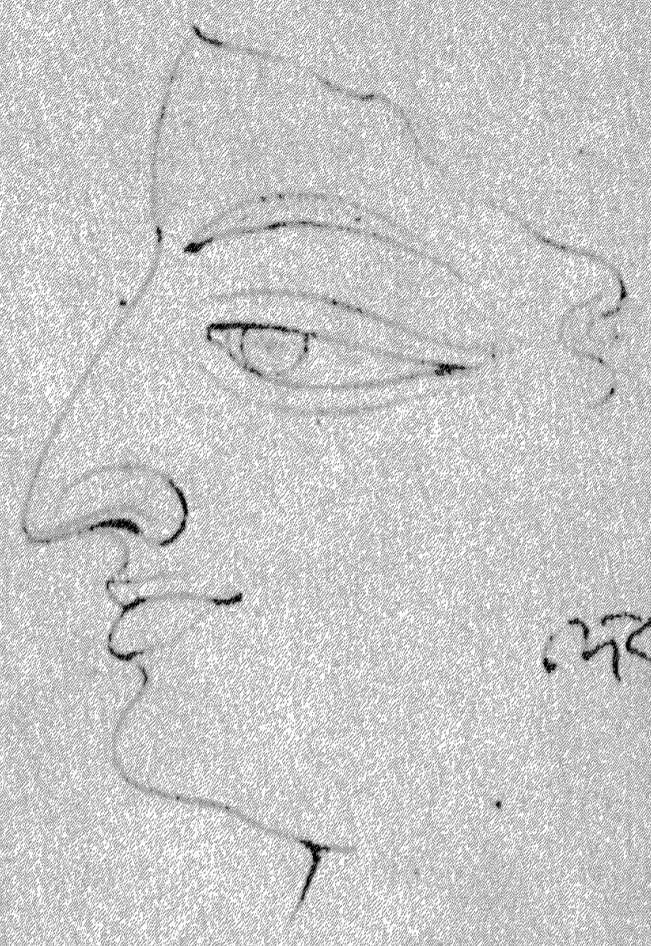




ବିଳମ୍ବପୁଞ୍ଜ



କୃଷ୍ଣଚର୍ଯ୍ୟ



ଅବସ୍ଥା

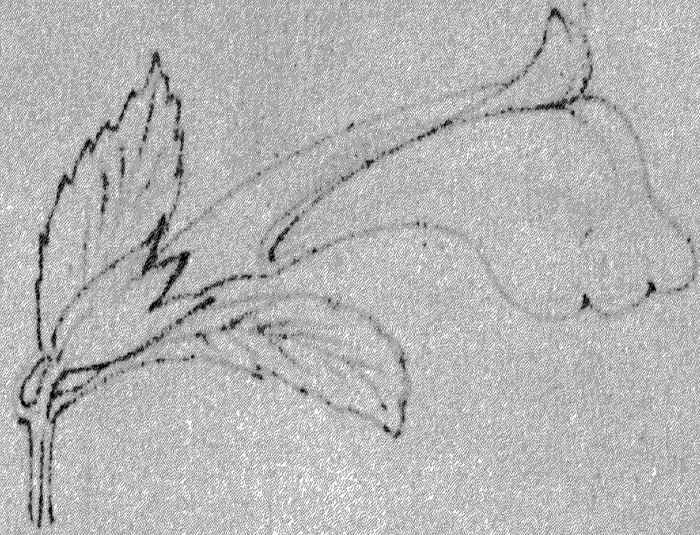
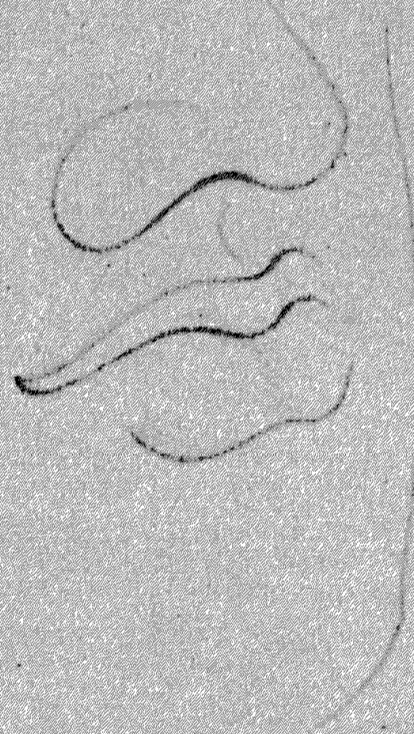
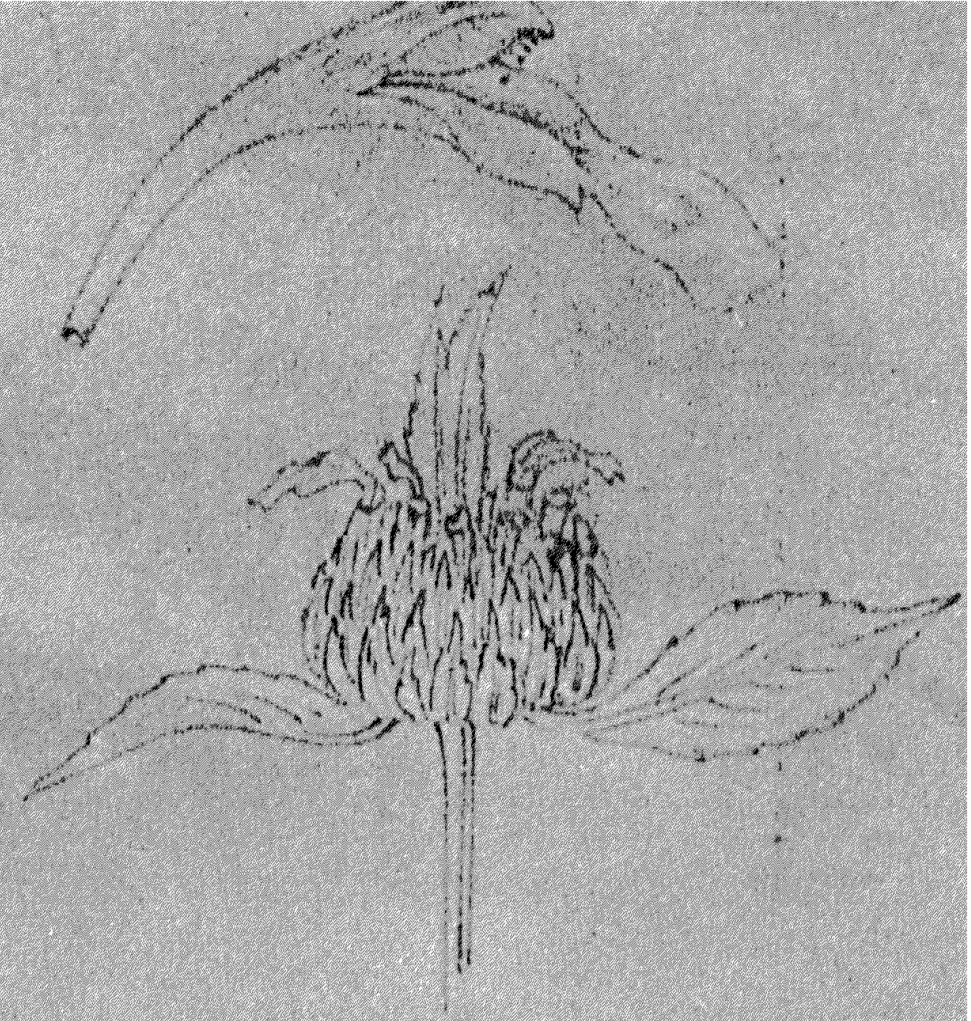
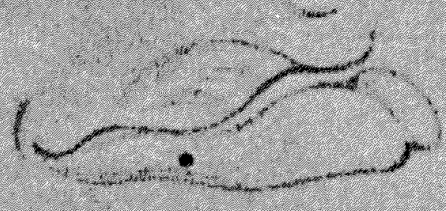


କାନ୍ତିସ୍ମୃତି



ବରବୀରୀ (ନିଜାଦବୀରୀ)  
ନାଶାପୁଞ୍ଜ





অর্ধব

বান্ধুলী বা হুন্দি বসন্ত ফুল



জাহুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,  
তাহার সুধা, সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা ।  
পূর্বাকাশে গান আছে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,  
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গনি ;  
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো  
অন্তরীক্ষে সজোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

\* \* \*

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,  
বন্ধে করে পরীর হাতের পুণ্য পারিজাতের কলি !

“বন্ধভূমি ! রম্য ভূমি” বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা,  
“ধন্য ভূমি বন্ধকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;  
বিশ্বে ভূমি বন্ধে বাধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,  
ধ্রুব তারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয় ।

\* \* \*

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,  
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ-রবির মুলুক থেকে ;  
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী  
সোনার বরণ বর্ণা করায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;  
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,  
পুষ্ট তোমার স্মৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

\* \* \*

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য ভূমি ;  
ধন্য ভূমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি ।  
বন্ধভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অন্ধে, কবি !  
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি ।  
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাণীকি ও ব্যাসের ধারা,  
বিশ্ব-কবি-সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা !  
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

## পঞ্চশস্য

মোসলেম ধর্ম সাধুসন্ত পূজা ( The Moslem World ) :—

সাধুসন্ত পূজাকে মুসলমানেরা “নারাবুৎ” বলে। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী হইলেও, তাহারা বহু সাধুসন্ত মহাপুরুষের পূজা করিয়া থাকে, এবং তাঁহাদিগকে ভগবানের কাছে পূজকের

কল্যাণের অস্ত্র ওকালতি করিতে নিযুক্ত করিবার অস্ত্র প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই যে মরপূজা ও কুসংস্কার, ইহা বোধ হয় অল্পমত জাতির সাহচর্য হইতে মুসলমানী বিশ্বাসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অথবা প্রত্যেক দেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারের পূর্বের স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের অবশেষ থাকিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের দেশ খুষ্টান কর্তৃক জিত হইলে মুসলমানেরা স্বধর্ম রক্ষার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ফলেও এইরূপ বীরপূজা ও সাধুপূজা প্রসার লাভ করিয়াছিল। গৌড়া ধর্মপাগল লোকেরা এখনো সাধারণ লোকের কাছে মহাপুরুষ বলিয়া সহজেই পূজা পাইয়া আসিতেছে। গৌড়ামির পাগলামি সাধারণে সহজেই ধার্মিকতা বলিয়া ভুল করে। পূজা আদায় করিবার আর-একটা সহজ পন্থা সন্ন্যাস-গ্রহণ। মানুষ বাহ্যত সংসার ত্যাগ করিয়া সহজেই সংসারের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া কায়েমি আসন দখল করিতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে মুসলমান ধর্মের তুল্য একেশ্বরবাদী আবর্জনাশূন্য পবিত্র ধর্মমত জগতে অত্যন্ত বিরল। মুসলমানের প্রধান ধর্মমত এই যে “লা-ইলাহা-ইল্লাহা”—পরমেশ্বর ভিন্ন আর কোনো ঈশ্বর নাই, অথচ তাহারা এই মন্ত্র আওড়াইয়াই পীর প্রভৃতির দরগার পূজা করিয়া থাকে। সিদ্দিক-ল-আরবী-উদ্-দরগাওনি এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তাঁহার অনুচরদিগকে “শাহাদা” মন্ত্রের (লা-ইলাহা ইল্লাহা, মুহাম্মদ রসুল্লাহ) প্রথমাংশ মাত্র উচ্চস্বরে বলিতে দিতেন, মহম্মদের স্তুতিবাদটুকু মনে মনে বলাইতেন, পাছে লোকে মহম্মদকেই পরমেশ্বরের আসনে বসাইয়া ফেলে; কিন্তু সাধারণ লোকে অসাধারণ লোককে দেবতার আসন দিতেই এত ব্যস্ত যে “দরগাওনা” সম্প্রদায়ের মুসলমানদের কাছে স্বয়ং দরগাওনি দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যেক দেশের জেলায় জেলায় গায়ে গায়ে কত যে পীর দরবেশ প্রভৃতি পূজা পাইতেছেন তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু ইহাদের খ্যাতি সেই স্থানেই আবদ্ধ হয় ত পাশের জেলাতেও তাঁহার পরিচয় লোকের অপরিজ্ঞাত।

## ইসলাম ধর্ম জগৎমালা (The Moslem World)—

জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে দুই সম্প্রদায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত না হইয়াও, সম্পূর্ণ পৃথক দেশে ও অবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াও, এমন অনুষ্ঠান অবলম্বন করে যাহা প্রায় একই রকমের। এইরূপ একটি জিনিস জগৎমালা। জগৎমালার ব্যবহার জগতের শ্রেষ্ঠ সকল ধর্মেই দেখা যায়—হিন্দু, খুষ্টান, বৌদ্ধ, যিহুদি, মুসলমান, সকলেই জগৎমালা ব্যবহার করে। কিন্তু এই-সকল ধর্মসম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং একের প্রভাবে অপর প্রভাবান্বিত। সুতরাং এই জগৎমালা সম্ভবত এক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথমে গৃহীত হইয়া অপর সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জগৎমালা খুব সম্ভব ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের অঙ্গ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল; হিন্দুধর্মের এই অঙ্গ পারসিক ধর্মে, এবং তথা হইতে খুষ্টধর্মে সম্প্রসারিত হয়; তৎপরে ইসলাম ধর্ম খুষ্টধর্মের সংপ্রবে আসিয়া খুষ্টধর্মের অপর অনেক অনুষ্ঠানের সহিত জগৎমালাও গ্রহণ করে। প্রবাদ আছে যে হজরত মহম্মদের যত্নে পর তাঁহার আসবাবের মধ্যে একখানি কোরান ও দুগাছি জগৎমালা পাওয়া গিয়াছিল। এ প্রবাদ যে বিশ্বাস্য তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেননা আবু বকরের



সমকালে কোরান সংগৃহীত হইয়াছিল, মহম্মদের সময় কোরানের অস্তিত্ব ছিল না। আর একটি প্রবাদ এই যে, একদিন মহম্মদ দেখিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক কাঁকর গণিয়া জপের সংখ্যা রাখিতেছে; মহম্মদ তাহাদিগকে কাঁকরে জপসংখ্যা রাখিতে নিবেদন করিয়া অঙ্গুলিপর্কের জপসংখ্যা করিতে উপদেশ দেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অনুষ্ঠানবহুল ইসলামধর্ম আল্লা ও মহম্মদের নামজপের সংখ্যা রাখিবার জন্ত সহজেই জপমালা উদ্ভাবন করিয়াছিল বা প্রতিরাসী ধর্মসম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যত্নী যে মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে অঙ্গুলিপর্কের আল্লার নামজপের সংখ্যা রাখিবে, আল্লার কাছে পরকালে তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু খলিফা ওমরের পুত্র আবদাল্লা জপসংখ্যা রাখার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—“ওরূপ করিয়ো না, উহা সয়তানের বুদ্ধি।” অনেক কুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছবুদ্ধি মুসলমান মালাজপের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন; মানস জপই জপ—পরমেশ্বরের নামরস পান করিব, তাহার আবার মাপ বা সংখ্যা কি? কিন্তু মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিদের সাবধানবাণী সত্ত্বেও হেজিরার তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জপমালা কায়েরি হইয়া প্রচলিত হইয়া গেল। জপমালা বা তসবীতে ৯৯টি দানা বা গুটি থাকে। জপমালা প্রথমে জুজ ও ইতর শ্রেণীর মধ্যেই প্রসার লাভ করে; তদনন্তর স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমান মুসলমানেরা এই প্রথাকে পবিত্র-ইসলাম-বিরোধী বলিয়া এখনো জপমালার নিন্দা করিতেছেন। কায়েরো হইতে প্রকাশিত অল-মানার নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, জপমালা আল্লার নামজপ সর্বদা স্মরণ করাইয়া রাখে, তাহাতে চিত্ত তন্নয় হইবার অবসর পায় না; অহংকার করিয়া আল্লার নামজপে পাপের ভরসাই ভারি হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অন্তরের ভাতি আচ্ছন্ন হয়।

### ভারতের ভিক্ষুক (East and West)—

ভারতের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের ভিক্ষুকই জ্যেষ্ঠ। এবং জ্যেষ্ঠাধিকারে তাহার দারিদ্র্যদুঃখও সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের ভিক্ষুক যেন মনুষ্যসমাজের ভাঙন—রসাতলের পথে সর্বনাশের আশায় হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাও আনন্দে ব্যগ্রতায় দ্রুতগতিতে। ভারতের ভিক্ষুকের মনের বল ও সাহস তাহার বিদেশী জাতিগোষ্ঠীদের চেয়ে চেয়ে বেশি, তাহার কন্দি অসীম, তাহার উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ও অসংখ্য। কিন্তু তবুও সে পাপচারী দলের শেষ যাত্রী।

হঠ পুষ্ট বলিষ্ঠ ভিক্ষুকেরা সম্প্রদায়ের সর্দার, সম্প্রদায়ের অলঙ্কার। সে আতুর পক্ষ প্রজাদের উপর প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করে। এই ভিক্ষুকরাজসম্প্রদায় আবার ব্যবসায় অনুসারে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত—

১। বানর ও রামাছাগলের নাচওয়াল।—সে বানর ও ছাগলকে দিয়া ভাঁড়ানি করিয়া লোককে হাসাইয়া খুসি করিয়া সহজেই পয়সা আদায় করিয়া ফিরে। তাহার আগমনে পাড়ার শিশুপাল উল্লসিত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে; সে শিশু লেলাইয়া মা-বাপের কষ্টার্জিত পয়সা খুব সহজেই পকেট হইতে বাহির করিয়া আনে। সুবিধামত জায়গায় একা পাইলে সে বানর লেলাইয়া পথিককে সমস্ত করিয়া দিয়া অতি সহজে পকেটও মারে। সে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা নয়; পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই মতো ভবঘুরে কোনো রমণীকে হস্ত জীবনসঙ্গিনী করে; তার পর একদিন খেয়াল হইলে গভীর রাত্রে বানর ও

ছাগলগুলিকে লইয়া সঙ্গিনীর সঙ্গে চিরজগের মত ত্যাগ করিয়া নূতনের সজ্জানে বাহির হইয়া পড়ে।

২। ভালুকনাচওয়াল।—বানরনাচওয়ালার কনিষ্ঠ। সে ভালুকের নাচ দেখাইয়া, ভালুকজগের ঔষধ—ভালুকের লোম বেচিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে।

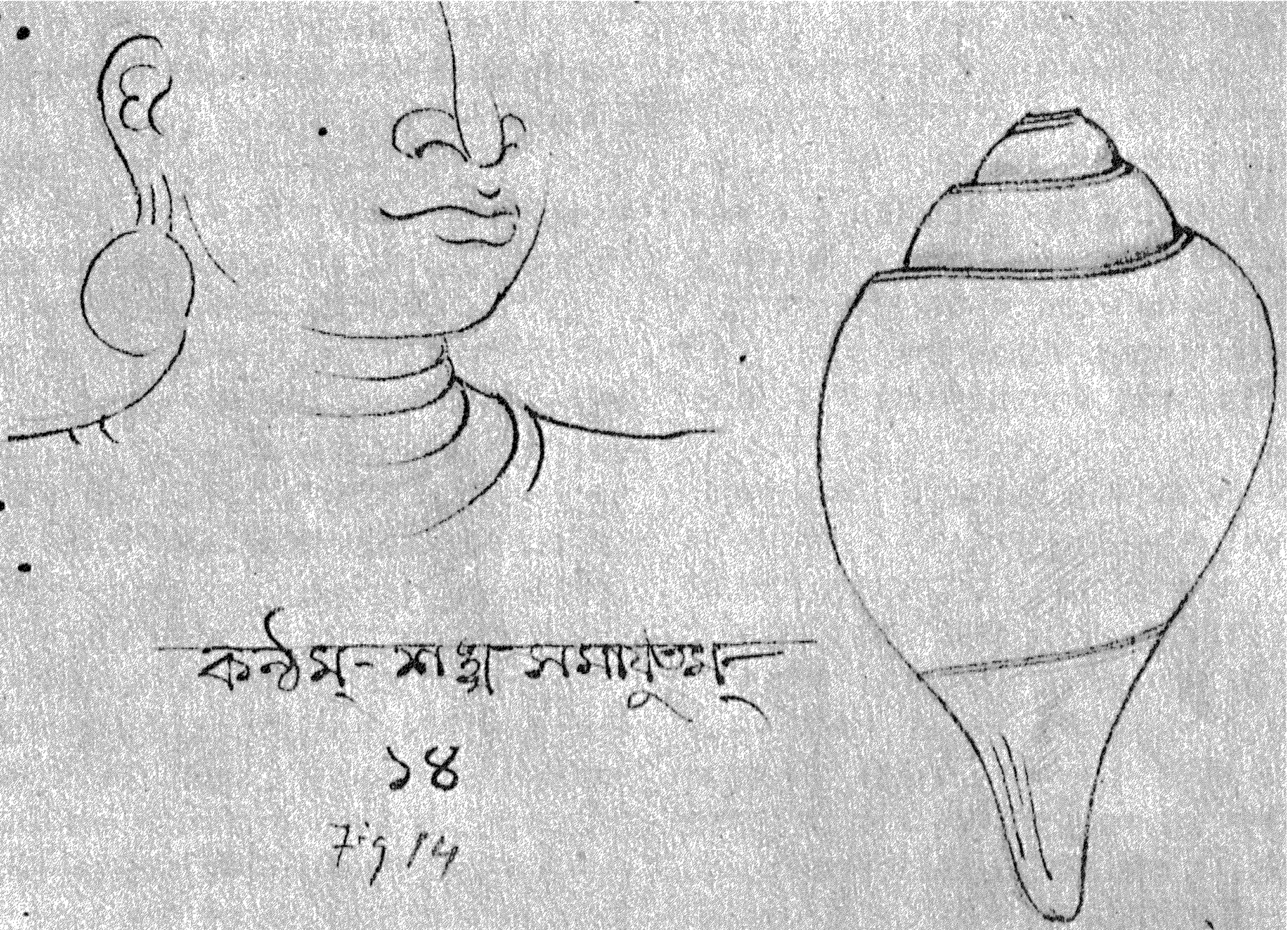
৩। সাপুড়ে—তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইয়া, সাপ ধরিয়া, অসম্ভব স্থান হইতে সাপ বাহির করিয়া, ভেঙ্কি লাগাইয়া, সাপের বিষের জড়িডুটি বিক্রয় করিয়া কোনো রকমে দিন গুজরান করে।

৪। গাইয়ে—রাশায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কোরান গাহিয়া গাহিয়া বাড়ীর ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে ইহার ডিক্কা করিয়া সিরে। ইহাদের গান কেহ শুনে, কেহ বা শুনে না; কেহ বা শ্রদ্ধায়, কেহ বা অশ্রদ্ধায় এক আধটা পয়সা ফেলিয়া দেয়; তাহাই কুড়াইয়া ইহাদের নিজের ও বটমীটির ভরণপোষণ চলে। ইহার ডিক্ক হইলেও চেছারায় বেশ ভদ্র রকমের, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তেলচুকচুকে স্নানমার্জিত গায়ে একখানি ফরসা চাদর জড়ানো, লম্বা টিকিটি গুচ্ছ করিয়া পরিপাটি বাঁধা, তিলকফোঁটায় প্রচুর যত্নপরিশ্রমের পরিচয়; কাহারো হাতে বেহালা, কাহারো ধপ্পনী, কাহারো গোপীযন্ত্র, কাহারো বা সম্বল ছুখণ্ড কাঠ—তাহাই টুকিয়া বাজাখেণ্ডে গলায় গানের তাল রাখে। সে গান গাহে—কিন্তু গানের পদ ও ভাবের সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, গান তাহার মন স্পর্শ করে না, তাহার মুখে কোনো চিত্র আঁকে না, সে পয়সা পাইলেই সমের অপেক্ষা না করিয়াই পান থামাইয়া অল্প মক্কেল পাকড়াইবার জন্ত সরিয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের মুখে মুখে কত পল্লীকবির কবিতাচেষ্টা, কত সাধকের সাধনার ইতিহাস যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা তাহারাজ্ঞানে না, লোকেও তাহার খোঁজ রাখে না।

৫। ভবঘুরে বেদে—ইহার স্বামী পুত্র সঙ্গে লইয়া, আঁতুড়ের শিশুকে কোলায় খুলাইয়া পথে পথে এক করুণ সুরে নিজেদের দৈন্ত জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরে; সুবিধা পাইলে চুরি করে; কিন্তু তাহাদের সম্বল কিছু জমে না। যাহা পায় তাহাই এক বেলায় উৎসবে ফুকিয়া দেয়, তার পর নিজেদের নগ্নতা ও শীর্ণতা দেখাইয়া লোকের দয়া আকর্ষণ করিয়া ফিরে।

৬। গণৎকার—ইহার একখানা আঁকজোঁককাটা অস্বাজীর্ণ বই, একজোড়া পাশ্টি, একটুকরা খড়ী, এবং এমনি আরো টুকটাকি জিনিস লইয়া লোকের হাত দেখিয়া মুখ দেখিয়া ভাগ্য গণিয়া ফিরে। ইহার সুদূর গ্রহের প্রভাবের ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রতিবেশীর-কাছে-শোনা ছচারটা খবর ও নিজেদের দুর্ভোগ উপরই নির্ভর করিয়া অদৃষ্ট গণনা করে। প্রথম দর্শনেই সে তাহার মক্কেলকে ভাগ্যবান বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু কিছুদিন পরে যে তাহার একটা ফাঁড়া আছে এ কথা বলিতেও সে বিস্মৃত হয় না। ইহার মনস্তত্ত্ব বেশ জানে; ভাগ্যবান বলিয়া খুসি করিয়া ও ফাঁড়ার ভয় দেখাইয়া ক্রমে বেশ আসর জাঁকাইয়া বসে; এবং মাটিতে গিঁজিবিজি আঁক কাটিয়া পাশা ফেলিয়া ফুলফলের নাম বলাইয়া অনর্গল বক্তৃতায় ও নানা প্রক্রিয়ায় মক্কেলের মন একেবারে অভিভূত করিয়া নিজের পারিশ্রমিক ও গ্রহশাস্তির জন্ত আটা দিউ চিনি ও সওয়া পাঁচ আনা পয়সা অতি স্বচ্ছন্দেই আদায় করিয়া চম্পট দেয়।

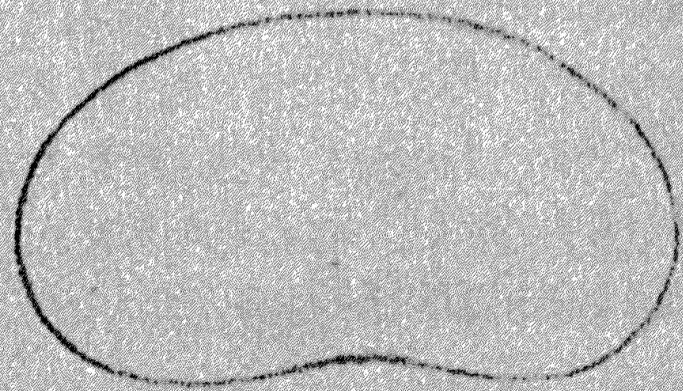
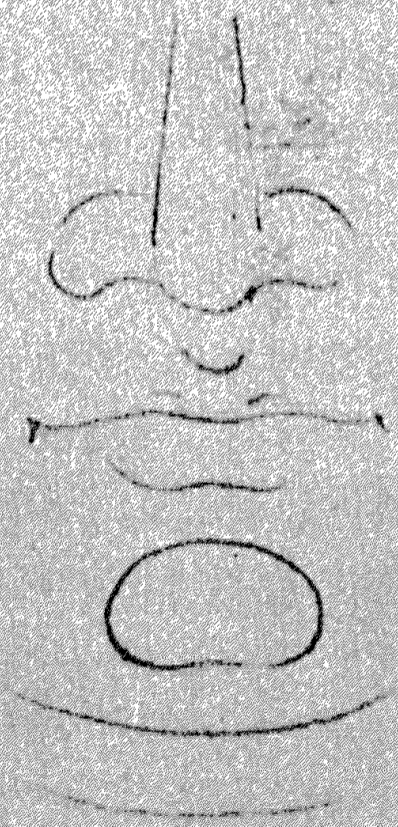
৭। বদ্যনাথের-গুরু-ওয়াল।—এরা নানা ছলে ভিক্ষা আদায় করে। অস্বাভাবিক-অঙ্গযুক্ত একটা গুরু জোগাড় করিয়া ইহার নানাবিধ কৌশল ও ইঙ্গিত শিক্ষা দেয়; ইঙ্গিত-অনুসারে এই গুরু পা তোলে, মাথা নাড়ে। এই গুরু পিঠে একখানি বিচিত্র-বর্ণের-কারুকার্য্য-করা কাঁথা ঢাকা দিয়া, কড়ি-গাঁথা দড়ি ও ঘণ্টা দিয়া



कर्णम्-शास्त्रं समाप्तम्

१४

Fig 14



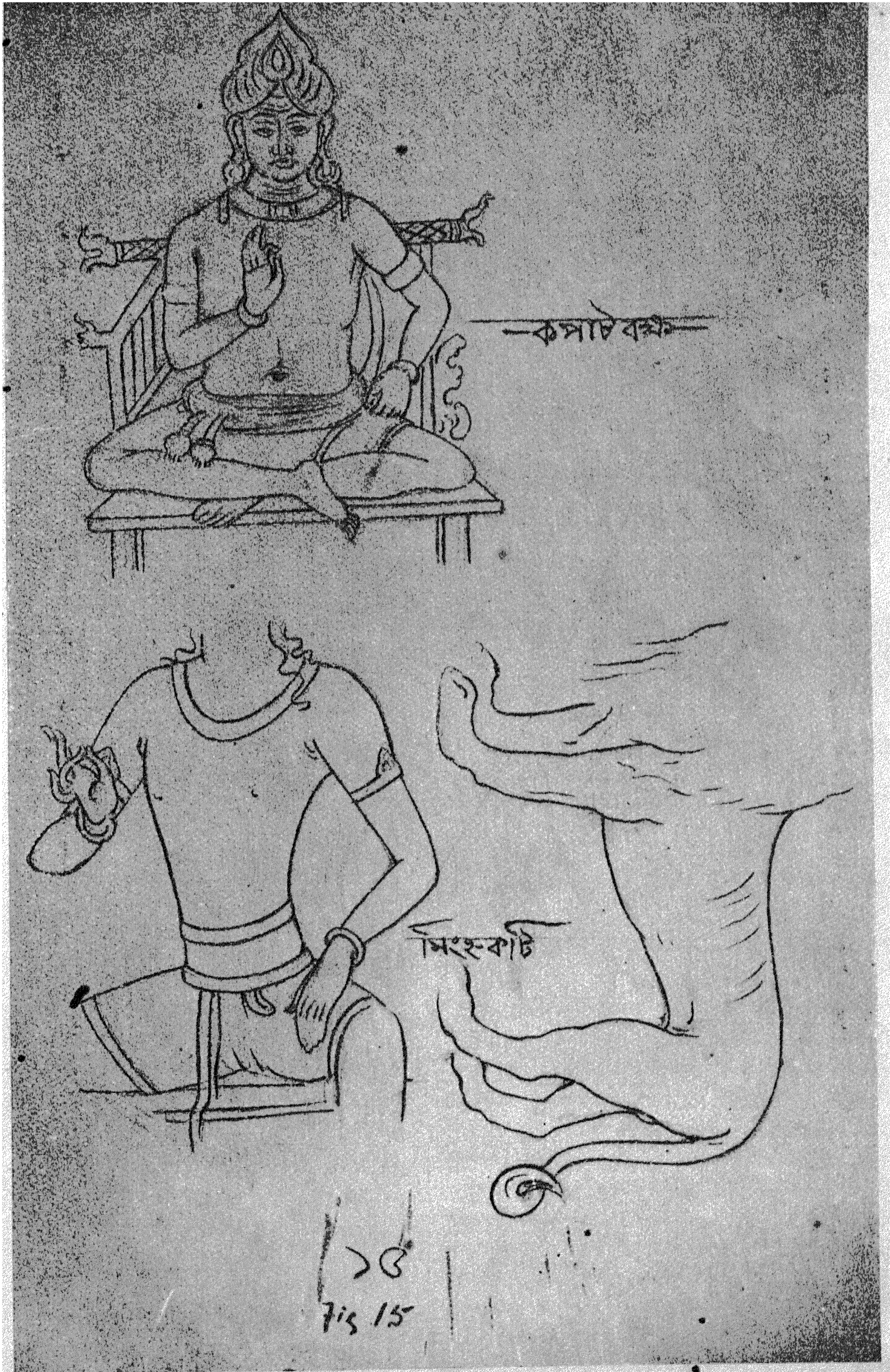
चिबुकम्-शास्त्रं समाप्तम्

१७











সাজাইয়া ইহার। লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরে, এবং সহজে বিশ্বাসশীল নরনারীকে গরুকে দিয়া আশীর্বাদ করাইয়া, ভবিষ্যৎ গণাইয়া, বাজ্রা করাইয়া পয়সা কাপড় ইত্যাদি আদায় করে।

৮। পুজারী ভিখারী—ইহার। একটা সাজিতে গুটিকয়েক ফুল ও একটু গঙ্গাজল লইয়া, একগোছা পৈতা ও বিচিত্র ফোটার জোরে লোকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বাবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অজ্ঞাত দেবতার পূজার ভান করিয়া জলফুল ছিটাইয়া খুব সহজেই দক্ষিণা আদায় করে। এই শ্রেণীতে শীতলা-ওয়লা, ওলাদেবীর পুজারী প্রভৃতিকেও ধরা যাইতে পারে। এই-সব ভীষণ রোগদেবতার রোগের ভয়ে গৃহস্থ অতি সহজেই চাল ডাল, কলামুলা, পয়সা কাপড় দিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হয়।

৯। ঋষ্যাধিনী প্রবন্ধক ভিখারী—ইহার। সত্যতার ভান করিয়া, নিত্য নব নব বিপদজ্বালের বর্ণনা সৃষ্টি করিয়া, সত্যের অবভাসে দয়ালু করিয়া প্রচুর রকম ভিক্ষা আদায় করে। ইহাদের কেহ দশটাকা মাহিনার চাকরী করে, কিন্তু বহুপরিবার, দশটাকায় চলে না, তাই ভিক্ষা করিতেছে, না হয় ত ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড় দেখাইয়া বলে যে বেচিতে আসিয়াছে, এগুলির পরিবর্তে সের-খানেক চাল পাইলে সেদিনকার মতন কতকগুলি শ্রাণীর আহার হয়। কোন্ পামণ্ড কাপড় রাখিয়া তাহাকে চাল দিবে?—সে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাল ডাল খাদ্য ও টাকাটা সিকেটা অমনিই রোজগার করিয়া বাড়ী ফিরে। কাহারও ঋষিগণ, তাহার ভাই পণ্টনমে নোঙ্করী করে, সে দেশ হইতে আসিয়া দেখিতেছে সেই পণ্টন রেখুনমে বদলি হইয়া গিয়াছে, এখন সে আশান্তরে পড়িয়াছে, কিছু অর্থ হইলেই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে, এবং আজ দু দিন সে ভুগা আছে, অন্তত একপয়সার ছাত্ত কি চানা খাওয়াইয়া দিলে বাবুজির বহুৎ পুণ্য হইতে পারে।

সমর্থ ভিক্ষুকদের আট প্রকার শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া হইল। ইহাই যে সম্পূর্ণ তালিকা তাহা নহে, তবু ইহা হইতেই অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষাবৃত্তি যতই হেয় হোক, ইহার দ্বারা দাতার অন্তরের মহৎ ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহা মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুক মঙ্গলদায়ক শান ও নিকম প্রস্তর উভয়ই।

### জনন-সমস্যা (Les Documents du Progres):-

অনেকের দৃঢ় ধারণা আছে যে প্রথমজাত জ্যেষ্ঠসন্তান কনিষ্ঠ-দিগের অপেক্ষা বলবান ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। ইহারই ফল-স্বরূপ অনেক স্থলে জ্যেষ্ঠের দায়াদায়িকার প্রবল ও অধিক, এবং কনিষ্ঠদিগের উপরাতাহার কর্তৃত্ব ও শাসন করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

অনেক পণ্ডিত বা পণ্ডিতস্বল্প ব্যক্তির মত এই যে অনির্দিষ্ট সন্তান-জনন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, এবং তাহার দ্বারা সামাজিক ক্ষতি হইবার যদিই বা কিছু সম্ভাবনা থাকে, তবে গুণোৎকর্ষ দ্বারা সংখ্যাহীনতার ক্ষতি সম্পূরণ হইতে পারিবে। তাহাদের মতে প্রতি দম্পতির দুইটির বেশি সন্তান হওয়া উচিত নয়। ইহাতে দম্পতির স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি এবং সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই ভালো হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিৎ মেটনিকফ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে জনন অব্যাহত না থাকিলে জাত সন্তানের গুণোৎ-

কর্ষের সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে জ্যেষ্ঠ সন্তান কনিষ্ঠদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী বা অধিকতর বুদ্ধিমান হয় না। প্রকৃতির নিয়মই হইতেছে ক্রমোন্নতি; সুতরাং প্রথমজাত সন্তান আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম না হইবারই কথা। বহুর জন্ম হয় বলিয়াই প্রকৃতি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি করিবার অবসর পায়। সুতরাং কেবলমাত্র প্রথমজাত সন্তানগুলিকে বাছিয়া লইলে সে বাছাই সরেস বাছাই কখনই হইবে না।

মেটনিকফের বহুপূর্বে অপর এক পণ্ডিত ওয়েস্টনগার্ড বলিয়া গিয়াছেন যে প্রথমজাত সন্তান সব চেয়ে কম মজবুত। তিনি গণনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

কোপেনহেগেনের ডাক্তার হান্সেন গণনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শৈশোক মতই সমর্থন করিতেছেন। তিনি ৪০০ লোকের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ২০৪ জন জ্যেষ্ঠ ও ১৬৬ জন কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠেরাই অধিকতর সৎ, সুস্থ ও বুদ্ধিমান।

ডাক্তার বুর্গে বলেন যে প্রথম প্রসব অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় বলিয়া প্রথমজাত সন্তানেরা মরে বেশি। প্রথম গর্ভ যদি ১২৬টা নষ্ট হয়, ত দ্বিতীয় তৃতীয় নষ্ট হয় ৮৮, এবং চতুর্থ পঞ্চম নষ্ট হয় ৮৯।

অতএব নানা প্রকারে আজকাল ইহা স্বিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে প্রথমজাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু অধিক হয়।

দুর্বল ব্যক্তির সন্তান দুর্বলতর হয়, এবং বুদ্ধি ও প্রতিভাবান প্রায় হয়ই না। রাসার ও রাবেলে জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন না; পাস্কালের এক বড় দিদি ছিলেন; রুসো ও ভণ্টেষ্টার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন; বোমার্শে সপ্তম গর্ভের সন্তান; শাতোত্রিয়া দশম; ভিক্টর হ্যাগো ও শেক্সপীয়র তৃতীয়।

অনেক সংখ্যাগ্রাহী পণ্ডিতের মতে যুবা দম্পতির তৃতীয় সন্তানই সর্বাপেক্ষা ভালো হয়।

অতএব প্রত্যেক দম্পতির অন্ততপক্ষে তিনটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যিক।

### বাঁচবে যদি বিয়ে কর (The Literary Digest)—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সেন্সন হইতে দেখা গিয়াছে যে চিরকুমার ও চিরকুমারী অপেক্ষা বিবাহিত নরনারী দীর্ঘজীবী হয়। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের বিবাহিত পুরুষের মৃত্যুর হার ৪২, চিরকুমারের মৃত্যুর হার ৬৬; ৩০ হইতে ৪০ বয়সের বিবাহিত মরে শতকরা ৬, চিরকুমার মরে প্রায় ১০; ৪০ হইতে ৫০ বয়সে মৃত্যুহারের তারতম্য আরো বেশী, বিবাহিত ৯৫, অবিবাহিত ১২৫; ৫০ হইতে ৬০ বয়সে তারতম্য অধিক না হইলেও, অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত হাজারকরা ১১ জন কম মরে; ৬০ হইতে ৭০ বয়সে বিবাহিত মরে ৩২, অবিবাহিত ৫১।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলকক্স ইহার কারণ স্বরূপ বলেন—(১) রুগ ও অসমর্থ লোকেরা অনেক সময় বিবাহ করে না; চিরকুমারের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা সেইজন্য বেশি হয়; (২) বিবাহিত লোকেরা নিয়ম ও ধরাধারায় মগ্ন থাকে, অবিবাহিত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী বেপরোয়া আঁবাধ হয়, এজন্য মরে বেশি; দেখা যায় যে বিপুলীয় বা পরীত্যাগীদের মধ্যে এই কারণেই মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হয়; এমন কি ২০—৩০ বৎসরের বিপুলীয় ও পরীত্যাগীর মৃত্যুহার



অবিবাহিতের মৃত্যুহারের প্রায় ডবল; অপর বয়সেও অধিক, এবং কখন কখন ডবল।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুহারে বিবাহ বা কোনার্থা বিশেষ ভারতম্য ঘটায় না। বয়স ২০—৩০ বৎসরের বিবাহিত মেয়েরা কুমারীর চেয়ে ৫ ও ৪ অনুপাতে বেশি মরে; ইহার কারণ সন্তানপ্রসব। কিন্তু ৩০এর পর হইতে বিবাহিতার মৃত্যু অপেক্ষা অবিবাহিতার মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখা যায়। বিধবা বা পতিপরিত্যক্তা নারীর মৃত্যু বিপত্তীক বা পত্নীত্যাগী পুরুষের অপেক্ষা ঢের কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিবাহ পুরুষের যেমন, নারীর পক্ষে তেমন জীবনবর্ধক নয়।

বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্রের জন্মই কর্তব্য—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতেও (জীববিদ্যা ও উদ্ভাববিদ্যা) সন্তান দেখিয়া বিবাহ ভালো বা মন্দ হইয়াছে বিচার করা উচিত। পিতা পুত্ররূপে পুনঃ পুনঃ নব নব জীবন লাভ করেন, এজন্য স্ত্রীর নাম সংস্কৃতে জায়া। অনেক পণ্ডিত বলেন যে ঘোড়া গরু ঠাস মুরগী ফল ফুল প্রভৃতির বংশ যাহাতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এজন্য আমরা ক্ষেত্র ও বীজ কত রকমে বাছাই করিয়া সাবধান হইয়া চলি, কেবল মনুষ্যবংশের বেলা আমরা উদাসীন ও অসাবধান—ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের কথা। প্রাচীন ভারতে সর্বণ বিবাহের মূলে এই বংশোৎকর্ষবিধান একটা কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কালে মিশ্রণের ফলে যখন সকল বর্ণ এক হইয়া উঠিল তখন আর সর্বণ বিবাহের কোনো অর্থ থাকিল না, তখন একদল পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—স্ত্রীরস্ত্রো দুঃখলাদপি। কিন্তু আধুনিক যুগে বিবাহে উৎকৃষ্টতম বর বা কন্যা বাছাই করা প্রায়ই হয় না—এখন রূপ, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি, বিচারের মধ্যেই ধরা হয় না। ইহার প্রতিকারের জন্ম আধুনিক উদ্ভাববিদ্যাবিদেরা বলেন যে যুবক যুবতীর অবাধ মিলন হওয়া আবশ্যিক, তাহাতে বিস্তৃত ও বহু লোকের সহিত পরিচয় দ্বারা কণ্ঠা স্বীয় মনোমত সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এজন্য স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ের একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত; ছেলে মেয়ে বাল্যাবধি অবাধে মিশিতে পাইলে যৌনমোহ অনেকটা হ্রাস হইয়া আসে, এবং তাহার ফলে তাহারা জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ধীরতা ও বিচারের সহিত কার্য্য করিতে পারে। যুরোপ ও আমেরিকার বহু স্কুল কলেজে এক্ষণে ছেলে মেয়ের একত্র শিক্ষা হইতেছে; আমাদের দেশেও মেডিক্যাল কলেজ, প্রাচীন ডভটন কলেজ ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কলেজেও ছেলেদের সহিত মেয়েরা পড়িয়া থাকে; ইহাতে এ পর্য্যন্ত ফল ভালো ছাড়া মন্দ হয় নাই।

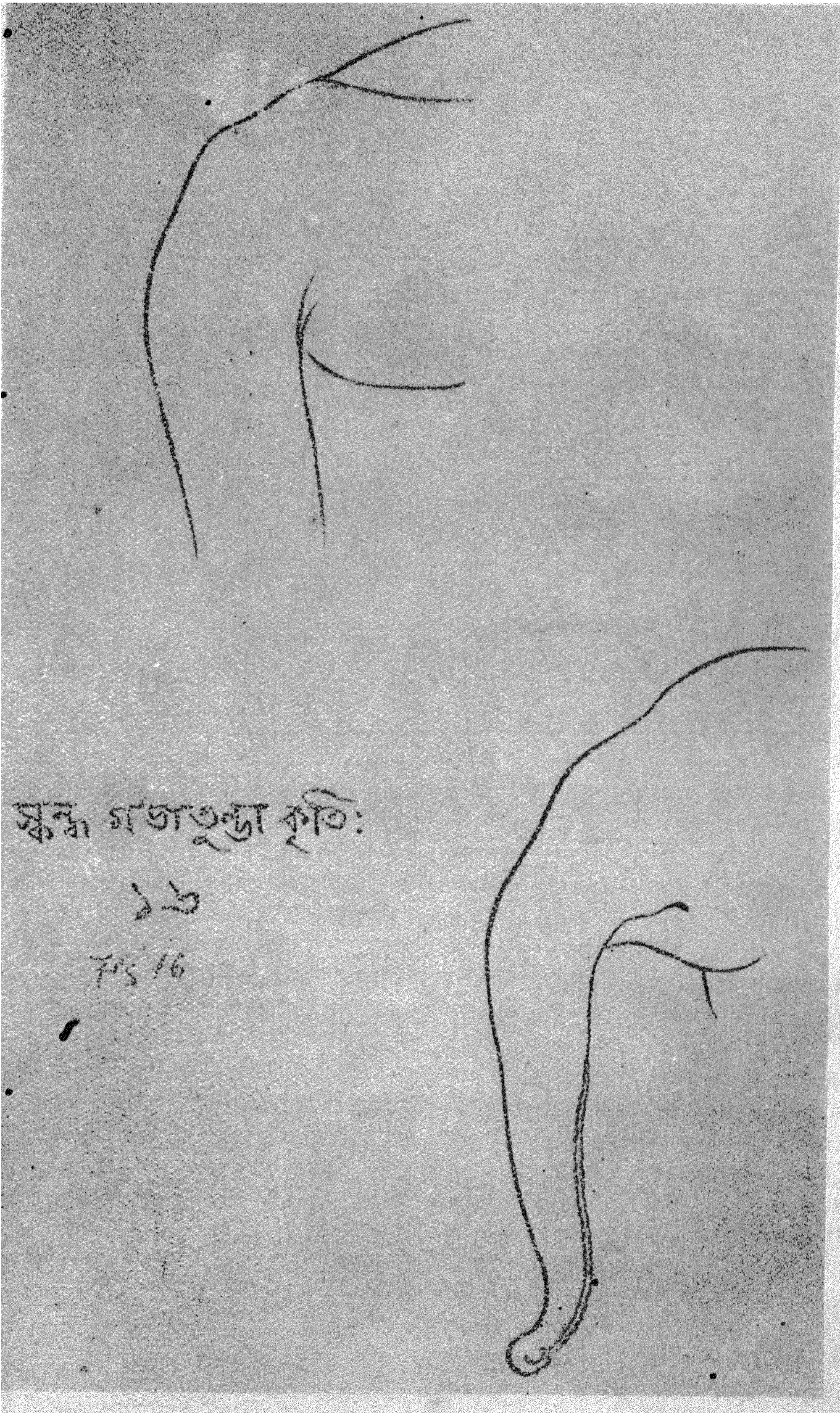
আমেরিকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাদ্রী শিকাগোর পাদ্রী ডীন সান্নারের প্ররোচনায় বহুপরিচয় হইয়াছেন যে চারিত্রগত সার্টিফিকেটের সহিত বিশ্বস্ত ডাক্তারের দেওয়া স্বাস্থ্যগত সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে তাহারা কোনো যুবক যুবতীর বিবাহ দিবেন না। রুগ্ন, নেশাখোর, নিবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি লোকের বিবাহ দিয়া পরিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ঘটাইবার অধিকার কাহারো নাই; পুরোহিতেরা ধর্ম্মের প্রহরী, তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কঠিন; অতএব তাহারা জানিয়া শুনিয়া পাপের প্রজন্ম আর দিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। অতএব এখন উভয় পক্ষের ইচ্ছা হইলেই বিবাহ হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—সমাজের কল্যাণের জন্ম ব্যক্তিগত সুখ বলি দিবার আহ্বান সভ্য সমাজে নিনাদিত হইতেছে। নিজেরা অক্ষম, অপটু, রুগ্ন, দুষ্কির ও দুষ্চরিত্র হইয়া সম্মানে সেই-সমস্ত দোষ সংক্রান্ত করিয়া সমাজ ও সংসারকে জ্বালাতন করার অধিকার কাহারো

নাই; সেরূপ সম্মানের পিতা মাতা অভিভাবকেরা যদি এই সোজা কথাটা না বুঝে তবে জোর করিয়া আইন করিয়া তাহাদিগকে বন্ধাইতে হইবে। আমেরিকার বহু ষ্টেটে আইনের ধসড়া পেশ হইয়াছে। কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিতেছেন এই বলিয়া যে, অনাগত ও অ-সম্ভব সম্মানের জন্ম মানুষ নিজে কেন কষ্ট করিতে যাইবে; বিবাহ করিলে সন্তান হইবেই, সন্তান হইলে সে বাঁচিবেই, এমন নিশ্চয়তা যখন নাই, তখন মানুষ নিজের জীবনকে বঞ্চিত করিবে কোন্ যুক্তিতে এবং বাহার সম্ভায়? জগতে মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন মৃত্যুর অনুরোগ রোগ প্রভৃতিও কেন না থাকিবে? সংসারে অপটু রুগ্ন আছে বলিয়াই দয়া, সহ্য, সেবা প্রভৃতি সদৃশ্যেরও বিকাশ লাভের অবকাশ আছে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে শ্রেষ্ঠ ও শুভবুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে অপটু শরীরেই—কোনো কুস্তিগির পালোয়ান এ পর্য্যন্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার বা প্রতিভার ত পরিচয় দেয় নাই।

### আকাশের সহিত অপরিচয় (Popular Astronomy)

আমরা নিত্য আশাদের মাথার উপর নক্ষত্রখচিত আকাশের বিচিত্র ছবি দেখি, কিন্তু কোনো দিন তাহার পরিচয় পাইবার জন্ম আমাদের ব্যগ্রতা হয় না। অত বড় সুন্দর জ্যোতিষ্কসভার সম্মুখে এমন বিরট উদাসীনতা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। শিক্ষিত লোকেরাও রাশিচক্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই চিনে না; খণ্ডশশী দেখিয়া তাহারা বলিতে পারে না উহা শুরু না কৃষ্ণপক্ষের, উদীয়মান না অস্তগামী চন্দ্রকলা; সূর্য্য যে প্রতিদিন আকাশে পথ বদলাইয়া চলিয়া চলিয়া এক সময়ে উত্তরে ও এক সময়ে দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে, এবং ইহার সহিত যে ষড়ঋতুপর্য্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এ খবর অনেকেই রাখে না। প্রত্যেককেই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে হইবে এমন কথা বলি না, কিন্তু খালি চোখে নিত্য যাহাদের আমরা দেখি, তাহাদের পরিচয় জানিবার উৎসুকতাহীনতা আমাদের মস্তিষ্কের ও মনের জড়তারই নামান্তর; সেই কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্মই জ্যোতিষ্কের পরিচয় লাভ করা উচিত। অনেকের বিশ্বাস যে দূরবীন ব্যতীত জ্যোতিষ্কপরিচয় হয় না; কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের মূলপত্তন হইয়াছিল দূরবীন আবিষ্কারের পূর্বেই। অনেকে মনে করে দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিলে আকাশের ছবি আরো চমৎকার জমকালো দেখায়; ইহাও ভুল—দূরবীন বিশেষ জ্যোতিষ্ককে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারই বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে। অতএব শুধু চোখেই আকাশের সহিত বেশ মোটামুটি পরিচয় হইয়া যাইতে পারে। জ্যোতিষ্কপরিচয়ে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই আছে; যে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী জড়িত হইয়া সেগুলিকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছে, তাহাদের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ে কাহার না আনন্দ হইবে? সেই আনন্দ সজ্ঞানে উপভোগ করার ফলে মন আনন্দময়ের আরতির প্রদীপের থালা আকাশটিকে বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণে জ্বলিতে দেখিয়া মুগ্ধ ও ভক্তিসন্নত হইতে শিখিবে।

চারু।

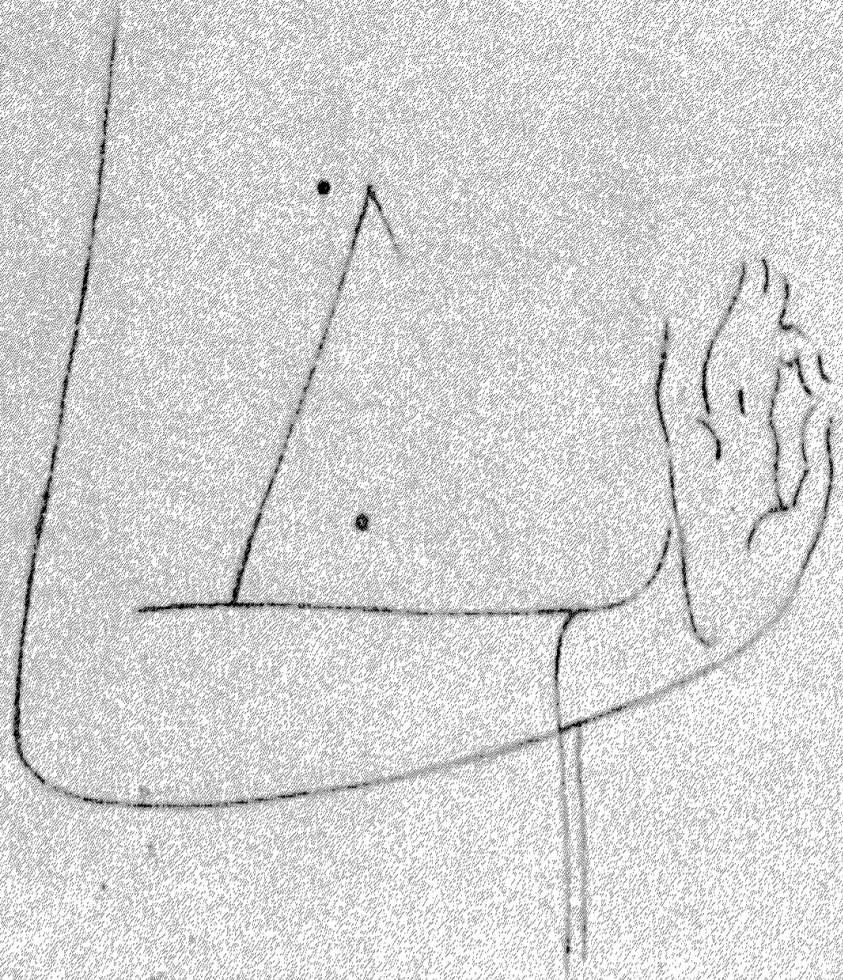


ସ୍ୱଳ୍ପ ଗତାତ୍ମକା କୃତି:

୧୭

୮/୧୬





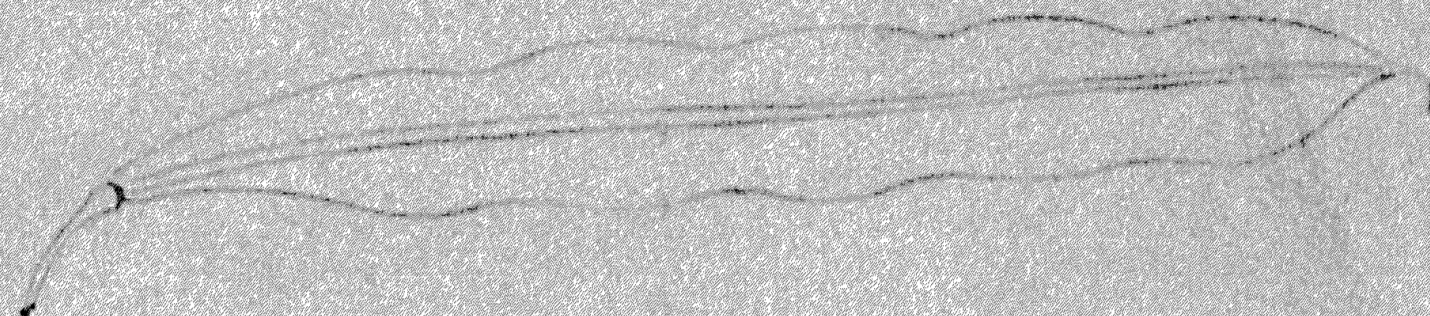
— बालकदली का तन्तु —



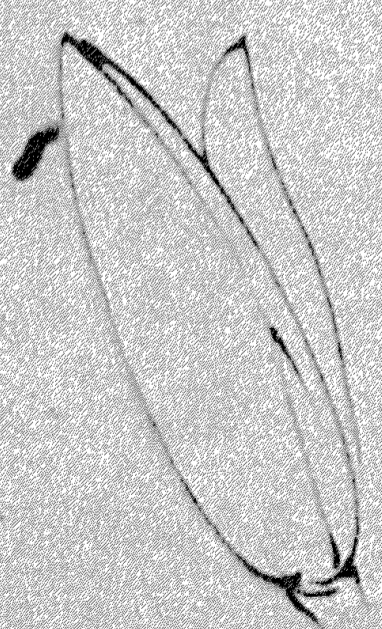
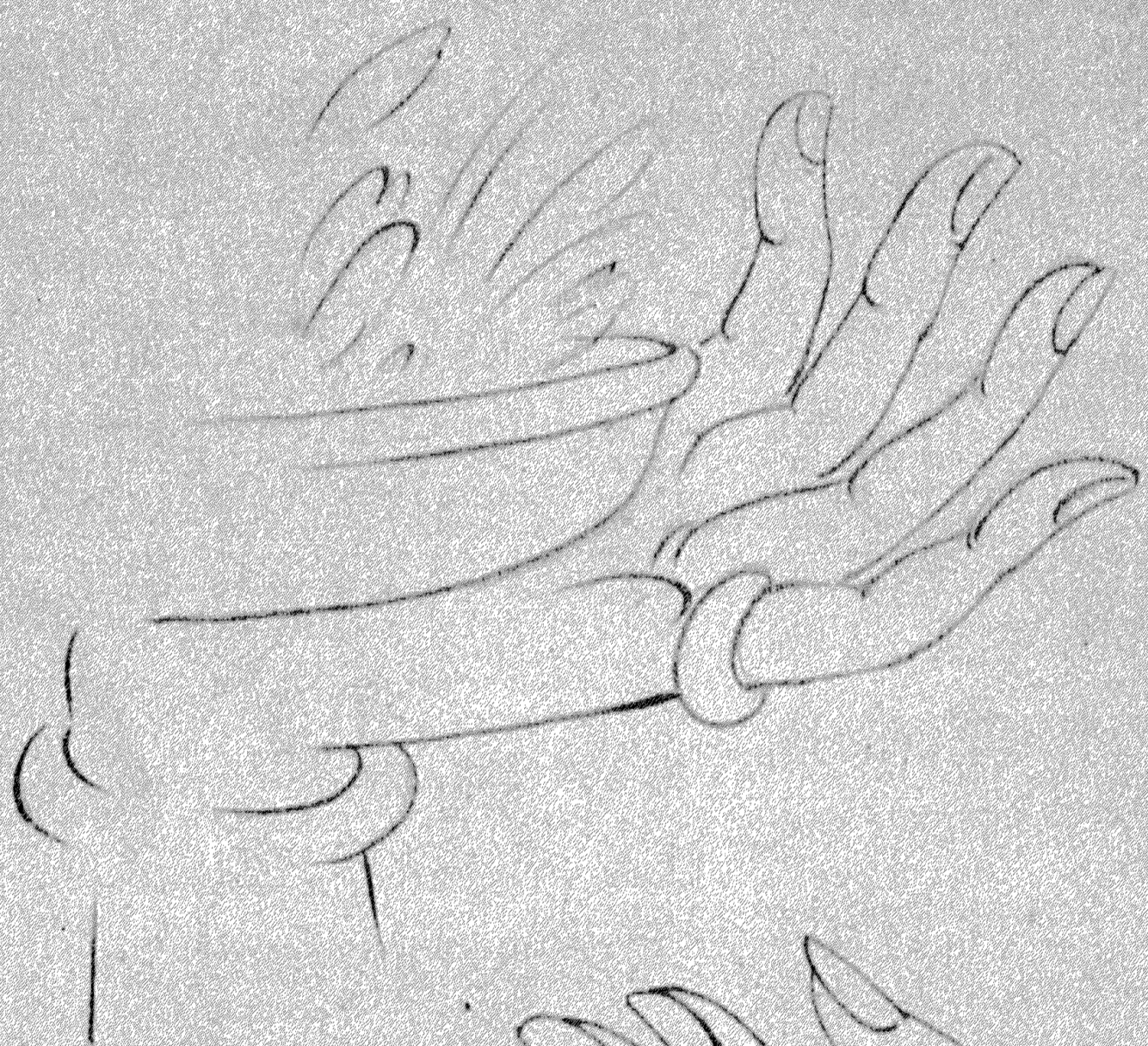




-सोरासोरा-



6  
-सोरा-



c  
-सोरासोरा-





## দানতত্ত্ব

আরোগ্যদান।

বিগুণ জলের অভাবে, স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মের অজ্ঞানতাবশতঃ, এবং সর্বোপরি সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও বিলাসের দরুণ, বঙ্গদেশে এখন রোগীর অসম্ভাব নাই। রোগ যাহাতে আদৌ না জন্মিতে পারে প্রথমে তাহাই কর্তব্য। উৎকৃষ্ট পানীয় জল ও বিদ্যা দান করিলে লোকের পীড়া কম হইবে। কিন্তু যাহাদের রোগ জন্মিয়াছে, তাহাদের জন্য দেশে বহুতর আরোগ্যশালা স্থাপিত হওয়া উচিত।

রোগীপরিচর্যা।

শাস্ত্রে রোগীপরিচর্যার বিশেষ প্রশংসা আছে (আপস্তম্ব ৬ ; যাজ্ঞবল্ক্য ১২০৯)।

ঔষধ পথ্যদান ও আরোগ্যশালা স্থাপন।

সংস্কৃত বলিয়াছেন

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।

যঃ প্রযচ্ছতি রোগিত্যঃ স ভবেদ্ব্যাধিবর্জিতঃ ॥ ৮৯

আনন্দাশ্রমের স্মৃতিসমুচ্চয় ৪১৬—৪১৭ পৃ।

যিনি রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য খাদ্য তৈল ঘৃত ও আশ্রয় স্থান দান করেন, তাহার ব্যারাম হয় না।

কুর্শ্মপুরাণে (২.২৬।৫০) ও সংবর্ত্তস্মৃতিতে (৫৮) আছে

ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিনাং রোগশান্তয়ে।

দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥

রোগীদের আরোগ্যের জন্য যিনি ঔষধ, পথ্য, তৈল, ঘৃতাদি দান করেন, তিনি নীরোগ, সুখী হইয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকেন।

পরশর বলিয়াছেন (বৃহৎ পরশর জীবা ৮ অধ্যায়, বোধাই ১০ অধ্যায়)

রোগার্ভসৌষধং পথ্যং যো দদাতি নরশ্চ তু।

অন্যশ্চাপি চ কস্যাপি প্রাণদঃ স তু মানবঃ ॥

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো চতুর্ভুজঃ।

যো দদ্যান্নধুরাং নাচং আশ্বাসনকরীমৃতাম্।

রোগক্ষুধাদিনার্ভস্য স গোমেধফলং লভেৎ ॥

যিনি মনুষ্য বা অন্য কোন জন্তুর রোগপ্রতীকারের জন্য ঔষধ পথ্য দান করেন, তিনি প্রাণদাতা, তিনি বিষ্ণু-

লোকে গমন করেন। যিনি রোগার্ভ বা ক্ষুধিতকে মধুর আশ্বাস বাকা বলেন, তিনি গোমেধের ফল লাভ করেন।

নন্দিপুত্রাণে আছে—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং সাধনং যতঃ।

অতস্বারোগাদানেন নরো ভবতি সর্বদঃ ॥

আরোগ্যশালাং কুর্স্বীত মহৌষধি পরিচ্ছদাম্।

বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ঘৃতান্নমধুসংযুতাম্ ॥

বৈদ্যস্ত শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো দৃষ্টৌষধিপরাংপরঃ।

ওষধিমূলপর্ণজ্ঞঃ সমুদ্ররণকালবিৎ ॥

আরোগ্যশালামেবং তু কুর্গ্যাৎ যো ধর্মসংশ্রয়ঃ।

স পুমান্ ধার্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্ ॥

সমাগারোগ্যশালায়ামৌষধেঃ স্নেহপাচনৈঃ।

বাধিতং নীরুজীকৃত্য অপোকং করুণায়ুতঃ।

প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ ॥

অপরাক ১৩৬৫—৩৬৬ পৃ।

আরোগ্য, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ভুগের উপায়। অতএব আরোগ্যদান করিলে, সর্বদানের ফল হয়। আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়া উহাতে ভাল ভাল ঔষধ এবং ঘৃত, অন্ন ও মধুর ব্যবস্থা করিবে। ঐ আরোগ্যশালায় সুপণ্ডিত বৈদ্য নিযুক্ত করিবে। বৈদ্য বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং ঔষধগুলির সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিবে। ওষধি, মূল ও পাতার বিষয় অবগত থাকিবেন এবং কোন্ ঔষধি কিরূপে সংগ্রহ করিতে হয় তাহাও তাহার জ্ঞান থাকিবে। [ এই স্থানে ভাল চিকিৎসকের গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উদ্ধার ও অনুবাদ করিলাম না। ] যিনি ধর্মবুদ্ধিতে \* এইরূপ আরোগ্যশালা স্থাপন করেন, তিনিই এই পৃথিবীতে ধার্মিক, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই কৃতকৃত্য। দয়ালু ব্যক্তি \* আরোগ্যশালাতে ঔষধ পাচন তৈল প্রভৃতির সাহায্যে একটা রোগীকেও সম্যক্ রোগমুক্ত করিতে পারিলে, তাহার ফলে সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

\* ধর্মবুদ্ধিতে এবং দয়াবশত আরোগ্যশালা স্থাপন করিলে এই মহাপুণ্য হয়। অন্য নিকট উদ্দেশে আরোগ্যশালা স্থাপন করিলে, এত বেশী পুণ্য হয় না সত্য কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট পুণ্য ও নাম আছে।



দেশীয় ধনীরা রাজপুরুষদিগের কৃপালাভের আশায় এলোপাথিক আরোগ্যশালায় জন্ম দান করেন।

আজকাল অনেকে আরোগ্যশালা স্থাপনের জন্ম টাকা দিতেছেন। সমাজে যঁাহারা ধনবান্, তাঁহারা যে নিধন-দের চিকিৎসার জন্ম অর্থব্যয় করেন, ইহা বড়ই সুপের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়েও একটু বক্তব্য আছে। বহুলোকে এলোপাথিক আরোগ্যশালা স্থাপনের জন্ম দান করেন, কিন্তু কেহই কবিরাজী আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট নহেন।

কবিরাজীর উপযোগিতা।

কেবল কলিকাতায় সুগৃহীতনামা ৩দিগদর মিত্রের বাড়ীতে একটা কবিরাজী দাতব্য ঔষধালয় ও একজন ব্যবস্থাপক চিকিৎসক আছেন মাত্র। \* লোকে যদি কবিরাজী চিকিৎসায় বিশ্বাস না করিতেন, যদি ডাক্তারীকে কবিরাজী হইতে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ইহা কোনও পরিতাপের কারণ হইত না। ধনীরা এখনও কবিরাজীর আদর করেন, এবং নিজেদের পীড়া হইলে, এখনও কবিরাজের খুবই ডাক হয়। কলিকাতায় চারি পাঁচজন এল্-এম্-এস্ ও এম্-বি-পাশ ডাক্তার কবিরাজী করিতেছেন। ইহাও কবিরাজীর উপযোগিতার অল্পতম প্রমাণ। কলিকাতার কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় চিকিৎসার্থে নেপালে নীত হইয়াছেন। তদীয় পিতা সুপণ্ডিত ও প্রবীণ ৩মহা-মহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহোদয়কে ভারতের বহু করদ মিত্র রাজারা নিজেদের চিকিৎসার জন্ম স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিতেন। এই সে দিন ৩ মহা-মহোপাধ্যায় বিজয়রত্নের কাশ্মীরে ডাক হইয়াছিল। আজ এক বৎসর হইল বাঙ্গালী কবিরাজ ধীমান্ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এল্-এম্-এস্ এলাহাবাদে এক কবিরাজী-সভার সভাপতি রূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় কৃতী কবিরাজের অভাব নাই। তবে বাঙ্গালায় কবিরাজী আরোগ্যশালা স্থাপিত হয় না কেন? ইহার কারণ খুব সোজা। রাজপুরুষেরা অনেকেই এলোপাথিক চিকিৎ-

সার ভক্ত। তাঁহারা এ বিষয়েও স্বদেশী। কাজেই এলোপাথিক আরোগ্যশালায় জন্ম দান করিলে, তাঁহাদের প্রিয় হওয়া যায়, সরকারি গেজেটে নাম ছাপা হয়, আর অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয়, তবে একটা 'রায় বাহাদুর' বা 'রায় সাহেব'ও বক্‌সিস্ মিলিতে পারে।

কবিরাজী বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা স্থাপন বাঙ্গালীর অবশ্যকর্তব্য।

আরোগ্যদানের মধ্যে লুক্কায়িত সাহেব-প্রীণনের চেষ্টা বাঙ্গালীর আরোগ্যদানকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালায় যতদিন কবিরাজী বিদ্যালয় ও কবিরাজী আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর আরোগ্যদান পূর্ণাঙ্গ হইবে না। এ বিষয়ে আরও দুইটি গুরুতর কথা আছে।

অধুনা কবিরাজী বাঙ্গালীর নিজস্ব।

১। কবিরাজীটা আজকাল বাঙ্গালীর নিজস্ব বিদ্যা। বাঙ্গালীর নব্যন্যায় নব্যস্বৃতি যাইতে বসিয়াছে, হয়ত তাহাতে দেশের তত ক্ষতি হইবে না। কিন্তু কবিরাজী গেলে, বাঙ্গালার প্রভূত অনিষ্ট হইবে। বাঙ্গালী যে-সকলের জন্ম সমগ্র ভারতে বিখ্যাত, কবিরাজী বিদ্যা তাহাদের অল্পতম। ইহার দুর্দশায় বাঙ্গালীর গৌরবের হানি হইবে। বাঙ্গালার গৌরবের জন্ম, ভারতের স্বাস্থ্যের জন্ম, স্বদেশীয়তার জন্ম কবিরাজীর রক্ষা ও বর্দ্ধন অত্যাশুক।

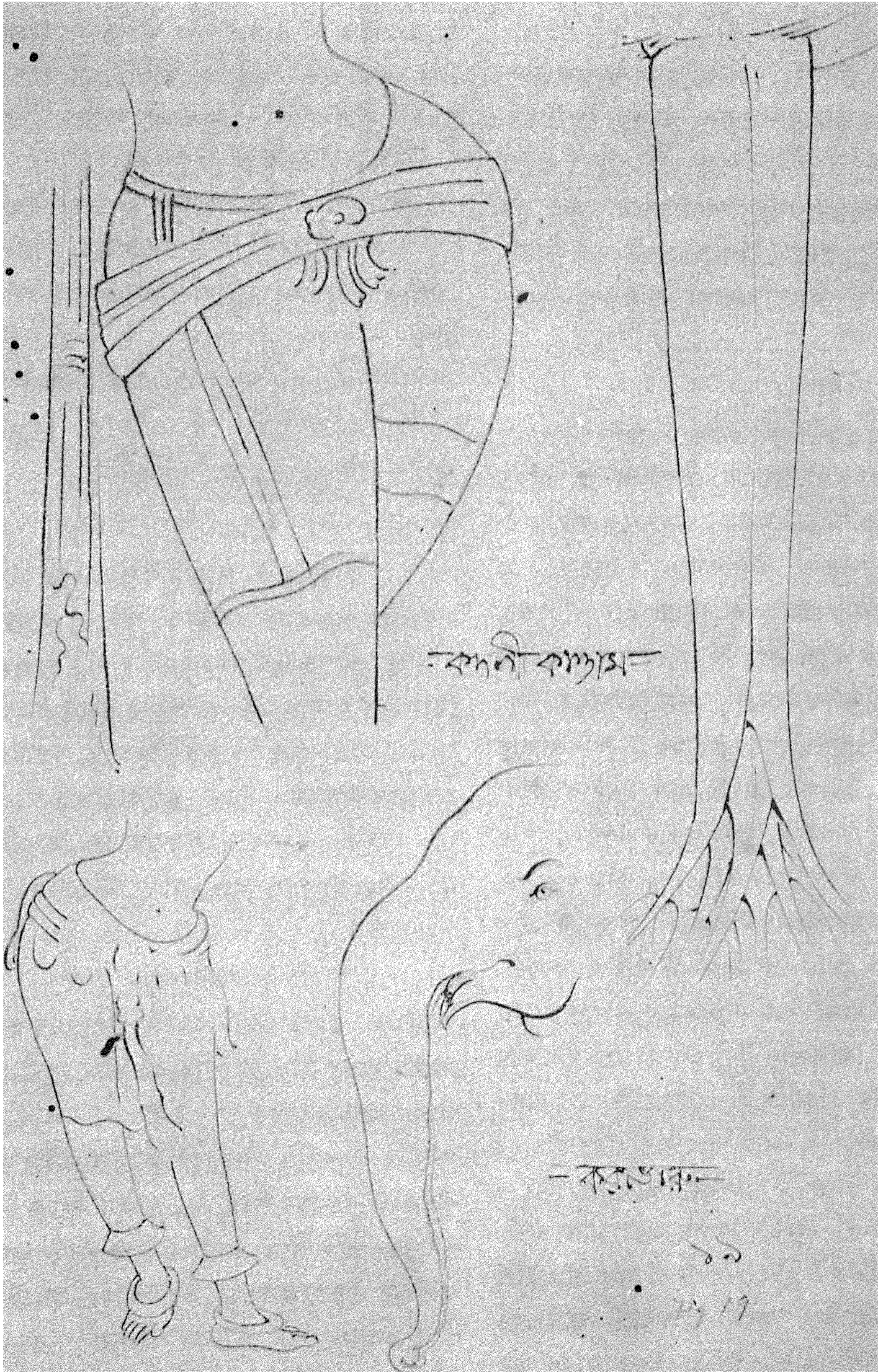
কবিরাজীর হ্রাসে স্বদেশী ব্যবসায়ের হ্রাস।

(২) কবিরাজী চিকিৎসাপ্রণালী দেশ হইতে উঠিয়া গেলে, দেশের স্বাস্থ্য ও গৌরবের হানি তো হইবেই, তা ছাড়া দেশের অর্থেরও হানি হইবে। কবিরাজী চিকিৎসার ঔষধাদি যাবতীয় উপকরণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশীয় পরিশ্রমে, স্বদেশীয় অর্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কবিরাজীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের আর একটা মস্ত লাভজনক কারবার উঠিয়া যাইবে। তখন আমরা হাহাকার করিব! কিন্তু এখনও সময় আছে। একবার কোনও ব্যবসা উঠিয়া গেলে, উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠানে প্রাণান্ত হয়। বঙ্গের বঙ্গনির্মাণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

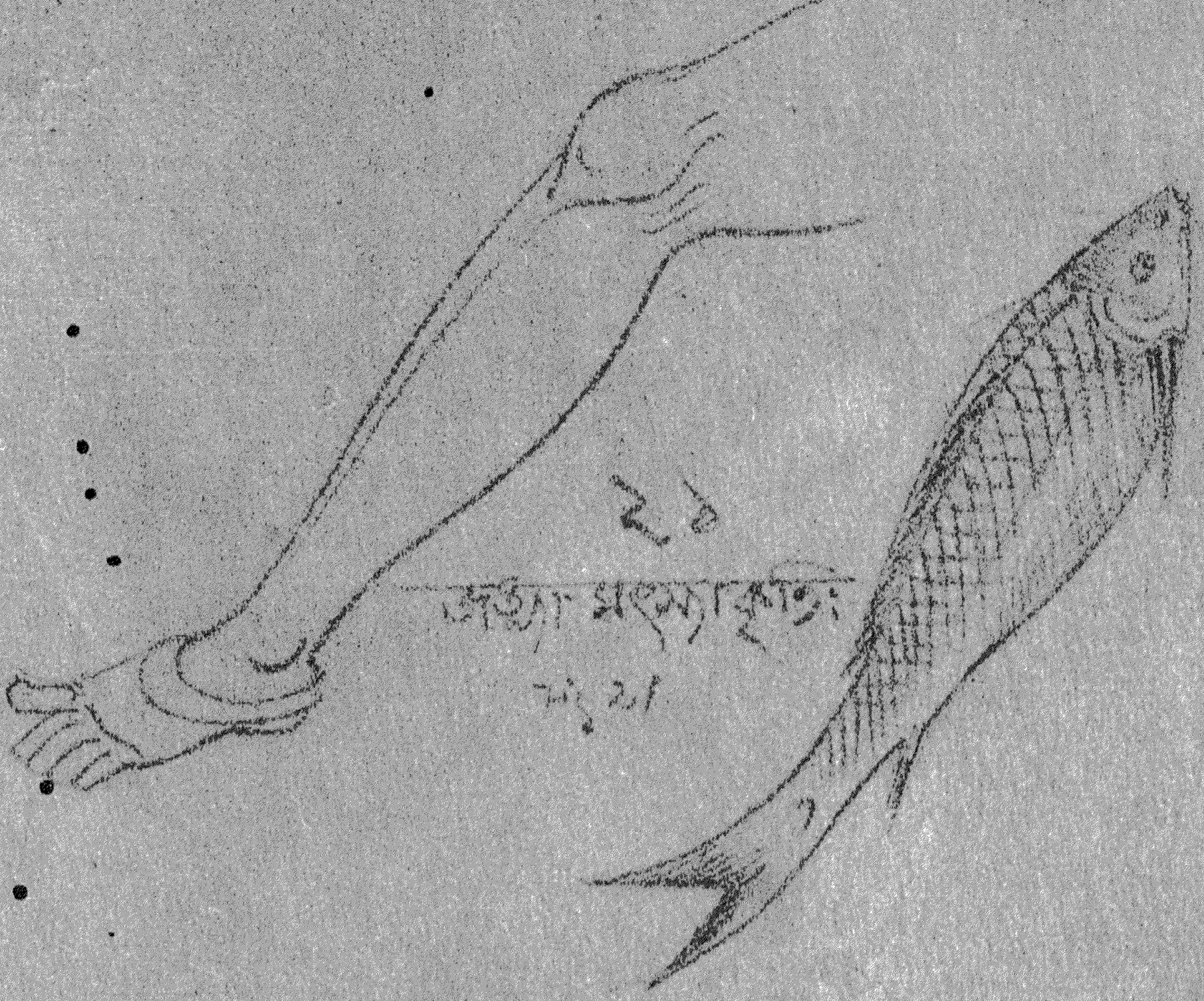
শ্রদ্ধা বা ভালবাসার সহিত দান করিবে।

\* মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন—

\* ৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চুঁচুড়ার বাড়ীতেও কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।—সম্পাদক।



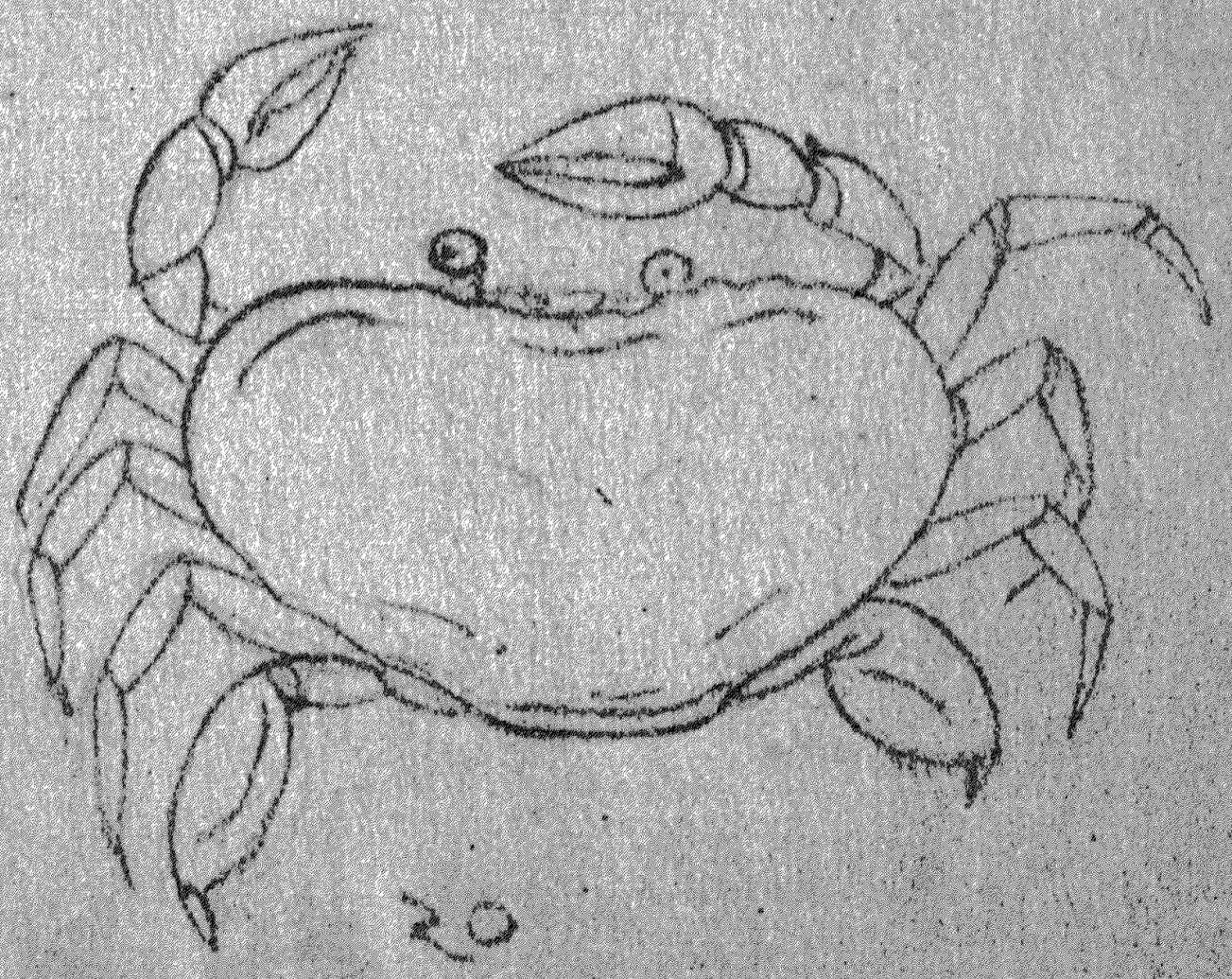
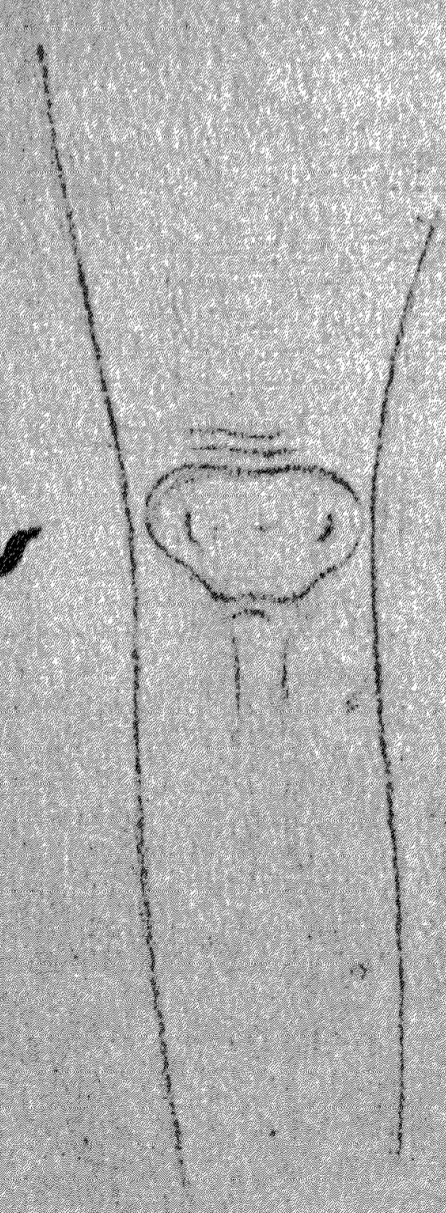




२०

श्रीगुरुभ्यो नमः

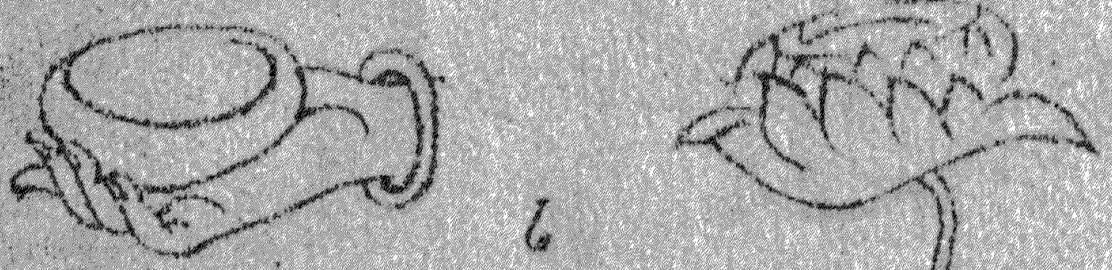
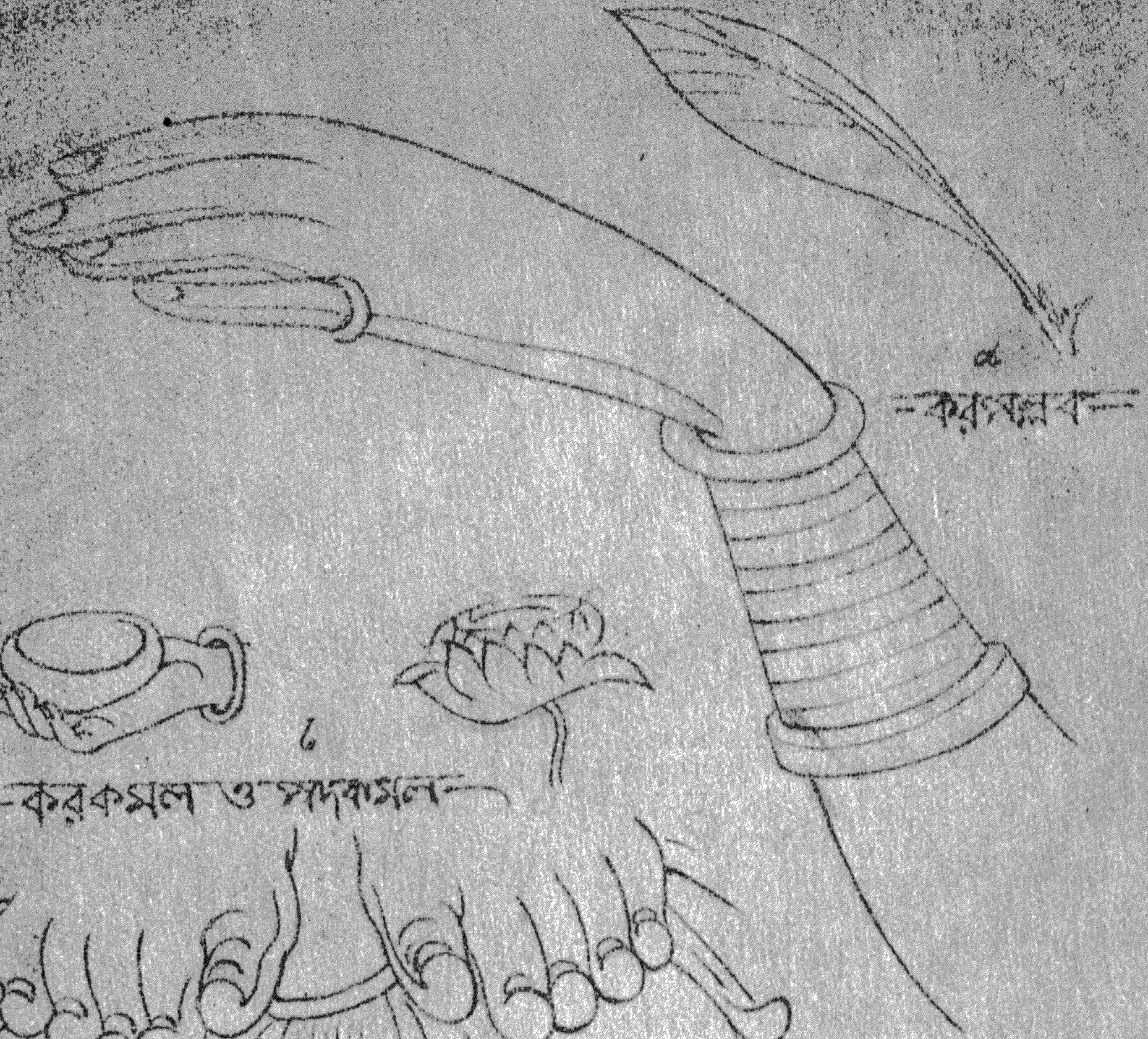
२०



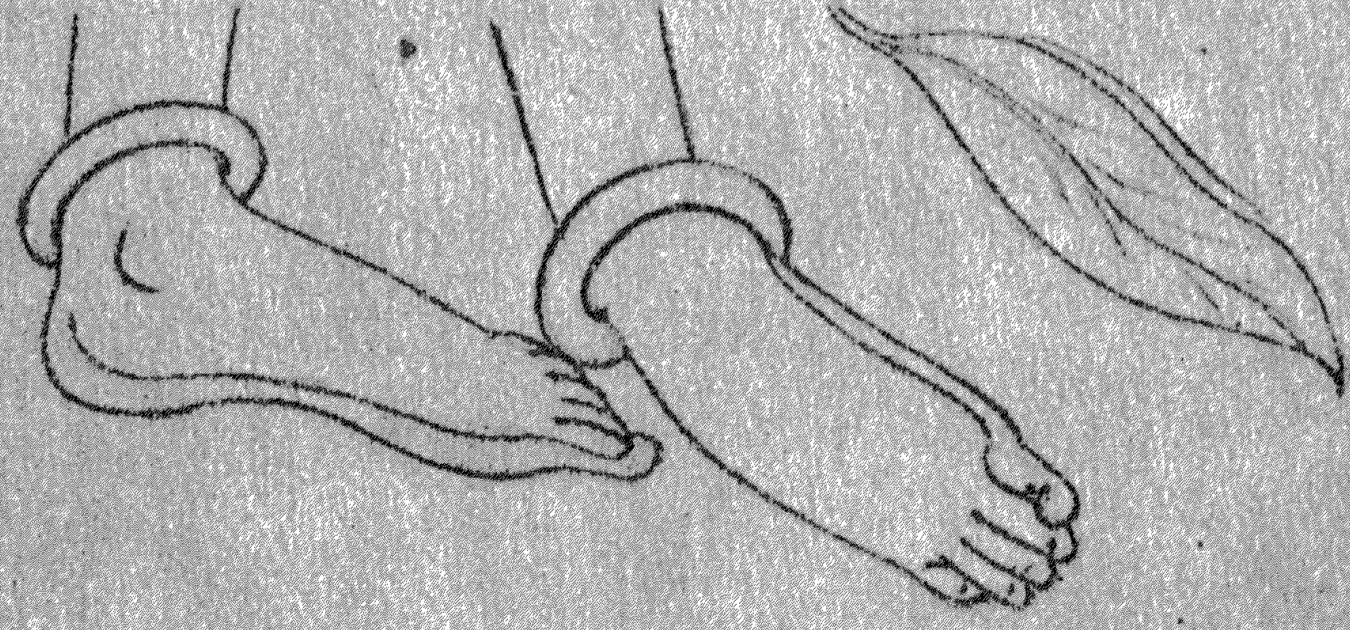
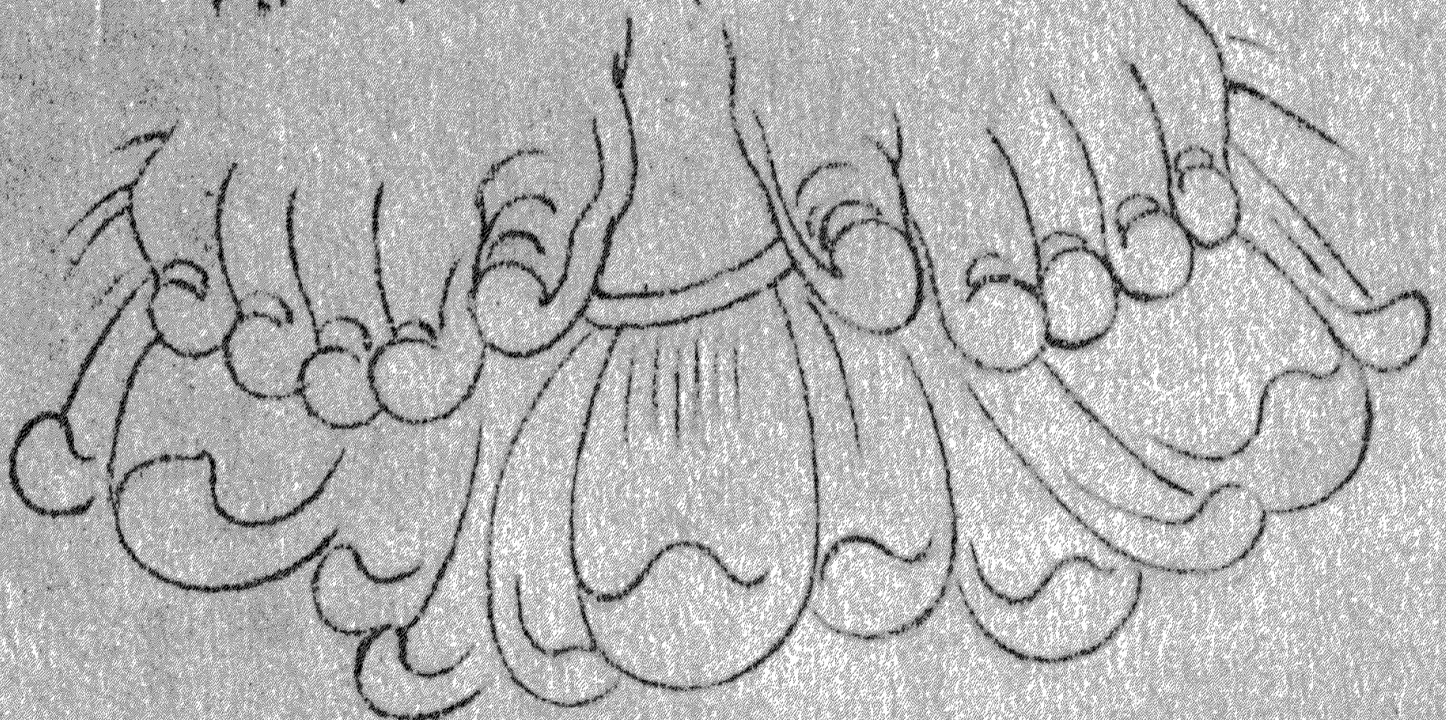
२०

श्रीगुरुभ्यो नमः





করকমল ও সাদাকমল



সাদাকমল



নাশ্বং বা বহুং বা দানশ্চাত্ত্যাদিয়াবহম্ ।  
শ্রদ্ধাশক্তিঞ্চ দানানাং বুদ্ধিক্ষয়করে হি তে ॥  
অপরাক ১২৮৭, পরাশরভাষ্য ১১৭৯ ।

অল্পমূল্যের জিনিস দানেই অল্প পুণ্য হয়, আর বহু-  
মূল্যের জিনিস দানেই বহু পুণ্য হয়, এরূপ নহে। ভাল-  
বাসা ও শক্তির পরিমাণ দ্বারাই দানপুণ্যের তারতম্য  
হইয়া থাকে। ভাল বাসিয়া, অল্পের কষ্টকে নিজের মনে  
করিয়া, যে দান করা যায়, তাহাই প্রকৃত দান। আমা-  
দের শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষা

কর্তব্য। “সর্বভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী” ।

বিষ্ণুপুরাণ ১১২৯৯ ।

লজ্জায় ভয়ে বা লোভে দান করিলেও পুণ্য হয় ।

সর্বভূতে অব্যভিচারী ভক্তি বা অবিচলিত ভালবাসা  
করিবে। এই ভক্তিপূত দানই শ্রেষ্ঠ দান। ম্যাজিষ্ট্রেটের  
ভয়ে, লজ্জায় বা বকসিসের আশায় যে দান করা যায়,  
তাহাতেও পুণ্য হয়, কিন্তু তত না। শাস্ত্রে আছে—

সংসদি ত্রীড়য়াশ্রত্য যোহর্থোহর্থিভ্যঃ প্রযাচিতঃ ।

প্রদীয়তে চেত্তদানং ত্রীড়াদানমিতি স্মৃতম্ ॥

আক্রোশানর্থহিংসানাং প্রতীকারায় যত্তয়াৎ ।

দীয়তে তাপকর্তৃত্যো ভয়দানং তদুচ্যতে ॥

অপরাক ১২৮৮ ; পরাশরভাষ্য ১১৮০ ।

সভার মধ্যে লজ্জার খাতিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে দান  
দেওয়া যায়, তাহার নাম ত্রীড়া- বা লজ্জা-দান। নিন্দা,  
সাংসারিক ক্ষতি বা হিংসার প্রতীকারের জন্ত, তাপকারী-  
দিগকে যা দেওয়া যায়, তাহা ভয়-দান। মহাভারতের  
অনুশাসন পর্বে ধর্মদান, অর্থদান, কামদান, ভয়দান ও  
কারুণ্যদান, এই পাঁচ প্রকার দানের উল্লেখ করিয়া বলা  
হইয়াছে—

ইতি পঞ্চবিধং দানং পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্ধনম্ ।

যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যমেবমাহ প্রজ্ঞাপতিঃ ॥

মহা ১৩১৩৮১১ বা ২০১১১ ।

এই পাঁচ রকম দানে পুণ্য ও কীর্ত্তি বাড়ে। প্রজ্ঞাপতি  
বলিয়াছেন যথাশক্তি এই পাঁচ রকম দানই করিবে।  
অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে বা উপাধি-লিপ্সায় যে দান  
হইতেছে, তাহাতেও পুণ্য আছে এবং যাহারা নিকৃষ্ট

অধিকারী, তাঁহাদের অগত্যা এইরূপ দানই কর্তব্য। আর  
যে-সকল রাজকর্মচারী উপাধির লোভ দেখাইয়া বা ভয়-  
প্রদর্শন করিয়া রূপণ ধনীদিগের টাকা সংকাজে লাগাই-  
তেছেন, শাস্ত্রে তাঁহাদেরও প্রশংসা আছে।

যোহসাধুভ্যোহর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ।

স কৃত্বা প্ৰবমাআনং সন্তারয়তি তাবুভৌ ॥

মহু ১১১৯ ; মহাভারত ১২১৩২১৪ ।

যিনি অসাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সাধুদিগকে  
দেন, তিনি উহাদের উভয়েরই উপকারক, ( কেন না  
একের পুণ্য, অল্পের জীবন রক্ষা হয় ) ।

শাস্ত্রে অন্নদান, ভূমিদান, গোদান, বস্ত্রদান প্রভৃতিরও  
ভূরি প্রশংসা আছে। এ-সকল কথা আমাদের দেশের  
আপামর সকলেই জানেন, কাজেই উহাদের বিশেষ  
আলোচনা করা গেল না। ধ্রুব জলদান, ধ্রুব বিদ্যাদান ও  
ধ্রুব আরোগ্যদানের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই  
এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের  
বিধি বর্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

দানের উদ্দেশ্য।

দানের প্রধান উদ্দেশ্য ভূতহিত। দাতা ভূতহিতে  
রতঃ। প্রতিগ্রহদানে সমাজের শিক্ষক ও যাজকদিগের  
পালনের উত্তম ব্যবস্থা আছে। ভরণ-দানের উদ্দেশ্য নির্ধন-  
দিগের জীবিকার ব্যবস্থা। আরোগ্যশালাস্থাপন, উপাধ্যায়-  
নিয়োগ, জলাশয়খনন প্রভৃতি সকলই প্রধানত ভরণ-  
দান ; উহাদের দ্বারা সমাজের, বিশেষত গরীবের, উপ-  
কার হইয়া থাকে। দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ নিবারণই দানের  
মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশে যাহাতে দরিদ্র না থাকে সর্বাত্রে  
তাহাই কর্তব্য। হিন্দুসমাজে প্রকৃত দরিদ্র সেকালে প্রায়  
ছিল না। লোকের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অপ্রতুল  
হইত না। লোকে সন্তুষ্ট ছিল ; বিলাসের উপকরণ  
তখন জীবনের আবশ্যিক জিনিস বলিয়া গণ্য হইত না।  
এখন সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন দরিদ্রের সংখ্যাও  
বাড়িয়াছে, ধনীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এই দারিদ্র্যের  
ও বৈষম্যের সমূল উচ্ছেদ আমাদের আদর্শ। উৎপন্ন  
হুঃখের প্রতীকার দ্বারা পুণ্য উপার্জনের চেষ্টা না করিয়া,  
হুঃখ যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।



যাহাতে লোকের রোগ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য শত বন্দোবস্ত করিলেও রোগের নিরবশেষ বিনাশ বর্তমান সময়ে হইবে না। হয় ত ভবিষ্যৎ সত্যযুগে তাহাও হইবে। কিন্তু রোগোৎপত্তি কমান এখনও খুবই সম্ভব। পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বায়ু ও বিশুদ্ধ জল যদি সুলভ হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম, এবং সাধারণ সংযম যদি সমাজে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে যে রোগের উৎপত্তি কম হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই-সকল পূর্বে সেদিনও অনেকটা ছিল। যুরোপীয়েরা ক্রমে ইহা-দিগকে আয়ত্ত করিতেছেন, তাই তাঁহাদের দেশে রোগ কমিয়া আসিতেছে, এবং সাধারণের পরমায়ু বাড়িয়া যাইতেছে। তথায় লোকেরা শয়ান হইয়া থাকে না, তথায় কলি নাই। শাস্ত্রে বলে কলিঃ শয়ানো ভবতি। আমরা শুইয়া আছি, এবং কলির প্রভাবে আমাদের আয়ু বিস্ত বুদ্ধি উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের উঠিতে হইবে, উঠিয়া বেড়াইতে হইবে। তবেই সত্য ফিরিবে। শাস্ত্রে বলে সত্যং সম্পদ্যতে চরন্। অতএব যাহাতে সমাজে দারিদ্র্য দুঃখ না থাকে, তজ্জন্ম আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ভিক্ষাবৃত্তি তুলিয়া দেওয়া আমাদের আদর্শ।

ভিক্ষুক আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সমাজে ভিক্ষাজীবী লোক থাকিবেন কেন? লোকে কেন চুরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হইবেন? নিদানের উচ্ছেদই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা। ভিক্ষাজীবী আসিলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এবং পুণ্যকর্ম করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চোর ধরা পড়িলেন, তাঁহাকে জেলে দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এইরূপ উদাসীনতা মহাপাপ। কোন্ সম্বন্ধে আমার গাড়ী ঘোড়া আছে, আর আমার প্রতিবেশীর উদরে অন্ন নাই, অন্নে বস্ত্র নাই? আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ভিক্ষাজীবী যাহাতে না থাকে, এমন করিয়া দান করিবে। ভিক্ষাজীবীরা নিজে কত কষ্ট পান, এবং অপরের কষ্টের কারণ হইয়া থাকেন। মহাভারতে আছে—

উদ্বৈজয়ন্তি যাচন্তি সদা ভূতানি দস্যুবৎ ।

অনুশাসনপর্ব ৬০।৪ ।

যাঁহারা সর্বদা ভিক্ষা চান, তাঁহারা দস্যুর মত লোকের উদ্বৈগের কারণ হইয়া থাকেন।

কুর্শ্বপুরাণে আছে ( ২।২৬।৭১ )—

যন্ত শ্চাদ্ যাচকো নিত্যং ন স স্বর্গশ্চ ভাজনম্ ।

উদ্বৈজয়তি ভূতানি যথা চৌরশ্চৈব সঃ ॥

যিনি রোজ ভিক্ষা করেন তিনি স্বর্গভাগী হন না। তিনি চোরেরই মতন প্রাণীদের উদ্বৈগকারণ হইয়া থাকেন।

এ কথা অতি সত্য। পৃথিবীর দুঃখভারের লাঘব করাই দানের উদ্দেশ্য, আত্মপ্রসাদ তাহার আনুষ্ঠানিক ফল। অবশ্য বৃত্তিক্রম ভিক্ষুক আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিতেই হইবে, কিন্তু যাহাতে লোকের ভিক্ষাকেই বৃত্তি বলিয়া অবলম্বন করিতে না হয়, তজ্জন্ম আমাদের বন্ধপরিকর হওয়া উচিত। “যাচিতেনাপি দাতব্যম্”—এই সূত্রাংশের উপরিতন ব্যাখ্যা দেখুন।

গরীবেরও দান কর্তব্য।

শাস্ত্রে বলে দান সকলেরই কর্তব্য, ধনীও কর্তব্য, নিধনেরও কর্তব্য, শূদ্রেরও কর্তব্য।

সর্বেষাং সত্যম্ অক্রোধো দানম্ অহিংসা প্রজননম্ চ ।  
বসিষ্ঠস্মৃতি ৪।৪ ।

সত্য, অক্রোধ, দান, অহিংসা ও স্মৃতোৎপত্তি—ইহারা সকলেরই কর্তব্য।

গ্রাসাদর্কমপি গ্রাসমর্ষিত্যঃ কিং ন দীয়তে ।

ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কশ্চ ভবিষ্যতি ॥

বেদব্যাসস্মৃতি ৪।২৪ ।

তোমার একগ্রাস থাকিলে, তাহার আধগ্রাস যাচককে দেও না কেন? ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি হইলে দান করিব এই মনে করিয়া দানধর্ম বন্ধ রাখিও না, কেননা আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। যিনি পরদুঃখে দুঃখী তিনি একগ্রাস হইতেও আধগ্রাস বিলাইয়া দেন, আর যাঁহারা ধনকামী, তাঁহারা কুবেরের ভাণ্ডার লাভ করিলেও কৃপণই থাকিয়া যান। টাকা জমানই যে নিন্দনীয় তাহা নহে, কিন্তু নিজের পারিবারিক উন্নতির জন্ম সঞ্চয় করা শ্রেয়স্কর নহে। টাকা জমাইয়া ভূদেব বা তারকনাথের মতন দান করিলে, তবেই উহা সার্থক হয়। অতএব এখন যাঁহারা যাহা আছে, তাহা হইতেই কিছু কিছু রোজ দান করা বিধেয়। শাস্ত্রে বলে—

দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ ।

যাচিত্তেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি ১।২০৩।

প্রত্যহ উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে। বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ দান করিবে। কেহ যাচঞা করিলে, তাঁহাকে দান করিবে। যথাশক্তি দান করিবে। • শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিবে। এটা দানসূত্র। ব্যাখ্যা করিতেছি।

• প্রত্যহ দান করিবে।

( ১ ) দাতব্যং প্রত্যহম্—প্রত্যহ দান করিবে। দানের অভ্যাস করিবে। পুণ্যের অভ্যাস করিতে করিতে লোক পুণ্যাত্মা, এবং পাপের অভ্যাস করিতে করিতে লোক পাপাত্মা হইয়া যায়। একটা পুণ্যকাজ ভবিষ্যতে আর একটা পুণ্যকাজকে সহজ করিয়া দেয়। ইহাই বুঝিবার জ্ঞান শ্রুতি বলিয়াছেন—

পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ।

বড় কাজ ভবিষ্যতে করিবার আশায় রাখিয়া দিলে চলিবে না। রোজ কিছু কিছু ভাল কাজ করিতে হইবে। শেষে এমন সময় আসিবে যখন মন্দ কাজ করার শক্তিই কমিয়া যাইবে—শত প্রলোভনে, শত নিস্পীড়নেও মন ভাল হইতে বিচলিত হইবে না, অভ্যাস আমাদিগকে জোর করিয়া ভাল কাজ করাইবে। অত্রিসংহিতায়

( ৪০ শ্লোক ) উক্ত হইয়াছে

অহন্যহনি দর্শিতব্যমদীনেনাস্তুরাশ্বনা ।

• স্তোকাঙ্গপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে ॥

রোজ রোজ প্রসন্নমনে যত্নপূর্বক কিছু-না-কিছু—যতই অল্প হউক না কেন— দান করিবে।

পাত্রে দান করিবে। অপাত্রে দান নিষেধ। দানের পাত্র কাহারো ?

( ২ ) দাতব্যং পাত্রে—পাত্রে দান করিবে। অপাত্রে দানে পাপ আছে। হাত পাতিলেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বিধি হিন্দুশাস্ত্রে নাই অন্নবস্ত্রহীনকে অন্নবস্ত্র অবশ্য দিবে ; সে পাপী হইলেও দিবে। কিন্তু বিলাসের বা পাপের উপকরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ষাঁহারা যাচঞা করেন ; তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ দান দিলে ঘোর

পাপ হয়। ভরণ-দানের পাত্রও তাঁহারা নহেন। প্রকৃত গরীব এবং পঙ্গু অন্ধ কধির প্রভৃতিই ভরণ-দানের পাত্র। অতএব ষাঁহাদের অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই, ষাঁহারা মাত্র বিলাসের জ্ঞান ভিক্ষুক, তাঁহাদিগকে মোটেই ভিক্ষা দিবে না। পূর্বে এ বিষয়ে অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন প্রতিগ্রহ-দান ও ভরণ-দান এই উভয়ের উপযুক্ত কতকগুলি পাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

দস্যুর উপদ্রবে ও দেশবিপ্লবে দান ।

কৃতসর্কস্বহরণা নির্দোষাঃ প্রভবিষ্ণুভিঃ ।

স্পৃহয়ন্তি স্মৃগুপ্তানাং তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥

মহাভারত ১৩।২৩।৫৭ ।

হতস্বা হৃতদারাশ্চ যে বিপ্রা দেশবিপ্লবে ।

অর্থার্থমুপগচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥

মহাভারত ১৩।২৩।৫৮, অপার্ক ১।৩৮৩ পৃষ্ঠা । বলবান্ ব্যক্তির যদি নির্দোষ ব্যক্তির সর্কস্ব হরণ করিয়া লয়, তবে তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাপুণ্য হয়। দেশ-বিপ্লবে ষাঁহাদের অর্থদারাদি অপহৃত হয়, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল হয়।

প্রকৃত গরীব ও বিপন্নকে দান ।

দক্ষ বলিয়াছেন ( ৩।৩০ )

ব্যসনাপদূর্ণার্থঞ্চ কুটূর্ণার্থঞ্চ যাচতে ।

এবমন্নিষ্য দাতব্যং সর্কদানেষু বিধিঃ ॥

অপার্ক ১।২৮৪ পৃঃ ।

ষাঁহারা আকস্মিক বিপদে পড়িয়াছেন, যমদণ্ডে ষাঁহাদের সর্কনাশ হইয়াছে, ষাঁহারা ঋণপীড়িত, বা ষাঁহারা অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবার পালনে অক্ষম, এমনতর লোক খুঁজিয়া দান করিবে। যজ্ঞাদিতেও ইহাদিগকে দান করিবে, ভরণ-দানও ইহাদিগকে দিবে

হৃর্তিকে দান ।

মহর্ষি অর্ধত্র বলিয়াছেন—

• হৃর্তিকে চান্দদাতাচ...স্বর্গলোকে মহীয়তে ।

যিনি হৃর্তিকে অন্নদান করেন, তিনি স্বর্গে পুঞ্জিত হন

কুর্শ পুরাণে আছে ( ২।২৬।৫২—৬০ )

যন্ত হৃর্তিকবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি ।

ত্রিয়মাণেবু সবেষু ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ ॥

তন্মান প্রতিগৃহীয়ান্ন বৈ দেয়ঞ্চ তস্ম হি ।

অঙ্কয়িত্বা স্বকাদ্রাষ্ট্রান্তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥

যখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপে জীবগণ মরিতে থাকে, তখন যিনি অন্নপ্রভৃতি দান করেন না তিনি ঘৃণার পাত্র, তিনি ব্রহ্মঘাতী। এমন লোকের নিকট হইতে পরিগ্রহ করিতে নাই; এমন লোককে কিছু দিতে নাই। রাজা তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

মাতাপিতৃহীনের শিক্ষাদান ও অন্নসংস্থান।

মাতাপিতৃবিহীনং তু সংস্কারোদ্ধাহনাদিভিঃ ॥

যঃ স্থাপয়তি তস্মৈহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ।

অপর্যক ১৩৬৮ পৃঃ।

মাতাপিতারহিত গরীবকে যিনি লেখাপড়া শিখাইয়া, বিবাহ দিয়া, গৃহাদি দান পূর্বক সংস্থাপিত করেন, তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই।

নিমিত্তে দান।

( ৩ ) দাতব্যং নিমিত্তেষু বিশেষতঃ—বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে দান করা বিধেয়। যেমন জন্মাষ্টমী, রামনবমী বা মাতাপিতার শ্রাদ্ধের দিন। যে তিথিতে সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্মের সংস্থাপনের জন্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা যে তিথিতে সাক্ষাৎ দেবতা মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই তিথিতে যে প্রত্যেক হিন্দুর দানাদি কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাচককে দান।

( ৪ ) যাচিতেনাপি দাতব্যম্—যাচিত হইলেও দিবে অর্থাৎ সাধারণত অযাচিত ভাবে সমাজের শিক্ষক ও রাজকগণের এবং অন্তান্ত গরীবের দুঃখ কমাইবার জন্ত দান করিবে। কিন্তু এইরূপ দানে, বর্তমান অবস্থায়, সমাজের দারিদ্র্য-দুঃখের সম্পূর্ণ প্রতীকার হয় না। কাজেই প্রকৃত স্বস্তিক্রম কেহ ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। এইরূপ অন্নদান বা মুষ্টি-ভিক্ষা দানে আমাদের একটা বড় উপকার হইয়া থাকে। দয়া আমাদের অভ্যন্ত হইয়া যায়। প্রত্যহ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া অকিঞ্চন গৃহস্থ যতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, ক্রোড়পতি একদিনে ব্যাক হইতে দশলক্ষ টাকা দিয়া আত্মার ততটা উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন না।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।

( ৫ ) শ্রদ্ধাপূতং দাতব্যম্—শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিবে। যেরূপ দানই কর না কেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত করিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

শ্রদ্ধা \* বা ভালবাসার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। নিজের ধনসম্পত্তির আধিক্য দেখিয়া, লজ্জার খাতিরে, ভয়ের দরুণ ও বন্ধুতার জন্ত দান করিবে। অর্থাৎ যে জন্তই দান কর না কেন, উহা শ্রদ্ধার সহিত করিবে। বাস্তবিককার বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধয়েব হি দাতব্য মশ্রদ্ধাভাজনেষপি ।

অর্থাৎ যাহারা শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, তাঁহাদিগকেও শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। একজন মহাপাপী স্বকৃত দুর্কর্মের ফলে অন্নভাবে শীর্ণ হইতেছে, বস্ত্রভাবে শীতে কষ্ট পাইতেছে; এমন লোককে ভালবাসা কঠিন। কিন্তু ইহাকেও ভালবাসিয়া অন্নদান করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ইহাই হিন্দুধর্মের মর্ম। এই জন্তই শাস্ত্রে “সর্বভূতেষু অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ” ( বিষ্ণুপুরাণ ১।১১।১ ) বিহিত হইয়াছে। যিনি তোমার অনিষ্টাচরণকে জীবনের ব্রতে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাকেও ভালবাসিবে, তাঁহাতেও যেন তোমার প্রেমের ভক্তির শ্রদ্ধার কখনও ব্যভিচার না হয়।

\* শ্রদ্ধা শব্দ প্রাচীন কালে ভালবাসা বা ভক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত। শ্রৎ শব্দ বর্তমান ইংরাজি heart, রুসীয় serdise, আইরিশ cridhe, গ্রীক kardia প্রভৃতির রূপান্তর বাদ। শ্রৎ-ধা= placing of the heart. বাঙ্গালায় আজও শ্রদ্ধা শব্দ ভালবাসা অর্থে লোকমুখে খুব প্রচলিত আছে; তিনি তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন ( বাৎসল্য অর্থে )। বধ্যমুগীয় সংস্কৃতে শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাস করা ও ভালবাসা একশ্রেণীর ভাব। ইংরাজি credo বা creed আর এই দ্বিতীয় শ্রদ্ধা একই। ওয়েবস্টারের অভিধানে creed শব্দ দেখুন। Hindu Realism প্রভৃতি রচিতা চিন্তাশীল পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অগনীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের মতেও শ্রদ্ধা অর্থ love. তিনি এ বিষয়ে বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। বর্তমানে বাঙ্গালা প্রয়োগ দ্বারা যে অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রাচীন বৈদিক অর্থ নির্ণীত হইতে পারে, তাহা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিপাঠ পাণ্ডিত্যপূর্ণ “আমাদের ভাষা ও সাহিত্য” ( প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ) প্রবন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

শ্রদ্ধার পরিচয়।

শ্রদ্ধার লক্ষণ কি তাহা দেবল বলিয়াছেন—  
সৌমুখ্যাদ্যভিসম্প্রীতিরর্থিনাং দর্শনে সদা।  
সংকুতিশ্চানস্ময়া চ দানে শ্রদ্ধেত্বাদাহতা ॥

অপর্যাক ১২৮৮, পরাশরভাষ্য ১২৮১।

যাচক দেখিয়া তাঁহার উপরে সম্প্রীতি বা সম্যক্ ভাল-  
বাসার উদয় হইবে, এবং উহা মুখের প্রসন্নতায় ব্যক্ত  
হইবে। যাচককে আদর করিবে। যাচকের দোষ চিন্তা  
করিবে না। \*ইহাই শ্রদ্ধার সহিত দান করার অর্থ।  
গরীবের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রেম থাকিলে, প্রসন্নচিত্তে দান  
করিতে পারা যায়। মনু বলিয়াছেন ( ৪।২২৭ )

দানধর্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিক পৌষ্টিকম্।  
পরিভূষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ॥

উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া লইয়া, \* প্রত্যহ সন্তুষ্টাস্তঃকরণে,  
যথাশক্তি ঐষ্টিক ও পৌষ্টিক এই উভয়বিধ দান করিবে। \*  
অত্রি (৪০) বলিয়াছেন—

অহনুহনি দাতব্যমদীনেনাস্তুরাশ্রনা।

রোজ প্রসন্নচিত্তে † দান করিবে। দান করিয়া পশ্চাত্তাপ †  
করিবে না। অর্থ হস্তচ্যুত হইল বলিয়া যেন চিন্তা  
দীন বা কাতর না হইয়া পড়ে। এই চিন্তের অদীনতা  
শ্রদ্ধাবানের পক্ষেই সম্ভব। তাই শাস্ত্রে আছে—

\* মহদপ্যফলং দানং শ্রদ্ধয়া পরিবর্জিতম্।

শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির সহিত দান না করিলে, মহাদানও  
নিফল হইয়া যায়। ঐষ্টিক বা প্রতিগ্রহ দানের বেলা,  
শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস। যজ্ঞ শ্রদ্ধাদিতে যে দান করা হয়,  
তাহাতে বিশ্বাস থাকা চাই, faith থাকা চাই।

\* ঐষ্টিক দান=যাজিক দান=প্রতিগ্রহ দান?। পৌষ্টিক  
দান=পৌষ্টিক দান=ভরণ দান? ইষ্ট=যজ্ঞ। পূর্ত=পুরণ=  
পোষণ=ভরণ। ইহার পোষণ বচন দেখিয়াছি মনে হইতেছে,  
কিন্তু এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। সাধারণত বাপী কুপ তড়াপ  
দেবতায়তন অন্নপ্রদান ও আরামকে পূর্ত বলে। ঐষ্টিক বা বৈদিক  
কালে একমাত্র ষিদ্ধিদিগের অধিকার ছিল। পৌষ্টিক কালে  
সকলেরই অধিকার আছে। ইষ্টের ফল স্বর্গ; পূর্তের ফল মোক্ষ।  
ইষ্টেন স্বর্গমাপ্নোতি পূর্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ (অত্রি ৪৩-৪৬; লিখিত  
১-৬)।

† শ্রদ্ধা চেতসঃ প্রসাদঃ (ব্যাসভাষ্য)। অ-পশ্চাত্তাপ সম্বন্ধে  
অপর্যাক ১ খণ্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

যথাশক্তি দান করিবে।

(৬) শক্তিতঃ দাতব্যম্। শক্তি অনুসারে দান  
করিবে। যাঁহার যেমন আছে, তিনি তেমন দিবেন।  
আমার সম্পত্তি নাই, অতএব আমি দানধর্মের বঞ্চিত,  
এইরূপ মনে করিবে না।

শ্রদ্ধা বা প্রেমের ভারতমো দানপুণ্যের ভারতম্য।

শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভারতম্য অনুসারে অন্নমূল্যের  
জিনিস দিয়াও বহুফল এবং বহুমূল্যের জিনিস দিয়াও  
অল্পফল হয়। লক্ষপতি নিজ মুখের বাধা না করিয়া  
দশহাজার টাকা দিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, গরীব নিজের  
গায়ের একটা সামান্য পুরাতন জামা দিয়া তদপেক্ষা  
সমধিক পুণ্য অর্জন করেন। মহাভারতে আছে—

সহস্রশক্তিঃ শতং শতশক্তিঃ শাপি চ।

দদ্যাদাপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্কে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ ॥

অশ্বমেধ পর্ব ৯০।৯৬।

যাঁহার সহস্র আছে তিনি শত, যাঁহার শত আছে তিনি  
দশ, দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করেন, যথাশক্তি চেষ্টা  
করিয়া মাত্র জলদানেও সেই পুণ্যই হইয়া থাকে।  
ইহাই সনাতন ধর্মের মর্ম। উৎসৃষ্টি কুরুক্ষেত্রনিবাসী  
ব্রাহ্মণ দুই সের মাত্র ছাত্ত দান করিয়া যে পুণ্যের সঞ্চয়  
করিয়াছিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে  
তত পুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই মহাভারতে  
আছে—

শক্তু প্রস্থেন বো নাহয়ং যজ্ঞস্তল্যাঃ নরাধিপাঃ।

উৎসৃষ্টে বদান্তশ্চ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥

অশ্বমেধ পর্ব ৯০।৭।

হে রাজগণ, আপনাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী বদান্ত  
ব্রাহ্মণের শক্তু প্রস্থের সমান নহে। আবার মহামতি  
রস্তিদেব জীবনের শেষভাগে একদিন যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ও  
জল দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সমস্ত  
জীবন ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোদনে ও যজ্ঞে সে  
পুণ্য লাভ করেন নাই। অই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

রস্তিদেবো হি নৃপতিরপঃ প্রাদাদকিঞ্চনঃ।

ভুঙ্কেন মনসা বিপ্র নাকপৃষ্ঠং ততো গতঃ ॥

মহাভারত ১৪।৯০।৯৭—৯৮।

নিঃস্ব রাজা রস্তিদেব শুদ্ধমনে ( শ্রদ্ধার সহিত ) জল দান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। রস্তিদেবের পাবনী আধ্যায়িকা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে আছে। রস্তিদেব পিপাসায় ত্রিয়মাণ হইয়াও, স্বকীয় পানীয় জল একজন অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য পুরুশকে দিতে দিতে বলিতেছেন,—

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরাং পরাম্

অষ্টর্কিয়ুক্তামপুনর্ভবং বা ।

আর্তিং প্রপদ্যেহখিলদেহভাজাম্

অস্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যহুঃখাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।১২ ।

আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টসিদ্ধি বা মোক্ষ চাহি না। ভগবৎসমীপে আমার ইহাই কামনা যেন যাবতীয় প্রাণীর দুঃখ আমি ভোগ করি এবং তাহারা যেন দুঃখ পায় না।

এই পরদুঃখসহিতাই সত্যতনুধর্ম্মানুমোদিত দানের প্রাণ। ইহার ভারতম্যেই দানপুণ্যের ভারতম্য হইয়া থাকে।

শক্তি থাকিতে দান না করিলে, পাপ হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রত্যহ দান করা কর্তব্য। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আছে—

সমর্থাশ্চাপ্যদাতারশ্চৈ বৈ নরকগামিনঃ ( ২৩।৮০ )

সামর্থ্য থাকিতে যাহারা দান না করেন, তাহাদের পাপ হয়। এই সামর্থ্য কি তাহা শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দানশক্তি কি ?

যাহাদের পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের অতিরিক্ত কিছু আছে, তাহাদেরই দানের সামর্থ্য আছে। তাহাদেরই দান অবশ্যকর্তব্য।

পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের যোগাড় করিয়া যাহা বাঁচে, তাহাই দান করিতে পারা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য ( ২।১৭৫ ) বলিয়াছেন

স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ম্ ।

অর্থাৎ অবশ্যপ্রতিপালনীয় বন্ধু মাতাপিতা সাধ্বী ভাৰ্যা এবং শিশু পুত্রকন্যা প্রভৃতির ভরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই দান করিবে। মনু বলিয়াছেন (১।১।১০)

ভৃত্যানামুপরোধেন যঃ করতোঽর্কদেহিকম্ ।

তদ্ ভবত্যন্ততোদর্কং জীবতোহস্ত মৃতস্ত চ ॥

অবশ্য-ভর্তব্যাদিগের পীড়া জন্মাইয়া, পারলৌকিক ফল-লাভের জন্ত, যে দানাদি করা হয়, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। নিজ পরিবারের বিলাসের, পোষ্যবর্গের বা কলিত মানের হানি হইলে, তাহা ভর্তব্যাদিগের পীড়া ( ভৃত্যানাম্ উপরোধঃ ) বলিয়া গণ্য হইবে না। কাজেই বিলাসাদির লাঘব করিয়া দান অবশ্য-কর্তব্য। তাহা না হইলে সাধারণের দান করাই দুর্ঘট হইবে। শাস্ত্রের আদেশ এই যে, নিজ পরিবারের ভাত কাপড়ের অভাব বারণ না করিয়া আগে অন্তের অভাব মোচন করিতে নাই।

কুটুম্বভর্তব্যসনাদেয়ং যদতিরিচ্যতে ।

অন্থথা দীর্ঘতে যদ্বি ন তদানং ফলপ্রদম্ ॥

কুর্ম্মপুরাণ ২।২৬।১০ ।

কুটুম্বভর্তব্যসনাদেয়ং যদতিরিচ্যতে ।

মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাদাতুর্ধর্ম্মোহন্থথাভবেৎ ॥

বৃহস্পতি ( অপার্ক ২।৭৮০ পৃষ্ঠা ) ।

পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের যোগাড় করিয়া যাহা উবরিয়া থাকে, তাহা দান করিবে। গৃহস্থামীর দানের ফলে যদি তাহার পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের কষ্ট হয়, তবে তাহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই।

ঘুষ লইয়া, চুরি করিয়া, বা উৎপীড়ন করিয়া, টাকা রোজগার

করিলে তাহার দানে পুণ্য নাই।

দান করিয়া পুণ্য বা ধ্যাতি লাভ করিবার লোভে, অসুস্থপায়ে টাকা রোজগার করিতে নাই। এখন এমন দুঃসময় দাঁড়াইয়াছে যে, হয় ত যে-কেহ একটা স্বদেশী কোম্পানি খুলিয়া সরল দরিদ্র লোকের অর্থ আত্মসাৎ করেন অথচ সমাজ তাহাকে মহাপাপী বলিয়া কুষ্ঠীর স্তায় পরিহার করেন না। এই মিথ্যা কোম্পানি খোলাটা বিলাতি রোগ। সরকারি আফিসে, রেল ষ্টেশনের টেনশনে বা পুলিশ থানায়, যেখানেই যাও ঘুষ ভিন্ন কথাটা বলিবার যো নাই। উৎকোচগ্রাহীদিগকে তাহাদের পাপের কথা বলিলে, তাহারা উত্তর করেন যে, ঘুষ না লইলে পেট চলে না এবং বাড়ীর দোল দুর্গোৎসব বন্ধ হয়। উৎকোচ না হইলে যাহাদের ভাত কাপড় চলে না, তাহাদের সংখ্যা কম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন লোকও আছে। অধিকাংশ

লোকই ঘৃষ লইয়া গহনা ও পোষাক বাড়ান, পাকা বাড়ী ও বিষয় করেন এবং নিতান্ত সংপ্রবৃত্তি হইলে পূজা অর্চনা করেন। সমাজের এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। যাহারা অত্যাঘ্য উপায়ে রোজগার করেন, তাঁহাদিগকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিলে, তবেই সমাজের মঙ্গল। শাস্ত্রে ( মহাভারত ১২।২২।৫ ) বলে—

ন ধর্মার্থী নৃশংসেন কর্মণা ধনমর্জয়েৎ ।

যিনি ধর্ম কামনা করেন, তিনি পরপীড়াজনক কর্ম দ্বারা ধন উপার্জন করিবেন না।

শ্রদ্ধয়েষ্টং চ পূর্তঞ্চ নিতাং কুর্যাদতদ্রিতঃ ।

শ্রদ্ধাক্রমে হৃদয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ ॥

মনু ৪।২২৬ ।

আয়ার্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট ও পূর্ত করিলে - অনন্ত ফল হয়।

ন ধর্মঃ প্রীয়তে তাত দানৈর্দনৈর্দৈর্ঘ্যফলৈঃ ।

মহাভারত ১৪।১০।১৮-১৯ ।

শ্রদ্ধাসহকারে আয়লব্ধ অল্পমূল্য জিনিস দান করিলেও মহাপুণ্য হয়। কেবল বেশী মূল্যের জিনিস দান করিলে তত পুণ্য হয় না।

বিশেষত্বত্র বিজ্ঞেয়ো আয়েনোপার্জিতং ধনম্ ।

পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥

অত্যাঘাৎ সমুপাস্তেন দানধর্মো ধনেন যঃ ।

ক্রিয়তে ন স কর্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

মহাভারত ৩।২৫।৩২—৩৩ ।

আয়া উপায়ে উপার্জিত ধন দেশ কাল পাত্র দেখিয়া দান করিবে। অত্যাঘ্যপূর্বক অর্জিত ধনের দ্বারা যে দানধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে দাতার মহাভয় দূর হয় না। ভূত-হিতই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব একের পীড়া জন্মাইয়া অগ্নিকে দিলে পুণ্য হইবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়।

দান করিয়া তাহা পরকে জানাইবে না।

দান করিয়া উহা পরকে বলিতে নাই। মনু বলিয়াছেন ( ৪।২৩৬ ) ন দত্ত্বা পরিকীর্তয়েৎ ।

দেবলী বলিয়াছেন ( অপরাক )

ইষ্টং দত্তমধীতং বা প্রণশ্যত্যনুকীর্তনাৎ ।

শ্লাঘানুশোচনাত্যাং বা ভগ্নতেজো বিপদ্যতে ॥

তন্মাদানুকৃতং পুণ্যং মৃতিমান প্রকাশয়েৎ ।

যজ্ঞ দান এবং শাস্ত্রপাঠ করিয়া উহার জন্ম নিজে নিজে শ্লাঘা করিলে, অনুতাপ করিলে বা অশ্রের নিকট উহার কীর্তন করিলে, উহাদের ফলহানি হয়। অতএব আশ্রুত পুণ্যের ব্যথা বিজ্ঞাপন দিতে নাই। একটা দান করিয়া অনেকে খবরের কাগজে তাহার প্রশংসা দেখিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া থাকেন। ছাপায় নাম না উঠিলে, তাঁহাদের স্বস্তি হয় না। এটা বিলাতি রোগ, এবং সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেকের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ মাসিক দান করা উচিত।

প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের একটা অংশ ধর্মকার্যের জন্ম নির্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। ইচ্ছা করিলে, শত টানাটানির মধ্যেও দান করা সম্ভব। যাহারা মাসিক শতাধিক টাকা উপার্জন করেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেক মাসে শতকরা দশ টাকা ধর্মার্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তবে অচিরে একটা মহৎ কার্য হইতে পারে। আমরা গরীব, কিন্তু বড় কাজ আমাদের করিতেই হইবে। এইরূপে ভিন্ন, আর কোন্ উপায়ে উহা সিদ্ধ হইতে পারে? শাস্ত্রে ( মহাভারত ১৩।১৪১ । ) বলে—

ধর্মার্থঃ সমাহার্যো ধর্মলক্ষং ত্রিধা ধনম্ ।

কর্তব্যং ধর্মপরমং মানবেন প্রযত্নতঃ ॥

একেনাংশেন ধর্মার্থচর্চবো ভূতিমিচ্ছতা ।

সাধু উপায়ে টাকা রোজগার করিবে। ঐ ধন তিনভাগে বিভক্ত করিবে এবং উহার একভাগ ধর্মের জন্ম ব্যয় করিবে। নারদ বলিয়াছেন—

ধর্মায় যশসেহর্ষায় কামায় স্বজনায় চ ।

পঞ্চধা বিভক্ত্বন্ব বিত্তম ইহামুত্র চ মোদতে ॥

যিনি স্বীয় আয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার একভাগ যশের জন্ম, একভাগ অর্থের জন্ম, একভাগ কামের জন্ম, এক আত্মীয়দের জন্ম ব্যয় করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন।

এইজন্ম বিলাস বাড়িতে হইবে।

মোট কথা এই যে, আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দানদির জন্ম ধরিয়া রাখিতে হইবে। এ দুর্দিনেও আয়ের দশভাগের একভাগ বা তাহারও কম অংশ নিয়মিতরূপে

মাসে মাসে ধর্মের নামে ব্যয় করা অসম্ভব নহে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে; বিলাস ছাড়িতে হইবে। তবেই আমরা মানুষ হইব।

সমবেত দানসমিতি ও গরীবের ঋণদান।

গরীবে একলা একলা ঋণ দান করিতে পারে না। আজকাল দেশে বহুতর সমবেত ঋণসমিতি (Co-operative Credit Society) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তদ্বারা লোকের উপকারও হইতেছে। সরকার বাহাদুর উহার প্রবর্তক। দেশের সাধারণ লোকেরা সমবেত হইয়া একটা সমবেত দানসমিতি (Co-operative Charity Society) গঠন করুন। উহাতে উদ্যোগীরা ধন্য হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে, গরীবেরা উহাতে দান করিয়া ঋণদানের মহাপুণ্যের অধিকারী হইবে। উহার অর্থের দ্বারা কবিরাজী আরোগ্যশালা ও টোল প্রতিষ্ঠিত হউক।

টোল করিতে হইবে।

জাতীয় বিদ্যালয় বলিলাম না, কেননা উহাতে টুল টেবিল বাড়ী ঘর লাইব্রেরী পরীক্ষা প্রভৃতির কম ধুমধাম বুঝায় না। টোল করুন। ঐ টোলে বঙ্গভাষায় অক্ষ, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি পড়ান হউক। ইংরাজি ও সংস্কৃত দ্বিতীয় ভাষা থাকুক। গ্রামে গ্রামে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার পুনঃপ্রচলন হউক। সহরে বিজ্ঞানীর আলোকে আলোকিত বোর্ডিং করিয়া ব্রহ্মচারীদিগের বিলাস বাড়ানোর জন্ত আমাদের আয়োজন নিরর্থক।

ছেলেরা দরিদ্র হইতে শিখিবে।

ছেলেরা হাতে কাজ করিতে, দরিদ্রমত থাকিতে অভ্যাস করুক। ক্রিকেট প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য বিলাতি খেলার আমদানি সরকার-বাহাদুর-পরিচালিত বিদ্যালয়ে যথেষ্ট হইতেছে। উহার জন্ত গ্রামে গ্রামে অর্থব্যয় নিম্নপ্রয়োজন। ছেলেরা পরিশ্রম করিয়া কৃষি করিতে শিখুক, গৃহস্থালি করিতে শিখুক। একত্র ব্যায়াম ও উপার্জন হইবে। মানুষ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাহা না করিয়া আমরা শরীররক্ষার জন্ত ডায়েল করি।

ডায়েল করা হান্তজনক।

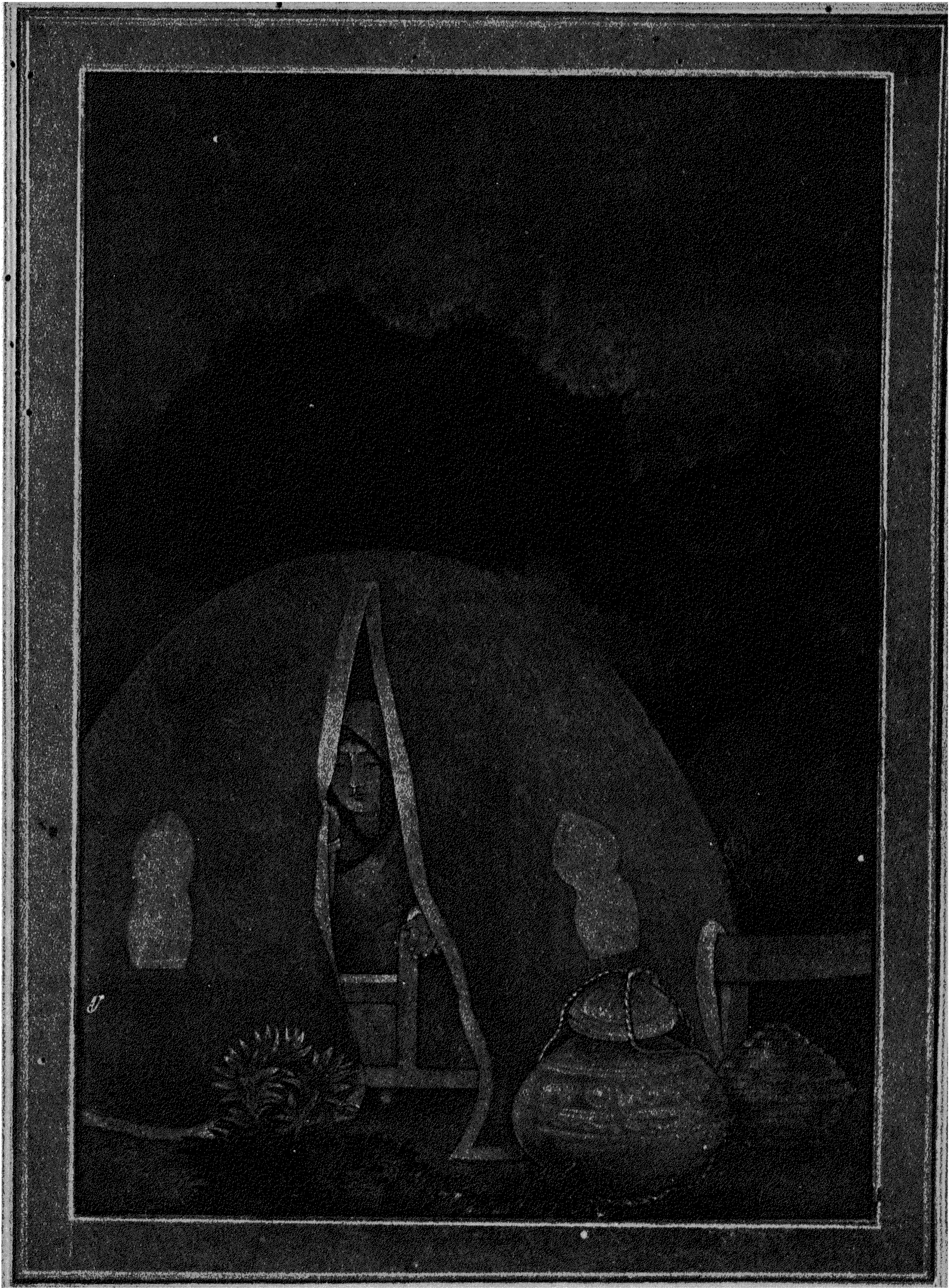
ইহা যে কিরূপ হান্তজনক, অভ্যাসের দোষে তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না। এম্ এ বা তর্কতীর্থ হইয়া কি কাঠফাড়া, মাটি কোদলান, নৌকা বাওয়া, চাল ছাওয়া যায় না? অবশ্য ষাঁহার বর্তমান সময়ে এম্-এ বা তর্কতীর্থ প্রভৃতি লোভনীয় উপাধিতে রঞ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই-সকল উপকারী সাধু কাজ অসম্ভব। তাঁহারা জোর স্ফাণ্ডে করিতে পারেন। ইহার কারণ অভ্যাস-দোষ। আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়-দিগের জন্ত নূতন ধর্ম্মানুমোদিত অভ্যাসের সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্ত নূতন টোল চাই। তজ্জন্ত অর্থ চাই। তজ্জন্ত সমবেত দানসমিতি চাই। তজ্জন্ত প্রত্যেকের মাসে মাসে কিছু দান চাই। ইহা সনাতন ধর্ম্মের আদেশ, ইহা সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ। ইহার অনুষ্ঠান কর। ইহার অনুষ্ঠান কর ॥\*

শ্রীবনমালী চক্রবর্তী বেদান্তাচার্য।

## মণিহার

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে,  
পরতে গেলে লাগে  
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।  
কর্ত্ত যে রোধ করে  
স্মর নাহি যে সবে,  
ওরি পরে মন দিতে যাই মন লাগে না কাজে ॥  
তাই ত বসে আছি  
এ হার তোমায় পরাই যদি  
তবেই আমি ষাঁচি।  
ফুলের মালার ডোরে  
বরিয়া লও মোরে,  
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে ॥  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

\* অগ্রহায়ণে ও পৌষে প্রকাশিত দানতত্ত্ব প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গৌহাটি শাখায় গঠিত হইয়াছিল।



কালীদাসীর পাড়ে ইন্দ্রা

শ্রীযুক্ত মন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।





## একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি

এক পরিবারের লোকের মধ্যে যদি প্রীতি ও সন্তানের অভাব হয়, পুত্রেরা যদি পিতার আবাধ্য হয়, পুত্রদিগের মধ্যে যদি বিবাদ-বিসংবাদ চলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কথায় কথায় কলহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, ঐ পরিবারের লোকগুলি এক পরিবারের লোক নহে। যাহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী, যাহারা এই দেশের অতীত ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত, তাহারা সকলে মিলিয়া যে একটি জনসম্মুখ বা Nation তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। প্রাদেশিকতার ফলে হউক, ধর্মের বিবাদে হউক, বংশের পার্থক্যে হউক, যদি প্রদেশে প্রদেশে মিলন না থাকে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকে, জাতিতে জাতিতে প্রীতির অভাব থাকে, তবে একটি পরিবারের শোচনীয় অবস্থার মত এই জনসম্মুখের দুর্দশার কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই ভারতবর্ষের সন্তানদিগকে বিভিন্ন জনসম্মুখের লোক বলিতে পারি না। যে কারণেই হউক, কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই তর্ক তুলিয়াছিলেন যে, ধর্মভেদ, ভাষাভেদ, প্রদেশভেদ প্রভৃতি কারণে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরা এক জনসম্মুখ নহেন, এবং কদাচ এই বিভিন্নভাষা-সম্মুখ এক জনসম্মুখ সৃষ্ট হইতে পারে না। অনেকে এই উক্তিতে বিচলিত হইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন, যদি আমরা এক জনসম্মুখ নহি, এবং ভারতের অধিবাসীগণ যদি কদাচ এক জনসম্মুখ পরিণত হইতে না পারেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারসমাজ। কাকে কান লইয়া গিয়াছে কি না, তাহা কানে হাত দিয়া না দেখিয়া অনেকেই কেবল কাকের পিছু পিছু ছুটিয়া থাকেন।

সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের কথা এই যে, যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে, একইরূপ মুখ-মুঃমুখ, অপরিভাষ্য প্রতিবেশীরূপে পুরুষাত্মকভাবে আঁড়িয়া উঠিয়াছে, এবং একই প্রকার রাজনৈতিক শাসনে শাসিত হইতেছে, তাহারা এক জনসম্মুখ, এক Nation। যেখানে এক অপরিহার্য ও অপরিভাষ্য অবস্থার মধ্যে

বর্দ্ধিত হইতেই হইবে, যেখানে একপ্রকারের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সকলকে শাসন করিবেই করিবে, সেখানে যে ভাষা ধর্ম প্রভৃতির মিল না থাকিলেও লোকে বাধ্য হইয়া একটি জনসম্মুখরূপে অবস্থিত থাকে তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে।

কবি বিজ্ঞানালয়ের কবি-অবতার যখন ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু কি না, তখন ভূতনাথ হাস্যোদ্দীপক জবাব দিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি হিন্দু বই কি? দেখুন, আমি দেখতে ঠিক হিন্দুর মত নই কি?” ভূতনাথ যে চেহারা, রঙ্গ এবং ভূঁড়ির নজির পেশ করিয়াছিলেন, কবিদেব হয়ত তাহা নেহাইত অগ্রাহ্য করেন নাই। ভূতনাথের হাঁদামির মধ্যেও একটুখানি গ্রহণীয় সত্য রহিয়াছে। এমন অনেক সময় ঘটে যে, ঠিক যুক্তিতর্ক দিয়া একটি বর্থাৎ অমুভূত সত্যও বুঝাইয়া উঠিতে পারা যায় না; কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি যে সত্য, তাহা খুব প্রত্যক্ষভাবেই অমুভব করা যায়। কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

ধরুন যে সুদূর লণ্ডন সহরের একটি গৃহে একজন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, একজন বিহারের মুসলমান, একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, একজন পোর্টুগীজ-অধিকৃত গোয়ানিবাসী সাতপুরুষে খৃষ্টান এবং একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধ একসঙ্গে মিলিলেন; সেখানে কি সকলেই আপন আপন ভাষাভেদ, ধর্মভেদ এবং আচারভেদের কথা তুলিয়া পরস্পরকে একদেশবাসী বলিয়া মনে করিবেন না? এরূপ অবস্থায় আমার নিজের মনে যে-প্রকার অমুভূতি হইয়াছিল, ঠিক তাহাই সিধিয়াছি। যদি ঐ লণ্ডনসহরে সিংহলবাসীর পরিবর্তে ব্রহ্মদেশবাসীকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে হয় না। একজন বাঙ্গালীর চক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক আপনার লোক বলিয়া প্রতীত হয়; অথচ নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত সিংহলদেশের লোকের মতই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্রহ্মদেশবাসীকে বিদেশী বলিয়া মনে হয়। আমার এরূপ ধারণার মূল কি, তাহা অমুসন্ধান করিলেই জাতীয়ত্বের মূল-ভিত্তির সন্ধান পাইতে পারিব।

অতি প্রাচীনকালেও বৈদিক ঋষিগণ ত্যাজ্য এবং অস্পৃশ্য অনার্যদিগকে নিজেদের দেশের অধিবাসী বলিয়াই ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে যুগে দক্ষিণাপথে অগ্রসর হওয়াও পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত, সে যুগেও আর্য্যনিবাস হইতে বহুদূর দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত অস্পৃশ্য শত্রুগণ স্বদেশী শত্রু বলিয়া কল্পিত হইত; অথচ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী প্রদেশের লোকেরা সিঙ্কনদের পশ্চিমপারে অবস্থিত হইয়া নিঃসম্পর্কিত বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইত। দাস হউক, দস্যু হউক, ত্যাজ্য হউক, অস্পৃশ্য হউক, ভারতবাসী আর্য্যোত্তর জাতির আর্য্যদিগের স্বদেশবাসী শত্রুই ছিল।

মানুষ যখন একটা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করে, তখন শত্রু হউক, মিত্র হউক, সকলকেই এক দেশের লোক বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইতে হয়। ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিলেও একজন আর একজনের প্রতিবেশী; দূরে থাকিলেও একজন আর এক জনের প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ সহজভাবে এক প্রদেশের লোক অল্প প্রদেশে যাইতে পারে, অথবা যাইতে পারিবে বলিয়া শঙ্কা এবং সন্দেহ থাকে। বিক্ষ্য প্রদেশের পাহাড় এবং অরণ্য এক সময়ে কথঞ্চিৎ দুর্লভ্য বলিয়াই মনে হইত; কিন্তু তবুও সিঙ্ক এবং হিমালয়ের বাধার সহিত সে বাধার তুলনা করা চলে না। বিক্ষ্য দুর্লভ্য হইলেও উহার পাহাড়ে পাহাড়ে এবং বনে বনে আর্য্যশত্রু লুকাইয়া থাকিত, এবং সেই শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা না করিলে আর্য্যের চলিত না। বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষ দেশটিকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, উহার যে-কোন ভাগেই যে-কোন জাতি বা লোক বাস করুক না কেন, তাহাকে অল্প সকল বিভাগের লোককেই একটি সুনির্দিষ্ট দেশের লোক বলিয়া ভাবিতে হয়।

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে একটি দেশের ভৌগোলিক স্থিতিতে একটা নির্দিষ্ট একতা আছে, সেখানকার সকল অধিবাসীর পক্ষেই একজাতীয়ত্ব লাভ করিবার পথ প্রশস্ত থাকে। কোন কারণে এক জাতীয়ত্ব লাভ যদি ঘটয়া নাও উঠে, তবুও কেবল মাত্র দেশের ভৌগোলিক স্থিতির বিশেষত্বে দেশবাসীদিগকে পরস্পরের

বিশেষ প্রতিবেশী হইয়া উঠিতে হয়। এইটুকু না থাকিলে একজাতীয়ত্ব জন্মিতেই পারে না।

আমরা এই ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ গণনাভীত এবং স্মরণাভীত কাল হইতে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করিয়া হউক, মিত্রতা করিয়া হউক, এই একই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিবেশী হইয়া বাস করিয়া আসিতেছি। কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, পরস্পরকে চিনিতে বাধ্য হইয়াছি; এবং অনেক স্থলে দায়ে ঠেকিয়াও সুখশান্তির খাতিরে পরস্পরের সহিত সন্ধি করিয়া খানিকটা কৃত্রিম সখা স্থাপন করিতেও বাধ্য হইয়াছি। প্রচলিত প্রবচনে ষাহাই থাকুক, রূপের চমকের জন্ম যে বিলক্ষণ “ঘণামাজা” চাই, এ কথা অতিবড় সুন্দরীকেও স্বীকার করিতে হইবে; “ধরা বাঁধা”র ফলেও যে অনেক সময়ে পাকা রকমের প্রীতির সন্ধার হইয়া থাকে, এ দেশের অনেক দম্পতিই তাহার সাক্ষী।

অতি প্রাচীন যুগে—যখন সমগ্র দক্ষিণাপথ আর্য্যোত্তর জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল, এবং আর্য্যাবর্তেরও কিয়দংশ-মাত্র আর্য্যজাতির আবাস ছিল, তখনও আর্য্যেরা সমগ্র ভারতবর্ষটিকে এক জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন, এবং উহার কোন অংশকেই জম্বুদ্বীপের বহির্ভুক্ত মনে করিতেন না। অবন্তী, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে বিগ্ধ আর্য্যকে পতিত হইতে হইত; তবুও কিন্তু ঐ দেশগুলি আপনাদের বাসভূমি ভারতবর্ষেরই অংশবিশেষ ছিল। দেববিরোধী অনার্য্য দস্যুগণ আপনাদের ঘরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; কিন্তু ভাষায়, ধর্মে এবং আচারে অত্যন্ত অধিক মিল সত্ত্বেও ইরাণের লোকেরা সিঙ্কর পরপারে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইত। অল্পদিকে আবার দেখুন যে, ব্রহ্ম, শ্রাম, অনাম প্রভৃতি বহির্ভারতের রাজ্যগুলি যখন ভারতের রাজ্যদিগের শাসনাধীনে আসিয়া আর্য্যসভ্যতায় উদ্ভাসিত হইতেছিল, তখনও ভারতের পুরাণ বা ইতিহাসে ঐ দেশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দ্রবিড়েরা ভিন্নভাষায় কথা কহে, ভিন্ন আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বাস করে, তবুও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের লোকদিগের মত তাহারা জম্বুদ্বীপের

বহির্ভুক্ত অন্য কোন দ্বীপের অধিবাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। পুরাণে যেখানে ভারতবর্ষকে কুর্শ্ব দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করা হইয়াছে, সেখানে অমূল্য এবং আর্ঘ্যের জাতির প্রদেশগুলি কুর্শ্বশরীরের উচ্চ তুচ্ছ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আবৃত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু কুর্শ্বপাদের একটি নখরেখাও ব্রহ্মদেশ অথবা ইরানকে স্পর্শ করে নাই। সিংহল দেশ এক হিসাবে চিরদিনই ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন; তবুও ঐ দেশ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। যখন আর্ঘ্যের রাজা সিংহলের অধিপতি, তখনও আর্ঘ্য-ভট্ট, বরাহগিহির প্রভৃতি সিংহলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের লোক যে সম্পূর্ণরূপে এক দেশের অধিবাসী, এ জ্ঞান ও অমূল্য ভিত্তি বৈদিকযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা সিংহলে যাই, কিংবা মাদ্রাজে যাই, পঞ্জাবে যাই কিংবা গুজরাটে যাই, সর্বত্রই মনে হয় যে, আমরা এক দেশের লোক। পরিচ্ছদে পার্থক্য থাকিলেও উহার মধ্যে একটা মিল লক্ষ্য করিয়া থাকি। আর্ঘ্যাবর্তের লেদটধারী দরিদ্র এবং দূর দক্ষিণাপথের অধিবাসী একই রকমের জাতীয় পোষাক পরিয়াছে মনে হয়। ব্রহ্মদেশের অতি দীন দরিদ্র যেভাবে কোপীন পরিধান করে, সে যেন ধাঁচা এবং প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। কোন যুক্তিতর্ক দিতে না পারিলে আমরা সকলে কল্পি অবতারের ভূতনাথের মত আমাদের চেহারা এবং পরিচ্ছদ দেখাইয়া বলিব যে, আমরা সকলেই হিন্দু নই কি?

সিংহলের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, এবং তাহাদের ভাষা ভারতের ভাষা হইতে ভিন্ন; তবুও তাহারা ব্রহ্মদেশের লোকের মত বিদেশী নহে। ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ একই সম্রাট-প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হইতেছে; কিন্তু সিংহলের রাজকীয় শাসন সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তবুও সিংহলবাসীরা আমাদের আপনার এবং ব্রহ্মবাসীরা পর। যিনি সিংহলদেশ দেখিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিবেন যে, সে দেশের লোকজনের আকৃতি প্রকৃতি, ধরণ ধারণ দেখিয়া কোনরূপে তাহাদিগকে আপনার বলিয়া না ভাবিয়া পারা যায় না। অতি প্রাচীনকালের জাতিমিশ্রণতত্ত্ব হইতে এমন অনেক কথা

জানিতে পারা যায়, যাহাতে ভারতের আর্ঘ্য ও অনাৰ্ঘ্যদিগের কোন কোন মিল এবং সাদৃশ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। এখানে সে ইতিহাসের কথা বলিব না।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিলেও একটি সুনির্দিষ্ট দেশের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এক প্রদেশের উৎপন্ন সামগ্রী অন্য প্রদেশে না গেলে লোকের অনেক সময়ে পেট ভরে না; ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলেও এক দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই তাহার সুবিধা অধিক, একই রকম প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে প্রায় যুগপৎ অনেক প্রদেশেই দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয়, এবং সে দুর্ভিক্ষে অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশকেও অল্পাধিক পরিমাণে পীড়িত হইতেই হয়। এই-সকল কারণে শত্রুতাই করুক, আর মিত্রতাই করুক, সকল প্রদেশের লোককেই এক সঙ্গে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে বাড়িয়া উঠিতে হয়, এবং পরস্পরে পরস্পরের ভাব দ্বারা অজ্ঞাতসারেও পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ভারতের সকল প্রদেশের অরণ্যচারীদিগের মধ্যেও আর্ঘ্যদিগের গুহা এবং সুনীতি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতে ভুলেন নাই। ধীরে ধীরে সর্বত্রই আর্ঘ্যনিবাস স্থাপিত হওয়াতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাৰ্ঘ্যেরা আর্ঘ্যের অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছে। আর্ঘ্যেরাও যে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ধর্মের অনুষ্ঠানে, সামাজিক আচারে এবং ক্রীড়া কৌতুকাদিতে অনাৰ্ঘ্যের অনেক উপকরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও আমাদের সামাজিক ইতিহাসে অলোপ্য অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বহুবিধ কারণেই বহুবিধ রীতি প্রকৃতি, দাঁড়া দস্তুর প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে এক আশ্চর্য্য মিল লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত সর্ববিধ জাতির তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত বা সমালোচিত হয় নাই বলিয়া এ-সকল কথা বুঝা অনেকের পক্ষে কথঞ্চিৎ কষ্টকর হইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে একটা অচ্ছেদ্য

মিলন রহিয়াছে, তাহা একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। যে দৃষ্টান্তটি দিতেছি, তাহা কদাচ ঘটবার নহে; তবুও পাঠকদিগকে একটু কল্পনার আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিতেছি। মনে করুন যে, প্রাচীন অনুরূপ যুগের অধিকারের মত অধিকার থাকার ফলে আমাদের ভারতসম্রাট ভারত-রাজ্যটিকে দান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদিগের মধ্যে বিলি করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার গবর্ণর বাঙ্গলা পাইলেন, আসামের চীফ কমিশনার আসাম পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের এই দান এবং বিলি বাটোয়ারার পর যদি রাশিয়ার সম্রাট অপরিমিত বল লইয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন, এবং পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বঙ্গ প্রভৃতি ঐ প্রদেশ রক্ষা করিতে সহায়তা না করেন, তবে সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারকে নিশ্চয়ই রাজ্য হারাইতে হইবে। রাশিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য অনায়াসেই দখল করিয়া ফেলিয়া সমগ্র দেশটিকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। এই কাল্পনিক ঘটনা যে অনায়াসেই ঘটিতে পারে, তাহা এ দেশের পরিচিত ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত করিতে পারা যাইত; কিন্তু প্রয়োজন নাই। অতীতকালে আবার ভারতবর্ষ যদি একতার বলে বলিষ্ঠ থাকে, তবে ব্রহ্মদেশে কিংবা আফগানিস্তানে কোন জাতি প্রবল হইয়া উঠিলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ থাকে না। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বৈজ্ঞানিক সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে পাঠকেরা এ কথাই সকল প্রমাণ এক সঙ্গে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, একপ্রদেশ অপর প্রদেশকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। উন্নতি লাভ করিতে হইলে সকল প্রদেশকেই হাত ধরাধরি করিয়া উঠিতে হইবে। নহিলে কিছুতেই চলিবে না, অর্থাৎ আবার লর্ড হার্ডিঞ্জকে সর্বময় কর্তা করিয়া সম্রাটের চরণতলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একদিকে যেমন প্রদেশে প্রদেশে একতা চাই, অতীতকালে তেমনি আবার অরণ্য-চারী কোল, কন্ধ, কল্লন্ প্রভৃতি জাতির লোকদিগকে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে রক্ষা করা চাই; না করিলে

চলিবে না। তাহা হইলেই ভারতবর্ষের অবস্থা এই হইল যে, উচ্চ নীচ সকল জাতির লোকদিগকে একত্র না রাখিলে এবং সকল প্রদেশের মধ্যেই একতার বন্ধন না থাকিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। ইহাই যখন স্বাভাবিক অবস্থা, তখন আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি আর নাই করি, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসী লইয়াই আমরা একটি জনসমাজ হইয়া রহিয়াছি।

কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং আমাদের কর্তব্য-জ্ঞান কিরূপভাবে উদ্ভূত হইলে এক পরিবারের লোকের মধ্যে মিলন স্থাপিত হইবে, একটি জনসমাজের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে, সে কথা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

এ পর্যন্ত আমরা যদি এইটুকু বুঝিয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট যে সমগ্র ভারতবর্ষ বিধাতা কর্তৃক এমন ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, খণ্ডিত হইলে ইহার খণ্ডিত অংশ হৃদয় আর মূল অংশ হউক, সতেজ এবং সজীব থাকিতে পারে না; বংশগত, ধর্মগত এবং ভাষাগত প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও ভারতের সকল প্রদেশের সকল অধিবাসীর মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য নৈসর্গিক মিল রহিয়াছে; আমরা যত বিচ্ছিন্ন, যত স্বার্থপর এবং যত কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হই না কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি লইয়া আমরা একটি Nation—একটি জনসমাজ,—এবং সেই জনসমাজের নাম, দেশের হিন্দুস্থান নাম অনুসারে, “হিন্দু জনসমাজ।”

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

## বঙ্গের বিবাহসংখ্যা

বিবাহ এতদেশে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে, জীবনের অন্ততম প্রধান কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে বিবাহ কেবল সংসারকর্মের সৌকর্যার্থ নহে, বিবাহকে পরকালেরও ধর্মবন্ধন স্বরূপ জ্ঞান করা হয়। তাই এদেশে পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বিবাহিতের সংখ্যা

অত্যন্ত অধিক। প্রায় পাঁচকোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৬৭৮৭ জন কোমার্ধ্যজীবন সন্তোগ করিতেছে। একমাত্র ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যায়, তথায় হাজার পুরুষে ৩৫৭ জন এবং হাজার স্ত্রীলোকে ৩৪০ জন মাত্র বিবাহজীবন ভোগ করিতেছে; অথচ বঙ্গে সেই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫৪ ও ৪৬৩ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, ভারতের অপরাপর স্থানেও বিবাহিতের সংখ্যা এইরূপ অধিক, যথা—মাদ্রাজে ৪২৭ ও ৪৩৯, বোম্বাইতে ৪৭৪ ও ৫১১, পঞ্জাবে ৩৮৮ ও ৪৮০, মধ্যপ্রদেশে ৫১৯ ও ৫২৯ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ৫০৪ ও ৫০৫ জন বিবাহিত। সমগ্র ভারতেই ইহার গড় যথাক্রমে ৪৫৬ ও ৪৮৩। ইহাতে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আরও কিছু লক্ষ্য করিবার আছে। দেখা যাইতেছে ভারতের সর্ব্বাংশেই বিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিতার সংখ্যা অধিক। বহুস্ত্রী-প্রথাতেও এই সংখ্যা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই পাত্রস্থ করার নিমিত্ত এতদেশীয় অভিভাবকমাত্রেরই উৎকট তৎপরতাই ইহার প্রধান কারণ। তাহার ফলে ১৫ বৎসর বয়সের শতকরা ২৩ জন মাত্র স্ত্রীলোক ও ২২ জন পুরুষ অবিবাহিত থাকে। বিংশতি বৎসর বয়সের পর অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৩ জনের মধ্যে একজন করিয়া মাত্র। এইরূপে সমগ্র বঙ্গে যদিও বিংশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক অবিবাহিতার সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার তথাপি তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রমণীরই অতঃপর বিবাহিত হওয়ার আশা আছে, তাহাদের অধিকাংশই ছুষ্ঠীরোগগ্রস্তা, দাস্তবৃত্তিতে নিযুক্তা, বারবনিতা, কি কুলিনাদি যে-সকল সম্প্রদায়ে বর একান্ত তুলত তাহাদেরই আইবড় কন্যা। পঞ্চাত্তরে পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের দলেও শতকরা ২২ জন করিয়া মাত্র অবিবাহিত থাকে। অর্থাৎ এই বঙ্গদেশে দশ হইতে পনের বৎসর বয়সের প্রত্যেক অবিবাহিত যুবকের মধ্যে একজন মাত্র করিয়া ঐ বয়সের অনুচা পাওয়া যায়।

অন্ততঃ বঙ্গে বিপত্নীকের সংখ্যা ইংলণ্ডেরই সমান। উভয় দেশেই হাজারকরা ৩৫ করিয়া মাত্র, কিন্তু মাদ্রাজে ৩৯, মধ্য প্রদেশে ৪৬, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫২, বোম্বাইতে

৫৭, এবং পঞ্জাবে সেই সংখ্যা ৮৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অথচ হাজারকরা বিধবার সংখ্যা বঙ্গে ২০১, মাদ্রাজে ১৮২, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৭৮, বোম্বাইতে ১৭৫, মধ্য-প্রদেশে ১৫৮, পঞ্জাবে ১৪৩ এবং ইংলণ্ডে ৭৪ জন মাত্র। এতদ্বারা অবশ্য ইহা বুঝিলে চলিবে না যে, বঙ্গভূমিতে স্ত্রী কমই মরে, এবং স্বামীর মৃত্যুসংখ্যাই অধিক। পরন্তু স্মৃতিকা প্রভৃতি স্ত্রীজাতির কতিপয় কালান্তক ব্যাধি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বঙ্গেই অত্যন্ত বেশী, তাহাতে প্রতিদিনই বহু রমণী কালগ্রাসে আশ্রয়বলি প্রদান করিতেছে। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর অবাবহিত পরেই এতদেশে অনেকে পুনরায় দাম্পত্যবন্ধনে সম্মিলিত হইয়া যায়, তাহাতে বঙ্গের সেন্সাসের গণনাকারীরা বিপত্নীকের সংখ্যা এত অধিক পাইতে পারে নাই। তাহাদের উপর বিবাহিতদিগেরই কাহার কয়টি করিয়া বিবাহ হইয়াছে, এবং সেই-সকল মৃত ও জীবিত পত্নীর সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ থাকিলে, হতভাগিনী বঙ্গীয় ললনাদিগের মৃত্যুসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। পঞ্চাত্তরে পুনর্বিবাহ প্রথা যে দেশে যত অধিক অব্যাহত, ততদেশে বিধবার সংখ্যাও তত কম পাওয়া যায়; বঙ্গভূমি ইহাতে তত উদার নহে বলিয়া এদেশে এত অধিক মহিলা বৈধব্য যন্ত্রণা সন্তোগ করিতেছে। বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা অধিক না থাকিলে এদেশে বিধবার সংখ্যা বোধ হয় আরও অধিক হইত। কেননা দেখা যায়, ১৫ হইতে ২০ বৎসরের হাজারকরা বিধবার সংখ্যা খৃষ্টানসমাজে ২১, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে ২৮, বৌদ্ধ ২৮, মুসলমান ৩৫, আর হিন্দু ৯৩; এবং ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সেরই হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা হিন্দু-সমাজে ২৬৬, মুসলমান সম্প্রদায়ে ১৩৯, ব্রাহ্ম ১২৮, খৃষ্টান ৯৬ এবং বৌদ্ধসমাজে ৯২ জন করিয়া মাত্র। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায়, খৃষ্টান, এবং ততোধিক বৌদ্ধ সমাজে প্রৌঢ়া বিধবারও যত অধিক পুনর্বিবাহ হয়, ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান সমাজেও তত হয় না। যাহা হউক এক্ষণে ১৯১১ সালের গণনালক্ষ্য বঙ্গের বিবাহিত প্রভৃতির প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে :—

বয়স	বৎসর	বঙ্গের মোট		অনূঢ়	অনূঢ়া	বিবাহিত	বিবাহিতা	বিপত্নীক	বিধবা
		পুরুষ	স্ত্রী						
০—১	১২৯৬৮৫	৭৩৪২২৬	৭২১৬২০	৭৩৪০৯২	৬১	১২৬	৪	৮	
১—২	৩৪০১৭৩	৩৬৫৭৭৮	৩৪০০৭০	৩৬৫২৪৩	১০১	৪১৪	২	২১	
২—৩	৭০৮১৮০	৭৬১০২২	৭০৭৫৪৫	৭৬৪৮৫৭	৬২৩	২০৪২	১২	১২৩	
৩—৪	৭৩৪৬২৪	৮০৬৮৪১	৭৩৩৩০৮	৮০১৯৬১	১২৮৮	৪৫৩৩	২৮	৩৪৭	
৪—৫	৬৯২০৬১	৭০৮৬৯৮	৬৮৯৬৩৮	৬৯৮২৪৩	২৬৩৮	৮৫০৭	৮৫	১৩৪৮	
০—৫	৬৫৭৮৮৮	৩১৯৭০২৩	৩১৯২১৮১	৩৩৬৪৩৯৬	৪৭১১	১৫৬২২	১৩১	১৮৪৭	
৫—১০	৩৬৫৩৮৮২	৩৫৩৮৯০০	৩৬১০৯২৫	৩১৭৩১৩৯	৪১৫৪৬	৩৪৯৬৬২	১৪১১	১৬০৯৯	
১০—১৫	২৮১৬৬২০	২২০৬৭৫১	২৬৪৬৯৬৯	৮৩১০৫৯	১৬৫১৯২	১৩২২৫১৪	৪৪৫৯	৫৩১৭৮	
১৫—২০	২০৬৩৮৮১	২২৭৫৮৮২	১৪৮৬৩৫১	৯৭০৫০	৫৬৪৮৭০	২০৩৯৬৪২	২৬৬০	১৩৯১২০	
২০—২৫	১৮৬৮০২৪	২১৩২০১৪	৬৭৪১০০	৩৬৪০৬	১১৬৩৪৩২	১৮৮৭৭৫৯	৩৯৪৯২	২০৭৮৪৯	
২৫—৩০	২২২৩৯৫২	২১১০৯৭২	৩১৯৭৪২	২২৭০২	১৮৪১৯৭১	১৭৬০৪৩৩	৬২২৩৯	৩২৭৮৩৭	
৩০—৩৫	১৮৮৩০৮০	১৬১৭৬৩০	১০০২৯০	১৩০৩৩	১৭১০৬৩৩	১১৯৩৩২৮	৭২২৩৭	৪১১২৬৯	
৩৫—৪০	১৫৮৯০৭৫	১১৬০৭৬৭	৪৭০৮০	৬৯৮৬	১৪৬৫৩৭৮	৭১৯৪০৩	৭৬৬১৭	৪৩৪৩৭৮	
৪০—৪৫	১৩৫৯৯৮০	১১৫২৫৭৫	৩৪৭২৩	৬১২০	১২৩০৪৩৮	৫৪৪৬৫০	৯৪৮১৯	৬১১৮০৫	
৪৫—৫০	৮৭৯৭৪৭	৬৭৮৭৬০	১৭৩৪৩	২৪৫২	৭৮২৫০২	২৩৮৬৭০	৭৯৯০২	৪৩৭৯৩৬	
৫০—৫৫	৮৪৫২৩৩	৮১৭৮২৫	১৫৮৫৯	২৬৪৮	৭২৫২৬৪	১৯১৯১৬	১০৪১০১	৬২৩২৬১	
৫৫—৬০	৩৯৮০১৭	৩৪৭৫৬১	৬৭৩৮	১০১৯	৩২৯৭৮৩	৬০১০৫	৬১৪৯৬	২৮৬৪৩৭	
৬০—৬৫	৫১৭০১৭	৫৬৩১৬২	৯০৭২	১৭৫৬	৪০৮৮০৯	৬১১০৭	৯৯১৩৬	৫০০২৯৯	
৬৫—৭০	১৬০০৫৩	১৫৮৬২০	২৭৫১	৫৪৮	১২১০১৬	১৬১৬২	৩৬২৮৬	১৪১৯১০	
৭০ হইতে তদুর্ধ্ব	৩৪৮০০৯	৩৫৮৭৬৫	৬২৭৬	১৫১১	২৪১৬২১	২৩৩৪৯	১০০১১২	৩৩৩৯০৫	

০—৭০ এর উর্ধ্ব ২৩৮০৩৫৯৩ ২২৫০২০৪৯ ১২১৭০৩২০ ৭৫৬০৮২৫ ১০৭৯৭১৬৬ ১০৪২৪৩২২ ৮৩৬১০৭ ৪৫১৬৯০২

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেরই ১৩১ জন বিপত্নীক, ও ১৮৪৭ জন বিধবাও রহিয়াছে এবং ৫ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যাও যথাক্রমে ১৪১১ ও ১৬০৯৯। বলা বাহুল্য এই বয়সের মধ্যে অনেক বিপত্নীক ও বিধবা হয়ত বিবাহিতের তালিকাতেও আশ্রয় পাইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায় এই বাল্যবিবাহ প্রথা বহুল প্রচলিত। এই যে বঙ্গের তালিকায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ২০৩৩৩ জন বিবাহিত এবং ১৯৭৮ জন বিপত্নীক ও বিধবা বালকবালিকার সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, বিহার ও উড়িষ্যার তালিকায় ইহার সংখ্যা যথাক্রমে ১২৭৯৮৪ ও ৮০৬৪; অথচ উক্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা বঙ্গদেশ হইতে অনেক কম। তথায় এমন কি এক বৎসর বয়সেরই ২০৩০ শিশু বিবাহিত এবং ঐরূপ

দুষ্কপোষ্য শিশুদেরই মধ্যে ৫৫৩ জন বিপত্নীক ও বিধবা রহিয়াছে। শুনিয়াছি এই-সকল শিশুবিবাহ নাকি খালাতে করিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে! পুতুল-খেলা আর কাহাকে বলে! উত্তরবিহারে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের প্রতি দশ বালিকার তিন জনই নাকি বিবাহিতা, স্বার-ভাঙ্গায় ঐ বয়সের দুই-পঞ্চমাংশ হিন্দু বালিকাই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও ঐ বয়সের শতকরা ২২ জন বালিকা বিবাহিতা। উত্তর বিহারের পরেই দক্ষিণ বিহার (তথায় মাইল প্রতি ঐ বয়সের বিবাহিতার গড় ২১৭), তৎপর ক্রমে মধ্যবঙ্গ (১৫১), পশ্চিম বঙ্গ (১৪০), ছোটনাগপুর (১০৬), উত্তরবঙ্গ (৯৮), পূর্ববঙ্গ (৬৮), অথচ উড়িষ্যায় এমন কি ৩৩ জন মাত্র।

জাতি	লোকসংখ্যা			অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক ও বিধবা			
	বৎসরের	বৎসরের	সর্বমোট	বৎসরের	বৎসরের	সর্বমোট	বৎসরের	বৎসরের	সর্বমোট	বৎসরের	বৎসরের	সর্বমোট	
হিন্দু	পুরুষ	১২৮৭৭৩৬	১৪৭১২৪২	১০৮৪৮২১৭	১২৮৫৫০৭	১৪৫৪৭১২	৫২৮৫৬৬৪	২১৫৩	১৫৮৬৫	৫০৩৬৮৬৭	৭৬	৬৭২	৫২৫৬৮৬
	স্ত্রী	১৩৬০৮০৩	১৪২৪২৮৮	১০০২৭১৬২	১৩৫২৭০৩	১২৪৪৫৭৩	২২৫১২৪০	৭১৩৯	১৭১০০৪	৪৫৫৪৭১৮	৯৬২	৮৬৮১	২৫২১২০৪
মুসলমান	পুরুষ	১৮২৬৪৮০	২০২১৪৮৬	১২৩৭৭২১৫	১৮২৪২৫৪	২০৬৫৭৫০	৬৫৭০৬৪২	২১৭১	২৫০২৫	৫৫১৩৭৫৩	৫৫	৭০৪	২০২৮২০
	স্ত্রী	১৯৩৪৬৬৬	২০২৫৩২৩	১১৮৬০০১৩	১৯২৫৫০১	১৮৪০২৩৯	৪৩৬২১২৩	৮২২৪	১৭৭০২৬	৫৬৩৪৭০৯	৮৭১	৭২৮৮	১৮৬৩১৮১
বৌদ্ধ	পুরুষ	১৭৩৯৮	১৯৩৫১	১২৫৩৮৮	১৭৩৮১	১৯২৭২	৭১৪৪৪	১৭	৭৭	৪৯৯৬১	—	২	৩৯৮৩
	স্ত্রী	১৭০৩৪	১৮৬২৫	১২১৪৭৮	১৭০১১	১৮৪৮২	৫৫৭৮৮	২৩	১৩৩	৫১১৮২	—	১০	১৪৫০৮
ব্রাহ্ম	পুরুষ	১৯০	১৬০	১৫২০	১৯০	১৫৯	৯৩৫	—	১	৫২৪	—	—	৬১
	স্ত্রী	১৫৩	২১৫	১৪৩৮	১৫২	২১৩	৭৮৯	১	২	৪৮৪	—	—	১৬৫
খৃষ্টান	পুরুষ	৮২২৫	৮৩৬৯	৭০২৬০	৮২০৭	৮৩৩২	৪১৫৭৩	১৮	৩৪	২৬৬৪৪	—	৩	২০৪৪
	স্ত্রী	৮২৭৫	৮০১০	৫৯৪৮৬	৮২৫৮	৭৯৩৭	২৮১০১	১৭	৬৭	২৪০২১	—	৬	৭৩৬৪

এক্ষণে এই বিবাহিত প্রভৃতির সংখ্যাটি বঙ্গের কয়েকটি প্রধান জাতিতে ভাগ করিয়া দেখাইলে, দেখা যাইতেছে শিশুবিবাহে মুসলমান সমাজও কম অমুরক্ত নহে। এমন কি তাহাদের মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়সেরই ৮৭১ জন বিধবা রহিয়াছে। কেবল বৌদ্ধ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজই বাল্যবিবাহের প্রতি সবিশেষ খড়গহস্ত। আবার এই তিন সমাজের মধ্যে খৃষ্টানেরা তবুও অনেকটা নুঁকিয়া পড়িয়াছে, বৌদ্ধেরাও তাহার প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি তাহাদের দৃঢ়ব্রত ছাড়িতে আরম্ভ করেন নাই। প্রত্যুত বাল্যবিবাহে অপর হাজার উপকার থাকুক বা না থাকুক বর্তমানে শিশুমৃত্যুসংখ্যা বহু বাড়াইতেছে। অন্ততঃ বিধবা সংখ্যাই হিন্দুধর্মী জাতি-নিচয়ের মধ্যে ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা হাজারকরা মহিলার বৈদ্যসম্প্রদায়ে ৯১, ব্রাহ্মণে ২৫৮, কায়স্থে ২৭৬, রাজপুত সম্প্রদায়ে ২৮৩, গোয়ালাদের মধ্যে ৩২৩, চাষী কৈবর্তে ৩০, কুমারে ৩০৭, নমশূদ্রদলে ৩০৪, সৎগোপে ৩২৬, সূত্রধরে ২৮৫, এবং তেলী সমাজে ৩১৩; আবার চামার সম্প্রদায়ে ১০০, ডোমদলে ১৯৭ এবং মুচিদের মধ্যে ১৮১ মাত্র, কেননা ইহাদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথাও রহিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

## গবেষণা

সভাতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন হয়, তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বর্তমান সময়ে আমরা অনেক শব্দ এমন অর্থে ব্যবহার করিতেছি, যাহা প্রাচীন কালে সে অর্থেই ব্যবহৃত হইত না। “গবেষণা” শব্দটি ইহার এক জগন্ত দৃষ্টান্ত। কোন কোন বৈয়াকরণ (যেমন বোপদেব) এই শব্দকে ‘গবেষ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এই ‘গবেষ’ ধাতু বোপদেবের নূতন সৃষ্টি। ‘গবেষণা’র প্রচলিত অর্থ “কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ নিমিত্ত অন্বেষণ।” কিন্তু ইহার মৌলিক অর্থ “গোকু খোঁজা।” গবেষণা=গো+এষণা। ‘এষণা’ শব্দ ‘এষ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন—এই ধাতুর অর্থ ‘পাইবার ইচ্ছা করা’ কিম্বা ‘খোঁজা’। সাহিত্যে ‘গবেষণা’ শব্দের অমুরূপ অনেক কথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ‘পুত্রলাভের ইচ্ছা’ এই অর্থে পুত্রেষণা (=পুত্র+এষণা), ‘বিস্ত লাভের ইচ্ছা’ এই অর্থে বিস্তেষণা (=বিস্ত+এষণা), ‘বিশেষ বিশেষ লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের ইচ্ছা’ এই অর্থে লোকেষণা (=লোক+এষণা) (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।৫।১); ‘হিতের অর্থাৎ কল্যাণের ইচ্ছা’ এই অর্থে হিতেষণা (=হিত+এষণা), ‘ধন লাভের ইচ্ছা’ এই অর্থে ধনেষণা (=ধন+এষণা), ইত্যাদি।

এইরূপ ‘গোকু লাভের ইচ্ছা’ কিম্বা ‘গোকু অমুরূপ কল্প’ এই অর্থেই প্রাচীন কালে ‘গবেষণা’ শব্দ ব্যবহৃত



হইত। আমরা 'গোত্র' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি অতি প্রাচীন কালে পশুই ধন বলিয়া বিবেচিত হইত,— ইংরাজী Pecuniary শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। Pecuniary শব্দ লাতিন Pecus হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ পশু। Pecuniary শব্দের ধাতুর্থে 'পশু সম্বন্ধীয়'; বর্তমান প্রচলিত অর্থ "অর্থ সম্বন্ধীয়।" এই অর্থের কি প্রকারে পরিবর্তন হইল তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। পূর্বে পশুই ছিল ধন। এই পশুর মধ্যে গোরুই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং গোরুই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। এই গোধন লাভ কিংবা এই গোধন অন্বেষণকেই পূর্বে 'গবেষণা' বলা হইত। ঋগ্বেদেও এই অর্থেই 'গবেষণা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

স ঘাষিবে অন্বেষণো গবেষণো বন্ধুন্ধিভ্যো গবেষণঃ (১।১৩২)। ইহার পদপাঠ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—  
সঃ ঘ বিদে অন্ব ইন্দঃ গো এষণঃ বন্ধুন্ধিভ্যঃ গো এষণঃ।  
ইন্দ বন্ধুদিগের ( অর্থাৎ নিজের উপাসকদিগের ) জন্ম  
গো অন্বেষণ করেন, এই জন্ম এখানে ইন্দকে গবেষণঃ  
( গো + এষণঃ ) বলা হইয়াছে।

গবেষণঃ স ধ্বমুঃ (৭।২০।৫)। পদপাঠ এইরূপ—গো  
এষণঃ সঃ ধ্বমুঃ—ইন্দ গো অন্বেষণ করেন এবং তিনি শক্র-  
ধ্বংসক। সায়ণও লিখিয়াছেন— গবেষণঃ = গবান্ অন্বেষণ।

যুদ্ধে রথন্ গবেষণন্ হ্রিভ্যাম্ ( ৭.২৩।৩ ) = গো-  
অন্বেষণক রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করি। এখানে গবেষণন্ =  
গো + এষণন্। গো লাভের জন্ম কিংবা গো অন্বেষণের  
জন্ম অনেক সময় রথে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়,  
এই জন্ম রথকে 'গবেষণ' বলা হইয়াছে।

ইমন্ চ নঃ গবেষণন্ ( গো + এষণন্ ) সাতয়ে সীসধঃ  
(৬।৫৬।৫)। এস্থলে গো-অন্বেষণকারী লোককে 'গবেষণন্'  
বলা হইয়াছে।

গো লাভের জন্ম অনেক সময় যুদ্ধ করিতে হয় এবং  
যুদ্ধে হ্রস্বভি নিনাদিত হইয়া থাকে। এই জন্ম অধর্ক বেদে  
(৫।২০।১১) হ্রস্বভিকে 'গবেষণঃ' বলা হইয়াছে।

'ইষ' শব্দ এবং 'এষণ' শব্দ একই ধাতু ('ইষ = ইচ্ছা  
করা) হইতে নিষ্পন্ন। গো শব্দের সহিত কেবল যে  
এষণ শব্দেরই সংযোগ হইয়া থাকে তাহা নহে, 'ইষ' শব্দও  
ইহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। গো + ইষ = গবিষ ;

যাহারা গো কামনা করে তাহাদিগকে 'গবিষ' বলা হয়।  
ঋগ্বেদে এই অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ( ৪।৪১।৭,  
৪। ৩২ ; ৮।২৪।২০ ইত্যাদি )।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এক সময়ে গো লাভের ইচ্ছা,  
গো অন্বেষণ,—একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।  
'গবেষণ' 'গবিষ' ইত্যাদি কথাও সদা সর্বদাই ব্যবহৃত  
হইত। উক্ত অংশসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে  
যে 'গবেষণঃ' শব্দের অর্থ "যে গো অন্বেষণ করে"।  
সুতরাং 'গবেষণা' শব্দের অর্থ গো অন্বেষণ কিংবা গো  
লাভের ইচ্ছা। এই মৌলিক অর্থ হইতে কি প্রকারে  
বর্তমান সময়ের প্রচলিত অর্থ আসিল, তাহা নিরূপণ করা  
কঠিন নহে। প্রাচীন কালে গো-ই প্রধান ধন ছিল,  
সুতরাং 'গো অন্বেষণ' অর্থ 'ধন অন্বেষণ'; ক্রমে ধনের  
অর্থ প্রসারিত হইতে লাগিল, অপর আবশ্যিক বস্তুও ধন  
বলিয়া গৃহীত হইল। যাহা মূল্যবান তাহাই ধন, সুতরাং  
এখন দাঁড়াইল 'গো অন্বেষণ' অর্থ 'মূল্যবান বস্তু অন্বেষণ'।  
কালে মানব যখন 'জড়' হইতে 'অ-জড়ে' পৌঁছিল  
তখন 'তত্ত্বজ্ঞান'কেও মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করিতে  
লাগিল। পূর্বে যাহার অর্থ ছিল 'গোধন অন্বেষণ' এখন  
সেই শব্দের অর্থ হইল 'তত্ত্ব অন্বেষণ'। সর্ব ভাষাতেই  
অর্থের এইরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

## পতিতজাতি উদ্ধার সমিতি

( পালঘাট । )

বিংশ শতাব্দীর স্তম্ভে স্তম্ভে ভারতবর্ষে একটা নবযুগের  
সূচনা হইয়াছে। এই মহামিলনের যাত্রার দিনে লোক  
আর সমাজকে সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে দিতে  
চাহিতেছে না। তাই আজ তথাকথিত "অস্পৃশ্য"  
জাতিদিগকে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিয়া বিরাট  
হিন্দুসমাজের কোনও এক উচ্চতর প্রদেশে স্থান দিবার  
জন্ম কয়েকজন মহাপ্রাণের প্রাণে বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে  
এবং তাহারা চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। দেশের এই  
নবউষার প্রারম্ভ কালে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব



পালঘাটের পতিত জাতির স্কুল স্থাপন। মদ্যস্থলে মাননীয় বিচারপতি সার শঙ্করন্ নায়ার উপবিষ্ট।

হইয়াছিল ও এই নবযুগের অন্তিম হোতাশ্বরূপ তাঁহার মেঘমল্ল বাণী সমাজের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন মানবজীবনের স্বার্থশূণ্য দুইটি উদ্দেশ্য—একটি ধর্মজগতে উন্নতিলাভ ও অপরটি সমাজসেবা। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণমিশনের অপর একজন স্বামী ব্রাহ্মবাদিনেরই চেষ্টায় পালঘাটে বেদান্ত-সভার সৃষ্টি হইয়াছে ও সভা স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণদের সঙ্কীর্ণতার জন্ম হিন্দুসমাজকে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিষ্ঠিতে হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণরাই এখানে পতিতের উদ্ধারের জন্ম অগ্রবর্তী হইয়া অতীতের পাপকে নবীন সহৃদয়তার জালে ঢাকিয়া কেলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিকতার সহিত এই কার্যে যোগ দিয়াছেন। অগ্ন্যাণ্ড জাতিরা যখন দেখিল ব্রাহ্মণেরাই এই কার্যে অগ্রবর্তী তখন তাহারাও আসিয়া যোগ দিতে লাগিল ও মিশনের চেষ্টাক্রম ফলবান্ হইবার আশা অতি নিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু স্বার্থলিপ্ত, স্বার্থশূণ্য যাহাই হউক না কেন সকল কার্যেই অর্থের প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই-সকল কার্যে অর্থ-বিনা অগ্রসর হইবার যো নাই।

এমন কি একবার অর্থাভাবে মিশনের কার্য বন্ধ হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল।

প্রথমে পতিত জাতিদিগের জন্ম একটা অবৈতনিক শিল্প-শিক্ষার-ব্যবস্থা-সম্বিত প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। কিন্তু “চেষ্টা করে যে ভগবান তাঁহার সহায় হন।” মিশনের সম্পাদক শেয়ার্যের অক্লান্ত চেষ্টায়, অদম্য উৎসাহে চেষ্টা অবশেষে ফলবর্তী হইয়া উঠিল। শেয়ার্য নিজে ব্রাহ্মণ, পরদুঃখ-কাহর। তাঁহার নিজেরই এত কাজ যে অল্প কাজ করার সময় পাওয়া কঠিন। কিন্তু বিপুল এই গুরুতর ভার স্বীয় শ্রমে লইয়া কার্যসূপের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে নিষ্ঠার সহিত পতিতজাতির উদ্ধার কার্যে নিরত হইয়াছেন। জীবনে ইহাই তিনি কর্তব্য মনে করিয়া লইয়াছেন ও যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহা শত কার্যের মধ্যেও ঠাঁকড়াইয়া ধরিয়া করিয়া যাইতেছেন। এইটুকু তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। প্রত্যহ সকালেই তাঁহাকে গাড়ী চড়িয়া ইয় স্কুলের কার্য পরিদর্শন, নয় চাঁদা আদায়, বা অন্ত্যজ পঞ্চমদের সুখস্বাস্থ্যের জন্ম কার্য করিতে বহির্গত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার



পালঘাট পতিত জাতির স্কুলের প্রথম ছাত্রদল। মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শেখাৰ্ঘ্য মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

কুকুরটীও প্রভুর অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে ফিরে। শেখাৰ্ঘ্যের সহকারী শ্রীযুক্ত বেকটরাম সেখানকার একজন পদস্থ ব্যক্তি। তিনি পঞ্চম নামে অভিহিত অন্ত্যজদিগকে বয়নকার্য শিক্ষা দিবার জন্ত ছয়টি হস্তচালিত তাঁত ও মিশনের পুস্তকাগারে বেদান্ত ও ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন। ইনিও একজন বেশ উদ্যোগী পুরুষসিংহ।

বেকটরাম তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আর অধিক আশা করা অচ্যায়; কিন্তু ইহাতেও মিশনের কার্য্য অর্থাভাবে মন্দা পড়িয়া গিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে শেখাৰ্ঘ্য মহাশয় স্বামী সারদানন্দকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন, স্বামীজীও স্বীকৃত হইয়া পালঘাটে যান। এই সময়ই মিশনের অর্থাভাবের সময়; কিন্তু স্বামী সারদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন ও বিগত ২১শে এপ্রিল জুটিস্ সার শঙ্করন্ নায়ার মহাশয় পালঘাটে পতিত জাতির জন্ত একটি রীতিমত প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন।

প্রথম প্রথম স্কুলটি কেবল দিনেই হইত; স্কুল খোলার সময় মাত্র ১৬ জন বালক ও একজন বালিকা ছিল। এরূপ আরম্ভ যাহার, তাহার ভবিষ্যৎ যে আশার আলোকে

সমুজ্জ্বল তাহা সূনিশ্চিত। এক মাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ দাঁড়াইয়াছে কিন্তু বালিকা সেই একটীই আছে। মিশন শুধু অবৈতনিক শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, এমন কি ছেলেদিগকে শ্লেট, পেনসিল, ইত্যাদি ও বই বিনামূল্যে দিয়া থাকেন ও যাহারা অতি গরীব তাহাদিগকে কাপড় ও পোষাকও বিনামূল্যে দেন। মালাবারের পঞ্চমরা সাধারণতঃ সকলেই গরীব। কোনও রকমে দিন খাটিয়া দিন আনিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাহাদের পক্ষে স্কুলে ছেলে পড়ান কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। উক্ত স্কুল খোলার এক সপ্তাহ পরে মালাবারের কালেক্টার মিঃ ইন্স্ আর একটা নৈশবিদ্যালয় খুলিয়া গিয়াছেন। মিশ্র পঞ্চমরা এই বিদ্যালয়ে পড়ে। স্থানীয় থিওজপিক্যাল সভার গৃহে এই স্কুলটি হইয়া থাকে। এই নৈশবিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইয়াছে যে, স্থান সঙ্কুলান হয় না। সেইজন্ত বর্তমানে একটা খড়ের ঘর নির্মাণের প্রস্তাব উঠিয়াছে। উপযুক্ত অর্থলাভ ঘটিলেই স্থায়ী স্কুলভবন নির্মিত হইবে। খৃষ্টান মিশনারীদের মত বেদান্ত-সভার অনেক স্বামী পঞ্চমদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, পান-প্রথার কুফল সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় পঞ্চমদের মধ্যে পান-

প্রথার ভারী প্রচলন; খুব কম লোকই আছে যে এই কদর্য প্রথার বশীভূত নহে। তাঁহারা অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও সাহায্য করিয়া থাকেন। কার্য্যকরী সভার আর একটা উদ্দেশ্য আছে যে পঞ্চমদের সুবিধার জন্য একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। এই দারিদ্র্যানির্পীড়িত পঞ্চমদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা মাথার নাম পায়ে ফেলিয়া সারাদিন গাধার মত খাটিয়া যাহা উপার্জন করে তদ্বারাই কোনও রকমে সংসার নির্বাহ হয়। সেই হেতু কার্য্যকাল দিবাভাগে তাহারা স্কুলে যাইতে পারে না। স্কুলে একজন বালক আছে। সে প্রতিবেশীর গরু চরায়, তাহার মাহিনা মাত্র ১২ টাকা। কিন্তু তাহার অবস্থা এত খারাপ যে, সে এই এক টাকা উপার্জন ত্যাগ করিয়া স্কুলে দিনে আসিতে পারে না। সেইজন্য সে নৈশবিদ্যালয়ে পড়ে। এই উপার্জন ত্যাগ করিলে তাহাকে অনেক নিরন্ন দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই ছেলেটি বেশ চালাক চতুর। স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হয়। ছেলেদের অর্থহীন নাম বদলাইয়া হিন্দুদেবতা রাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ইত্যাদি নূতন নামকরণ হইয়াছে। স্থানীয় হাঁসপাতালের এসিষ্ট্যান্ট সার্জন মিঃ কৃষ্ণ ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন।

সমাজে ধোপা নাপিতেরও যে অধিকার আছে পঞ্চমরা সে অধিকারটুকু হইতেও বঞ্চিত। এমন কি যে সকল পুকুর উচ্চবর্ণের লোকেরা নোঙরা কার্য্যে ব্যবহার করে, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও পুকুর হইতে তাহাদিগকে পানীয় জল পর্য্যন্ত লইতে দেওয়া হয় না। মিশনের আয় সামান্য; এই সামান্য আয় হইতেই কিছু টাকা ভাগ করিয়া লইয়া ইহাদের জন্য কুপ খনন করা হইতেছে।

কিন্তু এইরূপ বিরাট মহৎকার্য্য একজনের চেষ্টায় হওয়া একরূপ অসম্ভব। দেশের ও সমাজের অধিকাংশই এইরূপ পতিত জাতি। হিন্দুসমাজ এতদিন ইহাদিগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের এই উদ্ধারের প্রচেষ্টায় দানবীরগণ মুক্তহস্ত হউন, দেশের কর্ম্মশক্তির জাগরণের সাহায্য করুন। \*

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

\* Modern Review, July, 1913.

## “সমাজ বা দেশাচার” \*

( সমালোচনা )

“দেশ-হিতৈষীরা দেশের উন্নতির চেষ্টা করতেন; কিন্তু সে দেশের কি কখনও উন্নতি হতে পারে, যে-দেশের স্ত্রীলোকের চোখের জল শুখায় না; কমলার মত রমণী, যার আদর্শ লোকের চরিত্র গঠন কতে পারে, এমন সব রমণী যেখানে অনাদরে অবজায় কৈদে জীবন শেষ কতে; যে-দেশে জননী জীবনের, জননীর স্বাস্থ্যের মূল্য নেই; যে-দেশের রীতি দেশের লোক যাতে দুর্বল হয়ে জন্মায় তার চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজ, এর প্রতিকার দূরে থাক, এই অনিষ্টকর রীতির পোষকতা করে; সমাজহিতৈষী দেশহিতৈষীরা কখনও এদিকে চেয়েও দেখেন না। কন্যার পিতারা—যাঁরা এর ফল মর্মে মর্মে ভোগ করতেন, তাঁরাও এর প্রতিকার কতে ভয় পান। চোখের সামনে নিজ সম্মানের মৃত্যু দেখতে পারেন, যন্ত্রণা দেখতে পারেন, তবু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। ষিক! আজ যদি সমস্ত কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা করেন যে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেবেন, তা হলে সমাজ কি করতে পারে? কেবল যদি তাঁরা এই ভীকতা এই হৃদয়হীনতা ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞা করেন ‘ছোট বেলায় মেয়ের বিবাহ দিব না’ আর আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা দেশের, সমাজের ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন ‘বালিকা বিবাহ করব না’ তা হলেই এই প্রতিদিনের নারীহত্যা শিওহত্যা বালিকাহত্যা নিবারণ হয়। কিন্তু তাঁরা তা না করে Self-Government ও Nationalism-এর উপর কংগ্রেসে লম্বা লম্বা Speech দেন, আর প্রতিদিনের এই যে মনুষ্যহত্যা—যার প্রতিকার তাঁদের নিজেদের হাতে, তার কথা কখনও ভাবেন না। এই তাঁরাই আবার তাঁদের শিক্ষার গর্ভ করতেন। তাঁদের শিক্ষার ষিক! তাঁদের সমাজে ষিক!”

শিক্ষার গর্ভ করি নাই, সমাজকেও দোষহীন বলি না। তবে কংগ্রেসে বক্তৃতা করিয়াছি, Self-Government ও Nationalism-এর কথাও বলিয়াছি। বালিকা বিবাহ করিয়াছি, বালিকা বিবাহ দিয়াছিও। কায়েই “হেমলতা”-রচয়িত্রী এই তীব্র ভৎসনা পড়িয়া যে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণার উজ্জেক হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে আমি গুণ্ঠিত হইতেছি না। আমাদের সমাজের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা অস্বীকার বোধ হয় অনেকেই করেন না। যদি কাহারও এ বিষয়ে সম্মত সন্দেহ থাকে তাহাকে আমি এই “সমাজ বা দেশাচার” নাটিকা পড়িতে অনুরোধ করি। এইরূপ সামাজিক নক্সা যে আমাদের একটি গৃহলক্ষী, একটি হিন্দুকুলবধূ, শেষটা মুখ ফুটিয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়ভেদী প্রমাণ আর কি হইতে পারে। কারণ যিনি লিখিয়াছেন তিনি মর্মান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, যিনি পড়িবেন তিনিও মর্মান্বিত হইয়া পড়িবেন। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ক্রন্দন এরকম শুনিতে পাওয়া যায় না। লেখিকা যথেষ্ট গবেষণার পর, নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া ও পড়িয়া, নিজের মত স্থির করিয়াছেন এবং সাহসের সহিত বিনা সঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। লেখিকা ধন্য! আমি অন্তরের সহিত তাহাকে সাধুবাদ দিতেছি।

\* নাটক, “হেমলতা” রচয়িত্রী প্রণীত। এলাহাবাদ, ইতিহাস প্রেস, মূল্য ছয় আনা।

নগ্না নাটিকা আকারে অঙ্কিত হইয়াছে, পাঠকবর্গের ও পাঠিকা-মণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হইবে। আলোচ্য বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর। আমি তাহারই সংক্ষেপে দুইটি একটি কথা বলিব মাত্র।

লেখিকা দেখাইয়াছেন বাল্যবিবাহের ফল বিষয়। প্রথম, দুঃখপোষ্য বালিকার সহিত হৃদয় বিনিময় হয় না, ফল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা হয় না, স্বামীর চরিত্রে দোষ আসে, স্ত্রীর অনন্ত দুঃখ হয়, পতির-প্রেম-অপ্রাপ্ত শূণ্যজীবনে যদি পরপুরুষের অনুরাগের ছায়া পড়ে তাহাতে সুখ নাই, বরং পরিণাম অতৃপ্তি ও আত্মহত্যা। স্বামীও আবার চরিত্র হারাইয়া জঘন্য অত্যাচার করিয়া অকালে প্রাণ হারায়, বালিকা স্ত্রী হয়ত এত অল্প বয়সে বালিকা বিধবা হইয়া পড়ে যে সে বুঝিতেই পারে না তার কি সর্বনাশ হইল। দ্বিতীয়, বালিকা স্ত্রী শীঘ্র বালিকা জননী হইয়া পড়ে, ফল, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ অথবা অকালমৃত্যু। যদি বা না মরিল, বালিকা অবস্থায়, গৃহিণীর কর্তব্য বা দায়িত্ব বুঝিবার পূর্বে, গৃহিণীপদ পাইয়া গৌরবে ধরা-ধানিকে সরা দেখিয়া অকারণ অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ভাগ্য বলে, আর সেই অভ্যাস চিরদিন থাকিয়া যায়, পরিণাম সংসারে ঘোর অশান্তি। এইরূপে আমাদের দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে।

আমি “সমাজ” পড়িবার পূর্বে আমাদের সমাজ নৈতিক হিসাবে যে নরক হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনে করিতাম না। বাল্য-বিবাহ আমাদের দেশে কিছু নূতন নহে, তবে আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে, সাধারণতঃ দাম্পত্যজীবন আমাদের দেশে সুখময়। পাপ পৃথিবীতে সর্বত্রই আছে, তবে পাপ কিম্বা কলঙ্ক সংমিশ্রিত না হইলে যে যথার্থ প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা কখনও মনে করি নাই। শুনিয়াছি বঙ্গদেশে আধুনিক উপন্যাসের উপাদানের মধ্যে অপবিত্র এবং আইনবিরুদ্ধ প্রণয় একটি প্রধান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ওরূপ উপন্যাস পড়িবার আমার রুচিও নাই সময়ও নাই। বিবাহের পূর্বে বলিয়াছিলাম,—

Who is the happy husband? He

Who, scanning his new wedded life,

Thanks Heaven, with a conscience free,

'Twas faithful to his future wife.

বিবাহের পর এ কথার যে কোন প্রতিবাদ হইতে পারে তাহাত স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু “সমাজ”-রচয়িত্রী আমার বিশেষ প্রশংসার পাত্রী, তিনি বলিয়াছেন তাহার চিত্র অতিরঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আমি নতমস্তকে স্বীকার করিলাম, আজ বুঝিলাম যে, যেমন যক্ষুপীড়াগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তি সকল বস্তুকেই পীতবর্ণ দেখে, তেমনি আমিও নিজের সংসারে সুখ দেখিয়া মনে করিয়াছি বঙ্গসমাজটা কীটদষ্ট নহে। যাহা পূর্বে কল্পিত কল্পনার বিভীষিকা বলিয়া প্রত্যয় হয় নাই, আজ জানিলাম তাহার অভ্যন্তরে সকলই অসত্য নহে।

তবে পঁচিশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে একটা দশ বৎসরের মেয়ের বিবাহের অনুমোদন করিতে আমি কখনই প্রস্তুত ছিলাম না। “সমাজ”-রচয়িত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, “বিবাহ কি খেলা? স্ত্রী যে সহস্রশিখী—সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী। সে আমাদের দেশে আজ হাড়ী বেড়ীর মত জিনিষ মাত্র, কিম্বা টেবিল চেয়ারের মত গৃহসজ্জার জিনিষের সমান। এতে যে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করা হইছে।” বড়ই দুঃখের বিষয় যে যে-দেশে ঈশ্বরকে পর্যাস্ত মাতৃরূপে পূজা করা হয়, সে দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্যক ও সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

কিন্তু বহুদিন গত হয় নাই অন্ততঃ কিছু লোকের এরূপ ধারণা ছিল যে বাল্যবিবাহের দরুণ পুরুষজাতিই বেশী অক্ষী হয়। কবি বলিয়াছেন, বিবাহিতা নারী সখের খেলনা, সে প্রণয়, কেমন, পতি নারীর কিবা ধন, তা, জানে না ও ভাবে না। পুরুষেরা নারীর অন্তরের কথা জানিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লম্ব করা বিচিত্র নহে। “সমাজ”-রচয়িত্রী সুন্দররূপে এই ভ্রম দেখাইয়াছেন। তাহার আদর্শরমণী কমলা বলিতেছে, “আমি মানুষ, আমার হৃদয় আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ-দুঃখ-বোধ আছে। কেবল গহনা কাপড় আর সাজান ঘর পেয়ে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না, বিশেষতঃ মেয়ে মানুষ। কিন্তু সেজগৎ কাকে দোষ দেব? নয় বৎসরের বালিকাকে ছান্দিশ বৎসরের যুবক তা ছাড়া আর কি দিতে পারে? জোর অবজ্ঞামিশ্রিত একটু স্নেহ বা আদর। নয় বৎসরের বালিকাও তখন তার দুঃখ অभाव বুঝল না; তারপর যখন বুঝল, তখন স্বামীর হৃদয় অধিকার করবার জগৎ ব্যাকুল হইল; কিন্তু তখন স্বামীর হৃদয় কোথায়? বিভিন্ন প্রকৃতির নিম্পীড়নে তখন সে শুষ্ক কঠোর হয়ে গেছে। তখন স্ত্রী গৃহে সজ্জিত গৃহিণী হয়ে রইলেন। আর স্বামী বাহিরে অর্থোপার্জন আর আমোদে ব্যস্ত রইলেন। স্ত্রীকে প্রথম দর্শনে স্বামীর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেই ভাবই রয়ে গেল, স্বামীর চোখে স্ত্রী সেই নির্কোষ বালিকাই রইল, কিন্তু স্ত্রী অন্তরে অন্তরে অল্পভব করতে লাগল যে, আর সে বালিকা নয়। লজ্জা তখন তার ভার বোধ হতে লাগল যখন দেখলে তার পরণে ছেঁড়া কাপড় কি বারাগনী কাপড় স্বামীর দৃষ্টিতে পড়ে না, গৃহকর্ত্রী মনে করে সে আর তখন গৌরব বোধ করল না, যখন দেখল গৃহকর্ত্রী তার প্রতি উদাসীন। হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে তার হৃদয়টা তখন হাহাকার কতে লাগল। এতটা ভালবাসা কেবল অবজ্ঞাত হল।” এ কাতর আর্তনাদ মর্মস্থলের নিভৃততম কন্দর সর্বনিম্ন সুর হইতে উথিত হইয়াছে, পুরুষ লেখকের কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নাই; বাইরন বলিয়া গিয়াছেন প্রেম পুরুষের জীবনের অংশমাত্র, স্ত্রীলোকের সমগ্রজীবন। তবে এইরূপে নারী-হৃদয়ের আবরণ তুলিয়া, হৃদয়টাকে উণ্টাইয়া ফেলিয়া ভিতরের ভাগটা বাহিরে আনিয়া, তাহার অসীম অতৃপ্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাহার দুর্দম নিষ্ঠুর জ্বালা ও যন্ত্রণা, সহৃদয় স্ত্রীলেখিকা ব্যতিরেকে আর কেহ দেখাইতে পারিত না।

আমি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নহি, বাল্যবিবাহে যে দেশের অশেষ অকল্যাণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তর্কের বাহির, মনে করি। ইহাও জানি যে বাল্যবিবাহ আমাদের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম-সঙ্গত নহে। এই বাল্যবিবাহের জন্ত জাতীয় তেজ ও বল সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সহস্র সহস্র বহুমূল্য জীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, ফুল ফুটিবার আগে ঝরিয়া যাইতেছে, আমরা কোন রকমে কোন দিকেই মাথা তুলিতে পারিতেছি না। বিবাহ যে স্ত্রীপুরুষ দুই জনের জন্তই সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার, তাহা লোকে বিশ্বৃত হইতেছে, বেদের বিবাহমন্ত্র-সকল বুঝিবার চেষ্টা নাই। যখন পুতুল খেলিবার বয়স তখন বালিকার সন্তানের জননী হইয়া পড়ে, লেখাপড়া শেষ হইবার পূর্বে বালকেরা সংসারের ভারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এ রকম অবস্থায় জাতীয় মঙ্গল কিম্বা জাতীয় উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে? এ রোগের কি প্রতিকার নাই? “সমাজ”-রচয়িত্রী বলিয়াছেন প্রতিকার আমাদের হাতেই। এ কথার আমি পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা সকলেই স্বদেশী, দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী। আমরা যদি একমত হই, আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, বালিকার বিবাহ দিব না, বালিকাকে বিবাহ করিব না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অচিরে জাতি ও

সমাজের সর্বশুভমূলক এই দেশাচার লুপ্ত হইয়া যায়। পূর্বে যত অল্পবয়সে পুরুষের বিবাহ হইত, আজকাল আর তেমন হয় না, অনেকে কিছু উপার্জনের আশায় দুই তিনটা "পাস" না করিলে পুত্রের বিবাহ দেন না, অনেকে ভাল উদ্দেশ্যে বালকের পরিণয় স্থগিত রাখেন। কিন্তু যদি চ গৌরীদান এখন আর অধিক হয় না, তথাপি বালিকাবিবাহ ত প্রত্যহই হইতেছে। "হেনলতা"-রচয়িত্রী এই দারুণ দুই দেশাচারের প্রতিকারের চেষ্টায় বন্ধপারিকর হইয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন; সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেয়ই মনোযোগের সহিত "সমাজ" পাঠ করা উচিত।

এলাহাবাদ।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মালা ও নির্মালা

(সমালোচনা)

'আলো ও ছায়া'-প্রণেত্রী নূতন পুষ্প চয়ন পূর্বক এক 'মালা' রচনা করিয়াছেন। নিবেদন করিয়াছেন বিধাতার শ্রীচরণে।

এক সূত্রে জন্মমৃত্যু,

আনন্দ বেদন,

মালা গাঁথি শ্রীচরণে দাও ॥

ইহার সঙ্গে 'নির্মালা'ও মুদ্রিত হইয়াছে।

শুভভাষায় 'আলো ও ছায়া'র স্থান অতুলনীয়। এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহা ইহার অভাব পূর্ণ করিতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন—"নিতান্তই অতিশয়োক্তি। যেদেশে রবীন্দ্রনাথ রহিয়াছেন, সেদেশে কি একথা শোভা পায়?" এ প্রকার সন্দেহ কিন্তু ঠিক নহে। যে দেশে আমার জন্ম, সে দেশে কি আঙ্গুরের অভাব হইতে পারে না? 'আলো ও ছায়া'র কবি আমাদের কাছে বাহা দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, অথ কেহ তাহা দিতে পারেন নাই। 'পঞ্চক' 'সে কি?' প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। স্বীকার করি গ্রন্থে আলো অপেক্ষা ছায়াই অধিক। কিন্তু এই দুঃখের গীতিই গ্রন্থকে শ্রিয়তর করিয়াছে।

"Our sweetest songs are those that speak of saddest thoughts".

মালা ও নির্মালাও সেই পরিচিত স্বর, এখানেও সেই 'মধুর স্বপন', সেই 'আশার কথা', এখানেও

নয়নের জল রয়েছে নয়নে

প্রাণের তবুও যুচেছে ব্যথা ॥

উভয় গ্রন্থের ভাষাই অতি সরল ও প্রাঞ্জল, অথচ গভীর ও প্রাণস্পর্শী। পাঠকগণ এই নূতন গ্রন্থে অনেক নূতন ভাবের আবেশ দেখিবেন—আবার প্রাচীন ভাবেরও নূতন বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আলো ও ছায়া'র ভাব মালা ও নির্মালায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এক অপরের প্রপৃষ্ঠি। আলো ও ছায়া'র কবি 'নবীন', মালা ও নির্মালা'র কবি 'প্রবীণ'। আলো ও ছায়া'র ভাব উদ্দাম, শক্তি উন্মাদিনী—মালা ও নির্মালা'র কবিও ভাবে আবিষ্ট, তবে অধিকাংশ স্থলে অপেক্ষাকৃত সংযত ও প্রশান্ত। বাঁহারা আলো ও ছায়া পড়েন নাই, তাঁহারা ইহা পড়ুন। আর বাঁহারা পড়িয়াছেন,— তাঁহাদিগকে মালা ও নির্মালা পড়িতে অস্বরোধ করি। পড়িলেই বুঝিবেন—কি প্রকার সরল ও সরস ভাষায় কত উচ্চ ও গভীর ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ১১০টি কবিতা আছে, ইহার মধ্যে ৪৯টি নির্মালাই প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। আমরা কেবল দুই একটা কবিতা লইয়া আলোচনা করিব।

(১)

প্রথম কবিতার নাম 'মঙ্গলিক'। নিদারুণ শীত চলিয়া গেল, মধুমাস আসিয়া উপস্থিত; বসন্তের সুমঙ্গল গীত শুনিয়া কবি বলিতেছেন:—

"যে দেশে আছি সূতোর সৌন্দর্যের শেষ নাই,

জরা যথা শিশু যৌবন,

পুরাতন নাহি সেখা, মৃতনের চিরলীলা

জীবনের জনক মরণ।

এক দেশে সূর্য্য অন্তিমিত হয়, কিন্তু অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই শৈশবাবস্থা, কিংবা প্রথম যৌবন। একদেশে সূর্য্যের মৃত্যু, অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই জন্ম। উদ্ভিদজগতেও ইহা সত্য। উদ্ভিদ জরাগ্রস্ত হইল, রহিয়া গেল বীজ, এই বীজই নূতন উদ্ভিদের শৈশব অবস্থা। এক উদ্ভিদ মরিয়া গেল, তাহার স্থলে উৎপন্ন হইল নূতন বৃক্ষ। মৃত্যু জীবনের জনক হইল। কবি যে-রাজ্যের কথা বলিতেছেন—সে রাজ্যে জরায় যৌবনের শৈশবাবস্থা এবং মরণই জীবনের জনক।

(২)

জীবনের আদর্শ বিষয়ে এই গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। 'আশীর্বাদ' নামক কবিতাতে কবি নবযুগের নব সাধনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কবিতা রচিত হইয়াছে "অক্টোবর ১৮৯১"। কবির জন্ম, ১২ই অক্টোবর। তাই মনে হয় নিজ জন্মদিন উপলক্ষেই কবি জীবনের আদর্শ বিষয়ে, যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহাই এই কবিতাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কেবল ভাবে 'আমি কিছু নই', 'আমি কিছু নই', কালে তাহার জীবনও তদ্রূপই হইয়া যায়। সেই জ্ঞান কবি বলিতেছেন—

আপনার অযোগ্যতা আজিকার দিনে আর কর'না স্বরণ,

ভক্তিভরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেবতারে করগো বরণ।

আছে শক্তি তোমা মাঝে, করিও না অবহেলা দেবের সে দান,

তোমারি ভিতর দিয়া তোমার বাহিরে তাহা সাধিবে কল্যাণ।

বর্তমান যুগে আমরা কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারিতেছি না, জগতের কল্যাণ এবং আমাদের প্রত্যেকের কল্যাণ এক সূত্রে বাঁধা। জগতের সেবা আত্মার উন্নতিরই একটা অঙ্গ। তাই 'আশীর্বাদ' এই—

দিব্য দৃষ্টি, দিব্য কণ্ঠ, অক্ষয় জীবন লয়ে, মন্দাকিনী সম

বহাও নির্মল ধারা আতপ্ত-ধরণী-বক্ষে, স্নিগ্ধ নিরুপম

করিয়া উভয় কূল, হরিয়া মালিন্ধ্যভার; নিজে চলে যাও

অনন্ত জলধি পানে, সকল পিয়াস তব সেথায় মিটাও।

গাহি যাও প্রীতিগীতি, বেগবতি, ভোগবতি, বিষ্ণুপদ-ভবে,

তোমা হতে ভিক্ষার কত সপনের বংশ সমুদ্রার হবে।

'কবির কামনা'তেও এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবি

মাতা ও পিতার আদর্শে জীবন গঠন করিতে চাহিতেছেন:—

মায়ের বুকের শুভ ক্ষীরধারা

বেই কণ্ঠে করিয়াছি পান,

সেই কণ্ঠে যেন গেয়ে যেতে পারি

অনিন্দ্য মধুর গান।

পরসেবা-রত বায়ের হাতের  
পরশ রয়েছে শিরে,  
জনকের শত পুণ্য-অভিলাষ-  
মোরে রেপেছিল ঘিরে ।  
সদা মোর গীতে হটুক ধনিত  
সেবার বাসনা মার,  
পিতার অলস্তু দুর্নীতির ঘৃণা  
অটলতা প্রতিজ্ঞার ।  
শুনে গেন কহে পরিচিত জন—  
“তাদেরি তো সম্মান ।”  
সুধায় অপরে, “কোন প্রস্রবণে  
এ করেছে সুধাপান ?”

জগতের সেবার দিকে কবির দৃষ্টি আগ্রহ । সেই পরম  
দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

হে সুন্দর, তব অনুরাগে  
দিব ঢেলে, যদি কাজে লাগে,  
বিন্দু বিন্দু জীবনের লোহ ।

Browning বলিয়াছেন—

All service ranks the same with God,  
... .. there is no last, nor first.

এ কাজ ছোট, এ কাজ বড়—এভাবে কার্য করিলে চলিবে না ।  
যাহা কর্তব্য তাহা কর্তব্যই । আমাদের কবির ‘আকাঙ্ক্ষা’তে এই  
ভাবই প্রকটিত হইয়াছে ।

যাই করি, কিছু যেন করি,  
স্বপন না ভাল লাগে আর,  
সাধিয়া একটী ক্ষুদ্র ব্রত  
সাক্ষ হোক জীবন আমার ।

মানব ! তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ কিছু করিবার জন্ত—বৃথা  
কল্পনায় সময় যাপন করিবার জন্ত নহে । তাই কবি আবার  
বলিতেছেন :—

শুধু আয়োজন, কাজ হ'ল কই ?  
নাহি প্রবাসের দিন দুই বই, আগ না !  
আশে পাশে চেয়ে ভেবনাকো আর,  
কাজের মাঝারে লাগ এইবার, লাগ না !  
ভাবনা গণনা দূর করে ফেল,  
তুলিতে মাপিতে সব চলে গেল ক্ষমতা ।  
তীরে সম্ভরণ শেখা নাহি হয়,  
ছাড় আপনার প্রতি অতিশয় মমতা ।  
ঝাঁপ দিয়া পড়, ঠিক মধ্যস্রোতে  
পাইবে নিস্তার বাধা বিঘ্ন হ'তে ভাসিবে ।  
পাছে মারা যাই বুঝি এই ভয় ?  
মারা তো যাবেই, না গেলেই নয়,  
নূতন জীবন, শক্তি অক্ষয়  
তা' না হলে কেন আসিবে ।

( ৩ )

কবি ‘আধঘুমে’ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আধঘুমের কথা নহে,—  
তাহা অধ্যাত্মজগতের গভীর তত্ত্ব ।

“একবার আমি যেন শুনেছি কান  
আহ্বান সর্দার—‘এস’ । খুলি গৃহদ্বার

দাঁড়ানু সোপানে যেই, জনকোলাহলে  
ডুবে গেল ধনি, তুলি হৃদয়ের তলে .  
‘যাই যাই’—ব্যাকুলতা, তাই পাতি কান,  
বসে আছি, যদি ফিরে শুনি সেই গান,  
তার দিক লক্ষ্য করি চিনে যাব পথ  
তবেই সার্থক হবে সর্ব মনোরথ ।”

ঊহারই বাণী শ্রবণ করিবার জন্ত, ঊহারই দর্শন লাভের জন্ত  
কবি বসিয়া আছেন ।

“বহুদিন গেল, কত কেহ এণ,  
অচেনা, অপরিচিত,  
তোমার লাগিয়া, রয়েছে জাগিয়া  
ওহে চিরপ্রত্যাশিত ।  
তুমি কত দূরে, কোন্ সৌরপুরে,  
কোন্ দীর্ঘ পথ ধরি  
আসিছ একেলা শূন্য সিন্ধুবেলা  
আলোক-তরঙ্গে ভরি ?”

ঊহার সত্যানুসন্ধানী, সত্য ঊহাদিগের নিকট আত্মস্বরূপ  
প্রকাশিত করেন । প্রথম প্রথম বিজলীর জ্বালা দেখা দিয়া দূরে  
পলায়ন করিতে পারেন, কিন্তু কালে ধরা দিতেই হয় । কবি  
ঊহার জন্ত পাগল হইয়াছেন, ঊহাকে জানিবার জন্ত আত্মা ব্যাকুল ।

সেই অজানারে হবে জানিতে,  
যে পলায় দূরে, তারে বিশ্ব ঘুরে  
নিজপুরে হবে আনিতে ।  
দেখা দিয়া যায়, নাহি দেয় ধরা  
বিজলির মত কভু সে-প্রথরা ।  
স্বপনের মত বিহ্বলতা-ভরা,  
খেলে এ হৃদয়খানিতে,  
তারে ভাল ক'রে হবে জানিতে ।

ইহা শুনিয়া কেহ বলে ‘তোমার দেখিবার তুলি হইয়াছে,’ কেহ  
বলে ‘তুমি পাগল হইয়াছ’—কিন্তু কবি এসব কথা গ্রাহ্য করিতেছেন  
না । তিনি বলিতেছেন—

নারি কা'রো কথা মানিতে  
অজানারে হবে জানিতে ।

তিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন, কিন্তু আবার কোথায় চলিয়া  
যান । তখন অগৎ অন্ধকার ।

যনীভূত অন্ধকারে ফেলে  
ওগো তুমি কোথা চলে গেলে,  
আজ আমি কার পানে চাই ?  
প্রতিপদে পতনের ভয়  
প্রতিক্রমে জাগিছে সংশয়  
কোথা যাই, কোথায় দাঁড়াই ?

হেথা পথ অতীব বন্ধুর  
বন্ধু মোর থাকিওনা দূর,  
হস্ত তব দুর্কলে বাড়াও,  
যতক্ষণ থাকে অন্ধকার  
ধামায়ো'না তব গীতধার,  
প্রীতি আন ভীতিরে ভাড়াও ।

মা'নুষ যাহা চায়, তাহা পায় না ; যাহা পায়, তাহাতে প্রাণের  
পিপাসা মিটে না ।

যাহা পেতে চাই,            যাহা হাতে পাই  
সদা ভিন্ন এ উভয়,  
বাহিত প্রকৃত,            স্বপ্ন আগরণ  
কোথা গেলে এক হয় ?

মানুষ অপূর্ণ ; এই অপূর্ণ 'আমি' লইয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু এই অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

"আমি এ অতৃপ্ত অপূর্ণ আমি  
আমার সম্পূর্ণ আমারে চাই,  
দেবের প্রসাদে যাহা হতে পারি  
আজিও যে আমি আমাতে নাই।  
অথবা রয়েছে আধ বর্তমান  
আলোক-অস্পষ্ট ছবির সমান,  
বীজে যথা নরে অক্ষুর বাস  
অন্ধুরে নিদ্রিত পুষ্পের হাস।

জড়ের মাঝারে শক্তি যেমন  
দেহের মাঝারে প্রাণ,  
তেমনি এ মোর মাঝারে তাহারে  
নেহারি বর্তমান।

যিনি এই প্রকার অনুভব করেন, তিনি নিঃসন্দেহে থাকিয়া স্বপ্ন-মুষ্টি আঁকিতে পারেন না। জীবনের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে করিতেই তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

"এই চির ব্যাকুল হৃদয়  
এই নিত্য মিলনের সাধ,  
যবে একীভূত হয় হয়,  
ঐপ্সিত ও প্রকৃতে বিবাদ  
তবে থাকে। তবে চল যাই।  
এ জীবন মিথ্যা কভু নয়,  
ঝাঝে ঝাঝে যদি দেখা পাই  
থেকে থেকে ধরি ধরি হয়।  
যতদিন চোখে দৃষ্টি থাকে,  
যতদিন চলে এ চরণ,  
অনুসরি চলিব তাঁহাকে  
আত্মা যারে করেছে বরণ।"

কবি যাহাকে বরণ করিয়াছেন, আজ তাঁহার আস্থান শুনা যাইতেছে।

আসিতে বলিলে যদি  
এই আমি আসিতেছি তবে,  
বল দেখি কোন্ দেশে  
কতদূর যাইবার হবে ?

কবি সংসারের পরপারে যাইবার জন্তও প্রস্তুত। তাই বলিতেছেন  
তোমার নিদেশ যাহা

তাহাই আমার মনোরথ ॥

সখা সীম প্রাণে উপস্থিত ; হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সে ভাষা  
কোথায়, যাহা দ্বারা সমুদয় হৃদয়খানা বুঝান যাইতে পারে ?

বুঝাইব কোন কথা দিয়া  
এ আমার সমুদয় হিয়া  
তোমারে যে করিয়াছি দান,  
কেমনে গাহিব আমি গান ?

কোন্ ভাষা করিবে প্রকাশ  
এ আমার আনন্দ-উচ্ছ্বাস,  
মিলন-মিলিত বাবধান,  
কেমনে গাহিব আমি গান ?

এ জগতে আছে কোন লয়  
মনিতে এ বাধা মধুময়  
এই হাসি অক্ষর সমান  
কেমনে গাহিব আমি গান ?

মহাকবি মেগাপিয়ার বলিয়াছেন

The lunatic, the lover, the poet  
Are of imagination all compact.

যাহারা পাগল, তাহার একটা ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা  
কবি, তাহারও ভাবাবিষ্ট : কিন্তু এ ভাব উন্মার্গগামী নহে—ইহা  
সত্যসম্পর্কজনিত। এই দেহ-ভাও এত ভাব ধারণ করিতে পারে না।  
ভাবের তরঙ্গে দেহ বিচলিত হইয়া উঠে। লোকে বলে এ যে  
একটা পাগল। আমাদের কবিও মাঝে মাঝে এইরূপ পাগল হন।

"আমার কি হ'ল ভাই,  
তোমাদের এমন কি হয় ?  
জনতার প্রবাহ মাঝারে  
ছেড়ে যদি দিই আপনারে,  
তীরে কে সে দাঁড়াইয়া রয়  
শঙ্কিত নয়নে ফিরে চাই।

\* \* \* \* \*  
কেমন যে রীতি তার  
সদা মোর সাথে সাথে ফিরে  
আমি যেন নহি আপনার  
প্রাণে মোর অশান্তি সদাই।"

আমরা চাই নিজের সুখ, সত্যস্বরূপ আমাদেরকে নিজের করিয়া  
লইতে চাহেন। অনেক সময় ইহা আমাদের ঐতিকর হয়না,  
তাঁহার উপস্থিতি অসহ্য বলিয়া মনে হয়।

তার উপস্থিতি ভাই,  
নিতান্ত অসহ্য হয় কভু,  
বলি, তুমি কেন হে এমন  
সাথে থাকি কর উৎপীড়ন ?  
আমি মোর আপনার প্রভু  
তোমার কি কাজ মোর ঠাই ?

অনেক সময় আমরা ইহা হইতে দূরে থাকিতে চাই কিন্তু

কি আমি বলিব তাই,  
সাধ্য নাই যাই তারে ফেলে,  
সেই তার আঁধি নির্গমে  
হৃদয়ে বিধায় তীক্ষ্ণ ক্রেশ,  
আলিজিতে যাই বাছ মেলি  
পড়ি তার চরণে লুটাই।

বুঝিয়া না বুঝি ভাই,  
সে আমারে কি করিতে চায়,  
একা গেলে আকাশের তরে  
কানে প্রাণে কি যে কথা বলে  
কি চেতনা প্রাণ মন ছায়—



অনুভবি কেবল জীবন,  
অতীত সে হয় অন্তর্ধান,  
নেহারি অনন্ত বর্তমান,  
অমৃতপূরিত ত্রিভুবন ।

যখন সেই অন্তরাগ্নি আমাদের প্রাণ অধিকার করিয়া বসেন,  
তখন অতীত ভবিষ্যতের পার্থক্য দৃষ্টিয়া যায়। আমরা সমুদয়ই  
তাঁহাতে বর্তমান দেখি ।

সে শুভ মুহূর্তে ভাই,  
আপনারে যাই আমি ভুলে,  
স্বর্গপানে দুটি আঁখি তুলে  
বিধাতার যেন দেখা পাই ।

ইনি এত কাছে, অথচ সম্পূর্ণ মিলিতই বা হন না কেন, তিনি কেন  
ব্যবধান রাখেন ?

কে মোরে বলিবে ভাই  
কে সে জন সাথে ফিরে হেন,  
সম্মুখে কি পার্শ্বে কেন রয়,  
ছায়াহীন কার্যা জ্যোতির্শয়,  
আমাতে মিলিত নহে কেন ?

কবি ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

তুমি কহ, তোমারে সুধাই  
ওহে মম নিত্য সহচর,  
ওহে মোর ভৃত্য কিম্বা স্বামী  
কেন মাঝে রাখ এ অন্তর,  
ওগো মোর আমা-হতে-আমি ।”

প্রকৃতপক্ষে সেই অন্তরাগ্নিকেই বলিতে পারি—

ওগো মোর আমা-হতে-আমি ।

আমি নিজে আমার তত আপনার নই, তিনি আমার যত আপনার ।

( ৪ )

Browning ( ব্রাউনিং ) 'The Statue and the Bust' নামক  
একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। একজন রমণী নববিবাহিতা  
হইলেন, কিন্তু তিনি অনুরক্তা হইলেন (Great Duke Ferdinand-  
এর প্রতি ; Ferdinandও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন।  
উভয়েরই ইচ্ছা পলায়ন করিয়া পরস্পর মিলিত হন। ইহারা কাল-  
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন, আজ না কাল, কাল না পরশু, এই  
ভাবে সময় চলিয়া গেল। ফল হইল এই—যে, ইহাদিগের প্রেমায়  
অল্পে অল্পে নির্ঝাপিত হইয়া গেল। উভয়েই ভাবিতে লাগিলেন—  
তাঁহাদিগের সে প্রেম কি স্বপ্ন?—কবি এজগৎ ইহাদিগকে তিরস্কার  
করিয়াছেন। কবির এই ভাব অনেকে পছন্দ করেন না, তাই তিনি  
বলিতেছেন—

I hear your reproach—"But delay was best,  
For their end was a Crime !—Oh, a crime will do  
As well, I reply, to serve for a test.

The true has no value beyond the sham.  
Stake your counter as boldly every whit,  
Venture as truly, use the same skill,  
Do your best, whether winning or losing it,  
If you chose to play,—is my principle  
Let a man contend to the uttermost  
For his life's set prize, be what it will

উদ্দেশ্য ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, যদি সফল  
করিয়া থাক তবে সেই পথে অগ্রসর হও ।

আমাদিগের কবি ঠিক ইহার বিপরীত শিক্ষা দিতেছেন। দুইটি  
আত্মা প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একজন  
অপরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর বুঝিতে পারিলেন বড়ই  
ভুল হইয়াছে। একদিকে প্রেমের আকর্ষণ—অপর দিকে নীতির  
বন্ধন,—এখন যান কোন্ দিকে ?

নীতির বন্ধন জীর্ণ ছিঁড়িতে কতক্ষণ ?

তবুও ছিঁড়িতে সরেনা কেন মন ।

কি জানি নীতির ডর কাহার ছুটে যায়

কর্তব্য-কঠিন-বন্ধ কাহার টুটে যায় ।

সুতরাং সংসারে মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু

যদি জগতের গৃহে লেখাজোখা না থাকে,  
ভুলায়ে বিপথে যদি কাহারেও না ডাকে,  
এ সুখ না কাড়ে যদি কাহারো সুখভাগ,  
এ প্রেম হ্রদয়ে কারো না রেখে যায় দাগ,  
ধরণীর রীতি নীতি অক্ষত রাখি যায়,  
তবে পো মিলনসুখ চাহি এ ধরায় ।

কিন্তু ইহা ত সম্ভব নয়, সংসারে মিলিত হইলে ত কুফল ফলিবেই,  
তাই ইনি এক দিনের ছুটি চাহিতেছেন—

যদি একদিন শুধু জীবনে ছুটি পাই,  
জগতের সীমাশেষে দু'জনে মিলে যাই ;  
বিধাতার আঁখি ছাড়া দ্বিতীয় নাহি কেহ,  
সঙ্কারূপে যিরে রবে দুজনে তাঁর স্নেহ ;  
জানিব দুজনে দৌহে, জগৎ কিছু নয়,  
কিসের বা অভিমান সন্দেহ লাজ ভয় ?  
মাঝখানে কিছু নাই, মিলিত হিয়া দুটি,  
যত আবরণ বাঁধ সহসা গেছে টুটি ;  
সেথায় দু'জনে দৌহে খুলিয়া দিব প্রাণ  
চিরতরে ভুলভ্রান্তি করিতে অবসান ।

কিন্তু হায় ! হায় ! এবে কল্পনা ।

সে দিন হবে না হায় ; জীবনে নাই ছুটি  
নিতান্তই পর হেথা আত্মীয়-মোরা দুটি ।

কর্তব্য এবং লোকশিক্ষার দিকে আর্শাদিগের কবির দৃষ্টি সর্বদাই  
জাগ্রৎ। 'আলো ও ছায়া'তেও ঐ ভাব। শ্বেতকেতু পুণ্ডরীককে  
বলিতেছেন :—

সযতনে সর্ববিদ্যা শিখাইনু তোরে,  
অতুল প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে  
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার ।  
কিন্তু বৎস, চিরদিন জানিসু হৃদয়ে,  
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহে রে দুষ্কর ;  
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত ।  
নীতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,  
প্রতিকর্ষে, প্রতিবাক্যে, প্রতিপাদক্ষেপে  
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন  
সর্বলোক । অচ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে  
ধরি কর্তব্যের পথ চলিবে আপনি ।”

প্রেম যদি কর্তব্যের অন্তরায় হয়, তবে সে প্রেমের বন্ধনও ছিন্ন  
করিতে হইবে। 'কর্তব্যের অন্তরায়' নামক কবিতাতে কবি এই  
ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন ।

কে তুমি দাঁড়ায়ে কর্তব্যের পথে,  
সময় হরিছ যোর,  
কে তুমি আমার জীবন ঘিরিয়া  
জড়ালে স্নেহের ডোর,  
চির বিজাহীন নয়নে আমার  
আনিছ ঘুমের ঘোর ?

দুঃস্বপ্ন হ'তে দুঃস্বপ্ন আলোক  
কেন কর অন্তরাল ?  
আমার রয়েছে কঠোর সাধনা,  
ফেলনা আমার জাল ।

তোমারে দেখিলে গত অনাগত  
• যাই একেবারে ভুলে,  
মুঞ্চ ছিয়া মম চাহে লুটাইতে  
তোমার চরণমূলে ।

শ্রেম যখন কর্তব্যের অন্তরায় হইতেছে, তখন শ্রেমাপ্পদের নিকট  
হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় । সেইজন্য শেষ কথা এই :—

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী  
তোমার প্রণয় ক্রুর,  
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,  
লয়ে যাবে কত দূর ?  
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,  
চলে যাও হে নির্ভূর !”

জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইতে অনেক সময় ভুগভ্রান্তি হইয়া  
থাকে এবং এজন্য আবার নতুন কর্তব্যের ভারও বহন করিতে  
হয় । এই সময়ে অনেকে ইতস্ততঃ করেন—মনে ভাবেন এপথে  
থাকি, না ফিরিয়া যাই । কবি বলিতেছেন :—

“যে দিকে চলিয়াছিলে, চল সেই দিক,  
ইতস্ততঃ ক’র’না আবার,  
ভুল যদি করে থাক, ভুলে থাকা ঠিক,  
ভুল হতে ভুলেতে যাবার  
নাহি কাজ । \* \*  
\* \* ভুলে একে একে  
কত বর্ষ হয়েছে তো পার,  
এ যাত্রার আর যত ভুলচুক থেকে  
এক ভুল করুক উদ্ধার ॥

‘পরীক্ষা’ নামক কবিতাতে কবি একজন পতিব্রতা নারীর চরিত্র  
অঙ্কন করিয়াছেন ।

কহিছে কোবিদ—ভুজঙ্গী রমণী  
প্রত্যয় কর’না তায়,  
মূলভ প্রণয় বস্ত্র অলঙ্কারে  
তার কাছে কেনা যায় ।

ইহা শুনিয়া রাজকুমার ভাবিতে লাগিলেন—  
আভরণহীনা বাসে না কি ভাল  
দরিদ্র পতিরে তার ?  
দরিদ্র হইয়া আপনি হেরিব  
রমণীর ব্যবহার ।”

রাজপুত্র কৃষক সাজিলেন, কৃষকের কন্যা বিবাহ করিলেন । একদিন  
পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কহে একদিন—“কত ভালবাস,  
বল, প্রিয়ে, সত্য করে”—  
“কত ভালবাসি?” উত্তরিল বালা,  
“যতখানি হৃদে ধরে ।”

“রতন কাঞ্চন, মাণিক মুক্তা  
ইহাদের কার সম ?”  
“এদের অভাব বুঝি নাই কভু,  
মাণিক মৃত্তিকা মম ।”

“আমার অভাব বলতো কেমন ?”  
“ও কথা সুধাও কেন ?  
তোমার অভাব, হৃথের অভাব,  
প্রাণের অভাব যেন ।”

“বিধবা হইলে কি করিবে ধনি ?  
কীর্ণ-আয়ুঃ তব স্বামী—”  
“ওকি কথা প্রিয় ?”—“অতি সত্য কথা ।”  
“হোক,—সাধী হব আমি ।”

পরদিন রাজকুমার স্ত্রীর নিকট দশদিনের ছুটি লইয়া পিতা-  
মাতাকে দেখিবার জন্ত রাজধানীতে গমন করিলেন । দশ মাস পর  
সেই নারী এক চিঠি পাইলেন । ইহাতে লেখা ছিল  
“মরেছে কৃষক, যুবরাজ-প্রিয়া  
তুমি এবে ।”

রমণী এচিটির মর্শ্ব কিছুই বুঝিতে পারিল না । রাজকুমারের  
দাসদাসীগণ তাহাকে লইতে আসিয়াছে । তাহারা তাহাকে  
রাজকুলবধু বলিয়াই জানিত । রমণী কৃষক স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা  
করিল—তাহারা কিছুই বুঝিল না ।

রাজকুলবধু তুমি বরাননে,  
আজ বাদে রাণী হবে,  
কৃষকের কথা কি কহিছ, ধনি ?  
বিশ্বয়ে কহিল সবে ।

কি কথার পথে দাঁড়াইল ক্রোধ  
রাজিয়া উঠিল মুখ,  
চাহি চারিদিক্ অমনি আবার  
কাঁপিতে লাগিল বুক ।

“মরেছে কৃষক ? নিদ্রিত কি আমি ?  
নহে কি এ দুঃস্বপন ?  
পীড়িত মনের বিকৃত কল্পনা ?  
বিকল হইল মন ?”

.....“এ নহে স্বপন,  
যুবরাজ ছুরাচার  
বধিয়া কৃষকে, অভিলাষী এবে  
লভিতে বনিতা তার ।

পাপিষ্ঠের তোরা দাসী দাসী যত  
কিরে যা শ্রমের কাছে,  
অসহায় যারে ভেবেছিস্ তার  
মরণ সহায় আছে ।

অই দেখ চেয়ে কাহার পাছকা  
রেখেছি যতন করে',  
পতির উদ্দেশে উঠিব চিতায়  
ও পাছকা বুকে ধরে।”

বাক্য কার্যেই পরিণত হইল। (Mrs. Browning) মিসেস ব্রাউনিংএর Rhyme of the Duchess May নামক একটি অতি সুন্দর কবিতা আছে। ‘পরীক্ষা’ ইহার অনুরূপ না হইলেও উভয়েরই আদর্শ এক। উভয়েরই বর্ণনার বিষয়—পাতিব্রত—স্বামীর প্রতি অহুরাগ।

Lady May (লেডি মে) Lord Leighকে বিবাহ না করিয়া (Sir Guy) সার গাইকে বিবাহ করিয়াছেন। লেডি মেকে লাভ করিবার জন্য লর্ড লে সার গাইয়ের দুর্গ অবরোধ করিলেন। যখন দেখিলেন রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন যে অশপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গের উচ্চতম স্থান হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া ভূতলে পতিত হইবেন। লেডি মে ইহা জানিতে পারিয়া স্থির করিলেন তিনিও সহমৃত্যু হইবেন। এই সংকল্প করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামী বলিলেন

“Get thee in, thou soft ladie !  
here is never a place for thee !”  
Braid thy hair and clasp thy gown,  
that thy beauty in its moan  
May find grace with Leigh of Leigh.”

নিষ্ঠুর আঘাতে লেডি মে মর্মান্বিত হইলেন কিন্তু তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বামীকে কি গভীর প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। তিনি প্রেম ঘারা স্বামীকে পরাস্ত করিলেন, সহমৃত্যু হইলেন।

স্ত্রী স্বামীকে কি প্রকার ভালবাসিতে পারে, উভয় কবিতাতেই তাহা অঙ্কিত হইয়াছে। উভয় কবিতাই স্বাভাবিক। মিসেস ব্রাউনিং যাহা চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের বেশ উপযোগী, আর আমাদের কবি যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা গাঁটা স্বদেশী।

‘প্রতিভার প্রতি প্রেম’ নামক কবিতাতেও নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত। পত্নী প্রতিভাশালী স্বামীকে বলিতেছেন :—

“তুমি আলোকের মালা, তুমি সকলের তরে ;  
আমি ক্ষুদ্র শুধু আপনার,  
সকলে পশ্চাতে রাখি, দাঁড়িয়ে সম্মুখে তব  
ধন্য হব, ভুল নাই তার ;  
তুমি তো পড়িবে ধরা, দীর্ঘ তব করজাল,  
লোকচক্ষু চেয়ে রবে যত,  
আমি যে উঠিব জাগি নির্মল হৃদয়ে তব  
এক খণ্ড আঁধারের মত।  
সমুজ্জ্বল মধ্য তব আমি রাখ ছেয়ে রব  
আমি ক্ষুদ্র, ভূমা ধরাভল,  
সকলের আলোভাগ এতখানি আশুলিয়া  
জন্ম তব করিব বিফল ?  
তার চেয়ে দূরে যাই, সকলের চেয়ে দূর,  
যুক্ত হোক তব রঞ্জিলাল,  
তোমার আমার মাঝে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হোক  
চুল্লীয়া হৃর্ভেদ্য অন্তরাল।

কাছ থেকে দূরে গিয়া বাড়িবে আঁধার মোর,  
তুমি তত হইবে উজ্জ্বল,  
সবার পশ্চাতে থাকি শুনিব তোমার জয়  
সম্মুখের হর্ষ-কোলাহল।

‘নিরুপায়’ নামক আর একটি কবিতা। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সম্ভাবহার করে না, কার্যে ও বাক্যে ব্যবহার বড়ই রুদ্ধ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু স্ত্রী বলিতেছেন—

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,  
যত রুদ্ধ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়  
সব আমি হান প্রাণে, আমি সয়ে রত  
সিন্ধু চোখে, মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।  
তুমি পতি, তুমি প্রভু ; মন, মান মম  
সকলি তোমার হাতে ; দল যদি হায়  
এই রমণীর মন, তাহা প্রিয়তম,  
তোমারি চরণপ্রান্তে লুটাবে ধরাধর।  
করি যদি অপরাধ, তার যথোচিত  
বিধান তোমার কাছে ; তোমার উপরে  
কেহ নাই, যার দ্বারে হব উপনীত  
তব অবিচার হতে বিচারের তরে।

অবোধ নারী জানে না প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে মানুষ কতকি বলিয়া থাকে। সেই প্রেমের আজ কত পরিবর্তন! এই-সব কথা মনে করিয়া স্ত্রী অজঃ হুঃখ করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রেম অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। তাই সে বলিতেছে—

আমি বারমাস

তোমার পিঞ্জরে পাখী, ওহে মহাভাগ।

‘পক্ষ ও পক্ষজ’ নামক কবিতাও অতি সুন্দর। পক্ষ হইতে পক্ষজের জন্ম, পক্ষই ইহার মূল ; উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ—পার্থক্যও কত। উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়া জননী বলিতেছেন—

জীবনের তব প্রথম অনুর উঠেছে আমারি দেহে,  
যতদিন আছ, জীবনের মূল গুণ্ড এ আঁধার গেহে।  
যত দূরে যাও আলোক-সন্ধান, বঞ্চিত হবেনা স্নেহে।  
তোমার সৌন্দর্য্য যবে উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে ধরে ধরে,  
তোমার সৌরভ ছুটিছে বাতাসে, দূর হতে দূরতর  
শিকড় ক’খানি বুকে ধরে আমি পুলকিত কলেবর।  
তোমারি গৌরব, আঁধার ভেদিয়া উঠেছে আলোর দেশ,  
মাটিতে অনমি, বিমল শরীরে রাখি মাটির লেশ,—  
তোমার গৌরব, আমার গৌরব ভাবি আমি নির্বিশেষ।

‘হিসাব’ নামক কবিতাতে প্রেমের লাভ লোককানের হিসাব। প্রেমিক যুবক দরিদ্রের সন্তান, আর বনারী ধনী পুত্রী। ‘প্রেমের লাগিয়া কেহ প্রেম লয়না’—একথা সে যুবক জানিত না। কুমারী সেই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিল। যুবক সেই সমুদয় কথার উল্লেখ করিতেছেন—

তুমি বুঝাইলে আমার হয়েছে হিসাবে দারুণ ভ্রম,  
প্রাণী প্রাণীর উল্লসিতে নাহি প্রণয়ের পরাক্রম।  
কুসুম-কাননে লতার মণ্ডপ চন্দ্রালোকে শোভা ধরে,  
হৃদয় সেখায় বসি যবে যার, কে সেখা বসতি করে ?  
কুসুমের মধু মধু বটে, নহে জীবনের অন্ন পান,  
নিভাস্ত বিশ্বাস, অশ্রু লবণ, করে অশ্রু স্বাদ-দান ;  
তুমি বুঝাইলে, প্রণয় ভেমন, দিতে শোভা, দিতে স্বাদ,  
ওহে প্রেম লাগি করা ভাল নয় এত বাদ বিস্বাদ।

যত তুচ্ছা ক্ষুধা আছে মানবের এক প্রেমে নাহি যায়,  
কোথা রবে সুখ, স্বপ্নেরা যদি মুখ তুলে নাহি চায় ?  
নব পরিবার গুঠনে উপায়, প্রেম ত উদ্দেশ্য নয়,  
নূতন যৌবনে, কবিদে, স্বপনে একে আর মনে হয় ।  
যৌবন হারালে, কতু না ফুরাতে, মায়া মোহ ভেঙ্গে যায়,  
বুড়ুক্ষু মানব কহে—“এই ভুল না যদি হইত হয় ।”  
কত অঙ্ক কসি, ভাবিয়া গণিয়া, হৃদয় করিয়া রোধ,  
আমারে তাড়ালে লুকু ভিক্ষু সম, তাড়ালে জন্মের শোধ ।  
যুবকের নিকট এখন সংসার শ্মশানস্বরূপ । তাই সে বলিতেছে :—

আমার শুকাল কুম্ব-কানন, ফুরাল সকল ক্ষুধা ।

জীবনের স্বাদ কিসে ধুয়ে গেল, কণ্ঠের অনন্দক্ষুধা ।

সে দিন হইতে বিদেশে প্রবাসে করি আয়ু অতিপাত,

ধনের আকর চরণের তলে, চলিতে চাহে না হাত ।

কিন্তু সেই রমণীর দিনও কি সুখে কাটিয়াছে ? অনেকেই ত ধন  
কুলমান তাহার চরণে পদমর্পণ করিয়াছে, তবে কেন কাহাকেও পাণিদান  
সে করে নাই ?

জীবনের ভোজে লবণ নির্মল, লয়ে সুমধুর মধু

আসেনি কি তবে তাহাদের কেহ তোমারে করিতে বধু ?

এত দিনে তবে বুঝেছ কি মনে, আমি যা বুঝেছি আগে,

এ লবণ বিনা বিশ্বাদ জীবন, কোন কাজে নাহি লাগে ?

বুঝেছ কি মনে এ নহে সুলভ, অমাশুল না বিকায়,

যাহারে তাহারে যে সে বেচিবারে অধিকার নাহি পায় ?

বুঝেছ, লবণ কারো গৃহে যদি থাকে শত মণ ভার

অতিরিক্ত পড়ি দৈনিক বাঞ্ছন করে না বিশ্বাদ তার ?

বেশী ফুল ফোটে বাগানে তোমার, তাহাতে কাহার ক্ষতি,

অতিশয় ধন পারে না বহিতে, বিতরিতে ধনপতি ?

বেশী প্রেম হ'লে তাতে নাহি ভয়, না থাকিলে বৃথা সব,

সুখের লাগিয়া অশ্রু আয়োজন, ধন মান বৈভব ।

ধন ল'য়ে যবে আসে ধনেশ্বর, কুলীন কুলের মান,

তাই অনাদরে কর প্রত্যাখ্যান জীবনের অন্নপান ।

প্রেম চাহি সাথে লবণের মাপে, তাহাদের নাহি তাও,

আশ্চর্য ব্যাপার, সেখা তাহা চাও, যেখা যাহা নাহি পাও !

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যুবক বলিতেছেন :—

তুমি লক্ষ্মীরূপা গৃহে দাঁড়াইলে, চরণ-পরশ-ভরে

ধরণী কাটিয়া ফুটিয়া উঠিত ঐশ্বর্য্য দীনের ধরে ;

কুলীন না হই, অংমা হ'তে হত প্রতিষ্ঠিত মহাকুল,

আপনি ভুলিয়া হারয়ে আমারে হিসাবে করালে ভুল ।

তবে কি সে আবার পাণিপ্রার্থী হইবে ? শুভকণ বহিয়া গিয়াছে,  
যৌবনের বল আর নাই, প্রেমের উচ্ছ্বাস আছে কি ? না, তাহারও  
স্থিরতা নাই । তাই সে স্থির করিল “আর নয়, আর নয় ।”

‘হিসাব’ পাঠ করিলে স্বভাবতঃই Barret Browningএর Court-  
ship of Lady Geraldineএর কথা মনে পড়ে । Bertram  
একজন কবি । উচ্চবংশে তাহার জন্ম নয় এবং সে নিজে দরিদ্র ।  
তবুও সে Lady Geraldineকে ভালবাসিত । কিন্তু সে কখন  
মনেও স্বান্ত্র দেয় নাই যে তাঁহাকে লাভ করিবে । একদিন  
একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন । কথা-প্রসঙ্গে  
তাঁহাকে বলিতে হইল

“Whom I marry, shall be noble,

Ay, and wealthy. I shall never

blush to think how he was born”

Bertram এই কথা শুনিতে পাইল । সে পাগল হইয়া উঠিল !  
সে যাহা বলিল তাহা তাহার প্রেমেরই উপযুক্ত । তাহার মধ্যে একটা  
কথা এই —

If my spirit were less earthy

If its instruments were gifted with more vibrant  
silver strings

I would kneel down where I stand,

and say—“Behold me ! I am worthy

Of thy loving, for I love thee

I am worthy as a king”.

সংসারে সব সময়ে মিলন সম্ভব নয়, হিসাবের কবিও এই প্রকার  
চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন । কিন্তু Lady Geraldine কবি  
Bertramএর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন । Bertramকে সম্বোধন  
করিয়া Lady বলিতেছেন

“It shall be as I have sworn !

Very rich he is in virtues, —

very noble—noble, certes ;

And I shall not blush in knowing,

that men call him lowly born !”

হিসাবে এখানেও প্রথমে ভুল হইয়াছিল ।

এই গ্রন্থে নরনারীর প্রেম সংক্রান্ত কয়েকটা অতি সুন্দর কবিতা  
আছে । লুকা, শৃঙ্খলিতা, বিন্মিতা ভিখারিণী, ক'রনা জিজ্ঞাসা,  
ইত্যাদি কবিতা মনোমোহকর ও হৃদয়স্পর্শী । হতাভিজ্ঞান,  
পদদলি ইত্যাদি কবিতাতে বিশেষ বিশেষরূপে আছে ।

আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে । সুতরাং এই স্থলেই নিবৃত্ত  
হওয়া কর্তব্য ।

আমরা ‘মালা ও নির্মালা’ পাঠ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি ।  
কাব্যরসগ্রাহী পাঠকগণও যে পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন  
সন্দেহ নাই ।

পুস্তকের\* ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । বড়ই ঠুংখের বিষয়  
এই প্রকার গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে ।

মহেশচন্দ্র ঘোষ ।

## অরণ্যবাস

[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতা-  
বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে  
করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া  
মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্কট্য বর্ল্ডপুর্ন গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই  
খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন । পুরুলিয়া  
জেলার কৃষিবিভাগের তদ্বাবধায়ক বঙ্গ সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী  
গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ  
উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন । ক্রমে সমস্ত ঋণের সহিত  
ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বন্ধিত হইল । গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের  
জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে

\* মালা ও নির্মালা—‘আলো ও ছায়া’-প্রণেতৃ-প্রণীত । পৃ: ১৬০  
মূল্য ১৫। প্রাপ্তির স্থল :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স,  
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ করিবেন স্থির হয়।]

### চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ শয্যা ত্যাগ করিয়াই গৃহসংলগ্ন উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং কপি, লাউ, শাক, বেগুন, কুমড়া, প্রভৃতি বহুবিধ আনাজ ও শাকসব্জী তুলিয়া একজন ভৃত্য দ্বারা তৎসমুদায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। বেলা দশটার পর এগারটার মধ্যে কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে প্রস্তুত হইবার জন্ত দ্বারা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথায় কেবল বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন “ক্ষেত্র, তুমি যে বড় জ্বালাতন করলে! আমি দেখছি, তোমার এখানে এসে আমি ভারি অশ্রয় করেছি। ওসব আশীর্বাদ টাশীর্বাদে আমি নাই। আমি তোমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী যায না। তুমি যা হয়, করগে।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা, তোমায় আশীর্বাদ করতে হ'বে না। তুমি সেখানে খেতে যাবে তো? কাল যে বড় সর্ফরাজী ক'রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে? আজ পেছ-পা হ'লে চলবে কেন? ওঠ, ওঠ, স্নান করবে চল।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে খেতে যাবার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আশীর্বাদের কথা আমায় ব'লো না। মেয়ে আমি দেখেছি। আশীর্বাদের কাজটা অপরকে দিয়ে সেরে নাও। বুঝলে?”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “বুঝলাম। আচ্ছা, তাই হ'বে। তুমি তো এখন স্নান ক'রে নাও; বেলা হ'য়ে এল যে।”

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা ঠেলিতে না পারিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে বাহিরে আসিয়া দেখেন,

ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দারকে দিয়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে ভাল সন্দেশ ও মিষ্টান্ন, মাধব দত্ত মহাশয়ের পুঙ্করিণী হইতে দুইটা বড় রোহিত মৎস্য এবং নিকটবর্তী একটা গ্রাম হইতে চমৎকার দধি আনাইয়াছেন। সতীশ এই সমস্ত দেখিয়া বলিলেন “ক্ষেত্র, এসব কি হে? তুমি তো ভয়ানক লোক দেখছি। তুমি ও তোমার গৃহিণীটি একদিনের মধ্যেই ভালমানুষকেও পাগল ক'রে তুলতে পার, দেখছি!”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তুমি আর এ-সমস্ত দেখছ কেন? চোখ বুজে থাক। শুভকার্যের জন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু করা যেতে পারে, তা করা উচিত। শুধু হাতে আশীর্বাদ করতে যেতে নাই।” এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সেই-সমস্ত দ্রব্য সহ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মনোরমা অল্পক্ষণ মধ্যেই তৎসমুদায় সাজাইয়া গোছাইয়া দাসীদের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মনোরমা তাঁহার নিজের একখানি নূতন রেশমী সাড়ীও পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ অনিচ্ছুক সতীশচন্দ্রকে কষ্টে গৃহ হইতে বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে সতীশচন্দ্র বলিলেন “ক্ষেত্র, গত পরশ্ব আমি তোমার এখানে না এলে খুব ভালই হ'ত। এ যে কি হচ্ছে, আর আমি কি যে করছি, তা ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যবিধাতার হাতে আমি যেন একটা ক্রীড়ার পুতুলের মত হয়েছি। কেন, তাই, তোমরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলছ। আমি বেশ আছি। আচ্ছা, আমি যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী না যাই, তো কি হয়?” এই বলিয়া সতীশচন্দ্র পথের মাঝে স্থাগুবৎ সহসা অচল হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আবার তুমি পাগলামী আরম্ভ করলে? ভদ্রলোক তোমাকে আহ্বারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তুমি তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছ। তাঁর একটা অনূঢ়া কন্যা আছে! কন্যাটি বয়ঃস্থা ও পরম-সুন্দরী, তা তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ। তুমি অবিবাহিত এবং কন্যাটিও সর্বাংশে তোমার যোগ্য। কিন্তু সে

দরিদ্র-কণ্ঠা । সে যে তোমার সহধর্মিণী হবে, এ দুঃশা তার বা তার পিতার নাই । তুমি যদি দয়া ক'রে তাকে পত্নীত্ব গ্রহণ কর, তা হ'লে, তার ও তার পিতার পরম সৌভাগ্য বলতে হ'বে । কিন্তু তোমার যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে জোর ক'রে কি কেউ তোমার বিয়ে দিতে পারে ?”

ক্ষেত্রনাথের কণ্ঠস্বর কিছু গম্ভীর দেখিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন । বলিলেন “চল, চল, আর অত বক্তৃতায় কাজ নাই । ‘দরিদ্র-কণ্ঠা’ আর ‘দয়া’র অত ছড়াছড়িতে প্রয়োজন নাই ! কিন্তু তুমি আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছ না । যে কখনও ঘাড়ে জোয়াল নেয় নাই, তার ঘাড়ে প্রথম জোয়াল চাপাবার সময় সে যদি একটু অসহিষ্ণু হয়, তা'তে কি তার দোষ দাও !”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আমি যে তোমার অবস্থা না বুঝেছি, তা নয় । কিন্তু সকলেরই ঐ দশা । কালক্রমে সকলেরই ঘাড়ে জোয়াল স'য়ে যায় ।”

উভয় বন্ধুর মধ্যে আর অধিক কথা হইল না । সতীশচন্দ্র কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনের পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার মন হইতে সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল । অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । প্রজারা উভয়কে দেখিয়া ঘাড় নোয়াইয়া করঞ্জোড়ে প্রণাম করিতে লাগিল । কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের নিকটে আসিয়া অমুচ্চকণ্ঠে সতীশচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ইনি আমার বন্ধু ; পুরুলিয়ার ডেপুটী বাবু ; এখানে বেড়াতে এসেছেন । এখন ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী যাচ্ছি ।” “ডেপুটী বাবু”র নাম শুনিয়াই সকলে তফাৎ হইতে লাগিল ।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন “ক্ষেত্র, দেখ, ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করার কোনও বাধা হ'বে না, তা আমি বুঝতে পারছি ;—বিশেষতঃ যখন তাঁদের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের আদান প্রদান হ'য়ে গেছে । কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে ; আমাদের জ্ঞাতিরা আছেন, আর পিশতুতো ভাইও কলকাতায় আছেন । তাঁদের একটা কথা না জানিয়ে

হঠাৎ আশীর্বাদ করাটা কি ভাল হচ্ছে ? এত তাড়াতাড়ি না ক'রে, দু'দিন পরে এই কাজটি করলে ভাল হ'ত না কি ? তুমি কি বল ? আমার মনে যা হচ্ছে, তাই তোমায় বলছি ।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তুমি যা বলছ, তা ঠিক । কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ । তোমার জ্ঞাতির বা তোমার পিশতুতো ভাই কি এত দূরে তোমার জন্ম মেয়ে দেখতে আসবেন ? সকলেই আপনার আপনার কাজে ব্যস্ত । নিকট হ'লেও, না হয়, এক দিনের জন্ম তাঁরা সময় ক'রে আসতেন । কিন্তু এত দূরে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব । তার পর, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তুমি মোটে বিয়েই করবে না । এখন তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছে । এই কথা তাঁরা যদি শোনেন, তাহ'লে এখনই বলবেন ‘যদি বিয়ে করবে, তো দেশে কর ; কত ভাল ঘরের ভাল মেয়ে পাবে । সাঁওতাল-কুড়ুমীর দেশে বিয়ে করবে কেন ?’ এইরূপ নানা আপত্তি তুলে একটা গোল বাধাবেন । আমার কথা হচ্ছে এই যে, ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের ঘর যদি তোমাদের করণীয় ঘর হয়, আর সৌদামিনীকে দেখে যদি তোমার মনে হয়ে থাকে যে, তাকে তোমার সহধর্মিণী ক'রে তুমি সুখী হবে, তা হ'লে, এখন তোমার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে কোমল কথা না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ । তুমি আজ আশীর্বাদ করে যাও, তার পর, ভট্টাচার্য্য মশাইদের পরিচয় জানিয়ে সকল কথা তাঁদের বল । তা হ'লে, আর কেউ কোনও আপত্তি করবেন না । বিবাহের সময় তাঁদের যে এখানে আসতে হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু এখন আর কোনও কথা জানাবার প্রয়োজন দেখি না । আমার বুদ্ধিতে যা আসছে, তা তোমাকে বললাম । এখন তুমি যেমন বুক, তেমনই কর ।”

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন “তোমার কথাই ঠিক । আজ আশীর্বাদটা হ'য়ে যাক, পরে সব কথা তাঁদের জানাব । তবে আমি নিজে আশীর্বাদ করবো না । অপরকে দ্বিগুণে সে কাজটা সেরে ফেল ।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, “আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি ।”

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। তাঁহা-দিগকে আসিতে দেখিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রদ্বয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আনন্দাশ্রনয়নে ও বাষ্পগদগদকণ্ঠে তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামবাসী আরও কতিপয় বয়স্ক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিত সতীশচন্দ্র পরিচিত হইলেন। উপস্থিত সকলেই সতীশচন্দ্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা ও উচ্চপদের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে বাবাজীবনের পরিচয় পেয়ে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হয়েছি, তা আমি মুখে প্রকাশ ক’রে বলিতে অক্ষম। আমরা দেশ ছেড়ে এই কুস্থানে প’ড়ে আছি। এখানে আপনাদের মতন মহৎ লোকের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আজ বাবাজীবনের দর্শন লাভ ক’রে আমরা আপনাদিগকে যথার্থই সৌভাগ্যবান্ মনে করছি। তার পর, প্রজাপতির নির্বন্ধে বাবাজীবনের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধ যদি স্থাপিত হয়, তা হ’লে, শুধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন, আমাদের সকলেরই যে পরম সৌভাগ্য হ’বে, তার আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা যেমন সুন্দরী, সুশীলা ও গুণবতী, আপনিও তেমন তা’র যোগ্য পাত্র। সৌভাগ্যের কথা আমি একমুখে আর কি বলব? বিধাতার সমস্ত বিধানই অপূর্ণ, এবং মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর।” এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিকে ক্ষেত্রনাথ একান্তে লইয়া গিয়া সতীশচন্দ্রের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা অবগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন “আমরা সকলেই আশীর্বাদ করবো; সতীশ বাবুও সৌদামিনীকে ধাতু-দুর্কা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। তা’তে তাঁর আপত্তি কি হ’তে পারে?”

সৌদামিনী অন্তঃপুরে তাহাদের মাট-কোঠার “পিঁড়া” বা বারাণ্ডায় গুরুস্নাতা হইয়া এবং নববস্ত্র পরিধান ও নবমাল্য ধারণ করিয়া একটি মাদুরের উপর সসঙ্কোচে বসিয়া ছিল। পার্শ্বে প্রতিবেশিনী কতিপয় ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং মহিলা দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময়ে তাহাকে আশীর্বাদ করিবার জন্ত বহির্কাটা হইতে সকলে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সতীশচন্দ্র এবং ক্ষেত্রনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। সতীশকে দেখিয়া মহিলারা ও বালিকারা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সর্বাগ্রে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তোচ্চারণ পূর্বক কন্যার মস্তকে ধাতুদুর্কা দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন; তৎপরে, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রদ্বয় তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সর্বশেষে সকলের অনুরোধে সতীশচন্দ্রকেও অগ্রসর হইতে হইল। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ সকলের অলক্ষিতে তাঁহার হস্তে দুইটা গিনি দিয়া তাহা সৌদামিনীর হস্তে প্রদান করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। সতীশচন্দ্র লজ্জাবনতমুখী সৌদামিনীর মস্তকে ধাতুদুর্কা দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সৌদামিনী যেরূপ অন্যান্য গুরুজনকে, সেইরূপ তাঁহাকেও প্রণাম করিল। তৎপরে সতীশচন্দ্র তাহার হস্তে দুইটা গিনি প্রদান করিলেন। ইহার পর, ব্রাহ্মণ মহিলারা একে একে আসিয়া ধাতুদুর্কা দ্বারা সৌদামিনীকে আশীর্বাদ করিলেন। এইরূপে আশীর্বাদ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, পুরুষেরা বহির্কাটাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত একত্র বসিয়া সতীশচন্দ্র আহার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ এবং তাঁহার পুত্রেরাও মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ যাইবার সময় একবার সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “সদু, তোমার বর আমাদের বাটীতে আছেন ব’লে যেন আমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক’র না। তা’ হ’লে তোমার দিদি ভয়ানক রাগ করবেন, তা যেন মনে থাকে।”

সৌদামিনী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল ঈষৎ হাস্ত করিল।

সৌদামিনীর পিসীমাতা একবার সতীশচন্দ্রকে অস্তঃপুরে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। যখন তিনি উত্তরপাড়া হইতে চলিয়া আসেন, তখন সতীশ বালক ছিলেন। সতীশ তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও, তিনি সকলের কথা সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতৃহীনা সৌদামিনীর কথা পাড়িয়া, তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাহার রক্ষা ও পালনের ভার সতীশকে অর্পণ করিলেন।

### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

“কাছারী-বাড়ী”-অভিমুখে যাইতে যাইতে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন “দেখ, ক্ষেত্র, আশীর্বাদটা আমি কি ক’রে করুব, এই চিন্তায় প্রথমে মৃত্যু সত্যই বড় বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু যা হোক, কাজটা কোনও রকমে সেরে ফেলা গেল। আমি মনে করেছিলাম, এসব অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু, এখন দেখছি, হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেরই একটা সার্থকতা আছে। আশীর্বাদের পূর্বে সৌদামিনীকে আমি যতটা আপনার মনে করি নাই, এখন তা’র চেয়ে ঢের বেশী আপনার মনে হ’চ্ছে।”

• ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন “তুমি যে আশীর্বাদ করার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করেছ, তা’তে আমি সুখী হলাম। আজ সকালে তোমায় নিয়ে আমিও কি কম ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম? আশীর্বাদ-তরুটি আমি যে রকম বুঝেছি, তোমায় তার একটু আভাস দিচ্ছি। তুমিই কাল বলছিলে, আমাদের দেশে পূর্বরাগের স্থান নাই; তোমার কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। যুবক যুবতীর পূর্বরাগ আমাদের বিবাহের মূল ভিত্তি নয়। দাম্পত্যজীবনের সুখ ও সফলতা যে প্রেমেরই উপর নির্ভর করে, তা সত্য বটে; কিন্তু এই প্রেমটিকে সংযম ও ধর্মভাবের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তবে তাহা পবিত্র হয়। আমাদের বিবাহ, আমাদের প্রেম, আমাদের সকল কর্মই ধর্মের

উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বাগদান, বিবাহ, দ্বিরাগমন, ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই ধর্মকে বর্জন করা চলে না। আমাদের ভালবাসায় সংযম, আমাদের আহারে ও বিহারে সংযম। সংযম ছাড়া আমাদের কোনও ধর্ম বা কর্ম নাই। আমাদের সমাজে পূর্বরাগের অবসর নাই বটে; কিন্তু কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মানবের স্বাভাবিক প্রেমকে স্মৃতিত, প্রবাহিত, মার্জিত ও সংযত করা হয়। আশীর্বাদের ব্যাপারে বরকত্তার পরস্পরে মিলিত হবার প্রথা নাই। তার কারণ এই যে, যে পরিবারের সহিত যার সম্বন্ধ হ’চ্ছে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বাগ্রে সেই পরিবারের প্রতি তার একটা অনুরাগের সঞ্চার করা হয়। আগে পারিবারিক মিলন, তার পর ব্যক্তিত্বের—অর্থাৎ বরকত্তার মিলন; কেননা বরকত্তা স্ব স্ব পরিবারের অঙ্গীভূত, এবং পারিবারিক অস্তিত্ব ব্যতীত তখন তা’দের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। আশীর্বাদ বা বাগদানের পর বরকত্তার পরস্পরের প্রতি যে একটা অনুরাগ হয়, সে অনুরাগে কোনও বস্তুতন্ত্রতা থাকে না; সেটা অনেকটা তাদের কল্পনার খেলা। বিবাহের সময় বরকত্তা যখন মিলিত হয়, তখন তা’দের অনুরাগে বস্তুতন্ত্রতা আসে। সেই সময়ে, যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তদ্বারা সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পুষ্ট হয়। দ্বিরাগমন, প্রভৃতি ব্যাপারে সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পরিপুষ্ট হ’য়ে উঠে, এবং দাম্পত্য প্রেমও সংযত ও পবিত্র হয়। আজ সৌদামিনীর আশীর্বাদ ব্যাপারে তোমার উপস্থিত পূর্বরাগের কথা নয়; তোমাদের পারিবারিক কর্তারই উপস্থিত থাকবার কথা। তুমি যে তাঁর অনুপস্থিতির ওজর ক’রে আজ আশীর্বাদ বন্ধ রাখবার প্রস্তাব করেছিলে, সে প্রস্তাব উচিতই হয়েছিল। কিন্তু বিশিষ্ট অবস্থায় বিশিষ্ট বিধি অবলম্বনীয়। আজ তুমি সৌদামিনীর রূপে তাকে দেখা দাও নাই; তোমাদের বংশের প্রতিনিধিরূপে তুমি আজ তার সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলে। কিন্তু তা হ’লেও, তোমাতেই বরকত্তা ও তোমাদের বংশের প্রতিনিধিত্ব একাধারে বিদ্যমান থাকায়, সৌদামিনীর আশীর্বাদের পর তুমি তা’কে আপনার লোক ব’লে মনে কর্তে সমর্থ হয়েছ।



আশীর্বাদ বিবাহের একটি অঙ্গ। বিবাহের দিনে যখন তোমাদের দুই হাত এক হ'য়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবে, সৌদামিনী তোমার কত আপনার লোক !”

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা নীরবে শুনিতেছিলেন ও তাহা শুনিতে শুনিতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। ক্ষেত্রনাথের বক্তব্য শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “জীবনের এই কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও, দেখতে পাচ্ছি, তুমি তোমার পাঠ্যাবস্থার সেই দার্শনিক ভাব ও চিন্তা ত্যাগ কর নাই। জীবনসংগ্রামের মধ্যেও দার্শনিক ভাব ও চিন্তা বজায় রাখা হিন্দুর বিশিষ্টতা বটে। আমি তোমার মতন অত বিশ্লেষণ করবার অবসর না পেলেও, মোটা-মুঠা ভাবে সব কথাই বুঝতে পারি। আমি তোমার সহিত প্রায় একমত। ... হাঁ একটা কথা ভাল মনে হ'ল। দেখছি, তুমি আমাদের শাস্ত্র টাক্সেরও আলোচনা কর। আচ্ছা, তুমি আমায় বলতে পার, মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় বার বছরের আগেই মেয়েদের বিবাহ দেবার বিধি আছে; না দিলে পাপ হয়, আর পিতৃপুরুষেরা নরকস্থ হ'ন একথাও শুনে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের কুলীনের ঘরে যে যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীদেরও বিবাহ হয়, এটা কি অশাস্ত্রীয় নয়? আর এইরূপ বিবাহে কি পাপ হয় না? অবশ্য তুমি একথা মনে করো না যে, কন্যার যৌবন-বিবাহে আমার কোনও আপত্তি আছে। আমি কুলীনের ছেলে—আমাদের কুলীন কন্যাদের প্রায়ই কন্যাবস্থায় বিবাহ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধির সহিত কি এইরূপ বিবাহবিধি অসঙ্গত নয়?”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপাতদৃষ্টিতে তা অসঙ্গত বোধ হয় বটে; কিন্তু বেদ যদি হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হয়, তা হ'লে কন্যার যৌবন-বিবাহে কোনও দোষ হয় না; বরং যৌবন-বিবাহই ধর্মসঙ্গত। বেদপাঠ করবার বিদ্যা, অধিকার বা সামর্থ্য আমার নাই; কিন্তু আমাদের দেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (দ্রাবিড়ে এই রকম পণ্ডিত অনেক আছেন)—যাঁরা বেদ পড়েছেন, তাঁদের রচিত পুস্তক প'ড়ে বুঝেছি যে, পূর্বকালে প্রাপ্তযৌবনা না

হ'লে কন্যাদের বিবাহ হ'ত না। এখনও বিবাহে যে-সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা'তেও যৌবন-বিবাহেরই আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যৌবনবিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, সবিতৃকন্যা সূর্য্য যৌবন প্রাপ্তির পর বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের একটি সূক্তের ঋষি ঘোষা নামী জনৈক মহিলা। তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হয়েছিলেন; কাজেই তাঁর বিয়ে হয় নাই। পরে ভগবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রূপায় নীরোগ হ'য়ে অনেক বয়সে বিবাহ করেছিলেন। প্রাচীনকালে বিবাহ করা বা না করা স্ত্রীলোকের ইচ্ছাধীন ছিল। অনেকে আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন ও তপস্বী করতেন। “বৃদ্ধ-কন্যা”, মূল সংস্কৃতে এই কথাটি আছে। সূত্র আজীবন তপস্বী ক'রে মরণের অব্যবহিত পূর্বে বিবাহ করেছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। পুরাণাদিতেও স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে শাস্ত্রকার ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে যৌবন-বিবাহের বিধি তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে বালিকাদের বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত করলেন। ঋষিগণ বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের পর কন্যার দ্বিরাগমন, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধিও প্রবর্তিত করলেন। এ সব নিয়ম এখন এক বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হিন্দুমাত্রই মেনে চলেন। মানেন না কেবল শিক্ষাভিমাত্রী বাঙ্গালী! যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে বালিকাদের যে বিবাহ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহই নয়, -বাগদানমাত্র। যদি অপ্রাপ্ত-যৌবনা বালিকার বিবাহ হয়, এবং দ্বিরাগমন সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালিত হয়, তা হ'লে বালিকাদের বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা নিবারিত হ'তে পারে। সমাজসংস্কারকগণ এই দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করলে প্রভূত উপকার হ'তে পারে। মোসলমানগণ কতক ভারতবর্ষ আক্রমণের পর থেকেই বালিকাদের বাল্য-বিবাহটি এদেশে প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত হ'য়ে পড়ে। তার একটি কারণ আছে। বিজয়ী মোসলমান সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করত। কিন্তু সম্ভবা নারীকে বলপূর্বক গ্রহণ করা মোসলমান শাস্ত্রে

নিষিদ্ধ ; সেই কারণে, সেই সময়ে কুমারী ও বিধবা রমণীগণই অতিশয় বিপন্ন হতেন। কুমারীদের রক্ষার জন্ত পিতামাতারা অতি অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং বিধবারা প্রায়ই সহমরণ দ্বারা দেহত্যাগ করতেন। কিন্তু যারা বৈদিক ধর্ম মেনে চলতেন, তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া অশাস্ত্রীয় মনে করতেন। ব্রাহ্মণগণের কান্তকুজ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্মে অতিশয় আস্থাবান ছিলেন ; এই জন্ত তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বে কন্যাদের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন না : পরন্তু যুবতী অবিবাহিত কন্যাদের রক্ষার জন্ত অস্ত্রধারণ করাও ত্রায়সঙ্গত মনে করতেন। সেই অবধি কান্তকুজ ব্রাহ্মণেরা সমরকুশল, এবং এখনও ইঁহারা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। তার পর, দক্ষিণপথে নন্দুদিরি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁদের দেশে মোসলমানদের আধিপত্য হয় নাই, সেই কারণে, কন্যাদের রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কান্তকুজ ব্রাহ্মণদের ত্রায় অস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁরা বীরের জাতি, অনায়াসেই কন্যাদের রক্ষণে সমর্থ হতেন। একে পূর্বে থেকেই গোভিলপ্রমুখ সামবেদী মহর্ষিগণ কন্যাদের যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁদের অনুসরণ করে পরবর্তী স্মৃতিকারেরাও কন্যাদের বাল্যবিবাহ সমর্থন ও প্রচলন করেছিলেন, তাঁর উপর মোসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে কালক্রমে সেই প্রথা সমাজ-মধ্যে দৃঢ়ীভূত হয়ে গেল। বর্তমান সময়ে মোসলমানগণের অত্যাচারের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন রয়েছে। সেই অনুশাসন লঙ্ঘন করা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কালক্রমে লোকশিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাদের বাল্যবিবাহ-প্রথাও তিরোহিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এদেশে লোকশিক্ষার বর্তমান অবস্থায়, বাল্য-বিবাহ-প্রথার তিরোধানের সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বালকই নিরক্ষর, তখন বালিকাদের শিক্ষার কথা না ভুলেও

চলে। যুবকেরা ব্রাহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে, আর কুমারীরা প্রকৃত ধর্মশিক্ষা না পেলে, তারা সংপথে ও ধর্মপথে থাকতে পারবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। যাই হোক, কন্যাদের যৌবন-বিবাহটা যে অশাস্ত্রীয় নয়, এবং তুমিও একটা যুবতীকে বিবাহ করতে উদাত হ'য়ে যে শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করছ না। তা আমি মনে করি। সেই কথাটি বলতে গিয়ে তোমাকে আজ অনেক কথা বলে ফেললাম।”

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন “ক্ষেত্র, তুমি শাস্ত্র টান পড়বার এত সময় পাও কখন ? আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, শাস্ত্রে আমারই অধিকার হবার কথা ; আর তুমি বৈষ্ণব, কৃষিকার্য্যে তোমারই দক্ষতা হবার কথা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকাল সবই উণ্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি হলাম কৃষকের সর্দার ; আর তুমি আমাকে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিচ্ছ ! কলিযুগে সবই উণ্টো হয়ে পড়ল দেখতে পাচ্ছি।” সতীশের স্বরে বিদ্রূপ বস্কৃত হইয়া উঠিল।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “ওটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। কৃষিশাস্ত্র বল, বাণিজ্যনীতি বল, শিল্পশাস্ত্র বল, সমস্তই ঋষিরা প্রণয়ন করে গেছেন। মহর্ষি পরাশর কৃষিশাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন। পাকা কৃষক না হলে কেউ ওরূপ শাস্ত্র লিখতে পারেন না। মহর্ষি মনুর সংহিতায় সুন্দর বাণিজ্যনীতি দেখতে পাবে। মহর্ষি ভারত নাট্যকলা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বিহুর শূদ্র হ'লেও, ধর্ম্মতর্কে ও শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্বুত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হয়েও মহাভারতের শান্তিপর্ক ও অনুশাসন পর্কে যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে গেছেন, তা কয়জন ব্রাহ্মণে পারেন ? আজকাল লোকে সঙ্গীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে যেমন আবদ্ধ করে, পূর্বকালে লোকে তেমন করত না। তাই সেকালে হিন্দুরা উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। যে বিষয়ে ঋষি অধিকার জন্মে, তিনি সেই বিষয়ের আলোচনা করতেন এবং আপনার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও উন্নতি সাধন করতেন। এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয়।”

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত। ক্ষেত্রনাথ কথা বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

### ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র ভ্রমণে বহির্গত হইলে, মনোরমা সৌদামিনীকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিবার জন্ত যমুনাকে পাঠাইলেন। সৌদামিনী কিছুতেই “কাছারী-বাড়ী” যাইবে না; কিন্তু যমুনা তাহাকে বলিল যে, বাবুরা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন, এখন কেহ বাড়ীতে নাই, সেই কারণে গৃহিণী তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন।

তথাপি কাছারী-বাড়ী যাইতে সৌদামিনীর লজ্জা হইতে লাগিল। গ্রামের কেহ কেহ গতকল্য তাহার আশীর্ব্বাদের কথা শুনিলেও, অধিকাংশ লোকেই তাহা শুনে নাই। কিন্তু সৌদামিনীর মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তাহা শুনিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকলের সম্মুখ দিয়া কিরূপে কাছারী-বাড়ী যাইবে—বিশেষতঃ যখন একটা নূতন লোক সেখানে রহিয়াছেন? লোকে কি মনে করিবে? বাবা কি মনে করিবেন? পিসীমা কি মনে করিবেন? বৌদিদি কি মনে করিবেন? না,—সৌদামিনী এখন কাছারী-বাড়ী যাইবে না। সে স্পষ্টই যমুনাকে বলিল “যমুনি, তুই যা; আমি যাব না।”

যমুনা গালে হাত দিয়া বলিল “ওমা, তুমি নাই যাবে, কি বলছ গো? গিন্নী রাগ করবেক্ যে! গিন্নী তুমাকে লিয়ে যাতে এখাতে আমাকে পাঠালোক্, আর তুমি সেখাতে নাই যাবে, বলছ? ঘরে এখন কেউ নাই আছে—আমাদের বাবু আর তুমার বাবুটোও পাহাড়ে বুলতে গেলছে”—

যমুনার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই সৌদামিনী রাগিয়া বলিল “যমুনি, পোড়ারমুখি, চুপ্ কর বলছি। আ মবু, কথা বলবার ধরণ দেখ?”

যমুনা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল “লয়া বাবুটো কি তুমার বাবু নাই আছে? তুমার বাবু লয় তো উটো কার বাবু বটে? বাবুটো তুমাকে বিহা করবোক্। তুমি অমন বাবু কুথায় পাবে গো, সৌদাদিদি? আচ্ছা, আগে

বিহা তো হোক্, তার পর উটো তুমার বাবু বটে, ন কার বাবু বটে, তা দেখা যাবোক্।”

সৌদামিনী যমুনার কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বৌদিদি রন্ধনশাল হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া গস্তীরভাবে বলিলেন “কি, যমুনা, তোমাদের লয়া বাবুটা কি আমার ঠাকুরঝিকে দেখবার জন্ত ডেকে পাঠিয়েছে? বেশ তো; নিয়ে যাও না।”

যমুনা হাসিয়া বলিল “তুমি অমন কইলে তো সৌদাদিদি ওখাতে আর নাই যাবোক্। আমাদের বাবু আর লয়া বাবুটো পাহাড়ে এখন বুলতে গেলছে। গিন্নী আমাকে কহে দিলোক্, সৌদাকে ডেকে লিয়ে আয়, তার সঙ্গে আমার চের কথা আছে।”

বৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “যাও না, ঠাকুরঝি; তোমার বর ওখানে আছে তো কি হ'বে? একবার যদি দেখাও হ'য়ে যায়, তাতেই বা দোষ কি? যমুনা বলছে, তারা এখন বাড়ীতে নেই। যাও না, নলিনের মা কি বলে, শুনে এস। না গেলে সে রাগ করবে, বুঝলে?”

পিসীমা সেই সময়ে সেখানে আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। তিনিও সৌদামিনীকে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী কি করে, সকলের কথায় যাইতে সন্মত হইল। সেই সময়ে গাঙ্গুলীদের দশবর্ষবয়স্কা নীরদা সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, সৌদামিনী তাহাকে বলিল “নৌক্, আমার সঙ্গে কাছারী-বাড়ী যাবি তো আয়।” এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইল।

কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র, মনোরমা হাসিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন “এস, এস, সহ, এস। তুমি খুব কপির ডালুনা র'ধতে শিখেছিলে, যা হোক্। একজনকে কেবল কপির ডালুনা খাইয়েই বশ ক'রে ফেললে। তোমার খুব বাহাদুরী বটে!”

সৌদামিনী লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল “তুমি কি জন্তে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?”

“কি জন্তে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি? তোমার বরের সঙ্গে দেখা করবার জন্তে! এটাও কি আর বুলতে পার

নি ?” সচুকে লজ্জায় অধোবদন দেখিয়া মনোরমা বলিল “না, না, অত ভয় করুছ কেন ? তোমার বরের সঙ্গে এখন দেখা হ'বে না। তাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। তুমি বস। সেই যে সেদিন তুমি গেছ, তার পর থেকে তোমার আর দেখাটি নাই। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত আমি ছটফট করছিলাম।”

এমন সময়ে নরু আসিয়া মাসীমার ক্রোড়ে আরোহণ করিল। নরু বলিল “মাসীমা, কাল আমরা তোমাদের বাড়ীতে নেমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি। আচ্ছা, মাসীমা, কাকা-বাবু তোমার হাতে দুটো সোনার টাকা দিলে কেন ? খল না ?”

সৌদামিনী তিরস্কারসূচক অনুচ্চকণ্ঠে নরুকে বলিল “চুপ্ কর, দুষ্ট ছেলে।”

নরু বলিল “আমি দুষ্ট হ'ব কেন ? কাকাবাবু সেদিন বলেছে, তুমিই দুষ্ট। হ্যাঁ,—তুমি শোন নাই বুঝি ?”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন “ওরে নরু, তোর কাকা-বাবু এখন তোর মেশোমশাই হয়েছে। তাঁকে এখন মেশোমশাই বলে ডাকিস্।”

সৌদামিনী নরুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া লজ্জা ও অভিমানসূচক স্বরে মনোরমাকে বলিল “তুমি কি যে বল, দিদি, তার ঠিক নাই। নরু এখন কি বলতে কি বলে বসবে। নরু, তুই যদি ঐ কথা বলিস্, তা হ'লে তোকে আর কোলে নেবো না, ফুল এনে দেবো না, আর গল্প বলবো না। বুঝেছিস্ ?”

নরু মাসীমার শাসনে ভীত হইয়া বলিল “না, মাসীমা, আমি বলবো না। তুমি আমায় গল্প শোনাবে ?”

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল “শোনাব ; তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোমায় আবার গল্প শোনাবো না ?” এই বলিয়া তাহাকে আবার ক্রোড়ে লইল।

মাসীমার কথা শুনিয়া নরুর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মনোরমা সৌদামিনীকে বলিলেন “কাল যে সপ্তমী ; দস্তদের বাড়ীতে পূজো ; আমাদের নিয়ে যাবার জন্তে গাড়ী আসবে। তুমি যাবে না ?”

সৌদামিনী কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া বলিল “তুমি যাবে তো ? তুমি যদি যাও, তা হ'লে আমিও যাব।”

মনোরমা বলিলেন “আমরা যাব, ঠিক করেছি। বাবু বলছিলেন, দস্তগিন্দী নিজে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন ; না গেলে, ভাল দেখাবে না। সতীশ বাবুর বামুন রয়েছে। সেই এখন রেঁধে তাঁদের খাওয়াবে। কাল আর পরশু, দুটা দিন ওদের বাড়ীতে থেকে নবমীর দিন সকাল বেলায় আমরা চ'লে আসবো, কেমন ?”

সৌদামিনী বলিল “তা বেশ। আমি পিসীমাকে বলছি। বাবা আর দাদা আজ সকালেই দস্তদের বাড়ী গেছেন।”

মনোরমা প্রভৃতি যখন কলিকাতা হইতে চলিয়া আসেন, তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বন্ধকী গহনাগুলিও মহাজনের নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। মনোরমা এক্ষণে সৌদামিনীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া গহনার বাস্তু বাহির করিলেন, এবং সোনার চুড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া সৌদামিনীকে পরিতে বলিলেন।

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া বলিল “কেন, চুড়ী পরব কেন ?”

মনোরমা বলিলেন “কেন, তা পরে বুঝতে পারবে। বলি, এই সোজা কথাটাও বুঝতে পারছ না ? সতীশ বাবু তোমার জন্ত যে গহনা গড়াবেন, তা তোমার হাতের মাপ না পেলে কি ক'রে গড়াবেন ? বুঝলে এতক্ষণে ?”

সৌদামিনীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে মনোরমার সোনার চুড়ী পরিতে চাহিল না। মনোরমা অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। তখন মনোরমা নিরুপায় হইয়া সৌদামিনীর হাত হইতে একটা কাচের চুড়ী খুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন “বেশ, তোমার বরকে এই কাচের চুড়ীখানাই দেব। কে বলে, তোমার বুদ্ধি নাই ? তুমি কাচের বদলে কাঞ্চন পাবে, আর তিনি শহীরের বদলে কেবল জীরে পাবেন। দেখছি, তোমারই জিত।”

মনোরমার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠা শক্ত ভাবিয়া সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া নীরব রহিল। সৌদামিনী সর্ব্বক্ষণই ক্ষেত্রবাবু ও সতীশবাবুর প্রত্যাগমনের আশঙ্কা করিতেছিল। এইজন্ত সে বলিল “দিদি, তুমি বস ; আমি আর বেশীক্ষণ থাকব না, বাড়ী যাই। মৌদিদি একলা আছে। কাল কখন যাবে ?”

মনোরমা বলিলেন “খাওয়া দাওয়ার পর।”

সৌদামিনী বলিল “বেশ, আমিও যাব।” এই বলিয়া নীরদা ও যমুনার সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইল।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## কেরোলী রাজ্যে বাঙ্গালী

বীরপুরুষ ও বীরাজগণের জন্মভূমি, বীরপ্রসূ রাজো-  
বারার অন্তর্গত কেরোলীরাজ্যে বাঙ্গালীর উপনিবেশের  
কাহিনী অদ্য আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাগণকে উপ-  
হার দিব। সে আজ কয়েক বৎসরের কথা। একদিন  
কেরোলীরাজ্যের শাসনবিবরণী পাঠ করিতে করিতে  
১৮৯৭-৯৮ অব্দের রিপোর্টে রাজপুত সর্দারগণের মধ্যে  
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম এবং পর  
পর বৎসরের বিবরণীতে আরও দুই তিন জন বাঙ্গালীর  
নাম দেখিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন অর্থাৎ ১৮৯৪—৯৫  
অব্দের রিপোর্ট খুলিলাম। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে  
আছে, যে, ভোলানাথবাবু মিউনিসিপাল বোর্ডের  
ভাইসপ্রেসিডেন্ট, এবং মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।  
যখন প্রথম এই ছত্রগুলি পাঠ করি তখন বিশ্বয় ও আনন্দে  
আমাদের হৃদয় আগ্রত হইয়া উঠিল। কোতুহলী মনের  
মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল, এই সুদূর মরুস্থলীতে যত্ন-  
বংশীয় বীরগণের স্বায়ত্তশাসনবিভাগে একজন বাঙ্গালী  
এরূপ কর্তৃত্ব করিতেছেন, ইনি কে? পরে জানিতে  
পারিলাম ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ “সাহিত্য”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত  
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের আত্মীয়। কেরোলী-  
রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশের অনুসন্ধানকালে রাওসাহেব  
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র  
আমাদের বন্ধু, রসায়নবিৎ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
মহাশয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া কয়েক বৎসর হইল আমার  
হস্তে অর্পণ করিয়া আমায় অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।  
উপস্থিত প্রবন্ধ সেই সকল উপকরণ অবলম্বনেই লিখিত।

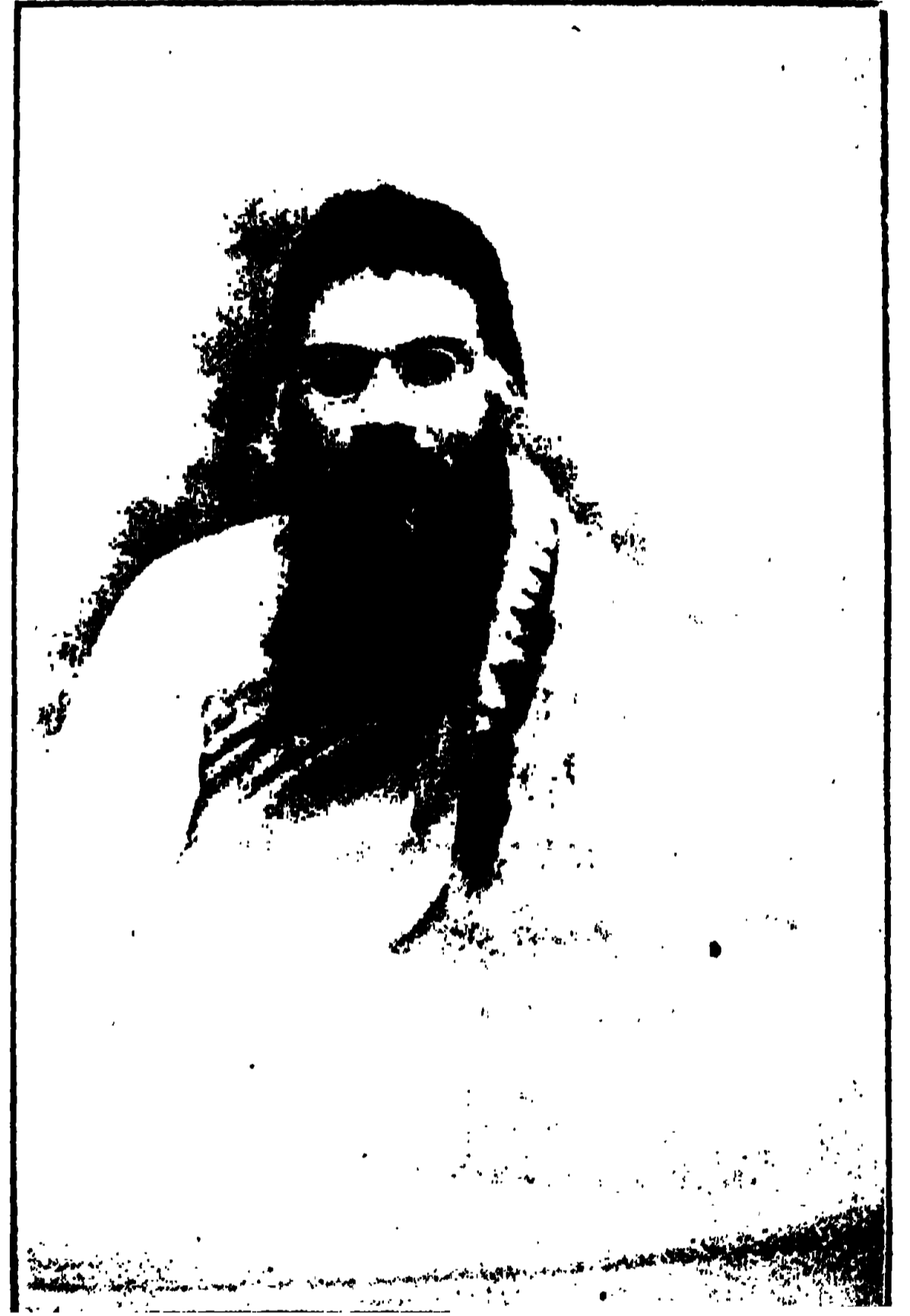
রাজপুতানার মধ্যে কেরোলী একটা ক্ষুদ্রায়তন রাজ্য।  
ইহার বিস্তার ১২৪২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সার্কুলকা-

ধিক, এবং ইহার প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১২৬ জন লোকের  
বাস। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে জয়পুর এবং ভরতপুরের  
স্বল্লাংশ। পূর্বে ধোলপুর এবং দক্ষিণে চম্বল—গৌরা-  
নিক চর্ম্মগতী নদী। এই নদী কেরোলীরাজ্যকে  
গোয়ালিয়র হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। রাজ্যটি  
আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের আভিজাত্য  
গণনায় ও সম্মানে গুরু। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গা-  
লীর আবির্ভাব হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে  
হিন্দুবিগ্রহচূর্ণকারী মোগলসম্রাট আরজুনেব কর্তৃক মথুরার  
মন্দির ধ্বংস ও বৈষ্ণব নিগ্রহ আরম্ভ হইলে, গোড়ীয়  
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গোস্বামীরা জয়পুরের মহারাজার  
শরণাপন্ন হন। সেই সূত্রে বৃন্দাবন হইতে আনীত বহু  
বিগ্রহের মধ্যে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী এবং মদন-  
মোহনজীর মূর্তির সহিত বাঙ্গালী গোস্বামীগণ জয়পুরে  
প্রতিষ্ঠিত হন। পরে কোন সময় জয়পুরের মহারাজাকে  
সাহায্য করায় কেরোলীর মহারাজা বন্ধুত্বের পুরস্কার-  
স্বরূপ মদনমোহনজীর বিগ্রহ লাভ করেন। মদনমোহন-  
জীর সহিত বাঙ্গালী গোস্বামীগণ উদবোধি কেরোলী-  
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। উপস্থিত যে ১৬১৭ খ্রিঃ বর গোস্বামী  
এখানে বর্তমান আছেন তাঁহার মদনমোহনজীর উক্ত  
পূজারীদিগেরই বংশধর।

কেরোলীরাজ্যে মদনমোহনজীর এতদূর প্রভাব যে,  
রাজার শীলমোহরে মদনমোহনের নাম অঙ্কিত থাকে  
এবং কেরোলীকে মদনমোহনের কেরোলী বলা হয়।  
মহারাজা এই বিগ্রহের প্রতিনিধিস্বরূপ মাত্র রাজ্য  
পরিচালনা করিয়া থাকেন। মদনমোহনজীই মহারাজার  
ইষ্টদেবতা। রাজ্যেশ্বরের ইষ্টদেবতার প্রসাদে এখানে  
বাঙ্গালী গোস্বামীগণের অপ্রতিহত প্রভাব। রাজদত্ত  
দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত গোস্বামীগণ রাণীদিগের নিকট  
হইতে প্রভূত ধন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া আসিতে-  
ছেন। প্রত্যেক রাজা ও রাণী মৃত্যুকালে স্ব স্ব বহুমূল্য  
অলঙ্কারগুলি মদনমোহনজীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান।  
এ পর্যন্ত পূর্ব পূর্ব রাণীরা সহস্র সহস্র টাকা আয়ের  
সম্পত্তি সহ ৬টা সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোস্বামীদিগকে  
দান করিয়া গিয়াছেন। শুধু কেরোলীর সীমার ভিতর

তাঁহাদের ১৬০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু এসকল থাকিলে কি হইবে? কেরোলীর বর্তমান গোস্বামীকুলে তাঁহাদের কুলপ্রবর্তক পূজ্যপাদ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এবং সনাতনের পাণ্ডিত্যের চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠশালায় সামান্য হিন্দী ও পাটোয়ারী হিসাব শিক্ষা করিয়াই ইহাদের পাঠ সমাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার বাঙ্গালা-অক্ষর-পরিচয়ও নাই। জয়পুরী মাড়বারী পোষাক পরিচ্ছদে ইহাদের অঙ্গ শোভিত হয়, মদনমোহনজীর “পরসাদ” (প্রসাদ)—“খীরসা” \*, “মিঠরী” †, “গুঁঝা” ‡, এবং “বিনা পানির রুটী” § ইহাদের রসনা পরিতৃপ্ত করে এবং বাজরার রুটীতে ইহাদের ভোজনব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে নিত্য কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, বাক্কলহ, এমন কি প্রণয়লাপ পর্যন্ত মাড়বারী ভাষাতেই হয় এবং ইহাদের বাহিরে, মাড়বারী পাগড়ী, অক্ষরাধা, জয়পুরী ধুতী ও ছুপাটা এবং নাগরা, আর অস্তঃপুরে “লাহঙ্গা” (ঘাঘরা), “ওঢ়না” এবং “আঙ্গিয়া (কাঁচুলী) ভূরি ভূরি ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপে ইহারা বাঙ্গালী হারাইয়া এক্ষণে “কেরোলীর গোস্বামী”তে পরিণত হইয়াছেন। ইহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই রাখেন নাই এবং সম্পূর্ণরূপে মাড়বারী সমাজে বিলীন হইয়া যাইতেও পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান গোস্বামীর নাম মোহনকিশোর। শুনিয়াছি তিনি নাকি বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে, বলিতে এবং পড়িতেও পারেন না। তিনি অপুত্রক! তাঁহার বিমাতা “মাজী” বা “মাইজী” নামে প্রসিদ্ধা। ইনিই

কেরোলী এবং বৃন্দাবনস্থ সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী। প্রধান গোস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা ৬ গোবিন্দলাল গোস্বামী, গুসাঁই গোবিন্দ লাল নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এবং মন্দিরাধিকারী গোস্বামী প্রতাপ শিরোমণি কেরোলীর “পরতাপ শিরোমণ গুসাঁই।” বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দকিশোরের লীলাভূমিতে বাঙ্গালী গোস্বামীগণ স্ব স্ব নামের সহিত “কিশোর” যুক্ত করিবার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। তাই



রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

মোহনকিশোর, বংশীকিশোর, মধুসূদনকিশোর প্রভৃতি নাম প্রায়ই ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিন এক বিবাহের মজলিসে গোস্বামী মধুসূদনকিশোর \* ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদিগের অতি ভয়াবহ পরিণামের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। • শুনিয়াছি কোন ভদ্রলোক তাঁহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন “হমার

\* শুনিয়াছি ইনি এলাহাবাদপ্রবাসী ৮ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন।

\* ঘোচার আকৃতি ক্ষীরের মিঠাই।

† উপরে চিনি মাধান ঘৃতপক আটার মিঠাই।

‡ আটার পূর দেওয়া, ঘিয়ে ভাজা ও চিনির রসে পাক করা, আটা, ক্ষীর ও চিনির লাড়ু।

§ বিনা জলে মাধা আটার মিঠারুটী; জলের পরিবর্তে ঘৃতে চিনি মিশ্রিত ময়দা মাধিতে হয়; সেই ময়দায় খালার পৃষ্ঠে রুটী বেলিয়া খালা মুক্ত আঙুনে সেকিতে হয়। রুটীর গায়ে নানা রকমের ফুল পাতা কাটিয়া তাহাতে নানা বর্ণে রঞ্জিত ধরমুজার বীজ মধ্যস্থলে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিন্দুমাত্র জলের সংগ্রহ নাই বলিয়া এই নাম।

নাম মকসুদর কিশোর।” প্রশ্ন হয়, “আপনার পদবী?” মধুসূদন গোস্বামী উত্তর দেন, “কেরোলীর মুখুর্জা।” পুনরায় প্রশ্ন হইল “আপনাদের গাঁই? উত্তরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, “হামাদের দুইটা গাঁই আছে।”

তাহারা জাতীয়ত্ব ও নিজস্ব শক্তি অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া একদিকে যেমন বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত হইয়া আছেন, অপরদিকে এ দেশীয়দিগের চক্ষেও অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের পূর্বগৌরব, পূর্বসম্মতি, সমাদর আর তরুণ নাই। পূর্বের ঞায় রাজারা আর এখন তাহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন না। গোস্বামীদিগের বংশধরগণের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজা ভ্রমরপাল ইহাদের সম্পত্তির বন্দোবস্তের ভার প্রায় সমস্তই ষ্টেটের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তবে পূজার অধিকার হইতে এখনও তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহাদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া গোস্বামী রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেরোলী ত্যাগ করিয়া অধিকাংশকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকেন। কেরোলীর গোস্বামীগণের মধ্যে ইনি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। মদনমোহনজীর ভূতপূর্ব ম্যানেজার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রে উপাধিপ্রাপ্ত জাতীয়ত্বরক্ষাপ্রয়াসী গোস্বামী গিরিবরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানকার ভাব গতিক দেখিয়া, স্থানত্যাগ করত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। তবে কি কেরোলীর “মুখুর্জা” এবং “গুঁসাইগণ” এইরূপে দুর্বল হইয়া পড়িবেন এবং তাহাদের উপনিবেশ এইরূপে পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইবে? না, তাহাদের সমুন্নতির সুযোগ আছে। তাহারা বিবাহের আদানপ্রদান বাঙ্গালীর গৃহেই করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীগৃহে, দ্বিতীয়তঃ পঞ্চকোটি ব্রাহ্মণকণ্ঠা ক্রয় করিয়া এবং অভাবে কৌশলেও বিবাহটা বঙ্গগৃহেই হয়। কেরোলীর উপনিবেশিক বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা অধিক আশার কথা এই যে বহুবর্ষ হইতে এখানে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাস করিতেছেন। কেরোলীর শাসন-বিবরণী হইতে যে সংবাদ

আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তদুল্লিখিত ভোলানাথ বাবুর কথাই বলিতেছি। ইনি কেরোলির মহারাজার মন্ত্রীসভার অন্ততম সদস্য, রাজ্যের উন্নতি-ও-মঙ্গলবিধায়ক এবং মহারাজার হিতচিন্তকগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ। ইহারই প্রভাবে গোস্বামীদিগের বাঙ্গালীত্ব ফিরিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথোপকথনের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধান কাপড় ও মাড়বারী ঘাঘরার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া শাড়ীর ব্যবহার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীপছন্দ খাওয়ার প্রচলন হইতেছে। ভোলানাথ বাবু কেরোলী রাজ্যের “সার-ওয়ার্টার র্যালো।” ইনি এই মরুভূমিতে কপি ও আলুর চাষ প্রথম প্রবর্তিত করেন। পরে মটরসুঁটিও লইয়া যান। কপি ও আলু এখানে জনসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে পুরাতন প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া ঐ দুই সুখাদ্য এক্ষণে মদনমোহনজীর ভোগেও চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া সুখরীয়া গ্রামে। তিনি ফতেপুর জেলায় জজের আদালতে কর্ম করিতেন। এখান হইতে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীবাসী হন। বারাণসীতেই তাহার পৈতৃক বাটীতে ভোলানাথ বাবুর জন্ম হয়। তিনি প্রথমে Bengaleetolah Preparatory School নামক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া বারাণসী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ অব্দে এই কলেজ হইতে বি.এ পাশ করিয়া ভোলানাথ বাবু কিছুদিন মির্জাপুর মিশন স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতে থাকেন। এখানে উন্নতির পথ বড় নাই দেখিয়া দুই বৎসর পরে কর্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা করেন। প্রথমাবধি তাহার গবর্ণমেন্টের কোন বিভাগে কর্ম করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুরুবির জোর না থাকায় তাহা কার্যে পরিণত করিতে পাবেন নাই। পরে কোন দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার তাহার ঝোঁক হয়। ইতিমধ্যে

“পাইয়োনায়ার” পত্রে কেরৌলীর মহারাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন আছে দেখিয়া তিনি ঐ পদের জ্ঞাত আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় এবং তিনি মাসিক ৬০ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি মির্জাপুর মিশনরী স্কুলের কর্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২৬ জুন নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হন। কেরৌলী রাজ্যে তখন ভাল ইংরাজী-জানা কর্মচারী কেহই ছিলেন না, সুতরাং অনেক সময় চিঠি পত্রাদিতে অর্থবিলাট ঘটত। ভোলানাথ বাবু চাকরীতে বাহাল হইবার পূর্বেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজার সেক্রেটারী তাঁহাকে যে মঞ্জুরী-পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কেরৌলীর রাজধানী রেল ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া তিনি অনুসন্ধান জানিতে পারেন দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে তিনগুণ অধিক অর্থাৎ ৫২ মাইল! একে ঠিকঠা মাসের দারুণ উদ্ভাপ, তাহাতে আবার মরুপর্ব্বতময় প্রদেশের অজানা পথ; তাহাতে অজ্ঞাতপ্রকৃতি ভিন্নভাষাভাষী পল্লীবাসীদের মধ্য দিয়া যাইতে প্রথমে তাঁহাকে বিলম্ব ইত্যন্তঃ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইতে হইবে জয়পুর রাজ্যের ভিতর দিয়া। তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া একান্তবাহিত বিচক্রপথ “একায়” আরোহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার বাহিরে যাহারা পদার্পণ করেন নাই তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। এই ৫২ মাইল পথ অশ্বযানে যাইতে ভোলানাথ বাবুকে মাত্র তিনটা রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। পথে মজরা নামক গ্রামে তিনি রাত্রিবাস করিয়া পরদিন যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে না পাইয়া, উদয়াস্ত হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে প্রথম প্রথম এখানে কোন ক্রমেই মন টিকাইতে পারেন নাই। জনৈক উচ্চ কর্মচারী কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং স্কুলের সেক্রেটারী জনৈক উদারপ্রকৃতি রাজপুত তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ছিলেন তাঁহার কথাবার্তার লোক।

ভোলানাথ বাবুর আগমনকালে কেরৌলীর মহা-

রাজার বয়স ছিল ৬০ বৎসর। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। কালোচিত শিক্ষার অভাবে তাঁহার সময়ে নানা গোলযোগ উৎপন্ন হওয়ায় রাজ্যের বন্দোবস্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের হস্তে যায়। তখন এজেন্ট ছিলেন সার ইভান স্মিথ ( Sir Evan Smith )। ঙ্গীর নিকট চিরদিনই ঙ্গের আদর হইয়া থাকে। এজেন্ট মহোদয় এই প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা ও সঙ্গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অগ্রহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। তিনি ইংরাজি স্কুলের হেড মাস্টার হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্কুল তখন পাঠশালা বলিলেই হয়, ভোলানাথ বাবু এই পাঠশালাটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এজেন্ট মহোদয়েরও বিদ্যালয়টির উন্নতি দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে ভোলানাথ বাবুর কোন প্রস্তাবই তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হয় নাই। এজেন্ট সাহেবের সহায়তা ও নির্দেশে তিনি সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং সমূহ উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাঠশালাটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে উন্নীত হইল, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, সাধারণের মনে সম্মানগণকে উন্নত শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি জাগিল এবং ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

ভোলানাথ বাবুর পরও শিক্ষার ভার বাঙ্গালীরই উপর ঞ্চ হইল। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে বাবু গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায় স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গোবর্দ্ধন বাবু রামগোপাল বাবুর সহোদর। শিক্ষা বিভাগে আমরা বাবু সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নামও প্রাপ্ত হই। কেরৌলীতে ছাত্রগণ ইংরাজি, হিন্দী, সংস্কৃত এবং পারস্ত ভাষায় শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং রাজপুতানার ঞ্চ এখানেও ছাত্রগণকে বেতন দিতে হয় না।

ভোলানাথ বাবু কেরৌলীর শিক্ষাবিভাগের সুবন্দোবস্ত লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। প্রথমাবধিই তাঁহাকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহেও হস্তক্ষেপ করিতে



হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে সকল কথাই উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এখানে বহু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রবল প্রতিপক্ষগণের কূটমন্ত্রণা ভেদ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি-ও চরিত্র-বলে ভোলানাথ বাবুকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ মহারাজার রাজত্বকালে যুবরাজের সহিত নানা কারণে মন্ত্রীসভার সভ্যগণের মনোমালিণ্য হয়। ভোলানাথ বাবু কেরোলীতে আসিয়া এইরূপ অবস্থাই লক্ষ্য করেন। তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে আগমন করেন, শ্রাবণ মাসে বৃদ্ধ মহারাজার স্বর্গ লাভ হয় এবং উক্ত যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। নবীন রাজার প্রতিপক্ষ কোম্পিলের মেধরগণ তখন অতিশয় ভীত হন। তাঁহারা নানারূপ চক্রান্ত করিয়া নবীন মহারাজকে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই শত্রুসঙ্ঘল পিতৃরাজ্যে একমাত্র ভোলানাথ বাবু, কাশ্মীরী পণ্ডিত নন্দলাল এবং স্কুলের সেক্রেটারী জনৈক রাজপুত্র সর্দার মহারাজার সংপরামর্শদাতা ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই সময় একজন ইংরাজী-জানা কর্মচারী আবশ্যক হওয়ায় ভোলানাথ বাবুই তৎপদে মনোনীত হন এবং সেই সূত্রে নবীন রাজার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর হিন্দী ভাষায় কথোপকথন ও উদয়াস্ত “জনাব, জনাব” করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে।

তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনটি কর্ম জুটাইয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল অল্পত্র সরিয়া পড়েন। শেষবারে যখন আজমীর মেয়ো কলেজে ১৩০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্কের পদের জন্য আবেদন করিয়া তাৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্টের যত্নে মনোনীত হন, ভোলানাথবাবু কেরোলীতে তখন ৮০০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেছিলেন; কিন্তু ভোলানাথ বাবু যে তখনও উভয় ইংরাজগভর্নেন্ট এবং মহারাজার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা আজমীর কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ণেল লক সাহেবকে মেজর মার্টেলাী কর্তৃক লিখিত সুপারিসপত্র \* হইতেই জানা যায়।

কিন্তু ভোলানাথ বাবু চলিয়া গেলে হঠাৎ এরূপ বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান্ ইংরাজীশিক্ষিত কর্মচারী পাওয়া সুকঠিন বুলিয়া অল্প দুইবারের মত এবারও মহারাজা তাঁহাকে কেরোলী ত্যাগ করিতে দেন নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই রাজ্যের নূতন বৎসরের আয়ব্যয়-তালিকা (Budget) প্রস্তুত হয়। সেই সময় আজমীর যাইতে না দেওয়ায় ভোলানাথ বাবুর যে ক্ষতি হয়, তাহা তিনি মহারাজাকে স্বরণ করাইয়া দেন, তাহাতে মাত্র ১২০০ টাকা তাঁহার জন্য মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই বৎসরই মহারাজা গভর্নেন্ট হইতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে পুরাতন কর্মচারীদের পদবৃদ্ধি ও নূতন কর্মচারীদের নিয়োগ উপলক্ষে ভোলানাথ বাবু ১৫০০ টাকা বেতনে স্থায়ী প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত এবং পর বৎসর ১৫০০০ টাকার জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং পূর্বোক্ত কাশ্মীরী পণ্ডিত দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। কিন্তু পলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত মহারাজার যাবতীয় চিঠিপত্রের আদান-প্রদান-কার্য ভোলানাথ বাবুর দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, সাহেবের দরবারে ডাক পড়িলে তাঁহাকেই যাইতে হয়, এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কোন কূটপ্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকেই মীমাংসা করিতে হয়। মন্ত্রীসভার কোন কোন দায়িত্বহীন দুর্বুদ্ধি কর্মচারীর দোষে যখনই যখনই রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিষ্টের সম্ভাবনা হইয়াছে তখনই ভোলানাথ বাবু রাজ্যের সমস্ত রক্ষা করিয়া উভয় ব্রিটিশ গভর্নেন্ট ও মহারাজার নিকট অধিক বিশ্বাস-ও প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতে, এমন কি তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিতে, বিপুল আয়োজন ও উদ্যম সহকারে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু ভোলানাথ বাবুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভায় সকল কুমন্ত্রণা ও কূটকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। একবার কেরোলীতে একটা সঙ্গীন মকদ্দমা উপস্থিত হয়। রাজধানী হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে একটা গ্রামে জনৈক রাজপুত্র মহিলা সতী হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মৃত

rate work in Kerowlee, and whom both the Maharajah and I shall be scrry to lose. I have the highest opinion of him."

\* "Babu Bholanath Chatterji, Headmaster of the Kerowlee State School, is a man who has done first-

পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন। স্বটনাস্থলে প্রায় বিংশতি সহস্র লোকের জনতা হয়। পুলিশও দলবল লইয়া উপস্থিত ছিল। কেহই সতীকে আত্মবিসর্জনে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এদিকে রাষ্ট্র হয়, যে, স্বীলোকটী চিতা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া তাহাকে দগ্ধ করা হয়। ইহাই মকদ্দমার বিষয়। রাজ্যে ছলস্থল পড়িয়া গিয়াছে। এমন সময় ভোলানাথ বাবুর ডাক পড়িল। মহারাজা তাঁহার হস্তে সকল দিক রক্ষার ভার দিলেন। এই সময় এজেন্ট সাহেব ৩ মাসের ছুটি লইলে ইন্দোরের দিক হইতে অত্র একজন এজেন্ট আগমন করেন। সুযোগ পাইয়া ভোলানাথ বাবুর প্রতিপক্ষ অথচ তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট জনৈক মুসলমান কর্মচারী এজেন্ট সাহেবের আদালতে থাকিয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়— কিন্তু নূতন সাহেব ভোলানাথ বাবুর অপক্ষপাত তদন্তে এবং দক্ষতার সহিত লিখিত মকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার প্রতি বরং সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মন্তব্য সহ ভোলানাথ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার রিপোর্ট ভারত-গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করেন। তাহার পরিণামে পুলিশ নিষ্কৃতি লাভ করে এবং শাসনসংক্রান্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

এই সতী-মকদ্দমার কিছুদিন পরেই পুরাতন এজেন্ট সাহেব প্রত্যাগত হইলে ১৮৯৭ অব্দে কেরৌলী রাজ্য পরিদর্শন করেন। সেই সময় ভোলানাথ বাবু মহারাজার অগোচরে তাঁহাকে জি, সি, এস, আই, বা জি, সি, আই, ই, উপাধি দানের জন্ত একখানি অনুরোধপত্র এজেন্ট সাহেবকে প্রদান করেন। পত্রের উত্তরে এজেন্ট মহোদয় উপাধির জন্ত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ঠিক সেই সময় বড়লাটের ভরতপুর আসিবার কথা ছিল বলিয়া মহারাজাকে ভরতপুর যাইবার পরামর্শ দান করেন। তদনুসারে ভোলানাথবাবুকে লইয়া মহারাজা ভরতপুর গমন করেন। তাহার ফলে ভিক্টোরিয়া মহারাজার হীরক জুবিলির সময় কেরৌলীর মহারাজা জি, সি, আই, ই, উপাধিভূষিত হন। ইহার কিছুদিন পরে ভোলানাথবাবু কেরৌলী

কৌন্সিলের মেম্বর পদে উন্নীত হন। তিনি কেরৌলী রাজ্যের জন্ত যাহা করিয়াছেন এবং এখনও যাহা করিতেছেন তজ্জন্ত কেরৌলী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি যখন পূর্বে কয়েকবার কেরৌলী ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন তখন কাশ্মীরের রেসিডেন্ট সার্জন, যিনি পূর্বে কেরৌলীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এখানকার ভূতপূর্ব ও পরে বিকানীরের পলিটিকাল এজেন্ট, কর্নেল স্ট্রাটন (Col. Stratton) প্রমুখ রাজ্যের হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনেকে তাঁহাকে কেরৌলী রাজ্যের মঙ্গলের জন্তই কর্মত্যাগে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন—

“To continue to discharge the duties entrusted to him \* \* \* in the interest of the State \* \*”.

কর্নেল হার্সার্ট কেরৌলী হইতে গোয়ালিয়রের রেসিডেন্ট হইয়া যাইবার কালে ভোলানাথ বাবুর সন্ধানে লিখিয়া যান,

“It gives me much pleasure to write these few lines to testify to the satisfactory manner in which Babu Bholanath Chatterjee, member of Council, Karauli State, performed his duties during the 3½ years I was Political Agent, Eastern States, Rajputana. Practically all the English correspondence between my office and the Karauli Durbar passed through his hands and I always found all references, no matter how troublesome or technical, intelligently received and properly answered rendering my dealing with the Durbar pleasant and free from all trouble. In this gentleman the Durbar has I think a loyal and excellent servant and it is a source of satisfaction to me to think that it was in my time when acting as Political Agent in, I think, 1886 that Bholanath Chatterjee first came to the State as Headmaster of H. H. the Maharaja's School. I feel sure, he will always retain the good will of his master and deserve the esteem of the Political authorities.—Sd. C. Herbert, Lt Col., Gwalior Residency.”

ভোলানাথবাবু যখন কেরৌলী মিউনিসিপালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখনকার শাসনবিবরণীতে রাজ্যের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসাজনক মন্তব্য দৃষ্ট হয়। ১৮৯৭—৯৮ অব্দের শাসন-বিবরণীতে আছে—

“Kerowlee is one of the cleanest cities in Rajputana. The conservancy arrangements of the city are all that can be desired. \* \* \* The above is the opinion

of successive administrative medical officers of Rajputana.”

এইরূপে সকল দিকেই ভোলানাথবাবুর কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ২৭২৮ বৎসর ধরিয়াকেরোলী রাজ্যের শিক্ষাবিস্তার, সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে কি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে, কি মিউনিসিপালিটির সভাপতিরূপে, কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে, কিম্বা তাঁহার মন্ত্রীসভার অন্ততম মন্ত্রীরূপে ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহিত মহারাজার একযোগে রাজ্যশাসন-বিষয়ে মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া এবং উভয় পক্ষের হিত বজায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্তব্য পরিচালনা দ্বারা যেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন এবং বিদেশে বাদশাহীর যেরূপ মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে বাদশাহী জাতি ও বঙ্গজননী তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতে পারেন। তাঁহার কার্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া ১৯০৫ অব্দের ৬ই মে তারিখে ইংরাজ গভর্নমেন্ট কেরোলীতে একটা প্রকাশ্য দরবার করিয়া স্বয়ং মহারাজা ও রাজ্যের বহু সর্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে রাজমন্ত্রী ভোলানাথবাবুকে রাওসাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সভায় রাজপুতানার পূর্বাঞ্চলস্থ রাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল সি, জি, এফ, ফ্যাগ্যান, আই, এ, মহোদয় ভোলানাথবাবুর হস্তে রাজকীয় সনন্দ অর্পণ করিবার কালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল ;—

“Your Highness and Sirdars,

I have asked you here this evening to witness a formality which it is my pleasing duty to perform, namely to place in the hands of my friend Babu Bholanath Chatterjee, member of the Karauli State Council, the Sanad conferring upon him the title of Rao Sahib, a distinction which was conferred by his Excellency the Viceroy on my friend, in January last in acknowledgment of many years' loyal service rendered by him to the State. Loyalty to a Chief or a State means loyalty to the British Government—the two cannot be disassociated since the interests of both are identical. Good government in a Native State means

good government in an integral portion of the British Empire in India and it is for this reason that His Excellency the Viceroy is always ready and willing to show his appreciation of services rendered by the officials of Native States as well as of those serving in British India.

Babu Bholanath Chatterjee has served in this State for 20 years, first as school master, then as Private Secretary to H. H. the Maharaja and lastly as member of council.

The loyal manner in which he has performed his duties in this latter office has earned for him the approbation of the Government of India.

Rao Sahib Babu Bholanath Chatterjee, in handing to you this Sanad which I now do, I have been asked by the Honourable the Agent to the Governor General in Rajputana to convey to you an expression of his congratulations to which I would at the same time add my own upon the distinction conferred upon you by the Government of India and I feel sure that the honour of which you have been the recipient will urge you on to further exertions on behalf of the chief of the State you serve.”

ভোলানাথবাবুর এই উপাধি লাভে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, ভরতপুর রাজ্যের পলিটিকাল এজেন্ট এবং যোধপুর রাজ্যের রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাদের অন্ততম। গবর্নর জেনারেলের এজেন্ট—(Sir Arthur Martindale) সার আর্থার মার্টিন্ডেলও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথবাবুর কেরোলীরাজ্য-শাসন-কার্যে ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহিত রাজভক্তিপূর্ণ সুদক্ষ সহযোগিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মেজর ট্যাটন লিখিয়াছিলেন,

“I take the opportunity of congratulating you on the honour which has been recently bestowed on you by the Government of India. It is evident that your good work in Karauli has been appreciated and I trust that the fact will have given you satisfaction \* \* \* With all best wishes for 1905.”

রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি দিনলিপি রক্ষা করিয়াছেন। সে সমুদয় প্রকাশিত হইলে দেশীয় রাজ্যের বহু কোতূহলপূর্ণ ঘটনার কথা জানা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

## ঝড়ো হাওয়া

( গল্প )

রুদ্র মুষ্টি ধরিয়া বাপ কহিলেন, “মা সইতে পারিস্ ত আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। অত গোরা-মেজাজ আমি বরদাস্ত করুব না।”

মা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুরে সুর মিশাইয়া বলিলেন, “এমন ঘরের মেয়েও এনেছিলুম! সলা-পরা-মর্শে ছেলেকে আমার একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। যে ছেলের মুখে কথা ফুটত না, সে আজ বোয়ের হয়ে কথা বলতে এসেছে! ঘোর কলি দেখছি!”

শশী নত শিরে প্রস্থান করিল। রুগ্না জীর কানে কথাটা পাছে প্রবেশ করে, ইহা ভাবিয়াই সে অস্থির হইয়া উঠিল।

ঘরে আসিয়া শশী দেখে, কিরণ বিছানা ছাড়িয়া জানালার পাশে বসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর পদ-শব্দ শুনিয়া চকিতে সে মুখ ফিরাইল। শশী কহিল, “বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে এসে বসলে কেন, কিরণ? ঠাণ্ডা লাগবে যে!”

কোনমতে অন্তরের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া মুখে-চোখে সন্মিত ভাব দেখাইয়া কিরণ কহিল, “অসুখ ত সেরে গেছে—মিছিমিছি আর কত শুয়ে থাকব, বাপু?”

শশীর আর বুকিতে বাকী রহিল না যে কিরণের কানে কথার সবটুকুই গিয়াছে। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, “ডাক্তার কি বলে গেল, শুন্লে ত?”

হাসিয়া কিরণ কহিল, “ডাক্তারদের কথা আগাগোড়া শুন্তে গেলে আর বাঁচা যায় না। সব-তাতেই ওদের বাড়াবাড়ি—গেরস্তর ঘরে অত পোষায় কখনো?”

কিরণের মুখে এ সময়েও হাসি দেখিয়া শশীর বুক ফাটিয়া গেল। সে বুকিল, এ হাসি শুধু তাহাকে ভুলাইবার জন্ত! সহসা তাহার মুখে আর-কোন কথা জোগাইল না—স্থির দৃষ্টিতে কিরণের পানে চাহিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বামীর ভাব দেখিয়া কিরণের অত্যন্ত বেদনা বোধ

হইতেছিল। দম্কা বাতাসে জমাট মেঘের রাশি যেমন উড়িয়া ছিঁড়িয়া ভাসিয়া যায়, তেমনি করিয়া স্বামীর মনের ভিতরকার রুদ্ধ অন্ধকারটাকে লধু কোতুকে উড়াইয়া দিবার বাসনায় সে আবার হাসিয়া কহিল, “কি ভাবতে বসলে—পাছে আমি মরে যাই—না?”

তাহার পানে চাহিয়া সতাই শশী সেই কথা ভাবিতে-ছিল। রোগে ভুগিয়া কিরণের শরীর যাহা হইয়াছে, যে, চোখে দেখিলে, কে এমন নিষ্ঠুর আছে, শিরিয়া একটা ‘আহা’ না বলিবে! জীবনটুকু নিতান্তই যেন পল্কা সূতার বাঁধনে কোনমতে আটকাইয়া রহিয়াছে—একটু জোরে বাতাস লাগিলেই নিমেষে ছিঁড়িয়া যাইবে। যেন বাসি-ফুলের দলঙলা কোনমতে আপনাদের আঁটিয়া রাখিয়াছে, হাতের এতটুকু স্পর্শ লাগিলেই করিয়া পড়িবে। তাহার উপর ডাক্তার বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে, এতটুকু কাজ-কর্মের পরিশ্রম হইলে ঔষধ-চাপা রোগটুকু আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারে, এবং এই দুর্বল শরীরে রোগের সহিত যুক্তিবার শক্তিই যখন রোগীর নাই, তখন তাহাকে বাঁচানো দুর্ঘট হইতে পারে। রোগীর এখন যেমন অবস্থা, তাহাতে যদি সত্তর তাহাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্তনে কোথাও না যাওয়া হয়, তবে যন্না হইবার পক্ষেও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

কথাটা শুনিয়া অবধি শশীর গা থাকিয়া-থাকিয়া ছন্দ-ছন্দ করিয়া উঠিতেছিল। কিরণের দিকে চাহিতেই মন তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়ে। হায়, সেই কিরণ, বিবাহের রাত্রে মোমের পুতুলটির মতই যাহাকে কোমল সুন্দর দেখাইতেছিল! হতভাগিনী বিধবার সে একমাত্র সন্তান। স্বামী ও চার-পাঁচটি পুত্র-কন্যা হারাইয়া কিরণের মাতা কিরণকে লইয়াই যে কোনমতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। বিবাহের পরদিন কন্যা-বিদ্যায়ের সময় বিধবা মাতা কন্যাকে জামাতার হাতে সঁপিয়া দিতে গিয়া কাঁদিয়া বহু কষ্টে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন আজ নূতন করিয়াই শশীর মনে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল! তিনি বলিয়াছিলেন, ‘সবগুলিকেই যমের হাতে তুলে দিয়েছি—এই আমার এক-রত্তি ঝড়োটুকু—এইই আমার সর্বস্ব—তোমার হাতে দিচ্ছি—যত্ন করো

বাবা, যত্নে রেখো—বাছার মুখের দিকে চাইতে আর কেউ নেই।”

সেই কিরণ—সে যদি তাহাকে ছাড়িয়া যায় ? সে কথা মনে করিতেও শশীর সারা দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাই সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতার কাছে জ্বীকে লইয়া পশ্চিম যাইবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। শুনিয়া পিতা চটিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন, “বড় আমার পয়সা দেখেছ, না ?” মা বলিলেন, “রোগ হয়েছে, সেরে যাবে, তার আবার অত ভড়ং কেন ? আমাদেরই কি কখনো রোগ হয় নি, না। সেরে উঠিনি ? তা বলে’ এত হাওয়া খাবার চণ্ড কখনো তুলতে হয়নি। বড়মানুষের মেয়ে বলে’ কি সব-তাতেই বড়মানুষি দেখানো চাই ! দেখে আর বাঁচিনে যে !”

স্নেহশীল পিতা-মাতার মুখে স্নেহহীন এমন পরুষ ভাষা শুনিয়া শশীর মন পুড়িয়া যাইতেছিল ! তাহাদের মুখ দিয়া যে কথাগুলো বাহির হইয়াছিল, সেগুলো শুধু কঠিন হইলেও শশী কতক আশ্রয় হইত ; কিন্তু সেগুলো শুধু কঠিন নয়, অনেকখানি শ্লেষও তাহাতে মাখানো ছিল। তাই কিরণের কথা শুনিয়া শশী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, তাহার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল।

কিরণ কাছে আসিয়া শশীর দুই চোখে হাত বুলাইয়া কহিল, “দেখ দেখি, কোথায় কি, আর তুমি কাঁদতে বসলে !”

“কিরণ—”

“কেন ! ওগো, সত্যিই কি আমি মরব ? তা নয়। এই ত কেমন সেরে উঠলুম। এ প্রাণ সহজে যাবার নয়—তুমি নিশ্চিত থাকো।” স্বামীর চোখে জল দেখিয়া কিরণের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তবু সে অধীর মনটাকে দুষ্ট ঘোড়ার মতই অনেক কষ্টে দমন করিয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সে কহিল, “আমি এখন বেশ সেরে উঠেছি। এ যা কাহিল দেখেছ, নাইতে-খেতেই এ সেরে যাবে। দেখো দেখি। তুমি আর এ-সব ভেবে শুধু-শুধু মন খারাপ করো না। তোমার পড়ার কত ক্ষতি হয়ে গেল। বেশ করে’ এবার পড়াশুনা কর, এম-এটা পাশ করতে হবে ত।”

শশীর চোখের সেই চিত্র-করা নিস্পন্দ ভাব কিরণের এত কথাতেও ঘুচিয়া গেল না। সে ভাবিতেছিল, যদি তেমন বিপদ ঘটে ! কিরণের কিছু হয় !—তাঁহা হইলে—? তাহা হইলে আর যাহার যে কোন ক্ষতিই হোক না, কিরণের মাতাকে সে কি বলিবে, কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ! বলিবে কি,—হায়, বিধবা উপায়-হীনা নারী, তুমি তোমার যে ধনটিকে আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, সেটিকে আমি নিরাপদ রাখিতে পারি নাই ? মৃত্যু-তঙ্কর আসিয়া সেটিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ? আমি যদি অবহেলা না করিতাম, তাহা হইলে বুঝি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতাম ! কিন্তু হায়, অবহেলা করিয়াই শুধু তঙ্করের হরণের সুবিধা করিয়া দিয়াছি !

তাহার অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সাড়া দিয়া উঠিতেছিল।

২

ঐটি লইয়া শাওড়ী আলু কুটিতেছিলেন, কোনমতে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া কিরণ আসিয়া তথায় বসিল, ডাকিল, “মা—” শাওড়ী মুখ তুলিলেন। মুখখানার ভাব অত্যন্ত কঠিন, বিরক্তি-পূর্ণ। কোন কথা না বলিয়া আলুই তিনি কুটিতে লাগিলেন।

মুখের সে ভাব দেখিয়া কিরণ বুঝিল, ঝড় একেবারে আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। তবু সে ছোট্ট ঐটিখানা টানিয়া লইয়া কুটিবার জন্ত সন্মুখস্থ চ্যান্ডারি হইতে তরকারী বাছিতে লাগিল। কথায় বিদ্যৎ হানিয়া শাওড়ী কহিলেন, “ধাক্, ধাক্, তুমি রোগা মানুষ, তোমার আবার এ-দবে হাত দেওয়া কেন ?”

কিরণের বুক ছুর-ছুর করিয়া উঠিল। সে কহিল, “হাত আমি ধুয়ে এসেছি, মা।”

“তা হোক। যাও, উঠে যাও, শোওগে। আবার ফের অসুখ করবে কি ?”

“অসুখ করবে না।”

“আবার কথা-কাটাকাটি করে। যাও, যাও,—শশী দেখলে রাগ করবে।” কিরণ বুঝিল, এত স্নেহের নিষেধ নয়। পুত্রের প্রতি এ দারুণ অভিমানের জ্বালা—

শ্লেষ ও বিজ্ঞপের অভিব্যক্তিমাত্র ! সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

শাওড়ীর অঙ্গ বেড়িয়া কিসের একটা জ্বালা তখনও ছুটিয়া বহিতেছিল। তিনি কহিলেন, “যাও না গা, ঠাণ্ডায় এসে বসলে কেন ? নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকগে না—”

করুণ স্বরে কিরণ কহিল, “বসি না মা, একটু—কোন অসুখ করবে না। একলাটি চুপ করে আর শুয়ে থাকতে পাচ্ছি না—”

শাওড়ী কহিলেন, “কেন ? শশী কোথায় গেল ? বৌকে সে একটু আগলে বসে থাকতে পারলে না ?”

কথার বিষে যদি মানুষের মৃত্যু ঘটত, তাহা হইলে শাওড়ীর এই কথায় কিরণ আর এক দণ্ডও বাঁচিত না। তাহার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। চারিধারে সমস্ত পৃথিবীটা আঙনের গোলার মতই ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে, বোধ হইল। স্বামীর উপর দারুণ অভিমানও জন্মিল। কেন তিনি অষ্ট প্রহর এমন করিয়া তাহার কাছে-কাছে থাকেন ? রোগ কি কাহারো স্ত্রীর হয় না ? তবে উহার কেন এত বাড়াবাড়ি ? সময়ে স্নান নাই, আহার নাই,—লেখাপড়া সব বিসর্জন দিয়া চিন্তা-মলিন ক্লিষ্ট মনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া চক্ৰিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকা ! কি এ নিলজ্জতা ! সকলের কাছে তাহার যে এখন মুখ দেখানো তার হইয়া উঠিয়াছে ! রোগের চেয়ে এ শ্লেষের বেদনা যে আরও অধিক, আরও রুঢ় !

কিন্তু এমন কথার পর আর সেখানে বসিয়া থাকিও চলে না। বসিয়া থাকিলে আরও কি শুনিতে হইবে ! তাই কিরণ কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার দেওয়ালে ভর দিয়া আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কান তাহার ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল, মাথার দপদপানিটা বিষম বাড়িয়া উঠিয়াছিল, দীর্ঘনিশ্বাসের বোকা বুকের মধ্যটাকে অত্যন্ত ভারী করিয়া তুলিয়াছিল শুইয়া পড়িয়া সে অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল।

এত লোক মরে, সে কেন মরিল না ? কিন্তু তখনই স্বামীর কথা মনে পড়িল। আহা, এত যত্ন, এত সেবা,

এমন ভালবাসা,—কোন নারী তাহার স্বামীর কাছে পাইয়াছে ? মানুষের মন স্বার্থ একেবারে ছাড়িতে পারে না। স্বামীর ভালবাসার কথা মনে পড়াতে তাহার যে এতটুকু গর্বও না বোধ হইল, এমন নহে। হায়, এমন স্বামীর মনে কষ্ট দিয়া সে মরিবে ! না, স্বামী তাহা হইলে উন্মাদ হইয়া যাইবেন। কিন্তু তবু পাশ-বন্ধা হরিণীর মত, এ কঠিন কথা, মুখ-ভার ও শ্লেষ-বিজ্ঞপে রচা জালে পড়িয়াও যে দিন আর কাটানো যায় না ! পোড়া শরীরও কি সারিতে জানে না ? কিরণের চোখ ফাটিয়া ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুর নিকর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় ঘরে কাহার পদ-শব্দ শুনা গেল। কিরণ বুঝিল, স্বামী আসিয়াছেন। বালিশে মুখ ঘষিয়া চোখের জল মুছিয়া সে স্বামীর পানে চাহিল। শশী তখন কাগজের মোড়া খুলিয়া আঙ্গুর, বেদানা ও নাশপাতিগুলি বাহির করিয়া আর্শির টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিতেছিল। কয়দিনে স্বামীর চেহারা এ কি হইয়া গিয়াছে ! গৌর কান্তি মলিন হইয়াছে, চোখের নীচে কে যেন কালির মোটা রেখা টানিয়া দিয়াছে !

কাজ শেষ করিয়া শশী একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, “আটটা বেজে গেছে—কিরণ, তোমার ওষুধ খাওয়া হয়নি যে—”

“থাক্গে—আর খায় না—” চোখের জল মুছিলেও কিরণ স্বরটাকে পরিষ্কার করিতে পারে নাই।

ছোট গ্লাসে ওষুধ ঢালিয়া শশী আসিয়া বিছানায় কিরণের পাশে বসিল। তাহার ললাটের উপর হইতে বিস্রম্ভ চুল কয়গাছা সরাইয়া দিয়া কহিল, “নাও—ছি, লম্বীটি, ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।”

কিরণ স্বামীর পানে চাহিল। স্বামীর মুখে এখনও তেমনি উৎকর্ষার ভাব ! সে কহিল, “তুমি বাবু পাগল করলে। সেরে উঠেছি ত, এখনো ঘড়ি ধরে ধরে ওষুধ খাওয়ানো—কি এ ?”

“না খেলে নয় যে, কিরণ !”

“তা বেশ ত ! তোমার দেবার দরকার কি, বাবু ? আমি কি নিজে নিজে পারি না, এখন—” স্বামীর মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইয়া এমন কাতর পাণ্ডু স্ত্রী ধারণ

করিল যে, কিরণ খামিয়া গেল, এবং ঔষধটুকু পান করিতে আর এতটুকু আপত্তি বা বিলম্ব করিল না।

৩

পরদিন ডাক্তার আসিয়া কিরণের জন্ম নূতন একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া শশীকে কহিলেন, “পশ্চিমে যাওয়ার কি ঠিক করলেন? বলছি আপনাকে, এ শুধু ওষুধের কাজ নয়। ঠাইনাড়াটা ভারী দরকার। অনর্থক দেৱী করবেন না।” শশীর বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। পশ্চিমে পাঠাইতে তাহারই কি অসাধ? কিন্তু কি করিবে সে? বাড়ীতে কেহই যে সে কথাটা বুঝিতে চাহে না! তাহার হাতেও পয়সা নাই, কিছু নাই,—সে যে একান্তই দুর্ভাগা, লক্ষ্মীছাড়া!

তবু এমন নিতান্ত উপায়হীন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। যেমন করিয়া, যে করিয়া হোক, ব্যবস্থা চাইই—নহিলে বিলম্ব হইলে কি জানি, অদৃষ্টে কি ঘটতে পারে! কিন্তু কি উপায় সে করিবে? কি উপায়?

কোনমতে নিয়ম রক্ষা করিয়া দুই-চারিটা ভাত উদরে পুরিয়া বই হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় কিরণের পানে একবার চাহিয়া দেখিল। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো চুলের রাশিতে কে যেন তাঁমার কব্ লাগাইয়া দিয়াছে, চুলগুলো একান্তই গুরু বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শীর্ণ দেহখানি রৌদ্রতপ্ত লতার মতই শুকাইয়া উঠিয়াছে! জল চাই, জল চাই,—নহিলে এ লতাটিকে কিছুতেই বাঁচানো যাইবে না। কিন্তু কোথায় জল? মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য নিতান্ত নির্মম তেজে অকরণ তপ্ত অনল-ধারা বর্ষণ করিতেছে! সে তাপে সারা বিশ্ব বুঝি জলিয়া পুড়িয়া থাক্ হইয়া যায়! শশীর সমস্ত অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল।

কিরণ কিন্তু ঠিক ঘুমাইতেছিল না। অত্যন্ত দুর্বলতার জন্ম তাহার ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুইটা আপনা হইতেই কখন যে মুদিয়া যায়, আবার আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে, কিরণের তাহা সকল সময়ে

খেয়ালও থাকেনা। আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ সময় কটিয়া যায়। তবু শশী কাছে থাকিলে, কোথা হইতে যেন সারা দেখে একটা শক্তি আসে। মুখে কথা ও হাসির রেখা জোয়ারের জলের মতই ফুটিয়া ছুটিয়া চলে।

শুভুর বাহিরের দালানে খাইতে বসিয়াছিলেন। শাওড়ী নিকটে বসিয়া বন্ধার দিয়া বলিতেছিলেন, “আজ বোধ হয় একবার বেরুল। লেখা গেল, পড়া গেল, চব্বিশ ঘণ্টা বৌকে আগলে বসে আছে! বৌ ওর স্বর্গে বাতি দেবে!”

শুভুর বলিলেন, “তা থাক্, মোদা এমন হরষড়ি ডাক্তার ডাকা কেন? এত পয়সা জোগায় কে? নবাবদের ঘরেও যে এমন হয় না।”

শাওড়ী বলিলেন, “তখনই বলেছিলুম, দেখে-শুনে একটা পুঁয়ে-রোগা বৌ নিয়ে এসেছ! যেমন আমার বরাত! ছেলের বিয়ে দিয়ে পরের মেয়ে ঘরে আনব, তাতেও উৎপাত। ঘরের মেয়ে হলেও নয় বুঝতুম—”

কথাগুলো কিরণ স্পষ্ট শুনিতো পাইল। আপনা হইতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। অঞ্চল টানিয়া চোখের জল মুছিয়া সে ভাবিল, পোড়া চোখে এত জলও ছিল! লেপখানা টানিয়া লইয়া সর্কাদ তাহাতে আবৃত করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বিধাতার নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিল, “কি পাপ করেছি ভগবান্, যে এত দুঃখ দিচ্ছ! এ রোগের জ্বালা যে আর সহ হয় না। সবাইকে জ্বালাজন করে তুলেছি। হয় সারিয়ে দাও, নয় মেরে ফেল। আর ভুগতে পারি না গো—”

অপরাহে স্বামী আসিয়া কিরণের মাথায় হাত রাখিয়া দৃষ্টি উৎফুল্ল কর্তে ডাকিল, “কিরণ—”

লেপের আবরণ সে টানিয়া ফেলিল। কিরণের চোখের কোণ দুইটা তখনও সিক্ত ছিল। কিরণ চোখ খুলিলে শশী দেখিল, তাহার চোখ দুইটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে হাত রাখিয়া দেখে, কপাল তপ্ত নহে। সে আশ্বস্ত হইল। কহিল, “এ ওষুধটা নতুন

বেরিয়েছে—কত ঘুরে তবে একটি দোকানে পেলুম। খুব ভাল ওষুধ! নাও, খাও দেখি।”

কিরণ অচপল স্থির দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া রহিল। শশী আবার কহিল, “খেয়ে ফেল, কিরণ।”

কিরণ সহসা পাশ ফিরিল। শশী কহিল, “পাশ ফিরলে যে! খাবে না?”

কিরণ কহিল, “না।” তাহার স্বর গাঢ়।

শশী কহিল, “কেন খাবে না, বল! রাগ করেছ?”

“না।”

“তবে?”

কিরণ আবার স্বামীর দিকে ফিরিল। স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, “কেন বাবু, তোমার এত বাড়াবাড়ি? তোমায় বলছি, আমি সেরেছি, তবু তুমি শুনবে না? কেবল ডাক্তার আর ওষুধ, ডাক্তার আর ওষুধ—পয়সার ছড়াছড়ি! সত্যি বলছি, দিবা-রাত্রির এমন জ্বালাতন করুলে—” কথাটা কিরণ শেষ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

শশী তখন বিছানায় বসিয়া কিরণের মাথা আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইল। স্নেহে যুথের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল, “কিরণ—”

কিরণ পাশবালিসটাকে ঝাঁকড়িয়া ধরিয়া দেওয়ালের পানে চাহিয়া ষাড় নাড়িয়া বলিল, “না, আমি শুনবো না, তোমার কোন কথা আমি শুনবো না। এত করে বলি তোমায়—”

কম্পিত স্বরে শশী কহিল, “কি বল?”

কিরণ কহিল, “চক্ষুশ ঘণ্টা তোমায় আমার কাছে এমন করে থাকতে হবে না। তুমি যাও—তোমার কি কাজ নেই? লেখাপড়া কি বিসর্জন দিয়েছ? কলেজে ত কখনও যেতে দেখি না।”

অসুস্থানে শশী ব্যাপারটা কতক বুঝিল। সে বুঝিল, কয়দিন ধরিয়া বাড়ীতে যে একটা বিক্রী ঝড়ো হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহারই একটা আঘাত আসিয়া কিরণকে সচ নাড়া দিয়া গিয়াছে! সেই ডাক্তার, পয়সা ও লেখাপড়ার অসুযোগ! ক্রোধের একটা রক্ত-শিখা বিহ্বাতের মত ছুটিয়া তাহার অন্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া

গেল। কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধ! এ ক্রোধে কাহারও কেশাণ্ড কম্পিত হইবে না! নিজেই সে শুধু জলিয়া থাকুক হইয়া যাইবে।

ক্রোধটাকে চাপা দিয়া সহজ ভাব দেখাইয়া শশী আবার কহিল, “বেশ ত! আমি পড়তে যাচ্ছি—হামেশাও আর এখানে থাকব না। তুমি আগে ওষুধটুকু খেয়ে ফেল, তার পর দেখ, আমি তোমার কথা রাখি কি না।”

“না, আমি বলেছি ত ওষুধ আর খাব না।”

“খাবে না?” শশীর স্বর স্থির, কঠিন।

কিরণও তেমনি স্বরে কহিল, “না, কখনও খাব না।”

সমস্ত জ্ঞান যেন শশীর নিমেষে উবিয়া গেল। কোল হইতে কিরণের মাথা বালিশে নামাইয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, “খাবে না? বেশ, খেয়ো না। কিন্তু আমিও তা হলে কি করব, জানো? বিষ খাবো,—তা হলেই ত তুমি সস্তুষ্ট হবে?”

কিরণ দেখিল, শশীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা পাগলের চোখের মতই জলিতেছে! শশীকে সে ভাল করিয়াই চিনে। এমন অবস্থায় বিষ খাওয়াটা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভবও নয়!

ব্যাপারটা রীতিমত সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক নয়। তাই সে চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়াই কহিল, “নিশ্চয় সস্তুষ্ট হব। তুমি বিষ খেলে আমি সস্তুষ্ট হই, এটা তুমি এতদিন কেন বুঝতে পারনি, বল দেখি? আমাকে মিছে খালি কষ্ট দিচ্ছ?” শশী কোন উত্তর দিল না, কিরণের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণ কহিল, “ওগো, খাও না বিষ—আমায় সস্তুষ্ট কর।”

শশী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। একে জীর এই দুর্বল শরীর—কত কথাটা এ সময় বলা ঠিক হয় নাই। সে বলিল, “ওষুধটা খেয়ে ফেল।”

কিরণ ওষুধ পান করিল; পানান্তে কহিল, “এটা ত খেতে বেশ! সেটা এত মিষ্টি ছিল যে খেলে গলা জ্বালা করত। এ মোটে একটি দোকানে পেলে? সাহেবদের দোকানে বুঝি?”

শশী সন্মিতভাবে কহিল, “হ্যাঁ।”



কিরণ দেখিল, শশীকে সে দুইটা সহজ কথায় বেশ ভুলাইয়া ফেলিয়াছে। আহা, এমন সরল, সহজ মানুষ, শুধু দুইটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশীমাত্র! তাহারও মনে সে কষ্ট দেয়! স্বামী! কোথায় তাহাকে সেবা করিবে, কর্ণে তাহার সঙ্গিনী হইয়া সহানুভূতি ও শক্তি দিবে, তাহা না করিয়া নিজের রুগ্ন শরীর লইয়া তাহাকে কষ্ট দিয়া শুধু সেবা আদায়ই করিতেছে! নারী হইয়া স্বামীকে সেবা করিবার পরিবর্তে, তাহার নিকট হইতে সেবা যে আদায় করে, কি সে দুর্ভাগিনী! তাহারই জন্ম স্বামী আজ গৃহে অহরহ রূঢ় কথা শুনিয়া বেড়াইতেছে, অনাদরে দিন কাটাইতেছে! এ পাপের কি আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে?

শশী কহিল, “কি ভাবছ, কিরণ?”

কিরণ কহিল, “আচ্ছা, মিছিমিছি পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকো কেন? এখন ত শুধু খবর দিলেই চলে।”

শশী কহিল, “মাঝে মাঝে দেখা চাই বই কি।”

কিরণ কহিল, “বাবার চেয়ে মার চেয়ে তুমি অবশ্য বেশী কিছু বোঝ না। তুমি হলে গে ওঁদের ছেলে। দরকার হলে ওঁরাই ডাকবেন—তুমি কেন কর্তামি কর? তাই আমি ওষুধ খাব না, বল্ছিলুম।”

এতক্ষণে, শশীর কাছে সমস্তটা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, সে চলিয়া যাইবার পর, সকালে ডাক্তার-আনার ব্যাপার লইয়া নিশ্চয় গৃহে কোন কথা উঠিয়াছিল। ডাক্তারকে দেখিয়া পিতার মুখ আজ বেশই রুদ্র কঠিন ভাব ধারণ করিয়াছিল! ডাক্তারকে ডাকিয়া একটা কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। ঠিক!

সে কহিল, “আমি চলে যাবার পর বাবা কি মা কিছু বলেছিলেন বুঝি?”

যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনই ভাব দেখাইয়া কিরণ কহিল, “কি বলবেন?”

“এই ডাক্তারের কথা—টাকাকড়ির কথা?”

কিরণের বুকের মধ্যে যুহুর্ন্তের জন্ম একটা দ্বন্দ্ব বাধিল। কে যেন শপাৎ করিয়া সজোরে তাহার মুখের উপর চাবুক মারিল। এ সব কি কথা? তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল।

একটা ঢোক গিলিয়া কিরণ কহিল, “না, তা কেন?”

“তবে তুমি ও কথা তুললে যে?”

“আমার নিজের মনে হচ্ছিল, তাই।”

“বটে! দুইটু—” বলিয়া শশী কিরণের পাশে বসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুষনে তাহার শীর্ণ কচি ঠোঁট দুইখানি রাঙাইয়া তুলিল।

৪

সেদিন দুপুরবেলায় শশী বাড়ী ছিল না। কিরণ বিছানায় শুইয়া একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়িতেছিল। বই-পড়ায় ডাক্তারের নিষেধ ছিল। কিন্তু সারাদিন চুপ করিয়া আর বিছানায় পড়িয়া থাকি যায় না, গল্প করিতেও কেহ নাই,—তাই সে কাঁদিয়া-কাটিয়া শশীর কাছ হইতে একটু-আধটু-পড়িবার অনুমতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। তবে সতর্ক ছিল, দুই পৃষ্ঠা করিয়া পড়িয়া দশ মিনিট বিশ্রাম লইতে হইবে। আপনার মাথার দিব্য দিয়া শশী বলিয়া গিয়াছে, এ সত্বের এক তিল যেন ব্যতিক্রম না হয়!

বাহিরে প্রতিবেশিনীর দল জটলা বাঁধিয়া মজলিস পাকাইয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতার বাজার-দর, পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া, দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে ও-পাড়ার নীপুর মার ঠেকার-দেমাক, গাঙ্গুলি-বৌয়ের বেহায়াপনা ও বিন্দুর বোনু সিদ্ধুর স্বামীর দৌরাণ্ডের আলোচনা, কিছুই সে মজলিসের মস্তব্য এড়াইবার সুযোগ পায় নাই। সহসা ও-পাড়ার গদার পিসী দুই আঙ্গুলে টিপিয়া গুল লইয়া কতক ঠোঁটের আড়ে ঢালিয়া কতক বা কাড়িয়া উড়াইয়া বাটীর গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার বৌয়ের কি আজও অসুখ সারল না, বাছা? হামেশাই ত দেখি, ডাক্তার আসছে! ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে যে চড়া পড়ে গেল! কেমন অসুখ এ?” কথাটা বলিয়া কিরণের ঘরের দ্বারে আসিয়া ভিতরে একবার উঁকি পাড়িতেও তিনি ভুল করিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন, “আর বলো না খুড়ী, বৌয়ের রোগ নিয়ে হাড় আমার কালি হয়ে গেল! ছেলে অবধি পর হতে চলল।”

গদার পিসী কহিলেন, “পর, কি রকম ?”

গৃহিণী কহিলেন, “কি রকম কি আবার! বৌকে নিয়ে ছেলে পশ্চিম যেতে চায়। তা বললুম, এত লোকের অসুখ হচ্ছে—এখানে কি সারছে না? তা ছেলে মুটিশ দিয়ে গেছে, পশ্চিমে সে যাবেই। মত না দাও ত চাই না মত! আমি নিয়ে যাব!”

কান্ত ঠাকুরাণী আর তিনটি সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া তাস খেলিতে বসিয়াছিলেন। পড়তা নিতান্তই খারাপ দাঁড়াইয়াছিল। ইন্সাবনের দশের উপর রঙের সাতা-খানি তুরূপ করিয়া তিনি কহিলেন, “ওমা, বলিস কি দিদি? তিন-তিনটে পাশ করিয়ে ছেলেকে মানুষ করে তুললি, আর সেই ছেলে পর হতে চায়!”

ঘোম-গৃহিণী পিট কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল, “তা আজকালকার পাশ-করা ছেলের দল কি মা-বাপকে মানে, না, তাদের কথা শোনে?—ও কি গো, ছোট বৌয়ের খেলা যে—বৌই হলগে ওদের সর্বস্ব!”

গদার পিসী প্রকাণ্ড শরীরখানি কোথায় রাখিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এক্ষণে ‘আত্তি’ জানাইয়া গৃহিণীর পাশে বসিয়া কহিলেন, “বেশ! ছেলে যে নিয়ে যাবে, তা পয়সা পাবে কোথা?”

গৃহিণী কহিল, “কে জানে, কোথায় পাবে! ইনি বারণ করলেন, কত বোঝালেন—তা ছেলে কি কিছু কানে করলে। বৌ-বৌ করে’ একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে!”

কান্ত ঠাকুরাণী কহিলেন, “তা পাগল বৈ কি, দিদি। বৌয়ের জন্তে বাপ-মার কথা ঠেলবে! তাদের চোখে জল ফেলাবে! অমন লেখা-পড়ার মুখে আঙুন!”

মোহিনীর মা এতক্ষণ বসিয়া চুপ করিয়া তাস খেলা দেখিতেছিল। সে বলিল, “তবু ত ঐ বৌ—বারো মাসই রোগ লেগে আছে!”

ও পাড়ার বিরাজ এতক্ষণ একটা পানের উমেদারী করিয়া ফিরিতেছিল। গৃহিণী কথাটা কানে তুলিয়াও তুলেন নাই। তাই তাঁহার কানটাকে সচেতন করিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ বুঝিয়া সহানুভূতি জানাইয়া সে কহিল, “আহ! তোমার বরাত, মামী। এই বয়সে

কোথায় দু’দিন জিরবে, বৌয়ের সেবা ধাবে, তা না এই শরীরে সংসার সামলে আবার সেই বৌয়েরই সেবা করে সারা হলে!”

গৃহিণী কহিলেন, “আর বলিসনে বিরাজ। ওমা, তুই একটা পান চেয়েছিলি না? আমার মনেও ছিল না। মনের ত ঠিক নেই, শশীর আচরণে—”

এমনই ভাবে বিস্তারিত আলোচনাদির পর প্রতিবেশিনী জুরীর দল সেদিন সর্ববাদীভাবে যে মতটি প্রকাশ করিয়া গেলেন, তাহার সার মর্ম্ম ইহাই দাঁড়ায় যে, শশী ছেলেটি লেখাপড়ায় যেমন ভালো, স্বভাবেও তেমনই নিরীহ ছিল। বাপ-মার প্রতি ভক্তি-বাধাতারও তাহার ক্রটি ছিল না। কিন্তু কোথা হইতে এক সর্বনাশিনী চিরকুয়া বৌ আসিয়া তাহার সে-সব গুণ টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘোমটা-ঢাকা মুখে কথাটি নাই বটে! কিন্তু এমন ভালমানুষ সাজিয়া থাকিলে কি হয়? কিরণের মনের মধ্যে দুর্ভিসন্ধির জাল মাকড়সার জালের মতই অহরহ দীর্ঘ বিস্তীর্ণ হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং সেই জালে পড়িয়াই বেচারী শশী আজ এতখানি নির্জীব অপদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিছানায় পড়িয়া কিরণ বইখানার উপর চোখ মেলিয়া রাখিলেও কান তাহার এই বচন-সুধার সবটুকুই নিঃশেষে পান করিতেছিল। শুনিবে না বলিয়া কান দুইটাকে চাপা দিলেও কথাগুলো সবলে সে লেপের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কানের মধ্যে হ-হ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছিল।

৫

সন্ধ্যার পর শশী আসিয়া বলিল, “সমস্ত জোগাড় করেছি, কিরণ। খুব সুবিধে হয়েছে। আমার এক বন্ধু—কস্মাটারে তাদের বাড়ী আছে। লোকজনের বন্দোবস্তও ঠিক আছে। সে বাড়ী তারা আমাদের ছেড়ে দেবে। ভাড়া লাগবে না। থাকবার খরচের জন্ত ঘড়ি, ঘড়ির চেন আর হীরের আংটি, যা তোমাদের বাড়ী থেকে বিয়ের সময় পেয়েছিলুম, তাই বেচব, মনে করচি। বেচে পাঁচশ’ টাকা হতে পারে। তাতে দু-তিন মাসের খরচের জন্ত ভাবতে হবে না। কাল-পরশুই তাহলে কথাটা ঠিক করে ফেলি,—কি বল?”

কিরণ জোর করিয়া মনকে আজ বশ করিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ সে কিছুতেই অভিমান বা রাগ করিবে না, বেশ সহজভাবেই স্বামীকে সব বুঝাইবে। যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আপনার দুর্বল শরীর মনের সকল শক্তি দিয়া সে তাহা রোধ করিবে। তাই সে প্রথমেই ধীর কণ্ঠে কহিল, “বাবাকে মাকে বলেছ ? তাঁদের মত নিয়েছ ?”

শশী কহিল, “তাঁদের মত নেবার কোন দরকার নেই। তাঁরা সে মত দেবেনও না। আর আমি যখন এ ব্যাপারে ওঁদের কাছ থেকে একটা পাই-পয়সার জন্তেও হাত পাতছি না, তখন মিছিমিছি আবার গণ্ডগোল তোলাবার দরকার কি ?”

প্রতিবেশিনীদের দুপুরবেলাকার কথাগুলো কিরণের কেবলই মনে পড়িতেছিল। কিন্তু সে কথাগুলো হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত ! তাহার মন নীচ নয় যে, সেই-সকল বুদ্ধি-ও-হৃদয়হীনা নারীগুলার অসম্বন্ধ প্রলাপ-বচনের জন্ত দুঃখ বা রাগ করিবে ! ‘তবু ত ঐ বো’—এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। কিন্তু তখনই সে মনকে চাবুক মারিল। এ কথা এখনও সে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে ! একটা নিতান্ত কোমল তৃণকে কাঁচা হইয়া আহা! বৃকে ফুটিতে দিবে ? না, কখনও না। টানিয়া সে তৃণটাকে মন হইতে পূর্বেই সে ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কথা ত সে-সকলের আলোচনা লইয়া নহে; কথা তাহার শব্দ-শাঙড়ীকে লইয়া। তাহার জন্ত তাঁহাদের ছেলে আজ পাগল হইয়া উঠিয়াছে ! তাঁহাদের কথা সে ঠেলিয়া চলিতে চায় ! না, তাহা হইবে না। কিরণ কিছুতেই তাহা হইতে দিবে না। তুচ্ছ একটা স্ত্রীর জন্ত স্বামী আপনার মা-বাপের মনে কষ্ট দিবে !

কিরণ কহিল, “দেখ, বাপ-মার মত না নিয়ে কোন কাজ করলে, কখনই তাতে ভাল হয় না। তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন, আর তুমি—”

বাধা দিয়া শশী কহিল, “কিন্তু তাঁরা যদি অবুঝ হন ?”

কিরণ বলিল, “ও কথা মনেও তুমি স্থান দিয়ো না। বাপ মা অবুঝ, এ কথা মনে করলেও পাপ। তাঁরা যদি

বোঝেন, পশ্চিমে গিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না, এখানে থাকলেও যদি আমি না সারি ত সেখানে নিয়ে গেলেও আমাকে বাঁচানো যাবে না—তা হলে—?”

কথাটা শুনিয়া শশীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোখের পিছনে অশ্রুর একটা তরঙ্গ আসিয়া ঠেলা দিল। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া সে বলিল, “তবু লোকে তার প্রাণপণ চেষ্টা ত একবার করে ! তাতে যদি বিপদও ঘটে, তাহলেও একটা সান্ত্বনা এই থাকে যে সে তার যথাসাধ্য করেছে—তার পর ভবিতব্য !” অশ্রু বাধা মানিল না। শশীর চোখের উপর ধীরে ধীরে সে একখানি অস্ত্রের পাংলা পরদা বসাইয়া দিল।

কিরণ হাসিয়া কহিল, “খারাপটাই তুমি ধরছ কেন ? ওঁরা যদি বোঝেন, এখানে থেকে ক্রমে ক্রমে আমি সেরে উঠব, তাহলে হাজাম করে মিথ্যে পশ্চিম যাবার দরকার কি ? মা-বাপের মত গুরু নেই। ওঁদের কথার উপর তোমার বিশ্বাস হয় না ? আমার ত হয়।”

পাগল ! পাগল ! শশী ভাবিল, কিরণ পাগল হইয়াছে। নহিলে এই-সব নিতান্ত লঘু তর্কে এত বড় সমস্যার সে মীমাংসা করিতে চায় ? সে কহিল, “না কিরণ, এ সব পাগলামির কথা নয়। তুমি বাধা দিয়ো না। আমার কথা শোন—চল, সেরে উঠবে। তুমি সেরে উঠলে যে শুধু তোমারই লাভ, তা নয়, আমিও সারব, মামুষ হব। না হলে ভেবে-ভেবে আমিই এখানে মারা যাব।”

কিরণের মনটা অধীর বেদনার হু-হু করিতেছিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া শশীর পানে চাহিয়া সে কহিল, “দাঁড়িয়ে রইলে, কেন ? বসো। আমার কাছে বসো। বেশ করে শোন, বোঝ সব।”

শশী কহিল, “ও আমায় তুমি বোঝাতে পারবে না, কিরণ। ডাক্তার বিশেষ করে বলে দিয়েছে—না বুঝলে সে-ই বা বলবে কেন ?”

কিরণ কহিল, “ডাক্তারকে তুমি ব্রহ্মা বলে’ মানো, দেখছি। তার কথা একেবারে বেদ-বাক্য বলেই ধরেছ।”

কিরণ দেখিল, এ সব কথায় স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা হইবে। আসল কথা খুলিয়া বলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু কি করিয়া সে সে কথা বলিবে ? মাতা ও পিতার

বিরুদ্ধে কি করিয়া সে তাঁহাদের সন্তানের কাছে নালিশ রুহু করিবে যে, ওগো, আমাকে লইয়া চিকিৎসা ও বায়ু-পরিবর্তনের এতখানি ঘটাই করিলে তাঁহারা বিষম চটিয়া যাইবেন। তোমায় তাঁহারা ত্যাগ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের কথা ঠেলিয়া চলিলে তুমিও তাঁহাদিগকে বন্ধ বয়সে নিতান্তই অবাধ্য লক্ষ্মীছাড়া কুপুলের মত ত্যাগ করিয়াছ, বুঝিবেন!

তবু কোন উপায়ে ইহার আভাষ একটু দিতেই হইবে, নহিলে এ সমস্তার যে কিছুতেই খণ্ডন হয় না! চট করিয়া তাঁহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। সে কহিল, “দেখ, এ রকম করে গেলে কিন্তু পাড়ার লোকে তোমার নিন্দে করবে। বলবে, বৌকে মাথায় করে বুড়ো বাপ-মার কথা ঠেলে চলে গেল। লোকে তোমাকেই হুসবে, ছি-ছি করবে।”

শশী কহিল, “করুক ছি-ছি! লোকের কথা অত জ্বনে চললে কেউ কখনও কর্তব্য করতে পারে না। আমি সে ছি-ছির ভয় করি না মোটে, কিরণ, তা কি তুমি আজও বুঝতে পার নি?”

কিরণ দেখিল, প্রতিজ্ঞা তাহার থাকে না। কঠিন তাহাকে হইতেই হইবে! তাই সে একেবারেই কঠিন স্বরে কহিল, “তবু তুমি নিয়ে যাবে? মা-বাপের কথা ঠেলে নিয়ে যাবে! এই তোমার ইচ্ছে! বেশ, তবে চল, কিন্তু আমিও বলাছি, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমায় তুমি রাখতে পারবে না। সারা ত দূরের কথা! সেখানে গেলে ভে-রাস্তিরও আমি কাটতে দেব না। যেমন করে পারি, মরবোইন”

শশী দেখিল, কিরণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—মুখ অস্বাভাবিক রাঙা হইয়াছে, চোখ দুইটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে, এমনই ভাব! নিশ্বাসও সজোরে বহিতেছে!

এ সে কি করিতেছে! সে পাগল, না দস্যু? তাড়াতাড়ি সে কিরণের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, “কিরণ, আমায় মাপ কর। আমি আর কিছু বলব না।”

কিরণ হুঁপাইতেছিল; কথা কহিতে পারিল না। স্বামীর মুখের উপর মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বাতি নিবিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ঘর। শশী নিদ্রা যাইতেছে। সহসা কিরণ তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল, “ওগো—”

ধড়মড়িয়া শশী উঠিয়া বসিল, কহিল, “কেন, কিরণ?” হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিরণ কহিল, “জানালাটা খুলে দাও,—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে! বড় কষ্ট হচ্ছে।”

শশী উঠিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল! কিরণ কহিল, “ওটা কেন? মাথার শিওরেরটা।”

“ঠাণ্ডা লাগবে যে, কিরণ!”

“না, না—ওগো, দাও খুলে।”

শশী মাথার দিকের জানালাটাও খুলিয়া দিল। বাহির হইতে উষ্ণ সোনালি কিরণের একটা রাস্ম বায়ু-তরঙ্গে গা ঢালিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিরণ কহিল, “আঃ!”

মশারিটা টানিয়া তুলিয়া শশী কিরণের পানে চাহিল। এ কি! মুখে তাহার কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে! ঘামে চুলখুলা একেবারে ভিজিয়া উঠিয়াছে! সমস্ত দেহেও যেন কে জল ঢালিয়া দিয়াছে!

শশী কহিল, “রাত্রে ঘুম হয় নি?”

কিরণ কহিল, “না, না,—সারা রাত্তির শুধু ছট্-ফট্ করেছি। বুকের মধ্যে কেবলি হাঁপ ধরেছে।”

“আমায় ডাকোনি কেন, কিরণ?” বলিয়া কোঁচা দিয়া তাহার দেহ ও মুখের ঘাম মুছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া শশী ঘরের দ্বার খুলিবার উপক্রম করিল।

দেখিয়া কিরণ কহিল, “কোথা যাচ্ছ?”

“ডাক্তারের কাছে।”

“ওগো, না, না, যেয়ো না। দরকার নেই। যেয়ো না।”

সে কথা কানে না তুলিয়াই শশী ক্ষিপ্ত বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে তখন দুই-চারিটা কাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে। ঝড় দার পথ কাট দিতেছিল। পথের ধারে

দূরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। শশী ছুটিয়া সেই গাড়ী ধরিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে চলিল। কায়মনে সে ভগবানকে ডাকিতেছিল, “হে হরি, ভালো করে দাও, কিরণকে আমার ভালো করে দাও। হে মা কালী—”

\* \* \* \* \*

ডাক্তারকে লইয়া শশী যখন ফিরিল, বাড়ীর দাসী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রাঙ্গণে দ্বারে ছড়া-গঙ্গাজল দিতেছে। আর কাহারও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই।

উপরে উঠিতেই শশীর গা কাঁপিয়া উঠিল। পা অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছিল—কিছুতে যেন সে চলিতে চাহে না!

তাহার ঘরের দ্বার সে যেমন ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনই তাহা ভেজানো রহিয়াছে। দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার অগ্রে চলিলেন, শশী ঠিক তাহার পিছনে আসিতেছিল।

শয্যার সম্মুখে আসিয়া ডাক্তার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাহার পিছন হইতে মুখ বাড়াইয়া শশী দেখিল, বিছানায় মুখ ঙ্গাজিয়া কিরণ কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে! বালিশের নীচে মাথাটা হেলিয়া রহিয়াছে। হাত দুইটা খাটের ধারে লতার মতই ঝুলিয়া পড়িয়াছে! কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই! কিছুই নাই! যেন ফুটন্ত পদ্মটি মাসুকের হাতের স্পর্শে শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে!

“কিরণ—” বলিয়া চীৎকার করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া; কিরণের প্রাণহীন দেহখানি জড়াইয়া শশী বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

## কষ্টিপাথর

( গৃহস্থ—কার্তিক )

বাউল-সম্প্রদায় — শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

উপক্রমণিকা।

বাউল বাঙ্গালার একটি উপধর্ম-সম্প্রদায়। অনেকে ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ধর্মের বিপ্লব চলিয়াছিল; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া নানা সময়ে বঙ্গদেশে যে-সকল নব নব ধর্মমত প্রচলিত হয়, বাউল তাহাদের অন্ততম। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহুদিন হইতে লক্ষিত হইলেও, ইহাদের রহস্য ও ইতিহাসানুসন্ধানে কাহাকেও বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ, বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে, এই সম্প্রদায়ের বিবরণ ও রহস্য জানিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। আর, যে দুই একজন কৃতকর্মা ব্যক্তি বাউলদিগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহারও উক্ত গ্রন্থাদিতে লিখিত শব্দসমূহের রহস্যাবৃত্ত গূঢ় অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্যক সমর্থ হন নাই। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার “ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখারূপে এই বাউল-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রথম প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। \* \* \* ইহাদের মতানুসারে পরম-দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানব-দেহের মধ্যেই বিরাজমান আছেন; অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুত তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। \* \* \* ফলতঃ কেবল ঐ পরম-দেবতা কেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মনুষ্যের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহ-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। \* \* \* প্রকৃতি-সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনেতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। \* \* \* ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ব হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে। \* \* \* ঐ প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত ‘চারি চন্দ্রভেদ’ নামে একটা ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল মহাশয়েরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহার কহেন, লোকে ঐ চারিটি চন্দ্রকে অর্থাৎ শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটি চন্দ্র-নির্গত পদার্থকে, পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাদের ঘৃণা-প্রবৃত্তি পরাভবের অশ্রু অশ্রু লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। \* \* \* ইহাদের মতে, বিগ্রহ-সেবা ও উপাসাদি করা আবশ্যিক নহে। \* \* \* ব্রহ্ম-উপাসনাতত্ত্ব, নায়িকা-সিক্তি, রাগময়ী-কণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ঐ-সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। \* \* \* ইহাদের ধর্ম-সঙ্গীতের মধ্যে দেহ-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-সাধন-সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাম্প্রতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে, এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। হইলেও প্রকাশ করিতে গেলে অত্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।”

তারপর রিজলে সাহেব ( H. H. Risley ) তাহার The Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে, এই বাউল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Baola ( Sansk. Vayula, crazed or inspired ), a gen-

eric term including a number of disreputable mendicant orders which have separated from the main body of Vaishnavas, and are recruited mainly from among the lower castes. They call themselves Nitay, Chaitanya, and Hari Das Baolas, after the great Vaishnava teachers. Differing from each other in minute points of ceremonial and social observance, the Baola sects agree in regarding pilgrimage to Vaishnava shrines as a sacred duty, and reverence the Gosains as their spiritual leaders. Flesh and strong drink are forbidden, but fish is deemed lawful food, and Ganja is freely indulged in. Baolas never shave or cut their hair, and filthiness of person ranks as a virtue among them. Ladu-Gopal, or the child Krishna, is the favourite object of worship; but in most akharas the charan or wooden pattens of the founder are also worshipped. Baolas as a class are believed to be grossly immoral, and are held in very low estimation by respectable Hindus.—page 347

কিন্তু ছঃখের বিষয় ইহাদের মধ্যে কেহই বাউলের বিস্তৃত ইতিহাস বা বিবরণী প্রকাশ করেন নাই।

শায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাস আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বাস্তবিকই বাউল-সম্প্রদায়ের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া ইতিবৃত্ত সংকলন করা বড়ই দুর্লভ ব্যাপার। যে গ্রন্থের সাহায্যে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে, সে রূপ কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অত্যাধিক মুদ্রিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের বহু আখড়ায় এবং বহু প্রাচীন বাউলের কাছে অনেক হস্তলিখিত কড়চা ও পুঁথি আছে। এই সকল গ্রন্থে বাউলদিগের সাধন-ভজন ও রীতি-নীতির কথা সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়-বাহিত কোন ব্যক্তির ঐ গ্রন্থগুলি দেখিবার কোন সুবিধা বা সুযোগ নাই। যখন বাউলগণ তাহাদের পুঁথি পাঠ করে, তখন যদি কোন অসাম্প্রদায়িক লোক সেই স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রন্থের 'ডোর' বন্ধ করিয়া আগমনকারীকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত বহু চেষ্টায় কোন ক্রমে ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোন গ্রন্থ সংগৃহীত হইলেও, গ্রন্থ-লিখিত বহু হেয়ালীপূর্ণ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এমন কি, তাহাদের তত্রকথাপূর্ণ সঙ্গীতগুলিও এরূপ দুর্বোধ্য হেয়ালী-পূর্ণ যে, সেগুলির অর্থও সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। আর এই-সকল গানের ও গ্রন্থনিহিত অংশের আধ্যাত্মিক অর্থ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির দ্বারা বুঝাইয়া লইলেও, তাহা এত অস্বীলতা-দোষে দুষ্ট যে, সাধারণে প্রকাশের অযোগ্য।

আমি নিম্নলিখিত অমুদ্রিত পুঁথিগুলি আলোচনা করিয়াছি :—

(১) স্বরূপ দামোদরের কড়চা (২) স্বর্ণটীকা, (৩) চন্দ্র-কলিকা বা চন্দ্রকলিকা, (৪) শ্রীলবঙ্গচরিত্র, (৫) মীরাবাইয়ের কড়চা, (৬) দিলকিতাব, (৭) ভাবামৃত, (৮) পঞ্চতন্ত্র, (৯) আশ্বতথ, (১০) রসসার।

তন্ত্র এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলিও আলোচনা করিয়াছি :—

(১) বিবর্ত-বিলাস, (২) স্বরূপ দামোদরের কড়চা, (৩)

মীরাবাইয়ের কড়চা, (৪) আশ্বতথ ও পঞ্চতন্ত্র, (৫) শ্রীরসকদম্ব-কলিকা (৬) রসতত্ত্বসার।

বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় সংগৃহীত বিষয় ও তথ্য নিম্নলিখিত বিষয়-বিভাগে আলোচিত হইবে।

#### বিষয়-বিভাগ।

১। বাউল শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি। ২। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে ইহার উল্লেখ। ৩। ধর্মবিপ্লব ও বাউল-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ৪। এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব। ৫। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অষ্টাঙ্গ প্রবর্তকগণ। ৬। বাউল-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি ও তাহাদের পরিচয়। ৭। এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত, ধর্মচরণপদ্ধতি ও সাধন-প্রণালী। ৮। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচালনার্থ বিধিনিষেধ। ৯। বাউলগণের রীতি-নীতি, আচার-বাবহার প্রভৃতি। ১০। ইহাদিগের বেশ-ভূষা। ১১। নেড়ানেড়ী, কিশোরী-ভজক, সহজিয়া দরবেশী প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বাউল-সম্প্রদায়ের মাদৃশ্য ও পার্থক্য। ১২। বিভিন্ন স্থানের বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয়। ১৩। প্রাচীন সময়ে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি এবং বর্তমানকালে ইহাদের স্থিতি ও অবস্থান। ১৪। বর্তমানকালে বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। ১৫। সঙ্গের বাউল-সঙ্গীত-সম্প্রদায়। ১৬। বাউল-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

#### ১। বাউল-শব্দের অর্থ।

"বাউল" এই শব্দটির অর্থ লইয়া বিশেষ গোল আছে। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "বাতুল" শব্দের প্রাকৃত রূপ "বাউল" হয়। কেন্দ্রী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন অভিধানকারগণ "বাতুল" অর্থে বাউল লিখিয়াছেন।\* হিন্দী ভাষায় এই শব্দটি "বায়ালো," "বাওল," "বাওলী" প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিমাক্ষরের অশিক্ষিত লোকেরা "বাভলে," "বাউরা," "বাউরী" ইত্যাদি রূপেও ব্যবহার করিয়া থাকে।

অভিধান প্রভৃতি হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা এই—উন্মত্ত, বাতবিকারপ্রাপ্ত, পাগল, বৈকল্য-সম্প্রদায়বিশেষ ইত্যাদি।

সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের পাগলের আয় অপূর্ণ বেশভূষা, হাবভাব, চালচলন এবং নৃত্য-গীতের ভঙ্গী প্রভৃতি, ইহাদিগের "বাউল" নামকরণে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহাদিগের ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত উন্মাদলক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে বাউল নামে অভিহিত করিত। এইরূপে সাধারণ লোকে ইহাদিগের বেশভূষাদি বাহ্য লক্ষণাদি লক্ষ্য করিয়া, এবং ভগবৎভুক্ত লোকে ইহাদিগের বাতুলবৎ প্রকৃত রূপাত প্রেমোন্মত্ততা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগের "বাউল" নামকরণ করিয়াছেন। [শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকুল হইতে বাউল নিম্পন্ন মনে

\* (ক) বাউল (from বাতুল mad)—mad, insane. A person who shouts or proclaims the name of a God.—A Dictionary of Bengalee Language by W. Carey, D. D., 1825.

(খ) বাউল—(বাতুল-শব্দ)—বঙ্গদেশের গৌরান্দভুক্ত ভিক্ষুক-বিশেষ। ইহারা পান করিয়া ভিক্ষা করে।—Barat's Pronouncing Dictionary.

করেন ; আংল হইতে আউলিয়া সম্প্রদায়ের নাম যদি হইয়া থাকে তবে ব্যাকুল হইতে বাউল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয় ]।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন, এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রাচীন নাম “বায়ুর”। এই বায়ুর শব্দ হইতে ক্রমে “বাউল” শব্দের উৎপত্তি। ভক্ত যখন বায়ুর মত ভগবানে মিশিয়া যাইতে পারে, তখনই তিনি প্রকৃত বায়ুর বা বাউল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। বায়ু যেমন নিজের অস্তিত্ব হারা-ইয়া, সকল স্থানে সর্বাধিক্যে যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, লোকে যখন আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া তেমনই ভাবে ভগবানে বিলীন হইতে পারে, তখনই সে প্রকৃত বাউল-পদবাচ্য হইবে।

বাউল এই শব্দটি অল্প রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলায় “বেড়ী” অর্থে “বাউলী” এবং ময়মনসিংহ জেলায় “ঘরবাড়ীশূণ্ড” এই অর্থে “বাউল্লিয়া” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত “বাউল্লিয়া” শব্দের অর্থ হইতে আমরা আর একটি নূতন কথা জানিতে পারিতেছি। বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা কেহই গৃহী নহেন, সকলেই ঘরবাড়ীশূণ্ড তাগী পুরুষ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরবাড়ীশূণ্ড বলিয়াও বোধ হয় ইহাদিগকে “বাউল্লিয়া” বলিয়া অভিহিত করিত।

বাউল শব্দ “বাতুল” এবং বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় এই উভয় অর্থেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে বাউল শব্দের উল্লেখ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি প্রাচীন গ্রন্থসকল আজিও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং যে দুই চারিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বাউল শব্দ আছে কি না জানি না। তবে যতগুলি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে চণ্ডী-দাসের পদাবলীর পূর্বে লিখিত কোন গ্রন্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ পাই নাই। বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর মধ্যে বাউল শব্দ নাই। তবে “তোমার বিরহ-বেদনে বাউর সুন্দর মাধব মোর।”

এই পদে বাউর শব্দ বাতুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীর মধ্যে তিন স্থানে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

(১) “প্রেম-চল-চল যেমন বাউল বনের হরিণী তারা।”

(২) “বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা গুনি সে মুরলী-গীত।”

(৩) “শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইলু অতি

কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।”

এই উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে প্রথম স্থলে বাউল শব্দের অর্থে “বায়ুগুণ্ড” বুঝায়। দ্বিতীয় স্থলে “পাগল” এবং তৃতীয় স্থলে ক্ষিপ্ত বা ব্যাকুল অর্থে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

চৈতন্য-চরিতামৃতে “পাগল” অর্থে বহু স্থানে “বাউল” শব্দের উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম :—

(১) দশেন্দ্রিয় শিখ্য করি মহাবাউল নাম ধরি।

(২) আমি ত বাউল এক কহিতে আন কহি,

কৃষ্ণের তরঙ্গ আমি সদা যাই বহি।

(৩) তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস,

বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ।

মাধব দেব কৃত অসমিয়া রামায়ণের আদিকাণ্ডে “পাগল” অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

সেহি সূর্য্যবংশে তুমি নৃপতি প্রধান,

শ্রীতে ভৈলাহা বাউল চিন্তা নাহি আন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ক্ষিপ্ত অর্থে “বাউল” শব্দের প্রয়োগ আছে :—

কথা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজান,

বাউল হইল কিবা করি অনুমান।

এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাগল বা ক্ষিপ্ত অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদায়বোধার্থক বাউল শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। তবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জ হইতে “শূণ্ডসংহিতা” নামে একখানি উৎকলীয় পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথির দুই স্থলে বাউল সম্প্রদায় অর্থে “বাউলী” শব্দের উল্লেখ আছে।

“গোরক্ষনাথক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা,

মল্লিকানাথক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা।”

“ঋষি তপা সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ,

রোহিদাস বাউলী কপিল যেতে সন্ধ্য।”

অনুসন্ধান করিয়া দ্রুত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে, এই পুঁথি ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে বাউল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ‘বাউল’ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। (ক্রমশ)

## ভারতী ( অগ্রহায়ণ )।

নারীর স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুনীলাল বসু --

সংক্রামতা প্রতিবেদের বিশেষ বিধি।

কলেরা (Cholera)—১। কলেরা মহামারীরূপে আবির্ভূত হইলে পেটের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একবার মাত্র পাতলা দান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জলমিশ্রিত সল্ফিউরিক এসিড (Diluted Sulphuric acid) ১০ ফোঁটা এবং ক্লোরোডাইন (Chlorodyne) বা টিংচার ওপিয়ম (Tincture of Opium) ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা। বালকদিগকে বয়সের প্রতি বৎসর হিসাবে আধ ফোঁটা করিয়া উক্ত দুইটি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তবে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালককে অর্ধফেন সেবন করিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে অগ্রে ঔষধ সেবন করাইয়া পরে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। ২। বিকৃত বা দুপ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্য (যেমন ফলমূলাদি) কাটা অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। তরকারি, মাছ, যাহা কিছু বাজার হইতে আসিবে, পরিশুদ্ধ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাদিগকে কুটিতে দিবে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিবে। বাজারের মিষ্টান্ন এ সময়ে ব্যবহার না করাই মঙ্গল। সকল খাদ্য-সামগ্রী একপে রাখিবে যে তাহাদিগের উপর মাছি বসিতে না পারে। ৩। পানীয় জল ও দুগ্ধ ১৫ মিনিট কাল উত্তমরূপে ফুটাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে যাহাতে তদ্ব্যতীক কোনমতে ধূলি পড়িতে বা মাছি বসিতে না পারে। যে জলে মুখ ধুইবে, তাহাও যেন ফুটাইয়া লওয়া হয়। ফিণ্টারের উপর এ সময়ে বিশ্বাস করিবে না। কৈলাসপত্র সংস্কৃত হইবার পর উহাদিগকে ফুটন্ত জলে পুনরায় ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। কলেরা-রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা করিলে কলেরা রোগ হয় না। রোগীর বসি ও মলের মধ্যে ঐ রোগের বীজ অবস্থিতি করে; উহার কোব-

রূপে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই রোগে মল ও বমির সহিত তৎক্ষণাৎ কোনরূপ বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহা শুষ্ক পড় বাঁ করাতেই গুঁড়ার উপর ঢালিয়া দেওয়া কর্তব্য। অন্য বিশোধক ঔষধের অভাবে উহার সহিত চুন মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরের গায় যে-সকল স্থানে বন্ধ ড়েন আছে, তন্মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তবে পোলা ড়েন, কাঁচা নর্দমা বা জমির উপর ফেলিয়া দেওয়া কোন রূপে উচিত নহে। রোগীর মলমূত্র বস্তুদি একদিন বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া একঘণ্টা কাল জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহার নির্যাস হইয়া যায়। বিশোধক ঔষধে ভিজাইবার পর সাবান-জলে কাচিয়া লইলেও উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে জলে ফুটাইয়া লইলেই এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইতে পারা যায়। এই-সকল বস্তুদি কোন পুষ্করিণীর জলে কাঁচা উচিত নহে। পল্লীগ্রামে বাটী হইতে বহুদূরে মাঠের মধ্যে গভীর গর্ত করিয়া তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের মলমূত্রাদি প্রোথিত করা যাইতে পারে। তবে নিকটে কোন জলাশয় থাকিলে এরূপ ব্যবস্থায় অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। পূর্বে খড়ের উপর মলমূত্রাদি ঢালিয়া পুড়াইবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজ-সাধ্য ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ৫। যাহারা রোগীর পরিচর্যা করিবেন অথবা সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাহারা যেন বিশোধক ঔষধ ও সাবান-জলে হাত উত্তমরূপে ধোঁত করিয়া কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ বা স্পর্শ করেন। রোগীর গৃহের মধ্যে কোনরূপ ভক্ষাজব্য বা পানীয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসুচিত। যাহারা রোগীর পরিবার-ভুক্ত নহেন, তাহাদিগের, রোগীর বাটীতে কোনমতেই জল পান বা কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহারা পরিবারভুক্ত, তাহারা রোগীর গৃহ হইতে দূরে, হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কৃত স্থানে অত্যাঞ্চ জলে ধোঁত বাসনে পক্ষাদ্যাদি গ্রহণ করিবেন। ৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় “খালি পেটে” থাকা উচিত নহে। আমাদের পাকস্থলীতে (Stomach) যে গ্যাস্ট্রিক যুস (Gastric Juice) নামক অম্লগুণ-সম্পন্ন পাক রস নির্গত হয়, কলেরার বীজ উহার সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্র মরিয়া যায়। “খালি পেটে” থাকিলে এই রস নিঃসৃত হয় না, কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিলেই ঐ রস নিঃসারিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন ঘটনাক্রমে দুই দশটা কলেরার বীজ উদরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও অম্লরস-সংযোগে উহার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পেট খালি থাকিলে ঐ-সকল বীজ ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রের (Small Intestine) মধ্যে গমন করে এবং তথায় অমুকুল-কারণ-সংযোগে উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়। ৭। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ আবর্জনা সঞ্চিত থাকিতে দিবে না। ইহাতে মাছির উপজব হয় এবং মাছি দ্বারা কলেরার বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত ও খাদ্য-দ্রব্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকে। ৮। পয়ঃপ্রণালী, পাইখানা প্রভৃতি স্থান সর্বদা ফেনাইল দ্বারা ধোঁত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবে। ৯। শরীর ও মন সর্বদা স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে। কলেরা-রোগীর সেবা করিবার প্রয়োজন হইলে কলেরা রোগকে কখন ভয় করিবে না। রোগ নিবারণের জন্য যে স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরে নিহিত আছে, শরীর ও মনের অবসন্নতা হেতু তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদের সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ১০। অনেক সময় সোডা ওয়াটার, লেমনেড

প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য দূষিত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই-সকল পানীয় গ্রহণ করিয়া সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইলে এই-সকল পানীয় গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই—তাহা না হইলে এ সময়ে এই শ্রেণীর পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক সময়ে অপরিষ্কৃত জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময়ে বরফ বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করাই কর্তব্য। ১১। কলেরার “টিকা” (Inoculation) লইলে কিছু দিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না।

টাইফয়েড জ্বর (Typhoid fever)—১। কলেরার গায় টাইফয়েড জ্বরেও মল এবং মূত্রের সহিত রোগের বীজ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। সংক্রামকতা-দৃষ্টে জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই এই রোগের বিস্তার সংঘটিত হয়। দুই তিন সপ্তাহ অবিরাম জ্বর হইলেই উহাকে টাইফয়েড জ্বর মনে করিয়া উহার সংক্রামকতা দোষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও কিছুদিন রোগীর মল মুত্রের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আরোগ্য হইবার পরেও উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সতর্ক অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

রক্ত-আমাশয় (Dysentery)—১। এই রোগের বীজ মলের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে।

যক্ষ্মা (Phthisis)—১। রোগীকে সর্বদা খোলা জায়গায় রাখিবে। দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া খোলা বায়ুতে বা দালানে রাত্রিকালে শয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং দিবাভাগে বাটীর বাহিরে ছায়াযুক্ত মুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। যদি ঘরের মধ্যে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। ২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত কফের সহিত নির্গত হয়। রোগী যথা-তথা কফ ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধুলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং রোগ-বীজ-মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিশ্বাসের সহিত অপরের ফুসফুসে অথবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত অপরের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কোন একটা নির্দিষ্ট পাত্রে বিশোধক ঔষধ রাখিয়া তন্মধ্যে কফ পরিত্যাগ করা উচিত এবং উহা ভূমিতে না ফেলিয়া ড়েনের মধ্যে অথবা গভীর গর্ত করিয়া তন্মধ্যে পুতিয়া ফেলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কফ মুছিবার জন্য যেসকল বস্ত্রও রোগী ব্যবহার করিবে, তাহা বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে দধি করিয়া ফেলিবে। খবরের কাগজের উপর কফ ফেলিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ দধি করিয়া ফেলিলে এই কার্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত স্নহ ব্যক্তি কখনই এক বিছানায় শয়ন করিবে না। রোগীর সহিত এক ঘরেও রাত্রি যাপন করিবে না। ৪। মানুষের গায় গোকুরও যক্ষ্মা হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গোকুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষের যক্ষ্মা হইতে পারে। দুধ একবার উথলিয়া উঠিলেই উহাকে নামাইবে না, কিছুক্ষণ উহাকে ফুটিতে দিলে উহা সম্পূর্ণ নির্যাস হইয়া যাইবে। ৫। অনেক সময় মাছি দ্বারা এই রোগের বীজ খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং খাদ্যসামগ্রীতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ৬। যক্ষ্মা-রোগীর সহিত স্নহ ব্যক্তির এক স্থানে এক সঙ্গে বা ব্যবহৃত



পাত্রে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ। ৭। যক্ষ্মা-পীড়িতা মাতা শিশু-সন্তানকে স্তনপান করাইবেন না। ৮। পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যাহার যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আমাদের দেশে কন্ডার বিবাহ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ব্যাধিযুক্ত কন্ডার বিবাহ দিলে যে ধর্মে পতিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অমাত্র সন্দেহ নাই।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria)—১। যাহারা ঐ রোগীর সেবা করিবেন, তাহাদের মুখ বা চোখের মধ্যে রোগীর থুতু বা কফ যাহাতে না প্রবেশ করে তদ্বিষয়ে স বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ কাশিবার সময় রোগীর গলা হইতে কফের সহিত নিঃসৃত হয়। ২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ লাগাইবার সময়ে রোগী অত্যন্ত কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি যেন একপঙ পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নিজ নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া গলায় ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন। ৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার স্নিকটে ছোট ছেলেমেয়েদের কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সুস্থ বালকবালিকাগণকে বাটী হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। ৪। গৃহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সূর্যালোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। ৫। ড্রেনের গ্যাস্ যাহাতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে, তদ্বিষয়ে স বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ৬। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্লেগ্ (Plague)—১। বাটীর সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবে। ২। মাসুকের প্লেগ্ হইবার পূর্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেপা যায়। যখন দেখিবে যে বিনা-কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে যে উহার প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া অগ্ৰত গমন করিবে এবং সমস্ত বাসগৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধোত করিয়া ও চুন ফিরাইয়া সমস্ত দরজা জানালা কিছুদিনের জন্ত খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য হইবে। ৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। পুড়াইয়া ফেলিবে। যে স্থানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ দ্বারা উত্তমরূপে ধোত করিবে। ৪। প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অগ্ৰত সংক্রামক রোগীর শুক্রবার নিমিত্ত যে-সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ্ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতিপালন করা কর্তব্য। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকাকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মানুষ-শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইয়া থাকে; প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ না করাই উচিত এবং প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা শুক্রবার সময়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা আঁচড় না লাগে, তদ্বিষয়ে স বিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্যকর্তব্য। প্লেগ্-রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে উহার থুতু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে স বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ এক মাস কাল তাহার পৃথক গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসাই কর্তব্য। যাহারা রোগীর শুক্রবা করিবেন, রোগীরোগ্যের পর ১০ দিন তাহাদের পৃথক হইয়া থাকিলে ভাল হয়। ৬। যেসকল স্থানে প্লেগ্ হইতেছে, তাহা হইতে আনীত বস্ত্র, শয্যা পুস্তক বা শস্ত

রাখিবার খলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। ৭। প্লেগের সময় পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে অনেক সময়ে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে। ৮। যাহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা শুক্রবা করিবেন, তাহারা প্লেগের “টিকা” লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে এক প্রকার নিরাপদ থাকিতে পারিবেন।

হাম, বসন্ত ইত্যাদি—১। এই-সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, অথবা বস্ত্র শয্যা বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। বাটীতে এই-সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাহারা একখনি মোটা চাদর গায়ে দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অগ্ৰত গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান-জলে উত্তমরূপে ধোত না করিয়া অগ্ৰত গমন করা উচিত নহে। ২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। এই-সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা এক স্থান হইতে অগ্ৰ স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে নিম্ন ছিল যে যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারো কোন স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়। ৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালকবালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্তব্য। ৪। যে বাটীতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (Vaccination) লওয়া অবশ্যকর্তব্য। এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্যাপ্ত টিকা লইলে রোগের পরিব্যাপ্তি স বিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে। ৫। এই-সকল রোগে যখন “ছাল” উঠিতে থাকে, তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ প্রবল ও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। রোগীর গৃহের জানালা দরজায় কার্বলিক এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গায়ে সর্বদা কার্বলিক তৈল (১ ভাগ কার্বলিক এসিড ও ৯ ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ত্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তদ্ব্যবস্থিত রোগবীজও নষ্ট হয়, ‘ছাল’ দেহ হইতে পৃথক হইয়া বায়ুসাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং ঘায়ে মাছি বসিতে পারে না, সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। ৬। রোগ আরোগ্য হইলে যতদিন না সমস্ত “ছাল” উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থব্যক্তির সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন স্নান করিবার পর সুস্থব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ৭। বস্ত্র শয্যাাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্বকথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অমাত্য রোগ (Hydrophobia)—কিঞ্চু কুকুর বা শূপালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশন

কালে উহা ক্ষতবধো সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুগুলীর পৃথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মূহুগতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্পাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিকে উপনীত হইয়া ভীষণ রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু স্থনিশ্চয়—এই রোগ কখন নীরোগ হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু কুকুরে বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জ্বলাতন রোগ উৎপন্ন হয়; তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অশ্ব প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুকুরে কামড়াইলেই জ্বলাতন রোগ উৎপন্ন হয় না; কুকুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কুকুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে সঞ্চারিত হয়, সুতরাং তাহার প্রথমদষ্ট, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দেহ বস্ত্রাদিতে আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়, দংশন-জনিত ক্ষত-মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না। জ্বলাতন রোগের একমাত্র সূতিকিৎসা স্বনামখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্ট্যুর (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলা শৈলের নিকট কমৌলি নামক স্থানে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কন্নর নামক নগরে গভর্ণমেন্ট-সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে এই চিকিৎসাধীনে থাকিলে কিন্তু কুকুর-দংশন-জনিত দেহ-প্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জ্বলাতন রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না।

গভর্ণমেন্ট, বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ গভর্ণমেন্ট হীনাবস্থ লোকের জন্ত কমৌলি যাতায়াতের রেলভাড়া পর্যাপ্ত দিবার এবং তথায় বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যাহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন।

১। কুকুরে দংশন করিলে উক্ত জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক এসিড (Strong Nitric বা Carbolic Acid) সক্র তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩৪ বার প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই-সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেননা উহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ২। কিন্তু শুদ্ধ এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা দষ্ট স্থানে যতদূর পর্যাপ্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, ততখানি মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরিষ্কার করা উচিত। অস্ত্রজনিত বা শুকাইতে দেয়ী হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংস তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দোষ হইয়া যায়। ৩। যে কুকুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর যদি ঐ কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে উহা ক্ষিপ্ত নহে। তবে দংশিত স্থান নাইট্রিক বা কার্বলিক এসিড প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। যতক হইতে ক্ষত স্থান যত দূরে অবস্থিত হইবে, ততই রোগের ভীকতার হ্রাস এবং প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। ৪। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইবে, তাহার নিকট ঐ রোগ-সংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। অনেক স্থলে শুধু ভয় পাইয়া

রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে, চিকিৎসক পর্যাপ্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের বিষ লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত।

## মহারাষ্ট্রীয় আহারপ্রণালী—শ্রীমত্যাঙ্গনাথ ঠাকুর—

এদেশের ভ্রাজ্জমাতেই নিরামিষ-ভোজী। সামান্ততঃ বলতে গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবি নয়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোকন, কানাড়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্য বশতঃ প্রচুর খাদ্য জন্মে তাই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার। তদ্ব্যতীত, বাজরী, জোয়ারী, গম প্রভৃতি দেখানে যেসকল শস্য জন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটা মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভ্রাজ্জ লোকদের ভাত ও 'বরণ' (ডাল) ভিন্ন চলেনা। রান্না অনেকটা আমাদের ধরণে, কেবল তরকারিগুলি ঝালপ্রধান, আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিষ্টি ঝাল লোম্বা যখন যাতে অভিক্রমিত তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টি খরচি হলে টক ঝাল, ঝালে অকরচি হলে আবার মিষ্টি, ঝালের মুখ মিষ্টি করে আবার লোম্বায় এসে পড়া যায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কখন কখন জিনিস খেতে হবে কোথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে তরকারী আর নানা রকম চাটনী, অখলের জায়গায় 'পকাগুত' (এক রকম পাঁচ মেশালো অল্পমধুর ঝোল), আর 'কড়ি' (একরকম মশলামাখা টক দধির পাক)। মিষ্টানের মধ্যে 'শ্রীপণ্ড' মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী, জাকরাণ-যুক্ত মিষ্টি দধি দিয়ে প্রস্তুত। মিষ্টানের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার চলন নেই, সুতরাং ওরা সন্দেহ রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল মিষ্টান্ন হতে বঞ্চিত। কোন বাঙ্গালী ময়রা ও-অঞ্চলে মিষ্টানের দোকান খুললে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পটবস্ত্র (সোলা) পরিধান করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের After Dinner Speech-এর ধরণে কিছু বলা একটা মারাঠী রীতি আছে সেটা আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক কোন সংস্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিম্বা গীতের একচরণ—এইরূপ যাঁর বা ইচ্ছা আবৃত্ত করেন, তাতে উপস্থিত নিমজ্জিতমণ্ডলীর বেশ আনন্দ হয়। ডাক্তারে বলে যে আহারের সময় হাসিখুঁস মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উক্ত নিয়ম বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত বলতে হবে।

বিবাহ ও ভোজনবিচার, হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল। বাঙ্গালী-দেশে ভোজনবিচারের নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়—অন্ততঃ কলকাতায়। কিন্তু বোম্বাইয়ে দেখতে পাই এই অস্ত্রজাতিক ভোজনের সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। "আর্য্যসম্ম" (Aryan Brotherhood) নামে ওদেশে মাননীয় জষ্টিচন্দ্রবারকরের নেতৃত্বে একটি সম্ম স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা ভাতভাদ পণ্য কার্য্যারম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্মতি এরূপ একট

মিশ্রভোজ দেওয়া হয়—“প্রীতিভোজন”। কিন্তু এই প্রীতিভোজন তাঁদের জাতভাইদের অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। মজা এই যে, দুজন মাহার জাতীয় ভ্রাতৃলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি তাদের নিজের জাত থেকে বহিষ্কৃত করবার ছদ্ম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাত অস্ত্যাজ বলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য। যা হোক মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করবার এক সহজ উপায় আছে। বিভিন্ন জাতের মিশ্রভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসন দেওয়া চাই। এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, খালি পংক্তিভেদের ব্যবস্থা করলেই হ'ল। এই নিয়ম আমাদের orthodox হিন্দুসমাজে প্রচলিত হলে মন্দ হয় না। এই সামান্য রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালভ মনে করা যায়। মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরুষের একত্র-ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা দেখতে পাই। যুরোপীয় সভ্যজগতের এই সাধারণ রীতি। পারসী বিঘ্নগুণী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠীসমাজ এখনো অতদূর এগোতে পারে নি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মতো নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্তী পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছটি পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না।

### মহারাষ্ট্রীয় উৎসব—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মহারাষ্ট্র দেশে পূজাপার্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত, কেবল উৎসব-বিশেষের মাহাত্ম্য গণনায় তারতম্য দেখা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশে নাই। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দুগৃহে দুর্গাপূজা হয়, তথাপি বোম্বাইবাসীদের মধ্যে ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়াদশমীই (দশারা) শারদোৎসবের বিশেষ দিন। সে দিন হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পিণ্ডবেরা বিরাত রাজ্যে প্রবেশ-কালে এই দিনে শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপূজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমীপূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথা দেখেছি। মারাঠি দেশে দশারার বিশেষ মাহাত্ম্য, কেননা এই সময়ে বর্গীরা শত্রুর্চনা করে' মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রায় বেরতো। দশারায় অশ্বকল চিত্রবিচিত্র ফুলের মালায় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেঘ মহিষাদি বলিদানে মেতে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে পশুবলি হয় না, কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? কারওয়ারে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ হয়। বিচারস্থানে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করে' দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন, সেই মানৎরক্ষা খানসে ভৃত্যকে দিয়ে এই কাণ্ড করানো হয়।

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাইবাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধনত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অব্যবস্থায় শেষ। বাঙ্গালাদেশে এ সময় কালীপূজা হয়, কিন্তু বোম্বাই এদেশে এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা লক্ষ্মী। অব্যবস্থায়

দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোসনাইয়ের ঘটা। সেই দিন বণিকদের বহিঃপূজনের দিন। তারা তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দান-খ্যান দেবার্চনায় উৎসব সম্পাদন করে ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভক্ত-চুড়ামণি পবননন্দনের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠীদের মধ্যে খুবই চলিত; এমন কি, মারুতি-মন্দির মারাঠি পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ ঠাকুরেরও মানমর্যাদা সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্তে স্বতন্ত্র উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা ও বিসর্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দোলযাত্রার সময় (হোলী) 'আবীর খেলা' আমোদ প্রমোদ সর্বত্রই সমান। মহলাররাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার এক হাতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর শ্রোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে পড়েছিল।

ভ্রাতৃত্বিতীয়ে বোম্বাইয়ে যমদ্বিতীয়া কহে। ভাই বোনের মিলন ও সম্ভাববর্ধন এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগ্নী ভাইয়ের কপালে তিলক দিয়ে তাকে বরণ করে, অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর স্নেহের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করতে হয়।

### মহারাষ্ট্রীয় গানবাজনা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙ্গালীরা যেমন গানবাজনাভক্ত আমি যতদূর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অগ্নতর। তারা ব্যবসায়ী Practical লোক; কলাবিদ্যার প্রতি তাদের ততটা অনুরাগ নাই। আমার একজন মারাঠী বন্ধু বলেছিলেন—তিনি কলিকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক-ও-সঙ্গীত-প্রিয়, যে বাড়ীতে যাও একটি ছকা ও তানপুরা। তাই বলে ওদেশে গীতবাদ্যের চর্চা বা আদর যে নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদার লোকদের মধ্যে বদ্ধ, ভ্রাতৃলোকের মধ্যে গীতবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্প লোকই দেখা যায়। সামান্যত বলা যেতে পারে এ দেশের গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেরাল ক্রপদ। এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে-স্থানে রূপান্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠীদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি দেশী ছন্দে নূতন ধরণের গান ও তান শুনা যায়, আর 'লাউনী' নামক একপ্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটি প্রাদেশিক জিনিস। আমাদের দেশের খোল কঠাল সমেত সঙ্গীতনের মত ধর্মসঙ্গীত ওদেশে শুনি নাই। ওদেশের 'কথা' কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ ছাড়া একটু প্রভেদও আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান বিস্তৃত করে' বলা বাঙ্গলা দেশের কথকতা; আর এদেশের কথা আদ্যোপান্ত একটি ভাবসূত্রে গাঁথা, সেইটি বিস্তার করে' শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্য। একটি নীতিসূত্র অবলম্বন করে গান ও উপাখ্যানসমূহে তার ব্যাখ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে-সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হতে সংগৃহীত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপাখ্যান ও গান থাকে, ধ্রুয় শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমন্বরে যোগ দেয়; অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনাদির পর সভাভঙ্গ হয়। মারাঠি দেশে কথা ও কীর্তন ধর্ম প্রচারের

সঙ্গীন অন্ন। কীর্তন-সভায় আমোদ ও শিক্ষা দুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্তনকলায় পরিপক ছিলেন। তাঁর মাদুরীময় সঙ্গীত শুনতে লোকেরা দেশ দেশান্তর হতে আসত। শিবাজী রাজাও অবসরক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হতেন। এককাল কালে রুটির পরিবর্তন যেমন বাঙ্গালাদেশে দেখা যায় ওদিকেও তেমনি। এখন সর্বত্র নাটকের পালা পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্তন এসব কারো ভাল লাগে না। মারাঠিদের মধ্যেও ভাল ভাল নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটী, নারায়ণরাও পেশওয়া বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ওদেশে সে-সব নাট্যকারদের পুশার ভারী। এই-সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত কথারস্ত হয়। অভিনয়ের আরম্ভে ময়ূরবাহনা বীণাপাণি নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ওদেশে সরস্বতীর বাহন—ময়ূর।

### •বিজয়া দশমী—শ্রীসরলা দেবী—

এ কোন্ দশমীর তিথি? ইহা বিজয়া দশমী। বার মাসে চন্দ্রিণী দশমী আসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তেইশটি নির্কিশেষণ—একটি দশমী মাত্র জয়সঙ্কেতে পূর্ণ। পুষ্পবিকাশের পূর্বে অক্ষরোদ্গম হয়, বসন্তানিল বহে; বৃষ্টিবর্ষণের পূর্বে মেঘরাশি আকাশে পুঞ্জীভূত হয়, বিছাৎ চমকায়; ব্রহ্মোদ্গমের পূর্বে অগ্নিতে অগ্নির আশির্ভাব হয়। এইরূপে কার্গাকারণ প্রায়শঃ ঘটনাপারম্পর্যে আশ্রয়বিকাশ করে। বিজয়াদশমী-উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে কোন্ জাতীয় অনুষ্ঠান দেখা যায়? কাহার পশ্চাতে এই জয়দায়িনী দশমীর অভ্যুদয়—তাহার দিকে ফিরিয়া দেখ। মহালয়া—অর্ধাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণই বিজয়ার পূর্বগামী মহানুষ্ঠান।

হে হিন্দু, এ তথ্যের গভীরতা ও সার্থকতা বিষয়ে ধ্যানশূন্য হইও না। যদি বিজয় চাও, যদি তেইশবার নিফল হইয়াও চন্দ্রিণী বারের বারও অন্ততঃ সফলতা কামনা কর, তবে তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের কীর্তির ধ্যানে অবগাহিত হও, সে-সকল মহৎকার্য-কলাপের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হও, বিশ্বাস কর যে সে-সকল তোমার আমার মতো রক্তমাংসের শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ কর। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, কেবলমাত্র ভৌতিক পিণ্ড ও জলদান করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিও না। তদপেক্ষা কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনা গ্রহণ কর। প্রথমতঃ জ্ঞান তাঁহাদের কীর্তিমার্গ কোন্ কোন্ দিশায় রেখা কাটিয়া গিয়াছে, জাতীয় ইতিহাসের অনুশীলন, অনুসন্ধান ও গঠন কর। তারপর সেই ঐতিহাসিক অতীতকে বর্তমানে সত্য করিয়া তোল। তেমনি সাহসিক, তেমনি বাণিজ্যদক্ষ, তেমনি সূনাবিক, তেমনি দ্বিগিজয়ী, তেমনি সহিষ্ণু, জ্ঞানী, তেমনি কন্মী হও। তাঁহাদের মার্গানুসরণ—তাঁহাদের প্রিয়কার্য সাধনই তাঁহাদের একত উপাসনা, তাঁহাদের প্রতি প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা।

## আগনের ফুল্কি

[ পূর্বপ্রকাশিত অংশের চূষক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কসিকা ধীপে বেড়াইতে বাইতেছিলেন; জাহাজে অসেঁ নামক একটি কসিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম

দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্দ কসিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অসেঁ তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অসেঁর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কসিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলের উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অসেঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অসেঁ লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার কোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বীণিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুঞ্চ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্ম একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অসেঁ ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া বাইতেছে। লিডিয়া অসেঁকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিট দোখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অসেঁ ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুকিতে পারিল যে অসেঁ তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অসেঁকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আশ্রয় দিতে চাহিল না।

অসেঁ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অসেঁকে তাহাদের পিতা যে আয়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদুলিন পিয়েত্রী অসেঁর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মোত্তের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অসেঁর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অসেঁর বাড়ীতে গিয়া অসেঁকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অসেঁ তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নুতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার খাতাপত্র ও অন্ত সাক্ষ্যমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দোষী নয়। তখন উত্তেজিত হইয়া অসেঁ বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়ানে অর্লান্ডিক-সিয়ো হঠাৎ ছোরা খুলিয়া অসেঁর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভ্যাঁসান্তেলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিমেষ মধ্যে ছোরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিভাড়িত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে

দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অর্সোকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অর্সো যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে। ]

( ১৭ )

পরদিন নির্ঝিবাদে কাটিয়া গেল। উভয় পক্ষই সাবধান হইয়া রহিল। অর্সো বাড়ী হইতে বাহির হইল না, এবং বারিসিনিদেরও বাড়ীর দরজা সমস্ত দিন বন্ধই থাকিল। কেবল থানার পাঁচজন চৌকিদার সমস্ত দিন গ্রামের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোঁদ দিয়া গ্রাম্য কলহের কথা লোকের মনে জাগরুক করিয়া রাখিতেছিল। জমাদার তাহার বন্দুক তাগ করিয়া ধরিয়াই বেড়াইতেছিল; কিন্তু উভয় বিবাদী বাড়ীতে গোলন্দাজীর আয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছিল না। তবে একজন কসিক গ্রামের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে একটা অন্তর্গূঢ় বিপ্লব আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, কারণ সেই কাঁপালো ওক গাছের তলায় কয়েক জন স্ত্রীলোক বাতীত সেদিন আর পুরুষদের মেলা বসে নাই।

রাত্রে আহারের সময় কলোঁবা প্রসন্ন মুখে তাহার দাদাকে লিডিয়াস একখানি চিঠি দেখিতে দিল। লিডিয়াস লিখিয়াছে—

প্রিয় কলোঁবা, আপনার দাদার চিঠিতে জানিলাম যে আপনাদের গ্রাম্য বিবাদ মিটমাট হইয়া গিয়াছে; ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। আমার বাবার আজাক্‌সিয়ো আর মোটেই ভালো লাগিতেছে না, এখানে ত আর আপনার দাদা নাই, যুদ্ধবিগ্রহ শিকার পত্নতির গল্প করেন কাহার সঙ্গে,

পান না। তাই আজ আমরা এখান থেকে রওনা হইতেছি, এবং আপনাদের সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্ত বাস করিতে যাইতেছি—আমাদের সঙ্গে একখানা পরিচয়পত্রও আছে। আগামী পরশ্ব, বেলা এগারটার কাছাকাছি, আমি আপনাদের পাহাড়ে হাওয়া সেবন করিতে উপস্থিত হইব। আপনার মতে পাহাড়ে হাওয়া শহরে হাওয়ার চেয়ে ঢের ভালো—এইবার পরীক্ষা করা যাইবে। আজ তবে এই পর্য্যন্ত। আপনার বন্ধু

লিডিয়াস নেভিল।”

অর্সো চিঠি পড়িয়াই বলিয়া উঠিল—“তবে আমার দ্বিতীয় চিঠিখানা পায়নি দেখছি!”

—চিঠির তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তোমার চিঠি পৌঁছবার আগেই ওরা রওনা হয়ে পড়েছে। তুমি কি ওকে আসতে বারণ করে’ চিঠি লিখেছিলে দাদা?

—আমি লিখেছিলাম যে আমরা এখন যুদ্ধের জোগাড়ে আছি, এ অবস্থায় কোনো অতিথির পরিচর্যা করা সম্ভব হবে না।

—বাঃ তা কেন? ইংরেজ জাতটা ভারি অদ্ভুত। শেষ যে-রাত্রিতে আমি তার সঙ্গে একত্র ছিলাম, ও আমাকে বলেছিল যে কসিকায় এসে একটা প্রতিহিংসার ব্যাপার না দেখে গেলে ওর মনে বড় দুঃখ থেকে যাবে। দাদা, তুমি যদি মত কর, তা হলে শত্রুর বাড়ী আক্রমণ করে’ ওদের একটু যুদ্ধের খেলা দেখিয়ে দেওয়া যায়।

—কলোঁবা, তোকে মেয়ে করে’ ভগবান কী ভুলই করেছেন, তা কি তুমি বুঝতে পারিস? তুমি একজন জবরদস্ত যোদ্ধা সৈনিক হতে পারতিস!

—খুব সম্ভব! কিন্তু সম্প্রতি আমাকে গিন্নি সেজে অতিথি-সংকারের আয়োজন করতে হবে।

—কিছু দরকার নেই। আমি এখন একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওদের রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

—সত্যি? এই বিষম দুর্ঘ্যোগে কাকে পাঠাবে, সে তোমার চিঠি নিয়ে বৃষ্টিবানে একেবারে ভেসে যাবে যে? .....এই দুর্ঘ্যোগে ফেরারীদের জন্তে সত্যি আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। ভাগ্যিস তারা খানকতক তেরপাল জোগাড় করে রেখেছে। দাদা তোমার এখন কি করা উচিত জান? ঝড় বাদল যদি খেমে যায়, তা হলে কাল ভোরে তুমি নিজেই রওনা হয়ে গিয়ে আমাদের সেই কুটুম্বটির বাড়ী যাও, পথে লিডিয়াস সেখানে থাকবে, লিখেছে; ভোর ভোর গেলে তুমি তাদের সেখানেই ধরতে পারবে, লিডিয়াস খুব বেলায় ওঠে। আমাদের এখানে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তুমিই তাদের গিয়ে নিজে বলবে; সব শুনেও যদি তারা আসতে চায়, সে ত আমাদের বিশেষ আনন্দের কথাই হবে।

অর্সো এই প্রস্তাবে অনায়াসে সম্মত হইল। কয়েক

মুহূর্ত চূপ করিয়া থাকিয়া কলোঁবা বলিল—দাদা, আমি যখন তোমাকে শত্রুদের বাড়ী আক্রমণ ও অবরোধ করবার কথা বলছিলাম, তুমি হয়ত ভাবছিলে যে আমি ঠাট্টা করছি। কিন্তু তুমি কি জান না যে আমাদেরই লোকবল বেশি, অস্ত্র ওদের ডবল? ম্যাজিষ্ট্রেট দারোগাকে সম্পেণ্ড করাতে গাঁয়ের সকল লোকই এখন নির্ভয়ে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। আমরা এখন ওদের কুচিকুচি করে' খুড়ে ফেলতে পারি, তা জান? ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা এখন ত খুব সহজ কথা। তোমার যদি মত হয়, তা হলে আমি বরনায় গিয়ে ওদের বাড়ীর মেয়েদের ঠাট্টা করব; পুরুষরা তা শুনে অমনি দৌড়ে আসবে... খুব সম্ভব আসবে, কারণ ওরা এমনি কাপুরুষ যে মেয়েমানুষেরও অধম! খুব সম্ভব ওরা ওদের পাইকদের শড়কী চালাতে হুকুম দেবে; কিন্তু আমি ঠিক আপনাকে বাঁচিয়ে চলে আসব। তা হলে আর কি, ওরাই প্রথমে আমাদের যখন আক্রমণ করলে তখন আমাদের আর কোনো দায় দোষ থাকবে না। ঝগড়া ঝাটতে আবার ভালোমানুষটি কে কোথায় করে' থাকে? দাদা, তোমার বোনটির কথা শোন; আদালতে কালো-গাউন-পরা উকিলেরা খানিকক্ষণ বকবক করবে, শাদা কাগজে অনেক কালির গাঁচড় পাড়বে, কিন্তু ফল হবে অষ্টরস্তা। ঐ বুড়ো শেরাল ধুঁ তখন চোখে সর্ষেদুল দ্বৈধবেন; দিন দুপুরে চোখের সামনে নক্ষত্রসভা বসে' যাবে। আঃ কি বলব, ম্যাজিষ্ট্রেটটা তখন যদি ভায়াস-স্তেলোটোর সামনে আড়াল করে' না দাঁড়াত তা হলে একটা শত্রু কম হ'ত।

এই-সমস্ত কথা কলোঁবা এমন শান্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে বলিয়া গেল যেন সে অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনেরই পরামর্শ করিতেছে।

অর্সো বিশ্বয়, প্রশংসা ও ভয়ে বিমূঢ়ের মতো হইয়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। তার পর টেবিল হইতে উঠিয়া বলিল—কলোঁবা, আমার মনে হচ্ছে তুই যেন সাক্ষাৎ সয়তানী। লক্ষীটি, তুই ক্ষান্ত দে। আমি যদি বারিসিনিদের মোকদ্দমায় কাবু করতে না পারি, তা হলে আমি অস্ত্র উপায় দেখব। গরম

গুলি কিংবা ঠাণ্ডা ছুরি! তুই দেখছিস ত, আমি কর্শিকার প্রবচন একেবারে ভুলে যাইনি।

কলোঁবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওভ কার্যা চটপট সেরে ফেলাই ভালো। দাদা, কাল ভোরে তুমি কোন্ ঘোড়াটায় চড়ে' যাবে?

—কালো ঘোড়ায়। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস যে?

—তাকে দানাপানি খাইয়ে ঠিক করে' রাখতে হবে কিনা।

অর্সো নিজের ঘরে চলিয়া গেলে কলোঁবা সাভেরিয়া ও পাইক বরকন্দাজদের গুহিতে পাঠাইয়া দিয়া একাই রান্নাঘরে রহিল। থাকিয়া থাকিয়া সে অধৈর্য হইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল তাহার দাদার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে কিনা। যখন তাহার মনে হইল যে সে ঘুমাইতেছে, তখন কলোঁবা একখানা ছোরা লইয়া পরখ করিয়া দেখিল যে তাহাতে বেশ ধার আছে কিনা; তারপর তাহার ছোট্ট পা দুখানি একজোড়া প্রকাণ্ড জুতার মধ্যে ভরিয়া নিঃশব্দ-পদসঙ্কারে বাগানে প্রবেশ করিল।

বাগানটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা; বাগানের পরেই বেড়া-ঘেরা একটা প্রশস্ত স্থান, সেখানে ঘোড়া ছাড়া থাকিয়া চরিয়া বেড়ায়, কারণ কর্শিকায় ঘোড়ার আস্তাবলও নাই, ঘোড়া কেহ বাঁধিয়াও রাখে না। সাধারণতঃ সকলে নিজের ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া রাখিয়া দেয়, এবং দানাপানি খাওয়াইবার দরকার হইলে বা বৃষ্টিবাদল হইতে রক্ষা করিতে হইলে সকলে নিজের নিজের ঘোড়াকে ডাকিয়া লইয়া আসে।

কলোঁবা সম্ভরণে বাগানের দরজা খুলিয়া ঘেরা-জায়গায় প্রবেশ করিল; এবং শিশ দিয়া ঘোড়াগুলিকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিল; সে প্রায়ই এমনি করিয়া ডাকিয়া ঘোড়াদের রুটি আর হুন খাওয়াইত। কালো ঘোড়াটা তাহার কাছে আসিবা মাত্র কলোঁবা তাহার কেশর ধরিয়া ছুরির এক চোপে তাহার একটা কান কাটিয়া ফেলিল। ঘোড়াটা চার পায়ে লাফাইয়া উঠিয়া ককরণ কাতর আর্তনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে

ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কলোঁবা মনে মনে খুসি হইয়া পুনরায় বাগানে ফিরিয়া আসিল, এবং তখন অর্সো তাহার ঘরের জানলা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কে ও ? ও কে যায় ?” কলোঁবা শুনিতে পাইল, অর্সো তাহার বন্ধুকের ঘোড়া চড়াইল। কলোঁবার সৌভাগ্যক্রমে বাগানের দরজাটা এক টেরে অন্ধকারের মধ্যে ছিল, এবং একটা ডুমুর গাছের ঝোপ সেখানটা প্রায় আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর, তাহার দাদার ঘরে, থাকিয়া থাকিয়া আলোর আভাস প্রকাশ পাইতে দেখিয়া কলোঁবা বুঝিল যে অর্সো আলো জালিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি বাগানের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রাচীরের ধারে ধারে গাছের ছায়ায় তাহার কালো পোষাক একেবারে মিশাইয়া দিয়া অর্সো আসিয়া উপস্থিত হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র আগে রান্নাঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কলোঁবা অর্সোকে রান্নাঘরে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, কি ?

অর্সো বলিল—আমার যেন মনে হ'ল কেউ বাগানের দরজা খুলছিল।

—অসম্ভব। তাহলে ত কুকুর ডাকত। যাই হোক, চল দেখি গে।

অর্সো বাগানের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, বাগানের বাহিরের দরজা বেশ বন্ধই আছে ; তখন মিথ্যা ভয়ের জ্ঞান মনে মনে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অর্সো নিজের ঘরে ফিরিয়া চলিল।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তুমি যে এমন সাবধান হয়েছ, এ দেখে আমার মন ভারি খুসি হয়ে উঠেছে। তোমার এমনি হওয়াই ত চাই।

অর্সো বলিল—তুইই ত আমাকে সংশোধন করে' তুলছিস। আচ্ছা, এখন তবে যাই। শুভরাত্রি হোক।

উষার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া অর্সো যাত্রার জ্ঞান প্রস্তুত হইল। তাহার সাজসজ্জায় প্রেসসী-মিলন-প্রয়াসীর বাবুয়ানা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ বীরের সাবধানতা এক-সঙ্গেই প্রকাশ পাইতেছিল। নীলরঙের একটা গুভার-কোটের উপর কশা কোমরবন্ধে রেশমী দড়িতে বুলানো

ছিল একটা কার্ডুজতরা টিনের বাক্স ; পাশ-পকেটে তাহার ছোরা এবং হাতে তাহার সেই ম্যাণ্টনের তৈরী বন্ধুক, দোনাতে গুলিভরা, একেবারে প্রস্তুত। কলোঁবার হাতের তৈরী কাফি একটা পিরিচে ঢালিয়া অর্সো তাড়া-তাড়ি যখন খাইয়া লইতেছিল, তখন একটা পাইক ঘোড়ায় জিনসাজ পরাইতে গেল। অর্সো ও কলোঁবা দুজনেই তাহার পিছে পিছে ঘেরা-জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল। পাইকটা ঘোড়া ধরিতে গিয়া হাত হইতে জিনসাজ ফেলিয়া দিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইল, এবং ঘোড়াটার মনে গত রাত্রির ব্যাপারটা এখনো বেশ টাটকা ও বেদনাদায়ক হইয়াই ছিল, তাই সে অপর কানটার বিনাশ-আশঙ্কায় লোক দেখিয়া দৌড় বাঁপ লক্ষ চীৎকার প্রভৃতি বিবিধ কসরৎ করিয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

অর্সো পাইককে ডাকিয়া বলিল—এই জলদি কর।

পাইকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বলিতেছিল—হায় হায় ! বাপরে বাপ ! হুজুর ! আজ্ঞে হুজুর ! এ ! ক্যা তাজ্জব ! .....

তাহার বিস্ময় ও হাহতাশ অসবন্ধ ও অনর্গল ভাবে চলিতেই লাগিল।

কলোঁবা জিজ্ঞাসা করিল—ওরে কি হয়েছে ?

সকলেই ঘোড়ার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার কানকাটা ও রক্তাক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়-ও বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া উঠিল। কসিকায় শত্রুর ঘোড়াকে বিকলাঙ্গ করা মানে এক কুখ্য প্রতিহিংসা লওয়া, শত্রুকে অগ্রাহ করা, এবং খুন করিবার ভয় দেখানো। সকলেই বলিয়া উঠিল “এই-অন্ডায়ের প্রতি-কারের একমাত্র উপায় বন্ধুকের গুলি ; তা ছাড়া আর উপায় নাই।” অর্সো বহুকাল কসিকা ছাড়িয়া যুরোপে বাস করিয়া আসিয়াছে ; সে এই ব্যাপারটার উগ্রতা সকলকার অপেক্ষা অল্পই অনুভব করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সেখানে যদি বারিসিনিদের গোষ্ঠীর কেহ উপস্থিত থাকিত তবে তাহাকে প্রাণ দিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ করিয়া যাইতে হইত ; কারণ সকলেই স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই কাণ্ডটা বারিসিনিদেরই শক্রতা সাধনের ফল

অর্সো গর্জন করিয়া উঠিল—নীচ কাপুরুষকোথাকার ! আমার সামনে আসতে সাহস নেই, শক্রতা সাধা হয়েছে একটা নীরিহ অবোলা জন্তুর ওপর !

কলোঁবা আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল—দাদা, এখনো আমাদের বিলম্ব ? তারা পদে পদে আমাদের উত্থাপন করেছে, ঘোড়াটাকে জখম করে' ছেড়েছে, তবু আমরা তাদের কিছু বলব না ? দাদা, তোমার গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই, তুমি কি পুরুষ মানুষ নও ?

পাইকেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা ! আমরা ঘোড়াটাকে গায়ে নিয়ে যাই, গাঁ মুক্ক ক্লেপিয়ে ওদের বাড়ী চড়াও হই গিয়ে !

বুড়ো পোলো গ্রিফো বলিল—ওদের বাড়ীতে যে খড়ের গাদা আছে সেটা ওদের ঘরের চালের সঙ্গে ঠেকে আছে, আমরা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবো।

অমনি একজন গির্জার ঘড়ীতে উঠিবার বড় মইখানা আনিতে ছুটিতে চায়, একজন বারিসিনির বাড়ীর সদর দরজা ঢেকির বাড়িতে ভাঙিতে উদ্যত। এই-সমস্ত উদ্ধত ও ক্রুদ্ধ গুণ্গোলের মধ্যে কলোঁবার তীব্র কণ্ঠ সকল শব্দের উপর উঠিয়া তাহার অমুচরদিগকে বলিল—ওরে, তোরা যে যার কাছে যাবার আগে এক এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে যা।

দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা সৌভাগ্যক্রমে ঘোড়া বেচারির উপর কলোঁবার নিষ্ঠুরতা অর্সোর কাছে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। যদিও অর্সোর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই নিষ্ঠুর আচরণ বারিসিনিদের শক্রতা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং অর্লান্দিক্‌সিয়াকেই ইহার কর্তা বলিয়া বিশেষ সন্দেহ হইতেছিল, তথাপি সে মনে করিতেছিল যে সে বেচারা তাহার কাছে চড়াই ঘুষিটা ধাইয়া উত্তেজিত হইয়া তাহার কিছু না করিতে পারিয়া শেষে ঘোড়ার কান কাটিয়াই নিজের লজ্জা ভুলিয়াছে। এই নীচ ও হাস্যজনক প্রতিহিংসাপ্রণালী দেখিয়া তাহার শত্রুর প্রতি অর্সোর ঘৃণা ও করুণারই উদ্বেক হইতেছিল, ক্রোধ হইতেছিল না ; এবং এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কথাই তাহার কাছে ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছিল যে এ রকম মেক্দারের লোকের সহিত

তাহার যুদ্ধ করা উপযুক্তও নয়, আর তাহার মানারও না।

সকলের গুণ্গোল ধামাইয়া যখন সে নিজের কথা সকলকে শোনাইবার মতো অবসর পাইল, তখন অর্সো বলিল—তোমাদের কারো লড়াইয়ের উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে না ; আইন আদালত খোড়ার কামের জন্তে উচিত-মত খেসারত আদায় করে' তবে ছাড়বে।

এই কথা শুনিয়া সকল লোক একেবারে হতভম্ব হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অর্সো কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল দেখ, এখানকার মালিক আমি, আমি চাই যে তোমরা আমারই হুকুম মানবে। যে খুনখারাপি কি ঘরজ্বালানীর কথা বলবে, সে জেনে রাখে যেন যে আমি তাকেই খুনখারাপি করে' জ্বালিয়ে দেবো। ... শোন ! একজন শাদা ঘোড়াটার জিন কষে দাও।

কলোঁবা অর্সোকে টানিয়া একান্তে লইয়া গিয়া বলিল—দাদা, তোমার রকম কি ? এই এতবড় অপমান-টাও হজম করে' ফেলবে ? বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে বারিসিনিদের কি সাধা হ'ত যে আমাদের কোনো জন্তুর গায়ে হাত তোলে ?

অর্সো বলিল—আমি ত তোকে প্রতিজ্ঞা করেই বলেছি যে এর জন্তে ওদের অমুতাপ করিয়ে তবে ছাড়ব। কিন্তু যে কাপুরুষদের অবোলা জন্তু ভিন্ন মানুষের সঙ্গে লড়াই করবার সাহস নেই, তাদের শাস্তি দেবার উপযুক্ত লোক পুলিশ আর জেলচৌকীদার। আদালতে এর বিচার হবে... আর যদিই সেখানে সুবিচার না হয়, তবে তখন আমাকে তোর স্বরণ করিয়ে দিতে হবে না যে আমি ব্যাটাছেলে...

কলোঁবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উদাস মনে আপন-আপনি বলিয়া উঠিল—উঃ কী ধৈর্য্য !

অর্সো বলিতে লাগিল—দেখ, কলোঁবা, তোকে বলে রাখছি, আমি কিরে এসে যদি দেখি যে তুই বারিসিনিদের বিরুদ্ধে কোনোরকম কাজ করেছিস, তা হ'লে আমি ককখনো তোকে ক্ষমা করব না।

তারপর একটু নরম স্বরে অর্সো বলিল—আমি



কর্নেল নেভিল আর তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়েই হয়ত ফিরব; দেখিস, তাদের ঘর যেন ঠিক সাজানো থাকে, খাবার দাবারের যেন বেশ জোগাড় হয়, আর আমাদের গৃহকর্ত্রী যেন মেজাজটা একটু মোলায়েম না হোক কম চড়া করে' রাখেন। দেখ্ কলোঁবা, সাহসী হওয়া খুব ভালো, কিন্তু মেয়েদের ঘরকন্নার কাজও একটু জানা দরকার। আচ্ছা, এখন তবে চল্লাম; শান্তশিষ্ট হয়ে থাকিস, লক্ষ্মীটি; শাদা ঘোড়াটার জিন কষা হয়ে গেছে।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তোমার একলা যাওয়া হবে না।

—না না, আমার সঙ্গে কোনো লোক যাবার দরকার নেই; তুই নিশ্চিত থাক, আমার কান কাটতে কেউ সাহস করবে না।

—না না, এই বিষম শত্রুতার সময় আমি তোমায় কখনই একলা ছেড়ে দেবো না। এই গ্রিফো, ক্রাঁসে, মেমো, ওরে তোদের বন্দুক নিয়ে আয়; তোরা দাদার সঙ্গে যা।

খুব খানিক বাক্বিতওয়ার পর ক্লান্ত হইয়া অর্সো অগত্যা বাধ্য হইয়া লোক সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইল; পাইক বরকন্দাজের মধ্যে যাহারা উচ্চরোলে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল, অর্সো বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকেই দূরে রাখিবার জন্ত সঙ্গে লইয়া চলিল; এবং পুনরায় তাহার ভগিনী ও অপরাপর পাইকদিগকে শাস্ত হইয়া থাকিতে অহুরোধ করিয়া ঘুরপথে বারিসিনিদের বাড়ী এড়াইয়া অর্সো রওনা হইয়া গেল।

পিয়েত্রান্‌রা হইতে কিছু দূরে একটা সোঁতা পার হইবার সময় গ্রিফো দেখিল কতকগুলো শূওর কাদা মাখিয়া জলে ছটাপুটি করিয়া খেলা করিতেছে। গ্রিফো দলের সেরা বড় শূওরটাকে টিক করিয়া এক গুলিতেই মারিয়া ফেলিল। শূওরটার সঙ্গীরা নিতান্ত কাপুরুষের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কেহই আর সঙ্গীর দিকে না তাকাইয়া যে যার প্রাণ লইয়া চোঁচা দৌড় দিল; এবং অপর পাইক তাহার বন্দুক যখন ছুড়িল তখন তাহার ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দিয়া নিরাপদ হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

অর্সো বলিয়া উঠিল—গাধারা! ওগুলো কি হরিণ? ও যে শূওর!

গ্রিফো বলিল—হাঁ হজুর, শূওরই তা। ওগুলো দারোগার পোষা—আমাদের ঘোড়ার কানকাটার একটু শোধ নিলাম।

অর্সো রাগে পানলের মতো হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—পাজি কাঁহাকা! তোরাও শেষে শত্রুর কাপুরুষতার নকল করলি! বেরো পাজিরা, বেরো আমার সামনে থেকে, দূর হ দূর হ! তোদের নিয়ে আমার কিছু দরকার নেই। তোরা শূওরের সঙ্গেই যুদ্ধ করবার যোগ্য। খবরদার বলছি, তোরা যদি আমার পেছনে এক পা আসবি ত আমি তোদের মাথা ভেঙে দেব—না দিই ত আমার অতিবড় দিবি।

পাইক দুজন অপ্রতিভ হইয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। অর্সো ঘোড়ার পেটে পায়ের জুতো লাগাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গ্রিফো বলিল—ভালা এ এক মজা দেখছি! যারা তোমার এমন সর্বনাশের চেষ্টায় ফিরছে, তাদের জন্তে এত দরদ!...আঃ! অমন মোটাসোটা শূওরটা, গুলি না করে' কি থাকা যায়? আবার শাসানো হ'ল যে মাথা ভেঙে দেবেন, মাথাটা খালি ফুকো শিশি আর কি! মেমো, যুরোপে এই রকমই শিক্ষে হয়।

—তাই বটে! যদি ওরা জানে যে তুমি শূওর মেরেছ, তা হ'লে ওরা মকদ্দমা করবে, আর ঐ অর্সো মিঞা জজ্বেব কাছে দেবে সাক্ষী, আর খেসারত! ভাগিয়াস্ কেউ দেখেনি, দেবতা পীরের আশীর্বাদে বড় বেঁচে যাওয়া গেছে।

তারপর অল্প যুক্তি পরামর্শ করিয়া পাইক দুজন ঠিক করিল যে শূওরটাকে একটা খানায় ফেলিয়া দেওয়াই নিরাপদ। সঙ্কল্প যেই করা অমনি তামিল। রেবিয়া ও বারিসিনির বিবাদের মধ্যে পড়িয়া নিরীহ শূওর বেচারার প্রাণের উপর দিয়াই সমস্ত চোটটা কাটিয়া গেল।

(.৮)

অর্সো তাহার বেয়াদব অহুচরদের তাড়াইয়া দিয়া আপন মনে লিডিয়ার দর্শন লাভের সম্ভাবনার আনন্দে

মশগুল হইয়া পথ চলিতে লাগিল ; গাধে যে শক্রর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এ সম্ভাবনার চিন্তার লেশ মাত্রও তাহার মনে ছিল না। সে আপন মনে ভাবিতেছিল—“বারিসিনির নামে নালিশ করিবার জ্ঞান আমায় ত বাস্তিয়া মহকুমায় যাইতেই হইবে, তবে লিডিয়ার সঙ্গেই কেন না যাই ? বাস্তিয়া হইতে আমরা দুজনে একসঙ্গে ওরেজ্জার সমুদ্রটাই বা না দেখিয়া আসিব কেন ?” অর্সোর শৈশবস্মৃতি মনে পড়িয়া গেল, ছেলেবেলায় ওরেজ্জার সমুদ্রতীর কী সুন্দরই না লাগিয়াছিল ! সে কল্পনা করিতে লাগিল, এক সার বাদাম গাছের উঁচায় তলায় একখানি যেন সবুজ ঘাসের বনাত বিছানো, তাহার উপর লিডিয়ার হাসিতরা নীল চোখের মতো সুন্দর-নীল নীল ফুলের বুটি—তাহার মধ্যে সে লিডিয়াকে সন্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। লিডিয়া তাহার টুপি খুলিয়া-ফেলাতে তাহার রেশমের গুচ্ছের মতো চিকণ ও উজ্জ্বল, কাকের ডানার মতো কালো চুলের রাশ, তাহার পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং বাদাম-গাছের পত্রাবকাশ দিয়া কুচি কুচি রৌদ্র আসিয়া চুলের উপর চুমা খাইয়া চিক চিক করিতেছে ; আর, পাতার ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ নীল আকাশের খণ্ডগুলির চেয়েও লিডিয়ার চোখ দুটি তাহার কাছে বেশী স্বচ্ছ ও নীল মনে হইতেছে। লিডিয়া এক হাতের উপর গাল রাখিয়া প্রসন্ন তন্দ্রতার সহিত অর্সোর ভাবকল্পিত কণ্ঠের প্রণয়প্রলাপ শুনিতেছে। আজাক্সিয়োতে শেষ দিন লিডিয়া যে মসলিনের পোষাকটি পরিয়াছিল, তাহাই আজও তাহার পরণে ; তাহার সেই শুভ্র লঘু কুঞ্চিত বস্ত্র-জালের ভিতর হইতে দুখানি অতুল কোমল পদতল কালো মকমলের হাঁকা জুতার বুকের উপর লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অর্সোর মনে হইতে লাগিল সে এই পদতলে পড়িয়া একবার সেই চরণটিকে চুষন করিতে পারিলে বর্জিয়া যায়। অর্সো যেন একটি ফুল তুলিয়া লিডিয়াকে দিতে গেল, লিডিয়া সেই ফুলটি লইতে হাত বাড়াইল, এবং অর্সো ফুলের বদলে ফুলের মতন সেই হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া আবেগভরে চুষন করিল, তাহাতে লিডিয়া কিছুমাত্র বিরাগ প্রকাশ করিল না।

এই-সমস্ত সুখকল্পনার সে তন্দ্র হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতেছিল, পথের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে কল্পনায় দ্বিতীয়বার লিডিয়ার শুভ্র সুন্দর হাতখানিকে চুষন করিবে এমন সময় সে সত্যসত্যই ঘোড়ার মাথা চুষন করিল,—ঘোড়া হঠাৎ ধমকিয়া দাঁড়াইল, আর অর্সো ঘোড়ার ঘাড়ে হাড়ি খাইয়া পড়িল। খুকি শিলিনা ঘোড়ার পথ আঙলিয়া লাগাম ধরিয়া ঘোড়া থামাইয়াছে।

শিলিনা বলিল—দাদাঠাকুর, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ? আপনার শক্ররা এই কাছাকাছি ঘুরছে, সে খবর কি রাখেন না ?

অর্সো অমন সুখের মুহূর্তে বাধা পাইয়া রাগে গসগস করিতে করিতে বলিল—আমার শক্র ! কোথায় তারা ?

—অলান্দিক্সিয়ো এই কাছেই কোথায় আছে ; সে আপনার অপেক্ষাই করছে। ফিরে যান, ফিরে যান।

—আ ! আমার অপেক্ষা করছে ? তুমি তাকে দেখেছ ?

—হাঁ দাদাঠাকুর, আমি স্ত্রীওয়ার ওপর গুয়ে ছিলাম, ও এদিক দিয়েই দূরবীন কষে চারিদিক দেখতে দেখতে গেল।

—কোন দিকে গেল সে ?

—ঐ দিকে, যেদিক পানে আপনি যাচ্ছিলেন।

—আচ্ছা বেশ।

—দাদাঠাকুর, কাকার জন্যে একটু অপেক্ষা করে' গেলে হ'ত না ? তার আসতে দেরি হবে না, সে সঙ্গে থাকলে আর কোনো বিপদের ভয় থাকবে না।

—ভয় কি শিলি ? তোমার কাকার আর সঙ্গে যেতে হবে না।

—তা হলে আমি আপনার আগে আগে যাই চলুন।

—না না, তোর আর কষ্ট করতে হবে না, থাক থাক।

অর্সো ঘোড়া ছুটাইয়া শিলিনার নির্দিষ্ট দিকে চলিয়া গেল। প্রথমেই তাহার মন অল্প উন্মত্ততার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং তাহার মনে হইল দৈব তাহাকে সুযোগ জুটাইয়া দিয়াছে, যে কাপুরুষ একটা

ঘোড়াকে অদহীন করিয়াছিল তাহার অদহানি করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই তাহার মনে হইল যে সে ইচ্ছা করিয়া কোনো রূপ শক্রতা সাধন করিবে না, স্বীকার করিয়াছে; অধিকন্তু লিডিয়ার সহিত সাক্ষাতে বিলম্ব হইবার বা বাধা পড়িবার ভয় হইল; তখন তাহার ভাবের পরিবর্তন হইল, এবং তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে অলান্দিক্‌সিয়োর সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই ভালো হয়। কিন্তু আবার পরক্ষণেই তাহার পিতার স্মৃতি, তাহার ঘোড়াকে অপমান, বুড়া বারিসিনির ভয়-দেখানো মনে পড়াতে তাহার রক্ত আবার গরম হইয়া উঠিল এবং সে শক্রকে সন্মান করিয়া যুদ্ধে বাধ্য করিবার জন্ত ছুটিয়া চলিল। এই রকম বিরুদ্ধ ভাবে উত্তেজিত হইয়া সে সম্মুখেই অগ্রসর হইয়া চলিল বটে, কিন্তু খুব সাবধানে, প্রতি ঝোপ ঝাড়, বেড়া আড়াল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া দেখিয়া এবং সামান্য শব্দেও দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিয়া শুনিয়া চলিতে লাগিল। শিলিনার নিকট হইতে দশ মিনিটের পথ অগ্রসর হইয়া, বেলা প্রায় নটার সময়, সে একটা একদম খাড়া পাহাড়ের ধারে আসিয়া পড়িল; যে পথ দিয়া যাইতেছিল তাহা কোনো বাধা পথ নয়, লোকের পায়ে পায়ে মাঠের বৃকের উপর একটা ক্ষীণ রেখার আভাস মাত্র; সেই পথটা সত্ত-পোড়ানো একটা বনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই জায়গাটার উপর ছাই কয়লা ছড়ানো, এখানে সেখানে আধপোড়া ঝোপঝাড়, পাতাশূন্য আধপোড়া গাছ, কোনোটা মরিয়া গিয়াছে, কোনোটা আমলিয়া পড়িয়াছে। এ রকম পোড়া বনের মধ্যে আসিলে উত্তর দেশের শীতের ছবি মনে পড়ে, সেও এমনি রিক্ত, এমনি শ্রীহীন ছন্নছাড়া; কিন্তু আঙনের জিহ্বালেহনে স্থানের ও উদ্ভিজ্জলীর যে দুর্দশা ঘটে তা যেন অধিকতর চক্ষুপীড়াদায়ক। কিন্তু অর্সো তাহা দেখিয়া বরং খুসিই হইল, এখানে কাহারো লুকাইয়া ছিপাইয়া থাকার সম্ভাবনা নাই। এবং যাহার প্রতি-পদে আশঙ্কা হইতেছে কোন্ অতর্কিত স্থান হইতে অলন্ধিতে বন্দুকের নল মাথা উঁচাইয়া তাহার বৃকের দিকে তাগ করিবে, তাহার কাছে উদ্ভিজ্জশোভা অপেক্ষা অবাধদৃষ্টি মরু প্রান্তর অধিক মনোরম মনে হওয়া নেহাৎ অস্বাভাবিক নয়। এই পোড়া

বনটার পরে কয়েকখানা চষা ক্ষেত, বুক-সমান উঁচু পাথরের বেড়া দিয়া বেয়া। ছধারি ক্ষেতের বেড়ার মাঝখান দিয়া পথ; পথের ধারে ধারে বাদামের গাছ এলোমেলো জন্মিয়াছে, দূর হইতে দেখিলে একটা নিবিড় জঙ্গলের মতোই দেখায়।

সেই জায়গাটা চড়াই বলিয়া অর্সো ঘোড়ার গলার উপর লাগাম ফেলিয়া দিয়া লাফাইয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল; বেড়ার কাঁকে কাঁকে ডান হাতি মোড় ফিরিয়া কুড়ি কদম যাইতে না যাইতে সে দেখিল ঠিক তাহার সামনে বেড়ার পাশ হইতে একটা বন্দুকের নল ও একটা মাথা উঁচু হইয়া উঠিল। অর্সো চিনিল, অলান্দিক্‌সিয়ো তাহাকে গুলি করিবার জন্ত তাগ করিতেছে। অর্সো চট করিয়া আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, এবং উভয়েই কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃত্যু দান বা গ্রহণের জন্ত আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে লাগিল।

অর্সো গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—হতভাগা কাপুরুষ কোথাকার!

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই অর্সো অলান্দিক্‌সিয়োর বন্দুকের মুখে আঙনের বলক দেখিতে পাইল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বা হাতি বেড়ার আড়াল হইতে আর একটা বন্দুক আওয়াজ হইল, কিন্তু কে যে আওয়াজ করিল তাহা বুঝা গেল না, লোকটা ধোঁয়ার আড়ালে লুকাইয়া ছিল। দুটো গুলিই আসিয়া অর্সোকে লাগিল; অলান্দিক্‌সিয়োর গুলিটা তাহার বাঁ হাত এপার ওপার ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, অপর গুলিটা বৃকে আসিয়া লাগিয়া জামা ছিঁড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ভাণ্যক্রমে তাহার ছোরার ফলার উপর গিয়া লাগাতে গুলিটা পিছলাইয়া তেবুছা হইয়া বাহির হইয়া গেল, তাহাতে খানিকটা চামড়া আঁচড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু সাংঘাতিক আঘাত করিতে পারিল না। অর্সোর বাঁ হাতটা অসাড় হইয়া বুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বন্দুকের নলটাও নীচু মুখে ঝুঁকিয়া গেল; কিন্তু সে এক হাতেই তাহার প্রকাণ্ড বন্দুকটা আবার চালাইয়া অলান্দিক্‌সিয়োকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। অলান্দিক্‌সিয়োর মাত্র চোখ দুটি পর্যন্ত বেড়ার উপরে জাগিয়া

ছিল, বন্দুকের আওয়াজ হইতেই তাহাও বেড়ার আড়ালে ডুবিয়া গেল। তখন অর্সো বা দিকে ফিরিয়া বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় গুলি আওয়াজ করিল; অমনি বন্দুকের ধোঁয়ার আড়ালে আবছায়া একজন লোক বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। এই চারটি বন্দুকের আওয়াজ এমন উপরা-উপরি হইয়াছিল যে কাওয়াজের সময় হুকুম পাওয়া মাত্র সৈন্তশ্রেণীর বন্দুকও এমন যুগপৎ আওয়াজ হয় কিনা সন্দেহ। অর্সোর দ্বিতীয় আওয়াজের পরে সব চূপচাপ। অর্সোর বন্দুকের ধোঁয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শূণ্ণে উঠিয়া যাইতেছিল; বেড়ার পাশে কোনো সাড়া শব্দের লেশ মাত্র নাই। তাহার হাতের বেদনাটা নিতান্ত রুঢ় সত্য বলিয়া মনে না হইলে অর্সো হয়ত ভাবিতে পারিত যে ইহা স্বপ্ন, ইহা তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা, অথবা ইহা মায়্যা—নতুবা তাহার শত্রুরা অকস্মাৎ কোথায় নিঃশব্দে অন্তর্ধান করিল ?

আবার যদি বন্দুক ছোড়ার দরকার হয়, এজন্য অর্সো তাড়াতাড়ি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা পোড়া গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে বন্দুক ধরিয়া এক হাতেই চটপট বন্দুকে আবার টোটা ভরিয়া ফেলিল। তাহার বাঁ হাতটায় অসহ যন্ত্রণা হইতেছিল, এবং মনে হইতেছিল যেন সেই হাতখানা বিষম ভারি বোঝা হইয়া বুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার শত্রুরা সব গেল কোথায় ? তাহা সে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না। যদি তাহার পলায়নই করিত, বা তাহার আহত হইয়াও পড়িত তাহা হইলে কোথাও ত একটুও শব্দ শোনা যাইত ? এ যে একেবারে চূপচাপ ! তবে কি তাহার মরিয়াছে ? না, তাহার আবার গুলি করিবার প্রতীক্ষায় বেড়ার আড়ালে ঘুপটি মারিয়া চূপটি করিয়া আছে। এইরূপ সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া অর্সো যাইতেও পারিতেছিল না, থাকিতেও পারিতেছিল না; অথচ তাহার বোধ হইতেছিল যে সে রক্তস্রাব দ্বারা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে; তখন সে মাটিতে ডাহিন হাঁটু গাড়িয়া বাঁ হাঁটু উঁচু করিয়া বসিল, এবং বাঁ হাঁটুর উপর আহত বাঁ হাতখানা শোয়াইয়া দিয়া একটা গাছের কঁকড়ি ডালের সন্ধির উপর বন্দুকটা

ঠেকনো দিয়া বসাইয়া, বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল, বেড়ার উপর দৃষ্টি, সামান্য শব্দের দিকে কান সতর্ক করিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া কয়েক মিনিট রহিল—কিন্তু তাহাতেই তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে শত শতাব্দী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় তাহার পশ্চাতে কাহার উচ্চ ডাক শোনা গেল, এবং একটা কুকুর খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া তীরের বেগে নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। এ ত্রিস্কা, ফেরারীদের সাকরেদ ও সঙ্গী। সে তাহার প্রভুর আগমনেরই অগ্রদূত। অর্সো উৎসুক হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এমন উৎসুক্য আর কখনো কোনো লোকের জন্য কাহারো হইয়াছে কি না সন্দেহ। কুকুরটা পাশের বেড়ার দিকে ফিরিয়া খুঁতি উঁচু করিয়া বাস্তব ভাবে বাতাস শুঁকিতে লাগিল। অকস্মাৎ সে গুমরাইয়া ডাকিতে ডাকিতে এক লাফে দেয়ালের মাথায় উঠিল, এবং সেখান হইতে তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটোতে বিষয় ভরিয়া অর্সোর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; অল্পক্ষণ পরেই সে নাক আকাশে তুলিয়া অপর দিকের দেয়ালের মাথায় লাফাইয়া গিয়া কিসের গন্ধ যেন শুঁকিতে লাগিল। তারপর সে বিষয় ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে অর্সোর দিকে তাকাইতে তাকাইতে দুই পায়ের মধ্যে ল্যাজ গুটাইয়া পিছু হটিয়া হটিয়া গুটি গুটি অর্সোর নিকট হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিছু দূরে গিয়াই যেমন বেগে নামিয়া আসিয়াছিল তেমনি বেগে এক ছুটে খাড়া পাহাড়ে উঠিয়া যে একজন লোক খাড়া পাহাড় বাহিয়া নামিয়া আসিতেছিল তাহার কাছে গিয়া জুটিল।

সেই ব্যক্তি একটু নিকট হইলে অর্সো যখন বুঝিল যে সে তাহার কথা শুনিতে পাইবে, তখন অর্সো তাহাকে ডাকিয়া বলিল—ব্রান্দো, এই যে আমি এখানে!

ব্রান্দো বেদম হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—  
আহা হা অর্সো আস্তো! আপনি জখম হয়েছ! গায়ে, না হাত পায়ে ?.....

—হাতে।

—হাতে ? ও তবে কিছু নয়। আর কোথাও ?

—বোধ হয় সে একটু ছুঁয়ে গেছে মাত্র।

ব্রান্দো তাহার কুকুরের অহুসরণ করিয়া পাশের বেড়ার ধারে দৌড়িয়া গিয়া ওপারে নীচের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল, এবং মাথার টুপি খুলিয়া শ্বেষের স্বরে বলিয়া উঠিল—অলান্দিক্সিয়ো সাহেব, সেলাম সেলাম।

তারপর অসেরাঁর দিকে ঘুরিয়া তাহাকে সমস্তম্বে সেলাম করিয়া গভীর স্বরে বলিল—একেই ত বলে মরদ-বাচ্চা!

অসেরাঁ কষ্টে নিশ্বাস লইয়া বলিল—কি রে, ওটা কি এখনো বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ বেঁচে থাকবে বৈ কি? জীবনকে সে আর এজন্মে কাছে ভিড়তে দেবে না! যে গুলি ওকে ঠুকেছ, একেবারে কানপটিতে! তাতে ও মনে মনে তারি খাপ্পা হয়ে আছে। বাপ! কী গর্ভই হয়ে গেছে! আচ্ছা বন্দুক যা হোক তোমার! ক্যায়সা জোর! একেবারে মাথার বিলু বা'র করে' দিয়ে ছেড়েছে! সত্যি, প্রথমে যখন আমি গুনলাম বন্দুকের আওয়াজ—পট! পট! আমি মনে করলাম ওরা আমার লেফটেন্যান্টকে খুন করলে বুঝি! তারপর গুনলাম ছড়ুম! ছড়ুম! ভাবলাম, যাক্, আমার লেফটেন্যান্ট সাহেবের ইংরেজ-তৈরী বন্দুক জবর রকমের জবাব দিয়েছে।..... আচ্ছা ব্রিস্কো, এখন আর কি করতে হবে?

কুকুর তাহাকে অপর ক্ষেতের বেড়ার ধারে লইয়া গেল।

ব্রান্দো হতভম্ব হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ! ছ-গুলি আর ব্যস সব খতম! বারুদ বড় মাগ্গী জিনিস, তাই আপনি অল্পেই কাজ সেরেছ দেখছি!

অসেরাঁ জিজ্ঞাসা করিল—ওরে ব্যাপার কি?

—লেফটেন্যান্ট, তোমার ঠাট্টা মস্করা রাখ! যেন কিছুই জানেন না! শিকার মাটিতে পেড়েছ আর কি? এখন কুড়িয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাবার ওস্তা। ...আহা, আজকে তোমার ভাগ্যে এমন শিকার জুটল, আর বুড়ো বারিসিনি বেচারী কসাইয়ের দোকানের মাংস খেয়েই পেট ভরাবে! আহা বেচারাকেও নেমস্তন্ন কোরো! আমি ভাবছি এখন কোন্ সময়তান ওর বিষয় খাবে আর বুড়োকে পিণ্ডি খাওয়াবে?

—কি! ভ্যাঁসাস্তেলোও মরেছে?

—একদম! আপনার দয়া খুব, ওদের আর মরতে বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। দেখ'সে অসেরাঁ আস্তো দেখ'সে ভ্যাঁসাস্তেলো ছোঁড়ার রকম! এখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, যেন ঘুমানো হচ্ছে! সীসের গুলির নি'ছটি মস্তুর! মহানিদ্রা এনে দিয়েছে! আহা বেচারী!

অসেরাঁ ভয়ে মুখ ফিরাইয়া বলিল—সত্যিই কি ও-ও মরেছে?

—আপনি যেন ঠিক সাম্পিরো কসেরাঁ, একগুলির বেশি খরচ কর না। ঐ যে বাঁ দিকে বুকের ওপর গুলিটা দেখছ, ও কলিজা থেকে বেশি দূর দিয়ে যায় নি; ওয়াটার্লু যুদ্ধে আমাদের ভ্যাঁসিলিওন অমনি করেই কাবু হয়েছিল। ছ-গুলি! ব্যস, ছ-গুলিতে দুজন কাত! এক এক ভাই এক এক গুলি! তেনলা বন্দুক হ'লে বুড়ো বাপটাও এই সঙ্গে সাবাড় হয়ে যেত! পরে হবে!... অসেরাঁ আস্তো, আচ্ছা লাগান লাগিয়েছ!...এমন ভাগ্য কি আমার হবে, দুই গুলিতে ছ দুটো ছষমন শিকার করব?

ব্রান্দো অসেরাঁর হাত পরীক্ষা করিয়া তাহার ছোরা দিয়া তাহাকে একটা লাঠি কাটিয়া দিয়া বলিল—ও কিছু নয়! এই জামাটা কলোঁবা ঠাকরণের একটু কাজ বাড়াবে, তাঁকে খানিকটা রিফুক্স করতে হবে। ...আহা! এ কি? বুকের ওপর জর্ধম হয়েছে? কিছু ঢোকেনি ত ওখানে? নাঃ, তোমার এমন হাসিখুসি ভাব আমার ভালো লাগছে না। দেখি দেখি, তোমার আঙুল দেখি, আমি কামড়াছি, লাগছে?...বেশি লাগছে না? না না, ও বেশি কিছু নয়। তোমার রুমাল আর গলাবন্দ খুলে আমায় দাও। জামাটা ত একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ..আচ্ছা, এমন বাবু সেজে যাওয়া হচ্ছিল কোথায়? বিয়ে করতে?...এস, এক চুমুক মদ খাও দেখি।...সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে বেড়াও না কেন? কসিক কখনো বোতল ছাড়া চলে?

ব্রান্দো অসেরাঁর ধারে পটি বাধিয়া দিতে দিতে আবার হঠাৎ বলিয়া উঠিল—ডবল গুলি! ডবল শিকার

একেবারে মরে' আকাট !...আঃ পণ্ডিতজী কী হাসিটাই হাসবে !...ডবল গুলি ! হাঁ, হাসবার আর-একজনও আছে, শিলিনাও খুব হাসবে !

অসেী এ কথাই কোনো জবাব দিল না। সে শবের আয় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্বদা তাহার ধরধর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ব্রান্দো বলিল—শিলি, বেড়ার ওপারে দেখত রে। কি ? অঁয়া ?

বালিকা হাতে পায়ে দেয়াল ধরিয়া আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া কুলিয়া উঠিয়া অলান্দিকসিয়োর শব দেখিয়া আঁচকাইয়া উঠিল।

ব্রান্দো বলিল—শুধু এই নয়, এ বেড়াটার পাশেও দেখ্।

বালিকা পুনরায় আঁচকাইয়া উঠিল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কাকা, এ কি তোমার কাজ ?

—আমি ! কেন আমি বুড়া হয়েছি বলে' কি আর ওকাজ আমি করতে পারি নে ? শিলি, ও এঁর কাজ। তুই এঁকে ধন্যবাদ দে।

শিলিনা বলিল—কলোঁবা দিদি খুব খুসি হবেন ; কিন্তু আপনি জখম হয়েছেন দেখে ভারি কষ্টও হবে তাঁর।

ব্রান্দো অসেীর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করিয়া বলিল—চল অসেী আস্তো, শিলিনা তোমার ঘোড়া ধরে' এনেছে। চড়ে' বস ; আমার সঙ্গে স্ত্রাজোনার জঙ্গলে এখন আস্তানা গাড়বে চল। সেখান থেকে তোমায় যে খুঁজে বা'র করতে পারবে সে কম ধড়িবাজ নয়। আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব দিয়ে তোমার সেবা করব। সেন্ট-ক্রিষ্টিনের ক্রেশের কাছ থেকে হেঁটে যেতে হবে, তখন শিলিনার হাতে ঘোড়াটা দিয়ো, ও কলোঁবা ঠাকরুণের কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাবে, আর তোমার যদি কোনো ধর দেবার থাকে তাও দিয়ে আসবে, তুমি শুধুকে সব কথাই বিশ্বাস করে' বলতে পার, ওকে কুচি কুচি করে' কেটে খুড়ে ফেললেও ও বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না।

অসেীর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে' শিলিনাকে বলিল—দুট

মেয়ে, যাবি, কিন্তু দেখিস নিমকহারাম হবি, সন্নতানী হবি, সর্বনাশ করবি, বুঝলি ?

ব্রান্দোর মনেও সাধারণ ফেরারীদের মতো কুসংস্কার ছিল যে কোনো শিশুকে আশীর্বাদ করিতে হইলে বা প্রশংসা করিতে হইলে যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহার উল্টা বলিতে হয় ; তাহা হইলে দৈব তাহা স্নু-কানে শোনে, মনের মানে বোঝেন ; কিন্তু সন্নতান যদি শোনে ত কথাই মনের কামনা বলিয়া ভুল করিয়া পাছে উহাতেই লোকের ভালো হয় তাই উহার উল্টাটাই হইবার পক্ষে সাহায্য করে।

অসেী অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—ব্রান্দো, আমি এখন কোথায় যাব ?

—হ্যা দ্যাখ ! তা আমি কেমন করে জানব ? সে তোমার যেমন ইচ্ছে - জেলে, নয় জঙ্গলে। কিন্তু রেবিয়া-বংশের কেউ ত জেলের পথ চেনে না। তবে আর কোথায় যাবে, জঙ্গলেই যেতে হয়।

অসেী হতাশাকাতর ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—তবে বিদায় আমার সকল আশা ভরসা, সুখের স্বপ্ন, আনন্দ উল্লাস, তোমাদের কাছে এই আজ চিরবিদায় !

—আপনার আশা ভরসা, সুখ আনন্দ ? আ আমার পোড়া কপাল ! দোনলা বন্দুকের দুই গুলিতে যা করেছ তার চেয়েও আরও বেশি কিছু আনন্দের আশা রাখ নাকি ?...আর ওরা ! তোমার গা একটু ছুঁয়ে গেছে মাত্র ! ওরা ভারি মজার মানুষ ছিল, কিন্তু বেরাল-ছানার চেয়ে ওদের প্রাণগুলো আর একটু টনকো হলে বেশ হ'ত।

অসেী বলিল—ওরাই আমাকে প্রথমে গুলি করেছিল।

—হাঁ হাঁ, আমি বিশ্বরণ হয়ে যাচ্ছি।...আগে, পট ! পট ! তারপর, দুড় ম ! দুড় ম ! ডবল গুলি এক হাতে !... এর চেয়ে' কেবুমৎ যদি কেউ দেখাতে পারে ত আমি আমার প্রাণ বাজি রাখতে রাজি আছি। এস, এখন চড়ে পড়... ; যাবার আগে একবার তোমার নিজের হাতের কাণ্ডখানা দেখে নাও। ওদের একলাটি তেপান্তর মাঠে ফেলে রেখে যাচ্ছি, বিদায় না নিয়ে যাওয়া কি তদ্রতাসঙ্গত হবে ?

অসেঁ ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো লাগাইয়া ছুটাইয়া দিল; যে হতভাগাদের সে নিজের হাতে বধ করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী পাইলেও সে তাহাদের দিকে তাকাইতে পারিত না।

ব্রান্দো ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—আরে থাম থাম, তোমাকে কি আবার খোলসা করে' বলতে হবে? তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি নে, কিছু মন্দ ভেবেও বলছি নে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এই ছেলে ছটোর জন্তে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে। আমার মাপ কোরো...কিন্তু অমন সুপুরুষ,... অমন জোয়ান...অমন ছোকরা বয়েস!...কত বার অল-ম্বিকুসিয়োর সঙ্গে আমি শিকার খেলেছি।...এই সবে চার দিন হ'ল ও আমাকে এক বাঙালি চুরুট দিয়েছিল। ...ভ্যাঁসান্তেলো ছোঁড়াও তোফা খোসমেজাজের লোক ছিল!...তোমার যা করা উচিত ছিল তুমি তাই করেছ, আর তাগ এমন মক্খম করেছ যে কারো আপশোষ করবারও কারণ নেই;...কিন্তু তবু আমার সঙ্গে ত তাদের কোনো বিবাদ ছিল না!..আমি জানি তোমার রাগের কারণ আছে; শত্রু যদি থাকে তবে শত্রু নিপাতই করতে হয়। কিন্তু বারিসিনিবংশ পুরোণো বনিয়াদি বংশ।..সে বংশটা একেবারে লোপ পেয়ে গেল...আর, মাত্র দু গুলিতে! এটা বড় আপশোষের বিষয়!

ব্রান্দো এই কথায় বারিসিনিবংশের তর্পণ শেষ করিয়া অসেঁ শিলিনা ও কুকুর ত্রিস্কোকে লইয়া দ্রুতপদে স্তাজোনার জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনিয়ন্ত্রিত রাজশাসনতন্ত্র। রাজার ক্ষমতা এই ক্ষমতা হইতে বিপদের সন্ধান। বিদ্রোহ। অপরাধ। প্রথম-সম্রাটদিগের চরিত্র।—প্রাসাদ—শিবির।—রাজার জীবনযাপন-পদ্ধতি।—অন্দর-মহল।—সম্রাটের অধীনস্থ জায়গীরদার।—উৎসবাদি।

সাম্রাজ্যের কল্যাণসাধন ও শাসনের সুব্যবস্থা—সমস্তই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিত। সমস্তই সম্রাটের ক্ষমতাসীম, সমস্তই তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু ও মুসলমান জায়গীরদার, এবং যে-সকল প্রাদেশিক শাসন-কর্তা বিদ্রোহের জন্ত উদ্বৃত—সকলেই একমাত্র সম্রাটকেই মানিয়া চলিত। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি তিনিই কেবল নিবারণ করিতেন। চতুর্দশ লুইর রাজদরবার অপেক্ষাও মোগল-বাদশার রাজদরবার রাষ্ট্রের প্রকৃত কেন্দ্র ছিল। আরংজেবের আমলে দুই শত কোটি মুদ্রার অধিক রাজস্ব রাজকোষভুক্ত হইত এবং কোন উপঢৌকন না লইয়া কেহ সম্রাটের সমীপে গমন করিতে পারিত না। একটিবার মাত্র সম্রাটের দর্শন-লাভ করিতে Travernierএর ১২,১১৯ ফরাসী পৌণ্ড-মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া বলেন,—সম্রাটের সাধারণিক উৎসবে উপঢৌকনের মূল্য তিন কোটি পৌণ্ড পর্যন্ত উঠিত (প্রায় আজিকার ৬২, ৫০০, ০০০ ফ্র্যাঙ্ক)। এত অধিক রাজস্বও সম্রাটের খরচ কুলান ভার হইত। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত খরচ, দরবারের খরচ, সৈন্যের খরচ—সমস্তই সম্রাটকেই দিতে হইত। আমীরদিগের অভ্যর্থনার ব্যয়ভারও তাঁহাকে বহন করিতে হইত। অবসর-বৃত্তি লাভে যাহাদের শাসন অধিকার এরূপ অসংখ্য লোক ছিল। আইন-ই-আকবরী এইরূপ চারি শ্রেণীর উল্লেখ করেন; বিদ্বজ্জন, ফকীর, দরিদ্র, ভূসম্পত্তিহীন সম্রাট-ব্যক্তি। Catrou ঠিকই বলিয়াছেন, এই উপকথা-স্বলভ বিপুল অর্থ রাজকোষ দিয়া পায় হইত মাত্র—উহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারিত না। সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সম্রাটের অর্থেই জীবন ধারণ করিত—রাজকর্মচারী, সৈনিক, সমস্ত কৃষক। ভূমি সম্রাটের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। উহার সম্রাটের জন্তই খাটিত এবং উহাদের ভরণ পোষণের ভার ছিল সম্রাটের উপর। এইরূপ সমস্ত নগরের কারিগরেরা :—ইহার সকলেই কাজে ব্যাপ্ত থাকিত, আর সুরকার হইতে বেতন পাইত। আরংজেবের মৃত্যুকালে, রাজকোষে ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

সম্রাট সর্বশক্তিমান হইলেও, কল্যাণ কি ঘটিবে সে

বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেন না।° রাজপ্রাসাদে অবিরাম বড়যন্ত্র, প্রদেশে প্রদেশে বিদ্রোহ। জেহাজির পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র শাজেহানের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শাজেহান গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিজ ভ্রাতাকে বধ করিলেন এবং ভ্রাতৃপুত্রকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। শাজেহান বৃদ্ধ হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা প্রাসাদের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন; পক্ষান্তরে অন্য পুত্রগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। আরংজেব সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইলেন। তিনি দারার শিরশ্ছেদ করিলেন, পিতাকে বন্দী করিলেন, আর দুই ভাইকে হত্যা করিলেন, এবং তাঁহার পরিবারের আর সকলেই দ্রুত বিষপ্রয়োগে নিহত হইল, নয় নির্বাসিত হইল।

যথেষ্টাচারী অনিয়ন্ত্রিত অধিপতি—এই মোগল সম্রাটেরা নিজ নিজ চরিত্রের অনুরূপ, স্বকীয় দরবার ও শাসনতন্ত্র গঠন করিতেন। আকবরের আমলে, জেহাজির গোঁড়া মুসলমানদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যেমন কঠোর-প্রকৃতি সৈনিক তেমন নিপুণ সেনাপতি—আরংজেব বিশ বৎসর কাল শিবিরে-শিবিরে কাটাইয়াছিলেন। তিনি ধর্মোন্মত্ত মুসলমান ছিলেন। যৌবনে দবেশ, সিংহাসনে সন্ন্যাসী;—কেবল নেমাজ পড়িতেছেন—আর ধ্যান করিতেছেন। মদ্য মাংস কখন স্পর্শ করিতেন না; কত মাস উপবাস করিয়া কাটাইতেন; কঠিন ভূমিশযায় শয়ন করিতেন, এবং একপ কঠোরভাবে আত্মনিগ্রহ করিতেন যে কতবার তিনি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ধৈর্য্যাবলম্বী ও কপটাচারী ছিলেন। তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগকে তিনি বলিতেন,—ইহ-জগতের ধন ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। পরে, যাহাকে তিনি বিধর্মী বলিতেন সেই দারার অধর্মাচরণে তিনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্তরালে লোক প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ধৃত করেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসেন, একজন বিশ্বাস-

ঘাতকের দ্বারা দারাকে আত্মসমর্পন করান, এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের গুপ্তঘাতকদিগকে তিনি ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত বৈরনির্ঘাতক বলিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন। অবশেষে যে দিন দারার জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করেন, ঠিক সেই দিনই তাঁহার নিকট জহাদকে পাঠাইয়া দেন।

•••

সম্রাটদিগের চরিত্র যতই বিভিন্ন হউক না, তাঁহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য ছিল। ভারতীয় রাজার প্রধান জিনিস—একটি জঁকাল রাজসভা। মোগল-সম্রাটদিগের প্রাসাদগুলি যার-পর-নাই সুন্দর। আকবর ফতেপুর ও লাহোরে, জাহাজির ও শাজেহান আগ্রার কেল্লায়, এবং আরংজেব জেহানাবাদে অবস্থান করিতেন। শাজেহান পুরাতন দিল্লির সন্নিকটে এই জেহানাবাদ নির্মাণ করেন, পরে এই নগরই আধুনিক দিল্লি হইয়া দাঁড়ায়।

জেহানাবাদের বর্ণনা পাঠ করিলেই পাঠক মোগল প্রাসাদসমূহের নক্সা এবং সম্রাটদিগের বিভব ঐশ্বর্যের একটু আভাস পাইবেন।

দুইটা সিধা রাস্তা, ত্রিশ ফুট চওড়া—তাঁহার ধারে ধারে খিলান-পথ (arcade) ও বিপণিসমূহ। তাঁহার শেষ-প্রান্তে, একটি বৃহৎ প্রাসাদ, লোহিতবর্ণ প্রাকার-বিশিষ্ট দুর্গ—দুর্গের পার্শ্বভাগে কতকগুলি বুরুজ এবং এই দুর্গ পরিধার দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণে ও বামে রাজপুতদিগের তাঁবু। এই রাজপুতেরা নিজ অধিবাসী সম্রাটের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিবে, কিন্তু কোন মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করিতে সম্মত হইবে না।

তাঁবু ও বাজার—এই দুয়ের মাঝখানে,—পশুপ্রদর্শক, বাজিকর ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি। জনতার মধ্য দিয়া নির্দয়-ভাবে পথ করিয়া, অশুচরবর্গের সহিত আশীরেরা অশপৃষ্ঠে চলিয়াছে; গোলাকার পাগড়ী অথবা পারস্যদেশীয় শিরদ্বাণ, কানের উপর সঁজোয়া, নমনীয় বর্ম, গোলাকার স্বর্ণরেখাকিত ঢাল; তাহাদের জম্বা-কবচ ও তলোয়ার,—বর্মের উপর অথবা অশ-সজ্জার উপর আঘাত করিতেছে। তাঁহার পর, পাকীতে শুইয়া হিন্দু রাজারা চলিয়াছে—



শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত, প্যাঁচাল পাগড়ী, কানে কান-বালা, নাকে নথ, পাগড়ীর উপর শিরুপচ্-কঙ্কা, মুদ্রার কণ্ঠহার, হাতে বলয়, পায়ে মল। পান খাইয়া উহাদের দাঁত লাল হইয়া গিয়াছে এবং রূপার পিক্‌দানীতে সর্বদা পিক্‌ ফেলিতেছে। ভূত্যেরা ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজন করিতেছে।

প্রাসাদের বহির্বেষ্টন হইতে বাহির হইবার জন্য খিড়কী-দ্বার ; তাহার দুই পার্শ্বে দুই প্রস্তরময় হস্তী, হস্তীর উপর বিজিত রাজাদিগের প্রতিমূর্তি। দুর্গপ্রাসাদ :—রাজপথ-সমন্বিত একটি নগর, কতকগুলি উদ্যান, খাল, একটি বাজার, সম্রাটের কারখানা—সেখানে অস্ত্রাদি, গালার জিনিস, সোনার সামগ্রী, অলঙ্কারাদি, ছবি, চিকণের কাজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যে পাহাড়ের নীচে যমুনা প্রবাহিত, সেই পাহাড়ের উপর রাজপ্রাসাদ ; বড় বড় প্রাঙ্গণ, তাহার চতুর্দিকে চাঁদনি, খোলা-দালান, মণ্ডপ-গৃহ, রত্ন-খচিত সাদা মর্ম্মর-প্রস্তরের চতুষ্ক। নিদাঘ-যামিনীতে বিশ্রাম করিবার জন্য বারান্দা-ছাদ-ওয়াল। কতকগুলি বাস-গৃহ।

লাল পাথরের বৃহৎ দরবার-শালা—দিওয়ান-ই-আম ; সাদা পাথরের ক্ষুদ্র দরবার-শালা—দিওয়ান-ই-খাস ;— এই দরবার-শালায় প্রসিদ্ধ রত্নখচিত ময়ূর-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল। এই দুই দরবার-শালায় সম্রাট প্রতিদিন স্বীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন। তুরী নিনাদিত হইত, ঢাক-টোল বাজিয়া উঠিত, সেলামী-তোপ ধ্বনিত হইত। উৎসবের সময়, একটা সমস্ত অঙ্গন জুড়িয়া একটা মণ্ডপ-গৃহ খাড়া করা হইত, গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইত। রেশমী কাপড়ে ও কিংখাপে দেয়াল ও খাম অদৃশ্য হইয়া পড়িত। সিংহাসনের উপর সম্রাট উপবিষ্ট, জরির-পাড়-ওয়াল। সাদা সাটিনের পরিচ্ছদ ; আঁটসাঁট ফতুয়া ও পায়জামা। ফুলো জামা : জোড়া হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বমান। রত্নখচিত একটি কোমর-বন্দ, মুক্তার কণ্ঠহার, জরীর পাগড়ী, তাহার উপর শিরো-ভূষণরূপ হীরক-বেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড পোখ-রাজ। সিংহাসনের পাদদেশে, একটা স্বর্ণময় মঞ্চের উপর, জাঁকাল পোষাক পরিয়া আমীর ও রাজারা উপবিষ্ট।

আরও নীচে খুলসবদার ও রাজকর্ম্মচারীগণ। প্রতি বৎসর সম্রাটের জন্মদিনে, মহাগভীরভাবে সম্রাটকে তৌলদণ্ডে ওজন করা হইত। ওজন বৃদ্ধি হইলে, সেই উপলক্ষে খুব আমোদ আহ্লাদ হইত।

পশুর লড়াই আমোদের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, কৃষ্ণসার যুগ, ভারুই, ও তিত্তির পক্ষী রক্ষিত হইত। যমুনার সৈকত-তটে হস্তীর যুদ্ধ হইত। সম্রাট, সভাসদগণ, ও বেগমেরা প্রাসাদের ছাদ হইতে নিরীক্ষণ করিতেন। ইতরসাধারণ দর্শকের অত্যন্ত ভীড় হইত। মধ্যস্থলে একটা মৃত্তিকাস্তূপ থাকিত ! দুইটা হাতী পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইত। প্রত্যেক হাতীর উপর তিন জন কন্নিয়া মাছত। মধুর স্বরে আহুত হইয়া, অঙ্কুশের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া, উহারা পরস্পরের প্রতি দন্তপ্রহার করিতে থাকে, গুঁড়ের দ্বারা প্রতিপক্ষের মাছতকে ধরিবার চেষ্টা করে। মাছত ভূতলে পতিত হইলে তাহাকে পদদলিত করে। ইহারই মধ্যে হস্তীগণ সেই মাটির টিবিটাকে উন্টাইয়া ফেলিয়াছে, পরস্পরের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিতেছে, দন্তের দ্বারা পরস্পরকে ক্রমবিস্কৃত করিতেছে। অবশেষে একটা হস্তী পলায়ন করিল, অপর হস্তীটা প্রমত্তভাবে তাহার অহুধাবন করিতে করিতে যেখানে অখারোহী, রথ ও পদাতিকেরা অধিষ্ঠিত—সেখান পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল। তখন সেই সব লোকেরা ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পলাইতে লাগিল এবং কত লোক ভূতলে পতিত হইয়া একেবারে নিস্পেষিত হইল। (১)

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## পুস্তক-পরিচয়

বাল্লালা শব্দ-কোষ ( দ্বিতীয় খণ্ড )—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম-এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য পরিষদের সদস্যের পক্ষে ১ টাকা ; সাধারণের পক্ষে ১।০ টাকা। রসাল অষ্টাংশিত আকার ২৬৫ হইতে ৫২৮ পৃষ্ঠা।

(১) Tavernierএর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং আইন-ই-আকবরীর হস্তী সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।



বোলপুরে রবীন্দ্র-সঙ্গমে গত ৭ই অগ্রহায়ণে উপস্থিত জনমণ্ডলী।

এই খণ্ডে 'চন্দ্রম' শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পট' শব্দ পর্যন্ত আছে। ইহার প্রথম খণ্ড দেখিবার সুযোগ আমাদের এখনো হয় নাই। যেখানির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারকে আমাদের অসামান্য আনন্দ ও পাঠকসাধারণকে বাংলা ভাষার প্রকৃত অভিধানের অভাব মোচনের শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাসু বিকই বিদ্যানিধি ; তিনি বহুভাষাভিজ্ঞ ; এবং জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন, জড়বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বহুবিদ্যার পারদর্শী। অতএব এক ব্যক্তির কোষসঙ্কলনের গুরুভার গ্রহণ করিতে হইলে তিনিই কোষসঙ্কলনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। বাংলা ভাষার অনেক অভিধান আছে, কিন্তু বাংলা অভিধান নাই বলিলেই হয়। প্রথম বাংলা অভিধান প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন বোধ হয় কেরী ও হটন সাহেব—তাহাদের বাংলা-ইংরেজী অভিধান দুইখানি বহুকাল গুর্কের রচিত হইলেও প্রায় পূর্ণাঙ্গ এবং চমৎকার ; তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী বিদ্যাভিনোদ মহাশয়ের বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধ (বি-ব্যানাজি কোম্পানী) নিহক বাংলা শব্দের অভিধান। সুবোলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধান ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান, আকতোব দেবের প্রকৃতিবোধ অভিধান এবং বি-ব্যানাজি কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণের প্রকৃতিবোধ অভিধান সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অল্প অল্প বাংলা কথাও গ্রহণ করিয়াছে। একখানি সর্বাত্মসম্পূর্ণ বাংলা কোষ গ্রন্থের নিভান্ত অভাব ছিল। যোগেশ বাবু সেই গুরুভার গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য, অবেশণ ও যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ দিয়াছেন। বহু

শব্দের সংস্কৃত, ওড়িয়া, মারাঠী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার তুল্যরূপ দেওয়াতে শব্দের মূল ও ব্যুৎপত্তি ধরা সহজ হইয়াছে ; কিন্তু অধিকাংশ দেশজ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রজুমদার বিভিন্ন সাময়িক পত্রের বহু বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও মূলের ইতিহাস দিতেছেন ; সেগুলি বিচার করিয়া দেখিয়া পরিশিষ্টে সেগুলি সংযোজিত হওয়া আবশ্যিক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যুরোপীয় ও আরবী ফারসী বহু শব্দের বাংলা রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ; সেগুলিরও বিচার আবশ্যিক। যোগেশ বাবু আরবী বা ফারসী শব্দের আদিরূপ অধিকাংশ স্থলেই নির্দেশ করেন নাই, কেবল মূল ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আদিরূপ দেওয়া থাকিলে বুঝা যাইত বাংলায় শব্দবিকার কিরূপে এবং কতখানি পরিমাণে ঘটিয়াছে।

একজনের চেষ্টায় কোষ সঙ্কলন কখনো সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এজন্য গ্রন্থকার সূচনায় লিখিয়াছেন—“বাংলা শব্দকোষ চারি খণ্ডে প্রচার করা যাইতেছে। ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে, এবং সমালোচক মহাশয়ের অনুগ্রহে কোষপরিশিষ্টে দোষ-প্রতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে। শব্দসংগ্রহ, অর্থান্তর প্রকাশ, কিংবা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় একজনের পক্ষে দুস্বহ। আশা আছে দশজনের ভার স্বল্পে লইয়া কোষকার সুমাপ্তিস্থানে বাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিবরে তাঁহার আনুকূল্য দানে পরায়ণ হইবেন না।”

তাঁহার এই আহ্বানে সাহসী হইয়া এবং যোগ্যতার ব্যক্তিকে একাধারে উৎসাহিত করিবার অল্প আদি কতকগুলি নূতন শব্দ, অর্থান্তর ও ব্যুৎপত্তি তাঁহার বিচারের অস্ত উপস্থিত করিতেছি। একেবারে

সর্বত্র অক্ষর পর্যায়ের শব্দ যাচাই, বাছাই ও প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি ক্রমশ প্রতি মাসে মাসে এই কার্য্য করিব। এবারে মাত্র 'চন্দ্রস' শব্দ হইতে 'চ'-আদি শব্দগুলির মধ্যেই আমার চেষ্টা আবদ্ধ রাখিলাম।

চাঁদা—হিন্দি চন্দা—ফারসী চন্দ। চন্দ্ অর্থ 'অন্ন'; অনেকের নিকট অন্ন অন্ন করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই চাঁদা।

চিকণ—সরু, ক্ষীণ। সুন্দর; বিজয় বাবুর মতে তেলেগু চক্কনি শব্দ।

চুমু—চুম্বন।

চ্যাটাং, চেটাং—চওড়া, কড়া বা কঠিন, বড়; যথা—কাল যে বড় শুনিয়াছিলে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

চাড়—তলায় বলপ্রয়োগ দ্বারা উপরে উৎক্ষেপ।

চুটকী—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির টিপে যতটুকু বস্তু ধরে।

চেক—চৌখুপী ডুরি-কাটা; যথা—চেক র্যাপার।

চপ্—মাংস ও আলু দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক।

চোপ—আঘাত, চোট; যথা—এক চোপে পাঁঠা কাটা।

চাঁচ } —পাতলা গালার চাকতি।  
চাঁদ জো }

চেপ্টালি খাওয়া—আসনপীড়ি হইয়া বসা।

চৌচাঁ—ক্রত ও সোজা দৌড়।

চৌকস—চৌকা-সহ, square; যাহার চারিদিককার জ্ঞান আছে।

চুপটি—ছির, অচঞ্চল, চুপচাপ।

চাপান—কবি বা তর্জনা গানে এক পঙ্কের দ্বারা অপর পঙ্কের প্রতি ছুরহ প্রথ, বা সমস্তা মীমাংসার আহ্বান। যোগেশ বাবুর শব্দকোষে 'আক্রমণ' অর্থে এই ভাব অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

চেটানো—প্রস্থযুক্ত, চওড়া; বিস্তৃত অথচ অগভীর।

চুমুরী—নারিকেলের মোচ বা পুষ্পস্তবক।

চিতা } —চিত্রিত; যথা চিতা বাঘ, চিতী কড়ি বা সাপ। ইহার  
চিতী } মূল, সংস্কৃত 'চিত্রক', না ফারসী 'চীৎ' শব্দ হওয়া  
অধিক সম্ভব।

চানা—ছোলা, চনক।

চানাচুর—খেঁতো করিয়া ঝাল মাখিয়া ভাজা ছোলা।

চুড়িওয়াল—যে চুড়ি বেচে।

চারী—মাছ ধরবার চৌপ করিবার জন্ত সংগৃহীত কেঁচো।

চাঁচ দা } —বকের শ্রায় বা অর্ধচন্দ্রের শ্রায় বক্রাকার ধারালো দা,  
চাঁদ দা } খেজুর গাছের রস বাহির করিবার জন্ত গাছ চাঁচিতে  
ব্যবহার হয়।

চানকানো } —ঈষৎ ভাজা। যথা, পোলাওএর চাল ঘিয়ে চমকে  
চমকানো } লওয়া।

চুনট—শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে বস্ত্রভঙ্গ, উর্ষিকা। কাপড়  
কৌচানো অপেক্ষাকৃত সহজ।

চিংড়ি—মাছ।

চিংড়ি-পোড়া—পুড়িয়া চিংড়িমাছের মতো বক্রাকার প্রাপ্ত।

চমচম—খাদ্য বিষ্টার বিশেষ, ছপাশ সূচালো, পেট ঝোটা।

চিতেন—গানের চড়া সুর, যাহা গাহিবার সময় গায়ককে চিতাইয়া  
পড়িতে হয়।

চাঁট—পত্তর লাধি।

চালশে—চল্লিশ বৎসর বয়সের।

চেলো—লম্বা বিছা।

চিজ—সামগ্রী, বস্তু।

চাহিদা—কোন জিনিসের প্রাপ্তির জন্ত বহু লোকের আগ্রহ, টান,  
কাটতি, demand।

চক্রা কাণা—যে কাণা দিশা হারাইয়া চক্রের শ্রায় ঘুরিয়া মরে।

চাইতে—চেয়ে, অপেক্ষা, তুলনার্থক; যথা—শ্রীর চাইতে কুমীর  
ভালো বলে সর্বশাস্ত্রী (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

চষানি—চাষ করার মজুরী।

চাটম—মর্তমান কলা।

চাদর—উত্তরীয়, গাত্রবস্ত্র।

চাপচাপ—ঘন, ঘনীভূত। চাপ শব্দের অর্থান্তর ঘন।

চারখানা—চেক ডুরে; চৌখুপী ডুরে, বস্ত্রের টানা ও পড়েন উভয়  
দিকেই ডুরি টানিয়া চতুষ্-সমাকীর্ণ বস্ত্র। চারি খণ্ড।  
ব্যুৎপত্তি—চার+খানা (ঘর)।

চৌখুপী, চৌখুপী—চেক-কাটা ডুরে। চারিখোপ বিশিষ্ট।

চারকোণা—চারি কোণ বিশিষ্ট।

চারগুণো—চতুর্গুণ।

চারপেয়ে } —চতুষ্পদ। চার পা বা ঠ্যাং আছে যাহার।  
চারঠেঙ্গে }

চৌআড়ী—চারিটি আড়া অর্থাৎ চাল সংযুক্ত খড়ে-ছাওয়া ঘর।

চাল—চালা; খড়ো ঘরের ছাদ।

চাষামী—চাষার শ্রায় ব্যবহার। চাষা+মী (প্রকৃতি বোধক প্রত্যয়)।

চাষাটে—ঈষৎ চাষার শ্রায়। চাষা+টে (অল্লার্থক প্রত্যয়)।

চিয়ন কোটাল—spring tide.

চিক্কুর—বজ্র, বা বজ্রনাদ। শব্দকোষে চিক্কুর শব্দ দেওয়া হইয়াছে;  
কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চারণ হয় চিক্কুর।

চিড়বিড়—অকস্মাৎ জ্বালা বোধ হওয়া, হঠাৎ অধিক ঝাল লাগা।

চুড়িদার—মুখের কাছে চুড়ির শ্রায় ফাঁদ কম হইয়া আসিয়াছে  
এমন জামার হাতা বা পাজামার পা। চুড়ি+দার (ফারসী  
দাস্তান্=রাখা, থাক)।

চেটো—সোমথ, যুবতী, নবযৌবনা।

চেতানো—উদ্বোধিত করা, বুদ্ধি বা জ্ঞান দান করা, জাগ্রত করা।  
চিত্ত শব্দ।

চোখানো—চোখা করা, ধার করা, তীক্ষ্ণ করা। চোখ খাতু।

চোটানো—উপযুক্তি পুরি চোট লাগানো বা আঘাত করা। চোট খাতু।

চৌচাপটে ধরা—ছেঁকাবঁকা করিয়া ধরা, ঘিরিয়া ধরা, যুগপৎ সকল  
দিকে আক্রমণ করা, চারিদিকে চাপিয়া ধরা।

চৌচাপটে পড়া—হঠাৎ দড়াম করিয়া লম্বা ও চিংপাত হইয়া পড়া,  
চারিদিক চাপিয়া পড়া।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্দী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক ইতিহাস পাব-  
লিশিং হাউস, কলিকাতা। ডবল কুলফ্যাপ ১৬ অংকিত ১৪৬ পৃষ্ঠা।  
ছাপা কাগজ অত্যুত্তম। মূল্য আট আনা।

"ক্রান্তের অমর লেখক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো  
প্রণীত করানী উপন্যাসের [Le Dernier Jour d'un Condamne]  
ইংরাজী অনুবাদ Sentenced to Death অবলম্বনে বন্দী রচিত  
হইয়াছে।"

কাঁশির-ছদ্ম-প্রাপ্ত একজন কয়েদীর মনেকু বিচিত্র ভাবতরঙ্গ একের পিছনে আর একটি অতি নিপুণতার সহিত বহানো হইয়াছে ; তাহাতে পাঠকের মনে দোলা লাগে যথেষ্ট, কিন্তু তাহার অবাধে ভাসিয়া চলিবার পক্ষে এতটুকু বাধা হয় না।

“রচনাটির বিশেষত্ব এই যে একটি অন্তরবাসী প্রাণীর করুণতম মর্শ্বকথা তাহারই মুখ দিয়া কবি মনোজ্ঞ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানবচিত্রের গূঢ়তম, গভীরতম প্রদেশে কবি অবাধে যাতায়াত করিয়াছেন। আবার শুধু তাহার নাগকের হৃদয়টিতেই নহে, চারিদিকের অবিরাম জনশ্রোতের প্রতি-কুদ্রতম তরঙ্গাঘাতটি অবধি তাহার বিশাল চিত্ততটে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।”

“বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনা নূতন।” এই কথ্য সুসম্পন্ন করিয়া সৌরীন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যকে নূতন সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার অল্প সাহিত্যমোদী মাঝেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। অনুবাদ সুন্দর সরস ও সঙ্গ হইয়াছে। সৌরীন্দ্র বাবুর মার্জিত স্বচ্ছ লঘুগতি ভাবার পরিচ্ছদে বিদেশী শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের ভাবধরুর রচনা আমাদের নিজস্ব সামগ্রী হইয়া গিয়াছে।

এই উপন্যাসে ঘটনাসংঘাত নাই, কিন্তু বিচিত্র ভাবসংঘাতে রচনা এত নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ যে পড়িতে একঘেয়ে লাগে না, ক্রান্তি আসে না। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেম, করুণা, মৈত্রী, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুর ছয়াতে দাঁড়াইয়া ছায়াবাজীর ছবির মতো মনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যে কাঁশীর আসামী তাহার জীবনের সুখ দুঃখ পুণ্য পাপ আজ সে অকপটে প্রকাশ করিতেছে। মৃত্যু অবধারিত আমরা সকলেই জানি, কেবল জানি না তাহার নির্দিষ্ট সময়টি ; কিন্তু যে তাহাও জানিয়াছে তাহার মনের মধ্যে যে কী তোলাপাড়া হয় তাহা জানিতে যাহার কৌতূহল আছে তাহাকে এই বন্দী পড়িতে হইবে।

### চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস—

ঐত্বন্যনচন্দ্র পুত্ৰত্বও প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বিশাল শাখা হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৫২ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ ভালো নয়। মূল্য এক টাকা, ছাত্রদের অল্প অর্ধমূল্য।

চন্দ্রদ্বীপ বা আধুনিক বাখরগঞ্জ ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার কিয়দংশ বঙ্গের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজ্য। এই রাজ্যের উৎপত্তি-বিবরণ, আদি রাজা দক্ষমর্দন দেব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ১১১১ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ স্বাধীন ও পরে করদ রাজ্যের বিবরণ, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা, সামাজিক বিধান, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্বকাহিনী, দুর্গ, গড়, কামান, ভাষা, লোক-সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ, মুদ্রা, সুপ্রসিদ্ধ বারভুঞার পরিচয় প্রভৃতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী আমাদের ভবিষ্যৎকে গৌরবান্বিত করিতে উদ্বুদ্ধ করে। যাহারা সেই উদ্যমে ইচ্ছন স্বরূপ দেশের ইতিহাস উদ্ধার করেন তাহারা দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যপ্রেমিকের ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার বিষয়সংস্থান সুবিন্যস্ত, তথ্যসংগ্রহ বহুল ও বিচিত্র ; এজন্য এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, এবং প্রাচীন বঙ্গের বিবিধ চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকে বলিয়া প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রাঘচন্দ্র রায় বশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা। ইহাদের চিত্রিত লইয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ “বোঁঠাকুরাণীর

হাট” নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন সে বহুকালের কথা ; তর্কস্বরীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। তাহার কল্পনায় ঐতিহাসিক চিত্র বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা নিন্দা করেন ; বঙ্গাধাম গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন “সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞান প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই।” প্রথম কথা “বোঁঠাকুরাণীর হাট” রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ ছিলেন না ; দ্বিতীয় কথা প্রবীণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঐ উপন্যাসকে তাহার উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না ; তৃতীয় কথা উপন্যাসকে উপন্যাসের মানদণ্ডেই বিচার করা কর্তব্য ইতিহাসের মানদণ্ডে নহে।

মুদ্রারাক্ষস।

## আলোচনা

### রঙের লুকোচুরি

আমাদের প্রবাসীতে কাঠিক বাবুর ‘রঙের লুকোচুরি’ নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে। রঙের লুকোচুরি দেখাইতে গিয়া তিনি কীট (Insecta) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমি কেবল সেই বিষয়েই দুই একটি কথা বলিব। প্রবন্ধে “পাতাপোকের কীড়ার” যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত পাতাপোকের (Phylhum scythe—Family, Phasmidae—Natural order, Orthoptera) কোন সম্বন্ধ নাই। প্রজাপতির (Natural order,—Lepidoptera) জায় পাতাপোকের কীড়া অবস্থা (Caterpillar stage) নাই ; ইহাদেরও ডিম হইতে যে ছানা (nymph) বাহির হয় তাহা অবিকল পাতাপোকের জায়, কেবল আকার ক্ষুদ্র ও ডানা থাকে না। যে কীড়াটির চিত্র দেওয়া হইয়াছে উহা এক প্রকার প্রজাপতির (Hawk moth—Family, Sphingidae—N. O. Lepidoptera) কীড়া। “পোলাপ গাছের কাঠি পোকের কীড়ার” চিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই প্রকার ভুল হইয়াছে। পাতাপোকের জায় “কাঠি পোকেরও” (Stick insect—Family, Phasmidae—N. O. Orthoptera) কীড়া অবস্থা (Caterpillar Stage) নাই। চিত্রে যাহাকে “কাঠি পোকের কীড়া” বলা হইয়াছে উহা প্রকৃত পক্ষে একপ্রকার প্রজাপতির কীড়া (Stick caterpillar—Family, Geometridae—N. O. Lepidoptera)। কাঠিক বাবু একস্থানে পাতাপোকের বিষয় লিখিয়াছেন, “পুং পতঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রী পতঙ্গের আকার অধিক পত্রসদৃশ, কারণ স্ত্রীকীটকে ডিম্ব প্রসব ও সন্তান পালনের জন্ত অনেক দিন এক স্থানে নিশ্চল হইয়া থাকিতে হয়”—স্ত্রী পাতাপোকা কখন সন্তান পালন করে না, উহার মাটির উপর কঠিন-আবরণ-যুক্ত ডিম পাড়িয়া অজ্ঞত চলিয়া যায়। সাধারণতঃ বোলতা, পিপীলিকা ও মৌমাছি জাতীয় কীট (N. O. Hymenoptera) ব্যতীত অল্প কোন কীটই সন্তান পালন করে না এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীকীটের (Queen) পরিবর্তে কার্যকারী কীটগণই (Workers) সন্তান পালনের ভার গ্রহণ করে। উক্ত জাতীয় কীট ব্যতীত কেবলমাত্র কানকোটারী নামক কীটকেই (Earwigs—Family, Forficulidae—N. O. Orthoptera) মুরগীর জায় সন্তান পালন করিতে দেখা গিয়াছে। “প্রজাপতির কীড়া সাপের মাথার অনুকরণ করিয়া আত্মপোপন করিতেছে” বলিয়া যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে উহা আদৌ কীড়া (caterpillar) নহে। কীড়া বলিলেই আমরা Larva বুঝি। চিত্রটি কোন প্রজাপতির পুস্তলি (chrysalis) ; কীড়া

(Larva) যখন পুতলিতে (Pupa) পরিবর্তিত হয় (Transformed) তখন আর উহাকে কীড়া বলা যায় না। হক্ মথ্ (Hawk Moth—family, Sphingidae—N. O., Lepidoptera) নামক প্রজাপতির কীড়া সাপের মাথার আকার ধারণ করিয়া শত্রুকে ভয় দেখায় বটে কিন্তু সাপের মাথার স্থায় পুতলি (Pupa) বড় একটা দেখা যায় না। প্রবন্ধের একস্থানে আছে “এই জাতীয় প্রজাপতির তলদেশ.....উপযোগী”—প্রজাপতির ডানা বা পাখা আছে বলিয়াই জানি, পালকওয়ালা প্রজাপতি কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। “মাকড়শা, গন্ধপোকা, গুবরে পোকা প্রভৃতি কীটের রূপ অনুকরণ করিয়াছে” বলিয়া যে চিত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে উহার একটীও গন্ধপোকা (Bug) নহে এবং যে কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ (Beetle) দু’টি চিত্রে দেখান হইয়াছে উহারও গুবরে পোকা নহে। বামপার্শ্বের চিত্র দু’টি মাকড়শা ও দক্ষিণ পার্শ্বের চিত্র দু’টি কাঁঠালে পোকা (Ladybird Beetle—family, Coccinellidae—N. O. Coleoptera), ইহাদের সহিত গোবরের কোনও সম্বন্ধ নাই,—ইহারা Coccinellinae ও Epilachninae নামক দুই শাখায় বিভক্ত, প্রথমটি কীট ও দ্বিতীয়টি পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। ক্যালাইমা ইনাকিস্ (Kallima inachis) নামক প্রজাপতির (ইংরাজীতে ইহাকে Oak Leaf Butterfly বলে) বর্ণনা করিতে লেখক বলিয়াছেন, “উভয় পাখার স্ফুমাংশ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সে স্থানের মধ্যদেশ হইতে একটা শিরা বক্রাকারে এমন ভাবে বাহির হইয়াছে যে.....দৃষ্ট হয়”—লেখক মহাশয় যাহাকে শিরা (Veins) বলিয়াছেন উহা প্রকৃত পক্ষে শিরা নহে এবং গুরুপ স্থানে শিরা হইতেও পারে না—উহা একটা রেখা মাত্র। কার্তিক বাবু লিখিয়াছেন এই প্রজাপতির পাখার উপর “ব্যাণ্ডের ছাতার স্থায়” এক প্রকার চিত্র দৃষ্ট হয়,—ব্যাণ্ডের ছাতা যদিও এক প্রকার Fungus তথাপি ‘ব্যাণ্ডের ছাতা’ বলিলে লোকে mushroomই (Agaricus—a particular kind of fungus) বুঝে; এখানে “ছাতাধারার স্থায়” কথাটা ব্যবহার করিলেই ঠিক হইত।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিতে হইলে প্রাণীতত্ত্ব (Zoology), উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যিক, নতুবা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক বা প্রবন্ধের অনুবাদ করিতে গেলে এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কৃষি কলেজ, সাবোর।  
১০ই আশ্বিন, ১৩২০

শ্রীকিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

## উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ।

গত আশ্বিন মাসে আমরা “উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তদ্বিবয়ে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তদ্বাধ্য প্রয়োজনীয় ২১টির উত্তর দিবার পূর্বে আমরা সাধারণ ভাবে ইহা বলা আবশ্যিক মনে করি যে মাসিক পত্রিকায় কোনও কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপিবার প্রধান উদ্দেশ্য কোতূহল উদ্দীপন এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের বিবৃতি। প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে মাসিক পত্রের প্রবন্ধ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

বিপিন বাবু জাতিতে চাহিয়াছেন যে (১) উদ্ভিদে যে স্নায়ু আছে, তাহার প্রমাণ কি? (২) অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারে নূতন কি? আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধের পাদটীকার অধ্যাপক বসুর যে-সকল

পুস্তকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই এই-সকল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। এহলে আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

বিপিন বাবু লিখিয়াছেন:—“ডাক্তার বসু—তাহার পরীক্ষা সমূহের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে লজ্জাবতীর শরীরের এক স্থানে কোন উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে উহা পরিচালিত হইয়া অল্পত্র যায়, কিন্তু কি উপায়ে পরিচালিত হয় তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। প্রমাণ করা গেল—উদ্ভিদ-দেহের একস্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে উহা অল্প স্থানে প্রবাহিত হয়, এই উত্তেজনা প্রাণীদেহে স্নায়ুগুণী দ্বারা প্রবাহিত হয়, সুতরাং উদ্ভিদদেহেও স্নায়ুজালে আচ্ছাদিত, এরূপ সিদ্ধান্ত কষ্টকল্পনা নহে কি? মনে করুন দুইজন লোক কলিকাতা হইতে কাশী রওনা হইল, তাহার মধ্যে একজন রেলপথ অবলম্বন করিল, অপর ব্যক্তি নৌকা-রোহণে গঙ্গাপ্রবাহ অবলম্বন করিল এবং পরিশেষে ক্রমশঃ উভয়েই কাশীতে উপনীত হওয়ার বলিতে পারি কি উভয়েই একই উপায়ে কলিকাতা হইতে কাশী আগমন করিয়াছে? প্রাণীদেহে যে উপায়ে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, উদ্ভিদ-দেহেও ঠিক সেই উপায়ে অর্থাৎ স্নায়ুগুণের দ্বারা প্রবাহিত হয়, ইহার স্বতন্ত্র পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আবশ্যিক। ডাক্তার বসু দেখাইয়াছেন উদ্ভিদ-দেহে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোন পথে প্রবাহিত হয় তাহা দেখান নাই। একটা ক্রিয়া চলিতেছে প্রমাণ করা এক কথা, আর অমুক উপায়ে উক্ত ক্রিয়া চলিতেছে আর এক কথা। গ্রীন্ সাহেব (J. Reynolds Green) লিখিত উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে (Manual of Botany) দেখিতে পাই উদ্ভিদের শরীরের মধ্যস্থিত (protoplasm) প্রোটো-প্লাজম্ কোষে স্ফুস্ক স্ফুস্ক রক্ত আছে, এই কারণে যাবতীর কোষের প্রোটোপ্লাজম্ সংযুক্ত থাকে, এই-সকল যুক্ত প্রোটোপ্লাজম্-সূত্র দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

উত্তেজনা সান্নিধ্যনিবন্ধন নিকটস্থ স্থানে পৌঁছিতে পারে। যেমন মাংসপেশীর এক অংশে আঘাত করিলে নিকটস্থ অল্প অংশ সঙ্কুচিত হয়। বিপিন বাবু গ্রীন্ সাহেবের উল্লিখিত যে-সব উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই প্রকারের।

স্নায়ুর বিশেষ প্রকৃতি এই যে উহা দ্বারা উত্তেজনা (১) বিশেষ পথে (২) দূরে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে প্রেরিত হয়। আর (৩) স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে যাহা দ্বারা তাহা অল্পরূপে প্রবাহ হইতে পৃথক।

(১) উদ্ভিদে স্নায়ুসূত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ অধ্যাপক বসুর Comparative Electro-physiology পুস্তকের On Isolated Vegetal Nerve অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

(২) লজ্জাবতী লতার আঘাতজনিত উত্তেজনা বহুদূরে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে ইহা স্নায়বীয় প্রবাহ। এ সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডে হয় নাই, জার্মানীতে হইয়াছে। গ্রীন্সাহেব এ সম্বন্ধে সঙ্কলনকারী পুস্তক-প্রণেতা মাত্র, আবিষ্কারক নহেন। Vegetable Physiology সম্বন্ধে যে-সব মৌলিক ও প্রাথমিক গ্রন্থ আছে, তাহা জার্মান পুস্তকের অনুবাদ মাত্র;—যেমন Pfeffer's Physiology of Plants (1907) অথবা Josts' Plant Physiology (1907)। লজ্জাবতী লতার স্নায়বীয় প্রবাহ আছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত পুস্তকে ৩য় ভল্যুমে ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

“Pfeffer showed that the stimulus was able to travel

Other chloroformed parts of the stem. We are therefore fully justified in ascribing the transmission of stimulus to the movements of water."

According to Haberlandt, we have in *Mimosa* "a genuine instance of transmission of stimulus and not of excitation."

Jost তাঁহার পুস্তকের ৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"One must not compare the transmission of stimuli in the animal nerve with transmission in *Mimosa*, seeing that in the former conduction is effected by living protoplasm which is not the case with the latter. As a matter of fact the stimulus in *Mimosa* may travel by way of tissues which have been killed by narcotics. Hence the conception of a transmission by living cells and especially by intercellular protoplasmic strands is excluded from consideration."

এচলিত বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা যে প্রাণীর স্নায়বীয় উত্তেজনার গায় দূরে প্রবাহিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ বাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অধ্যাপক বন্থর রয়্যাল সোসাইটির Philosophical Transactions Series B, Vol. 204এ প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহা দেখিতে পাইবেন।

বৈজ্ঞানিক-উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ অবগত আছেন যে নূতন আবিষ্কার বাতীত অল্প কিছু রয়্যাল সোসাইটি প্রকাশ করেন না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে রয়্যাল সোসাইটির সভ্যগণের নিকট প্রস্তুত প্রেরিত হয়। যদি নূতনত্ব কিম্বা সম্পূর্ণ প্রমাণের কোন অভাব থাকে, তাহা হইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। রয়্যাল সোসাইটির Proceedings সম্বন্ধেই এই কথা। Transactionsএ কিছু প্রকাশ করিবার পূর্বে আরও কঠিন বিচার করা হয়। সুতরাং রয়্যাল সোসাইটির Transactionsএ প্রকাশিত অধ্যাপক বন্থর প্রবন্ধের শেষ অংশে যে চূষক দেওয়া হইয়াছে, তাহা উক্ত সভা সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রমাণিত বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। সেই চূষকের কয়েকটি প্যারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

The various characteristic polar effects of electric current in excitation and the arrest of excitatory impulse by various physiological blocks afford crucial tests of the physiological character of the transmitted effect.

The physiological character of the excitation of the plant by constant current is further demonstrated by the respective reactions of Anode and Kathode which are antithetic. The excitability of animal nerve to the stimulus of constant current is enhanced by cooling and depressed by warming. Precisely similar effect is shown to take place in the conducting tissue of *Mimosa*.

The excitatory impulse may be arrested by electrotonic block. This arrest persists during the continuation of the blocking current, the conductivity being restored on its cessation.

The conductivity of a selected portion of a petiole is abolished by the local application of poison.

These results prove conclusively that the transmission of excitation in the plant is a process fundamentally similar to that which takes place in the animal.

এই বিষয়ে সপক্ষে বিপক্ষে পূর্বে অনেক অনুমান ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক বন্থর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা অবিসংবাদিত রূপে উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া-

ছেন। এই অল্প তাঁহাকেই এই তথ্যের আবিষ্কার বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাসে ঐলজুলিক ঘোটকে চড়িয়া বা গালিচার উপর বসিয়া আকাশপথে সঞ্চরণের কথা আছে। তাহাতে বোম্বান, আকাশতরী (airship), ইত্যাদির নূতনত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কল্পনা ও অনুমান, এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত তথ্যের পার্থক্য বুঝিবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিলে অনেক সন্দেহ মনের মধ্যে আসিতে পারে না।

সম্পাদক।

## প্রকৃতিতে বর্ণ বৈচিত্র্য।

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য' নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখকের কএকটি প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব দিতে চেষ্টা করিব।

লেখক কএকটি বৈজ্ঞানিক মতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে সূর্যরশ্মি পড়িয়া বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি করে, ইহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে কে? কাহার নিকট হইতে আমরা ইহার যথার্থ উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিমাছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না।" তিনি ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বিজ্ঞান নিজের বিচার নিজেই করে ও সকল সমস্তর উত্তর দিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞান সকলের নিকট হইতে ও সকলের চেষ্টা হইতে পুষ্টিলাভ করে। বিজ্ঞান 'আপ্ত'বাক্য নহে। ইহা বিশেষ যুগে, বিশেষ স্থান দ্বারা লোকসমাজে প্রকাশ পায় না। সকলেই ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞানের পুষ্টি করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক সকল মতই অজ্ঞান নহে। ভুল প্রকাশ পাইলেই তাহা স্বীকার করিয়া লয়। বিজ্ঞান কোথাও এমন কথা বলে নাই ইহাই চূড়ান্ত শীবাংসা, ইহা ভিন্ন আর সকলই ভুল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক মত সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বর্ণবৈচিত্র্যকে একমাত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সহায়রূপে নির্দেশ করেন নাই। তাঁহাদের মত, বর্ণ-বৈচিত্র্য জীবজগতে অনেক স্থলে সহায় রূপে কার্য্য করিয়াছে। জীবের বংশরক্ষা ইত্যাদি করিবার অল্পই যে কেবল প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ডারউইন কোথাও তাহা বলেন নাই। তাঁহার মতে কোন কারণে জীবজগতে (ও উদ্ভিদজগতে) মধ্যে মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আরম্ভ হয়। অনেক স্থলে সেই-সকল পরিবর্তন জীবের উপকারে লাগে, সুতরাং তাহারা রহিয়া যায়, অর্থাৎ বংশগত হয়। আর যে পরিবর্তনগুলি জীবনসংগ্রামের অন্তরায় হয়, হয় ক্রমে তাহারা লোপ পায়, নয় সে আর্তিকে লোপ করে। যেমন জিরাফ্ লম্বগ্রীব হইয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে পরিবর্তন টিকিয়া গেল আবার কত আতি প্রতিকূল পরিবর্তনের ফলে একেবারে লোপ পাইয়াছে, জীব-অভিব্যক্তির ইতিহাসে তাহাদের চিহ্ন বর্তমান আছে।

আর যদি কোন পরিবর্তনের ফলে জীবের কোন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সে পরিবর্তনের সাহায্য না লইয়াও বাঁচিয়া থাকে। মানব আপন উপকারের জন্য কত জীবকে কতরূপেই পরিবর্তিত করিয়াছে। তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে পরিবর্তন সর্বত্র জীবের সহায় হয় না।

মনে করুন কোন কৃষকপ্রাণীর কোন কারণে কতকগুলি কৃষ-

বর্ণ শাবকের সহিত দুই একটি শাদা ছানা ও দুই একটি লোহিত ছানা হইল। যদি শাদা ছানাগুলি বরফের মধ্যে বা অল্প পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া কৃষ্ণকায় ছানা অপেক্ষা অমুকুল অবস্থায় পড়ে, তাহা হইলে ক্রমে সেই শাদা ছানার বংশ এই আকস্মিক পরিবর্তনের সাহায্য পাইয়া অবস্থার উন্নতি করিবে। অপরদিকে যদি লাল জীবগুলি শক্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই হউক বা অল্প কারণে এই পরিবর্তনে প্রতিকূল ফল লাভ করে, তাহা হইলে হয় সে লোহিত বর্ণ ক্রমে লোপ পাইবে অথবা তাহাদের বংশই লোপ পাইবে। কিন্তু মনে করুন লোহিত বর্ণ শক্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, বা সেখানে কোন শক্রর সম্ভাবনা নাই। সেখানে লোহিত জীব সম্পূর্ণ জীবন ধারণ করিতে লাগিল, চারিদিকে বরফই থাকুক বা মরুভূমিই থাকুক। মেরু প্রদেশে বর্ণ-বৈচিত্র্যের উদ্ভব এইরূপেও হইতে পারে। বর্ণ-বৈচিত্র্য আগে হয়, লাভালাভ পরে দেখা যায়।

আর সর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য যে জীবের সহায়তার জন্য হয় নাই, তাহার একটি উদাহরণ জীবদেহের উষ্ণরক্তের বর্ণ। এরূপ সুন্দর বর্ণ প্রকৃতিতে অল্পই দেখা যায়। কিন্তু ইহার বর্ণ জীবের কি সহায়তা করে বুঝা যায় না। এইরূপে কত বর্ণের কত অজ্ঞাত কারণে প্রথমে আবির্ভাব হয়, পরে কোথাও জীবের কাজে লাগে, কোথাও বা বিফলে যায়।

“সূর্য্যকিরণই প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ ইহা মানিয়া লইয়াও আমাদের নিকৃতি পাইবার জো নাই।” কেন বুঝিতে পারিলাম না। সকল পদার্থই সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা-অভ্যন্তরে কোন বর্ণে রঞ্জিত না দেখাইলেও সূর্য্য-আলোকে আনিলেই কোন-না-কোন রংএর দেখাইবেই। যদি সূর্য্য-কিরণের সকল রশ্মিগুলি সে পদার্থ গ্রহণ করে, তবে তাহা গাঢ় কাল বর্ণের দেখাইবেই। আর দুই চারিটি রশ্মি ‘ফিরাইয়া দিলে’ সেই বর্ণের দেখাইবে, আলো না লাগিলে কোন বর্ণ দেখা যাইবে না, সুতরাং সূর্য্য-কিরণই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াই বোধ হয়।

লেখক লিখিয়াছেন “বিশেষ বিশেষ ঋতুতে পুষ্পমধ্যে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের আধিক্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।.....যেমন আমাদের দেশে বর্ষায় ও শরতে, বনে ও বাগানে শাদা ফুলেরই বাহার বেশী।”

দেখা যায় যে অঙ্ককারে যে-সকল ফুল ফুটে প্রায় তাহার শাদা হয় অথবা উগ্র-গন্ধবিশিষ্ট হয়। কারণ অঙ্ককারে কীট পতঙ্গ শাদা বর্ণ দেখিতে পায়, অথবা উগ্রগন্ধে তাহাদের খুঁজিয়া পায়। সকলেই জানেন কুসুমের বর্ণ ও গন্ধ কীটকে মুগ্ধ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। দিনের পুষ্পের বর্ণ প্রায় নানাবর্ণের হয় আর নিশীথ-কুসুম আর শুষ্ক বর্ণের। লেখক উদাহরণ স্বরূপ জুঁই, মালতী মল্লিকা, টগর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, শিউলি, প্রভৃতি ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ নিশীথ-পুষ্প, সেই জন্য শুষ্ক। আর বর্ষাকালে আকাশ মেঘে আবৃত থাকে বলিয়া দিনেও অঙ্ককার থাকে। সুতরাং শাদা ফুলের আধিক্য। বসন্তে দিবা-পুষ্পের আধিক্য হেতু এত বর্ণের বিচিত্রতা দেখা যায়। বসন্তে তাই স্বাবর জন্মের মহোৎসব।

প্রকৃতিতে অধিকাংশ পুষ্প নীল বা বেগুনি রঙের, হলুদে নহে। একটু ভাল করিয়া দেখিলেই এ সত্য উপলব্ধি হইবে।

ফুলের বর্ণ সম্পর্কে আর একটু বলিবার আছে। লেখক লিখিয়াছেন ‘এক এক জাতীয় ফুলকে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে

আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ ফুলের বর্ণ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, একটি অন্নায়ক আর একটি ক্রায়ক। অন্ন শ্রেণীর ফুল হরিদ্রা-প্রধান ও ক্রায় শ্রেণীর ফুল নীল-প্রধান। লোহিত দুই শ্রেণীতেই বিদ্যমান। সেইজন্য হরিদ্রা-শ্রেণীতে নীলের ও নীল-শ্রেণীতে হরিদ্রার কচিং সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গোলাপ, হরিদ্রা বা অন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই হরিদ্রা গোলাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু নীল কদাচ নহে। দোপাটি নীল শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই হরিদ্রা বর্ণের হয় না। মানব কিন্তু অসংগত সংগতন করিতেছে। প্রকৃতিতে না পাওয়া যাইলেও মানব সকল বর্ণের সৃষ্টি করিতেছে। ‘চন্দ্রমল্লিকা’ এখন সকল বর্ণের পাওয়া যায়। সেদিন কোথায় পড়িলাম ‘নীল গোলাপ’ জন্মিয়াছে।

প্রাণীজগতে লেখক লিখিয়াছেন যে “মাংসাশী জানোয়ারদের অধিকাংশেরই গায়ে ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল গোল চক্র আঁকা।” এ বিষয়ে আমি বিশেষ আলোচনা করি নাই। তবে সিংহশিশুর গায়ের দাগ ডোরউইন বলেন, ব্যাঘ্র জাতীয় কোন জন্তু হইতে সিংহ উদ্ভূত বলিয়া। অবশ্য উভয়ই মাংসাশী। কিন্তু “তৃণভোজী জন্তুদের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত” কেন বুঝিতে পারিলাম না। ডোরউইন দেখাইয়াছেন অথ, গর্দভ প্রভৃতি খাদ্যে ঐ ডোরাকাটা জন্তু হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। পাখীদের মধ্যে বোধ হয় ইহা সত্য। কিন্তু মৎস্যের বেলাও কি ডোরাকাটা মৎস্যই মাংসাশী, আর রোহিতাদি মিরামিষাশী?—বোধ হয় না। লেখকের মতে “পশুদের সমস্ত শরীর ভিন্ন ভিন্ন লোমে আবৃত হইলেও মেরু-দণ্ডের উপরিভাগ সাধারণতঃ ঈষৎ শুভ্র হইতে দেখা যায়। মৎস্যের বেলায় কিন্তু ইহার বিপরীত”—তাহা ত দেখিতে পাই না, মৎস্যের পক্ষেও ঐ নিয়ম খাটে।

লেখকের মতে গৃহপালিত জন্তু এত চিত্রবিচিত্র হইবার কারণ চিত্র-বিচিত্র জন্তুর সংযোগে সম্ভাবন উৎপাদন। আমি যতদূর দেখিয়াছি ইহার বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। কোন বিশেষ ‘চিত্রের’ জন্তুকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্প কোনও ‘চিত্রের’ সহিত সংযোগ করিতে না দিয়াই বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়। বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায় ইহাই। কারণ বিশেষ চিত্রিত লক্ষ্য পায়রা অল্প বিশেষ চিত্রিত মুখধি পাররার সহিত সংযোগ করিলে আদি সূনাতন গোলা পায়রাই পাওয়া যায়।

পূর্বে লেখক এক স্থানে ‘গাংশালিকে’র উল্লেখ করিয়াছেন। গাংশালিক শাদা নহে। লেখক বোধ হয় Sea-bullকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রবি বাবুর ‘সিন্ধু-শকুন’ মন্দ নহে ত।

ঐশ্বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

## ইজ্জতের জন্য

“ইজ্জৎ কী ভেদ মুগ্ধক কা খিদমৎ মে হায় ছিপা।”—হালি।

অপমানের মৌন দাহে চিন্ত দহে তুধানলে ;

জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে !

ক্ষুধ সাগর আনুল ধবর হালু আইনে আফ্রিকাতে

রঙের দায়ে ভারত প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে !

ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জন্মানা উঠলে ভুলে,

নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা বেচার লাভে...মুলে।



দক্ষিণ আফ্রিকায় অণ্ডায়বিরোধী বীর ভারতনারী যাঁহারা প্রথমেই ২১শে অক্টোবর তিন মাসের অণ্ড কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,  
'জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে !

\* \* \*

কাজের বেলা ছিল কাজী অল্লে-খুসী ভারতবাসী,  
অল্লে-খুসী বলেই আবার সবাই তাড়া দিচ্ছে আসি' !  
“মজুর ভাল অল্লে তুট্ট” ভাব্ছে ওরা সুনিশ্চয়,  
“খনির কাজে আখের চাষে ইষ্ট তাহে প্রচুর হয়।  
কিন্তু যখন সেই কুলি হয় প্রতিযোগী দোকানদার  
অল্লাভে ব্যবসা জমায়,...তখন তোমার টে কা ভার।”  
মুদী মাকাল উঠল ক্ষেপে ; অম্নি হল রাতারাতি  
স্বার্থে-গোয়ার গোরা-বোয়ার বর্ণ ভেদের পক্ষপাতী !

\* \* \*

অম্নি গেল শুরু হ'য়ে নূতন নূতন আইন জারি  
“ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি,” “ভারতবাসী দুষ্ট ভারি,”  
“অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,  
কারণ বহনরীর ভর্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।  
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবাঙ্ক চানা,  
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কণ্ঠা জায়া আনতে মানা।”  
এম্নি ধান্না ফন্দি ফিকির নিত্য তারা বার করোগো,  
বোয়ার মুদী মনু এবং মহম্মদের ভুল ধরে গো।  
ভারত এবং হাব্সী মুলুক এক রাজারই অধীন জানে,  
তবুও মুদু বার্ষ লাগি' সাম্রাজ্যে সে দুচ্ছ মানে !

অথচ এই ভারতবাসী সব সঁপে সাম্রাজ্যটাকে,—  
আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকংএ সে শান্তি রাখে ;  
অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্ধমান,  
তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।  
সিংহলে যে সভ্য করে, আরব-কূলে সুখত্রায়,  
ব্রহ্মে, শ্রামে যবদ্বীপে উপনিবেশ যাদের, হায়,  
তাদের ছেলে স্থল পেলেন না কুল পেলেন না আল কোথাও,  
গর্-বনেদি বণ্ড বোয়ার ভিন্ন তাদের সভ্যতাও।

\* \* \*

এক রাজারই আমরা প্রজা বোয়ার এবং ভারতবাসী,  
মোদের বেলা কান্না শুধু তাদের বেলা শুধুই হাসি।  
রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিঙ্করে,  
দেশের উচিত শুধু রে.দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—  
রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাটতে চাই,  
বোয়ার-বিধির বর্ধরতা আমরা দ্বিষৎ ছাঁটতে চাই।  
দেশের মুখে ধর্ম যেমন আইনু তেমনি দেশের মতে,  
কেমন করে টি কবে মানুষ বে-আইনীতে বে-ইজ্জতে ?  
তাই প্রবাসী ভারতবাসী বেঁধেছে বুক আজকে সবে,  
পণ করেছে বে-আইনী এই আইনটাকে ভাঙতে হবে।

\* \* \*

দলে দলে ফিরছে তারা সইছে শত লাঞ্ছনা,  
শগবানের রাজ্যে তারা গণ্ডী কোথাও মান্ছে না।



ধর্ম-আচার করছে তারা যাচ্ছে জেলে সজীকই,  
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ রুখবে তাদের অস্ত্রে কি ?  
নেতা তাদের তরুর মত শুক, দৃঢ়, দুঃখজিৎ,  
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন, বিজয় তাঁহার সুনিশ্চিত !  
লড়ছে এদের ইষ্টবুদ্ধি যুদ্ধে এদের মনের বল,  
ভবিষ্যতের অন্ধকারে এদের মশাল সমুজ্জ্বল ।



শ্রীমতী শেখ-মহতাব-পত্নী, দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্থায়িবিরোধী  
খবীর ভারতনারীদিগের মধ্যে কারাবরুদ্ধা সর্ব প্রথম  
বীর মুসলমান মহিলা ।

ইজতে আজ হাত পড়েছে ঠেকেছে দেশ দেশের দায়ে,  
পরবাসে দেশের মানুষ তোমার আত্মকল্যাণ চাহে ;  
পেটের জন্তে চায়না তারা, 'হক' সীমানার ভাঙছে তট  
তোমার আমার রাখতে ভরম করেছে তাই ধর্ম-স্বট ;  
স্বজাতির হক রাখতে বজায় সইছে তারা নির্ঘাতন,  
চাবুক ধরে মরছে প্রাণে বুক-ফাটা এই আবেদন !  
ইজতে হাত পড়ল জাতির 'জোৎ' বেচে সে রাখতে হবে—  
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো হবে !

দাও সাহায্য দেশের পুরুষ ! পৌরুষের আজ জন্মতিথি  
দেশের সঙ্গে যোগ যে তোমার মনে তাহা জাগুক নিতি ।  
দাও গো কিছু ভারতনারী ! ভারতনারীর অমর্যাদায়  
নিজের অমর্যাদা তোমার ; ঘুচাও নারী ! নারীর এ দায় !  
দাও জমীদার ! দাও অফিসার ! লাট সাহেবের হুকুম  
আছে ;  
দাও কিছু দাও স্কুলের বালক ! কিছুও যদি থাকে কাছে ।  
দাও গো আমীর ! দাও গো ফকীর ! মুক্ত তোমার রিক্ত  
হাতে,  
দাও মহাজন ! দাও দোকানী ! দাও কিছু ইজতের খাতে!

নির্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে  
স্থান হারিয়ে মান হারিয়ে প্রবাসী আজ নাগর-পারে,  
কেউ বা করে দিল-মজুরী, কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার,  
তাদের শ্রমে শ্রাক্ষণ আজি মরুস্থলী আফ্রিকার ।  
রবার গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের হয় জনতা,  
বো-বাব্ গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের কথকতা ।  
মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা,  
ভারত-স্বপন জাগায় সেখা পরবাসের বন্দীরা ।

আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং মৌন হয় !  
সবাই যদি মন কর তো আবার তারা সাহস পায়,  
সবাই যদি মন কর তো চেষ্টা তাদের হয় সফল,  
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলি-বেনের দল ।  
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা  
হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্মানে হচ্ছে সোজা ।  
সুরু হ'ল নূতন নাট্য সূত্রধরের নূতন নাট,  
নাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী-পাঠ ।  
ইজতের দায় আজিকে, ব্রহ্মরজে রুদ্রবীণা  
উঠছে কেঁপে, সহায় হওগো যুদ্ধে তারা অস্ত্র বিনা ।

সহায় হও গো সাহায্য দাও, স্মরণ কর কে খ্রীষ্টান—  
সংগোপনে যজ্ঞে মোদের দিয়েছে সর্বস্ব দান ;  
হিন্দু ভূমি হার মানিবে ? হার মানিবে মুসলমান ?  
কর্ণ-শিবি রাজার জাতি !...হাতেম্ তাইয়ের হে খান্দান !  
হওগো সহায় তোমরা সবাই বিভেদ বুদ্ধি উচ্ছেদে,  
ধর্ম তোমার পক্ষে আছেন দাঁড়াও বন্ধ বুক বেঁধে ;  
সহায় হওগো সাহায্য দাও নষ্ট হউক সব ঘৃণা  
বিখে আসুক নূতন ঐক্য তোমার দানের দক্ষিণা !  
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।





সায়ংসন্ধ্যা ।

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতিক্রমে ।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY  
U. RAY & SONS, CALCUTTA.



# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৩শ ভাগ

২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২০

৪র্থ সংখ্যা

## মূর্তি

(৩)

### ভাব ও ভঙ্গি ।

ভারতীয় মূর্তিগুলিতে সচরাচর চারিপ্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দৃষ্ট হয়, যথা—সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ ।

#### ১ নং চিত্র, সমভঙ্গ বা সমপাদ ।

এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র দেহকে বাম ও দক্ষিণ সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মূর্তির শিরোদেশ হইতে নাভি, নাভি হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত সরল ভাবে লঙ্ঘিত হয় অর্থাৎ মূর্তিটি দুই পায়ের উপরে সোজা ভাবে, দেহ ও মস্তক বামে বা দক্ষিণে কিঞ্চিৎ মাত্র না হেলাইয়া, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহে। বুদ্ধ সূর্য্য এবং বিষ্ণুমূর্তির অধিকাংশ সমভঙ্গঠামে সমপাদ-সূত্রনিপাতে গঠিত হয়। সমভঙ্গ মূর্তিতে দেহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বের ভঙ্গি বা ভঙ্গ সমান রহে, কেবল হস্তের মুদ্রা পৃথক হয়।

#### ২ নং চিত্র, আভঙ্গ ।

এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নাগার ও নাভির বাম কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্ব বহিয়া বাম কিম্বা দক্ষিণ পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্তির উর্দ্ধদেহ মূর্তি-রচয়িতার বামে, মূর্তির নিম্নের দক্ষিণে, কিম্বা মূর্তি-রচয়িতার দক্ষিণে, মূর্তির নিম্নের বামে হেলিয়া রহে।

বোধিসত্ত্ব ও অধিকাংশ সাধুপুরুষগণের মূর্তি আভঙ্গঠামে গঠিত হইয়া থাকে। আভঙ্গঠামে মূর্তির কটীদেশ মানসূত্র হইতে এক অংশ মাত্র বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

#### ৩ নং চিত্র, ত্রিভঙ্গ ।

এইরূপ মূর্তিতে মানসূত্র বাম অথবা দক্ষিণ চক্ষু-তারকার মধ্যভাগ, বক্ষস্থলের মধ্যভাগ, নাভির বাম অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্তিটি মৃগালদণ্ডের মত বা অগ্নিশিখার মত পদতল হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত নিম্নের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে), কটী হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিম্নের বামে, এবং কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত নিম্নের দক্ষিণে হেলিয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকে। এই ত্রিভঙ্গ ঠামে রচিত দেবীমূর্তিগুলির মস্তক মূর্তির দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) ও দেবমূর্তিগুলির মস্তক নিম্নের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) হেলিয়া থাকে, অর্থাৎ দেবতা দেবীর দিকে, দেবী দেবতার দিকে ঝুঁকিয়া রহেন। অতএব ত্রিভঙ্গঠামে পুরুষমূর্তিকে নিম্নের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) ও স্ত্রীমূর্তিকে নিম্নের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) হেলাইয়া গঠন করা বিধেয়, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি ত্রিভঙ্গ মূর্তি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হইবে যেন মৃগালদণ্ডের উপরে প্রফুল্ল পদ্মের মত উভয়ের মুখ উভয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল মৃগল-মূর্তির বা দেবদম্পতির গঠনরীতি। মূর্তিতে অভিমান খেদ ইত্যাদি ভাব দেখাইতে হইলে পুরুষে নারী-ত্রিভঙ্গ এবং নারীতে পুরুষ-ত্রিভঙ্গ রচনা প্রয়োগ

কারিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের বিপরীত মুখে হেলিয়া রহিবে। বিষ্ণু সূর্য্য প্রভৃতি যে-সকল মূর্ত্তি দুইপার্শ্ব-দেবতা বা শক্তির সহিত গঠন করা হয়, তাহাতে সমভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ দুই প্রকারের ভঙ্গ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা সমভঙ্গঠামে কোন এক পার্শ্ব-দেবতার দিকে কিঞ্চিৎমাত্র না হেলিয়া একেবারে সোজাভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহেন, আর তাঁহার দুই পার্শ্বে যে দুই দেবতা বা শক্তি—যিনি দক্ষিণে আছেন তিনি, যিনি বামে আছেন তিনিও—ত্রিভঙ্গঠামে উভয়েই প্রধান দেবতার দিকে নিজের নিজের মাথা হেলাইয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকেন। ইহাতে দুই পার্শ্বমূর্ত্তি দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা করিতে হয়, যথা—শিল্পীর বামে ও প্রধান মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর দক্ষিণ দিকে ও নিজের বাম দিকে, এবং শিল্পীর দক্ষিণে ও প্রধান মূর্ত্তির বামে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর বাম দিকে ও নিজের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহে। দুই পার্শ্বদেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্শ্বদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন। ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে মধ্যস্থ বা মানস্থ হইতে মস্তক এক অংশ ও কটীদেশ এক অংশ বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

### ৪ নং চিত্র, অতিভঙ্গ।

এইরূপ মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই অধিকতর বন্ধিমতা দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যে রূপ গাছ তেমনি মূর্ত্তির কটীদেশ হইতে উর্দ্ধদেহ কিম্বা কটী হইতে পদতল পর্য্যন্ত অংশ বামে দক্ষিণে পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গ ঠাম শিবতাণ্ডব, দেবাসুর যুদ্ধ প্রভৃতি মূর্ত্তিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূর্ত্তিতে গতিবেগ নর্ত্তনশক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গঠামে গঠন করা বিধেয়।

শুক্রেণীতিসার বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মূর্ত্তির মান পরিমাণ আকৃতি প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেওয়া আছে। মূর্ত্তি নির্মাণ সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্যগণের কয়েকটি উপদেশ প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

“সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমালক্ষণম্ স্মৃতম্”

মূর্ত্তি ও প্রতিমার যে-সকল লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি দেওয়া হইল তাহা যে-সকল প্রতিমার সহিত শিল্পীর পূজকের বা প্রতিষ্ঠাতার সেব্য ও সেবক, প্রভু ও দাস, অর্চিত ও অর্চক সম্বন্ধ কেবল তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং কেবল সেইরূপ মূর্ত্তিই যথাশাস্ত্র সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন করিয়া গঠন করিতে হয়। অতঃসকল মূর্ত্তি, যাহার পূজা কেহ করিবে না তাহাদের, শিল্পী যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পারে।

“লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃগয়ী পৈষ্টিকী তথা

এতেষাং লক্ষণাভাষেন ন কৈশ্চিদ্রোষ হীরিতঃ ॥”

কিন্তু চিত্র এবং আল্পনা, বালি মাটি ও পিটুলি দ্বারা রচিত মূর্ত্তি বা প্রতিমা লক্ষণহীন হইলেও দোষের হয়না, অর্থাৎ এগুলি যথাশাস্ত্র গঠন করিতেও পার, নাও করিতে পার, কারণ এই-সকল প্রতিমা ক্ষণকালের জন্য নির্মিত হয় এবং নদীতে সেগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার মূর্ত্তি সাধারণতঃ জ্বীলোকেরা নিজের হাতে রচনা করিয়া থাকেন—পূজা, আমোদ প্রমোদ অথবা সময়ে সময়ে শিশুসন্তানগণের ক্রীড়ার জন্য, সুতরাং সেগুলি যে যথাশাস্ত্র সর্বলক্ষণযুক্ত হইয়া গঠিত হইবে না, তাহা ধরা কথা, এই জন্যই চিত্র আলিম্পন ইত্যাদি রচনাতে রচয়িতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন।

“তিষ্ঠতীং সুখোপবিষ্টাং বা স্বাসনে বাহনস্থিতাম্

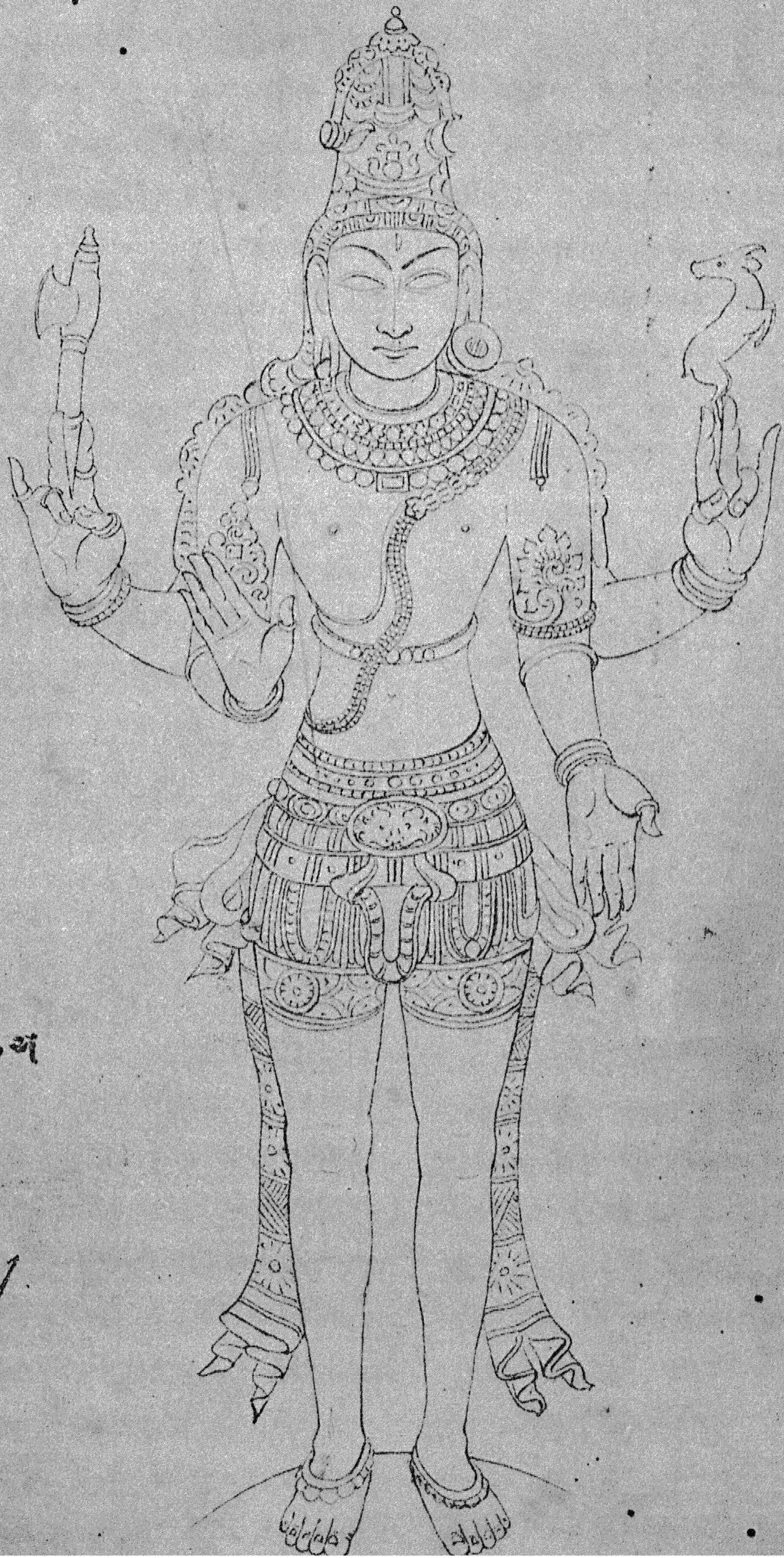
প্রতিমামিষ্টদেবস্তু কারয়েদ্ বৃক্ষলক্ষণাম্ ।

হীনশ্মশ্রনিমেঘাং চ সদা ষোড়শবার্ষিকীম্

দিব্যাভরণবস্ত্রাঢ্যাং দিব্যবর্ণক্রিয়াং সদা

বস্ত্রৈরাপাদগূঢ়া চ দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্ ॥”

নিজ নিজ আসনে দণ্ডায়মান অথবা সুখে উপবিষ্ট কিম্বা বাহনাদির উপরে স্থিত, শ্মশ্রহীন, নির্গিমেঘ-দৃষ্টি, সদা ষোড়শবর্ষবয়স্ক, দিব্য আভরণ ও বস্ত্র পরিহিত, দিব্যবর্ণ, দিব্যকার্য্যরত অর্থাৎ বরাভয় ইত্যাদি দানরত এবং কটীদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত ও নুপুর মেখলা ইত্যাদি ভূষিত করিয়া ইষ্টদেবমূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়।



अध ७ अ

१

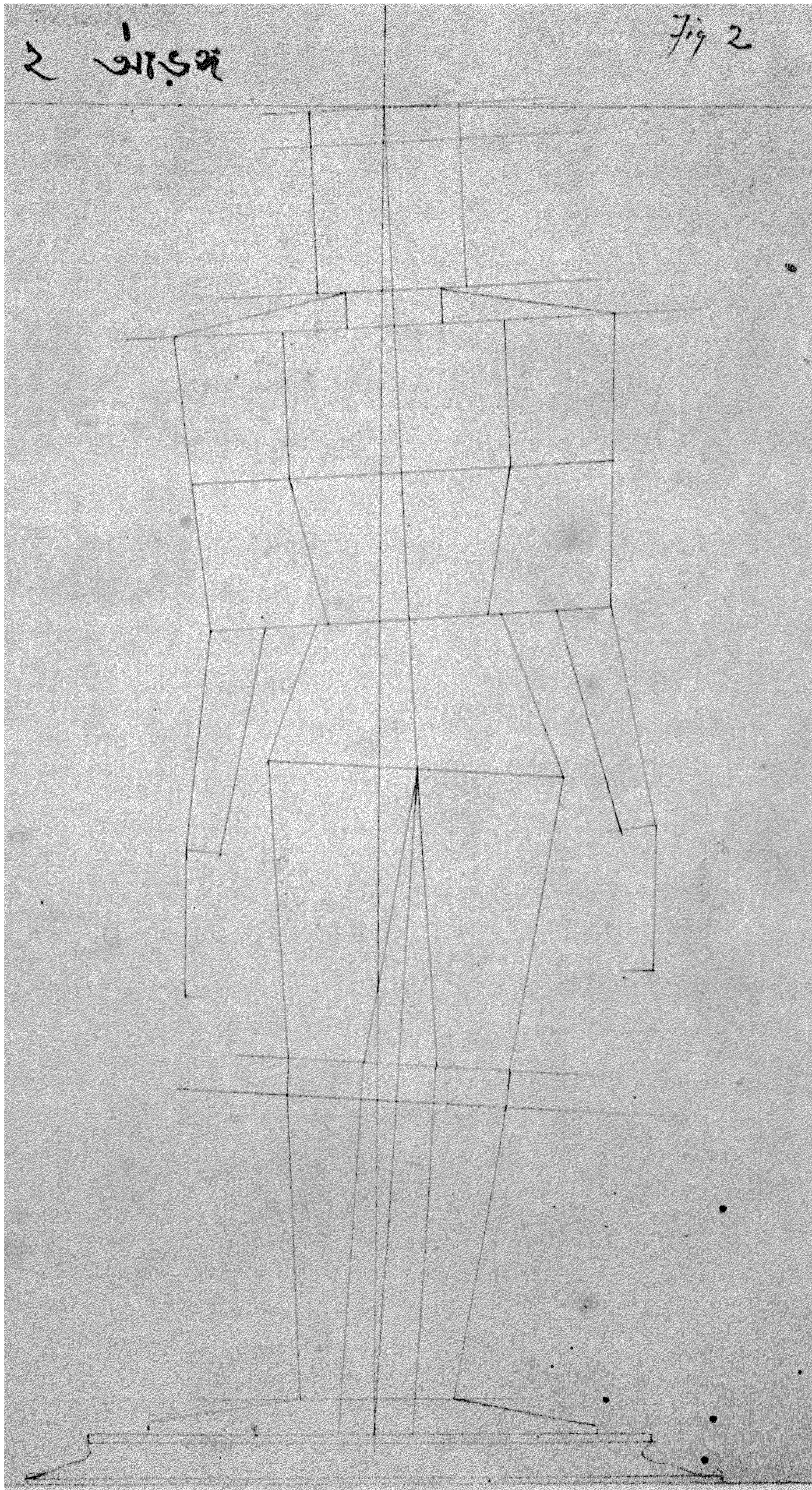
Fig 1





২ আঁক

Fig 2







•

“কুশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থলা রোগপ্রদা সঙ্গী ।

গূঢ় সন্ধ্যাস্থিধমনী সর্বদা সৌখ্যবর্ধিনী” ॥

প্রতিমার হস্তপদাদি কুশ করিয়া গঠন করিলে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে, অতি স্থল করিয়া গঠন করিলে রোগ আনয়ন করে এবং অপ্রকাশিত-অস্থি-শিরা স্ঠাম হস্ত-পদাদিযুক্ত মূর্ত্তি সুখ সৌভাগ্য আনয়ন করে ।

“মুখানাং যত্র বাহুলাং তত্র পংক্ত্যা নিবেশনম্ ।

তৎ পৃথক্ গ্রীবামুকুটং স্মৃৎসং সান্নিকর্ণযুক্” ॥

যে মূর্ত্তিতে তিন বা ততোধিক মুখ রচনা করিতে হয় তাহাতে মুণ্ডগুলি এক শ্রেণীর উপরে আর এক শ্রেণী করিয়া সাজাইয়া সকল মুখেরই পৃথক গ্রীবা কর্ণ নাসা চক্ষু ইত্যাদি দিয়া গঠন করা বিধেয়, যথা পঞ্চমুখ মূর্ত্তিতে সারি সারি পাঁচটি মুখ এক শ্রেণীতে না সাজাইয়া চারি-দিকে চার ও উপরে এক, ষড়মুখ মূর্ত্তিতে প্রথম থাকে চার দ্বিতীয় থাকে দুই, দশমুখ মূর্ত্তিতে প্রথম চার তদুপরি তিন তদুপরি দুই ও সর্বোপরি এক এইরূপভাবে সাজাইতে হইবে এবং সকল মুণ্ডগুলির পৃথক পৃথক গ্রীবা মুকুট চক্ষু কর্ণাদি থাকিবে । ৪নং চিত্র দেখ ।

“ভূজানাং যত্র বাহুলাং ন তত্র স্বক্লেভেদনম্ ।”

মূর্ত্তিতে চার বা ততোধিক বাহু রচনা করিবার সময় এক এক বাহুর এক এক স্বক্লেভ দিতে হইবে না কিন্তু একই স্বক্লেভ হইতে বাহুগুলি ময়ূরপিচ্ছের মত ছত্রাকারে রচনা করিতে হইবে । ৪নং চিত্র দেখ ।

“কচিৎ বালসদৃশং, সর্দৈব তরুণং বপুঃ ।

মূর্ত্তিনাং কল্পয়েচ্ছিন্নী ন বৃদ্ধসদৃশং কচিৎ ॥”

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সর্বদা তরুণবয়স্কের আয়, কখন কখন বালকের আয় করিয়াও গঠন করিবে, কিন্তু কদাচিৎ বৃদ্ধের আয় করিয়া গঠন করিবে না ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

## ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটা বৈজ্ঞানিক কারণ

প্রথম অধ্যায় ।

( প্রচলিত কারণসমূহ )

বঙ্গীয় গাঠকসমূহের স্বতিশক্তিকে ভারতবর্ষের অধঃপতন সংক্রান্ত এত অধিক সংখ্যক কারণ বহন করিতে হয় যে, তদুপরি আমার এই ‘শাকের আঁটিটির’ ভার অত্যন্ত অধিক হইবে না বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের স্বক্লে এই নূতন ভারটিকেও অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলাম ।

তবে প্রথমতঃ প্রচলিত কারণগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক । (১) ব্রাহ্মণদিগের বর্ধরতা (২) জাতিভেদ (৩) বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ও বাল্য-বিবাহের প্রচলন (৪) স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার (৫) পৌত্তলিকতা (৬) মন্ত্রাদি বিবিধ কুসংস্কারের প্রভাব (৭) মাংস না খাওয়া, ইত্যাদি ভারতবর্ষের অধঃপতনের বিবিধ কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । কেহ উহাদের কোন একটিকেই ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন । কেহ কেহ আবার দুই তিনটির ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া থাকেন ।

অবশ্য সকলেই যে ঐগুলিকে ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, এমন নহে ; অনেকে ঐ কারণগুলির অস্তিত্বই একবারে অস্বীকার করেন । তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণগণ সর্বজীবহিতৈষী অপূর্ব মানব ছিলেন । ইউরোপের খৃষ্টীয় পুরোহিত ( Priest ) এবং ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণে অনেক প্রভেদ । ইউরোপের পুরোহিতের মত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বিলাসবিভ্রম এবং বিপুল সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না । অতি হীন চামারের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামগ্রী অধিক ছিল না । (১) তবে যে তাঁহারা শূদ্রদের নিকট হইতে নিজেদের অনেকটা দূরে দূরে রাখিয়া চলিতেন এবং তজ্জন্য কতকগুলি কর্কশ ব্যবস্থাও প্রণয়ন

(১) পিয়ার লোটার ভারত-ভ্রমণ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ও ভূদেবের যত্নে ভারতের ইতিহাস ত্রুটব্য ।

করিয়াছিলেন, সে শুধু আত্মরক্ষার জন্ত। তাৎকালীন শূদ্রদিগের সহিত অবাধ মেলামেশা করিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব হইত।

ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের উপর যে কোনও অত্যাচার হইত ইহারা তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ চিরদিনই স্ত্রীজাতিকে বিশেষ মর্যাদার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে (২)

তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষের মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা নহে। মূর্ত্তি সাধকের দেবতা ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। লোকে শুধু পুতুলের পূজা করে না। (৩)

মন্ত্রাদিরও তাঁহারা বিবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। মন্ত্রাদি Hypnotistদিগের মধ্যে Auto-suggestion মাত্র। (৪)

তাঁহারা বলেন নিরামিষ আহারই মানুষের স্বাভাবিক আহার। নিরামিষ আহারে শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়। গ্রীক জাতিও অল্প মাংসই আহার করিত। জাপানীরাও তজ্জপ। এমন কি ইংলও প্রভৃতি সভ্যদেশেও সভ্যতার প্রাক্কালে বর্তমান সময়ের অপেক্ষা অতি সামান্য মাত্র মাংসই ব্যবহৃত হইত।

কেহ কেহ ভারতবর্ষে জাতিভেদ, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণের অস্তিত্ব তর্কের খাতিরে দেশ মধ্যে স্বীকার করিয়াও সেগুলি যে এ দেশের অধঃপতনের পর্যাপ্ত কারণ তাহা স্বীকার করেন না।

প্রাচীন গ্রীকজাতির বিবিধ ধর্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার ছিল। তাহাদের হেলটদিগের প্রতি ব্যবহার কিম্বা আমেরিকার নিগ্রোদিগের উপর ব্যবহারের তীব্রতা

(২) চন্দ্রনাথের হিন্দু জীবন। The wives of the Greeks lived in almost absolute seclusion. They were usually married when very young.—Lecky's History of European Morals, p. 121, R. P. A. Series.

(৩) মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃপাং চেদ্রোক্ষসাধনী।

অপলকেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তথা ॥১১৭।১৪ উঃ

মহানির্দোষ তন্ত্র।

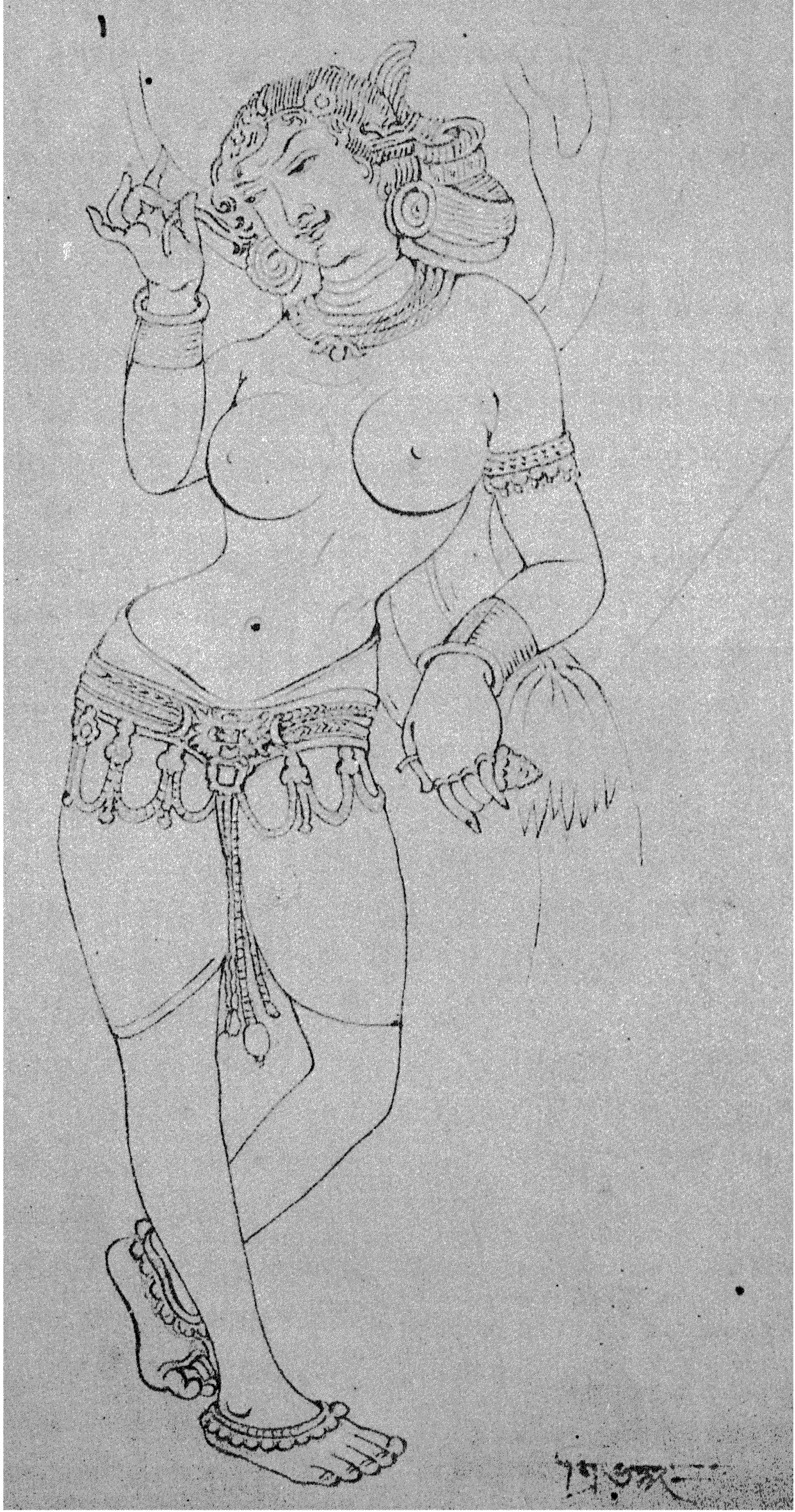
অজ্ঞা বজ্জন্তি বিশেষং পাষণাদিষু সর্কমা

সর্কত্র সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥

বৃহস্পতিরীয় পুরাণম্। ৪৮।২।

(৪) See Meyer's Human Personality.

ভারতবর্ষের জাতিভেদের অপেক্ষা অন্ততঃ কম ছিল না। স্পার্টানদিগের দুর্বল-শিশুসন্তান-হত্যাপ্রণালী, ইউরোপীয়দিগের ডাইনী (Witch) পোড়াইবার প্রণালী যে যথেষ্ট নৃশংস ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকানেরা নিগ্রোদিগের উপর যে নিদারুণ অত্যাচার করিত (এবং এখনও অনেক পরিমাণে করে) তাহাও সর্কজনবিদিত। অথচ আমেরিকা এখন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমওয়েলের সময়ে ইংলণ্ডের বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ামির প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট ছিল এবং তাৎকালীন ইংরাজদিগের আইরিস্দিগের প্রতি ব্যবহার বিশেষ মোলায়েম হয় নাই। অথচ তখন ইংরাজদিগের উঠতির মুখ। মুরগণ স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত ও বিবাহবন্ধন যখন ইচ্ছা উচ্ছেদ করিতে পারিত; অথচ তাহারা বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল এবং মুরদিগের জ্ঞানচর্চার উপরই বর্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপিত। ইউরোপীয় বিবিধ সামরিক জাতিসমূহের মধ্যে বিবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেক আছে। নেপোলিয়নের নিয়তির উপর অগাধ বিশ্বাস সর্কজনবিদিত। ফ্রেডারিক দি গ্রেট সৈন্যধ্যক্ষ নির্বাচন কালে সৈন্যধ্যক্ষের পয় আছে কি না প্রথম জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রসিদ্ধ রুস-সেনাপতি স্বেভেলস্কের একটা মাদুলী ছিল—তাঁহার বিশ্বাস তিনি সেই মাদুলীর বলেই জয়লাভ করিতেন। বর্তমান কালে চোরদীর অনেক জ্যোতির্বিদ ইংরাজী কুসংস্কারের উপর নির্ভর করিয়াই বেশ দু-পয়সা উপার্জন করে। আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার একজন বিখ্যাত সর্কজন বিশেষ মাদুলীভক্ত, কিন্তু মাদুলীর নিতান্ত অভক্ত সর্কজনগণও তাঁহাকে অস্ত্রচিকিৎসার নৈপুণ্যে পরাভব করিতে পারেন নাই। মনুপ্রচলিত বাল্যবিবাহব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর বহুকাল পর্যন্তও যে হিন্দুদিগের শারীরিক অবনতি ঘটে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। প্রাচীনগণের যুগে যাহা শুনিয়াছি এবং নিজেরাও যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, শারীরিক গঠনের প্রকাণ্ডে, স্বাস্থ্যে ও দীর্ঘজীবিতায় আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইউরোপীয়দিগের



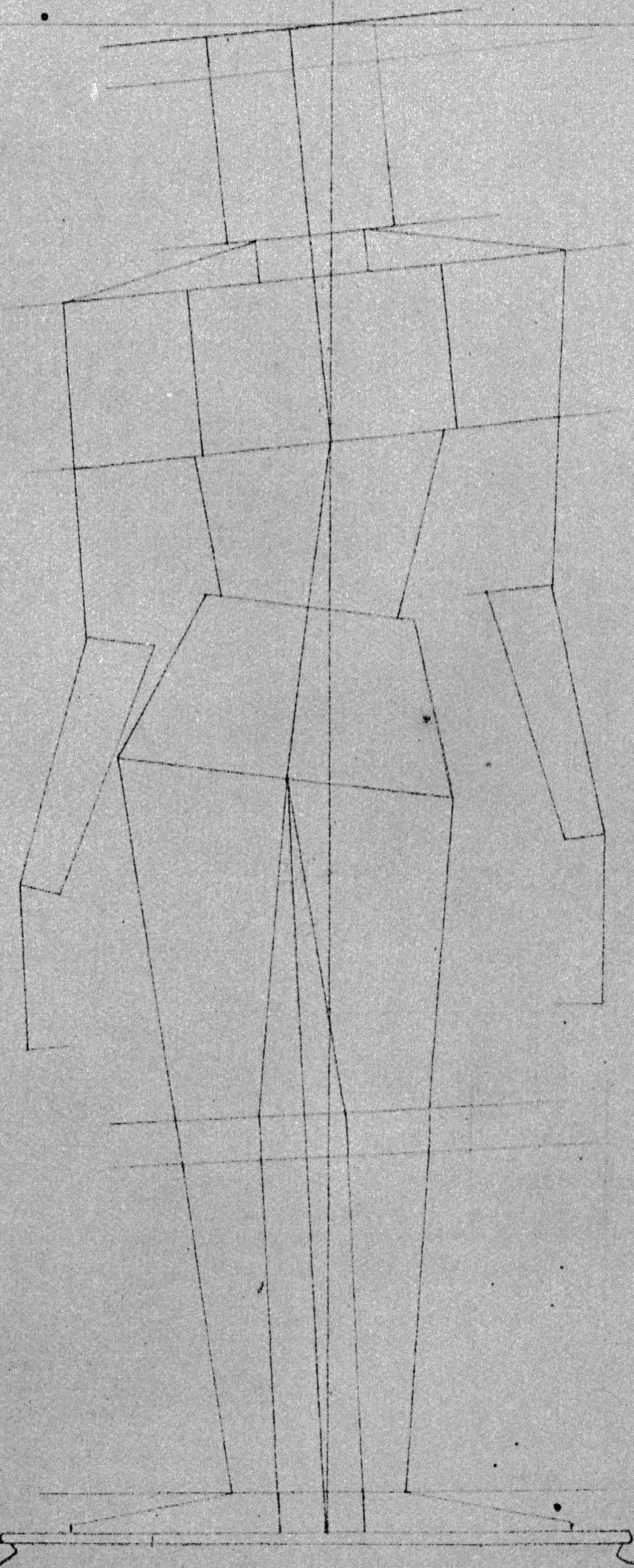




प्रिअ

७ १

• Fig 3









অপেক্ষা কোনক্রমে ন্যূন ছিলেন না। \* বিগত পঞ্চাশ বৎসর হইতে বঙ্গদেশবাসীগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়াছে তদ্বিধে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্বে ইউরোপীয় সমাজসমূহেও অনেকাংশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সলিনের আত্মজীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাৎকালীন আমেরিকান বালকেরা ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বিবাহ করিত এবং তাহাদের বহুসংখ্যক সন্তান জন্মিত। বর্তমানকালে বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে যে-সকল বালক অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত—হিন্দুসমাজভুক্ত বালকগণ শারীরিক, মনসিক, নৈতিক প্রভৃতি কোন গুণেই যে মুসলমান, ক্রিষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি বাল্যবিবাহহীন সমাজভুক্ত বালকগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তাহা শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়। †

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের যাহাতে কোনও

\* লেখক বোধ হয় বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃহের প্রভেদ ভুলিয়া যাইতেছেন। বাল্যমাতৃহ না ঘটিলে বাল্যবিবাহে মাতার বা সন্তানের শারীরিক অবনতি না হইতেও পারে। পূর্বে বাল্যবিবাহ ছিল, কিন্তু দ্বিরাগমন সম্বন্ধে কঠিন শাস্ত্রীয় নিয়ম পালিত হওয়ায় বাল্যমাতৃহ, এখনকার মত বয়সে, ঘটিত না। ইহার প্রমাণরূপ বর্তমান আটমসমাজের অবস্থা দেখুন। তথায় বাল্যবিবাহ থাকিলেও বাল্যমাতৃহ না থাকায় আটেরা হীনবল নহে। যথা—

“Wherever infant marriage is the custom, the bride and bridegroom do not come together till a second ceremony called *mukhlawa* has been performed, till when the bride lives as a virgin in her father's house. This second ceremony is separated from the actual wedding by an interval of three, five, seven, nine, or eleven years, and the girl's parents fix the time for it. &c.”—Census of India, 1901, Vol. I. Part I. p. 433.

† লেখক নিজের ধারণাটি “শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়” বলিয়াছেন। ঐ ধারণা সত্য হইতে পারে, কিন্তু “নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়” বলিলে ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া হইল না। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই। সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা ও তন্মধ্যে বঙ্গবান্ নীতিমান্ মনস্বী ছাত্রের সংখ্যা, এবং সমগ্র ব্রাহ্ম আদির সংখ্যা ও তন্মধ্যে বঙ্গবান্ নীতিমান্ মনস্বী ছাত্রের সংখ্যা, ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া যদি কেহ তুলনা করেন, তবে তাঁহার উক্তি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। নতুবা উহা ব্যক্তিবিশেষের অসুস্থ বা কথার কথা মাত্র। তন্নিম্ন, ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ অল্প দিনের জিনিষ, তাহাতে এখনও উহা ৩।৪ পুরুষের বেশী কালের নয়। তাহার মধ্যে আবার এখনও অনেক বুদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক ব্রাহ্ম বাল্যবিবাহের সন্তান। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বাল্যবিবাহের ফলাফল বিচার করিবার এখনও সময় আসে নাই। তা ছাড়া, কেবল যথাযোগ্য বয়সে বিবাহ হইলেই ত বংশের উন্নতি হয় না। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস,

ভুল ধারণা না হয় তজ্জন্য এইখানে কয়েকটা কথা বলিয়া রাখি। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রচলিত ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথাসমূহের অস্তিত্ব থাকা উচিত কিনা, তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। রাজনীতিক, নীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক বা সমাজরক্ষক এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। বর্তমান লেখক ঐ-সকল উচ্চ উপাধিলাভের জন্ম সচেষ্ট নহেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের জ্ঞায় সত্য অবধারণ করাই তাঁহার উচ্চাশার বিষয়। সত্য তিষ্ঠ বা মিষ্ট হইল বলিয়া তাহার কোনও রূপ পরিবর্তনে বৈজ্ঞানিকের অধিকার নাই। তাঁহাকে জাগতিক ঘটনাবলী স্থিরচিত্তে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, প্রত্যেক ঘটনার কার্য ও কারণ নিরূপণ করিয়া তাহাকে যথাযথরূপ মর্যাদা দিয়া তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এবং এই কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্ম তাঁহাকে তাঁহার নিজের ভাব ও ভাষাকে যথাসম্ভব রাগশূন্য করিতে হইবে

কেহ কেহ কোনও আকস্মিক কারণের উপর ভারতবর্ষের অধঃপতনের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। পানিপথের যুদ্ধে যদি মারহাট্টাগণ পরাজিত না হইত, পৃথীরাম যদি মহম্মদঘোরীর প্রতারণা-বাক্যে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা অন্তরূপ হইয়া যাইত। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালার মুসলমানগণের, ও লালসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা শিখগণের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল; ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। একটু ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, ঐগুলিই পরাজয়ের একমাত্র কারণ নহে; জাতীয় অধঃপতনের কারণ আরও পূর্বে ঘটিয়াছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ যাহারা পাঠ করিয়া-পুস্তিকর যথেষ্ট খাদ্য দিবার এবং রোগে চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা, ভাল শিক্ষালয়ে ভর্তি করিয়া, ভাল গৃহশিক্ষক রাখিয়া, প্রয়োজনীয় পুস্তক যন্ত্রাদি কিনিয়া, শিক্ষা দিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি সুবিধা কাহার কি পরিমাণে আছে, তাহাও বৈজ্ঞানিকের অসুস্থের।

সেলসু রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে বঙ্গের সর্বত্র হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বংশবৃদ্ধি অনেক বেশী পরিমাণে হইতেছে। ইহাতে মুসলমানদের জীবনীশক্তির আধিক্য প্রমাণিত হইতেছে। ইহা কি তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষের একটা প্রমাণ নয়? মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন কম।

—সম্পাদক।

ছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন, সেই বিপুল মহারাটা বাহিনীর পরিচালকবর্গের কি বিপুল অযোগ্যতাই না ছিল। যে কারণ বা কারণপরম্পরা সেই বিপুল বাহিনীকে সুপরিচালিত করিবার উপযুক্ত একজন নেতা উৎপন্ন করিতে পারিল না, অথবা কোন উৎপন্ন উপযুক্ত নেতাকে স্থানে স্থাপন করিতে পারিল না তাহার বিষয় কি কেহ ভাবিয়াছেন? মহাত্মার কণিক প্রভৃতি রাজনীতিকগণের বক্তৃতা পাঠে ও চাণক্যনীতি পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণের কূটরনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনভিজ্ঞতা ছিল না; অথচ যে শত্রু পূর্বে একবার সন্ধিস্তম লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার বাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক হিন্দুবীরগণের স্তুতিদ্রাকে তাঁহাদের নির্ক্স ক্রিত্যর অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিব, না তাঁহাদের অপূর্ব সারল্যের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিব? জাতির মধ্যে এই যে সব নিদারুণ নির্ক্স ক্রিত্য জন্মিতেছিল তাহার কারণ কি? সমাজের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাতেই সমাজমধ্যে বিশ্বাসঘাতকের উদয় হয়। লালসিংহ ও মীরজাফর তাৎকালীন মুসলমান ও শিখসমাজের অধোগত অবস্থার পরিষ্কৃত ফলমাত্র। সমাজ কি প্রকারে নিজের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা বীরের উৎপত্তির পক্ষে সহায়তা করে তাহা ইংরাজসমাজ হইতে গৃহীত একটা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইবে। ইংরাজজাতির অভ্যুদয়কাল হইতে ঐ সমাজে কোনও নামজাদা বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব শুনা যায় না। ইংরাজসমাজের এমনই সুস্থ অবস্থা যে, ঐ সমাজে বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব হওয়াই প্রায় অসম্ভব। ইংরাজজাতির সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে ঐরূপ সুস্থাবস্থার কারণের পরিচয় পাওয়া যায়। Channings, Mrs. Henry Wood প্রণীত একখানি বালকপাঠ্য উপন্যাস। উহাতে বিদ্যালয়ের বালকদিগের আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ ঘেরূপ, বিদ্যালয়ে অনেক ছেঁটু (ছেঁটু অর্থাৎ বদমাইস নহে) ছেলে থাকে এবং তাহারা অনেক অপকার্যও করিয়া থাকে। ভাল ছেলেরা তাহাদের সেই অপকার্য নিবারণের বধাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন-

রূপে কোনও না কতিপয় বালক কোনও অপকার্য করিয়া ফেলে এবং কর্তৃপক্ষ দুষ্কৃতকারীর নাম জানিবার জ্ঞ প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাহা হইলেও স্কুলের ভালই হউক আর মন্দই হউক কোন বালকই কিছুতেই দুষ্কৃতকারীর নাম বলিয়া দিবে না। এমন হইয়াছে কত নিরীহ বালক সন্দেহবশে প্রহারজর্জরিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি সে কিছুতেই তাহার সঙ্গীদের নাম করিয়া দেয় না। যদি কেহ কোনও রূপে নিজের সঙ্গীদের বা অপরাধীর নাম বলিয়া দেয় তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। স্কুলের সমস্ত ছেলে তাহাকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিতে থাকে; শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজের বাপ ভাইও তাহাকে ঘৃণার ও দয়ার পাত্র বিবেচনা করিতে থাকে। সে সমাজে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের এমনই লাঞ্ছনা, যে, সেখানকার অতি বড় কাপুরুষও সমাজে কাপুরুষ ও Sneak বলিয়া অভিহিত হইতে ভয় পায়।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

(জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে)

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, যেগুলিকে সাধারণতঃ ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় যুক্তির দ্বারা দেখিলে সেগুলিকে পর্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রথমেই “জাতীয় উন্নতি জিনিসটা কি?” তাহার একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যিক। যে জাতির সুখের পরিমাণ বেশী সেই জাতিরই যে জাতীয় উন্নতি অধিক এরূপ কোনও ব্যাখ্যা করা সুবিধাসঙ্গত হইবে না। কারণ কি প্রকারে কোন জাতির সুখ হয় তাহা ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই সোজাসুজি জাতীয় উন্নতির যে অর্থ নিরূপিত আছে, সেই অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইংলণ্ড ও জার্মানী উন্নত দেশের আদর্শ, এবং ভারতবর্ষ ও পারস্য অধঃপতিত দেশের আদর্শ; এই উভয় দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের জাতীয় অবনতি ও উন্নতি এই দুটি কথার সংজ্ঞা বাহির করা যাউক। যে দেশ উন্নত সে দেশ স্বাধীন, সে দেশ নিজেই নিজ প্রয়োজনানুরূপ রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, পণ্ডিত,

দার্শনিক, শাসক, শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারে; আর যে দেশ অল্পমত, তাহা নিজের প্রয়োজনানুরূপ ঐসকল সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা-দিগকে আশ্রয় করা করিবার জন্ত পরদেশীয় যোদ্ধার বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহারা নিজেরা শাসনশৃঙ্খলা করিতে জানে না, রাজস্বের ব্যবস্থা করিতে জানে না, তাহারা নিজদের দেশের কোথায় কি আছে তাহা জানে না, এবং কিরূপেই বা সেই-সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় তাহাও জানে না, তাহারা চিকিৎসা-তত্ত্ব, স্নকুমার কলা প্রভৃতি সকল বিষয়েই নিজেরা কিছুই করিতে পারে না; তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। এবং কোনও উন্নত দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিভাবান্ ব্যক্তির এতই প্রাচুর্য্য হয় যে, তাহারা নিজদের দেশের অভাব পূরণ করিয়াও অল্পমত পরদেশ জয় করিয়া সেখানকার সর্ববিধ প্রতিভার কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা অবনত দেশের লোকদের জন্ত চিন্তা করিয়া থাকে, শৃঙ্খলা করিয়া থাকে, চিকিৎসা করিয়া থাকে, শাসন করিয়া থাকে এবং অজ্ঞান যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহা নির্বাহ করিয়া থাকে। অতএব আমাদের উন্নত ও অল্পমত দেশ এই দুই কথার অর্থ অনেকটা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই দেশ উন্নত যে-দেশে পর্য্যাপ্তসংখ্যক সর্ববিষয়িণী-প্রতিভাশালী লোকের সম্ভাব, এবং অল্পমত সেই দেশ যেখানে তাদৃশ লোকের অভাব।

কেহ কেহ বলিতে পারেন কোনও দেশে অল্প সব বিষয়ে প্রতিভাশালী লোকের সম্ভাব 'আছে, কেবল সামরিক প্রতিভাশালীর অভাব, এ কারণে সে দেশের অধঃপতন হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখা যায়।  
উন্নতি প্রায়শঃ \* সর্ববিষয়িণী হইয়া থাকে। যে সময়ে জাৰ্মানীতে মণ্টকে, বিসমার্ক প্রভৃতি সামরিক পুরুষ

\* কিন্তু সব সময়ে নহে। রোমানেরা যখন গ্রীস জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা সাহিত্যদর্শনাদি বিষয়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়া ঐসকল বিষয়ে তাহাদের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল। সভ্যতায় নিকট হইলে, পথ প্রভৃতি জাতি সভ্য রোমকে পরাভিত করিয়াছিল। এইরূপ অনেক অসভ্য অনাৰ্য্যজাতি ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল।—সম্পাদক।

জন্মিয়াছে, সেই সময়ের জাৰ্মানী জ্ঞান বিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ; যে সময়ে ফ্রান্স দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেতৃবন্দ জন্মিয়াছিল সে সময়ে সেখানে বিবিধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বহু প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছিল; এইরূপ ইংরাজদেরও উন্নতি সর্ববিষয়িণী হইয়াছে; আরবদিগেরও তাহাই।

তুর্কদিগের কথা লইয়া কেহ বলিতে পারেন—এই জাতি ত জ্ঞান বিজ্ঞানে কোনও উন্নতি দেখাইতে পারে নাই, তবে ইহারা এতকাল বুলগেরীয়ান্ প্রভৃতি জাতিকে কেমন করিয়া পদানত রাখিয়াছিল? যখন উন্নত অল্পমত জাতিতে সংঘর্ষ হয় তখন উন্নত জাতিই বিজয় লাভ করে। কিন্তু যখন অল্পমতে অল্পমতে সংঘর্ষ বাধে তখন উভয়ের মধ্যে যে উন্নততর সেই বিজয়ী হয়। তুর্কদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান না থাকিলেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বুলগেরীয়ান্দিগের মধ্যে উহাদের চর্চার কোনও প্রমাণ নাই। অতএব সামরিক বলে বসীয়ান্ তুর্কী বুলগেরিয়াকে পদানত রাখিয়াছিল। বুলগেরীয়ান্দিগের যখন উন্নতি হইল তখন আবার তুর্কী পরাভূত হইল।

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি :—“কোন জাতির উন্নতি সেই জাতির বিবিধ-বিষয়িণী-প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা ও তাহাদের ঔৎকর্ষের উপর নির্ভর করে।”

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করা আবশ্যিক। এমার্সনের একটা উপমা এ বিষয়ে আমাদের সুন্দর সাহায্য করিতেছে; তিনি বলেন নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে জন্মিয়াছিলেন, তখন সেখানে ছোট ছোট নেপোলিয়নও বহুসংখ্যক জন্মিয়াছিল; নচেৎ নেপোলিয়নের কৃতকার্য্যতা সম্ভবপর হইত না। ফরাসী সৈন্যগণের মধ্যে এই সকল ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন না থাকিয়া যদি সেখানে তৎপরিবর্তে একদল কাপুরুষ থাকিত তাহা হইলে নেপোলিয়নের যুদ্ধবিদ্যার জারিজুরী কিছুই খাটিত না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও হুএকটা ঘটনা দেখা যাউক। রাণা সঙ্গ মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া এক বিরাট হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেন। তাহার সে বাসনা ফলবতী হয় নাই। কারণ দুইটা হইতে পারে। প্রথম রাণা সঙ্গের প্রতিভা

সেই মহৎকার্যের উপযোগী ছিল না। তিনি স্বীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকায় পরাভূত হইয়াছিলেন বলিলে চলিবে না। বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি পরাভূত করিতে পারেন নাই কেন? আরঙ্গজীবের পুত্র যখন বিদ্রোহী হইয়া রাজপুতদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল তখন তিনি যে কৌশলে রাজপুতগণ ও নিজ পুত্রের মধ্যে অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিয়াছিলেন রাণা সঙ্গ সেরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই কেন? অথবা ইহাও হইতে পারে রাণা সঙ্গের প্রতিভার অভাব ছিল না কিন্তু তিনি যে-জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সাধারণ প্রতিভার এতই অভাব ছিল যে, তিনি তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক পান নাই। মানুষের স্বার্থপরতা ও অন্তঃকণ্ট দোষ চিরকালই আছে কিন্তু বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞগণ মানুষের বিবিধ দোষ সত্ত্বেও এবং তাহার সেই-সকল দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াও কিরূপে তাহার দ্বারা নিজ প্রয়োজনানুরূপ কার্য সমাধা করিয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে চাণক্য ও ইউরোপে বিসমার্ক। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, যদি দুই একজন বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেশমধ্যে জন্মে তাহা হইলেও দেশের উন্নতি হইতে পারে, কিম্বা যদি বহুসংখ্যক অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে তাহা হইলেও দেশের উন্নতি হয়।

ইহাও দেখা যায় যে, কোনও জাতি যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সেই জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং কোনও জাতি যখন অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সেই জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির অভাব ঘটিতে থাকে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটিতে অনায়াসেই উপনীত হওয়া যায় ;—

(১) যে-সকল কারণ জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়তা করে সেই-সকলই জাতীয় উন্নতির প্রকৃত কারণ।

(২) এবং যে-সকল কারণ জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিবার পক্ষে সহায়তা করে সেই-সকলই জাতীয় অবনতির প্রকৃত কারণ।

### তৃতীয় অধ্যায়।

( প্রতিভা-বিজ্ঞান )

অতএব যে-সকল কারণ ভারতবর্ষের প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা কমাইয়া দিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে সেই-সকলই ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। আমরা দিগকে সেইগুলিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কাউন্ট টলষ্টের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর কার্যে দোষ দিয়াছেন। এই পৃথিবী যখন মানুষের দুঃখকষ্টে এখনও পূর্ণ, তখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অধিকাংশ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া গগনের গ্রহতারাগণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা উদ্ভিন্নরূপ দূরহ অথচ লোকহিতচেষ্টাশূন্য গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। টলষ্টের মত যদি কোনও লোক ডারউইনের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে যে, ডারউইন যে Origin of Species প্রভৃতি প্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তদ্বারা মানব-জাতির কি উপকার হইয়াছে? এইসকল পুস্তক কি মানবজাতির অলস জিজ্ঞাসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে বা অন্য কোনও মহত্তর উপকার করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে? এই-সকল প্রশ্নের উত্তরে ডারউইন-শিষ্যগণ সহসা কিছু গোলযোগে পতিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ডারউইন স্বীয় Descent of Man নামক গ্রন্থে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

যখন পৃথিবীতে কোনও প্রতিভার কাজ হয় তখন আমরা সকলেই সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে প্রশংসা করিয়া থাকি। যখন কোন রাজনীতিক কোন নূতন বুদ্ধির পরিচয় দিয়া কোন দেশের উপকার সাধন করেন, কিম্বা কোন যোদ্ধা নূতন সমর-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া বিপক্ষগণকে পরাভূত করেন, কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন বা কোন শিল্পী নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তখন আমরা সকলেই



তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করি, তাঁহারা স্বঃস্ব দেশকে উন্নত করিয়াছেন. বুলিয়া থাকি। যদি কোনও পণ্ডিত এমন কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহার ফলে দেশমধ্যে অজস্র প্রতিভার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ঐরূপ নিয়মের দৃষ্টাও যে দেশের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডারউইন লিখিয়াছেন,—

“মানুষে নিজের ঘোটকের বংশরক্ষা করিবার সময় উহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন দুর্বল ও মৃদুগামী জাতীয় ঘোটক ছিল কি না সে বিষয় সম্যক আলোচনা করে; কারণ তাহার জানা আছে যে, আপাততঃ যে ঘোটকটি খুব দৌড়াইতে পারে তাহার শরীরে যদি কোনও ক্ষীণ জাতীয় ঘোটকের রক্ত থাকে তবে তাহার সন্তানগণের মধ্যে কতকগুলি ক্ষীণজাতীয় হইবার সম্ভাবনা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ উচ্চজাতীয় ঘোটক লইয়া তাহার বংশ-বৃদ্ধি করিলে উৎকৃষ্ট ঘোটক পাইবার জন্ম পূর্বের মত দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয় না। যদিও মানুষে ঘোটকের বংশবৃদ্ধি করিবার সময় ঐরূপ বিবেচনা করিয়া কাজ করে তথাপি সে নিজের বংশ-বৃদ্ধি করিবার সময় পূর্বোক্ত রূপ কোনও প্রকার অতীত ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করা আবশ্যিক বিবেচনা করে না। ইহার কারণ এই যে এখনও লোকসমাজে, পূর্বপুরুষের গুণসমূহ \* কি প্রকারে ও কি নিয়মে অপত্যে সংক্রামিত হয় এবং চারি পার্শ্বের অবস্থাই † বা মানুষকে কতটা গড়িয়া তুলে অর্থাৎ প্রত্যেক মানব তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের জন্ম কতটাই বা পূর্বপুরুষের কাছে ঋণী, কতটাই বা চারিদিকের শিক্ষার কাছে ঋণী—এই-সকল বিষয়ক জ্ঞান সম্যক্রূপে সংস্থাপিত হয় নাই। অতএব প্রতিভা কি নিয়মে জন্মে তদ্বিষয় আবিষ্কারের পূর্বে বংশের বীজ, Heredity ও চতুষ্পার্শ্বের অবস্থাসমূহ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের চর্চাই সর্বপ্রথম হওয়া আবশ্যিক।”

ডারউইন Descent of Man নামক গ্রন্থে যে কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় শিষ্য ও প্রশিষ্য-গণের চেষ্টায় তাহা এক্ষণে অনেকটা সফল হইয়া উঠিতেছে। তিনি নিজের আজীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে যে তরুর বীজকে অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন সেই তরু এক্ষণে মুকুলিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। ডারউইনের পরে প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত বাইসমান বংশক্রম (Heredity) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় Germplasm theory ব্যাখ্যা করিয়া বংশগত গুণের (Heredity) প্রভাবকে ডারউইনের অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়তর স্থান দিয়াছেন।

পরে গ্যান্টন Hereditary Genius নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির

কুলজী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করেন যে, “প্রতিভা বংশগত।” গ্যান্টনই প্রকৃত পক্ষে Eugenics \* বা প্রতিভাবিজ্ঞান নামক নূতন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান কালে আচার্য্য পিয়ার্সন এই বিদ্যার চর্চায় বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত। স্যালিবী প্রমুখ পণ্ডিতগণ Eugenicsএর তত্ত্বসমূহকে জনসমাজে প্রচার করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত গ্যান্টনের পূর্বেও মেগেল প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত উদ্ভিদ ও ইতর জন্তুদিগের মধ্যে বংশক্রমের (Heredity) প্রভাব সম্বন্ধে অনেক পর্যবেক্ষণ করিয়া কতিপয় নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে সেই-সকলের কোনও আদর হয় নাই; এক্ষণে কিন্তু উহাদের বিশেষ আদর হইয়াছে এবং Mendelism সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিবার জন্ম অনেক পত্রিকা ও সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ-সকল পুস্তকের সমালোচনা করা বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে, তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্যক বোধের জন্ম পরবর্তী অধ্যায়ে যে-সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া “প্রতিভা বংশগত” গ্যান্টনের এই মতবাদ সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

(প্রতিভা বংশগত)

উদ্ভিদ ও জীবগণের মধ্যে বংশপ্রভাবের শক্তি বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কে না দেখিয়াছেন যে, দুইটা বীজ—একটা বটের ও অপর একটা নটিয়া শাকের, যাহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে একই প্রকার বোধ হয়, কি বিভিন্ন শক্তি লইয়াই জন্মিয়াছে। একটিকে

\* আমাদের এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে Eugenics নামক তথাকথিত নূতন বিজ্ঞান, এখনও রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার মত অবিসংবাদিত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। ইহার অনেক তথ্যই এখনও অনুমানের অবস্থায় আছে। প্রমাণ, যথা—এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নূতন সংস্করণে Eugenics প্রবন্ধে আছে—

“It can hardly be said that the science has advanced beyond the stage of disseminating a knowledge of the laws of heredity, so far as they are surely known, and endeavouring to promote their further study.”

—সম্পাদক।

\* Heredity. † Surrounding Circumstances.

অর্থে লালিত করিলেও তাহা হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, আর অপরটিকে পরম যত্ন করিলেও তাহা হইতে তিন হাতের বেশী উচ্চ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না। ঐ উভয় বীজের অন্তরে যে শক্তি নিহিত আছে, চারিপার্শ্বের (Environments) অবস্থা ও ঘটনার যেকোনও রূপ সংযোগ ও বিয়োগের ফলে উহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন সম্ভব নহে। গর্দভ হইতে গর্দভ জন্মে এবং ঘোটকের বংশে ঘোটকই জন্মে। গর্দভ হইতে কখনও ঘোটক এবং ঘোটক হইতে কখনও গর্দভ জন্মে না। ঘোটকের পুত্র আহারাভাবে দুর্বল হইয়া গতি-শক্তিতে সুপুষ্টকলেবর গর্দভনন্দনের নিকট পরাভূত হইতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বল ঘোটকের পুত্র যদি খাইতে পায় তাহা হইলে সে ঘোটকেরই মত হইবে, গর্দভের মত হইবে না। বংশক্রম সঙ্কীয় ঐ-সকল তত্ত্ব অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু ও গ্রীক প্রভৃতি জাতিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই তাহাদের শ্রেণীবিভাগ ও জাতিবিভাগের কারণ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইউরোপেও যে বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের মত অপরিবর্তনীয় জাতিবিভাগ না থাকিলেও বিবাহ আদি ব্যাপারে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহারও কারণ “বংশক্রমের অনেকটা শক্তি থাকা সম্ভব” জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার।

কিন্তু বর্তমান সময়ের Eugenics বা প্রতিভাবিজ্ঞান এখনও যে সুসংস্থাপিত হয় নাই তাহার দুইটা কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ উহা অপেক্ষাকৃত নূতন বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল বিজ্ঞান পণ্ড বা জড়পদার্থ অধ্যয়নে ব্যাপৃত তাহাদের যেরূপ সহজে মীমাংসা হয়, মানুষ যে-সকল বিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয় তাহাদের সেরূপ সহজে মীমাংসা হয় না। মানব সঙ্কীয় কোনও সিদ্ধান্ত মানবসমাজের অধিকাংশ বা কিয়দংশ লোকের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে। সেরূপ স্থলে, স্বভাবতই সমাজের কতক লোকে স্বার্থ বা মনোবেগের বশে সেই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ও কতক লোকে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাহাদিগের বংশ ভাল তাহাদিগের প্রতিভাবিজ্ঞানের সপক্ষে মত দিবার একটা স্বত ইচ্ছা

আছে; সেইরূপ যাহাদিগের তাদৃশ বংশগৌরব নাই তাহাদিগের উহার বিপক্ষে মত দিবার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা হয়।

এই-সকল বাধা সত্ত্বেও প্রতিভা-বিজ্ঞান (Eugenics) যে দিন দিন উন্নতি করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণবিদ্যা (Biology) সঙ্কয়ে যাহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের নিকট প্রতিভা-বিজ্ঞানের কথাগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়। বংশক্রমের প্রভাব দেখিয়া তাহারা নিয়তই বিস্মিত হইতে থাকেন। মানুষ ও কুকুরের ক্রমের উৎপত্তির এক এক কালে তাহাদের গঠনগত অসাধারণ সাদৃশ্য থাকে; অথচ এমন এক এক অদ্ভুত শক্তি ঐ দুই ক্রমের মধ্যে নিহিত আছে, যাহার ফলে একটা মানুষ হইবে এবং একটা কুকুর হইবে, ইহার কোনও অশ্রুতি হইবে না। যে নিয়ম সমগ্র জীব ও উদ্ভিদ-জগতে খাটে তাহা মানুষের বেলায় খাটবে না, ইহা হইতেই পারে না। মানবশারীর-বিধানবিদ্যা (Human Physiology) বলিয়া যে শাস্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষাই প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের উপর হইয়াছে; উহার অধিকাংশ পরীক্ষাই ইতর জন্তুদিগের উপর নির্বাহিত হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষার ফল হইতে মানব-সংক্রান্ত বিধানসমূহ অনুমানের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ-সকল জ্ঞানের যাথার্থ্য প্রতিনিয়তই চিকিৎসকগণের চিকিৎসার সাফল্য হইতে প্রমাণ হইতেছে।

কেহ কেহ মানবশিশু শারীরিক ঋতনে পিতামাতার অনুরূপ হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেও মানসিক ও নৈতিক গুণে যে তাহারা উহাদের অনুরূপ হইবে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু শারীরবিধান-শাস্ত্র যতই উন্নত হইতেছে ততই প্রমাণ হইতেছে যে, মানসিক ও নৈতিক গুণগুলি মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির গঠনের বিশেষত্বের উপর ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ও নৈতিক গুণগুলিরও বিশেষত্ব নির্ভর করে। আর ইহা সকলেই জানে যে, বানরের মস্তিষ্ক বানরের অনুরূপ, কুকুরের মস্তিষ্ক কুকুরের অনুরূপ এবং মানুষের, মস্তিষ্ক মানুষের

অনুরূপ। শুধু তাহাই নহে, এক পণ্ডিত সুস্পৃহিত দেখাইয়াছেন যে, এক বংশের ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনে যথেষ্ট ঐক্য থাকে এবং, অপর বংশের ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কের গঠনের সহিত যথেষ্ট অনৈক্য থাকে।

মেণ্ডেল ও তদনুগামীগণের পরীক্ষাসমূহও প্রতিভা-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। মেণ্ডেলের একটা পরীক্ষা বড়ই কৌতূহলজনক। যদি একটা কাল ধরগোসের সহিত একটা সাদা ধরগোসের মিলন হইয়া বংশবৃদ্ধি হয় তবে শাবকদিগের কতকগুলি সাদা ও কতকগুলি কাল হইতে পারে। ঐরূপে উৎপন্ন দুইটা কাল ধরগোস মিলিত হইলে তাহাদের বংশে যে শুধু কাল ধরগোসই জন্মিবে এমন নহে, কতকগুলি সাদা ও কতকগুলি কাল জন্মিবে। এ স্থলে সাদা শাবকগুলি দেখিতে পিতামাতা কাহারও মত নহে, কিন্তু পিতামহ বা প্রপিতামহীর মত। মেণ্ডেলের নিয়ম য়ানুসারে উপর প্রয়োগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—সন্তান পিতার অনুরূপ হইতে পারে, মাতার অনুরূপ হইতে পারে, পিতামাতা উভয়ের গুণের মিশ্রণ পাইতে পারে; অথবা এ সকল না হইয়া অল্প কোনও পূর্বপুরুষের মত হইতে পারে, বা তাহাদের গুণের মিশ্রণ পাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিভা-বিজ্ঞান (Eugenics) নির্মিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আমরা উক্ত বিজ্ঞানের সপক্ষে একটা নূতন প্রমাণ দিব। আমরা দেখিব যে, যদি আমরা প্রতিভা-বিজ্ঞানের প্রধান সূত্র—“প্রতিভা বংশগত” এই কথাটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সুন্দর রূপ কারণ নির্ণয় করা যায়। ঐ সূত্রটি সত্য না হইলে ঐরূপ কখনই সম্ভবপর হইবে না। এরূপ Deductive তর্ক-প্রণালী সত্য নির্ণয়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা অসঙ্গত নহে। আডাম স্মিথ স্বীয় Wealth of Nation নামক গ্রন্থে ঐরূপ তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বাকুল এ বিষয়ের আরও উদাহরণ দিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

( প্রতিভাশালীর সংখ্যাহ্রাসের কারণসমূহ )

আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি যে, জাতির মধ্যে প্রতিভা-শালীর সংখ্যা ও তাহাদের উৎকর্ষের উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

আমরা এক্ষণে বলিতেছি যে, প্রতিভা বংশগত; অর্থাৎ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে।\*

এই দুই প্রতিজ্ঞা হইতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে :—

সামাজিক বা চারিপার্শ্বের যে-সকল কারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবর্গের বংশবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে, সেই-সকল কারণের দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, আর যে-সকল কারণের দ্বারা প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশের হ্রাস হয় সেগুলি জাতীয় অবনতির কারণ।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের বংশ হ্রাস হইবার বা সম্যক বৃদ্ধি না পাইবার নিম্নলিখিতগুলি কারণ হইতে পারে :—

- ( ১ ) সন্ন্যাস।
- ( ২ ) সত্যতা ও বিলাসের বৃদ্ধি।
- ( ৩ ) বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি।
- ( ৪ ) যুদ্ধ।
- ( ৫ ) ব্যাধি।

এক্ষণে আমরা ঐ গুলির আলোচনা করিব।

( ক্রমশ )

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

\* “প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে,” এরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত যথেষ্ট প্রমাণ লেখক দেন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিভা বলিতে কি পরিমাণ বুদ্ধি, উদ্ভাবনী-শক্তি ও কার্যক্ষমতা বুঝিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করা দরকার; অথচ তাহা নির্দেশ করা বড় কঠিন। কিন্তু তাহা না করিলে কোনও প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পূর্বপুরুষের প্রতিভাশালী ছিল কি-না, তাহা কেমন করিয়া স্থিরীকৃত হইবে? আমরা একবার পঠদশায় এক ফ্রেন্সজিষ্টের নিকট পিয়াহিলাম। তিনি আমার মাথার হাত বুলাইয়া ও নানাস্থান টিপিয়া বলিলেন, “তুমি বেশ গণিত জান।” তাহাতে আমার সহপাঠীরা হাসিয়া উঠিল; কারণ অঙ্কে আমি বরাবর কাঁচা। ফ্রেন্সজিষ্ট মহাশয় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “কেন বাপু, হ্রাস কেন? বল ত আট নম্ব কত?” আমি বলিলাম “১২।”

## একতাবিধানের উপায়

কথা কহিবার রীতিটা গণ্ড বুলিয়া বুঝিলেই কেহ গণ্ড-রচয়িতা সাহিত্যিক হয় না। আমরা না হয় সমাজ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে বুঝিলাম যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীর সমষ্টি একটি nation বা জনসঙ্ঘ; কিন্তু উহাতেই জাতীয় অভীপ্সিত ফললাভ করা যায় না। এ কথা সত্য যে, গোড়ায় এই জ্ঞানটি পরিস্ফুটরূপে থাকা চাই যে, আমরা সকল প্রদেশের সকল লোক মিলিয়া সত্য সত্যই একটি জনসঙ্ঘ হইয়া রহিয়াছি; তাহা না হইলে জনসঙ্ঘটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার দিকে দৃষ্টিই পড়ে না। আমরা সকলে মিলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে একটি জনসঙ্ঘের বিভিন্ন অংশরূপে সৃষ্ট রহিয়াছি; সকলে এক সঙ্গে মিলিত না হইলে কোন বিভক্ত অংশই কার্যকর হইতে পারিবে না, আমরা সকলে হাত-ধরাধরি করিয়া না উঠিলে কেহই উন্নতিলাভ করিতে পারিব না, এই-সকল কথা মনের উপর মুদ্রিত না হইলে যথার্থ স্বদেশপ্রেম জন্মিতে পারে না, কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ আশায় বুক বাঁধিয়া রাষ্ট্রীয় মিলন সম্পাদনে ত্রুতী হইতে পারে না।

যাঁহারা দুই একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া আত্মহারা হয়েন নাই, এবং সুস্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, শত প্রভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসীগণ একটি জনসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারাও এ দেশে নানা প্রকারের ধর্মমত

তিনি বলিলেন, “তাহা হইলে এই ত তুমি গণিত জান।” আবার গণিতজ্ঞতা যেভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল, অনেক প্রতিভা-শালী ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের প্রতিভা যদি সেই ভাবে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ত চলিবে না। কোন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের পূর্বপুরুষ বাজার-সরকার বা গোমস্তা ছিলেন ও হিসাব রাখিতেন বলিলে উক্ত পূর্বপুরুষের গণিতবিষয়িণী প্রতিভা প্রমাণিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কেহ বলিতে পারেন কি, কালিদাস, বুদ্ধ, কবীর, হাইদার আলী, শিবাজী, কৃষ্ণদাস পাল, মহেন্দ্রলাল সরকার, সমর্থ রামদাস স্বামী, রাণাডে, প্রভৃতির বংশে প্রতিভা কোথায় ছিল? উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের মাতৃপিতৃকুলের পূর্বপুরুষদের সকলের বৃত্তান্ত ত জানা নাই; জানা থাকিলে বলা যাইত। কিন্তু ইহা একটা আত্মমানিক কথামাত্র, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নহে। অজাতকুলশীলের পুত্র প্রতিভাশালী, আবার প্রতিভাশালীর বংশধরেরা অকালকুম্ভাও, এরূপ বিস্তর ঘটনা দেওয়া যাইতে পারে।

—সম্পাদক।

এবং ভাষাজনিত প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন যে, সকল জাতির ভাষা ও ধর্ম এক করিতে না পারিলে এই জনসঙ্ঘকে রাষ্ট্রীয় মিলন ও রাষ্ট্রোন্নয়ন কার্যে চালিত করা অসম্ভব। ভাষা এবং ধর্মের একতা না থাকিলেও যে জনসঙ্ঘের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধা যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ দিতেছি। ভূমিকা স্বরূপে মিলন সম্বন্ধে দুই একটি ভ্রান্ত ধারণার আলোচনা করিব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্কর সমাজে যে প্রকারের একতা বা বৈচিত্র্যহীনতা লক্ষ্য করা যায় উন্নত সমাজে সে শ্রেণীর একতা পার্থনীয় নহে এবং জন্মিতেও পারে না। বর্করতার চিহ্নই এই যে সকলেই প্রায় পশুপক্ষীর মত আপনাদের কাজ করিয়া যাইতেছে; এবং বংশপরম্পরায় সেই-সকল কার্যে বড় প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। সামাজিক নিয়ম, ধর্মের মত প্রভৃতি এমন ভাবে বাঁধা পড়িয়া আছে, যে, এক সমাজের সকল বর্করকেই নীতি এবং ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একরূপ আচার এবং বিশ্বাস-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল যুগাই সমান বিশ্বাসে তাহাদের বোঝাগুলিকে মানিয়া থাকে। এবং সকলেই সমান দৃঢ়তার সহিত অন্য জাতির অন্নাদি পরিহার করে। আমরা এই বর্করের একতা চাহিনা; এবং জনসঙ্ঘের মধ্যে যাঁহারা বর্কর, অথবা উপযুক্ত উন্নতিলাভে আংশিকরূপে একতাবাপন্ন, তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিদ্যায় চালাইয়া চিন্তা এবং কর্মের বিভিন্নতা উৎপাদন করিতে চাই; জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া সমাজশরীরে জীবনসঞ্চার করিতে চাই।

ভাষাভেদ এবং ধর্মভেদের বাধাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা বুলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্ত এই দুইটি বাধার সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। জনসঙ্ঘের ভাষা যদি এক হইত, তাহা হইলে যে বড়ই কাজ দেখিত, ইহা নিশ্চিত। যাঁহারা এ দেশের ভাষাভেদের কারণে এবং গভীরতা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এ প্রভেদ তিরোহিত হওয়া অসম্ভব। ভারতের যে-কোন ক্ষুদ্র প্রদেশ হইতেও সুইটজারল্যান্ড আয়তনে ক্ষুদ্র; অথচ ঐ উন্নত দেশের সুসংবদ্ধ জন-

সম্ভব মধ্য চারিটি বিভিন্ন ভাষা প্রবল রহিয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া রাষ্ট্রীয় মিলন, সে উদ্দেশ্য এই ভাষার প্রভেদে পরাভূত হইতে পারিতেছে না। একবার যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ উদ্ভূত হয়, তবে এ বাধার কথা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইবেন না। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বিকাশ যখন অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া উঠিবে, তখন হয়ত বা অনেকগুলি নিকটসম্পর্কিত ভাষার মধ্যে একটি ভাষা জাতীয় ইচ্ছার প্রেরণায় অধিক প্রবলতা লাভ করিবে এবং এইরূপে এই বিপুল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র চারি পাঁচটি ভাষা প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া অধিকাংশ শিক্ষিত লোক দ্বারাই অধীত হইবে; কিন্তু জোর করিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে কেহই ভাষার একতা বিধান করিতে পারেন না।

সংস্কৃত গ্রন্থ অধিক পরিমাণে যুক্তপ্রদেশে পাওয়া যায় বলিয়া অগ্ণাণ প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞেরা যুক্তপ্রদেশে ব্যবহৃত নাগরী অক্ষরের সহিত অল্পাধিক পরিচিত। এই অজুহাতে কোন্ কোন্ একতাপ্রার্থী ব্যক্তি ভারতবর্ষময় কেবলমাত্র নাগরী অক্ষর চালাইতে চাহেন। কৌলীণ্যে এবং বয়সে যখন নাগরী অক্ষর অগ্ণাণ প্রাদেশিক অক্ষরের উপরে আসন পাইতে পারে না, তখন কি কোন প্রদেশেই ব্যবহৃত অক্ষরের পরিবর্তে নাগরী অক্ষর প্রচলিত হইতে পারে? অক্ষরপরিচয় হইলেই যে এক প্রদেশের লোক অগ্ণ প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিবে, ইহার প্রমাণও নাই, সম্ভাবনাও নাই। আসামের অক্ষর আমাদের অক্ষর হইতে অভিন্ন; এই সুবিধায় ক জন বাঙ্গালী আসামীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন? মহারাষ্ট্রে নাগরী বালবোধ অক্ষর প্রচলিত আছে; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা ঐ অক্ষরকে আপনার বলিয়া ভাবিতেই পারেন; বঙ্গের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও নাগরী অক্ষরের সহিত পরিচিত। জিজ্ঞাসা করি, এই সুবিধা অবলম্বনে ক জন বাঙ্গালী এবং ক জন যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী মহারাষ্ট্র ভাষা শিখিয়াছেন? আন্ধ্র দেশের তেলুগু অক্ষর এবং কানাড়ার অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অল্প; অথচ এই উভয় প্রদেশের মধ্যে কেহই কাহারও ভাষা জানে না বলিলে কিছুমাত্র

অত্যাক্তি হইবে না। গ্রীক, অক্ষর দুতন্ত্র বলিয়া, অথবা ফরাসী ইটালীয় অক্ষর এক বলিয়া ক জন ইংরাজের পক্ষে গ্রীক শিখিবার বাধা অথবা ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিখিবার সুবিধা ঘটিয়াছে? অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াও ইউরোপের এক দেশের লোক অগ্ণ দেশের ভাষা কিছুমাত্র জানে না। যে আকর্ষণের ফলে পরস্পরকে জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে, সে আকর্ষণ যেখানে জন্মিয়াছে বা জন্মিবে, সেখানে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ হইয়া উঠে। এই প্রাকৃতিক মনের টান কিসে হয়, তাহাই হইল আসল কথা,—তাহাই হইল একমাত্র কথা। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের সহিত পরিচয় লাভ করিতে কোন ব্যক্তিরই এক মাসের অধিক সময় লাগিতে পারে না; এ কথা আমি কিয়ৎ পরিমাণে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া জোর করিয়া বলিতে পারি। অক্ষরের বাধায় কখন কোন গোল উপস্থিত হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

ধর্ম এখন যে ভাবে পালিত হয়, এবং ধর্মের সহিত অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যে ভাবে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্মের প্রভেদ এ দেশে জাতীয় মিলনের পক্ষে একটা বিষম বাধা বটে। ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বিভিন্নরূপে অনুভূত অথবা কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু সে মতপ্রভেদে মানুষে মানুষে বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন? যে দেশে জাতি-ভেদাদির সংস্কারের সহিত ধর্মমত জড়িত নাই, সেখানেও ধর্মবিষয়ে কয়েকটি মানসিক মতবাদ লইয়া বিলক্ষণ ঝগড়া এবং দলাদলি উপস্থিত হয়। এ প্রকারের বিবাদ-বিসংবাদ যে-রকমের গৌড়ামির ফলে জন্মে, সে গৌড়ামি ইউরোপ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে মনে হয়। শিক্ষার সুবিস্তার হইলে এ শ্রেণীর গৌড়ামি ও তজ্জনিত বিবাদ এ দেশেও মন্দীভূত হইয়া আসিবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম প্রথমে যে-দেশে উপন্ন হইয়াছিল, কৃত্রিমভাবে তাঁহারা সেই দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া, দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস হইতে আপনাদিগকে

বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই অসম্ভব কার্য করিতে গিয়া তাঁহারা যে আপনাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহা সমাজবিজ্ঞানের ক, খ, গ, ঘ, পড়িলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। ইউরোপের লোকেরা এক সময়ে heathen ছিল বলিয়া তাহাদের ভাষা এবং ভাবের মধ্যে heathen যুগের অনেক জিনিস রহিয়া গিয়াছে। ভাষা প্রভৃতি সমূলে ধ্বংস করা চলে না, এবং প্রাচীন ঐতিহ্য পরিহাস করা চলে না বলিয়া “থর্” “ওডিন্” প্রভৃতির রাজত্ব-কালের চিহ্ন পরিত্যক্ত হয় নাই। Heathen যুগের সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য বলিয়া খৃষ্টানেরা উহা সময়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টকে ত্রাণকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে, কিংবা হজরত মোহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিলে বেদ, মহাভারত কিম্বা কালিদাসের কাব্য অপাঠ্য হয় না; ভারতবর্ষীয় ধাঁচায় নামকরণ ধর্মবিশ্বাসকে মলিন করে না, কিম্বা যুদ্ধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতির মাহাত্ম্যের স্মৃতি অগৌরবের বিষয় হয় না। এ দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্য সত্যই আরব কিংবা পারস্য হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের বংশেও যখন ভারতবর্ষের রক্তসংশ্লিষ্ট অস্বীকৃত নহে, তখন তাঁহারা এখন ভারতবর্ষের না বিদেশের লোক? বিজ্ঞানের খাঁটি প্রমাণে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সন্তানের শরীর সমান ভাগে পিতা ও মাতার অংশ হইতে উৎপন্ন। এ অবস্থায় যে তিন পুরুষের মধ্যেই বিদেশের রক্ত অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এক্ষণে স্থলে ভাষা, পরিচ্ছদ, নামকরণ প্রভৃতি বিদেশের ধাঁচায় করিতে হইবে কেন? হজরত মোহম্মদের ভ্রম যদি আরবে না হইয়া ভারতবর্ষে হইত, তবে কি তিনি এ দেশের ভাষায় কথা কহিতেন না? কাহারও নাম যদি “রহিম” না রাখিয়া “করুণাপ্রসাদ” রাখা যায়, তাহা হইলে কোন প্রভেদ হয় কি?

বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে আমরা একটি সহরে একটি খৃষ্টান পরিবারের প্রতিবেশী ছিলাম। কার্তিক মাসে দেওয়ালির দিন আমাদের ঘর প্রদীপ দিয়া সাজাইয়াছিলাম দেখিয়া খৃষ্টান বাড়ীর বালকবালিকারা

আপনাদের গৃহে প্রদীপদান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সহসা সেই বালক-বালিকাদিগের মাতা যখন গৃহে আসিয়া এই প্রদীপাবলী দেখিলেন, তখন তিনি বালকদিগের আনন্দে আনন্দলাভ না করিয়া যে ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, সেই হাস্তকর ভাষা কখনই ভুলিতে পারিব না। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কাণ ধরিয়া বলিলেন,—“আদমের ঘরে পাপ আনিয়াছিল সয়তান, আর আমার ঘরে আজ পাপ আনিয়াছিস্ তুই!” বিদেশী ঐতিহ্য-ইতিহাস টানিয়া আনিয়া মানুষ এমন করিয়া কৃত্রিমভাবে ভাষা গড়িতে পারে, তাহা সেই প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম। গ্রীক পুরাণ অবলম্বন করিয়া ইউরোপের কবিরা কাব্য রচনা করেন, এবং উহার দৃষ্টান্ত ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; মাইকেল মধুসূদন দেশের পুরাণ-ইতিহাস লইয়াই কবিতা লিখিয়াছিলেন। ধর্মের নামে কোন প্রকার বিকৃত বিজাতীয় এবং অযৌক্তিক অনুষ্ঠান ও আচরণ যখন সুশিক্ষার ফলে এবং সুবুদ্ধির উদয়ে দূরীভূত হইবে, তখন কোন প্রকার ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা জাতীয় একতার অন্তরায় হইতে পারিবে না।

ধর্মবিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এ দেশের জাতিভেদের মূল অত্যন্ত দৃঢ়। যে-সকল জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকার করে না, কিংবা কোন প্রকারে ব্রাহ্মণাশাসনে শাসিত নহে, তাহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যাহার সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত অগাধ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া সম্প্রদায়নিষ্ঠ বা বংশনিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক বাধন একটুখানি শিথিল হইলেই এই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া কেহ কাহারও অঙ্গুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না! এই জাতিভেদের ইতিহাস, প্রকৃতি, এবং সুফল-কুফলের আলোচনা এ প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে করা অসম্ভব। এখানে কেবল এই একটি কথাই বিচার করিব যে, এই জাতিভেদপ্রথা ভারতীয় জনসমাজের একতার পথে বাধা কি না।

এ দেশে এক্ষণে অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়,

যাহারা জনসঙ্ঘের একতা প্রার্থনীয় বলিয়াই মনে করেন না। ইহাদের অভিমতি এই যে, ইহারা স্নান করিয়া, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, মানুষ নামক ঘৃণ্যজীবের স্পর্শে অশুচি না হইয়া নির্জনে ধর্মসাধন করিবেন, এবং ঐ সাধনার ফলে স্বর্গে যাইবেন অথবা ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন; অন্তান্ত লোকেরা বিবাদ করুক বা একতা করুক, মরুক বা বাঁচুক, তাহাতে (অর্থাৎ এই মায়ার খেলাতে) তাঁহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা এই সাধক-দলের ব্রহ্মপরিণতি কামনা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের মতবাদ লইয়া তর্ক করাটা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করি। যাহারা জনসঙ্ঘের মিলনকামনা করেন, অথচ জাতিভেদ বজায় রাখিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছি। এই শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন রকমের তর্কযুক্তি ক, খ প্রভৃতির দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করিতেছি।

• (ক) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যে-সকল জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং মতবাদ দ্বারা শাসিত, তাহারা বিশ্বাস করে, যে, পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষেরা বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কাজেই এক জাতি যদি অন্য জাতিকে স্পর্শ না করে, কিংবা অন্য জাতীর জলগ্রহণ করা পর্য্যন্তই যথেষ্ট মনে করে, তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে বিবাদ বা বিরোধ উপস্থিত হইবার কোনই কারণ থাকে না। ইহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে ইউরোপের নিম্নস্তরের লোকেরা এই পূর্বজন্মের কর্মফল মানে না বলিয়াই আপনাদের ভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, এবং উচ্চ হইবার প্রত্যাশায় ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা এই পূর্বজন্ম এবং পূর্বজন্মের কর্মফল প্রভৃতি অত্যন্ত ভ্রান্ত-সংস্কার বলিয়া মনে করিয়া থাকি বটে; কিন্তু এ কথা স্বীকার করি যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে মানুষ আপনার অত্যন্ত হীনভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে; এবং কোন প্রকার উন্নতিলাভের জন্য উৎসাহী বা উদ্যোগী হয় না। যাহারা রাষ্ট্রোন্নয়ন কামনা করেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর সম্ভাষণ এবং উন্মোগহীনতা অশুভ বলিয়াই বিচার করিবেন। সে যাহাই হউক, আমরা

কখনই আশা করিতে পারি না যে, বর্ষের সমাজে ধর্মের মতবাদ প্রভৃতিতে যে-প্রকার একতা এবং অটলতা দেখা যায়, এ কালের শিক্ষাবিস্তারের যুগে সেই প্রকার ভাব কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে। বঙ্গদেশে যাহারা চণ্ডাল আখ্যায় অতি হেয় পদবী পাইয়াছিল, এখন তাহারা দলে দলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং শুনিয়াছি যে, কোন কোন স্থলে ঐ জাতির শিক্ষিত ব্যক্তির বিচারকের আসনে বসিয়া অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উকিল কর্তৃক “ভজুর” বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। সুবিধা পাইলে সর্বত্রই যখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ পদবী লাভ করিতে ছাড়ে না, এবং উচ্চ পদ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর লোকের উপর প্রভুতাবিস্তার করিতে পারিলে সুখী হয়, তখন আর এ কথা বলা চলে না যে, কর্মফলের কথা কল্পনা করিয়া যে যাহার আপনার ভাগ্য লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। আমরা যাহাদিগকে নীচ বলিয়া মনে করি, তাহারা যদি নীচতাকে অগৌরব মনে করে, তবে কি উচ্চ-নীচের মধ্যে মনোমালিণ্ড ঘটবে না, বিবাদ বাড়িবে না? জাতিভেদ যে আমাদের একতাবিধানের পথে বিষম অন্তরায়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

(খ) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখন যখন জাতিভেদটি আংশিকরূপে আহাঙ্গাদির সম্পর্কে এবং সম্পূর্ণরূপে কেবল বিবাহে প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হইয়া থাকে, তখন জাতিতে জাতিতে বিরোধ হইবে কেন? স্বীকার করি যে, ভারতবর্ষ হইতে বর্ণভেদ উঠিয়া গিয়াছে; এখন ‘কাল বায়ুণ এবং কটা শূদ্র’ একটা আকস্মিক বিষয়-মাত্র নয়। এ কথাও স্বীকার করি যে, এ কালের বিধি-ব্যবস্থার ফলে উপার্জনের উপায় স্বরূপে যে যে-পন্থা পাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিতেছে বলিয়া কর্ম-ভেদের জাতিভেদও উঠিয়া যাইতেছে। বংশনিষ্ঠ প্রকৃতি বজায় রাখিবার সংকল্পে বিবাহ বিষয়ে জাতিভেদ রক্ষিত হওয়া উচিত কি না, এবং উচিত হইলেও উহা কত দূর পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে, এবং কত দূর পর্য্যন্ত প্রাচীন বান্ধন ছিঁড়িয়া দিতে হইবে, এ-সকল কথার স্বতন্ত্র বিচার করিয়া পূর্বেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। যদি কেহ বিবাহ

এবং আহার বিষয়ে জাতিভেদ রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তাঁহাকেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কার্য জনসংজ্ঞার একতাবিধানের পথে বাধা কি না, এবং ঐ প্রকার জাতিভেদ থাকিলে জাতিতে জাতিতে এবং প্রদেশে প্রদেশে মিলন এবং প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে কি না। প্রত্যক্ষ এবং সর্বজন-পরিচিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রশ্নটির আলোচনা করিতেছি।

আয়র্লণ্ডের লোক হউক, স্কটল্যান্ডের লোক হউক বা ইংলণ্ডের লোক হউক, তাহারা ঐ প্রদেশত্রয়ের যেকোন স্থানে অর্থ উপার্জন করিয়া নিশ্চিত মনে আপনাদের চিরস্থায়ী আবাস রচনা করিতে পারে, এবং ঐ আবাস-স্থানের প্রদেশটিকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে। জন্মে আইরিশ হইলেও সে ব্যক্তি অনায়াসে ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করিতে পারে, সে অনায়াসেই ইংলণ্ডে বাস করিয়া প্রাদেশিক বিভিন্নতা বিস্মৃত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীকে যদি বঙ্গের বহির্ভাগে বাস করিতে হয়, তবে কি সে এই নূতন বাসের প্রদেশটিকে অথবা ঐ নূতন প্রদেশের লোকদিগকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে? যদি আমি আমার সন্তানদিগের বিবাহের জন্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ খুঁজিতে বাধ্য হই, এবং ঐ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান আমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হয়, কিংবা প্রবাসবাসের সময়ে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয় যে, আমার পরিবারের কেহ প্রবাসে দেহ-ত্যাগ করিলে মৃতের সৎকারের জন্ত খাঁটি নিজের জাতির লোক কোথায় পাইব, তাহা হইলে কি কদাচ কোন প্রদেশ আমার আপনার হইতে পারে? কেহ মরিলে মড়া ফেলিবার লোক মিলিবে না বলিয়া আশঙ্কা করিয়া অনেক সরকারী কর্মচারী যে উৎকল ও বিহার হইতে বঙ্গদেশে যাইবার জন্ত দরখাস্ত করিয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। জাতিভেদের অতি দৃঢ় বাধনের কথা দূরে থাকুক, যদি একজন বঙ্গের ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ অথবা প্রদেশের ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সঙ্ঘস্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি তিনি কর্মক্ষেত্রের প্রদেশটিকে আপনার বলিয়া ভাবিতেন না? বিহারী এবং ওড়িয়া আমাদের কেহ

নহে বলিয়া মনে করিয়া থাকি; এবং সেই জন্তই ঐ সকল প্রদেশের সহিত কদাচ আমাদের সন্তান স্থাপিত হইতে পারে না। আমার দস্তপ্রিয় বাঙ্গালী বলিতে পারেন যে, আমরা উন্নততর বলিয়াই বহিঃপ্রদেশের লোকদিগকে তুচ্ছ করিয়া থাকি, এবং সেই জন্তই মনের জ্বালায় ঐ প্রদেশের লোকদিগের মনে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জন্মে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কি অনুন্নত অশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ঐরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন? অনুন্নত ব্রাহ্মণবংশের সহিতও কি উন্নত ব্রাহ্মণেরা সঙ্ঘস্থাপন করিতে কিংবা সৌজন্তের সহিত আচার-ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? সকল সুশিক্ষিত কিংবা পাস-করা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই কি উৎকলের সুশিক্ষিত অথবা পাস-করা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উন্নততর? পরীক্ষা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে যাহাদের সহিত বৈবাহিক সঙ্ঘস্থাপন করা চলে না, যাহাদের সহিত আহারাদিতে একত্রে মিলিত হইয়া সামাজিকতা করা চলে না, তাহাদের প্রতি কদাচ প্রাণের টান জন্মিতে পারে না। জাতিভেদ জিনিসটি স্বর্গলাভ এবং ব্রহ্মহত্যার যতই উপযোগী হউক, উহা যে সামাজিক উন্নতির পথের কণ্টক, জাতীয় মঙ্গল অনুষ্ঠানের মস্তকে অভিসম্পাত, এবং জনসংজ্ঞার মিলন স্থাপনের পক্ষে ঘৃণিত অন্তরায়, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

(গ) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কোন-নাকোন রূপে মানব-সমাজে জাতিভেদ থাকিবেই; ইউরোপে ধনী দরিদ্র লইয়া জাতিভেদ আছে, এবং ঐ জাতিভেদ এ দেশের জাতিভেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদার্থ। এ কথার উত্তরে প্রথমে বলিতে পারি যে, যদি জাতিভেদ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যেকোন প্রকারে উহা থাকিবে স্বীকার করিলেও উহা রক্ষা করিবার অনুকূলে কোন কথা বলা চলে না। সমাজের অনেক পাপই মানবের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী বলিয়া সন্দেহ হয়; তাই বলিয়া কেহ পাপের প্রশ্রয় দিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, যখন প্রাকৃতিক নিয়মে ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ হইবেই হইবে, তখন সে জাতিভেদ কেবল ইউরোপেই আছে, না ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি



জাতিভেদের দেশেও উহা সত্যযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে? “ধনী দরিদ্রকে উপেক্ষা করে ও পীড়ন করে,” “অর্থ থাকিলেই মানুষের অহঙ্কার জন্মে,” “অর্থ থাকিলেই দুর্বল বলবান হয় এবং মূর্খ পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়,” এ-সকল প্রবচন কি ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চাণক্যের নীতিগ্রন্থ পর্য্যন্ত সর্বত্রই দেখিতে পাই না? এমন কোন্ যুগ ছিল, যখন রাজার দ্বারে গুণবান পণ্ডিতেরা প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেন না, এবং রাজার অজস্র স্তুতিবাদ গাহিতেন না? বৈদিক যুগের গৃহস্থের ব্যবস্থায় কি নাই যে ব্রাহ্মণের গৃহেও রাজা অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে নিজে জল লইয়া রাজার পা ধোয়াইয়া দিতে হইবে? সুরশ্রেষ্ঠদিগের অংশে রাজার উৎপত্তি বলিয়া কোন্ ব্রাহ্মণ না রাজাকে পূজ্য বিবেচনা করিতেন? ধন অর্থ যখন ক্ষমতা, তখন কোন সমাজেই কোন যুগেই ধনীর প্রভাব অল্প বলিয়া লক্ষিত হয় না। যাহারা সুশিক্ষাসত্ত্বেও কাপুরুষ, তাহারা সকালে-একালে, স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই নীচ লোভের খাতিরে ধনীর গোলাম হইয়াছিল, এবং হইয়া থাকে; তাহা না হইলে ইউরোপেই হউক, আর ভারতেই হউক, যথার্থ মাহাত্ম্যের কাছে ধনীকে মাথা নোয়াইতেই হয়। সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহারা ধনী নহেন, তাহারা যদি নির্কোষ না হয়েন, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়াই তাহারা ধনীদিগের সহিত অনেক বিষয়ে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন। যে-সকল ভোগের বা লোভের সামগ্রী অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ক্রীত হয়, হয়-ত বা সে-সকল পদার্থের ব্যবহার ধনীর পক্ষে কথঞ্চিৎ স্বাভাবিকভাবেই দোষযুক্ত নয়। কিন্তু দরিদ্রেরা যদি সামাজিক সন্মিলনে ধনীর দলের সহিত মিশেন, তাহা হইলে অলক্ষ্যে তাহাদিগের নিজের বা তাহাদের সম্মানদিগের মন ঐ ভোগবিলাসের পদার্থাদির দ্বারা চালিত বা উদ্বিগ্ন হইতে পারে। তাহা হইলেই অলক্ষ্যে দরিদ্রের ভাগ্যে অনেক নৈতিক অধোগতি ঘটিতে পারে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক দরিদ্রকেই মাথা উঁচু করিয়া ধনীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রে প্রভেদের সকল দেশেই এ নৈতিক সুশিক্ষার অভাব দেখিতে পাওয়া

যায় না। তৃতীয় কথা এই যে, যে দেশে আমাদের মত বিভাগ নাই, কিন্তু ধনী-দরিদ্রে জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা উল্লেখ করি, সে দেশে কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের জাতিভেদ সত্ত্বেও জনসংঘের একতা পূর্ণরূপে রহিয়াছে। ঐ প্রভেদ অপ্রার্থনীয় বলিয়া বিচারিত হইলেও প্রমাণিত হইল না যে জাতীয় একতাবিধানের পক্ষে ঐ প্রভেদ একটা বিষম রকমের বাধা। ধনলাভ করিয়া সকলের পক্ষে ধনী বলিয়া স্বীকৃত হইবার পথ যে উন্মুক্ত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু গুণে বড় হইলে মানুষে সভাসমিতি করিয়া গুণীকে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নীত করিয়া দিবে, এবং গুণহীনতার জন্য উচ্চজাতির লোককে নীচজাতির মধ্যে বসাইয়া দিবে, ইহা কেহ কোন প্রকারে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন না। জাতির সহস্র সহস্র লোকের দোষ গুণের এই পরীক্ষা কে লইবে, এবং এই পরীক্ষায় পাস বা ফেল হওয়া কে কে মাথা পাতিয়া লইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? মনকে চোখ ঠারিবার জন্য যাহারা এই-সকল অসম্ভব কথা কল্পনার বলে রচনা করিয়া থাকেন, তাহারা তর্কিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে থাকুন, কিন্তু তাহাদের কথায় কাহারও কিছুমাত্র উপকার হইবে না।

জাতিভেদ অনুসারে ব্যবসায়-ভেদ হইয়া এক সময়ে যদি উহা দ্বারা শিল্পাদির উন্নতি হইয়াছিল, এখন আবার তেমনি ব্যবসায়-ভেদের নূতন বিধিবিধান হইবার দিনে উহা তেমনি আমাদের সকল উন্নতির বাধা হইয়া রহিয়াছে। আমরা যদি নীচ স্বার্থপরতার অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া জানের শুভ আলোকে বসিয়া রাষ্ট্রায়ন সংকল্পে প্রীতির মন্ত্র জপ করিতে পারি, তাহা হইলেই এ কণ্টক, এ বাধা, এ অভিসম্পাত দূরীভূত হইতে পারিবে, নচেৎ নহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

## পল্লীচর্যা-বিধান

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসীরা রোগে ও অনাক্ষেপে ক্রমশঃ শীর্ণ এবং হীনবল হইয়া

পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্প সমুদয়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসীগণের ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্তই আমরা ক্রমশঃ দীন হীন হইয়া পড়িতেছি; কারণ—(ক) সকল দেশেই পল্লীবাসীগণ সমাজের প্রধান বল ও অবলম্বন স্বরূপ; (খ) আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী; সুতরাং নগর অপেক্ষা গ্রামগুলিরই লোকসংখ্যা এবং সমাজ-শক্তি অধিক; (গ) অতীত কালে পল্লীগ্রামগুলিতেই আমাদের সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল; ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মত নগরগুলিকে অবলম্বন না করিয়া পল্লীগ্রাম সমূহেই পরিপুষ্ট হইবে, তাহা না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের পল্লীবাসীগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহায়ত্বের অভাব নাই; সকলে সমবেত হইয়া কার্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অঙ্গুষ্ঠানেই সম্যক ও সুচারুরূপে প্রবর্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। দরিদ্র এবং দুর্বল কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী একক হইয়া কাজ করিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষক-বিশ্বক—একে একে স্বতন্ত্র-ভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী গঠন করিবে। এই উপায়ে তাহারা অল্পসুদেই মহাজনের নিকট কর্জ পাইবে; সকল কৃষকগণের অর্থসাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও সুস্থ সবলকার বৎস উৎপাদনের উপায়

বিধান করিতে হইবে; সাধারণ গো-শালা স্থাপন করিয়া গোপগণকে সমবেত ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধি রক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) শিল্প-বিশ্বক—শিল্পীগণ ব্যক্তিগত ভাবে পাইকারিদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পসুদে মহাজনের নিকট কর্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থসহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্য-বিশ্বক—কৃষকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দালাল ও পাইকারিগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ক্ষায়া লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকার স্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেত-প্রণালীতে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সংঘত করিতে হইবে; খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য-গোলা স্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীগণের নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না রাখিয়া পাইকারী দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামজাত শিল্পদ্রব্যাদির ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয় তাবৎকাল শিল্পীগণকে আহাৰ্য্য ও বস্ত্রাদি কর্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি-এবং শিল্প-জাত দ্রব্যসামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্ত পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষা-বিশ্বক—গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কৃষিক্ষেত্রে

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্যপ্রণালী সৰ্ব্বক্ষে .শিক্ষা দিতে হইবে ; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে ; ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র, সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ-দ্রব্য-সামগ্রী সমবেত ভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে ; রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমুদয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ; স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে ; পুল্লীগ্রামে ফকির, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

• (ঙ) স্বাস্থ্য বিষয়ক—পল্লীবাসীগণের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বন-জঙ্গল পরিষ্কার, নদী, খাল, পুকুরিণী ইত্যাদির সংস্কার সাধন, পানীয় জলের জন্ত পুকুরিণী কূপাদি খনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারিভয়ের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; দেশের গাছ-গাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; পল্লীগ্রামবাসীগণের শ্রম-ময় জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লী-ক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে তাহার জন্ত গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠ কল্যাণকর্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের

জন্ত দেশের শিক্ষিত, ধনী এবং জমিদারবর্গকে মুক্ত-হস্ত ও সর্বদা সচেত্বে থাকিতে হইবে।

• ত্রীরাধাকমল যুথোপাধ্যায়।

## গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে সমরোপযোগী করিবার জন্ত—সংস্কৃত করিবার জন্ত—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে সমাজের সর্বত্র জাগরণের চিহ্ন ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। বাঙ্গালার নানাস্থানে বহুবর্ণের সভাসমিতি স্থাপিত হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ও সাধারণে প্রচার করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সদগোপ, সাহা, সুবর্ণ-বণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনেকেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই উন্নতির মূল। চিরকাল লোকে পরপদানত রহিবে কেন? এই জন্তই আপনাপন সম্প্রদায়কে উন্নত করিয়া সমাজমধ্যে উচ্চতর স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। ইহা অবশ্য শুভলক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা অবশ্য উদ্ভিদ-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরাদিগের মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদ না আছে তাহা নহে। সুতরাং মহাজনদিগের পথ অনুসরণে আমরাদিগেরই বা দোষ হইবে কেন? আমরাও ত অনেককাল ধরিয়া এই বাঙ্গলাদেশেই লালিত পালিত হইতেছি। **সুতরাং** আমি যদি নিজ সম্প্রদায়ের গৌরবকাহিনী অল্পবিস্তর কিছু বর্ণনা করি তাহা হইলে লোকে আমাদের এই অপূর্ব-কাহিনী না শুনিবে কেন?

জাতিতে উদ্ভিদ হইলেও অশ্বখ, বট, শাল প্রভৃতির ন্যায় আমরা উচ্চ নহি, একথা স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও হস্তী অপেক্ষা গৌজাতির আদর ও প্রতিপত্তি কম হয় নাই। গুণ থাকিলেই লোকের নিকটে সম্মান লাভ করা যায়। আমরাই বা বঞ্চিত হইব কেন?

বেদ ও জেন্দাবেস্তারি প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে

আর্য্যজাতির আদি-নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ায় ; কিন্তু চুংখের বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরাদিগের আদি বাস-ভূমির সন্ধান করিতে পারি নাই। কেহ বলেন আমরা চীন হইতে এদেশে আসিয়াছি। আদি-নিবাস সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিলেও ইহা ঐক্য সত্য যে আমরা এখন আর্য্য-দিগের ঞায় পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি। কুসুমফুল নামক আমরাদিগেরই এক সম্প্রদায় জাতি আদি-নিবাস এই ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। \* সৌধীন ফরাসীদেশেও উহার রংএর বিন্দুমাত্র আদর কমে নাই।

পূর্বকালে এই বাঙ্গালাদেশেই আমরাদিগের কত আদর ছিল। লোকে আদর করিয়া আমরাদিগকে চয়ন এবং দেবপূজার জন্ত ব্যবহার করিত। তখন এত সব নার্সারি ছিল না। কাজেই গোলাপের কলম টবে চড়িয়া গৃহ-স্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিত না। আশ্রয়প্রার্থী উপযাচককে প্রত্যাখ্যান করাও ত অভদ্রতা। কাজেই বাধ্য হইয়া আমরাদিগকে এখন একটু স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এই আশ্রয়দানই আমরাদিগের কালস্বরূপ হইয়া পড়ে। রূপের মোহিনী মায়ায় গৃহস্থ মুগ্ধ হইয়া যায়। গৃহে কোন কোন কুটুম্বের স্থান হইতে একবার আরম্ভ হইলে যেমন ভ্রাতৃপুত্রাদি পরি-জনবর্গকে ক্রমে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়, আমরাও সেইরূপ প্রেমাগ, এমন কি কাঠগোলাপদিগকেও ক্রমে পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। রূপেগুণে আমরা এই-সকল কাঠগোলাপ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি, কিন্তু পোড়া অদৃষ্টের দোষে গৃহে স্থান পাই না। আমরা বেল, জুই, প্রভৃতির ঞায় দুঃখফেননিভ গুল নহি, কিন্তু আমরাদিগের অনেক জাতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বটে। আমরাদিগেরই এক সম্প্রদায় গোলাপের বর্ণ অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমরাদিগের অধিকাংশেরই

বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য। পূর্বে লোকে মালা গাঁথিয়া আমরাদিগকে গলদেশে ধারণ করিত ; এখন কিন্তু উৎসব উপলক্ষে সদর দরজায় ও, বিবাহ বাটীতে ছালা-তলায় কদলী বৃক্ষের উপরে আমরাদিগকে স্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার বারান্দায় দেবদারু ও নারিকেল পত্রের উপরে আমরাদিগকে রক্ষা করে। আমরাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অশ্রম। গোলাপের কথা দূরে থাকুক জবাফুলও এরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে সম্মত হয় কি না সন্দেহ।

এ পোড়া দেশে ত গুণের আদর নাই ; লোকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। এই বাঙ্গালাদেশে বহুকাল ধরিয়া বস-বাস করিলেও আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি যে—

অল্পানামপি কল্পনাম্ সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।

তুণৈশ্চ গণত্বমাপন্নৈব দ্বন্ধস্তে মন্তদন্তিনঃ ॥

তাই আমরা বহুসংখ্যক একত্র বসবাস করিয়া থাকি। আমরা পুরুষাত্মক্রে জগতে এই সত্য—একতার উপকার—প্রচার করিয়া আসিতেছি, কিন্তু বাঙ্গালীরা এতদূর দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা অসার সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আবশ্যক বিবেচনা করে না। যাহারা আমরাদিগকে প্রত্যহ দেখিয়া থাকেন, এমন কি যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দেবপূজার জন্ত আমরাদিগকে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অনেকেই জানেন না যে আমরা একটিমাত্র ফুল নহি। সাধারণ অবস্থায় লোকে যাহাকে একটিমাত্র গাঁদাফুল বলিয়া মনে করে উহা যে বহুসংখ্যক ফুলের সমষ্টি—একএকটি পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence) তাহা কি কেহ লক্ষ্য করেন ?

মনুষ্যসমাজে যেমন উন্নত অবনত দুই সম্প্রদায় থাকে, আমরাদিগের মধ্যেও সেইরূপ আছে। যাহারা অযত্ন-সত্ত্ব, স্বভাবজাত, তাহারাই “ফকিরে বা টিরে” নামে কথিত হইয়া থাকে ; আর যাহারা গৃহস্থামীর যত্নে প্রতি-পালিত হয়, কলম হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি তাহারাই “চাপ” গাঁদা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

আমরা অতি নিরীহ জাতি, হিংসাকরা কাহারে বলে তাহা আদৌ জানি না। গোলাপফুল তুলিবার সময় একটু অসাবধান হইলেই কণ্টকে কত বিস্তৃত হইতে হয়,

\* Safflower ( কুসুমফুল ) (originally from India) furnished a dye soluble in alcohol but is now cultivated in Asia, America and nearly over the whole of Europe.”  
—History of the Vegetable Kingdom by Rhind.

কিন্তু আমরা হ্রস্ব করিয়া বলিতে পারি, আমাদের কেহ কখন কাহারও সহিত এরূপ অভ্রবাবহার করে নাই। আমরা নিষ্কটক বলিয়া শিশুরা পর্য্যন্ত আমাদের ঘাড় মোচ্ড়াইয়া পিতামাতার ক্রোড় হইতে আমাদেরকে বিচ্যুত করিতে পারে। আমরা ভ্রাতা-ভগিনীগণ যে, মার কোল জুড়িয়া আজীবন একস্থানে বাস করিব পোড়া অদৃষ্টে সে সুখ লেখে নাই। আমরা যখন আনন্দে ভ্রাতাভগিনীগণ মিলিয়া মাতার কোল আগো করিয়া থাকি, পোড়া লোকের সে দৃশ্য চক্ষুশূল হইয়া উঠে। কেহবা মালা গাঁধিবাব জন্ত, কেহবা বেগট অর্থাৎ ফটক সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে, আবার কেহবা বিনা কারণে আমাদের বস্তুচ্যুত করে। হৃৎখের কথা বলিব কি, মধ্যে মধ্যে বেড়া ভাঙিয়া গরুবাছুরেরা পর্য্যন্ত আমাদের নিষ্কটক দেখিয়া ভয় পাইতে অগ্রসর হয়। গৃহস্থ তাড়া না করিলে হয়তঃ একদিনেই আমাদের কোন কোন সম্প্রদায়কে সবংশে নির্মূল হইতে হইত।

এরূপস্থলে আমাদের বাঁচিবার একটা উপায় ত চাই; বংশরক্ষা করা ত আমাদের পক্ষেও আবশ্যিক বটে। গোলাপের জায় আমাদের আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র নাই। আকন্দ, করবী, কল্কে ফুল প্রভৃতির জায় যদি বিঘাত আঠা থাকিত তাহা হইলেও পশুর গ্রাস হইতে আমাদের অনেকেই সহজে রক্ষা পাইত। ভগবান তাহারও একটা সুব্যবস্থা করেন নাই। রাম-তুলসীর জায় একটা তীব্রগন্ধ আমাদের আছে বটে, কিন্তু উহা প্রশস্ত অস্ত্র নহে। গন্ধভাদালের ত অতি উৎকট গন্ধ আছে, কিন্তু তাহাতে গবাদি পশুর গ্রাস হইতে উহা মুক্তি পায় কি?

ভীষণ জীবন-সংগ্রামে যে আমরা এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছি সে কেবল আমাদের বাপ-মার বুদ্ধির জোরে। স্ত্রী-ইলিশ যে একেবারে লক্ষ লক্ষ অণু প্রসব করে তাহা ত সকলেই জানেন। বহু শত্রুর কবল হইতে বংশ-রক্ষা করার একমাত্র উপায়—অসংখ্য সন্তান প্রসব করা। আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ যে এ সত্য না জানে তাহা নহে। এইমতই বড়বৃষ্টি কোয়াসা প্রভৃতিতে অনেক সন্তান

অকালে গতানু হইলেও অবশিষ্টেরা আপন আপন কুর্প রক্ষা করিতে পারে। আমরাও অনেকগুলি ভ্রাতাভগিনী একত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। মা আমাদেরকে শিশু-কালে একটা আবরণের মধ্যে (involucre of bracts) লুকাইয়া রাখেন। ক্রমে আমরা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকি ততই ঐ আবরণের আড়াল আমাদের পক্ষে অসহ হইয়া উঠে। কাজেই একদিন উহাকে বিদীর্ণ করিয়া আমাদেরকে উন্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হইতে হয়। স্ত্রীজাতি যে অল্পবয়সেই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়, একথা আর বলিবার আবশ্যিক নাই। আমাদের ভগিনীগণও রূপের ছটায় সকলকে শীঘ্র মোহিত করিয়া থাকেন। আপনারা ত আমাদের কোন ধবর রাখেন না, নতুবা সহজেই আমাদেরকে চিনিতে পারিতেন। আপনারদেরই বাঙ্গালী বাবুরা যাহাদিগকে একএকটি হরিদ্রাবর্ণ পাপড়ি মনে করেন উহারা আমাদের এক-একটি ভগিনীর ওড়না মাত্র। ভগিনীর সংখ্যা অগণ্য গুনিয়া অবাক হইবেন না; এরূপ না হইলে আমাদের বংশ রক্ষা হইত কি? কারণ আমার ভগিনীগণ কাকবক্ষ্যা। অর্থাৎ হইল না বৃক্ষি? উহারা জীবনে একের অধিক সন্তান প্রসব করেন না। শশা, লাউ প্রভৃতির ফুলে গর্ভকোষটি (ovary) ফুলের নীচে থাকে, তাহা ত অবশ্য দেখিয়াছেন? আমার ভগিনীগণও সেইরূপ বীজ-কোষ ধারণ করেন। হাথের ছোটলোকের ঘরেই বেশী ছেলে হয়? উচ্চ বংশে রাজা-রাজড়াদের ঘরে একটা জন্মিলেই যথেষ্ট।

“বরমেকো গুণী পুত্রঃ ন চ মূর্খঃ শতৈরপি।

একশতশস্তমো হস্তি ন চ তারাগণৈরপি” ॥

আমাদের বংশেরও এই নিয়ম। একটা ফুল হইতে একটিমাত্র ফজলী আম জন্মিয়া থাকে।

সত্যসমাজে ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত নহে। আমরাও ত অসত্য নহি, যে, ভগিনী হইয়া আপন ভ্রাতাকে বিবাহ করিব। এরূপ কদর্যা বিবাহের ফলে যে পরিপুষ্ট দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মিতে পারে না তাহা আমাদেরও অবিদিত নাই। আমরা কুলীন-কন্তা; সেইজন্য স্বামীগৃহে গমন করা আমাদের ভাগ্যে বটে না—এই পর্য্যন্ত। আমাদের বিবাহের

অনেক ভ্রমর ঘটক ও কীট দ্বীপে সময়কালে আমাদের গৃহে আসিতে হয়। প্রত্যেক ভগিনী পৃথক পৃথক থাকিলে দ্বীপ ও ঘটকের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বুদ্ধি করিয়া আমরা সকল ভগিনী একত্র থাকি। কাল্লেই উহারা দূর হইতে আমাদের সোনার-বরণ ওড়নাগুলি দেখিতে পায় ও চিনিতে পারিয়া নিকটে আসে। স্বামীর দান আমরা উহাদিগের নিকট হইতে রেণু আকারে গ্রহণ করিয়া সঘণ্টে রক্ষা করি। এই সময় হইতেই আমরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে গমনের চেষ্টা করিয়া থাকি। বিবাহের পর কোন্ কুল-স্ত্রী পরপুরুষের সংস্রবে আসে? আমাদের কোমলকান্ত দেহ মুশড়িয়া যায়, আর তপ্তকাননের ছায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ থাকে না। পিপীলিকারাও ত বিবাহের পর স্ব-ইচ্ছায় পক্ষচ্ছেদন করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়া থাকে। আমরাও সেইরূপ বিবর্ণ হইতে থাকি। আমাদের জননী প্রথমে অনেকগুলি কণ্ঠা প্রসব করিয়া শেষে বহুসংখ্যক যমজ-সন্তান (hermaphrodite flowers) প্রসব করিয়া থাকেন। সেই-সকল যমজ-সন্তানের প্রত্যেকের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কণ্ঠা থাকে। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে প্রথম-কার কণ্ঠার ছায় এক-একটি পৃথক পৃথক পুত্র সন্তান (male flower) প্রসব করা আমাদের মাতার ভাগ্যে ঘটে না।

অসংখ্য শরৎ ও হেমন্তকালেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা একত্রে পৃথিবীর সমুদায় উদ্ভিদসংখ্যার দশভাগের একভাগ হইবে।\* ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারেন আমাদের বংশ কিরূপ বিস্তৃত। সুসভ্য আর্ধ্যগণের বংশও এরূপ বিশাল কি না সন্দেহ। আমাদের এই বংশে কত কত মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। জিনিয়া, গৌজা, সূর্যাসুখী আমাদেরই নিকট-

জাতি। আমরা বহুসংখ্যক ফুল একত্র মিলিয়া বাস করি; এইজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের জাতীয় নাম রাখিয়াছেন মিলিতপুষ্প বা Compositae. এই গুণ আম, জাম প্রভৃতি উচ্চজাতীয় বৃক্ষসমাজেও দেখা যায় না, এমন কি পুষ্পশ্রেষ্ঠ গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, চম্পক, বেল, জুই প্রভৃতি উচ্চতম সমাজেও এ গুণ কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না। ইহা ভিন্ন পরোপকারের জন্তও আমরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবলমাত্র শেফালিকা পুষ্প হইতেই যে লোকে জরদ রং পায় তাহা নহে, আমাদের নিকট-জাতি কুসুমফুল হইতেও উহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ক্রান্তদেশে এ রংয়ের বিশেষ আদর। আমরা সংসারের আরো অনেক উপকার করিয়া থাকি। সর্দি ও কাশি রোগে আমাদের কেহ কেহ (Tussilago) প্রায়ই লোকের উপকার করিয়া থাকে। আহতস্থানের উপকার করিতে আমাদের আর্নিকা (Arnica) মত কেহ নাই। কাটা ঘা (cuts) আরোগ্য করিতে আমাদের বহু জাতিভ্রাতাকে (Calendula) যে দ্রবীচি মূলের ছায় আয়োৎসর্গ করিতে হয় তাহা কে না জানে! লোকে যে “কলের তেল” নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহার অভাব হইলে বাঙ্গালীদিগের স্নান ও আহারের একান্ত অসুবিধা ঘটে, সেই তৈল উৎপাদনেও আমাদের অনেককে আশ্রয়বিসর্জন করিতে হয়। আমাদের জাতি ভ্রাতা সোরগোঁজা ঘানিগাছে ও কলে নিম্পেষিত হইয়াও পরোপকার করিতে বিমুখ হন না। এই জন্তই সত্তা “সরিষাতৈল” বাজারে দেখা দিতে পারে। এত করিয়াও আমরা লোকের মম পাই না। এই বড় ছুঃখ। অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের দেহ হইতে যে জ্যোৎস্না পোকার ছায় একপ্রকার আলোক নির্গত হয় তাহাও কম আশ্চর্য্য নহে। এ গুণ উচ্চশ্রেণীর পুষ্পে আছে কি? এখন আপনারা সকলে স্থির করুন উদ্ভিদসমাজে আমাদের স্থান কত নিরে হওয়া উচিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

\* “It is the largest of all natural orders, containing one-tenth of the known plants of the world.”  
—Elementary Botany by Edmonds.

## আমেরিকার প্রজাতন্ত্র \*

(James Bryceএর 'American Commonwealth'

অবলম্বনে লিখিত)

বর্তমান যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিমানেরই ধারণা পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্রের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। এরূপ মতাবলম্বীদিগের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্তমান কালে আমেরিকাতে যে রূপ প্রকৃষ্ট ও বিশাল আয়োজনের সহিত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, প্রাচীন, মধ্য, ও বর্তমান সময়ে কখনও, কোথাও এরূপ হয় নাই। এই সমস্ত দার্শনিকগণের মনে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উদ্ভূত হয়—“যে দেশ এত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির এত উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে সে জাতির উন্নতির কারণ কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের শাসনপ্রণালীতে আরোপ করা যায়।”

বাস্তবিক আমেরিকার উন্নতি অবনতির কারণ কতটা আমেরিকার বর্তমান শাসনপ্রণালীর ঘাড়ে চাপান যায় এ একটা জটিল সমস্যা। ইহার মীমাংসা করিতে গেলে বোধ হয় নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্রসর হইলে কতকটা সম্ভাবজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যিক সাধারণতঃ প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালীতে কি কি দোষ আরোপিত হইয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ সেই দোষগুলি কি পরিমাণে আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে বর্তমান; এবং তৃতীয়তঃ দেখা প্রয়োজন আমেরিকার শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা কোথায়।

প্রথম কথা—সাধারণতঃ—প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর কি দোষ :—

প্লেটো (Plato) হইতে হেনরী মেন (Henry Maine) ও রবার্ট লো (Robert Lowe) পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাশীল শাসনবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর নিম্নলিখিত কয়েকটা দোষ বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

(১) আকস্মিক বিপদে অদৃঢ়তা—অর্থাৎ রাজ্যে কোন

\* পৌরহাস্য বর্জিত সাহিত্য-পরিবর্ধে গঠিত।

গুরুতর বিপদ সহসা উপস্থিত হইলে, রাজতন্ত্র অর্থাৎ যথেষ্টাচার-শাসনপ্রণালীর অধীন প্রজাতন্ত্র তৎপরতার সহিত কার্য করিতে অশক্ত।

(২) প্রজাতন্ত্রের চঞ্চলতা বা পরিবর্তনশীলতা—ক্রমাগত মত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কার্য-পরিচালন-নীতিরও পরিবর্তন ঘটিবে। বিশেষতঃ যে দেশে শাসনপদ্ধতিতে এরূপ ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট সে দেশের মান ও প্রতিপত্তি কিছু হ্রাস হইতেই হইবে।

(৩) স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং অবাধ্যতার ভাব জনসাধারণের মনে প্রবেশলাভ করে। এই প্রকার বশতা স্বীকারে অনিচ্ছা ক্রমশঃ অন্তর্বিবাদের সূচনা করে এবং কালে কালে এই আশঙ্কলহ এরূপ বিকটভাব ধারণ করে যে তখন সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্ত দেশশাসনের ভার একজন প্রভুত্ব-পরিচালক প্রতিভা-সম্পন্ন সেনানায়কের হস্তে গুপ্ত হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারি ফলে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান।

(৪) ঐ শাসনপ্রণালীতে সকলকে সমপদস্থ অর্থাৎ তুল্যরূপ মর্যাদাসম্পন্ন করিবার স্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে জন্মে। এই স্পৃহাই পরশ্রীকাতরতার মূল। এরূপ প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রকৃত মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তিষ্ঠিতে পারে না।

(৫) একদল অল্পদলের চেয়ে সংখ্যায় কিঞ্চিৎ অধিকতর এই অজুহাতে প্রজাতন্ত্রের স্থানে সেই দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে, এবং যে দলে অল্পতর সংখ্যা সেই দলের উপর যথেষ্টাচার করিতে ক্রটি করে না।

(৬) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দুর্ভতা। এরূপ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর লোকদিগকে কোন জনপ্রিয় বিদ্রোহোদ্দীপক নেতা সন্মায়সেই মাতাইয়া তুলিতে পারে। এই শ্রেণীর লোকের অভাব ও দুর্ভেদ অনেক, কিন্তু তাহাদের অভাবের কথা তাহারাই সকলের চেয়ে কম জানে। তাহাদের এই দৈন্তের কথা বুঝাইয়া সহজেই তাহাদিগকে উত্তর করা যায়।

এখন দেখা যাক এই দোষগুলি কি পরিমাণে আমেরিকার শাসনপ্রণালীতে বর্তমান।

প্রথম অভিযোগ—আকস্মিক বিপদে অদৃঢ়তা। আমেরিকা স্বাধীন হইবার পরে এরূপ আকস্মিক বিপদের কথা প্রধানতঃ দুইবার ইতিহাসে পড়িয়াছি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে কয়েক-বৎসরকাল রাজনীতি-কৌশলঘটিত গোলমালের পর যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার লড়াই বাধিল সেই যুদ্ধের ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে এ বিপদে আমেরিকার রাজনীতিবিদগণ সমরোচিত দৃঢ়তার সহিত কার্য করিতে পারেন নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার চেয়েও ঘোরতর বিপদ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের যুক্ততাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আমেরিকার উত্তর প্রদেশসমূহ এবং দক্ষিণপ্রদেশসমূহের মধ্যে ক্রীতদাসপ্রথা বজায় রাখা বা উঠাইয়া দেওয়া লইয়া যে দারুণ অনল জলিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই সাংঘাতিক অন্তর্বিবাদ চলিয়াছিল। এ সময় ইংলণ্ডে পামার্স-টন গ্লাভস্টোন প্রমুখ মনীষীগণ সকলেই যেন দিবাচক্ষে যুক্তরাজ্যের ধ্বংসের প্রারম্ভ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্যকালে বাপার অন্তরূপ দাঁড়াইল। সমর যখন তুমুলভাবে বাধিয়া উঠিল এবং বাস্তবিকই যখন ওয়াশিংটন-অভিষ্টিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ধ্বংসোন্মুখ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন উত্তরদেশসমূহ যুক্তরাজ্যের সন্মিলিত অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে প্রকার ক্রিপতা ও স্থিরসংকল্পের সহিত বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব অবাক হইয়া আমেরিকার দিকে তাকাইয়াছিল। এই সংগ্রামে আমেরিকার প্রেসিডেন্টপ্রমুখ শাসন-বিভাগ যে প্রকার সেনাদলের পর সেনাদল সজ্জিত করিয়া এবং অজস্র প্রাণহানি ও অর্থব্যয় করিয়া সমগ্র দেশের একত্ব বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর ঘাড়ে আকস্মিক বিপদে যে অদৃঢ়তারূপ দোষ সচরাচর আরোপিত হয়, সে দোষ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে প্রযোজ্য নহে।

জাতীয় চরিত্র সমাকৃভাবে গঠন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একাগ্রতা এই দুইটি উপকরণ বর্তমান থাকিলে এরূপ বিপৎকালে শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্রদেশ উন্মত্ত হইয়া উঠে। এটি জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভর করে—কোন জাতি কি প্রকার শাসনপ্রণালীর অধীন তাহার উপর ততটা নির্ভর করে না। Charles the Bold অর্থাৎ সাহসী চার্লসের বিরুদ্ধে সুইসদিগের সংগ্রাম; ফ্লোরেন্সবাসীগণ যে ভাবে পঞ্চম চার্লসের কবল হইতে নিজেদের ছোট্ট গণতন্ত্র Republic-টিকে রক্ষা করিয়াছিল; এ দুইটি ঘটনাই আমার মস্তের সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এ ত গেল মধ্যযুগের কথা। বর্তমান যুগেও মস্কোবাসীগণ যেরূপ ঐকান্তিক স্বদেশ-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া নিজেদের ঘর বাড়ী যথা-সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া তাহাদের দেশবৈরী নেপোলিয়নকে ব্যর্থ-মনোরথ এবং চিরকালের জন্য প্রায় শূন্য করিয়াছিল—এ ব্যাপারটি যদিও দৃষ্টান্তরূপে সম্পূর্ণভাবে এস্থলে প্রযোজ্য নহে, তথাপি তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে জাতীয় শক্তির উত্থানের সঙ্গে জাতীয় শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সম্বন্ধ ততটা ঘনিষ্ঠ নহে।

অতএব প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র দাঁড় করাইয়াছি, দেখা গেল আমেরিকার প্রজাতন্ত্র তাহার প্রথম অপরাধে অপরাধী নয়। এখন দেখাইব যে দ্বিতীয় অভিযোগও উহার বিরুদ্ধে টেকে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ—প্রজাতন্ত্রের চঞ্চলতা বা পরিবর্তনশীলতা। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জনসাধারণ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া অনেক সময় যুক্তিবিরুদ্ধ আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়াস পায়। এরূপ অবস্থা আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া হইতে চীনদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল তাহা এই প্রকার সাময়িক উত্তেজনার ফল বলিয়া উল্লেখযোগ্য। আমেরিকাতে যাহাকে Lynch law বলে তাহাও এই প্রকার উত্তেজনার ফল। প্রদেশসমূহকে বিভিন্নভাবে



দেখিতে গেলে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্র মার্কিন জাতির চরিত্রে এ চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ দেখা যায় যে মোটের উপর অন্যান্য জাতির স্যায় আমেরিকার জাতীয় চরিত্রও স্বভাবতঃ অত্যধিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরিবর্তনবিরোধী। আমেরিকার পশ্চিমদেশীয় কৃষকেরা জানিত যে তাহাদের পরিধানের বস্ত্রাদি গুরু বিবর্জিত হইলে সস্তা হয়। কিন্তু তাহারা এ কথাও জানিত যে পণ্যগুরুপ্রথা সমগ্র দেশের বাণিজ্যের মঙ্গল-বিধায়ক। সুতরাং তাহারা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশের কল্যাণের জন্ত ঐ আইনের বিরুদ্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন প্রকার আন্দোলন করিতে বিরত থাকিল। প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের সময় তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা যে-সমস্ত দেশের অহিতকর কার্য করিয়া জনসাধারণের নিকট নিন্দ্যুভাজন হইয়াছিল, সে-সমস্ত কার্যের জন্য জনসাধারণ গ্রাণ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে নাই এবং তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও কমে নাই, কারণ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তুয়ুল অস্ত্রবিগ্রহের সময় গ্রাণ্ট যে প্রকার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন দেশবাসী তাহার নিকট সেই জন্মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল। এই উত্তর দৃষ্টান্তই আমেরিকার জাতীয় চরিত্র যে রক্ষণশীল তাহারই পরিচায়ক। যে চরিত্রে রক্ষণশীলতা এরূপ মাত্রায় বর্তমান, সে চরিত্রে পরিবর্তনশীলতা ও চঞ্চলতা মজ্জাগত হইতে পারে না। আমেরিকার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ অন্যান্য দেশের স্যায় স্থায়ী হয় না সত্য, কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে আমেরিকাবাসীগণ একটা মূল কার্যনীতির অনুসরণে ঐ পরিবর্তনের পোষকতা করে, জাতীয়চরিত্রগত চঞ্চলতা হেতু ঐ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—বস্ত্রতা স্বীকারে অনিচ্ছা এবং অধজাসহকারে বৈধপ্রভূত্বের বিরুদ্ধাচরণেচ্ছা। এ অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং ইহার হাত হইতে আমেরিকার প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। অনেক প্রদেশ ও সহর আছে, যেখানে অনেক আইন কার্যে পরিণত করা হয় না এবং

হইলেও অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার কোন কোন স্থানে নরহত্যা গুরুতর অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয় না। এরূপ অপরাধীকে অনেক সময় গ্রেপ্তার করা হয় না, হইলেও নরহত্যাকারীর কাঁপী কদাচিৎ কখনও হইয়া থাকে। তবে যুক্তপ্রদেশসমূহের সর্বত্রই এরূপ অবাধতার ভাব লক্ষিত হয় না। যে কয়েকটা প্রদেশে সভ্যতার শালোক অতি অল্পদিন হইল প্রবেশলাভ করিয়াছে সেই-সমস্ত প্রদেশেই এরূপ আইন প্রয়োগে শৈথিল্য দেখা যায়। নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি প্রদেশে যখন জাতীয় চরিত্রের এরূপ কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না, তখন ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার অন্যান্য ভাগেও আইনের মর্যাদা রক্ষা করিবার ইচ্ছা এবং বৈধপ্রভূত্বের প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনের ইচ্ছা ফিরিয়া আসিবে।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ—সকলকে সম-পদস্থ করিবার স্পৃহা। এ আপত্তির কথা প্রথমে তকেভিল্ (Tocqueville) উত্থাপন করেন এবং তাহার পরে জন্ টুয়্যাট মিল উহা সমর্থন করেন। আমেরিকার ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে এ অভিযোগ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাইত, কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাকারণে এ ভাব অপসারিত হইয়াছে। যত দিন আমেরিকা প্রবাসী ইংরেজ, জার্মান, আইরিশ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশজাতীয় লোক আপনাদিগকে আমেরিকান মনে না করিয়া, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী ও আইরিশ বলিয়া বিবেচনা করিত, ততদিন এ ভাবের পোষকতা করে এরূপ লোক বিরল ছিল না। কিন্তু আঙ্গকাল আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশসমূহ একপ্রাণে অনুপ্রাণিত। এই জাতীয়-জীবনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জাতি নিজেদের মধ্যে যাহারা দানশীল, ধনী ও প্রতিভাশালী তাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিতে শিখিয়াছে। এমার্সন, লংকেলো, ও আর্ভিঙের নাম করিয়া আঁই সমগ্র মার্কিন জাতি সভ্য-জগতের সম্মুখে নিজেদের জাতীয় গৌরব প্রতিপন্ন করিতে চায়। মনীষার ক্ষেত্রে বেকপ, ধনবানদিগের প্রতি মার্কিন

জাতির ব্যবহারেও এই ভাব পরিলক্ষিত হয়। দানবীর কার্নেগী ও রকফেলারের নাম করিয়া গৌরব অনুভব না করে এমন মার্কিন বোধ হয় কেহ নাই।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ—প্রজাতন্ত্রের স্থানে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Tyranny of the Majority বলে। এই অভিযোগটি অল্পবিস্তর ইউরোপীয় সমস্ত শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবকালীন অরাজকতার ইতিহাসে ও ইংলণ্ডে গণতন্ত্র বা Commonwealthএর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমেরিকার প্রধান দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দল কোন সক্রীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ধর্মের পার্থক্য কিম্বা সামাজিক বিভিন্নতা আমেরিকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করে নাই, কেবলমাত্র দুইটি মূলনীতির বশবর্তী হইয়া এই দুইটি দলের অভ্যুত্থান হইয়াছে। আরও বিশেষতঃ যদিও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা ও পথ আছে তবুও আমেরিকায় ফেডারেল গভর্নমেন্ট (Federal Government) সমবেত রাষ্ট্রতন্ত্র থাকায় বিভিন্ন প্রদেশসমূহের পক্ষে ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহারের পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযোগ—জনসাধারণের অজ্ঞতাহেতু বিদ্রোহোদ্দীপক জননায়কের অভ্যুত্থান। এক কথায় ইহাকে Fault of demagogism বলা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত দোষের জায় এ দোষটীও পৃথিবীর অগ্ৰাণ্য শাসনপ্রণালীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নানাকারণে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীর মধ্যে এ দোষ সহজেই সৃষ্টি হয় এবং অতি স্বল্পচেষ্ঠায় সংক্রামক আকার ধারণ করে। ইউরোপ শ্রমজীবী এবং মূলধন (Labour and Capital) সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সমাজধ্বংসকারী যে Syndicalism এর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এখানে উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু মার্কিন রাজ্যের সুবৃহৎ আয়তন, প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার হেতু বর্তমান থাকায় আমেরিকাতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অজ্ঞ কিংবা অর্ধশিক্ষিত উত্তেজনা-প্রবণ জনমণ্ডলীকে সহজে মাতাইয়া ভুলিবার সুযোগ

আমেরিকা হইতে ইউরোপধণ্ডে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এ দোষটীও আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের ঘাড়ে চাপান যায় না।

প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর কি কি দোষ তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সেই দোষগুলি মার্কিন প্রজাতন্ত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহা দেখাইলাম। এখন আমেরিকার শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

(১) উহার প্রথম বিশিষ্টতা—আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের স্থিরতা অর্থাৎ অপরিবর্তিতভাবে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব। আপনারা সকলেই জানেন, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরান্তে ওয়াশিংটন, হ্যামিল্টন, ও জেফারসন প্রমুখ আমেরিকার মনীষীগণ যে শাসনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন সমগ্র মার্কিনজাতি অদ্যাবধি সেই বিধানের অনুবর্তী হইয়া চলিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। যে দেশে স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে সেই দেশে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত কোটি কোটি নরনারী আজ প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ একই শাসননীতির অনুবর্তী হইয়া চলিতেছে—কেবল তাহাই নয়, এই শাসনপ্রণালীর প্রভাবে থাকিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যেমন নাকি, যদি কেহ জানিতে চাহেন একটা লোকের জীবদ্দশায় তাহার শারীরিক সুস্থতা কিরূপ ছিল তবে প্রথম জানিতে হইবে তিনি কতদিন বাঁচিয়াছিলেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ শাসনপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে ঐ শাসনপদ্ধতি কতদিন পর্য্যন্ত মৌলিকভাবে পরিবর্তিত না হইয়া টিকিয়া আছে। আজ দেড়শত বৎসরের মধ্যে আমেরিকার শাসননীতির যে কোন প্রকার আমূল পরিবর্তন ঘটে নাই এইটাই উহার প্রধান বিশিষ্টতা। ইউরোপের সর্বত্রই রাজনীতিসংক্রান্ত আমূল পরিবর্তনের কথা সচরাচর শুনা যায়—গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ফরাসী-দেশের শাসনপ্রণালীর ছয়বার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জার্মানী ও ইটালীতে ২৩ বার এরূপ সর্বব্যাপী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে আজ কেহই ভরসা করিয়া

বলিতে পারেন না দশবৎসরের পর House of Lords-এর অবস্থা কিরূপ হইবে, অথবা আয়ারল্যান্ড ও উপনিবেশসমূহের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াইবে। আজ অর্ধশতাব্দী যাবৎ সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালী ফরাসী-দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কিন্তু এখনও সেখানে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী-অমুরাগী এক দল অত্যন্ত প্রবল। ইটালী ও স্পেন যদিও বহুকালযাবৎ রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে তথাপি ঐ দুইটি দেশে সাধারণতন্ত্রশাসন-প্রণালীর অমুরাগী দল বিদ্যমান আছে এবং কখন কখন আধিপত্যও করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার যে আদৌ হয় না তাহা নহে, তবে সে সংস্কারে কোন প্রকার আমূল পরিবর্তন ঘটে না। আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মোটের উপর ঐ বিধান বজায় রাখিয়া ঐ বিধানের কোন একটা সূক্ষ্মভাগ ঋণভাবে সংস্কার করাই আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি-সংস্কারকদিগের কার্য। ইংলণ্ডে কেয়ার হার্ভি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসী—ফ্রান্সে অনেকে এখনও রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নোর পক্ষপাতী—জার্মানিতে সমাজপন্থী বা Socialist দলের প্রবল প্রত্যাপের কথা আপনাদের অবিদিত নাই। আমেরিকায় যত প্রকার দলাদলি থাকুক না কেন—যতভেদ যতই থাকুক না কেন—পূর্বাগর যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতির মূলনীতির বিরোধী ব্যক্তি আমেরিকাতে একটাও নাই। এই গেল প্রথম কথা।

আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা—আইনের বশতা স্বীকার। পূর্বেই বলিয়াছি যে যুক্তরাজ্যের কোন কোন প্রদেশে এই বশতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছি যে শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব দিন দিন অপসারিত হইতেছে। মার্কিন জাতিকে ঋণভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, আইনকানুন মানিয়া চলার ভাবটা উহাদের জাতীয় চরিত্রে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ কারণও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক

ক্ষমতাসম্পন্ন—প্রত্যেকেই যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচন কার্যে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে নিজের অংশ উপলব্ধি করিতে পারে—প্রত্যেকেই যখন জানে যে দেশশাসনের জন্য যে-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে সে আইন তাহারই অথবা তাহার নির্বাচিত প্রতিনিধির সৃষ্টি, তখন আইন মানিয়া চলিবার স্পৃহা লোকের মনে স্বতঃই জন্মিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি।

মার্কিন প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় বিশিষ্টতা এই যে—মার্কিন জাতি রাষ্ট্রনৈতিক ভাবগুলি বেশ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা দৈনিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে না। ২১ টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেই এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। আমেরিকাতে মুদ্রাবন্ধের স্বাধীনতা বেরূপ সীমাবিহীন সেরূপ পৃথিবীতে আর কোন দেশেই নাই। এরূপ অসংবত স্বাধীনতা হেতু অনেক বিষময় ফল ফলিয়া থাকে সত্য কিন্তু আমেরিকার লোকে সেদিকে ভ্রমকল্প করে না, কারণ তাহারা বণিকের জাত এবং বেশ জানে যে সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারই একপ ভালমন্দে মিশ্রিত—তাহারা জানে সমস্ত আইন, সমস্ত বিধিপ্রথারই অপব্যবহার সম্ভব। সময় সময় অপব্যবহার হইবে বলিয়া তাহারা একটি সুপ্রথা প্রবর্তন করিতে ইতস্তত করে না।

আজ কয়েকবৎসর হইল আমেরিকাতে সমস্ত শ্রম-জীবী লইয়া যে বিপুল সন্মিলনী গঠিত হইয়াছিল সেই সন্মিলনী অনেক কারবারের ক্ষতি করে এবং অনেক শ্রমজীবীকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের দলভুক্ত করিতে আরম্ভ করায় সমস্ত দেশ তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেজন্য দেশে কোন প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই বা ঐ সন্মিলনীর যথেষ্টাচার নিবারণ করিবার জন্য কোন বিশেষ আইনের প্রয়োজন হয় নাই। প্রকৃত স্বাধীনতার অপব্যবহার অসম্ভব ইহা জানিয়াই লোকে নিশ্চিন্ত ছিল এবং কলতঃ ইহাই হইল। ঐ সন্মিলনীর যথেষ্টাচার আপনা হইতেই ক্ষান্ত হইল। কোন বিশেষ আইনের দ্বারা ছুটের দমন শিষ্টের পালন করিবার প্রবৃত্তি আমেরিকাতে নাই, কারণ যদিও তাহারা

জ্ঞানে যে স্বাধীনতাকে অসংযতভাবে প্রশ্রয় দিলে কুফল ফলিতে পারে, কিন্তু তাহারা ইহাও জানে যে স্বাধীন চিন্তাকে, স্বাধীন কার্যকরী শক্তিকে, ঘন ঘন বিশেষ আইনের দ্বারা সংযত করিতে থাকিলে দেশের প্রচলিত শাসননীতির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে।

আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ বিশেষ গুণ এই যে এ শাসনতন্ত্রে জাতিভেদ একেবারেই নাই। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সভ্যদেশেই এরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক জাতিভেদ আছে—যদিও কেবলমাত্র হতভাগ্য ভারতবাসীর নামেই এ কলঙ্ক সর্বদা আরোপিত হইয়া থাকে। আপনারা সকলেই জানেন, আজ তিন বৎসর হইল বিলাতে গণসভায় যে বজেট তৈয়ারী হইয়াছিল সে বজেট অভিজাত-সভায় গৃহীত হয় নাই, কারণ সে বজেটে ইংলণ্ডের ধনীদিগের কর দিবার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল এবং সেই অনুপাতে গরীবদিগের করের হার হ্রাস করা হইয়াছিল; বিলাতে বর্তমান মন্ত্রাসূত্র Insurance Bill নামক যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন সে আইন দরিদ্রশ্রমজীবী ব্যবসায়ীদিগের উপকারের জন্যই প্রণয়ন করা হইয়াছে। জার্মানিতে সমাজপন্থী বা Socialist দলের অভ্যুত্থানে ধনী ব্যক্তিদিগের কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। রুশিয়ার ডুমা (Duma) প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই Czar প্রমুখ রুশিয়ার জমিদারশ্রেণী প্রাণপণ করিয়া ডুমার অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ ডুমা প্রজাশক্তির কেন্দ্রস্থল এবং প্রজাশক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধনীগণের মর্যাদা হ্রাস হইবে এবং এযাবৎকাল তাহারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অসংযতভাবে পরিচালন করিয়া আসিয়াছে তাহার বিপর্যয় ঘটবে। এই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের কথা বিলাতে এখনও শুনা যায়। এখনও শুনা যায় যে পার্লামেন্টের অধিক আইনটি একশ্রেণীর লোকের সমূহ উপকার করিবে, কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থে আঘাত করিবে। জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে এখনও কোন আইন কোন এক ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক আর অন্য এক ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষে অসুবিধা-

জনক হইয়া থাকে। এরূপ জাতিভেদ আমেরিকার কোথাও নাই—এরূপ সম্প্রদায়-ভেদের হাত হইতে মার্কিন যুক্তরাজ্য একেবারেই অব্যাহতি পাইয়াছে।

ইউরোপে সর্বত্রই গরীবেরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পার্থক্য দেখাইয়া হাহাকার করিতেছে এবং ধনীব্যক্তিদিগের প্রতি সন্দেহচিত্ত, ঈর্ষা-পরবশ ও ঘৃণাযুক্ত হইয়া আছে। আমেরিকায় দরিদ্রেরা যাহা কিছু পাইবে বলিয়া আশা করিতে পারে তাহা সমস্তই পাইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিকত্রে ধনী, নিধন সকলেরই অধিকার সমান, আইনের চক্ষে রাজা প্রজা, ধনী নিধন, সকলেই সমান, রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ধনীদিগের জন্য একটা ও গরীবদিগের জন্য অপরটা নির্দিষ্ট হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্র কোন পার্থক্য নাই—Well-to-do Class বা ধনী সম্প্রদায়ের জন্য কোন স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মার্কিন প্রজাতন্ত্রের পঞ্চম বিশেষ গুণ এই যে সমগ্র প্রজাশক্তির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তেজ নিহিত আছে। এই প্রচ্ছন্নশক্তির প্রভাব আমেরিকাবাসীর দৈনিক জীবনে আদৌ অনুভূত হয় না, কারণ উহার প্রয়োজন হয় না; কোন জাতীয় সঙ্কটের সময় এই জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকায় যখন প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমেরিকাবাসীগণ তাহাদের দেশীয় শাসন-বিভাগের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিল, কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতন্ত্রেই শাসন-বিভাগের (Executive Department) অধিকার ও ক্ষমতা সংযত করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় এবং তদুপরি আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইল তখন আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধারণা এই ছিল যে ইংলণ্ডে লর্ড নর্থ প্রমুখ শাসন-বিভাগের কর্মচারীদিগের ক্ষমতার অপব্যবহারেই এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে। তাহাতে শাসনবিভাগের ক্ষমতা সংযত করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইল যে অবশেষে ইহাই ধার্য হইল যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, মিনি

শাসন-বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মচারী, তিনিও আমেরিকার কংগ্রেসের অর্থাৎ আমেরিকার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসন-বিভাগকে মার্কিন জাতি এরূপ বিরাট আয়োজন করিয়া ধরু করিয়াছে, মার্কিন প্রজাতন্ত্র কোন জাতীয় সঙ্কটের সময় সেই শাসন-বিভাগের হস্তে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা করে না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ভূমল অন্তর্বিদ্ধানের সময় আমেরিকাবাসীগণ আব্রাহাম লিনকলনকে Roman Dictator অথবা Russian Czar হইতেও অধিক ক্ষমতাপালী করিয়াছিল। আমেরিকার দৈনিক জীবনে প্রেসিডেন্ট ও তাহার মন্ত্রীগণকে একটি প্রকাণ্ড কেরাণীর দল বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণের নির্বাচিত কংগ্রেসের ত্রুক্ষম তামিল করিবার জন্যই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় যে-সমস্ত কর্মচারী এরূপ ক্ষমতাহীন বোধ হয়—সমগ্রজাতির বিপৎকালে সেই কর্মচারীগণের হস্তে দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার শক্তিকেই আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন তেজ বলিয়া আমি অভিহিত করিয়াছি।

আর একটি গুণের কথা বলিলেই আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা-পত্র সমাপ্ত হইল। কোন বিখ্যাত ইংরেজ আমেরিকার প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে মস্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া এ গুণটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—“Democracy has not only taught the Americans how to use liberty without abusing it. It has also taught them fraternity.” অর্থাৎ আমেরিকার শাসন-প্রণালীই মার্কিন জাতিকে ভ্রাতৃত্ব শিখাইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ‘ভ্রাতৃত্ব’ কথাটি বিশেষ আমল পায় না। তাহার কারণও আছে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ভ্রাতৃত্বের নামে ও সাম্যের দোহাই দিয়া কি লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন—সেই জন্যই ইউরোপে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ভ্রাতৃত্ব অর্থ অনেকটা চোরে চোরে মাসতূত ভাই গোছের ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন রাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

সকলকে এমন নিজের ওজনে সমানভাবে প্রদান হইয়াছে যে সাম্যের ভাবটি সে দেশে শিখাইতে বা শিখিতে হয় না। মার্কিন জাতি ফরাসীদিগের ভ্রাতৃত্ব পিটাইয়া সাম্য রাজ্য সংস্থাপন করিতে গিয়া একজন যথেষ্টাচারী নরপতির পরিবর্তে শত শত যথেষ্টাচারী জননায়কের অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কার করে নাই, কিন্তু এমন অভিনব অত্যাচার্য শাসনপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে যে যদিও অহরহ সাম্যের তুলুতি নিনাদিত হয় না—যদিও সাম্যের মহৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় না—যদিও পথে ঘাটে সাম্যবিধানিনী সভা ও সাম্যপ্রচারক সাহিত্যের ছড়াছড়ি দেখা যায় না, তবুও কি জানি কোন্ যাত্রকের মস্তপ্রভাবে সাম্যের ভাব, ভ্রাতৃত্ব মার্কিন জাতীয় চরিত্রে মজ্জাগত হইয়াছে, এ যেন প্রত্যেক মার্কিনের পূর্বসংস্কার। আমেরিকাবাসী প্রত্যেকেই সাম্য ভাবটিকে এরূপভাবে উপলব্ধি করে যে কোন অতুল-ধনসম্পত্তির অধিকারী বা প্রবলপ্রতাপশালী ব্যক্তি রাস্তায় যাইতে যাইতে ভদ্র বা ইতর সর্বপ্রকার লোকের জনতা ঠেলিয়া যাইতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। লণ্ডন সহরের West End ও East Endএ পার্থক্য—ধনী ও নিধনের পার্থক্য; আর আমেরিকাতে যেখানে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই—সে দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে এরূপ বিশেষভাবে চিহ্নিত কোন স্থান নাই; সে সহরের উদ্যানে যে ফুল ফোটে সে ফুলের গন্ধ ধনী ও দরিদ্রের নিকট সমভাবে প্রীতিকর, সে সহরের সরকারী চৌকি-পার্শ্বে যে স্বাস্থ্যকর বায়ু বহিয়া যায় সে বায়ু সেবনে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই।

আরও একটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকায় আমেরিকাতে এই সাম্যের ভাব বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইউরোপে সর্বত্রই State Religion বলিয়া একটি পদার্থ আছে; আমেরিকাতে শাসনপ্রণালীর সঙ্গে কোন ধর্মবিশেষের সংস্রব নাই। ধর্ম ও শাসন-প্রণালী এই দুইটি একেবারেই স্বতন্ত্র। জার্মান পাল্লিমেণ্টে Catholic Party বলিয়া একটি দল আছে, ইটালীতে ঐ দলেরই নাম Clerical Party, বিলাতেও House of Lordsএ Bishops দলের ক্ষমতা নিতান্ত নগণ্য

নয়। ইউরোপে যেরূপ ধর্মের পার্থক্য অমুযায়ী রাজ-  
নৈতিক জীবনে পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি আবার সামা-  
জিক বিভিন্নতা অমুসারেও ঐ পার্থক্য সংঘটিত হইয়া  
ধাকে। জার্মানিতে Bundesrath, হাঙ্গেরীতে Table  
of Magnets ও বিলাতে House of Lords তাহার  
প্রমাণ।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে ধর্মের পার্থক্য কিম্বা সামাজিক  
বিভিন্নতা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবৈধ সৃষ্টি করে  
নাই। মধ্যযুগের প্রভাব ইউরোপে এখনও প্রবল। এই  
প্রভাব দিন দিন বিলীন হইয়া আসিতেছে। বর্তমানযুগে  
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মত যে প্রজাশক্তির ক্ষমতা  
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশেই ধর্ম- ও শাসন-প্রণালীর  
যে সংস্রব আছে উহার বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। এই সাম্য-  
ভাবের আরও একটা সুফল এই যে সাম্যের ভাব যে-দেশে  
এত প্রবল সে-দেশে বিদেশীয় রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের  
লিপ্সা বলবতী হইতে পারে না, কারণ যাহারা ভ্রাতৃত্বাবে  
প্রণোদিত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মান করিতে  
ও ভালবাসিতে শিখে, তাহাদের চরিত্রে বিশ্বপ্রেম  
জিনিষটীও অন্যান্য দেশের জাতীয় চরিত্রের চেয়ে অধিক  
মাত্রায় বিদ্যমান। গত দেড়শত বৎসরের পৃথিবীর  
ইতিহাসে দেখা যায় যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া অথবা  
জার্মানি যতবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অজস্র অর্থব্যয় ও প্রাণ-  
ক্ষয় করিয়াছে, আমেরিকা সেরূপ করে নাই—অথচ  
ইতিহাসে ইহাও স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ দেশসমূহের  
কোনটির চেয়ে আমেরিকার জাতীয় সমৃদ্ধি কম নয়।  
সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ ও চিরশান্তিস্থাপন  
করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা হইতেছে—এই চেষ্টা ও  
যত্ন সফল করিবার মানসে কার্নেগী ও রকফেলার প্রমুখ  
আমেরিকার ধনশালী ব্যক্তিগণ যেরূপ যুক্তহস্তে দান  
করিয়াছেন ও করিতেছেন সেরূপ অন্য কোনও দেশের  
ধনী ব্যক্তিরা করেন নাই। বিশ্বব্যাপী শান্তিস্থাপনের  
জন্য এরূপ অজস্র দান বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত না হইলে সম্ভবে  
না। এবং আমেরিকাবাসীর এই বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তিস্থল  
কোথায়?—তাহাদের দেশব্যাপী সাম্যভাবে ও ভ্রাতৃত্বাবে।

এক এক করিয়া আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের বিশেষ

গুণ কয়েকটির কথা বলিলাম। জাতীয় চরিত্রের এই  
বিশিষ্টতার কারণ কতটা জাতীয় শাসনপ্রণালীতে  
আরোপিত হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা দুঃসহ।  
তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মার্কিন জাতীয়  
চরিত্র ও শাসনপ্রণালীর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকম  
সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই ফরাসীদেশের  
শাসনপ্রণালীতে এত ঘন ঘন আমূল পরিবর্তন ঘটে—  
এই সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ইটালী, ইংলণ্ড হইতে  
Parliamentary Party Government অনুকরণ  
করিতে গিয়া বিলাতের শাসনপ্রণালীর একটা বিকৃতমূর্ধি  
উৎপাদন করিয়াছে। আমেরিকার জাতীয় চরিত্র ঠিক  
আমেরিকার শাসনপ্রণালীরই উপযুক্ত। উপরোল্লিখিত  
গুণাবলী বর্তমান থাকার সত্ত্বেও—মার্কিন প্রজাতন্ত্রে অনেক-  
গুলি দোষও আছে, তবে এত সুবৃহৎ ও এত দীর্ঘকালস্থায়ী  
অনুষ্ঠান নির্দোষ হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র।  
যে শাসনতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত শক্তিসমূহের উৎকর্ষ-  
সাধনে সর্বপ্রকারের সুযোগ বিদ্যমান আছে, যে শাসন-  
পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই ধর্মমতের জন্য বা সামাজিক  
অবস্থানিবন্ধন কোন প্রকার অধিকারে বঞ্চিত হয় না,  
যে শাসনতন্ত্রে ৭০ লক্ষ নিগ্রোকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক  
অধিকার দান করা হইয়াছে, যাহারা পরের দেশ জয়  
করে তাহাদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া  
স্বাধীনতায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, শত দোষ বর্তমান  
থাকিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার  
সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের এক অভিনব, অপূর্ব্ব অধ্যায়  
আরম্ভ হইয়াছে। এ জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির উপর সমগ্র  
বিশ্বের উন্নতি নির্ভর করে।

শ্রীভুবনমোহন সেন।

## দরিদ্র ডিউক্

( The Bottom Up গ্রন্থ হইতে )

( সত্য ঘটনা )

আমরা যাহার বিষয় বলিতে যাইতেছি তিনি ষাট বৎসরের  
একটি শুলাকাচার বৃদ্ধ। পরিধানে তাঁহার ধলবলে জীর্ণ

মলিন বেশ। চোখ দুইটি নীল, লাল ঘন চুল এবং মুখ-মণ্ডলের বর্ণ রক্তিম। সঙ্গে তিনটি বড় বাক্স লইয়া তিনি আমাদের দরিদ্র-আবাসে এক দিন দেখা দিলেন। সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এতগুলি বাক্সের মধ্যে তাঁহার আছে কি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বাসায় যে লোকটিকে সকলে 'এক-চোখো ডাচি' বলিয়া ডাকে তাহাকে তিনি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। দশ আনা ভাড়ার ঘরে যে বাস করে সেই ভাড়াটিয়ার আবার ভৃত্য! আশ্চর্য্য বটে!

তিনি অত্যন্ত কুণো ছিলেন। তাঁহার কোন বন্ধু ছিল না বা কাহাকেও তিনি নিজের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিতেন না। তাঁহার ভৃত্য এক দিন তাহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট গল্প করিয়াছিল যে তিন মাস অন্তর জার্মানি হইতে তাহার মনিবের নামে একখানি করিয়া চেক আসে। যত দিন না সেই টাকা খরচ হইয়া যায় তত দিন হিসাব রাখা, দোকানদারের নিকট জিনিষ ফরমাস দেওয়া, পাওনাদারদিগের পাওনা চুকানো ইত্যাদির ভার সেই 'এক-চোখো ডাচি'র উপর থাকে।

এই গল্প শুনিয়া অবধি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আহ্বান করিবার জন্ত আমি বিস্তর অনুরোধ করিয়া-ছিলাম কিন্তু তিনি কোনো শিষ্ট বাক্য মাত্র না বলিয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কয়েক মাসের মধ্যে এই রহস্যময় বিদেশীর টাকার পুঁজি ফুরাইয়া গেল এবং 'এক-চোখো ডাচি'কে তিনি বিদায় দিলেন। এই সময় বরফবর্ষণের একটি ঝড়ে বৃদ্ধকে কাবু করিয়া ফেলিল। তখন তিনি দশ আনায় যে খাট ভাড়া পাইয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া সাত আনায় একটি মাচা আশ্রয় করিলেন। যখন তিনি পুনরায় হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন তখন এক দিন তাঁহাকে কাঁচি শানাইবার একটি জাঁতা টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে দেখা গেল। অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিল কিন্তু তিনি অবজ্ঞার সহিত সকলের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া যেমন করিয়া পারেন নিজেই সেটিকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন।

আবার একটি বরফবর্ষণে পুনরায় তাঁহার বাত দেখা

দিল। তিনি ঘরের ভিতর বসিবার অনুমতি পাইলেন। পুরাতন জাঁতাটি অকর্মণ্য হইয়া এক কোণে পড়িয়া রহিল। অনশনে তাঁহার দিন কাটিতেছিল, এক দিন এক রাত্রি ধরিয়া তাঁহার ভামাকের পাইপটি শূন্য পড়িয়া ছিল, তথাপি তিনি দারিদ্র্য রাক্ষসীর সন্মুখে অসহবেদনায় একাকী খাড়া হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার উপবাসের তৃতীয় দিনে তিনি একটি পত্র পাইলেন। তাহার মধ্যে এক ডলারের একটি নোট ছিল। যিনি নোটটি পাঠাইয়াছিলেন তিনি দূর হইতে দেখিতেছিলেন। তিনি বলেন যে বৃদ্ধের বিস্মিত ভাব ক্রমে একটু ঈষৎহাস্তে পরিণত হইল। তাহার পর তিনি কোন ক্রমে উঠিয়া ধোঁড়াইতে ধোঁড়াইতে নিকটের একটি জার্মান মদের দোকানে গেলেন। চতুর্থ দিনে তাঁহার একটু নব্রভাব দেখা গেল। আদমসুমারিতে তিনি সেই বাড়ীর লোকসংখ্যা গণিবার কার্যভার লইলেন।

বাতের জন্ত তিনি কাঁচি শানাইবার জাঁতার গাড়ীটি রাস্তায় রাস্তায় ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইতে পারিতেন না। কাজেই তখন তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ হইল। আমি একটি তালাচাবিওয়ালার দোকানের এক পাশে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। সেখানে কয়েক সপ্তাহ বাস করিয়াই তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন। চাবি-ওয়ালার গল্প করিল যে বৃদ্ধ না কি তাঁহার জাঁতাটি বেচিয়া বাহা পাইয়াছিলেন তাহা একটি বৃদ্ধকে তাঁহার কণ্ঠার সৎকারের জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

কয়েক মাস পরে দরিদ্রনিবাসের কেরাণীর নিকট ডাচি এক পোষ্টকার্ড লিখিল যে সে এবং তাহার মনিব জেল খাটিতেছে।

আমি তাহাদের ছাড়াইয়া আনিলাম।

তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। তিনি আর কুণো হইয়া থাকিতেন না। এক দিন রাত্রে যখন বৃদ্ধেরা মিলিয়া তাঁহাদের পূর্ব স্মৃতি আলোচনা করিতেছিলেন তখন আমাদের বৃদ্ধটি তাঁহার জীবন-কাহিনী বলিতে

স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার গল্প দশ বৎসর গোপন রাখিবার জন্য তিনি আমাদেরকে অক্ষরোধ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই দলের মধ্যে এক মাত্র আমিই জীবিত আছি।

“১৮৪৯ সালে দাদা ও আমি ছাত্ররূপে হাইডেলবুর্গে বাস করিতাম। তখন আন্দোলনে রাষ্ট্রবিপ্লব আগিয়া উঠিল। আমি দাদার ছই বৎসরের কনিষ্ঠ—পিতার খেতাব ও সম্পত্তি দাদারই পাইবার কথা।

“আমরা পাঁচজন ছাত্র বলিলাম ‘এই রাষ্ট্রবিপ্লব ঘিনিষটা কি? আমরা ত সে বিষয় কিছু জানি না। অতএব আমরা ওটা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব।’ আমরা যতই আলোচনা করিলাম ততই রাজা ও মাতৃভূমির প্রতি আমাদের ভক্তি আগিয়া উঠিল, কিন্তু দাদার তাহা হইল না।

“দাদা বলিলেন ‘আমি বিজ্রোহী।’ তাঁহাকে আমাদের দলে আনিবার জন্য আমরা ক্ষেপিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন ‘রাজা একজন মাত্র, প্রজা অনেক এবং তাহার নিপীড়িত।’

“দাদার প্রতি ঘৃণায় আমার মন ভরিয়া উঠিল, তাঁহাকে শিক্ষার দিলাম, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তবু আমি তাঁহাকে অভিশাপ দিতে লাগিলাম। অবশেষে দাদা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

“ক্রমে তিনি বিজ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়া রাজার বিপক্ষে লড়িলেন। বিজ্রোহীরা যুদ্ধে হারিয়া গেল, দাদা পলায়ন করিলেন। অনেকে দোষী সাব্যস্ত হইল এবং তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল।

“মা আমার মন জানিতেন না, তাই তিনি আমাকে চিঠিতে লিখিলেন যে দাদা দেশে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমি বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেম এবং লর্ড পদবী পাইবার ইচ্ছা—এই তিনটি চিন্তা আমার মনে ঘুরিতে লাগিল।

“আমি রাজসরকারে খবর দিলাম। দাদা ধৃত হইলেন এবং গুলি করিয়া মারিবার অপেক্ষায় তাঁহাকে দুর্গের মধ্যে রাখা হইল।

“আমরা চারিজন রাজভক্ত ছাত্র তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। দাদাকে—পাণ্ডুর ও নির্ভীক দেখাইতেছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া আমার বুক দমিয়া গেল। আঙনের শ্রায় তাঁহার চোখ জ্বলিতেছিল এবং তিনি অবিচলিত দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন ‘প্রেম ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই। যাহা সত্য এবং শ্রায় আমি তাহাই ভালবাসি। আমাকে বধ করিলে সত্যকে বধ করা হইবে এমন কথা মনেও করিও না। জল পাইলে ফুল যেমন কোটে তেমন আমার রক্ত যেখানে পড়িবে সেইখানে বিজ্রোহ বিকশিত হইয়া উঠিবে। আমি সকলকেই কমা করিলাম।’ তাহার পর তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ‘হাল্, হাল্।’ দাদা আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। তিনি বলিলেন, ‘আমি আমার জাতাকে একবার চুখন করিব।’ সেনাপতি বলিলেন ‘আচ্ছা।’ আমি বলিলাম, ‘না, আমি রাজাকে ভালবাসি, আমার কোন ভাই নাই। আমি রাজজ্রোহীকে চুখন করিব না।’

“বাস্ রে। শুনিয়া দাদা কিরকর হইয়া গেলেন। তখনই যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল—এত বেদনা তাঁহাকে বাজিল।

“গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম—বন্দুকের শব্দ হইল। আমার বুক

রক্ত জল হইয়া গেল, দাদার মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।

“আমি আনন্দের ভান করিয়া চলিয়া গেলাম কিন্তু মনের ভিতর আমার নরকের আগুন জ্বলিতে লাগিল। পুত্রশোকে আমার পিতামাতা এক বৎসরের মধ্যেই পরলোকে গমন করিলেন। আমি লর্ড হইলাম। আমি লোকসমাজে বিশিষ্টে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সমাজ আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। আমার ভোজন-টেবিলে কোন অতিথি আসে না। আমার কাছে কোন ভৃত্য থাকিতে চায় না। তাহার বলে রাজে আমার পিতামাতার বিলাপধ্বনি শোনা যায়। শুনিয়া আমি হাসিতাম, কিন্তু মনে মনে জানিতাম যে উহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য। আমি যখন গ্রামে যাইতাম কুবকেরা আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত।

“দিন দিন আমার মনে আরো অবসাদ ঘনাইতে লাগিল। প্রতিদিন রাজে আমি সেই বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাই—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। যাহারা কিছুই পরোয়া রাখে না এমন সকল সৈনিক পুরুষ আনিয়া আমার নিকট রাখিতাম, কিন্তু তাহার একবার চলিয়া গেলে আর কিরিয়া আসিতে চাহিত না, বলিত যে তাহার ফৌজের পক্ষশব্দ শুনিতে পায়।

“এক দিন রাজে সৈনিকদিগের সহিত আমি এমন করিয়া মদ খাইলাম যাহাতে রাজে আর বন্দুকের শব্দ না শোনা যায়।

“আমার প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় আমরা মদ্যপান করিতে লাগিলাম। মোটা মোটা দরজা জানলাগুলি চারিদিকে বন্ধ, পর্দাগুলি টানা, বড় বড় সেজ জ্বলিতেছে, আর আমরা পান করিতেছি, গান করিতেছি, আর ঈশ্বরকে গালি দিতেছি—মত্ত হইয়া বলিতেছি ‘আমরা নিজেরাই ঈশ্বর।’

“বন্দুকের শব্দের সময় নিকট হইয়া আসিল। আমার জিভ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, কপাল বর্ষাঙ্ক হইয়া উঠিল, রক্ত হিম হইয়া আসিল।

“গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম—সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, গৃহের মধ্যে বিদ্যুতের আলো খেলিয়া গেল—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

“তাহার পর আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? বলিতে পারি না। আমার অতীত জীবন ছবির মত আমার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল—আঙনের ক্রমে আলোর ছবি। প্রথম দৃশ্যে দাদা ও আমি বাল্যাবস্থায় খেলা করিতেছি। দ্বিতীয় দৃশ্যে শোকে অধীর হইয়া মা কাঁদিতেছেন। তাহার পর দেখিলাম সেই দুর্গের প্রাচীর—দাদা হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আবার আমার রক্ত হিম হইয়া আসিল—আমি বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, দাদাকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলাম। আমার বুকের উপর ভয় চাপিয়া ধরিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া উঠিলাম ‘আমি রাজাকে ভালবাসি’, কিন্তু কে যেন বজ্রধ্বনে বলিয়া উঠিল ‘মিথ্যক’। তখন একটি ছোট বালিকা—তার মাথার চুলগুলি সোনালী—আমার কাছে আসিয়া কপাল হইতে রক্ত মুছাইয়া দিল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আপিয়া দেখি আমি একলা রহিয়াছি। বাতি নিভিয়া গিয়াছে। আমার মুখে রক্তের দাগ। ভয়ে আমি চলৎশক্তিহীন হইয়াছি। যখন চলিতে পারিলাম তখন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। আমি ভাবিলাম হয় ত শুধু আন্দোলনেই বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাই।

“কুড়ি বৎসর স্পেনে বাস করিলাম তবুও সেই শব্দ শুনিতে পাঠ।



“ফ্রাঙ্কে গেলাম সেখানেও প্রতি রাতে নির্দিষ্ট সময়ে আমার রক্ত জল হইয়া আসিত আর বন্ধুকের শব্দ শুনিতে পাইতাম। যে এমেরিকাকে আমি স্নাতক ঘৃণা করিতাম সেই এমেরিকায় আসিলাম, তবু সেই শব্দের আর বিরাম নাই। ক্রমে আমার সম্পত্তি হারাইলাম, টাকা নাই। গোরা বালিতে মানুষের যেমন দশা হয় আমিও সেইরূপ ক্রমেই তলাইতে লাগিলাম। আমি তোমাদের এইখানে আসিলাম, ইহা অপেক্ষা নীচে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব।

“একদিন ঘোড়ের কাছে আমি যেন সেই অগ্নির মেয়েটিকে দেখিলাম—বারু সোনালী চুল, যে আমার রক্ত মুছাইয়া দিয়াছিল।

“বালিকা মৃত। কিন্তু এ মুখ যে সেই মুখ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বালিকাটিকে আবার কেন দেখিলাম। এই দেখার ভিত্তর কি অর্থ নিহিত আছে কিছুই বুঝিলাম না। অজ্ঞান হইয়া গেলাম।

“অগতে আমার সবে একটি মাত্র জিনিষ অবশিষ্ট ছিল—সেই পুরাতন কাঁচি শানাইবার জাতটা। সেটি বেচিয়া যাহা কিছু পাইলাম বালিকার সংকারার্থ দান করিলাম। এই আমার প্রথম সংকর্ষ্য। জীবনে আমি এই একটি মাত্র মঙ্গল কণ্ঠ সম্পন্ন করিয়াছি। তাহার পর নির্ধন অগতে বাহির হইয়া পড়িলাম—সেখানে দুয়া করিবার কেহ নাই। আমি একটি অন্ধকার গলিতে বসিয়া পড়িলাম, আমার হৃদয়ে এক নূতন চেতনার স্পর্শ অনুভব করিলাম।

“বন্ধুকের শব্দের সম্বন্ধ হইয়া আসিল—আশ্চর্য্য যে তবু আমার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসিল না। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—শব্দ হইল না। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

“এ কি সত্য হইতে পারে? এক, দুই, তিন মিনিট অপেক্ষা করিলাম—শব্দ হইল না। আনন্দে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। একটি বজ্রহস্ত আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমাকে জেলে লইয়া গেল। তবু আমার কাছে সেই কারণের যেন আলোকময় স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখন বন্ধুকের শব্দ নীরব হইয়াছে।”

শ্রীঅতসী দেবী।

## অরণ্যবাস

[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্কত্যা বনভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রকার সহিত ভূম্যধিকারীর বনিষ্ঠতা বর্জিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুলক্ষী কন্যা শৈলস

সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার দুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ করিবেন স্থির হয়। ]

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মনোরমা তাঁহার সন্তানগণকে এবং সৌদামিনী ও যমুনাকে সঙ্গে লইয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র বৈকালে পর্বতে ও প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র নানাস্থানে অন্ন, লৌহগর্ভ প্রস্তর ও নানাবিধ মূল্যবান খনিজ পদার্থ দেখিতে পাইয়া ক্ষেত্রনাথকে তাহাদের ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ উত্তোলন ও সংগ্রহ করিতে যে বিশেষ জ্ঞান এবং প্রভূত অর্থেরও প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। বনভপুর ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রকৃতি দেবী সযত্নে যে অতুল ধনরত্ন সঞ্চিত করিয়া বসিয়া অছেন, তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্রের আনন্দ ও বিশ্বাসের পরিসীমা রহিল না।

মহাষ্টমীর প্রভাতেও দুই বন্ধুতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, মাধবদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিধন দুইটা গোয়ান লইয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র হরিধন বিনীত বচনে বলিলেন “বাঁবাঁ আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আপনাকে ও আপনার বন্ধু সতীশবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আজ পায়ের ধূলা দিতে হবে। আমি আপনাদের নিতে এসেছি। আমি সাহস করে সতীশ বাবুকে অনুরোধ করতে পারছি না। আপনি আমার হয়ে তাঁকে অনুরোধ করুন।”

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে যাইবার জন্ত অনুরোধ করায়, তিনি বলিলেন “বেশ তো; বিকেল বেলায় যাওয়া যাবে। যখন এ অঞ্চলে বেড়াতে এসেছি, তখন এঁদের গ্রামটিও দেখে আসা যাক।” এই বলিয়া তিনি হরিধনকে সোধোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনাদের গ্রাম এখান থেকে

কত দূর? সন্ধ্যার সময় তো ফিরে আসতে পারুব?”

হরিধন বলিলেন “বেশী দূর নয়; এক ক্রোশ হবে। আর আজ আপনারা ফিরে নাই বা এলেন? সেখানে আজ আপনারা অবস্থিতি করবেন। বেলা পাঁচটার সময় সন্ধিপূজা শেষ হবে। তার পর ছেঁ-নাচ আর যাত্রা হবে, তা দেখবেন।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “না ভাই, রাত্রি জেগে যাত্রা শুন্তে পারুব না।”

হরিধন বলিলেন “আচ্ছা, আপনাদের যেরূপ অভি-  
ক্রুচি হয়, তাই করবেন।”

এইরূপ কথাবার্তার পর, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র স্নান করিয়া হরিধনকে তাঁহাদের সহিত আহার করিতে যাইবার জন্ত অমরোধ করিলেন। কিন্তু হরিধন বলিলেন যে, তিনি মহাষ্টমীর উপবাস করিয়াছেন; সন্ধিপূজা শেষ না হইলে, জলগ্রহণ করিবেন না।

অগত্যা উভয়ে আহারাদি শেষ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর হরিধনের সহিত গোষানে আরোহণ করিয়া মাধবপুর গ্রামে উপনীত হইলেন।

মাধবপুরের মধ্যে মাধব দত্তই সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি; তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম হইয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানা বাটীর সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র, মাধব দত্ত মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং সতীশবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য। আপনার ঞ্চায় মহাস্মার পদার্পণে আজ আমার বাটী পবিত্র হ’ল, আর আমরাও ধন্য হলাম। আপনাকে আমার বাটীতে আনবার ছুরাশা আমি কখনও করতে পারতাম না, যদি আপনি ক্ষেত্রবাবুর বন্ধু না হতেন। ডট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে আপনার পরিচয় অবগত হয়েছি। আমার কি পরম সৌভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ করলাম। আনুন, আনুন ভেতরে আনুন।” এই বলিয়া মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে লইয়া বৈঠকখানা বাটীতে বসাইলেন।

সন্ধিপূজার বসিতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। এই জন্ত ডট্টাচার্য মহাশয় এবং অনেক অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও উদ্রলোক বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প

করিতেছিলেন। তাঁহারাও সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর বিলম্বণ সমাদর করিলেন। তাঁহাদের সহিত সকলের আলাপ পরিচয় হইল। আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহারা উভয়ে উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমাদর্শন করিতে গেলেন। সুগঠিত প্রতিমা ও প্রতিমার সাজসজ্জা দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত হইলেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া সতীশবাবু মাধবদত্ত মহাশয়কে বলিলেন “আপনাদের এখানে প্রতিমার চমৎকার গড়ন হয় তো! বাঃ! এ দেশেও এমন কারিগর আছে?”

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন “এখানকার কারিগরে এ প্রতিমা গড়ে নাই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে কারিগর এলে এই প্রতিমা গড়ে যায়।”

চণ্ডীমণ্ডপের কুহুং উঠানটি হরিধন শালপত্রাচ্ছাদিত একটি উচ্চ ছান্দ্যার দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। তাহাই চন্দ্রাতপের কার্য করিতেছিল। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই অত্যন্ত আনন্দ অমুভব করিলেন। মাধবদত্ত মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন “এ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ ছান্দ্য টাঁদোয়ার কার্য করে। এরই নীচে ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালীভোজন, যাত্রা নাচ প্রভৃতি হয়। আমরা মোটামুটি ধরনের লোক; আর আমাদের চালচলনও মোটামুটি রকমের।”

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন “মোটামুটি হোক; কিন্তু এটি ভারি চমৎকার হয়েছে। কাঁচা শালপাতার আচ্ছাদন হওয়ায়, আপনার উঠানের চমৎকার শোভা হয়েছে। এর নিম্নভাগটি ছান্দ্যবুদ্ধ ও শীতল হয়েছে, আর এই ছান্দ্যার জন্তই আপনার দেবীমন্দিরটিও সুন্দর যোরালো দেখাচ্ছে।”

সন্ধিপূজার বসিতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। অগত্যা সকলেই তাহার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গ্রামটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত পূজাবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ের অনেক নিমন্ত্রিত কুটুম্বও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন যে, তিনি তিনক্রোশ দূরে একটা গ্রামে বাস করেন। এই প্রদেশের প্রায় সকল গ্রামেই পূর্বদেশীয় গন্ধবণিকেরা আসিয়া বাস করিয়াছেন। পূর্বদেশীয় বৈষ্ণব কায়স্থ প্রভৃতি জাতি এই অঞ্চলে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকের সংখ্যাই অধিক, আর অনেক গন্ধবণিক পূর্বদেশ হইতে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণও আনাইয়া এই প্রদেশে বাস করাইয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন “ক্ষেত্রনাথ, যেখানে অর্ধোপার্জনস্বীকার ও অন্নবস্ত্রের সুখ, সেইখানেই ঠিকেরা উপস্থিত হ’য়ে বাস করেন। প্রাচীনকালেও তাঁরা এইরূপ করতেন ব’লে, তাঁদের নাম “বিশ্বঃ” অর্থাৎ Pioneers হয়েছিল। এই ছোটনাগপুরটি একটা অনাধ্যক্ষপ্রধান দেশ; কিন্তু এই ভদ্রলোকের মুখে শুনে পাচ্ছি, এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গন্ধবণিকেরা এসে বাস করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে, তোমরা এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে Pioneers বা বৈষ্ণবই আছ। তোমাদের সেই পুরাকালের রীতি ও ব্যবহার এখনও তোমাদের ত্যাগ করে নাই। তোমাদের সঙ্গে বা পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরাও এ দেশে এসেছেন; কেন না, ব্রাহ্মণ না হ’লে তোমাদের ধর্মকর্ম ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় না। তার পর, তোমাদের দেখাদেখি অপর জাতীয় লোকেরাও এ দেশে আসবেন। তোমরা এ দেশে এসে বাস করতে তোমাদের আচার ব্যবহার দেখে এ দেশবাসীদেরও আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে। তোমাদের দ্বারাই বোধ হয় প্রাচীনকালেও হিন্দুসভ্যতা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়েছিল।”

সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সেই ভদ্রলোকটি উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তোমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা না হ’তে পারে। বোর্নিও ( অর্থাৎ সুবর্ণ দ্বীপ ), যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্রাম, ক্যাম্বোদিয়া প্রভৃতি দেশে ও দ্বীপে আর্ধ্য বৈষ্ণবগণ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা সাংঘাতিক অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রী বণিক ছিলেন। গন্ধবণিকজাতীয় ধনপতি সদাগর, ঐমন্ত

সদাগর, চন্দ্রবণিক বা চাঁদবেগে সদাগর—এঁরা সকলেই সমুদ্রযাত্রা করতেন, তার বিবরণ প্রাচীন পুঁথিতে দেখতে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা যে পূর্বোক্ত দেশে ও দ্বীপসমূহেও বাস করেন নাই, তা কে বলতে পারে?”

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী হইতে ঢাক ঢোলের শব্দ শ্রুত হওয়ার, তাঁহারা বুঝিলেন যে, সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। এই কারণে তাঁহারা ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন দেবীর আরত্ৰিক হইতেছিল। আরত্ৰিক দেখিবার জন্ত পূজার দালানের সম্মুখে সেই বৃহৎ উঠানটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। আরত্ৰিকের পর লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে, সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবু মাধবদত্ত মহাশয়ের অনুরোধক্রমে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং তৎপরেই বল্লভপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে পড়িয়া তাঁহারা ছৈ-নাচ দেখিয়া যাইবেন, স্থির হইল।

তখনই ছৈ-নাচের উদ্যোগ হইল। স্থানীয় ভূমিকেরা এই নাচ দেখাইয়া থাকে। তাহারা দুই তিনটি ছন্দুভি বা নাগরা লইয়া আসিল। ছান্দু তলার চারিদিকে উজ্জ্বল মশাল প্রজ্জ্বলিত হইল। দণ্ড দ্বারা ছন্দুভি আহত হইবামাত্র গম্ভীর শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। আবার দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বৈঠকখানা-গৃহের ভিতর দিকের বারাণ্ডায় সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবু বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। নাচ দেখিবার জন্ত অন্তঃপুর হইতে সুরেন, নরু প্রভৃতিও আসিয়া তাঁহাদের নিকট বসিল। পার্শ্বস্থ এক সজ্জাগৃহ হইতে মুখোশ পরিয়া ও বিচিত্র বেশ করিয়া দুইটি লোক বাহির হইল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি রাম, ও অপর ব্যক্তি রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়েরই হস্তে ধনুর্কাণ। ছন্দুভির তালে তালে তাহারা পাদবিক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ধনুর্কাণ করিয়া বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাবণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তার পর, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ, ভীম-দুর্যোধনের গদা-

বুদ্ধ, কিরাতার্কুনের যুদ্ধ, এইরূপ নানা যুদ্ধ প্রদর্শিত হইল। তার পর, সামাজিক নক্সা প্রদর্শিত হইল। কলিকাতার বাবু, পল্লীগ্রামের জমীদার, সাহেব হাকিম, ডিপটি বাবু প্রভৃতির নক্সা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সর্বশেষে দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির বীতংস নৃত্য প্রদর্শিত হইল। ছৈ-নাচ শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ, মাধবদত্ত ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গো-যানে "কাছারী-বাড়ীতে" প্রত্যাগত হইলেন।

### অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমীর রাত্রিতে সতীশচন্দ্র বল্লভপুর ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় গমন করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সতীশবাবুকে পূজার ছুটির অবশিষ্ট কয়েকটি দিন বল্লভপুরেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহাকে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পিসু-ভুতো ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ আর কোনও আপত্তি করিলেন না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রের ধান্ন পাکیয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহা কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। খামারবাড়ীর ঘাস ইত্যাদি কোদালি দ্বারা ছুলাইয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহা মৃত্তিকা ও গোঁময় দ্বারা লেপিত করাইলেন। সেই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন খামারবাড়ীতে কর্তিত ধান্নসমূহ রক্ষিত হইতে লাগিল। ধান্নের "পালুই"গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের আয় প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল। এই সময়ে লখাই সর্দার প্রভৃতি মুনিষগণের বিশ্রামের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। ক্ষেত্রে ধান্ন কাটা, কাটা ধান্নের গোছাগুলিকে আঁটি আঁটি করিয়া বাঁধা, আঁটিগুলিকে আবার বোঝা করিয়া বাঁধা, তৎপরে সেগুলিকে গাড়ীতে করিয়া খামারবাড়ীতে বহন করিয়া আনা, আবার তৎসমুদায় পালা দিয়া স্তুপীকৃত করা—এই সমস্ত কার্যে তাহারা প্রত্যাষ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকিত। ধান্নসমূহ কর্তিত ও খামারে আনীত হইলে, তাহারা একএকটি আঁটি আছাড়িয়া তাহা হইতে ধান্ন ঝাড়িয়া ফেদিতে লাগিল। কামীনেরা সেই ধান্নগুলি কুলো দ্বারা ঝাড়িয়া তাহা হইতে আগড়া

বাহির করিতে লাগিল। এই পরিষ্কৃত ধান্নগুলির ওজন হইলে, তৎসমুদায় মরাইয়ে বা গোলাতে উত্তোলিত হইতে লাগিল। ধান্নের, যে শীষগুলিকে আছড়াইবার উপায় ছিল না, গরু দ্বারা তাহা মাড়াইবার জন্ত মুনিষেরা মাড়া জুড়িতে লাগিল। এই সমস্ত কার্যে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, ও মুনিষ কামীন কাহারও নিখাস ফেলিবার যেন অবসর ছিল না। ধান্ন মরাইয়ে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, প্রায় ছয়শত মণ ধান্ন সঞ্চিত হইয়াছে। এই ছয়শত মণ ধান্নের তিনটি মরাই বা গোলা হইল। খড় বা বিচালীগুলিকে স্তুপীকৃত করিয়া পালুই দেওয়া হইল। ধান্ন সঞ্চিত হইলে, ক্ষেত্রনাথ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইলেন এবং আসানসোল হইতে দুই গাড়ী কয়লা আনাইয়া তাহা পোড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। এখানে উই পোকার অত্যন্ত উপদ্রব বলিয়া ক্ষেত্রনাথের গৃহের চতুর্দিকবর্তী কাঠের প্রাচীরগুলি জীর্ণ হইয়াছিল। ইষ্টক পোড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ চারিদিকে পাকা প্রাচীর গাঁথাইবার অভিপ্রায় করিলেন।

এ দিকে অড়হর, বিরি (কলাই) এবং মুগও পাکیয়া উঠিল। এই সমস্ত ফসল কর্তিত ও উৎপাটিত হইয়া খামারে আনীত হইল, এবং যথাসময়ে মাড়াই ঝাড়াই হইয়া গৃহমধ্যে রক্ষিত হইল। ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ওজন করিয়া দেখিলেন, কলাই পঁচাত্তর মণ, অড়হর ত্রিশ মণ ও মুগ বাইশ মণ হইয়াছে। লখাই সর্দার ধান্নাদি প্রত্যেক শস্যের বীজ যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিল এবং তৎসমুদায় বোরা বা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া তাহাদের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া দিল।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে গোল আলু উঠাইবার সময় উপস্থিত হওয়ায়, সকলে গোল আলু উঠাইতে নিযুক্ত হইল। সেই সময়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশচন্দ্রের সহিত মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বল্লভপুর অঞ্চলে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ পূর্বেই সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি কতকগুলি,

বাধাকপি, শালগম, ওলকপি, ফুলকপি, মটরসুঁটি, টমেটো বা বিলাতী বেগুন ও বড় বড় গোল আলুর দ্বারা একটা বৃহৎ ডালি'স্কাইফল রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী ডাক-বাকালায় উপনীত হইলেন এবং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমুদায় উপচৌকন প্রদান করিলেন। বল্লভপুরে এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনিয়া ডেপুটী কমিশনার সাহেব যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে সতীশবাবুর সহিত বল্লভপুরে যাইতে প্রতিক্ষিত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে সাহেব ও সতীশবাবু বল্লভপুরে উপনীত হইয়া, ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার শস্তক্ষেত্রসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে আলুর ক্ষেত্রে আলু উত্তোলিত হইতেছিল; আলুর ফসল দেখিয়া সাহেব অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথ যে উপায়ে নন্দাজোড় বাধাইয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি কার্পাস ক্ষেত্রে গিয়া কার্পাসের গাছ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। হরিণ ও হাতীর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার জন্ত ক্ষেত্রনাথ প্রজাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন ও ক্ষেত্রনাথের বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সতীশচন্দ্র কৌশলক্রমে সাহেবকে পরিতৃপ্তি আনয়ন করাইয়া গভর্ণমেন্টের খামহাল নন্দনপুর মৌজাটি দেখাইলেন এবং তাহার মৃত্তিকার উর্বরা শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিলেন। এই বিস্তৃত ভূভাগটি আবাদ করিতে পারিলে তাহাতে যে বহুপ্রকারের শস্ত এবং প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও তাঁহাকে বুঝাইলেন।

সাহেব সতীশবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন “আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। কিন্তু এ দেশের অধিবাসীরা অতিশয় অলস ও অকর্মণ্য। খামহালের ডেপুটী কলেक्टर অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনও প্রজা বসাইতে পারেন নাই। তবে তোমার বন্ধু ক্ষেত্রবাবুর মত উদ্যোগী, উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকেরা যদি ইহা আবাদ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, ইহা নিশ্চিত

আবাদ হইতে পারে।” তৎপরে তিনি ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, আপনি কি ইহা গভর্ণমেন্টের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আবাদ করিতে ও ইহাতে প্রজা বসাইতে পারেন না?”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার অমুগ্রহদৃষ্টি থাকিলে নিশ্চয়ই পারি; তবে ইহা বহুব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।”

সাহেব বলিলেন “আচ্ছা, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আপনি মার্চ মাসে পুকুলিয়ায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আর সেই সময়ে আপনার কার্পাস ফসল কি রকম হয়, তাহাও আমাকে জানাইবেন। আর একটা কথা আপনাকে আমার বলিবার আছে। তাহা এই—আলু ও কার্পাসের চাষ আপনি আপনার প্রজাদিগকে শিখাইবেন ও তাহাদিগকেও তাহা আবাদ করিতে উৎসাহিত করিবেন।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার উপদেশের জন্ত ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাহাই করিতেছি। প্রজারা আলুর চাষ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে এবং আগামী বৎসর অনেকেই আলুর চাষ করিবে। আপনি আগামী বৎসর এই সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিলে, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন। কার্পাস যদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহারা তাহাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবাদ করিবে।”

এইরূপ কথাবার্তার পর সাহেব বল্লভপুর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হাসিয়া সতীশবাবুকে বলিলেন “সতীশবাবু, আপনি বোধ করি অদ্য আপনার বন্ধুর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিবেন। আচ্ছা, কাল প্রাতঃকালে আমার সহিত ডাক-বাকালায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।”

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের আগমনবার্তা শুনিয়া পূর্ব হইতেই তাঁহার আহ্বায় প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সোদামিনীর পিসীমাতা আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন। সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে কাছারীবাটিতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর স্নানাহার সমাপন করিলেন।

### উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

আহারের পর দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বল্লভপুরে অদ্য ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আগমনের উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন “কেন্দ্র, সাহেব আজ তোমার কৃষিকাজ দেখে অন্তিম আশ্লাদিত হয়েছেন। নন্দনপুর মৌজাটি বন্দোবস্ত করে নেবার জন্ত তিনি নিজেই তোমাকে অনু-রোধ করলেন। এ ভালই হ’ল। তুমি ঐ মৌজাটি বন্দোবস্ত ক’রে নিতে ইতস্ততঃ ক’রো না। যা’তে সুবিধা-মত বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা আমিও করব। ঐ মৌজাটি হস্তগত হ’লে, তোমার আর ভাবনা কি? তুমি যদি কালক্রমে ক্রোড়পতি হও, তাও বিচিত্র নয়। মার্চমাসে তুমি পুরুলিয়াতে নিশ্চয় যেও। এমন মাহেন্দ্র-যোগ আর পাবে না। এ সুযোগ কিছুতেই ছেড়ো না।”

কেন্দ্রনাথ বলিলেন “মার্চ মাসটি হচ্ছে চৈত্রমাস। ফাল্গুন মাসে তোমার বিয়ে হ’বে। সেই সময়ে তো তুমি ছুটিতে থাকবে। তুমি না থাকলে, বন্দোবস্ত করে নেবার তেমন সুবিধা হ’বে কি?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “আরে, ভাই, ছুটি নিলেও আমি ফাল্গুন মাসেই নেবো। চৈত্র মাসে আমি এসে পড়ব। তার জন্ত ভাবনা কি? কথা হচ্ছে যে, তুমি এই মাহেন্দ্র-যোগ ছেড়ো না। সাহেব তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট।”

কেন্দ্রনাথ বলিলেন “তা বেশ; তাই করা যাবে। তুমি তো বড়-জোর এক মাসের ছুটি নেবে। তুমি আমার পত্র পেয়েছ, বোধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে তোমার বিয়ের দিন অবধারিত হয়েছে। তুমি বিয়ে করে বৌ নিয়ে পুরুলিয়ায় যাবে, না দেশে যাবে?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “দেশেই যাব, স্থির করেছি। আমার পিসতুতো ভাই, রজনী দাদারও মত তাই। দেশেই পাকস্পর্শ—না, বৌ-ভাত—তোমরা কি বল?—তাই করতে হ’বে। জাতিদের সন্তুষ্ট করতে হ’বে। নতুবা উঁহারা একটা ছল ধ’রে নানারূপ গোল বাধাতে পারেন। কুটীচাৰ্য্য মহাশয়েরা আমাদেরই পাণ্টীঘর বটে; কিন্তু দেশের সঙ্গে তাঁরা অনেক দিন সম্পর্ক ছেড়েছেন। এই জন্ত, এখানে বিয়ে করা সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি। আর

তুমি ঠিকই নলেছিলে—সকলেই বলেন ‘বিয়ে করবে তো দেশে কর; অত দূরে বিয়ে করবে কেন? তবে আমি নিজে মেয়ে দেখে, পছন্দ করেছি ‘বলে, আর বেশী কথা কেউ বললেন না। কিন্তু পাকস্পর্শ দেশেই করতে হবে। আমি আমাদের বাড়ীখানা মেরামত করবার বন্দোবস্ত করে এসেছি। অলঙ্কারপত্রও গড়াতে দিয়ে এসেছি। সাদা সাফটা রকমেরই অলঙ্কার। ছোট ক’নে হ’লে অল্প রকম ব্যবস্থা করতে হ’ত। রজনী দাদা নিজেই অলঙ্কারের ফর্দ প্রস্তুত করেছেন।”

কেন্দ্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ফর্দে কি কি অলঙ্কার ধরা হয়েছে?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “আমার সব মনে নেই। তবে যতদূর স্মরণ হয়, তোমায় বলছি :—বালা, অনন্ত, চুড়ী, ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ, হার, চিক্, এয়ারিং, মাথার কাঁটা, ফুল, চিরুণী, নেকলেস (সেটিকে আবার টায়েরাও করা যেতে পারে)—এই সব আর কি।”

সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাত্তাগের জানালাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়াই কেন্দ্রনাথ বলিলেন “কে রে? তেতরে কে রয়েছে?”

জানালাতে আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। কেন্দ্রনাথ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন “কে ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে, বল না?”

কোনও উত্তর নাই। তৎপরিবর্তে আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ!

কেন্দ্রনাথ এইবার ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে উঠিয়া গিয়া বলিলেন “ওঃ! তুমি? আমি মনে করেছিলাম, আর কেউ বুলি?” তার পর ঈষৎ অমুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন “কি বলছ?”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন “কি আর বলব, সতীশ-বাবুকে বল, যে-সব গয়না গড়াতে দেওয়া হয়েছে তা বেশ হয়েছে। কিন্তু কোমরের জন্ত একছড়া সোনার গোট, নাকের জন্ত ভাল দামী যুক্তোর একটা ছোট নথ, আর পায়ের ভারী মল চার গাছা চাই।”

কেন্দ্রনাথ বলিলেন “আরে ছেঃ! খেড়ে মেয়ের পারে আবার চারগাছা মল!”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন “খেড়ে মেয়ে হ’ল তো

কি হবে? বিয়ের ক'নে তো? এখন মল পর্বে না তো আর কখন পর্বে? সতীশবাবুকে বল, মল দিতেই হবে।”

ক্ষেত্রনাথ একটু হাসিয়া বিক্রপসূচক স্বরে বলিলেন “কেন? পায়ে বেড়ী না পড়লে তোমারা বুঝি পোষ মান না?”

মনোরমা ক্ষেত্রনাথের কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন “আ করি! কথার কি ছিরি, দেখ! যা হয়, তোমরা কর গে। আমি আর কিছু বলব না।” এই বলিয়া মনোরমা অভিমানভরে সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ওগো, ধাম, ধাম; রাগ করছ কেন? মল দেবার জন্ত আমি সতীশকে বলছি।”

কিন্তু সতীশকে বলিবার পূর্বেই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “ক্ষেত্র, নগিনের মাকে চটাও কেন? আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি; চার গাছা মলেরও বরাত দেওয়া হয়েছে। তবে নথ আর গোট গড়াতে দেওয়া হয় নাই। তা গড়াবার জন্ত আমি কালই পত্র লিখে দেব।”

সতীশচন্দ্র অন্তরাল হইতে এইরূপে মাঝখানে পড়িয়া দম্পতিকলহ মিটাইলেন। মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “শুনলে?” এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তোমারই জিত।”

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের নিকটে আসিলে, সতীশচন্দ্র বলিলেন “কি হে ভায়া, গৃহিণীর সঙ্গে তো খুব ঝগড়া লাগিয়েছিলে?”

ক্ষেত্রনাথ যেন একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলিলেন “ঝগড়া তো লাগিয়েছিলাম; কিন্তু ঝগড়ায় যেমন চিরকাল হেরে থাকি, আজও সেইরূপ হার হ'ল।”

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “তোমার জন্ত বাস্তবিক আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আমার জন্ত আর দুঃখ ক'রে কাজ নাই। এর পর নিজের জন্ত ঐ জিনিষটা সঞ্চয় ক'রে রাখ। বুঝলে, ভায়া, ওদের না হ'লেও সংসার

চলে না; আর ওদের পেয়ে উঠবারও যো নাই। এমনি চিৎ! যেটি ধরবে, তা ছাড়বে না। আর যা মনে করবে, তা হবেই হবে।”

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “ধাম, ধাম। গৃহিণীর উপর বড় অত্যাচার মন্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে।—মা কালীর পদতলে শিবঠাকুরকে প'ড়ে থাকতে দেখেছ তো? আমি সেদিন তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ছিলাম। লেখক বলেছেন, শিব পুরুষ আর কালী প্রকৃতি। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেই এই বিচিত্র বিশ্বলীলা। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব দেখাবার জন্তই শিব ধরাতলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত; আর প্রকৃতির ক্রিয়াশীলত্ব দেখাইবার জন্ত কালী রণ-রঙ্গিণী। বুঝলে ভায়া?”

ক্ষেত্রনাথ গাভীরোর ভাণ করিয়া বলিলেন “বুঝলাম। তোমার ঐ শিবঠাকুরটি আর আমাদের স্বয়ং কৃষ্ণঠাকুরটি পুরুষগুলোকে চিরকালের জন্ত মাটি ক'রে গেছেন। একজন তো পদতলে প'ড়েই রইলেন; আর একজন বললেন ‘দেহি পদপল্লবযুদারম্।’ শুধু তাই নয়, আরও বললেন:—

‘যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা,

তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।’

ব্যাপার বোঝ! ঠাকুরেরা যখন এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন, তখন ক্ষুদ্র মানুষের কথা ছেড়ে দাও।”

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন “যখন এমন নজীর রয়েছে, তখন আর দুঃখ করা কেন? আচ্ছা, এখন থাক এ সব কথা—বেশ কথা আমার মনে হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের এই নূতন সেশন্ অরস্ত হয়েছে। তোমার সুরেনকে এই সময়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেব।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তুমি তো শীঘ্রই ছুটি নেবে। সুরেন থাকবে কোথায়?”

সতীশচন্দ্র বলিলেন “কোথায় থাকবে?—আমার বাসায় হে। বাসায় বায়ুণ, চাকর সবই থাকবে। একটা নূতন সব্‌ডেপুটী এখন আমার বাসায় আছেন। তিনিও থাকবেন। তুমি সুরেনকে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “বেশ কথা। আমি একটা ভাল দিন দেখে তাকে নিয়ে যাব। আর অমনি একবার আসানশোল পর্যন্ত গিয়ে কয়লার হিসাবও মিটিয়ে আসব।”

সেই সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সতীশ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন “১৫ই ফাল্গুনেই বিবাহ হ’বে। সতীশের কোনও অমত নাই।” তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

বৈকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া সাইকেলে রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## উৎসাহের জয়

কোন একটা আদর্শের সন্ধানে যে যাত্রা করেছে তার কি অসীম শক্তি! কোনো-কিছু পাবার জন্তে, কোনো কাজ সম্পন্ন করবার জন্তে, যে পণ ক’রে বসেছে, সে রোগ শোক কষ্ট নীরবে সহ করে, কুৎসা অপমান বিক্রম মাথা পেতে নেয়, শত অত্যাচার তাকে দমন করতে পারেনা।

পারীর এক চিত্রশালায় একটি সুন্দর খোদিত মূর্তি আছে। মূর্তিটি যে কল্পনা করেছিল সে দীনহীন দরিদ্র, সামান্য এক কুটারের মধ্যে বাস করত। অনশন অনাহার তার নিত্য সহচর হলেও তার অন্তরের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে রোধ করতে পারে নি। হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য সাড়া দিত, তাকে রূপদান করাই ছিল তার কাজ, তার দাধনা। মাটির মূর্তিটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন ভয়ানক তুষারপাত হ’ল। সর্বনাশ! মূর্তিটি তখনো কাঁচা; কাদার মধ্যকার জল যদি জমে যায় তবে ত মূর্তিটি নষ্ট হয়ে যাবে। তার এতদিনকার সাধনা,

যার জন্তে সে এত দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিয়েছে তা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সে তাড়াতাড়ি সামান্য যা-কিছু বিছানা ছিল তা দিয়ে মূর্তিটিকে মুড়ে ফেলে জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে রইল। শীতে হাত পা জমে যেতে লাগল, হাড়গুলো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, মৃত্যুর শীতল হস্ত যেন তাকে একেবারে বেঁধে করে ফেলেছে। প্রভাতে দেখা গেল সে মরে গেছে। কিন্তু অল্প ভাস্করেরা সেই মৃৎমূর্তি প্রস্তরে গঠন ক’রে তুলে মৃত শিল্পীর কীর্তিকে অমর করেছে!

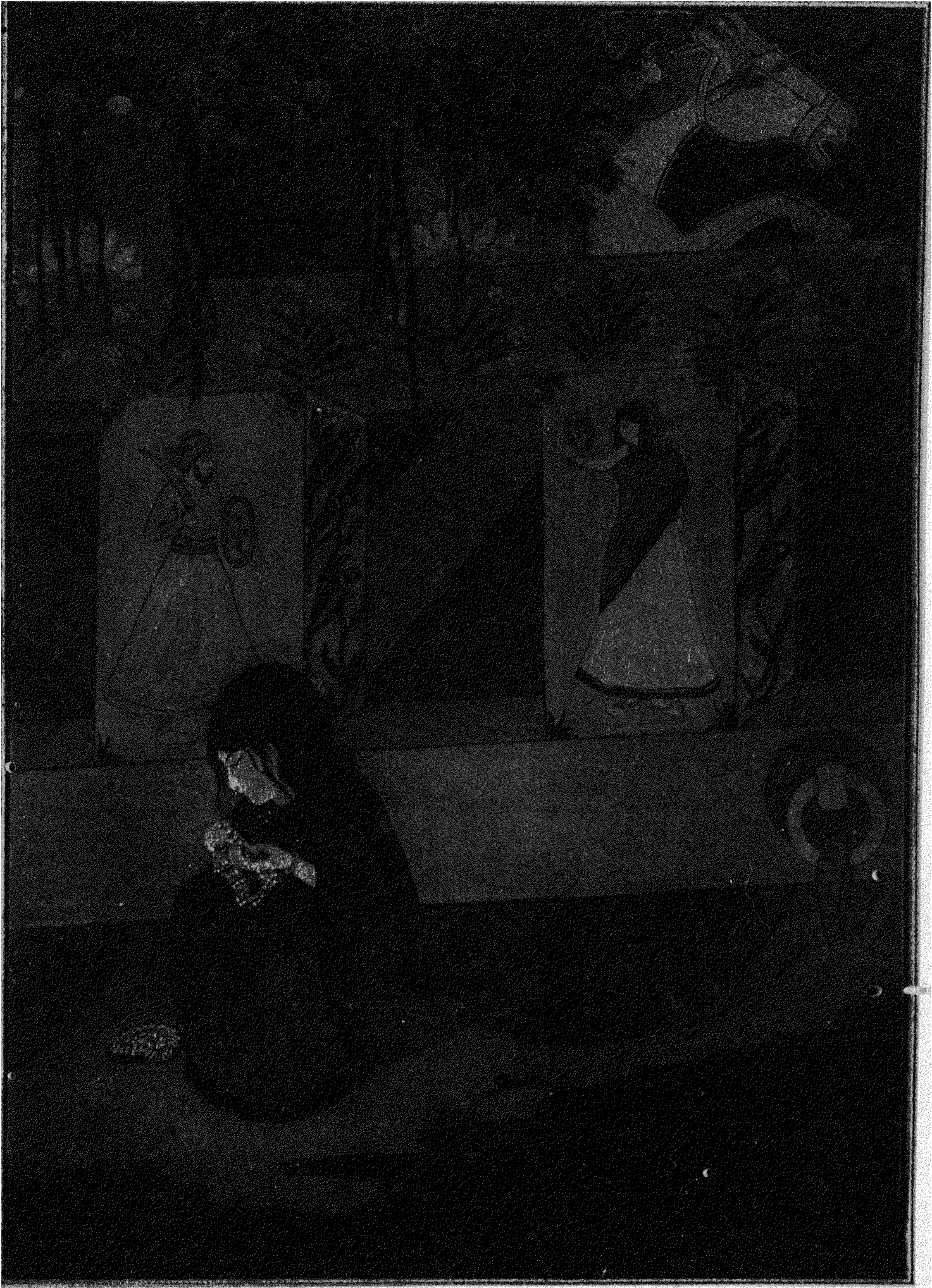
আন্তরিক অহুরাগ ও উৎসাহ ব্যক্তিরেকে কেনো বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায় না। যা অতি কুৎসিত তাও যেমন তরুণ প্রেমিকের চোখে স্বর্গসুখময় ভ’রে ওঠে, তেমনি উৎসাহ থাকলে লোকে শুধু নীরস বিষয়েরও একটা নূতন অর্থ দেখতে পায়। তরুণ প্রেমিকের প্রেমের আগ্রহে যেমন অনুভব করবার শক্তি ও দেখবার শক্তি বেড়ে যায়, সে প্রেমপাত্রীতে এমন কত গুণ কত সৌন্দর্য্য দেখে যা অন্যের দেখা অসম্ভব; তেমনি উৎসাহী পুরুষেরও উৎসাহের ব্যগ্রতার চোখ খুলে যায়, সে এমন সব নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের সংবাদ পায় যা উপভোগ করতে করতে কঠোর শ্রম দুঃখ দৈন্ত্য নির্ঘাতন সবই সে উপেক্ষা করতে পারে।

ডিকেন্স বলতেন যে তাঁর গল্পের বিষয় ও পাত্রপাত্রীগুলো তাঁকে যেন পেয়ে বসত, ভূতের মত সদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরত, সেগুলোকে লিখে ফেলতে না পারলে তাঁর আর বিশ্রাম বা নিদ্রা উপভোগ করবার জো ছিল না! এক একটি চিত্র সৃজন করতে তিনি মাসখানেক ধরে বন্ধ হয়ে থাকতেন, যখন বার হতেন চেহারা দেখে বোধ হ’ত যেন তিনি ধুন করেছেন!

ভিক্টর হ্যাগোর লেখার ঝোঁক চাপলে তিনি তাঁর বাইরে যাবার পোষাক পরিচ্ছদ বন্ধ করে রেখে ঘরে খিল দিয়ে লিখতে লেগে যেতেন—যা লিখতে চাই তা সম্পন্ন করে তবে উঠতে হবে—না হোক আহার, না হোক নিদ্রা, না হোক বহুবাহুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

গ্যাডস্টোন বলতেন, প্রত্যেক বালকের নিঃস্ব





রথের পাশে রাধারাগীর মালা গাথা ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY  
U. HAY & SONS, CALCUTTA.

•

তাদের গাছের শিকড় আর জল,—সব সহ করছেন তাঁরা স্বাধীনতা লাভের জন্যে! এই সব লোকের সঙ্গে কি আমাদের যুদ্ধ করা পোষায়?

\* \* \*

ঔদাসীন্য কখনো কোনো সেনাদলকে জয়ী করেনি, পাষণের গায়ে মৃত্যুহীন মূর্তি রচনা করেনি, স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতির শক্তি আয়ত্তাধীন করেনি, নয়নমোহন নিকেতন নির্মাণ করেনি, কবিতা দিয়ে কারো চিত্ত আর্দ্র করেনি, অসামান্য বদান্যতায়ও জগৎ স্তম্ভিত করেনি। কিন্তু উৎসাহ, সে করেনি কি? সে যেমন নাবিকের দিকনিরূপণের সদাচঞ্চল শূন্য কাঁটাটিকে বসিয়েছে তেমনি আবার মুদ্রায়ন্ত্রের প্রকাণ্ড লৌহ-দণ্ডকেও চালিত করেছে। সে-ই গ্যালিলিওর চোখের সামনে শত শত অজানা জগতের ছবি উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছিল, মৃত্যুর বিভীষিকাও তা ম্লান করতে পারে নি; সে-ই কলম্বাসের তরণীর পালে হাওয়া লাগিয়েছিল। শাণিত কুপাণ-হস্তে সে স্বাধীনতার সকল সংগ্রামে যোগ দিয়েছে, নির্ভীক মানব যখন জঙ্গল কেটে সভ্যতা বিস্তারের প্রয়াস পেয়েছিল তখন তার কুঠারে অধিষ্ঠান করেছে, অখিল বিশ্বের সকল মহাকবির লেখনীমুখে সে প্রকাশিত হয়েছে।

অসামান্য প্রতিভাবান্ সঙ্গীতের ওস্তাদ বীথোভেনের জীবনীকার লিখেছেন—শীতকালে এক জ্যেৎস্নাময় সন্ধ্যায় আমরা দুজনে বনের একটি অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম, হঠাৎ একটি নগণ্য বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি বল্লেন ‘চুপ! ও কি শব্দ। আমারই বাজনা যে! শোন শোন কি সুন্দর বাজাচ্ছে!’ বাজনার শেষের দিকটায় সহসা বাজনা থেমে গেল, শোনা গেল কে যেন করুণকণ্ঠে আক্ষেপ করছে, ‘আর আমি বাজাতে পারব না। এখানটা এত সুন্দর, আমার সাধ্য নয় বাজানো। আহা একবার যদি কলোনের কনসার্ট শুনতে যেতে পারতুম!’ তখন আর একজন বল্লেন ‘না দিদি, হুঃখ কোরো না, উপায় যখন নেই তখন আর হুঃখ ক'রে কি হবে বল? আমরা ত বাড়ীভাড়াই দিতে পারি না!’ তখন প্রথম ব্যক্তি বল্লেন ‘তোমার কথাই ঠিক!

কিন্তু তবুও স্ত্রীবনে অন্ততঃ একটিবার ভালো বাজনা শুনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে করেও ত কোনো ফল নেই!’

বীথোভেন বল্লেন, ‘চল ভিতরে যাওয়া যাক।’ ‘ভিতরে? ভিতরে গিয়ে কি করবেন?’ তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন, ‘আমি ওকে বাজিয়ে শোনাব। এই ত এখানে শক্তি আছে প্রতিভা আছে হৃদয় আছে!’ দ্বার ঠেলে দেখলেন, একটা টেবিলের ধারে ব'সে এক যুবক জুতা মেরামত করছে ও একটা পুরাণো পিয়ানোর উপর একটা তরুণী বালিকা বিষণ্ণমুখে নত হয়ে আছে। বীথোভেন বল্লেন, ‘মাপ করবেন আমাকে। বাজনা শুনে এখানে আসবার লোভ শব্দরণ করতে পারিনি। আমিও বাজাতে পারি। আপনাদের কথাবার্তা আমি কিছু কিছু শুনেছি। আপনারা শুনতে চান—মানে আপনারা ইচ্ছে করেন—মানে—এই আমি কি বাজিয়ে শোনাব?’

মুচি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বল্লেন—‘কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা জঘন্য, স্বরলিপিও কিছু নেই।’ ‘স্বরলিপি নেই! তবে উনি কেমন ক'রে—আমায় মাপ করবেন,’ বীথোভেন দেখলেন মেয়েটি অন্ধ, ‘দেখতে পাইনি। তা হ'লে আপনি শুনে বাজান! কিন্তু শোনেই বা কোথা? আপনি ত কনসার্টে জান না!’ ‘আমরা জ্বলে বছর দুই ছিলাম। আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা মহিলা থাকতেন। তিনি বাজাতেন আমি শুনতুম। গ্রীষ্মের সময় সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ীর জানলা প্রায়ই খোলা থাকত, আমি বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শুনতুম।’

বীথোভেন পিয়ানোয় বসলেন। সেই অন্ধ মেয়েটি ও তার ভায়ের কাছে তিনি যেমন বাজালেন তেমন আর তাঁকে কখনো বাজাতে শুনিনি। পুরাণো যন্ত্রটা যেন জ্যাস্ত হয়ে উঠল। ভাইবোনে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল, বাজনা একবার ওঠে একবার নামে, ভালো ভালো রাহিরের বাতাসে ভেসে চলে। হঠাৎ বাতির আলো দপ দপ ক'রে উঠল, ম্লান হয়ে এল, তারপর একবার কেঁপে উঠে নিবে গেল। তখন জানলা খুলে দেওয়া হ'ল, তাঁদের আলোয় ঘর ভেসে গেল। যেন কি ভাবে বিভোর হয়ে তিনি বাজনা ধামালেন।

মুচি মূহুরে বলেন—‘অদ্ভুত লোক ! কে আপনি ? কি করেন আপনি ?’

তিনি ‘শোন’ বলে অন্ধ মেয়েটি যে গৎটি বাজিয়েছিল, তাঁর স্বরচিত সেই গৎটি আরম্ভ করলেন। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না। তাইবোনে আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলে উঠল—‘তা হলে আপনিই বীধোভেন !’ তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন ; তারা বলে ‘আর একবার বাজান, আর একটিবায়।’

নির্মেঘ শীতের আকাশে তারাগুলি স্নিগ্ধ আলো জ্বলে রেখেছিল, তিনি চিন্তান্বিতভাবে সেদিকে চেয়ে চেয়ে বল্লেন—আমি একটি জ্যোৎস্নার সুর রচনা করব। তারপর তিনি একটা করুণ সুর বাজাতে লাগলেন। কি সুন্দর সে সুর ! জ্যোৎস্না যেমন নিঃশব্দ-চরণে ধরণীর ওপর নেমে আসে এ সুরটিও তেমনি ধীরে ধীরে যন্ত্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ; তারপর ক্রমে সুরটি উদ্দাম হয়ে উঠল, পরীরা যেন তৃণভূমির ওপর নৃত্য জুড়ে দিয়েছে ; সুরের শেষটা যেন তাড়াতাড়ি ছড়োছড়ি উষ্মে পূর্ণ,—কে-যেন কি-এক অজানা ভয়ে ভীত হয়ে ত্বরিতগতিতে পালিয়ে যাচ্ছে ! বাজনা ধামলে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। আমরাও সুরের সঙ্গে কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিলুম !

তিনি দ্বারের দিকে এগিয়ে বল্লেন—‘বিদায়।’ তাইবোনে সম্বরে বলে উঠল—‘আবার আসবেন ত ?’ বীধোভেন তাড়াতাড়ি বল্লেন—‘হ্যাঁ হ্যাঁ আবার আসব। মেয়েটিকে বাজাতে শেখাব। বিদায় !’ আমাকে বল্লেন—‘শীগুগির ফিরে চল, মনে থাকতে থাকতে সুরটা লিখে ফেলতে হবে।’

তাড়াতাড়ি ফিরে গেলুম। পরদির যখন তিনি সুবিখ্যাত ‘মুনলাইট সোনাটা’র সমস্ত সুরটি কাগজে লিখে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠলেন তখন অনেক বেলা।

গিলবার্ট বেকেট নামক একজন ইংরাজ ক্রুসেডের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এক মুসলমান রাজপুত্রের দাস হয়েছিলেন। ক্রমে তিনি প্রভুর বিশ্বাস ও প্রভুকন্যার প্রেমলাভে সমর্থ হয়ে একদিন সুযোগ বুঝে স্বদেশে পলায়ন

করলেন। মেয়েটিও প্রেমাস্পৃদের সন্ধানে বাঁধার জন্যে রুতসংকল্প হলেন। তিনি মাত্র দুটি ইংরাজি কথা শিখেছিলেন—লগুন ও গিলবার্ট। প্রথমটি বলে তিনি একখানি জাহাজে ক’রে লগুন সহরে উপস্থিত হলেন। তারপর পথে পথে দ্বিতীয় কথাটি জপমন্ত্রের মত বার বার উচ্চারণ ক’রে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে সত্যসত্যই যে পথের উপর গিলবার্টের বাড়ী সেখানে এসে পৌঁছলেন। তার পিছনে বহুলোকের ভিড়, তারা এই রূপসী বিদেশিনীর কার্যকলাপে অবাক হয়ে গিয়েছিল। গিলবার্ট ভিড় দেখে জানালার নিকট উঠে গেলেন, তারপর—দূরগত প্রিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে ঘরে এলেন।

দূরত্বের বাধা প্রেমিকার উৎসাহের নিকট পরাজিত হ’ল।

\* \* \*

উৎসাহের বলে পনের বৎসর বয়সে ভিক্টর হ্যাগো একখানি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন, সাঁইত্রিশ-বর্ষব্যাপী জীবনের মধ্যে র্যাফেল ও বাইরণ জগতে অক্ষয়-কীর্তি রেখে গেছেন, আর আলেকজান্ডার তরুণ বয়সে এসিয়ার বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন।

উৎসাহ যদি থাকে ত “কেশে পাক ধরলেও” অস্তরের তারুণ্য তার ঘোচে না। উর্কশীর মতই তার যৌবন অনন্ত !

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

— — —

## মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

( De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে )

( পূর্বানুস্মৃতি )

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ, সুদীর্ঘ ভ্রমণ, ও যুগয়ার আসক্তি বশতঃ, মোগল সম্রাটেরা পূরাপুরি কয়েক মাস শিবিরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইতেন।

আরংজেবের কাশ্মীরভ্রমণসম্বন্ধে Bernier বর্ণনা করিয়াছেন :—এই ভ্রমণে দেড়বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। তাঁহার অন্ধরমহলের বেগমদিগকে, প্রধান প্রধান

আমীর ও রাজাদিগকে, এবং ৩৫ হাজার অশারোহী, ১০ হাজার পদাতিক, রুশ-বাহিত বা হস্তী-বাহিত ৭০টা ভারী-ভারী কামান, উষ্ট্র-বাহিত ৬০টা মেঠো কামান তাহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত জমকাল একটি তান্জামে চড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজারা ও আমীরেরা, অশ্বপৃষ্ঠে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে; তাহাদের পশ্চাতে মুন্সবদারগণ। আসা-সোটাধারী চোপদারেরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, এবং কুতুহলী লোকদিগকে তফাতে সরাইয়া দিতেছে। সৈনিকেরা ধ্বজাপতাকা ও ছত্রচামরাদি রাজ-চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে। (১)

কিঞ্চিৎ দূরে, অন্দর-মহল,—অশারোহী-খোজা ও পদাতিক-খোজার দ্বারা সুরক্ষিত। এক-পাল হস্তী; তন্মধ্যে প্রধান হস্তীটি প্রকাণ্ড আকারের;—রত্নখচিত জমকাল সাজে সজ্জিত। তাহার পিঠের উপর বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত হাওদা; এই হাওদায় সম্রাজ্ঞী উপবেশন করেন। মাছি তাড়াইবার জন্ত ও ধূলা অপসারিত করিবার জন্ত বাদীরা ময়ূরপুঙ্কের হাত-পাখা ধারণ করিয়া থাকে।

দুইটি শিবির প্রস্তুত থাকে; সম্রাটের আগমনে এই দুইটি শিবির যথাবিহিত সুসজ্জিত হয়। শিবিরের যে স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেইখানে সম্রাটের মহল—দুই metre অন্তর খোঁটা-পোঁতা একটা চতুষ্কোণ বেষ্টিত। এই খোঁটাগুলো খুব টক্-টকে লাল ফুল-কাটা ছিট-কাপড়ে আবৃত। দুই প্রশস্ত মৃত্তিকাস্তূপের উপর দরবারের দুই বহুং মণ্ডপ;—একটি খাস-দরবারের ও একটি আম-দরবারের মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দুটি খুব উচ্চ ও লাল কাপড়ে মণ্ডিত; লাল রংই, বাদশার খাস রং। অভ্যন্তরে নানারকমের কাপড়; মখমল; সোনার জরির ও রূপার জরির কিংখাপ; চিকনের কাজ-করা রেশমি কাপড়; মধ্য-এসিয়া ও কারামনিয়ার গালিচা। এই দুই মণ্ডপের পশ্চাদ্ভাগে মোগলের স্নানাগার, সম্রাটের

অন্তঃপুর, ও বেগম-মহল। একটা প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া সম্রাটের মহলে প্রবেশ করিতে হয়। সম্রাটের যানের পুরোগামী শরীররক্ষী অশারোহীগণ এইখানে কতকগুলি অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই দ্বারের সম্মুখে মেঠো কামান হইতে সেলামি-তোপ ধ্বনিত হয়। সম্রাট-অঞ্চলের অনুকরণে রাজা ও আমীরদিগের অঞ্চল; কিন্তু উহাদের মণ্ডপগুলি ততটা জঁকাল নহে। প্রত্যেক আমীরের জন্ত নির্দিষ্ট এক-একটি বিশেষ রকমের রং। এই-সমস্ত অঞ্চলেই বাজার বসে এবং এই-সকল বাজারে খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র বিক্রীত হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে শিবির বলা যায়, উহা পূর্বোক্ত স্থানের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে সন্নিবেশিত অশ্বশালা, মুন্সবদার ও সৈনিকদিগের তাঁবু, দোকানদার ও কুলি-মজুরদিগের জলতা। আমীর ও মুন্সবদারগণ স্বীয় পত্নীদিগকে সঙ্গে আনিয়া থাকে; খুব নিম্নপদস্থ কর্মচারীও অনেক দাসদাসী সঙ্গে আনে; সামান্য একজন ডাক্তার ব্যাণ্ডিগে—ইহার সঙ্গে ছিল দুইটা ঘোড়া, একজন সহিস; একটা উট ও উটের একজন চালক, একজন পাচক ও একজন ভৃত্য; এই ভৃত্য আদ্র বস্ত্রাবৃত একটা জলের কুঁজা হাতে করিয়া আগে-আগে চলিয়াছে। জল হইতে ভাপ ওঠায় জল বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বলিতে গেলে, এই নগরের লোকদিগের স্থানচ্যুতি সর্বদাই ঘটে।

গরম পড়িবার পূর্বেই খুব ভোরে যাত্রা আরম্ভ করা হয়। সম্রাট ও আমীরগণ পূর্ব-হইতে-প্রস্তুত নিজ নিজ শিবির-বিভাগে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলে পর—শিবির তাড়াতাড়ি খাড়া করিয়া তোলায়, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে—হাঁকাহাঁকি চ্যাচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি,—এবং ধূলারাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন। দিবাবসানে, সৈনিক ও কুলিরা রন্ধনের জন্ত ঘুঁটের আগুন জ্বালায়। ইহার ধোঁয়ায় সমস্ত শিবির আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

তাহার পর রাত্রিসমাগমে, যখন ঐ ধূমরাশি অপসারিত হয়, তখন সম্রাটের অঞ্চলে, সারি সারি মসালের আলো দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা আমীরদিগের মশালধারী রক্ষীগণ, রাত্রিতে সেলাম দিবার জন্ত আসিয়াছে। এই মশালের আলোকে উহাদের জরির পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র

(১) ইহা তারকা-চিহ্নিত ভারতীয় নিশান; সূর্যের সম্মুখ দিয়া সিংহ চলিয়া যাইতেছে—এইরূপ চিহ্নাঙ্কিত মোগল-নিশান; ও বল্লভের মাথায় ধাতবমূর্তি-বিশিষ্ট কোকব ও কুব নামক দুই বিভিন্ন ধ্বজা; লালরঙের রাজছত্র, ব্যজনের জন্ত একপ্রকার চামর (সাইবাস)।—আইন-ই-আকবরীয় ফলক-চিত্র দ্রষ্টব্য।

কর্মকর্তা করিতেছে। তারপর সমস্ত আলোক নিবাইয়া দেওয়া হয়। পথহারা পথিকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য একটা উচ্চ মাস্তুলের উপর হইতে শুধু একটিমাত্র দীপ জ্বলে। কখন কখন চন্দ্রোদয় হইলে, সমস্ত তাঁবুর উপর, ঘুমন্ত মানুষদিগের উপর, ঘোড়াদের উপর, উটদিগের উপর, বৃষদিগের উপর, হাতীদিগের উপর, সেই চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়ে।

প্রধান আন্দোলন ছিল শীকার। চিতাবাঘ হরিণকে দংশিত্বাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। বাজপাখী বকের উপর ছোঁ মারিতেছে; বুনো হাঁস, দাঁড়-কাক দল বাধিয়া বাজপাখীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, বাজপাখীকে চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, কিন্তু পক্ষের গুরুতাবশত তেমন দ্রুতভাবে উড়িতে না পারায়, এবং বাজপক্ষীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায়, উহারা অবশেষে বাজপক্ষীর কুবলে পতিত হইতেছে। তারপর মহিষ শীকার এবং নিকট হইতে জালে-বদ্ধ সিংহ-শীকার, তারপর বড় বাঘ ও বড় জাতের চিতা। সেই যুগযুগান্তর তুণ এত উচ্চ যে অশ্ব ও অশ্বারোহী তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

\* \* \*

সর্বশক্তিমান হইলেও আততায়ীর আক্রমণভয়ে সর্বদাই সশঙ্ক,—মোগল-সম্রাট সামন্তবর্গের নিকট ও সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট আশ্রয়প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেন : সে বিষয়ে অবহেলা করিলে, লোকে তাঁহার মৃত্যু রটাইয়া দিত ; তাঁহার পুত্রগণ ও তাঁহার সেনাপতিগণ বিদ্রোহ করিত। পীড়িত হওয়ায়, সাজাহান নিজ অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন ; অগ্নি তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, শোকচিহ্ন ধারণপূর্বক, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অল্পকাল এই-যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা কখন ভুলেন নাই। তিনি অররোগে মুম্বু হইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে ছইবার করিয়া বাহক-সাহায্যে দরবারে গিয়া প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন।

জীবিত আছেন ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সম্রাট যেমন সামন্তদিগের নিকট আশ্রয়প্রদর্শন করিতেন,

সামন্তেরাও তেমনি স্বকীয় প্রভুত্বের প্রমাণ দিবার জন্য দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত। কি রাজপুত্র রাজা, কি কোন দলের দলপতি, কি সেই-সব ভাগ্য-অশেষীর দল যারা বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাচরণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত, কি সেই-সব মোগল ও তুর্ক যাহারা তখনও অসভ্য-অবস্থায় অবস্থিত, কি যুদ্ধপ্রিয় আফগান ও বেলুচি, কি “মুখে মধু হৃদে ক্ষুর” ভারতীয় মুসলমান—বিশেষত পারস্যকগণ—ইহাদের কাহাকেই বিশ্বাস করিবার জো ছিল না। রাজকার্য পরিচালনে, আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধানে, যুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতিত্বের ভারগ্রহণে, একমাত্র এই পারস্যকেরাই সমর্থ ছিল। সকলেই অর্থ পাইলে আশ্রয় বিক্রয় করিত ; এবং অপেক্ষাকৃত যুবা ও সাহসী প্রভু পাইলে, জরাগ্রস্ত ও রুগ্ন প্রভুকে উহারা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হইত।

এইজন্ত রাজা ও আমীরেরা বৎসরের একাংশকাল দিল্লিতেই অবস্থান করিতেন। প্রত্যেক আমীরের জন্য এক-এক বিশেষ দিন নির্দিষ্ট ছিল, সেই দিন শুধু সেই আমীরের সৈনিকেরাই সম্রাটের প্রাসাদ রক্ষা করিত। কিন্তু বিদ্রোহস্থলে সম্রাট অন্য রক্ষী নিযুক্ত করিতেন—প্রাসাদ-ঘেরের বাহিরে রাজপুত্রেরা পাহারা দিত।

প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে,—শিবিরেই থাকুন বা দিল্লিতেই থাকুন—সকল আমীরেরাই সম্রাটকে সেলাম জানাইতে আসিতেন।

শুক্রেবারে সম্রাট হাতিতে চড়িয়া বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া মসজিদে আসিতেন। সমস্ত পথটা বন্দুকধারীরা গুল্মবেড়ার মত সারীবন্দী হইয়া দাঁড়াইত। মিছিলের আগে আগে সোয়ারেরা ঘোড়া ছুটাইয়া যাইত ; মিছিলের পশ্চাতে-পশ্চাতে আমীরেরা চলিতেন।  
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## সুখমৃত্যু

তোমারি চিন্তার মাঝে বেঁচে আছি আমি,  
তোমারি ভাবনা ভূরে মরিব এবার,  
চন্দ্র যথা সূর্য্যকরে জীয়ে দীর্ঘ যামি,  
তারি দীপ্তালোকে মরে প্রভাতে আবার !

## পঞ্চশস্য

### প্রাচীন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ( The Current Opinion ) :—

বাইবেলে বর্ণিত ব্যাবেল টাওয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে,—এই সংবাদে প্রাচীনতত্ত্বাসক্তানী পণ্ডিতেরা একেবারে উদ্‌গীব হইয়া উঠিয়াছেন। পম্পিআই নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর আর কোনো আবিষ্কার পণ্ডিতসমাজে এমন কৌতূহল জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর হইতে ব্যাবিলনের খননকার্য চলিতেছিল। তাহাতে ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ রাজা নেবুকাডনেজার ও তাহার রাজধানীর অনেক গোপন ইতিহাস প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সঙ্গে ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীনতম রাজধানী কিস নগরেরও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত অঙ্গনে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার নাম “স্বর্গমর্ত্যের ভিত্তি, জাতীয় দেবতা জমামার মন্দির।” এই ভগ্নাংশের মধ্যে মূর্তি ও পাত্র পাওয়া গিয়াছে,—সেগুলি ৪০০০ বৎসরেরও পুরাতন।

বোগদাদ ও নিনেভের মধ্যবর্তী অসুর নগরের খনন হইতে প্রাচীন আসিরীয় জাতির একটি সুগঠিত সভ্যতার ইতিহাস আবিষ্কারের পন্থা সুগম হইয়া আসিয়াছে। কালডীয়ের যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির উপর এখন আসিরীয় শিল্পকলার ছাপ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; সুতরাং শিল্পোন্নতির জন্ম কালডীয়া আসিরীয়ের নিকট পশ্চী প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। আসিরীয়ের শিল্পসাধনার কেন্দ্র ছিল নিনেভে রাজধানীতে।

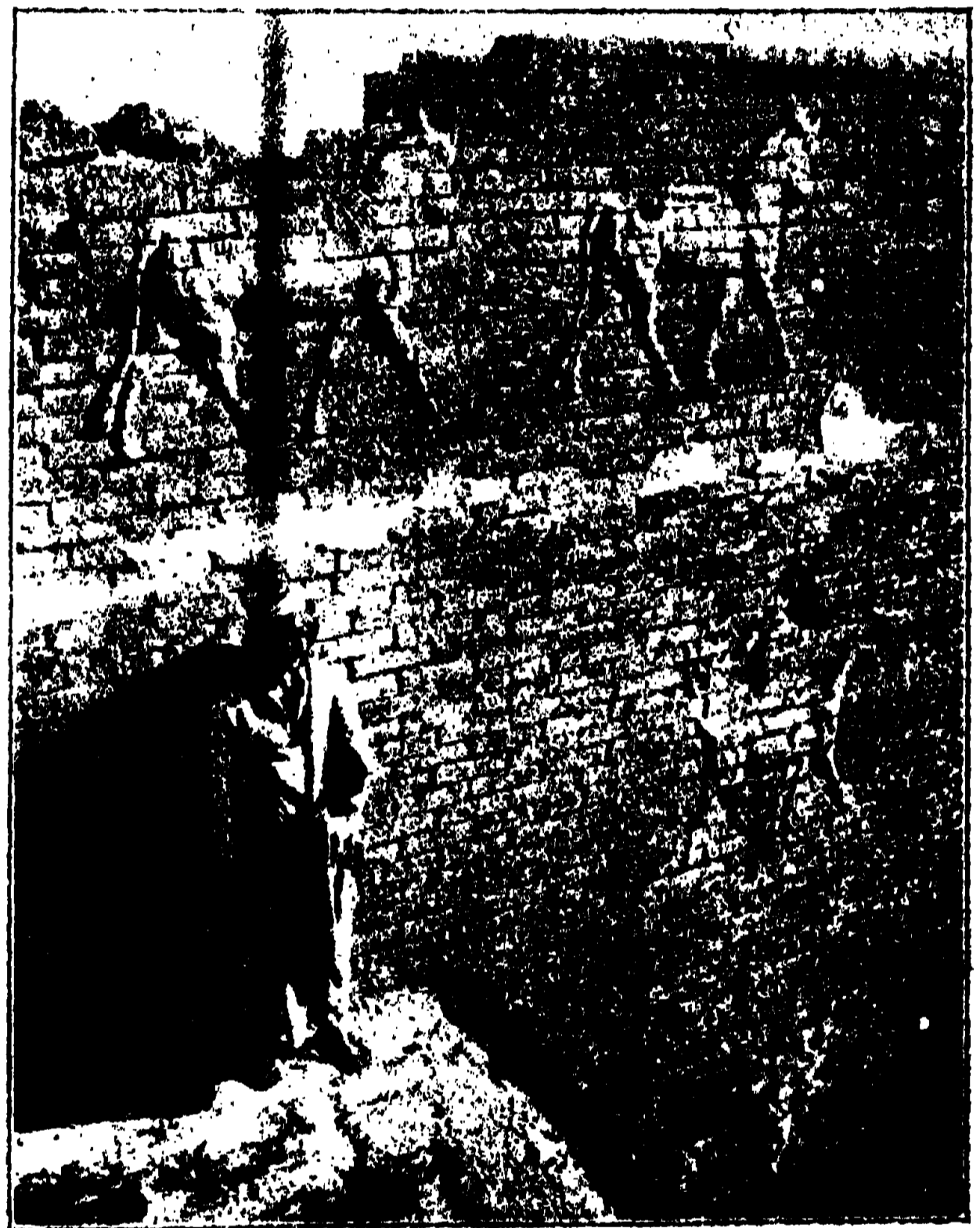
কালডীয় ও আসিরীয় জাতির সমস্ত বাড়ী ঘর ইটের তৈরী; এবং এক প্রাচীন সহর ছাড়িয়া নূতন সহর গঠন করিবার খবরই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই প্রাচীন সহরের বাড়ী ঘর ভাঙিয়া নূতন সহর গঠিত হইয়াছে; ইহাতে কোনো সহরেরই একটি পূর্ণ মূর্তি পাইবার জো রাখে নাই। যে-সমস্ত বাড়ী লোকের আক্রমণ হইতে নিষ্ফুটি পাইয়াছিল সেগুলিও কালের আক্রমণ এড়াইতে পারে নাই। যে একটি মাত্র অথও বাড়ী পাওয়া গিয়াছে সেটি সাততলা, এবং প্রত্যেক তলার দেয়ালের বাহির দিক সাতটি গ্রহের নামে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও আকারের ইট দিয়া গাঁথা। এই-সমস্ত বাড়ীর বিরাট পত্তন দেখিয়াই বোঝা যায় যে তাহাদের আয়তন ও আয়োজনটা বড় সামান্য ছিল না।

নিনেভে সহরে অসুর-বনি-পাল রাজার প্রাসাদে একটি লাইব্রেরী আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেই লাইব্রেরীতে হাজার হাজার ফলক-লিপি সংরক্ষিত আছে। এই-সমস্ত লিপি পাঠে জানা যায় যে এগুলি অণ্ড লিপির নকল; ব্যাবিলোনিয়াতেও অল্পরূপ নকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই-সকল ফলক-লিপির মধ্যে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভাষার সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, পশু পক্ষী ও উদ্ভিদের নাম-তালিকা, ভূগোল-বৃত্তান্ত, কাব্য ও পুরাণপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি দেশের যুবকদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই-সমস্ত ফলকলিপির মধ্যে কতকগুলিতে কাব্যে প্রসিদ্ধ কালডীয় বীর গিজ্‌ধুরর সংক্ষেপে কাহিনী বিবৃত আছে। তাহার একাদশ কলকে বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্রাণের অসুররূপ বর্ণনা রহিয়াছে। এখানেও গাণের আতিশয্যই মহাপ্রাণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা

হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি নোকা ( আর্ক ) গঠন করিয়াছিল তাহার নাম সমসু-নপিস্তি বা সূর্গা; নোকা প্রথম স্থল পায় নিজির পাহাড়ে; এবং বৃষ্টি হইয়াছিল সাত দিন। এই অমিল হইতে বুঝা যায় যে হিব্রু ও কালডীয় জাতির প্রত্যেকেই অপর কোনো প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া স্থানের অবস্থানের সহিত মিলাইয়া মহাপ্রাণের কাহিনী রচনা করিয়াছিল।

আসিরীয় রাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল অসুর। সেই সহরের ডবল দেওয়াল ও পরিখা এবং তোরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীর একেবারে অটুট অভয় অবস্থায় আছে; প্রাচীর-গাত্রে তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপের ছিদ্রগুলি পর্যাপ্ত। বহু প্রাসাদ, মন্দির, জল সরবরাহের এবং জল নিকাশের পয়োনালী, বাজারের মধ্যকার মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত পথের দুধারি দোকানের শ্রেণী, গরিব লোকদের বস্ত্রি, ধনীদিগের খিলানকরা সমাধিমন্দির ও তাহাতে পাথরের কজায়



ব্যাবিলনের প্রাচীন প্রাসাদ-প্রাচীরে ইটে গাঁথা ঘোটকমূর্তি।

ঝুলানো অথও প্রস্তরের দরজা, অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণ প্রস্তর প্রভৃতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগরের দক্ষিণাংশে, নগর-প্রাচীরের নিকটে একটা ফাঁকা জায়গায় প্রস্তর-স্তম্ভের যেন অরণ্য; এগুলি ৩ হইতে ৮ ফুট উচ্চ অথও প্রস্তরের; মাথার দিকে আসিরীয় ভাষায় যাহার স্মরণার্থ যে স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে তাহার পরিচয় উৎকীর্ণ আছে। ইহাদের মধ্যে একটিতে শামুরামাত বা পৌরাণিক রাণী শেমিরামিসের নাম পাওয়া গিয়াছে; সকল আবিষ্কারের মধ্যে এই আবিষ্কারটি ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য।

ব্যাবিলোনিয়ার প্রায়রকা নামক স্থানে গিলগামিশ কাব্যের নায়কের বাসস্থান ছিল; ঐস্থানের প্রাচীন নাম এঁরেক, বাইবেলে উল্লিখিত দেখা যায়। এই স্থানেরও খননকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ইউফেটিস নদীর বাম কূলে বোগ্দাদ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে। নেবুকাডনেজারের কসর বা কেল্লা-প্রাসাদ সেই অতি পুরাকালের স্থপতিবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটা দেয়ালের গায়ে আশ্চর্য্য কোশল ও কারিগরীতে ইহার প্রস্তুত। সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তি চৌকা পোড়া ইটে গাঁথা; প্রত্যেক ইটে বিধবিধে রাজা নেবুকাডনেজারের নাম ও উপাধি ছাপা। প্রাসাদে হাজার খানেক কুঠরি, কিন্তু ছোট ছোট; যে একটি ঘর সর্বাপেক্ষা বড়, তাহার এক পার্শ্বে একটা ইষ্টক-বেদী আছে—ইহাই বোধ হয় সিংহাসন-পীঠ ছিল।

বাবিলন নগরের মধ্যে একটি পথ দিয়া দেবমূর্তির মিছিল বাহির হইয়া মন্দির হইতে রাজপ্রাসাদে কোনো এক উৎসব-দিনে দাইত; সেইজন্য এই পথটি লোকে পবিত্র মনে করিত। এই পথের



বাবিলোনিয়ার ভূগর্ভস্থিত প্রস্তরের সিংহমূর্তি।

মোহড়ায় যে তোরণ আছে, তাহার নাম ইশ্তর তোরণ; ইহা বিরাট ও জমকাল রকমের। ইহা এখনো প্রায় অটুট আছে; ইহার বর্তমান উচ্চতা ৪০ ফুট; ইহার গায়ে ছয়টি চৌকা গুহজ আছে, সেগুলিও পোড়া ইটের গাঁথা, ১২ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চৌড়া, এবং দেয়ালের গায়ে উপরাউপরি সাজানো দেয়ালের গা হইতে উচ্চ করিয়া ষড়, সিংহ, ড্রাগন ও কিন্তু তকিমাকার জন্তুর মূর্তি গাঁথা আছে। এই মূর্তিগুলির ইটের উপর চকচকে নীল, হলদে ও শাদা পালিশ লাগানো, এবং এখনো নূতনের গায় বকবক করিতেছে। গাঁথনির প্রত্যেকখানি ইট পৃথক পৃথক করিয়া গড়া ও রং করা; কিন্তু এমন কোশল ও মাপে তৈয়ারী যে সকলগুলি মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট আকারের সৃষ্টি করিয়াছে। অথও প্রস্তর কুঁদিয়া নির্মিত একটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি পাওয়া গিয়াছে; সে মূর্তিতে পশুরাজের স্বাভাবিক মূর্তির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যায়,

কিন্তু পশুরাজের ভাব সেই বৈলক্ষণ্য দ্বারাই স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য কলাবিচারকেরা এই মূর্তির সঙ্গে রোঁদার মূর্তিনির্মাণরীতির সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তাহার প্রাচ্য মূর্তি ও চিত্রশিল্পের মূলসূত্র আকারের উপর ভাবের প্রাধান্যের সংবাদ রাখিলে বিস্মিত হইতেন না।

আমরান নামক স্থানে ৪০ ফুট মাটির নীচে, আরব হিব্রু পার্শ্ব ও পারসিক জাতির বাসচিহ্নের ধ্বংসের তলে বাবিলনের প্রসিদ্ধ এমাগিল মন্দির অবিকৃত হইয়াছে। বাবিলনে কতকগুলি মৃৎকলক, মুদ্রা, মৃৎপাত্র, ওজনসামগ্ৰী, প্রস্তরাস্ত্র, মূর্তি, ও অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। মৃৎকলক হইতে জানা যায় যে বাবিলনের দালালী ব্যবসায় বহু পুরুষ ধরিয়া হিব্রু জেজব বা যাকুব পরিবারে আবদ্ধ ছিল। একটা ঢোলের আকারের মৃৎপিপার গায়ে পারশুরাজ সাইরাস কর্তৃক বাবিলন বিজয়ের সংবাদ লিখিত আছে।

লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইমারতের খিলান রোমানদের উদ্ভাবন। কিন্তু বাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের বাস্তব-বিদ্যা আশ্চর্য্য রকম উন্নত হইয়াছিল দেখা যায়। একটি স্মৃতিস্তম্ভ খিলান পাঁচকটির গায় বৃজপৃষ্ঠ-সমতল পোড়া লাল ইটে গাঁথা। এখানে ইটের ইমারতের অত্যাশ্চর্য্য প্রাচুর্য্য।

বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ তিনটি বড় ও কতকগুলি ছোট টিবিতে পরিণত হইয়াছে। এইগুলিকে বেটন করিয়া অত্যাশ্চর্য্য বুলিঙ্গুপ নগরপ্রাচীরের স্থান আধিকার করিয়া আছে। হেরোডোটাস বলেন যে এই প্রাচীর ৩২৫ ফুট উচ্চ ও ৮৫ ফুট চৌড়া এবং ৪২ হইতে ৫৬ মাইল ধরিয়া ছিল; ইহার চতুর্দিকে ২৫০টি গম্বুজ, ১০০টি পিতলের কপাটওয়লা তোরণ ছিল। এই স্থলে বাবেল টাওয়ার ও বাবিলনের শূণ্যসংস্থিত উদ্যানের অস্তিত্বের প্রমাণ ও অবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

### স্থলচর জন্তুর পূর্বপুরুষ ( The American Museum Journal ) : —

বিবর্তনবাদীদের অভিমত যে স্থলচর মাছই ক্রমশ উন্নত হইয়া স্থলচর জীবে পরিণত হইয়াছে; মাছের ডানা পরিণত হইলে পাখীর ডানা পরিণত হইলে চতুষ্পদ, চতুষ্পদের সম্মুখ পদ পরিণত হইলে বানরের হাত, এবং বানরের হাত পরিণত হইলে পরে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত সমর্থনের উপযুক্ত প্রমাণ এত দিন পাওয়া যায় নাই; অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তের মাঝে মাঝে প্রমাণের অসম্ভাব থাকিয়া গিয়াছে—সেইগুলিকে লুপ্তসূত্র বলা হয়। এতদিনে একটি লুপ্তসূত্রের খেঁই ধরা পড়িয়াছে। আফ্রিকার এক রকম মাছ দেখা গিয়াছে তাহার জলে থাকিলে কানকো দিয়া নিশ্বাস লয়, আবার ডাঙায় উঠিলে ফুসফুসের কার্য্য আরম্ভ করে; ইহার ডাঙায় বহু খানেক অনায়াসেই বাস করিতে সমর্থ। এই মাছের জাতির জগতের বহু পুরাতন অতীত যুগে ভবলীলা সাধ করিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; হই একটি এখনো ফে কেমন করিয়া থাকিয়া গিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য। ইহাদেরই বংশধর—উভচর জন্তু, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের চামড়া, পেশী, অস্থি, মস্তিষ্ক, পাখনা সমস্তই মাছ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝামাঝি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়।





তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন শিশুমূর্তি।

### তিন হাজার বৎসর পূর্বেরকার শিশুমূর্তি (The Literary Digest) :—

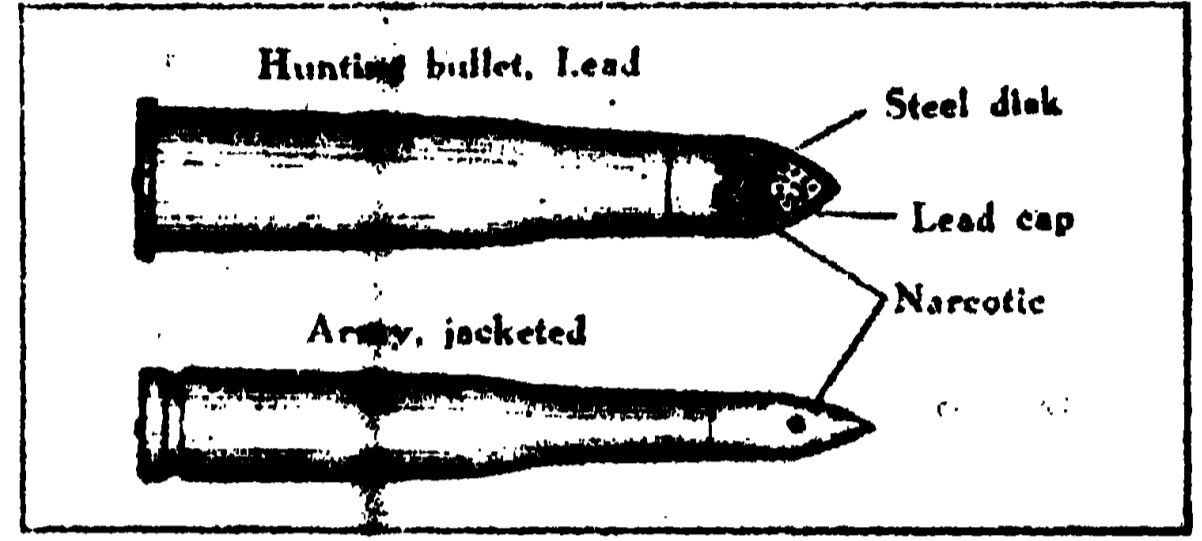
লিয়োনাদে' দা ভিকি কর্তৃক অঙ্কিত মোনা লিসা বা লা গিয়োকন্দা নামক যে প্রসিদ্ধ চিত্রখানি ফ্রান্সের চিত্রশালা হইতে চুরি গিয়াছিল তাহা ইটালীতে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রসিদ্ধ চিত্র চুরি যাওয়া ও ফিরিয়া পাওয়া লইয়া বেশ একটু আন্দোলন হইয়া গেল। এইরূপ অপর একটা আন্দোলন এথেন্সের উপর দিয়া চলিয়া গেছে। এথেন্সের জাতীয় ম্যাজিয়ম হইতে পনের বৎসর পূর্বে একটা তিন হাজার বৎসরের পুরাতন শিশুমূর্তি চুরি যায়। সেটি সম্প্রতি আমেরিকায় ধরা পড়িয়াছে। এই অমূল্য পুরা-নিদর্শনটি উদ্ধার করিবার জন্য গ্রীস-গভর্নমেন্ট দেশে দেশে ছদ্ম পুলিশ প্রেরণ করিয়া বহু পরিশ্রমে এটি উদ্ধার করিয়াছে। এই মূর্তিটি বালিকার, মর্দর প্রস্তরে নির্মিত। ইহার গলাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

### জ্ঞানকোষ (Technical World Magazine) :—

পিটসবার্গের অধিবাসী আলেকজান্ডার হাফে, এক রকম বন্দুকের গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আহত প্রাণী তৎক্ষণাত্ গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবে, কোনো রূপ জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করিবে না। এই গুলি ব্যবহার করিলে যে শুধু শত্রুর প্রতিই দয়া প্রকাশ করা হইবে তাহা নয়, নিজেদেরও সুবিধা যথেষ্ট—চোরকে একেবারে না মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া ধরা চলিবে, হিংস্র লজ্জগুলি ধাইয়া শিকারীকে পাশ্চাত্য আক্রমণ করিতে পারিবে না, যুদ্ধে

বন্দের তাণ্ডব নৃত্য খামিয়া যাইবে, আর ঘুমপাড়ানি বাসি পিসি আদির করিয়া ঘুম পাড়াইয়া কাজ হাসিল করিবে।

এই জঙ্কক গুলিকার মুখের কাছে ছোট একটা ছিদ্রের মধ্যে একটু আফিংসার বা মফিয়া ভরিয়া তাহার উপর ঢাকনি, কাঁটিয়া দেওয়া হয়। এই গুলিতে আহত হইলে হাড় ভাঙিবার সম্ভাবনা থাকে না; ক্ষত গভীর বা মারাত্মক হয় না; এবং আফিংসার শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে শারীরিক কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না। এই গুলির মধ্যে হাসির গ্যাস ভরিয়াও চালানো যায়। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, এমন সময় উহাদের উপর এই গুলিবৃষ্টি



ঘুম-পাড়ানো বন্দুকের গুলি।

করিলে শত্রুসৈন্য হাসিয়া হাসিয়া পাগল হইয়া উঠিবে বা ঘুমে ঢুলিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকিবে, যুদ্ধ করার সাধ্য তাহাদের আর থাকিবে না। যদি কাহারও আঘাত গুরুতর হয়, তবে সে ঘুমের ভিতর দিয়া মহাঘুমে অচেতন হইবে, যত্নের যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না।

এইবার আমাদের দেশের একদল লোকের বৃথা গর্কের আফালন করিবার সুবিধা হইবে, যে, আমাদের পুরাতনের জঙ্ককাত্ত বা সম্মোহন বাণ ফাঁকা কবিকল্পনা নহে, আমাদের দেশে না ছিল কি? আমরা যখন সব আগেই করিয়া চুকিয়াছি, তখন এখন স্বচ্ছন্দে ঘুম দিবার অধিকার আমাদের আছে।

### ভূমিকম্পে গৃহ ভূমিসাৎ হওয়ার প্রতিকার (Knowledge, London) :—

আপানে হওয়ায় অন্ততঃ একবার ভূমিকম্প হয়। আপানীরা সেইজন্য উহাতে ক্রমেকপই করে না। ছোট পাটো কম্প ত গ্রাহ্যই করে না; যে কম্প আমরা ধরবাড়ী ছাড়িয়া প্রাণের ভয়ে কাতর হই, সে রকম কম্পও তাহাদের কাছে আমাদের এক পশলা মুবলধারের বৃষ্টির মতো এক-আধবারের আলোচনার বিষয়। ইহার কারণ এই যে আপানীরা ভূকম্পন-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এমন কায়দায় বাড়ী তৈরী করে যে ভূমিকম্পে তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

সকলেই জানেন যে আগের গিরির সন্নিহিত স্থানে ভূমিকম্প হয়; ভূজঠরের জ্বালাবেগ উদ্গিরণ করিবার চেষ্টা ভূমিকম্প হইয়া প্রকাশ পায়, এবং সেই জ্বালা শেষে বাহির হয় আগের গিরির মুখ দিয়া। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে আপান, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অতি ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলিয়া ঐ স্থানগুলি এখনো টিকিয়া আছে; নতুবা আগের গিরির বিদীর্ণ মুখ দিয়া ভূজঠরের জ্বালা উদ্গাত হইয়া দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত।

ভূমিকম্পের প্রাচুর্য্যের থাকাতে আপানীরা ভূকম্পন-তত্ত্ব (seismology) বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও অনুসন্ধান করিয়া



জাপানের ভূমিকম্প-প্রতিবেদক মন্দির।

থাকে। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে ভূকম্পনতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক ও বীক্ষণাগার নির্দিষ্ট আছে। এবং দেশের সমস্ত আবহপরীক্ষাগারে ভূমিকম্প পরিমাপ করিবার যন্ত্র ও ব্যবস্থা আছে।

ভূমিকম্পতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ওমোরী ভারতবর্ষে ইংরেজী পদ্ধতিতে নির্মিত ইমারতের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—যে-সকল ইমারতের মধ্যে বহু কেরাণী, ছাত্র, কয়েদী, সৈন্য প্রভৃতি থাকে সেইসব আপিস, স্কুল, জেলখানা, বারাক প্রভৃতি পক্ষা মালমসলায় এবং ভূমিকম্পের নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে তৈরী করা গভর্মেণ্টের পক্ষে অপরাধ বলিয়া মনে করি। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারেরা মনে করে যে কলিকাতার মাটি নরম, ভূমিকম্প সেই নরম তলতলে মাটিতে নাড়া দিলে সে নাড়ায় মাটিই সংহত ও চাপ হইয়া যায়, উপরের ইমারতে সে কম্প সংক্রামিত হয় না। কিন্তু ইহা ভুল; নরম মাটিতে নাড়া পড়িলেই অলের চেউয়ের মতো সে নাড়া দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে; ইহা পরীক্ষিত সত্য।

ভূমিকম্পের অত্যাচার নিবারণের জন্য সমস্ত ইমারতটিকে অখণ্ড সংহত স্তূপ করিয়া গঠন করা উচিত; সমস্ত বাড়ীর মাঝে পুঙ্করিণীর স্থায় গর্ভ কাটিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড পীঠ বা বেদির আকারে বনিয়াদ কংক্রীট করিয়া তাহার উপরে দেয়াল খাম প্রভৃতি গাঁথিলে ভূমিকম্প তলা হইতে উপর পর্যন্ত সমস্ত বাড়ীটা একই দিকে দোল খাইতে থাকে, তাহাতে বাড়ীর দেয়ালে চিড় খায় না, খাম বা ছাদ ধসিয়া যায় না; কিন্তু কেবল দেয়ালের নীচে নীচে মাত্র বনিয়াদ থাকিলে সমস্ত দেয়াল পৃথক পৃথক থাকে, ভূমিকম্পে বিপরীত দিকের দেয়াল বিপরীত মুখে দোল খায়, এবং তাহাতে দেয়াল ফাটে, খাম পড়ে, ছাদ বসে।

জাপানের বাড়ীর বনিয়াদ হইতে ছাদ পর্যন্ত অখণ্ড ভাবে গঠিত হয় বলিয়া অতিবড় ভূমিকম্পেও পড়িয়া যায় না। জাপানের অতি প্রাচীন মন্দিরগুলিও এই পদ্ধতিতে নির্মিত, এবং ভূমিকম্পে দোল খাইবার সময় দীর্ঘ উচ্চ মন্দিরগুলির ভারকেন্দ্র বিচ্যুত হইয়া উন্টাইয়া পড়িবার খুব সম্ভাবনা বলিয়া মন্দিরের ভিতরে একএকটি বড় ও ভারি কাঠের চক্র ছাদ হইতে মাটির প্রায় কাছাকাছি বুলাইয়া দোলক বা পেগুলামের স্থায় টাঙানো থাকে, তাহা ভূমিকম্পের দোলায় দোল খাইয়া মন্দিরটির ভারকেন্দ্র বজায় রাখে। ইহাতে ভূমিকম্পে মন্দিরগুলি ঘুরপাক খাইতে পারে, এক স্থান



তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প-প্রতিবেদক ভূমিকম্প-বীক্ষণ

হইতে অল্প স্থানে সরিয়া বসিতে পারে, কিন্তু উন্টাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে না; মন্দিরটি একদিকে হেলিয়া পড়িতে গেলেই দোলকটি ছলিয়া অপর দিকে আসিয়া মন্দিরটিকে টানিয়া আবার ঠাড়া করিয়া তোলে।

### ছাগলের দুধই দুধের সেরা (The Literary Digest) :-

সকলের পক্ষে বাড়ীতে গরু রাখিয়া দুধ খাওয়ার সম্ভব হয় না, বিশেষত শহরের লোকের। কেনা দুধের মধ্যে কত কি ভেজাল থাকে, অনেক সময় যক্ষ্মা- বা ক্ষয়রোগ- বা বসন্তরোগপ্রসূত গরুর দুধ গয়লারা অনায়াসেই চালাইয়া দেয় এবং কয় গরুর দুধ খাইয়া লোকেরও সেই সেই রোগ হয়। এই দুধসমগ্রা মিটাইবার জন্য সমাজহিতৈষী পণ্ডিতেরা ব্যস্ত আছেন; কেহবা কৃত্রিম দুধের কল উদ্ভাবন করিতেছেন, কেহবা গরুকে সুস্থ নীরোগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহবা নীরোগ অপর দুধ গরুর দুধের পরিবর্তে চালানো যায় কি না তাহার সন্ধান করিতেছেন।

আমেরিকার বাফেলো (মহিষ) শহরের ডাক্তার বুল (বুল) বলেন যে দুধাল জন্তুদের মধ্যে ছাগলই একমাত্র দুধ বাহার ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগ হয় না, ছাগলের দুধের পুষ্টিকরতা সহজে ছাগল পোষার সুবিধাও খুব বেশী। লোকে কথায় বলে—ছাগলে কি না খায়? পাপলে কি না বলে? বাড়ীর কুটনো-কোটা ওচলা কেন খাওয়াইয়াই একটা ছাগল পোষা চলে। ছাগল খুঁটিয়া খাইয়া ছাড়া চরিয়া বেড়াইতে পাইলে ত কথাই নাই। ছাগল

এক বিয়ানে অনেকগুলি বাচ্চা বিয়ায়, তাহাতেও লাভ যথেষ্ট। হিসাব করিয়া দেখিলে গুরু পোষার চেয়ে ছাগল পোষায় লাভ ঢের বেশী হয়— (১) ছাগলের আকার ও আহারের অনুপাতে ভালো জাতের ছাগল গরুর চেয়ে বেশী দুধ দেয়; (২) ছাগলের দুধ গরুর দুধ অপেক্ষা পুষ্টিকর, পোষ্টাই পদার্থে পূর্ণ, অথচ শীঘ্র হুজম হয়। গরুর দুধ আর ছাগলের দুধের স্বাদে বিশেষ পার্থক্য নাই। সব চেয়ে বেশী বাঁচোয়া যে ছাগলের যক্ষ্মা রোগ হয় না। তারপর সু-প্রজনন বিদ্যার নিয়মানুসারে বাছাই-করা ছাগলের সম্ভান উৎপাদন করিতে থাকিলে কালে আকারে বৃহৎ, প্রচুর দুগ্ধবতী ছাগী লাভ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

চাকর।

## ছাতা \*

( গল্প )

মিসেস ওরিলী রূপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। আধলা-টার অবধি তিনি বিলক্ষণ মূল্য জানিতেন। জীবনে তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল অর্থসঞ্চয়! বাটার চাকর দাসী কখনও তাঁহার নিকট হইতে পাইপয়সাটি অবধি ভোগা দিয়া লইতে পারে নাই; মিঃ ওরিলীও হাতখরচ কিছু পাইতেন না। সৌভাগ্যক্রমে ওরিলী-দম্পতির কোন সম্ভান-সম্ভতি হয় নাই; মিসেস ওরিলী এজন্ম একটুও দুঃখিত ছিলেন না, বরং সে বাজে খরচের হাত এড়াইয়া সুখীই হইয়াছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া যেদিন বাজারের দেনা মিটিত বা কোন অনিবার্য্য কারণে একটা মোটা রকমের টাকা বাহির হইয়া যাইত, সেদিন তিনি সে শোক বহুকষ্টেও সম্বরণ করিতে পারিতেন না; বুকে বাঁশ দিয়া দিলে যেমন যন্ত্রণা হয় তিনিও তেমনি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকিতেন। সারা রাত্রি তাঁহার স্ত্রী হইত না এবং পরদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইত।

মিঃ ওরিলী মধ্য মধ্য বলিতেন,—“দেখ, আর একটু হাত ছেড়ে খরচ কর; আমাদের যেমন আয় সেই মত না থাকলে লোকের কাছে নিন্দে শুন্তে হয়।”

“হয় ত বুদ্ধ বয়েই গেল। কাল কি হবে কে বলতে

পারে? তখনকার জন্মে একটা মোটা রকম সঞ্চয় ক’রে রাখাই ত বুদ্ধিমানের কাজ!”

মিসেস ওরিলীর বয়স হইয়াছিল প্রায় চল্লিশের হেরা-হেরি; ঝরঝরে তরতরে বেঁটে খাট মানুষটি। মেজাজটি ছিল একটু উগ্র।

পত্নীর শাসনদণ্ডে বেচারী ওরিলী একেবারে মুশুড়াইয়া পড়িতেছিলেন; তাঁহার আত্মসম্মানও সে শাসনে অনাহত থাকিত না।

মিঃ ওরিলী যুদ্ধ বিভাগের হেডক্লার্ক ছিলেন। সেখানেও তিনি যে-কিছু কর্ম করিতেন সকলই তাঁহার পত্নীর নির্দেশ অনুসারে; মাসের শেষে আবশ্যকের অধিক বেতন আনিয়া পত্নীর শ্রীকরকমলে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হইতেন; তাহা হইতে পত্নীর বিনামূল্যে এক কপর্দকও তাঁহার খরচ করিবার অধিকার ছিল না।

আজ প্রায় দুইবৎসর হইল তিনি এই আফিসে কর্ম করিতেছেন; সেই যে প্রথমে পত্নী তাঁহাকে একটা শত-তালিযুক্ত ছাতা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন সেটা আজিও বদলান হয় নাই। আফিসের সামান্য লোক হইতে ম্যানেজার অবধি সকলে তাঁহাকে সেই ছাতা লইয়া তামাসা করিত; নিরীহ বেচারী নীরবে সকলের কথা সহ করিয়া যাইতেন, কোন কথা কহিতেন না। ক্রমে যখন সে ঘটনা উত্তরোত্তর বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি পত্নীর নিকট একটা নূতন ছাতা চাহিয়া ফেলিলেন। সেদিন মিসেস ওরিলী ছয়শিলিং আট পেন্স খরচ করিয়া স্বামীকে একটা নূতন ছাতা কিনিয়া দিলেন। বেচারী ওরিলী কিন্তু লোকের তামাসাব হাত এড়াইতে পারিলেন না। সহকর্মীরা তাঁহার জায় একজন পদস্থ কর্মচারীকে এরূপ খেলো জিনিষ কিনিতে দেখিয়া নূতন করিয়া শ্লেষ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ছাতাটাও ভাল উৎরাইল না; তিনমাস যাইতে না যাইতেই সেটা একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাঁর বিক্রপ-হাস্তে বিশাল অট্টালিকা প্রতি-ধ্বনিত হইল। স্বভাব নীরস কেরণীকুলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি এই বিষয় লইয়া একটা ছড়াও বাঁধিয়া ফেলিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি সেই ছড়া শুনিতে শুনিতে মিঃ ওরিলীর কান ঝালাপালা হইয়া উঠিত।

\* Guy de Maupassantর ফরাসী গল্পের অনুবাদক Mrs. Ada Galsworthyর অনুমতি অনুসারে অনূদিত। অনুবাদকর্ত্রী অনুমতি দান করিয়া আবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ক্ষুধিত্তে তিনি পন্নীকে একটী নূতন ছাত্তর জ্ঞত বলিলেন । এবার যেন ষোল শিলিংএর কম না হয় পুনঃ পুনঃ সে কথা বলিয়া দিতেও ভুলিলেন না এবং ছাত্তাটী যে সতাই ষোল-শিলিং মূলোর ত্তাহার প্রমাণ স্বরূপ দোকানের রসিদ আনিয়া দেখাইতে বলিলেন । মিসেস ওরিলী আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একটী চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্সের ছাত্তা আনিয়া স্বামীকে দিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে জানাইলেন,—“এবার দামী ছাত্তা কিনে দিয়েছি, অন্ততঃ পাঁচবছর এটা চলা চাই !”

সে দিন আফিসে আর কেহ মিস ওরিলীকে তামাসা করিতে পারিল না । সন্ধ্যার সময় ছাত্তা হাতে লইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিতেই মিসেস ওরিলী চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন,—“ওইত না, অমন ক’রে বেঁধে রাখলে সিন্ধের ছাত্তা ক-দিন টেকবে ? অগ্নি করেই তু ছেঁড়ে ! এবার আর তা ব’লে শীগ্গির ছাত্তা কিনে দিচ্ছি না ।”

তিনি ক্ষিপ্ৰহস্তে স্বামীর নিকট হইতে ছাত্তাটী লইয়া ত্তাহার বাধন খুলিয়া ফেলিলেন । সযত্নে তাঁজগুলি সোজা করিয়া দিতে গিয়া তিনি ভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন । ছাত্তার মধ্যে একটী আধলার মত ছেঁদা দেখা যাইতেছিল । নিশ্চয়ই এ সিগারেটের আ গুনে পুড়িয়াছে !

ক্রোধরুদ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —“বলি, এ হয়েছে কি ?”

মিস ওরিলী এবিষয় কিছুই জানিতেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি বলছ ? হবে আবার কি ?”

• “হবে আবার কি ?—হবে আবার কি ?—” রাগে ত্তাহার কথা যোগাইতেছিল না—“এটা—ওঁর নেই এ করেছে,—এই ছাত্তাটা—তোমার ছাত্তাটা এর মধ্যেই এ করেছে—পুড়িয়ে ফেলেছ ! পাগল নাকি ? কি হাড়হা বাতে ! আমাদের তুমি পর্ধে বসাতে চাও ?”

মিস ওরিলী ভয়ে কতকটা বিবর্ণ হইয়া গেলেন ; স্ত্রীর দৃষ্টি হইতে এই পরিবর্তন গোপন করিবার জ্ঞত অন্ত দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“কি বলছ তুমি ?”

“বলছি—এর মধ্যেই ছাত্তাটা পুড়িয়ে বসেছ ? এই দেখ না, চোঁধের মাথা ত খাও নি !”

প্রহারোদাত্তার মত প্রচণ্ড বেগে তিনি ছাত্তার ফুটাটী লইয়া একেবারে স্বামীর নাকের নিকট ধরিলেন ।

মিস ওরিলী হতবুদ্ধির মত একটু হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—“ওটা—ওটা—আঁা, ও-আবার কি ক’রে হ’ল । কই আমি—আমি ত’ তা জানি না ! সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না, কিছু করিনি । বল ত’ তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না ।”

“এটা নিয়ে বুঝি তুমি আফিসময় দেখিয়ে বেড়িয়েছ ? —যেন কি একটা রাজক্তি লাভ হয়েছে ! নিশ্চয়ই তাই, আমি বেশ বুঝতে পারছি ।”

“না না, আমি কেবল জিনিষটা কেমন দেখাবার জ্ঞতে একবার খুলেছিলুম, বাস্ ! মাইরি বলছি, আর একবারও খুলিনি ।”

সে কথা তখন গৃহিনীর কানেই পৌঁছিল না । তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিতে লাগিলেন । শান্তিময় গৃহকক্ষ রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইল ।

পুরাতন ছাত্তা হইতে কাপড়ের একটা টুকরা কাটিয়া লইয়া তিনি সেই ছিন্ন অংশে একটা তালি দিয়া দিলেন ; পরদিন মিস ওরিলী সেই বিবর্ণ তালিযুক্ত ছাত্তাটী লইয়াই আফিস চলিয়া গেলেন । আফিসে পৌঁছিয়া প্রথমে ছাত্তাটীকে চাবির মধ্যে গোপনে রাখিয়া পরে আপনার কর্ম্মে মন দিলেন ।

সন্ধ্যার সময় বাটীতে পদার্পণ করিতেই গৃহিনী ছাত্তাটী ত্তাহার হাত হইতে লইয়া অন্ত কোন নূতন ক্ষতি হইয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলেন । ছাত্তাটা খুলিতেই একস্থানে ত্তাহার দৃষ্টি পড়িল । ঠিক অলস্ত পাইপের ছাই ঢালিয়া দিলে কাপড় যেমন পুড়িয়া যায় সে স্থানটী তেমনি ভাবে কাঁকরা হইয়া পুড়িয়া গিয়াছিল ! সত্য বলিতে হইলে জিনিষটা একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল । সে আর সারিয়া লইবার উপায় ছিল না ।

তিনি নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; ক্রোধ-ধিক্যে কথা কহিতে পারিলেন না । মিস ওরিলীও সে ছিন্ন দেখিতে পাইলেন ; ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেমুহূর্ত্তে বুঝিয়া কম্পিত কলেবরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন; দৃষ্টি বিনিময় হইতেই মিঃ ওরিলী সভয়ে দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটা আসিয়া তাঁহার মুখে লাগিল।

“যত সব লক্ষ্মীছাড়া, হাড়হা বাতে! সর্বনাশ করলে, সর্বনাশ করলে! জিনিষটা একেবারে শেষ ক’রে এনেছ! আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি,—আর ত ককখন কিনে দেবো না”—

আবার দুইজনে যুদ্ধ চলিল। প্রায় একঘণ্টা পরে মিঃ ওরিলী পত্নীকে শান্ত করিয়া জানাইলেন যে তিনি সত্যই এবিষয়ে কিছু জানেন না, কেহ বোধ হয় ঈর্ষাবশে এ কাজ করিয়া থাকিবে।

সেদিন একজন বন্ধুর তাঁহাদের সহিত ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিলে বেচারী ওরিলী নিষ্কৃতি পাইলেন।

তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইয়া গৃহিণী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। ঘটনাটা বুঝাইয়া তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন এখন আর নূতন ছাতা কেনা কোন মতেই সম্ভবপর নহে, এখন উপায়?

নবাগত ভদ্রলোকটি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—“এক্ষেত্রে দেখছি তা হ’লে মিঃ ওরিলীকে বিনা ছাতায় আফিস যেতে হয়, কিন্তু তা হ’লে ত’ ওরিলীর জামাজোড়া ধারাপ হ’য়ে যাবে; আর তাতে ক্ষতিটা বেশী বই কম হবে না।”

মিসেস ওরিলীর রাগটা তখনও সব পড়ে নাই; তিনি বলিলেন,—“বেশ, তা হ’লে ও ওই রান্নাঘরের ছাতাটা নিয়ে আফিস যাবে।”

মিঃ ওরিলী মহা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন,—“সে কিছুতেই হ’তে পারে না, আমি তা পারব না; তা হ’লে কালই আমি চাকরীতে জবাব দেব।”

নবাগত বন্ধু কহিলেন,—“আচ্ছা, ছাতার কাপড়টা ত’ বদলে নিলেই চুকে যায়, তাতে ত’ আর তেমন খরচ পড়বে না।”

মহাক্রুদ্ধস্বরে মিসেস ওরিলী বলিলেন,—“খরচ পড়বে না! বল কি?—অন্ততঃ সাড়ে-ছ’ শিলিং খরচ পড়বে। তবেই হ’ল, হিসেব কর না, চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স, আর

গিয়ে ছ’শিলিং ছ’পেন্স, কত হ’ল দেখ না, এক পাউণ্ড এক শিলিং এক পেনী! বাবাঃ! একটা ছাতার পেছনে একশ শিলিং খরচ ক’রতে হ’লেই ত হয়েছে আর কি!”

নবাগত বন্ধুটি একজন বিচক্ষণ হিসাবী ঙ্গলোক; তিনি অনতিবিলম্বে বলিয়া উঠিলেন,—“তা গিয়ে, এক কাজ কর না; তোমাদের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ কর। তোমার বাড়ীর যে কোন জিনিষ পুড়লে তারা খেসারৎ দিতে বাধ্য।”

গরম লোহা জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলে যেমন প্রথমটা ছ’য়াক করিয়া মুহূর্ত মধ্যে সেটা শীতল হইয়া যায়, নবাগত বন্ধুর এই উপদেশ লাভে মিসেস ওরিলীও তেমনি মুহূর্তে প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কি’চিন্তা করিয়া মিঃ ওরিলীকে বলিলেন,—“দেখ, কাল আফিস যাবার আগে একবার ‘মেটারনিলি অফিসে’ যেও; ছাতার অবস্থা দেখিয়ে দামটা আদায় ক’রে আনবে।”

কথাটা শুনিয়া মিঃ ওরিলী চমকিয়া উঠিলেন।—“নাও, নাও, এ ক্ষতিতে ম’রে যাব না। ভারী ত চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স ক্ষতি হয়েছে—তার জন্তে আমি এ কাজ করতে যাব,—তা আমি পারব না।”

পরদিন মিঃ ওরিলী একটা ছড়ি লইয়া আফিস চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেটা নিতান্ত খেলো জিনিষ নহে। মিসেস ওরিলী একাকী ঘরে বসিয়া সেই ক্ষতির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সেকথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। ভোজন-টেবিলের উপর ছাতাটা রাখিয়া তিনি অস্থির চিন্তে টেবিলের চারিদিকে ঘূর্ণিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথাটা ক্রমাগতই তাঁহার মনে আসিতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট গিয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবেন তাহা আর কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। সাধারণের সম্মুখে কখনই তিনি ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না, কে-জানে-কেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন; নিজের স্বামীর কাছে ছাড়া অপরের সম্মুখে তিনি স্বভাবতঃই একটু ভীক, একটু লাজুক!

কিন্তু সে কথা ভাবিতে গেলে এদিকে চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্সের মায়া ত্যাগ করিতে হয়। তিনি আর ভাবিবেন না স্থির করিলেন, কিন্তু সেই ক্ষতির স্মৃতি ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। আচ্ছা বিপদেই পুড়া গেছে! করা যায় কি? ক্রমেই সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তিনি তখনও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে জোর করিয়া মন হইতে লজ্জা সঙ্কোচ ভয় দূর করিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন,— “আমি যাব-ই! দেখি না কি হয়!”

কিন্তু তাহা হইলে ত' ছাত্তাটা আগে ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যিক। এমনটা হওয়া চাই যাহা দেখিয়া লোকে 'ও কিছুনা' বলিয়া তুচ্ছ ভাছিল্য না করিতে পারে! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ছাত্তার একটা অংশ ভাল করিয়া পুড়াইয়া লইলেন। সে স্থানের ছিদ্রটা এতবড় হইল যে হাতের মুঠা তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অতঃপর ছাত্তাটিকে সমস্তে গুটাইয়া লইয়া সংলগ্ন ফিতার দ্বারা বাঁধিলেন। আপনার টুপী খাল লইয়া ছাত্তা হস্তে দ্রুতপদে রু-ডিরিভোলিতে ইনসিওরেন্স অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

তিনি ক্রমাগত বাটার নম্বর দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। আর আটাশখান বাড়ীর পরই অফিস। তা ভালই হইয়াছে, ততক্ষণ ভাবিবার সময় পাওয়া যাইবে। যতই অফিসের নিকট আসিতেছিলেন তাঁহার চরণের গতি ততই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ঐ যে দ্বার দেখা যাইতেছে। দ্বারের উপর উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

“লা মেটারনিলি!—

ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানী।”

এই ত আসিয়া পড়া গিয়াছে, এখন! একবার তিনি কয়েক সেকেণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া আর একটু আগে চলিয়া গেলেন, তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন, আবার গেলেন, আবার আসিলেন।

অবশেষে ভাবিলেন,—“এতটা এসেছি যখন ভেতরে একবার যাবই, তবে আর দেবী ক'রে ফল কি, যত নীগ-গির হ'য়ে যায় ততই ভাল।”

বাড়ীর দ্বারে প্রবেশ করিতেই তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। স্পন্দিত বক্ষে অগ্রসর হইয়া তিনি এক সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সে ঘরটার সম্মুখভাগ ক্রিকেট খেলিবার ব্যাটের রাশিতে পূর্ণ; তাহার পশ্চাতে কয়েকটা নরমুণ্ড দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ব্যাটের জন্ত দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাইতেছিল না।

কতক্ষণ পরে একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া একজন ভদ্রলোক বাহির হইলেন।

মিসেস ওরিলী শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাপ করবেন মশাই, ক্ষতিপূরণের দাবী দেওয়া হয় কোনখানটায় বলতে পারেন?”

ভদ্রলোকটা একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিলেন,—“উপর তলে গিয়ে বাহাতি; সেখানে “ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা” বিভাগে আপনার বক্তব্য বলবেন।”

কথাগুলি শুনিয়া মিসেস ওরিলীর মন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্ত প্রাণ ছটফট করিতেছিল, মনে হইতেছিল ইহার অপেক্ষা চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স ক্ষতি সহ করা বৃষ্টি শতগুণে ভাল ছিল। উঃ চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স! টাকাও ত বড় অল্প নহে! টাকার পরিমাণ মনে হইতেই তাঁহার হৃত সাহসের কিয়দংশ ফিরিয়া আসিল; সঙ্কে সঙ্কে তিনি উপর তলে উঠিতে লাগিলেন; লজ্জা ভয় ও শ্রমে তিনি প্রতিমুহূর্তে অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতে-ছিলেন, শ্বাসগ্রহণের জন্ত বার বার দাঁড়াইতে হইতেছিল।

উপরে উঠিয়া সম্মুখেই একটা দ্বার দেখিতে পাইলেন; দ্বারের কড়া ধরিয়া নাড়িতেই ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল,—“ভিতরে আসুন।”

ঘরটা দীর্ঘ প্রস্থে খুব বড়; এতবড় গৃহের মধ্যে মাত্র তিনটা সুবেশধারী ভদ্রলোক কথা কহিতেছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—“আপনার এখানে কোন দরকার আছে কি?”

মিসেস ওরিলী উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাইলেন

না; তিনি বলিলেন,—“আমি—আমি—আমি একটা দুর্ঘটনার কথা—একটা ক্ষতির কথা বলতে এসেছি।”

ভদ্রলোকটা অত্যন্ত নম্রতা জানাইয়া বলিলেন,—  
“অনুগ্রহ করে এই একখানা চেয়ারে বসুন, এখনি আপ-  
নার কথা শুনছি।”

তাহার পর তিনি অপর ভদ্রলোক দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“তা দেখুন মশাই, কোম্পানী এ জন্তে আপনাদের ষোল হাজার পাউণ্ডের বেশী দিতে পারেন না; এর ওপর আর চারহাজার পাউণ্ড দেওয়া যেতে পারে না। আমরা হিসেবে”—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ভদ্রলোক দুইজন বলি-  
লেন,—“আজ্ঞে, তা হলে আমরা আইনের আশ্রয় নেব;  
আচ্ছা তবে আমরা আসি।”

তাঁহারা সভ্যতা অনুমোদিত অভিবাদন করিয়া বাহির  
হইয়া গেলেন। মিসেস ওরিলীর মনে হইতেছিল এই  
সঙ্গে তিনি যাইতে পারিলে বাঁচিতেন। কিন্তু এখন আর  
তাহার উপায় নাই। এখন পলাইতে পারিলে তিনি  
চৌদ্দ শিলিংএর মমতা ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।  
এতটা অগ্রসর হইয়া তিনি এখন ফিরিবেন কোন মুখে?

ভদ্রলোকটা এইবার মিসেস ওরিলীর দিকে ফিরিয়া  
সসন্মান অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—“এইবার আপনার  
দরকারটা বর্ণুন।”

অতিকষ্টে মিসেস ওরিলী বলিলেন,—“আমি—আমি  
এসেছি—এই—এইটার জন্তে”—

ডিরেক্টার মহাশয় আকুলবিস্ময়ে মিসেস ওরিলী-  
প্রদর্শিত জিনিষটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা  
বলিতে পারিলেন না।

মিসেস ওরিলী ছাতার বাধন খুলিতে চেষ্টা করিলেন,  
দুই তিন বার ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে ছাতাটা খুলিয়া  
ফেলিলেন।

ভদ্রলোকটা সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিলেন,—“তাইত!  
ছাতাটা যে একেবারে মাটি হয়ে গেছে দেখছি।”

—“এটা কিনতে আমার ষোল শিলিং খরচ  
পড়েছে!”

ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া গেলেন! —“এ, এত  
পড়েছে?”

—“আজ্ঞে; জিনিষটাও বেশ ভাল ছিল, এই দেখুন  
না!”

—“থাক থাক, আর দেখবার দরকার নেই, জিনিষটা  
যে খেলো তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা  
নিয়ে আপনার এখানে আসবার কারণটা বুঝতে পারলুম  
না।”

মিসেস ওরিলীর মনের মধ্যে একটা কষ্টের স্মৃতি  
জাগিয়া উঠিল। তবে বুঝি কোম্পানী এমন ছোট খাট  
ক্ষতিপূরণ করেন না!

—“কারণ,—কারণ এটা পুড়ে গেছে!”

—“তা’ ত দেখছি।”

আপনাআপনি তাঁহার মুখ বুজিয়া গেল। ডিরেক্টারকে  
ইহার পর যে কি বলিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।  
হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল এখনও লোকটাকে সকল কথা  
খুলিয়া বলা হয় নাই।

—“আমার নাম হচ্ছে মিসেস ওরিলী। এই  
কোম্পানীর কাছে আমরা ফায়ার ইনসিওর করেছি;  
সেই জন্তে আজ এই ক্ষতিপূরণের দাবী করতে  
এসেছি।”—পাছে লোকটা ছাতার দাম দিতে অস্বীকৃত  
হয় এই ভাবিয়া তখনই আবার বলিলেন,—“আমি আর  
কিছু চাইনা, ছাতাটা আপনারা সারিয়ে দেবেন, তা  
হ’লেই হবে।”

ডিরেক্টার মিসেস ওরিলীর দাবী শুনিয়া হতবুদ্ধি  
হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,  
—“কিন্তু—কিন্তু আমাদের ত’ ছাতার দোকান নয়।  
এরকম সারার কাজই বা আমরা হাতে নি কি করে?”

রমণীর স্বাভাবিক কলহস্পৃহা ধীরে ধীরে ফিবিয়া  
আসিতেছিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন সহজে  
কার্যোদ্ধার না হইলে তিনি কলহ করিবেন—নিশ্চয়ই  
কলহ করিবেন! তখন তাঁহার মনের ভয় কাটিয়া  
গিয়াছিল।

—“বেশ ত’; তা এটা সারাতে যে খরচ পড়বে  
সেইটে দিয়ে দিলেই ত চুকে যায়; তা না হয় আমিই  
কষ্ট করে ছাতার দোকানে নিয়ে যাব।”

অতঃপর ডিরেক্টার কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন  
না।

—“তা,—কিন্তু—এ একটা ভারি নতুন রকমের। এ রকমের দাবী ইতিপূর্বে আমরা আর কখনও পূরণ করিনি। এই ধরুন না, রুমাল, দস্তানা, ঝাড়ন, চটি জুতো বা এই গোছের জিনিষ যা দিনের মধ্যে দশ বিশটা পুড়ে যেতে পারে সে রকমের জিনিষ পোড়ার দাবী দিতে গেলে আমরা পেরে উঠি কই?”

রমণীর ক্রোধ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

—“আপনারা কি রকম লোক মশাই, গত ডিসেম্বরে আমাদের একটা চিম্নী আঙনে পোড়ে, সে প্রায় বিশ পাউণ্ডে বা পুড়েছিল, কিন্তু মিঃ ওরিলী এমনি ভদ্র লোক যে তার জন্তে আপনাদের কাছে এক পয়সাও দাবী করলে না, আর আপনারা কিনা আজ তাঁর এই সামান্য চৌদ্দ শিলিং দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করছেন?”

ডিরেক্টার বুদ্ধিতে পারিলেন রমণী মিথ্যা কথা বলিতেছেন। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন,—“তা আপনাকে একটা কথা বলি, আচ্ছা যে লোক বিশ পাউণ্ড কঁতির এক পয়সা দাবী করলে না সেই লোক আজ চার পাঁচ শিলিং খরচের একটা ছাতা সারাবার দাবী করছে, কথাটা শুনে একটু কেমন কেমন হচ্ছে না?”

“এতে আর কেমন কেমন কি? সে ছিল মিঃ ওরিলীর নিজের জিনিষ, আর এ হচ্ছে মিসেস ওরিলীর! ছোটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক।”

ডিরেক্টার বুদ্ধিলেন রমণীর কবল হইতে তাঁহার মুক্তি লাভের আশা নাই, কেবল কথায় কথায় সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র। কাজেই তিনি তর্ক ছাড়িয়া বলিলেন,—“আচ্ছা বলুন, আপনার ছাতাটা পুড়ল কি ক’রে!”

—“এই বলি শুনুন। আমাদের হল ঘরে ছাতা লাঠি ইত্যাদি রাখবার দেয়ালের গায়ে একটা তাক আছে। কাল বেড়িয়ে এসে আমি ছাতাটা সেইখানেই রেখে ছিলাম। হ্যাঁ, সেই তাকের ঠিক ওপরেই বাতি দেশলাই রাখবার একটা কুলুঙ্গী মতন আছে। সন্ধ্যা হ’য়ে গিছল তখন, আলোটা জ্বালব বলে দেশলাই জ্বাললাম। তাই কি ছাই সব জ্বলেগা। প্রথম কাঠিটা ত ঘ’সে ঘ’সে হায়রান, কিছুতেই জ্বল না, দ্বিতীয় কাঠিটা যদিবা

জ্বলল ত’ অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল তার পরের টাও তাই। চতুর্থটা জ্বলে তবে আলো জ্বললুম।”

ডিরেক্টার বলিলেন,—“সেটা বুদ্ধি স্বদেশী দেশলাই।”

মিসেস ওরিলী ডিরেক্টারের শ্লেষ বুদ্ধিতে পারিলেন না, আপনার কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—“তা হ’বে বা। যাই হোক চতুর্থ কাঠিটা ঠিক জ্বল; আমি ত আলো জ্বলে ঘরে গিয়ে একটু শুলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে মনে হ’ল যেন কাপড় পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। চিরকালটা আমি আঙনকে বড় ভয় করি। কখনও যদি আঙন লাগে—অবশ্য ভগবান না করুন, তা যেন না হয়—সে কিন্তু আমার দোষে কখনই হবে না জানবেন। সেই যে চিম্নীতে আঙন লাগার কথা বলুম সেই থেকে বরাবর আমার প্রাণে একটা আতঙ্ক জেগে আছে। কাজেই ঐ কাপড় পোড়া গন্ধ পাবা মাত্রই আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বেরালের মত চারিদিক ভুঁকে ভুঁকে বেড়াতে লাগলাম। শেষে দেখিলাম আমার ছাতাটা পুড়েছে। বোধ হয় সেই পোড়া কাঠিই আমার এই সর্বনাশটা করেছিল। দেখুন ছাতার অবস্থাটা, আহা অমন জিনিষটা গা!

ডিরেক্টার মত স্থিত করিয়া ফেলিলেন।

—“তা আপনি এর জন্তে কত দাবী করেন?”

মিসেস ওরিলী সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে আপন সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“তা আপনার কাছেই এটা থাক না, আপনি স্মারিয়ে পাঠিয়ে দেবেন আপনার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।”

এ প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন,—“না না, তা আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি কত পড়বে বলুন।”

—“তা—দেখুন—না, আচ্ছা তার চেয়ে এক কাজ করলেই সব চুকে যায়। আমি ছাতা নিয়ে কোন দোকান থেকে মজবুত ভাল সিল্ক বসিয়ে নেব, তারপর তারা যে বিল করবে সেইটে আপনাকে এনে দেব। কেমন; তা হ’লেই বেশ হবে না?”

—“হ্যাঁ সেই বেশ হবে। তা আচ্ছা তবে ঐ কথা



রইল। এই আমি কেসিয়ারকে লিখে দিচ্ছি আপনার যা খরচ পড়বে সে দিয়ে দেবে।”

ডিরেক্টারের হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মিসেস ওরিলী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন। তখন তিনি যত শীঘ্র সম্ভব সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ বিলম্বে যদি ডিরেক্টারের মতের পরিবর্তন হয় এই ভাবিয়া তিনি কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এবার মিসেস ওরিলী বেশ ফুল্ল মনে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ভাল ছাতার দোকানের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; বেশ একটা বড় রকমের দোকানে পৌঁছিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“এই ছাতাটায় একটা ভাল সিল্কের কাপড় বসাতে হবে। তোমাদের কাছে সব চেয়ে যে সেরা কাপড় আছে বের কর। দামের জন্তে কিছু এসে যাবে না।”

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## আগুনের ফুলকি

[ পূর্বে প্রকাশিত অংশের চরিত্র—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কসিকা ঘাঁপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; আহাজে অসেঁ নামক একটি কসিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বস্তু কসিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু আহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অসেঁ তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের কলে লিডিয়ার মন ক্রমে অসেঁর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কসিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলের উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অসেঁর বনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জন্মিয়া আসিতেছে।

অসেঁ লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে জুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার ধোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার আশা সন্নততা ও করমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অস্বস্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা বড় কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্ত একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অসেঁ ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার

দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অসেঁকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় হুঃখিত হইবে। অসেঁও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বৃষ্টিতে পারিল যে অসেঁ তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অসেঁকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আশল দিতে চাহিল না।

অসেঁ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অসেঁকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে আশা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদলিন পিলেত্রী অসেঁর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অসেঁর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অসেঁর বাড়ীতে গিয়া অসেঁকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অসেঁ তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অস্বস্তি করিয়া ডাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার ষাড়াপত্র ও অন্ত সাক্ষ্যমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দোষী নয়; তখন উত্তেজিত হইয়া অসেঁ বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়াতে অলান্দিক-সিয়ো হঠাৎ ছোঁরা খুলিয়া অসেঁর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভাঁসাগুলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিমেষ মধ্যে ছোঁরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিভাডিত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অসেঁকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অসেঁ যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে।

কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা লিডিয়া অসেঁর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেছেন। অসেঁর ইচ্ছা যে এই গুণপোলের সময় তাঁহারা না আসেন; সে স্থির করিল লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু কলোঁবা বলিল অসেঁর নিজে গিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অসেঁ রাজি হইল। যে ঘোড়ায় চড়িয়া অসেঁ সকালে রওনা হইবে কলোঁবা রাজে গোপনে সেই ঘোড়ার কান কাটিয়া দিল। সকালে তাহা দেখিয়া অসেঁ মনে করিল কাপুরুষ বারিসিনিরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া ঘোড়ার উপর ঝাল ঝাড়িয়াছে। অসেঁ ক্রুদ্ধ মনে রওনা হইল। পথে বারিসিনিপুত্রের লুকাইয়া ছিল; অসেঁকে একা পাইয়া সম্মুখ ও পিছন হইতে একসঙ্গে গুলি বর্ষিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে আঘাত মারাত্মক হইল না। অসেঁর একটা হাত ভাঙিয়া গেল। তখন অসেঁ এক হাতে ছুই গুলিতে দুজনকে বধ করিতে বাধ্য হইল, এবং ব্রান্ডোর সঙ্গে পলাইয়া বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।]

( ১২ )

অসৌ রওনা হইয়া যাইবার পর কলোঁবা তাহার দূতদের মুখে শুনিল যে ঝরিসিনিরা গ্রাম হইতে বাহিরে গিয়াছে ; শুনিয়া অবধি সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল,—একবার রান্নাঘরে, একবার শোবার ঘরে, একবার ভিতরে, একবার বাহিরে সে ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, যেন অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন লইয়া সে কতই ব্যস্ত, কিন্তু সে একটুও কিছু কাজ করিতেছিল না ; ছুটাছুটির মধ্যে বার বার সে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল গায়ে কোনো নূতন সংবাদ কোনো নূতন রকম গণ্ডগোল শোনা যাইতেছে কি না। বেলা এগারটার কাছাকাছি, গ্রামে একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল—ইহারা কর্ণেল নেভিল, তাঁহার কণ্ঠা লিডিয়া এবং তাঁহাদের চাকর-বাকির লোকলস্কর। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়াই কলোঁবার মুখ হইতে প্রথম কথা বাহির হইল—“আপনাদের সঙ্গে দাদার দেখা হয়েছে ?” তার পরে সে তাঁহাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল তাহারা কোন পথে আসিয়াছে, ক’টার সময় তাহারা রওনা হইয়াছিল ; এবং সে যাহা নাও বলিতে পারিল তাহার উত্তর হইতে কলোঁবা তাহা আন্দাজ করিয়া লইতে লাগিল।

পথপ্রদর্শক লোকটি বলিল—হয়ত আপনার দাদা ওপর পথে গেছেন ; আমরা নাবাল পথ দিয়ে এসেছি।

কিন্তু কলোঁবা সন্দ্বিগ্নভাবে মাথা নাড়িয়া পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক দৃঢ়তা এবং অপরিচিত অতিথিদের কাছে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রকাশের লজ্জা সত্ত্বেও নিজের উদ্বেগ ও ব্যস্ততা চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; এবং শীঘ্রই তাহার উদ্বেগ-চঞ্চলতা কর্ণেল নেভিল এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার কণ্ঠা লিডিয়ার মনেও সংক্রমিত হইল। লিডিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিল যে চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিয়া সন্ধান করা যাক ; এবং তাহার পিতা স্বয়ং বোড়ায় চড়িয়া পথপ্রদর্শক লোকটিকে সঙ্গে লইয়া

অসৌকে খুঁজিতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। অতিথিদের ভয় ও ভাবনা দেখিয়া কলোঁবার মনে গৃহকর্তার কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া নির্ভাবনার হাসি হাসিতে চেষ্টা করিয়া কর্ণেলকে খাইতে বসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল এবং বিশ রকম সম্ভব অসম্ভব কারণ দেখাইয়া ভ্রাতার বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে নিজের উদ্বেগে একটা কারণ দেখাইয়া পরক্ষণেই আবার তাহার উল্টা রকম কথা বলিয়া কেলিতেছিল।

স্রীলোকদিগকে আশস্ত করা পুরুষের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া কর্ণেল একটা কৈফিয়ৎ দিবার জন্য বলিলেন—নিশ্চয় রেবিয়া পথে শিকার দেখেছে ; আর যাবে কোথায়, সে সব ভুলে গিয়ে সেই শিকারের পেছনেই ছুটোছুটি করছে ; দেখে নিয়ো সে বোলা-বোঝাই শিকার নিয়ে এসে হাজির হ’ল বলে’। আমরা পথে আসতে আসতে চারবার বন্দুকের আওয়াজ শুনে পেয়েছি ; আগের দুটো আওয়াজের চেয়ে শেষের দুটো খুব চড়া ; তাই না শুনে আমি লিডিয়াকে বললাম—নিশ্চয় এ রেবিয়া শিকার করছে, আমার বন্দুক ছাড়া এমন জবর শব্দ আর কোন্ বন্দুকের হ’তে পারে ?

কলোঁবা পাণ্ডাশ হইয়া উঠিল, এবং লিডিয়া তাহা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিল যে তাহার পিতার আন্দাজ হইতে কলোঁবার মনে কিসের সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া ভাবিয়া কলোঁবা বিশেষ আগ্রহাঘ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—যে বড় আওয়াজ দুটো ছোট আওয়াজ দুটোর আগে না পরে হইয়াছিল। কিন্তু না কর্ণেল, না লিডিয়া, না তাঁহাদের লোকলস্করেরা ইহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল।

একঘণ্টার মধ্যেও কলোঁবার প্রেরিত চরেরা যখন শুভ অশুভ কোনো খবরই লইয়া ফিরিল না, তখন সে সাহসে বুক বাধিয়া অতিথিদিগকে পীড়াপীড়ি করিয়া খাইতে বসাইল। কিন্তু এক কর্ণেল ছাড়া আর কাহারো মুখে খাবার রুচিল না। একটু সামান্য শব্দ শুনিতেই কলোঁবা ছুটিয়া জানালায় গিয়া খুঁকিয়া পড়িতেছিল

এবং কিছু নয় দেখিয়া আরো বিমর্ষ হইয়া স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিতোছিল; তাহার কষ্ট কঠিনতর বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, তাহাকে এইরূপ মনের অবস্থা লইয়াও হাসিখুসি প্রফুল্ল মুখে তুচ্ছ যা-তা বিষয় লইয়া অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিতে হইতেছিল; কিন্তু অতিথিদের কেহই তাহার কথা মন দিয়া শুনিতোছিল না, এবং অনেককণ চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেহ এক আধটা কথা বলিতেছিল মাত্র।

হঠাৎ একটা ঘোড়া ছুটিয়া আসার শব্দ শোনা গেল। কলোঁবা লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—ঐ আমার দাদা আসছে।

কিন্তু অর্সোর ঘোড়ার উপর হৃদিকে পা দিয়া শিলিনাকে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া কলোঁবা বুকফাটা হৃৎখের স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, আমার দাদা আর নেই গো!

কর্ণেলের হাত হইতে গেলান বনবন করিয়া পড়িয়া গেল, লিডিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর সকলে সদর দরজার দিকে ছুটিয়া গেল।

শিলিনা ঘোড়া ধামাইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িবার পূর্বেই কলোঁবা তাহাকে এক টুকরা সোলার মতো আল্টপ্কা তুলিয়া লইয়া এমক জোরে এক ঝাঁকানি দিল যে বেচারার নিশ্বাস আটকাইয়া যাইবার উপক্রম। কলোঁবার ক্ষিপ্ত মুক্তি দেখিয়া বালিকা তাহার মনের ভাব আঁচিয়া লইয়া বলিল—দাদাবাবু বেঁচে আছেন!

কলোঁবা তাহাকে ছাড়িয়া দিল, এবং ছোট বিড়াল-ছানার মতো শিলিনা মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। কলোঁবা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আর ওরা?

শিলিনা নীরবে একবার বুকের উপর হাত দুটিকে আড় করিয়া রাখিল। অমনি কলোঁবার পাগাশ মুখে রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল; সে তীব্র দৃষ্টিতে একবার বাঁরিসিনিদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া লইয়া হাসিমুখে তাহার অতিথিদিগকে বলিল—চলুন, চা-টুকু জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নেবেন।

কোরারীদের পরীটির সমস্ত ঘটনাটা বলিয়া শুনাইতে

অনেককণ লাগিল। তাহার গৈয়ো ভাষা কলোঁবা জো-সো করিয়া ইটালিয়ানে তর্জমা করিয়া লিডিয়াকে, এবং লিডিয়া আবার ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া নির্জের পিতাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া কর্ণেল বিশ্বয় প্রকাশ করিতেছিলেন, লিডিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল, কিন্তু কলোঁবা প্রশান্ত স্বর, কেবল সে অন্যমনস্ক হইয়া তাহার সৌখীন চা-সেটটিকে মাড়াইয়া ঝুঁড়া করিয়া ফেলিল। কলোঁবা বালিকাকে দিয়া পাঁচ ছয় বার বলাইয়া শুনিল যে ব্রান্দো বলিয়াছে অর্সোর জখম মারাত্মক বা সাংঘাতিক হয় নাই, এবং ওর চেয়েও সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও মানুষকে বাঁচিতে সে দেখিয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া শিলিনা বলিল—দাদাঠাকুর চিঠি লিখবার জন্যে খানিকটা কাগজ নিয়ে যেতে বিশেষ করে' বলে' দিয়েছেন; আরো বলেছেন যে, তোর দিদি-ঠাকুরকে বলিস, আজ আমাদের বাড়ীতে খে' মেয়েটি আসবেন, হয়ত এতকণ এসেছেন, তাঁকে যেন দিদি-ঠাকুর দাদাঠাকুরের হ'য়ে মিনতি করে' বলেন যে তাঁর চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন এই বাড়ীতে অনুগ্রহ করে' থাকেন। তাঁর বন্ধুকের গুলির ধায়ের চেয়ে এই মেয়েটির জন্যেই তিনি বেশী কাতর হয়েছেন দেখছি; আমি রাস্তায় রওনা হয়ে আসছি, আর আমায় ডেকে ডেকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিন তিন বার শুধু এই কথাই বলে দিলেন।

দাদার এই কথা শুনিয়া কলোঁবা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া লিডিয়ার হাত ধরিয়া খুব জোরে ঝাঁকড়াইয়া দিল; লিডিয়া কলোঁবার কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এবং শিলিনার কথার এই অংশটা সে তাহার পিতাকে তর্জমা করিয়া শুনাইতে পারিল না।

কলোঁবা লিডিয়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হাঁ, তোমাকে ত আমার কাছে থাকতেই হবে, তুমি আমাদের এই বিপদে সাহায্য করবে।

তার পর কলোঁবা একটা আলমারি খুলিয়া কতকগুলো পুরাণো কাপড় বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ব্যাণ্ডেজ তৈরীর জন্যে কালি করিতে লাগিল। তাহার

উজ্জ্বল চক্ৰ, দীপ্ত যুধী ও প্রশান্ত স্থিরতা। দেখিয়া ঠাহর করা ছুঁকর হইতেছিল যে সে তাহার ভাইয়ের আঘাতের জন্য বেশী দুঃখিত হইয়াছে; না শক্রনিপাতের জন্য বেশী আনন্দিত হইয়াছে। তারপর এই সে কাফি তৈরী করিয়া কর্ণেলকে ঢালিয়া দিতে দিতে তাঁহাকে বেশ একটু গৰ্ব করিয়া শুনাইয়া দিল যে সে খুব ভালো কাফি তৈরী করিতে পারে; পরক্ষণেই ঝাকড়ার ফালিগুলি লিডিয়া ও শিলিনার কাছে দিয়া লম্বা করিয়া সেলাই করিতে ও পাকাইয়া গুটাইতে পরামর্শ দিল; তার পরেই আবার শিলিনাকে বিশ দফা জিজ্ঞাসা করিল যে তাহার দাদা আঘাতে কি খুব বেশী কষ্ট পাইতেছে? এবং এইরূপ বিবিধ কাজের ব্যস্ততার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া সে কর্ণেলকে বলিতেছিল—হু-হুজন অমন হুঁদে লোক! অমন জোয়ান মজবুত!...আর সে একা, জখম, মোটে এক হাত...তবু সে একাই হুজনকে মেরেছে! কর্ণেল সাহেব, একি কম সাহস! একি কম বীরত্ব! হায় মিস নেভিল, আপনাদের মতন শাস্ত্রিক রাজ্যে যারা বাস করে তারা কত সুখী!...আমি জানি, আপনি আমার দাদাকে এখনো ভালো রকম চিন্তে পারেন নি!...আমি ত বলেইছিলাম যে বাজপাখী একদিন না একদিন তার পাখা মেলবে! ...তার অমন ঠাণ্ডা মূর্তি দেখে আপনাদের ভুল ত হতেই পারে। ..কিন্তু বাস্তবিক যা, তা ত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, মিস নেভিল!...আহা আজ দাদা যদি স্বচক্ষে দেখত যে আপনি তার জন্তে কাজ করছেন!...আহা বেচারা!

লিডিয়া না একটি কথা বলিতে পারিতেছিল, না কাজই করিতে পারিতেছিল। তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে একজন কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া কেন নাশিশ রুজু করিতেছে না। তিনি করোনারের তদারক ও এমনি আরো সব কর্তৃকদের একেবারে অজানা উদ্ভট রকম বিষয় প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। এবং অবশেষে জানিতে চাহিলেন, ব্রান্দো নামে যে ভদ্রলোক তাহার বাড়ীতে আহত অর্সোকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহার সেই বাসগ্রাম কি পিয়েজানরা হইতে

অনেক দূরে? সেখানে তিনি, তাহার বন্ধুকে কি দেখিতে যাইতে পারেন না?

কলোঁবা তাহার অভ্যন্ত শান্ত ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে অর্সো এখন বনবাসী এবং ফেরারী আসামী, তাহার গুণ্ধাকারী; ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের মনের ভাব জানার আগে সে লোকালয়ে দেখা দিলে তাহার বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে; যাহাই হোক কলোঁবা গোপনে একজন দক্ষ ডাক্তারকে সেখানে পাঠাইয়া দিবে ঠিক করিয়াছে

অবশেষে কলোঁবা বলিল—দেখুন কর্ণেল সাহেব, এটা আপনি বেশ করে' মনে করে' রাখবেন যে আপনি চারবার বন্দুক আওয়াজ শুনেছেন, আর আপনি আমাকে বলেছেন যে হু আওয়াজের পরের হু আওয়াজ অর্সো করেছে।

কর্ণেল এ কথার কোনই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার কণ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার চোখ মুছিল।

যখন বেলা অনেকখানি চড়িয়াছে, তখন একটা হৃদয়-বিদারক দৃশ্য গ্রামে দেখা গেল। ক্ষেতের চাষারা দলবদ্ধ হইয়া বারিসিনি-পুত্রদের দুটি লাস দুটি ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্য দিয়া বুড়া দারোগা বারিসিনির নিকট লইয়া যাইতেছিল। বুড়ার মকেল, আত্মীয়, ও অন্যান্য অনেক নিরক্ষর লোক সেই দলের পিছু লইয়া একটি বেশ ভারী রকম সমারোহ-যাত্রা গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মহুর-গামী দলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও ছিল, যদিও দস্তুর মার্কিক তাহারা সকলের পরে বিলম্ব করিয়াই আসিয়া দলে যোগ দিয়াছিল। পুলিশের জমাদার থাকিয়া থাকিয়া উর্কে হাত তুলিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতেছিল—“হায় হায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি বলবে!” কতকগুলি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অলান্দিকসিয়োর হুধমা কাঁদিয়া আপসাইয়া আসিয়া পড়িল এবং ঘোড়া থামাইয়া মাথাকপাল চাপড়াইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এই সব বিলাপ আর এক জনের নীরব শোকের কাছে একেবারে ম্লান ও ভুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে এই মৃত পুত্রদের

শোকাক্ত পিতা—সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুত্রদের কাদামাথা লুপ্ত মাথা দুটি একে একে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের নীল মুখে ওষ্ঠে অধরে চুষন করিল; পথ চলিবার সময় তাহাদের আড়ষ্ট হাত-পা নড় নড় করিয়া ঝুলিতেছিল, তাহা সে তুলিয়া তুলিয়া ধরিতে লাগিল। তারপর সকলে দেখিল সে মুখ খুলিল যেন কিছু বলিবে, কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে বিলাপ বা কথা কিছুই বাহির হইল না। সে তাহার দৃষ্টি পুত্রদের মৃতদেহের উপরই স্থির নিবদ্ধ করিয়া পথ হাঁটিতেছিল, পথের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, সে একবার পাথরে হৌচট খাইয়া পড়িতেছিল, একবার গাছের গায়ে গিয়া ধাক্কা খাইতেছিল, একবার বা বেড়ার উপর গিয়া

যখন দূর হইতে অর্সোর বাড়ী নজরে পড়িল, তখন স্ত্রীলোকদের বিলাপ ও সমবেত জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার উপর যখন রেবিয়ার দলের কতকগুলি লোক নিজেদের জয়ে উল্লাসের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল তখন বিপক্ষ দলের আক্রোশ অদম্য হইয়া উঠিল। কতকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—“এর শোধ তুলতে হবে! প্রতিহিংসা নিতে হবে!” ক্রুদ্ধ জনতা হইতে ইট পাটকেল ছুটিতে লাগিল, এবং জানালার ভিতর দিয়া কলোঁবা ও তাহার অতিথিদের দেখিতে পাইয়া দুইটা বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিয়া জানলার শাশী ফুঁড়িয়া যে টেবিলের পাশে কলোঁবা ও লিডিয়া বসিয়া ছিল সেই টেবিলের চটা উঠাইয়া চলিয়া গেল। লিডিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, কর্ণেল একটা বন্দুক তুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাধা দিয়া নিবারণ করিবার পূর্বেই কলোঁবা একেবারে ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গিয়া জোরে দরজা খুলিয়া ফেলিল। দরজার চৌকাঠের উপর সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া শত্রুদের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া সে চীৎকার করিয়া ঝুলিল—কাপুরুষ কোথাকার! মেয়েমানুষদের দিকে, বিদেশী অতিথির দিকে, গুলি ছুড়তে লজ্জা করে না! তোরা কি কর্ণিক? তোরা কি পুরুষ মানুষ? হতভাগা সব, তোরা শুধু জানিস পেছন থেকে গুলী মারতে!

আয় দেখি ঐকবার এগিয়ে, আমি তোদের ডাকছি আয়, আমার সঙ্গে লড়ে যা! আমি মেয়েমানুষ, আমি একলা, আমার দাদা এখানে নেই, আয়, দেখি তোদের মুরোদখানা আর মর্দানী! আয় মেরে যা আমাকে, মেরে যা নির্দোষী বিদেশী অতিথিদের; আয়! এতে তোদের খুব পুরুষ হবে, গৌরব হবে! ..নড়ছিস না যে বড়, ওরে কাপুরুষ ভীকু কোথাকার! মনে জানছিস কিনা যে আমরা শুধু মরি না, মরার শোধও নিতে পারি! ‘যা যা, মেয়ে-মানুষের মতো কাঁদগে যা, আর আমাদের ধন্যবাদ দিগে যা, যে, আমরা আরো বেশী রক্তপাত না করে’ এত অল্পে অল্পে তোদের ছেড়ে দিয়েছি!

কলোঁবার শাব ভক্তি চেহারায় এমন একটা মহিমা-বিত ভয়ঙ্কর ভীষণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাহার সম্মুখে সমস্ত জনতা ষেন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল,—যেন কর্ণিকার শীতের সন্ধ্যায় আবিভূত যে-সব ভূতপ্রেতের ভয়ঙ্কর গল্প শোনা যায় তাহাদেরই একটা কাহারও সম্মুখে তাহারা পড়িয়া গিয়াছে। এই ভয়ের সুযোগে পুলিশের জমাদার, কয়েকজন কনেষ্টবল, ও কতকগুলি স্ত্রীলোক উভয় বিপক্ষদলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কারণ রেবিয়ার দলের পাইক বরকন্দাজেরা তাহাদের ঢাল শড়কী লাঠি সোঁটা বাগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং একটা রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার এক মুহূর্তের মাত্র বিলম্ব ছিল। কিন্তু উভয় দলেরই আজ সর্দারের অভাব। কর্ণিকেরা তাহাদের ক্রোধের দ্বারা চালিত হইলেও তাহাদের ঘরোয়া বিবাদে একজন নেতান্না থাকিলে তাহাদের চলে না। অধিকন্তু স্ত্রী সফলতার দ্বারা সাবধান হইয়া কলোঁবা তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে নিবারণ করিয়া বলিল—ছেড়ে দে, বেচারাদের কাঁদতে যেতে দে, বুড়োটাকে গায়ের চামড়া নিয়ে যেতে দে। ঐ বুড়ো শেয়ালটাকে ছেড়ে দে, ওর বিষদাঁত ভাঙা হয়ে গেছে, আর ও কামড়াতে পারবে না। বারিসিনি সাহেব! সেই ২রা আগষ্টের কথা মনে কর। মনে কর সেই রক্তমাথা খাতাখানির কথা যার পাতায় তুমি নিজের হাতে খুনীর নাম জাল করেছিলে। আমার বাবা সেই খাতার পাতায় তোমার ঋণের অঙ্ক নিজের রক্ত দিয়ে ঐকে রেখে গিয়েছিলেন;

তোমার ছেলেরা সেই ঋণ শোধ দিলেণ বৃড়ো মানুষ  
তুমি, তোমার আমি মাপ করলাম, রেহাই দিলাম !

কলোঁবা বৃকের উপর হাত জড়াইয়া দাঁড়া-  
ইয়া, মুখের উপর ক্রুর হাসি খেলাইয়া দেখিতে লাগিল  
যে তহহার শক্রের বাড়ীতে মৃত দেহ দুটি সকলে ধরা-  
ধরি করিয়া ধীরে ধীরে বহন করিয়া লইয়া গেল, এবং  
জনতা আস্তে আস্তে বিদায় হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।  
তখন সে দরজা বন্ধ করিয়া খাবার-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া  
কর্ণেলকে বলিল—আমি আমার পড়শীদের ব্যবহারের  
জন্তে আপনায় কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, মাপ করবেন মশায়।  
আমি কখনো ভাবি নি যে যে-বাড়ীতে বিদেশী অতিথি  
আছে সে-বাড়ীতে কোনো কসিক গুলি চালাতে পারে।  
আমি আমার স্বদেশের ব্যবহারে লজ্জিত হয়েছি।

সন্ধ্যাকালে লিডিয়া তাহার জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে শুইতে  
গেলে তাহার পিছনে পিছনে কর্ণেলও সেই ঘরে গিয়া  
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে গ্রামে প্রতি মুহূর্তে  
মাথার মধ্য দিয়া বন্দুকের গুলি ফুঁড়িয়া যাইবার  
আশঙ্কা আছে এবং যেখানে খুনজখম ছাড়া আর কিছু  
দেখিতে পাওয়া হুকর, সেই গ্রাম ছাড়িয়া কাল সকালেই  
প্রস্থান করা উচিত কি না।

লিডিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল ;  
তাহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে তাহার  
পিতার প্রস্তাব তাহাকে সামান্য বিপদে ফেলে নাই।  
অবশেষে সে বলিল—এই বিপদের সময় যখন সান্ত্বনা ও  
সাহায্যের দরকার তখন এই মেয়েটিকে একলা ফেলে  
চলে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? বাবা, আমাদের  
এ রকম ব্যবহারটা কি নিষ্ঠুরতা করা হবে না?

কর্ণেল বলিলেন—তোমার জন্তেই আমি বলছি, মা।  
যদি আমি জানতাম যে তুমি আজাকুসিয়োর হোটেলে  
নিরাপদে আছ, তা হলে তুমি নিশ্চয় জেনো সেই বীর-  
পুরুষ দেলা রেবিয়াকে আলিঙ্গন না করে এই ঘাঁপ ছেড়ে  
যেতে আমার ভারি দুঃখ হ'ত।

—বেশ বাবা, তা হলে আমরা একটু অপেক্ষাই করি,  
বাবার আগে জানা যাক আমরা এদের কোনো উপকার  
যদি করতে পারি।

কর্ণেল কন্ঠার ললাট চূষন করিয়া বলিলেন—বেশ মা  
বেশ! পরের দুঃখ লাঘব করবার জন্তে তোমার নিজের  
এমন স্বার্থত্যাগ আমার বড় ভালো লাগছে। এখন ঘুমাও।  
ভালো কাজ করে কাউকে কখনো পস্তাতে হয়নি।

লিডিয়ার কিছুতেই আর ঘুম আসে না, সে বিছানায়  
পড়িয়া এপাশ ওপাশ ছটফট করিতে লাগিল। কোথাও  
একটু খুট করিয়া শব্দ হইলে মনে হয় বুঝি শক্ররা বাড়ী  
চড়াও হইয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে; পরমুহূর্তে  
যেই নিজের বিপদের ভয় অমূলক প্রতিপন্ন হইতেছে,  
অমনি তাহার মনে পড়িতেছে সেই আহত লোকটির  
কথা—হয়ত সে এই দারুণ শীতে ঠাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া  
আছে, ফেরারীদের দয়া ছাড়া সেখানে তাহার অস্ত  
আশ্রয় অস্ত সাহায্য হয়ত আর কিছু নাই। লিডিয়ার  
মনে পড়িল সেই লোকটির এখনকার ছবি—রক্তে মাথা-  
মাখি হইয়া দারুণ বেদনায় সে যেন লুপ্ত হইতেছে।  
কিন্তু যতবারই তাহার ছবি মনে আসে ততবারই সেই  
মূর্ত্তি মনে হয় যে চেহারা সে শেষ বিদায়ের দিন দেখিয়া-  
ছিল—সে যেন লিডিয়ার-দেওয়া কবচটিকে সেইদিনকারই  
মতন নত হইয়া চূষন করিতেছে। .....তারপর মনে  
পড়িতে লাগিল তাহার বীরত্বের কথা। যে ভয়ানক  
বিপদের কবল হইতে সে প্রাণে প্রাণে কোনো রকমে  
বাঁচিয়া গিয়াছে তাহার সে বিপদ ত লিডিয়ারই জন্ত !—  
তাহাকে কয়েক ঘণ্টা আগে দেখিতে পাইবার লোভে সে  
নিজের প্রাণ মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া  
ছিল! এমন কি লিডিয়া মনে মনে স্থির বিশ্বাস করিয়া  
তুলিল যে তাহাকেই বাঁচাইবার জন্ত অর্সো নিজের গা  
পাতিয়া গুলি খাইয়াছে। লিডিয়া অর্সোর আঘাতের  
জন্ত নিজেকে নিপীড়িত লালিত করিতে লাগিল, অর্সো  
আহত হইয়াছে বলিয়া উহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া  
গেল; এবং যদিও অর্সোর ডবল গুলির বাহাহুরি ও  
মাহাত্ম্য কলোঁবা ও ব্রান্দোর চোখে যেমন উজ্জ্বল হইয়া  
দেখা দিয়াছিল, তাহার চোখে তেমন ভাবে লাগে নাই,  
তথাপি সে ভাবিতেছিল যে এমন বিষম বিপদের মধ্যে  
এমন ঠাণ্ডা মেজাজ ও এমন ধীরতা উপস্থানের খুব অল্প  
নাযুকই এ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছে।

যে ঘরে লিডিয়া শুইয়াছিল তাহা কলোঁবার ঘর। একখানি ওক কাঠের উপাসনা-চৌকীর মাথাব উপর একটা প্রসাদী তালপত্রের নির্মাল্যের পাশে অর্সোর একখানি ছোট ছবি দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছিল। লিডিয়া সেই ছবিখানি পাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিল, তারপর সেখানিকে স্বস্থানে টাঙাইয়া না দিয়া আপনার শয্যার শিয়রে রাখিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া সূর্য্য প্রায় মাথার কাছে উঠিয়াছে।

কলোঁবা আসিয়া তাহাকে বলিল—আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে তোমার বোধহয় খুব কষ্ট হয়েছে? আমার ভয় হচ্ছে তুমি বোধ হয় ভালো করে ঘুমুতে পার নি।

লিডিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভাই, তাঁর কোনো খবর পেয়েছ?

বলিতে বলিতে তাহার নজর অর্সোর ছবিখানার উপর পড়াতে লিডিয়া তাড়াতাড়ি একখানা রুমাল লইয়া ছবিখানি ঢাকিতে গেল।

কলোঁবা হাসিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। এই ছবিখানি ঠিক কি ছবছ দাদার মতন? দাদা এর চেয়েও সুন্দর!

লিডিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—তোমার দিব্যি ভাই.....আমি.....এই.....অনুমনস্ক হয়ে.....নামিয়ে নিয়েছিলাম...ঐ...ঐ ছবিখানা।...আমি তোমার সব 'জিনিস-পত্র' হাঁটকেছি, কিন্তু আবার ঠিক করে রাখিনি... আমার ভারী অশ্রয় হয়েছে।... তোমার দাদা কেমন আছেন?

—ভালো আছেন। গিয়োকাস্তো রাত চারটার সময় এখানে এসেছিল; দাদার একখানা চিঠি এনেছিল—তোমার নামে। দাদা আমাকে এক ছত্রও কিছু লেখে নি। শিরোনামায় অবশ্য বড় বড় করে লেখা ছিল—শ্রীমতী কলোঁবা, কিন্তু তার নীচেই ছোট ছোট অক্ষরে লেখা ছিল—শ্রীমতী ন-কে দিয়ে।...ভাগ্যিস বোনেরা হিংস্রটে হয় না। গিয়োকাস্তো বললে যে লিখতে দাদার ভারি কষ্ট হয়েছিল। গিয়োকাস্তো খুব ধোসখৎ লিখিয়ে, সে বললে যে তুমি বলে যাও আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি; কিন্তু দাদা

কিছুতেই রাজি হ'ল না। দাদা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে, ব্রান্দো কাগজ ধরে' ছিল। এক এঁকটা কথা লেখে আর উঠে বসতে চেষ্টা করে, আর অল্প নড়াচড়াতেই হাতে ভয়ানক ব্যাথা লাগে। গিয়োকাস্তো বলছিল যে, সে অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, বুক ফেটে যায়। এই সেই চিঠি।

লিডিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি ইংরেজিতেই লেখা; বোধ হয় চিঠির কথা গোপন রাখিবার জন্য সাবধানতা। চিঠিতে লেখা ছিল—

আমার দুর্দৃষ্ট আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আমার শক্ররা কি বলছে বা কি নিন্দা করছে তা আমি গ্রাহ করি না, তাদের কথায় কিছু এসে যায় না, যদি আপনি তাদের কথা বিশ্বাস না করেন। যবে আপনায় আমার শেষ দেখা, সেই দিন থেকে আমি পাগলামির খেয়ালে দোল খেয়েছি। এই যে দুর্দৈব, এ শুধু আপনাকে আমার নিবুদ্ধিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে এসেছে; এখন আমার হুঁস হয়েছে। আমি এখন জানি আমার অদৃষ্টলিপি কি, এবং তার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। সেই যে আংটিটি আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, সেটিকে রক্ষাকবচ মনে করে ধারণ করেছিলাম, এখন সেটি ধারণ করার যোগ্যতা আমি খুইয়েছি। আমার মনে হচ্ছে যে আপনার দান এমন অপাত্রে গুলু করার জন্যে এখন আপনার আপশোষ হচ্ছে; অধিকন্তু সেই আংটি আমাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে যে আমি কি রকম পাগল হয়েছিলাম। কলোঁবা সেটি আপনাকে ফিরিয়ে দেবে।...ভাবে বিদায়, ওগো জন্মের মতো বিদায়। আপনি কসিকা থেকে চলে যাবেন, আমি আপনাকে একবার দেখতেও পাব না; কিন্তু আমার বোনকে অনুগ্রহ করে বলে যাবেন যে আপনি এখনো আমাকে শ্রদ্ধা করেন,—আমি জোর করে' বলতে পারি আমি চিরকাল তার যোগ্য থাকব।

অ-দে-রে।”

লিডিয়া এই চিঠি পড়িবার জন্য পিছন কিরিয়া বসিয়াছিল। কলোঁবা তবু মনোযোগ দিয়া তাহাকে দেখিতেছিল; চিঠি পড়া শেষ হইয়াছে বুঝিয়াই সে সেই মিশরী

আংটিটি লিডিয়ার হাতে দিল এবং দৃষ্টির তিতর দিয়াই চোখের ইন্ধিতে জিজ্ঞাসা করিল—এর মানে কি ? কিন্তু লিডিয়া মাথা না তুলিয়া বিবর্ষ দৃষ্টিতে সেই আংটিটি দেখিতে দেখিতে একবার আঙুলে পরিতোছিল এবং একবার ঝুলিতেছিল।

কলোঁবা বলিল—লিডিয়া, আমার দাদা তোমাকে কি লিখেছেন তা কি আমি জানতে পারি না ? কেমন আছেন কিছু লিখেছেন ?

লিডিয়া লাল হইয়া উঠিয়া বলিল—কৈ...কিছু ত লেখেন নি।...চিঠিখানা ইংরেজিতে লেখা।...বাবাকে বলতে বলেছেন।...ওঁর আশা হচ্ছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়ত একটা মীমাংসা করে দিতে পারবেন...

কলোঁবা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বিছানার উপর বসিল এবং দুই হাতে লিডিয়ার দুখানি হাত ধরিয়া তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল—আমার একটা উপকার করবে তাই ? তুমি দাদার চিঠির জবাব দেবে না ? তোমার জবাব পেলে দাদা বর্তে যাবে, বেঁচে যাবে ! যেই দাদার চিঠি এল তখনি তোমায় জাগাবার জন্তে একবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু শেষে ভেবে চিন্তে জাগলাম না।

লিডিয়া বলিল—তুমি ভারী অন্ডায় করেছ। যদি আমার একটা কথা তাঁর...

—কিন্তু আমি ত তাঁকে চিঠি পাঠাতে পারব না। ম্যাজিষ্ট্রেট এসে পৌঁছেছেন, গাঁ-ময় তাঁর চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরং আমরা নিজেরাই যাই চল। তাই লিডিয়া, তুমি যদি আমার দাদাকে চিনতে তা হলে তুমিও তাকে আমারই মতন ভালো বাসতে !...আহা, সে যেমন সৎ, তেমনি সাহসী ! ভেবে দেখ একবার সে কি করেছে ! একা, জখম হয়েও, দু-দুজনকে ষাল করেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুলিশের জমাদারের রিপোর্ট পাওয়া মাত্র কনেষ্টবল চৌকীদার, পুলিশ কমিশনার, জজ, সেরেস্তাদার, নাজির, পেশকার প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত সকলকেই সঙ্গে লইয়া এই নূতনতর ভয়ঙ্কর ও অটল বিবাদের শেষ মীমাংসা করিবার জন্ত

তিনি ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। আসিয়াই তিনি কর্নেল নেভিল ও তাঁহার কন্ডার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং ব্যাপার যে খুব ধারাপ ও ঝাঁক হইয়া উঠিয়াছে তাহাও তিনি তাঁহাদের নিকট গোপন করেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আপনি ত বুঝতেই পারছেন যে অকুস্থলে কোন সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত ছিল না। অধিকন্তু সেই হতভাগ্য যুবক দুটির সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি এমন প্রসিদ্ধ, যে, কেউ বিশ্বাসই করছে না যে দেলা রেবিয়া ফেরারীদের সাহায্য বিনা একাই তাদের মারতে পেরেছে—শুনছিও ত যে উনি ফেরারীদের আশ্রয়েই এখন আছেন।

কর্ণেল বলিয়া উঠিলেন—এ একেবারে অসম্ভব, আমি জানি অর্সো দেলা রেবিয়া যতদূর সঁচা খাঁটি ছেলে হতে হয়। আমি তার সততার জামিন হচ্ছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আমিও ত তাঁকে জানি, কিন্তু পুলিশ কমিশনার সাহেব, যাদের সন্দেহ করাই স্বভাব, আমার মনে হচ্ছে, তত অনুকূল নন। তাঁর হাতে আপনার বন্ধুর দুঃখভোগের অস্ত্রও একটু গিয়ে জুটেছে। সে একখানা চিঠি—তিনি অলান্দিকসিয়াকে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করে লিখেছিলেন।...এই যুদ্ধে আহ্বান, পুলিশ সাহেব মনে করেন, গুপ্ত গুপ্তা দিয়ে আক্রমণের সুযোগ করে' নেওয়া।

কর্ণেল বলিলেন—সে ত অলান্দিকসিয়োই, যে পুরুষের মতে সম্মুখ যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিল।

—সম্মুখযুদ্ধ করা ত এখানকার রেওয়াজ নয়। এরা লুকিয়ে থাকে, পেছন থেকে আক্রমণ করে, এই এদের দেশের ধারা। একটা সাক্ষী কেবল সুবিধে মনে হচ্ছে ; সে একটি ছোট মেয়ে ; সে বলছে যে সে চারবার বন্দুক আওয়াজ শুনেছিল, আগের দুটো আশ্বে, পরের দুটো জোরে—দেলা রেবিয়ার বন্দুকের মতো বড় বন্দুকের আওয়াজেরই মতন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটি, ফেরারীদের এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকার সন্দেহ হচ্ছে তাদেরই একজনের ভাইঝি। হয়ত তারা মেয়েটিকে শিথিয়ে পড়িয়ে তালিম করে রেখেছে।



লিডিয়া লজ্জায় লাল হইয়া কথার মাঝখানে কথা পাড়িয়া বলিল—মশায়, আমরা তখন পথে আসছিলাম, আমরাও বন্দুকের আওয়াজ ঐ রকমই শুনেছিলাম।—লিডিয়ার চোখের শাদা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

—সত্যি? আপনার এই সাক্ষী খুব কাজে লাগবে। আচ্ছা কর্ণেল, আপনিও নিশ্চয় তা হলে শুনেছিলেন?

লিডিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, শুনেছিলেন বৈ কি। আমার বাবার বন্দুক ছোড়া ত নেশা; যেমন বন্দুকের আওয়াজ শুনলেন আর বললেন—ঐ দেলা রেবিয়া আমার বন্দুক ছুঁড়েছে।

—আচ্ছা, যে আওয়াজ আপনারা দেলা রেবিয়ার বন্দুকের বলে চিনেছিলেন, সে আওয়াজ কি পরে হয়েছিল?

—পরেরই দুটো, নয় বাবা?

কর্ণেলের স্বরণশক্তি তত প্রখর ছিল না; এবং তাঁহার কল্পার কথা প্রতিবাদ করিতেও তিনি জানিতেন না।

—কর্ণেল, তা হলে পুলিশ সাহেবকে শিগ্গীর এ কথা বলা দরকার। তারপর আজ সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার দিয়ে লাস পরীক্ষা করা হবে, যে, যে বন্দুকের কথা হচ্ছে বাস্তবিক সেই বন্দুকের গুলিতেই খুন হয়েছে কি না; তখন আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে।

কর্ণেল বলিলেন—ও বন্দুকটা আমিই অসৌক্যে দিয়েছিলাম, সমুদ্রের ওপার থেকে দেখলেও আমি সেটাকে চিনতে পারি?—আমার বন্দুকে না হলে কি অমন আওয়াজ হয়?

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## কষ্টিপাথর

ভারতী (পৌষ)।

শিবাজীর রাজ্যশাসনপ্রণালী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুর—

শিবাজী রাজ্যের অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের আয়তন সামান্ত ছিল, অল্পকালের মধ্যে সেই রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। শিবাজীর শেখাবস্থার দক্ষিণাভ্যে তাঁহার প্রতাপ

অভুলন, তাপ্তীনদী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজ্যের রাজেশ্বররূপে তিনি একবারে গৃহীত হইলেন।

শিবাজী রাজ্যের রাজ্যলাভে যেমন চাভূর্থা, রাজ্যসংগঠন ও শাসন-কার্যেও তেমন তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অর্জন ও রক্ষণ-কর্মতা বাহার একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী বিচার-যোগ্য, অধুনাতন সভ্যত্বপূর্ণের মাপনও দিয়া মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান করা যায় না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রথম। এক একটি গিরিদুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল। মারাঠী ইতিহাস (বধর)-লেখকেরা বলেন শিবাজী রাজ্য ক্রমশঃ ২৮০ সংখ্যক গিরিদুর্গ ইন্তগত করেন। এই-সকল দুর্গ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ক্রটি করেন নাই। দুর্গরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার ও তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত ছিল। তাহার দেওয়ানী ও রাজস্ব কার্যভার একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারের হাতে—দুর্গের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কার্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্মচারী ধান্ড ও রসদ যোগাইবার ও জীর্নসংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিন বর্ণের লোক এক কর্মসূত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সৃষ্টিভাবে কার্য চলিত। নীচে রামোসী প্রভৃতি শিক্টিজাতীয় লোকেরা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। দুর্গের আয়তন ও উপকারিতা অনুসারে দুর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে নয় জন সিপাই; বন্দুক, তলবার, বর্শা, পটা—প্রভৃতি অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত থাকিত। ইহারী সকলে আপন আপন পদ ও কর্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিদুর্গ হইতে নীচে সমান জমিতে আসিলে তাহার অল্প প্রকার ব্যবস্থা।

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকদের সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকল মাত্র। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই—একজন নায়কের অধীনে ১০ জন সিপাই—নায়কের উপর হাওয়ালদার, তার উপর জুমালদার—একসহস্র সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন 'হাজারী'—১০০০ সেনার নায়ক যিনি তাঁহার নাম সর্গোবৎ। এই গেল মাওলী পদাতিক। ষোড়শোওয়ার দলের নিম্নশ্রেণীর নায়ক সিলেদার, ২৫ সিলেদারের উপর একজন হাওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর জুমালদার, দশ জুমালার এক হাজারী, ৫ হাজারীর অধিনায়ক একজন সর্গোবৎ। উচ্চশ্রেণীর মারাঠা সৈনিকের অধীনে এক-একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার ও অল্প জাতীয় কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চনীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্মানুসারে বেতন নির্দিষ্ট ছিল। কোন আয়গীর বা জমিদারী হাবর সম্পত্তি পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত না—ধান্ড অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই-সকল কড়াকড় নিয়ম সম্বন্ধে শিবাজীর সৈন্যসংগ্রহে কোন বাধা ছিল না। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশরার দিনে মাওলী, হেতকরী, সিলেদার প্রভৃতি লোকেরা দলে দলে জাতীয় পতাকা-তলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈন্যদলভুক্ত হইত। দশরার উৎসব সৈন্যসংগ্রহের কাল,—শিবাজী প্রাজ্ঞ ঐ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

দ্বিতীয়। অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা। সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। তিন্ন তিন্ন বিভাগের আটজন কর্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ১। পেশওয়ার

—প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)। রাজ্যের মুদ্রাক্ষী, দেওয়ানী, কৌশলদারী প্রভৃতি সমুদায় কার্যভার তাঁহার হাতে। রাজার নীচেই তাঁহার আসন। ২। সেনাপতি (সর্গোবৎ Commnader-in-chief) সেনা বিভাগের কার্যাবলী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যধাক্ক দুইজন স্বতন্ত্র ছিল। ৩। অমাত্য (মজুমদার Finance Minister)। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্তা। ইঁহাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইঁহার কার্যভার গুরুতর। চৌথ ও সরদেশমুখ নামে দুইপ্রকার কর আদায় হইত। ৪। স্পীস (Minister of public records and correspondence) রাজ্যের পত্রাবাহার বিভাগের কর্তা। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার হাতে লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে-সমস্ত মঞ্জুর হইত। ৫। ব্যক্তিগত (Private Secretary)। ইঁহাকে শিবাজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈন্যদলের, তথা ঋহস্য সমস্ত ব্যাপ্তির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর। ৬। স্মস্ত (ডবীর Foreign Minister) বৈদেশিক রাজকর্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর বিদেশীয় রাজকার্য ইনি নির্বাহ করিতেন। ৭। পণ্ডিতরাও (Minister of Education) স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা। ধর্ম-দণ্ড-বিজ্ঞান-বিভাগ ও রাজ্য-সংক্রিয় ফলফিল গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল। ৮। জায়াধীশ (Chief Justice, অল্প হিসাবে Law Member)।

পণ্ডিতরাও এবং জায়াধীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মে যথোচিত সময় দিতে পারিতেন না। এই হেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত—যথা (১) দেওয়ান অথবা কারবারী (২) মজুমদার, হিসাবপত্র পর্যবেক্ষক (৩) ফর্দবীস, সহকারী হিসাব পরীক্ষক (৪) সরনিসু দফতরদার (৫) কর্কনিস (Commissary) (৬) চিটনিসু (Secretary) (৭) জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ইঁহার হাতে থাকিত (৮) পোটনিস, খাতাধিকারী।

এই অষ্টপ্রধান সভা, শিবাজীর উদ্ভাবনী শক্তির ফল; এই শাসন-প্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার পেশওয়ার হস্তেই পিয়া পড়িল। পেশওয়াই সর্বময় কর্তা, তাঁহার পদ বংশানুগামী হইল। সেনাপতি সচিব স্মস্ত, পেশওয়া নিজেই সকলি একাধারে, সে-সকল পদ নামমাত্র। প্রণালীবদ্ধ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয়। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপুত ছিল না—স্বাভাবিক গুণ ও কর্মযোগ্যতা অনুসারে কর্মচারী নিযুক্ত করা এই তাঁহার রাজনীতি ছিল।

- চতুর্থ। বেতনভুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা। রাজকীয় কর্মচারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁহাদের হাতে জায়গীর জমিদারী সঁপিয়া দেওয়া, শিবাজীর মতবিরুদ্ধ ছিল। শিবাজীর বিধানে
- পেশওয়া সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাই কারকুন পর্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাজকোষ কিম্বা ধান্যভাণ্ডার হইতে বেতন পাইত। নির্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইত। প্রভূত ঐশ্বর্যশালী জায়গীরদার জমিদার সৃষ্টি করা রাজ্যের হিতকর নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্র-বর্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী শক্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া উঠে—শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কার্য করিতেন। শিবাজী যাহা

কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাধিয়া দিয়াছিলেন তাহা ধর্মকেন্দ্রে—বন্দির প্রতিষ্ঠা ও দান ধর্মের কার্যে নিয়োজিত হইত। বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজনার জন্য দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চা বড় একটা ছিল না কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত দক্ষিণাদি দানবাবস্থার দক্ষণ ছাত্রগণ কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া আসিত। এইরূপে দক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হইল। পেশওয়ারাও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পঞ্চম। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা। রাজা-প্রজার সাক্ষাৎ সংস্ক, জমিদারের মধ্যবর্তিতা নাই, শিবাজীর এই নিয়ম ছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে, রাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্তী জমিদার নিয়োগ করা যত অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে, জমিদার প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া বেশীর ভাগ রাজনা আত্মসাৎ করে, সরকারী তহবিলে অল্পই আসে। এই হেতু, তিনি জমিদারী-প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তিনি যোগা বেতন দিয়া কম-বিসদার, মহলকারী, সুবেদার প্রভৃতি রাজস্ব কর্মচারী রাখিতেন—রায়তদের যাহার যাহা দেয় তাহার জন্য কবুলিয়ৎ লওয়া হইত। ফসলের দ্বিতীয়-পঞ্চম অংশ সরকারী রাজনার হার; অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন আদালতের কাজ বেশী ছিল না—সুবেদার দেওয়ানী কৌশলদারী দুই কাজই করিতেন। তেমন কিছু বড় মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত।

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্ট্রোল বা ইজারা দেওয়া রহিত করা। রাজস্বের কণ্ট্রোল দিয়া জমিদার বা ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও এই নিয়ম অনেককাল পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল।

সপ্তম। সিভিল বিভাগের অধীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। একরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে সৈন্যপ্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সর্বসর্বা হইয়া পড়ে।

অষ্টম। জাতিনির্কিশেষে কর্মবিভাগ। ব্রাহ্মণ, প্রভূ, মারাঠা, উচ্চনীচ বর্ণের সন্নিহনে রাজকার্য পরিচালন করা শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির প্রাধান্য নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছ্‌খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন অক্ষয় থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য নির্বাহ হয়, তাহাই উদ্দেশ্য। শিবাজীর পরে এই নিয়মটি রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই আমলে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য দেখা যায়।

শিবাজীর যে শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিশ রাজ্য-শাসন-প্রণালী তাহার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দিষ্ট বেতনে কর্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্কিশেষে রাজকার্যে নিয়োগ, রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, সভাপতির স্বল্পায় রাজকার্য নির্বাহ করা, এই-সমস্ত সুশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সুষ্টিময় ইংরাজজাতি ভারতবর্ষে একত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিবাজী-নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালীর অঙ্গধাচরণ করিয়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিল।

গৃহস্থ (অগ্রহায়ণ)।

শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

বিনি বত অধিক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। তিনি এক দিকে যেমন জনগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে

পারেন. অপর দিকে তেমনই বিষম অনিষ্টও উৎপাদন করিতে পারেন। কারণ, শ্রেষ্ঠেরা যাহা আচরণ করেন, অন্তেরা তাহাই অনুবর্তন করে।

শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যদি সম পরিপুষ্ট হয়, তবেই তাহা সুস্থ, এবং তাহাতেই শরীরী আনন্দ অনুভব করিতে পারে। প্রত্যেক মানবও সেইরূপ একাকী নিজে সম্পূর্ণ নহে, তাহার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ হয়। সে অনুভব করুক বা না করুক, প্রত্যেকের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। বিরাট সমাজ-দেহের আশি যেমন একটি অঙ্গ, আমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও অঙ্গাঙ্গ অঙ্গ। অতএব যতদিন এই সমস্ত অঙ্গই সুপরিপুষ্ট হইয়া না উঠে ততদিন সমাজের স্বাস্থ্যসুখ কোথায়? সুতরাং ব্যক্তিগত শিক্ষা বা সফলতা বস্তুত থাকি না-থাকি তুল্য।

যতদিন আমাদের চতুর্দিকের প্রত্যেকটি লোক শিক্ষিত হইয়া না উঠিতেছে, যতদিন আমরা তাহার জ্ঞান যথার্থ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত না হইতেছি, এবং যতদিন আমাদের এই কার্য যথোচিত ভাবে পরিচালিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের যথার্থ সফলতা লাভ হয় নাই, ততদিন আমরা অন্ধ ও পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি।

শিক্ষার প্রসারের সম্বন্ধে ভারত-ইতিবৃত্তের কয়েকটি পংক্তি এখানে আপনাদের স্মরণপথে আনয়ন করিব। একজন রাজা ( কৈকেয় অশ্বপতি ) বলিতেছেন ( ছান্দোগ্য, ৫-১১-৫ )—

ন মে স্তেনো জনপদে, ন কদর্যো, ন মদ্যপো, নানাহিতাগ্নিঃ, ন অবিদ্বান্, ন শ্বৈরী, ন শ্বৈরিণী ।”

“আমার রাজ্যে চোর নাই, কুপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, স্বেচ্ছাচারিণী—ব্যভিচারিণী নাই।” দেশের অধিপতি বলিতেছেন তাঁহার রাজ্যে একটিও অবিদ্বান্ নাই, এবং বিদ্যালভের যাহা ফল, তাহা তাঁহার রাজ্যে বিরাজমান।

আরও কয়েকটি পংক্তির দিকে লক্ষ্য করুন ( রামায়ণ, অযোধ্যা, বাল, ৬ )। সেখানেও ঐ একই কথা উক্ত হইয়াছে—

কামী বা ন কদর্যো বা নুশংস পুরুষঃ কচিৎ ।  
 ব্রহ্মৈ শক্যমযোধ্যায়ঃ নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥ ৮  
 সর্বে নরাশ্চ নার্যাশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ ।  
 মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥ ৯  
 নানাহিতাগ্নির্গায়জ্ঞা ন ধুক্রো বা ন তস্করঃ ।  
 কশ্চিদাসীদযোধ্যায়ং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥ ১২  
 নাস্তিকো নানুভী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ ।  
 নাস্ম্যকো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে কচিৎ ॥ ১৪

যদি কেহ মনে করেন অশ্বপতি নামে বা দশরথ নামে বস্তুত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাহা হইলে আমরা বলিব, না থাকুন, ক্ষতি নাই। ধরিয়া লইলাম অশ্বপতি ও দশরথের রাজ্য সেরূপ ছিল না। কিন্তু উপনিষৎকার ও রামায়ণকার দেশের ঐ যে আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য নহে। যাহারা দেশের বস্তুত মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদের ত শিক্ষা সম্বন্ধে উহা ভিন্ন আদর্শই হইতে পারে না, এই আদর্শকে পরিচালনা বা অবজ্ঞা করিলে কোন দেশই অভ্যাদয় লাভ করিতে পারে না, পারে নাই, এবং পারিবেও না। ভারতের এই যে ‘ন অবিদ্বান্’—কেহই অবিদ্বান্ নহে—এই পুরাতনী বাণী বর্তমান সভ্যদেশসমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তদনুসারে কার্য করিতেছে। নিয়ত (compulsory) শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

জাপানের মৃত স্মৃতি সিকাদো বলিয়াছিলেন—এখন হইতে একপ-ভাবে শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে যাহাতে কোন গ্রামে অশিক্ষিত পরিবার না থাকে, বা কোন পরিবারের মধ্যে কেহ অশিক্ষিত না থাকে। ‘ন অবিদ্বান্’—কেহই অবিদ্বান্ নহে, ইহাই যদি শিক্ষাপ্রচারের সনাতন মঙ্গল আদর্শ হয়,—তাহা হইলে ইহাই লক্ষ্য রাখিয়া যে আশাদিগকে চলিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু আমাদের যাহা যথার্থ কল্যাণ, তাহার আশোচনায়, তাহার সিদ্ধির প্রয়াসে আশাদিগকে প্রবৃত্ত দেখিয়া বৃদ্ধেরা যদি উপহাস করেন, করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে আমরা তাহা ভুলিয়া থাকিব? যাহা না হইলে আমাদের চলিবে না, যতই কেন আমরা ক্ষীণ হই, দুর্বল হই, চেষ্টা ত করিতেই হইবে। আমরা চাঁদ ধরিতে চাহিতেছি না; লোকে যাহা ধরিতে পারে,—সর্বত্র ধরিতেছে, আমরাও তাহাই ধরিতে চাহিতেছি। যদি আমরা ধরিতে চাই, সত্যসত্যই যদি তাহা ধরিবার জ্ঞান আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন বা দশ বৎসর পরে হউক আমরা তাহা নিশ্চয়ই ধরিব। কিন্তু আমরা যে অঙ্গ লোকেই ধরিতে চাহিতেছি। “মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে”—সহস্র-সহস্র মানবের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধির জ্ঞান চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমরা যদি সনাতন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া একপ শিক্ষাপ্রচার চাহি, তাহা হইলে সিদ্ধি আমাদের অদূরবর্তিনী না হইলেও, দূরবর্তিনী থাকিয়াও, একদিন শুভমুহূর্তে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত “ন রত্নমিষ্যতি যুগ্মতে হি তৎ”—রত্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না, তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সর্বদা কেবল অন্তের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, মঙ্গল তাহার দুর্ভাগ্য। শৈশবে আহার-বিহার-শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্যেই জননীকে অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ভিন্ন গতি থাকে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সন্তান যদি পূর্বের জ্ঞান প্রত্যেক কার্যে মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। শিক্ষাসম্বন্ধেও এইরূপ। আমাদের জননীস্থানীয়া রাজশক্তির উপর কেবল নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। দেশের সমস্ত শিক্ষার ভার রাজার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, এবং কোন স্থানেও তাহা হয় না, হইতে পারেও না। রাজা যতদূর পারেন করেন এবং দেশের লোককে দিগ্‌দর্শন প্রদান করেন, তাহার পর দেশবাসীরাও তাহার যত্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

লোকশিক্ষার ভার প্রধানত লোকেই লইতে হইবে। ভারত-বর্ষে তাহাই হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানই ‘ন অবিদ্বান্’ এই মহাবাণী এখানে অসম্ভব হয় নাই। ভারতের বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত “আচার্য্যকুল” \* বা “গুরুকুল” গুলি † দেশের রাজার স্থাপিত নহে, বা রাজকোষের অর্থেও তৎসমুদয় পরিচালিত হইত না। জনগণ বা সমাজের ব্যবস্থাতেই সেই সমুদয় স্থাপিত হইত, এবং ব্রহ্ম-চারীর দ্বারা গৃহস্থ-পরিবার হইতে ভিক্ষাক্রম তুলমুষ্টিতেই তাহাদের ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, বিদ্যা তখন দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না; এবং শিক্ষাও তখন নিয়ত (com-

\* গোপব্রাহ্মণ, পূর্ব ২-৪; ছান্দোগ্য ৪-২-১; আপস্তম্বব্রহ্মসূত্র, ১-১৩-১২।

† মুণ্ডক, ১-২-১২; বোধায়নব্রহ্মসূত্র, ২-১-২২, ১-২-৩০, বিষ্ণু, ২৮-১৩২, যাজ্ঞ, ১-২-৩৪-৩৫।

pulsory) ছিল। জনগণ নিঃসহজে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই আর্থাভাভাতা ততদূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল।

শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠিলেই স্কুল-কলেজের কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে; আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ঘর-দালান, টেবিল-চেয়ার, বেঞ্চ-ডেস্ক ইত্যাদি উপকরণসমূহ আসিয়া জুটে। এগুলি ভা হইলে স্কুলই হইবে না, আর স্কুল না হইলে পড়া শুনাও হইতে পারে না। যাহারা সব সময় কোটপ্যাটালুন পরেন, সেই সাহেব-স্বাদের জন্ত চেয়ার-বেঞ্চের আবশ্যিকতা থাকিতে পারে; তাহা বলিয়া আমাদের শিশুগণের জন্ত তাহার কি প্রয়োজন আছে জানি না, বরং অপকারই হয়। অথচ এই আসবাবপত্র না হইলে মনে করি বিদ্যালয় আমাদের হইল না। অথচ সামান্য মাদুরেই এই কাজ চলিতে পারে। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত পরীক্ষায় তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যকই বালক দৃষ্ট হইয়াছিল! এই সমস্ত সংস্কৃত-বিদ্যার্থী বেঞ্চ-ডেস্কের সাহায্যে অধ্যয়ন করে নাই, বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহেও শিক্ষা পায় নাই। অথচ ইহারা পড়িয়াছে, জ্ঞানও উপার্জন করিয়াছে, উপাধি-লাভও ইহাদের ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যও যে ইহাদের তাহাদের অপেক্ষা ধারাপ তাহীর প্রমাণ নাই। যে দেশ বিদ্যাকে যত মূল্য করিতে পারিবে, সে দেশ ততই অভ্যুদয় লাভ করিবে। ভারতবর্ষ ইহা যেমন করিয়াছিল, আয়ি জানি না, অথচ কোথাও আর এরূপ হইয়াছে কি না। আচার্য্যকুল বা গুরুকুলগুলিতে বালকেরা শীতাতপ-বর্ষা-অনুসারে কখনো বা সাধারণ অনাড়ম্বর গৃহের মধ্যে, কখনো বা স্নিগ্ধছায় তরুশ্রেণী, কখনো কখনো বা রমণীয় বেদিতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন পাতিয়া মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিত। উন্মুক্ত প্রকৃতির সংসর্গে চিত্তের গ্ৰায় শরীরেও তাহারা সমুন্নত হইয়া উঠিত। তাহারা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, সেই দীন অথচ শাস্তোজ্জ্বল আশ্রমে অধ্যয়ন করিত; তাহারা গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি তাৎকালিক সমস্তই সেই স্থানেই শিক্ষা করিত। বিদ্যা সেই সময়ে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ততদূর তাহারা আয়ত্ত করিত, ততদূর শিক্ষা তাহীদের সম্পূর্ণ হইত। বিদ্যার উৎকর্ষ সে সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল না। Residential বিদ্যালয় বিষয়ক বর্তমান উচ্চ-চীৎকারের সমাধানও এই স্থানেই হইয়াছিল। সেই কুটারের শিক্ষা, তরুতলের শিক্ষা, বন-আশ্রমের শিক্ষা পাইয়া দেশে আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা হইত; আদর্শ মন্ত্রী, আদর্শ শিল্পী, আদর্শ শিক্ষক দেখা দিত। শিক্ষার দ্বারা দেশের যাহা যাহা হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাতেই তৎসমুদয় সুসিদ্ধ হইত। এখনও এই প্রণালীতেই নব-নব চতুষ্পাঠিতে আমাদের বালকেরা ইংরাজী, বাঙ্গালা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা করিবে। এক-একটি চতুষ্পাঠিতে যেমন একাধিক অধ্যাপক থাকিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে। যে অধ্যাপক যে বিষয় যতটা শিক্ষা দিতে পারেন, বিদ্যার্থী তাহার নিকট ততটাই সেই বিষয় শিখিয়া আবার অপর টোলে গিয়া অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করিবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ যেমন এক একটি চতুষ্পাঠি খুলিয়া বিনি যাহা আনেন তিনি সেই বিদ্যাই প্রচার করিতেছেন, ইংরাজীশিক্ষিতগণও সেইরূপ করিবেন।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য থাকিলেও এক-একটি ইন্দ্রিয় যেমন এক-একটি কার্য্যের জন্ত নিযুক্ত থাকিয়া দেহীর

উপকার করে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন-বিভিন্ন কার্য্যের জন্ত কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। তাঁহাদিগকে পড়িতেও হইবে পড়াইতেও হইবে। নির্ভাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এখনও তাহা করেন। সংস্কৃত শিখিলেই তাঁহারা স্বভাবতই অধ্যাপনে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ইহা না করিয়া থাকিতেই পারেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবক আর কোন্ দেশে আছে? ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের এই আদর্শই আমাদের মধ্যে বিদ্যাত্রী লোক-সেবকগণের প্রয়োজন। ইহারা তাহাদেরই মত পড়িবেন ও পড়াইবেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যদি গভীর তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিবার যোগ্যতা থাকে, সকলেই যদি যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সূত্রের সীমা থাকে না, সে সমাজে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় না। সমাজে অভিজ্ঞের গ্ৰায় অজ্ঞ লোকও থাকে, পণ্ডিতের গ্ৰায় মূর্খ লোকেরও তাহাতে স্থান হয়, বোপা-অযোগ্য পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কে লইয়াই সমাজ। অতএব যাহারা সমাজের পরিচালক, যাহারা লোকহিতের নিয়ন্তা, তাঁহাদিগকে উভয় শ্রেণীরই লোকের কুশল চিন্তা করিতে হয়, বরং অভিজ্ঞ-শ্রেণী স্বয়ং স্বকীয় মঙ্গলসাধনে সমর্থ বলিয়া তাহাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহারা অজ্ঞ-অযোগ্যগণেরই মঙ্গলের জন্ত বিশেষ প্রয়াস করিয়া থাকেন। ভারতের মুনি-ঋষিগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ প্রভৃতিতে যে-সকল গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে, তৎসমুদয় সাধারণ-জনের বোধগম্য নহে, ঐ-সকল দুঃসহ গ্রন্থে প্রবেশ করিয়া সাধারণ-লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারে না, অথচ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকা কোনরূপে কর্তব্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সহজভাষায় নানা কথা-আখ্যায়িকায়, নানা দৃষ্টান্ত-উপমায়া ব্যাখ্যা করিয়া এবং উপযুক্ত নানাবিধ নব-নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া তৎসমুদয়কে পুরাণ নামে প্রচার করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐশ্বরতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব প্রভৃতি যে-সকল বিষয় পূর্বে সাধারণ-লোকের নিকট অতি দুঃসহ ছিল, পুরাণের প্রচারে তাহাদিগের নিকট সেই সমুদয় সহজ হইয়া উঠিল। লোক ধর্ম্মভাবে, দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐশ্বর্য্যভিযুগ হইয়া উঠিল। আজিও ভারতের জমিদার নগর-এক-পল্লীতে যে ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বেদ-বেদান্ত-আরণ্যক-উপনিষদের জন্ত নহে, তাহার একমাত্র কারণ পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারতেরই অমৃত কথা ভারতের অতি নিকট সমাজেরও লোককে বহু-বর্ষের অসভ্য হইতে দের নাহি, পুরাণসমূহের মধুর কথালহরীই তাহাদের হৃদয়কে এখনো পূণ্যামুভাবে সরস করিয়া রাখিয়াছে। সূ-ক, ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিকে পুরাণেরই সাহায্যে ভারতের সাধারণজনগণ সম্যক উপলক্ষি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাণেরই কল্যাণে গ্রামে বাপী, কূপ ও তড়াপ প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইত, পথে পথে ফলচ্ছায়াপ্রদ পাদপ-শ্রেণী রোপিত হইত, পান্থশালা স্থাপিত হইত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইত। ক্ষেত্র ও অন্নাগ্ন স্থানে জলের আগম-নির্গমের জন্ত উপযুক্ত সেতুসমূহ বদ্ধ হইত, আরোগ্যশালা স্থাপিত হইত, আতুর ব্যক্তি ঔষধ পাইত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইত, পবিত্র দেবায়তন-সমূহের উন্নত শৃঙ্খলা বেষণ্ডল স্পর্শ করিত, প্রভাত-প্রদোবে বলিরে শব্দ-ঘণ্টা-কাসের মঙ্গলধ্বনি দিগন্ত কম্পিত করিয়া উখিত হইত; অধিক কি, কোন উন্নত সমাজের লোকেরা যাহাতে

কিছু কল্যাণ উপভোগ করিতে পারে, ভারতের জনগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, প্রত্যুত দেবভাবে অক্ষুপ্রাণিত হইয়া প্রচুরভাবে তৎসমূহ অধিকার করিয়াছিল। কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের কথা নহে, কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জ্ঞান নহে, লৌকিক বিষয়সমূহকেও সাধারণ জনসমাজে পুরাণ-পাঠের সাহায্যে প্রচার করা হইত। ভূগোল, ঋগোল, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, বাস্তু-বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞাতব্য তাত্‌কালিক সমস্ত তত্ত্বই কোন স্থানে সংক্ষেপে কোন স্থানে বা বিস্তৃতভাবে পুরাণে সঙ্কলিত হইয়াছে। যাহারা স্বয়ং বা গুরুর নিকটে অধ্যয়নের অবসর পাইত না, তাহারা পুরাণকথা শুনিয়া ও নিয়াই সেই-সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিত। বাহ্য ও অধ্যাত্ম উভয়দিকেই পুরাণশ্রবণে ভারতের জনগণ এইরূপে শিক্ষালাভের অতি রমণীয় সুযোগ পাইত। কিন্তু বর্তমানের পুরাণ-পাঠের অবস্থা শোচনীয়। পুরাণ-পাঠ দেখিতে দেখিতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, আর অতি অল্প দিনেরই মধ্যে হয় ত তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবে। বিচক্ষণ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রায়ই পুরাণকথক হইতে দেখা যায় না। মনে হয় বর্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মহোদয়গণ পুরাণ-কথকতায় স্বকীয় মর্যাদা-হানি আশঙ্কা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, একদিন বাস-বশিষ্ঠের শ্রায় মহর্ষিরাই পুরাণকথকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রায় ব্যক্তিগণ ঐ ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই পুরাণপাঠ-শ্রবণের যাহা ফল, ভারত তাহা লাভ করিয়াছিল। আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরাই যথার্থভাবে করিতে পারেন, মুর্থের তাহা কার্য্য নহে। আজকাল যে-সকল পুরাণকথক দৃষ্টিগোচর হন তাঁহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানহীন ইহাদের হাতে পড়িয়া পুরাণকথা দুর্গতির চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর কথক মহা-শয়েরা মূলপুরাণে যাহা নাই তাহা কল্পিত করেন, যাহা আছে তাহা বলেন না, অথবা বিকৃত করিয়া বলেন। মুর্থমোহনের জ্ঞান ইহারা সময়ে সময়ে বিখ্যাকথার ত সৃষ্টি করেনই, তাহা ছাড়া অনেক স্থলে অতিবিকৃত অতি-অশ্লীল কথার অবতারণা করিতেও নিবৃত্ত হন না।

পুরাণের কথকতা সমরোপযোগী করিয়া আমাদিগকে ইহার সংস্কার করিতে হইবে। পুরাণের রচনার সময় পর্য্যন্ত ভারতে যে-যে বিষয় যে-রূপে আলোচিত বা পরিজ্ঞাত ছিল, পুরাণকারেরা তাহা তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আরও কত নব-নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এক-একটি বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আমাদিগকে এগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। আমরা যখন “লবণেশ্বরাসর্পিঃ”—প্রভৃতি সমুদ্র-সমুদ্রের কথা বলিব, তখন সন্ধে সন্ধে আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতিরও নামো-ল্লেখ করিব; যখন বিজ্জা-হিমালয়ের কথা আসিবে, সেই সময়ে আল্প-স-ককেসেরও নাম করিব; যখন গঙ্গা, যমুনা, সিঙ্গু, সরস্বতীর নাম করিতে হইবে, সেই সময়ে তল্গা-নাইলেরও উল্লেখ করিতে হইবে; যখন নবগ্রহের কথা উঠিবে, তখন নব্যতন্ত্রের বতে রাহু-কৈতুর লোপ করিয়া ইউরেনস্ ও নেপচুনের উল্লেখও করিতে হইবে; যখন দর্শনপ্রসঙ্গ হইবে, তখন সাংখ্য-বেদান্ত-বীমাংসার শ্রায় প্লেটো-ক্যাট-হিগেলের কথাও কহিতে হইবে। যেমন একই বিষয়কে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি, নব্য আবিষ্কার ও মতবাদগুলিকেও সেইরূপ ভাবে উল্লেখ

করিতে হইবে। যদি এমন কোন বিষয় থাকে যাহার সহিত পৌরাণিক বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, তাহা না হয় ধর্মপুরাণের কথকতার সময় নাই বলিলাম, কিন্তু তাহারই আদর্শে নবীন পুরাণে তাহা শুনাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য-অধ্যাত্ম উভয়দিকেই কতক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এবং ইহাই আমাদিগকে করিতে হইবে; অতএব বিদ্যাত্রীপণ পুরাণকথকের আসনে অধিষ্ঠিত হউন। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে মধুময় পুরাণ-কথার লহরীমালা উথিত হইয়া গ্রামবাসীর পল্লীবাসীর হৃদয়কে অভিষিক্ত করুক, এবং পুনর্বার পবিত্র সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়া উঠুক। গ্রামের মন্দির ও মসজিদ-গুলি জীর্ণ হইয়া স্থলিত-পতিত হইতেছে। এগুলিকে সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। পল্লীর বটতরুর মূল শূণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। মুক্তশামল দুর্ভাগ্যেরূপে আসন পাতিয়া প্রকৃতি দেবী আহ্বান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া পুরাণ-কোরাণ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহারই কথকতা আরম্ভ করুন। শ্রোতার অভাব হইবে না। পুর-নারীগণ কথক ঠাকুরকে পরিবৃত্ত করিয়া রাখিবে। যথাশক্তি ভোজা-দক্ষিণা দিতেও তাহারা কৃপিত হইবে না, স্বতই তাহাদের সে প্রবৃত্তি আছে।

আয়নির্ভরতা না থাকিলে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীর ক্রমশই ইহা হারাইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, হস্ত থাকিতেও তাহারা কার্য্য করিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি আছে, অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহারা এক-একটি বৃহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে ভান তাহাদের উদ্বন্ধ নাই। পানায় পানায় পুকুরের জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই জল পান করিয়া তাহারা দুশ্চিকিৎস ব্যাধিতে ভুগিতেছে, কত অসুবিধাতেই তাহাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে; কিন্তু প্রতিদিন হয় ত পাঁচ শত লোক সেই পুকুরে স্নানাদি করে, তথাপি তাহার পান্য উঠে না। প্রত্যেকে প্রতিদিন স্নানের সময় পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে কয়দিনই বা এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে লাগে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ-বিধবা একাকিনী দুইটি পুষ্করিণীর পান্য পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন স্নানের সময় নীরবে কিছুক্ষণ এই কার্য্য করিতেন। বর্ষায় পল্লীগ্রামে জলকাদায় মাসুকের ত দুয়ের কথা, গ্রাম্য পশুগুলিও কত কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে দুই-চারি কোদাল মাটি কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, দুই-একটা নালা কাটিয়া দিলে গ্রামের জল বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও সহ্য করিবে, প্রতি বৎসরই জ্বরে জ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িবে, অথচ নিজেদের এই সামান্য কাজটি তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা ইহার জ্ঞান পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলার বোর্ডের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই যে এই কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তাহা তাহাদের জানা নাই। ইহাদের এই শক্তিকে আগাইয়া তুলিতে হইবে; যতদূর সম্ভব তাহারা নিজের প্রয়োজন নিজেই যাহাতে সম্পন্ন করিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতি বৎসরই হয় বানের জলের আধিক্য, অথবা একেবারে তাহার অভাবে কত স্থানের কৃষকদের ধান নষ্ট হইয়া যায়। দুই চারি দশ গ্রামের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ২৪ দিন কোদাল ও খুড়ি লইয়া

কাজ করিলে হয়ত একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তাহার দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে এ শক্তি আছে, তাহা তাহারা ভাবিতেই পারে না। এতই তাহাদের নিজের প্রতি অবিশ্বাস। “নাওয়ানমবমানয়েৎ দীর্ঘমায়ুর্জীবীবিধুঃ।” দীর্ঘকাল খাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে নিজেকে অবমানিত করিতে হয় না। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে নিজের প্রতি অবজ্ঞার ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়া সকলকে জড়-জীর্ণ করিয়া দিতেছে ইহার অপনয়ন করিতে হইবে, এবং ইহা খুব শক্ত নহে। যিনি কখনও এই শ্রমজীবী ও কৃষকদলকে লইয়া কোন নির্মল রজনীতে উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে কথাবার্তা বা আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, শিক্ষার কথা, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের স্ব-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার সহায়ত্বীতি দেখাইয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন ভঙ্গনাথখারী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা তাহাদের হৃদয় কোনরূপেই শিক্ষাগ্রহণের এবং পরিচালনের সহযোগী নহে; তাহাদেরও যথেষ্ট বোধশক্তি আছে, এবং কার্য করিতেও তাহারা পটু। গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকগণের সহিত ইহাদের কেমন একটা বিচ্ছেদ আছে। উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত, কেহই কাহারও দিকে দেখে না, একের স্ব-দুঃখ অণ্ডের নিকটে পৌঁছায় না। এই দূর-বাবধানের উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং এক শিক্ষাপ্রচারেই ইহা সম্ভব। দেশের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই শ্রমজীবী ও কৃষকগণকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের বস্তুত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নানা উপায়ে, যিনি যেরূপে পারেন, তিনি সেইরূপেই ইহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। ইহাদের জ্ঞান নৈশ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় এবং ইহা ছুড়কও নহে। ইচ্ছা হইলেই অনেকেই ইহা নিজ নিজ গ্রামে করিতে পারেন। গ্রামের যিনি যাহা জানেন, অবসর-মত এক-এক দিন তিনি তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই-সকল পাঠশালায় আলোচনা করিবেন। মুখে মুখে তাহারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যাদির কত কথা শিখিয়া ফেলিতে পারিবে, দেশবিদেশের কত কত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিবে, ভূগোল-ইতিহাসের কথা শুনিয়া বিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিবে।

উপনিষদের এক স্থানে আছে—“প্রজাপতিরান্নানং স্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভয়তান্”—প্রজাপতি নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহাতে পতি ও পত্নী হয়। আরো আছে—“অর্ধো হ বা এন আত্মনো যজ্জায়তি”—স্ত্রী নিজের অর্ধেক অংশ। ইহাই যদি পতি-পত্নীর সম্বন্ধ হয়, গৃহপতি যদি নিজের অপরাধ গৃহপত্নীকেই লইয়া সম্পূর্ণ হন, তবে বলা বাহুল্য গৃহপত্নী অশিক্ষিত থাকিলে গৃহপতিরও শিক্ষা বস্তুত সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। শিক্ষার যদি আদৌ প্রয়োজন থাকে তবে তাহা যেমন পুরুষজাতির, সেইরূপ স্ত্রীজাতিরও। অল যদি তুচ্ছকে নিবারণ করিতে পারে, তবে তাহা পুরুষেরও করিবে, স্ত্রীরও করিবে; দীপ যদি অন্ধকার নাশ করিয়া গৃহকে উদ্ভাসিত করে, তবে তাহা, হে বন্ধু, তোমারও করিবে, আর ঐ যে সীমন্তিনী গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারও করিবে। এই একটা ষোটা কথা লইয়া যখন এখনও কোন স্থানে বাদামুবাদ দেখিতে পাই, তখন অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বালকদের শিক্ষার জন্ত আমরা যেরূপ প্রয়াস করি, বালিকাদের ও অল্পপুরুষদের শিক্ষার জন্ত আমরা তাহার একাংশও করি না। আমাদের যে, এ কোন বোহ জমিট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। হে পুরুষ, হয় তুমি তোমার সহধর্মিণীকে তোমার মত শিক্ষিত করিয়া তোলা, না হয় তুমিও যাহা কিছু শিখিয়াছ সমস্ত

গজার জলে বিসর্জন করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া, গিয়া, তোমার সহ-ধর্মিণীরই মত অশিক্ষিত সাজিয়া বস। আমার বিশ্বাস, বন্ধু, তুমি কিছুতেই দ্বিতীয় পক্ষ স্নেহকার করিতে সক্ষম হইবে না। যদি তাহাই হয়, যদি নিজে তুমি অশিক্ষিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে কি নিমিত্ত, কোন্ অধিকারে তুমি তোমার স্ত্রীকে অশিক্ষিত রাখিবে? কেন আমরা আমাদের গৃহিণী, ভগিনী, জননীকে শিক্ষিত দেখিব না?

মাতৃভাষার সাহায্যে কোন বিষয়ের শিক্ষা সুলভ ও সুগম হয়। ভাষান্তর শিক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা কিছু শিখিতে গেলে তাহাতে অনেক অসুবিধা আছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদেরকে মাতৃভাষারই সাহায্যে শিক্ষালাভের জন্ত যত্ন করিতে হইবে। বঙ্গভাষাকে একমাত্র পরিপুষ্ট করিতে হইবে, এবং এই পরিপুষ্ট হই উপায়ে হইতে পারে; প্রথম, বঙ্গভাষায় নব-নব মৌলিক পুস্তকের প্রণয়ন; দ্বিতীয়, ভাষান্তরের অত্যাশঙ্কক পুস্তকসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। অনুবাদকার্য কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ আশাশ্রম হইলেও অল্পরূপ বা আবশ্যিকমত এখনো হয় নাই। এদিকে দ্রুতগতি না হইলে চলিবে না। পাশ্চাত্যভাষায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর অভাব নাই, যুরোপীয় দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত বাঙ্গালীও অনেক আছেন, কিন্তু কয়খানি পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানাদির পুস্তক অনূদিত হইয়াছে; কয়জন বাঙ্গালী একমাত্র পদ্যপিকর হইয়াছেন; প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে কত এম্-এ বাহির হইতেছেন, তাহারা অধ্যাপকও হইতেছেন, তাহাদের ছাত্রেরাও আবার উত্তীর্ণ হইতেছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত একখানিও যুরোপীয়-দর্শন-বিষয়ক পুস্তক বাঙ্গালায় বাহির হইল না। মাসিক পত্রিকা-গুলিতেও কচিৎকদাচিৎ এক-আধটা দার্শনিক প্রবন্ধ দেখা যায়, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। ঐ যুরোপীয় দর্শন যদি আমাদের সংস্কৃতদার্শনিকগণের নিকট উপাভূত হয়, তবে কত উপকার হয়। কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধকতাই সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক আজ গল্প লিখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এক-এক জন এক-একটি বিষয় লইয়া সংগ্রহ করিতে থাকিলে অল্প দিনেই ভাষার পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আমরা কোন কাজ আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল দেখিবার জন্ত উৎসুক হই, নাম আহির করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ি। কার্যের দিকে যাহার লক্ষ্য নাই,—তিনি প্রধানত নামের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহার কার্য ত ভাল হয়ই না, নামও হয় না। কিন্তু ধৈর্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যত্নের সহিত যদি কোন কাজ করা যায়, তবে কাজটাও ভাল হয়, আর নামও হয়।

সংস্কৃতভাষা—সংস্কৃতসাহিত্য জগতের সর্বত্র নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষার—বঙ্গভাষার নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা অনেক লইয়াছে, আরও তাহাকে অনেক লইতে হইবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ইহার পরিপুষ্টি অসম্ভব। বঙ্গভাষার অভ্যুদয়ের জন্ত সংস্কৃতেরও প্রচার অত্যাশঙ্কক। জেলায় জেলায় সংস্কৃতভাষার যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তাহা আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রাধিকানের বিষয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর দুইটি ভাষার প্রচার করিতে পারি, এবং করা উচিত। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য কোন মতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের সম্পূর্ণতাবিধানে পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যই সমর্থ। ভারতের মধ্য-যুগের ধর্মে ও সমাজে ত্রিধারার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক দিকে

বৌদ্ধ, আর এক দিকে-জৈন, এবং মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধারা। পালিসাহিত্যের এক-আধটু আলোচনা দেখা গেলেও প্রাকৃত সাহিত্য, বিশেষত প্রাকৃতনিবন্ধ জৈন সাহিত্য এখনও আমাদের আলোচনার পথে উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃতের সহিত পাল ও প্রাকৃতের এত ঘনিষ্ঠ সংস্ক সে, অনায়াসে তাহার সহিত ইহাদের আলোচনা চলিতে পারে।

কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে গাঙ্কর বা সঙ্গীত-বিদ্যা অতি-উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে-যে স্থানে ইহা আলোচিত হয়, প্রায় সর্বত্রই ইহা একটি বিলাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; ইহা যে একটি বিদ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না। আমাদের পৌরাণিক আচার্যগণ সঙ্গীতকে অষ্টাদশবিধ বিদ্যার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাহারাই ইহাকে বেদের ঞায় সম্মান করিলেন, এবং সেই জগুই গাঙ্করবেদ বলিয়া ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সঙ্গীতের কোন স্থান নাই, যে-সমস্ত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা-কল্পনা, আন্দোলন-আলোচনা শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদেরও মধ্যে সঙ্গীতের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশান্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের স্থান আছে, এবং তাহা অতি-সম্পন্ন। ভারতের সঙ্গীতবিষয়ে নিজের বিশেষত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, শিক্ষিতগণ এদিকে প্রায় উদাসীন, ভারতের নিজের চিন্তিত, নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের দর্শন পাওয়া দূরের কথা, নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি আসিয়া ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লোকে একটু চেষ্টা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল রস অনুভব করিবার ইচ্ছা করে না, কেবল উপরের ভাসা-ভাসা নংকিঞ্চিং পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অভিনয়গুলি ত পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণ, যাত্রার দলও ক্রমশ সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রায়ই বহিষ্কৃত হইয়াছে। আতোদ্য বা ঐকতানিক বাদ্যে বৈদেশিক যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত যখন ব্যসনরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহা অনর্থ প্রসব করে, সংযতভাবে তাহার অনুশীলন কখনই অকল্যাণের কারণ নহে।

সঙ্গীতের দ্বারা সাহিত্যের রসপুষ্টি হয়। কাব্যার্থ গীত হইলে তাহা শ্রোতার মর্মে অধিকতর ভাবে স্পর্শ করে। সাহিত্য সমাজে যাহা করিতে চাহে, সঙ্গীত সংযোগ হইলে তাহা আরও সূচকভাবে করিতে পারে। ভারতের আদি মহাকাব্য এখনও নানারূপে গীত হইয়া শ্রবণবিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। সঙ্গীত সাহিত্যেরই অঙ্গ। ইহাকে বর্জন করিলে সাহিত্য বিকল বলিয়া গণনীয়। অতএব সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ে নৈর নিম্নলিখন করিয়া অবস্থান করা কোনরূপেই উচিত নহে। কেবলমাত্র বিলাসের উপকরণ মনে না করিয়া, বিদ্যাহিসাবে যাহাতে ইহা সকলে অনুশীলন করেন, এবং ভারতীয় সঙ্গীতকলা রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গীতপ্রিয়গণ এজগৎ চেষ্টিত হউন।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষত্ব থাকে এবং তাহারই প্রয়োজন। যিনি যেরূপে পারেন তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিপুষ্টির জগু সেইরূপেই তাহা করিবেন। যিনি ধনবান্ তিনি ধর্ম দিয়া সাহায্য করুন, যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি বুদ্ধি প্রদান করুন যিনি বিদ্যান্ বিদ্যা প্রদান করিবেন, শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্রের কথা উপদেশ করিবেন, ধার্মিক ধর্মপ্রচার করিবেন; এইরূপে যাহার যাহা শক্তিতে কুলায়, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। যাহার যাহা আছে তিনি তাহাই দিয়া আমাদের প্রকাশিত করুন। দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই কেবল বিশ্বের

নিকট নিজেকে সমর্পণ করিতেছে। তাহাতেই তাহার সার্থকতা। গোলাপ ফুলটি নিজের অস্তরের ভিতরে যে সৌরভসত্তার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই ত কেবল প্রকাশ করিয়া বিশ্বের মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, গোলাপের গোলাপত্ব তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। সে নিজের জগু এক কণাও রাখিয়া দিতেছে না। যখনই তাহা সেই সৌরভ-সঞ্চয়ে পরাঙ্গু থ থাকে, তখন তাহার বস্তুত আত্মপ্রকাশ হয় না, তাহার সার্থকতা লাভ হয় না। সূর্য্য নিম্নতই এইরূপে বিশ্বের নিকটে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ করিতেছে। বর্ষার মেঘ এইরূপেই জলরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিশ্বের নিকটে সমর্পণ করিতেছে। জগতের সমস্ত ভূতই এইরূপে নিজেকে প্রকাশ ও উৎসর্গ করিতেছে। প্রকাশ ও উৎসর্গ ইহাই জগতের নিয়ম। অতএব বঙ্গগণ, প্রকৃতির নিয়মে এই ভাবেই পরিচালিত হওয়া আমাদের স্বভাব, আমরা যেন এই স্বভাব হইতে স্বলিত না হই। আমরা যে যাহা পারি তাহাই করিব, এমন কি একটি কথাও উচ্চারণ করিয়া যেন সাহিত্যসেবা করিতে পারি, এবং এই সাহিত্য-সেবা দ্বারা বিশ্বসাহিত্যের সেবা করিয়া এই সমস্ত বিশ্বের সেবায় সমর্থ হইতে পারি।

## তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা ( পৌষ ) ১

গান — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্দু—কাঁপতাল।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে ;

কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে ..

এমন গানে গানে !

কেন তারার মালা গাঁথা,

কেন ফুলের শয়ন পাতা ;

কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা

জানায় কানে কানে !

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে ;

কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া

চায় এ মুখের পানে ! ..

তবে কণে কণে কেন

আমার হৃদয় পাগল হেনা !

তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার

কুল সে নাহি জানে !

## দেশের অশান্তি ও আশঙ্কার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের উপর দিয়া যেন এক ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। চারিদিকে উপযুঁপরি নানা অশান্তি, উদ্বেগ, আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস যেন নিত্য নূতন বিকট-মূর্তিতে দেশের রাজ্য প্রজা, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারীকে আতঙ্কিত ও বুদ্ধিব্রান্ত করিতে চেষ্টা করি-

তেছে। অনেকেই মনে ভাবিতেছেন—ভারতবর্ষের বস্তুতঃ অতি দুঃসময় উপস্থিত। বিধাতা কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কি ব্যাপার সংঘটিত করিতেছেন, তাহা সকল সময় অবধারণ করা আমাদের শ্রায় ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু তিনি মঙ্গলময়,—আপাততঃ যাহা আমাদের নিকট দুঃখ ও বিভীষিকাপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয় তাহার মধ্যেও তাহার মহামঙ্গলময় মহাদুঃশ্রু-সাধন-বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভয় বিভীষিকার দুর্দিনে, স্ব স্ব কর্তব্য ও বিচারবুদ্ধিকে সুস্থির রাখিয়া, ধীর-নিশ্চিত-গতিতে, সত্য-প্রেম-মঙ্গল-পূর্ণ অভীষ্ট পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াও যে অত্যন্ত কঠিন, তাহারও সন্দেহ নাই। রাজা প্রজা সকলেরই সকল সমস্যার সমাধানও যে সুকঠিন, তাহারও সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় বিধাতা সকলকেই সুমতি ও সদ্বুদ্ধি দিয়া, সুপথে পরিচালিত করিবার শক্তি ও সুযোগ দিয়া দেশের সর্ব-বিধ সুখ শান্তি স্বস্তি ও শুদ্ধি প্রবর্দ্ধিত করুন, এই আমাদের প্রাণের কামনা ও কাতর প্রার্থনা। সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই অতঃপর আমরা এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বিষয়টি যেমন অত্যন্ত গুরু, সে বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করিয়া—সমালোচনা করিয়া সত্য প্রকাশ করাও সেইরূপ সুকঠিন। কারণ আমাদের কোন্ কথা আজকাল কে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কারণ রাজা প্রজা—সকলের চিত্তই এখন অল্পাধিক পরিমাণে আলোড়িত, সঙ্কুচিত, সঙ্কুচিত। তাই বলিতেছি, এসময়ে এ ক্ষুরধার পথে পদার্পণ করাও সহজসাধ্য নহে। কিন্তু রাজা ও প্রজা—জনসাধারণের সাধ্যানুসারে সেবা করাই যখন পত্র-পত্রিকা-পরিচালক-বর্গের ও দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ শিক্ষিত নাগরিক মাত্রের মুখ্য কর্তব্য ও ধর্ম, তখন এ সময়ে নীরব নিষ্ক্রিয় থাকাও আমরা একান্ত অসঙ্গত মনে করি। তাই সময় সময় নানা সুযোগে নানাভাবে সত্য কথা, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অপ্রিয় হইতে পারে একরূপ আশঙ্কা থাকিলেও, প্রকাশ করিয়া আমরা আমাদের দায়িত্বপ্রতিপালন করি। “পাইওনিয়র”, “ইংলিশম্যান” প্রভৃতির সহিত সকল সময়ে

সুর মিলাইয়া আমরা সর্ববিধ শাসন-তন্ত্র-মন্ত্রের সমর্থন করিতে পারি না বলিয়া, আমরা তাহাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট নিন্দিত, এমন কি সাম্রাজ্য-ধ্বংসকামী বিপ্লববাদী বলিয়াও অভিহিত হই; আবার অপরদিকে, আমরা “যুগান্তরের” সহিত সুর মিলাইয়া, অতঃপর এই মুহূর্ত্তেই ইংরাজ জাতির সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও সহায়তা করিতে পারি না বলিয়া, এ দেশের কোন কোন ব্যক্তির নিকট কাপুরুষ ও দেশের মহাশত্রু বলিয়া নিন্দিত ও দিকৃত হই। কিন্তু বিধাতার রূপায় আমরা আমাদের ধর্মবুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে আপন কর্তব্য যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করিতে পারিলেই পরম কৃতার্থ বোধ করি।

এদেশে এখন অশান্তি, আতঙ্ক, উদ্বেগ ও অবিশ্বাস ক্রমেই যে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত সাধুপ্রকৃতির লোককেও এখন অবিশ্বাসের চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহার অনেকক্ষেত্রে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে এমন কোন কোন দেবচারিত্র মহাশয় ব্যক্তির পশ্চাৎ এমন অযোগ্য অকৃত ঔপ্তপুলিশ নিত্যসহচররূপে সর্বত্র অনুসরণ করে, যে, তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুগপৎ লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিস্ময়-সাগরে নির্মজ্জিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না। নবগঠিত ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন কমিটির সদস্য মহোদয়েরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নানা সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তির ও স্থানীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষবর্গের নিকট স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এ দেশের জনসাধারণের ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি মনের ভাব এখন কিরূপ, প্রজাসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ লোকে আজকাল এদেশে ইংরাজ গবর্নমেন্টের স্থায়িত্ব অথবা উচ্ছেদ-কামনা করিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে গবর্নমেন্ট অধিকৃত লোকপ্রিয় হইতে পারেন, কি উপায়ে দেশের এনার্কিষ্টদল নিমূল হইতে পারে, এনার্কিষ্টদলের প্রতি প্রজাদের সহানুভূতি কিংবা কোন



প্রকার সংস্রব থাকিলে তাহার পরিমাণ কত, ইত্যাদি।

সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইলেও এদেশে আজ কয়েক-বৎসর যাবৎ যে একদল বিপ্লববাদীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের জন্ম দেশের রাজপুরুষ এবং জনসাধারণ—সকলেই এখন নিয়ত উদ্বিগ্নভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তাহাদের দুঃসাহসের কথা মনে ভাবিয়া, রাজপুরুষগণ প্রজাবর্গের ধন মান প্রাণ সুখ শান্তি কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারিবেন সে চিন্তায় যেমন সতত চিন্তিত, নিজেদের ধন মান প্রাণ কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারিবেন সে চিন্তায়ও তেমনি ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। দেশের লোকও এখন উভয়সঙ্কটে পড়িয়া অতি ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতেছে। একদিকে বিপ্লববাদীদের হস্তে কাহার কখন যথাসর্ব্ব্ব লুপ্ত হইয়, কে কখন কোথায় দস্যুর বোমা রিভলভারের আঘাতে অকালে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি নানা ভয় বিভীষিকা। অপর দিকে গুপ্তপুলিশ আপন ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় কখন কোন্ নিরপরাধকে বিপজ্জালে জড়াইতে চেষ্টা করে, কখন কাহার বাড়ী খানাতল্লাস হয়, কোন্ দিন কে কোন্ মোকদ্দমায় পড়ে, কাহার পুত্র ভাগিনেয় কিম্বা ভ্রাতার লেখাপড়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া কোন্ ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সে আসামী বলিয়া ধৃত হয়, অথবা কে কখন কোন্ রাজপুরুষের সন্দেহ, বিদ্বেষ বা কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়, কাহার কখন চাকরী যায়, ইত্যাদি নানা প্রকারের আশঙ্কা।

আবার অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে গুর্খা, গোলন্দাজ, শিখ, মারহাটী, পদাতিক, অখারোহী এবং গোরা সৈন্যের বহু সমাবেশের কথায় দেশের সকল শ্রেণীর নরনারী অত্যধিক ভীত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা দেশের বর্ত্তমান অশান্তি ও উদ্বেগের এখানে কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। ভয় ও অবিশ্বাসের বিকট মূর্ত্তিসমূহ নানা জল্পনা কল্পনার সাহায্যে কিরূপ বীভৎস-লীলা করিতেছে, আমরা এখন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পূর্ব্ববঙ্গে এবার এত বিভিন্ন শ্রেণীর ও এত অধিক-

সংখ্যক বৃটিশ বাহিনীর আগমন-সংবাদ শুনিয়া কেহ কেহ এরূপও মনে ভাবিতেছে যে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বোধ হয় বিপ্লববাদীদের গুপ্ত অস্ত্রাগার কেমন প্রভৃতির গভর্ণমেন্ট অনুসন্ধান পাইয়াছেন। কেহ কেহ এমনও মনে ভাবিতেছে যে হয়ত পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লববাদীদের এতই সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকিতে পারে যে তাহারা স্বেযোগ পাইলে বৃটিশ সৈন্যসমূহের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিতে পারে, এই সম্ভাবনায় বিপ্লববাদীগণ প্রকাশ্যযুদ্ধ ঘোষণা করে কিনা পরীক্ষা করা গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায়। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিতেছে যে বিপ্লববাদীগণকে নিমূল করিবার জন্ম পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাসাধারণ গভর্ণমেন্টের সহিত মনে প্রাণে ষোগ দিবার পরিচায়ক উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কার্য এ পর্য্যন্ত করে নাই; সৈন্যেরা নানা স্থানে লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার ভয়ে গভর্ণমেন্টের ভবিষ্যতে মফঃস্বলে আর কোথাও যেন সৈন্য প্রেরণ করিবার কারণ উপস্থিত না হয়, সেজন্য প্রজাসাধারণ বিপ্লববাদীগণকে শাসিত করিবার জন্ম নানা উপায় অবলম্বন করিবে, এইরূপ অভিপ্রায়েই গভর্ণমেন্ট এবার এক সময়ে এতগুলি সৈন্য আনয়ন করিতেছেন। এইরূপ ভাবের নানা লোকের উর্ধ্ব মস্তিষ্কে কত বিভিন্ন বিচিত্র কল্পনার উদ্ভব হইতেছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সুকঠিন।

কোন কোন ইংরাজ যেমন ভারতবাসীদিগের স্বাভাবিক রাজভক্তিতে সন্দ্বিহান হইয়াছেন, কোন কোন ভারতবাসীও আবার সেইরূপ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের স্বাভাবিক প্রজাহিতৈষণা বুদ্ধিতে একেবারে সন্দ্বিহান। গভর্ণমেন্ট ভারতের কৃষিবল গোজাতির সংখ্যা ও অবস্থা অবগত হইবার জন্ম ভারতবাসীর গৃহস্থিত গবাদি পশু সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কোন কোন ভারতীয় কৃষক মনে ভাবিল, গভর্ণমেন্ট হয়ত গবাদি পশুর সংখ্যার উপর নূতন কোন কর ধার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছেন। দেশে সেটেলমেন্ট করিপকালে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কয়খান ইষ্টকালয়, কয়খান খড় বা উলুত্বণের ঘর আছে তাহা যখনই জিজ্ঞা-

সিত হয়, কোন কোন প্রজা মনে করে, হয়ত ইষ্টকালয় ও ঘরের সংখ্যার উপর গৃহস্থের সাংসারিক অবস্থার স্বচ্ছন্দতা অক্ষুমান করিয়া গভর্নমেন্ট নূতন কোন টেক্স স্থাপন করিবেন। বঙ্গীয় কৃষকেরা কেঁকি পরিমাণ ভূমিতে কোন বৎসর পাট বপন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে গভর্নমেন্টের কৃষিবিভাগ বার্ষিক ভাবী পাট আবাদের পরিমাণ অবধারণ করিতে অনেকটা সাহায্য পাইবার কথা। সেইজন্য গভর্নমেন্ট স্থানীয় চৌকীদার পুলিশের সাহায্যে পাটচাষে কোন প্রজার কত জমী রহিয়াছে জানিতে চেষ্টা করিলেন, অর্থাৎ কোন কোন অশিক্ষিত অবস্থানভিজ কৃষক সমালোচনা করিতে লাগিল যে অতঃপর নিশ্চয় সরকার বাহাদুর পাটের উপর একটা টেক্স ধাৰ্য্য করিবেন। এই প্রকার নানা সহৃদয়-প্রণোদিত সরকারী অনুষ্ঠানেও আজকাল লোকে গভর্নমেন্টকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষে দেখিতেছে। জমীদার ও তালুকদার শ্রেণীর লোকের অনেকের মনের এখন এই ধারণা যে গভর্নমেন্ট এদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করিতেছেন না—এজন্যও কেহ কেহ উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও দেশে শিক্ষার বহুল বিস্তারের প্রতি গভর্নমেন্টের মনের ভাব অক্ষুণ্ণ নহে বলিয়াও এদেশের বহুলোকের এখন ধারণা। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দিন দিন অন্নচিন্তা-সমস্যার সমাধানে অক্ষম হইয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় প্রমাদ গণিতেছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষার বিস্তার জন্য অগ্ৰায় সভ্য স্বাধীন দেশের গভর্নমেন্টের ন্যায় সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেছেন না, এরূপ ধারণাও ক্রমে বহুলোকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। দেশবাসী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্রমে বর্ধিত করিয়া দিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু গভর্নমেন্ট কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিধানের ন্যায় অকস্মাৎ এমন এক একটা আইন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রচলিত করিতেছেন যে তদ্বারা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে নূতন স্বাধিকার লাভ ত দুরের কথা, পূর্বে প্রাপ্ত ও প্রশংসার সহিত পরিচালিত অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া দেশবাসীর তাহা পুনঃ-

প্রাপ্তির নিমিত্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী স্বরভঙ্গকারী ও শক্তিকরকারী ভীষণ আর্ন্তনাদেও তাহা আবার লাভ করিবার আশা অতি অল্প। সুদূর ভবিষ্যতেও কোন কালে ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত করা ইংরাজ-জাতির পক্ষে সম্ভব কিংবা সম্ভবপর হইবে না, লর্ড মলি একথা স্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করিয়া দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করেন নাই, পরন্তু বহু ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত ব্যক্তির অগাধ বিশ্বাস বিনষ্ট ও ভক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের অধীন উপনিবেশিক গভর্নমেন্ট সমূহ, সেই-সকল দেশের প্রবাসী ভারতবর্ষীয় নরনারীর প্রতি এই যে নিত্য নূতন ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, নীচ স্বার্থবুদ্ধিতে আইনের চক্র ঘুরাইয়া ভারত-সন্তান-সন্ততিদিগকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত করিতেছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আধুনিক ভারতবাসী মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতেছে যে এ যুগের ইংরাজেরাও ক্লার্কসন, বাক্সটন ও উইলবারফোর্স প্রভৃতি মহাত্মাদিগেরই বংশধর।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সমক্ষে এ দেশের যে-সকল শ্বেতাঙ্গপুরুষ সাক্ষ্য দিতেছেন তাহাদের অনেকে এই ভাবে কথা বলিতেছেন যে সরকারী কার্য্যে প্রায় সকল বিভাগেই ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনায় ভারতবাসীদিগের যোগ্যতা যথেষ্ট নহে। মিত্র রমেশচন্দ্র, দত্ত রমেশচন্দ্র, সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সংসারচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র, রাসবিহারী, নীলাধর, আবদুল লফি, আবদুল জব্বার, প্রভৃতি—এক বঙ্গদেশের শত শত সুসন্তানের বিমল কর্মজ্যোতি-ছটাতে দিগ্বল আজও অত্যধিক আলোকিত রহিয়াছে। অধিকতর সুযোগ পাইলে এই-সকল ভারতবাসীই আরও কত বিশ্বয়কর কর্ম-সাফল্য প্রদর্শন করিয়া জননী জন্মভূমির ও স্বজাতির মলিন মুখ উজ্জ্বলতর করিতে পারিতেন, কে তাহা অবধারণ করিতে পারে? কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন কোন স্বার্থাঙ্ক শ্বেতপুরুষ, কোন যুক্তি কারণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম না হইয়াও, শুধু গায়ের জোরে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অপকৃষ্টতা প্রতিপাদিত করিয়া

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদিগের অভিমত এদেশীয় লোকদিগের প্রতিকূলে প্রকাশিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইতেছেন! যে দেশে এযুগেও রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হরিনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, লালমোহন, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, শিশিরকুমার, অশ্বিনীকুমার, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহা মনীষী পুরুষেরা একে একে, এক এক অদ্বিতীয় অতুলন প্রতিভা কৰ্ম-কুশলতা ও চরিত্রগৌরব প্রদর্শন করিয়া, বলিতে গেলে একরূপ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিম্বিত বিমুগ্ধ করিয়া গেলেন, সে দেশের লোক কৰ্মকুশলতায় ইউরোপীয়ানদিগের সমকক্ষ নহে, এরূপ উক্তি করা কি নিতান্তই সহজ না সঙ্গত?

সে যাহা হউক, ভারতবাসীর মহা সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এ সময়ে, ভারত-গৌরব কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিক্ষা-সভ্যতাভিমानी পাশ্চাত্য জগতের আজ আবার অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গিবার নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় রড লর্ড হার্ডিং গীতাঞ্জলির অনুবাদ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া সে দিন যঁাহাকে “Poet Laureate of Asia” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আজ বিশ্বসাহিত্য-সমাজের শিরোমণিরা তাঁহাকেই Poet Laureate of the World রূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমাদের এখন আশা হইতেছে ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি আরও কোন কোন মনীষী অচিরে আবার এই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভারতজননীর মলিন মুখ জগতে আরও উজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার কথা এই যে, আজও যে জাতির অন্ততঃ একজনও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার জাতি-গোষ্ঠী-স্বজন-বংশের অপর সকলে কি একবারেই জুলু কিম্বা একুইমোর সমশ্রেণীর জীব? ভারতবর্ষীয় “সার্ভিসের” সহিত যঁাহাদের স্বার্থ-সংশ্রব নাই, সভ্য জগতের সেই-সমস্ত দেশ ও জাতির লোক এখন অবশ্যই উপলব্ধি

করিতেছেন যে ভারতবর্ষের লোক অসভ্য, অক্ষম কিংবা নিরক্ষর নহে। শুধু কতিপয় সার্থক ইংরাজ তাহা স্বীকার না করিলে ভারতবাসী তাহাতে প্রীত সন্তুষ্ট হইতে পারিবে কেন? ভারতবর্ষীয়েরা যে শারীরিক সামর্থ্য, বুদ্ধি-প্রখরতায় এবং চরিত্র-গৌরবে পৃথিবীর যে-কোন সভ্য ও স্বাধীন জাতির সমতুল, তাহা কোন কোন সহৃদয় সত্যবাদী ইংরাজও স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতবাসীর চক্ষে রাজা “মহতী দেবতাহেবা নর-রূপেণ তিষ্ঠতি।” ভারতবাসীর রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ, যে রাজভক্তির জগতে অতুল তুলনা নাই; Loyalty শব্দ ভারতের সেই “রাজভক্তি” শব্দের প্রতিশব্দও নহে, সমার্থ-বাচকও নহে। ভারতের রাজভক্তি স্বর্গের জিনিস। সেদিন মহামহিমাদিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তি কিরূপ অতুলন ও অমূল্য তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আত্মাদিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনেক ইংরাজ মনে ভাবেন না যে ভারতবর্ষের রাজার আদর্শও শ্রীরামচন্দ্র। রাজ্যাভিষেক-কালে ভারতের রাজা রামচন্দ্রই প্রজাবর্গকে বলিয়াছিলেন—প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে, নিজ ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক যাবতীয় দ্রব্যসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে, তৃতীয়তঃ আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতে, এমন কি প্রজাদিগের হিতসাধিত হইবে বৃষ্টিতে পারিলে পরিশেষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। এবং জগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ও অপরিত্যক্ত্য স্বীয় ধর্মপত্নী জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র বিধাবোধ করিবেন না কিংবা পঁচাত্তপদ হইবেন না। পৃথিবীর অপর কোন দেশে, কোন কালের কোন রাজা স্বীয় অভিষেক-কালে এভাবে প্রজাগণ-সমক্ষে এরূপ ভাষায় স্বীয় কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছেন? জগতের ইতিহাস বোধ হয় এখানে নীরবে পরাভব স্বীকার করিয়া মস্তক অবনত করিবে। কিন্তু বিস্ময় ও আত্মাদের বিষয় এই যে মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি তদীয় জীবনে বর্ণে বর্ণে আচরিত সত্যে পরিণত হইয়াছিল। জগতের নীতিশাস্ত্র-বিদেরা মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত এই কঠোর

রাজধর্ম্মাচরণকে অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু প্রজারঞ্জক আদর্শ রাজার ইহা যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের অত্যাঙ্কল ও অদ্বিতীয় মহদৃষ্টান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ্যার স্বজাতীয় বলিয়া যে-সকল ইংরাজ বা ইউরোপীয়, ভারতবাসীদিগের নিকট রাজবৎ সম্মাননার চক্ষে অবলোকিত হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের নিজ দায়িত্ব কিরূপ গুরু, সে বিষয়টাও একবার স্থির ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে এদেশের দুঃখ দুর্গতি অশান্তি, অসন্তোষ উদ্বেগ অবিশ্বাস, রাজপুরুষ ও প্রজাপুঞ্জ—উভয় সম্প্রদায়ের মধোই অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। যে-সকল খেতাজ সবুট লাথি মারিয়া গরিব ভারতবাসীর প্রাণবধ করেন এবং যে-সকল খেতাজ রাজপুরুষ রাজা রামচন্দ্রের বিচারাসনে বসিয়াও স্বজাতিপ্ৰীতিতে অন্ধ হইয়া ভারতবাসীর বিবর্জিত প্ৰীহার দোহাই দিয়া বিচারে বিভ্রাট ঘটাইয়া নরহত্যার অপরাধ অস্বীকার করেন, উড়াইয়া দেন, এ দেশের অসন্তোষ অবিশ্বাসের অগ্নিতে তাঁহারা সামান্ত ইন্ধন প্রদান করিতেছেন না। দস্যু, তস্কর, লম্পট সকল দেশেই আছে, তাহারা নিশ্চয়ই দেশের কলঙ্ক ও পাপ। পথে ঘাটে রেল স্টামারে কোন খেতাজ কোন ভারতীয় মহিলার ধর্ম্মনষ্ট করিলে তাহার অপরাধে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে নিন্দা করা নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু সেই অপরাধী, খেতচক্ষী বলিয়া, যদি ইউরোপীয় বিচারকের নিকট বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করে কিংবা অসঙ্গত লঘু-দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে সেই বিচারক ভারতবর্ষের বিচারাসনে বসিবার অযোগ্য এবং দেশের অশান্তি ও অসন্তোষ বৃদ্ধির তিনিও একজন সহায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যুগের ভারতীয় মোসলমান রাজপুরুষগণ এ যুগের ইউরোপীয় রাজপুরুষগণ অপেক্ষা বুদ্ধি, বিবেচনা, রাজনীতিজ্ঞতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে অনেকটা হীন ছিলেন বলিয়া। এখনকার অনেকের ধারণা। শ্রীকৃষ্ণাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি হিন্দুর কোন কোন পুণ্য তীর্থে সে যুগের মোসলমান রাজপুরুষেরাও গোবধ, এমন কি কোন কোন স্থানে কোনও প্রকারের জীবহিংসা এবং বৃক্ষ-

চ্ছেদও অকর্তব্য মর্শ্মপীড়াকর ভাবিয়া, যাহাতে কোন মোসলমানও এরূপ কোন গর্হিত কার্য না করিতে পারে সেজন্য, সুস্পষ্ট নিষেধ ঘোষণা করিয়া সকলকেই সেই বিধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিতেন। এখনকার সকল রাজপুরুষ সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত প্রজার মনোবেদনা যাহাতে না জন্মিতে পারে এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিলে অযোধ্যায় গোবধের ঞায় ব্যাপার এ যুগে সংঘটিত হইতে পারিত না। শ্রীশ্রীব্রজধামের নিষিদ্ধ ভূখণ্ডে সে দিন এক নিরীহ প্রকৃতির ব্রজবাসী বৈষ্ণবের সমতুল্যপালিত হরিণ বধ করিয়া এবং অবশেষে সেই বৈষ্ণবেরও প্রাণবধ করিয়া যে ইংরাজ সৈনিক বৃটিশ বাহিনীর উপর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিল তাহার কাহিনী এবং তাহার বিচার-কাহিনী—উভয়ই ভারতবাসীর মনে অশান্তি, উদ্বেগ, আশঙ্কা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে ভিন্ন বিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই। কানপুরের মছলি-বাজারের মসজিদ সম্পর্কিত শোচনীয় ব্যাপারের পরিশেষে দূরদর্শী ও সহৃদয় বড়লাট লর্ড হার্ডিং বাহাদুর যে সমুদ্বির পরিচয় দিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন ঐ ব্যাপারের আদিতে কিংবা মধ্যভাগে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, এমন কি ছোট লাট মেজ্টন বাহাদুর তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলে এই দেশব্যাপী মর্শ্মবেদনার কদাচ উদ্ভব হইত না।

প্রজাবর্গের সন্তোষ যে শতকোটি সৈন্তের শারীরিক বল ও শতকোটি আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও অধিকতর আবশ্যক সকলে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইংরাজ রাজত্বের কর্ণধারকুলের কেহই যদি তাহা উপলব্ধি না করেন, তবে তাহা নিতান্তই পরিতাপ ও অনিষ্টের কারণ বলিতে হইবে। এদেশের শিক্ষা-সংস্কারে রাজপুরুষদিগকে সৈন্ত-সংস্কার অপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইতে দেখিলে, সকলেই সমস্বরে রাজপুরুষদের প্রশংসা করিবে। দেশে পুলিশ এবং গোয়েন্দা-পুলিশের সংখ্যা এবং পোষণব্যয় দিন দিন অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষাবিস্তার-কল্পে সেই টাকাগুলো ব্যয় করিলে দেশ প্রকৃত লাভবান হইতে পারিত। গুপ্তপুলিশ এবং পিউনিটিভ পুলিশ রাখিয়া

গবর্ণমেন্টের কিছু লাভ হইয়া থাকিলেও তদ্বারা দেশের অপকারও কম হইতেছে না।

মোসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশের মনের ভাব ও বিশ্বাস অতি অল্প দিন পূর্বেও অগুরুপ ছিল। তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাসে যদি কোন কারণে কেহ নিদারুণ প্রচণ্ড আঘাত করেন, তবে তাঁহাকে আমরা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও সাত্রাজ্যের সুহৃদ বলিতে পারিব না। হুংখের বিষয় সম্প্রতি ডাঃ সুহাবর্দী ও আবহুল রশুল সাহেবদের অধ্যাপকপদে নিয়োগে গভর্নেন্ট আপত্তি করিয়াছেন এবং বিলাতে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মহম্মদআলী ও শ্রীযুক্ত ওয়াজির হোসেন সাহেব যেরূপ অপ্রত্যাশিত রুশ্ব ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহাতেও দেশের শিক্ষিত হিন্দু মোসলমান খৃষ্টান—জনসাধারণের আশা বিশ্বাস অনেকটা লাঘব হইয়াছে, কেহ কেহ উদ্বিগ্ন হইয়াছে। বিলাতের স্টেট সেক্রেটারী এবং প্রধান মন্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশাল মোসলমান-সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নানা হুংখ ও অভাবের কথা মিলে দান করিতে পারিতেন। বৈধ আন্দোলনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। অভিযোগের প্রতিকার ফেরা সরকার বাহাদুরের পক্ষে সম্ভবপর কিনা তাহা তাঁহাদেরই বিবেচনা ও ইচ্ছাধীন। কিন্তু ব্যথিত-হৃদয়ে প্রজাদের কোন পদস্থ প্রতিনিধি যদি রাজপুরুষ-গণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিবারও অধিকার প্রাপ্ত না হয়, তবে সে মর্শ্ববেদনা এ সংসারে আর কে দূর করিতে পারে ?

বৈধ আন্দোলনের সফলতায় শিক্ষিত প্রজা-সাধারণের আশা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলা ও কার্য করা গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য। শাসন ও বিচারবিভাগের পার্থক্য-সাধন, মুদ্রায়ন্ত্রবিধানের কঠোরতা হ্রাস, দেশের ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সদস্যগণের প্রকৃত কার্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া প্রকৃতরূপে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ, প্রভৃতি বিষয়ে এদেশের হিন্দু মোসলমান, সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিক্ষিত-সমাজ-শিরোমণিদের প্রায় সকলেরই এক মত। এ-সকল বিষয়ে কংগ্রেস ও মোস্লেমদিগের মত এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের এরূপ বিরাট, বিশাল বৈধ আন্দোলন ফলপ্রদ না হওয়ায় দেশবাসীর মনে শান্তি ও আশা বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে কি প্রকারে ? ইংরাজ রাজপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞদিগের এ-সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রতিকারযোগ্য বিষয়সমূহের সহর সংস্কার ও সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত দেশের বুদ্ধিমান ও ধর্মভীরু ব্যক্তিবর্গের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকা অসম্ভব বলিয়া আমরাদিগের বিশ্বাস। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে নিশ্চুল করিতে পারিলে দেশবাসী সুখে শান্তিতে নিরুদ্ধেগে দিনযাপন করিতে পারিবে, এ কথাও সকলে বিশ্বাস করে। দেশের লোক সাধ্যানুসারে গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিতে সর্বদা ইচ্ছুক। কিন্তু তাহাদের কার্যপ্রণালীর বিষয়ে এত চেষ্টা করিয়াও গবর্ণমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারী-বর্গ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। তথাপি যাহারা, দেশবাসী যথোপ-যুক্তরূপে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সহায়তা করিতেছে না, এরূপ মনে ভাবেন, আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নির্দোষ কিংবা নিরপেক্ষ, এরূপ বলিতে পারি না। প্রকৃত দোষীকে নিরাকরণ করিতে অক্ষম হইয়া মিরপরাধ প্রজাসাধারণকে সৈন্যসমাবেশের ভয়ে আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন করাও আমরা সঙ্গত মনে করি না। এ যেন ছোট ডাকাতে বদলে বড় ডাকাত লেলাইয়া দেওয়া। ডাকাতে বন্দুক রিভলভার প্রভৃতি ভীষণ প্রাণনাশক আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া নিরস্ত্র নিরীহ-প্রকৃতির গ্রাম্যলোকগুলিকে মেঘশাবকের ন্যায় অক্ষম পাইয়া অত্যাচার করিতেছে। তাহার উপর সৈন্য সমাবেশে আতঙ্ক বৃদ্ধি না করিয়া যাহাতে প্রতি সমৃদ্ধ পল্লীতে অন্ততঃ ২১জন লোকের বাড়ীতে রিভলভার ও কার্তুজ বন্দুক রক্ষিত হয় গবর্ণমেন্ট তাহার উপায় করুন। অস্ত্র-আইনের কঠোর বিধানগুলি পরিবর্দ্ধিত হউক। বিপৎকালে গ্রামের যে-কোন সাহসী সুদক্ষ-

ব্যক্তি যাহাতে গ্রামের অন্যকীয় আশ্রয়স্থ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ নির্ভয় প্রাপ্ত না হইলে এবং গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহজে বন্ধুকে রিতলভারের লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইলে, ডাকাইতদিগকে প্রতিরোধ করা ত দূরের কথা, তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাদের দলের দুই এক জনকে আহত করিতেই বা কে সাহসী বা সক্ষম হইতে পারে? অস্ত্র-আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি করায় দেশে বন্ধুকাতির লাইসেন্স ও সংখ্যা ক্রমে অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে কোন কোন স্থলে হিংস্র পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং কোথাও কোথাও মনুষ্যও হিংস্র জন্তুর দ্বারা নিহত হইতেছে, অপর দিকে দস্যু ডাকাইতদিগেরও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে।

দেশের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপও বলিতেছেন যে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র পরিবারের বালকেরা ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে অক্ষম হইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। অর্থোপার্জননের উপযোগী কার্য্যকরী কোনশিল্প বাণিজ্যের শিক্ষাও কেহ সহজে প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহার ফলে দেশের দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের অননুস্থান-সমস্তা দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। এ কারণেও কোন কোন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ভদ্রসন্তান জীবনে নিরাশ হইয়া ডাকাতের দলে যোগ দিতেছে। তাহাদের এ অনুমানও যে একেবারে মিথ্যা, তাহাই বা কে কি প্রকারে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন। ধর্মশিক্ষাবিহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে ইউরোপ আমেরিকা এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, সফরেজিষ্ট প্রভৃতির সংখ্যাধিক্য ও তাহাদের ভীষণ লোমহর্ষণকর নানা অনুষ্ঠানে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে-সকল দেশের সমাজ ভীষণ অশান্ত-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শুনিতে পাই সে-সকল দেশের অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব যুবক যুবতীও এখন অপরাধ-ব্যবসায়ীদের দলবৃদ্ধি করিতেছে—অনেক বি-এ, এম-এও নাকি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করিতে বিন্দুমাত্র বিধা বা ভয় মনে করিতেছে না। এ দেশে জাতীয় প্রধান জাতীয় ভাব রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে

যাহারা জাতীয় শিক্ষার প্রচারের জন্ত প্রয়াসী হইয়াছিলেন, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে প্রীতি ও বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিতে পারেন নাই। তাই মফঃস্বলের অধিকাংশ নেশনেল স্কুল অকালে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া গেল—কলিকাতাস্থ নেশনেল স্কুল ও তৎসংসৃষ্ট শিল্প-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের অবস্থাও উৎকৃষ্ট কিংবা আশাজনক নহে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়ও বহুদিন গবর্নমেন্টের নিকট সন্দেহের চক্ষে অবলোকিত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত “হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়” এবং “মোসলমান বিশ্ববিদ্যালয়” গবর্নমেন্টের নিকট যথোপযুক্ত উৎসাহ ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেছে না ও পারিবে না বলিয়া, দেশের শিক্ষাসংস্কার-প্রয়াসী বহু হিন্দু ও মোসলমানের এখন ধারণা। এ দেশের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের জন্ত গবর্নমেন্ট তেমন কিছু করিতেছেন না বলিয়া যাহারা অভিযোগ করেন, মহামতি তাতার প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের কার্য্যে গবর্নমেন্টের ধীর-মহুর-গতি দেখিয়াও তাহারা সামান্য দুঃখিত নহেন। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কত শত বি-এস্ সি, এম্-এস্ সি, কত শত এল্-সি-ই, বি-সি-ই উপাধি পাইল, কিন্তু শিল্প বিজ্ঞান চর্চা দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে তাহারা ঠিক যেন হস্তপদবিহীন অক্ষম পদার্থ - শ্রীক্ষেত্রের “মুলো জগন্নাথ”। অক্ষ কসিয়া তাহারা দিনে শতবার এই পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র টাইমপিস বড়ীর জু বদলাইয়া দিবারও তাহাদের কোন শক্তি নাই। দেশের শিল্প বাণিজ্যকে এ ভাবে পঙ্গু করিয়া রাখায় দেশ দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইতেছে, শিক্ষিত প্রজাসাধারণের মনে ততই নিরাশা বর্দ্ধিত হইতেছে।

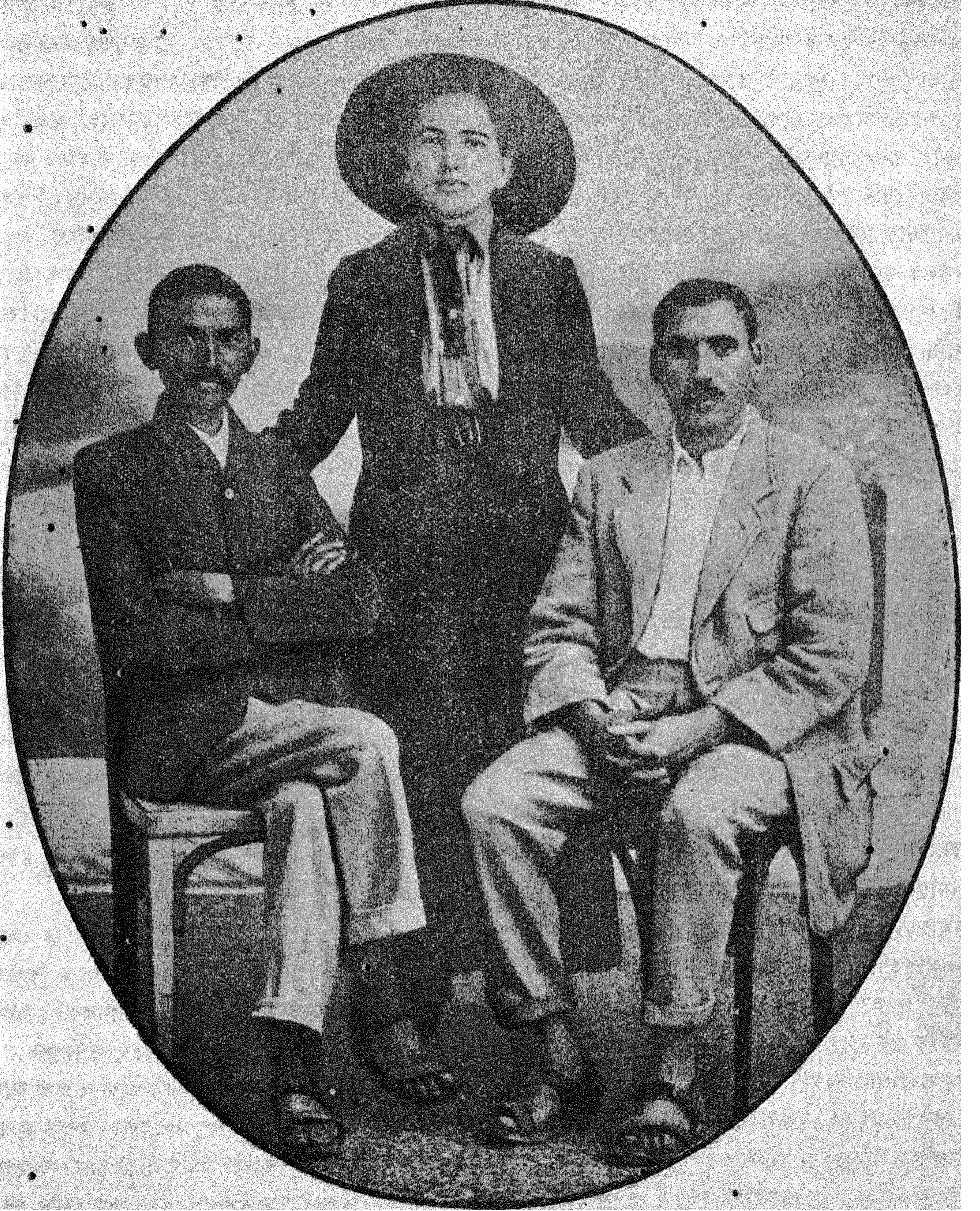
আমাদের দেশের সকল ছাত্রকেই এখন রাজপুরুষেরা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া গবর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে স্কুলের ইন্সপেক্টর হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষকদিগকে পর্য্যন্ত গোয়েন্দার কার্য্য করিতে হইতেছে। ইহাতে ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে হৃদয়তা জন্মিবার অবকাশ ঘটিতেছে না এবং শিক্ষা-কার্য্যেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই সেদিন ঢাকার

কমিশনের মাদারীশের স্কুলের ছাত্রদের প্রদত্ত মালা গ্রহণ করিলেন না—ইহাতে কোমলমতি ছাত্রদের জাতিসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে যদি তাহাদের মনে অসন্তোষের বীজ উদ্ভূত হয় তবে তাহার জন্ত দায়ী তাহারা বা তাহাদের শিক্ষকেরা বা অভিভাবকেরা নহে, দোষী অপরিণামদর্শী সন্ধিষ্ণু-প্রকৃতি রাজপুরুষেরাই। ছাত্র নামাই যে ছর্তু এ সংস্কার দেখিতেছি আজকালকার অনেক রাজপুরুষের মনে বহুমূল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা যে কেবলমাত্র অপকর্ম করিতেই পটু এ বিশ্বাস ছাত্র, ছাত্রদের অভিভাবক ও রাজশক্তি কাহারই পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে যে ধর্মভাব ও পুণ্যকর্মের প্রেরণা কতখানি আছে তাহা বিগত বণ্ণাপীড়িতদের সেবার সময়ে দেখা গিয়াছে—এবং স্বয়ং বড়লাট হইতে সামান্য ইংরেজ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাহাদের সেবা-পটুতা ও কর্মকুশলতার প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক ইংরেজ আমাদের ছাত্রদের দেশসেবার ইচ্ছাকে রাজ-দ্রোহিতা মনে করিয়া ভুল করেন, এবং সেই ভুলের বশে সকলকেই এনার্কিষ্ট দলের অণুভুক্ত মনে করিয়া অবিশ্বাস করেন। ইহাতে নির্দোষী উৎপীড়িত হইয়া অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ভাগ্যবতী মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকাল কি মুখেই কাটিয়াছে! ইংরাজ জাতির প্রজাহিতৈষণা-বুদ্ধিতে তখন এ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। মহারানীর “ভারতসম্রাজ্ঞী” উপাধি গ্রহণ কালে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ-কালে, আমাদের মহীয়সী মহারানী ভিক্টোরিয়া, মাতৃজাতির স্বাভাবিক স্নেহদয়া-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া স্বহস্তে যে অভয়-ঘোষণা ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া এ দেশের সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশাষিত আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জনের ন্যায় যে-সকল রাজপুরুষ মহারানী ভিক্টোরিয়ার মহনীয় বাণীর অর্থসংকোচ করিতে চেষ্টা করিয়া ভারতবাসীর ভ্রম ধপনোদন করিতেছি বলিয়া মনে মনে বাহাদুরী করিতেছেন, এ দেশের অশান্তি, অবিশ্বাসের জন্য তাহারা সামান্য দোষী নহেন। ভারত-

বাসী জানিত, এবং এখনও অনেকে জানে যে, ইংরাজ “হাকিম নড়িলেও ছকুম নড়ে না।” কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয়, ইংরাজ রাজপুরুষ-প্রধানদের— এমন কি স্বয়ং সম্রাটের শ্রীমুখবিনিঃসৃত ঘোষণাবাক্যও যে সর্ব্বথা পালনীয় অমূল্যজনীয় সত্য নহে, তাহা কেহ কেহ সযত্নে সজোরে প্রচার করিতে ও তাহাতে ভারত-বাসীদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন। সেদিন সহৃদয় প্রজারঞ্জক সম্রাট পঞ্চম জর্জ মহোদয় এ দেশে আসিয়া যে-সকল সুধাসিক্ত শান্তিবাচন দ্বারা ভারত-বাসীদের হৃদয়স্বত শুশীতল করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবিভাগ রহিত-কালে সহৃদয় দূরদর্শী বড়লাট লর্ড হার্ডিং বাহী-ছরের গবর্নমেন্ট, স্ট্রেট সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট ডেসপ্যাচে এ দেশের “অটোনমাস্” বা স্ব-তন্ত্র গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যেরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় মঙ্গব্য প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করিলেন, তাহার অন্যথাচরণ করিয়া—নানা সংকীর্ণ ব্যাখ্যা ও কদর্থ করিয়া এখনকার কোন কোন রাজপুরুষ ও রাজজাতীয় ব্যক্তি ভারতবাসীর ভয় ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিতেছেন। ইংরাজ জাতির উদার অন্তঃকরণ, ন্যায়বিচারবোধ প্রভৃতিতে বিশেষ আস্থা থাকাতেই ভারতের শিক্ষিত সমাজে “ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসের” উৎপত্তি ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। সেই কংগ্রেসের জীবনী ও শক্তি যদি ক্রমশঃ সতেজ না হইয়া ত্রিয়মাণ হয়, তাহা কি এ দেশের, শুভ লক্ষণ? না তাহা ইংরাজ ও ভারতবাসীর মঙ্গলের কারণ?

উপসংহারে আমরা আবার বলিতেছি, এ দেশের বহু লোক আজও ভারতে ইংরাজ রাজত্বকে বিধাতার মঙ্গলময়-বিধান-প্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারত-বাসী ইংরাজ-শাসনাধীনে থাকিয়া ক্রমে উন্নততর হইয়া প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতে পারিবে, এ কথা অনেক শিক্ষিত ভারতসন্তান বিশ্বাস করেন। যাহাতে সেই আশা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া রাজা রাজপুরুষ ও প্রজাসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশের সকল শ্রেণীর নরনারীর সুখ শান্তি ও সম্ভাব বৃদ্ধি করিতে পারে, দেশের রাজপুরুষ ও প্রজা সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টাই



শ্রীযুক্ত গান্ধি, তাঁহার সেক্রেটারী কুমারী গ্লেসিং, এবং তাঁহার প্রধান সহকারী মিঃ ক্যালেনব্যাঙ্ক ।



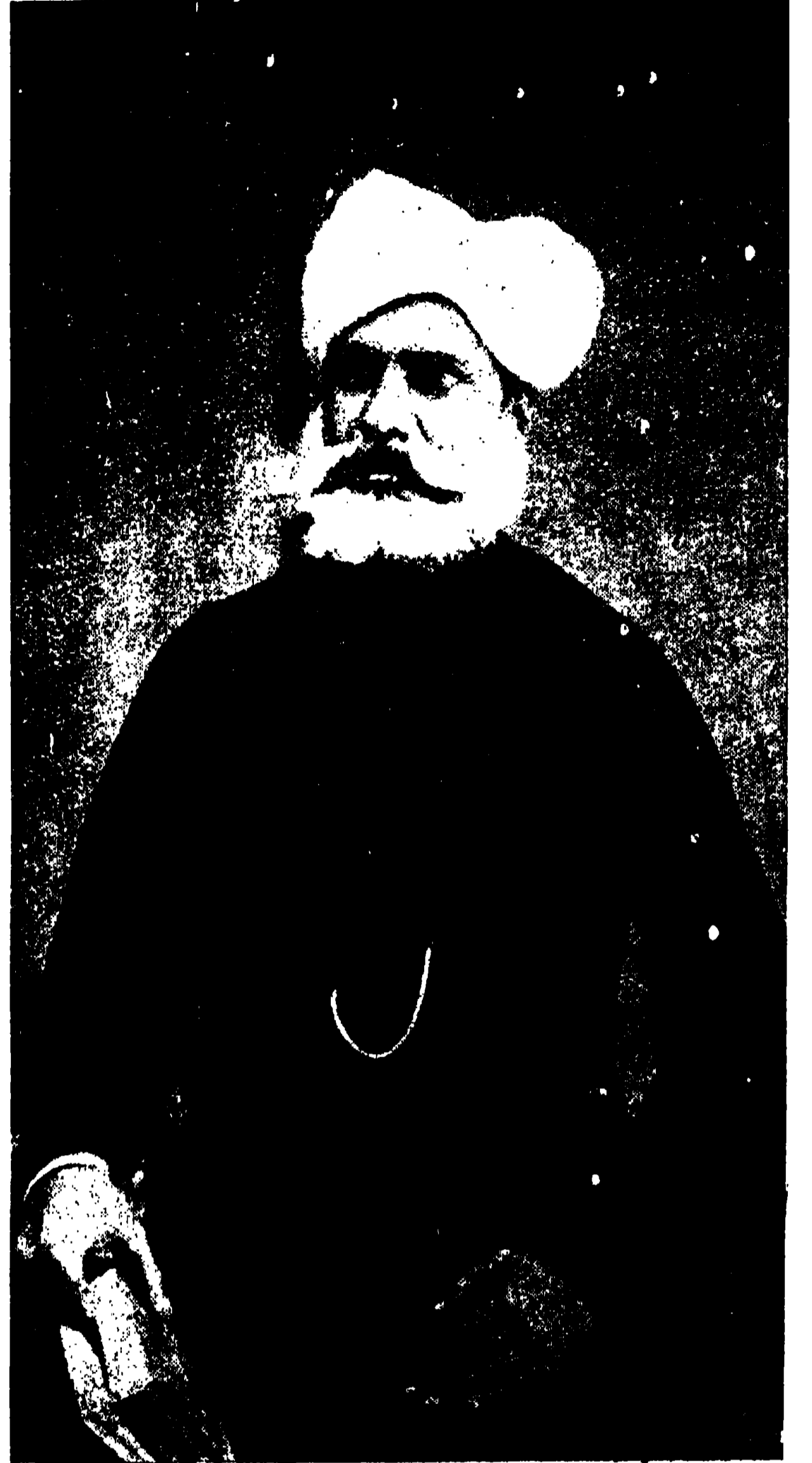
করুন। ভগবান্ কৃপা করিয়া সকলকে সুমতি দিয়া দেশের সুখ শান্তি স্বস্তি ও শুদ্ধি অচিরে প্রবর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন দেশ বড় কি ছোট তাহা দেশের বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব দ্বারাই নিরূপিত হয় না। শক্তির দ্বারাই মহত্বের বিচার। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও ওয়েলস্ লইয়া সম্মিলিত রাজ্য ( United Kingdom )। ইহার আয়তন ১২১৩৯১ বর্গ মাইল। কিন্তু এই ক্ষুদ্রদেশগুলির দ্বারা শাসিত বা উপনিবিষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ১১৪৯৮৮২৫ বর্গ মাইল। বিলাতের লোকসংখ্যা ৪৫৬৫২৭৪১; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২১:৭৮৯৬৫। অর্থাৎ সাড়ে চারি কোটি লোকের দ্বারা স্থাপিত সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২ কোটির উপর। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের আয়তন ১৭৭৩০৮৮ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা সাড়ে একত্রিশ কোটির উপর। যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অপমান নির্যাতনের কথা কাগজে পড়িয়া আমাদের হৃদয় মুহূমান ও মাথা হেঁট হইতেছে, সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের ( South African Union ) বিস্তৃতি ৪৭৩১৮৪ এবং লোকসংখ্যা ৫০৭৩৩৯৪ মাত্র। তাহার মধ্যে আবার শ্বেত মানুষের সংখ্যা ১২৭৬২৪২ মাত্র। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ শ্বেত মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিকার সাড়ে একত্রিশ কোটি ভারতবাসীর দ্বারা হইতেছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২ কোটির উপর। এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও এই ১৩ লক্ষ মানুষকে জোর করিয়া বলিতে পারিতেছে না, “তোমাদের বর্বর নিষ্ঠুরতা ও অশ্রদ্ধা আচরণ বন্ধ কর।” ইহার কারণ কি? উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক।

এ সব বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্রতর ঘরের কথাতেও দেখিতে পাই, লোকসংখ্যায় দেশকে বড় করে না,



শ্রী বাহাদুর দেওয়ান কৌরামুল চন্দনমল,  
ভারতীয় সমাজসংস্কারসমিতির সভাপতি।

অমুরাগ, উৎসাহ ও শক্তিতে বড় করে। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত বড় প্রদেশগুলিতেই হইয়াছে। এবার হইয়া গেল সিন্ধুদেশে। এই দেশটির লোকসংখ্যা মোটে ৩৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৩৫। এই সংখ্যাটি যে কত কম, তাহা বঙ্গের একটি জেলার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। নদের মৈমনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৪২২। সিন্ধুদেশের প্রধান নগর করাচী। তাহাও যে খুব বড় তা নয়। তাহার লোকসংখ্যা ১৫১৯০৩।



গোলাম আলি চাগলা,  
করাচী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।



রাজ বাহাদুর দেওয়ান তারাচাঁদ শৌকিরাজ,  
একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনের অভিযুক্ত সমিতির সভাপতি।

লোকসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষের সহরগুলির মধ্যে উহা সপ্তদশ স্থানীয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, আহমেদাবাদ, কাশী, বাদ্বালোর, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, পুনা এবং অমৃতসর উহা অপেক্ষা বড়। সত্য, করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কেবল কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের নীচে। তাহা হইলেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে এবার দেশী ব্যাঙ্ক অনেকগুলি ফেলু হওয়ায় করাচী এবং সমগ্র সিন্ধুদেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু দেশ ক্ষুদ্র হইলে বা লোকসংখ্যা কম হইলে কি হয়? যদি মানুষের মত মানুষ থাকে, যদি দেশ-হিতকর কার্যে অনুরাগ ও উৎসাহ থাকে, ভিতরে শক্তি থাকে, তাহা হইলে অল্পসংখ্যক লোকেও দুঃসাধ্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। সিন্ধুদেশেও তাহাই চলিয়াছে। কংগ্রেস, সমাজ-সংস্কার-সমিতি, শিল্পোন্নতি-

সমিতি, মাদক-বাবহার-নিবারণ-সমিতি, একেশ্বরবাদী-দিগের সম্মিলন, শুদ্ধিসভা, অবনত জাতিদিগের উন্নতি-বিধায়ক প্রচেষ্টা, ইত্যাদি নানাবিধ সভাসমিতির অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে করাচীতে হইয়া গেল। যুষ্টিমেয় উৎসাহী এবং দলবন্ধন-ও-স্বশৃঙ্খলকার্যনির্বাহ-শক্তিসম্পন্ন নেতার অধীনে অল্পসংখ্যক লোকের চেষ্টায় সমস্তই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

করাচী কংগ্রেসে তৎপূর্ববর্তী ঝাঁকিপুর ও কলিকাতা কংগ্রেস অপেক্ষা প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। অথচ গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালবীয়া, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতার মত বাগ্মীদের আকর্ষণে যে লোক গিয়াছিল, তাহা নয়; কারণ ইহার



মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর, করাচী কংগ্রেসের সভাপতি।

সকলেই অক্ষুপস্থিত ছিলেন। আর একটি আশার কথা এই যে এবার মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা শতাধিক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতি ততদিন দুর্ঘট থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ঐক্য না ঘটিবে, এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক ঝগড়া না মিটিবে। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের লোক যত প্রকারে একজোট হইয়া কাজ করেন, ততই মঙ্গল।

কংগ্রেসের বিরোধী ছদল লোক দেখা যায়; একদল ভারতপ্রবাসী শ্বেতকারেরা, অন্যদল ভারতবাসী সমালোচকবর্গ। শ্বেত মনুষ্যেরা কখনও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উপহাস বিক্রম করিয়া কংগ্রেসকে উড়াইরা দিতে চাহিয়াছেন; কখনও বা তাহা অসম্ভব দেখিয়া শক্রতা করিয়াছেন ও উহার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছেন। এখন আর এক পুর ধরিয়াছেন যে ভারতসাম্রাজ্যের বড়

লাটের ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি বড় করা হইয়াছে; তাহাতে দেশের প্রতিনিধিরা দেশের কথা বলিতে পারে, অভাব অভিযোগ জানাইতে পারে; অতএব এখন আর কংগ্রেসের দরকার কি? এবং এই দরকার নাই বলিয়াই এবার বড় বড় নেতারা কংগ্রেসে যান নাই। বাস্তবিক কিন্তু গোথলে যান নাই কঠিন পীড়া বশতঃ। অতেরা কেন যান নাই জানি না। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদিই বা তাহা সত্য হইত, তাহাতেও বেশী আসিয়া যাইত না। কারণ ছুচার জন নেতার মতামত স্মৃতি অস্মৃতি সহিত কংগ্রেসের

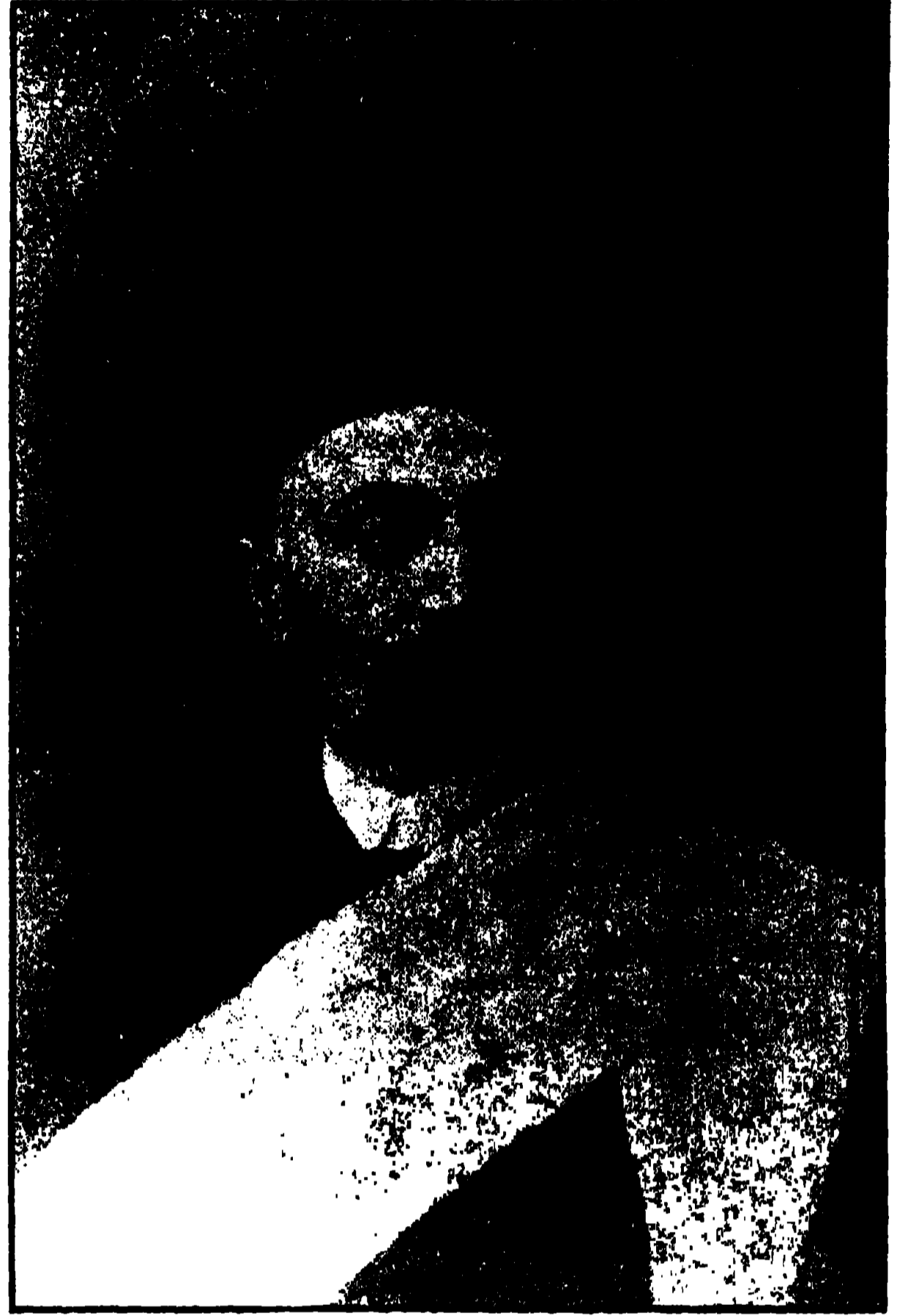


হাসারাম বিধিগদাস, করাচী কংগ্রেস কমিটির স্থায়ী সম্পাদক, ভারতীয়, সমাজ-সংস্কার-সমিতির এবং একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনের সম্পাদক।

ভাগ্য জড়িত নহে। এখন, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বড় হওয়ার কংগ্রেস অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে কি না দেখা যাক। কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের; সুতরাং সমস্ত ভারতের লোক যে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভা, তৎসম্পর্কেই বিষয়টির আলোচনা করা যাক।



রাও বাহদুর দেওয়ান হীরানন্দ ক্রম সিং,  
শিল্পোন্নতিবিষয়ক সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।



মাননীয় লালুভাই শামলদাস,  
শিল্পোন্নতিবিষয়ক সমিতির সভাপতি।

গ্রেটব্রিটেন আয়ারলণ্ডের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চারি কোটি। এই সাড়ে চারি কোটি লোকের ব্যবস্থাপক সভার নাম প্যারলিমেণ্ট। তাহার যে অংশ পৌর ও জানপদবর্গের দ্বারা নির্বাচিত, তাহার নাম হাউস অব কমন্স। এই হাউস অব কমন্সের সভ্যসংখ্যা ৬৭০। ইহারা সকলেই নির্বাচিত। ভারতের বড়লাটের সভার সভ্যসংখ্যা লার্টসাহেবকে লইয়া ৬৮ জন। তন্মধ্যে ৩৬ জন সরকারী, ৩২ জন বেসরকারী লোক। এই ৩২ জনও আবার সকলে নির্বাচিত নহে। যদি এই ৩২ জনের প্রত্যেককেই প্রজাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও তুলনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতী সাড়ে চারি কোটি লোকের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার চালাইবার জন্য ৬৭০ জন প্রতিনিধির দরকার, পঞ্চাশত্রে ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের রাষ্ট্রীয় কার্য চালাইবার জন্য ৩২ জন প্রতিনিধির

দরকার। সুতরাং কেহ যদি বলে যে বড়লাটের সভায় কতকটা প্যারলিমেণ্টের কাজ চলিতেছে, আর কংগ্রেস আদি করিয়া আন্দোলনের প্রয়োজন কি, তবে তাহার কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। \* দ্বিতীয়তঃ, আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধিদের এবং বিলাতের লোকদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতার কথাটা ভাবুন। হাউস অব কমন্সের সভ্যদের আইন করিবার বা রদ্ করিবার, ট্যাক্স বসাইবার বাড়াইবার কমাইবার তুলিয়া দিবার, রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য টাকা মঞ্জুর নামঞ্জুর করিবার, একদলের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য দলের মন্ত্রিসভাকে শাসনক্ষমতা দিবার, রাজমন্ত্রীদিগের সর্ববিধ

\* যদি একথা উঠে যে ৬৭৪ জন হাউস অব কমন্সের সভ্য ৪২ কোটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীর প্রতিনিধি তাহা হইলেও আমাদের ৩২ কোটির প্রতিনিধি ৩২ না হইয়া আর ৫০০ হওয়া উচিত।



রাজ বাহাদুর বলচাঁদ দয়্যারাম,  
সমাজ-সংস্কার-সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।

কার্যের সমালোচনা করিবার, সকল বিষয়ে প্রশ্ন করি-  
বার, অধিকার আছে। আমাদের তথাকথিত প্রতিনি-  
ধিদের প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই নাই। তাঁহারা যদি সকলে  
সম্পূর্ণ একমত হন, তাহা হইলেও কোন নূতন আইন  
করিতে পারেন না, কোন পুরাতন আইন রদ করা দূরে  
ধাক, ঘূণাক্ষরেও তাহার পরিবর্তন করিতে পারেন না,  
কোন ট্যাক্স কমাইতে পারেন না, আমরা যে ট্যাক্স দি  
তাহার একটি পয়সাও কেমন করিয়া খরচ হইবে বা  
না হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিতে পারেন না, গবর্ণ-  
মেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন করিতে পারেন  
না, অনুমতি অনুসারে যে প্রশ্ন করেন তাহারও উত্তর  
দেওয়া না-দেওয়া গবর্ণমেন্টের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা  
গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে

পারেন বটে; কিন্তু ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে  
কখনও ব্যবস্থাপক সভা কতৃক গৃহীত হইতে পারে না।  
কারণ সরকারী সভ্যসংখ্যা ৩৬, বেসরকারী ৩২। যদিই  
বা ঘটনাক্রমে সরকারী সভ্য অনেকে অনুপস্থিত থাকায়  
বেসরকারীদের জিত হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রস্তাব অনু-



মাননীয় হরচন্দ্র রায় বিষ্ণু দাস,  
কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

সারে কাজ করিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য নহেন। এহেন  
দিল্লী-কা-লাড্ডু আমরাগকে দিয়া খেতকায়েরা বলিতে  
চান যে “আর কংগ্রেসে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা  
করিয়া কি হইবে? তোমাদের সব কথাই ত এখন  
বড় লাটের সভায় হইতে পারে।” \* এই লোকগুলির  
বোকা বুঝাইবার প্রয়াসের তারিফ বেশী করিব, না

\* বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা যে দেশের লোকের কিরূপ  
প্রতিনিধির কাজ করে, তাহার একটি খুব আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি।  
শ্রীমুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত  
করেন যে ১৯১০ সালের মুদ্রাবন্ধ স্বাধীন আইনে সার্বভৌম কিছু

যে-সব হিন্দু মুসলমান এহেন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য লইয়া প্রতিবেশিকনোচিত সম্ভাব ভুলিয়া যান, তাঁহাদের কাহার বোকাটির প্রশংসা অধিক করিব, বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশের লোকের মত কথায় ভুলিতে এমন জাতি আর ছনিয়ায় আছে কি? জিনিষটা আসলে কি তাহা তলাইয়া বুঝিলাম না, কিন্তু ভারতময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক-জন “অনারেব্ল” হইবেন, তাহা লইয়া বিবেচনের ঈর্ষ্যার গরল ছড়াইয়া পড়িল।

বিলাতের অধিবাসিবর্গের ষষ্ঠাংশ নির্বাচক। তথায় কি পরিমাণ ট্যাক্স দিলে, কত সম্পত্তির অধিকারী হইলে ও কতদিনের বাসিন্দা হইলে, প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেওয়া যায়, তাহা নির্দিষ্ট আছে। এ দেশে কেহ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বা ধনিশ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার নির্বাচনাধিকার না থাকিতে পারে। মুসলমানদের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে;—কেন, তাহার বিচার এখানে নিম্নয়োজন।

কংগ্রেসকে যে নিম্নয়োজন বলা হইতেছে, কংগ্রেস যে-সকল দাবী করিয়া আসিতেছেন, তাহার সমস্তই বা অধিকাংশই কি পাওয়া গিয়াছে? জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বা বহুবৎসরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে? রাজকার্য্যে জাতি ও রঙের ভেদ উঠিয়া গিয়া কেবল কার্য্যক্ষমতার আদর কি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? সৈনিকবিভাগে দেশীয় লোক কি উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছে? সিভিল সার্ভিস আদি পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ গৃহীত হইতেছে কি? দেশ মধ্যে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইয়াছে কি? বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করা হইয়াছে কি? সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে কি? দেশে প্লেগ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে কি? দেশীয় শিল্পসকলের বিনাশে দেশের দারিদ্র্য বাড়ি-

পরিবর্তন করা হউক। কিন্তু তাঁহার এস্তাবের বিপক্ষে হইল ৪০ জন, সপক্ষে কেবল ১৭ জন। অথচ কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ উভয়েরই পক্ষে অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এই আইন একেবারে উঠিয়া যাক। দেশের লোক চায় যে আইনটা উঠিয়া যাক, ব্যবস্থাপক সভায় কিন্তু সাতাশ একটু পরিবর্তনের প্রস্তাবও গ্রাহ্য হইল না। আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধি বেসরকারী সভ্যরাও সকলে সুরেন্দ্র বাবুর সপক্ষে ভোট দেন নাই।

তেছে। সর্বত্র শিল্পশিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে কি? দেশজাত কার্পাসবস্ত্রের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি? এইরূপ আরও কত প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

দেশীয় সমালোচকেরা বলেন যে একটি বার্ষিক তিন দিনের তামাসা করিয়া কি লাভ? প্রথম উত্তর এই, যে, কংগ্রেস ত বলে না যে তোমরা কেবল তিন দিনই রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিবে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করিতে কংগ্রেস নিষেধ করে না, বরং করিতেই বলে। সৎসর যে, কাজ হয় না, সে দোষ দেশের লোকের; কংগ্রেসের নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে বর্ষান্ত্রে কেবলমাত্র একবারও সমস্ত দেশের লোকদের কি অভাব ও দাবী তাহা একপ্রাণে অনুভব করা এবং বলার মূল্য আছে ও আবশ্যিক আছে। তদ্বিন্ন, এই যে সমগ্র ভারতের নানা ভাষাভাষী বিচিত্রপরিচ্ছদধারী বিভিন্নধর্মাবলম্বী বহুজাতীয় মনুষ্যের তিন দিনের জ্ঞাও একত্র সমাবেশ, একত্র বাস, একত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, পরস্পর কথোপকথন ও বহুত্বপাশে আবদ্ধ হওয়া, ইহা কি একজাতিত্ব-বোধ বৃদ্ধি করে না? নিশ্চয়ই করে। কংগ্রেস আর কিছু না করিয়া থাকিলেও যে দূরের মানুষকে নিকট এবং পরকে আপন করিবার সাহায্য করিয়াছে, ইহাতেই তাহার জন্ম ও অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

দেশীয় সমালোচকদিগের দ্বিতীয় অক্ষপত্তি এই যে কংগ্রেস কেবল আবেদন প্রার্থনাই করেন, স্বাবলম্বন করেন না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে কংগ্রেস এমন অনেক বিষয়ে আবেদন করেন, যাহাতে আবেদন ভিন্ন আর কিছু করা যাইতে পারে না। আমরা খুব স্বাবলম্বী হইলেও নিজেই জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারি না, সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ চালাইতে পারি না, কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে পারি না, বিচার ও শাসনবিভাগ স্বতন্ত্র করিতে পারি না। সত্য বটে, দেশ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আমরা নিজেই অনেকদূর করিতে পারি, নানা শিল্পেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারি,

দেশের স্বাধীনতার উন্নতির চেষ্টাও অল্পস্বল্প করিতে পারি।  
এরূপ চেষ্টা দেশে যে একেবারে হইতেছে না, তাহা  
নয়; কংগ্রেস যে এরূপ চেষ্টার বিরোধী, তাহাও নয়।  
স্বাবলম্বন-সমর্থক প্রস্তাব কংগ্রেসে ধার্য হইয়াছে।  
কিন্তু গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকে এই-সকল বিষয়েও  
সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেও  
হয়। যতদূর দেশভক্তি, উৎসাহ, ঐক্য, একাগ্রতা,  
অধ্যবসায় এবং কার্যশক্তি থাকিলে গবর্ণমেন্টের সাহায্য  
ব্যতিরেকেও এই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, সে পরিমাণে  
ঐ-সকল গুণ আমাদের থাকিলে দেশ পরাধীন হইত  
না; যখন ঐ-সকল গুণ আমরা সাধনা দ্বারা লাভ  
করিব, তখন আর অধীনতাও থাকিবে না।

আর এক কথা এই যে স্বাধীন দেশের লোকেরাও  
তাহাদের গবর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত আবেদন করে;  
প্রভেদ এই যে তাহাদের ভাষাটা আমাদের চেয়ে  
পুরুষোচিত। ইহার উত্তরে দেশীয় সমালোচকেরা বলি-  
বেন, স্বাধীন গবর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করায় হীনতা  
নাই, এবং এরূপ আবেদন বাস্তবিকই দাবী। ইহা সত্য  
কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পরাধীন হই-  
লেই মানুষকে মনুষ্য হারাইতে হইবে, বা মানুষের  
জন্মগত অধিকারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এমন  
কোন স্বাভাবিক নিয়ম নাই। আমাদের আবেদন-  
সমূহকে ভিন্না বলিয়া মনে করি কেন? তাহাও বাস্তবিক  
দাবী। সত্যবটে, প্রার্থনাই বলুন আর দাবীই বলুন,  
সরকার তাহা অগ্রাহ করিলে আমরা জোর করিয়া  
সরকারের নিকট হইতে আমাদের অভীষ্ট আদায়  
করিতে পারি না। কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকদের  
দাবীও অগ্রাহ হইলেই কি তাহারা কথায় কথায় বিদ্রোহ  
করে? তাহারাও ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকে।  
তাহারা ধর্মঘট আদি নিঃশস্ত প্রতিরোধ (passive  
resistance) দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করে বটে। দক্ষিণ  
আফ্রিকার ভারতবাসীদের কথা বলিতে গিয়া বর্তমান  
বড়লাট তরুণ উপায়কে প্রকারান্তরে বৈধ বলিয়া স্বীকার  
করিয়াছেন। সুতরাং প্রয়োজন হইলে ইহাও ভারত-  
বাসীর পক্ষেও অবৈধ বিবেচিত না হইতে পারে।

তাহার পরম্পরাহারা আপনাদিগকে আশঙ্কালিষ্ট বলেন,  
তাহাদের এই এক আপত্তি আছে যে সুরাটে কংগ্রেস  
ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর প্রকৃত “জাতীয়” কংগ্রেস নাই,  
উহা একটা দলের জিনিষ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে  
মতভেদ দেখা যাইতেছে। আশঙ্কালিষ্টগণ যাহাদিগকে  
নিজ দলের নেতা মনে করিতেন, তন্মধ্যে অন্ততম শ্রীযুক্ত  
লাজপৎ রায় এবার কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং,  
শুনা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা তাহারই হইয়াছিল। আর  
যদি আজকাল কংগ্রেস একটা দলেরই হইয়া থাকে, তাহা  
হইলেও উহা একটা অবাস্তব আপত্তি মাত্র। সকলে  
পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়মাবলী  
বদলাইয়া লওয়া অসম্ভব নহে।

কোন চিন্তাশীল লোকেই এরূপ মনে করিতে পারেন  
না যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারাই দেশের  
উন্নতি হইতে পারে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, প্রভৃতি নানা  
বিষয়ে আমাদের মন দেওয়া দরকার। আমরা যেমন  
বায়ুসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছি, বায়ু ব্যতিরেকে বাঁচিতে  
পারি না, অথচ সকল সময়ে একথা মনে থাকে না;  
তেমনি আমাদের সর্ববিধ উন্নতিচেষ্টার মূলে একটি  
বিশ্বাস আছে যাহা আমরা চিন্তা করিলে ধরিতে পারি,  
কিন্তু অল্প সময়ে তাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া থাকি। চেষ্টা  
করিলে উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়; সাধনার দ্বারা  
সিদ্ধি লাভ হয়, বারম্বার অকৃতকার্য হইলেও নিরাশ  
হইবার কারণ নাই,—মানুষের যে এবিধ নানা ধারণা  
আছে, তাহার ভিত্তি কি? ভাবিলেই বুঝ যাইবে যে ইহার  
ভিত্তি এই যে বিশ্ববিধাতা মঙ্গলবিধাতা, মঙ্গল প্রতিনিয়ত  
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং মঙ্গলই জয়যুক্ত হইবে। বিশ্ব-  
ব্যাপারের গতি পূর্ণ মঙ্গলের দিকে। এইজন্য রাষ্ট্রীয়,  
সামাজিক প্রভৃতি সর্ববিধ সংস্কারকার্যে মানুষ যখন  
প্রাণ দিয়া লাগে, তখন কোন বাধা, উৎপীড়ন, অকৃত-  
কার্যতাই গ্রাহ্য করে না। তখন মানুষ জানে যে বিফল  
প্রয়াসই সাফল্যের সোপান, আপাতপরাজয় শেষ জয়ের  
পথপ্রদর্শক। যাহা হইতে মানুষের চেষ্টার ফল আসে,  
তাহার নাম মানুষের দর্শনশাস্ত্রে মানা রকম রাখা

হইয়াছে; কিন্তু ফলদাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই;—তাহাকে পুরুষই বলুন বা শক্তিই বলুন। ফল কখন কি আকারে পাইব, জানি না, কিন্তু ফল পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে কেহই কোন চেষ্টা করিত না।

এইহেতু যাহারা মানুষের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় ও উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা বাস্তবিক সর্ববিধ সংস্কার-প্রয়াসের মূলে জল সেচন করেন। ইহা হইতে অগ্ৰাণ্ণ বার্ষিক সভার সঙ্গে সঙ্গে একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনের আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

করাচীতে যেমন কংগ্রেস আদির অধিবেশন হইয় ছিল, তেমনই আগ্রাতে মুসলমান-শিক্ষা-সভা এমোস্লেম লীগের অধিবেশন হইয়াছিল। এমোস্লেম লীগ এবং কংগ্রেস উভয়েরই সভাপতি মুসলমান। এমোস্লেম লীগের সভাপতির বক্তৃতা অধিকতর তেজোগর্ভ স্পষ্ট কথায় পূর্ণ ছিল। কেবল একটি ছাড়া আর সব বিষয়ে উহা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের মতামতমুখ্য হইয়াছিল। সেই বিষয়টি এই যে ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতিনিধি কেবলমাত্র মুসলমানদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হইবে। এ বিষয়ে ঝগড়া বা তর্কের ভাব হইতে কিছু বলা মোটেই আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিছুদিন হইতে মুসলমানদের নেতারা “একীভূত ভারতবর্ষের” (United India) আবশ্যিকতা প্রচার করিতেছেন। আমাদের ধারণা এই যে এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উহারই দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাচনের প্রথা, এবং “একীভূত ভারতবর্ষ,” এ দুটা জিনিস পরস্পরবিরোধী। এক মামে এক, দুই নহে। দেশের সেবা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। মুসলমানেরাও যে স্বদেশের সেবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু হিন্দু প্রতিনিধি যেমন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান আদি সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন হইয়া নির্বাচিত হন, ইহাই বাঞ্ছনীয়, মুসলমান প্রতিনিধিরও তেমনভাবে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব ও পক্ষপাতবশতঃ হিন্দুরা অধিকাংশ স্থলে

প্রতিনিধিত্বপ্রার্থী মুসলমানকে ভোট দিবেন না। কিন্তু মুসলমান যোগ্যতা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় দিলেও হিন্দু তাহাকে কখনও ভোট দিবেন না, বিরুদ্ধভাবে চিরস্থায়ী হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতেও যে আমরা একজাতি হইব, এ আশা ত্যাগ করিতে হয়। হিন্দু যোগ্য পারসীকে ভোট দেয়, যোগ্য খৃষ্টিয়ানকে ভোট দেয়, আর যোগ্য মুসলমানকে ভোট কখনই দিবে না, ইহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। তজ্জন্ম আমাদের ধারণা এই যে কিছুকাল যদি যোগ্য মুসলমানও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে না পারেন, এবং তজ্জন্ম মুসলমানেরা অসুবিধা ভোগ করেন, বরং তাহা ভাল, কিন্তু, মুসলমানদের পক্ষে অধিকতর রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বা অণু কোন ওজুহাতে, স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট চাওয়া উচিত নহে। লর্ড মিণ্টো হিন্দু মুসলমানে ভেদ জন্মাইবার জন্য এই ব্যাপারের সূত্রপাত করেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই জানে ও বুঝে।

আমি যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের লোক হই যাহাকে লোকে অণায়রূপেও অবিশ্বাস করে, তাহা হইলেও আমি স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার চাহিব না, আমার ব্যবহার দ্বারা জীবন দ্বারা এই অবিশ্বাসকে বিনষ্ট করিব, দূর করিব, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইবে।

সুখের বিষয় আগা খাঁ, মোহাম্মদ আলি, প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ এবার এমোস্লেম লীগের অধিবেশনে স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে বলেন। তাহাদের মত অধিকাংশের মতে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু আশা আছে যে উহাই কালে অধিকাংশের মত হইবে।

মুসলমানগণ এইরূপ একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন, যে, “গোবলিদান বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যেন হস্তক্ষেপ না করেন; হিন্দু মুসলমান আপোষে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।” ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বিবাদ নিবারণের ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কি হইতে পারে? কারণ, মানুষকে আইনের জোরে যাহা করান যায়, বা যাহা



হইতে নিরন্তর রাখা হয়, তাহা মনের মধ্যে আঙনের স্মৃতি রাখিয়া দেয়। সুযোগ পাইলেই তাহা জলিয়া উঠে। কিন্তু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যাহা হয়, তাহাতে এ প্রকারের কুফল জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। মুসলমানেরা এই বিষয়টিতে যেমন পরস্পরসম্মতিসাপেক্ষ বন্দোবস্তের মূল্য বুঝিয়াছেন, নির্বাচন বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিলে সকলের বাঞ্ছিত সুফল ফলিবে। আপোষে গো-বলিদানের মত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা যদি হইতে পারে, তাহা হইলে নির্বাচনাধিকারের মত সামান্য ব্যাপারের মীমাংসাও হইতে পারে।

যদি ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সভ্যই মুসলমান হন, তাহাতেও আমরা তাঁহাদের সঙ্গে বগড়া করিব না; আমাদের দীর্ঘ্যাও হইবে না। কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের বা সমস্ত জাতির মঙ্গল হইবে, বা তদ্বারা ভারতবর্ষের একীভবন নিকটতর হইবে। আমরা ব্যবস্থাপক সভাগুলির মূল্য জানি। ইহা বুঝি যে ইংরাজ কোন শক্তি আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। দেশের সেবা করিবার অধিকার ও ক্ষমতা মাহুষে দিতে পারে কি? উহা অনেক তপস্বী করিলে সাধনা করিলে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিলে ভগবানের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত পোলাকের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাইয়াছেন :—

“Mrs. Gandhi has come from the prison almost irrecognisably altered owing to the refusal of special diet. In the early stages, imprisonment reduced her to a skeleton, in appearance a tottering old woman: heart-breaking sight.”

“জেলের কর্তৃপক্ষ বিশেষ খাদ্য দিতে অস্বীকার করায় শ্রীমতী গান্ধিজায়ী জেল হইতে এরূপ চেহারা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, যে, তাঁহাকে প্রায় চেনা যায় না। কারাদণ্ডভোগের প্রথম অবস্থাতেই তিনি শীর্ণ হইয়া কঙ্কালসার হইয়াছিলেন। তাঁহাকে চলৎ-শক্তিহীন বৃদ্ধার মত দেখাইতেছে;—হৃদয়বিদারক দৃশ্য।”

শ্রীযুক্ত গান্ধি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র; ব্যারিষ্টারী করিয়া বৎসরে প্রায় একলক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণী আর এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীর কন্যা। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিতা এই মন্ত্রিকন্যা মন্ত্রিসুখা ভারতীয় জাতির ও ভারতনারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় জেলে গিয়াছিলেন। তথায় কাফির পাক-করা অনভ্যন্ত কদর্যা খাদ্য খাইতে না পারিয়া, জেলের কাফির রক্ষীদের অপমান ও অত্যাচার সহ করিয়া, অনভ্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া, তিনি কঙ্কালসার হইয়া কারাগার হইতে বাহির হইয়াছেন।

ভবিষ্যৎ-ভারতীয়-জাতির জননি, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার শীর্ণ দেহ হইতে যে রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে আমাদের মোহকুঞ্জটিকু কাটিয়া যাক, আমাদের জড়তা দূর হউক। তোমার দিব্য তেজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক; তদ্বারা আমাদের ভীকৃততা ও স্বার্থের বন্ধনরঙ্জু ভস্মীভূত হউক।

বঙ্গের জননী ও কন্যাগণ, যাহাদের অশন বসনের কোন ক্রেশ নাই, যাহারা সৌভাগ্যবতী, তাহারা তাঁহাদের এই পূজনীয়া ভগিনীর কথা, নিত্য, আহার আমোদ-প্রমোদের সময়, স্মরণ করুন। যাহারা দরিদ্র, যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্বাহিত হয় না, তাহারাও তাঁহাদের এই আরাধ্যা ভগিনীকে ভুলিবেন না। তাঁহাদের ক্রেশ আছে বটে, কিন্তু স্বদেশের জন্ত তপস্বীর কৃচ্ছ সাধন তাঁহারাও ত এমন করিয়া করিতেছেন না।

বঙ্গের পিতা ও পুত্রগণ, আপনারাও স্বচ্ছন্দে দিনান্তিপাত করিবার সময় ব্রতধারিণী তপঃক্লিষ্টা গান্ধিজায়ীর শীর্ণমূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন না।

পুরুষদের ভোগবিলাসের আয়োজন, নারীর বসন-ভূষণের আড়ম্বর, গান্ধি-জায়ীর শীর্ণমূর্ত্তির সম্মুখে কি অকিঞ্চিৎকর, কি শ্রীহীন, কিরূপ তুচ্ছ।

বঙ্গদেশ হইতে এখনও অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপীড়িত ভারতবাসীদের পাহা-যার্থে অল্প টাকাই গিয়াছে। বাঙ্গালী যে দাতা নহেন, তাহা ত ময়। তবে এমন কেন হইতেছে? অনেকে মনে করেন, কেবল ধনীদেরই দান করা উচিত। ইহা বড়

ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ ধারণা অনেক সময় স্বার্থপরতা-প্রসূত। এক আধ পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি যত পারেন, এবং যতবার পারেন, দান করুন। অর্থের পরিমাণে কিছু আসিয়া যায় না; প্রাণের টানই আসিল জিনিষ। প্রাণ কাঁদে বলিয়া যিনি যাহা দেন, তাহাই অমূল্য।

কেবল যে রাজধানীর বা প্রধান প্রধান সহরের লোক-দেরই দান করা কর্তব্য তাহা নয়; ক্ষুদ্রতম গ্রামের ক্ষুদ্র-তম কুটীরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যা-চারের কাহিনী পৌঁছুক। তথা হইতেও সাহায্য আসুক। সর্বত্র দান সংগৃহীত হউক।

যাহাদের অল্প কোথাও সাহায্য পাঠাইবার সুবিধা নাই, তাহারা আমাদের কার্যালয়ে টাকাকড়ি পাঠাইলে আমরা তাহা প্রবাসীতে স্বীকার করিব, এবং নিজব্যয়ে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিব।

• দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি কিরূপ অত্যা-চার হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্ত তথাকার গবর্ণমেন্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া-ছেন। এই কমিশনের তিনজন সভ্যের মধ্যে দুজন পূর্বে পূর্বে প্রকাশ্যভাবে ভারতবাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় শ্রীযুক্ত গান্ধি প্রভৃতি তত্রত্য গবর্ণমেন্টকে জানান কমিশনে নিরপেক্ষ আরও দুজন সভ্য নিযুক্ত না হইলে তাহারা উহার নিকট সাক্ষ্য দিবেন না। গবর্ণমেন্ট এই দাবী অগ্রাহ করিয়াছেন। আমাদেরও মত এই যে এরূপ কমিশনের নিকট সাক্ষ্য না দেওয়াই উচিত। কমিশনের ভারতবাসীর শত্রু সভ্য দুজন কিরূপ লোক, তৎসম্বন্ধে গান্ধি মহাশয় শ্রীযুক্ত গোখলেকে টেলিগ্রাফ দ্বারা জানাইয়াছেন :—

“মিঃ এসেলেন ও কর্ণেল ওয়াইলি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-বাসীর ঘোরতর বিরোধী বলিয়া সুপরিচিত। মিঃ এসেলেন প্রকাশ্য সভায় অনেকবার এগিয়াবাসীদের ঘতদুর সম্ভব বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে তাহাকে সকলে মন্ত্রিসভার একজন বেসর-কারী সভ্য বলিয়া গণনা করে। এই সেদিন তিনি পালেমেন্টের যেয়ার নামক একজন সভ্যের সহিত কথাবার্তায় ভারতবাসীদের খুব বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তৎপরে মিঃ যেয়ার কমিশনে এসেলেনের নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। দুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া কর্ণেল ওয়াইলি নেটালে আমাদের দারুণতম

শত্রু। ১৮৯৬ সালেও, এত দিন পূর্বেও, দুটা জাহাজে করিয়া ভারতবাসীরা ডার্বান বন্দরে আসিয়া পৌঁছায়, তাহারা যাহাতে জাহাজ হইতে নামিতে না পারে তৎক্ষণা তিনি অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া বন্দরে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য সভায়, ভারতবাসী যাত্রী সহ ঐ দুটা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়ার সমর্থন করেন। আর একজন বক্তা বলে যে কেহ যদি একবারও ভারতবাসীদের উপর গুলি চালায়, তাহা হইলে সে নিজের একমাসের মাহিনা দিবে। কর্ণেল ওয়াইলি এই বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে “আর কে কে, ভারতবাসীর উপর এক এক গুলি ছোড়ার জন্ত, এক এক মাসের বেতন দিতে রাজি আছ।” তিনি বরাবর আমাদের শত্রুতা করিয়া আসিতেছেন। যে ‘দেশরক্ষী কোর্সের’ (Defence Force) অত্যাচারের অনুসন্ধান কমিশনের অগ্রতম কার্য, ওয়াইলি তাহারই কর্ণেল পদবীধারী নায়ক, যে-সকল চা বা ইক্ষুক্ষেত্রে অত্যাচারিত ভারতীয় কুলিরা থাকে, তাহাদের মালিকদের অনেকের আইন-বিষয়ে পরামর্শদাতাও এই কর্ণেল, এবং বর্তমান আন্দোলনের সময় তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে নেটালের চুক্তিতে অনাবদ্ধ প্রত্যেক ভারতবাসীর উপর যে বার্ষিক ৪৫ টাকা ট্যাক্স আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়।”

অতএব গান্ধি মহাশয় যে বলিয়াছেন যে “কমিশন ঠায় বিচার করিবার জন্ত নিযুক্ত হয় নাই, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছে,” ইহা অতি সত্য কথা।

## আলোচনা

বাক্সালা শব্দ-কোষ।

পৌষের প্রবাসীতে শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রণীত বাক্সালা শব্দ-কোষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্তি করেন নাই। সে তিন বিষয় এই,—(১) “অধিকাংশ দেশজ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হয় নাই।” (২) “আরবী বা ফারসী শব্দের আদিম রূপ অধিকাংশ স্থলেই নির্দেশ করেন নাই, কেবল মূল ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আদিম রূপ দেওয়া থাকিলে বুঝা যাইত বাংলার শব্দবিকার কিরূপে এবং কত-খানি পরিমাণে ঘটিয়াছে।” (৩) শেষে চাক্রবাবু কতকগুলি “নূতন শব্দ” দিয়াছেন, যেগুলি তিনি কোষে পান নাই।

বহুদিন হইতে বহু লোকের মুখে ও লেখায় এবং যাবতীয় বাক্সালা অভিধানে ‘দেশজ’ শব্দ গুলিয়া পড়িয়া আসিতেছি। আমার কোষের যদি কিছু বিশেষ থাকে, তাহা এই ‘দেশজ’ ব্যুৎপত্তির উচ্চৈঃ। এবিষয় আমি গত বৎসরের প্রবাসীতে সবিস্তরে লিখিয়াছিলাম। একটু চিন্তা করিলে যে-সকল বাক্সালা শব্দের মূল সংস্কৃত বলিষ্ঠ বৃত্তিতে পারা যায়, সে-সকল শব্দ, ‘দেশজ’ নামে নির্দেশ করিয়া আভিধানিকগণ পাঠককে বুঝা সন্দেহে কেলিয়াছেন। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় ব্যাকরণকার সে ভাষার শব্দের ত্রিবিধ মূল পাইয়াছিলেন। স্পষ্ট সংস্কৃত ও অপস্পষ্ট সংস্কৃত ব্যতিরিক্ত যে-সকল শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার ছিল, সে সকলের নাম দেশজ। অর্থাৎ সে-সকল শব্দ

সংস্কৃত ভাষা হইতে আসে নাই, এই দেশে উৎপন্ন। হয় ত প্রাচীন অধিবাসীর রচিত, হয় ত প্রতিবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

ইহার পর মুসলমান রাজত্বের সময়ে বহু যাবনিক শব্দ ভারতের সকল ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে ইংরেজ রাজত্বে বহু মেল্ল শব্দ প্রবেশ করিতেছে। যাহার মূল সংস্কৃত নহে, যাবনিক নহে, মেল্ল নহে, এক্ষণে তাহার নাম দেশজ বলা যাইতে পারে। আমার কোষে একটা শব্দেরও মূল 'দেশজ' লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই বলিয়া কি বাঙ্গালা ভাষায় দেশজ শব্দ নাই? কে জানে। কিংবা, নিশ্চয় আছে; কিন্তু কে চেনাইয়া দিবে? প্রাচীন বঙ্গীয়েরা, আর্যের বঙ্গীয়েরা, কি ভাষা কি শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা কে জানে? কে জানে প্রাচীন বঙ্গীয় জন কোন্ ভাষা হইতে কোন্ শব্দ লইয়াছিল, কোন্ শব্দ নিজেরা রচনা করিয়াছিল, কোন্ শব্দ সংস্কৃতভাষী আর্যের নিকট শিখিয়াছিল? ইতিহাসের কথা নয়, যে ইতিহাসে বলে আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া বাঙ্গালী, যে বলে আর্য্য ও দ্রবিড় জাতি কিংবা আর্য্য ও মঙ্গোলীয় জাতি মিশিয়া বাঙ্গালী। সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও নয় যে বলে আদিম কোন জাতির পরিণামে বাঙ্গালী জাতির, আদিম কোন ভাষার পরিণামে ও অল্প আগন্তুক জাতির ভাষার মিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের অনুমান, সৃষ্টির পরম্পরা স্বীকার এক, আর এই শব্দ অনার্য্য প্রাচীন বঙ্গীয়ের শব্দ, এই শব্দ দ্রবিড় জাতির শব্দ, এই শব্দ কোল জাতির শব্দ, ইত্যাদি নির্ধারণ অপর। বাহা আছে তাহা ধরিয়া অনুমান চলে; বাহা নাই তাহা ধরা চলে না। যেহেতু তিনি, যিনি এতগুলো সংস্কৃত পুথী পাঠ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি এই শব্দ তাহার অধীত পুথীতে পান নাই, অতএব শব্দটা দেশজ অর্থাৎ আর্য্যের জাতির সৃষ্ট, এ তর্ক শুনিয়া আসিতেছি। এই তর্ক বরং বুঝিতে পারি; অল্প তর্ক যাহাতে অধিকাংশ বাঙ্গালা অভিধানে অপভ্রংশ সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দেশজ লেখা হইয়াছে, সে তর্ক উদ্ভেদে অশক্ত। আমার কোষে এই-সকল তর্কের স্থান নাই।

আবার বলি, বাঙ্গালা ভাষায় 'দেশজ' অর্থাৎ ভারতবাসী আর্য্যের জাতির রচিত শব্দ আছে। বঙ্গদেশজ, প্রতিবেশী প্রদেশজ, ভারতপ্রান্তজ শব্দ নিশ্চয় আছে; কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না। এক জাতি স্বতন্ত্র হইয়া অল্প জাতির সংসর্গ বর্জন করিয়া বর্তিতে পারে না। এইরূপ থাকিতে ইচ্ছা করিলেও অল্প জাতি থাকিতে দেয় না। বাণিজ্যে হউক, রাজত্বে হউক, সামাজিকতায় হউক, এক জাতির সহিত অল্প জাতির সম্পর্ক ঘটে; সম্পর্ক ঘটিলেই শব্দের আদান-প্রদানও ঘটে।

কিন্তু কোষকার সর্বজ্ঞ নহেন। ব্যুৎপত্তিনিরূপে ভুল হইতেই পারে। কারণ অতীতের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে গেলে দিশা-হার হইতে হয়। অর্থের ব্যাখ্যানে ভুল হয়, প্রয়োগ প্রদর্শনে ভুল হয়। এমন কি, একটা দেখিয়া আরটা লিখিতে লিখিতে ভুল হয়। ইহাদের উপর ছাপাখানার ভুল অনিবার্য্য হইয়া আছে।

এ সব সত্ত্বেও কোষ রচনায় সবজ্ঞান হইতে হইবে। নচেৎ ক্রোম রচনা অসম্ভব। সংসারের দশ কাজে আমরা যেমন অনুমানে ভ্রম করি, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশেও অনুমানই এক প্রমাণ। সং ধামন্ শব্দ হইতে বাং ঠাম আসিয়াছে, কারণ বহু শব্দে ধ স্থানে ঠ হইয়াছে, কারণ ধাম শব্দের অর্থ ঠাম শব্দে আছে, কারণ যাহারা ধাম বলিতেন তাহাদের অশিক্ষিত প্রতিবেশীরও সেই শব্দ প্রয়োগ অভ্যাস হইবার কথা। কেবল প্রবণ ও বাগ্‌যন্ত্রের গুণে বা দোষে ধাম স্থানে ঠাম হইয়া পড়িত। বাং ঠাম শব্দ সং দৃষ্টিগোচর শব্দ

হইতে আসিয়াছে, কারণ শব্দবিকারের সূত্রে এই পরিবর্তন বাধিত হইতেছে না। সং নধরপ্লনী হইতে বাং নধন শব্দ আসিয়াছে, কারণ শব্দবিকারের সূত্রে পরিবর্তনটা স্বাভাবিক, কারণ পড়শের ভাষায় এমন রূপ পাইতেছি যাহাতে নধরপ্লনী শব্দের অধিক চিহ্ন আছে। এইরূপ নানা উপায় প্রয়োগ সত্ত্বেও কতক শব্দের মূল-নির্ণয় হইতে পারে নাই। হয়ত কালে অল্প সূত্র আবিষ্কৃত হইবে, একের কল্পনায় বাহা আসিতেছে না, অল্পের কল্পনায় তাহা আসিতে পারিবে। তথাপি কতক শব্দের মূল চিরদিন অজ্ঞাত থাকিবে।

বাঙ্গালা ভাষার ভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দের দুই রূপ আছে। (১) সংস্কৃত শব্দ অপভ্রষ্ট বিকৃত সংক্ষিপ্ত হইয়া কতক শব্দ হইয়াছে। (২) সংস্কৃত ধাতু ধরিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইয়াছে। বোধ হয় বহুকাল সংস্কৃত ভাষা বঙ্গদেশের লোকের মজ্জাগত হইয়াছিল। সং চতুষ্ক হইতে চউক—চউকস—চৌকস; আর সং চক্ষুয়ান হইতে চউকষ চৌকষ—চৌকস (লোক); সং চূড়া হইতে চূটী—চূটকী, আর সেই চূড়া হইতে অর্বাচীন সং চুল আসিয়াছে। সং চণক হইতে চনা, ছোলা; চণক-চূর্ণ হইতে চনা-চূর্ণ, স্থানবিশেষে গ্রাম্য চানাচূর্ণ। সং চূর্ণিত হইতে বাং চূন্ট, আর সং কুঞ্চিত হইতে বাং কৌচানা। কাপড় কৌচানা যেমন, কাপড়ের পাড়িতে চূন্ট করা তেমন নয়। বস্ত্রের উর্নি বা তরঙ্গের নাম চূন্ট। এইরূপ, বহু বহু শব্দে সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ধাতু হইতেও বাঙ্গালাতে বহু শব্দ রচিত হইয়াছে। সং চিৎ ধাতু হইতে বাং চিতানা, চিয়ানা (চিয়ানা)। সেই চিৎ ধাতু হইতে বাং চিতান, স্থানবিশেষে (গানের) চিতেন হইয়াছে। সং চন ধাতু গতি শব্দ হইতে বাং চ-চৌ দৌড়। সং ছম ধাতু ভক্ষণ হইতে বাং গা ছম-ছম করে, সং স্থ ধাতু হইতে বাং ছর-ছর করিয়া জল পড়ে, সং ছুপ ধাতু হইতে বাং ছু ধাতু। এই ছু হইতে ছোয়াছুয়ি, ছোয়া ছুইয়া—ছোয়াছিয়া (রোগ) আসিয়াছে।

সংস্কৃত কোষে যে শব্দ পাইতেছি, তাহা সংস্কৃত বিবেচনা করিতেছি। তাহা প্রাচীন কি অর্বাচীন, তাহা বেদ-রচনা সময়ের শব্দ কি তাহা 'পালি' ভাষার কিংবা "প্রাকৃত" ভাষার প্রচলনের সময়ের শব্দ, তাহা দেশজ শব্দের সংস্কৃত-করা রূপ কি দক্ষিণাপথ-বাসী আর্য্যের বিকৃত রূপ, ইত্যাদি বিচারের যোগ্যতা আমার নাই। উপস্থিত কোষে আবশ্যকতাও নাই। অধিকাংশ স্থলে শব্দের সংস্কৃত ধাতু কিংবা সে ধাতুর স্বাভাবিক ভ্রংশ পাইলেই তুষ্ট হইতেছি।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন, দ্রবিড় ভাষার কয়েকটা শব্দ বাঙ্গালাতে চলিত আছে, এমন কি সংস্কৃতেরও চলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কিন্তু সে শব্দ কোনগুলো, তাহার প্রমাণ তিনি দেন নাই। যে অনুমানে ভ্রম করিয়াছেন, সেটাকে নির্ভর সাহস্য মানিতে শঙ্কা হয়। তেলেও নীচ জাতীয়া নারীর মুখে উদকমু শুনিয়াছি। নীর-লু শব্দও শুনিয়াছি। মনে হইতেছে বিজয় বাবু বলিয়াছেন সং নীর শব্দ দ্রবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছিল। হয়ত আসিয়াছিল, হয়ত সং নীর শব্দ সং নার শব্দের রূপান্তর। কোন্ দ্রবিড় শব্দ, দেশজ শব্দ, সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সংস্কৃত কোষকারের বিবেচ্য, বাঙ্গালা কোষকারের নহে। এইরূপ বাঙ্গালা কোষকার বাং ঠামা কারসী চন্দা চাপরাস চাবুক চামচ চালাক এতৃতি শব্দের মূল কারসী শব্দ তুলিয়া দেখাইলেই তাহার কাজ শেষ মনে করি। সে-সকল কারসী বা আরসী শব্দের মূলার্থ কি, কিংবা ব্যাকরণ কি, তাহা সে সে ভাষার কোষকারের বিবেচ্য, বাঙ্গালা কোষকারের নহে। অন্ততঃ আমি এইখানে

সীমারেখা টানিয়াছি। অধিকাংশ শব্দ ফাল্গুনী সাহেব কৃত হিন্দু  
স্তানী কোষ হইতে লইতেছি। শব্দবিকাশের ক্রম আনিবার ইচ্ছা  
হইলে এই গুণটো গোটো শব্দ আবশ্যিক। আমার রচিত বাঙ্গালা-  
ভাষা গ্রন্থের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দবিকাশের সূত্র  
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোষ সমাপ্ত হইলে ভূমিকায় শব্দবিকাশের  
সূত্রের পুনরালোচনা ও বিস্তার করিবার সংকল্পও আছে।

এখন চারু বাবুর উদ্ধৃত নূতন শব্দ দেখি। দুই পাঁচটা ছাড়া  
সমুদয় আমার কোষে আছে। চারু বাবু কেন দেখিতে পান নাই  
তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে শব্দ যেখানে বসাইলে তাহা সহজে  
গোঁথে পড়িত, হয় ত সকল স্থলে সেখানে বিস্তৃত হয় নাই। গ্রন্থ-  
কলেবর হ্রস্ব করিবার চেষ্টায় এই অসুবিধা হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক  
শব্দ যথাস্থানে বসাইয়া গেলে গ্রন্থকলেবর বিপুল হয়, না বসাইলে  
পাঠকের অসুবিধা হয়। হয় ত এই দুইএর মধ্যপথ নিরূপণ করিতে  
পারি নাই। প্রথমে শব্দগুলো একত্র হউক, পরে সাজানা গোছানা  
ধাইবে; প্রথমে এক একটা মূল ধরা যাউক, পরে বিশেষ বিচার  
চলিবে।

চারু বাবু চাট চাড় চারপেয়ে চিংড়ি চিতেন চেটালো চেতানো  
চোটানো প্রভৃতি শব্দ লিখিয়াছেন। আমার কোষে এই সকল  
শব্দ চাট চাড়া চারিপেয়ে চিঙ্গড়ী চিতান চটাল চেতানা চোটানা  
আকারে আছে। আমি শব্দের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-সঙ্গত আকারের  
পক্ষপাতী। ভাষা ও ভাষার \* প্রভেদ যথাসাধ্য রক্ষা করিতে না  
পারিলে বাঙ্গালাশব্দ-কোষ সঙ্কলন বৃথা হইবে। ভাষার কোষ  
আবশ্যিক বটে, কিন্তু সে কোষ সঙ্কলন আমার উদ্দেশ্য নহে। সকল  
স্থলে ভাষা ও ভাষার শব্দের প্রভেদ রক্ষা করিতে পারিতেছি কি না,  
তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

চারু বাবু কয়েকটা নূতন শব্দ দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে  
অনেকে এইরূপে কোষের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করিতে পারেন।  
নূতন শব্দ দিবার পূর্বে একবার আমার কোষের এক এক বর্গের  
যাবতীয় শব্দ পড়িয়া গেলে পরিশ্রম অল্প হইবে। কোন্ স্থানের  
শব্দ, এবং ভঙ্গ্যপরিবारे সে শব্দ চলিত কি না, এই দুই বিষয় জানা  
আমার আবশ্যিক। কলা ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শব্দের বেলা ভ্রাতৃভ্র  
বিচার আবশ্যিক হইবে না। দেশের সৌভাগ্য যে ভাষা ক্রমশঃ  
লুপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইতেছে। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

## ভালক্ষ্য

না জানি সে কোথা হ'তে, জানি না কেমনে

তোমারি কামনা মোরে পরশি গোপনে

সঙ্গীতে ভরিয়া দেয় অণু পরমাণু

আঁধার পরাণ-পথে পরকাশে তামু !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

\* অনেকে এই ভাষা শব্দ জানেন না। একারণে 'প্রাদেশিক'  
শব্দ বলেন। কিন্তু ভাষা শব্দ হইতে ভাষা শব্দের উৎপত্তি হইলেও  
ভাষা শব্দের অর্থ যোজনাস্তে ভাষা এই প্রবাদে স্পষ্ট আছে। এখানে  
যোজনাস্তে ভাষা বলা চলে না।

## পুস্তক-পরিচয়

### উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্রদর্শন—

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত দীনেশ-  
চন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ১৮৩ ও ৪২  
পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ছাপা কাগজ পরিষ্কার, মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকে হরিদ্বার, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি উত্তর-ভারতের  
বহু প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত, স্থানীয় ইতিহাস ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের  
বর্ণনা এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও কুতুবদিয়া দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে  
সমুদ্রযাত্রার বিবরণ ব্যক্তিগত যাত্রাবিবরণের সহিত বেশ সহজভাবে  
বর্ণিত হইয়াছে। পর্যটক ও দেশপরিচয়লাভেচ্ছ ব্যক্তিগণের ইহা  
মনোরঞ্জক হইবে।

পুস্তকে একটি সূচীপত্রের, ও চিত্রের অভাব আছে। প্রসিদ্ধ  
স্থান ও দর্শনীয় দৃশ্যের চিত্র দিলে বর্ণনা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা  
হয়।

### সেবা—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ  
ক্রাঃ ১৬ অং ১৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকে সাহিত্যপরিষৎ-বরিশাল-শাখার ভিন্ন ভিন্ন অধি-  
বেশনে পঠিত প্রবন্ধ হইতে বাছিয়া সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে  
যথা—

১। পরলোক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত। ২। দার্শনিক  
পরলোকবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব—ঐ। ৩। আত্মদর্শন—  
শ্রীগণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। ৪। আর্ধ্যসভ্যতার প্রাচীনতা—শ্রীবিজয়চন্দ্র  
মজুমদার। ৫। অসমীয়া ভাষা—শ্রীপারেশনাথ সেন। ৬। জন্মান্তর  
ও কর্ম—শ্রীযোগেশচন্দ্র কুমার ঘোষ। ৭। কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—  
শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত। সমস্তগুলিই সৃষ্টিস্থিত ও মূলিখিত।

### ত্রিশ্রোতা—

কবিতা-রেণু-রচয়িত্রী-রচিত কবিতাপুস্তক। দিনাজপুর, গণেশ-  
তলা হইতে শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ  
১৬ অং ১৬৪ পৃষ্ঠা এণ্টিক কাগজে ছাপা। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর  
ভট্টাচার্য্য লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকর্তার ছন্দের উপর অধিকার আছে, ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতি  
আছে, ভাব ও কবিত্বেরও নিতান্ত অসম্ভাব নাই। অধিকাংশ  
কবিতাই তত্ত্ব ও ধর্মভাবমূলক, অথচ তাহা বিনাদের ছায়াপাতে  
সকরণ।

### কমলকুমার—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র সামাজিক উপন্যাস।  
ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এই উপন্যাস-  
খানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

### গৈরিক—

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়  
ও পুত্রগণ। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৩৬ পৃষ্ঠা। মোটা বোর্ডে রেশমী  
কাপড়ে বাঁধা, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই পুস্তকের একটি ছাড়া সমস্ত কবিতাই গিরিশঙ্কর বসিরায় রচিত, এজন্য ইহার নাম গৈরিক রাখা হইয়াছে। ইহাতে এগারটি দীর্ঘ কবিতা আছে। কবিতাগুলি সমস্তই প্রীর সুখপাঠ্য, কেবল অতি-দীর্ঘতা হেতু রস অমট বাঁধিতে পারে নাই, স্থানে স্থানে পদ্য-বেঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু অধিক হৃৎকের বিষয় প্রতিষ্ঠাবান কবির কাব্যে বহু স্থানেই হৃৎপতন লক্ষিত হইল।

**শান্তিজল—**

শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইতিহাস পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১৯ পৃষ্ঠা। এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য বারো আনা।

করণানিধান ষিষ্ট কথায় হবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত বলিয়াই জানিতাম, এবার তাঁহার রচিত ভাবসম্পদেরও পরিচয় পাইলাম। এমন সুশিষ্ট কবিতাপুস্তক আজকাল খুব অল্পই চোখে পড়ে। শান্তিজলের কবিতাগুলি শান্তিজলের স্তায় পবিত্র, স্নিগ্ধশীতল; বিচিত্র মধুর ভাবে অল্পপ্রাণিত। এক একটি কবিতায় এক একটি ভাবকে উপহার পর উপমা সাজাইয়া অত্যন্ত জমকালো করিয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সমগ্রের রসটি নষ্ট হইয়াছে। উপহার বাহার ও বাহারী দেখিয়া মন অভিভূত হইয়া উঠে, আরও হইতে শেষ পর্যন্ত ভাবধারা অক্ষুণ্ণভাবে জয়যজ্ঞ করা কঠিন হয়। অধিক মনোমগ্ন তরকারী যেমন গুরুপাক হয়, অধিক ষিষ্ট প্রয়োগে সম্বেশ যেমন তীব্র ষিষ্ট হইয়া উঠে, শান্তিজলের অনেক কবিতাই সেইরূপ গুণাবিক্যে পীড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য মনে হয় কবিতার বচনবিন্যাস যেমন কবির মনের মধ্যে খতই উৎসারিত হইয়া উঠে নাই, কবি সজ্ঞানে চেষ্টা করিয়া সুন্দর সুন্দর কথা, মনোমুগ্ধকর উপমা, চমৎকার ভাব চুনিয়া চুনিয়া সুন্দর নিপুণতার সঙ্গে বোহিনী মালিকা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে মালার সবকিছুকে সবকিছু বেমানান ছোড় আগে নাই, প্রত্যেক সবকিছু সুন্দর, কিন্তু জোড়ের মুখে কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। বহু কবিতা অতিদীর্ঘ বলিয়াও এই দোষ প্রতিবার অবসর যষ্টিয়াছে। কবির সংহত ও সংহত হওয়ার সুযোগ কারুকার্যের প্রলোভনে বহু স্থানে অগ্রাহ ও বিকল হইয়াছে। মোনের ফুলের মালার মতো ইহাতে সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি পড়িবেন তিনিই কবির শক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন; কিন্তু ফুলের মালার সজীবতা ইহার মধ্যে মূলত। হৃৎকের বৈচিত্র্য ও বর্জ্য, শব্দের মাধুর্য ও সজীবতা, উপহার চমৎকারিত্ব ও অনবদ্যতা, প্রকাশের স্বচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা এই প্রস্থানিকে পাঠকালে পাঠকের মনের সম্মুখে রত্নবসির স্তায় প্রতিষ্ঠাত করে, কিন্তু সজীবতা ও প্রতিবেশ না থাকিতে তাহা মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া ফের না, বৃহৎ করিলেই তাহার কিছুই আর আবার নয়, আবার মনের সঙ্গে আবার ভাবের ও চিন্তার প্রতিধ্বনিরূপে কোনো পংক্তিই জুড়িয়া যায় না। একদিকে ইহা যেমন অসাধারণ সুন্দর, অপর দিকে ইহা তেমন অসাধারণ বাধ। এ কবিতা যেমন পটের সুন্দরী, তেমনি সাজানো চলে, ধর করা চলে না। অবসর-মত চোখ পড়িলে বা। বলিতে হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে নিত্যকার জীবনের সুখহৃৎ আশা আত্মতার আশ্রয়স্থান চলে না। করণানিধানের কাছে আমরা ইহার চেয়েও সুন্দর কবিতা আশা করি, বাহাতে কবিতাগুলির মরনারীর মনের ভাব সাজা পাইয়া ছাপ ছাড়িয়া বাঁচবে। শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ হইতেছে—

“সাক্ষর হৃৎকর যে কথটি নাহি কবে,  
হৃৎকের তিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।”

মানবজীবনের শাখত ভাবলীলা করণানিধানের মধুসজীতে প্রকাশ পাইবার অপেক্ষার আছে।

**সঁড়াবকুসুম—**

রজনীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক এম, কে, লাহিড়ী কোম্পানি, কলিকাতা। হৃঃ ক্যাঃ ১ অং ৪৯ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

কান্ত কবির অপ্রকাশিত রচনা। বালকবালিকাদিগের উপযোগী উপদেশমূলক। অধিকাংশ কবিতাই পরার হৃৎকর রচিত। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবির পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইবে। অতএব সকলেরই এই পুস্তক এক একখানি ক্রয় করা উচিত।

**স্নেহ-উপহার—**

কুমারী স্নেহলতার শুভপরিণয়ে শ্রীহরিশঙ্কর নিরোগী প্রণীত। ৪০ পৃষ্ঠা।

বিবাহে যে রকম কবিতা সচরাচর রচিত হয় এই পুস্তকখানি তাহা অপেক্ষা চের ভাঙ্গা। ইহাতে কবিতা, হৃৎকর, ও শুভ, সবল ভাষা আছে। কস্তার বিবাহের পরে বিদায়ের করুণ বেদনা প্রকাশ করা বাঙালী কবির নিজস্ব বিশেষত্ব; উমা বেনকা ও গিরিশঙ্করের যে শাখত চিত্র, তাহা খাঁটি বাংলার জিনিস। কালিদাসের শকুন্তলাকে বিদায় দিকি চিত্রটি ছাড়া আর কোনো প্রাচীন কাব্যে নাটকে কস্তাবিদায়ের চিত্র আছে কি না জানি না; আজকাল ত কালিদাসকে বাঙালী দেশের বলিয়া দাবি করিতেছে। কালিদাসের বাঙালীত্বের যদি আর কিছু প্রমাণ না থাকে তবে কস্তাবিদায়ের ছবি একটি প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করিতে পারা যায়। সেই শাখত কস্তাবিদায়ের বেদনা এই স্নেহ-উপহারে ব্যক্তিগত ভাবে কবিত্বময় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুম্বারাকস।

**গোপালন—**

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিত্র প্রণীত। আমরা গো-রক্ষা লইয়া এত ব্যস্ত যে গোপালন বিষয়ে মন দিবার আমাদের অবসর নাই। পুত্রের মাথার মারিকেল ভাজিয়া কেবলমাত্র মৌখিক চীৎকার ছাড়াই গোরক্ষারত পালন করা যায়। কিন্তু গোপালন পরিশ্রম-এবং ব্যয়সাধ্য। সত্যেন্দ্রনাথ গোপালন বিষয়ক কুত্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া গোপালনের এবং দেশের বিশেষ উপকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুস্তকখানি কুত্র হইলেও ইহাতে অতি সংক্ষেপে গোপালন বিষয়ক অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহা প্রত্যেক গৃহস্থের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। ইহাতে এসবের সময়ে গরুর সেবা, এবং রুগ গরুর সাহায্য সাবাস্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গরুর বাধ্যাদি বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা তত মূল্যবান বিবেচিত না হইতে পারে। তবে সে দোষ তাঁহার নয়। অত্যন্ত প্রত্যাদেশের ফেরপ, এদেশে গরুর বাধ্যবিষয়ে সেরূপ কোন দ্বারাদিক পত্রিকাতে সূত্রপাতও আজ পর্যন্ত হয় নাই। কাঁচা দাস গরুর আদর্শ ব্যা। কিন্তু আমরা দেশের গোপ্রাণ ভূমি-সকল আক্রান্ত করিয়া দিল্পিত্ব করে গোরকিষ্ট সত্বর এনার কুড়ি লইয়াই ব্যস্ত থাকি।

ঐতিহাস দত্ত।





## শেষ বোঝা ।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে তাহল্লর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৩শ ভাগ

২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২০

৫ম সংখ্যা

## যাওয়া আসা

“সব্জু হোতেহি পাঁওকি তলে রউন্দে গয়ে হম্ ।

ইস্ গর্দিসে আফ্লাক্-সে ফুলে না ফলে হম্ ॥”

মনটুকুতে সবেমাত্র যখন রং ধরিতেছিল; তখন তাহাকে ঘর্ষণ ও ধর্ষণ হইতে রক্ষার জন্য বেড়া দিতে হইয়াছে, লোক খেদাইতে হইয়াছে। পাছে তোমার নূতন বাগানে শ্রামলতার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে, ফুলের ও ফলের আশ্বাস টুকু লোপ পায় আমি সেই ভয়েই দিন কাটাইয়াছি, চোখের জলে তাহাকে সরস রাখিতে বুক পাতিয়া তাহাকে ছায়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। তোমার বাগানে মালীর কায করিতে আমি অনেক সহিয়াছি, এখন আমার সহায় পালা সাক্ষ হইয়াছে। তুমি এখন তোমার নিজের ফুল নিজেই ফুটাইয়া তুলিয়া নিজের ডালা নিজেই ভরিয়া লইয়া পোন্দর্যের হাটে আপন পসরার মূল্য বুঝিয়া লও। আমি আমার জীর্ণ ভরীখান লইয়া সকলের শেষে পড়িয়া থাকি, আর নূতন বাতাসে ভরা পালে তোমার নূতন ভরী ওকূলে পাড়ি দিক।

একূলের নূতন পসারী তোমার ডালার জুল মালার মূল ওকূলের বিকিকিনির হাটে হয়তো কেহ দিবে, হয়তো কেহ দিবে না, হয়তো দেখিবে এপারের মতই ওপারে ভাল বা মন্দ, চেনা ও না-চেনা, কিন্তু তা বলিয়া বলিতে পারি না যে তোমার ভরী চিরদিনই একূলে বাধিয়া রাখ। নদী তুষারের কূলে বাধা রহিলে নিজেকে

নিজেই চেনে না। কূলের বাধা ভাঙ্গিয়া না দিলে তুমি সে একূলের পার চিনিয়া লইবে কেমন করিয়া ?

কেবল একটিবার তোমাকে বাহিরে আনিতে আমি তোমায় কত ভুলানই ভুলাইয়াছি, তোমার সঙ্গে কত ছলনাই করিয়াছি! বাতাস যখন তপ্ত ছিল তখন ছায়ার মায়্যা দিয়া তোমাকে ঘিরিয়াছি, আকাশ যখন শুষ্ক ছিল তখন অকালে বাদলের সৃষ্টি করিয়াছি কেবল তোমাকে সশ্রী রক্ষার ধস্তাধস্তির মাঝখানে একটিবার নামাইয়া দিব বলিয়া। আমাকে আজ নির্দম বলিয়া লজ্জা দিও না; লজ্জা দিতে পারিতে যদি আমার সমস্ত শক্তিটুকু তোমার এ তুষারকারার কঠিন প্রাচীর গলাইয়া দিতে নিষুক্ত না রাখিতাম। তোমাকে বাহিরে আনিয়া বহাইয়া দেওয়াই আমার কায ছিল, কামনা ছিল, সে কায সোসাধ আমার পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর আমাকে তোমার আগে শব্দ বাজাইয়া ধ্বজা উড়াইয়া চলিতে বলিও না। আমাকে একা ফেলিয়া যাও, পিছে রহিতে দাও, আর আমার তোমার ভার সহ্যও কেন? রথতো তোমার চলিয়াছে, দড়ি টানিতে এখনো কি আমার চাই?

নদী! ও নূতন নদী!—“সত্ত দাবা গহো, আপ নির্ভয় রহো, আপকো চীনহ...” তোমার যে সত্য দাবী আছে গ্রহণ কর, নির্ভয় হও, আপনাকে চিনিয়া লও।

আমাকে আর কেন? •

“মৈ আপনে সাহব-সক চলী—  
নদী-কিনারে সাঁদি মিলে হো।”



ও আমার ভূরা নদী ! তোমার কিনারায় আসিয়া আমি আমার স্বামীকে পাইয়াছি, আমায় ছাড়, আমি আমার স্বামীর সঙ্গেই চলি, “দেমনে” কুল অবতার চলি” একূল ওকূল ছুকুলেরই পারে চলি।

কি করি “মেরে সারগুরু পকড়ী বাঁহ  
নঁহি তো মৈঁ বহি যাতা।”

আমার পরমগুরু যে আমার হাতে ধরিয়াছেন নহিলে মনে ছিল আমার মানস-ধারা তোমারি সাথে বহিয়া যেতে, ভাসিয়া যেতে ! “হম অটকে হৈঁ জইঁ অটকে হৈঁ” আমার স্বামী আমায় আটকাইয়াছেন, আর তো এখন হইতে নড়িবার সাধা নাই, তোমার সাথে সাথে ভাসিবার মন নাই। ও আমার স্রোতস্বিনী, এখন “তেরে গবনকা দিন নগিচানা, সোহাগিন্ চেত করোরী”—ও সোহাগিনী, প্রিয়তমের ঘরে যাইবার দিন তো তোর এল, আপনাকে সচেতন কর, বহিয়া যা, চলিয়া যা, ভাসিয়া যা রক্তভরে ও বিচিত্রবরণী নবরঙ্গিনী !

“মো পৈ সঁদি রঙ্গ ভারা

সুরকি চোট লাগি মেরে মনমে”

বেধ গয়া তন সারা।”

আমার স্বামী আমার উপরে যে রং ঢালিয়াছেন তাহারি সুরের আঘাত আমার প্রাণে বাজিয়াছে, দেহে বিধিয়াছে, আমি সেই স্বামীর সঙ্গে চলি যিনি—

“সর্ব রঙ্গ রঙ্গিয়া

সব রঙ্গ সে রঙ্গনারা”

সকল রঙ্গের রঙ্গী অধচ সকল রং হইতে স্বতন্ত্র !

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## আগুনের ফুল্কি

[ পূর্বপ্রকাশিত অংশের চূড়ক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কসিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অসেঁ নামক একটি কসিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বস্তু কসিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অসেঁ তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতুহলের কলে লিডিয়ার

মন ক্রমে অসেঁর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কসিকার বন্দরে গিয়া সকলে ‘এক হোটেল’েই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অসেঁর বনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অসেঁ লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার ঘোঁষে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুক্ত কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জগ্ন একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অসেঁ ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জগ্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অসেঁকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অসেঁ ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অসেঁ তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অসেঁকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অসেঁ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অসেঁকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদুলিন পিয়েত্রী অসেঁর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মোঁতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অসেঁর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অসেঁর বাড়ীতে গিয়া অসেঁকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অসেঁ তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার খাতাপত্র ও অন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দোষী নয়। তখন উত্তেজিত হইয়া অসেঁ বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়ানে অল’নিক্-সিয়ো হঠাৎ ছোঁরা খুলিয়া অসেঁর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভ্যাঁসাস্তেলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিবেশ মধ্যে ছোঁরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিভ্রাডিত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অসেঁকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অসেঁ যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে।

কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা লিডিয়া অসেঁর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেছেন। অসেঁর ইচ্ছা যে এই গওপোলের সময়

তাহারা না আসেন ; সে স্থির করিল লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে পথ হইতে কিরাইয়া দিবে। কিন্তু কলোঁবা বলিল অসেঁর নিজে গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অসেঁ রাজি হইল। যে ঘোড়ায় চড়িয়া অসেঁ সকালে রওনা হইবে কলোঁবা রাতে গোপনে সেই ঘোড়ার কান কাটিয়া দিল। সকালে তাহা দেখিয়া অসেঁ মনে করিল কাপুরুষ বারিসিনিরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস নী করিয়া ঘোড়ার উপর ঝাল ঝাড়িয়াছে। অসেঁ ক্রুদ্ধ মনে রওনা হইল। পথে বারিসিনিপুত্রের লুকাইয়া ছিল ; অসেঁকে একা পাইয়া সম্মুখ ও পিছন হইতে একসঙ্গে গুলি করিল ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে আঘাত মারাত্মক হইল না। অসেঁর একটা হাত ভাঙিয়া গেল। তখন অসেঁ এক হাতে দুই গুলিতে দুজনকে বধ করিতে বাধ্য হইল, এবং ব্রান্দোর সঙ্গে পলাইয়া বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।

অসেঁর খবর পাইবার জন্য কলোঁবা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল ; কর্ণেল নেভিল ও লিডিয়া আসিয়াও ব্যস্ত হইলেন ; পরে শিলিনা আসিয়া অসেঁর খবর ও গিয়োকাস্তো লিডিয়াকে অসেঁর চিঠি দিয়া গেল। বারিসিনি-পুত্রদের লাশ আনিবার সময় তাহাদের দলের লোকেরা দাঙ্গা বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছিল ; কলোঁবার সাহস ও ভূৎসনায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল নেভিলের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারিলেন যে অসেঁ আগে আক্রান্ত হইয়া পরে বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ইহাতে অসেঁর মকদ্দমা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল।]

( ২০ )

ডাক্তার একটু বিলম্ব করিয়া আসিল। পথে তাহার এক অসম্ভাবিত ঘটনা ঘটয়াছিল। পথে তাহার গিয়োকাস্তো শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা ; সে বিনয় সহকারে ডাক্তারকে একজন আহত লোককে দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাহাকে অসেঁর কাছে লইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধ পটি বাধিয়া দিয়া আসিয়াছে। সেই ফেরারী পণ্ডিতটি ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেছে ; গিয়োকাস্তো পিঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের শিক্ষাপ্রদ গল্পে গল্পে ডাক্তারের পথটা বেশ সুখেই কাটাইয়াছে ; ঐ-সমস্ত প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নাকি গিয়োকাস্তোর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

ডাক্তারের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতজী বলিল—ডাক্তার মশায়, আপনার ব্যবহারে আপনার ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছে, কারণ আপনাকে বলাই বাহুল্য যে শিষ্যের সমস্ত-পাপ-পরিজ্ঞাত গুরুর মতো চিকিৎসকেরও খুব মন্ত্রণাপ্তির ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক ; আপনি অনুগ্রহ করে' ভুলে যাবেন যে এই জায়-

গায় এসেছিলেন বা আমাদের সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি পরম আপ্যায়িত হলাম।

কলোঁবা কর্ণেল নেভিলকে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যেন তিনি ডাক্তারের মৃত্যুস্তর পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকেন। সে বলিল—আপনি দাদার বন্দুকটিকে যেমন চেনেন তেমন ত আর কেউ চেনে না, আপনি সেখানে উপস্থিত থাকলে অনেক সুবিধা হবে। অধিকন্তু সেখানে এমন সব মিথ্যাবাদী লোক জড়ো হবে যে আমাদের হয়ে দুটো কথা বলে এমন একজন লোক না থাকলে আমাদের বিষম বিপদে পড়তে হবে।

কলোঁবা একাকী লিডিয়ার সহিত বাড়ীতে রহিল। তাহার বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সে লিডিয়াকে তাহার সহিত গাঁয়ের মধ্যে একটু বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া বলিল—হাওয়া লাগলে মাথাটা একটু ছাড়বে। উঃ ! কতকাল যে খোলা হাওয়ায় বেড়াই নি !

বেড়াইতে বেড়াইতে কলোঁবা লিডিয়াকে কেবল তাহার দাদার কথাই বলিতে লাগিল ; লিডিয়ারও সেই প্রসঙ্গ এমনই ভালো লাগিতেছিল যে সে তাহাতেই তন্ময় হইয়া গিয়া লক্ষ্যই করিতেছিল না যে কলোঁবা তাহাকে কথায় কথায় ভুলাইয়া গ্রাম হইতে কত দূরে লইয়া চলিয়াছে। সূর্য্য যখন অস্ত গেল তখন লিডিয়ার হাঁস হইল ; সে কলোঁবাকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কলোঁবা বলিল যে সে একটা সোজা পথের সন্ধান জানে, সেই পথে গেলে যতটা ঘুরিয়া আসিয়াছে ততটা আর ঘুরিতে হইবে না। এই বলিয়া কলোঁবা পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। শীঘ্রই সে এমন একটা খাড়া ও বহুর পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল যে এক হাতে গাছের ডাল ধরিয়া ধরিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া ও অপর হাতে বনজঙ্গল সরাইয়া সরাইয়া পথ করিয়া করিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে হইতেছিল। খাড়া পনের মিনিট এমনি সঙ্কট ও কষ্টকর খাড়াই চড়িয়া তাহারা একটা সমতল স্থানে গিয়া পৌঁছিল ; সে জায়গাটার স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

শিলাখণ্ড মাটি ফুঁড়িয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের কাঁকে কাঁকে সমস্ত জমিটা পুদিনা, বনতুলসী আর শাকুলের ঝোপে ঢাকা। লিডিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রামের চিহ্নও দেখা যাইতেছিল না, রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

লিডিয়া বলিল—ভাই কলোঁবা, তুমি ঠিক জান ত যে আমরা পথ হারাই নি ?

কলোঁবা বলিল—কিছু ভয় নেই। এই পৌছলাম বলে। আমার সঙ্গে এস।

—কিন্তু নিশ্চয় তোমার পথ ভুল হয়েছে; গাঁ ত এ দিক পানে নয়। আমার মনে হচ্ছে যে আমরা গাঁয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়েই চলেছি। ঐ দেখ, ঐ যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে, ঐ খানেই নিশ্চয় পিয়েত্রানরা গ্রাম।

কলোঁবা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাঁ ভাই, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এখান থেকে একশ কদম আগে...এই বনের মধ্যে...

—কি আছে ?

—দাদা। আমি তাঁকে একবার দেখতে চাই, একবার তাঁকে প্রণাম করতে চাই—যদি তোমার মত হয়।

লিডিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল।

কলোঁবা বলিতে লাগিল—আমি গাঁ থেকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি তুমি আমার সঙ্গে ছিলে নলে...নইলে পুলিশ আমার পিছু নিত। ... তাঁর এত কাছে এসে তাঁকে একবার দেখে যাব না! ...আমার দাদা বেচারাকে তুমিই বা দেখতে যাবে না কেন ? তুমি তাঁকে কি আনন্দই না দেবে!

—কিন্তু কলোঁবা... আমার পক্ষে সেটা উচিত হবে না।

—আমি বুঝেছি। তোমরা সব শহরে মেয়ে, তোমরা সর্বদাই আদব কায়দার উচিত অনুচিতের নিক্তি নিয়েই ফের। আমরা সব পাড়ার্গেয়ে মেয়ে অত শত ভালো মন্দর খুঁটিনাটির ধার ধারি নে।

—কিন্তু এত রাত্তিরে! তোমার দাদাই আমাকে কি ভাববেন ?

—সে ভাববে যে তার বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করে নি এতে তার ছব. বাড়বে, কষ্ট সহ্য করার শক্তি ও সাহস বাড়বে!

—আর আমার বাবা ? তিনি যে ভয়ানক ব্যস্ত হবেন।...

—তিনি জানেন যে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, ...যাই হোক, এখন যা হয় একটা স্থির করে'ফেল।... আজ সকালেই না তুমি তার ছবি দেখছিলে ?—কলোঁবা একটুখানি বিক্রপের ক্রুর বক্র হাসি হাসিল।

—না... সত্যি ভাই কলোঁবা... আমি যাব না... সেই ডাকাতগুলো সেখানে আছে...

—তাতে কি ? ফেরারীরা ত তোমাকে চেনে না. আর চিনলেই বা ? অধিকন্তু তুমি যে ফেরারী দেখতে চেয়েছিলে।

—বাবা রে!

—শোনো ঠাকরুণ, বিচার করে দেখ। তোমাকে এখানে একলা রেখে যাওয়া সে আমার দ্বারা হবে না; বলা ত যায় না কি ঘটবে না-ঘটবে। হয় চল দাদার সঙ্গে দেখা করি গে, নয় চল গাঁয়ে ফিরে যাই—যা বল দুজনের একসঙ্গেই তা করতে হবে।...ভগবান জানেন কবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে... হয় ত এ জন্মে আর না।

—কলোঁবা, ও কি তোমার কথা ? আচ্ছা, চল! কিন্তু বলে রাখছি এক মিনিট সেখানে থেকেই খাড়া-খাড়াই আমরা ফিরব।

কলোঁবা লিডিয়ার হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া আর কোনো কথা না বলিয়া এমন জোরে চলিতে আরম্ভ করিল যে লিডিয়ার তাহার সহিত চলিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই কলোঁবা থামিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল—ওদের আগে হ'তে জানান না দিয়ে অগ্রসর হওয়া আমাদের ঠিক হবে না, চাই কি একটা বন্দুকের গুলি খেতে হ'তেও পারে।

কলোঁবা মুখে আঙুল দিয়া শিশ দিল। অমনি একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল এবং ফেরারীদের মোহড়া ঘাটীর পাহারাদারের উপস্থিত হইতেও বিলম্ব হইল না। সে আমাদের পুরাতন পরিচিত ব্রিস্কো কুকুর। সে আসি-

মাই কলোঁবাকে চিনিল এবং তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বনের মধ্য দিয়া দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছুদূর যাইতেই তাহাদের সম্মুখে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—ব্রান্দো নাকি রে? দাদা কোথায়?

—ঐ হোঁথা। কিন্তু আশ্তে আশ্তে চল; জখম হওয়ার পর আজ এই প্রথম তার একটু তন্দ্রা এসেছে।

রমণীদ্বয় সাবধানে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল কতকগুলি পাতলা পাতলা পাথর গোল করিয়া উপরা-উপরি সাজাইয়া একটা অগ্নিকুণ্ড তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে—তাহাতে বাহিরের বাতাস আগুনে লাগিতেছে না বা আগুনের আলো বাহিরের আসিতেছে না; সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে একখানা চেটাইয়ের উপর তেরপাল ঢাকা দিয়া অর্সো শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার মুখ বিবর্ণ ও পাণ্ডাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার ব্যথিত নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে। কলোঁবা আশ্তে আশ্তে গিয়া তাহার পাশে বসিয়া নীরবে হাত দুখানি জোড় করিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল, যেন প্রার্থনা করিতেছে। লিডিয়া তাহার ওড়না দিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া কলোঁবার পিছনে পিঠ-ঘেসিয়া বসিল; এবং মাঝে মাঝে কলোঁবার কাঁধের উপর দিয়া মুখ তুলিয়া তুলিয়া আহত অর্সোকে দেখিতে লাগিল। পনের মিনিট কেহ একটু টুঁ শব্দও করিল না। পণ্ডিতজী ইসারা করিয়া ব্রান্দোকে ডাকিয়া লইয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল; ইহাতে লিডিয়া আরাম অনুভব করিল এবং সে এই প্রথম বুঝিতে পারিল যে ফেরারীদের প্রকাণ্ড দাড়ি ও সাজসরঞ্জামে, ভারী একটি সেই দেশী বিশেষত্ব আছে।

অর্সো একটু নড়িল। অমনি কলোঁবা তাহার উপর বুঁকিয়া পড়িয়া বার বার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল এবং তাহার আঘাত, তাহার বেদনা ও তাহার কি চাই না-চাই সঘনকৈ শতকৈ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। অর্সো, এ অবস্থায় যতটা ভালো

থাকা সম্ভব তাহা সে আছে; জানাইয়া কলোঁবাকে পান্টা প্রস্তুত করিতে লাগিল, যে, লিডিয়া এখনো পিয়েত্রান-রায় আছে কি না, সে তাহাকে কোনো চিঠি দিয়াছে কি না, ইত্যাদি, কেবল লিডিয়ারই কথা।

কলোঁবা দাদার মুখের উপর বুঁকিয়া ছিল বলিয়া তাহার দাদা তাহার সন্ধিনীকে দেখিতে পাইতেছিল না; আর দেখিতে পাইলেও সেই অন্ধকারে তাহাকে চেনাও সহজ হইত না। কলোঁবা এক হাতে লিডিয়ার একখানি হাত ধরিয়া অপর হাত দিয়া আশ্তে ও সম্ভরণে দাদার মাথাটি একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল—না দাদা, লিডিয়া ত কে কোনো চিঠি তোমাকে দেয় নি। তুমি সর্বস্বত্ব শুধু তার কথাই ভাব দেখছি, তবে কি তুমি তাকে ভালো-বাস?

—কলোঁবা, হয় ত আমি বাসি। .. কিন্তু সে... সে হয়ত আমাকে এখন ঘৃণা করে!

লিডিয়া কলোঁবার হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কলোঁবার মুঠির ভিতর হইতে হাত ছাড়াইয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়; তাহার ছোট ছোট সুন্দর সুগঠিত হাত দুখানির বলের পরিচয় ত আগেই আমরা পাইয়াছি।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তোমাকে ঘৃণা করবে! তুমি যা করেছ এর পর! .. বরং উন্টো, সে তোমাকে খুব প্রশংসাই করে।... ইয়া দাদা, তোমাকে তার অনেক মনের কথা বলবার আছে।

লিডিয়ার হাত ক্রমাগত মুক্তিলান্তের জন্ত চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কলোঁবা ক্রমশ টানিয়া টানিয়া অর্সোর নিকটেই লইয়া যাইতেছিল।

অর্সো বলিল—কিন্তু তাই যদি, তবে সে আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?... তার হাতের একটি লাইন লেখা পেলেই ত আমি খুসী হতাম।

লিডিয়া এবার জোরে হাত ছাড়াইতে গেল; কলোঁবা অমনি টানিয়া সেই হাতখানি অর্সোর হাতের উপর দিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া উজ্জ্বল হইয়া বলিল—দাদা, খবরদার! শ্রীমতী লিডিয়ার নিম্নে বুকে স্নেহ করে, সে তোমার কর্তিক ভাবা বেশ বোঝে।

লিডিয়া হাত টানিয়া হইয়া অস্পষ্ট কি দুই একটা কথা বলিল। অর্সোর মনে হইল যন্ত্রণা !

—মিস নেভিল, আপনি এখানে! আপনি কেমন করে' এলেন? আপনি আমাকে কি খুসীই করলেন!

কষ্টে একটু উঠিয়া সে লিডিয়ার কাছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

লিডিয়া বলিল—আপনার বোনের সঙ্গে আমি এসেছিলাম যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে যে ও কোথায় বাচ্ছে... তার পর আমারও ইচ্ছে হ'ল... জেনে যেতে... আপনি কেমন আছেন।... আহা! আপনি কি রোগাই হয়ে গেছেন!

কলোঁবা অর্সোর পিছনে গিয়া বসিয়াছিল। সে অর্সোকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপনার হাঁটুর উপর তাহার মাথা রাখিল এবং ইসারা করিয়া লিডিয়াকে কাছে সরিয়া আসিতে বলিল।

—আরো কাছে! আরো কাছে এস! জখমী রোগীর চোঁচিয়ে কথা বলা ত ঠিক নয়।

লিডিয়া ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কলোঁবা তাহার হাত ধরিয়া এমন জোরে টানিল যে লিডিয়া একেবারে অর্সোর কোলের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার কাপড় অর্সোর গায়ে ঠেকিতে লাগিল, এবং তাহার যে-হাতখানা কলোঁবা ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা অর্সোর কাঁধের উপর থাকিল।

কলোঁবা প্রফুল্ল মুখে বলিল—এই বেশ হয়েছে! দাদা, খোলা আকাশের তলে বনবাসের এমন মধুর রাত্রি কেমন লাগে?

অর্সো ভাবনির্মূলিত নেত্রে বলিল—সত্যি রে সত্যি! বড় মধুর রাত্রি! জীবনে কখন ভুলব না!

লিডিয়া বলিল—আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে!

—কষ্ট! আমার আর কষ্ট নেই! এই রকম করে' এখন যদি আমি মরতে পেতাম!

কলোঁবা লিডিয়ার যে হাতখানিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল অর্সো ধীরে ধীরে আপনার ডাহিন হাত তুলিয়া সেই হাতের উপর দিল।

লিডিয়া বলিল—আপনাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার হয়েছে, নইলে আপনার গুরুত্ব হবে কেমন করে? আজ আপনাকে যে রকম কর্তব্য বিছানায় খোলা জায়গায় শুয়ে থাকতে দেখলাম, এর পর আমি আর বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারব না।..

—মিস নেভিল, যদি আপনার সঙ্গে দেখা হবার ভয় না থাকত, তা হলে আমি পিয়েত্রানরায় ফিরে যেতাম আর পুলিশের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম। কেবল কি করে' আপনার কাছে মুখ দেখাব বলেই যেতে পারি নি।

কলোঁবা জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, ওঁর সঙ্গে দেখা হবে তাতে আর ভয়টা কি?

—মিস নেভিল, আমি আপনার হুকুম অমান্য করেছি, আমার কথা রাখতে পারিনি।.....এমন অবস্থায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি!

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—দেখছ ত ভাই, লিডিয়া, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে! পিয়েত্রানরায় তুমি আসাতে দাদার কত উপকার হয়েছে! আমি আর তোমাকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতে দেবো না।

লিডিয়া অর্সোকে বলিল—আমার মনে হচ্ছে এই শোচনীয় বিপদ শীঘ্রই কেটে যাবে, তখন আপনার আর কাউকে ভয় করতে হবে না।.....আমরা চলে যাবার আগে যদি জেনে যেতে পারি যে আপনার প্রতি সুবিচার করা হয়েছে, আর, সকলে আপনার সাহসের মতন আপনার কর্তব্য-ও ত্রায়নিষ্ঠারও পরিচয় পেয়েছে, তা হলে ভারী সুখের হবে।

—মিস নেভিল, আপনি চলে যাবেন! ও কথাটা আমার কাছে এখনি বলবেন না।

—আপনার ইচ্ছেটা কি?.....আমার বাবা ত কেবল শীকার খেলেই বেড়াতে পারেন না, তাঁকে বাড়ী ত ফিরে যেতেই হবে।

অর্সোর যে-হাতখানি লিডিয়ার হাতের উপর রাখিত ছিল, তাহা স্থলিত হইয়া পড়িয়া গেল; সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

কলোঁবা বলিল—বাঃ! অমনি গেলেই হ'ল। আমরা এত শিগগীর যেতে দিলে ত! পিয়েত্রানরায়

তোমাদের অনেক সব ভালো ভালো জিনিস দেখতে এখনো বাকী আছে।.....অধিকন্তু তুমি আমার ছবি এঁকে দেবে স্বীকার করেছিলে, সে ত এখনো আরম্ভই কর নি।.....আর তুমি আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলে যে তোমায় পঁচাত্তর শ্লোকে একটা গাথা তৈরী করে শোনাতে হবে।...ত্রিস্কো ডাকছে কেন? ঐ যে ওর পিছনে পিছনে ব্রান্দো দৌড়ে আসছে!...ব্যাপার কি!

কলোঁবা অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া লিডিয়া'র কোলে অর্সো'র মাথা শোয়াইয়া দিয়া সে ফেরারীদের কাছে দৌড়িয়া গেল।

লিডিয়া কলোঁবার ব্যবহারে আশ্চর্য হইয়া দেখিল যে সে বিজন বনের মধ্যে একজন যুবা পুরুষের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পাছে সরিয়া গেলে আহত ব্যক্তির বেদনা লাগে এই ভয়ে সে সরিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। কিন্তু অর্সো নিজেই তাহার ভগিনীর-দেওয়া এমন সুখকর উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া ডান হাতের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া বলিল—মিস লিডিয়া, আপনি এত শিগ্গীর চলে যাবেন? এই হত-ভাগা দেশে আপনার বেশী দিন থাকা উচিত, তা আমি মনে করি না,... কিন্তু... যখন থেকে আপনি এখানে এসেছেন তখন থেকে আপনাকে বিদায়বাণী বলতে হবে মনে করে আমি শতেকবার দারুণ বেদনা বোধ করেছি।...আমি একজন গরিব লেফটেন্যান্ট...ভবিষ্যৎ বলে' কিছু আশা নেই...এখন ত ফেরারী মিস লিডিয়া, এখন কি বলা সাজে যে আমি তোমায় ভালবাসি।.. কিন্তু তোমাকে সে কথা শুনিয়া দেবার অবসর আমার এইই। আমি আমার হৃদয়ভার তোমার কাছে লাঘব করে' এখন আমার সকল দুঃখ লঘু মনে করছি

লিডিয়া তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, যেন ঘন অন্ধকারও তাহার লজ্জার অরুণিমা ঢাকিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে কম্পিত গদগদ ভাবে বলিল—দেখুন রেবিয়া মশার, আমি কি এখানে আসতাম যদি.....

অসমাপ্তবাণী লিডিয়া অর্সো'র হাতে সেই মিশরী আংটিটি আঙুলে আঙুলে ফিরাইয়া দিল।' তারপর প্রাণপণ

চেঁচায় তাহার স্বাভাবিক উপহাস-রসিকতার স্বর ফিরাইয়া আনিয়া সে বলিল—দেখুন, এমনতর কথা বলা আপনার ভারী অগ্রায়'।...বিজন বনে, ডাকাতে'র দলের মধ্যে, আপনি জানেন কিনা যে আমার রাগ করার সাধ্য নেই!

যে হাতখানি আংটি ফিরাইয়া দিতেছিল অর্সো তাহাতে চুষন করিতে গেল। লিডিয়া চট করিয়া হাত সরাইয়া লওয়াতে অর্সো তাহার আহত হাতের ভরে মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। অর্সো বেদনা পাইয়া কাতর-ধ্বনি প্রকাশ না করিয়া পারিল না।

লিডিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিল—বন্ধু, বন্ধু আমার, তোমার কি লাগল? আমার দোষেই লাগল, আমায় ক্ষমা কর।...

উহারা পরস্পরে নিজের ঘাড়ে দোষ লইবার জন্ত চাপা গলায় খানিকক্ষণ তর্ক করিতেছিল। কলোঁবা উর্কুখাসে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, সে উহাদিগকে যেমন অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল উহারা ঠিক তেমনি আছে। সে বলিয়া উঠিল—পুলিশ! পুলিশ! দাদা, তুমি একটু চেঁচা করে উঠে হেঁটে চল, আমি তোমাকে ধরছি।

অর্সো বলিল—আমাকে ছেড়ে দাও। ফেরারীদের পালাতে বল। আমায় যদি ধরে তাতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু মিস লিডিয়াকে এখান থেকে নিয়ে যাও। দোহাই ভগবানের, ওরা যেন ওঁকে এখানে না দেখে!

ব্রান্দো কলোঁবার পিছনে পিছনেই আসিয়াছিল, বলিল—আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। পুলিশের সার্জেন্ট বারিসিনি উকিলের ধর্মবেটা; সে ত তোমায় গ্রেপ্তার করবে না, খুন করবে, তারপর বলবে যে আসামীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি

অর্সো কষ্টে-কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কয়েক পা চলিল, তারপর ধমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি চলতে পারছি না। তোমরা সব পালাও। মিস্ নেভিল, বিদায়! তোমার হাতখানি একবার আমার দাও, বিদায় বিদায়! •

রমণীধর বলিয়া উঠিল—আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না।

ব্রান্দো বলিল—যদি তুমি হাঁটতে না পার তবে

আমাকেই তোমায় বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এস, লেফটেন্যান্ট সাহেব, একটু হুব কর। ঐ পিছনের খদের ভিতর দিয়ে আমরা ঠিক পালিয়ে যাব খন। পণ্ডিতজী তত-ক্লম ওদের একটু কাজ দিয়ে ব্যস্ত করে রাখবে।

অর্সো মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বলিল—না, আমাকে ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের দোহাই তোকে কলোঁবা, তুই মিস্ নেভিলকে এখান থেকে নিয়ে পাল।

ব্রান্দো বলিল—কলোঁবা ঠাকরুণ, তোমার গায়ে ত বেশ জোর আছে; তুমি ওর বগলের কাছটায় ধর, আমি পা ধরি; ঠিক! চলে চল সোজা!

অর্সোর নিবেদ ও ভৎসনা অগ্রাহ্য করিয়া উহারা দুজনে তাহাকে বহিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। অত্যন্ত ভয়ে কাতর হইয়া লিডিয়াও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইতেছিল। একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল, অমনি পাঁচ ছয়টা বন্দুক জবাব দিয়া উঠিল। লিডিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্রান্দো গালি দিল কিন্তু দ্বিগুণ জোরে পা চালাইয়া দিল। কলোঁবাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিতে লাগিল—গাছের ডাল তাহার মুখে শপ-শপ করিয়া চাবুকের মতো পড়িতেছিল, কাঁটায় তাহার পোষাক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে তাহার সঙ্গিনীকে বলিল—বোনটি আমার, নীচু হও নীচু হও, পেছন থেকে গুলি এসে লাগতে পারে।

উহারা প্রায় পাঁচ শ কদম চলিয়া গিয়াছে, ঠিক করিয়া বলিতে গেলে দৌড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় ব্রান্দো বলিল, আর সে পারিতেছে না, এবং কলোঁবার অনু-রোধ ও ভৎসনা সত্ত্বেও সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ নেভিল কোথায়?

লিডিয়া বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়া এবং প্রতি-পদে বনের গহনতায় গতিরুদ্ধ হইয়া একাকী পিছা-ইয়া পড়াতে পলাতকদিগের চিহ্ন পর্য্যন্ত হারাইয়া দারুণ উদ্বেগ ও আতঙ্কে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রান্দো বলিল—তিনি ত, পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি হারাবে না, মেয়ে লোকরা কখনো হারায় না। শোনো শোনো, অর্সো আস্তো, পণ্ডিতজী তোমার বন্দুক

নিয়ে ক্যায়সা মুমধড়াকা বাধিয়ে দিয়েছে। আপশোষের কথা যে আঁধার রাতে কিছু চোখে সোঝে না; রাতের ব্যাপারে কোনো পক্ষেরই বেশী কিছু ক্ষতি হয় না।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—চুপ! আমি একটা ঘোড়ার আওয়াজ পাচ্ছি! আর আমাদের মারে কে!

বাস্তবিক একটা ঘোড়া বনের মধ্যে চরিতে আসিয়া বন্দুকের আওয়াজে ভয় পাইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল।

ব্রান্দোও বলিয়া উঠিল—আর আমাদের পায় কে!

দৌড়িয়া গিয়া ঘোড়াটার কেশর ধরা এবং কলোঁবার সাহায্যে একগাছা দড়ী লাগামের মতো করিয়া ঘোড়ার মুখে পরাইয়া দেওয়া ব্রান্দোর এক নিমেষের ব্যাপার। সে বলিল—এখন পণ্ডিতজীকে মানা করে দেওয়া যাক।

সে দুইবার শিশ দিল; দূর হইতে একটা শিশে তাহার জবাব আসিল; এবং মাগ্টনের বন্দুকের গম্ভীর গর্জন ধামিয়া গেল। ব্রান্দো ঘোড়ার উপর এক লাফে চড়িয়া বসিল। কলোঁবা তাহার দাদাকে তুলিয়া ব্রান্দোর সম্মুখে বসাইয়া দিল; ব্রান্দো এক হাতে তাহাকে আঁকড়া-ইয়া ধরিয়া অপর হাতে ঘোড়া চালাইতে লাগিল। ডবল বোঝা ষাড়ে লইয়াও ঘোড়াটা পেটে ব্রান্দোর পায়ের দুই গুঁতা খাইয়া উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িয়া এমন একটা খাড়া পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিল যে কর্শিকা ছাড়া আর অন্য যে-কোনা দেশের ঘোড়া হইলে সেখানে শতক বার ষাড়মুড় মুচড়াইয়া ডিগবাজি খাইয়া পড়িত ও শতকবার মরিত।

কলোঁবা চলিতে চলিতে প্রাণপণ জোরে লিডিয়ার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথার জবাব দিল না।...কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে করিতে সে একটা পথের উপর দুজন সিপাহীর সামনে গিয়া পড়িল। সিপাহীরা তাহার সাড়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—হু কুম দার!

কলোঁবা মস্তরার স্বরে বলিল—ভ্যালা! গুলির নেশাটা জমেছিল কেমন! কজন কাত হ'ল?

একজন সিপাহী বলিল—তুমি ফেরাবী আসামীদের সঙ্গে ছিলে। আমাদের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।

—খুসীর সঙ্গে। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এখানে কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে আগে খুঁজে নিরসো।

—তোমার বন্ধু আগেই ধরা পড়েছে। চল তার সঙ্গে হাজতখানায় যুলাকাত হবে।

—হাজতখানায়? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে এখন। এখন আপাতত আমাকে তার কাছে নিয়ে চল ত।

সিপাহীরা তাহাকে ফেরাবী আসামীদের আড্ডায় লইয়া আসিল; সেখানে তাহারা তাহাদের বিজয়লক্ষ সামগ্রী জড়ো করিয়া রাখিয়াছিল—অর্থাৎ কিনা, অর্সোর গায়ের সেই তেরপালখানা, একটা পুরাতন মালুসা, আর একটা জলভরা কুঁজো। সেইখানে লিডিয়া ছিল; সিপাহীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, ভয়ে আধমরা হইয়া, ফেরাবীর সংখ্যায় ক জন এবং কোন দিকে পলাইয়াছে প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু চোখের জল ঢালিতেছিল।

কলোঁবা তাহার বুকে ঝাপাইয়া গিয়া পড়িয়া চুপি চুপি কানে কানে বলিল—ওরা বেঁচে গেছে।

তারপর সিপাহীদের সার্জেন্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মশায়, আপনি যে-সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করছেন ইনি তার বিন্দুবিসর্গও যে জানেন না তা আপনি বেশ জানেন। আমাদের গাঁয়ে ফিরে যেতে দিন, সেখানে সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

সার্জেন্ট বলিল—হাঁগো পিয়ারী হাঁ! আপনাদের খুব করে' আদব কায়দার সঙ্গে ষাড়ে করে দিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু হয়ত আপনাদের সেটা বিশেষ মনঃপূত হবে না। এমন রাত্রিকালে পলাতক খুনী ডাকাতদের সঙ্গে কি করা হচ্ছিল তার জবাবদিহি করতে হবে চাঁদ, মনে থাকে যেন!

কলোঁবা বলিল—সার্জেন্ট সাহেব, খবরদার! মুখ সামলে কথা কয়ো! এই মেয়েটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটুম, ওর সঙ্গে ঠাট্টা করা চালাকি না!

একজন সিপাহী তাহাদের দলপতির কানে কানে

বলিল—হ্যাঁ, হতেও পারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটুম! দেখছেন না ওর মাথায় টুপী রয়েছে।\*

সার্জেন্ট বলিল—আরে রেখে দে তোর টুপী! এমন ঢের ঢের টুপী দেখেছি! ওরা দুজনেই দেশের দুবমন হুঁদে পণ্ডিতজীটার সঙ্গে ছিল; ওদের গ্রেপ্তার করে' নিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। যাক, এখন আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। সেই পাজি ফরাশী মাতাল হাবিলদার তোপ্যা না থাকতে বেশ সুবিধেই হয়েছে, আমি জঙ্গল ঘেরাও করে সব ক'টাকে একেবারে হালি গৌঁথে গ্রেপ্তার করে ফেলব।

কলোঁবা বলিল—আপনারা ত সাত জন আছেন? জানেন কি মশায়রা যে যদি কোন ক্রমে গাধিনি, সারোখী আর থিয়োডোর পোলী তিন ভাই, ব্রান্দো আর পণ্ডিতজীর সঙ্গে জুটে যায়, তা হলে ওরা আপনাদের বেশ বেগ দিতে পারে? যদি আপনাদের জঙ্গলী রাজা থিয়োডোর পোলীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের মতলব থাকে তবে তার মধ্যে থাকাটা আমার পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রাতকাণা গুলিগুলো আবার শক্রমিত্র চিনতে পারে না।

কলোঁবা যে-সব হুঁদে দুর্ধর্ষ দস্যুদের নাম করিল তাহাদের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনাটা সিপাহীদের মনটা বেশ একটু নাড়িয়া দমাইয়া দিয়া গেল। ফরাশী কুকুর হাবিলদার তোপ্যাকে অনর্গল গালি দিতে দিতে সার্জেন্ট সাহেব সিপাহীদের সরিয়া পড়িতে ছকুম দিল; এবং সেই ক্ষুদ্র বাহিনীটি পিয়েত্রানরার পথ ধরিয়া তেরপাল ও কুঁজো জয়চিহ্ন স্বরূপ বহিয়া লইয়া চলিল। আর সেই মালুসা-খানার বিচার এক লাথির চোটে ঠাণ্ডা করিয়া দিল। একটা সিপাহীর ভারী সাধ হইল, সে লিডিয়ার হাত ধরিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু কলোঁবা তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল—খবরদার! কেউ গায়ের হাত দিতে পাবে না। তোরা কি মনে করিস যে আমরা তোদের মতন কাপুরুষ, পালিয়ে যাব? এস ভাই লিডিয়া, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। নেও ভাই আর ধুকির মতন

\* ফরাশী ও ইটালিয়ান রীতি অনুসারে লেডি হাড়া অপর সাধারণ স্ত্রীলোকের বনেট টুপী পরিবার অধিকার থাকে না।



কোনতে হবে না, লক্ষ্মীটি! এ একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল; কিন্তু এতে কিছু ক্ষতি হবে না; আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা খেতে বসতে পারব গিয়ে। সত্যি আমি নির্ধেয় মরে যাচ্ছি!

লিডিয়া চাপা গলায় বলিল—সবাই আমাকে কি মনে করবে?

—মনে করবে, তুমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে গিয়েছিস, আবার কি।

—ম্যাজিষ্ট্রেট কি বলবে?... আমার বাবাই বা কি বলবেন?

—ম্যাজিষ্ট্রেট? ... তাকে তুমি বলে দিয়ো, যাও যাও তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও, আসামীদের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি ফলিয়ো। আর তোমার বাবা?... তুমি যে রকম করে দাদার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তাতে ত আমার মনে হয়েছিল যে তোমার বাবাকে বলবার মতো কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে।

লিডিয়া কিছু না বলিয়া কলোঁবার হাত ধরিয়ো নাড়িয়া দিল।

কলোঁবা লিডিয়ার কানের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিতে লাগিল—আমার দাদা কি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নয়? তাকে কি তুমি একটুও ভালোবাস না?

লিডিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া কেলিয়া বলিল—আমরি! তুমি ভাই আমার সব কথা ফাঁস করে ফেলছ, তোমার ওপরে আমার ভাই, এত বিশ্বাস ছিল!

কলোঁবা একখানি হাত দিয়া লিডিয়ার কোমর জুড়াইয়া ধরিয়ো বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার ললাটে চুশন করিল। তারপর কানে কানে বলিল—ছোট বোনটি আমার, আমাকে ভাই ক্ষমা করবে?

লিডিয়া কলোঁবাকে চুশন ফিরাইয়া দিয়া বলিল—অয়্যরী ভগিনী আমার, তোমাকে ক্ষমা না করে' আর উপায় কি!

ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব পিয়েত্রানরার দারোগার বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন। কর্ণেল নেভিল কুণ্ডার জঘ্ন অন্ত্যস্ত উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন; তিনি বিশ দফা তাঁহাদের কাছে আসিয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে কোনো ধর

পাওয়া গিয়াছে কি না; এমন সময় সার্জেন্ট কর্তৃক অগ্রদূত রূপে প্রেরিত একজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বর্ণনা করিতে লাগিল ফেরারী দস্যুদের সহিত কিরূপ ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক যুদ্ধ হইয়াছে, বাস্তবিক উভয় পক্ষের কেহ হত বা আহত না হইলেও সেই মারাত্মক যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে অনেক—একটা তেরপাল, একটা জলভরা কুঞ্জো, আর দুজন জীলোক,—এরা বোধহয় ডাকাতদের উপপত্নী অথবা তাহাদের গোয়েন্দা চর। এইরূপ সংবাদ শুনিতে শুনিতেই সশস্ত্র সিপাহীতে পরিবৃত হইয়া সেই জীলোক দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইল। কলোঁবার মুখ লাল হইয়া উঠিল, লিডিয়ার লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্চর্য, এবং কর্ণেল নেভিল বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। পুলিশ সাহেব লিডিয়াকে জেরা করিয়া এক প্রকার নীচ ও ক্রুর আনন্দ সন্তোগ করিতেছিল, এবং লিডিয়া একেবারে লজ্জায় ত্রিয়মাণ ও নীরব না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর খামিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আমার মনে হচ্ছে বিচারে সকলেই খালাস পাবে। দৈবক্রমে এই মহিলা দুজন যে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন এর চেয়ে সু-যোগ আর কি হতে পারে। ওঁরা বেড়াতে গিয়ে একজন যুবককে আহত দেখে তার কাছে যদি গিয়েই থাকেন তবে ত সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তারপর কলোঁবার দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি আপনার ভাইকে খবর পাঠিয়ে দিতে পারেন যে তাঁর মকদ্দমা এমন সুরাহা ধরেছে যে আমি এমন আশাই করতে পারি নি। লাস পরীক্ষার ফল, ও কর্ণেল সাহেবের জবানবন্দী হ'তে জানা যাচ্ছে যে আপনার দাদা আগে আক্রান্ত হয়ে জরায় দিয়েছিলেন মাত্র। এবং উনি লড়াইয়ের সময় একলাই ছিলেন। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু ওঁর শীঘ্র বন ছেড়ে এসে গ্রেপ্তার হওয়া দরকার।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া কর্ণেল নেভিল, কণ্ডা ও কলোঁবাকে লইয়া জুড়াইয়া-হিম খাবার খাইতে বসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও সিপাহীদেরকে ঠাট্টা করিতে করিতে কলোঁবা বেশ

জোর ফুধার পরিচয় দিতে লাগিল। কর্ণেলও একটি কথাও না বলিয়া একদৃষ্টে কণ্ঠার দিকে তাকাইয়া গস্তীরভাবে বেশ ভালো রকমই আহার করিতেছিলেন কিন্তু তাহার কণ্ঠা তাহার খালা হইতে একবারও চোখ তুলিতেছিল না। অবশেষে কর্ণেল গস্তীর অথচ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ইংরেজি ভাষায় বলিলেন—লিডিয়া, তুমি তা হলে দেঙ্গা রেবিয়ার সঙ্গে বাগ্‌দান করেছ ?

লিডিয়া লজ্জায় লাল হইয়াও দৃঢ় স্বরেই বলিল—হাঁ বাবা, আজকে।

তারপর সে ধীরে ধীরে তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ-ভয়-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া পিতার দিকে চাহিল এবং যখন দেখিল যে তাহার মুখভাবে বিরক্তির লেশমাত্র নাই, তখন সে পিতার বুকের উপর কাঁপাইয়া পড়িয়া আদরিণী সোহাগিনী কণ্ঠার মতো তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কর্ণেল বলিলেন—বেশ করেছ মা, সে বড় ভালো ছেলে। কিন্তু ভগবান সাক্ষী তোমাদের এই সর্বনেশে দেশে আর থাকতে দেবো না; যদি রাজি না হও তবে আমিও রাজি হব না জেনে রেখ।

কলোঁবা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত তাহাদের রকম দেখিয়া দেখিয়া বলিল—আমি ত ইংরেজি জানি নে; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন আপনারা যা বলছেন তা আমি কতকটা আন্দাজ করতে পারছি।

কর্ণেল উত্তর করিলেন—আমরা বলছিলাম কি, তোমাকে একবার আমাদের দেশে আয়ারলণ্ডে বেড়াতে নিয়ে যাব

কলোঁবা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—সত্যি! নিশ্চয় যাব, আমি'য়ে লিডিয়ার কলোঁবা ঠাকুরকি হব! কর্ণেল সাহেব, ঠিক কি না? তবে আমার বৌদিদির হাতে ধরে সম্পর্ক পাতিয়ে নি!

কর্ণেল বলিলেন—চুষন আলিঙ্গন দিয়ে বরণ করাই রীতি!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## উদ্ভিদের অনুভব শক্তি

উদ্ভিদগণের যে ধারণা আছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তবে ইহাদের যে আমাদের মত অনুভবশক্তি আছে এবং ইহারা যে ক্ষেত্র বুদ্ধি কার্য করিয়া থাকে সে কথা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্যতীত অতি অল্পলোকেই জানেন। জীবনধারণ করিবার জন্ত, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার জন্ত, আশ্রয়লাভ করিবার জন্ত, বংশরক্ষার জন্ত ইহারাও যে প্রাণীদিগের দ্বায় কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা আলোচনা করিলে বাস্তবিকই মোহিত হইতে হয়। এইরূপ কৌশল অবলম্বন যে জীবদিগের একচেটিয়া নহে তাহা বুদ্ধিতে আর বিলম্ব থাকে না।

জীবের যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বলিয়া পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে উদ্ভিদের ঠিক সেইরূপ কিছু আছে কিনা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্ভিদ-শরীরের কোন কোন অংশের তুলনা করিতে পারি। কিন্তু জীব যেমন ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত, উদ্ভিদে সে রূপ কিছুই নাই। কণ্ঠী দেখিয়া একএকটি উদ্ভিদ-শরীরংশকে ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে মাত্র। জীবের পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সকল তথ্য মস্তিষ্কে নীত হইতেছে এবং তথা হইতে কর্তব্য নির্ধারিত হইয়া জীবকে ঠিক পথে চালিত করিবার উপায় আছে, উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে আমরা ঠিক অবগত নহি। তবে উদ্ভিদের অনুভব-শক্তির অস্তিত্ব সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

উদ্ভিদের অনুভবশক্তি (Sensitiveness) সম্বন্ধে জাপ-দ্বিখ্যাত ডারউইন প্রথমে ঔবেজ্ঞানিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। সান-ডিউ (Sundew) নামক কীটানী (Insectivorous) বৃক্ষই প্রথমে এই বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিলেন যে উক্ত বৃক্ষের পাতায় কতগুলি গ্রন্থিযুক্ত গুঁয়া (Glandular hair) আছে। মস্কিকা বা অণু কোনও কীট আসিয়া পাতার উপর বাসলে এই গুঁয়াগুলি উত্তেজিত হয়; তাহার ফলে

গ্রন্থিগুলি ক্ষীত হইতে থাকে, পাতাটি ক্রমে একটি পাত্রেৰ আকার ধারণ করে এবং এই গ্রন্থিগুলি হইতে পাচক রসের স্থায় এক প্রকার আঠাল রস নিঃসৃত হইয়া ছুঁতগা জীবের ইহলীলা শেষ করিয়া দেয়

এই ব্যাপার দেখিয়া ডারউইন উদ্ভিদের অনুভবশক্তি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি আরও দেখান যে এই স্ত্রীগুলিকে অনৈসর্গিক উপায়ে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, তাহাতে কিন্তু পাচকরস নিঃসৃত হয় না।

ডারউইন এই তথ্য প্রচার করিলে (Wiesner) উইজনার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারে কিনা তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিলেন যে উদ্ভিদের সমস্ত অংশ সমভাবে অনুভব করিতে পারে না।

(১) প্রথমে তাঁহারা (Passiflora) পাসীফ্লোরা নামক উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই লতার শুণ্ডের (Tendrils) উপর তঁহু গ্রেন পরিমিত সূতার টুকরা চাপাইলে সমস্ত লতাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে উক্ত লতার অন্য কোন স্থান এইরূপ অল্প উত্তেজনায় এত অধিক উত্তেজিত হয় না।

(২) (Dionea) ডায়োনিয়া-পত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক স্ত্রী (Sensitive hair) অতি অল্প উত্তেজনায় সমস্ত পত্রটিকে স্পন্দিত করিতে থাকে।

(৩) মিছুটীর (Deadnettle) পত্রের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই উহার উপরে যে বালুকাস্থক (Silicious) পদার্থ থাকে তাহা ধসিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কাঁটাটি আক্রমণকারীর শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয়।

(৪) ছুপাটীর বীজাধারের বা ফলের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই বীজাধারটি ফাটিয়া এমন হঠাৎ শুটাইয়া যায় যে বীজগুলি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

(৫) Venus's Flytrap, Sundew প্রভৃতি কীটামী বৃক্ষ ও লতার স্ত্রীগুলি অতি অল্পেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ কতকগুলি পরীক্ষার পর ইহা নির্ধারিত হইল যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি সকল স্থানে সমভাবে নাই। জীবশরীরে যেমন স্পর্শানুভূতিস্থান, শৈত্যানুভূতিস্থান (Touchspots, coldspots) প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে, উদ্ভিদ-শরীরেও ঠিক সেইরূপ কতকগুলি অনুভবকেন্দ্র (Sensory areas) আছে। সেই স্থানগুলি অতি অল্প উত্তেজনায় স্পন্দিত হইতে থাকে, অন্য স্থানে সেরূপ উত্তেজনায় কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

যখন প্রমাণিত হইল যে উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারে না, তখন কোন্ কোন্ অংশ অনুভব করিতে পারে তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল। ডারউইন প্রথমে এই পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে নবজাত উদ্ভিদের শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের বা ডগের (tip) অনুভবশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। তিনি এই কথা প্রচার করিলে (Cisielski) সিজিলস্কী কতকগুলি উদ্ভিদের সূক্ষ্মাগ্রভাগ (tip) কাটিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপ বহু পরীক্ষার পর নির্ধারণ করিলেন যে যতদিন এইগুলি আঘাতযুক্ত না হয় অর্থাৎ সূঁ না হইয়া উঠে ততদিন ইহাদের অনুভবশক্তি থাকে না। সম্প্রতি (Pfeffer) পেফারও নানা প্রকার পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বাহ্যতঃ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহাদের যে অনুভব বরিবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আর নাই। ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রগুলিকে আমরা “অনুভব-কেন্দ্র” বলিয়া উল্লেখ করিব।

জীবজগতের স্বায়বিক স্পন্দনের বিশেষত্ব এই যে উত্তেজনা ও স্পন্দনের মধ্যে একটি সঘন আছে। একটি স্নায়ুকে যখনই একভাবে উত্তেজিত করা যাইবে তখনই সে একইপ্রকারে স্পন্দিত হইবে। তাড়িৎ বা অন্য কোন প্রকার উত্তেজকের সাহায্যে একটি স্নায়ু উত্তেজিত হইলে তাহা চিরকালই একই প্রকারে স্পন্দিত হয়। উদ্ভিদ-জগতেও আমরা সেই সঘন দেখিতে পাই। অনুভব-কেন্দ্রগুলি বিভিন্নপ্রকারে উত্তেজিত হইলে বিভিন্ন প্রকারে

স্পন্দিত হইতে থাকে। কোনবার আমরা একরূপ ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) পাইয়া থাকি; কোনবার অন্যরূপ ভাবাত্মক সাড়া (Negative curve) পাইয়া থাকি। তবে যে প্রকারে উত্তেজিত হইলে ভাবাত্মক (Positive curve) পাই, সেই প্রকারে যখনই পরীক্ষা করি-না চিরকালই সেইরূপই ভাবাত্মক সাড়া পাইব। এখানে ইহা বলা আবশ্যিক যে, অল্প অল্প সমস্ত সর্ভ পরীক্ষাকালে ঠিক থাকা আবশ্যিক; তাহা না হইলে অবশ্য অল্প প্রকার ঘটিতে পারে।

এক্কেণে আমরা এক সময়ে যদি দুইটি ঠিক বিপরীত ভাবের উত্তেজক দিয়া পরীক্ষা করি তাহা হইলে কি ফল হইবে? বিপরীতভাবের উত্তেজক অর্থে একটিতে ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) এবং অপরটিতে (Negative curve) অভাবাত্মক সাড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন উত্তেজকের কথা বলা যাইতেছে। যদি দুইটি উত্তেজকের শক্তি তুল্য হয় তাহা হইলে আমরা কোন প্রকার স্পন্দনের লক্ষণ দেখিতে পাইব না। বাস্তবিক অতিসূক্ষ্ম তাড়িৎমান যন্ত্রের (delicate galvanometer) সাহায্যেও এই স্পন্দনের কোন লক্ষণই ধরিতে পারা যায় না। \* কিন্তু যদি দুইটি উত্তেজক তুল্য না হয় অর্থাৎ একটি অপরটির অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে যেটি প্রবল হইবে সেটির অনুসারেই বৃক্ষটি স্পন্দিত হইবে।

\* উপরে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা গেল উহা সাধারণ লোকের দ্বারা সাধিত হওয়া দুষ্কর। উত্তেজনা অনুসারেই যে স্পন্দন ঘটয়া থাকে তাহার গুণিতক সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাউক। এইগুলি সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(১) শিকড় মাটির নিম্নে নামিতে নামিতে যখন কোন বাধা পায় তখন যাহাতে সহজে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে এমনিভাবে ঝাঁকিতে আরম্ভ করে।

(২) আবার যদি কখন এমন কোন স্থানের উপর আসিয়া পড়ে যাহা আর ভেদ করিয়া যাইবার উপায় থাকে না তখন ইহা সেই বাধাপ্রাপ্ত জমির উপর দিয়া সমান্তর (parallel) ভাবে চলিতে থাকে। পরীক্ষা

করিবার জন্য ফুলের টবের মধ্যে একটা কাচের টুকরা রাখিয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া দিয়া একটি গাছ পুঁতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাধমসীমের ও তেঁতুলের বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ হয় এবং শিকড়ও দ্রুতভাবে মাটির নিম্নে নামিতে থাকে। ছোলা সরিষা প্রভৃতির দ্বারাও এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(৩) উদ্ভিদের জল-শোষণকারী শক্তির (hydro-tropism) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাটি হইতে রস পাইবার জন্য উদ্ভিদের শিকড় চিরকালই মাটির নীচে গিয়া থাকে।

(৪) যে দিকে আলোক পায় সেই দিকেই গাছ ঝাঁকিতে থাকে, ইহা হইতেও উত্তেজনা ও স্পন্দনের নিয়ম অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। একটি মাধমসীম বা কুমড়ার বীজ একটি টবে পুঁতিয়া একটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলে এবং সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র একটি আলোকপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিলে দেখা যাইবে যে গাছটি জন্মাইয়া এই আলোকপ্রবেশের পথের দিকে আসিতেছে। কিছুদিন পরে এই পথটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই পথের বিপরীত দিকে অপর একটি পথ করিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গাছটি আবার সেইধারে ঝাঁকিয়া চলিয়াছে। সীম, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গাছে এই পরীক্ষা করা সুবিধা, কেননা ইহারা অতি শীঘ্র বাড়িতে থাকে। সমস্ত গাছেই এইরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, তবে উহা সময়-সাপেক্ষ।

এতক্ষণ উদ্ভিদের কার্যকরী ও অনুভব-শক্তির কথা বলা হইল। সকল ক্ষেত্রেই কার্যের পর অবসাদ লক্ষিত হয়। কোন মাংসপেশীকে আমরা যদি ক্রমাগতই তাড়িৎ দিয়া (electrically) উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে ইহা আর স্পন্দিত হয় না। তখন ইহার বিশ্রাম আবশ্যিক। কিছুক্ষণ ইহাকে উত্তেজিত না করিলে ইহার স্পন্দনশক্তি ফিরিয়া আসে। জীবজগতের জায় উদ্ভিদ-জগতেও “অবসাদ” (fatigue) লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ডাইয়োনিয়ার সূক্ষ্ম কৈশিক গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করিলে সমস্ত পত্রটি মুড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিং

যদি কোন কৌশলে আমরা পত্রটিকে যুড়িতে না দিয়া একটি গ্রন্থিকে বারবার উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে এই গ্রন্থির অনুভবশক্তি লোপ পায়, তখন পাতাটি ছাড়িয়া দিলেও আর যুড়ে না। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের Response in Living and Nonliving নামক পুস্তকে এইরূপ অনেকগুলি পরীক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

ক্রোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি বিষাক্ত অসাড়-করিবার-শক্তিসম্পন্ন বাষ্পগুলি যেমন জীবজগতে স্নায়ুশৃঙ্খলীর উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া অবসাদ ও অসাড়ভাব আনিয়ন করে, উদ্ভিদজগতেও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। আচার্য্য বসু গাজর, মূলা, ফুলকপির ডাটা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। এই-সমস্ত উদ্ভিদের অবসাদ সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু ক্রোরোফরম বা ঈথারের বাষ্প লাগিবামাত্র ইহাদের অনুভবশক্তির হ্রাস হয়। তখন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও ইহারা স্পন্দিত হয় না। তবে এই বাষ্পের প্রভাব হইতে সরাইয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরেই ইহাদের এই অবসাদ দূর হয় এবং পুনরায় যথানিয়মে স্পন্দিত হইতে থাকে।

জীবজগতে যেমন (narcotic) অবসাদক বিষের সাহায্যে একেবারে স্পন্দন লোপ করা যাইতে পারে উদ্ভিদজগতেও তাহাই হয়।

স্নায়ুশৃঙ্খলীকে আমরা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। কতকগুলির সাহায্যে বহির্জগতের সমস্ত ষাৎ প্রতিঘাত অনুভূত হয়। অপরগুলির দ্বারা স্পন্দন-কার্য্য সমাধা হয়। তৃতীয়টির কার্য্য এই যে বহির্জগতের ষাৎ প্রতিঘাত বুঝিয়া কিরূপ স্পন্দিত হওয়া কর্তব্য তাহারই নির্ধারণ করা। মোটের উপর এই তিনটিকে অন্তর্মুখ প্রবাহ, বহির্মুখ প্রবাহ, ও মস্তিষ্ক বলিতে পারি।

স্নায়ুশৃঙ্খলীর কার্য্যকলাপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। সাধারণের বোধগম্য একটি উদাহরণ লইয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিলে ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইবে।

মনে করুন রাজ্যের কোন একস্থানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে পারেন

না, তাহাদের রাজ্যেই থাকিতে হয়, কিন্তু সমস্ত রাজ্যের মঙ্গলের জন্ত যুদ্ধের সমস্ত সংবাদাদি জ্ঞাত হওয়া চাই। একারণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে, দিবারাত্রিই আড়িৎবার্তা সাহায্যে যুদ্ধের সকল সংবাদই মন্ত্রীগণের নিকট পৌঁছিতেছে। তাহারা পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া সেক্ষেত্রে কি করা আবশ্যিক তাহার উপদেশ দিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ পাঠাইতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে প্রেরিত তাড়িৎ-বার্তা যেমন মন্ত্রীগণকে যুদ্ধের আন্তর্ভুক্তিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত করায়, অন্তর্মুখ স্নায়বিক প্রবাহও তেমনি বহির্জগতের সকল তথ্যই মস্তিষ্ককে জ্ঞাত করায়। মন্ত্রীগণের পরামর্শাভ্যর্থী যেমন যুদ্ধ চলিতে থাকে তেমনি মস্তিষ্কের (nerve cell) স্নায়ুকোষের নির্দেশানুযায়ী স্পন্দনকার্য্য ঘটিয়া থাকে।

জীবজগতের উচ্চস্তরে এই তিনটি বিশদ বিভাগ স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া থাকি, কিন্তু উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ তিন প্রকার স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে জীবে ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মোটামুটিভাবে অনুভবকেন্দ্রগুলির (Sensory areas) তুলনা করিতে পারি। জীবজগতের উচ্চস্তরে চক্ষুর আলোক অনুভব করিবার শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু যতই নিম্নস্তরে নামিতে থাকি ততই দৃষ্টির প্রাধর্য্য কমিতে থাকে, ক্রমে এমন ক্ষীণ হয় যে নিম্নস্তরের অনেক জীবকে কেবল আলোক অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। উদ্ভিদজগতে চারা গাছগুলিরও আলোক অনুভব করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। জীবগণ যেমন স্বকের দ্বারা স্পর্শন অনুভব করিয়া থাকে, উদ্ভিদগণ সেইরূপ লতাতন্ত (tendrils) ও শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ (root-tip) দ্বারা অনুভব করিয়া থাকে; কাজেই স্বকের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জীবের ভারবোধশক্তির সহিত উদ্ভিদের ভূকেন্দ্রাভিমুখে (force of gravity) গমনের তুলনা করা যাইতে পারে। ক্রোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি নানা প্রকার উত্তেজক নানা প্রকার স্পন্দন দেখাইয়া থাকে; তাহা হইতে ইহাদের স্বাদগ্রহণের ও স্পর্শের শক্তির পরিচয় পাই।

মোটের উপর উদ্ভিদ ও জীবজগতে স্নায়বিক প্রবাহের

যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার স্থূল কারণ এই যে উদ্ভিদগণ অজড়জগতের নিয়ন্ত্রণে অবস্থিত। আমরা যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকি স্নায়বিক স্পন্দনের ক্রমবিকাশ ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের যেরূপ অনুভবশক্তি আছে তাহা জীবজগতেও দুঃপ্রাপ্য। পাসীফ্লোরা (Passiflora) এত অল্প আঘাতে স্পন্দিত হয় যে জীবের সর্বাঙ্গের স্পর্শানুভবক্ষম ইন্দ্রিয় জিহ্বাও তাহা অনুভব করিতে অক্ষম। আমাদের চক্ষু যে-সমস্ত সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি অনুভব করিতে পারে না (Phalaxis) ফালারিসের ক্ষুদ্র চারাগুলি তাহাও অতি সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি অনেকস্থলে অধিক হইলেও জীবের তুলনায় তাহাদের স্পন্দনশক্তি অতি অল্প। উদ্ভিদের স্পন্দিত হইতে অনেক সময় লাগে এবং একবার স্পন্দন আরম্ভ হইলে উত্তেজনার অভাবেও অনেকক্ষণ স্পন্দিত হইতে থাকে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্বানুবৃত্তি)

মোগল-সম্রাট প্রায়ই অস্তঃপুরে অবস্থিত করিতেন। এমন কি স্বয়ং আকবরও অস্তঃপুরে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহার দরুণ তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়।

আইন-ই-আকবরিতে আমরা দেখিতে পাই :—

“সম্রাট-বাহাদুর সকল বিষয়েই সুশীল ও পারিপাট্য ভাল-ভাসেন...বেগমদিগের সংখ্যাধিক্য বড় বড় রাজনীতিকদিগকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে; কিন্তু এইরূপ সমস্যা স্থলে, সম্রাট-বাহাদুর তাহার বিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জগুই যেন একটা নূতন উপলক্ষ্য প্রাপ্ত হন। তিনি একটা বৃহৎ ঘরের মধ্যে পাঁচটি ইমারৎ নির্মাণ করাইয়াছেন। পাঁচ হাজার রমণী থাকা সত্ত্বেও সেই অস্তঃপুরে তিনি বেশ পাস্তিতে অবস্থান করেন; প্রত্যেক বেগমের জগু তিনি একএকটি মহল নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই-সকল রমণীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাহারা আপন-আপন নির্দিষ্ট কর্তব্য সুসম্পন্ন করে তৎপ্রতি তাহার সতর্ক দৃষ্টি আছে। কতকগুলি অনিন্দ্য নির্মল-

চরিত্র রমণী বিভিন্ন বিভাগের পরিদর্শকরূপে নিয়োজিত হয়, এবং তন্মধ্যে একজন মুনসির কাজ করে।...তাহাদের বেতন বেশ উচ্চ-হারের। সম্রাট-বাহাদুর মুক্তহস্তে তাহাদিগকে যে বকশিস্ দিয়া থাকেন—তা ছাড়া উচ্চপদস্থ রমণীরা ১০২৮ টাকা হইতে ১৬১০ টাকা পর্য্যন্ত এবং পরিচারিকারা ২০ টাকা হইতে ৫১ টাকা অথবা ২ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। অস্তঃপুরের জগু একজন নিপুণ ও উৎসাহী হিসাব-নবিস্ নিযুক্ত আছে। সেই ব্যক্তি অস্তঃপুরের সমস্ত খরচপত্র পরিদর্শন করে, বাকস-গত তহবিলের হিসাব ও ভাণ্ডারের দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবও রাখে। স্বীয় বেতনের মোট অর্ধ ছাড়াইয়া না যায় এরূপ মূল্যের কোন জিনিস যদি কোন রমণী, ক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে সে অস্তঃপুরের একজন স্ত্রী-তহসিলদারকে জানায়। তহসিলদার একটা রোকা লিখিয়া অস্তঃপুরের হিসাব-নবিসের নিকট পাঠাইয়া দেয়; হিসাব-নবিস তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, খাতাগুলি সেই পত্রলিখিত টাকা দাখিল করে। কারণ, এইরূপ খরচের টাকা চেকের দ্বারা দাখিল হয় না। অস্তঃপুরের অভ্যন্তর প্রদেশ, সংযতচিত্ত ও উদ্যমশীলা রমণীদিগের দ্বারা রক্ষিত হয়। যে-সকল রমণী সর্বাঙ্গের স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ত তাহারাই সম্রাটের মহলে পাহারা দেয়। প্রাচীর-ঘেরের বাহিরে খোজা করা থাকে। আরও দুই, বিশ্বাসী রাজপুত্রগণ; সর্বশেষে, দ্বারদেশের রক্ষীগণ। তা ছাড়া, ইমারতের চারি মুখভাগের উপর আর্মীয়েরা, “অহদি”রা ও জগু সৈনিকেরা পাহারা দেয়” (১)।

অস্তঃপুরের এইরূপ জীবনযাত্রা-প্রণালী এক্ষেত্রে হইবারই কথা। তাই, সম্রাট অস্তঃপুরিকাদিগের জগু চিত্তবিনোদনের কতকগুলি উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। উহার সাক্ষাৎকারীদিগকে অস্তঃপুরে গ্রহণ করিত, কখন কখন উহার অগ্ৰগৃহে সাক্ষাৎ করিতেও যাইতে পারিত। আকবর সাময়িক বাজারের প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন; শাহজাদীরা দ্রব্য বিক্রয় করিত; আর্মীদিগের পত্নী ও কন্যা উহা ক্রয় করিত। সম্রাট এই-সকল উৎসবে উপস্থিত হইতেন; খুব ছোটখাট জিনিসও ক্রয় করিবার সময় তিনি রূঢ়ভাবে উহার দর-কসাকসি করিতেন। বিক্রয়ক্রীণ সম্রাটের সহিত রসিকতা করিয়া, ঠাট্টা করিয়া, এমন কি সম্রাটকে গালি পর্য্যন্ত দিয়া বেশ লগ্নমায়িক উত্তর প্রত্যুত্তর করিত। সম্রাট প্রথমে রুষ্ট হইতেন, পরে অধিক পরিমাণে ক্রীত পণ্যের মূল্য প্রদান করিতেন; তখন হাশ্বের রোল উঠিত ও বিবাদ মিটিয়া যাইত।

সমস্ত প্রাক্য সাম্রাজ্যের স্মরণ, ভারতবর্ষেও, রাজ-অস্তঃপুরই জটিল বড়যন্ত্রজ্বালার লীলাভূমি ছিল। অস্তঃপুরের

(১) আইন-ই-আকবরী।

সংবাদ জানিবার জন্ত, আমীরেরা, রাজারা, ভাগ্যান্বেষীরা, সেই সব সাময়িক বাজারে স্বকীয় কত্যাগিকে প্রেরণ করিত। সম্রাট তাহাদের রূপে যুদ্ধ হইবেন, তাহাদের রাক্-চাতুর্ঘ্যে আকৃষ্ট হইবেন, এইরূপ আশা তাহারা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিত। সম্রাটের একজন সামান্য উপপত্নীরও এইরূপ বাসনা হইত যে, তাহার গর্ভে সম্রাটের একটি পুত্র জন্মে। কেননা, মুসলমান-আইন, উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান ও ধর্মপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। একজন বাদীর গর্ভজাত পুত্রও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে। তাই অস্ত্র-সম্বা বেগমদিগের মধ্যে কতই ঈর্ষ্যা, কতই কলহ!

সকল সম্রাটই স্বকীয় পত্নীর বশীভূত ছিলেন। আক্-বরের হিন্দু পত্নীগণ, আক্-বরকে মুসলমান-ধর্ম হইতে বিমুখ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর একজন পারস্যদেশীয় রমণীর হস্তে—সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের হস্তে, রাজ্যশাসনের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শাহ-জাহান প্রথমে তাজ-মহলকে ভাল বাসিয়াছিলেন (২)—তাহারই নিকটে স্বকীয় ছুহিতা বেগম-সাহেবের সমাধি স্থাপন করেন। তাজমহল ও বেগম-সাহেব—উভয়ই সম্রাটের সর্বপ্রকার বদ্-খেয়াল চরিতার্থ করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেন, আরংজেবও রৌশোনারাবেগমের বশীভূত ছিলেন। শিবজির প্রতি তাঁহার বেগমদিগের বিদ্বেষ থাকায়, ঐ প্রসিদ্ধ মরাঠা সর্দার তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

\*\*\*

অতএব, অনিয়ন্ত্রিত রাজাদিগের ও এসিয়িক রাজ্যতন্ত্রের যত কিছু দোষ সমস্তই মোগলদিগের আমলে পরিলক্ষিত হয়। তবে,—এই সময়কার ভারতে অত্রপ্রকার শাসন-তন্ত্র স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল। যতদিন তৈমুর লংএর বংশধরেরা স্বকীয় বংশগতগুণ আপনাদের মধ্যে রক্ষা

(২) এই বাদশাহাদীর নাম (১৫২২-১৬০১) অর্জুন্দ-বনো-বেগম। বেগমের পিতা উজীর আসফ-খান—সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের ভ্রাতা,—ইনি ইহার জামাতা শাহ-জাহানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। বেগম- (আসাদের বরণ্যা), “মৃত্যুভঙ্গ মহল”—এই উপাধি গ্রহণ করেন। লোকেরা এই নামের অপভ্রংশ করিয়া তাজমহল বলিত—পরে সম্রাজ্ঞীর সমাধি-মন্দির এই নামে অভিহিত হয়।

করিয়াছিল, ততদিন উহারা সকলের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। যখন ভোগসুখ, আব-হাওয়া, এবং হিন্দুদিগের সহিত বিবাহ-বন্ধন উহাদিগকে হীনবীৰ্য্য করিয়া তুলিল, তখনই উহারা ভাগ্যান্বেষীদিগের ক্রীড়নক হইয়া পড়িল এবং মোগলসাম্রাজ্যের কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## বর্ণাশ্রম

আজকাল বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। এ আর কিছুই নয়, ইহা বর্ণাশ্রমের “বল হরি হরিবোল।” শবের চারিদিকে যেমন ক্রন্দনের রোল উঠে, বর্ণাশ্রমের চারিধারেও, তেমনই রোল উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ শ্রীমতী বৈশাখ তাঁহার বোল ফিরাইয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“Now in 1913, it is time to say, that while the caste system has a glorious past, its work is over, and it must pass away. The new form of the Indian Nation is ready to be born; the hour of travail is upon us. Let the old form, which is dead, the corpse from which the spirit of Dharma has departed, be carried to the ghat and burnt.” (The Indian Review—October, 1913). জাতিভেদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, ইহাকে এখন শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত কর। নবজীবন প্রসবের অপেক্ষা করিতেছে।

এ কথা তো বহুপূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু হৃৎধের বিষয় এতকাল শ্রীমতী বৈশাখ সে কথাটা স্বীকার করেন নাই, তাই অন্ধের ঞায় নবালোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জোরে পুরাতনকেই খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃতদেহ সাজাইয়া গুছাইয়া ধরে রাখিয়া দিলে তাহাতে যে বিষয় অনর্থ উপস্থিত হয় সে কথা এতদিন না বুঝিলেও তিনি আজ সে কথা স্বীকার করিতে

বাধ্য হইতেছেন। যদি কেহ এই নবজীবনের প্রসব-বেদনার কালকে সুদীর্ঘতর করিয়া থাকেন--যদি সে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে-- তবে তিনি শ্রীমতী বৈশান্ত। তিনি নবালোক লইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের হাতে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

কৃষ্ণমূর্তি মোকর্দ্দমায় মিসেস বৈশান্ত আপনার হারান আমিকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন। তাই, জাতিভেদের শবের জ্ঞান যাহা সূচু ব্যবস্থা তাহা আজ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। অন্তরিক্তে আবার দেখি, একদল লোক রাজা রামমোহন রায়কে বর্ণাশ্রমী হিন্দু বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে বর্ণাশ্রমের শ্রদ্ধা-ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে মিসেস বৈশান্ত তাহার শব এতকাল লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ জাঁকজমকের সঙ্গে তাহা শ্মশান-ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। এই যে সোব্রগোল ইহার মধ্যে নবজীবনের প্রসববেদনার ক্রন্দনরোল ও মৃতের জ্ঞান “হরিবোল” উভয়ই মিশিয়া গিয়াছে। যিনি বর্ণাশ্রমের ধারও ধারেন না, বরং আচার-ব্যবহারে স্বতঃপরতঃ উহার অস্তিত্বক্রিয়া করিতেছেন, তিনিও বর্ণাশ্রমের নাম করিয়া অশ্রুবিসর্জন করেন। ইহা স্বাভাবিক। অতি বড় শত্রুর শব দর্শনেও মানুষ অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারে না। তাহাতে আবার মিসেস বৈশান্ত শবদাহের যাহাতে অঙ্গহানি না হয় তাহার উপদেশ দিয়াছেন—শবদাহ করিতে হইবে “with the reverence and tenderness due to the services rendered in the past.”

\* বর্ণাশ্রম একবস্ত্র নহে, দুই ত্বের সংমিশ্রণ, বর্ণ ও আশ্রম। তবে বর্ণও চারিটি, আশ্রমও চারিটি।

বর্ণ বিভাগ করিবার সময় শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছিলেন, যে, পঞ্চমের স্থান নাই—“নাস্তি পঞ্চমঃ।” কিন্তু পাঁচ কেন, আজ আমরা শত সহস্র দেখিতেছি,—কানে শুনিতেছি, গোখে দেখিতেছি না; কেননা, অন্ধকারে সব বর্ণ এক হইয়া গিয়াছে,—ঘোর কলির অন্ধকারে সবুও তাহা বর্ণ। তাঁহার “গুণকর্মবিভাগশঃ”ই বর্ণমালা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যদিও তাহার

সব পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া কেবলমাত্র বিবাহের মেলবন্ধনে আনিয়া ফেলিয়াছি, তবুও শাস্ত্রকারদিগের মহিমাকীর্তনে আমরা গকে কে কবে পশ্চাৎপদ দেখিয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু কেন হইয়াছিলেন? ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইত না বলিয়া। সত্যকাম গৌতমের নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিলে গুরু তাহার পিতার নাম জানিতে চাহিলেন। মাতা জ্বালার নিকট হইতে জানিয়া আসিয়া সত্যকাম গৌতমকে বলিলেন যে এতকাল পরে পিতার ঠিকানা হওয়া দুঃসাধ্য। গুরু ধীরভাবে বলিলেন, “নৈতদ ব্রাহ্মণঃ বিবক্ত মর্হতি” (ছান্দোগ্য)। “ন সত্যাদসাঃ”—তুমি যখন সত্য হইতে বিচলিত হও নাই, তখন তুমি ব্রাহ্মণ। সেই দিন হইতে মাতার নাম লইয়া জ্বালি যে ব্রাহ্মণ-গোত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণের নহে, কিন্তু সত্যবাদীর ব্রাহ্মণহলাভের গোত্র। এ বর্ণ আর সে বর্ণ কি এক? যদি শ্বেত ও কৃষ্ণ এক হয়, তবে এক। যখন গৌতমবংশজ আরুণি সমিৎহস্তে ব্রহ্মদীক্ষার জ্ঞান চিত্ররাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, “ব্রাহ্মার্থোহসি গৌতম যো ন মানমুপাগাঃ” (কৌষিতকী) তুমি যখন অহঙ্কার করিলে না তখন তোমাকে ব্রাহ্মণের সম্মানই দিতেছি। স্থানান্তরে বলিয়াছিলাম যে “আমি ব্রাহ্মণ” এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যায়। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা আমার গায়ের জোরের কথা নয়। উপনিষদ্ সেই কথা সমর্থন করিতেছেন—তুমি ব্রাহ্মণত্বের অভিমান করিলে না তাই তুমি ব্রাহ্মণ। বর্ণব্রাহ্মণ এই দোষে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তাই তো চেনা যায় না। আর এখন কোন বর্ণ তো নাই, সব শূদ্র (বঙ্গদেশের কথাই হইতেছে)।

আশ্রমের অবস্থাও বড় আশাজনক নহে। চতুরাশ্রমের তিন আশ্রম তো বহুদিনই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। আছেন যিনি ত্রিনংও কেরাণীগিরি আশ্রম করিয়া দাসা-শ্রমে পরিণত হইয়াছেন। এই আশ্রমে মুখুটি গাঙ্গাটি আর দাস-মণ্ডল সব এক পদবী লাভ করিয়াছেন। আশ্রমের কথা ভাবিলে বেশ বুঝা যায় যে আমাদের চারি আশ্রম ও



চারি বর্ণ মিলিয়া এক বিরাট একত্রে পরিণত হইয়াছে—  
সে একত্রে নামকরণ করাও দুঃসাধ্য নহে—তাহাকে  
দাসত্বও বলা যায়, শূদ্রত্বও বলা যায়, আবার কেরাণী-  
গিরিও বলা চলে। আমরা বর্ণাশ্রম বলিতে কেন যে  
এক অদ্বৈত অখণ্ড বস্তু বুঝি তাহার স্পষ্টপ্রমাণ এইখানে  
রহিয়াছে! আমরা অর্থ উপার্জন কর আর সংসারযাত্রা  
নির্বাহ কর। ইহাই বর্তমান বর্ণাশ্রমধর্ম। এখানে  
যে বর্ণ ও যে আশ্রম পাইতেছি তাহারা উভয়ে  
একার্থবোধক।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্মের নামে হৈ চৈ করিতেছেন,  
তাঁহারা একটা প্রহসনের অভিনয় করিতেছেন মাত্র।  
বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই, অথচ এই দুইএর রাসায়নিক  
সংযোগে ইঁহারা কি বস্তুর আবির্ভাব কল্পনা করিতে-  
ছেন তাহার রক্ষার জন্য এই বিপুল আয়োজন? উদ্দেশ্য  
মহৎ, উদ্যম প্রশংসনীয় এবং চেষ্টা সাধু। নলুচে ও খোল  
বদলাইয়া এই বর্ণাশ্রমরূপ ছ'কোটিকে টি'কাইয়া রাখিবার  
যে চেষ্টা তাহা বেদে ও পুরাণে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ  
করিবে। একদিন একজন লোক কেন যেন হঠাৎ বলিয়া  
ফেলিল, বেলা দুটোই হোক আর তিনটাই হোক প্রাতঃ-  
স্নান করিতেই হইবে। তাহার পাশে যে বসিয়াছিল, সে  
আর লোভ সঘরণ করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল,  
তা ভাই, ঠিকই, অভ্যাস হয়ে গেলে না করে পারা  
যায় না। আমার কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে রোজ  
স্নান করে সন্দেশ দিয়ে জল না খেলে চলে না। তা  
থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই। না থাকলেও কি  
করিয়া খাওয়া চলে, এবিষয়ে বিশ্বয় প্রকাশ (সন্দেশ  
প্রকাশ চলে না—এ যেখানকার কথা সেখানে সন্দেশের  
স্থান নাই) করিলে সে বলিল,—তা, ভাই, কি করি,  
অভ্যাসদোষ ছাড়াতে পারি না। সেইরূপ শেষকালে  
বর্ণাশ্রম রক্ষাটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

## সমালোচনা

কালিদাস\*

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যারোপ ও অপবাদ আজকাল ঐত্বতত্ত্বের উপর  
এতদূর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ইহাতে  
সাধারণের স্থির থাকা শক্ত। অনেক স্থলে 'নূতন কিছু করিতে  
হইবে' এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কোন-কোন লেখক শূণ্ডে  
অট্টালিকা নির্মাণ করেন, এবং বস্তুত যাহা যাহাতে নাই তাহাতে  
তাহা আরোপ করিয়া ফেলেন। স্থলবিশেষে এই অধ্যারোপের  
অপবাদ হয়, আবার অনেক স্থলে তাহা হয় না, এবং কিছুদিন অতীত  
হইয়া গেলেই ঐ অধ্যারোপই একটি সিদ্ধান্ত বলিয়া চলিতে থাকে।  
সাধারণ পাঠক তখন এই তথ্য-কথিত মতবাদসমূহের মধ্যে  
দিগ্গোহে নিপতিত হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে।

কয়েক দিন হইতে একটি 'ভেরীকঙ্কার' শুনিতে পাওয়া যাইতেছে  
যে, কালিদাসের কাব্যে গুপ্তসাম্রাজ্যের কথা ও ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।  
বিজয় বাবু কালিদাসের আবির্ভাবকাল আলোচনা করিতে গিয়া  
এই কথাটাই নানারকমে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়া সিদ্ধান্ত  
করিয়াছেন (১৪পৃঃ)—“সমগ্র প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া  
বলিতেছি যে, কবি কালিদাসের সাহিত্যলীলা-কাল সম্ভবতঃ ৪৪৫  
খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।” (এখানে সমগ্র শব্দটির অর্থ  
অধিক হইয়াছে)। সম্ভবতঃ থাকে থাকুক, ঐ সময়ের সম্বন্ধেও  
আমরা কিছু বলিতেছি না; তিনি যে মেঘদূত বা রঘুবংশের বর্ণনায়  
গুপ্তসাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই আমরা  
একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রধান কথা দুইটি; প্রথম, তিনি বলেন,  
রঘুবংশে সমুদ্রগুপ্ত-প্রভৃতি গুপ্তরাজগণের ও তাঁহাদের রাজধানীর  
পুষ্পপুরের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়, মেঘদূত ও রঘুবংশে গুপ্ত-  
সাম্রাজ্যের ঘটনার নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুষ্পপুরের উল্লেখ আছে,  
সত্য, কিন্তু তাহা যে, গুপ্তরাজগণের রাজধানী রঘুবংশকার  
তাহা বলেন নাই। গুপ্তরাজগণের “বংশাবলী নিম্নলিখিত নামক্রমে  
পাওয়া যায়, যথা—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত  
মহেন্দ্রাদিত্য এবং স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।” ৭ম পৃঃ। বিজয় বাবু  
দেখাইয়াছেন কিরূপে এই নামগুলি রঘুবংশে পাওয়া যায়  
(২-১০ পৃঃ)। তিনি বলেন—“আসমুদ্রক্ৰীতীশানাম্” এই পদে  
সমুদ্রগুপ্তকে সূচনা করা হইয়াছে। “ইন্দুঃ কীরনিধাবিব” এখানে  
ইন্দু ও চন্দ্র একই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত সূচিত হইতেছে। তারপর  
দিলীপের পুত্র রঘুর নামের পূর্বে কুমার শব্দ পুনঃ পুনঃ যোজিত  
হওয়ায় এখানে কুমারগুপ্ত লক্ষিত হইতেছে। ইত্যাদি।

এখানে আমাদের প্রশ্ন—কালিদাস গুপ্তরাজগণকে জ্ঞানপূর্বক  
অথবা অজ্ঞানপূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন। অজ্ঞানপূর্বক করিয়াছেন  
বলিতে পারা যায় না, তাহা হইলে ধারাবাহিক এতগুলি নাম  
পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব তিনি জ্ঞান-  
পূর্বকই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে বিচার  
করিয়া দেখা উচিত, কালিদাসের যদি সত্য-সত্যই গুপ্তরাজবংশের  
নাম বা কীর্তিকলাপ প্রসঙ্গক্রমেও বলিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা  
হইলে কি তিনি তাহা অনুরূপ ভাবে করিতে পারিতেন না? তাঁহার  
লেখনী কি এতই দুর্বল ছিল? সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দভাণ্ডার  
কি তাঁহার নিকট বন্ধ ছিল? যে সংস্কৃতের বিচিত্র শব্দমালায় রাঘব-

\* শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, ১৩১৮, ডবল ক্রাউন বোর্ডপাংশ ৬২ পৃঃ।

পাণ্ডবীয়-প্রভৃতির শ্রায় কাব্যে আমূল্য দুইটি রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে, যে সংস্কৃতের শ্লেষের বন্ধার অনির্করণীয়, কালিদাস সেই ভাষায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও কি প্রসঙ্গগত দুইচারিটি শ্লোকে রঘু ও গুপ্ত উভয় রাজবংশ বর্ণনা করিতে পারিতেন না? “আসমুদ্র ক্ষিতীশানাম্ অনাকরধবঅর্নাম্” ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের কি বলা হইয়াছে? ধরলাম সমুদ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্তরাজেরা “রাজাধিরাজ” (১পৃঃ) হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমগ্র পদটির এ পক্ষে অর্থ দাঁড়ায়—সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত হইতে ভূপতিগণের। ক্ষিতী শ বলিতে রাজাধিরাজ অর্থ ধরিতে যাইব কেন, এবং কিরূপেই বা বুঝা যাইতেছে যে, সমুদ্রগুপ্ত হইতে গুপ্তেরা রাজাধিরাজ হইয়াছেন? কালিদাস এত শব্দরিদ্র কোন কালেই ছিলেন না যে, এই একটা অতিসহজ ভাব প্রকাশ করিবার যোগ্য শব্দ তাঁহার ছিল না। আচ্ছা, ধরাই গেল, ঐ পদের অর্থ হইল—সমুদ্রগুপ্ত হইতে যাহারা রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কি? কালিদাসের কি এ টুকুও ভঙ্গীতে বলিবার শক্তি ছিল না? মেঘদূতের “অজ্ঞেঃ শৃঙ্গং” ইত্যাদি শ্লোকে মল্লিনাথ যে দিগ্‌নাগের কৃপা বলিয়াছেন, তাহার কোন অসঙ্গতি নাই, সমগ্র শ্লোকটিতেই বাচ্য অর্থ ছাড়া আর একটি অর্থ ব্যক্ত হয়। বিজয় বাবু কি এখানে বলিতে পারেন, কালিদাসের এখানে “আসমুদ্রক্ষিতীশ” লিখিবার উদ্দেশ্য কি?—তিনি কেন এখানে সমুদ্র শব্দ প্রয়োগ করিলেন? কাব্যে শব্দপ্রয়োগ-সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম আছে। কাব্যে এমন শব্দ প্রয়োগ করা উচিত যাহা পরিবৃতিসহ নহে,—অর্থাৎ যে শব্দটির পরিবর্তে তদপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্টতর শব্দ দিতে পারা যায় না। যে কাব্যে এইরূপ অপরিবৃতিসহ পদসমূহ থাকে তাহাই উৎকৃষ্ট। কালিদাসের কাব্যে পরিবৃতিসহ পদ দুর্লভ। ঐ “আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্” এই পদটির পরিবর্তে ঠিক ঐ ভাব অব্যাহত রাখিতে পারে, এরূপ অপর কোন উৎকৃষ্টতর পদ পাওয়া যাইবে না; যদি যায়, তবে এ স্থলে কালিদাসের অশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজয় বাবু সমাসের সরলতা উল্লেখ করিয়া ঐ স্থলে “আসমুদ্ররাজ্য” পদের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল রাজা বলিলে চলবে না, রাজ্যে শ পর্যান্ত বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেও, ইহা “আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্” এই পদের কাছেও আসিতে পারে না।

বিজয় বাবু বলেন “দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব” এই শ্লোকে ক্ষীরনিধি বা সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত হইতে ইন্দু বা চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের উৎপত্তি জানা যায়। তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করিবার জগ্ন য়ে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটিকেই কথঞ্চিৎ সঙ্গত মনে করিতে পারা যায়; এবং অপর দৃঢ়তর প্রমাণ থাকিলে ইহাকে সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু এখানেও বিচার করিবার আছে। কালিদাসের যদি অভিপ্রায় থাকিত যে, সমুদ্রগুপ্ত হইতে চন্দ্রগুপ্ত যেমন উৎপন্ন হইয়াছিলেন, দিলীপও সেইরূপ মল্লবংশে (তদীয় জনক হইতে) উৎপত্তিলাভ করিলেন, তাহা হইলে, তিনি “ইন্দুঃ ক্ষীর-নিধেরিব” এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি দিয়া লিখিতেন, “ক্ষীরনিধাবিব” এইরূপ সপ্তমী দিতেন না। তাঁহার স্পষ্টভাব হইতেছে—ক্ষীরসমুদ্রে ইন্দুর শ্রায় মনুর বিশুদ্ধ বংশে রাজেন্দু দিলীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আর কোন ভাবের ব্যঞ্জনা বা সূচনা হয় না।

বিজয় বাবুর তৃতীয় কথা হইতেছে—রঘুর নামে পুনঃ পুনঃ “কুমার” শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাঁহার এ যুক্তি নিতান্ত দুর্বল। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজপুত্রকে বুঝাইতে যে-সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে কুমার শব্দটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কবিগণের

নিতান্ত প্রিয়। যাহাতে রাজপুত্রের কথা থাকিতে পারে, এরূপ যে-কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিজয় বাবু অর্থঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে আলোচ্য গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, (পৃঃ ১৬-১৯), সেগুলিরও দিকে লক্ষ্য করিলে তিনি ইহা জানিতে পারিতেন। দ্রষ্টব্য—“ততঃ কুমারঃ ধনু গচ্ছতীতি” (৩-১৩); “তস্মিন্ কুমার পথি বীক্ষমাণাঃ” (৩-২২)। অর্থঘোষ ১ম হইতে ৪র্থ সর্গের মধ্যে স্বকাব্যে রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে বুঝাইবার জগ্ন অন্যান ১৯ বার কুমার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। \* বিজয় বাবু কি এখানেও কুমারগুপ্তের উল্লেখ দেখিবেন? দশকুমার-চরিতের পৃষ্ঠাগুলির দিকে একটু অবহৃত দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি এইরূপ ভুরি-ভুরি প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন। †

বিজয় বাবু এই প্রসঙ্গে “কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ” (রঘু ৩-৫৫) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা-রীতির সহিত যাহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, অর্থঘোষ সিদ্ধার্থের শান্ত-সদয় প্রকৃতি বর্ণনার জগ্ন সেখানে “সনৎকুমারপ্রতিমঃ কুমারঃ” (২-২৭) ও “কুমারঃ শকুমারচিত্তঃ” (৩-৪) বলিবেন; কালিদাস সেখানে রঘুর বীরত্ববর্ণনায় “কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ” ইহা না বলিয়া অপর শব্দ প্রয়োগ করিতেই পারেন না, তাঁহাকে “কুমার-বিক্রমঃ” বলিতেই হইবে। বীরত্ববর্ণনায় কুমার বা কার্তিকের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ। ঐ দশকুমারচরিতেও বিজয় বাবু দেখিয়াছেন—“সাহসোপহসিতকুমারেন শকুমারেন ..... কুমারনিকরেন” (৩০-৩১ পৃঃ)। বালকের জন্মবর্ণনাতেও সংস্কৃত কবিগণ কার্তিকের উল্লেখ করেন (বুদ্ধচরিত, ১-৯৪; রঘু-২-৭৫)। কালিদাসও এইরূপ প্রসঙ্গকমে ঐ দেবসেনাপতিকে কখন কুমার, কখন সেনানী, কখন বা স্কন্দ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয় বাবু পূর্বোল্লিখিত প্রকারে রঘুবংশে কুমারগুপ্তের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়া বলিতেছেন (১০ পৃঃ)—“পুনশ্চ যখন অজের কথা বলা হইল তখন অনেক সময়েই স্কন্দ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দুমতীর সহিত অজের মিলনের কথায় “স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্” লিখিত হইয়াছে।” ইহা দ্বারা তিনি স্কন্দ-গুপ্তকে দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার এই নব্বিচিন্তিত বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। উহা অগ্রসরণ করিয়া কেহ বলিতে পারে কুমারগুপ্তের পূর্বে গুপ্তরাজবংশে আর এক জন স্কন্দগুপ্ত-নামে রাজা ছিলেন, কেননা, কালিদাস তাহার সূচনা করিয়া দিয়াছেন। যথা—“স্কন্দশ্চ মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ” (রঘু, ২-৩৬)। আবার ঐ কবি কালিদাসেরই উক্তি জ্ঞানায় গুপ্তবংশে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তও ছিলেন, কারণ “ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব” এখানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সূচিত হইয়াছেন। আবার ইহার পরেও কবি স্পষ্টত চন্দ্রশব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন—“চন্দ্রং প্রবৃদ্ধো-ক্ষিরিবোক্ষিমালী” (৫-৬১)। অতএব ইহা দ্বারা তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

“ইতিহাসে ঠিক স্কন্দের পরেই পুরগুপ্ত” (১২ পৃঃ)। বিজয় বাবু রঘুতে এই পুরগুপ্তকেও দেখিতে পাইয়াছেন। কোথায় কোন শ্লোকে? বোড়শ সর্গের প্রথম শ্লোকে। যথা—

“অথতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরা জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।

চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং সৌভ্রাত্রমেবাংহি কুলাহুসারি ॥”

\* বুদ্ধচরিত, ১-৫৭, ৬৫, ৭০; ২-১৯, ২০, ২৭; ৩-৪, ৬, ১৩, ২২, ২৫, ২৭, ৩৮, ৪৪, ৫৩, ৫৪; ৪-২৪, ২৬, ২৭, ৫৩, ১০০।

† দশকুমারচরিত (জীবানন্দ সংস্করণ), পৃঃ ১৮, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ইত্যাদি।

এহুকার বলিতেছেন—“ষোড়শ সর্গের প্রথম স্লোকেই পাই যে, যিনি রাজা হইলেন তিনি “পুরোজন্মতয়া” রাজা হইলেন। ইচ্ছা করিয়া যে কালিদাস “পুর” শব্দটি দিয়াছেন তাহাই মনে হয়, কারণ ঠিক স্কন্দের পরেই পুরগুণ্ড।” তিনি “পুরোজন্মতয়া” শব্দের অর্থ কি বুঝিয়াছেন, তিনিই জানেন। আর ঐ সমস্ত পদটির মধ্যে “পুর” শব্দ কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাও তিনি ভিন্ন কেহ জানেন না। আমরা দেখিতেছি এখানে তিনি “পুরসু” শব্দকে “পুর” বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। যদি বা “পুর” শব্দই থাকিত, তাহা হইলেও, পুরগুণ্ডকে আমরা কিরূপে জানিব তাহা জানি না।

এহুকারের এই প্রসঙ্গের অন্ত্যস্ত কথামূলিও এইরূপ। মেঘ-দূতের কথাও অকিঞ্চিৎকর। সমর্যভাব হেতু কেবলমাত্র আর একটি কথা-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। তিনি বলিতেছেন (৭ পৃঃ), রঘুবংশে তিনি দেখিতে পান যে, ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে “সমবেত রাজাদিগের মধ্যে “পুষ্পপুর”-নিবাসী মগধেশ্বরই ভারতবর্ষে রাজাধিরাজ ছিলেন।” এ বর্ণনা রঘুবংশের সময়কার নহে, কবির নিজ সময়ের, এবং ইহা দ্বারা গুণ্ডরাজ্যেরই কথা জানিতে পারা যায়।

ভাবে বোধ হয় “রাজাধিরাজ” শব্দে বিজয় বাবু এখানে রাজ-চক্রবর্তী, “সম্রাট” বুঝাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু রঘুবংশের বর্ণনায় এরূপ কিছু বুঝা যায় না। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য মগধেশ্বর-সম্বন্ধে রঘুবংশের নিম্নলিখিত কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

“ততো নৃপাণাং শ্রুতবংশবৃত্তা পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী।

প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরশ্চ নীড়া কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ৬-২০

সুনন্দা প্রথমে মগধেশ্বরের নিকট কুমারী ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া বলিলেন—

“অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানাম্ অগাধসঙ্ঘো মগধপ্রতিষ্ঠঃ।

রাজা প্রজারঞ্জনলকুবর্ণঃ পরস্তপো নাম স্বার্থনামা ॥” ৬-২১

কালিদাস বলিতেছেন তাঁহার মগধেশ্বরের নাম পরস্তপ। গুণ্ড-রাজবংশে এই নামে কেহ ছিলেন কি? মগধেশ্বর যে রাজাধিরাজ ছিলেন, \* ইহা সমর্থনের জন্য বিজয় বাবু এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“কামং নৃপাঃ সন্ত সইশ্রশোহন্তে রাজঘতীমাহরনেন ভূমি।

দক্ষক্রতারাগ্রহসঙ্কলাপি জ্যোতিষ্যতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ।” ৬-২২।

“সুরাজি দেশে রাজধান্ স্তাৎ ততোহন্যত্র রাজধান্” ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে আমরা ত এই শ্লোক হইতে এইমাত্র বুঝিতেছি যে, তাৎ-কালিক অন্ত্যস্ত রাজাদের মধ্যে মগধেশ্বর ভাল ছিলেন। “রাজঘতীম্ শোভনরাজবতীম্”—ইতি বল্লিনাথ। তিনি যে, রাজচক্রবর্তী সম্রাট বা রাজাধিরাজ ছিলেন, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় না। সুনন্দা ইন্দুমতীকে প্রথমে ইহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতেও তাহা বুঝা যায় না। সমবেত রাজগণকে তাঁহাদের পদমর্যাদানুসারে যথাক্রমে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও, সুনন্দা যে, ঠিক সেই ক্রমেই ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। সুনন্দা ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিতে পারিত যে, ইনি সম্রাট, এবং আর সমস্ত রাজারা সামন্ত। কৈ, সুনন্দার মুখে ত এরূপ কিছু শুনা যায় নাই। বিজয় বাবু বলিতেছেন, “সুনন্দা বর্ধন ইন্দুমতীকে স্বয়ংবরসভায় লইয়া গেলেন তখন প্রথমেই রাজা-

ধিরাজের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য সুনন্দা ইন্দুমতীকে “প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরশ্চ” করিলেন।” (এখানে দ্বিতীয় সুনন্দা শব্দ-স্থানে সর্বনাম তিনি প্রয়োগ করা উচিত ছিল। সুনন্দা ইন্দুমতীকে “প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরশ্চ” করিলেন। ইহার মানে কি হইল? বরং এখানে করা হইলে নিম্নলিখিত কতকটা ঠিক হইত। বস্তুত লইয়া গেলে নলেখাই উচিত ছিল।) ইন্দুমতী মগধেশ্বরকে বরণ করিলেন না, অথচ “প্রণাম ক্রিয়া” দ্বারা রাজাধিরাজের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন।” বিজয় বাবু কিরূপে জানিলেন যে, রাজাধিরাজের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য সুনন্দা প্রথমে ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং ইন্দুমতীও সেই জন্য নমস্কার করিয়াছিলেন? রাজাধিরাজ 'না হইলে যে, কাহাকেও নমস্কার করিতে হয় না, সন্মান করিতে হয় না, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? বিশেষত বিজয় বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কালিদাস স্বয়ংবরসভায় সমবেত রাজগণের মধ্যে রঘুপুত্র অজকেই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

“তেবাং মহাহীসনস্ফুটিতানাম্ উদারনেপথ্যভূতাং স মধ্যে।

বরাজ ধামা রঘুসুহৃদব কল্পক্রমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬-৬

আবার শেষেও উক্ত হইয়াছে—

“শুক্লীং ধূম যো ভুবনস্য পিত্রা।

ধুর্যোগ ক্রমাঃ সদৃশং বিভর্তি ॥ ৬-৭৮

অজ এখানে ভুবনভার বহন করিতেছেন, অতএব যদি রাজা-ধিরাজ কাহাকেও বজিতে হয়, তবে ইহাকেই বলিতে হইবে। অথচ, বিজয় বাবু লক্ষ্য করিবেন, ইন্দুমতী সর্বশেষে ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রথমে আসেন নাই। এবং কালিদাস মনে করেন নাই যে, ইহাতে ইন্দুমতীর অজের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করা হয় নাই।

বিজয় বাবু এক পাদটীকায় (১২পৃঃ) লিখিয়াছেন—“রঘুবংশ-কাহিনী কালিদাস রামায়ণ এবং পুরাণাদিতে পড়িয়াছিলেন। উহা কদাচ তাঁহার কেবলমাত্র শুনিবার বিষয় ছিল না। অথচ তিনি কাব্যের আরম্ভেই লিখিয়াছেন যে, “তৎগুণৈঃ (তদগুণৈঃ, হইবে) কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রোদিতঃ (প্রোদিতঃ হইবে)।” গুণ্ডদিগের কীর্তিকাহিনী তাঁহার শুনিবার বিষয় ছিল, কেননা তাঁহাদের কীর্তির কোন ইতিহাস তখন সর্বত্র পঠিত হইত এ কথা বলিতে পারা যায় না। উজ্জয়িনীবাসী কবি দূর হইতে কীর্তিকথা শুনিয়াছিলেন।” বিজয় বাবুর মুক্তিপটুতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, ঐ “তৎগুণৈঃ” ইত্যাদির পরেই যে, কালিদাস লিখিয়াছেন “তং সন্তঃ শ্রোতুমহঁস্তি সদস্যক্তিহেতবঃ” (১-১০), এখানে, শ্রোতু ম্ না লিখিয়া পঠিত হইত লেখাই এহুকারের উচিত ছিল, কেননা গ্রন্থ 'ত লোকে পাঠ করিয়া থাকে, শ্রবণ করে না। সাহিত্য-দর্পণ হইতে বিজয়বাবুকে বহু স্থলে নানা কথা উদ্ধৃত করিতে আমরা দেখিয়াছি, সেই গ্রন্থে কাব্যকে দৃশ্য-ও শ্রব্য-ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে শ্রব্য স্থলে পাঠ্য করা উচিত ছিল। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজেরই বিশ্বাস নাই। রামায়ণ-সম্বন্ধে (৩৬পৃঃ) তিনি লিখিয়াছেন—“নিত্য নিত্য শু নি তে ছি, অথচ পুরাতন হয় না, অথচ আবার শু নি তে ইচ্ছা করে।” কালিদাস এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবে না?

কালিদাসের এহাবলী-প্রসঙ্গে এহুকার অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখিতে

\* এখানে ইহা প্রতিপাদনের জন্য এহুকারের এইরূপ দৃঢ় নির্বন্ধ, কিন্তু বস্তুত তিনিও সন্দেহ, ইহা পরে স্মৃতি হইয়াছে :—“একহত্র রাজঘ না থাকিলেও” (৪৯ পৃঃ)।



দিলীপ, রঘু, অজ্ঞ, ও কুশের কথা বলিতে গিয়া বিজয়বাবু বাহা-  
যাহা বলিয়াছেন, তাঁহা স্থানে স্থানে আমাদের বেশ ভাল  
লাগিয়াছে।

বিজয় বাবুর গ্রন্থের ভাষায় নানা স্থলে ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটি ও অসংযম  
দেখা যায়। পূর্বে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রসঙ্গত দিয়াছি। তিনি  
রঘুবংশ লইয়া এতটা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু হু গ স্থলে (“তত্র  
হু গা বরোধানাম্”—৪-৬৮) অসফুৎ হু ন লিখিয়াছেন। না হয়  
গকার-স্থানে দন্ত্য নকার গ্রহণ করিলাম; কিন্তু হু-স্থানে হু কিছুতেই  
হইতে পারে না। এইরূপ পা র সী ক না লিখিয়া (“পা র সী কাং-  
স্ততো জেতুম”—৪-৬০) তিনি লিখিয়াছেন পা র সি ক (৪ পৃঃ)।  
তাঁহার স খ ৭ স র, স খ ৭, ও স্ব য স্ব র (৬-৭ ইত্যাদি) যথাক্রমে  
সং ব ৭ স র, সং ব ৭ ও স্ব য ৭ ব র হইবে। রাজা গ গ (২ পৃঃ  
ইত্যাদি) লেখা তাঁহার উচিত হয় নাই। বা হি ক (৩২ পৃঃ)  
না বলিয়া বা হ লেখা উচিত। যৌ ব না তী তে (৩৩ পৃঃ) না  
লিখিয়া যৌ ব না ত্য য়ে লেখা ভাল। “দশপুরের রাজারা অধী ন স্থ  
সে না প তি রাজা ছিলেন” (৭ পৃঃ); এখানে অধী ন সা ম স্ত  
রাজা লিখিতে হইত। “এই পুরাতন পাঠ যে মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ  
অপেক্ষা অধিক প্রা মা গ্য” (২৪ পৃঃ), এখানে প্র মা গ লেখা উচিত।  
ইনিও প ড়ী ব ৭ স ল লেখেন (৫০ পৃঃ), এ সম্বন্ধে আমাদের  
মন্তব্য “কালিদাসের সীতা”-সমালোচনায় বলিয়াছি।

গ্রন্থকারের আর একটি বিচিত্র বাক্য এই (৩৬ পৃঃ)—“পাঠশালার  
বালকশিক্ষার জন্ত রচিত শিশুরামায়ণ পর্য্যন্ত রা ম ক থা স খ লি ত  
মাত্র স ক ল গ্র ন্থ ই এদেশে আদৃত।” বোধ হয় এখানে তাঁহার  
বিবক্ষিত ভাব—রা ম ক থা স খ লি ত গ্রন্থ মাত্রই।

তাঁহার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় একটি পঙ্ক্তিতে যুবতী সম্পর্কে তিনি  
যে কথা বলিয়াছেন তাহা কিরূপ রসিকতা? ইহাই তিনি বিদ্যালয়ের  
ছাত্রদের নিকট আদৃত দেখিতে চাহেন (মুখবন্ধ)? দ্বিতীয় সংস্করণে  
প্রথমেই ইহা কাটিয়া দিলে তাঁহার সর্বপ্রধান কর্তব্য করা হইবে।  
কারণ ইহা সত্য নহে, সুনীতিসঙ্গতও নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

## অভিধানপদীপিকা বা পালি

### শব্দকোষ \*

সংস্কৃতে অমরকোষের যে স্থান পালিতে অভিধানপদীপিকারও  
সেই স্থান। অভিধানপদীপিকা সম্পূর্ণরূপে অমরকোষের অনুকরণে  
লিখিত; কতকগুলি সংস্কৃতে অপ্রচলিত বিশেষ-বিশেষ শব্দ না  
থাকিলে ইহাকে অমরকোষের পালি অনুবাদ বলা যাইত।  
সিংহলরাজ পরাক্রমবাহুর রাজত্ব সময়ে (১১৫০ খ্রীঃ) তত্রত্য জেতবন-  
বিহারবাসী হুবির মোগ্দল্যায়ন (মোগ্গলান) ইহার রচয়িতা।  
পালিভাষায় লিখিত ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্ট অভিধান নাই।  
Childers তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পালি-অভিধানে ইহার সমস্ত শব্দ গ্রহণ  
করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয় বা সিংহলীয়  
অক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ এতদিন

আলোচনা করিবার সুবিধা ছিল না, স্বামী জ্ঞানানন্দ বঙ্গাক্ষরে ইহা  
প্রকাশিত করার অদ্য সে সুবিধা কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। তাঁহার  
এ প্রয়াস সাধুবাদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা  
আমাদের অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতে পালির  
আলোচনা এই সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহার ইহাতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় পুস্তকের অভাব। পাশ্চাত্য  
অঞ্চলে রোমীয় অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ এত দুর্লভ যে, সাধারণ  
ব্যক্তির তৎসমুদয় সংগ্রহ করা অতিকষ্ট। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের  
অক্ষর এত জটিল যে, সকলের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা সহজ  
নহে। যদি বিশেষ কোন সুবিধার কারণ না থাকে, তাহা হইলে  
যাহাতে সমগ্র ভারতের পালিপাঠার্থীকে সুবিধা প্রদান করিতে পারা  
যায়, পালিগ্রন্থপ্রকাশকগণকে সে কথা মনে রাখিতে হইবে।  
আমরা যদি এই-সকল গ্রন্থ দেবনাগরে প্রকাশ করি, তাহা হইলে  
সমগ্র পৃথিবীরই উপকার হইতে পারে। পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও  
গাথা আলোচনা করিতে হইলে দেবনাগর না জানিলে চলে না,  
ইহা সকলকেই জানিতে হইবে। বিশেষত বঙ্গবাসিগণের নিকট  
ইহা শিক্ষা করা ঘোটেই কষ্টকর নহে। যদি একই অর্থ ও পরিশ্রমে  
সমগ্র ভারতকে উপকৃত করিতে পারা যায়, অথচ নিজ প্রদেশের  
তেমন কোন ক্ষতির কারণ না থাকে, তবে কি তাহাই করা  
আমাদের উচিত নহে? যদি প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ থাকে,  
তবে তাহা প্রাদেশিক অক্ষরেই মুদ্রিত হইবে, কিন্তু এতদর্শন স্থলেও  
মূল অংশ দেবনাগরে কল্পাই উচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রোমীয়  
অক্ষরে ক্রমে-ক্রমে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সবই প্রকাশ করিয়া  
লইতেছেন। তাঁহাদের নিকট ইহা সুখপাঠ্য মনে হইতে পারে,  
কিন্তু ভারতবাসীর নিকট তাহা সেরূপ হয় না। এবিষয়ে সন্দেহ  
থাকিলে দৃষ্টান্তস্বরূপ Cowell ও Nailএর রোমীয় অক্ষরে  
প্রকাশিত দিব্যাবদানের দুই এক পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝা যাইবে।  
ছোট-ছোট পদ পড়িতে কষ্ট হয় না, কিন্তু দীর্ঘ সমসেবদ্ধ পদ পড়িতে  
খুবই সুবিধা হয়। পাশ্চাত্যেরা নিজের সুবিধা দেখিয়া চলিতে-  
ছেন। হুংখের বিষয় আমরা নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাণ্ডিত্য  
মনে করিয়া সেই দিকেই গা চালিয়া দিতেছি। কলিকাতা-  
বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যগণের জন্ত নহে, কিন্তু তাহাতেও পালিভাষায়  
রোমীয় অক্ষরই বাবস্ত হইতেছে।

বিগত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলোম্বো নগরে হুবির স্মৃতি প্রতিপত্র  
মধ্যে মূল অংশ ও তাহার দুই পার্শ্বের একদিকে সিংহলীয় ও আর  
একদিকে ইংরাজী শব্দার্থ, এবং শেষে সৃষ্টিপত্রাদি যোগ করিয়া  
অভিধানপদীপিকার এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করেন। আমরা  
ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর সংস্করণের কথা জানি না।  
স্বামী জ্ঞানানন্দ যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে  
সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, “ইনি সর্বতোভাবে স্মৃতির সংস্করণকে  
অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি তাঁহার  
অনুকরণ-প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি ভাল করিতে গিয়া  
মন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন, গ্রন্থের কলেবরও অনর্থক বাড়াইয়া  
ফেলিয়াছেন। স্মৃতিকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে পারিলে খুবই  
ভাল হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ  
পাইয়াছে।

\* সঙ্কল্পবিহারী জ্ঞানানন্দ স্বামী, চৈতন্যপ্রসাদ বিহার, শিলক,  
চট্টগ্রাম, প্রকাশক ইতিয়ানু প্রেস, এলাহাবাদ, ইতিয়ানু পার্লিশিং  
হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, বুদ্ধাব্দ ২৪৫৭, মূল্য  
২ টাকা। ডবল ক্রাউন বোডশাংশ, ৩৭৭+১০ পৃষ্ঠা।

গাথার সঙ্কল্প পদগুলিকে যাহাতে অনায়াসে সঙ্কল্পবিচ্ছেদ  
করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তৎসমূহ হুবির স্মৃতি সঙ্কল্পসমূহে  
১, ২, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্টে এই চিহ্ন-  
অনুসারে সমস্ত সঙ্কল্পবিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ

সেইরূপ কোন পরিশিষ্ট দেন নাই, কিন্তু সঙ্কীর্ণসমূহে তাহার সূচনার অক্ষর ( ) চিহ্ন দিয়াছেন। সংস্কারকের ইহা নূতন উদ্ভাবন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু-বহু স্থলে তিনি তাহাও দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যথা, ৫ পৃঃ—“ভূতপর্ভা ( পি ), বিড়োজো \* ] (খ) সূক্তাত ( সূস ভরিয়ার্থ পুরস্কারে )।” স্বামীজী সহসা এখানে এক নক্ষত্রচিহ্ন দিয়া পাদটীকায় ‘বিড়জস্’ লিখিয়া পাঠকগণকে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা দুজের। পালির ‘বিড়োজো’ শব্দের সংস্কৃত ‘বিড়োজস্’।

গ্রন্থের সংস্কার বা সম্পাদন বিষয়ে প্রমাদ, স্বলন, ক্রটি পদে-পদে লক্ষিত হয়। “অকাপরখং” ( পৃঃ ১/০, গাথা ১ ) এস্থলে “অকা পরখং” এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া লেখা উচিত ছিল। এ দোষ অতি প্রচুর দেখা যায়। স্থানে-স্থানে গাথার পাদবিভাগে ভ্রম হইয়াছে, যথা, ১৭ সংখ্যক গাথা। বগীয় ব যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই। স্ত ( অথবা / ) বর্ণের দিকেও সম্পাদকের লক্ষ্য দৃষ্ট হইল না। অশুদ্ধির ত কথাই নাই, প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ভূরি-ভূরি রহিয়াছে। অথচ সম্পাদক লিখিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে প্রফ শোধনে সাহায্য করিয়াছেন।

১ম পৃষ্ঠা—‘চক্ষুমা’ ( গাথা ১ ) স্থানে ‘চক্ষুমা,’ ‘মহেসী’ ( ২ ) স্থানে ‘মহেসি,’ ‘মারজী’ স্থানে ‘মারজি’ হইবে। ২য় পৃষ্ঠা—‘নিষ্কাণং’ ( গাথা ৫ ) ‘নিব্বানং’ ( দস্ত্য ন ) হইবে। ৩য় পৃষ্ঠা—‘পারম্পি’ ( গাথা, ৮ ) নহে, ‘পারমপি’ পাঠ হইবে, তাহাই সিংহল-সংস্করণে আছে, স্বামীজীর পাঠে ছন্দোভঙ্গ হয়; ‘বিমুত্যাসংখতা’ ( গাথা ৮ ) ‘বিমুত্যাসংখত’ হইবে। এতাদৃশ ভুলে সমস্ত গ্রন্থখানি কলুষিত হইয়াছে। আবার, ৩৯ সংখ্যক গাথাটি আলোচ্য সংস্করণে রহিয়াছে—

- “বেগো জবো রয়ো  
(তু) খিগ্নং তুরিতং লছ
- আসু তুগ্নমরং (চ) ‘বি  
লখিতং তুবটং (পি চ)।”

কিন্তু ইহা হইবে—

বেগো জবো রয়ো খিগ্নং তু সীখং তুরিতং লছ।  
আসু তুগ্নমরং বাবিলখিতং তুবটং পি চ ॥

• ১১ পৃষ্ঠা—‘নবরত’ ( গাথা, ৪০ ) স্থানে ‘নরত’ হইবে। ইত্যাদি, সত্যাদি।

সম্পাদক ৮২ পৃষ্ঠায় ( গাথা ৩১৬ ) ‘কন্দুক’ শব্দের বাঙলা অর্থ দিয়াছেন ‘লাটিম বা লাটু’। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, ইহা গের্দ বা গের্দু নামে প্রসিদ্ধ, ইংরাজী ‘বল’ (ball) শব্দে ইহাকে নির্দেশ করা যায়। হস্ত দ্বারা আঘাত করিলে ইহা লাফাইয়া উঠে, এবং এইরূপে বিলাসিনীরা ইহার দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। “করাভিষাতোখিত-কন্দুকেন্দ্ৰম্”—রঘু, ১৬, ৮৩। এই গাথাতেই ‘অদাসদগ্নং’ স্থলে ‘আদাসদগ্নন’ হইবে, পরবর্তী (৩১৭) গাথায় ‘পম্পুটো’ স্থলে ‘সম্পুটো’ হইবে। আমরা এইরূপ অশুদ্ধি দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। একটি শুদ্ধিপত্রও দেওয়া হয় নাই, হইলেও প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে পুস্তকখানি উপযোগী হইত না।

ছাপা চলনসই, বাঁধান রন্দ নহে।

ঐ বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

## বন্ধে

অনুশীলনের অভাবে পল্লীগ্ৰামে প্রাপ্ত শিলাময়ী মূর্তি-গুলির স্বরূপ নির্ণয় হইতে পারে নাই। ইহার ফলে ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ পড়িতেছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিন্ন-নাসা পাষণময়ী মূর্তি মাত্রই “নাককাটা বাসুদেব” নামে খ্যাত, পক্ষান্তরে অনেক বুদ্ধমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেছে। অনেক সূর্য্য ও নৃসিংহ মূর্তি সুবচনৌষষ্ঠী দেবী রূপে তৈল সিন্দূরে লিপ্ত হইতেছে। যাহা হইতেছে তাহা চিরকালই হইবে। সরলবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ পল্লীবাসী হিন্দুগণ কিছুতেই তাঁহাদের পূর্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে বুদ্ধমূর্তিখানির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি, ইহা অদ্যাপি দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত, নলতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে, হিন্দু-দেবতারূপে পূজিত হইতেছে। অনুমান শতবর্ষ পূর্বে এক দিবস জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এই মূর্তি সহ উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রপিতামহ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করেন যে—“আমি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় পাথেরশূন্য হইয়া পড়িয়াছি; মহাশয় অশুগ্রহ-পূর্বক এই মূর্তিটি প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া আমাকে ৫টি মুদ্রা প্রদান করুন, আমি তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়া মূর্তি ফেরত লইব। ভট্টাচার্য মহাশয় ৫টি মুদ্রা সন্ন্যাসীকে প্রদান করিয়া মূর্তিখানি গ্রহণ করিলেন; বহুকাল পরেও সন্ন্যাসী আর প্রত্যাবর্তন না করাতে, তিনি উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন; তদবধি মূর্তিটি নিয়মিত রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

সাধারণের নিকট মূর্তিটি “চিন্তামণি ঠাকুর” বলিয়া পরিচিত। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অভিধানে চিন্তামণি শব্দের অস্ত্যর্থ অর্থ ব্যতীত “বুদ্ধ-বিশেষ” এইরূপ এক অর্থ লিখিত আছে। কিন্তু মূর্তিটি পূজিত হইতেছে অর্দ্ধ-নারী-স্বর বা হর-গৌরীর ধ্যানে। আমরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট যে ধ্যানটি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—



চিন্তামণি ঠান্ডার।

নীল-প্রবাল-রুচিরং বিলসলিনেত্রং

পাশারুণোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।

অর্দ্ধাঘিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষণং

বালেন্দুবদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥

তন্ত্রসার গ্রন্থেও অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যান ঠিক এইরূপ দেখিতে পাইলাম।

প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তিটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তির পাদপীঠে অতি প্রাচীন বঙ্গাকরে “লোকনাথ সাত্ত্যাম” এই লিপিটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিটি মূর্তির নাম এবং অবস্থা পরিজ্ঞাপক। লোক-

নাথ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সাত্ত্যাম শব্দটি বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিত রূপ অর্থপরিগ্রহ হইতে পারে -  
আত্মনো হিতং কাম্ম—আত্মান্ (আত্মান্+হিতার্থে যৎ)  
আত্মোয়ান সহ বর্তমানঃ ইতি সাত্ত্যাম্। অর্থাৎ আত্মহিত  
কাম্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব। মূর্তিখানির প্রতিলিপির  
প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ লিপির সার্থকতা  
উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিকশিত শব্দলোপরি ধ্যানমগ্ন তথাগত উপবেশন  
করিয়া আছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে যোগানন্দজনিত  
পবিত্র হাস্য উছলিয়া উঠিয়াছে। মূর্তির দক্ষিণ হস্ত  
দক্ষিণ জাহুর উপর দিয়া যাইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে,  
ইহাই ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা নামে খ্যাত। বাম হস্তখানি  
ক্রোড়ের উপর বিশ্রুতভাবে রহিয়াছে। ঐ হস্তের মণি-  
বন্ধে বলয় এবং তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবকাশস্থলে  
একটি কিশলয় শোভা পাইতেছে, বক্ষস্থলে যজ্ঞোপবীত,  
বাম স্কন্ধে বিচিত্র উত্তরীয়, মস্তকে প্যাগোডার আকৃতি  
মনোরম মুকুট।\* কর্ণভূষণ স্কন্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত।  
ললাটে উন্নত টীকা। মূর্তির চালচিত্রের উপরিভাগে  
বিভিন্ন-মুদ্রায়ুক্ত পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ। দুই পার্শ্বে দুইটি  
দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। ১৪"×৮" ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টি-  
পাথরের ফলকে মূর্তিটি তক্ষিত হইয়াছে। †

বুদ্ধদেব উরুবেলায় বোধিদ্রুমমূলে যখন সঙ্ঘোধি  
লাভ করিতেছিলেন, তখন মার বিবিধ প্রকারে প্রলো-  
ভন প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে বোধিমার্গ হইতে স্থলিত  
করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কৃতকার্য  
হইতে পারিল না, তখন মার গৌতমকে সঙ্ঘোধন করিয়া  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যে সমুদ্র হইলে, তাহার ত'  
কেহ সাক্ষী রহিল না। পরে কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান  
করিবে? তথাগত তদুত্তরে মেদিনী স্পর্শ করিয়া  
পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্তই এই  
মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বা সাক্ষী মুদ্রা। মহাবোধিতে

\* বহুদিন পূর্বে কোন একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে জনৈক  
লেখক প্রতাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জাতির  
ব্যবহৃত টুপী তত্তৎ জাতির দেবমন্দিরের সদৃশ হইয়া থাকে।

† যে কষ্টিপাথরের ফলকে আঘাত করিলে ধাতুর স্থায় ঠন ঠন  
শব্দ হয় উহাই ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথর।

এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থে এই শ্রেণীর মূর্তির সাধনা বা ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে।\* ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত ফুসে নেপালে আবিষ্কৃত “সাধনমালা তন্ত্র” “সাধন সমুচ্চয়” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বজ্রাসন-সাধন নামক ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্তির ধ্যান আবিষ্কার করিয়াছেন।—

শ্রীমদ্বজ্রাসন-বুদ্ধ-ভট্টারকং আত্মানং ঋট, ইতি নিষ্পা-  
দয়েৎ; দ্বিভূজৈকমুখং পীতং চতুর্দ্বার-সজ্জাচিত-মহা-  
সিংহাসন-বরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্যাক্ষ-সংস্থিতং  
বামোৎসঙ্গস্থিত-বামকরণং, ভূম্পর্শমুদ্রা-দক্ষিণকরণং, বন্ধুক-  
রাগারুণ-বস্ত্রাবগুষ্ঠিত-তনু সর্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনক  
বিগ্রহং বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম ধাতু স্বভাবান্নকোহং ইত্যদ্বয়াহং-  
কারং কুর্যাৎ।” (বজ্রাসন-সাধন) Etude sur L'  
Iconographie Boudhique de L' Inde, P. 16.

যে পদ্মের উপর বুদ্ধদেব সমাসীন তাহার নাম ‘বিশ্ব-  
পদ্ম,’ যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়াছেন তাহার নাম  
‘বজ্র-পর্যাক্ষ-সংস্থান।’\*

মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটীতে যে অক্ষর ব্যবহৃত  
হইয়াছে, উহার সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক  
সংগৃহীত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত  
অক্ষরের বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ  
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত তাম্রশাসন পাল  
সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-যুগের (খ্রীঃ দশম—একাদশ শতাব্দীর)  
বঙ্গলিপি বলিয়া অনুমান করেন।† তাহার অনুমান  
সত্য হইলে এই মূর্তিটী প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন  
হইবে।

\* উল্লিখিত বঙ্গাক্ষরযুক্ত লিপি সন্নিবিষ্ট থাকাতে মূর্তিটী  
যে বঙ্গীয় শিলাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা সহজেই  
প্রমাণিত হইতেছে। মূর্তিটী এমন মসৃণ যে দেখিলে  
বোধ হয় ভাস্কর এইমাত্র উহার তক্ষণকার্য্য পরিসমাপ্ত  
করিয়া গিয়াছেন বঙ্গের বাহিরে বুদ্ধগয়া ও সারনাথে

\* ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে-সব তথ্য লিখিত  
হইল তাহা ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা  
হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “একটি  
বুদ্ধমূর্তি” নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

† “সাহিত্য”—১৩২০—১ম সংখ্যা—৫৮ পৃষ্ঠা।

বহুসংখ্যক মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু এমন কমনীয়  
মুখশ্রী এবং লাবণ্যে চলচল মূর্তি-শিল্প, বঙ্গদেশ ভিন্ন  
আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। প্রাচীন শিলা-  
শিল্পের কীর্তি-কোহিনূর অজস্তা গুহার উপলময়ী মূর্তি  
সমূহের প্রতিলিপি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে  
অত্যাশ্চর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলাময়ী রচনার সবিশেষ পারি-  
পাটা বর্তমান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পের বদন-  
মণ্ডলের কমনীয়তার নিকট ঐ-সকল মূর্তির মুখশ্রী মলিন  
ও কদর্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বঙ্গীয় শ্রীমূর্তির ঈদৃশ  
শিল্পমাধুরী বঙ্গীয় শিলা-শিল্পাচার্য্য “ধীমান” ও “বীত-  
পালের” শিক্ষাপদ্ধতির অননুসরণীয় স্বাতন্ত্র্য, অগতের  
সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাভিনোদ।

## ধানের উফরা রোগ

এই রোগটী প্রথমতঃ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাতেই  
দেখা যায় এবং ইহার স্থানীয় নাম ‘উফরা’ বা ‘উপরা’।  
ত্রিশ বৎসর হইতে এই রোগের অস্তিত্ব জানা আছে, বিশ  
বৎসর পূর্বে হইতে ইহার সংক্রামণ অধিক হইয়াছে, দেশীয়  
লোকদিগের মতে গত ৬৭ বৎসর হইতেই ইহার প্রকোপ  
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। বাটলার সাহেব উফরা  
রোগ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া রোগের কারণ ও  
সম্প্রতি ইহার কতকটা প্রতিকার স্থির করিয়াছেন।  
উফরা আমন ও আউস ধানেই দেখা গিয়াছে, বোরো  
ধানে ইহার আক্রমণ এখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই রোগের  
দ্বারা শস্যের কতটা ক্ষতি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা  
যায় নাই, তবে নোয়াখালি জেলায় সুধারাম, বেগমগঞ্জ,  
রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানায় অনিষ্ট খুবই বেশী হইয়াছে।  
১৯১০ সালে কেবল বেগমগঞ্জ থানায় ২০,০০০ মণ ধান  
নষ্ট হইয়াছে, চৌহমানিতে প্রায় অর্ধেক ফসল বিনষ্ট  
হইয়া গিয়াছে। বাটলার সাহেব মনে করেন ক্ষতির  
পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী।

নোয়াখালিতে জুন মাসের শেষে যখন আউস ধানে  
শীঘ্র বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখনই এই রোগের প্রথম





ধানের উফরা রোগ।

১—পাকা উফরার পরিণত অবস্থা; ডাঁটা সরু হইয়া গিয়াছে ও শীষের নিম্নাংশে রংএর বিকৃতি হইয়াছে। ২—এই স্থলে ডাঁটার ক্ষত স্পষ্ট নহে, শীষের নিম্নাংশে আক্রমণ হয় নাই। ৩—পাকা উফরার স্বভাব-পরিচায়ক লক্ষণ। ৪—ধোড় উফরার আক্রমণ।

আক্রমণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমে ইহা ক্ষেতের এক এক খণ্ডে মাত্র আবদ্ধ থাকে এবং প্রথম হইতেই ইহা সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে না। যদিও যে খণ্ডে এই রোগ ধরে সে খণ্ডের সমস্ত ধানই নষ্ট হইতে পারে তথাপি আউস ধানের সমগ্র অনিষ্টের পরিমাণ অধিক নহে;

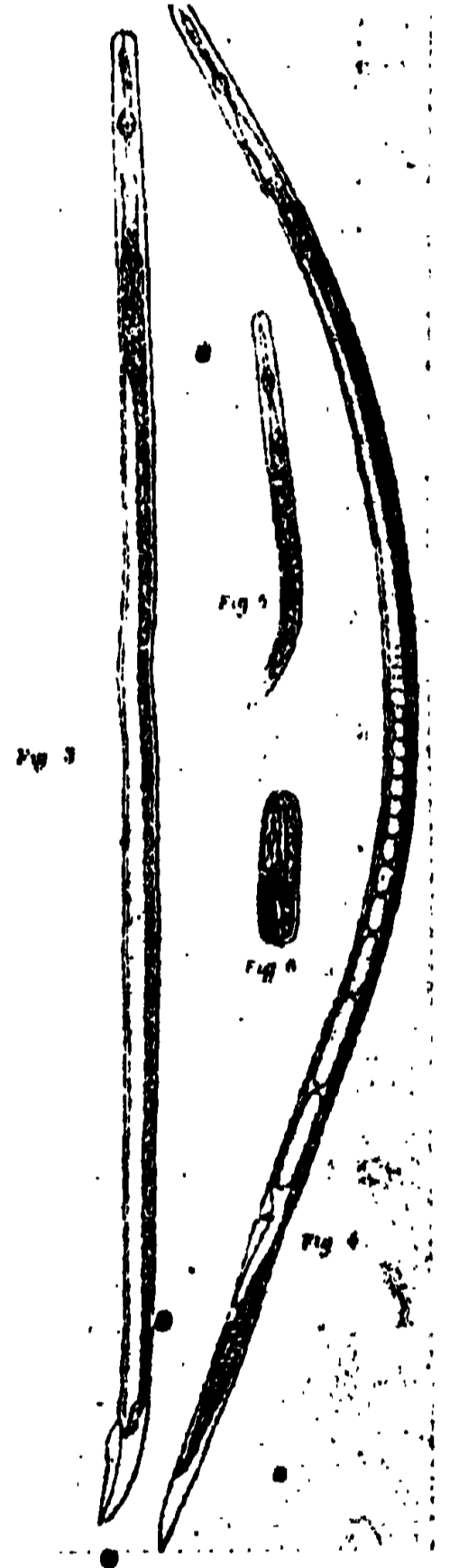
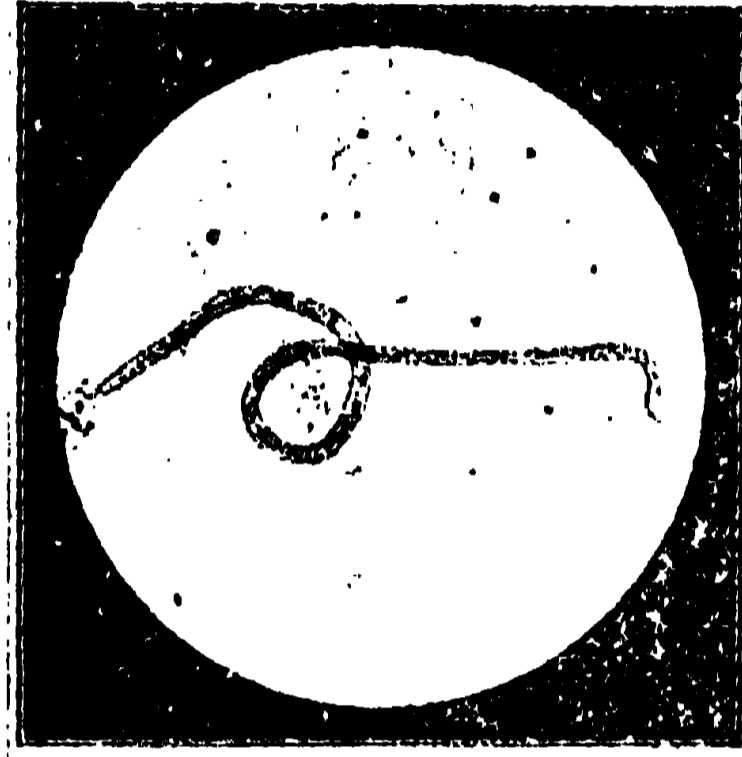
কারণ এই রোগ বহুবিস্তৃত হইবার পূর্বেই আউস ধান মাঠ হইতে উঠান হয়।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই, যখন আউসে উফরার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র, তখন আমন ধানের জীবনের অর্ধকালও পূর্ণ হয় না এবং তখনও ইহাতে ইহার শীষ বাহির হইবার সময় হয় না। এই অবস্থাতেও আমন ধানে উফরা রোগের প্রথম লক্ষণগুলি পাওয়া গিয়াছে। জুন মাসের পূর্বেই এই রোগের সূত্রপাত আউসে হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থার লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ছিটান আমন ধান ও মিশ্রিত আমন ও আউস ধান আগষ্ট মাসের শেষে কিম্বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ আউস ও আমন ধানের রোগপ্রবণতায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু রোগের কারণগুলি যত দিন যায় ততই ক্রমিক বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; তবে আউস ধানের স্থিতি অল্পকাল বলিয়া উহার বড় বেশী ক্ষতি করিতে পারে না; আমন ফলিতে অনেক সময় লাগে, সুতরাং তাহার অনিষ্ট অধিক হয়। জুলাই মাসের শেষে কেবল ছিটান আমন ধানে এই রোগের প্রথম অবস্থা দেখা গিয়াছে; তখন দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'পাতা' উফরা কহে। এই সময়ে সুস্থ ও আক্রান্ত গাছের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না, কেবল পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়া আসে, কতকগুলি প্রশাখার উপরিভাগ মলিন ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পাতায় ও পত্রকোষে মধ্য মধ্যে বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়। কুঁড়ির ভিতরের পরদা কুঞ্চিত হইয়া পড়ে ও কখন কখন তাহার উপর অস্পষ্ট বাদামী রংএর দাগ থাকে। গাছের ডাঁটার নিম্নাংশের কিছুই পরিবর্তন হয় না কিন্তু উপরের অংশে কতকগুলি বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়।

মাঠ হইতে ফসল উঠাইবার এক মাস পূর্বে উফরার শেষ লক্ষণগুলি দেখা যায়, তখন গাছ প্রায়ই বাঁড়ে না, বাহিরের পাতাগুলি কখন কখন শুকাইয়া যায়, আবার সময়ে সময়ে ইহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, পত্রকোষের উপর বাদামী রংএর দাগ থাকে ও ডাঁটার এক বা ততোধিক গাঁটের ঠিক উপরে এক প্রকার ক্ষত দেখা

যায় ; এই ক্ষতগুলি রোগ চিনাইয়া দেয় এবং প্রায়ই পাতায়ুক্ত গাঁটের উপরে কিম্বা নীচে অর্ধ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে। ডাঁটার এই অংশের রং খুব গাঢ় বাদামী কিম্বা কাল হয় এবং ইহা দুর্বল ও কুঞ্চিত হইয়া যায় ও কখন কখন অত্যন্ত সরু হইয়া পড়ে। যে স্থলে রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে রংএর বিকৃতি ডাঁটার কেবল এক দিকেই দেখা যায় কিন্তু ইহা সচরাচর চারি দিকেই বিস্তৃত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে ডাঁটার অগাঢ় অংশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগগুলি বর্তমান থাকে, ফুলের ডাঁটার রংও কখন কখন বদলাইয়া যায়। এবং সময়ে সময়ে ইহা কুঞ্চিত হইয়াও পড়ে, শীষ উপরের পত্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিম্বা উহার বাহিরেও আসিয়া পড়ে। শীষের এই প্রথম অবস্থার রোগকে চাম্বীরা 'খোড়' ও শেষোক্ত প্রকারকে 'পাকা' উফরা কহে। 'খোড়' উফরাতে ডাঁটার উপরের অংশ মাকুর ঝায় দুর্লিয়া উঠে, এবং উহার মধ্যেই ধানের শীষ সম্পূর্ণ ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই ক্ষীণ অংশ ও পাতা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থাতে পত্রকোষের দুই ধার মাত্র শুকাইয়া যায় ; কখনও নিম্নদিক হইতে, কখনও উপর দিক হইতে শুকাইতে আরম্ভ করে। পত্রকোষের মধ্য অংশ কিছুকাল সবুজই থাকে কিন্তু শীঘ্রই ইহাতে বাদামী রংএর দাগ দেখা যায় ; এই-সকল দাগই উফরা রোগের বিশেষ লক্ষণ। এই-সকল দাগ কখন কখন বিস্তৃত হইয়া পড়ে কিম্বা এক সঙ্গে ডাঁটার অনেকটা অংশ আবৃত করিয়া থাকে ; প্রায়ই এই দাগগুলি পাতলা কিম্বা গাঢ় রংএর হয় ; শেষ গাঁটের উপরে যেখানে পত্রকোষ ডাঁটার ক্ষত ঢাকিয়া থাকে তাহার নিম্নভাগে একই প্রকারের দাগ দৃষ্ট হয়। পত্রকোষের ভিতরের শীষে যে-সকল ফুল থাকে তাহাতে প্রায়ই পরাগসঙ্গম হয় না ও ফলগুলি কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং সমস্ত শীষে ছাতা পড়ে। 'পাকা' উফরাতে কোষ হইতে হয় সম্পূর্ণ শীষ কিম্বা উহার কিয়দংশ বাহিরে আসিয়া পড়ে। ফুলের ডাঁটাতে ইহার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ; উপরের পত্রকোষ প্রায়ই বাদামী ও শুষ্ক হইয়া যায় ও ইহা শীষের উপরিভাগ আবদ্ধ করিয়া রাখে ও নীচের

অংশ বিকৃত হইয়া পড়ে। বীজকোষের নীচের অংশে ফল প্রায়ই থাকে না এবং উপরের অংশ কখন কখন শূন্য থাকে, আবার সময়ে সময়ে ইহাতে পরিপক্ব বা অপরিপক্ব ফলও থাকে। আমন ধান অধিক দিনের ফসল বলিয়া ইহাকে এই রোগ দ্বারা গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।



ধানের উফরা পোকা।

- ১—পরিণত-বয়স্ক পুরুষ পোকা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ২—বহুসংখ্যক পোকায় সমবেত অবস্থা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ৩—পুরুষ পোকা (শতাধিক গুণ বর্ধিত) ৪—স্ত্রী পোকা (শতাধিক গুণ বর্ধিত) ৫—অপরিণত পোকা (শতাধিক গুণ বর্ধিত) ৬—উৎস্বিত ছোট পোকা (বহুগুণ বর্ধিত)।

অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কীট (insect) কিম্বা কোনও জীবাণু (Bacteria) দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি নহে। (Nematode) বা Eelworm জাতীয় এক প্রকার পোকায় (Worm) আক্রমণই এই রোগের কারণ। এই জাতীয় অনেক পোকা বৃক্ষ বা প্রাণীদেহের উপর থাকিয়া জীবন ধারণ করে। উফরা রোগ যে শ্রেণী

হইতে উৎপন্ন তাহা Tylenchus জাতিভুক্ত। এবং ইহার নাম Tylenchus Angustus। এই পোকা গাছের পেশীর উপরেই থাকে ও ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। রোগের প্রথম অবস্থাতে পাতার কুঁড়ির ভিতরের পর্দার মধ্যেই পোকাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। 'খোড়' উফরাতে ডাঁটার কুঞ্চিত, কাল অংশে শীষের নীচে পোকাগুলি একত্র সমবেত হইয়া থাকে; 'পাকা' উফরাতেও ডাঁটার পূর্বোক্ত অংশে ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু শীষেই ইহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলের বাহিরে থাকে। এক একটা পোকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, হাঁ ইঞ্চি লম্বা ও ১/১০ ইঞ্চি চওড়া—শুধু-চোখে দেখা একেবারেই অসম্ভব; যখন এক স্থানে বহুসংখ্যক সমবেত হইয়া থাকে তখন সাদা সূত্রসমষ্টির ন্যায় দেখায়। ছোট, বড়, সকল রকম পোকা, ও তাহাদের ডিম, সব একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকার মুখে একটা ছোট কাঁটা থাকে, শুষ্কিয়ারা থাইবার সময় ইহারা এই কাঁটা বাহির করে। প্রত্যেক স্ত্রীপোকা ৫০ হইতে ১০০টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি ১০০টা ডিম ফুটিয়া ৫০টি পুরুষ ও ৫০টি স্ত্রীপোকা বাহির হয় তাহা হইলে তিনবার বংশ পর্য্যায়ের এক জোড়া পোকা হইতে ২৫০০০ পোকা উৎপন্ন হইবে—ইহা হইতেই এই পোকার বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এযাবৎকাল এই পোকা কেবলমাত্র ধানেই পাওয়া গিয়াছে এবং ধানের যে অংশ মাটির উপরে থাকে তাহাতেই দেখা গিয়াছে; শিকড়ে, মাটিতে বা জমির আগাছাতে ইহা দেখা যায় নাই। যে-সকল গাছে এই রোগ ধরে শস্য উঠাইবার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে শুষ্ক হইয়াও এই পোকা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন কি ১৫ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তবে জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকিলে এই পোকা চারি মাসের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত পোকাগুলি অধিক সজীবতা প্রাপ্ত হয় ও চারিদিকে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়। ডিসেম্বর মাসে তাহাদের নড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা আর

থাকে না ও তাহারা শীষের ভিতর ও শস্য উঠাইবার পর পরিত্যক্ত অংশের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে। বর্ষার আরম্ভে মাঠে যখন জল আসে তখন ইহারা পুনরায় কার্যাত্মক হয়। সজীব গাছ হইতেই ইহারা আহার গ্রহণ করে ও গাছের উপরেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, ধান পাকিলে ইহারা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগের সংক্রামণের সময় পোকারা জলের উপর দিয়া এক গাছ হইতে অপর গাছে যায়, এমন কি জলের নীচে থাকিলেও জলের উপর উঠিয়া গাছের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পোকার মুখে ছোট, সরু কাঁটা থাকে, ইহা বিদ্ধ করিয়া ইহারা গাছের রস টানিয়া লয়। এই সরু কাঁটা গাছের কঠিন অংশে প্রবেশ করাইতে পারে না, সেই জন্য গাছের কোমল স্থানেই এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়; ডাঁটার প্রত্যেক গাঁটের ঠিক উপরের অংশ খুব কোমল ও সরু, সুতরাং এই স্থানেই উফরার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এই রোগনিবারক কোন সঠিক উপায় নির্ধারণ বহু সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ; তবে দুই প্রকার উপায়ে ইহা নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ রোগ-উৎপাদক পোকার বংশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ধানগাছের এই রোগপ্রবণতা যাহাতে অল্প হয় তাহার উপায় স্থির করা। প্রথমেই মনে হইতে পারে যে গাছে কোনও বিষাক্ত পদার্থ ছিটাইলে কিম্বা জমির জলের সহিত উক্ত বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকার বংশ ধ্বংস করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব, কারণ পোকাগুলি গাছের কুঁড়ির অভ্যন্তরেই থাকে, উক্ত বিষাক্ত পদার্থ ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে পায় না।

ধান উঠাইয়া লইবার পর মাঠে পরিত্যক্ত অংশগুলি জ্বালাইয়া দিলে পোকা বিনষ্ট হইতে পারে; রোগাক্রান্ত বীজ পরবৎসর বপন করা উচিত নহে, কারণ যে-সকল গাছে 'পাকা' উফরা ধরে সেই-সকল গাছের বীজে পোকা থাকে, এই সময়ে ইহারা জীবিত থাকে কি না তাহা জানা যায় নাই। যদি এই রোগ বীজ হইতে আসিত তাহা হইলে এই ব্যাধির ব্যাপ্তি আরও বেশী হইত, কারণ বীজ বিনিময় সর্বত্রই অতি অধিক পরিমাণে হইয়া

থাকে; যদি মাটি হইতে এই রোগ বিস্তৃত হইত তাহা হইলে যে-সকল জমিতে ধান নাড়িয়া রোপণ করা হইয়াছে সেই-সকল জমি নিশ্চয়ই পূর্বে আক্রান্ত হইয়া পড়িত, কেননা শীতের শেষে নীচু জমি হইতে মাটি কাটিয়া পাটের জমিতে দেওয়া হয় ও ইহা হইতে ইহমস্তিক ধানের দ্বিতীয় ফসলও লওয়া হয়। আক্রান্ত গাছের সহিত সুস্থ গাছ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে এই পোকা আসিলেই গাছ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বীজ-জমি হইতে গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময় এই রোগ বর্তমান থাকে না।

গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়াইয়া ফেলিলে খুব উপকার হয় এবং ইহা কৃষিকার্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য বলিয়া মনে করা উচিত। ধান উঠাইবার পর জমিতে লাক্স দিলে গাছের গোড়া মাটির সহিত মিশিয়া অতি শীঘ্র পচিয়া যায় এবং পোকাও মরিয়া যাইতে পারে, কেননা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ভিজা জমিতে এই পোকা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল জমি খুব শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়, এক পশলা বৃষ্টির পর তাহা খুবই নরম হইয়া পড়ে, তখন ইহার উপর লাক্স দেওয়া সহজ হইয়া উঠে। রোগ নিবারণের জন্ত গাছের সুস্থতার দিকেও মনোযোগ রাখা বিশেষ দরকার। দেখা গিয়াছে যে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া যে-সকল ধান রোপণ করা হয় তাহাতে উফরার আক্রমণ হয় না, সুতরাং যাহাতে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া ধান রোপণ করিবার প্রণালী বুদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা অতি আবশ্যিক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের উপদেষ্টানুসারে এই রোগ নিবারণের জন্ত জমিতে চূন ছিটান হইয়াছিল, ইহাতে রোগের আক্রমণ বিলম্বে হইয়াছিল বটে কিন্তু ফসল রক্ষা পায় নাই, অধিকন্তু ইহাতে ব্যয় অধিক পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে-সকল ধান-জমির মৃত্তিকায় বায়ুর চলাচল বহুদিন ধরিয়া বাধা পায় সেই-সকল জমিতেই উফরা রোগ দেখা দিবার বেশী সম্ভাবনা। যাহাতে জমি হইতে অত্যধিক জল স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

উপস্থিত রোগনিবারক যে-সকল উপায় আলোচনা করা হইল তাহা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্ত বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট বর্তমান বৎসরে রোগনিবারক পরীক্ষার জন্ত এগার হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কৃষিবিদ্যালয়,  
সাবোর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

## উদ্বোধন ❀

প্রভাতে যখন সকল ধরণী আনন্দে জাগিয়া ওঠে সেই সময় সকল প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে, নব পবন-মর্মরের সঙ্গে সঙ্গে, সকল কুসুম-কুলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সকল বিহঙ্গের কলসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে, সহজেই আমাদের চিত্ত জাগিয়া উঠিতে চাহে। কিন্তু সকল কর্ম-কোলাহলের সমস্তদিনব্যাপী বিচিত্র উন্মত্ততার অসা-ড়তা হইতে কে আমাদের গকে এই সন্ধ্যার আনন্দ-উৎসবে জাগ্রত করিবে? সকল দিবস নানা ক্ষেত্রে উত্তপ্ত হইয়া, নানা ভাগে ধুও ধুও হইয়া, যে হৃদয় ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, এখন সন্ধ্যার গভীরতার গুভম্বে শান্তিময়ী জননী সন্ধ্যাপহারী বন্ধে ফিরিবার সময় কে তাহাকে সমগ্র পরিপূর্ণ করিবে? কে তাহাকে জননী গহন গভীর পরশের জন্ত ব্যাকুল করিয়া লইবে?

চরণ করলকে লাল পরশ পর

সব সুর সুরভি খোলৈ।

পৌন কাঁপত কাঁপত কঁরলরা

মৌন কোইল সব বোলে।

(জ্ঞানদাস)

“হে প্রিয়তম, তোমার চরণকমলের অরুণ-রক্ত পরশ-মাত্র প্রকৃতির সীমাহীন মন্দিরে সকল সুর সকল সুরভি বিকশিত হইয়া উঠে। সেই প্রাণময় পরশ লাগিয়া পবন নব জাগরণের আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, কমলদল জাগরণের নব আনন্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, মৌন বিহগকণ্ঠে সুর নব আনন্দে জাগিয়া উঠে।”

আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

কিন্তু সন্ধ্যার এই অচল জড়তার ভারে যখন মন অবসন্ন, নানা কোলাহলের ও উন্মত্ততার বিক্ষেপে যখন হৃদয় সংক্ষুব্ধ, তখন পরমদেবতার চরণতলে শান্ত হইয়া বসিতে হইলে তাঁহারই শ্রীচরণকমলের আরো গভীরতর পরশ চাই।

এই যে সন্ধ্যার প্রশান্ত লগ্নে তাঁহার অসীম অতল হৃদয়, সকল চরাচরকে গভীর অন্তরের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে, এও একটি গভীরতর প্রভাত। প্রভাতের ঞায়ই তিনি প্রেমারুণ হস্তে আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া স্বীয় নিঃশব্দগন্তীর বক্ষে টানিয়া লইতেছেন। কি গভীর সেই তিমির-ঘন আলিঙ্গন, যে, তাহার পরশে এই অপরূপ প্রভাতে গগনময় গ্রহতারকার কুসুম-দল ফুটিয়া চলিয়াছে।

অথাহ হিরদকে তিরিঁর পরস পর

সব তার সিতার জাগৈ।

বেলি চমেলিকে মহক ফিরি ফিরি

সব উর পরবেস মাগৈ।

( জ্ঞানদাস )

“তোমার অতল হৃদয়ের তিমির-পরশে সব নক্ষত্র তারা গগনে জাগিয়া উঠিল। বেলাই চামেলীর গন্ধ ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সকলের হৃদয়ে প্রবেশ ভিক্ষা করিতে লাগিল।”

সেই প্রিয়তমের যে পরশখানি ধরণীতলকে বক্ষের গভীর আলিঙ্গনে গ্রহণ করিবা মাত্রই জগতের সকল ধূলিজাল অপসৃত হইল, সকল কোলাহল শান্ত হইয়া গেল, সকল পক্ষী নীড়ে ফিরিয়া আসিল; সেই পরশ-মণির দ্বারা তিনি আমাদের হৃদয় মন প্রাণকে স্পর্শ করুন। আমাদের হৃদয়ের সমুদয় ধূলি এই পুণ্য উৎসব-লগ্নে অপগত হউক, সকল মুখরতা শুক হইয়া যাউক, হৃদয়ের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়েই ফিরিয়া আসুক।

তাঁহার তিমির-পরশের এই যে একটি পবিত্র লগ্ন, দিবসের অবসানে নিখিল চরাচরে অপার শান্তি আনিয়া দেয়, সেই লগ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সেই গভীরতর প্রভাতের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে চাই। এই শুভমিলন-মুহূর্তে আমাদের হৃদয়কে জাগাইয়া তুলিতেই

হইবে। প্রেমময় তাঁহার তিমির-প্রেমধারায় আমাদের হৃদয়ের সকল জড়তা, অবসাদ, দৈন্ত, দাহ ধৌত করিয়া নির্মল করিয়া দিউন। রজনীগন্ধার ঞায় আমাদের হৃদয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আপন নির্মলতার আনন্দটি বিকীর্ণ করিয়া দিউক। এই শুভ লগ্নকে আশ্রয় করিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় আমরা মহা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই উৎসবের আহ্বান সকল মানবকে নানা সুখভোগ, দৈন্ত জড়তা শোক দুঃখ, বিলাস অবসাদ, কৰ্ম ও ব্যস্ততা, হইতে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।

এই যে উৎসব-যজ্ঞের দীক্ষা তাহাতেও তাঁহার নিকটেই দীক্ষিত হইয়াছি। সেই জগদগুরু, নিকটেই ইহার শিক্ষা পাইয়াছি। অন্তরের সহিত অন্তরের মিলন, জগতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, সে শিক্ষাও পাইয়াছি তাঁহারই কাছে। কোন্ অনাদি কাল হইতে তিনি আমার হৃদয়ের সহিত মিলনপ্রয়াসী। তাহার জন্ম সেই অনাদি কাল হইতেই তিনি গ্রহচন্দ্রতায় উৎসব-সভা 'দাজাইয়া রাখিয়াছেন। কি বিরাট নীল চন্দ্রাতপ মাথার উপর ধরিয়া, কিবা শ্রামল নানা-কুসুমবিচিত্র মিলনের আসন-খানি বিছাইয়া রাখিয়াছেন। কত পুষ্পসৌরভে আমোদিত, কত পবন-বীজনে বীজিত এই উৎসব-মন্দির। আমার হৃদয় যে আজও জাগিয়া উঠে নাই, তাহাকেই বা কত আঘাত দিয়া তিনি উৎসবের জন্ম জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

কি মধুর তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি, দিবসের রজনীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! কত সৌন্দর্য্যে সৌকুমার্য্যে আমার ইন্দ্রিয়-বাতায়নে বাতায়নে তাঁহার অনুনয়-বাণীর করুণ রাগিনী কত কত যুগ ধরিয়া তিনি বুথাই শুনাইয়া গিয়াছেন। কত দুঃখদুর্গতির দুঃসহ কঠিন আঘাত দিয়াছেন। কত শোকতাপের বজ্র-আঘাতে আমাকে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। নিদ্রিত হৃদয় তথাপি জাগিয়া উঠে নাই। হৃদয় সুখের মধ্যে ভোগের মধ্যে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিয়াছে, বিলাস-বৈভবের মধ্যে আপন মর্ষগত দারিদ্র্য লুকাইতে গিয়া কেবল তাঁহার আহ্বান এড়াইয়া এড়াইয়া চলিয়াছে। তথাপি তাঁহার উৎসবসভার সমারোহ একদিনের জন্মও নিশ্চিত করিতে, এক দিবসের

জন্যও এই আয়োজনকে সংযত করিতে তিনি সাহস পান নাই, কারণ কোন্ যত্নে যে আমার হৃদয় হঠাৎ জাগিয়া উঠিবে তাহার তো কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাই তাঁহার বিশ্বস্ততা আমার অনিশ্চিত লগ্নের জাগরণের জন্য এমনি অসীম এমনি গভীর ভাবে নিত্য-নিত্য কাল প্রস্তুত রাখিয়াছে।

বরং তাঁহার উৎসবের সাজসজ্জার আড়ম্বরেই আমার হৃদয় হৃদয়েশ্বরকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার মিলন-মন্দিরের ঐশ্বর্যের দিকেই নয়ন চাহিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে হৃদয় অবসর পায় নাই। তাঁহার মিলন-সভাই তাঁহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তথাপি তো তিনি আমার জন্য এই উৎসব-সমারোহকে সঙ্কচিত করিতে পারেন নাই।

এই বিশ্বশোভা যে তাঁহারই দূত। এই দূতকেই যখন আমার সন্মুখে দেখিয়াছি তখন আমার মহারাজের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া এই দূতের দিকেই, তাহার সাজসজ্জার দিকেই, অবাক হইয়া চাহিয়া রাখিয়াছি। বিমুক্ত মানবের বঞ্চিত হৃদয় দূতকে এইজন্য বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে

কজর মে জব স্মায়া যলচী পুশাক সুনহলী তেরী ।  
গমক ভর জব স্বাস লগায়া চিত জাগায়া মেরী ॥  
ধূপমে হমকো কিয়া উদাস। ক্যা পীড় দুর সমায়া ।  
গায়া গেরুয়া সুর মগররী মরণসা রৈণ আয়া ॥  
কাগজ কালা হরফ উজালা ক্যা ভারী খত পায়া ।  
ইতী রোনক কোঁরে যলচী তুহি যাদ ভুলায়া ॥

( জ্ঞানদাস )

“হে দূত, প্রভ্রাতে যখন তুমি আসিলে কি স্বর্ণবর্ণ ছিল তোমার পোষাক! সুরভিতে পরিপূর্ণ বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস যখন আমার অঙ্গে লাগাইলে তখন আমার চিত্ত যেন জাগিয়া উঠিল। রোদ্রে দূরে দূরান্তরে কি বেদনা তুমি ভরিয়া দিয়া আমার হৃদয় উদাস করিয়া তুলিলে! তুমি সন্ধ্যায় কি গেরুয়া রঙের পশ্চিমা সুর গাহিলে! তার পুর মুহুর ঞায় গভীর রাত্রি আসিল। তখন তোমার কি বিরাট পত্র পাইলাম। গগনের কৃষ্ণ পত্রে গ্রহতারকার অগ্নিময় উজ্জ্বল অক্ষরে অক্ষরে তোমার কি

বিরাট বাণী জ্বলিয়া উঠিল! এত আড়ম্বর কেন তোমার ওরে দূত, তুইই ত আমার চিত্তকে ভুলাইয়া দিলি।”

ভক্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতা যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তখন আবার মহারাজের বিশ্বদূতই তাহার ব্যথিত হৃদয়ের কানে কানে এই কথাটি বলিয়া দেয়

ভারী জলসা আজম দারত তুহি ইক মেহমান ।

খল্ খল্ মে খত হৈ ফৈলী মধ্ কুর হম ফরমান ॥

“হে অতিথি, মহতী সেই সভা, বিরাট সেই উৎসব, তুমিই তাহাতে একমাত্র নিমন্ত্রিত। লোকে লোকে তাই তোমার জন্য লিপি বিস্মৃত হইয়া রাখিয়াছে। তুমি ছাড়া আর ত কেহ সে গভীর সভাতে নিমন্ত্রিত নাই। তোমার নয়নে তাঁহার লিপিখানি পাছে না পড়ে সেই সকল লোকে লোকে সেই অগ্নিময়ী লিপি। ঋতুতে ঋতুতে সেই লিপি নব নব বর্ণে উদ্ভাসিত। সকল কালে, সকল স্থানে, যুগে যুগে, লোকে লোকে, তোমারই জন্য এই অপরূপ আয়োজন চলিয়াছে। আর এমন উৎসবের একমাত্র নিমন্ত্রিতের নিকট প্রেরিত যে দূত সে কেন না গর্বে ক্ষীণ হইয়া উঠিবে। তাই আমার দিকে দিকে নব নব নেপথ্য-বিধান, ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিচিত্র বিলাস।”

হৃদয়েশ্বরের সহিত মিলনের এই যে উৎসব তাহা ত তবে আমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল, যে স্থানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন সে স্থান ত নিভৃত হওয়াই উচিত ছিল। সকলে একত্র হইয়া কেন এক সন্মিলিত মহা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলাম।

তিনি ত কেবল একমাত্র হৃদয়েরই দেবতা নহেন, তিনি যে বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের পিতা, তাই তাঁহার সকল সন্তান—অমৃতের সন্তান, তাঁহার উৎসবে সমবেত হইয়াছে। মানবমাত্রই যে অমৃতের পুত্র সেই মহাসত্য আজ সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক। সেই প্রাচীন ঋষিবানী আজ যুগ যুগান্তের বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্ণে বজ্রের ঞায় গভীর শব্দে বাজিয়া উঠুক,— “শৃগস্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ”—হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর। ধনের পুত্র স্নেহের পুত্র নহ, পাপের তাপের দুঃখ-দারিদ্র্যের পুত্র নহ, তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র। তোমার জন্য নিখিল বিশ্ব যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাহার সমস্ত

বাণী লইয়া শুরু হইয়া আছে—আজ সেই পরিপূর্ণ বাণীর মধ্যে উদ্বোধিত হও, আজ সমস্ত ধরিত্রী আকাশ মহা-ছন্দে বিদীর্ণ হইয়া তোমাদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করুক। আমরা কি ক্ষুদ্র দীন ভাষাতে মানবকে আহ্বান করিতে পারি! নিজের সত্য নাম কে জানে, তোমরা কি নিজের নাম জান? নিজেকে কেহ বা জ্ঞানী বলিয়া, কেহ বা মানী বলিয়া, কেহ বা ধনী বলিয়া, কেহ বা দুঃখী দরিদ্র বলিয়া, কেহ বা কৰ্ম্মী বলিয়া জান; কিন্তু সেই সব নাম মিথ্যা। তোমাদের সত্য নাম একমাত্র জানেন তিনি, যিনি নিখিল জীবনের অন্তর্যামী। “নিজ তত্ত্বনাম নিশ্চৈ নহি জানৈ সৰ্বৈ ভরম মে খপসী” নিজের তত্ত্বনাম না জানা-তেই যে সব ভ্রমে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই যে বিরাট বিশ্ব তাহা মহেশ্বরেরই মহাবাণী—তাহা বিরাট ছন্দে ছন্দে গ্রহ চন্দ্র তারকায়, কোটি চন্দ্র উপনে, শৈল সাগর কান্তারে উদ্ভাসিত। সেই-সব যুগ যুগান্ত ধরিয়া অহর্নিশি তোমাকে ডাকিতেছে—তোমাকেই ডাকিতেছে। শ্রবণ কর, শ্রবণ কর। নিজেকে জ্ঞানী, ধৰ্ম্মী, ধনী, মানী, যোগী, সংসারী প্রভৃতি নানা মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার বাণীকে এড়াইও না। “শৃগন্তু”—শোন শোন নিত্যকালে উদ্ভাসিত সেই বাণী। তোমরা সেই আহ্বান এড়াইলে কি হইবে? তিনি তোমাকে কোনো ক্ষুদ্র নামে ডাকিবেন না। আজ তাঁহার সন্ধ্যা-মহোৎসবে উদীরিত সেই আবাহন-ধ্বনি “শৃগন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।” তোমরা সকলে হৃদয় পাতিয়া শুনিয়া তবে আজিকার মহামহোৎসবে যোগদান কর। তিনি যেমন নিখিল বিশ্বে আপনাকে লুটাইয়া দিয়াছেন তেমনি আপনাকে আজ নিখিল চরাচরে লুটাইয়া দাও। কোনো দৈন্ত নাই—আজ উৎসবের দিন এবং তোমরা অমৃতের পুত্র। তাই তো আমাদের দূত এত বিরাট, বাণী এত বিপুল, প্রতীক্ষা এত অসীম। তার মধ্যে কি নিরুপম অনুন্নয় অতুলন অপার সৌন্দর্য্যে ও অপরূপ সৌকুমার্য্যে ও বেদনায় ঝঙ্কত হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্মই জগতে এই উৎসবের ষটা পাগিয়া গিয়াছে।

হে দেবতা, আমার অনিশ্চিত লগ্নের আকস্মিক জাগরণের জন্ম যদি তোমার” এমন বৃহৎ অসীম লোক-

লোকান্তরকে অনন্তকাল হইতে এরূপ উৎসব-সাজে সাজাইয়া রাখিতে পারিয়া থাক, তবে আজ যখন তোমার সন্তানগণ তোমার আহ্বানে সমবেত হইয়াছেন তখন মিলন-সভাকে তাঁহারা আলোকে সঙ্গীতে সৌভবে বিচিত্রতায় সুন্দর উৎসবময় করিতে কেন না চাহিবেন? আজিকার এই সন্ধ্যায়ও তোমার গগনে কি বিরাট উৎসবের উজ্জ্বল সমারোহ, পবনে কি মনোহর পরশ চলিয়াছে। তোমার ত্রীচরণ-পরশ-আশাতে যখন সকল হৃদয় আজ সন্মিলিত, তখন এই প্রাঙ্গণে যদি একটু উৎসব লাগিয়া গিয়া থাকে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু হে জীবননাথ, আজ বাহিরের সাজ সজ্জাতেই যেন এই উৎসবের পরিসমাপ্তি না হয়। আজ যেন উৎসবের অবসানে অবমানে নতমুখে আমরা এখান হইতে ফিরিয়া না যাই। তোমার চরণধূলি যেন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তোমায় আত্মদান-ব্রতের পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করিয়া তোমার প্রসাদ-সুধায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আমরা আজ আনন্দে এখান হইতে যাত্রা করি। তোমার দিকে চাহিবার মৃত দৃষ্টি আজ দান কর, তোমার ব্রতে অটল থাকিবার মত বিরাট বীর্য্য দাও, সকল মধুর সঙ্গীতে ও সকল কঠিন আঘাতে তোমার বাণী শুনিবার মত শ্রবণ আজ দাও। সকল বচনে তোমার ধ্বনি যেন বাজিতে থাকে। সকল হৃদয়ে হৃদয়ে যেন তোমার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

হে নারায়ণ, আমাদের আজিকার এই যে উৎসব তাহা আমাদের গৃহকোণে বসিয়া তোমাকে একেলা সম্ভোগ করিবার জন্ম নহে। অক্ষি যে পিতা বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিবার উৎসব। আজ যদি হৃদয়ের কোথাও একটুও সঙ্কীর্ণতা থাকে তবে এই পিতৃনামের উৎসবে, তোমার প্রসাদ নহে, তোমার বজ্র অবতীর্ণ হইবে।

“কিতী ধাহ হৈ তেরে অজন মে কিতী ধাহ হিঁয় বীচ” পিতা বলিয়া যে তাঁহাকে সম্বোধন করিবে—কত দূর ঠাঁই আছে তোমার উৎসব-ভবনে, কত দূর ঠাঁই আছে তোমার হৃদয়ে? যদি তুমি আজ আপনার ও পরের দল বলিয়া বিচার করিতে বসিয়া থাক, তবে ভাদিয়া দাও এই উৎ-

সব-সভা। যদি তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তবে সকল চরাচরকে গ্রহণ করিবার মত বিস্তীর্ণ কর তোমার হৃদয় ; নহিলে গৃহকোণে বসিয়া কোণকে পূজা কর—পিতার নাম যুখে উচ্চারণ করিও না।

তিনি পিতা। পুত্র হইবার অধিকার যদি চাও তবে আজ পিতার ঐশ্বৰ্য্যের অধিকার লইতে হইবে। সেই যে তাঁহার আপনাকে নিঃশেষে দান করার ঐশ্বৰ্য্য, সকলের সেবায় আপনাকে রিক্ত করিয়া দিবার অমৃত— তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সৰ্ব্ব ঐশ্বৰ্য্যের উপরে তাঁহার পরম ঐশ্বৰ্য্য এই, যে, তিনি সকলের পায়ের ধুলার তলে অটল হইয়া বসিতে পারেন। সেই ঐশ্বৰ্য্যের বিপুল ভার গ্রহণ করার মত বল চাই। আজ সকলের মধ্যে বসিয়া সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার সকল আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে সম্বরে আহ্বান করিতে চাই।

হে সকল লোকপিতা, তোমাকে এই সভাতে উৎসবে যোগ দিতে হইবে। তোমাকে যখন প্রিয়তম বলি তখন বাসরগৃহখানি তোমার মন্দির, যখন বন্ধু বলি তখন গৃহে ও পথে তোমাকে লইয়া একেলা চলিতে পারি, যখন প্রভু বলি তখন সকল কর্ণে তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। যখন বলি জীবনের অধীশ্বর, তোমাকে আমাদের জীবনে অধিষ্ঠিত করিবার যে সাধনা তাহা তখন আমাদের একেলার।

পীতম বাসর-মন্দির হৈ য়ার ঘর রাহ।

সব কর্ম ধর্ম মে' রহু মে'রে নাই ॥

পিতা জব কহন লাগেঁয়া আরো আঁগন হমার।

দিরালা দিহরা নহি দেব নহি করতার ॥

( নির্ভয় দাস )

“প্রিয়তম, বাসর তোমার মন্দির ছিল ; বন্ধু, গৃহে পথে মিলন তো হইয়াছে ; প্রভু, সকল কর্ণে ধর্মে তুমি থাক। কিন্তু আজ তুমি পিতা। আজ তোমাকে দেবতা বলিব না। তবে আমাকে তোমার মন্দিরে যাইতে হইবে। আজ দেবতা নও, মহারাজ নও, আজ মন্দিরে আমরা যাইব না, সভায় আমরা যাইব না। আজ আমাদের সকলের মধ্যে, তোমার সকল সন্তানের মিলনের প্রাক্কনে তোমাকে আসিতে হইবে।”

আসিতেই হইবে, তুমি যে পিতা, তুমি মাতা। তোমার যে-সব সন্তান সারা বর্ষ ধরিয়া তোমার মন্দির খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেহ মনে শান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকেই বিশ্বত হইয়া নানা শোক দুঃখের রোগ-ভোগের দারুণ আঘাতে যাহারা মাটিতে হুইয়া পড়িয়াছে, দৈন্ত্য দুর্গতির বিষম আঘাতে যাহারা গুণ্ড প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে, পাপ তাপের নীচতার অপমানের অপরাধের দাহে যাহাদের হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই-সব সন্তান আজ তোমার উৎসবের সন্ধান পাইয়াছে। হতভাগ্য যে-সব সন্তান তোমার কথাও বিশ্বত হইয়া বিলাসে ভোগে, বৈভবে ঐশ্বৰ্য্যে, আপনার অন্তরাঙ্গাকে দিন দিন বিগুণ্ড ও মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে তাহারা আজ এখানে সমবেত। শোকের দারুণ আঘাত, দুঃখের তীব্র দাহ পাইয়া যাহারা অন্ধকারে তোমার শান্তিময় শ্রীচরণ খুঁজিয়া পায় নাই তাহারা আজ সমাগত, অগতির গতি এই পিতার মন্ত্র সকলে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি পিতা, তুমি মাতা, আমরা যে তোমার পুত্র ; যে সন্তান তোমার সন্ধান করিতে পারিল না সে আজ সৰ্ব্বজনের উদার প্রাক্কনে বসিয়া পড়িল, যে পাপে তাপে দগ্ধ সে আজ এখানে আশ্রয় লইল, সারা বৎসর যাহার হৃদয় অনশনে দিন কাটাইয়াছে সে আজ এই প্রাক্কনে আসিয়া মিলিল। এইবার জননী তোমাকে আসতে হইবে। মলিনতা থাকে ধৌত করিতে হইবে, কারণ “পিতা নো হসি” আমরা যে তোমারই পুত্র। তুমি যে আমাদের পিতা মাতা। তুমি আমার একেলার পিতা নহ। তুমি যে সকলের পিতা। এই মন্ত্র যখন উচ্চারণ করিয়াছি—তখন আর আমাদের হৃদয়ের দ্বার—উৎসবের দ্বার সঙ্কুচিত করিলে চলিবে না। “আমাদের পিতা” তুমি—তোমার সকল সন্তানের স্থান আজ আমার ঘরে আমার হৃদয়ে আছে। আজ সকল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। আজ ধনী নাই, দরিদ্র নাই, পাপী নাই, ধার্মিক নাই, পূজ্য নাই, অপবিত্র নাই—আজ কেবল আছে তোমার পূজার অঞ্জলি ; সকল জীবন দুই হাতে তুলিয়া তোমার চরণতলে নিবেদন করিয়া দিবার অঞ্জলি ; আছে পৌঠস্থান আমাদের উৎসব। আর আছে নিখিল মানবের স্বাগত অর্ঘ্য, উদার আবাহন-



ধ্বনি। যদি অপরিষ্কৃত হই তবে পবিত্র কর, যদি অজ্ঞান হই তবে জ্ঞান দাও।

হে পিতা, এতদিন যাহারা গাথের সন্ধান পায় নাই তাহারা আজ পথের সন্ধান পাইয়াছে। তুমি যে পিতা এই সন্ধান তাহারা পাইয়াছে। তোমার সম্মানগণের সমবেত আহ্বানে তোমাকে যে আসিতে হইবে সে নিগূঢ় সন্ধান সকলে লাভ করিয়াছে, তাই আজ সকলে উৎসবে প্রস্তুত।

আজ সকলের উৎসব, মুক্তির উৎসব। প্রতিদিন সকলে যে একই অভি্যাসের ক্ষুণ্ণ পথে কুলাল-চক্রের ঞায় চলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার উৎসব। আপনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্ধ হইয়া আসিয়াছে আমাদের যে নয়নমণি, আজ তাহা পিতার দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল হউক মুক্ত হউক। আর সংসারের চক্রে ঘুরিয়া মরিতে যে পারি না। ঋষিরা সত্যাবাণী বলিয়াছেন—“যিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন—ন স পুনরাবর্ততে—ন স পুনরাবর্ততে।” তিনি আর ঘূর্ণীক লে ঘুরিয়া মরেন না। তিনি যে আর জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণীপাকে পড়েন না তাহা নহে। তাঁহার কণ্ঠ, বাক্য, সেবা আর প্রাণহীন জড়চক্রে ঘুরিয়া মরে না। এই যে পূর্ব পূর্ব দিনের পশ্চাতে পশ্চাতে পর পর দিন লইয়া ঘুরিয়া মরা, সেই বাক্য, সেই চিন্তা, সেই কষ্ট, এই দৈন্য হইতে একেবারে তাঁহার মুক্তি হয়। এই উৎসবে আজ আমাদের পরমা মুক্তিতে উপনীত কর। “উল্টা ফের লাগাও”—এই মৃত্যুচক্রে হইতে স্বতন্ত্র গতি দান কর—উল্টা পথ ধরাও। তোমার কাছে বিনয় নহে, দাবী আছে। আমাদেরও তুমি অনুময় করিও না—আমাকে মুক্ত করিয়া ছাড়। তোমার সম্মান হইয়া কতকাল আর এই দুর্গতি এই দারুণ অপমান সহ করিয়া চলিতে হইবে ?

তুমি ত কেবল দেবতা নহ, তুমি কেবল রাজা নহ, তুমি যে পিতা মাতা। এস পিতা, এই সভায় এস, আমাদের সকলের মধ্যে বস। তোমার গভীর প্রেমের তিমির-পরশে আমাদের হৃদয়কে দ্বিকশিত করিয়া দাও, আমাদের কাছে বহু করিয়া দাও হে ব্রহ্ম। প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি শক্তি দাও, শান্তি দাও, বীৰ্য্য দাও,

ধৈর্য্য দাও, আশা দাও, বিশ্বাস দাও, প্রেম দাও। হে উৎসব-জননী, আমরা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া দণ্ড হই। সকল হৃদয়ে আজ তুমি অবতীর্ণ হও, সকলের হৃদয় আজ তোমার চরণে প্রণত হউক, এই উৎসব-প্রাপ্তি আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

## আলোচনা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে ‘পুরাতন প্রসঙ্গের’ সমালোচনায় সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ভিন্ন বাঙ্গলাতে ইতিপূর্বে ঐ ধরনের কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান নাই। সমালোচক মহাশয় ও পাঠকদের মধ্যে যাহাদের ঐরূপ ধারণা তাহাদের অবগতির জ্ঞান জানাইতেছি যে স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের “স্বামীশিষ্য-সংবাদ” যাহা উদ্বোধন পত্রিকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছিল, ‘পুরাতন প্রসঙ্গের’ পূর্বে ও কথাবতের পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে শরৎ বাবুর সহিত স্বামীজীর বিভিন্ন দিনে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ভারতের ইতিহাস, লক্ষ্য, সাধনা, কর্তব্য, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল শরৎবাবু তাহা নিজ ডায়েরী হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

## ব্যুৎপত্তি-রহস্য

বা

বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের

ব্যুৎপত্তিনিরূপণ-চেষ্টা।

শব্দের ব্যুৎপত্তি না জানিলে কোন ভাষাজ্ঞান সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। ইংরাজী ও অষ্ট্রােলি ইটালোপীয় ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেক শব্দেরই ব্যুৎপত্তি স্থির করা হইয়াছে এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে যে-কোন অভিধান হইতে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় সে সুবিধা নাই। বাঙ্গলার যে-সমস্ত অভিধান আছে, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন অল্প শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। প্রায়ই ঐরূপ শব্দ অভিধানে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। যাহারা ভাগ্যক্রমে স্থান পায়, তাহাদের পর “দেশজ” বা “যাবনিক” এইমাত্র লিখিত থাকে। কিন্তু তাহাতে মনের কোতুহল নিবৃত্তি হয় না। কোন্ শব্দ কোন্ যাবনিক ভাষার কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা কোন্ দেশজ শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিবার জ্ঞান স্বতঃই মনে একটা উৎসুক্য হয়। কিন্তু সে কোতুহল পরিতৃপ্তির কোন উপায় নাই। কাজেই বাঙ্গালী হইয়াও আমাদের বাঙ্গলা ভাষার জ্ঞান খুব অসম্পূর্ণ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে অনেকের পণ্ডিত হইয়াছে। শুনিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ একখানি অভিধান

প্রস্তুত করিতেছেন। যোগেশ বাবু প্রাতিভাসম্পন্ন ও সুপণ্ডিত। তাঁহার প্রস্তুত অভিব্যক্তি উপাদেয় হইবারই সম্ভাবনা এবং উহা সম্পূর্ণ হইলে উহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার একটা গুরুতর অভাব মোচন হইবে সন্দেহ নাই। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার অভিব্যক্তির বহুটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। কিন্তু যে অভাব অনুভব করিয়া যোগেশ বাবু এই কার্যে প্রতী হইয়াছেন, আমিও সেই অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি এবং সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিতে পারা যায় কি না তাহার চেষ্টাও কিছু দিন হইতে করিতেছি। তাঁহার ফলে কিছুদক্ষিণ ১৫০০ শব্দ সংগৃহীত ও যথার্থভাৱে তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। এগুলি সমস্তই ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত। ইহাদের মধ্যে যেগুলি অধিক প্রচলিত এবং যেগুলিকে প্রায় সকলেই ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া জানেন, সেগুলির আলোচনা এখন করিব না। যেগুলি আপাততঃ খাঁটি বাঙ্গলা বলিয়া মনে হয় এবং যেগুলির ব্যুৎপত্তি সহসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ কতকগুলি শব্দের অদা আলোচনা করিব। এই ব্যুৎপত্তির অতিশয় কঠিন এবং আমার গ্রাম্য সামান্য লোকের ইহাতে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি এই গুরুতর ব্যুৎপত্তির একজন দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন এবং সকলেরই ইহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টার সামান্য ফল সাধারণের গোচর করিতে সাহসী হইলাম। যদি ইহাতে বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি প্রণয়নে কিছুমাএও সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল মনে করিব।\*

\* অথবা সবে—“সময়ে, অসময়ে” এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী “অথবা সবে” হইতে গৃহীত। অথবা অর্থে অবেলা, অসময়। সবে অর্থ ‘সকাল’।

আলগোছে—“দূর হইতে”, “স্পর্শ না করিয়া”, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা;—আলগোছে জল খাওয়া। হিন্দী “অলগুসে” এই শব্দ হইতে উৎপন্ন। “অলগুসে” হইতে “অলগছে”, তাহা হইতে “অলগোছে”, তাহা হইতে “আলগোছে”। “স” “ছ” হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—হিন্দী “ঐসন” বাঙ্গালা “ঐছন”, হইয়া গিয়াছে, “কৈসন” বাঙ্গালা “কৈছন” হইয়া গিয়াছে, বসি, অছি হইয়াছে।

আঙ্গিনা—স্পষ্টই হিন্দী হইতে। প্রাচীন কাব্যে এবং সম্ভবতঃ চলিত কথাতেও “উঠান”এর পরিবর্তে “আঙ্গিনা” ব্যবহৃত হইত। [সং অঙ্গন হইতে নহে কেন?—প্র. স.]

কুঞ্চি—অবিকল ফারসী—“কমুচি” শব্দ।

কাঁচি—ফারসী “কাঁচি” শব্দ।

কৈদো—“মোটা” অর্থে ব্যবহৃত; যথা—“কৈদো” বাঘ। সম্ভবতঃ ফারসী “কুন্দ” মোটা শব্দ হইতে গৃহীত। “কুন্দ” হইতে “কুঁদো,” তাহা হইতে “কৈদো” হওয়ার সম্ভাবনা।

\* লেখক মহাশয়ের তালিকায় প্রদত্ত যে-সমস্ত শব্দ যোগেশ বাবুর শব্দকোষে আছে তাহা বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। যেগুলি একেবারে নূতন বা যেগুলির ব্যুৎপত্তিতে সামান্যও নূতনই নির্দিষ্ট হইয়াছে সেগুলি রক্ষিত হইল। অতঃপর যিনি এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন তিনি যেন যোগেশ বাবুর শব্দকোষ দেখিয়া তবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যোগেশ বাবুর শব্দকোষ ‘প’ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে; এজ্জ ‘প’য়ের পরের শব্দ সমস্তই দেওয়া হইল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

কিরীচ—Malay “Crease” শব্দ হইতে।

কচে বারো—হিন্দী “কচে” বারহ” হইতে গৃহীত। পাশা খেলায় ছয়, পঁচ ও এক লইয়া যে বারো হয়, তাহাকে হিন্দীতে “কচে বারহ” অর্থাৎ কাঁচা বারো বলে। এখানে আমরা একেবারে বিভক্তি সমেত বহুবচনান্ত “কচে” শব্দ লইয়া উহাকে বাঙ্গলায় “কচে” করিয়া লইয়াছি, “কচে”র অল্পবাদ “কাঁচা” করিয়া লই নাই। এইরূপে বিভক্তিসম্মত হিন্দী শব্দ গ্রহণ করার প্রমাণ আরও দেওয়া হইবে।

কামান—হয় ইংরাজী Cannon বা ফরাসী Canon শব্দ হইতে উৎপন্ন, নতুবা ফারসী ‘কমান’ শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফারসী ‘কমান’ অর্থে ধনুক। সুতরাং ইংরাজী বা ফরাসী হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

কুদা—যেমন “নেচে কুদে বেড়াচ্ছে”। হিন্দী “কুদনা” লামান।

কুলী—ফারসী ও তুরকী “কুলী” শব্দ। [ কুলী মানে শ্রেষ্ঠ, তুলনীয় মুগীন্দ কুলী খাঁ, হোসেন কুলী খাঁ। নাট কক্ষকেও সম্মানিত কারবার Dignity of Labour চেষ্টা পাঠ্য পণ্ডে অনেক দেখা যায়; যেমন, মেহতর = শ্রেষ্ঠ।—প্র. স.]

খোর—ফারসী “খোর” শব্দ। [ অর্থ—ভোজনপাত্র—প্র. স.]

খানকা বা খামকা বা খামকা—ফারসী “খানকা” শব্দের অপভ্রংশ।

খাড়ি—“খাস্ত”, “পোটা” অর্থে ব্যবহৃত; যেমন খাড়ি মসুর। হিন্দী “খড়া” শব্দ। এখানেও বিভক্তি-সম্মত হিন্দী শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দীতে “দাল” বাটক শব্দ স্থালিন্দ্র, সুতরাং তাহার বিশেষণেও স্থালিন্দ্রের বিভক্তি দিতে হয়। যেমন খড়ী মসুর, হরী মুগ ইত্যাদি। খড়া মসুর বা হরী মুগে বলিলে ভুল হইবে। বাঙ্গলায় ওরুগ লিন্দ্রের ভেদাভেদ নাট। সুতরাং বাঙ্গলায় খাড়ী মসুর বলিলে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু হিন্দীর প্রভাব বশতঃ স্থালিন্দ্র “খাড়ি”ই রহিয়া গিয়াছে—কোন পরিবর্তন হয় নাই।

খেনা—হিন্দী “খেবা” শব্দের অপভ্রংশ। “খেনা” অর্থে দাঁড় টানা।

খুঁকাপোন—ফারসী “খাফাপোন” হইতে গৃহীত।

গুনোগার—ফারসী (গুনহুগারী) শব্দ হইতে। [ যোগেশ বাবুর শব্দকোষে ‘গুনকার’ আছে; কিন্তু গুনকার বলিতে শুনা যায় না, গুনোগারই বলে।—প্র. স.]

চডক—সম্ভবতঃ ফারসী চরপ চক্রা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

চাঁচনি—ফারসী চাশনি শব্দের অপভ্রংশ। [ অর্থ—স্বাদ পরীক্ষার্থ নমুনা। এই শব্দ হইতে চাটনি শব্দেরও উৎপত্তি।—প্র. স.]

চোট—হিন্দী শব্দ।

চাই—হিন্দী চাহি শব্দ, চাহনা ইচ্ছা করা হইতে। ঐরূপ চাও = চাহো, চায় = চাহে।

চওলা—যথা, কাদা চওলা। হিন্দী চহলা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ছবি—আরবি “সবীহ” শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ছাঁচি—যথা, ছাঁচি পান। হিন্দী স্থালিন্দ্র সচী শব্দের অপভ্রংশ।

ঝুরো, ঝুরী—হিন্দী ঝুরা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ঝকমারি—হিন্দী ঝক নার্না হইতে উৎপন্ন।

ঝুমকো—হিন্দী ঝুমকা শব্দ; ঝুমনা—ঝুলিয়া থাকা।

ঝুঁকি—যেমন উঁকি ঝুঁকি মারা। হিন্দী ঝাঁকনা = উঁকি মারা।

ঝাঁপি, ঝাঁপিল—হিন্দী ঝাঁপনা = ঢাকা।

টহল—যেমন টহল দেওয়া। হিন্দী টহল = বেড়ান।

টেড়ী—সম্ভবতঃ হিন্দী টেড়ী (বঁকা) শব্দ হইতে উৎপন্ন। সাধারণ একপাশে বঁকা করিয়া চুল ভাগ করার নাম টেড়ী। সাধারণ মধ্যস্থলে ঐরূপ ভাগ করাকে সিঁধি বলে। এই সিঁধি শব্দ

হিন্দী সীধী=সোজা শব্দের অপভ্রংশ। [ সংস্কৃত সীমন্ত হইতে  
নহে?—প্র. স. ]

টুপি—হিন্দী টোপী শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী টোপনার অর্থ  
ঢাকা। বাহা ঘারা (মস্তক) ঢাকা যায় মতাই টুপি।

টোপন—সম্ভবতঃ টোপনা হইতে উৎপন্ন।

টেড়া—বধা—টেড়া বাকা। হিন্দী টেড়া শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ডোকরা—যেমন বুড়ো ডোকরা। হিন্দী ডোকরা=বৃদ্ধ।

ডগর—রাস্তা; সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে পুরু ঘাইবার রাস্তাকে  
ডগর বলে। হিন্দী ডগর (রাস্তা) শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উৎপন্ন  
হইয়াছে।

দো-আসলা—কারসী দোনসলা শব্দের অপভ্রংশ। [ আরবী  
নসল=বংশ, কুল।—প্র. স. ]

দাদখানি—সম্ভবতঃ দাউদ খান্ (=খাঁ) নামক কোন ব্যক্তির  
নাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

ধূপ—রৌদ্র অর্থে, যেমন ধূপছায়া। হিন্দী ধূপ শব্দ।

নীম—অর্দ্ধ অর্থে, যেমন নীমরাঙ্গি। কারসী শব্দ। মহামহো-  
পাধ্যায় ৮তমকাল তর্কালঙ্কারের মতে সংস্কৃত নেম=অর্দ্ধ শব্দও  
পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন।

নোলক—হিন্দী লোলক শব্দ; লোলনা=দোলা।

নৈচা—কারসী নৈচা শব্দ। হকার নলচে।

পানি—যেমন পানিকল। হিন্দী পানী শব্দ।

পান্দে—হিন্দী পানী সা (অর্থাৎ জলের মত) শব্দের অপভ্রংশ।

পলিতা—কারসী পলিতা শব্দ।

পিরারী—যেমন রাজার নন্দিনী প্যারী, অথবা পিরারী লাল।  
হিন্দী পিরারী=প্রিয়।

পয়বাল—কারসী পায়বাল=পদদলিত, নষ্ট।

পিরাম—কারসী পৈরাহন্ শব্দ।

পৈঠা—হিন্দী পৈঠাও শব্দ। পৈঠনা=প্রবেশ করা। বাহা  
ঘারা প্রবেশ করা যায় তাহা পৈঠা।

বেড়ে—ভাল অর্থে; হিন্দী বড়িয়া।

বৌচকা—কারসী বুকুটা শব্দের অপভ্রংশ।

বাউল—পাগল অর্থ; হিন্দী বউলানা=পাগল হওয়া। [সং বাতুল  
বা ব্যাঙুল শব্দের অপভ্রংশ নহে কেন?—প্র. স.]

বাহড়ি—যেমন বাহড়ি আইল=কিরিয়া আসিল; হিন্দী বহড়না  
=কিরিয়া আসা।

বালিশ—কারসী বালিশ শব্দ।

ব্যারাম বা বেরারাম—কারসী বে-আরাম শব্দ।

বাসু—যেমন "বাসু, আর চাই না।" অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে।  
কারসী বসু—যথেষ্ট।

ভূনী—যেমন ভূনী খিচুড়ী। হিন্দী ভূনী=ভাজা; ভূনা=ভাজা।

ভাগ, ভাগিয়ে দেওয়া—যেমন মেরে ভূত ভাগিয়ে দেব। হিন্দী  
ভাগনা=পালান।

ভঁরসা—যেমন ভঁরসা বি; হিন্দী ভৈঁসা; ভৈঁস=মহিব।

ভেঙ্ক—যেমন "ভেঙ্ক না হইলে ভিকা মেলে না"। হিন্দী ভেঙ্ক  
শব্দ। বেশ হইতে ভেব, বাহা হিন্দী উচ্চারণ অনুসারে ভেঙ্ক  
হইয়াছে।

ভেজিয়ে দেওয়া—যেমন "দোহটা ভেজিয়ে দাও"; হিন্দী ভেজ  
দেনা=পাঠিয়ে দেওয়া।

ভাটকা—যেমন ভুল ভাটকা; হিন্দী ভটকনা=ঘুরে ঘুরে  
বেড়ান; পথ ভুলে বাওয়া।

বানা—আরবী বনহ শব্দ।

বজা—কারসী মুজ্ হ শব্দ।

বাক—কারসী বাক শব্দ।

মেম—ইংরাজী Madamএর সংক্ষেপ ma'am হইতে।

মাইরী—সম্ভবতঃ Mary হইতে।

রাখাল—সম্ভবতঃ হিন্দী রখবাল শব্দ হইতে উৎপন্ন।

লাল—"বালক" অর্থ। যেমন লালগোপাল=বালগোপাল।

লালবাধব=শিশুবাধব, বালবাধব। পেয়ারীলাল=প্রিয়বালক।

হিন্দী লাল=বালক, ছেলে। কিন্তু পার্সালাল, চুনীলাল ইত্যাদির

লাল শব্দ বালক অর্থবাচক নহে, কিন্তু উহা কারসী লাল, বাহার  
অর্থ পদ্মরাগ বনি।

লেন দেন—হিন্দী লেনা দেনা হইতে উৎপন্ন।

লেবু—আরবী লীহু শব্দের অপভ্রংশ।

লুচি—হিন্দী লুচী শব্দ। সম্ভবতঃ লচনা—নত হওয়া হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছে। কলিলা "নচ নচ" শব্দও এই লচনা হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছে।

লেজড়া—হিন্দী লেজড়া (=গোড়া) শব্দ। যেমন লেজড়া আম।  
শুনা যায় যে, কান্দী লেজলে কোন একটা ভাল আম পাছ বায়ুবেগে  
হেলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে উহাকে লেজড়া=খোঁড়া বলা হইত।  
সেই আত্ম হইতে বত জালের উৎপত্তি হইয়াছে, সকলেই 'লেজড়া'  
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বালাই—কারসী বলা'এ শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ আপদসমূহ।

সিরি—কারসী শিরীশী শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সুরকি—কারসী সুর্খী শব্দ; অর্থ লাল। ইঁটের গুঁড়া আল  
বলিয়া ইহাকে সুর্খী বা সুরকি বলা হইয়াছে।

সাঁজা—হিন্দী সাজা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সাবান—ফরাসী Savon শব্দ।

সধ, সৌধীন—কারসী শৌক শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সাউকোড়—হিন্দী সাহকার (মহাজন) শব্দের অপভ্রংশ।

সাদ বা সাধ—কারসী শাদ=আহ্লাদ, আনন্দ শব্দ।

হালি—যেমন 'হালি মুগ'। হিন্দী 'হরী' শব্দের অপভ্রংশ।  
হিন্দীতে মুগ শব্দ ত্রীলিঙ্গ, কাবেই উহার বিশেষণ হরী হইয়াছে। কিন্তু  
বাজমাতে 'মুগ' শব্দ ত্রীলিঙ্গ নহে অথচ আনন্দ হালি মুগ বলিয়া  
থাকি। ইহার কারণ আনন্দ হিন্দী 'হরী' শব্দ গ্রহণ করিয়া উহাকে  
'হালি' করিয়া লইয়াছি।

শ্রীকালীপদ মৈত্র।

## প্রতিহিংসার মুল্লুক

পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যো-  
পাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আগুনের ফুলকী" নামক উপন্যাস  
পাঠে কর্ণিকানদিগের অদ্ভুত প্রতিহিংসা সম্বন্ধে কিছু  
জানিতে পারিয়াছেন; এক্ষণে আমি এক সুপ্রসিদ্ধ  
ইংরেজী পত্রিকা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম।

ইতালীর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে, ফ্রান্সের একশ'  
মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপশ্রেষ্ঠ কর্ণিকা ইউরোপীয়



দেবশিশু ।

সার যশুয়া রেনল্ড্‌স্‌ কর্তৃক অঙ্কিত

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY  
D. HAY & SONS, CALCUTTA.



সভ্যতার কয়েকটা কেন্দ্রের নিকটে থাকিয়াও মহা-  
তাপসের জ্ঞান বহির্ভূত হইতে সর্বপ্রকার সংশ্রবশূন্য।  
অজ্ঞানতা হইতে উন্নতি লাভে নিশ্চেষ্ট কর্তিকানগণ এরূপ  
আদিম অসভ্যতার নিয়ম যে তদর্শমে সভ্য জাতিগণ  
বিশ্বয় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সভ্য  
জাতিগণের উন্নতি ও সভ্যতা, কোন-কিছুরই উপর  
কর্তিকানগণ লক্ষ্য রাখে না এবং খেতাজ জাতির পক্ষে  
যতদূর অজ্ঞান হওয়া সম্ভবে, কর্তিকানগণ ততদূর অজ্ঞান।

কিন্তু কর্তিকার ইহা অপেক্ষাও একটা অত্যন্ত কলঙ্কের  
কথা আছে। ইহার প্রত্যেক পর্বত উপত্যকা প্রতি-  
হিংসা নিবৃত্তির জন্ত পাতিত নররক্তে রঞ্জিত। যাহারা  
কর্তিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি এবং অধিবাসীদিগের মহত্ব  
এবং গর্বহীনতার জন্ত কর্তিকার পক্ষপাতী, তাহারাও  
কর্তিকানদিগের অদ্ভুত প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা  
ভাবিতেও লজ্জিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কর্তিকার  
অধিবাসীগণের প্রতিহিংসার জন্ত নরহত্যা এখন অতীত  
কাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও  
একজন কর্তিকান ঐতিহাসিক বলেন যে ১৫৩৯ হইতে  
১৭২৯ অব্দ ১২০ বর্ষ মধ্যে, তিন লক্ষ এবং ১৮২১ হইতে  
১৮৫২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে—৩১ বর্ষে ৪৩০০ জন মানুষ প্রতিহিংসা-  
বশে নিহত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জিকোভা নামক গ্রামে  
দুই দলে এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে উভয় পক্ষে চারিজন  
লোক যোগদান করে, কিন্তু প্রতিপক্ষের অব্যর্থ-লক্ষ্য  
গুলির নিকটে কেহই অব্যাহতি পায় নাই এবং সকলেই  
প্রাণত্যাগ করে। এই চারি ব্যক্তির প্রকাশ্য স্থানে  
সংগ্রামের জায় বিশ্বয়কর কোন কিছু এ পর্য্যন্ত শুনা যায়  
নাই। কিন্তু কর্তিকার প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে।  
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফরাসী গভর্নমেন্ট  
তাহার সেই-সব প্রকার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে,  
যাহাদের নিকট গোমেষাদি পশুর এবং মানবের জীবন  
সমান? ফরাসী গভর্নমেন্ট এরূপ প্রথার মূলোচ্ছেদ  
করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং আইন  
করিয়াছেন, যে-ব্যক্তি লুকাইয়া পিশুল বা ছোরা সন্দে  
লইয়া বেড়াইবে ধরা পড়িলে তাহার জেল হইবে। কিন্তু  
কর্তিকানরা এ আইনের প্রতি লক্ষ্যও রাখে না এবং

পুলিশও চক্ষু মুদিয়া থাকে। যাহারা কর্তিক রীতিনীতি  
অবগত আছেন তাহারা জানেন যে আইন দ্বারা এ প্রথা  
উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত পার্শ্বত্যা প্রদেশ-  
সমূহ নরহত্যা পলাতকদিগের আশ্রয়রূপ থাকিবে, যে  
পর্য্যন্ত গ্রামবাসীগণ উক্তরূপ মনুষ্যদিগকে দেবতার জ্ঞান  
শ্রদ্ধা করিবে এবং পুলিশের কবল হইতে তাহাদিগকে  
রক্ষার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সে পর্য্যন্ত গভর্নমেন্টের  
কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইবে না। অতর্কিতভাবে  
আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় এবং অতর্কিতভাবে আক্রমণের  
জন্ত অনেকে দুই তিন প্রকার অস্ত্র না লইয়া ঘরের বাহির  
হয় না। বন্দুক, পিশুল ও এক জোড়া ছোরা সন্দে  
আছে এরূপ লোকও রাস্তায় দেখা যায়। এবং বার  
বৎসর ও তাহার উচ্চ বয়স্ক প্রায় সকল বালকই বন্দুক বা  
ছোরার ব্যবহারে সুদক্ষ।

বাহিরের কোন লোকের পক্ষে কোন কর্তিকানের  
নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন কথা বাহির করা অত্যন্ত  
দুরূহ কার্য্য। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন কর্তিকানকে  
প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরে বিশ্বাস করেন, তিনি প্রায়ই  
ভ্রমে পতিত হন। তিনি ইহাও মনে করিতে পারেন  
যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্তিকান প্রতিহিংসা  
কাহিনী মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা এবং বোধ-  
শক্তি দ্বারা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিবেন তাহার ধারণা  
অন্তরূপ হইবে।

বন্দুক, পিশুল এবং “Vendica l'honore,”  
“Vendetta corse”, “Morte al nemico” প্রভৃতি  
মটো-অস্ত্রিত ছোরা খুনীদিগের অত্যন্ত প্রিয়। বর্তমান  
কালে সংখ্যায় কম হইলেও পার্শ্বত্যা অঞ্চলে পলাতক  
হত্যাকারী এখনও আছে। জনৈক কর্তিকা প্রবাসী বলেন  
যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় শত শত, অপর পক্ষে একজন  
ফরাসী সৈনিকপুরুষ—অবশ্য কর্তিকা তাহার কর্মস্থল—  
বলেন যে, এরূপ ব্যক্তি বর্তমানে মাত্র তিন চার জন  
হইবে।

ইহার মধ্যে কাহার কথা ঠিক তাহা বলা যায় না।  
তবে এরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব এখনও আছে সে বিষয়ে  
কোন সন্দেহ নাই। কারণ, প্রতিহিংসার বশে খুন করিয়া

পলাতক ব্যক্তির সন্ধানে অশ্বারোহী পুলিশদিগকে প্রায়ই নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীগণের গৃহ খানাতল্লাস করিতে দেখা যায়।

এরূপ ব্যক্তি যে আছে তাহার আরও এক প্রমাণ যে, পিটকেরন নোয়েলস্ নামক জনৈক কর্সিকালমণকারী বলেন “এরূপ ব্যক্তি যে বিংশ শতাব্দীতে আছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি কর্সিকা হইতে দুইটা ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। গভর্ণমেন্ট জনৈক খুনীর গতিবিধির সংবাদ তাহার এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর নিকট পাইয়া এবং কোন্ সময়ে ও কোথায় তাহার সহিত খুনী দেখা করিবে জানিতে পারিয়া নির্দিষ্ট স্থানে চারজন সৈন্য পাঠাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে খুনীকে জীবিত অথবা মৃত যে প্রকারে হউক আনিবার আদেশ দেওয়া হয়।

“আমার ফটোগ্রাফার আবার একজন সৈনিকের নিকট হইতে এই বিষয় জানিতে পারিয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তথায় গিয়া কোপের মধ্যে ক্যামেরা সমেত এরূপ স্থানে লুকাইয়া থাকেন, যেখান হইতে তিনি আশ পাশে চারিদিকেই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। নির্দিষ্ট সময়ে হত্যাকারী তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। পরে আক্রমণকারীদের সুবিধাজনক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, পূর্ব নির্দেশ অনুসারে তাহারা গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক অসমান যুদ্ধও আরম্ভ হইল, কারণ তাহারা জানিত যে প্রাণ থাকিতে খুনী ধরা দিবে না। কয়েক মুহূর্ত পরেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং বন্ধু আহত দস্যু ভূপতিত হইল। ফটোগ্রাফারও ক্ষিপ্তহস্ততার গুণে যুদ্ধের দুইটা ফটো লইতে সমর্থ হইয়াছিল।”

যাহা হউক বর্তমানে উক্ত শ্রেণীর লোক অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দেশ আরও উন্নতি লাভ না করিলে তাহারা একেবারে লোপ পাইবে না। কর্সিকার রীতিনীতি হইতেই জানা যায় যে কর্সিকানরা বাল্যকাল হইতেই অসমসাহসিকতার মস্তে দীক্ষিত হয়। সার্টন নামক জেলায় নবজাত শিশুকে স্বাশীর্বাদে প্রথা এইরূপ— “আহা! ঈশ্বর করুন তুমি যেন বন্দুকের গুলিতে মর”। যে সকল ব্যক্তি গৃহে মরে বা অপর কোন দেশে গিয়া বাস

করে তাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে এবং তাহাদের পরলোকগত পিতামাতারাও সহজে নিষ্কৃতি পান না। অপর পক্ষে বাহারা এইরূপে খুন হয় বা শত্রুকে খুন করে তাহারা “জাতীয় বীর” নামে অভিহিত হয়।

যে স্থলে নিহত ব্যক্তির শরীর পাওয়া যায় তথায় বা তাহার যতদূর সম্ভব নিকটে ক্রুশ কাঠ স্থাপন করাও এক প্রথা। হত ব্যক্তির সহিত মৌখিক আলাপ পরিচয় ছিল এরূপ ব্যক্তিগণ সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় মস্তক হইতে টুপী উত্তোলন করে এবং আত্মীয়গণ ও বাহারা বিশেষ বন্ধু ছিলেন তাহারা রাস্তা হইতে এক খণ্ড কাঠ ও মাটির ঢেলা তুলিয়া ক্রুশের তলদেশে রাখিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রার্থনাও গাওয়া হয় এবং প্রার্থনার শেষে খুনীর উপর প্রতিশোধ লওয়ার একটা প্রতিজ্ঞাও জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তর বা কাঠ-খণ্ড সঞ্চিত হইতে হইতে স্তূপের আকার ধারণ করে। হত্যার সাপ্তাহিক শোক প্রকাশের দিন অগ্নি-সংযোগে কাঠখণ্ড সূহ ভস্মীভূত করা হয়।

হত্যাকারী পার্শ্বতা অঞ্চলে পলায়ন করে এবং তাহার অনুচর ও বন্ধুবর্গের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই হত্যাকারীদিগকে পলায়নপটুতার বলে দশ বিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পলাতকগণ বন্ধুবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাতের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করে। তাহারা প্রায়ই যুড়িসুড়ি দিয়া মুখস পরিয়া কোন ধর্মসম্বন্ধীয় মিছিলে যোগদান করে এবং পুলিশের চক্ষুর সম্মুখেই নিরাপদে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও আবার খুনীও হত হয়। এরূপও দেখা গিয়াছে যে স্বামী-অথবা পুত্রহারা স্ত্রীলোক প্রতিহিংসা লইবার জন্য পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া বন্দুক হস্তে দিবানিশি হত্যাকারীর সন্ধানে ফিরিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসানল নির্বাপিত করিয়াছে।

পলাতক খুনী আজীবন গভর্ণমেন্ট ও শত্রুপক্ষ কর্তৃক অনুসৃত হয় এবং যতদিন না সে বন্দুকের গুলিতে ভূতলশায়ী হয় ততদিন বিরুদ্ধ পক্ষের যথাসাধ্য ক্ষতি করিতে থাকে।

পলাতক খুনীদের মধ্যে অনেকে গভর্ণমেন্ট ও শত্রু-পক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া এত খ্যাতিলাভ করিয়াছে যে তাহাদের নাম 'প্রায় প্রতি-গৃহেই উচ্চারিত এবং উপমাশ্বরূপে ব্যবহৃত' হয়। এইরূপে খ্যাত লোকের মধ্যে "বেলাকোসকিয়স" ভ্রাতৃত্ব সম-ধিক প্রসিদ্ধ। অ্যাণ্টয়েন ও জ্যাকুয়েস বেলাকোসকিয়স চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল—১৮৪৮ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—গভর্ণমেন্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া লুকাইয়া ছিল। তাহারা একটা কলহের বশে একজন সরকারী পুলিশের কর্মচারীকে খুন করিয়া পার্কত্যা প্রদেশে পলায়ন করে। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য মিলিটারী পুলিশের সমস্ত চেষ্টা নিফল হয় এবং এতদুপলক্ষে যে-সকল দাঁড়া হয় তাহাতে পুলিশপক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। গ্রামবাসীগণ বিষ্ময়হেতু এবং কতকটা তাহাদের ভয়ে খুনীদের সহিত যোগ দান করে। এইজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে একটা বেশ বড় রকমের সামরিক অভিযানও কোন কার্যের হয় নাই।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ঐ দুই ভাই শত্রুপক্ষীয়দিগকে হত্যা এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কর আদায়—সংক্ষেপে বলিতে সমগ্র অঞ্চলে প্রচুর ক্ষমতাভোগ—করিতে থাকে; অবশেষে ২০ বৎসর পূর্বে শেষ বেলাকোসকিয়স অ্যাণ্টয়েনকে ক্ষমা করা হয় এবং সে গ্রামবাসীদের সহিত শান্তিতে বাস করিতে থাকে। এখনও অ্যাজাকসিওর দোকানে, বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে এবং পোস্টকার্ডেও বেলাকোসকিয়সের ছবি দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস কর্তব্যবীরদিগের মধ্যে নেপোলিয়নের পরেই বেলাকোসকিয়সের স্থান

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাওলী নামক একজন খুনী অ্যাজাকসিয়োর ধৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ধরাইয়া দেয় এবং সে দশ বৎসরের জন্য নিউক্যালিডোনিয়া দ্বীপে নির্বাসিত হয়। তাহার কিছুদিন পরেই যে-ব্যক্তি তাহাকে ধরাইয়া দেয় সে খুন হয় এবং আয়োপিত হত্যাপরাধে পাওলীর দুই ভাইয়ের জেল হয়। কয়েক দিন পরে কর্তব্যবীর শাসনকর্তা পাওলীর হস্তে পরিত হন এবং সে তাহাকে বলে যে তাহার

ভাইদের মুক্তি না দিলে সে তাহাকে হত্যা করিবে। পাওলী আরও বলে যে সে ক্যালিডোনিয়া হইতে পলায়ন করিয়া তাহার শত্রুকে খুন করিয়াছে, তাহাদের জেল হইয়াছে তাহারা নির্দোষ। তাহাকে পুনরায় ধরিবার জন্য চেষ্টা হইতে থাকে। অবশেষে একজন জীলোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দেয়।

"ভসেরো" নামক কর্তব্যবীর অস্ত্যুষ্টি-গীত এখনও কোন কোন অঞ্চলে গুনা যায়। কোনও নিহত ব্যক্তির সমাধিকালের "ভসেরো" অত্যন্ত শোকোদ্দীপক দৃশ্য। হতব্যক্তির পরিবারভুক্তা জীলোকগণ কাফনের নিকটে মুক্তকেশে দাঁড়াইয়া বন্ধে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হতব্যক্তির গুণগান এবং হত্যাকারীকে অভিসম্পাত প্রদান করিতে থাকে। এমন জীলোকও দেখা যায় তাহারা শোকের আবেগে মুখের চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শোকচিহ্নরূপে ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে।

এইরূপ নানা কারণে ভ্রমণকারীগণ, মধ্যযুগের সভ্যতার ঞ্চায় অর্ধ সভ্যতার সীমারূঢ় দেশ—কর্সিকা ভ্রমণ করিতে চান না। কিন্তু তাহারা আগে হইতেই একরূপ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করা নিরর্থক বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন তাহারা প্রায়ই ভ্রমে পরিত হন। কর্সিকায় আগত বিদেশী লোক স্বদেশের অনেক স্থল অপেক্ষা কর্সিকায় নিরাপদ। কর্সিকানদিগের কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট না রাখিলে বিদেশীর পক্ষে তাহাদিগকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ইহাও সম্ভব যে ভ্রমণকারী কোন পর্ততা দি দেখিতে গেলে তথায় লুকায়িত কোন খুনীর সহিত তাহার দেখা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ পলাতক খুনী অনর্থক খুন অথবা লুট করে না এবং অপরিচিতের অপকারের চিন্তা তাহাদের মনে কখনও উদ্ভিত হয় না। পলাতক খুনী অদ্ভুত উত্তেজনাপূর্ণ মনুষ্য নহে। এবং তাহার বংশের প্রতি কৃত কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহার-জানা একমাত্র উপায়ে সে লইয়াছে, এইমাত্র তাহার দোষ। নতুবা সে চোর ডাকাত বা অসাধু ব্যক্তি নহে; তাহাদের হৃদয় বীরত্বের উদার্যো পূর্ণ থাকিতেই দেখা যায়।



বহু পূর্বকাল হইতে যখন “জোর যার মূলুক তার” এই নীতি সার ছিল এবং যখন “যে আমার অপকার করিয়াছে আমিও তাহার অপকার করিব” ইহাই অচায়া-চরণের একমাত্র প্রতিকার ছিল, যখন কসিক জেনোয়ার অধীনে ছিল, তখন হইতে জেনোয়া গভর্ণমেন্টের অসীম অত্যাচারের ফলে কসিকানরা এইরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কসিকানরা মিথ্যা কথা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং চৌর্য্যকে ঘৃণা করে। কিন্তু শত্রু এবং তাহার নিরপরাধ আত্মীয় স্বজনকে বধ করাকে তাহারা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

শ্রীঅনুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## অরণ্যবাস

[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বনভূমির গ্রাম ক্রয় করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজ্ঞার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বান্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুমোদন করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের স্বপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হন। সতীশের অনুমোদনে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্ত পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ]

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিবসে একটা শুভদিন দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ সুরেন্দ্রকে লইয়া পুরুলিয়ায় যাইতে প্রস্তুত হই-

লেন। সুরেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া, মনোরমার মুখখানি সমস্ত দিন ভার-ভার ও বিমর্ষ রহিল। মধ্যে মধ্যে তিনি গোপনে অশ্রুমোচন করিয়া অঞ্চলে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রের জন্মাবধি তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্তও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই। আজ তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। মনোরমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একবার হাত-পা ছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারিলে, তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার লঘু হয়। কিন্তু কাঁদিলে অমঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়েই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

মনোরমা স্বহস্তে সুরেনের তোরঙ্গ সাজাইয়া ও বিছানা গোছাইয়া দিলেন, এবং স্নানাহার সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। বনভূমিতে আসিয়া অবধি, সুরেনের লেখাপড়ার সুবিধা ছিল না, এই জন্ত তাহার মনে স্ফূর্তির একান্ত অভাব ছিল। এক্ষণে সে স্কুলে পড়িতে যাইতেছে, এই চিন্তায় তাহার মনে বিলক্ষণ আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু যাত্রা করিবার সময়, তাহার কোমল হৃদয়টি প্রিয়জনগণের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কনিষ্ঠা ভগিনী বিভাকে কোলে করিয়া কতবার তাহার মুখচুষন করিল; নরুকে সঙ্গে করিয়া একবার পুষ্পোৎসানে বেড়াইতে গেল ও তাহাকে দুই চারিটি পুষ্প তুলিয়া দিল। সে নরুকে বলিল “নরু, তুমি আমার জন্ত কেঁদ না। আমি তোমার জন্ত কলের গাড়ী, ছোট বন্দুক, আর কতকি নিয়ে আসব। বুঝলে?”

নরু বলিল “দাদা, তুমি কোথায় যাবে?”

সুরেন বলিল “আমি স্কুলে পড়বার জন্ত পুরুলিয়া যাব।”

নরু বলিল “তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

সুরেন বলিল “নরু, তুমি যখন আমার মতন বড় হ’বে, তখন যাবে। এখন বাড়ীতে মার কাছে থাক।”

নরু কাঁদিয়া উঠিল ও বলিল “না, আমি মার কাছে থাকব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।” নরু পুষ্পোৎসান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর আসিয়া

জননী অঞ্চল ধরিয়া বলিল “মা, আমি তোমার কাছে থাকুব না; আমি দাদার সঙ্গে যাব।” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইতে গেলেন। কিন্তু নরু ক্রোড়ে না উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা জননীকে আঘাত করিতে করিতে বলিল “না, আমি তোমার কাছে থাকুব না, আমি দাদার সঙ্গে যাব।” জননী ও নরুকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র বিভাও কাঁদিয়া উঠিল; এবং জননীর ক্রোড়ে উঠিবার জন্ত তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুটি বাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে সৌদামিনী সেখানে আসিয়া এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। সৌদামিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল “নরু, তোমার মার কাছে তোমায় থাকতে হবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে। তোমার দাদা শীগ্গীর তোমার জন্ত কলের ঘোড়া, কলের গাড়ী, কলের হাতী, কতকি নিয়ে আসবে। বুঝলে?”

নরু অল্প শান্ত হইয়া বলিল “দাদা আর কি আনবে?”

“তুমি যা বলবে, তাই নিয়ে আসবে।”

নরু বলিল “কাকাবাবুর মত একটা গাড়ী?”

সৌদামিনী দ্বিধা হাসিয়া বলিল “আচ্ছা, তাই আনবে।” এই বলিয়া তাহাকে পুষ্পাচ্ছানে লইয়া গেল।

যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখাইয়া ক্ষেত্রনাথ সকলকে ভরা দিতে লাগিলেন। মনোরমা চক্ষুর জল মুছিয়া সুরেনকে কিছু খাওয়াইলেন। ইত্যবসরে গাড়ীতে জিনিষপত্র উত্তোলিত হইল। সুরেন্দ্র পিতাকে, জননীকে, মাসীমাকে, ও নগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া এবং নরুর জন্ত একটা সাইকেল গাড়ী আনিবার অঙ্গীকার করিয়া পিতার সহিত যানে আরোহণ করিল।

সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ সুরেনের সহিত পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন।

সুরেন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহাদের স্কুল হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া আসিয়াছিল। তাহা দেখাইয়া সে শুভমুহূর্ত্তে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইল।

সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়ায় রাখিয়া, ক্ষেত্রনাথ আসানশোলে গেলেন এবং সেখানে কয়লার হিসাব মিটাইয়া পুরুলিয়ায় আসিবার জন্ত গাড়ীর প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মে পদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা একটা যুবক আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। তাহার বেশ-ভূষায় দৈন্ত সূচিত হইতেছিল। গায়ে একটা ছিন্ন কোট, রূপারখানিও ছিন্ন ও মলিন; পরিধেয় বস্ত্রও মলিন; পায়ের জুতা জোড়াটি জীর্ণ ও হস্তে একটা ছোট পুঁটুলি। মাথার কেশ অনেক দিন কর্তিত হয় নাই। মুখে সামান্য গোঁপের রেখা; বদনমণ্ডল বিগুঞ্চ; কিন্তু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

যুবক ক্ষেত্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি চাও?”

যুবক উত্তরে কি বলিবে, তাহা যেন প্রথমে স্থির করিতে পারিল না; পরে বলিল “মশাই, আমি বিপদে পড়েছি।”

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “কি রকম বিপদ?”

যুবক বলিল “মশাই, আমি এন্ট্র্যান্স পরীক্ষা পাশ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমি আর অধিক পড়তে পারি নাই। পিতার মৃত্যুর পর আমার বিদ্যালয়শিক্ষার জন্ত অর্থ সাহায্য করতে পারেন এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে, একটা চাকরীর চেষ্টায় আমি নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মা আছেন; আর একটা ছোট ভাই আছে। আমি কোনও স্কুলে মাষ্টারী, কোনও অফিসে কেরানীগিরি, কিম্বা যে-কোনও কাজ হোক, কিছু একটা করবার জন্ত নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি ও কত দরখাস্ত করেছি। কিন্তু কোথাও চাকরী পাই নাই। আসানশোলের কাছে অনেক কয়লাকুঠা আছে ওনে এখানে চাকরীর চেষ্টায় এসেছিলাম; কিন্তু এখানেও কোনও চাকরী পেলাম না। সঙ্গে যা পাথের ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। আপনাকে বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু না বললেও থাকতে পারছি না—আজ সমস্ত দিন আমি কিছু খাই নাই। আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারছি না। কোথায় যাব, কেমন করে যাব, আর কি যে করব, তা ঠিক করতে পারছি না। আপনাকে

দেখে সাহস ক'রে আপনার কাছে এলাম। আপনি দয়া ক'রে কোথাও আমার একটা উপায় ক'রে দিতে পারেন? আমি বেশী বেতন চাই না। খেয়ে প'রে যদি আপাততঃ পাঁচটি টাকাও পাই, তা হ'লেই যথেষ্ট হবে। আমার মা এক জাতির বাড়ীতে কাজকর্ম ক'রে কোনওরূপে জীবন ধারণ করছেন। আমি যদি মাসে মাসে তাঁকে পাঁচটি টাকা পাঠাতে পারি, তা হ'লে তাঁর ও আমার ছোট ভাইটির কোনওরূপে প্রাণরক্ষা হয়।” এই কথা বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল এবং সে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেত্রনাথ যুবকের কাহিনী শুনিয়া কিছু বিচলিত হইলেন। তিনিও একদিন দারিদ্র্যের তাড়নায় উন্নতের গায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। সহসা সেই স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরিত হইল। যুবকটি যে বাস্তবিক বিপন্ন হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবক বলিল “আমার নাম শ্রীঅমরনাথ দাস। আমরা জাতিতে তন্তুবায়। আমার নিবাস নদে জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে।”

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার পিতার কি কোনও কাজকর্ম ছিল না?”

যুবক বলিল “না; তিনি কৃষ্ণনগরে একটা কাপড়ের কানে চাকরী করতেন।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা, অমরনাথ, তুমি চাকরীর চেষ্টায় নদে জেলা থেকে এতদূর এসে পড়েছ কোথাও একটা চাকরীর যোগাড় করতে পারলে না?”

যুবক বলিল “মশাই, কলকাতার অনেক আফিসে চাকরীর চেষ্টা করেছি। অনেক আপিসেরই বড় বাবু হয় ব্রাহ্মণ, নয় কায়স্থ, নয় বৈষ্ণব, আমার জাতির পরিচয় শুনে, অনেকে চুপ ক'রে থাকেন; অনেকে তখনই বলে দেন, এখানে কোনও চাকরী নাই; আবার কেউ কেউ আমার জাতির উল্লেখ ক'রে বলেন, যাও, যাও, চাকরী করতে হবে না; তাঁতে কাপড় বোন।”

ক্ষেত্রনাথ অমরের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, “দেখ, অমরনাথ, তাঁরা ঘৃণা ও বিজ্ঞপ

ক'রে তোমাকে ঔরকম কথা বললেও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ, তা ভালই করেছ। সকলেরই কিছু লেখাপড়া শেখা কর্তব্য। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে চাকরী “করতে হ'বে, তাঁর কোনও মানে নাই। আপনার জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করলে কারও কথা সইতে হয় না। আর অনায়াসে সংসার প্রতিপালনও করতে পারা যায়।

অমরনাথ বলিল “মশাই, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু জাতীয়বৃত্তি অবলম্বন করতে গেলেও বাল্যকাল থেকে সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য। আমার সেরূপ শিক্ষা হয় নাই। অতি যৎসামান্য যা লেখাপড়া শিখেছি, তাতে চাকরী করা ভিন্ন আর উপায় নাই। যদি স্থলে না প'ড়ে, তাঁত বুনতেই শিখতাম, তা হ'লে আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্ত হাহাকার ক'রে আমায় দেশ-বিদেশে বেড়াতে হ'ত না। চাকরী না করলে, আর ডেপুটী, মুনসেব, উকীল না হ'লে, আজকাল কোনও লোকই সম্মান ব'লে পরিচিত হন না। পিতামাতা সেই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে, ছেলেকে সম্মান করবার জন্ত স্থলে পড়ান। ছেলেরও জীবনের লক্ষ্য কোন একটা ভাল চাকরী করা। এইজন্ত সকলেই জাতীয় বৃত্তিকে ঘৃণা করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা ও পৌরোহিত্য করতে লজ্জা বোধ করেন। বৈদ্য চিকিৎসা-বিদ্যায় মন দেন না; কৃষক লাঙ্গল ধরে না; তাঁতী কাপড় বোনে না; আর কামার, কুমার, ছুতার—সকলেই অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে চাকরীর জন্তই লালায়িত হয়। আমি যে এসব কথা না ভেবেছি, তা নয়; কিন্তু দেশের হাওয়া বদলে না গেলে, —প্রত্যেক জাতীয় বৃত্তিকে গৌরবের চক্ষে না দেখলে,—আমার মতন হতভাগ্যের সংখ্যা দেশে দিন দিন বাড়বে বই কন্বে না।”

অমরনাথ অল্পবয়স্ক হইলেও, তাহার মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইলেন। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন যে তাহাকে চিন্তাশীল করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কোন্ ডিভিডানে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলে?”

অমর, বলিল “সেকেণ্ড ডিভিডানে, এই আমার সার্টিফিকেট দেখুন।” এই বলিয়া পুঁটুলি হইতে তাহার সার্টিফিকেট বাহির করিয়া ক্ষেত্রবাবুকে দেখাইল।

ক্ষেত্রনাথ সার্টিফিকেট দেখিয়া বলিলেন “দেখ, অমর, আমি তোমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারব না। তবে, তুমি ধাওয়া পরা ব্যতীত এখন যদি পাঁচটি টাকা পেলেই সম্বল হও, তা হলে তোমাকে একটি কাজ দিতে পারি। তুমি আমার একটি ছেলেকে পড়াবে, আর যখন যা কাজ হয়, তাই করবে। এতে কি তুমি সম্মত আছ?”

অমরনাথ অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া বলিল “মশাই, এতেই আমি সম্মত আছি। আপনি দয়া ক’রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।”

ধাবারওয়ালার নিকট খাবার কিনিয়া ধাইবার জন্ত ক্ষেত্রনাথ তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া তাহার জন্ত একখানা টিকিট কিনিলেন এবং প্লাটফর্মে গাড়ী লাগিবারাত্র উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

### একত্রিশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুর গ্রামে কোনও পাঠশালা, স্কুল বা পোষ্ট অফিস ছিল না। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একটি পাঠশালা ও একটি ডাকঘরের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এই দুইটী স্থাপন করিবার কোনও সুযোগ করিতে পারেন নাই। আসানশোল ষ্টেশনে অমরনাথের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে পাঠশালা ও পোষ্টঅফিস স্থাপনের আশা তাঁহার মনে জাগরিত হইল। নরু এতদিন সুরেন্দ্রের কাছেই ছিল; কিন্তু সুরেন্দ্র পুরুলিয়ায় আসাতে নরু একেবারে সঙ্গীহীন হইয়াছে। তাহাকে সর্বদা কাছে রাখিতে ও অল্প অল্প লেখাপড়া শিখাইতে একটি লোকের প্রয়োজন। এই-সমস্ত কথা ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইলেন।

পুরুলিয়ায় সতীশচন্দ্রের বাসায় আসিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে অমরের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজ মনোগত ভাব ও আশা ব্যক্ত করিলেন। সতীশচন্দ্র

ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন “চমৎকার হয়েছে। তুমি আপাততঃ একটি পাঠশালা স্থাপন কর। যাতে পাঠশালাতে মাসে মাসে কিছু সরকারী সাহায্য হয়, তার জন্ত আমি স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টার এবং ডেপুটী কমিশনার সাহেবকেও বলব। পাঠশালাটি স্থায়ী হ’লেই, তার সংলগ্ন একটি ডাকঘরও স্থাপিত হবে। তারও ভার আমার উপর রইল। আমি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে বলে তার ব্যবস্থা করতে পারব বলে আশা করি।”

পরদিন পুরুলিয়ার মনোহারী দোকান হইতে নরু ও বিভার জন্ত দুই চারিটি ক্রীড়নক ও পুস্তক ক্রয় করিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইয়া বল্লভপুর যাত্রা করিলেন। বল্লভপুরে উপনীত হইয়া তিনি মনোরমাকে অমরনাথের পরিচয় দিলেন। অমর ও নরেন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক। সুরাং উভয়ের মধ্যে শীঘ্র সম্ভাব স্থাপিত হইল। মনোরমারও তাহার প্রতি পূর্নবৎ স্নেহ হইল। নরুও তাহার সহিত অনতিবিলম্বে আলাপ করিয়া লইল।

কাছারীবাড়ীর সম্মুখে সাহেবদের আস্তাবল, গুদাম, বাবুর্চিখানা, খানসামাদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি কয়েকটি ঘর ছিল। কিন্তু সেগুলি সংস্কারভাবে অব্যবহায়া হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, এই ঘরগুলির সংস্কার হইলে, ইহাদের মধ্যে একটিকে পাঠশালাগৃহে, আর একটিকে ডাকঘরে ও অপর ঘরগুলিকে গুদামে পরিণত করা যাইতে পারে। ঘরগুলির সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত, আপাততঃ তাঁহার বৈঠকখানার বারাণ্ডাতেই পাঠশালা স্থাপন করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদিন গ্রামের মণ্ডল ও বিশিষ্ট লোকদিগকে কাছারীবাড়ীতে আহ্বান করিলেন ও তাহাদিগকে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। গ্রামে একটি পাঠশালা ও একটি ডাকঘরের যে অভাব আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। পাঠশালার পড়িবার যোগ্য বালকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন অল্পধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতেও দশ পনের জন বালক আসিতে পারে। ডাকঘর স্থাপিত হইলে, বল্লভপুর, মাধবপুর, কালপাথর, সোনাডাঙ্গা

প্রভৃতি পনের ঘোলাটি গ্রামের লোকের সবিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু প্রজাগণ নিবেদন করিল যে, পাঠশালা স্থাপিত হইলে, তাহারা মাসে মাসে ছেলেদের বেতন দিতে পারিবে না ; তবে যখন ধাত্ত হইবে, তখন তাহারা অবস্থানুসারে কেহ এক মণ, কেহ দুই মণ, এবং কেহ বা অর্ধমণ ধাত্ত দিতে পারিবে। কে কত ধাত্ত দিবে, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে গ্রাম হইতে শিক্ষকের বেতন স্বরূপ প্রায় পঞ্চাশ মণ ধাত্ত আদায় হইবে। সকলেই নিজ নিজ অংশের ধাত্ত সেই বৎসর হইতেই দিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সকল কথাবার্তা স্থির হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসে সরস্বতী পূজার দিনে পাঠশালা স্থাপনের সঙ্কল্প হইল।

এদিকে পাথর ও ঘুটিম পোড়াইয়া প্রচুর চুন এবং ভগ ইষ্টক চূর্ণ করাইয়া প্রচুর সুরকী সংগৃহীত হইলে, ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়া হইতে ছয়জন রাজমিস্ত্রী আনাইলেন, এবং এক এক দিকের খুঁটির প্রাচীর উঠাইয়া, সেই দিকে ইষ্টকের পাকা প্রাচীর গাঁথাইতে লাগিলেন। সেই দিকের প্রাচীর সম্পূর্ণ হইলে, আবার অপর দিকের প্রাচীর গাঁথাইলেন। এইরূপে ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুর ও খামার-বাটীর চারিদিকেই উচ্চ পাকা প্রাচীর হইল। রান্নাঘরটি কাঁচাঘর ছিল ; তাহাও তিনি পাকা করিয়া লইলেন। পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে দুইটা পাকা পায়-খানাও প্রস্তুত করাইলেন। এই সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি আস্তাবল ও বাবুর্চিখানা প্রভৃতির সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বাবুর্চিখানার গাঁথুনি পাকা ছিল ; ছাদও মজবুৎ ছিল। কেবল দুই এক স্থানে দুই একটা জানালা ফুটাইতে হইল মাত্র। এই ঘরগুলির সংস্কার সম্পূর্ণ হইলে, সেগুলি দেখিতে সুন্দর হইল। বলাবাহুল্য, এই-সমস্ত কার্যে নগেন্দ্র, অমরনাথ ও লখাই সর্দার ক্ষেত্রনাথকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে ও গৃহসংস্কার সম্পূর্ণ করিতে ক্ষেত্রনাথের প্রায় চাঁরিশত টাকা খরচ হইল। এদেশে সকল দ্রব্যই সুলভ এবং জনমজুরের বেতনও সামান্য বলিয়া এত অল্প খরচে সকল কার্য সম্পন্ন হইল। এই-সমস্ত কার্য শেষ করিতে সমগ্র মাঘ মাস এবং ফাল্গুন মাসেরও এক সপ্তাহ লাগিল।

ইতিমধ্যে, ঠরা ফাল্গুন তারিখে বসন্তপঞ্চমী ও শ্রীশ্রী সরস্বতীপূজা উপস্থিত হইল। নিকটবর্তী একটা গ্রামের কারিগর দ্বারা সরস্বতীদেবীর একটা প্রতিমা গঠিত হইয়া বল্লভপুরে আনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ গ্রামের বালকগণকে সরস্বতীপূজা দেখিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবদের অধুষিত গৃহে হিন্দুদেবতার পূজানুষ্ঠান করা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায়, কাছারীবাড়ী ও বাবুর্চিখানার মধ্যবর্তী বৃহৎ মাঠে একটা কাঁচাঘর ও তাহার সম্মুখে একটা ছান্‌লা প্রস্তুত করা হইল, এবং সেই গৃহের মধ্যে দেবী-প্রতিমা স্থাপিত হইল। মাঘবদন্ত হইতে মাঘবদন্ত মহাশয় ও তাহার ছেলেমেয়েরা নিমন্ত্রিত হইয়া পূজা দেখিতে আসিলেন।

বসন্তপঞ্চমীর প্রত্যয়ে কাছারীবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিবামাত্র, গ্রামের বালকেরা স্নান করিয়া ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইতে লাগিল। কেহ কেহ নিকটবর্তী অরণ্য হইতে রাশি রাশি আরণ্যপুষ্প লইয়া আসিল। কেহ কেহ সবিশেষে প্রতিমা দেখিতে লাগিল ; কেহ কেহ লক্ষন ও কুর্দন, কেহ কেহ ঢাকের তালে তালে নৃত্য, এবং কেহ কেহ বা উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া দেবীমন্দিরের সম্মুখবর্তী সেই সুরহৎ প্রাঙ্গণটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া দেবীর পূজা করিলেন ; তৎপরে বালকেরা দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল ; সর্বশেষে তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা হইল। লুচি তরকারী ও দধি সন্দেশ খাইয়া রান্নাঘরের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। গ্রামের লোকেরা, এবং মাঘবদন্ত মহাশয়, দত্তগৃহিণী, সৌদামিনী, মনোরমা প্রভৃতি মহিলারা বালকভোজনের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কেবলমাত্র প্রবাসী সুরেন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়া মনোরমা এই আনন্দের দিগেও মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতেছিলেন।

বালকভোজন শেষ হইলে, ক্ষেত্রনাথ বালকদিগকে একত্র বসাইয়া তাহাদিগকে সরল ভাষায় বলিলেন যে, সেই দিন হইতে সেই স্থানে তাহাদের পাঠশালা স্থাপিত হইল। তাহারা যেন প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পাঠশালায়

পড়িতে আসে; তারপর জলধাবারের ছুটি হইবে। জল-ধাবার খাইয়া আবার পাঠশালায় আসিবে। মধ্যাহ্নে স্নান করিবার ও ভাত খাইবার ছুটি হইবে। তার পর বিকালে একবার আসিয়া নাম্তা পড়িয়া ও খেলা করিয়া বাড়ী যাইবে। ক্ষেত্রনাথ পঞ্চাশটি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ আনাইয়াছিলেন; তাহা তিনি বিদ্যার্থী বালকগণকে একে একে ডাকাইয়া দিলেন। সর্বশেষে তিনি বলিলেন যে, তাহারা যদি ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে আগামী বৎসর সরস্বতী পূজার সময়ে তিনি তাহাদিগকে আরও ভাল ভাল বই পুরস্কার দিবেন। এইরূপ বক্তৃতার পর, ক্ষেত্রনাথ অমরনাথকে দেখাইয়া বলিলেন “ইনি তোমাদের গুরুমহাশয় হইলেন। তোমাদের আর একটি গুরুমহাশয় আসিবেন। তোমরা ইহাদিগকে খুব ভক্তি করিবে। এখনই তোমরা ইহাকে প্রণাম কর।” বালকেরা ক্ষেত্রনাথের উপদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে বসিয়াই করজোড়ে মাথা নোঙাইয়া তাহাদের নবীন গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিল।

সভাভঙ্গের পর বালকেরা তাহাদের দেশীয় ক্রীড়া ও কুস্তী দেখাইল। সন্ধ্যার সময় দেবীর আরত্রিক দেখিয়া তাহারা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

### দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা ও পাঠশালা স্থাপনের উৎসবে ক্ষেত্রনাথের প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়া গেল। হটুক, কিন্তু তজ্জন ক্ষেত্রনাথ দুঃখিত হইলেন না। তিনি মনোরমাকে বলিলেন “আমরা এই দেশে এসে বাস করেছি। এদেশের লোকের অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও দূষিত রীতিনীতি দেখে সময়ে সময়ে আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়। জ্ঞানালোকের অভাবে এদেশের লোকেরা কোনও উন্নতিলাভ করতে পারে নাই। এই-সব অসভ্যদের মধ্যে বাস করলে আমাদের ছেলে মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে অসভ্য হয়ে পড়বে। সকলে যদি ভাল থাকে, আমরাও ভাল থাকতে পারব। এইজন্য এখানে একটি পাঠশালা স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যিক মনে

করলাম। অমরকেই এখন পাঠশালায় পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ'ল। খাওয়া পরা ব্যতীত অমরকে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা দিতে আমি স্বীকৃত হয়েছি; কিন্তু তাতে তার বেশী দিন চলবে না। সে হয়ত আর কোথাও একটি ভাল কাজ পেলে চ'লে যাবে। তখন নরুকে পড়াবার জন্য আবার একটি লোক নিযুক্ত করতে হ'বে। কিন্তু অমর খাওয়া পরা ব্যতীত যদি আমার কাছে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা পায়, আর পাঠশালা থেকেও কিছু পায়, আর এখানে একটি ডাকঘর খুললে যদি তার থেকেও কিছু পায়, তা হ'লে হয়ত সে এখানে কিছু দিন থাকতে পারে। তা না হ'লে, সে নিশ্চয়ই চ'লে যাবে। এই কারণে, একটি পাঠশালা স্থাপন করবার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে ইতস্ততঃ করলাম না।”

মনোরমা বলিলেন “এখানে একটি পাঠশালা খুলে তুমি ভাল কাজই করেছ। কিন্তু এ বৎসর তো তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল। গাই, গরু, মোষ কেনা, ধান-চাল—কলাই কেনা, চাষের খরচ, ইট পোড়ানো, প্রাচীর দেওয়া, রান্নাঘর পায়খানা তৈয়ের করা, বন্দুক কেনা, চাকর মনিষের বেতন, এই সরস্বতী পূজা, তারপর বাড়ীর খরচপত্র এই সকলে তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, “এই সকল বিষয়ে প্রায় চৌদ্দ-শ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। কিন্তু যেমন খরচ হয়েছে, তেমনই আয়ও হয়েছে। তিনটি মরাইয়ের প্রায় ছয়-শ মণ ধান মজুত আছে। তার দাম বার-শ টাকা। পঁচাত্তর মন কলাইয়ের দাম দেড়-শ টাকা, ত্রিশমণ অড়-হরের দাম ষাইট টাকা, বাইশ মণ মুগের দাম প্রায় ষাইট টাকা, দেড়-শ মণ আলুর দাম প্রায় তিন-শ টাকা। এই মোট সতের আঠার-শ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হয়েছে। এসব ছাড়া মাঠে এখনও গম, যব, ছোলা, সরুষে, গুঞ্জা ও কাপাস রয়েছে। এই সকলেও চার পাঁচ-শ টাকা হতে পারে। তা হ'লে আমাদের প্রায় বাইশ শ টাকার ফসল হবে। এছাড়া প্রজ্ঞাদের নিকট ষাটনাও প্রায় তিন-শ টাকা আদায় হবে। তা হ'লে এবছর আমাদের আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা হবে।”

মনোরমা বলিলেন “যদি আড়াই হাজার টাকা হয়, তা হ’তে তোমার খরচ চৌদ্দ-শ টাকা।”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। এবৎসর এগার-শ টাকার অধিক মুনাফা থাকবে না সত্য; কিন্তু আগামী বৎসরে, এ বৎসরের মতন তো খরচ হ’বে না। আমাদের গরু-মোষ আছে, তা কিন্তে হবে না; ধান-চাল কলাইও কিন্তে হবে না, বন্দুক কিন্তে হবে না, আর বাড়ী মেরামতও কর্তে হবে না। এই সকলেই যে এবৎসর প্রায় হাজার টাকা খরচ হ’য়ে গেছে। এই টাকাটা আগামী বৎসরে বাঁচতে পারে—অবশ্য যদি ফশল ভাল হয়। কেননা, ভাল ফশল হওয়ার উপরেই সব নির্ভর কর্তেছে। তোমার সংসারের জন্ত প্রায় কিছুই কিন্তে হবে না। ঘরে ধান, চাল, কলাই, অড়হর, মুগ আছে। তেলের জন্য সবুধে গুঞ্জা আছে। বাড়ীতে তোমার ছয় সাত সের দুধ হয়। দুধও কিন্তে হবে না। দুধের সর থেকে, আর দই জমিয়ে তুমি তো প্রত্যহই মাখন ও ঘী তৈয়ের কর। তাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর। জালানী কাঠ কিন্তে হবে না; তা জঙ্গল থেকে কেটে আনলেই হবে। তোমার তরকারী-বাগানে যথেষ্ট তরকারীও হয়। আলুও এ বৎসর অনেক হয়েছে। কিন্তু আমরা ঘর-খরচের মতন আলু রেখে অবশিষ্ট আলু বেচে ফেলব। কেননা, আলু শীঘ্র নষ্ট হ’য়ে যায়। এবৎসর ক্ষেত্রে গম হয়েছে। সুতরাং গমও কিন্তে হবে না। তোমার মোষ-গরুর জন্ত খড় আর বিচালী যথেষ্ট রয়েছে। তার পর কলাই গম ছোলার ভূষা আছে। আর সবুধে গুঞ্জা থেকে খইলও যথেষ্ট হবে; তা গরু-মোষে খাবে। আমাদের চাষ থেকে প্রায় সবই উৎপন্ন হয়েছে। হয় নাই কেবল আক। তাও লখাই এবৎসর আবাদ করবে বলেছে। আমাদের কেবল গুড়, চিনি, মুন, মশলা কিন্তে হবে। আর কাপড়-চোপড়ও অবশ্য কিন্তে হবে। তা’তে আর খরচ কত? বছরে বড় জোর একশ টাকা। তার উপর চাকর কামীনদের বেতন, অমরের বেতন, আর পূজা ইত্যাদিতে খরচ—এই

সকলে বড় জোর চারশ টাকা খরচ হবে। আগামী বৎসর সর্বসমেত, যদি আড়াই হাজার টাকা আয় হয়, তা হ’লেও চারশ টাকা বাদ দিলে তোমার একশ শ টাকা লাভ থাকবে।”

মনোরমা বলিলেন “এবৎসর যে এত ধান, কলাই অড়হর হয়েছে, তা সমস্তই কি রাখবে?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তুমি চমৎকার গৃহিণী তো? অত রেখে কি হবে? কিন্তু ধান সমস্ত রাখবে; ধান এখন হাত-ছাড়া করা হবে না। ধানই লক্ষ্মী। ধান আগামী বৎসরে কি রকম হবে, তা তো জানি না। যদি অজন্মা হয়, তা হ’লে ঘরে লক্ষ্মী থাকলে অন্নের কষ্ট হবে না। ধান ছাড়া, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুগ, গম, যব—এই-সকল কেবল বাড়ীর খরচের মতন রেখে বাকী সব বেচে ফেলব। আমি ঠিক করেছি, কলাই পঞ্চাশ মণ, অড়হর বিশ মণ, মুগ পনের মণ, আলু সোয়াশ মণ, আর খরচের মতন গম, যব, সবুধে, গুঞ্জা রেখে অবশিষ্ট সব বেচে ফেলব। কাপাসও বেচে ফেলব। এখন জিনিষের দর কিছু নরম আছে। দর একটু চড়লেই বেচতে আরম্ভ করব। ঐ যে গুদাম-ঘর মেরামত করলাম, তা কি জন্ত? এই সব জিনিষ ধ’রে রেখে দেবো ব’লে। বুঝলে?”

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন “এই সমস্ত বেচে যা টাকা পাবে, তা কি করবে?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা বুঝতে পারলে না? আগামী বৎসর যে বার শ টাকা খরচ হবে, সেই টাকাটি রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবো।”

মনোরমা বলিলেন “ব্যাঙ্কে তোমার আর কত টাকা জমা আছে?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা এখন জেনে কাজ নাই। যা আছে, তোমাদেরই আছে।”

উত্তর শুনিয়া মনোরমা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি স্বাক্ষর করিয়া বলিলেন “এই জন্তই তো তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। আমাদের জন্ত টাকা! টাকা কি তোমার নয়, আর তোমার জন্ত নয়?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদের

এই টাকা। তুমি টাকার কথা যখন জিজ্ঞাসা করছ তখন নিশ্চয়ই তোমার একটা মতলব আছে। কি মতলব মনে, দেখি ?”

মনোরমা যেন একটু রাগিয়া বলিলেন “আমার মতলব কি ? তোমার ছেলে নলিনের জন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম। সে একটা কিছু কাজ করতে চায়। সেই জন্য রোজই আমাকে বলে। আমি তোমাকে এত দিন কোন কথা বলতে সাহস করি নি। তুমি ওকে কিছু পুঁজি দিয়ে একটা কাজ কর্ন করে দাও— এই আমার কথা !”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ও গো, আমি যে সে কথা ভাবি নাই, তা নয়। আরও দিন কতক যাক, তার পর তোমাকে বলব। আগে এখানকার অবস্থা ভাল করে বুঝি, তার পর তাকে একটা কাজ ক’রে দেব।”

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## শুশুনিয়া

বর্ধমান হইতে রেলপথে আসানসোল যাইবার সময়ে বামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ হস্তী বসিয়া আছে। এই শুশুনিয়া দর্শনের লোভে আমরা পাঁচজনে গত বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম যে শুশুনিয়া বাঙ্গালার একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান, এই পর্বতগাত্রে বাঙ্গালা দেশের সর্বপ্রাচীন খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে। বহু-পূর্বে স্বকীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীশুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শুশুনিয়ার খোদিতলিপির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সবেও বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত “গৌড়রাজমালা” গ্রন্থে যখন শুশুনিয়ার নাম দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন বাঙ্গালার একজন বিশালকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া গেলেন। সেইজন্য খোদিতলিপি স্বচক্ষে দেখিবার উদ্দেশ্যে অভিযান।

গাড়ীতে চড়িয়াই আহারের মদ্যোৎসব আরম্ভ হইল।

একটু অবকাশ হইলে বাহিরে চাহিয়া দেখি, যে-বাঙ্গালা-দেশে আমরা বাস করি তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি, কাল মাটি, নীল জল, শ্রামল তুণক্ষেত্রের দেশ পরিত্যাগ করিয়া লাল মাটির দেশে আসিয়াছি। দুর্বলতাবশতঃ এই কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলায় আমাদের অন্ততম সঙ্গী ব—বাবু আমাকে সন্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। তিনি বলেন এই প্রকৃত বাঙ্গালাদেশ, আমরা যেখানে বাস করি, সেস্থানটি সমুদ্রগর্ভ ; ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে লালমাটির দেশটাই প্রাচীন, এবং কাল-মাটির দেশটা তাহার তুলনায় অতি শিশু। আমি আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

গাড়ী যখন মেদিনীপুর ছাড়াইয়া বিষ্ণুপুরের দিকে চলিয়াছে তখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, স্বপ্নে দেখিলাম রথে চড়িয়া শুশুনিয়া আক্রমণ করিতে চলিয়াছি, একসঙ্গে পাঁচখানি পাঞ্চজন্ম নিনাদিত হইতেছে, কুল-বধুগণ আমাদের উদ্দেশ্যে লাজ নিক্ষেপ করিতেছে, আর মহারথী-পঞ্চককে দেখিয়াই শুশুনিয়া দৈত্য ভয়ে আর্তনাদ করিতেছে। আমার ঘুম ভাঙিলে দেখি বাকী চারিটি নাসিকার গর্জনে বাষ্পীয় দৈত্য ভীত হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বিষ্ণুপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছি, বাঁকুড়ার আর অধিক বিলম্ব নাই। সকলকে ডাকিয়া উঠাইলাম, কারণ কোথায় নামিব তখনও পর্যুস্ত তাহা স্থির হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে শুশুনিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু বাঁকুড়ার পরের ষ্টেশন ছাতনা শুশুনিয়ার আরও নিকট। বাঁকুড়ায় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু ছাতনায় গোয়ান ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী প্রথা অনুসারে বুদ্ধির মূলে তাম্রকূট ধূমসেক করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে বাঁকুড়া বড়ই নিকটে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখনও কিছু স্থির হয় নাই। দলপতির নিকট কথাটি পাড়িতেই ফয়সালা হইয়া গেল, স্থির হইল বাঁকুড়াতে নামিতে হইবে।

বাঁকুড়ায় যখন পৌঁছিলাম তখন শীতকালের বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক ব—বাবু পূর্বে তাহার



এক আত্মীয়কে গত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারা গেল যে সেদিন শুশুনিয়া যাত্রা করিবার কোনই উপায় নাই, শুশুনিয়া অনেক দূর, রাস্তাও তেমন সুবিধার নহে, পথে দুইটি নদী পার হইতে হইবে, তাহার একটির উপরেও সেতু নাই। পথপ্রদর্শক মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে আমাদিগকে তাঁহার আত্মীয়ের গৃহে লইয়া যান, কিন্তু দলপতি অসম্মত হওয়ায় স্থির হইল যে ডাক-বাঙ্গলায় আশ্রয় লওয়া হইবে।

বাঁকুড়া ষ্টেশনটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি অভিযোগ আছে,—আমাদিগের দলপতির ঞায় গুরুভার আরোহীদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি বেঙ্গল-নাগপুর রেলের কর্তৃপক্ষের মোটেই মনোযোগ নাই। প্রথম অভিযোগ এই যে ষ্টেশনের প্লাটফর্মটি উচ্চ নহে, দলপতি মহাশয়ের আকারের আরোহীগণকে কুলি ডাকাইয়া নামাইতে হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে ষ্টেশন হইতে নগরে যাইতে হইলে যে “ওভারব্রিজ” পার হইতে হয় তাহাও তেমন ভারসহ নহে। কোনও বিশেষ দুর্ঘটনা না হইলে কর্তৃপক্ষগণের চৈতন্যোদয় হইবে না। যাহা হউক, নির্বিঘ্নে দলপতি মহাশয়কে লইয়া সেতু পার হইলাম, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। অকাল-ঝর্ককে জরজর দুইখানি রথ, তাহাতে চারিটি ছাগশিশু যোজিত, দলপতি যে তাহাতে আরোহণ করিয়া কিরূপে গমন করিবেন ইহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইলাম। ব—বাবুর পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া অপর গাড়ীখানিতে ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য সমেত আমরা ছয়জন আরোহণ করিলাম।

সন্ধ্যার সময় ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। শেষ রাত্রিতে শুশুনিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

দিব্য আরামে লেপ মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময়ে গাড়োয়ান আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল, তখনও সকলে নিদ্রিত। ব—বাবুর আত্মীয় বাঁকুড়া কালেক্টরীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁহার অনুগ্রহে দুইখানি ভাল গাড়ী মিলিয়াছিল। সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া

বিছানাপত্র বাঁধিয়া লইতে লইতে প্রভাতের আলোক দেখা দিল। পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী চাঙিতে লাগিল, পথপ্রদর্শক ব—বাবু বলিলেন যে এই রাস্তাই পুরাতন পন্টনের রাস্তা, বাঁকুড়া ও মানভূম স্বতন্ত্র জেলা হইবার পূর্বে, ছোটনাগপুর যখন কোম্পানীর রাজত্বের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ছিল, তখন পন্টনের যাতায়াতের জন্ত এই রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। রেলের লাইন পার হইয়া ছাতনা নগরের অভিমুখে চলিলাম। চারিদিকে বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র, স্থানে স্থানে রক্ষরাজির মধ্যে দুই একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই।

ক্রমে গাড়ী দুইখানি ছাতনা নগরে প্রবেশ করিল। প্রাচীন ছাতনা নগর এখন একখানি বৃহৎ গ্রাম। এখানে এখন পুলিশের থানা, স্কুল ইত্যাদি আছে। ছাতনা গ্রামে বাঙালী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ একমাত্র দর্শনযোগ্য স্থান। পথের পাশ্বেই প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মন্দিরের চূড়া বহুপূর্বে পড়িয়া গিয়াছে, তবে তিন পাশ্বে দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতের দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গিতে একটি দেবীমূর্তি আছে। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি বৃহদাকার রক্ষ জন্মিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া ফেলিলে এখনও মন্দিরের অবশিষ্টাংশ রক্ষা হইতে পারে। বাঙালী মন্দিরের পূর্বদিকে আর একটি বৃহদাকার ইষ্টকনির্মিত মন্দির বা গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যেক ইষ্টকখানি খোদিতলিপিসূক্ত। দলপতি ও ব—বাবু খনন করিয়া দুইখানি সুন্দর-খোদিতলিপিসূক্ত ইষ্টক বাহির করিলেন। “বিশ্বকোষের” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বহুপূর্বে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ছাতনার ইষ্টকলিপির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে যাহার খোদিতলিপি পাঠের পিপাসা অসহ হইবে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দেখিয়া লইবেন।

বেলা যখন দশটা তখন শুশুনিয়া গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্বতের পাদমূলে একটি প্রাচীন “বাঙ্গলা”, ইহাই বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর আপিস ছিল, বহুপূর্বে বেঙ্গল



স্বনিয়া গণ্ডের বিস্তার ।

ষ্টোন কোম্পানীর পাথরের মূল্য ছিল, তখন ইহার নাম ছিল “বর্ধমান ষ্টোন।” এখন চারিদিকে রেল খোলাতে পাথর সস্তা হইয়া পড়িয়াছে, বেলা হইতে অনেক দূরে বলিয়া বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানী অল্প মূল্যে পাথর বিক্রয় করিতে পারেন না, কোম্পানীর কার্য এখন বন্ধ আছে। ব—বাবুর আত্মীয় “বাক্সালার” কর্মচারীর নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, তিনি “বাক্সালার” আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন। “বাক্সালা”টি বহু পুরাতন, সম্মুখের বারান্দার ছাদ নাই, আসবাবপত্রও বার্ককাহেতু অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামান হইতে লাগিল, আমরা কর্মচারী মহাশয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম একজন বাঙ্গালী বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর সিকি অংশীদার। পূর্বে একজন সাহেব এই “বাক্সালার” থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শুশুনিয়ার “বাক্সালার” পিত্তলফলকে একটি স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। তিনিই তাঁহার অংশ শ্রীযুক্ত অবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং জর্জ হেগারসন্ কোম্পানীর অংশীদার। “বাক্সালার” সম্মুখে পিত্তলফলকে জর্মান বা ওলন্দাজ ভাষায় নিম্নলিখিত কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে—

Lum Audenke  
an meine lieber Eltern

Carl B. Reuss and Amalie Reuss

1874

Susunia Hill

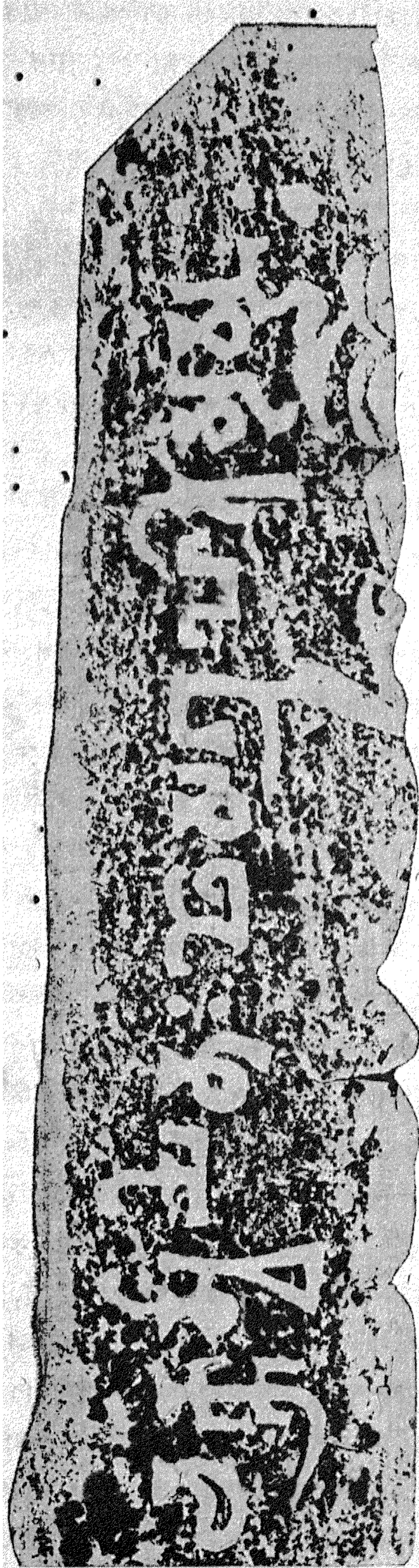
Johann Leonhard Reuss.

শূন্যগর্ভ হইয়া দলপতি কোন কাজ করিতে পারেন না, তিনি যখন শুনিলেন যে খোদিতলিপি “বাক্সালা” হইতে দেড়ক্রোশ দূরে পর্বতের উপরে অবস্থিত, তখন তিনি একাগ্রচিত্তে আহারে মনোনিবেশ করিলেন। বন্ধুবর রা— বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক, তিনি যথা-সাধ্য দলপতির সাহায্যে প্রেরিত হইলেন, লজ্জায় পড়িয়া ব—বাবুও অগ্রসর হইলেন, বাকী রহিলাম আমি ও ব—বাবু, আমরা একপেয়লা “চা”র প্রয়াসী, সম্মুখ দিয়া পর্বতপ্রমাণ লুচি, বাঁকুড়ার কাৎলা মাছ, কলিকাতার

মিষ্টান্ন ও কমলানেবু “এক্সপ্রেস স্পিডে” চলিয়া যাইতেছে, আমরা সেদিকে চাহিয়াও দেখিলাম না। “এই জন্তু বাঙ্গালী জাতির উন্নতি হয় না, বাঙ্গালাদেশে মুড়ি মিছরির সমান দর, আমাদের এই অপূর্ব স্বার্থত্যাগ, আমাদের এই অপূর্ব বীরত্ব, দেশের লোকে এখনও শুনিতে পাইল না। সেই জন্তুই হুঃখে, ক্ষোভে, মশ-পীড়ার কষাঘাতে আহত হইয়া এই ভ্রমণকাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে সার টমাস লিপ্টন্ আমার মার্কেলের মূর্তি গড়াইয়া ফেলিত, কমল মহাসভা আমার জন্তু বিশেষ বৃত্তি নির্ধারিত করিত। হায়, দ্বিজেন্দ্রলাল!

অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলো পুরাতন কাগজ বাহির করিলাম। তাহা জ্বালাইয়া ব্রাহ্মণঠাকুর জল গরম করিতে না করিতে অল্প সকলে যাত্রার জন্ত ডাকিতে আরম্ভ করিল। জল অল্প অল্প গরম হইয়াছে, ফুটিয়া উঠে নাই, কি করি, তাহাতেই চা এবং টিনের দুধ ঢালিয়া দিলাম। আমি এবং ব—বাবু চায়ের এক একটি পেয়লা লইয়া বসিবামাত্র ডাক বন্ধ হইল, তখন দেখি রা— একটি ঘণ্টা লইয়া এবং ব—বাবু ফটোগ্রাফ ডেভেলপ করিবার একখানি ডিস্ লইয়া উপস্থিত। বন্ধুবর রা— বড় উদরনৈতিক লোক, তিনি অনেক সময় আমাকে বলিয়াছেন যে চা পান বাঙ্গালাদেশে অত্যন্ত আবশ্যিক, তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শর্করা থাকিলে গরম জল ও গুঁড় চা-পত্রের কোনই আবশ্যিক থাকে না। চায়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, যথা বিস্কুট, রুটী, মাখন, চিনি, জ্যাম, জেলী, মার্শলেড্, অভাবে সন্দেশ বা রসগোল্লা, চায়ের পূর্বেও চলিতে পারে, পরেও চমিতে পারে; আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে পাওয়া গেলে চায়ের বাটী মুখে না তুলিয়া দেখিতে দেখিতে সেগুলি পার করা উচিত। এ বিষয়ে বন্ধুবর বিশেষ বিশেষজ্ঞ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি কখনও এ বিষয়ের পরিভাষা সংগ্রহে লিপ্ত হন তাহা হইলে ভরসা করি আমার বন্ধুবরকে বিস্মৃত হইবেন না।

ধীর মস্তুরগতিতে “বাক্সালা” ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। পর্বতের উপরে ও চারিপার্শ্বে নিবিড় বন, এই



বিষ্ণুচক্রের বামপার্শ্বের খোদিত লিপি—শুণ্ডনিয়া পর্বত, বাকুড়া।



বিষ্ণুচক্রের নিম্নের খোদিত লিপি।

বনের ভিতর দিয়া পূর্বে পথ ছিল ; যখন বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর কাজ চলিত তখন এই পথে পাহাড়ের উপর হইতে পাথর লইয়া গোয়ান নীচে নামিত। পথ দেখিয়া বোধ হইল বহুকাল গোয়ান আসে নাই, পথে ঘাস জন্মিয়াছে, স্থানে স্থানে দুই একটা গাছও দেখা দিয়াছে। বনের মধ্যে বহু ঘণ্টার শব্দ হইতেছে, ব—বাবু বলিলেন যে উহা মহিষের গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ। এই পথে এক ক্রোশ চলিয়া পর্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর কর্মচারী মহাশয় আমাদিগের সহিত পথ দেখাইবার জন্ত দুইজন লোক দিয়াছিলেন, তাহারা কুঠারহস্তে পথ দেখাইয়া চলিল। পথপ্রদর্শক লোক দুইজন বলিয়া উঠিল যে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, “চন্দ্রসূর্য্য” খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেকক্ষণ জেরা করিয়া বুঝিলাম পর্বতের যে স্থানে খোদিতলিপি আছে তাহার উপরে চন্দ্র ও সূর্য্যের মূর্ত্তি খোদিত আছে। আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া তাহারা “চন্দ্রসূর্য্যের” অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এক দণ্ড পরে মাথার উপরে কে “বাবু,” “বাবু,” করিয়া দুইবার ডাকিল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম একজন পথপ্রদর্শক আমাদিগকে ডাকিতেছে। তাহাদিগের একজন নাহিয়া আসিল ও আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পর্বতের গায়ে অনেকগুলি ঝরণা ছিল। শীতকালে তাহার কোনটিতে জল ছিল না, একটি ঝরণার পথ ধরিয়া আমরা পর্বতে উঠিতে লাগিলাম। অনেকদূর উঠিয়া দেখিলাম যে দ্বিতীয় পথপ্রদর্শক একখানি পাথরের উপর বসিয়া আছে, সেই স্থানে পর্বত কাটিয়া অনেকটা স্থান সমান করা হইয়াছে, তাহা দূর হইতে প্রাচীরের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই স্থানে অতীতযুগে কে পাথরে দুইখানি চক্র খুঁদিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার একখানি বড়, আর একখানি ছোট। ইহারাই গ্রাম্য লোকের “চন্দ্রসূর্য্য”। বড়খানি সূর্য্য এবং ছোটখানি চন্দ্র। বড়খানির নীচে দুই ছত্র এবং দক্ষিণ পার্শ্বে এক ছত্র লেখা আছে। ছোটখানির নীচেও এক ছত্র লেখা ছিল, কিন্তু তাহা আর পড়িতে পারা যায় না, কে যেন তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছে।

পথপ্রদর্শক দুইজনের কার্য্য শেষ হইল, তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল, তখন আমার কার্য্য আরম্ভ হইল। বাঙ্গলার প্রকৃতক্বে আমি “চিনির বন্দ,” পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি বটে, কিন্তু নাম হইয়াছে অপর “লোকের। আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ছাপা তুলিয়া দিয়াছি, নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়াছি, দলপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বাজারে নাম কিনিয়াছেন, ইহাই বাঙ্গালা দেশের রীতি। যখন “চন্দ্রসূর্য্যের” নিকট পৌঁছিলাম তখন বেলা বারটা, আর কার্য্য যখন শেষ হইল তখন বেলা তিনটা। দলপতি মহাশয় পাচক ব্রাহ্মণকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে আমরা বারটার মধ্যে ফিরিব এবং একটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ছাত্না যাত্রা করিব। তাহার ইচ্ছা ছিল যে আজ রাত্রিতেই ছাত্না হইতে পুরুলিয়া যাত্রা করিব। খোদিতলিপির ছাপ তুলিতে তুলিতে ভাবিতেছিলাম যে অন্ন আবার তুলে পরিণত হইতেছে, উনানের আশুন অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, সুতরাং ফিরিয়াই যে এক পেয়ালা গরম চা পাইব তাহারও কোনই ভরসা নাই। ছাপা তোলা শেষ হইল, দলপতি ফটোগ্রাফ তুলিতে গিয়া দেখিলেন যে ক্যামেরার স্ক্রুটি বাঙ্গালায় ফেলিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ফটোগ্রাফ তোলা আর হইল না। দলপতি দেখাইয়া দিলেন যে এইস্থানে একটি বৃহৎ গুহা ছিল, তাহার পশ্চাদিকের প্রাচীরে সর্ব প্রথমে ক্ষুদ্র চক্র ও তাহার নিম্নে খোদিতলিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার পরে সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে আসিয়া বৃহৎ চক্রটি ও তাহার দুই পার্শ্বে খোদিতলিপিগুলি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ঝরণাটি নিকটে থাকায় গুহা ধ্বংস হইয়াছে, ঝরণার জলের বেগে উহার পার্শ্বে ছাদ ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ছাপা লইয়া বিরসবদনে বেলা চারিটার সময় বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম, স্নানাহার শেষ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার হইবার পূর্বে যাত্রা করিলাম। যখন বাঁকুড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দুইটা। “ওয়েটিং রুম” বেঞ্চির উপরে বসিবামাত্র পাঁচটা বাজিয়া গেল, পুরুলিয়ার গাড়ীর

বর্তা দিল। টেন আসিলে বোঝাই হইয়া পুরুলিয়া  
যাত্রা করিলাম।

শ্রী—।

### শুশুনিয়ার পর্বতলিপি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু  
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শুশুনিয়ার পর্বতলিপির  
আবিষ্কার-বার্তা প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরের বঙ্গীয়  
এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে শুশুনিয়ার খোদিত  
লিপির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যা-  
মহার্ণব মহাশয়ের বন্ধু বাবু গোপীচন্দ্র কৰ্মকার তাঁহাকে  
জানাইয়াছিলেন যে শুশুনিয়া পর্বতের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে  
একটি খোদিতলিপি আছে। স্থানীয় লোকে বলিয়া  
থাকে যে উহা দেবান্বরে লিখিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব  
মহাশয় গোপীচন্দ্র বাবুকে খোদিতলিপির প্রতিলিপি  
আনয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি যে নকল  
(Hand copy) আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই উপর  
শির্ভর করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় খোদিতলিপির  
নিম্নলিখিত পাঠ্যেদ্ধার করিয়াছিলেন :—

- ১। চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ
- ২। পুঙ্করাম্মুধিপতের্মহারাজ শ্রীসিন্ধবর্ষগঃ পুত্রস্য
- ৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ষগঃ কৃতিঃ \*

তাহার পরে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-  
পত্রিকার ৩য় ভাগে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় মহারাজ  
চন্দ্রবর্ষা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।  
এই প্রবন্ধে তিনি শুশুনিয়া খোদিতলিপির সংশোধিত  
পাঠ প্রকাশ করেন :—

- চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ
- পুঙ্করাম্মুধিপতের্মহারাজ শ্রীসিন্ধবর্ষগঃ পুত্রস্য
- মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ষগঃ কৃতিঃ †

এই প্রবন্ধের সহিত খোদিতলিপির একটি প্রতিলিপি  
প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত ডাক্তার ডিওডোর ব্লকের নিকট  
শুশুনিয়ার খোদিতলিপির একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ

দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত  
প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখিলাম যে উক্ত পাঠের সহিত  
কতক মিলিলেও কোন অক্ষরের আকারের সহিত ফটো-  
গ্রাফের অক্ষরের আকারের মিল হয় না। সেই অবধি  
শুশুনিয়া পর্বতে গিয়া খোদিতলিপিটির ছাপা উঠাইবার  
বড় ইচ্ছা ছিল। “প্রবাসী”-সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত  
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে একবার শুশুনিয়া  
যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত বৎসরে শ্রীযুক্ত  
রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রণীত “গোড়রাজমালার” সমালোচনা-  
কালে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে শুশুনিয়ার প্রতিলিপি  
বঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। সেই লিপি  
দেখিবার জন্য ১৩১২ বঙ্গাব্দে ৩জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে  
শুশুনিয়া পর্বতে গিয়াছিলাম।

শুশুনিয়া পর্বত বাঁকুড়া হইতে ১৪ মাইল দূরে  
অবস্থিত। পর্বতের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে প্রাচীন কালে একটা  
গুহা ছিল। তাহার পার্শ্বে একটি প্রস্তম্ব খাকায় গুহার  
ছাদ ও পার্শ্বের প্রাচীরগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।  
পশ্চাতের প্রাচীরে একখানি চক্র খোদিত আছে,  
চক্রের নিম্নে দুই পংক্তি ও বামপার্শ্বে এক পংক্তি  
খোদিতলিপি আছে। ইহার বামপার্শ্বে আর একখানি  
ক্ষুদ্রতর চক্র আছে। পূর্বে তাহার নিম্নে এক পংক্তি  
খোদিতলিপি ছিল, কিন্তু কোন সময়ে কেহ তাহা  
ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিয়াছে। এই খোদিতলিপির প্রারম্ভে  
একটি “স্বস্তুর” চিহ্ন ছিল। আমরা যখন শুশুনিয়া  
পর্বতে গিয়াছিলাম তখন বিশেষ কারণে খোদিতলিপির  
আলোক-চিত্র গৃহীত হয় নাই। তবে যে প্রতিলিপি প্রকা-  
শিত হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য। প্রাচ্য-  
বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ষোল বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রতিলিপি  
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে “চিত্রখানি ঠিক অমুরূপ হয় নাই,  
খোদকের দোষে অতি সামান্য রূপান্তর ঘটয়াছে।” \*  
পাঠকবর্গ উভয় প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে  
পারিবেন যে অত্যন্ত অধিক রূপান্তর ঘটায় পরিষদ-  
পত্রিকার প্রতিলিপিখানি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শুশুনিয়া পর্বত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৬৮ পাদটীকা।

\* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,  
1895, P. 180.

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৭০।

একদিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গুণিতে পাই যে তিনি মন্দশোরে অর্থাৎ প্রাচীন দশপুরে একখানি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত গুণিনিয়া খোদিতলিপির সিদ্ধবর্ষার নাম আছে। গুণিনিয়ার খোদিতলিপিতে সিদ্ধবর্ষার নাম নাই গুণিনিয়া তিনি প্রতিলিপি দেখিতে চাহেন। উভয় প্রতিলিপি দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন খোদিতলিপিতেই সিদ্ধবর্ষার নাম নাই, সিংহবর্ষার নাম আছে। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় গুণিনিয়ার খোদিতলিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

১। চক্রস্বামিনঃ দাস [ ১ ] [ ৫ ] গ্রণ [ ১ ] তি সৃষ্টঃ

২। পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্ষাঃ পুত্রশ্চ

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ষাঃ কৃতিঃ

“চক্রস্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক উৎসর্গীকৃত, পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্ষার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ষার অস্থান।”

উক্তম প্রতিলিপির অভাবে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খোদিতলিপির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম কথাটি একবার “পুষ্করণাধি” ও দ্বিতীয়বার “পুষ্করণাধি” পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে আমারও বিশেষ সন্দেহ ছিল।

পুষ্করণ বা পুষ্করণা নামক কোনও দেশের নাম ইহার পূর্বে গুণিতে পাওয়া যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভট্ট ও চারণগণের গ্রন্থে দেখিয়াছেন যে বর্তমান মাড়োয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোকরণা বা পুষ্করণা। দুই বৎসর পূর্বে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালব দেশের প্রাচীন দশপুর নগরে (বর্তমান নাম মন্দশোর) একখানি খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহারই সাহায্যে গুণিনিয়ার খোদিতলিপির রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি এই নূতন খোদিতলিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

( ১ ) সিদ্ধম্ সহস্রশিরসে তন্মৈ পুরুষায়মিতাশ্বনে

চতুস্‌সয়ুজ-পর্যাক-তোয়-নিদ্রালবে নমঃ

শ্রীশ্রীমালবগণায়ান্তে প্রশস্তে কৃতসদ্বিতে

( ২ ) একষষ্ঠাধিকে প্রাপ্তে সমাশত চতুষ্টি [ ৫ ] য়  
প্রাবৃক্কালে শুভে প্রাপ্তে মনস্তষ্টিকরে নৃণাম্  
ময়ে প্রবৃন্তে শক্রশ্চ কৃষ্ণশ্চানুমতে তটে.

( ৩ ) নিম্পন্ন ত্রীহি-শবসা কাশ পুষ্পৈরলঙ্কতা  
ত্যাভিরভাধিকং ভীতি মেদিনী সস্তমালিনী  
দিনে আশোজ-শুক্লশ্চ পঞ্চম্যামথ সংকৃতে

( ৪ ) ঈদৃক্কালবরে রম্যে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্  
প্রাক্ পুণ্যোপচয়াভ্যাসাৎ সধর্ষিত মনোরথে  
জয় বর্ষ নরেন্দ্রশ্চ পৌত্রে দেবেন্দ্র বিক্রমে

( ৫ ) ক্ষিতীশ সিংহ বর্ষাণস্ সিংহবিক্রান্ত-গামিনি  
সংপুত্রে শ্রীশ্রীহারাজ নর বর্ষাণি পার্শ্বিবে  
তৎপালন গুণোদ্দেশাঙ্কশ্চ প্রাপ্তার্থ বিস্তরঃ

( ৬ ) পূর্ব জন্মান্তরাভ্যাসাৎ বলাদাক্ষিপ্তমানসঃ  
শ্বশঃ পুণ্যসংভার বিবর্ধিত-কৃতোদ্যমঃ  
যুগতৃষ্ণা-জল-স্বপ্ন বিদ্যাদীপ শিখাচলম্

( ৭ ) জীবলোকমিমং জাত্বা শরণ্যং শরণস্ততঃ  
ত্রিদশোদার ফলদং স্বর্গ জ্ঞৌ চারুপল্লবম্  
বিমানানেক বিটপং তোয়দাংবু মধুস্রাবম্

( ৮ ) বাসুদেবং জগদ্বাসমপ্রমেয়মজং বিভূম্  
মিত্র ভৃত্য [ ১ ] র্ত সৎকর্তা স্বকুলশ্চ [ ১ ] থ চন্দ্রমাঃ  
যশ্চ বিস্তংচ প্রাণাশ্চ দেব ব্রাহ্মণ সাগতা [সাংকৃতা]

( ৯ ) মহাকারুণিকঃ সত্যোধর্মার্জিত মহাধনঃ  
সংপুত্রো বর্ষ বুদ্ধেস্ত সংপৌত্রোথ জয়শ্চবৈ  
দুহিতু পুল শূরায়্য সংপুত্রো জয় মিত্রয়া

এই খোদিতলিপি হইতে তিনটি বিষয় জানা যাইতেছে :—

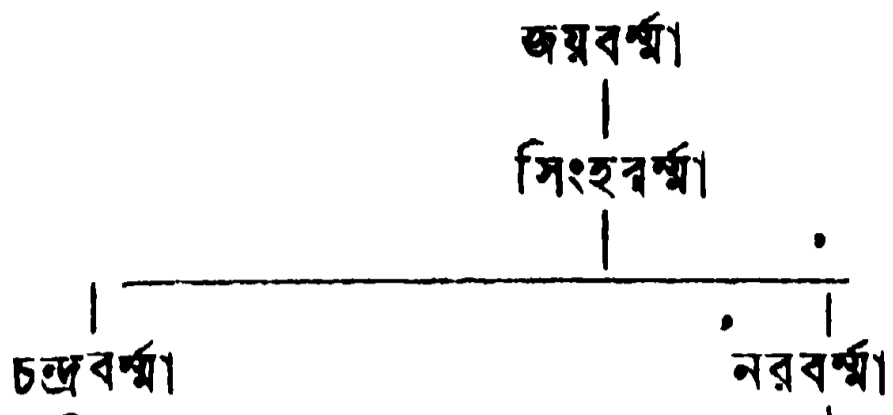
( ১ ) ৪৬১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৪০৪ খৃঃ অব্দে দশপুরে নরবর্ষা নামক একজন রাজা বর্তমান ছিলেন।

( ২ ) তাঁহার পিতার নাম সিংহ বর্ষা ও পিতামহের নাম জয় বর্ষা।

( ৩ ) গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা মালবাধিপতি বজ্রবর্ষা, নর বর্ষার বংশসম্ভূত।

এতদ্ব্যতীত গুণিনিয়ার খোদিতলিপি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে চন্দ্র বর্ষার পিতার নাম সিংহবর্ষা এবং তিনি পুষ্করণা দেশের অধিপতি ছিলেন, অতএব ইহা প্রায় নিশ্চিত যে চন্দ্রবর্ষা মালবরাজ সিংহবর্ষার পুত্র।

মালবের বর্ষরাজবংশ



বিষ্ণুবর্ষা [গঙ্গধরের প্রস্তরলিপি মালবান্দ ৪৮০ = ৪২৩ খৃঃ অঃ]

বন্ধুবর্ষা [মন্দশোরের প্রস্তরলিপি, মালবান্দ ৪২৩ = ৪৩৭ খৃঃ অঃ]

চন্দ্রবর্ষার কাল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়-কালে চন্দ্রবর্ষাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অশোকের এলাহাবাদ স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাতে আৰ্য্যাবর্ত রাজ-গণের মধ্যে চন্দ্রবর্ষার নাম দেখিতে পাওয়া যায়-- রুদ্র-দেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ষ গণপতিনাগ নাগসেনাচ্যুত নন্দিবলবর্ষাণেনকার্য্যাবর্তরাজপ্রসভোদ্ধরমৈন্ধৃস্তপ্রভাবমহতঃ (২১শ পঙ্ক্তি)।

দিল্লিতে বিখ্যাত মসজিদ কুতব-উল-ইসলামের প্রাঙ্গণে একটি লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে, ইহাতে প্রাচীন অক্ষরে চন্দ্র নামক একজন রাজার বিজয়কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় :—

(১) চন্দ্র বিষ্ণুপদ পর্বতে এই লৌহনির্মিত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) তিনি সমবেত বঙ্গবাসীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এবং

(৩) সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহিসকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

অন্য উপায় না দেখিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ, জে, পি, ভোগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছিলেন যে “চন্দ্র” ও গুপ্তবংশীয় সম্রাট “দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত” একই ব্যক্তি। শুশুনিয়া ও মন্দশোরের নবাবিষ্কৃত খোদিত লিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে “চন্দ্র” ও “দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত” এক ব্যক্তি নহেন। কারণ—

(১) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপির অক্ষর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপিসমূহের অক্ষর অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

(২) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপির অক্ষর ও শুশুনিয়ার খোদিতলিপির অক্ষর একই প্রকারের।

(৩) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপিতে বঙ্গবিজয়ের উল্লেখ আছে এবং রাঢ়ে (পশ্চিম বঙ্গে) চন্দ্রবর্ষার দ্বিতীয় খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব “চন্দ্র” ও “চন্দ্রবর্ষা” একই ব্যক্তি।

(৪) চন্দ্রবর্ষার পিতার নাম সিংহ বর্ষা, সুতরাং তাঁহার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়ারী নামক পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সকল মতগুলিই গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে শুশুনিয়া ও মন্দশোরের খোদিতলিপি হইতে কয়েকটি নূতন কথা জানা যাইতেছে—

(১) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে চন্দ্র বর্ষা আৰ্য্যাবর্ত বিজয় করিয়াছিলেন।

(২) সেই সময়ে—গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা মহারাজ যটৌৎকচগুপ্ত চন্দ্রবর্ষার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

(৩) বঙ্গবাসীগণ সমবেত হইয়া চন্দ্রবর্ষাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মালবের ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নূতন তথ্য কয়টি আবিষ্কৃত হইয়াছে—

(১) জয়বর্ষা, সিংহবর্ষা ও চন্দ্রবর্ষা স্বাধীন রাজা ছিলেন।

(২) সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ষাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নর বর্ষাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩) নর বর্ষা ও বিষ্ণুবর্ষা গুপ্তসাম্রাজ্যের করদ রাজা ছিলেন।

(৪) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার জে, এফ্., ফ্লিট্ বলিয়াছেন যে বন্ধুবর্ষা কুমার গুপ্তের সময়ে দশপুরে রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন (under him the Governor at Dasapura was Bandhuvarman, the son of Visvavarman—Fleets' Corpus incriptionum



Indicarum, Vol III, page 80)। ইহা সত্য নহে।  
নরবর্ষা ও বিশ্ববর্ষার ঞায় বহুবর্ষাও করদ নৃপতি  
ছিলেন :—

তস্তাশ্চজঃ সৈর্য্যানয়োগপপয়ো বহুপ্রিয়ো বহুরিব প্রজানাং  
বংধ্বার্জিহর্তা নৃপ বহুবর্ষা ঘিড দৃশু পক্ষ রূপগৈকদক্ষঃ ॥

মন্দশোরের প্রস্তরলিপি ১৪ ১৫শ পংক্তি।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ছোট ও বড় ❀

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎ-  
পর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার  
মধ্যে মানুষ ক্রমকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ  
আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া বাপার বলে  
মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালবাসা আশা  
আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের  
অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ  
নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে  
আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ  
আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই  
নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল  
কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উদ্যম প্রকাশ পায় সে  
যে একটা অদ্ভূত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল  
জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত  
মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা  
জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-  
পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে  
আর সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্ত উদাসীন তার  
নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি  
রচনা করে পড়ে আছে; তবু সমস্ত মস্ততা, অহঙ্কার এবং  
জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায়  
নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে আমার  
সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়।

• আদি ব্রাহ্মসমাজে বাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

সেই জন্তে আমরা যাকে দেখলুম না, যাকে প্রত্যক্ষ  
প্রমাণ করলুম না, যাকে সংসার-বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের  
দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে যুধ তুলে যারা বলেন,  
তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ, প্রেয়োহন্ত্রিয়াৎ  
সর্কশ্বাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিস্ত হতেও প্রিয়,  
অন্ত সব-কিছু হতেই প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের  
জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ  
পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এই জন্তে যখন আমরা  
তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীন প্রেমে  
জীবনের প্রতি-যত্নকে মধুময় করে বিকশিত করচেন,  
যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে  
প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলায় হার করে  
তুলুচেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে' আমরা বলুম এইবার  
মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ বিভাগের  
মাঝখানে এইটি ঘটবে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা  
দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অন্তরের বিশ্বাস,  
এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েছে, বারবার  
দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের  
সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত,  
কিন্তু এ যে মর্শ্বের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল  
থেকে এ যে অনির্কচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই ত ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে  
এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের  
কঠিনতায় তার অন্তরের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে,  
ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সঙ্গীত  
বেজে উঠত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠে।  
শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিশ্বিত  
হয়ে দেখেছে সেই যত্নহীন বীজ আবার নূতন তেজে  
অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন  
আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিশ্বর-  
আগাছ কাটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের  
সমস্ত জায়গাটি ঘন করে' জুড়ে বসে, আমাদের চলবার  
পথটি রোধ করে' দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের

বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খররোদের দিনই শুভদিন—তখন অবিধানে আপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে, সে মরবে তখন যখন আমরা মরব; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মীর খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃত-লোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত বেজে উঠে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করছে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটা চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করছে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সদৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই ত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে; সেই দিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই দিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরা ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই জন্মেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি? আজ কি অল্প সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্মজাল বুনে

বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরম কল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত উর্ধ্বমুখ হয়ে উঠেছে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্শ্বনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয় ত আসেনি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি;—কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষটি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অগ্নমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা এ ত আমাদের কারো একলার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসঙ্গীত উঠবে সে ত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যার নাম ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে, আমরা সেই সকল-মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি—কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্মে—যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেছি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্” আমরা সেই মহান পুরুষকে জেনেছি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্মেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আঁরামে আছি তাই আনন্দ করছি তা নয়। ঘরে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়েই বলেছে, “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ”—আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্স্বরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। মানুষের

তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে, মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে এবং রুদ্ধ যন্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্ধ, গোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা ত সহজ দেখা নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গোরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে, তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সাম্মিলন।

কিন্তু বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সন্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি—অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্ধেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্তন হতে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাইত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করিনে, তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত; কিন্তু যে সূর্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে, ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্তে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে' পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে' এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে' অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেছে,

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাং,  
আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি 'অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্শ্বরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হল না—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত কোনো কথা বলা চলে না। "সীমা" শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—'ভাইত তাঁকে ওঁ বলে' ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে—সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিষটি যেমন-কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি-মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি-মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না। মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে "হাঁ"।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায়—সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্থলিত হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গত্যাত সত্ত্বও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানি; নিরন্তর সমস্ত চলে যাওয়ায় পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা ধণ্ড ধণ্ড করে দেখি; কখনো আজ, কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায়, কখনো অল্প ঘটনায়, তাঁর সন্ধানে আমরা বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সন্ধানে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন

বোধের উদয় হয়েছে, তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানার কুল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে; যে ক'টি গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল অনাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন কি মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবদ্ধির দেখাগুলিকে স্ননির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানেন—কিন্তু সমস্ত খণ্ড জ্ঞানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অমৃত্যু অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ, কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যঁারা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম ঠাঁকাটিকে একান্ত অমৃত্যু করেছেন, তাঁরাই বলেছেন, এষান্ত পরমাগতিঃ, এষান্ত পরমাসম্পৎ, এসোহস্ত পরমোলোকঃ, এসোহস্ত পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ;—তিনি একদিকে যেমন গতি, আর একদিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার মিরপেক্ষ,—তেমনি

অনন্তব্রহ্মের প্রকাশও ত আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করেছেন। যখন তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করছেন তখন তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাং তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা ত আমারই, বনের শ্রামল শোভা ত আমারই, কুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে, ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে সে সঙ্গীত কার জন্মে? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধূরা, এই ত ঘরে বাহিরে যাদের ভালবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্কচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর আল্পনা-গাঁকা বরণ-বেদীটির উপরে, আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে, সেই সত্যজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাক্ষণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালবাসতে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমরাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুম্বকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে

তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না ; মা যে অন্ন মহন্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালিনি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজের রচনা করেছে তাতেই তাঁর পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আৱন্তি করে পড়ছিল ; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেছে, তার থেকে তুমি কি বুঝলে ? সে বললে, সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে, যে, কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, “সুশীতল” শব্দের জায়গায় “সুস্নিগ্ধ” শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি ; এইজন্তে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি, তুমি কখনো কি দেখেছ ? সে বললে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি, যে-নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোল-বিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী।

ভেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয়

না, যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্তে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর, ভরে, পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি ? এই যে এষঃ, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠেছে ; এই যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠেছে, বেদনায় পাষণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তরক রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যাশিক্ষাময়ী কণা মাঝে মাঝে আকাশে ঝলকে ঝলকে উঠেছে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়-কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তশিবমদৈতং, সেই কবিশ্রমণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে-এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করছেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরি-ব্যাপ্ত সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, যার সঙ্গে স্তম্ভযোগে আমাদের বুদ্ধি স্তম্ভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতা মাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিন্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না ? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্তে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি ; তখন টুকুরো কেবলি হাজার টুকুরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর

স্বতন্ত্র চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছ্বল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও মিষ্টর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীকু রমণীর মত পীড়ন-বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়; খামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্ছে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সেই দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়; সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক—সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার নেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে' আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জগ্নে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে যেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতেই পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায়, যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোট করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের গুহতা।

অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড়, এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে যাচ্ছেন। এইজগ্নে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রহিমোচন করছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই

তার যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জানে প্রেমে কণ্ঠে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে, তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি—যখনি এ কথা সত্য হয়েছে, তখনি এ কথাও সত্য—অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজগ্নে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-একদিকে অণু আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-একদিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজগ্নেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমনি সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে

ছেড়ে দিয়েছে তখন নিলজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মানুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সঙ্কলিত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার খলি লুকিয়ে রাখে, তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুককে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে—এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব পিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মুঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে' কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উঞ্চলকি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মানুষের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদসাধন নয়, মানুষের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে এই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা, অল্প দিকে তপস্চার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলি রসে মজে থাকতে হবে না, জানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে, তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-একদিকে বলেছে স তপোহতপ্যত, তিনি তপস্চার দ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন। এ দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্চার দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন।

একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, “আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে!” সে আরো গেয়েছিল “আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?” তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাঞ্চে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সেই কথাটা বোঝে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠেছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিক্রমণ করে গড়েছেন, স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই ত মানুষকে তৈরি করে তুলছেন, সেই জন্মে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কাঁকে অনুভব করছে। সেই জন্মেই ঐ বাউলের দলই বলেছে—“খাঁচার মধ্যে অচিন্ত পাখী কমনে আসে যায়!” আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্রমে ক্রমে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্মে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,

আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট রূপে আন্দোলিত, যা বিরাত হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অণু জগতের অণু জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সঙ্ঘর্ষে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ভুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যা গুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে, “আমার মনের মানুষ কে রে, আমি কোথায় পাব তারে?” সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থগ্নরকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বন্ধ হবে না। “কোথায় পাব তারে?” কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে, কোনো বিশেষ অস্থানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে কর্তেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমন করেই ত আপনার মনের মানুষের সন্ধান করচে—এমন করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠচে; যতই তাকে পাচ্ছে, ততই বলচে, “আমি কোথায় পাব তারে?” সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের দাবীখানেই এই যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না; জানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে পৌঁছেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে-

দিকেই মানুষ বলেছে আমি চিরকালের মত পৌঁচেছি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে সেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বৃক্ষন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেই-খানেই সে কেবল বৃক্ষনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে! এই যে তার চিরকালের গান, “আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে?” এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন—“মনের মানুষ যেখানে, বল কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?” কেননা সন্ধান এবং পেতে থাকা একসঙ্গে; যখন সন্ধানের অবসান তখন উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে “পিতা নোহসি” তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সঙ্ঘর্ষ—কেনো অনন্তত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল। এতে কি কোনো অপরাধ হল? এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল? কিছুমাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূণ্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি—মানুষের সকল সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে—মানুষের সকল সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-একভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে, আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জগেই আমার ঘর, সেই জগেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, সেই জগেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে “পিতা নোহসি” তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই



বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবল মাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না—যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফললাভ করতে চাই, অন্য় করে' তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্ত ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্বলতাকে লালন করবার জন্তে তাঁকে পিতা বলা নয়। সেই জন্তেই বলা হয়েছে পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বোধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে, সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে, পিতা,—সে ডাক সমস্ত অন্য়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তুহস্ত, পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়, সমাজের কাজে, দেশের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুইধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্তকালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে নমস্কার, তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## পঞ্চশস্য

শান্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা (British Review):—

অগতে যুদ্ধবিগ্রহ মানুষকে দানব করে। এইজন্য আধুনিক সভ্যজগতের জনহিতৈষী, মনীষীগণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বারা মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার ফলে বহুদিন হইতেই (১৮৯৯, ২০শে জুলাই) ওলন্দাজ শহর হেগ নগরে এক সার্বজাতিক শান্তিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় সেই সমিতির বৈঠক হয় এবং তাহার নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিবদমান জাতির অভিযোগের কারণ বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ ও নির্দেশ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে সেই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। বিগত কয়েক বৎসরে এই হেগ শহরে শান্তি-সমিতির সালিসীতে বহু আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসিত ও শান্তি সংস্থাপিত হইয়া সন্ধিস্ত স্বীকৃত হইয়াছে।



শান্তির মন্দির।

ওলন্দাজ জাতি এককালে অগতের অগ্রণী জাতি ছিল; তাহার এককালে ইংলও বিজয় করিয়াছিল, ভারতের একাংশ ও বহির্ভারতের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিল, বাণিজ্যসম্পর্কে সমস্ত পরিজ্ঞাত দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইয়াছিল। অথচ এই দেশ অতি ক্ষুদ্র; দেশ সমুদ্রের জলতলের অপেক্ষাও নীচু বলিয়া বাধ দিয়া সমুদ্রের কবল হইতে দেশটুকু কোনো রকমে কাড়িয়া লইয়া তাহার পৃথিবীপৃষ্ঠে টিকিয়া আছে। কিন্তু এই জাতি শিলায় স্বাধীনতার শিল্পে বাণিজ্যে অগতের সকল শ্রেষ্ঠ জাতির সমকক্ষতা করিয়া আসিতেছে। এই জাতিও নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী আক্রমণে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া বড় হীনবল ও নষ্টবাণিন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার জাতি সত্তর তাহাদের নষ্ট সামর্থ্য পুনর্বার অর্জন করিয়া লইয়াছে।

ওলন্দাজেরাই আন্তর্জাতিক বিধিনিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তাহাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নগরে আন্তর্জাতিক শান্তিসমিতি প্রতিষ্ঠা

ইয়াকেই হইয়াছিল। এক্ষণে ওলন্দাজেরা তাহাদের নষ্টস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে হেগু নগরে স্বাধীনতার স্মৃতিসৌধরূপে এক শাস্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

স্বচ-আমেরিক্যান বদাণ্ড ধনবৃবের এণ্ড, কার্নেগী ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের হাতে, ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করিয়া শাস্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অহুরোধ করেন। এই সংকল্পের পোষকতা স্বরূপ ওলন্দাজ গভর্নমেন্টও ৯ লক্ষ টাকা দিয়া একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া শাস্তিমন্দিরকে দান করেন।

এই মন্দিরভিত্তিতে খোদা হইয়াছে এই কথাগুলি—Paci Justitia Firmadae Hanc Aedem Andreae Carnegii Munificentia Dedicavit, অর্থাৎ এই মন্দির এণ্ড, কার্নেগীর বদাণ্ডতায় স্মারসঙ্গত শাস্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হইল। মন্দিরটি করালী স্থপতি কর্দনীরে কর্তৃক ওলন্দাজ ও ফ্রেমিশ সৌধসংগঠন-নীতিতে গঠিত হইয়াছে। এই মন্দিরটি ২১৬ খানি নগ্নার ভিতর হইতে, গ্রেট ব্রিটেন, হলান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি ছয়জন শ্রেষ্ঠ কারিগর কর্তৃক নির্মাণিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে দুটি স্তম্ভ আছে—একটি বড়, একটি ছোট, এবং উহাদের পাশে পাশে বিচারকক্ষ। বড় স্তম্ভটি ৭০ ফুট লম্বা, ৪০ ফুট চৌড়া, ৩৩ ফুট উচ্চ; তাহার একদিকে তিনটি প্রকাণ্ড জানালা, অপরদিকে তিন খাক গ্যালারী, অপর একদিকে আর একটি বড় জানালা এবং তাহার বিপরীত দিকে বিচারকদের বেদীপাঠ। ছোট স্তম্ভটি বড় কক্ষের অর্ধেক। নমস্ত মেরে গ্রাস ও ইটালী দেশের শুভ মর্ম্মর প্রস্তরে সজ্জিত; ছাদতল ধনুকাকৃতি ও কারুকর্ষ্যে-সুসজ্জিত। এই কক্ষদ্বয়ের পাশে পাশে পাঠাগার, মানচিত্রাগার, মন্ত্রণাগার প্রভৃতি আরো অনেক কক্ষ আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণচত্বর ১৪৪ ফুট লম্বা ও ১১১ ফুট চৌড়া; তাহার মধ্যস্থলে ফোয়ারা ও নিখাস গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্ত বায়ুশোধনের যন্ত্রাদি আছে। সেখান হইতে প্রকাণ্ড ও বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী উপরতলে উঠিয়াছে। উপরতলে স্থায়ী শাস্তিসমিতির আফিস, দু লক্ষ পুস্তক ধারণক্ষম লাইব্রেরী-ঘর আছে; লাইব্রেরী হইতে নীচের পাঠাগারে বই দিবার জন্ত একটি লিফ্ট আছে। ছাপাখানা, টেলি-গ্রাফ-ও পোস্ট-আফিস, হোটেল, প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত আছে। হোটেলের একত্র থাকিতে বসিয়া বিভিন্ন প্রদেশের শাস্তিদূতদের সম্মেলন পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায় বলিয়া হোটেলটির অত্যন্ত সমাদর।

এই মন্দিরটিকে সার্বজাতিক আকার দিবার জন্ত প্রত্যেক স্বাধীন ও সভ্য জাতি নিজের নিজের দেশের দ্রব্যসামগ্রী দিয়া মন্দির সজ্জিত করিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন রঙিন কাচের বড় জানালা আরটি ও জগতের শাস্তিপ্রতিষ্ঠাতা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মূর্তি উপহার দিয়াছে; ফ্রান্স ও হলান্ড স্বদেশী ওস্তাদ চিত্রকরদের চিত্র ও অগ্ন্যস্ত্র সামগ্রী দিয়াছে; জার্মানী দিয়াছে মন্দিরের প্রবেশ-দোরণগুলি; ইটালি মর্ম্মর প্রস্তর, অষ্ট্রিয়া পিত্তল ও বেলগারী সোণ ও বাতিঘান, নরওয়ে ও সুইডেন প্রবেশপথে পাতিবার জন্ত প্লাইট প্রস্তর, ডেনমার্ক ফোয়ারার পোসিলেন, সুইজারল্যান্ড ঘড়ী, ক্রিয়া ১১ ফুট উচ্চ একটি মণিপাত্র, আমেরিকার যুক্তরাজ্য "আয়ের দ্বারা শাস্তি" সূচক মর্ম্মরমূর্তি, জাপান কিংখাবের পর্দা, ও অন্যান্য দেশ অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী দিয়াছে। এই মন্দির হইতে মৃত জীবন রক্ষা হইবে যে জগতের শ্রেষ্ঠ হাসপাতালেও এত জীবন রক্ষা হয় নাই তা হইবে না।

১৮৯৯ সালে শাস্তিসমিতি প্রতিষ্ঠার বৎসরই যে প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আলোচনার জন্ত সন্মিলন হয় তাহা, ক্রিমিয়ার জারের আহ্বানে। এবং জারের শাস্তিপ্রচেষ্টা জাগ্রত হয় বারনেস ভন সাটনারের "অস্ত্র ত্যাগ কর" নামক একটি গল্প পাঠ করিয়া। সাটনার একমাত্র স্ত্রীলোক যিনি আন্তর্জাতিক শাস্তিসংস্থাপনচেষ্টার জন্ত নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং তিনি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের লিখিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শাস্তি-বিষয়ক রচনা লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রত্যেক ৮ বৎসর অন্তর এক একটি রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার-আলোচনাসন্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সন্মিলনও ক্রিমিয়ার জারের আহ্বানে হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৯১৫ সালে তৃতীয় সন্মিলন হইবে।

এইরূপ আলোচনা দ্বারা সভ্যজাতিদিগের পরস্পর সম্ভাব বর্ধিত হইবে, বিবাদ কলহের কারণ উপস্থিত হইলে সহজে মীমাংসা হইবে, এবং তাহার ফলে যুদ্ধ অনাবশ্যক হইয়া উঠিলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইবে ও যে অর্থে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি মারণোপায় সংগ্রহ করিতে হইতেছে তাহাতে মনুষ্যজীবনের বহু অভাব মোচুন হইতে পারিবে।

### সাহিত্য-সেবিকার প্রণয়পত্র

(Current Opinion, Literary Digest):—

প্রসিদ্ধ স্ত্রী-উপন্যাসিক শার্লৎ ব্রন্টে তাহার শিক্ষক ক্রসেলসের অধ্যাপক হেজারকে মনে মনে ভালো-বাসিতেন বলিয়া সাহিত্যিক মহলে একটা কানামুমা গুনা যাইত। ব্রন্টের "ভিলেৎ" Vilette নামক উপন্যাসের নায়ক পল ইমানুয়েল নাকি তাহার প্রণয়ী অধ্যাপকেরই অমর চিত্র।

সম্প্রতি অধ্যাপক হেজারের পুত্র চারখানি পত্র ব্রিটিশ মিউজিয়মকে উপহার দিয়াছেন; সেগুলি শার্লৎ ব্রন্টে অধ্যাপক হেজারকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলি আবিষ্কার হওয়াতে যুরোপের সাহিত্যিক মণ্ডলীতে একটা খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের সম্পদ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

শার্লৎ ব্রন্টে ফ্রেঞ্চ ভাষা পড়িবার জন্ত ক্রসেলসে গিয়া অধ্যাপক হেজারের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সেই সময় তিনি বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু বৃদ্ধ, শিষ্যের প্রতি কোনো রূপ আসক্তির পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে ভগ্নহৃদয় ব্রন্টে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ অধ্যাপককে পত্রে প্রণয়নিবেদন করিয়াছিলেন। এই পত্রগুলি মানবাত্মার বুকফাটা হৃৎকের করুণ ক্রন্দন। এই চিঠিগুলিতে ব্রন্টের সমগ্র প্রাণের আশা, আশঙ্কা, বেদনা, বাসনা প্রণয়স্পন্দকে নিবেদিত হইয়াছে। চারখানি পত্রই ফরাসী ভাষায় লেখা, কেবল শেষের খানিতে ইংরাজিতে একটু পুনশ্চ আছে।

লণ্ডনের নেশান পত্র বলেন—এমন মহিমাযুক্ত স্বভাবের অধ্যাপককে যে-শিষ্য ভালো-বাসিতে না পারে সে মিস্কোষ মূর্থ। একদিকে এমন মহিমাযুক্ত অধ্যাপক, অপর দিকে শার্লৎ ব্রন্টের তুল্য প্রতিভাশ্রয়ী ছাত্রী, তাহাতে আবার একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রণয়সংস্কার না হইয়া যায় না। ইহা গুরুতর প্রতি শিষ্যের পবিত্র ভক্তির আতিশয্য ছাড়া কল্পিত কিছু নহে। চিঠিগুলিতে এই পবিত্র ভক্তিরই আতিশয্যের পরিচয় আছে, লালসার লেশ নাই। ব্রন্টের নিঃসঙ্গ একক

জীবনের বেদনা তাঁহার মনীষী গুরুর সাহচর্যের জগ্ন উচ্ছ্বসিত হইয়া যদি থাকেই তবে তাহা আভাবিক মানবধর্ম, তাহাতে নিন্দার কিছু নাই। যদি কেহ ইহাকে অর্ধেকশতের প্রলাপ বলিতে চান বনুন, এমন অবস্থায় কে না পাগল হইতে চায় ?

শাল'৬ ব্রহ্মের জীবনীলেখিকা শ্রীমতী বে সিনক্রয়ার বলেন— ব্রহ্মের বন্ধু-বন্ধনের অদ্ভুত প্রতিভা ছিল ; তিনি পরিচিত নরনারী ব্যক্তিকেই ভালো-বাসিতেন। অধ্যাপক হেজারের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহার হইয়াছিল সেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহার কোনো স্ত্রীবন্ধুর সহিত হইলে তাহাকেও তিনি ঐরূপই উচ্ছ্বসিত প্রণয়-পত্র লিখিতেন। তিনি তাঁহার ভগিনী এমিলী ব্রহ্মকে যেমন ভালো-বাসিতেন তেমন উন্নত ভালোবাসা কোনো ভগিনীকে বাসে না।

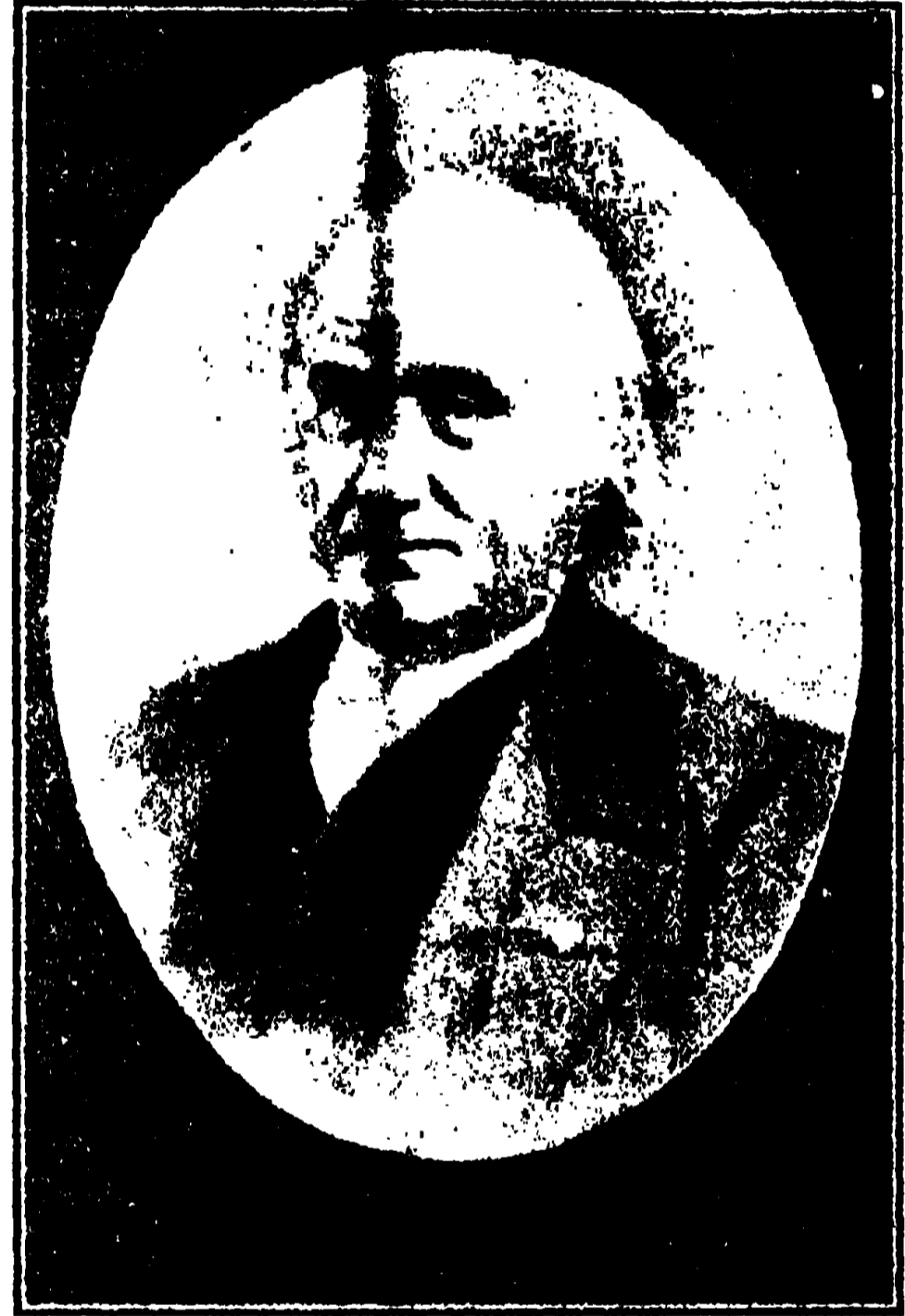
অধ্যাপক হেজার বৃদ্ধ ছিলেন ; তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল। স্ত্রীরাং

প্রায়ই বিনষ্ট হইত। এই জগ্ন বৃদ্ধ চিঠিগুলি রক্ষা করিতে পারিতেন না ; কিন্তু কলহাস্তরিতা বৃদ্ধা গৃহিণীর কৌতূহল সেই ছিন্ন পত্রাংশ আঠা ও কাগজ দিয়া জুড়িয়া, সূতা দিয়া সেলাই করিয়া নতুন কলহের সুযোগ খুঁজিত। ছিন্নপত্রও স্ত্রীর হাতে পড়ে দেখিয়া ব্রহ্মকে অধ্যাপক হেজার তাঁহার পাসিয়োনা বা স্কুলের ঠিকানায় পত্র লিখিতে বারণ করিয়া আন্তেনে রোমাইয়ালের ঠিকানায় লিখিতে অনুরোধ করেন। অধিকন্তু পাঠসমাপ্তির পর যখন ব্রহ্মে ক্রসেল্‌স্‌ ছাড়িয়া ইংলণ্ডের গৃহে ফিরিবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রোধে উন্নতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ও বিবাহিত বলিয়া, যুবতী অনুচর ছাত্রীর প্রতি নিজের অনুরাগ সংযত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মের প্রণয়পত্রগুলির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—



শাল'৬ ব্রহ্মে ।

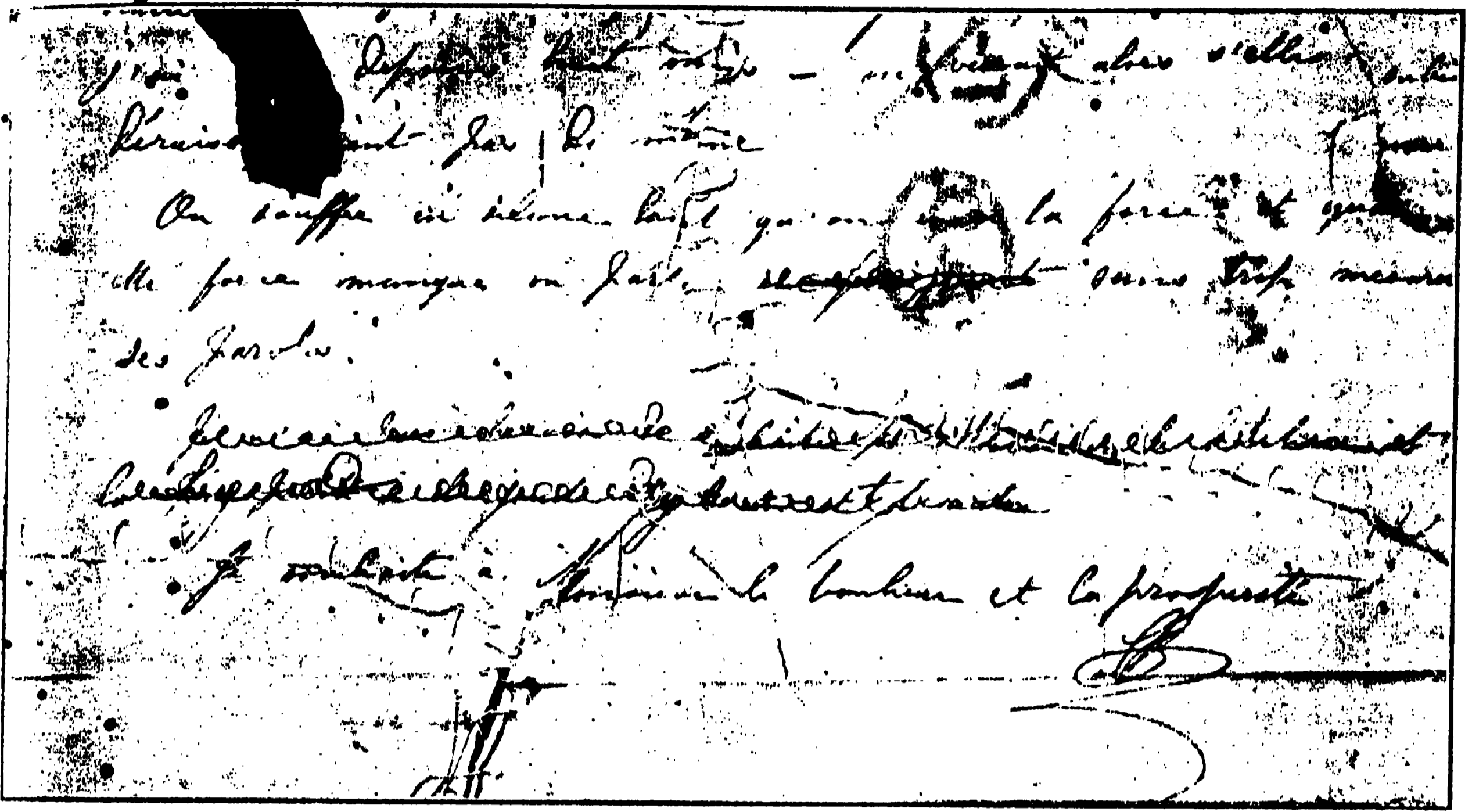


অধ্যাপক হেজার ।

তাঁহার দিকের আসক্তি যুবতী অনুচর ব্রহ্মের স্ত্রায় উচ্ছ্বসিত আবেগময় ছিল না। অনেকে যে বলেন, যে, তিনি ব্রহ্মের প্রণয়-নিবেদনের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, সে কথাও সত্য নয়। যদিও ব্রহ্মের প্রণয়লিপির মার্জিনে অধ্যাপকের হাতের লেখায় জুতার হিসাব টুকা আছে দেখা যায়, যদিও ব্রহ্মের চর-খানি চিঠির উত্তরে হেজার কেবল একবার মাত্র সাধারণ কথায় ছাত্রীকে অভ "উচ্ছ্বসিত" হইতে বারণ করিয়া জবাব দিয়াছিলেন, যদিও ব্রহ্মের চিঠিগুলি তিনি সমস্তে রক্ষা না করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, তথাপি ইহা হইতে ব্রহ্মের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা প্রমাণিত হয় না। অধ্যাপক হেজারের পত্নী শ্রীমতী হেজার, ব্রহ্মের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার প্রতি দীর্ঘাঘিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মকে লইয়া হেজার-দম্পতির পারিবারিক শান্তি

( ১ )

“পূর্বে আমি সমস্ত দিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস লিখিতাম, একেবারে নিফল লেখা নহে, কারণ আমাদের দেশের দুজন শ্রেষ্ঠ লেখক শেলী [ সাউদে ? শেলীর মৃত্যুর সময় ব্রহ্মের বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল ] এবং কোলরিজ আমার লেখা দেখিয়া অস্ব-মোদন করিতেন। এখন আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, আমি আর লিখিতে পারি না। যদি লিখি তবে অন্ধ হইয়া বাইব। এই ক্ষীণদৃষ্টি আমার বিষম বাধা হইয়াছে। নতুবা গুরুদেব, জানেন কি আমি কি করিতাম ?—আমি একখানি বই লিখিয়া আমার সাহিত্যের বন্দুদাতা, আমার একমাত্র গুরুর চরণে উৎসর্গ করিতাম।—সে গুরু আপনি। আমি পরকীয় করাশী ভাবায় অনেক-বার আপনাকে জানাইয়াছি আপনাকে আমি রুতখানি প্রদা



শাল'৬ বস্তুর প্রণয়-লিপি।

( এই ছবিতে দ্বিতীয় পত্রের শেষাংশ দেখা যাইতেছে )

করি—আমি আপনার সদাশয় উপদেশের কাছে কতখানি ঋণী ; সেই কথাটা একবার, আমার নিজের ভাষায় প্রাণ খুলিয়া বলিতে আমার বড় সাধ। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইবার নয়, তাহা চিন্তা করা মিথ্যা। সাহিত্যের স্বর্গদ্বার আমার কাছে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

“আমি ভয়ে আপনাকে চিঠির জবাব দিতে অমুরোধ করিতে পারি না, পাছে আমার নির্দোষে আপনি বিরক্ত হন। কিন্তু আপনি দয়া করিয়া ভুলেন নাই যে আমি মুখ ফুটিয়া না চাহিলেও অন্তরে কিরূপ উৎসুক—বাস্তবিক আপনার চিঠি পাওয়া আমার পরম ও চরম অভিলাষ। যাক; আপনার যেমন অভিরূচি তাহাই করিবেন। যদি আমি বুঝিতে পারি আপনি কেবল দয়া করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তবে আমি বিষম আঘাত পাইব—তেনন দয়ার দানে আমার কাজ নাই।”

( ২ )

“মিসঃ টেলার ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার নামে কোনো চিঠি আছে কি না। না, নাই, কিছু নাই। আমি মনকে প্রবোধ দিলাম,—ধৈর্য্য ধর, উহার ভগিনী শীঘ্রই আসিবেন। মিস টেলার আসিলেন, বলিলেন—ক্রীযুক্ত হেজার ভ্রামাকে ত কিছুই দেন নাই, না চিঠি, না সংবাদ।

ইহার পর আমি মনকে প্রবোধ দিলাম—যে-শান্তি পাওয়া আমার উচিত ছিল না তাহা পাইয়াছ বলিয়া ব্যথিত হইও না, তাহা হয় হোক। আমি অশ্রু রোধ করিতে চেষ্টা করিলাম, উপাত্ত অভিযোগের ভাব দমন করিলাম।

কিন্তু যখন কেহ অভিযোগ করে না, যখন কেহ নিজেকে খেচ্ছাচারী কুরাজার শ্রায় অত্যাচার করিয়া দমন করিতে চায়, তখন মনস্ত চিন্তাবৃত্তি, বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং বাহিরের শাস্ত ভাবের অন্তরে যে বিষম সংগ্রাম চলিতে থাকে তাহা অসহ্য বোধ হয়।

দিবারাত্রি আমার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। তন্মতী আসিলে ভয়ঙ্কর কষ্টকর স্বপ্নে আপনাকেই দেখি—কি কঠিন, কি গস্তীর, কি ক্রুদ্ধ সেই মূর্তি।

অতএব ক্ষমা করিবেন, আবার আপনাকে চিঠি লিখিতেছি। প্রাণের বেদনা ব্যক্ত যদি না করি তবে প্রাণ ধারণ করিব কেমন করিয়া?

আমি জানি এই চিঠি পড়িয়া আপনি বিরক্ত হইবেন। আপনি হয়ত বলিবেন যে আমি উন্মাদ, আমার মন কুচিন্তায় পরিপূর্ণ। যাই বলুন, আমি নিজেকে সকল রকম লাঞ্ছনা তিরস্কারের হাতে সঁপিয়া দিয়াছি, নিজেকে কোনো রকমে সমর্থন করিতে চাই না। আমি এইমাত্র জানি যে আমি আমার গুরুত্ব বন্ধ হারাইতে পারি না, হারাইতে দিব না। আমার অন্তর বেদনায় হিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহার চেয়ে শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট সহনীয়। যদি আমার গুরু আমাকে তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন, আমি আশাশূন্য হইয়া পড়িব; যদি এতটুকু—কেবল এতটুকু—পাই তবেই আমি সন্তুষ্ট—সুখী। তবেই আমি বাঁচিবার, কাজ করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইব।

দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা অতি ক্ষুদ্র, তাহার অভাব সাধারণ—ধনীর প্রসাদ যাহা ছড়াইয়া পড়ে তাহা খুঁটিয়াই তাহার বাঁচিতে পারে। তাহাও যদি না পায় তবে দারুণ ক্ষুধা তাহাদিগকে সংহার করে। আমিও যাহাদের ভালোবাসি তাহাদের ভালোবাসা খুব বেশী চাই না। আমি খুঁজিয়া পাই না একটা পরিপূর্ণ অর্থও প্রণয় লইয়া আমি কি করিব—আমি তাহা কখনো পাইও নাই। কিন্তু আপনি আপনার হাতীর প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমি সেই একটুই ধরিয়া থাকিতে চাই, সেই একটুই আমার জীবন।

আপনি হয়ত বলিবেন—কুমারী শাল'৬, তুমি তা আমার কেহ

নও, তোমার মতো কত ছাত্রী আসে যায়, আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার প্রতি আমার এতটুকু মমতা নাই।

ভালো, তাই স্পষ্ট করিয়া বলুন। ইহা বড় বাজিবে। তাহাতে কি? ইহা অনিশ্চিতের চেয়ে অল্প ভয়ানক।

এ চিঠি আমি পড়িতে পারিব না। যেমন লিখিয়া গেলাম, তেমনি পাঠাইতেছি। আমার অন্তর চুপি চুপি বলিতেছে, কেহ কেহ বলিবে, মেয়েটা আবোল-তাবোল বকিয়াছে। তাহাদিগকে আমি অভিসম্পাত আর কি দিব, এই আট খাস ধরিয়া যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি তাহারা মাত্র-একদিন সেই যন্ত্রণা ভোগ করুক। তখন দেখা যাইবে সেই-সব বিজ্ঞ লোকেও আবোল-তাবোল বকেন কি না।

যতদিন শক্তিতে কুলায় ততদিন নীরবে সহ করা চলে; যখন শক্তি টুটে তখন বেদনার ভাষা ওজন করিয়া বলা চলে না। আপনার সুখসমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।”

( ৩ )

“গ্রীষ্ম শরৎ বড় দীর্ঘ লাগিয়াছে; সত্য কথা বলিতে কি, যে-আত্মত্যাগ ব্রত করিয়াছি তাহা বহন করিতে বিশেষ কষ্ট ও বেগ পাইতে হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, আমি আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। না খুঁজিয়াছি এমন উপায় নাই; আমি কর্ণের আশ্রয় খাটিয়াছি; এমন কি এমিলীর সঙ্গেও আপনার প্রসঙ্গ আলাপ-করার আনন্দ বর্জন করিয়াছি; তথাপি আমার বেদনা ও অধৈর্য্য দমন করিতে পারি নাই। এ বড় লজ্জার কথা—নিজের চিন্তাকে বশ করিতে না পারা; শোকের, স্মৃতির, একটা কোনো প্রবল ভাবের দাস হওয়া। আমার প্রতি আপনার যেমন অহুরাগ আমারও কেন ততটুকু হয় না, না বেশী না কম? আপনার শেষ চিঠিখানি আমার ছমাস ধরিয়া অবলম্বন ও আশ্রয় হইয়া আছে। আর উহাতে চলে না, আর-একখানি চাই, আপনাকে দিতে হইবে, আমার প্রতি বন্ধুত্বের বা স্নেহের খাতিরে নয়, সেও আপনার থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আপনি সদাশয়, নিজের কয়েক মুহূর্তের অহুর্বিধার জন্ত একজনকে দীর্ঘ যন্ত্রণায় নিম্পেষিত হইতে দেওয়া আপনি সহ করিবেন না বলিয়া। আমার পত্র-লেখা বারণ করিলে, উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে, আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ কাড়িয়া লওয়া হইবে—এই আমার শেষ অধিকার আমি সহজে ছেঁচায় ত্যাগ করিতে পারিব না। হে আমার গুরু, বিশ্বাস করুন, আমাকে পত্র লিখিলে আপনার পুণ্যকর্ম করা হইবে। যতদিন জানিব আপনি আমার উপর প্রীত আছেন, যতদিন আপনার সংবাদ পাইবার আশা থাকিবে, আমি নিশ্চিত থাকিব, বেশী দুঃখ বোধ করিব না। কিন্তু যখনই দীর্ঘ নীরবতার অঙ্ককার আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার গুরুর সহিত বিচ্ছেদের বিভীষিকা দেখাইতে থাকে—যখন দিনের পর দিন পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিয়া বার বার দারুণ নিরাশার দুঃখ অভিজুত করিয়া ফেলে—এবং আপনার মধুর লিপির উপদেশবাহী আশা স্বপ্নের জায় মিথ্যা হইয়া মিলাইয়া যায়, তখন আমার জ্বর আসে—আমার আহার নিজা দূরে যায়—আমি দিনের দিন শুষ্ক শীর্ণ বিবর্ণ হইতে থাকি।”

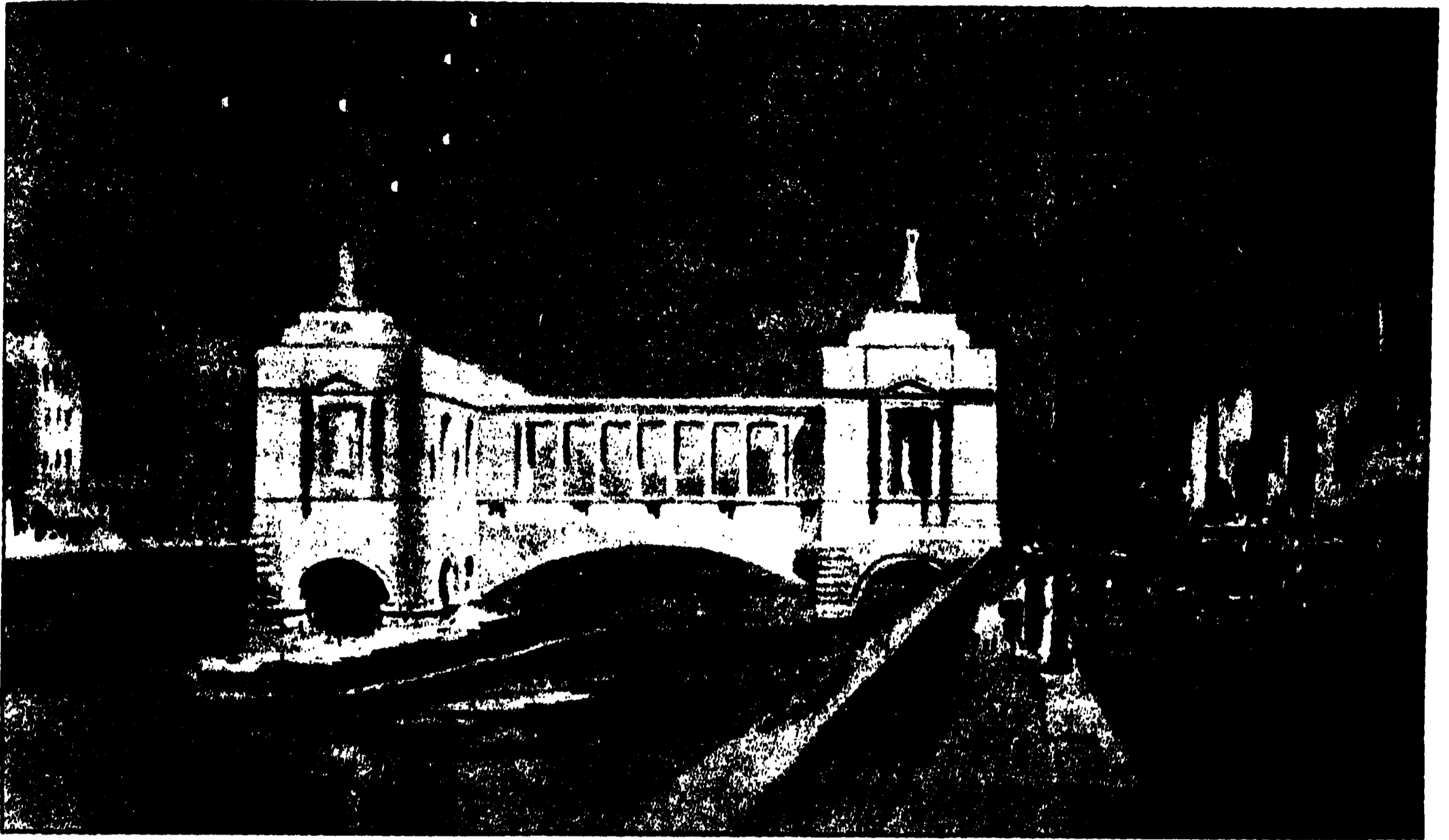
### আদর্শ সংবাদপত্র (Economist) :—

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় ব্যবসায় খাতিরে সংবাদপত্র পরিচালিত হয়; সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী বুকে শুধু টাকা; সংবাদপত্র কেমন ভাবে চলিতেছে, দেশের কিছু উপকার করিতেছে কিনা,

সে বিষয়ে লক্ষ্য করা তাহার কার্যসমায় বহির্ভূত মনে করে, কিন্তু সংবাদপত্রের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের সেবা, দেশবাসীকে সত্যের ও মঙ্গলের সন্ধান নির্দেশ করিয়া দেওয়া। সুপের বিষয় এরকম ধরণের সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক দুই চার জনও দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক বাহারা উচ্চদের সম্পাদক তাহারা স্বত্বাধিকারীর মুখ চাহিয়া, স্বত্বাধিকারীর টাকার খলির পেট কতখানি স্ফীত হইতেছে না-হইতেছে বিচার করিয়া দেশের জনসাধারণের স্বীকৃত মতামত অনুসারে পত্র-সম্পাদন করেন না; যাহা তাহার নিজের সত্য বলিয়া, মঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস, তদনুসারেই চলিয়া থাকেন। স্বত্বাধিকারীরা প্রায়ই নিষ্ঠা অপেক্ষা টকা, খ্যাতি ও সম্মান অপেক্ষা ঘৃণ্য অশ্লীল বিজ্ঞাপন অধিক পছন্দ করে, তাহাদের চাকর বলিয়া সম্পাদকদিগকেও পেটের দায়ে তাহাতেই মায় দিয়া চলিতে হয়। যতদিন কাগজখানার কাটাতি থাকে ততদিন সম্পাদক মহাশয় হয়ত নিজের সত্যসঙ্কল্প প্রকাশ করিতেও বা পারেন, কিন্তু যখন গ্রাহক-সংখ্যা ঘটাত হয়, তখন তিনি স্বত্বাধিকারীর মুখ চাহিতে বাধ্য হন, তখন ধর্মবুদ্ধি ও স্বার্থ—সোজা কথায় আত্মসম্মান ও রুজি—দুইয়ের মধ্যে কাহাকে ধারিয়া থাকিবেন তাহা সমস্তা হইয়া উঠে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সম্পাদকই অধিকাংশ গণ-নায়কদের মতো,—কারে পড়িলে তাহারা “ছেড়ে দেন পথটা আর বদলে যায় মতটা।” তাহারা ছুকুল বাচাইয়া মাঝ পথ ধরিয়া সম্ভরণে দড়ির-নাচ নাচিতে থাকেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে গণসাধারণ সততা সরলতা এবং তেঁজকে সম্মানের চক্ষে দেখে; অতএব সম্পাদকের নিষ্ঠীক স্বাধীনতা কৃশ্মন কালেও ক্ষতিকর হয় না। যদি তিনি স্বত্বাধিকারীর শ্রদ্ধা না পান, তিনি পাঠকদের শ্রদ্ধা পাইবেন নিশ্চয়। স্বচ্ছ স্বাধীন চিন্তা ও স্পষ্ট লেখা পাঠককে মুগ্ধ করিয়া আকৃষ্ট করেই। নিজের দলের ও সরকারের মুখ চাহিয়া রাষ্ট্রনৈতিকদের নিজের মত প্রকাশ করিতে হয়; মঙ্গলের স্বার্থ দেখিয়া উকিলদের সমস্ত বুদ্ধি চালিত করিতে হয়, কিন্তু পত্রিকাসম্পাদকের কাহারো তোয়াক্কা রাখার আবশ্যক দেখা যায় না। পত্রিকাসম্পাদক ত আর এ-দল ও-দলের লোক নন, তিনি সমগ্র দেশের প্রতিনিধি, কাজেই সত্যের মুখ চাহিয়া মঙ্গলের পথে চলা ছাড়া তাহার নাশ: পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। যদি তিনি পূর্বাগ্ন-সম্রত মত অনুসারে সত্যনিষ্ঠ ভাবে ঘটনা ও মতের সমালোচনা করিয়া চলিতে পারেন তবে তাহার পক্ষে লোকের অভাব কখনো হইবে না। নীচ ঈর্ষার-ঘৃণ্য অশ্লীল ছাবলামীর ক্ষণিক বাহাদুরীর উপর অপ্রমত্ত হিরণী যে জরী হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শহরের-দেখাদেখি মফস্বলের কাগজগুলোও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শহরের ও মফস্বলের কাগজের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়া উচিত; মফস্বলের কাগজ স্থানীয় ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকে ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে প্রচারে বাধা হইবার কোন ভয় নাই; স্থানীয় সংবাদ ও অভাব অভিযোগ, কর্তৃপ্রচেষ্টা ও অসুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সুসঙ্গত ও সুসংযত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলে তাহা নিঃসম্পর্কীয় লোককেও আকৃষ্ট করিবে।

আজকাল সংবাদপত্র-স্বত্বাধিকারীরা নিজেদের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্ত কি ছুশ্চেষ্টাই না করিতেছেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে কাগজের লেখার গুণপনাই তাহার সকলতার প্রধান কারণ ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন। বিলাতের অনেক কাগজ ধবল অপেক্ষা তাহাদের সুলিখিত সুচিন্তিত নিরপেক্ষ বক্তব্যের জন্ত বেশী সমাদৃত ও বিক্রীত হয়। ধবলের-কাগজের সকলতার আর একটি উপায়



সেতু-শিক্ষাগার।

হইতেছে ভালো লোক দেখিয়া পরিচালক নিযুক্ত করা; সকল ক্ষেত্রেই সম্ভার তিন অবস্থা ধরা কথা।

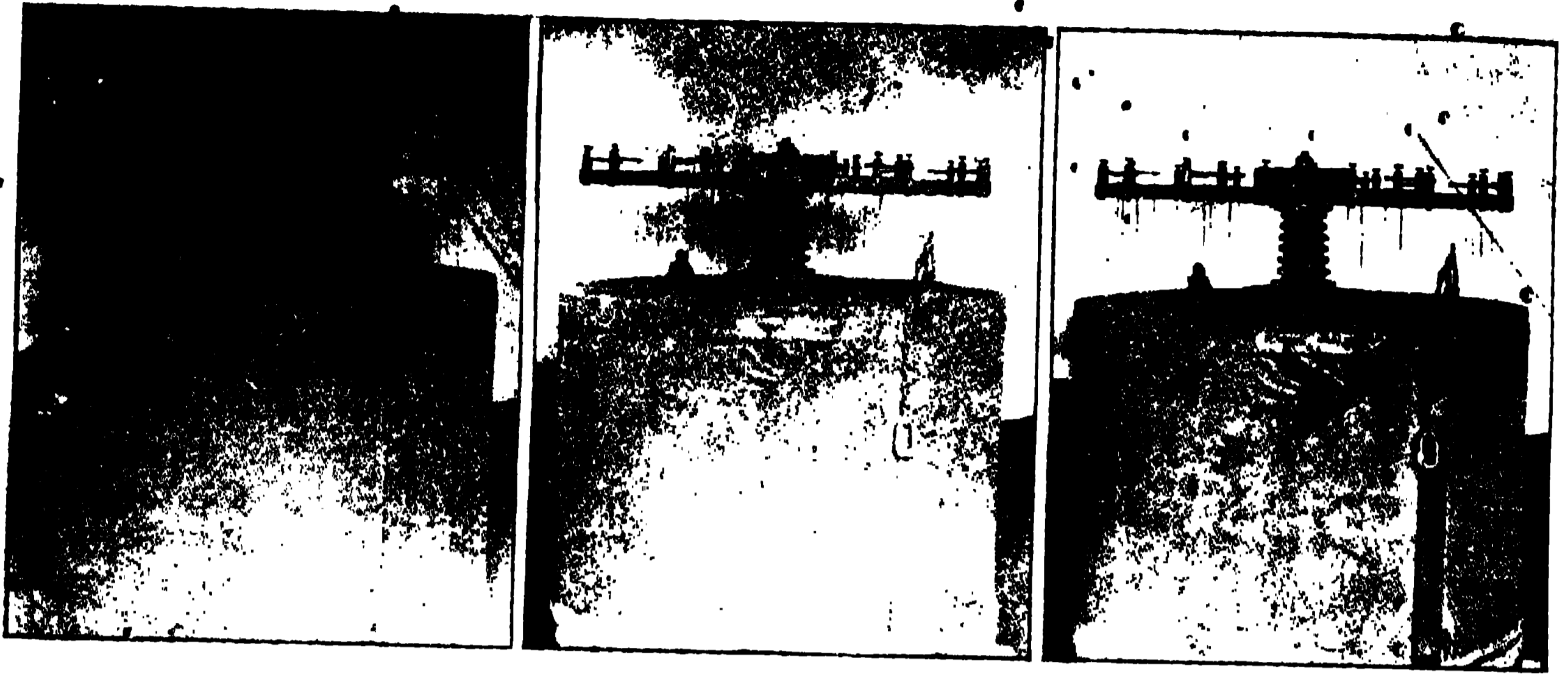
বিলাতের সংবাদপত্রগুলিকে সত্যের সারথী করিবার জন্য যেরূপ অসম্ভব উদ্যম ও অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহাতে কালে উহার একটি মহাশক্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

ভবিষ্যতের সংবাদপত্র হয়ত এইরূপ হইবে—উহার চাউস আকার ভঙ্গ রকমে ছোট করিয়া আনা হইবে অথচ লেখা অল্প হইবে না; ভাষা, সেলাই, ছাপা সুন্দর হইবে, সুদৃশ্য রঙিন ছবি থাকিবে। দ্রুত বিলি করিবার ব্যবস্থা হইবে; দূরে বিলি করিবার জন্য আকাশ-তরী, মোটর গাড়ী, তাড়িৎ ট্রেন নিযুক্ত হইবে। তখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবানাত্রি কাগজ বাহির হইবে; অ-তার টেলিফোনে খবর আসিবে, রিপোর্টারদের পকেটে পকেটে টেলিফোনের যন্ত্র থাকিবে। লোকেরা বায়স্কোপ, থিয়েটার, বা নাচগানের মজলিসে গিয়া বায়োস্কোপে সংবাদের ঘটনা দেখিবে, গ্রামফোনে কথা শুনিবে। তখনকার বাবু-লোকদের, কষ্ট করিয়া সংবাদ পড়িতে হইবে না; কলের জল বা গ্যাস তাড়িতের আলোর মতন চাবি ঘুরাইলেই তাঁহার ঘরে কানের কাছে বিশ্বের সংবাদ কথায় ব্যক্ত হইতে থাকিবে।

এমন কালের কারখানা হইলেও তখনও সেইসব লোকের কদর কমিবে না যাহারা তুচ্ছ টাকার লোভে নিজদের শক্তিসামর্থ্য বুদ্ধিচিন্তা লইয়া বেপ্যাবৃত্তি করিয়া বেড়ায় না, যাহারা দায়িত্ব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি ষা-তা লিখিয়া কাগজ ভরাইতে পারিলেই কর্তব্য হইতে খালাস মনে করে না। এবং তখন জনসাধারণও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া বেকি আবর্জনা পাইয়া ভুলিবে না, তাহার দাম দিয়া পূর্য্য কাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

আর্ট শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা (Sphere):—

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে লিফে নদীর উপর একটি সেতু-গৃহসংলগ্ন শিক্ষাশালা নির্মাণের জন্য একজন কলারসিক, সার হিউ লেন, তাঁহার জীবনব্যাপী সঞ্চয়—অর্থ ও শিক্ষাসামগ্রী—দান করিয়াছেন। লিফে নদীর উপরকার কদম্বা কুদৃশ্য লোহার পুলের বদলে সুদৃশ্যগৃহসংযুক্ত সেতু নির্মিত হইবে; এবং সেই গৃহে বিচিত্র সুন্দর শিক্ষাসামগ্রী রক্ষিত হইবে। তাহাতে পথিকজন সেতু অতিক্রম করিতে করিতে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়া পথশ্রম লাঘব করিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত এডুইন লুটিয়েল এই সেতু-শিক্ষাগৃহের নক্সা করিয়াছেন। অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে আয়ারল্যান্ডের এই স্বদেশী প্রচেষ্টার উদ্বোধনের দিনে ইংরেজকে সেতু প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু লুটিয়েল খাঁটি ইংরেজ নহেন, তিনি ইংলণ্ডের অধিবাসী হইলেও তিনি ওলন্দাজ জাতীয় এবং তাঁহার মাতা আইরিশ; অধিকন্তু শিক্ষাশালায় বিদেশী শিক্ষা চিত্র প্রভৃতিও যখন স্থান পাইবে তখন স্বদেশী আপত্তি খাটিতেছে না। একশত বৎসরের মধ্যে ডাবলিন শহরে কোনো বিশিষ্ট ইमारত প্রস্তুত হয় নাই; তাই ম্যুনিসিপালিটিও দাতার সহিত একযোগে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই শিক্ষা-সেতু গঠন করিতে মনস্থ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। এনি করিয়াই ক্রমে ক্রমে দেশ সুন্দর ও সম্পন্ন হইয়া উঠে। আমাদের দেশের নিঃসন্তানেরা সম্পত্তি দেশকে না দিয়া একজন নিঃসম্পর্কীয় পোষাপুত্রকে দেন; ইহা অপেক্ষা ভুল কিছু হইতে পারে না। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ যে মহদৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহা আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে। বিশেষতঃ পালিত মহাশয় নিঃসন্তান নহেন; এই জন্য তাঁহার দানের বাহান্না আরো অধিক।



১ম অবস্থা।

২য় অবস্থা।  
ধূম-প্রতিকার।

৩য় অবস্থা।

### ধোঁয়ার উৎপাতের প্রতিকার (Scientific American Supplement):—

বড় বড় শহরগুলো আজকাল কলকারখানার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে ; কলকারখানা চলে আগুনের জ্বারে ; এজন্ত কতশত মণ কয়লা প্রত্যহ পুড়াইতে হয় ; তাহার ফল হয় ধোঁয়া, ধোঁয়ার ফলে নগরবাসীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ঘর ঘর ভূষা লাগিয়া ময়লা হয়, কাপড়চোপড় কালিকৃষ্টি হ'ল ; লণ্ডন নগরের ধূমকুক্ষ মুক্তি প্রসিদ্ধ, তাহার নামই Black London অর্থাৎ কালো লণ্ডন। শীতকালে কলিকাতাতেও ধোঁয়ার উৎপাত কম নয় ; নাকের ভিতরে, হাতে মুখে, কাপড়-চোপড়ে, বাড়ী ঘরে কালির ভূষা জমিয়া সমস্ত কৃষ্ণী কুৎসিত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। শীতকালের বাতাস গ্রীষ্মকালের বাতাস অপেক্ষা হিমে ভারী হইয়া থাকে বলিয়া ধোঁয়া উপরে উড়িয়া যাইতে পারে না, নীচেই কুণ্ডলী পাকাইয়া পথ ঘাট জুড়িয়া অন্ধকার জমাইয়া লোককে 'আলায়'। কিছুদিন পূর্বে লর্ড কার্জন বড় লাটের আমলে ইংলণ্ড হইতে একজন ধূমপ্রতিকার-উপায়ের বিশেষজ্ঞ (Expert) দরিদ্র ভারতবাসীর ট্যাক্সের টাকায় জেব ভরিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া গেল, কিন্তু ধোঁয়ার উৎপাত (smoke nuisance) যেমনকার তেমনি রহিয়া গেল। এখনো মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যাল বৈঠকে ধোঁয়া প্রতিকারের আলোচনা শুনা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। কলিকাতার ধোঁয়া বিনা প্রতিবাদে একাধিপত্য করিতেছে। লণ্ডন প্রভৃতি পাশ্চাত্য নগরগুলিতে ধোঁয়া শুধু বাহিরেই উপদ্রব করে ; কিন্তু আমরা আতিথের জাতি, আমরা পরম আত্মীয় ভাবে সকলকেই একেবারে ঘরে ডাকিয়া বসাই—ধোঁয়া আবর্জনা সব কিছুই আমাদের সহিত ঘর ভাগ করিয়া লইয়া বাস করে। যতই অসুবিধা হোক আমরা শক্রকেও একবার ঘরে দখল করিয়া বসিতে দেখিলে আর তাড়াইতে পারিও না, চাহিও না। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজিতে যাইতে হইবে না। আমরা সকলেই বেশ জানি ধোঁয়া আমাদের ঘরের মর্ধ্যও কম আধিপত্য করে না ; রান্নাঘর হইতে ধোঁয়ার নির্গমনের জন্ত যে, চিমনি প্রভৃতি সুডঙ্গপথ রাখা অত্যাবশ্যক তাহা আমরা মানি না, আমরা বাড়ীর

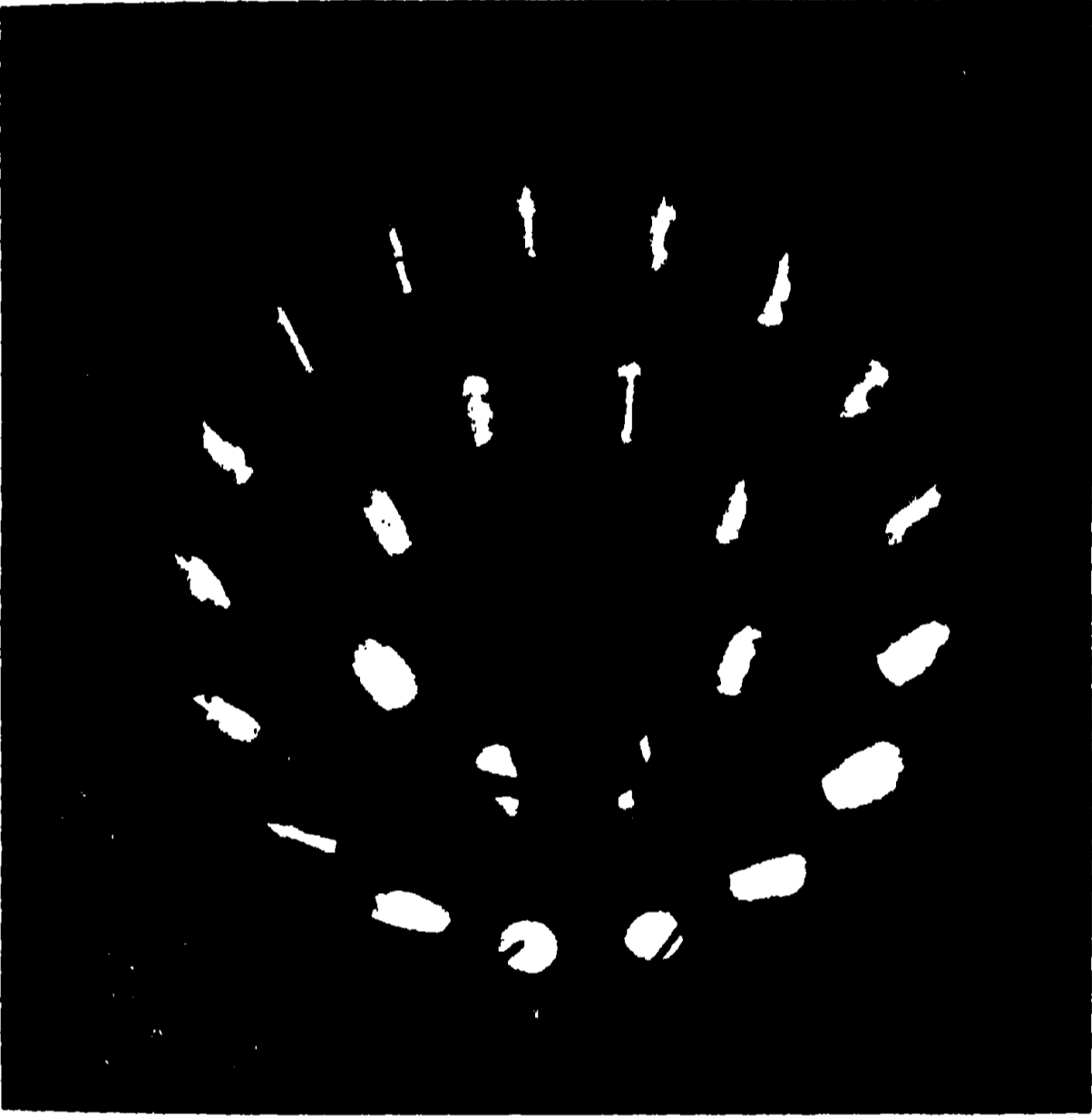
ধোঁয়া বাহির করিব এমন লক্ষ্মীছাড়া আমরা কখনো নহি ; আমরা ধোঁয়া লইয়াই ঘর করি, কতক নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে বোঝাই করিয়া যক্ষ্মা ক্ষয় রোগের আসন প্রতিষ্ঠা করি, কতক চোখে লাগাইয়া চোখের জলে নাকের জলে হইয়া দৃষ্টি ক্ষীণ করি, এবং কাপড়চোপড় ময়লা হইলেও ধোঁবার খরচ কুলাইবার সামর্থ্য না থাকাতে ময়লা কাপড়েই বাবু সাজিয়া বেড়াই।

লর্ড কার্জনের আনীত ধূমবিশেষজ্ঞ যে কোনো প্রতিকার করিতে পারে নাই তাহা সে বেচারার তত দোষ নয় ; কধারণ কলকারখানা শহর হইতে দূর করা ছাড়া ধূমপ্রতিকারের অন্য উপায় তখনো সফলতার মুখ দেখে নাই। সম্প্রতি তাড়িৎ-প্রয়োগ দ্বারা ধূম-প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

তাড়িৎ-প্রয়োগে ধূমপ্রতিকারের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই হইতেছিল কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। এই প্রণালীর মূল তত্ত্ব হইতেছে এই—ধূম ভূষা-কণিকার সমষ্টি বই ত আর কিছু নয় ; প্রত্যেক ভূষা-কণিকাকে তাড়িৎ-যুক্ত করিলে বিচ্ছিন্ন কণিকাগুলি আ-সিক্ত হইয়া মোদক-গুটিকার মতো দলা পাকাইয়া যায় ; তখন ভারী হইয়া সেগুলি নীচে ঝরিয়া পড়ে, বাতাসে আর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। ষ্ট্রং নামক একজন আমেরিকান বলিতেছেন যে, এই উপায়ের মূলতত্ত্বটি ঠিক ; কিন্তু যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত যথোপযুক্ত আকারের না হওয়াতে ঐতদিন সম্যক ফললাভ হইতেছিল না। তিনি তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত (electrodes) অঙ্গুরীয়াকার করিয়া ধূমপ্রতিকারে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্বে সূক্ষ্ম বা ধারালো তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত ব্যবহৃত হইত ; তাহাতে সূচীমুখ বা ধারের চারিদিকে সমানভাবে তাড়িৎ বিকিরিত হইত না ; সেইজন্ত তাড়িৎ-প্রয়োগে ধাক্কা খাইয়া ধূমের ভূষা-কণাগুলি তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্তের সেই স্থানেই সরিয়া থাকিত যেখানে তাড়িৎ-বিকিরণ ক্ষীণ অথবা একেবারেই নাই। কিন্তু ষ্ট্রং অঙ্গুরীয়াকার তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত ব্যবহার করিয়া সর্বত্র সমান সুসমঞ্জসভাবে তাড়িৎ-প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন ; তাহাতে ভূষাকণাগুলি আর পরিত্রাণের পথ পায় না। ষণ্মাত্রক প্রাপ্তই ধূম-প্রতিকারে বিশেষ দক্ষ। ৩৭০ ওয়াটস্ সেল্-সংযুক্ত ব্যাটারী এক মিনিটে ৮০০ হইতে ১০০০

খনফুট প্রগাঢ়তম ধূম বা ধূলি পরিষ্কার করিতে সক্ষম। তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত হইতে ৪ ফুটের মধ্যে ধূম থাকিলেই হইল।

সংলগ্ন চিত্রের ১ম ছবিতে ৪ ফুট উচ্চ ও ৩ ফুট ব্যাসের একটি চিমনি হইতে যখন কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইতেছে, এক মিনিটে ১০০ খনফুট ধূম ক্রমাগত উঠিতেছে। ২য় ছবিতে চিমনি-সংলগ্ন অঙ্গুরীয়-তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রাপ্ত হইতে মাত্র এক সেকেন্ডে তাড়িৎ-প্রয়োগের পর ধূমনিরাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ছবিতে কিছুক্ষণ তাড়িৎ-প্রয়োগের পর দেখা যাইতেছে যে চিমনির মুখ দিয়া ধূম মোটেই নির্গত হইতেছে না, অথচ চিমনির অভ্যন্তরে ধূম যথেষ্টই উঠিতেছে। তাড়িৎ-স্পৃষ্ট ভূবার দলাগুলি চিমনির ভিতরে একটা পাত্রে গিয়া পড়িতে থাকে, এবং চিমনির মুখ হইতে কেবল মাত্র সুপরিষ্কৃত গ্যাস নির্গত হয়। ৪র্থ ছবিতে অঙ্গুরীয়-প্রাপ্ত হইতে রাত্রিকালে তাড়িৎ-বিকিরণের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।



ধূম-প্রতিকারের যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ।

এখন আশা হইতেছে এই উপায়ে নগরগুলি সত্তর ধূলিধূমের উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। অধিকন্তু এই উপায়ে যে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাতে নগরের বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা হইতে অনেক দেরী লাগিবে, কারণ ব্যবস্থার ভার আমাদের নিজেদের হাতে নাই, এবং যাহাদের হাতে আছে তাহারা ধৈর্যের উপদ্রবে বিব্রত নন। সেজগ্ন নিশ্চেষ্ট আমরাই দোষী—আমরা কেবল “ধূঁয়ার ছলনা করি কাদি।”

রুশীয় ঔপন্যাসিক ডমেট্রিয়েভস্কী (Times, London):

ডমেট্রিয়েভস্কীর নভেলের পাত্রপাত্রীগুলি আমাদের চেনা-শোনা লোকদের মতো কথাবার্তা বলে না বলিয়া নভেলগুলি আমাদের কাছে একটু উদ্ভট রকমের লাগিতে পারে। কিন্তু তবু যে আমরা মুগ্ধ হইয়া সেগুলি পড়ি নূতন কিছু পাই বলিয়া নহে; যেমন একটা গল্প কি কথা কি দৃশ্য কোনো এক বহুবিম্বিত ব্যক্তির বা স্থানের

স্বৃতি আমাদের মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরে, তেমনি ডমেট্রিয়েভস্কীর নভেলগুলি আমাদেরই ভোলা-আম্বিকের স্মরণ করাইয়া নূতন করিয়া ফিরাইয়া আনে।

ডমেট্রিয়েভস্কীর নভেলের উদ্ভট বিশেষত্ব তাহার রচনার ঐশ্বর্য-লীতে। সাধারণ নভেলের রচনার সফলতা নিফলতা তাহার প্লটের উপর নির্ভর করে; নায়কের একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য থাকে, সেই কর্তব্য নির্বাহের উপর সমস্ত পুস্তকের সফলতা নিফলতার বিচার হয়। এমন কি যে-সমস্ত নভেলে চরিত্র-সৃষ্টিই প্রধান সেখানেও তাহারই সফলতা ও নিফলতা হইতেই প্লটের সফলতা নিফলতা বুঝা যায়। যেমন, নায়ক হয়ত কাহারো প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার সেই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই প্লট গড়িয়া উঠে; অথবা, নায়ক বিবাহিত, তাহার সখদুঃখই সমস্ত প্লটের উপাদান। কিন্তু ডমেট্রিয়েভস্কীর শ্রেষ্ঠতম নভেলগুলিতে (যেমন, The Brothers Karamazov, The Idiot) পাঠকের কৌতূহল ও ত্রুৎসূকা নায়কের সখদুঃখের উপর নির্ভর করে না, কারণ ডমেট্রিয়েভস্কীর কাছে সখদুঃখ মানবজীবনের বাহিরের বস্তু, খোসা মাত্র, ইহার সহিত তাহার সৃষ্ট মানবজীবনের সফলতা-নিফলতার সম্পর্ক নাই। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস যে মানবের আত্মা ও নিসর্গনিয়ম এমন দৃঢ় সৃষ্টি, যে, মানুষের সখদুঃখ আসল মানুষকে টলাইতে পারে না। সকল নভেল-লেখকেই জীবন-সমস্যার একটা সমাধান করিয়া দিতে চাহেন; এবং এই জগুই জোরালো প্লট আমাদের অত ভাল লাগে; কারণ আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে যে-একটি গুণ দুর্বলতা আছে নভেল-লেখকেরা নানাবিধ পরীক্ষা বিচার বিতর্ক ও ফলাফল রচনা করিয়া সেই দুর্বল বিশ্বাসেরই অমুকুল একটা মায়া সৃষ্টি করেন। কিন্তু ডমেট্রিয়েভস্কী সখদুঃখ লইয়া একটা নিশ্চয় সমাধানের মায়া সৃষ্টি করিতে চাহেনও না, সৃষ্টি করেনও না। আত্মার সখদুঃখ-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাহার গভীর বিশ্বাস আছে; তিনি জীবনে গভীর দুঃখ ভোগ করিয়াই দেখিয়াছেন আত্মার শান্তির কাছে বাহিরের সখদুঃখ মিথ্যা মায়া মাত্র। এই স্থানে তাহার সহিত টলষ্টয়ের পার্থক্য; টলষ্টয় এই শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এইজগু টলষ্টয়ের কাছে মানবজীবন মানে বিশ্বাস ও কার্যের দ্বন্দ্ব বলিয়া ধনে হইয়াছিল, এবং এই জগুই তিনি নিজে ও মানবসমাজকে দিয়া অসম্ভব সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সখকেই দ্রব-আদর্শ স্থির করিয়া লইয়া তাহার নিকট অগ্র-সর হইবার চেষ্টায় যে-সমস্ত অর্ধসফলতা ও অর্ধনিফলতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পুস্তকে তাহারই পরিচয় আছে। কিন্তু ডমেট্রিয়েভস্কীর কাছে সখই পরম বস্তু নহে, সাধনার চরম ধন নহে; তাহার নিকট সখের জগু সংগ্রামের কোনো মূল্য ছিল না; সুতরাং সখী বা দুঃখী দেখিয়া তিনি কাহারও আত্মার অবস্থা বিচার করিতেন না। আত্মা তাহার নিকট উপাধি-রহিত, অবস্থার অতীত, এবং কর্মের দ্বারা অসাসক্ত, স্বাধীন। তিনি আত্মাকে নিশ্চিন্ত নিরঞ্জন জ্ঞান করিতেন; কর্ম যাহা তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দেহের লালসার ফল মাত্র। কর্ম দ্বারা আত্মা প্রকাশমান অথবা প্রচ্ছন্ন হয় বলিয়া কর্মের প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়ে। এই জগু তাহার নভেলের উদ্দেশ্য আত্মাকে প্রকাশ করা মাত্র; মানুষের কর্মের সমালোচনা বা মানুষের জগতের সখদুঃখের ইতিহাস নহে। ইহাই তাহার নভেলের বিশেষত্ব। তিনি শরীর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আত্মার পরিচয় দেন না, কিন্তু শরীরাবিষ্ঠিত আত্মার বেদনা ও মিথ্যা প্রকাশ আত্মার কাছেই কেমন হইয়া দেখা দেয় তাহারই সত্য পরিচয় তাহার নভেলে পাওয়া যায়। তাহার



পাত্রপাত্রীরা একসঙ্গে জগৎস্রোতে ভাসিয়া চলে এবং এমন সব কথা বলে যাহার লিখিত পুস্তকের প্লেটের কোনোই সম্পর্ক নাই। তাহারা হাওয়া ধরিয়া ধাওয়া করে, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে, তাহারা লজ্জার ধার ধারে না, তাহাদের ব্যবহার বাস্তব জীবনের পক্ষে অসহ্য ঘৃণ্য। কিন্তু যখন তাহাদের কথা পড়ি আমরা তাহা-দিগকে ঘৃণা করিতে পারি না, বরং তাহাদের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া তাহাদের অন্তরালে আমাদের নিজেদেরই ছবি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। রুঘীয়ান লেখকেরা বড় খোলাখুলি কথা বলে; ডট্টোয়েভস্কী তাহাদের অগ্রগণ্য। ডট্টোয়েভস্কীর পাত্রপাত্রীর খোলাখুলি কথাবার্তা বিস্ময় আনে, কিন্তু অবিশ্বাস আনে না; সেই-সব কথাবার্তার ভিতর দিয়া তাহাদের পরিচয় তাহাদের অজ্ঞাতসারে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। এইজন্য তাঁহার নভেলের প্লেট মনে রাখা হুঙ্কর; মনে রাখিবার চেষ্টা না করাই ভালো; কেবল নরনারীর আত্মার পরিচয় যাহা পাওয়া যায় তাহাই পরম লাভ।

ডট্টোয়েভস্কীর পাত্রপাত্রীগণ বাহিরের পর্যবেক্ষণের ফল নহে, উহারা লেখকেরই নিজের অন্তরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁহার নভেলে মনচরিত্রের প্রাচুর্য দেখা যায়, এবং তাহারা সকলেই লেখকেরই অন্তরের ছবি অর্থাৎ তাহারা মানুষেরই প্রতিনিধি—মানুষে মানুষে পরস্পর অপেক্ষা মিল অনেক বেশী। সেই জন্য তিনি অতি পাষণ্ড পাপীকেও শ্রদ্ধা সম্বন্ধের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন; ডিকেন্সের গায় তিনি উদ্ভট চরিত্র সৃষ্টি করিয়া রঙ্গ করেন নাই, তিনি চরিত্রগুলির সহিত সমবেদনায় কাতর হইয়াছেন, কারণ মানুষের স্বভাব যেমনই পৃথক হোক তাহাদের সকলের আত্মাই সমান, তা সে পুরুষই হোক কি নারীই হোক। এইজন্য ডট্টোয়েভস্কী নারীকে নারী বলিয়া পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন নাই; স্ত্রীপুরুষের যে দেহের প্রভেদ তাহাতে আত্মার প্রভেদ ত সূচিত হয় না। যৌন-সম্পর্কে নরনারীর লীলা তাঁহার নিজের হৃদয়বৃত্তিকে স্পর্শ করে আলোড়িত করে বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাহার ভিতর দিয়া মানুষের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার নিকট নরনারী-সম্পর্কের মূল্য।

বিধোভেনের বধিরতার গায় তাঁহার আত্মা নিরলস ও নিবন্দ হইয়াছিল বলিয়া সে যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অমন গভীর ও আধ্যাত্মিক রসমধুর হইয়াছে। বিধোভেনের সঙ্গীতের সুর শুধু যেমন স্রুতিগ্রাহ্য নয়, শ্রবণাতীত সূক্ষ্ম আর কিছুই অনুভূতি, ডট্টোয়েভস্কীর রচনাও তেমনি পাঠকের হৃদয়বৃত্তির গ্রাহ্য নয়, তাহা জীবনাতীত আত্মার অনুভূতি।

তিনি যোগীদের স্তায় দুঃখের তপস্য়ায় নির্মল নিরলস ঋষিশিল্পী; দুঃখের সাধনাতেই তিনি নিবন্দ নিরহংকার নিঃস্বার্থপর হইয়া তাঁহার মনের—মনের নহে আত্মার—কথা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। যতক্ষণ একজন শিল্পী নরনারী বা বস্তুসামগ্রীকে আপনায় অহঙ্কার ও লালসা বাসনার সহিত মিলাইয়া দেখে ততক্ষণ তাহারা তাহার হাতে শিল্পের সাধন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। ডট্টোয়েভস্কী আপনাকে ভুলিয়া সমস্তকে দেখিতে পারিয়াছিলেন; এমন আর কোনো শিল্পী পারিয়াছেন কিনা জানি না। ডট্টোয়েভস্কীর মধ্যে প্রাচ্যপ্রদেশের জ্ঞান মুক্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার নায়ক নায়িকা গুচ্ছ বুদ্ধ মুক্ত অনাসক্ত। যুরোপীয় চিত্রে সাধুদিগের মুক্তি যেমন একটা অর্থশূন্য নির্কৃৎসিতার চিত্র জ্যোতিষ্কটা দিয়া ঘিরিয়া চিত্রিত হয় এবং একটা মুঢ় পবিত্রতার হলনা সৃষ্টি করে, ডট্টোয়েভস্কীর সাধুরা পুণ্যকর্মের অস্থগান কাঁদিয়া

নিজদের পরিচয় দিবার জন্য তেমন ভাবে ব্যগ্র হন না। তাঁহাদের যে সাধুতা তাহা আত্মার বিমল বিকাশ মাত্র, অন্তরের জিনিস, তাহা ধ্যানের সামগ্রী, বাহিরের কর্মে প্রকাশ হইবার বস্তু নহে। ইহা প্রাচ্য ধ্যানরসিক মরমিয়াদের আদর্শ। ইহারা নিজদের সাধুতা বা জগতের অসাধুতা সম্বন্ধে তুল্য উদাসীন, তুল্য অনভিজ্ঞ; তাই যাহারা তাঁহাদের সংসর্গে আসে তাহারা তাঁহাদিগকে মনে করে বোকা (Idiot), ক্লেপা, ভণ্ড।

রুঘীয়ার অপর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক গোরকী কিন্তু ডট্টোয়েভস্কীর রচনার নিতান্ত বিরোধী। তিনি মনে করেন ডট্টোয়েভস্কীর উপন্যাস পাঠ ও অভিনয় দর্শন করিয়া লোকের নৈতিক অবনতি ঘটতেছে। ডট্টোয়েভস্কীর বুদ্ধির অলসতা যে আধ্যাত্মিক আবরণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রুঘীয়ার উপর ধর্ম্মানুশাসনের ফল যে নির্জীবতা তাহার ফল; ইহাতে মানুষের মন কর্মবিমুখ স্বপ্নবিলাসী ও দুঃখবাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে মানুষের অন্তরাত্মা ও ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রান্তিতে জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু সকল দেশের স্বধীসম্প্রদায় গোরকীর স্তায় প্রতিভাবান লোকের এই ভ্রান্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন। গোরকী ডট্টোয়েভস্কীর সূক্ষ্ম শিল্পসৌন্দর্য্য একেবারেই ভুল বুঝিয়া বসিয়া আছেন।

চারু।

## ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি

### বৈজ্ঞানিক কারণ

( পূর্বানুভূতি )

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সম্যাস।

সম্যাসই ভারতবর্ষের অধঃপতনের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। আর বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতবর্ষের সম্যাসীসম্প্রদায় সংস্থাপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছিল।

মহুপ্রচলিত সম্যাস সমাজের অপকারক নহে। বরং উহা সমাজের হিতকরই। পঞ্চাশের পর সম্যাস মহুর সাধারণ বিধি ছিল। কচিং কোনও ক্ষেত্রে মহুতে যুবকের সম্যাসী হওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রতিভার যখন অত্যধিক বিকাশ হইয়াছে তখন তাদৃশ ব্যক্তির সম্মান উৎপাদন করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। অতএব সেরূপ লোকের সম্যাসে সমাজের ক্ষতি হইত না। বরং তাহাদের অদ্ভুত কার্যের দ্বারা সমাজের সবিশেষ উন্নতিই হইত।

মানুষ যখন বিবাহ না করিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির

উরণপোষণের জন্ত নিজের সমস্ত শক্তি বা শক্তির অধিকাংশভাগ ব্যয় করিতে বাধ্য না হয়, তখন তাহার কোনও নূতন মত, নূতন কার্য বা ধর্ম সংস্থাপনের প্রচুর সময় ও সুবিধা থাকে। অতএব সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি বিবাহ না করে তবে তাহার কার্যসফল্যের পৌরবী জগতকে বিস্তৃত করিতে পারে। তাহাদের পরার্থপরতা, তাহাদের কার্যকুশলতা সকলকে প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতিকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সন্ন্যাসীর বংশ থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের যে নিদারুণ অপকার করিয়াছে তাহার কে হিসাব রাখিবে? উহার উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া আমরা উহার অপরাধের কথা ভুলিয়া যাই।

যেমন কৃপণ পিতার বহুকালের সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি তাহার অমিতব্যয়ী পুত্র কর্তৃক মহোদ্যমে ব্যয়িত হইয়া উজ্জ্বল আড়ম্বরের পরিচয় দিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষ হয়, তেমনি হিন্দুধর্মের সুব্যবস্থার গুণে দেশের মধ্যে যে প্রতিভার রাশি জন্মিয়াছিল বৌদ্ধধর্ম তাহাদিগকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া মহৎকার্য্যসমূহ সম্পাদন পূর্বক ভারতের তাৎকালীন ইতিহাসকে এক অভূতপূর্ব শ্রীবিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষ চিরকালই বশীকরণ-বিচার বশ। তাহাকে যখন যেরূপ কার্য্য বা আচরণ ভাল বলিয়া খুব জোরে জোরে প্রেরণা (suggestion) দেওয়া যায় সে সেই রূপই ভাল বলিয়া বুঝে। বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষু-জীবনকেই মানবের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিল ও বুঝাইয়াছিল। তাই দলে দলে সেকালের যুবকগণ ভিক্ষু হইয়া বংশ রক্ষায় বিরত হইত।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বর্ষের পর বর্ষ, ভারতের প্রতিভাশালী যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের বংশে রাজনীতিক, সেনানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হইয়া উত্তরকালে ভারতবর্ষকে পরাক্রান্ত করিতে পারিত তাহারা সকলেই বংশ রক্ষায় বিরত ছিল।

ঐ কয় শতাব্দী ধরিয়া সমাজের যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে নির্বংশ করা হইয়াছে এবং সমাজের যাহারা

অপেক্ষাকৃত কাপুরুষ, স্বার্থপর ও হীন তাহাদেরই বংশ রক্ষা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে দূর হইল; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম দেশ-মধ্যে যে সন্ন্যাসের আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছিল তাহা দূর হইল না। সংসারের অধিকাংশ লোকই নির্বোধ। বাহিরে যাহা দেখা যায় তাহা অপেক্ষা কোনও গূঢ় বিষয় ভাবা তাহাদের কুষ্টিতে লেখে না। অধিকাংশ লোকে ভাবিতেই জানে না। সন্ন্যাসী আসিয়া বলে “আমার স্ত্রী-পুত্র নাই। পরোপকারের জন্তই আমি আত্মত্যাগ করিয়াছি। অতএব তোমরা আমাকে চাঁদা দাও, সম্মান প্রদর্শন কর।” আর অমনি চারিদিক হইতে সন্ন্যাসীর উপর চাঁদা ও সম্মান বর্ষিত হইতে থাকে। একজন গৃহস্থ ঐরূপ করিতে চাহিলে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। লোকে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে না যে, গৃহস্থ লোক ভাল হইতে পারে এবং সন্ন্যাসী মন্দলোকও হইতে পারে। গৃহস্থের স্ত্রীপুত্রের জন্ত সমাজের যে খরচ হইবে, সন্ন্যাসী অসাধু হইলে, তাহার উপপত্তীগণ ও গুপ্ত বিলাসের জন্ত তদপেক্ষাও অধিক খরচ হইতে পারে।

যাহা হউক জনসাধারণের এই নিবুদ্ধিতার জন্ত শঙ্কর হিন্দুধর্মকে স্থাপন করিতে পারিলেও মনুষ্যচলিত সন্ন্যাস-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহাকেও বালকসন্ন্যাসীর দল স্থাপন করিতে হইল। তাই ভারতবর্ষে আজি পর্য্যন্ত দলে দলে যুবকসন্ন্যাসী রহিয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেব একবার সন্ন্যাসের বিপক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য হন। তবে তিনি কয়েকজন সংসারী শিষ্যকে উচ্চপদ দিয়া—মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেও যে সংসার পরিত্যাগ করা প্রয়োজনীয় নহে তাহা প্রচার করেন। ঐ কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক বঙ্গদেশে সন্ন্যাসের প্রাচুর্য্য অধিক হয় নাই। বঙ্গদেশের বর্তমান উন্নতির উহা একটা শ্রেষ্ঠ কারণ।

সন্ন্যাসবাদের ফলে ভারতবর্ষের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজেই আলোচনা করা যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে বিদেশী পদার্পণ

করিতে পারে নাই। ইহাই বোধ হয় আমাদের পূর্বোক্ত কথাগুলির সত্যতার প্রধান প্রমাণ। ভারতের পরবর্তী ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতের সৈনিক, কৃষক ও শিল্পীগণ পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সৈনিক, কৃষক ও শিল্পীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এমন কি এখনও নহে। ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যে ইংরেজ ও মুসলমান উভয়েই বড় বড় সামরিক ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছে। ভারতবর্ষে শুধু অভাব দেখা গিয়াছিল—পর্যাপ্ত-সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তির—রাজনীতিজ্ঞ, সৈন্য-পরিচালক, শাসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতির।

প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সমাজমধ্যে বংশ বিস্তার করিতে বিরত থাকিলে সমাজের কি দারুণ ক্ষতি হয় তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে কতকটা অনুমিত হইতে পারে। মানুষের বংশ ধীরে ধীরে বাড়িলেও পঁচিশবৎসরে উহা সাধারণত দ্বিগুণ হয়। \* ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন বর্ষে মানুষের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—( দশজন লোকের বংশের হিসাব ধরা যাউক )

১ম বৎসরে—	১০ জন
২৫ "	২০
৫০ "	৪০
৭৫ "	৮০
১০০ "	১৬০
১২৫ "	৩২০
১৫০ "	৬৪০
১৭৫ "	১২৮০
২০০ "	২৫৬০
২২৫ "	৫১২০
২৫০ "	১০২৪০
২৭৫ "	২০৪৮০
৩০০ "	৪০৯৬০

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ একজন প্রতিভাবান লোককে সন্ন্যাসী করিলে

\* Darwin's Origin of Species. Chap. III.

Even the slow-breeding man has doubled in twenty-five years.

তাহার বংশে তিনশত বৎসর পরে যে তিন হাজার লোক জন্মিতে পারিত তাহা জন্মিবে না। চৈতন্য রঘুনাথ প্রভৃতির বংশ থাকিলে আজ কয়েক সহস্র প্রতিভাবান ব্যক্তি বঙ্গদেশে বিদ্যমান থাকিত।

যে সময়ে ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বংশ বিস্তার করেন নাই, সেই সময়ে কিন্তু সাধারণ লোকের বংশবিস্তার-কার্য স্বগিত থাকে নাই। আমরা পরে দেখাইব যে নিম্নশ্রেণীর জনগণের বংশবিস্তার উচ্চশ্রেণীর অপেক্ষা প্রায়শঃ অধিক হইয়া থাকে। অতএব সন্ন্যাসের ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমাজ-মধ্যে প্রতিভাশালীর অনুপাত জনসাধারণের অনুপাতের অপেক্ষা অত্যন্ত কম হইয়া উঠে। এইরূপ অনুপাতও সমাজের সমৃদ্ধী ক্ষতিকর। কোন পল্লীতে যদি উৎসাহী উদ্যোগী ও কর্মতৎপর ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় তবে তাহারা নিজেদের উৎসাহের আধিক্য দ্বারা সমাজের জড়ভরতগুলিকেও অনুপ্রাণিত করিয়া অনেক সংকার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কিন্তু যদি এরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা জড়ভরতগণের সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম হয় তবে তাহারা ঠাট্টা আলস্য ও ঔদাসীন্য দ্বারা উহাদিগকেও নিজেদের দলে টানিয়া লয়। এরূপ ঘটনা সকলেরই নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হয়। বলকানযুদ্ধে তুর্কদিগের পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ, তুর্কদিগের সৈন্য অনেক ছিল কিন্তু সৈন্য পরিচালন করিবার উপযুক্ত নেতা পর্যাপ্ত সংখ্যক ছিল না। \*

Monasticism বা সন্ন্যাসবাদ শুধু যে ভারতবর্ষেরই অপকার করিয়াছে এমন নহে। উহা যে-দেশেই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল সেই দেশেরই অপকার করিয়াছে। সেই-সকল দেশের সন্ন্যাসবাদ যখনই বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার পর হইতেই দেশের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস এবিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইতালী ইউরোপীয় সন্ন্যাসবাদের আদিভূমি; সেই সর্বশেষ হইয়াছে; আর সেই উন্নতির পূর্বে জনসাধারণ, ধর্মের রাজা পোপ অপেক্ষা ঐহিকের রাজা-

\* General Von Der Goltz in the *Fornightly Review*, May 1913.

দিগকে অধিকতর খাতির করিতে শিখিয়াছিল। সন্ন্যাসবাদ স্পেন ও পর্তুগালের অবনতির প্রধান কারণ। ঐ-সকল দেশের উন্নতির পূর্বে সন্ন্যাসীদের উপর লোকের ভক্তি কমিয়াছে এবং অনেক দেশ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সন্ন্যাসীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ইংলণ্ড, রোম হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরে বলিয়া সেখানে সন্ন্যাসবাদ অধিক পরাক্রান্ত হইতে পারে নাই। এবং সন্ন্যাসবাদ সেই স্থান হইতেই প্রথম উঠিয়া যায়। উহাই ইংলণ্ডের উন্নতির প্রধান কারণ। অবাধ বংশ-বিস্তারই যে ইংলণ্ডের উন্নতির সর্বপ্রধান কারণ তাহা ঐ দেশের বিপুল কার্য্য দেখিলেই অনুমিত হইবে। ঐ ক্ষুদ্র দেশ যে বর্তমান সময়ের যে-কোনও দেশ অপেক্ষাও অধিকতর-সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহা নিজ দেশের অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়াও আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহুদেশে বহুসংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বাণিক, শাসক, রাজনীতিজ্ঞ, শিক্ষক প্রভৃতি পাঠাইয়া ঐ-সকল দেশের সুশাসন বিধান করিয়াছে।

ফরাসীদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের বহুপূর্বে অনেক পণ্ডিতের লেখনী সন্ন্যাসবাদ বিধ্বস্ত করে। সন্ন্যাসবাদ যখন দেশমধ্যে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল, সন্ন্যাসী হওয়াটাই যখন একটা শ্রেষ্ঠকার্যের মধ্যে গণ্য রহিল না, তখন দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস গ্রহণে বিরত হইল এবং দেশের উন্নতি আরম্ভ হইল।

### সপ্তম অধ্যায়।

#### সভ্যতা ও বিলাস।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে বিলাসের বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রথম প্রথম মানুষের যে-সকল সামগ্রীতে জীবনযাত্রা চলিতে পারিত এখন আর সে-সকলে চলে না। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত আরও অনেক অধিক সংখ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন। কাজেই অল্প আরও অধিক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। অসভ্য অবস্থায় মানুষে যে পরিশ্রমে নিজের জীবনোপায় নির্বাহ

করিয়া নিজ স্ত্রীপুত্রেরও জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সভ্য অবস্থায় অনেক সময় সেই পরিশ্রমে নিজের জীবনোপায়ের সংস্থান করাই দুরূহ। অসভ্য মানুষের সামান্য কুটীর ও সামান্য তৈজসপত্রের ব্যবস্থা হইলেই চলিবে। সভ্য মানুষের ভাল গৃহ, আসবাবপত্র, খাট, টেবিল, চেয়ার, (আরও সভ্য হইলে) পিয়ানো, গ্রামোফোন, পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদির আবশ্যক। ঐ-সকল পাইতে গেলেই পরিশ্রমের প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত অল্প সভ্য অবস্থায় ঐ-সকল দ্রব্যের জন্ত যে পরিশ্রম তাহা আহাৰ্যাদি সংগ্রহের জন্তই ব্যয়িত হইত। কাজেই আরও অধিক সংখ্যক লোকের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা হইত।

আমার মনে হয় ইতিহাস একটা প্রকাণ্ড Reversible equation. রাসায়নিক অনেক ঘটনা দ্বিমুখী হইয়া থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই গ্যাসের মধ্য দিয়া বৈজ্যতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিলে উহা জলে পরিণত হয়। আবার জলের মধ্য দিয়া বৈজ্যতিক শ্রোত প্রেরণ করিলে উহা বিদ্বিষ্ট হইয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও এই প্রকার। কোন জাতির মধ্যে বিবিধ কারণের সংযোগ হইয়া প্রতিভাবানের বংশবিস্তার হইলে সেই জাতির উন্নতি আরম্ভ হয়। উন্নতির প্রধান লক্ষণ ধনবৃদ্ধি হয় সেই জাতি নিজের দেশের পদার্থ সমূহের সম্যক ব্যবহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি করে, কিম্বা অল্প জাতিকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের ধন লুণ্ঠন করে বা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদিগের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের ধনবৃদ্ধি করে, কিম্বা ঐ-সকল উপায়ের সকলগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার ফলে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। ধনবৃদ্ধির ফল দেশে নানাবিধ শিল্পকলার আবির্ভাব অর্থাৎ বিলাসের বৃদ্ধি। বিলাসের বৃদ্ধির ফল সমাজের প্রতিভাশালীগণের বংশবৃদ্ধির হ্রাস ও ক্রমশ সভ্যতার পতন।

বর্তমান সময়ে যে-সকল দেশ সভ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থিত তাহাদিগের মধ্যেও এক্ষণে পতনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ফ্রান্সের বংশবৃদ্ধি স্থগিত রহিয়াছে।

ইংলণ্ড ও জার্মানীর বংশবৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছে। জার্মানীর বংশবৃদ্ধির হ্রাস সর্বাপেক্ষা কম, তথাপি জার্মান গবর্ণমেন্ট শক্তিত হইয়া বংশবৃদ্ধি হ্রাসের কারণানুসন্ধান ও তৎ-প্রতিকারের জ্ঞান কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন।

আর এই বংশবৃদ্ধির হ্রাস দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক। দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সমূহের বংশবৃদ্ধি এই সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে নানাবিধ বিলাস-দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ঐ-সকল দ্রব্য না পাইলে তাহারা নিজেদের এবং নিজেদের স্ত্রী পুত্রাদির জীবিকানির্ভার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বিবেচনা করে। কাজেই তাহারা অনেক স্থলে বিবাহ করে না এবং বিবাহ করিলেও বংশবৃদ্ধি যাহাতে বেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাহারা অলস, উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ভবিষ্যৎবোধহীন তাহারা অবাধে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে সমাজে প্রতিভাশালী ব্যক্তির হার ক্রমাগত কমিতে থাকে, অর্থাৎ ক্রমশঃ একটি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়।\*

সভ্যদেশ সমূহে স্ত্রীলোকদিগকে বর্তমান সময়ে যেরূপ লেখাপড়া শেখান হয় তাহাও দেশের প্রতিভার বংশ-বিস্তারের পক্ষে অনুপযোগী। উহা ব্যক্তির জীবনের পক্ষে যতই ভাল হউক না কেন, জাতির জীবনের পক্ষে

\* "They recommend, as we do, the employment of anticonceptional measures, they do so without any discrimination. They address themselves to the altruistic and intelligent portion of the public and induce the most useful members of society to procreate as little as possible, without recognising that with their system, not only the Chinese and Negroes, but, among European races, the most incapable and immoral classes of the population are those who trouble the least about their maximum number of children. Hence the result they attain is exactly the opposite of what they intend.

Among the North American and New Zealanders with whom neo-malthusianism is very prevalent, the number of births among the intelligent classes is diminishing to an alarming extent, while the Chinese and Negroes multiply exceedingly. In France the practice of neo-malthusianism is chiefly due to reasons of economy. Page 464, The Sexual Question, By August Forel, M.D., Ph.D., LL.D., Former Professor of Psychiatry at and Director of the Insane Asylum in Zurich (Switzerland).

যে সমূহ অকল্যাণকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভা-বানের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই যদি জাতীয় উন্নতির সর্বপ্রধান কারণ হয় তবে স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষিত করা অপেক্ষা তাহাদিগকে অল্পশিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর রাখা সমাজের পক্ষে হিতকর।† খুব বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ রমণীর উচ্চাভিলাষ বর্ধিত হওয়ার ফলে তাহাদের বর পাওয়া শক্ত। একারণ সভ্যদেশ সমূহে তাহাদের অনেককে বহুকাল এবং কাহাকেও চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাছাড়া সন্তান-জনন ও পালনের কাজগুলি একবারেই কবিত্বজনক নহে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিবার সময় প্রসূতির সৌন্দর্য্যহানি হয় ও অনেক শারীরিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারপর ছেলে মানুষ করা—সেও কম গুরুতর ব্যাপার নহে; উহা অতীব Dull অর্থাৎ একঘেয়ে রকমের ব্যাপার। একটি অপোগণ্ড শিশুকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চোখে চোখে রাখিতে হয়। সে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাঁদিয়া উঠে, তাহাকে খাইতে দিতে হইবে। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবার যো নাই, সে কাঁদিয়া উঠিলে তাহার বিছানা বদলাইয়া দিতে হইবে। সময়ে সময়ে বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত গাত্রাদি পরিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। তদ্ব্যতীত তাহার অসুখ আছে, আবদার আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐ ভাবে তাহাকে লইয়া চলিতে হইবে। শিশুপালনে যে কিছু আনন্দ আছে তাহার ভিতর বৈচিত্র্য নাই। শিশু দিনের পর দিন ধরিয়া একই রকম অঙ্গভঙ্গী করিবে, এক আধটি কথা উচ্চারণ করিতে শিখিবে ইত্যাদি। ঐ-সকল হইতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে সন্তান প্রতি-পালনাদি কার্যের পক্ষে সুশিক্ষিতাদিগের অপেক্ষা কম শিক্ষিতাদিগের কতকটা সুবিধা আছে। অধিকাংশ সভ্যদেশেই সুশিক্ষিতা মহিলাগণ নিজেদের সন্তান প্রতিপালনের ভার বেতনভুক্ত অশিক্ষিতা মহিলার উপর

† মানবসমাজে কোন একটা নূতন ব্যাপার ঘটিলেই, তাহাতে প্রথম প্রথম অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তজ্জন্ম সেই জিনিষটাকেই অপরিহার্য্য অনর্থের মূল মনে করা ভুল। স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা জিনিষটা সব দেশেই আধুনিক। অতএব ইতিমধ্যেই উহা সব দেশে একটা সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। লেখক মহাশয়ের মত অনেকে কেবল অনুমান করিয়া কথা বলেন। আমরা কিন্তু বহুসন্তানবতী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা অনেক দেখিয়াছি।—প্রবাসী-সম্পাদক।

দিশা নিশ্চিত হন। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। কাজেই যখন ঐরূপ আদর্শই একটা সমগ্র দেশের আদর্শে পরিণত হয় তখন সেদেশে হয় বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পায় নয় বিবাহ হইলেও সন্তান জন্মিতে দেওয়া হয় না।\*

আর স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া না শিখাইলে ব্যক্তিগত জীবনের যতই অসুবিধা হউক বংশের পক্ষে তত অসুবিধা নাই।† কারণ বাইসমানের মতামুসারে নিজের চেষ্টায় অর্জিত গুণগুলি সন্তানে সংক্রমিত হয় না।

সত্যতা বৃদ্ধির পর সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের বংশবৃদ্ধি হ্রাস হইবার আর একটা কারণ আছে। সত্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধনবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই ধন অসমভাবে সমাজমধ্যে বিভক্ত হয়। ইহার ফলে মনোনয়ন দ্বারা সমাজে প্রতিভার বিকাশের অসুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট পুরুষের সহিত উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া যে-সকল সন্তান হয় তাহাদের উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবনা। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের মিলনের ফল অপকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে প্রথমোক্ত রূপ মিলনের দ্বারাই সমাজের স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ভালরূপে রক্ষিত হইতে পারে। সমাজের কোনও কোনও অবস্থায় প্রতিভাবান স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিবাহবন্ধনে মিলনের বিশেষ সুবিধা হয়, আবার কোনও কোনও অবস্থায় এরূপ মিলনের পক্ষে অনেক অন্তরায় ঘটে। পূর্বোক্ত সময়ে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর এবং শেষোক্ত সময়ে জাতি অধনতির পথে অগ্রসর হয়। সত্যতার প্রাক্কালে সমাজ-মধ্যে অধিক ধনসঞ্চয় হয় না এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অর্থগত পার্থক্য অধিক থাকে না। তখন সমাজে গুণেরই অধিক আদর। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রতিভাবান

\* অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের বাল্যমাতৃ হইয়া না, এবং তাঁহারা অশিক্ষিতাদিগের অপেক্ষা সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বেশী জানেন। এবিধ এবং অগ্ৰাণু কারণে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় নিরক্ষর এবং ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা প্রায় শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা সাত জন কিন্তু ইংলণ্ডের সাড়ে দশ জন বাড়িয়াছে।—সম্পাদক

† লেখক কিন্তু নিজেরই পক্ষে বলিয়াছেন যে সাধারণ নারী অপেক্ষা বুদ্ধিমতীর বংশে বেশী প্রতিভাশালী লোক জন্মে। কিন্তু শিক্ষা ব্যক্তিরকে বুদ্ধির উৎকর্ষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে? —প্রবাসী-সম্পাদক।

ব্যক্তি-সকল তখন সদৃশ প্রতিভাবান ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা বন্ধনে আবদ্ধ হন। এইরূপ সন্নিগনের ফলে প্রত্যেক পরবর্তী বংশের লোক পূর্ববর্তী বংশের লোকদিগের অপেক্ষা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতর হইতে থাকে। কিন্তু দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়; ধন একটা নূতন অবস্থা দেশমধ্যে আনয়ন করে। যে নিরোধ কিংবা দুর্গোতিগ্রস্ত ছেলেটিকে নিজের ক্ষীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতে হইলে আহারাভাবে মারা যাইতে হইত, পরসা থাকিলে তাহারও এক্ষণে খুব সম্বন্ধীয় পাত্রী লাভে অসুবিধা ঘটে না। উৎকৃষ্ট বড় লোকের নানাবিধ দোষাশ্রিত কল্লারও সুপাত্র জুটিবার কোনও বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ বিবাহ যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আইন কিংবা চিকিৎসা বাবসায়ের আপাততঃ মনে হয় যে শুধু প্রতিভারই জয় হয়, অর্থের উহাতে কোনও প্রভাব নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। একটা বড়লোকের ছেলে ও একটা দরিদ্রের ছেলে, শেষোক্তটি প্রতিভায় প্রথমটির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রথমটির অপেক্ষা বড় ডাক্তার বা উকীল হইবে এমন কোনও কারণ নাই। অর্থ থাকিলে ভাল ভাল পুস্তক অনায়াসে পাওয়া যায়, যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায়, ভাল ভাল শিক্ষকেরও সাহায্য পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ভাল হইবার পক্ষে এ-সকল কম সাহায্য করে না। ব্যবসায়-কালেও যাহার পৃষ্ঠপোষণ (Back) করিবার লোক আছে সে সহজে মক্কেল বা রোগী পায়। অধিক সংখ্যক রোগী বা মক্কেলের কাজ করিতে করিতে তাহার চিকিৎসা বা আইনে অধিকার যে বেশী জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এই কৃতকার্যতা সত্ত্বেও সমাজের পক্ষ হইতে দেখিলে দরিদ্রের ছেলেটাই সৎপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধনীর পুত্রটির সহিত যে প্রতিভাশালিনী পাত্রীটির বিবাহ হইয়াছে তাহার সহিত দরিদ্রের ছেলেটির বিবাহ হইলে সমাজ আরও শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর সন্তান পাইত।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## গীতাপাঠ

অতঃপর বাস্তবিক সত্তার সহিত জ্ঞান-প্রেম এবং আনন্দের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যিক বিবেচনায় তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম দৃষ্টব্য।

প্রথম দৃষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক সত্তাই বস্তুসকলের জ্যেষ্ঠের নিদান। “জ্যেষ্ঠ” কিনা জ্ঞানগোচরে প্রকাশ-যোগ্যতা। জ্ঞান-গোচরে যাহা যখন প্রকাশ পায়— তাহার বাস্তবিক সত্তার গুণেই তাহা প্রকাশ পায়। স্বপ্নে আমরা যে-সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি তাহা তো এক-প্রকার কিছুই না; প্রকাশ পায় তবে তাহা কিসের জ্বোরে? সেই মিথ্যা বস্তুগুলার কাল্পনিক সত্তার মূলে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা গূঢ়ভাবে কার্য্য করে অবশ্য, নতুবা আর-কিসের জ্বোরে তাহা প্রকাশ পাইবে? বাস্তবিক সত্তা যদি তলে তলে কার্য্য না করিত, তবে এ তো বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা মুহূর্ত্তকালের জন্ম ও প্রকাশ পাইতে পারিত না। বাস্তবিক সত্তার কার্য্যই হ’চ্ছে বিদ্যমান হওয়া। বিদ্যমানতার অর্থ—জ্ঞান; “বিদ্যমান” কিনা জ্ঞান-গোচরে প্রতীয়মান।

দ্বিতীয় দৃষ্টব্য।

জ্ঞানের অসাক্ষাতেও বাস্তবিক সত্তা বিদ্যমান হইতে পারে না, বাস্তবিক সত্তার অবর্ত্তমানেও জ্ঞান স্মৃতি পাইতে পারে না। জ্ঞান না থাকিলে বাস্তবিক সত্তা নিষ্ফল হয়; বাস্তবিক সত্তা না থাকিলে জ্ঞান নিষ্ফল হয়। বাস্তবিক সত্তা চায় জ্ঞানকে—জ্ঞান চায় বাস্তবিক সত্তাকে—উভয়ের দৌহার প্রতি দৌহার এইরূপ মন্বাস্তিক প্রেম; আর, সেই জন্ম দৌহার সম্মিলন অতিশয় আনন্দের ব্যাপার। খুবই তো তাহা আনন্দের ব্যাপার—কিন্তু তাহা ঘটে কই? সর্বত্রই তো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, চখাচখীর শ্বাস—জ্ঞান রহিয়াছে ভবনদীর ওপারে, সত্তা রহিয়াছে ভবনদীর এপারে, আর, দৌহার মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে সাঁঝারাত্রি অবিরাম! এরূপ

যে হয়—তাহার অবশ্য একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। দাঁত থাকিতে যেমন দাঁতের মর্যাদা জানা যায় না—তেমি মিলনই যদি কেবল একটানা শ্রোতের শ্বাস ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকে তবে মিলনের মর্যাদা লোপ পাইয়া যায়। মিলনও চাই—বিচ্ছেদও চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি যাহা চাই সেইটিই হ’চ্ছে সেরা জিনিষ। বিচ্ছেদ এবং মিলনের মাত্রা তালমান-সঙ্গত হওয়া চাই। বিচ্ছেদ যদি মাত্রা অতিক্রম করিয়া মারাত্মক হইয়া ওঠে, তবে তাহার মতো শোচনীয় বস্তু ত্রিজগতে নাই;— তা’চেয়ে আমি বলি মৃত্যু ভাল! চখাচখীর মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাহা নহে! তাহাদের বিচ্ছেদ মিলনেরই একপ্রকার অনুপান। ডাকাডাকিতেই তাহাদের ভরপুর আনন্দ, এমন কি সেই আনন্দে তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জ্ঞান এবং সত্তার বিচ্ছেদ-মিলনের বিশাল রঙ্গশালা কী চমৎকার! বাস্তবিক সত্তা কোথাও বা তমোগুণের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া মান-ভরে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে; কোথাও বা রজোগুণের নেশার ঘোরে সোণা মনে করিয়া মাটির ঢালা স্তুপাকারে গাদা করিতেছে—সূর্য্যকান্ত মণি মনে করিয়া প্রস্তরখণ্ড মস্তকে ধারণ করিতেছে—আর, আপনার মন হইতে একটা মায়ামূর্ত্তি গড়িয়া দাঁড় করাইয়া সেই অবিদ্যাটাকে বলিতেছে “তুমিই আমার পরম জ্ঞান—আমার মস্তকে পদধূলি প্রদান কর”। আবার—কোথাও বা বাস্তবিক সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে প্রেমপূর্ণ মধুরস্বরে। কিন্তু তা বলিয়া—এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বাস্তবিক সত্তা যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন—কোনো অবস্থাতেই তাহার গভীর অন্তরে জ্ঞানের প্রতি মনের লক্ষ্য এবং প্রাণের টান চুপিচুপি কার্য্য করিতে এক মুহূর্ত্তও বিরত হয় না। দেখিতেও তো পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানের অসাক্ষাতেও বিদ্যমান হইতে পারে না—আনন্দের সঙ্গচ্যুত হইয়াও বর্জিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানই বাস্তবিক সত্তার চক্ষের জ্যোতি—আনন্দই বাস্তবিক সত্তার প্রাণের সঞ্চল। পূর্ব্বতন ঋষিমনীষীদিগের কণ্ঠ হইতে গদগদ স্বরে এই যে

একটি হৃদয়ের মর্শ্গত আকিঞ্চন উদ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল—

“অসতো মা সদ্গময়” “তন্মসো মা জ্যোতির্গময়”

“মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়”—

“অসৎ হইতে আমাকে সতে পৌঁছাইয়া দেও” “অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে পৌঁছাইয়া দেও” “মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে পৌঁছাইয়া দেও” ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা সংকে চায়, তমোগুণের অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানজ্যোতিকে চায়, রজোগুণের বিষজ্বালা আনন্দাগ্রত চায়।

• প্রশ্ন ॥ তুমি বলিতেছ যে, বাস্তবিক সত্তা সংকে চায়। আবার, একটু পূর্বে তুমি বলিয়াছ যে, বাস্তবিক সত্তা সত্ত্বগুণেরই আর এক নাম। এটাও তুমি বলিয়াছ যে, সত্ত্বগুণের প্রধান দুইটি ধর্ম জ্ঞান এবং আনন্দ। ইহাতে ফলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, যে, সত্ত্বগুণ আত্মারই আর এক নাম। তা ছাড়া—বেদান্ত শাস্ত্রে বলে আত্মাই সংস্কৃতির বাচ্য। সং এবং সত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ তবে যে কোন্‌খানটিতে তাহা তো আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর ॥ এটাও আমি পূর্বে বলিয়াছি তোমার স্বরণ থাকিতে পারে যে, কবি এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ—সং এবং সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ। একথা খুবই সত্য যে, কবিত্ব যেমন কবির মর্শ্গত ভাবের আবির্ভাব—সত্ত্বও তেমনি সত্ত্বের মর্শ্গত ভাবের আবির্ভাব; কিন্তু তা' বলিয়া—কবিত্বও কবি নহে, সত্ত্বও সং নহে। কবির হৃদয়ে যখন কবিত্বের চেউ খেলিতে থাকে, তখন তাহা হইতে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু কবির মনোমধ্যে আনন্দের যে এক বাঁধা রোসুর্নাই গোড়া হইতেই বর্তমান রহিয়াছে তাহারই তাহা প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো কিছুই নহে। তেমনি, সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম—জ্ঞান এবং আনন্দ, যাহার কথা এক্ষণে হইতেছে, তাহা সংস্করণ আত্মার চিরন্তন জ্ঞান এবং আনন্দের প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো-কিছুই নহে। বেদান্তশাস্ত্রে অন্তঃকরণের প্রধান দুইটি পীঠস্থানকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ বলা হইয়াছে ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কাহারো অবিদিত নাই,

আর তাঁহাদের মধ্যে এটাও কাহারো অবিদিত নাই যে, বেদান্তদর্শনের মতে ও-দুইটি কোষ আত্মার দুইটি উপাধি বই ও-দুটার কোনোটাই সাক্ষাৎ আত্মা নহে। আনন্দময় কোষ আনন্দময় বই না—কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ; বিজ্ঞানময় কোষ বিজ্ঞানময় বই না—কিন্তু আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। চন্দ্র যেমন সূর্যের গুণেই জ্যোতির্ময়—নিজ গুণে নহে, সত্ত্বগুণ তেমনি আত্মার গুণেই বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—তাহার নিজগুণে নহে। সত্ত্বগুণ যদিচ সাক্ষাৎ আত্মা নহে, কিন্তু তাহা প্রকৃতির আত্মা-ধাঁয়াসা সারাংশ এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রই একবাক্য।

কালিদাস কেমনতর কবি ছিলেন তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে—শকুন্তলা নাটকের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—মেঘদূতের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—কুমারসম্ভবের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—তাহার প্রতি যেমন মনঃসমাধান করা আবশ্যিক হয়, সংস্করণ আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, তেমনি, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের কোন্ কোন্ স্থানে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি কী কী প্রকার তাহার প্রতি মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা আবশ্যিক হয়। কিন্তু এটাও দেখা চাই যে, শকুন্তলা মেঘদূত কুমারসম্ভব প্রভৃতি কালিদাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ-সকলের মধ্যে যেখানে যত সুন্দর সুন্দর কবিত্ব ছড়ানো রহিয়াছে সমস্ত এক জাগ্গায় জড়ো করিলেও তাহা দৃষ্টে কালিদাসের মর্শ্গস্থানীয় কবিত্বরসের উপরের উপরের তরঙ্গলীলার রসগ্রহণই এক-যা-কেবল সম্ভবে, তা বই, তাহার গভীর প্রদেশের অক্ষিসন্ধি তলাইয়া পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক না কেন—এটা সত্য যে, কালিদাসের লেখনী দিয়া সেরা সেরা কবিত্ব যাহা শকুন্তলাদি পুস্তকে বাহির হইয়াছে তাহা কালিদাসের মর্শ্গস্থানীয় কবিত্বরসের বিমল দর্পণ। সেই দর্পণে কালিদাস নিজেও তাঁহার সেই মর্শ্গস্থানীয় অকথিত কবিত্ব যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না তাহার আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, আর, তাঁহার পাঠকবর্গও সেই দর্পণেই সেই তাঁহার অকথিত কবিত্বের যথাসম্ভব আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ আত্মার সেই



রকমের দর্পণ। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, এক আত্মার দুই পৃষ্ঠ; এক পৃষ্ঠ জ্ঞাতা, আর এক পৃষ্ঠ জ্ঞেয়। সত্ত্বগুণের দর্পণে আত্মার দুই পৃষ্ঠই কিছু আর প্রতিবিম্বিত হয় না; প্রতিবিম্বিত হইতে—আত্মার জ্ঞেয় পৃষ্ঠই কেবল প্রতিবিম্বিত হয়—আত্মার জ্ঞাত-পৃষ্ঠ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ২০শ সূত্রে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছেও তাই; তা'র সাক্ষী :—

“দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ” ॥২০॥

ভোজরাজকৃত টীকায় ইহার অর্থ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—

“দ্রষ্টা পুরুষঃ । দৃশ্যমাত্রশ্চেতনামাত্রঃ । স শুদ্ধোহপি—পরিণামিত্বাচ্ছভাবেন সুপ্রতিষ্ঠোহপি—প্রত্যয়ানুপশ্যঃ । প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানানি । তানি স্বাব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি । এতদুক্তং ভবতি—জ্ঞাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধানমাত্রেনৈব পুরুষশ্চ দ্রষ্টৃত্বমিতি ।”

ইহার অর্থ।

“দ্রষ্টা” কিনা পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। “দৃশ্যমাত্র” কিনা চেতনামাত্র। আত্মা পরম পরিপূর্ণ, পরিণামরহিত, এবং স্বপদে স্থির প্রতিষ্ঠ হইলেও প্রত্যয়ের যোগে জ্ঞেয় বস্তুসকল উপলব্ধি করেন। “প্রত্যয়” কিনা বিষয়োপরক্ত জ্ঞান \* । আত্মা স্বস্থান হইতে না নড়িয়া বিষয়োপরক্ত জ্ঞানসকল

\* প্রত্যয় শব্দের মুখ্য অর্থই হ'ছে ঐ—কি না “বিষয়োপরক্ত” জ্ঞান। তবেই হইতেছে যে, প্রত্যয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ হ'ছে—ইংরাজীতে যাহাকে idea বলে। যে-জ্ঞান বস্তুদ্বারা উপরক্ত তাহাকেই বলা যায় বস্তু-প্রত্যয় কি না idea of substance। তেজি কারণ-প্রত্যয়কে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে idea of cause। আত্মপ্রত্যয়কে বলা যাইতে পারে idea of self। যদি বলা যায় যে, “আমরা আত্মপ্রত্যয়দ্বারা আপনা-আপনাকে জানে উপলব্ধি করি” তবে তাহার অবিকল ইংরাজী অনুবাদ হ'ছে “We cognize our individual selves through the idea of self”। শঙ্করাচার্য্যাকৃত বেনাস্ত্রভাষ্যের উপক্রমণিকার গোড়াতেই আছে যে, বিষয়ী ( কিনা আত্মা ) অশ্লশ্চপ্রত্যয়ের ( কি না idea of selfএর ) গোচর ( কিনা বিষয়ীভূত )। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, অশ্লশ্চপ্রত্যয় ( কি না idea of self ) আত্মোপরক্ত জ্ঞান। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলিবা মত্রেই বুদ্ধিতে পারিবেন যে, অশ্লশ্চপ্রত্যয়ের বিষয় আভাস-চৈতন্য, আর, অশ্লশ্চপ্রত্যয়ের জ্ঞাতা কূটস্থ চৈতন্য। \* অর্থাৎ Self as it appears to itself is the phenomenal object of the idea of Self; Self as the knower is the noumenal subject of the idea of Self.

( বা প্রত্যয়সকল ) সাক্ষাৎ সঙ্ক্ষে উপলব্ধি করেন। [ভাব এই যে, আত্মা সাক্ষাৎ সঙ্ক্ষে ঘটপ্রত্যয় ( কিনা idea of ঘট ) উপলব্ধি করেন, আর, ঘটপ্রত্যয়ের দ্বারা দিয়া ( through the idea of ঘট ) দৃশ্যমান ঘট উপলব্ধি করেন ]। কথা হ'ছে এই যে, বুদ্ধি যখন বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তখন সেই বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির ( কিনা প্রত্যয়ের ) সন্নিধানমাত্রেই আত্মার জ্ঞাতত্ব সিদ্ধ হয়। [ ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আত্মা বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিরই—প্রত্যয়েরই—সাক্ষাৎ জ্ঞাতা। ]

আমি তাই রূপকচ্ছলে বলিতেছি যে, আত্মার জ্ঞাত-পৃষ্ঠ ( বৈদান্তিক ভাষায়—কূটস্থ চৈতন্য ) স্বরূপে স্থির; প্রতিষ্ঠ, আর, আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ ( বৈদান্তিক ভাষায়—আভাস চৈতন্য ) সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধির দর্পণে—আত্ম-প্রত্যয়ের দর্পণে—প্রতিবিম্বিত। ( আমি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই রূপকের ভাষা ব্যবহার করিতেছি—সাধ করিয়া তাহা করিতেছি না ইহা বলা বাহুল্য )

প্রশ্ন ॥ একটু পূর্বে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের প্রয়োজনীয়তা সঙ্ক্ষে তুমি যাহা বলিয়াছিলে, আর, তাহার পরে রূপকচ্ছলে আত্মার দুই পৃষ্ঠের কথা এখন এই যাহা বলিলে, এই দুই কথার এটার সঙ্গে ওটা মিলাইয়া দেখিয়া আমার মনে হইতেছে এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ-ব্যাসা প্রকৃতি-রাজ্যে অভিনীত হওয়া যে-কারণে আবশ্যিক—আত্মার জ্ঞাতপৃষ্ঠ-ব্যাসা স্বরূপ-রাজ্যে তাহা অভিনীত হওয়াও সেই কারণে আবশ্যিক। সে কারণ এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মিলনের আনন্দ একটানা স্রোতের ঞ্চায় ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া গিয়া বিষাদেরই আলায় হইয়া ওঠে। আমি তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মার জ্ঞাতপৃষ্ঠ-ব্যাসা স্বরূপ-রাজ্যেও সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা অভিনীত না হয় কেন ?

উত্তর ॥ যদি বলা যায় যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে এমনি ঘোরতর মর্মান্তিক রকমের পার্থক্য যে, কোনো অন্যেই দৌহার সহিত দৌহার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেও নাই—ঘটিতে পারেও না; তবে তাহা বলাও যা,

আর, জ্ঞানও নাই—সত্তাও নাই—কিছুই নাই, তাহা বলাও তা, একই; কেননা, জ্ঞানের অসাক্ষাতে সত্তা বিদ্যমানই হইতে পারে না, আর, পাতঞ্জল-দর্শনে এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তাগর্ভ বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির অসাক্ষাতে জ্ঞানের জাত্বই সিদ্ধ হয় না। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞান-বিরহে সত্তা সত্তাই হয় না—সত্তা-বিরহে জ্ঞান জ্ঞানই হয় না। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে, জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অবশ্য কিছু-না-কিছু যোগ গোড়া হইতেই আছে, তবে সেরূপ একটা শ্লোক-বাক্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। তাহা হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে অগত্যা এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যাহাকে তুমি বলিতেছ “কিছু-না-কিছু যোগ” তাহা কোথা হইতে আসিল? তাহা কি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে—অথবা তাহা ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে? শেষোক্ত কথাটাই যুক্তিসঙ্গত ইহা বলা বাহুল্য। এটা যখন স্থির যে, সত্তা এবং জ্ঞানের ভিতর হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তা এবং জ্ঞান যেখানে একীভূত সেইখান হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, সকলের মূলে সত্তা জ্ঞান এবং উভয়ের মিলন-জনিত আনন্দ তিনই একসঙ্গে একীভূত; আর, সেই যে সকলের মূল তিনি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। পরমাত্মাতে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দ একীভূত ভাবে পরিপূর্ণ মাত্রায় চিরবর্তমান। যিনি সৎস্বরূপ তিনিই চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি চিৎস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি আনন্দস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। গীতাশাস্ত্রে আছে যে, পঞ্চভূত মুন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার অপরা প্রকৃতি, তা ছাড়া, জীবভূতা আর এক প্রকৃতি আছে, তাহা আমার পরা প্রকৃতি। তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতি পরমাত্মার পর নহে; প্রকৃতি পরমাত্মার আপনারই প্রকৃতি; তা ছাড়া, জীবভূতা পরা প্রকৃতি, সংক্ষেপে—জীবাশ্মা, পরমাত্মার দ্বিতীয় আশ্মা। প্রকৃতিরাজ্যে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা যাহা অভিনীত হয়, তাহা তাঁহারই অভিনীত হয়। তিনিই তাঁহার এই নানা

রসযুত প্রকৃতিসঙ্গীতে চিরমিলনের সর্দানন্দকে বিচ্ছেদের তালমানসঙ্গত মাত্রা সংযোগে নিত্য নিত্য নূতন নূতন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন।

অতঃপর প্রকৃতিরাজ্যের কোন্খান দিয়া কিরূপে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দের—এক কথায় সত্ত্বগুণের—অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাক।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

আমাদের এই সাগর-বেষ্টিত, বায়ুগর্ভস্থিত, চন্দ্রসূর্য্য-তারকা-প্রদীপিত আশ্চর্য্য বাস-দ্বীপে, অর্থাৎ পৃথিবী-মণ্ডলে, সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি-সোপানের প্রথম ধাপ হ'ছে জীবের উৎপত্তি। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যাদির অধিকার-প্রদেশে সর্বশব্দ জীব-অর্থেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তা'র সাক্ষী—শকুন্তলা নাটকের যে-শ্লোকটিতে দুষ্যন্ত রাজা তাঁহার মৃগয়া-প্রেমসীর গুণ গাহিতেছেন তাহার প্রথমার্ধ এই :—“মেদশ্ছেদ কুশোদরং লঘু ভবত্যাখানযোগ্যং বপুঃ সন্ধানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্ছিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।” ইহার অর্থ এই যে, মেদহাসে শরীর কুশোদর লঘু এবং উগ্ৰমশীল হয়, আর তা' ছাড়া—ভয় ক্রোধের আবির্ভাবে সর্বদিগের, কিনা জীবদিগের, চিত্ত কিরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন হয় তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৫২শ অধ্যায়ে—স্বপ্নশরীরী মনুষ্যের ভিতরে যে-এক স্বপ্নশরীরী মনুষ্য আছে সেই স্বপ্নশরীরী অতিমানুষকেও সর্বের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে;—বলা হইয়াছে এই যে,

“শরীরাদ্ বিপ্রযুক্তং হি স্বপ্নভূতং শরীরিণং  
কর্মভিঃ পরিপশ্যন্তি শাস্ত্রোক্তৈঃ শাস্ত্রবেদিনঃ ॥

যথা মরীচ্যঃ সহিতাশ্চরন্তি  
সর্বত্র, তিষ্ঠন্তি চ দৃশ্যমানাঃ।  
দেহৈ বিমুক্তানি চরন্তি লোকান্  
তথৈব সৎসান্যতিমানুষানি ॥”

ইহার অর্থ :—

শাস্ত্রজেরা, শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা, স্বপ্নশরীরী হইতে বিমুক্ত স্বপ্নশরীরী মনুষ্য দর্শন করেন। এই যে-সকল ভূপতিত সূর্য্যরশ্মি যাহা আনাদের প্রত্যক্ষগোচরে

ভাসমান, এই-সকল সূর্য্যরশ্মি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তেমনি স্থূলদেহ-বিমুক্ত অতি-মানুষ সত্ত্বেরা ( অর্থাৎ ইহলোকে দ্বাহারা মানুষ ছিল— এখন অতিমানুষ হইয়াছে—সেই-সকল সত্ত্বেরা ) লোকে লোকে বিচরণ করে । \*

প্রশ্ন ॥ কিন্তু তুমি বলিয়াছ সত্ত্বের আর এক নাম বাস্তবিক সত্তা । তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—বাস্তবিক সত্তা নাই কা'র ? ঐ অচেতন দেয়ালটারও তো বাস্তবিক সত্তা আছে । সংস্কৃত ভাষায় তবে অ্যাকা কেবল জীবকেই সত্ত্ব বলা হয় কেন ? জড়বস্তু কী অপরাধ করিল ? এ যে দেখিতেছি এক যাত্রায় পৃথক ফল !

উত্তর ॥ তুমি তো দেখিতেছ এক যাত্রা ! আমি যে দেখিতেছি দুই যাত্রা !

দেখিতেছি যে জীবের বাস্তবিক সত্তা যাত্রা করিয়া বাহির হয় আগে ; আর, তাহা অভিব্যক্তি-পথে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে দৃশ্যমান জড়বস্তু-সকলের যাত্রারস্ত হয় পরে । তুমি যে বলিতেছ—ঐ দেয়ালটারও বাস্তবিক সত্তা আছে, কিসের জ্বরে বলিতেছ ? দেয়ালটার রূপ তুমি চক্ষে দেখিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়াল-টার রূপ চৌকোণ ষ্বেতবর্ণ ; দেয়ালটার গাত্র তুমি স্পর্শ করিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়ালটার গাত্র কঠিন । কিন্তু দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা তুমি চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে ছুঁতে পাইতেছ না । তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কিসের জ্বরে তুমি বলিতেছ যে, দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা আছে ?

প্রশ্ন ॥ তা যদি বলা তবে উভয়তই গতিনাস্তি ! আমারও যে দশা—তোমারও সেই দশা ! তুমিও তো জীবের বাস্তবিক সত্তা চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে-ছুঁতে পাইতেছ না—অথচ বলিতেছ যে, জীবের বাস্তবিক সত্তা আছে ;—কিসের জ্বরে বলিতেছ ?

উত্তর ॥ জানের জ্বরে ! আমার আত্মসত্তা যেমন

\* অধুনাতন কালের spiritualist সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন ।

আমি জানে উপলব্ধি করিতেছি, তোমার আত্মসত্তাও তেমনি তুমি জানে উপলব্ধি করিতেছ ; আর তাহারই জ্বরে তোমাতে আমাতে দুজনায় মিলিয়া সমস্তের বলিতেছি যে, আমাদের উভয়েরই আত্মসত্তা জাগ্রত জীবন্ত জানের সত্য, স্মৃতরাং তাহা বাস্তবিক সত্তা ।

প্রশ্ন ॥ তুমি কি বলা যে, ঐ দেয়ালটার—মূলেই বাস্তবিক সত্তা নাই ।

উত্তর ॥ না, আমি তাহা বলি না । তা' ছাড়া—সাংখ্যাদি কোনো শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে ঐ দেয়াল-টার ভিতরে সত্ত্বগুণ মূলেই নাই । সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উল্টা আরো বলে এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ; আর সেই সপ্তে এ কথাও বলে যে, মনুষ্যজাতির মনোমধ্যে সত্ত্বগুণ তমোগুণের অন্ধকারময় পাতাল-গর্ত হইতে অভিব্যক্তি-সোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে ; পক্ষান্তরে, জড়বস্তু-সকলের ভিতরে সত্ত্বগুণ তমোগুণের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া তমসচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । অত কথায় কাজ কি ? এই সোজা কথাটি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, জগতে যদি জীব না থাকে তবে জ্ঞান দাঁড়াইবে কোথায় ? জ্ঞানের যদি দাঁড়াইবার স্থান না থাকে, তবে বাস্তবিক সত্তা দাঁড়াইবে কোথায় ? আমি তাই বলি যে, পৃথিবী-মণ্ডলে জীবের অভিব্যক্তি হয় আগে—বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে বিদ্যমান হয় পরে ।

প্রশ্ন ॥ পৃথিবীস্থ জীবেরা তো সে-দিনের জীব বলিলেই হয় । তাহাদের জন্মবার পূর্বে পৃথিবী যে, কতশত যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবশূন্য অবস্থায় বর্তমান ছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না । তুমি কি বলা যে ততটা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বাস্তবিক সত্তা ছিল না ?

উত্তর ॥ দীর্ঘ কাল ! তোমার আমার মতো অজ্ঞানাত্ম জীবদিগের নিকটেই উহা দীর্ঘ কাল । ব্রহ্মার নিকটে উহা পৃথিবীমাতার দশমাস দশদিন ; আর, সেইজন্ত, ততটা কাল পর্যন্ত সত্ত্ব ( কিনা জীব ) তাহার গর্তমধ্যে প্রমুগ্ত ভাবে বা অনভিব্যক্ত ভাবে বর্তমান থাকিবারই কথা । তা' শুধু না—ভূগর্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে

protoplasm সেই সমুদ্রগর্ভস্থিত সৃষ্টিক্রমাগারে সস্র গোকুলে বাড়িতেছিল \*। তোমার প্রশ্নের সীধা উত্তর এই যে, \*পৃথিবীসঙ্গে জীবের উৎপত্তির পূর্বে পৃথিবীর বাস্তুবিক গত্তা ছিলই না যে, তাহা আমি বলি না; ছিল—কিন্তু তাহা না থাকিবারই মধ্যে। রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছিলেন “অশ্বখামা হতো ইতি গজো” †, আমি তেমনি বলি যে, পৃথিবীর তখন সত্তাও ছিল, চেতনাও ছিল, আনন্দও ছিল—

ছিল সবই—অনভিব্যক্ত। এটা বোধ করি তুমি দেখিয়াছ যে, ছবিণের সোজা দিক দিয়া দেখিলে ছোটো জিনিস যেমন বড় দেখায়—ছবিণের উল্টা দিক দিয়া দেখিলে বড় জিনিস তেমনি ছোটো দেখায়। মনো-ছবিণেরও তেমনি উল্টা দিক দিয়া দেখিলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একটা বৃহৎ কথা আবালবৃদ্ধ বনিতার চির-পরিচিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কথার সামিল হইয়া দাঁড়ায়। তার সাক্ষীঃ—দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, তখন আমার সন্নিধানে—আমিও

\* পিতা-বাহুদেব সদ্যপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা রাণীর নিকটে রাখিয়া আসিয়া যশোদা রাণীর নবপ্রসূত কন্যাটিকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া কংশরাজার নিকটে পরিচয় দেওয়ার কংশরাজা সেই কন্যাটিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটি শঙ্কর ঢিল হইয়া আকাশে উড়িয়া গিয়া তথা হইতে কংশরাজাকে বলিল

“আমাকে মারিছ তুমি!  
তোমাকে মারিবে যে,  
গোকুলে বাড়িছে সে।”

এই পৌরাণিক উপাখ্যানটির সহিত তান মিলাইয়া আমি তাই বলিলাম যে, পৃথিবীর সেই আদিমকালে—তমোরাজার দোদণ্ড-প্রতাপকে যে করিবে পদতলে দলিত, সেই সত্ত্বমহাপুরুষ সমুদ্রগর্ভে গোকুলে বাড়িতেছিল।

† আমাদের দেশের কথক-মণ্ডলে “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই সংস্কৃত বোলটির পরিবর্তে “অশ্বখামা হতো ইতি গজো” এই বাংলা বোলটি এযাবৎকাল পযাপ্ত অবিকর্তিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙালীর মুখে শেযোক বোলটিই শুনায় ভাল। শুনায় তে, ভালই, তা ছাড়া—“অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এটা যেমন শুদ্ধ সংস্কৃত, “অশ্বখামা হতো ইতি গজো” এটা তেমনি শুদ্ধ বাংলা। কেননা বাংলাভাষা প্রাকৃত ভাষারই সহোদর। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষার বিভক্তিঘটিত বিসর্গের স্থানে ওকার হয়; তার সাক্ষী—“ইতঃ” সংস্কৃত, “ইদো” প্রাকৃত। এই জন্য বলি যে, “অশ্বখামা হতো ইতি গজো” এইটিই শুদ্ধ বাংলা, আর, “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এটা না সংস্কৃত না বাংলা—আর তাহারই নাম অশুদ্ধ বাংলা বা ভ্রষ্ট বাংলা।

আছি—আমার মুখ চক্ষু হস্ত পদও আছে—খাট পালকও আছে—বিছানা বালিশও আছে;—আছে সবই অনভিব্যক্ত। তুমি হয় তো বলিবে “পৃথিবী জড়বস্তু বই আর তো কিছু না। একটা মশার শরীরে যতটুকু প্রাণ আছে—পৃথিবীর শত সহস্র যোজনব্যাপী দিগ্গজ শরীরে তাহার সিকির সিকি মাত্রাও প্রাণ নাই; যাহার প্রাণই নাই, তাহার আবার চেতনা— তাহার আবার আনন্দ!” তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, চেতনাবান্ দ্বিপদ জীবেরা বোল আওড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া তাহারা সবাই মিলিয়া যা’দিগে জড়বস্তু বলিয়া খোঁটা দায়, তাহারা সত্য সত্যই কিছু আর বৃত্তিশূন্য নিশ্চেষ্ট পদার্থ নহে। ঐ লোক দেয়ালটার ভিতরেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়া নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে : আর, আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার সে যে স্পন্দন তাহা প্রাণস্পন্দনেরই পূর্বলক্ষণ। প্রাণস্পন্দন তেমনি-আবার মনঃস্পন্দনের বা আনন্দের পূর্বলক্ষণ; এমন কি—প্রাণস্পন্দন এক প্রকার আনন্দের নৃত্য বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। আমি তাই বলিতে চাহিতেছি এই যে, ঐ দেয়ালটার মর্মস্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণক্রিয়া চাপা দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাও বলি—নিতাস্তই চাপা দেওয়া রহিয়াছে বলা এখন আর চলে না! কেন যে বলিতেছি “এখন আর চলে না” তাহার ভিতরের কথাটা তোমাকে তবে বলি :—

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ কামিখ্যার অনেকটা নিকটবর্তী তাহা তুমি অবশ্য জানো। সেই পূর্ববঙ্গ হইতে কামিখ্যাদেশীয় বিদ্যার যে-এক মহাপণ্ডিত মন্ত্রতন্ত্রমন্ত্র-সহ বাহির হইয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তাহার অসাধ্য কার্যই নাই! তিনি সোণার কাটি ছোঁআইলেই \* নির্জীব খাতু প্রস্তরাদি সজীব হইয়া উঠে—রূপার কাটি ছোঁআইলে আবার-তাহারা যেমন-কে-তেমনি অসাড় হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে। এইমাত্র আমি তোমার নিকটে যে-একটি রহস্য-কাহিনীর

\* ছোঁয়া=ছোঁয়া স্তরঃ অণ্ড।

ছোঁআ=ছোঁআ স্তরঃ শুদ্ধ।

ইঙ্গিত করিলাম সেই কথাটি—অর্থাৎ “দেয়ালটার মর্ম-স্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণস্পন্দন চাপা দেওয়া রহিয়াছে” এই কথাটি—এই মায়াবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মাটির মন্ত্রতন্ত্রমন্ত্রের খোঁচাখুঁচির জ্বালায় প্রকাশে বাহির হইয়া পড়িয়া বিজ্ঞানের বাধা রাস্তায় ধীরে ধীরে পায়চালি করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; তাহার জ্ঞান এখন আর ভাবনা নাই। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি পবনশর্চ্যা রহস্যকাহিনী যাহা আমি তোমাকে চুপি চুপি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারিবার মতো জিনিসই নহে ; কেননা তাহা একেবারেই যন্ত্রতন্ত্রাদির আয়ত্ত-বহির্ভূত। সে কথা এই যে, ধাতু প্রস্তুতাদির প্রাণস্পন্দনের ভিতরে চেতনা এবং আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। যদি বলা “কেমন করিয়া তুমি তাহা জানিলে ?” তবে বলি শোনো—কেমন করিয়া আমি তাহা জানিলাম। এটা যখন স্থির যে, কেহই মরিতে চাহে না—সকলেই বাঁচিতে চাহে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, কামিখ্যাঘাণা প্রদেশের মহাত্মাটি মায়াবিদ্যার মহাপণ্ডিত যদিচ, তথাপি তাহার শরীরে মায়াদয়ার লেশ মাত্রও নাই ! যুহুর্ন্তেক পূর্বে যে-একটি গরিব বেচারী তাম্রখণ্ড দিব্য স্মৃতি বাঁচিয়া বর্তিয়া ছিল তাহাকে ঠগীদের মতো গলা টিপিয়া যমালয়ে পাঠাইতে একটুও তাহার বিধা হয় না। বড় হো'কু—ছোটো হো'কু, মানুষ হো'কু—জন্তু হো'কু, ধাতু হো'কু—পাষণ হো'কু, যেমনই যে-কোনো পদার্থ হো'কু না, যাহার শরীরে প্রাণ আছে—সেই প্রাণের প্রতি তাহার প্রাণের টানও আছে ; কেননা প্রাণের প্রতি যাহার প্রাণের টান নাই—প্রাণে তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহাকে বলে প্রাণের টান তাহাকেই বলে ভালবাসা। যেখানে আনন্দের আশ্বাদ পাওয়া যায়, সেইখানেই ভালবাসার আসন জমে। ধাতুপ্রস্তুতের প্রাণ আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, তাহাদের প্রাণের প্রতি তাহাদের প্রাণের টান আছে ; তাহাদের প্রাণের প্রতি প্রাণের টান আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, প্রাণের ক্ষুধিতে তাহাদের আনন্দের অনুভব হয় ; আর, আনন্দের অনুভব বিনা-চেতনে তো হইতেই পারে না। দৃশ্যমান

বস্তু-সকলের যবনিকার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলেই যাহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পান যে, সেই যবনিকার আড়ালে জীবনীশক্তি হ্লাদিনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি সখীত্বের প্রেমমন্ত্রে গাঁথা। আমার ভয় হইতেছে—পুঞ্জাপুঞ্জ যুক্তিপরম্পরার সহিত দৌড়িয়া চলিতে পাছে আমার সহযাত্রীরা হাঁপাইয়া যান। দুর্দমনীয় যুক্তির অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নাবিয়া—আমি তাই শাস্ত্রের পথ ধরিয়া চলিয়া গম্যস্থানাভিযুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বোধ করিতেছি ; অথচ আবার রাজ্যের পুঁথি বাঁটিয়া পুঁথি বাড়াইতে মূলেই আমার ইচ্ছা নাই। এইরূপ যখন উভয়-সঙ্গট, তখন কর্তব্য হ'ছে আমার—, মধ্যপথ অবলম্বন করা ; অর্থাৎ সাংখ্যাশাস্ত্রের মুখ্য মন্তব্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিতে যত সংক্ষেপে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখা। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে !

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত-স্বরের গতিপদ্ধতির **ক্রম** যেমন অবরোহী এবং আরোহী এই দুই খণ্ডে বিভক্ত, সাংখ্যাশাস্ত্রের মতে তেয়ি সমগ্র প্রকৃতির গতি-পদ্ধতির ক্রম অনুলোম এবং প্রতিলোম এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাহার মধ্যে—পৃথিবীর উৎপত্তি অনুলোম সোপানের শেষের ধাপ ; জীবের উৎপত্তি প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ। ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের প্রথম খণ্ডে, কিনা অনুলোম খণ্ডে, রজস্বমোণ্ডের বন্ধন ক্রমশঃ ঘনীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া তমপ্রধান পৃথিবীতে পর্য্যবসিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে—কিনা প্রতিলোম খণ্ডে রজস্বমোণ্ডের বন্ধন ক্রমশঃ আলুগা আলুগা হইয়া খুলিয়া খুলিয়া গিয়া মনুষ্যজাতীয় মহাপুরুষদিগের অন্তঃকরণে সর্বগুণের উৎকৃষ্টতম অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। কিন্তু নীচের ধাপের সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্যদিগের পক্ষে রজস্বমোণ্ডের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ন্যূনাধিক পরিমাণে দীর্ঘকালসাপেক্ষ। কিন্তু এটা সত্য যে, চেষ্টার অসাধ্য কার্যই নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাহার বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন

“তন্মান্ মনঃ কারণমশ্র জস্তোঃ  
বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ চ বা বিধানৈ ।

বন্ধস্ত হেতুর্মলিনং রজোশুণৈ  
মৌক্ষস্ত শুদ্ধং বিরজস্তমস্কং ॥”

ইহার অর্থ এই যে মনই জীবের বন্ধ-মোক্ষের কারণ। রজস্তমোশুণৈ মলিনীভূত মন বন্ধের কারণ, আর বিরজস্তমোবিনিমুক্ত বিশুদ্ধ মন মুক্তির কারণ। শঙ্করাচার্যের ঞায় মহাপুরুষদিগের কথার ধারাই এইরূপ। ইহাদের অন্তঃকরণের ভিতরকার আভাসন্ধি আর কিছু না—সংসারের বাধাবিল্লের প্রতিশ্রোতে যাহারা প্রাণপণ চেষ্টায় মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে এইরূপ অভয় বাক্যে উৎসাহিত করা—যে, “তোমার আপনারই মন তোমার বন্ধের কারণ, সুতরাং বন্ধ টুটিয়া ফালা তোমার আপনারই হস্তে। অতএব অবিদ্যা-রাক্ষসীব মায়ামন্ত্র-সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মুক্তিপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইও।” শঙ্করাচার্যের ঐ শ্লোকটি শুনিয়া কোনো অতিনব ব্রতী যদি মনে করেন যে, “বন্ধ-মোক্ষের কারণ আপনারই তো মন, তবে আর ভাবনা কি?” তবে তিনি তাঁহার মনকে এখনো পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই; যদি চিনিতে পারিতেন তাহা হইলে বরং এ কথা তাঁহার মুখে কতকটা শোভা পাইত যে, তবে আর ভাবনা কি? মাছিয়া যদি মাকড়সার জাল চক্ষে দেখিতে পাইত, তবে মাছীদের মুখে এ কথা কতকটা শোভা পাইত যে, মাকড়সা তো আমাদেরই এক সম্পর্কে বড় দাদা—উহাকে ভয় কিসের? কিন্তু কোনো জালাক মাছির আসন্ন কালে যদি এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয় যে, আমি মাকড়সার চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেলেও সে আমাকে ধরিতে পারে না—যে হেতু তাহার পাখা নাই, তবে তাহার মরণ ঘূনাইয়া আসিয়াছে। অর্জুন কিন্তু তাঁহার মনকে পাকা জহরির ঞায় ভাল-মতে চিনিয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে সোধোদন করিয়া বলিয়াছিলেন।

“চক্ষুসং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সূহৃৎকরং ॥”

ইহার অর্থ :—

মন, কৃষ্ণ, বড়ই চঞ্চল, বিষম হৃদ্যন্ত এবং শক্ত বলবান্।  
যাকে যেমন হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখা হুঃসাধ্য—

মনকে তেয়ি বশে রাখা হুঃসাধ্য। অর্জুনের মুখ দিয়া এইরূপ একটি কথা যাহা মনের খেদে বাহির হইয়াছিল তাহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মনকে বিধিমতে চিনিতে পারিলেও তাহার হস্ত হইতে পার পাওয়া মুকঠিন। আমার বালাকালে, আমার মনে পড়ে, প্রতিমা বিসর্জন দেখিবার জন্ম আমরা যখন সকল ভ্রাতায় একত্রে মিলিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতাম, তখন আমাদের চাকর-বাকরেরা পথের মধ্য হইতে আর-পাঁচরকম খ্যালনার সঙ্গে আমাদের জন্ম মুখোস্ কিনিয়া আনিত। তাহার পরে আমরা নানাবিধ খ্যালনা হাতে করিয়া মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কিঙ্কর-শ্রেণীর কোনো কোনো ব্যক্তি যখন মুখোস্ মুখে দিয়া আমাকে ভয় দেখাইত তখন আমার মনকে আমি যতই বলিতাম “ও তো অযুক—ওকে কী ভয়!” আমার মন ততই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত, আর তাহার কিয়ৎ পরেই উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিয়া ফেলিত। আমি বেস্ জানিতাম যে, মুখোসের আড়ালে অমূকের হাশ্বমুখ ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে—কিন্তু তাহা জানা-তে করিয়া আমার ভয়ের স্বল্পমাত্রও লাঘব হইত না। প্রকৃত কথা এই যে একটা প্রবল সংস্কার-সিংহ যখন মনের গুহার মধ্যে প্রসুপ্ত থাকে তখন জ্ঞান-ধনুর্ধর তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার মনকে এইরূপ প্রবোধ দ্যান যে, ওটা একটা অমূলক সংস্কার বই আর কিছুই না—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান! কিন্তু সেই সিংহটার নিদ্রা ভাঙিয়া গেলে সে যখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া গুহার মধ্য হইতে বাহির হয়, তখন জ্ঞান তাহার কাছে এগোবে কি—তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই জ্ঞানের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, ঐ, দেয়ালটা বটে একটা সন্তিকের জিনিস—কিন্তু মনের সংস্কারগুলি মিথ্যা মায়ী বই আর কিছুই নহে। কিন্তু ফলে কী দেখা যায়? ফলে দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত! রাজমজুর ডাকাইয়া আনিয়া দেয়ালটার মধ্য হইতে উহার ইষ্টকাদি সমস্ত গঠনোপকরণ বাহির করাইয়া লইয়া সেই রাশীকৃত ইষ্টকাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে পাঠানো অতি সহজে হইতে পারে; কিন্তু তুখোড় বিষয়ী ব্যক্তিদিগের

মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, ধন মান প্রতিপত্তিই সমস্ত মঙ্গলের মূলাধার, অথবা স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির চরিতার্থতাই মনুষ্যজীবনের সার সর্বস্ব; এই-সকল অমূলক সংস্কার মনকে যখন রীতিমত পাইয়া বসে তখন সেগুলিকে মন হইতে নড়ানো কঠিন হইতেও কঠিন। আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ভৌতিক শক্তি যেমন জড়পরিমাণুগণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করে, তেমনি—সাংখ্যদর্শনে যাহাকে বলে “আকৃতি” অর্থাৎ বাছুর আসিতেছে দেখিয়া যেমন গোরুর বাট হইতে দুগ্ধ করণ হইতে থাকে তেম্নিতর-সব সংস্কারমূলক প্রবৃত্তি-শ্রোত আমাদের প্রাণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; পুরাতন গ্রীক দর্শনকারেরা যাহাকে বলিতেন পরমাণুগণের পরস্পর “sympathy antipathy” স্বেদ নিবেদ বা অনুরাগ-বিরাগ, তাহা আমাদের মনের উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; বেদান্ত-দর্শনে যাহাকে বলে “মায়া” (অর্থাৎ অসত্যকে সত্য মনে করা—ক্ষণস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখ মনে করা—সংসারকে সার মনে করা— ইত্যাদি) তাহা আমাদের বুদ্ধির উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এইরূপে আমরা রজস্তমোগুণের বন্ধনে আপাদ-মস্তকে জড়িত হইয়া রহিয়াছি।

ধরিতে গেলে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন “আকর্ষণ-বিকর্ষণ” তাহাও “মায়া” “আকৃতি” অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিতর ধাঁচার এক রকম সংস্কার-মূলক শক্তি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, অনবগাহতা (Impenetrability) \* জড়পদার্থের একটি অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে বায়ু এবং জলীয় বাষ্প পরস্পরের যতই গা ঘেঁসিয়া অবস্থিতি করুক না কেন—সমুদ্র অঞ্চলে লবণ এবং জল পরস্পরের সহিত যতই মাখামাখি-ভাবে

সংলিপ্ত থাকুক না কেন—তথাপি দৌহার মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান থাকিতেই চায়। তবেই হইতেছে যে, জড়বস্ত-সকল যখন আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, তখন পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়াই কার্য্য করে, তা বই পরস্পরের সহিত সংলিপ্ত হইয়া কার্য্য করে না। কাজেই বলিতে হয় যে, আকর্ষণ-বিকর্ষণশক্তি একপ্রকার মায়ামন্ত্র—একপ্রকার “আকৃতি”—একপ্রকার sympathy antipathy—একপ্রকার অনুরাগ বিরাগ। সাংখ্যদর্শনের মতে—সূক্ষ্ম আকাশ যখন অনুলোম-ক্রমে অনিলানল-সলিলের মধ্যদিয়া পৃথিবীরূপে পিণ্ডীভূত হয়, তখন তাহা-সে হয় একপ্রকার আকৃতির প্রবর্তনায়। “আকৃতি” আর কিছু না—মেঘ ডাকিলে যেমন ময়ূর না-নাচিয়া থাকিতে পারে না, তেম্নি কতকগুলি পরমাণু যখন একসঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, তখন পার্শ্বস্থ পরমাণুরা তাহাদের সহিত নৃত্য যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না;—ইহারই নাম “আকৃতি”, ইহারই নাম “Sympathy”, ইহারই নাম মায়ামন্ত্র।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

অনুলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক যেমন আকৃতি, বা অবিদ্যামূলক সংস্কার—প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক তেম্নি প্রেম। জীবজগতের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে রজস্তমোগুণের মায়া-হৃদের মধ্য হইতে সবুগণ যতই উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে, ততই আকৃতির বা অক্ষসংস্কারের কার্য্য ফুরাইয়া যাইতে থাকে, আর, সেই সঙ্গে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকে। আকৃতি এবং প্রেমের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, আকৃতি অবিদ্যার রাজসী শক্তি, প্রেম আত্মার সাত্বিকী শক্তি বা দৈবী শক্তি। অবিদ্যার-সুশ্রো-হনী শক্তি রূপার কাটি, প্রেমের উদ্বোধনী শক্তি সোণার কাটি। অবিদ্যার সংস্পর্শে চক্ষুস্থান্ জীবের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়—প্রেমের সংস্পর্শে অন্ধজীবের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। নেপোলিয়নের রাজসী মায়াশক্তি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যসামন্তের উপরে কিরূপ প্রবল পরাক্রমের সহিত

\* Impenetrability শব্দের অবির্কল অনুবাদ “অনবগাহতা” তাহাতে আর ভুল নাই। তা ছাড়া—Impenetrability কথাটার শকার্ণ এবং ভাবার্থের মধ্যে বৈরুপ প্রভেদ, অনবগাহতা কথাটারও শকার্ণ এবং ভাবার্থের মধ্যে অবিলম্ব সেইরূপ প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক ভাষার নামকরণে ঐরূপ প্রভেদকে ঘাড় পাতিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কার্য করিত তাহা কাহারো অবিদিত নাই, আর, চৈতন্য মহাপ্রভুর দৈবী মায়াশক্তি নবদ্বীপের অধিবাসীদিগের উপরে কেমন সুগায় মাধুর্যের সহিত কার্য করিয়াছিল তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। দুয়ের মধ্যে কত না প্রভেদ! নেপোলিয়নের অধীনস্থ সৈন্যেরা “Glorious” নামক একটা মিথ্যা প্ররোচনা-বাক্যের ভেরী-নির্নাদে মস্তমুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তেরা হরিনাম-কীর্তনের মধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে মৃত শরীরে প্রাণ পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রেম জীবকে রজোগুণ হইতে স্বৰ্গে উঠাইয়া দেয়, অবিদ্যা জীবকে রজোগুণ হইতে তমোগুণে নামাইয়া দেয়। প্রেম-সোপানের দুইটি ধাপ। নীচের ধাপটি রজোগুণ-ব্যাসা—এটি হ’চ্ছে স্বেচ্ছা প্রেম; উপরের ধাপটি স্বৰ্গে ব্যাসা—এটি হ’চ্ছে নিকাম প্রেম। নিকাম প্রেম মুক্তির দ্বার-স্বরূপ। উপনিষদে আছে— “তদেতৎ প্রেমঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহনুশ্চাৎ সূৰ্য্যশ্চাৎ অন্তরতরং যদয়মাশ্রা।” ইহার অর্থ এই যে, অন্তরতর এই যে আশ্রা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয়—সকল হইতে প্রিয়।” প্রিয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে যত কিছু প্রিয়বস্তু আছে সবই আশ্রার কারণেই প্রিয়, কিন্তু আশ্রা আর কোনো-বস্তুই কারণে প্রিয় নহে—আশ্রা স্বতঃই প্রিয়; আশ্রা প্রেম-স্বরূপ! এরূপ যদি দেখ যে, একজনের মুখচক্ষুর ভিতরে আশ্রা সাতহাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—আর-এক জনের মুখচক্ষুর মধ্য দিয়া আশ্রা উকি দিতেছে, তবে সে-দুজনের কাহাকে তুমি সুন্দর বলিবে—কাহাকে তুমি সুবুদ্ধিমান বলিবে—কাহার সহিত তোমার প্রথম-পরিচয় হইবামাত্র তুমি বলিবে “আজ আমার শুভদিন?” জহরী যেমন জহর’কে চেনে—আশ্রা তেমনি আশ্রাকে চেনে। পূর্বতন কালের যোগিগণি মহাপুরুষেরা আশ্রাকে চিনিতেন বলিয়া—প্রস্তর-পাষাণের সাতপুরু অন্ধকারাবণ্ডন ভেদ করিয়া তাহার মধ্যেও তাহারা আশ্রাকে দেখিতেন, আর সেইজন্য তাহাদের প্রেম কোনো-কিছুরই অবরোধ মানিত না। চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে কোড় পাতিয়া আলিঙ্গন

করিয়াছিলেন—ইহা সকলেরই জানা কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি :—

- (১) জীবের উৎপত্তিই প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রথম সোপান।
- (২) প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক প্রেম।
- (৩) নিকাম প্রেম-প্রতিলোম-পদ্ধতির চরম সোপান।
- (৪) নিকাম প্রেমের দৈবীশক্তির প্রভাবেই স্বৰ্গ-গুণের অন্তর্নিগূঢ় সুবিমল জ্ঞান এবং আনন্দের দ্বার উদঘাটিত হইয়া যায়।
- (৫) নিকাম প্রেমের দ্বার দিয়া যখন স্বৰ্গ-গুণের রীতিমত অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহাই মুক্তির সোপান।

ষষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, প্রকৃতির গতি-চক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া উদ্‌গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যেহেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরা প্রকৃতিকে বিশেষ-মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে “জীবভূতা” পরা-প্রকৃতি। এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা; আর, স্বৰ্গ-গুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সবই পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রের ভোজ-রাজকৃত টীকায় একটি নিগূঢ়তম তত্ত্বের সন্ধান বাহা অতীব সংক্ষেপে দুইচারি কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহা এই :—

“তন্ম চ (অর্থাৎ ঈশ্বরম্ চ) তথাবিধং ঐশ্বর্যং অনাদেঃ সত্ত্বাৎকর্ষাৎ। সত্ত্বাৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদ্ এব। ন চানযো জ্ঞানৈশ্বর্যায়ো রিতরেতরাশ্রয়ত্বং পরম্পরানপেক্ষত্বাৎ।

ইহার অর্থ :—

ঈশ্বরের সেই যে ঐশ্বর্য তাহার গোড়ার কথা হ’চ্ছে অনাদি সত্ত্বাৎকর্ষ; আর, অনাদি সত্ত্বাৎকর্ষের গোড়ার কথা হ’চ্ছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এই যে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত।

রূপকচ্ছলে আমি যাহাকে বলিলাম জীবভূতা পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার



মহাত্মা ভোজরাজ তাহাকে বলিতেছেন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বরের মহিমা। তিনি বলিতেছেন “অনাদি সর্বোৎকর্ষ ঈশ্বরের মহিমা।” ভোজরাজ যাহাকে বলিতেছেন “অনাদি সর্বোৎকর্ষ”, —গীতাশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকে তাহাকেই বলা হইয়াছে নিত্যসব, আর, শঙ্করাচার্যের প্রণীত নানা পুস্তকের নানা স্থানে তাহাকেই বলা হইয়াছে শুদ্ধ সব। পাতঞ্জলের টীকাকার মহাত্মা ভোজরাজ আরো বলিতেছেন এই যে, ঈশ্বরের সেই যে মহিমা—কি না শুদ্ধ সব, ঈশ্বরের জ্ঞান তাহা হইতে নির্লিপ্ত। নির্লিপ্ত কেন? না ঈশ্বরের জ্ঞান যেহেতু তাঁহার স্বরূপের অন্তঃপাতী, আর তাঁহার মহিমা যেহেতু প্রকৃতির অন্তঃপাতী, সেইজন্যই উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত। কিয়ৎ পূর্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে জড়পরমাণু-সকল পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়া পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, অথবা, যাহা একই কথা—পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া আকর্ষণাদি-শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে; এক্ষণে তেয়ি আমরা দেখিতেছি যে, পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্ত-মতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার মহিমা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া শক্তি-যোগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে কার্য্য করিতেছেন। আবার উপনিষদে আছে “স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি—স্বৈ মহিম্নি” ইহার অর্থ এই যে, যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবান্-তিনি কিসে ‘প্রতিষ্ঠিত’ তবে তাহার উত্তর এই যে, তিনি তাঁহার আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের এই কথাটির সঙ্গে পূর্বেদর্শিত পাতঞ্জল দর্শনের ঐ কথাটির তান মিলাইয়া রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে পদ্মপত্র যেমন নির্লিপ্ত ভাবে সরোবরের নীরাসনে অধিষ্ঠান করে—পরমাত্মা তেম্নিতর নির্লিপ্ত ভাবে আপনার মহিমাতে—জীবভূতা পরাপ্রকৃতির হিরণ্য পরম কোষে—পরম পরিশুদ্ধ সব্বগুণের অমুপম দিব্য জ্যোতির্মণ্ডলে অধিষ্ঠান করিতেছেন। উপনিষদে এ কথাও বলে যে,

“তাবানন্ত মহিম্না ততো

অ্যায়াংচ পুরুষঃ”

ইহার অর্থ এই :—

এত যে তাঁহার মহিমা—পুরুষ-তিনি তাহা অপেক্ষাও বড়।

এই উপনিষদ-শ্লোকটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ শ্লোকের শঙ্করভাষ্যে লিখিত হইয়াছে

“তথাহন্ত দ্বিরূপাং স্থিতি মাহ আয়াংঃ”

ইহার অর্থ যে, পরমেশ্বরের দুইরূপ স্থিতির কথা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে দুইরূপ স্থিতি যে, কী, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তাহা এই :—

- { (১) স্বরূপে স্থিতি।  
(২) মহিমাতে স্থিতি।

শাস্ত্রোক্ত এই-সকল নিগূঢ় কথার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা খুব ঠিক বলিয়া আমার মনে লাগিতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

পরমাত্মা একদিকে আপনার মহিমাতে নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আর, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার প্রভাবে—তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতমাত্রে—কোটি কোটি জগৎ মহাব্যোমে ভ্রাম্যমান হইতেছে; আর একদিকে তিনি আপনার শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত অনাদি অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং গভীর। একটি উপমার অবতারণা করিতেছি—তাহা দৃষ্টে বোধ করি বা উহার মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ প্রকারে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

- (১) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল নিস্তরঙ্গ।
- (২) সমুদ্রের উপরের তল তরঙ্গসঙ্কুল।
- (৩) সমুদ্রের ঐ দুই তলের মাঝের জায়গায় আর-একটি তল আছে যাহা তরঙ্গিত প্রদেশের সমাপ্তি-স্থান এবং নিস্তরঙ্গ প্রদেশের আরম্ভ-স্থান।
- (৪) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল যেমন নিস্তরঙ্গ—তাঁহার ঐ মাঝের তলটিও তেম্নি নিস্তরঙ্গ; অথচ সেই মাঝের তল হইতেই তরঙ্গ-সকল উত্থান করিতেছে—উত্থান করিয়া আবার সেই মাঝের তলেই বিলীন হইতেছে।

(৫) সমুদ্রের মাঝের তলটি-যে-বড় ছোটো খাটো জিনিস তাহা নহে। সমুদ্রের যেমন কোথাও কুলকিনারা নাই, তাহার মাঝের তলটিরও তেমন কোথাও কুলকিনারা নাই। অথচ সেই মাঝের তলটি সমুদ্রের একাংশ বই নহে। এই গেল উপমা। প্রকৃত কথা যাহা—তাহা এইঃ—

(১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এপারে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তরঙ্গ উত্থান পতন করিতেছে।

(২) ওপারে বুদ্ধিমনের অগম্য প্রদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

(৩) এপার এবং ওপারের মধ্যবর্তী প্রদেশে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই মধ্যবর্তী প্রদেশটিই সৃষ্টির উত্থান-স্থান, স্থিতির আশ্রয়-স্থান এবং প্রলয়ের বিরাম-স্থান। এই মধ্যস্থানটি ঈশ্বরের মহিমা। তাহার এই মহিমার মধ্যেই ঐশীশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। নিপুণ অস্বারোহী যেমন অগ্নে অধিষ্ঠিত—কিন্তু অগ্নির বশীভূত নহে; অগ্নিই অস্বারোহীর বশীভূত। ঐশীশক্তিতে তেমনি ঈশ্বর নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি তাহার ঐশীশক্তির বশীভূত নহেন, পরন্তু তাহার ঐশীশক্তি সম্পূর্ণরূপে তাহার বশবর্তিনী। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ মাঝের তলটি যেমন সমুদ্রের একাংশ—তেমনি ঐশীশক্তি ঈশ্বরের একাংশমাত্র; অথচ সেই ঐশীশক্তির যোগে তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সপ্তম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত পক্ষে জীবাঙ্গার অংশ যদিচ নাই, অথচ যেমন একভাবে বলা যাইতে পারে যে, মানব-দেহের মস্তিষ্কের সারাংশই জীবাঙ্গার জ্ঞানাংশ, তেমন অথচ পরমাত্মার প্রকৃত পক্ষে যদিচ অংশ নাই, তথাপি এক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বা মহিমা তাহার একাংশ মাত্র। গীতাশাস্ত্রে বলা হইয়াছেও তাই। তার সাক্ষী গীতাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের সর্বশেষের শ্লোক-দ্বিতে বলা হইয়াছে

“যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সস্বং শ্রীমদুর্জিত মেব বা।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সত্ত্ববং ॥

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টব্যাহমিদং কুৎসং একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

ইহার অর্থ :—

যেখানে যত কিছু ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রীমান্ এবং বলবীর্ষ্যবান্ সব আছে সমস্তই জানিও আমার তেজাংশ \* হইতে সমুদ্ভূত। অথবা অত কথা কী হইবে তোমার জানিয়া অর্জুন—আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

সে একাংশ যে, কি, তাহার সন্ধান সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞাপন করা হইয়াছে এইরূপ :—

“ভূমি রাপোহনলো বায়ুঃ ধং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়ং—ইতচ্ছাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥”

ইহার অর্থ :—

আমার এই যে অষ্টধাভিন্না প্রকৃতি—ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, ইহা অপরা প্রকৃতি; এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকৃতি আছে যাহা জীবভূতা, তাহাই জানিও আমার পরা প্রকৃতি, সেই-পরাপ্রকৃতি যাহা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।”

পূর্বপ্রদর্শিত শ্লোকদ্বটির শেষে রহিয়াছে “আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি”; আর, অত্র-প্রদর্শিত শ্লোকদ্বটির শেষে রহিয়াছে “আমার জীবভূতা পরা প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।”

ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই পরমাত্মার সেই একাংশ, যাহাতে-করিয়া তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, বাস্মীকি যুনির রামায়ণ-গান প্রথম উপক্রমে যদিচ অবরোহি-ক্রমে রামের রাজ্যচ্যুতি হইতে ক্রমশ নীচে নাবিয়া সীতাহরণের হাহাকারে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক

\* বাংলা ভাষায়—তেজাংশই তাল।

তাহার বিপরীত। তাহা কী? না রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসনে রামের পার্শ্বে বসানো। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তেমনি, সৰ্বগুণের দৈবী শক্তিকে রজস্বমোচনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবরাজ্যের সিংহাসনে আত্মার পার্শ্বে বসানো। ষষ্ঠ দ্রষ্টব্যের গোড়াতেই আমি তাই বলিয়াছি এবং এখানে আরেক বার বলা আবশ্যিক মনে করিতেছি যে, প্রকৃতির গতিচক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া উদ্গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যে-হেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরাপ্রকৃতিকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে “জীবভূতা পরাপ্রকৃতি।” এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা; আর, সৰ্বগুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সত্ত্বই—পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি।

গীতাশাস্ত্রের অন্ধি-সন্ধির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল নিগূঢ় কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আমি সাধ্যানুসারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু আমার সাধাই বা কতটুকু—আর যাহা আমি বিবৃত করিলাম তাহাই বা কতটুকু! সবই সমুদ্রে অর্ধা দান! তন্মানুসন্ধানে আমি যতই অগ্রসর হইতেছি ততই দেখিতেছি যে, সকলই অকূল অপার, অনির্কচনীয়, এবং আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য। বহুপূর্বে কিংকিঁটের সুরে আমি একটি গীত বাধিয়াছিলাম—এইখানে তাহার কয়েকটি ছত্র আমার মনে পড়িতেছে। সে কয়েকটি ছত্র এই :—

“উচ্ছে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে  
অস্ত কোথায় তাঁর অস্ত কোথায় তাঁর

এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

কর তাঁর নাম গান—

যতদিন রহে দেহে প্রাণ—কর তাঁর নাম গান।

করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পারি।

যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে

• কর তাঁর নাম গান—যতদিন রহে দেহে প্রাণ—  
কর তাঁর নাম গান।”

• শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

## জলন্দের কন্যা-বিদ্যালয়

আমরা প্রতি বারেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধিবেশনে বর্ষীয় বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে' থাকি, এবারে জলন্দের কন্যা-মহাবিদ্যালয় ও পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে আপনাদের কিছু বলতে ইচ্ছা করি। আমি এ পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়টি দেখি নাই, কিন্তু গত সালে আর্য্যসমাজের যে পাঁচটি মেয়ে সেখান থেকে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপে ও কথাবার্তায় যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছি তাই আজ আপনাদের জানাব।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে আর্য্যসমাজ কর্তৃক জলন্দের কন্যা-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এটি বালিকা-দের দৈনিক স্কুলই ছিল; ক্রমশঃ ইহার সঙ্গে কন্যাশ্রম (বোর্ডিং), বিধবাশ্রম ও অনাথাশ্রম যুক্ত হওয়াতে বিদ্যালয়টিকে সর্কারীন শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী করে' তোলা হয়েছে। বর্তমান বৎসরে এখানে ৪২৫টি বালিকা ও বয়স্কা মহিলা শিক্ষা পাচ্ছেন। তার মধ্যে ১৫০টি কন্যাশ্রমে থাকে, ৫০টি বিধবাশ্রমে ও ১০০টি অনাথাশ্রমে বাস করে। অবশিষ্টগুলি দৈনিক ছাত্রী। এই মহৎ শিক্ষাকার্য্যে ১০ জন পুরুষ শিক্ষক ও ১০ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই সেখানকারই ভূতপূর্ব ছাত্রী, সেজন্য তাঁরা ঐ কাজ ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করে' উহার উন্নতির জন্ত নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন

আর্য্যসমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে' বা ভিক্ষা দ্বারা টাকা তুলে এই স্কুলটি চালাচ্ছেন। বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ বড় হওয়াতে স্কুল-কমিটি জলন্দের সহবুর এক ক্রোশ দূরে প্রায় ৫০ বিঘা জমি কিনেছেন। সেখানে নূতন বাড়ী নির্মাণের জন্ত নানা স্থান হ'তে অর্থ সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। এ দেশ থেকেও তাঁরা প্রায় দশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের জায় তাঁদেরও মুখ্য বাক্য—ভগবানে নির্ভর করে' যে যার কর্তব্য করে' যাও, তিনিই ফলাফলের কর্তা।

• গত ডিসেম্বর মাসে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শেষ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে গঠিত।

জলন্দর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার • সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ধর্ম নীতি ও ব্রহ্মচর্য্য শিখান হয়। কন্যা-শ্রম ও বিধবাপ্রমের মেয়েরা প্রত্যহ বেদপাঠ, শুভগান প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করতে বাধ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে শিখে। এইরূপে আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ হওয়াতে এই অল্প সময়ের মধ্যে পাঞ্জাবী নারীদের ভিতরে যে •কিরূপ জীশক্তি জেগে উঠেছে তা দেখলে বাস্তবিক আমরা আনন্দের সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ করি। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে জীশিক্ষা ও জী-জাতির •যেক্রম উন্নতি হয়েছে, বাঙ্গালা দেশে ৬০ বৎসরে তা হয় নাই।

•এ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কুমারী ও বিধবা কন্যারা অল্প বয়স হতেই ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বদেশের জন্মে ও স্বজাতির উন্নতির জন্মে সুখারাম বিসর্জন দিতে পারেন। আর্ধ্যসমাজের শিক্ষিতা মহিলারাই সর্ব প্রথম প্রচারিকা হয়ে মহলায় মহলায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়ে মুখ ও দরিদ্র নারীদের মধ্যে ধর্ম নীতি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। সেই সমাজের মেয়েরাই কত কষ্ট ও অসুবিধা সহে দেশে দেশে টাঁদা সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। কি তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা! কি তাঁদের মনের তেজ! কি তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে, বিনা আত্মবিসর্জনে, বিনা ত্যাগে আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এ শক্তি কোথায় পাব?

এ পাঞ্জাবী মেয়েদের উদাহরণ দেখে কি আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি না যে আর্ধ্যসমাজের জলন্দর-মহাবিদ্যালয়ে যে প্রথা অবলম্বন করে' জীশিক্ষা চলছে উহাই ঠিক পথ। আমাদেরও সেই শিক্ষাপন্থা ধরে' চলা উচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পাঞ্জাবের চেয়েও কত বেশি শিক্ষা বিস্তার হয়েছে, এ প্রদেশে শতকরা ৪ জন মেয়ে লিখতে পড়তে পারে, সে দেশে ২০০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র। আমাদের মধ্যে কত মেয়ে উপাধি পেয়েছেন, কত বালিকা সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ হয়েছেন, কতজন ডাক্তারও হয়েছেন—কিন্তু বঙ্গমহিলার সে মনের বল, হৃদয়ের উচ্চতা, প্রাণের গভীরতা কোথায়? প্রকৃত

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মামুষকে মামুষ করা' মামুষের ভিতর মামুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা, মামুষকে পার্থিব লাভা-লাভের উপরে তুলে •দেবতার আসনে বসান। এ পাঞ্জাবী মহিলাগুলি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দ্বারা দেহের শক্তি ও আত্মার তেজ লাভ করেছেন, যাহা দ্বারা তাঁরা শত শত পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন, কত পথ হেঁটে পল্লীতে পল্লীতে পরিদর্শন করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কত মিতাহারে কঠোর শয্যায় দিবারাত্রি যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের তাতে অক্ষিপ নাই, দেশের কাজের জন্ম, নারী জাতির উদ্ধারের জন্ম, তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। জীশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতা ও সুমার্জিতা ভারতীয় জননী গঠন করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এত শিক্ষিতা হয়ে ও এত শিক্ষার সুযোগ পেয়েও আমরা পাঞ্জাবী ভগিনীদের তায় মনের বল ও হৃদয়ের তেজ সঞ্চয় করতে পারছি না কেন? প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে একটা কথা বলতে হলে আমরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, রাস্তায় এক পা চলতে হলে আমাদের যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়! তাঁদের সাদাসিঁদে পরিচ্ছদের কাছে আমাদের পোষাকটা পর্য্যন্ত যেন আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়! এই-সব দেখে স্পষ্টই বোধ হয় আমরা যে-পথ ধরে' চলেছি, ভারতীয় নারীর পক্ষে তাহা প্রকৃত আদর্শস্বরূপ ঠিক পথ নয়। এ পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কেবল পাশ্চাত্য বা বিলাতীর অনুকরণেই হয়েছে; অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে শিক্ষা পাচ্ছেন। তার ফলে অনেক মেয়ে ড্রইংরমে অতি সুন্দর ইংরেজী কথা কইতে ও পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারেন; অনেক মহিলা বিলাতী আদবকায়দায় অতি সুন্দর ভাবে নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারেন—কিন্তু জীবনের কঠোর ব্রতসাধনে জয়ী হতে পারবেন কয়জন? প্রকৃত আদর্শ নারীর উচ্চাসনে বসবার যোগ্য হয়েছেন কয়জন?

অবশ্য আমি ২৪টা বঙ্গমহিলা বাদ দিচ্ছি, যারা সকল বিষয়েই পারদর্শিনী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চ-

শিক্ষিতা মেয়েদের দেখে আমাদের ইহা স্পষ্ট বোধ হয়েছে যে পাশ্চাত্য অক্ষুরণে শিক্ষা আমাদের ভারতীয় রমণীর পক্ষে কিছুমাত্র হিতকরী নয়। আমরা বহুকাল অশিক্ষা ও অবরোধের মধ্যে থেকে দেহের শক্তি ও মনের বল ও সাহস হারিয়েছি। আমরা যে-শিক্ষা দ্বারা সেই জীশক্তি ফিরে পাব, যার চর্চায় ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে, যে-সংঘের দ্বারা আমরা সকল অবস্থায় নিজেদের সমান ভাবে চালাতে পারব, যাতে আমাদের সংকীর্ণ মন প্রশস্ত ও উদার হয়ে সকলকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারবে—যাতে আমরা পরস্পরের দোষ ক্ষমা ও গুণ গ্রহণ করতে শিখব—সেই সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষাপ্রথা আমাদের মধ্যে চলিত করতে হবে।

পাঞ্জাবী মেয়েদের দেখে ইহাও স্পষ্ট বুঝা গিয়েছে যে, আমাদের এ প্রদেশের নারীর উচ্চশিক্ষা বাহিরের দিকে খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু আপনারা তলিয়ে দেখবেন ইহা অন্তঃসারশূন্য। এ শিক্ষা দ্বারা আমাদের মনের বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি না বেড়ে আরো কমে যাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষে অশিক্ষিত দেশের নারীদের তুলনায় যতই শিক্ষার অভিমান করি না কেন, যতদিন না আমরা বর্তমানের সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী বর্জন করে ভারতীয় বা প্রাচ্য ভিত্তির উপর শিক্ষাপ্রথা স্থাপিত করব, আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ করব, ততদিন আমাদের প্রকৃত শিক্ষা বা উন্নতি কখনই হতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ২১ টী মেয়ের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবে বাঙ্গালীমেয়েরা কখনই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

উপসংহারকালে মাননীয় লর্ড বিশপের কথাগুলি উদ্ধৃত না করে থাকতে পারছি না। গত সপ্তাহে ডায়ো-সিসন বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাইজ-বিতরণ-উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন—ভারতীয় নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী কখনই ঠিক হবে না। আদর্শ রমণীর উদাহরণ খৃস্টাব্দে অন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে যাবার দরকার নাই। এ দেশের মহিষারা যে রকম উচ্চ ধর্মের, সতীত্বের ও শাসনকার্যের পর্যন্ত আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন,

সে রকম জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। সেই-সব উন্নত নারীচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের অনুসরণ করে' চললেই বর্তমান ভারতীয় কণ্ঠাদের শিক্ষা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে।—তিনি বিদেশী হয়েও বুঝেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্য মহিলাদের পক্ষে কখনই প্রকৃত উপকারী হতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা অনেক সময় ছায়াটা ধরে প্রকৃত বস্তুকে হারিয়ে ফেলি। সে কারণে প্রথম থেকেই ভারত-জাতি-মহামণ্ডল যাতে পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করে বাঙ্গালী মেয়েদেরও তাঁদের মত শক্তিশালিনী করে গড়তে সক্ষম হয়, আমাদের সকলেরই প্রাণপশে সেই চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

## লাঞ্ছিতা \*

রামহরি বাবু চাপকানটি পরিয়া তালি-দেওয়া জুতাটিতে পা গলাইয়া দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা সাড়ে নটা। উর্দ্ধ্বাসে না ছুটিলে আর ১০টার মধ্যে আফিসে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। তাড়াতাড়ি জুতা পরিয়া ছাতাটি লইয়া ছুটিয়া বাহির হইবেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন “বলি, চলে কোথা? যত জ্বালাতন সব কি আমি একা ভোগ করুব? তোমার কি একটু হুঁস নেই? এমন ঝগাটে কি যাহুবে পড়ে? একে ত কাজ করে করে অবসর নেই, তার উপর আবার এ রকম উৎপাত হ'লে বাঁচ'ব কি করে?”

রামহরি, বাবুর তখন কঠকাস আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও চলে। কারণ তিনি দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ব্যাপারটা বুঝিতে গেলে আজ আর আপিসে যাওয়া হয় না। কাজেই বৃষ্টি ঠুকিয়া ছাতা লইয়া নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য সদর দরজা খুলিলেন। দরজার সামনে পথের উপর একটি দশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কপাল কাঁটিয়া রক্ত পড়িতেছে। মেয়েটি এক হাতে কাপড় দিয়া রক্ত

\* Jean Marat রচিত প্রবাসী গল্প হইতে।

মুহুর্তে মুহুর্তে কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।  
মেয়েটি রামহরি বাবুর মৃত ভ্রাতার কন্যা।

রামহরিবাবু বলিলেন “কি হয়েছে রে পুঁটি? কপাল  
কাটল কি করে? দেখি, ওঃ এতখানি কেটেচিস? চ', চ',  
বাড়ীর ভেতর চ', পটি বেঁধে দিই গে। রক্তে  
কাপড়খানা ভেসে গেল যে। কাটলি কিসে? এঁয়া?”

পুঁটি কেবল কাঁদে, কথা কয় না। রামহরিবাবু  
তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গামছা  
ভিজাইয়া মাথায় পটি বাঁধিয়া দিলেন। ‘কি হয়েছে?’  
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল  
“কাকিমা মেরেছে।”

পুঁটি আজ এ অভিযোগ কেন করিল জানি না।  
ইতিপূর্বে কাকার কাছে কাকিমার নামে কোনও অভি-  
যোগ করিয়া কখনও কিছু ফল সে পায় নাই। যে দিন  
কাকিমার অসাবধানতায় বিড়ালে দুধ খাইয়া যাওয়ার পর  
তাহার কাকিমা খানিকটা দুধ জলে মিশাইয়া রান্নাঘরের  
মেঝেয় ঢালিয়া দিয়া রামহরিবাবুকে শুনাইয়াছিল  
“এমন হতভাগা মেয়ে ত বাপু বাপের জন্মেও দেখি নি।  
যত ছড়োছড়ি খেলা রান্নাঘরের ভেতর এক কড়া দুধ  
গেল, ছেলেপুলে সব খায় কি?” সে দিন পুঁটি কাকাকে  
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ব্যাপারটা কি। কাকা  
বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে উত্তরে কেবল  
বলিয়াছিলেন “চুপ্ করু। চুপ্ করু।” আবার যেদিন  
তাহার কাকিমা তাক হইতে পাথরবাটি পাড়িতে গিয়া  
তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেন ও রামহরিবাবুর কাছে নালিস  
করিলেন “এত বড় মেয়ে, একটুও শাসন নেই। আমি  
ত আর পারি না। সকাল থেকে আবদার ধরলে পাথর  
বাটি নিয়ে খেলা করুব। কত বারণ করুলুম, ভেদে  
যাবে। ওমা, তা কি মেয়ে শোনে! না হয় নিগ্গে  
বাপু, এই বলে ত বাটিটা দিলুম। তিলেককে সেই  
বাটিটাকে টুকরো টুকরো করে ফেললে। এমন করলে  
কি সংসারে লক্ষ্মী থাকে?” সে দিনও পুঁটি কাঁদিতে  
কাঁদিতে নিজ নির্দোষিতার কথা কাকাকে জানাইবার  
চেষ্টা করিয়াছিল। কাকাবাবু তাহাতে একটিও কথা  
কয় নাই। কেবল কাকিমা গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন

“আবার মিথ্যে কথা? অতটুকু মেয়ের ভেতর এতখানি  
সয়তানী?”

এইরূপ অনেক দিন গিয়াছে কিন্তু আদ্য আবার কি  
প্রত্যাশায় পুঁটি এ কথা বলিল তাহা বুঝিতে পারি না।  
হয় ত মনে করিয়াছিল কাকিমা তাহাকে যে কাঠের বাড়ি  
মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাহার  
কাকা-বাবুর দয়া হইবে। হয় ত তাহার আঘাত দেখিয়া  
কাকা-বাবু বুঝিবেন যে দোষ তাহার কিছুই নাই। কি  
ভাবিয়া পুঁটি বলিল ‘কাকিমা মেরেছে’ তাহা জানি না,  
কিন্তু যেই সে এই কথা উচ্চারণ করিল অমনি ঝড়ের মত  
তাহার কাকিমা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

“আমি মেরেছি। ওগো দেখে যাও একবার মেরে-  
টার কাণ্ড দেখে যাও। তোমার ঘড়িটার কি অবস্থা  
করেছে একবার দেখ।”

“এঁয়া? আমার ঘড়ির কি করেছে?”

রামহরিবাবু ছুটিয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করি-  
লেন। দেখিলেন তাহার একমাত্র রুক ঘড়িটি ব্র্যাকেট-  
সমেত দেওয়াল হইতে মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া  
গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একখানি উঁচু টুল।  
তাহার উপর উঠিয়া কেহ ব্র্যাকেট টানিয়াছে।

রামহরিবাবু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। পুঁটির  
আঘাতের কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। উচ্চ  
কণ্ঠে “পাজি মেয়ে, দাঁড়া আজ তোকে বাড়ী থেকে  
দূর করে দেবো তবে আমার অগ্র কাজ।”

এই বলিয়া রামহরিবাবু দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া  
গেলেন।

তখনও কাকিমার ঝঙ্কার উঠিতেছিল। প্রায় একঘণ্টা  
গালাগালির পর কাকিমা আহা হারা দি করিলেন। পুঁটিকে  
কেহ ধাইতে ডাকিল না। মাথার বেদনায়, স্কন্ধের আলায়  
সে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় তাহার  
কাকিমার উচ্চকণ্ঠ শুনিতে পাইল “বলি, পড়ে থাকলে  
সংসার চলবে কি? যা চট করে দোকান থেকে এক  
পয়সার হলুদ কিনে নিয়ে আস। খোকা কাঁদছে, কোলে  
করে নিয়ে যা।”

পুঁটি গালাগালির ভয়ে পয়সা লইয়া খোকা

কোলে করিল। খোকা তাহার কাকিমার ছেলে, বেশ  
হুঁপুট। হাতে দুগাছি ছোট সোনার বালা। গায়ে  
একটি ক্রানেলের জামা।

পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া রাস্তায় বাহির হইল।  
তখনও মধ্যে মধ্যে রোদনবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া  
উঠিতেছিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একজন লোক  
তাহাকে বলিল “কি হয়েছে খুকী? কাঁদছ কেন?”

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, লাল রূপার গায়ে টেড়িকাটা  
একজন যুবক। তাহার পায়ে বাণিশ-করা জুতা।  
কোঁচান কালাপাড় কাপড় পরা। পুঁটি কিছু বলিল না।

আগন্তুক বলিল “কাঁদছ কেন? খিদে পেয়েছে?  
চল তোমায় খাবার কিনে দিই গে।”

পুঁটির সেদিন সকাল হইতে কিছুই আহার হয় নাই।  
ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে আগন্তুকের সঙ্গে  
সঙ্গে চলিল।

দুই তিনটি রাস্তা পার হইয়া একটি গলির মোড়ে  
পৌঁছিয়া আগন্তুক পুঁটিকে বলিল “ঐ দোকান থেকে দু  
আনার খাবার নিয়ে এস। খোকাকে আমার কোলে  
দাও। খাবার নিয়ে এখানে এনে এই রকে বসে খাও।  
তারপর খোকাকে নিয়ে যাবে।” পুঁটি খোকাকে  
আগন্তুকের কোলে দিয়া গলির ভিতর ঢুকিল। খানিকটা  
দূরেই একখানা বড় খাবারের দোকান।

খাবার কিনিয়া গলির মোড়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,  
খোকা রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। আগন্তুক নাই।

সর্জনশ! খোকার হাতের সোনার বালা? পুঁটির  
গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। খোকার বালা কি হইল?

পুঁটি আর দাঁড়াইতে পারিল না। রকে বসিয়া  
পড়িল। রকে বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে  
লাগিল। পাশে খাবারের ঠোঙা পড়িয়া রহিল। তাহার  
সেদিকে ত্রুক্ষেপও নাই। খোকা একখানা জিলিপি টানিয়া  
লইয়া কামড়াইতে লাগিল ও মুখেও লালে ও জিলিপির  
রসে জামা ভিজাইয়া তুলিল।

শেষে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। পুঁটি তখন খোকাকে  
কোলে লইয়া থামাইবার চেষ্টা করিল। খোকা কিছুতেই  
খামিল না। ক্রমশঃই তাহার কান্না বাড়িতে লাগিল।

তখন পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া খাবারের ঠোঙা  
লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী ঢুকিতে আর তাহার পা উঠে না। শেষে, কি  
ভাবিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পুঁটি প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইয়া বাড়ীর  
বাহির হইয়া আসিল। দরজা পর্য্যন্ত তাহার পিছনে  
কে দৌড়াইয়া আসিল, তাহার পর সদর দরজা সশব্দে বন্ধ  
হইয়া গেল। খিল পড়িল। পুঁটি তাহা দেখিল না। সে  
তখন উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতেছে।

তাহার কাকিমার ছেলে-মেয়েরা তখন মহা উল্লাসে  
খাবারগুলি খাইতেছিল।

সন্ধ্যাকালে কলিকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের সন্মুখে মহা  
জনতা। চতুর্দিক বৈজ্ঞানিক আলোকে উদ্ভাসিত। কত  
মোটর গাড়ী, কত বিচিত্র যান, সাহেব বিবিদের আনিয়া  
হোটেলের সন্মুখে নামাইয়া দিতেছে। রাজপথের দিকে  
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচের ভিতর দিয়া হোটেলের ভিতর  
সজ্জিত কত কি জিনিস দেখা যাইতেছে। ভিতরে  
ভোজনের মহা আয়োজন। শত শত পরিচারক স্মৃশ্রু  
কাচপাত্রে উষ্ণ খাদ্যসামগ্রী বহন করিতেছে। কত মদ্য;  
কত পানীয়। কতই না ভোজনের উল্লাস।

বাহিরে শীতের কনকনে বাতাসে একখানি কাপড়ে  
কম্পাঙ্কিত দেহখানি জড়াইয়া ক্রান্তচরণে ঘূর্ণায়মান মস্তকে  
পুঁটি সবিস্ময়ে হোটেলের গবাক্ষগুলির দিকে চাহিয়া ছিল।  
সে সমস্তদিন পথে পথে ছুটিয়াছে। পরিধানে সেই রক্ত-  
সিক্ত বসন। সে দূর হইতে হোটেলের মোহন সৌন্দর্য  
দেখিয়া ভাবিতেছিল “ঐ বুঝি স্বর্গ। ওখানে গেলে বুঝি  
ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রেশ থাকে না।”

“এইও! হট যাও। হট যাও।” দরওয়ান  
হাঁকিল।

পুঁটি অবসন্নপদে লোলুপ দৃষ্টিতে হোটেলের সজ্জিত  
কক্ষ দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা রামহরি বাবু দ্রুতপদে চলিয়া  
যাইতেছেন দেখিয়া তাহার পাড়ার গোবিন্দ বাবু বলিলেন  
“কি রামহরি বাবু! কোথা যাচ্ছেন?”

“একবার ধানায় যাচ্ছি। আমার ভাইঝিকে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

“বলেন কিস্তি ? সর্বনাশ ! এই যে কাগজে পড়ছিলুম—”

“কি ? কি ?”

গোবিন্দবাবু সংবাদপত্রে একটা প্যারা দেখাইয়া দিলেন।

“সন্দেহজনক মৃত্যু। গত কল্যা রাত্রি বারটার সময় জনৈক সাহেব গড়ের মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষতলে এক বালিকার মৃতদেহ দেখিতে পান। বালিকার বয়ঃক্রম দশ এগার বৎসর হইবে। পরিধেয় বসন রক্তাক্ত। দেখিলে সম্ভ্রান্ত বংশমভূতা বলিয়া মনে হয়। পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছে। বোধ হয় অলঙ্কারের লোভে কেহ ইহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

## কষ্টিপাথর

প্রতিভা ( আশ্বিন-কার্তিক )।

ভাটিয়াল গান—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত—

( ১ )

মন পাগেলা রে, আরে হরদমে গুরুজির নাম লইও।

( ওরে লইও নামটা পরম যতনে )

ওরে দিবা নিশি লইও নাম,

কাষাই নাহি দিও।

ওরে ভাই বল, বন্ধু বল, সব সম্পদের সাধী,

ওরে অসময় নিদানকালে গুরুর নাম সারথি।

ওরে টাকা বল, কড়ি রে বল, সব পুরাণ হয়ে যায় ;

আমার গুরুজির নাম সদা নতুন রয়।

( ২ )

আমি দোষী হইয়াছি,—

দোষী হইয়াছি—আমি শ্রীগুরু গৌরান্দ্রপদে

প্রাণ সইয়াছি গো।

• দোষী হইলাম ভাল হইল গো,—

তাতে ক্ষতি নাই ;—

ওগো যার অন্তে হইলাম গো দোষী—

তারে যদি পাই গো।

• পয়ের বন্দ পুষ্প-চন্দন গো,—

ওগো অলঙ্কার গায়,—

নেইচে গেয়ে ব্রজে গো যাব—

• নিতাই বাঞ্ছির নাম গো।

( ৩ )

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাইরে পানাপানী  
আমি যেই দিকে চাই সেই দিকে দেখি অকুল পাথর।  
উদ্ভুধন্দু নইরাকারে, সৈ কথা মনে পইলে কাগর করে,  
চিন্তায় অর অরে—না দেখি উপায় ( গুরু বিনে )।

( ৪ )

হুঁখু কইও রে—

নিঠুরের কাছে সঠি হুঁখু কইও রে।

সই গো সই, যেই কালে পীরিত্তি করলাম

যমুনার ঘাটে,—

ছাড়ু ম না ছাড়ু ম না বইলা—

হাত দিল মাথে রে।

সই গো সই, যখন গো পীরিত্তি করলাম

তুমি আমি জানি।

এখন কেন সে-সব কথা—

লোকের মুখে শুনি রে।

সই গো সই, বট বিরিকের তলে গেলাম

ছেওয়া পাইবার আশে,

পাতা ভেইদা রৌদ্ গো লাগে

আপন করম-দোষে রে।

( ৫ )

পাখী তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি  
আর আমায় জ্বালাইও না—আমার মাথা খাও  
জ্বালাইও না—“বউ কথা কও” বলে গো ডাইকো না।

পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,

আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভূলে ;

যদি ডাক নিশি কালে

আমি কাইন্দা ভিজাই বিছানা।

( ৬ )

দিবা নিশি হরি বলে কে

—বান্ধবীর মায়রা

অহর্নিশি হরি বলে কে।

হরি বলে কে, গৌরান্দ্র বলে কে,

ওরে মনের সাথে হরি বলে কে

—বান্ধবীর মায়রা।

কে শুনাইলা এই হরির নাম,

ওনের বান্ধব বলি তারে,

ওরে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কইরা

দয়াল নিতাই এইসেছে রে

—বান্ধবীর মায়রা।

হরি হরি হরি রবে মায়-বৃন্দের ধনে

• উঠলাম জেইগে ;—

হরির নামে পাষণ পলে।

—বান্ধবীর মায়রা।

হরি হরি বইলে আমার নিতাই নাচে

বাহু তুইলে,

হরির নামে বন প্রাণ হরে

—বান্ধবীর মায়রা।



( ৬ )

এই না কার্লরূপ আমার লাগিল নয়নে গো—

কলঙ্ক রইল জলে ।

ভরা না ছুইফরের কালে জল ভরিবার যাই,

জলের ছায়ায় কৃষ্ণরূপ গো—( যেমুন ) দেখিবারে পাই গো,

কলঙ্ক রইল জলে ।

সব সখী লাল গো, নিল ,

গউরু বরণ সাড়ি ;

শ্রীরাধার পৈরণে শোভে গো—

কৃষ্ণ নীলাশ্রয়ী গো—

কলঙ্ক রইল জলে ।

( ৭ )

আ-গো মা কালো জামাই ভাল লাগে না—

একে ত চিকন কালা, গলে দোলে বনমালা,

ওগো আমাবস্থা রাইতে গো মা,

আমি চক্ষে তারে দেখি না ।

## ভারতী—(মাঘ) ।

## নোবেল প্রাইজ—বীরবল—

সব জিনিষেরই দুটি দিক আছে—একটি সদর আর একটি মফস্বল । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে বহু লোক যে খুসি হয়েছেন তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সকলে যে সমান খুসি হননি এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি । এই বাঙ্গলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখক-সম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিশে বিষাদ ঘটেছে । আমি একজন লেখক, সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি ।

প্রথমতঃ যখন একজন বাঙ্গালী লেখক এই পুরস্কার লাভ করেছেন, তখন আর-একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে তা উপড়ে ফেলতে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে । অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড় জোর তাঁর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ, তাই বলে পড়তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে নোবেল প্রাইজ পাব না এ হতে পারে না । সাহিত্যের রাজটীকা লাভ করা যায়—কপালে । তাই বলছি আশার আকাশে দোহুলামান এই টাকার খলিটি চোখের স্তম্ভে থাকতে লেখা জিনিষটে আমাদের কাছে অতি সুকঠিন হয়ে উঠেছে ।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয়, আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে, তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । চলাফেরা দূরে থাক, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়, এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি । তেমনি নোবেল প্রাইজের সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি, লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে আমরা, আর হালকা ভাবে কলম ধরতে পারি নে ।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র সুইডিশ একাডেমির মুখ চেয়ে লিখতে বাধ্য । অথচ যে দেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত সে দেশের লোকের মন যে কি করে পাব তাও বুঝতে পারি নে ।

এইটুকু মাত্র জানি, যে আমাদের রচনার অর্ধেক আলো আর অর্ধেক ছায়া দিতে হবে, কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তাই হিসেব করে বলে দেয় ? সুইডেন যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালি পৌঁচড়া দিয়ে যেতে পারতুম ; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয় ভরসা করে সাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম । কিন্তু অবস্থা অন্তরূপ হওয়াতেই আমরা উভয়সঙ্কটে পড়েছি ।

দ্বিতীয় মুন্সিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী ভাবে লেখা চলবে না । ভবিষ্যতে ইংরেজি তর্জমার দিকে এক নজর রেখে,—এক নজর কেন পুরো নজর রেখেই—আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য গড়তে হবে । অবশ্য আমরা সকলেই দোভাবী, আর আমাদের নিতা কাজই হচ্ছে তর্জমা করা । কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখী মেরে উঠতে পারি নে । আমরা যখন বাঙ্গলা লিপি তখন ইংরেজির তর্জমা করি, কিন্তু সে না-জেনে ; আর যখন ইংরেজি লিপি তখন বাঙ্গলার তর্জমা করি, সেও না-জেনে । কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে, মুন্সিল ত এখানেই । মনোভাবকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে, আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোশাক পরিয়ে সুইডিশ একাডেমির স্তম্ভে উপস্থিত করতে হবে । এবং এর দক্ষণ মনোভাবটির চেহারাও এমনি ত'য়ের করতে হবে যে, শাড়ীতেও মানায় পাউনেও মানায় ।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে, যুগপৎ, দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বলেও অতুক্তি হয় না । কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্যসাধন করতেই হবে । একটি বাঙ্গালী আর একটি বিলাতি—এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন । তা ছাড়া এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে এ দুই সংসার করাও মিছে । সর্বভূতে সমদৃষ্টি চাইকি মানুষের হতেও পারে, কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হৃদয় শুধু একটি । স্ত্রী হতে হলে একটি মাত্র স্ত্রী চাই । এমন কি, দুই দেবীকে পূজা করতে হলেও পালা করে করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই । অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্ধেক সময় আমাদের বাঙ্গলা লিখতে হবে, আর অর্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তর্জমা করতে হবে । ফিরেফিরতি সেই সুইডেনের কথাই এল । অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই ।

তৃতীয় মুন্সিল এই যে, সে তর্জমার ভাষা চলতি হলে চলবে না । সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না । দেশী জাভা এমনি ভাবে বিলাতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে । ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির । প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার পায়ের রং থাকা চাই দেশী পোকের । এক কথায় আমাদের পূর্বের স্বর্ঘ্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে । এহেন অঘটন-ঘটন-পটয়ঙ্গী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই ।

কাজেই যে কার্য আমরা একদিন বাঙ্গলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছি—রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ—তাই আবার দোকর করে ইংরেজিতে করতে হবে । ইউরোপে আসল জিনিষট প্রায় হচ্ছে বলে নকল জিনিষটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা ছরাসী

মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে, আমরাও যে সে দেশে মেকি চালাতে পারব এমন ভরসা আশার নেই।

কলে আমরা সাদাকে কালো, আর কালোকৈ সাদা যতই করি না,—আমাদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ শিকিয়ে তোলা রইল। এককথা যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে শিকিয়ে যদি ছিঁড়ে? সেও ঘাবার বিপদের কথা হবে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অর্থ এক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎসংস্ঠ গৌরবটুকু। বাঙ্গলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাটু-টুকু। স্বদেশের শুভইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে' ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে আমাদের সাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা পরিয়ে দেয়, তাহলে তার কলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি না হয়ে হাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন, যে, নোবেল প্রাইজের তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়বার কিংবা গড়বার অবসর আর আমাদের থাকবে না। এক কথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফুলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্রের রচনা করতে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে নোবেল প্রাইজ লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্য-জীবনের মোক্ষ লাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিবা স্মরণে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব জিনিষটে ওভাবে আশ্রয় করা চলে না। দেশসুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে “গৌরবে বহুবচন।” কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে কোন একটা নজির নেই বলে, এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। অপর পক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম জাত্ভাব জেগে ওঠে তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একীধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাহুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এই কথা বেরিয়ে যায় যে “ছেড়ে দে মা বেঁচে যাও।” এবং ও কথা একবার মুখ ফেলে বেরিয়ে গেলে, তার ফল, কবিকে কেঁদে মরতে হবে।

তাই বলি আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ হচ্ছে দিল্লির লাডু, যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।

## তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ( মাঘ )।

### সত্যের দীক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারিদিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, সে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারি মধ্যে বেশ আরামের থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে

জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ তার বেদনাবোধ থাকে না। যেমন যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোট ছোট খাঁচায় ঘুমলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। কিন্তু একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড় আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্বোধিত হলে বলে ওঠে—“কি হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে, এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোন ভাবনা চিন্তা নাই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে তা জানি। কিন্তু এ আমার নয়।” সংসারের পনেরো আনা লোক যেমন ধনমনে বেষ্টিত হ'য়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে আছে, তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু একবার যদি কোন আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়, অমনি মনে হয় এ কী কারাগার। এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোন জ্ঞাবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড় বড় আঘাত এসে পৌঁছায় আবরণ ভাঙবার জন্তে—এবং তাঁরা সংসারে, যাকে অভ্যস্ত আরাম বলে লোকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকে, তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। তিনি বলেন—আমার পিতাকে আমি জানতে চাই; দশজনের সত করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না। সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, দশজনের মুখের কথায়, শাস্ত্রবাক্যে, আচারে বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেন। সেই তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, সে মুক্তির দীক্ষা গ্রহণ। যে দিন পক্ষিশাবকের পাখা ওঠে সেইদিনই পক্ষিমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার তার মুক্তির দরকার। চারিদিকে জড় সংসারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চান।

আমরাও তাঁদের কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা জীবনে উপলব্ধি করব; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তার সঙ্গে আমাদের যোগ হ'তে দিচ্ছে না, তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয়, তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্তে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হ'বে।

সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোন নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন—যাঁরা মানুষকে এই সব কৃত্রিম সংসারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনেই জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। সে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি, তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীন পড়ি এবং সেই নামের পূজা শুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলে বিদ্যালয় করলে মানুষের নাম যেমন বদলায় না, তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব, সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

যে-কোন দেশ থেকে, যে-কোন সমাজ থেকে যেই আসুক না কেন, আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ দেশান্তর দূর ছুরাজর থেকে যে-কোন ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন

করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোন সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোন সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সঙ্কুচিত না হয়।

আমাদের দীক্ষামন্ত্রটি ঈশাবাস্যমিষ্টং সর্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখ। সর্বত্র, সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোন সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে সে সত্যকে শেখ ক'রে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে আনন্দিত হই।

### উৎসব-দেবতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কতদিন নিভতে এখানে তাঁর নাম শুনেছি। আজ এই জন-কোলাহলেও তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্ছে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকেই চারিদিকে বেঁটন করে উঠেছে। আজ অন্তরের অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্ধ্যামীকে বিরলে স্বরণ করবার দিন নয়—সংসার-তরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন, আজ তাঁকে দেখবার দিন। এই কোলাহলে যিনি শাস্তং শিবং অদ্বৈতং তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে রয়েছেন। কোলাহলের মধ্যে যেখানে নিস্তর তাঁর আসন, আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জগু চিন্তকে উদ্বোধিত করি।

আমাদের উৎসব-দেবতা কোলাহল নিরস্ত করেননি, তিনি মানা করেননি। তাঁর পূজা তিনি সবশেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, কারণ তাঁকে না মেনে কোন উপায় নেই। কিন্তু যিনি রাজার রাজা তাঁর কোন আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক—তাঁর কোন তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক—এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা তাঁর কাছে কোন ভয় নেই। বিশ্বের আর সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। কিন্তু কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোন ভয় নেই—তিনি বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও কোন ক্ষতি নেই। তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্লিপ্ত? কিন্তু তাঁর শাসন নেই। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘৃণ দিচ্ছি—তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্ব-মন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন গনিয়ে আসছে আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে পরকালে গিরে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে! যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটেছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না—তারি জগু তিনি যুগযুগান্তর ধ'রে অপেক্ষা করে রয়েছেন। যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে—এতেও তিনি বৈর্ঘ্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনই ক্ষতি নেই।

কিন্তু এতে কার ক্ষতি হচ্ছে? ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদার্থাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমानी লোকের, কোন ক্ষতি হচ্ছে না—কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। এই যে বিশাল

বহুক্ষরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে জ্ঞান নিয়ে কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব? সেই সার্থকতার জন্তেই যে তৃষিত হ'য়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু ভয় নেই, কোথাও কোন ভয় নেই। কারণ যদি ভয়ের কারণ থাকত, তবে তিনি উদ্বোধিত করতেন। তিনি বলেছেন—আমি তাঁর জোর ক'রে চাইনে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এই জন্তে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব—আমার হ'ল না, আমার হৃদয় ভরল না। যে দিন সত্য ক'রে চাইব, সে দিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু এ ভুল তবে রয়েছে কেন? আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁছেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রসাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত ক'রে দিচ্ছে—অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে। কোথা থেকে হঠাৎ বসন্ত সমীরণ আসে—যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বৈষবিদ্বেষ, চারিদিকে এত উন্নততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের চৈতন্য যে কেবলি জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনা গান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না? তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্ববগান উঠছে। 'অনন্তদেবের প্রাক্রণে সেই স্ববগান ধ্বনিত হচ্ছে—শোনো, একবার শোনো। এই অর্ধশতাব্দী নিগিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জগু বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা যে অনন্ত পথের পথিক—আমরা যেকোন যুগ ধরে চলেছি। যারা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচছে। তাই যদি না পৌঁছায় তবে কি নিয়ে আমরা থাকব? এই কাড়াকাড়ি মারামারি উত্তরুত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে? এই জন্তেই কি জন্মেছিলুম? এই যে সংসারি জন্মেছি, চলেছি—এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে—তা কি আমরা দেখছি না? কেবলি কি দেখে পদার্থাদা, টাকাকড়ি, বিষয়বিভব—আর কিছুই নয়? যিনি সকল মানবের বিধাতা, একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না? পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না?

কিন্তু ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অজ্ঞান হয়ে আছি—তবু বলা যায় না,—শুভক্ষণ বে কখন আসে তা বল যায় না। তাই তো এখানে আসি। কি জানি যদি মন ফিরে যায়! তিনি যে ডাক ডাকছেন—তাঁর প্রেমের ডাক—যদি শুভক্ষণ আসে,

শুন্তে পাই! সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি—এই মুহূর্তেই হয় ত তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলেনি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে! আমাদের সত্য প্রার্থনা—যা চিরদিন অস্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক। অসত্যের সঙ্গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যা জাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধনিত হ'রে উঠুক।

### উৎসব-দিন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

আজ আমাদের উৎসবের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অল্প দিন থেকে স্বতন্ত্র—প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যে জন্মে আমরা ঘরের অগ্নিকে একটু দূরে নিয়ে খাবার জন্মে বনভোজনে যাই। প্রত্যাহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই আজ আমরা আমাদের প্রতিদিনের অগ্নিকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্মে আয়োজন করেছি।

কিন্তু বনভোজনের আয়োজনে যখন খাটুসামগ্রী দূরে এবং একটু বড় করে বয়ে নিয়ে বেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তাহলে সে দিন দেখতে টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত অগ্নির বনভোজনের আয়োজনে হয় ত অভাব দেখতে পাব। যদি পাই তবে সেই অস্তরের অভাবকে বাইরের কি দিয়েই বা ঢাকা দেব? কিন্তু ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখীর বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে, বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অগ্নমনস্কতায় সেই রসুনচৌকি ভালকরে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শাস্ত করে বসি; অঞ্জলি করে হাত পাতি; তাহলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারিদিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকিনি বলেই যাঁকে দেখিনি, আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায় ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। যেননা তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের ভিতরের রস যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে; সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে কণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা, তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্বোধিত করি। কণকালের জন্মও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্মও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সময় কোনো দিন মরবে না—সেই অমৃতবীজ চিরকালের মত

আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমত করে একবার আমাদের চিত্তপ্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি তাহলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু ধরে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক, এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হোন, ধরণীর শামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে, আজ চিরসুন্দর দেখা দিন! শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে, তেমনি করেই আজ সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক! যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তার ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয়, তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

### নূতন গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মিথ্যে বিভাস—কাশ্মীরি খেমটা।

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে  
ফুলবনে  
তারি মধু কেন মন-মুপে  
খাওয়াও না!

নিত্য সস্তা বসে তোমার প্রাঙ্গণে  
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন  
গাওয়াও না!

বিশ্বকমল ফোটে চরণ চুখনে  
তোমার মুখে মুখ তুলে চায়  
উন্ননে।  
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে  
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া  
চাওয়াও না!

তোমার  
আকাশ ধায় রবি তারা ইন্দুতে,  
বিরাম-হারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,  
তেমনি করে মধুসাগর-সন্ধান  
আমার জীবন-ধারা নিত্য কেন  
খাওয়াও না!

তুমি  
(ওগো) তোমার কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ;  
ফুলের বন্ধে ভরিয়া দাও সুগন্ধ,  
তেমনি করে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে  
কেন ঘাঁরে তোমার নিত্য প্রসাদ  
পাওয়াও না!

### অগ্রসর হওয়ার আস্থান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

সমাতনধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোণো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়াধেঁবে টেন্ডুলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি ব'লে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা এখন অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে মন্দিরে যাওয়া অসম্ভব হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে প'ড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেই অস্ত্র ধর্মকে আঘাত দেবার আনন্দ বুদ্ধিমান লোকদের খুব একটা কাজ হয়েছে। অথচ ধর্মকে আঘাত মাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে? তাতে কিছু দিনের মত মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবী জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দস্ত করতেন, সে দিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়—নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধর, আমাদের দেশে চার্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপ্ত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিলে যে চলে না—এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ওদেশের লোকেরা মনে করছে যে ঐ-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলেই ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ঐ-সব ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্মের সত্যতাকে তারা খুঁজছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপারে তারা যদি বিশ্বাসের মূল না পায় তবে অশু কিছুতে এমন কি ভিত্তি পাবে? ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেই-জন্ত ওরা যদি কখনো দেখে যে মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে—যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি, তেমনি একটা অধ্যাত্ম-দৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়—তাহলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেমস প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে mystic ব'লে যাঁরা গ্যা তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন—তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড় আশ্চর্য।

অতএব ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্ব-দেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। Dogmaর কোন অংশ না টিকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা

দেখতে পাওয়া যায়—সে বড় খারাপ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোন বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোন দেশের কোন লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভাল লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্বের যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না ব'লে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্তে খৃষ্টান অত্যন্ত খৃষ্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়তন-চেষ্টে শিলমোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সব রকম সাহিত্যরস সবাই নিজের ব'লে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠেছে। এবং সকলের চেয়ে বেটা পরম ধন—ধর্ম—সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না—সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনোবী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক।

তুমি এস, আরো কিছু দেখবার আছে—এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোন জায়গায় ঈশ্বর বন্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে, সমাজে, সকল দিকে স্বর্গ থেকে উপর থেকে ডাক আসছে—তোমরা চলে এস, তোমরা ব'লে থাকতে পারবে না। ইহলোকের মধ্যেই সেই পরে-যা-হবে তার ডাক মানুষ শুনেছে ব'লেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করেছে। সেখানে তার সঙ্কীর্ণতা সেখানে ক্রমাগতই আস্থান আসছে—আরো কিছু আছে, আরো আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে, এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই “আরো আছে”র ডাককে অমান্য করি, তাহলে মানুষের ধর্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তাহলে মানুষের মুক্ততার পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তাহলে জড়তার পতন। কালে কালে মহাপুরুষেরা কি দেখান। তাঁরা দেখান যে তোমরা যাকে ধর্ম ব'লে ধ'রে রয়েছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন—তাঁরা বলেন, চলতে হবে। কিন্তু মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষেরা যে পর্যাপ্ত গিয়েছেন, তাঁরো বেশি তাঁদের অনুপস্থিতি যাবে এই তো তাঁদের ইচ্ছা—কিন্তু তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্ম-হত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং পথে-বসলে গম্যস্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে—তুমি ব'লে থেকে কিছু পাবে না। চল, আরো চল, আরো আছে, আরো আছে। মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি—ধর্ম আমাদের কোন সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাণ্ডী যেমন আকাশে ওড়ে, এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না, তেমনি আমরা অমর্তের মধ্যে যে অবাধ গতি নিয়েছে তাতেই

স্বপ্নে থাকবে। পাখী পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করে তার কারণ নয় যে সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই সেখানে পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অন্যন্তে বিহার—অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে-ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

স্কুল ইন্স্পেক্টর মিষ্টার ষ্টার্ককে উত্তরপাড়ার নিকট ৩০ কালী স্কুলের একটি তের বছরের ছেলে রাস্তায় বলে, “সাহেব, সেলাম, সেলাম, সেলাম”। এই জন্ত তিনি তাহাকে বার বেত মারিবার হুকুম দিয়াছেন, এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিষ্টার হর্নেল এই হুকুম বাহাল রাখিয়াছেন। ছেলেটি মিষ্টার ষ্টার্ককে ক্যাপাইবার জন্ত ঐ কথা বলিয়াছিল কি না, তাহার কথা ছাড়া তাহার আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে সে ছরস্ত বা অশিষ্ট, এবং তাহাকে ক্যাপনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলেও এই অশিষ্টতার জন্ত চোর বদমায়েসের মত বার বেত মারা শাস্তিটা খুব গুরুতর হইয়াছে বলিতে হইবে; ইহাকে নিষ্ঠুরতা বলিলেও চলে। শুনিতে পাই, ইংরেজেরা স্বদেশে একটা কথা বলেন যে, boys will be boys, “ছেলেরা ছেলেমানুষী, ছরস্তপনা, বাদরামি করিবেই,” এবং সেই জন্ত তাহারা তাহাদের এই রকমের ব্যবহার প্রশংসনীয় মনে না করিলেও অনেকটা প্লেহ ও ক্রমার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বালকস্বভাব সর্বত্রই এক প্রকার। এই হেতু অশিষ্টতার জন্ত শাস্তি দিবার সম্মুখ এদেশে ইংরেজেরা যদি ইহা মনে রাখেন যে তাহাদের নিজের দেশে একটা তের বছরের ছেলে কাহাকেও “good morning, Sir, good morning, good morning” বলিলে তাহার কি শাস্তি হইত, তাহা হইলে ভাল হয়। লোকে বলে যাহারা বধু অবস্থায় শাওড়ীর দ্বারা উপীড়িত হন, তাহারাই পরে বৌ-কাটকী শাওড়ী হন। সেইরূপ যে ছেলে ছাত্রাবস্থায় খুব মার খাইয়াছে, সে শিক্ষাসম্পর্কীয় কাজে পাইলে হয়ত খুব

প্রহার দিবার পক্ষপাতী হয়। মিঃ ষ্টার্ক ও হর্নেলের মনস্তত্ত্বের ইতিহাস এরূপ কিনা জানি না; কিন্তু ছোট ছেলের অশিষ্টতা, ছরস্তপনা বা বাদরামির এইরূপ গুরুতর শাস্তি দেওয়া তাহাদের শিক্ষানীতির যদি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করিবার ভার দিলে ভাল হয়। কারণ, শিক্ষাদান অপেক্ষা এই কাজটি তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবার সম্ভাবনা। বালক ও যুবকদিগের সর্ববিধ ছরস্তপনা, বাদরামি বা দুর্কৃত্যতা দূর করিবার অগ্ৰতম উপায়, তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা পরিহার।

একটি ১৪ বছরের মেয়ের একজন “শিক্ষিত” যুবকের সহিত বিবাহের সন্দেহ হয়। ছেলের বাবা যে পণ চায়, মেয়ের বাবা তাহার সমস্তটা যোগাড় করিতে না পারিয়া শেষে নিজের বসতবাটীটি পর্যন্ত বন্ধক দিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার বিবাহের জন্ত পিতামাতা সর্বস্বাস্ত ও গৃহহারা হইতেছেন, এই চিন্তা বালিকাকে ব্যাকুল করে। সে বাপমাকে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্তি দিবার জন্ত আঙনে পুড়িয়া মরিয়াছে। নিষ্ঠুর সামাজিক রীতির যুগকাষ্ঠে এই যে নিরপরাধ উন্নতমনা পিতৃমাতৃভক্ত বালিকাটি আপনাকে বলি দিল, তাহাতেও কি আমাদের চেতনা হইবে না? অনেকে এই বলিয়া অহঙ্কার করেন যে অগ্ৰ অনেক জাতির বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, কিন্তু হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। হিন্দু বিবাহের মন্ত্র হইতে যে আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাতে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা অবশ্বস্বীকার্য। কিন্তু অধুনা যে রূপ পণ লইয়া বিবাহ চলিতেছে, তাহা অতি ভাস্করিক ও জঘন্য। ইহা একটা জাতীয় কলঙ্ক।

প্রতিকার যুবকদের হাতে। বিবাহ কি, প্রেম কি, পৌরুষ কি, তাহারা ভাল করিয়া বুঝুন। শুনিয়াছি, বঙ্গসাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্ত বিখ্যাত। তবে, বাল্যালী অনেক যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্ধপিশাচ, কাপুরুষ কেন? অনেকে বলিবেন, তাহারা কি করিবে? এটা তাদের বাপ-মায়ের দোষ। আমরা

বলি, এক দিকে যেমন ছেলের ধর্মবুদ্ধির উপর হস্তক্ষেপ করা বাপমায়ের পক্ষে অকর্তব্য, অপর দিকে তেমনি যুবকদেরও একমাত্র ধর্মবুদ্ধিরই অনুসরণ করা কর্তব্য। বাপমাও যদি অধর্ম করিতে বলেন, তাহা করা উচিত নয়। কিন্তু বিদ্রোহী হইবার পূর্বে ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহার প্রেরণায় পিতা মাতা বা অণ্ডুরুজনের অবাধ্য হইতে যাইতেছেন, তাহা ধর্মবুদ্ধি, না প্রবৃত্তি, না খেয়াল।

যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুই প্রতি দৃকপাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হায়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র খণ্ডরের নিকট হইতেও বাপমাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি? বঙ্গের যুবকেরা নানা প্রকারে আপনাদের পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন। এই সামাজিক কুরীতির সহিত সংগ্রামেও তাঁহারা জয়ী হউন, আমরা সর্বাস্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

“ডেলি নিউস্ ও লীডার”, নামে একখানি প্রসিদ্ধ বিলাতী দৈনিক কাগজ আছে। তাহাতে আর্চার নামক একজন লেখকের, ২০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, একটি “স্বপ্ন” মুদ্রিত হইয়াছে। স্বপ্নের সার কথাটা এই যে তখনকার রাজপ্রতিনিধি বা বড় লাট ভারতবর্ষের রাজত্ব ও প্রকৃতিপুঞ্জের উপর ভারতশাসনের ভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ নৃপতির দ্বিতীয় পুত্র পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে রাজত্ব করিবার জন্য ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। স্বপ্নে একথা লেখা নাই, যে, এই ইংলণ্ডীয় ভারতেশ্বরের নিজের এবং পুত্রকন্যাদির বিবাহ ইউরোপের লোকদের সঙ্গে হইবে, না ভারতবর্ষের লোকদের সঙ্গেও হইবে; তাঁহার ও তাঁহার বংশীয় রাজাদের সভাসদ পারিষদ প্রধানতঃ বিলাত হইতে আসিবে, না

ভারতবাসীরাই হইবে; তাঁহাদের প্রধান প্রধান সেনা-নায়ক ও অগ্ণাণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বিলাতী না ভারতীয় হইবেন; এক কথায়, এই রাজবংশও তাঁহাদের দরবার মন্ত্রিসভাদি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইয়া যাইবেন, না প্রধানতঃ বিদেশীই থাকিবেন। এসব কথার উত্তর না পাইলে ত বুঝা যাইবে না যে এই বিলাতী স্বপ্নে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে কতটা স্বাধীন ও কতটা পরাধীন কল্পনা করা হইতেছে।

অনেকে বলিবেন, এটা যে স্বপ্ন, এটা লইয়া এত গভীর ভাবে আলোচনা কর কেন? আমরা বলি, যদি এটা স্বপ্নই হয়, তাহা হইলে যেমন আমাদেরই স্বদেশীয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় “বিদ্যা বিষয়ক” “শ্রায়-বিষয়ক” প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এবং ভূদেব যুধোপাধ্যায় মহাশয় “স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদেরই কেহ ভবিষ্যৎ ভারতের “রাষ্ট্রবিষয়ক” স্বপ্ন দেখিলে ভাল হয়। ইংরেজ আমাদের বাস্তব ইতিহাস গড়িতেছেন; আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলোও তাঁহারা দেখিবেন, এতটা পরের বোঝা তাঁহারা নাই বহিলেন, আমাদের প্রতি এতটা দয়া নাই করিলেন। তাঁহারা ত বলেনই যে আমরা স্বপ্নদর্শকের জাতি (a race of dreamers); অতএব অগ্ণাণ সকল বিষয়ে যেমন আমাদের স্বপ্ন দেখার পুরুষাধিকার আছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও এই অধিকারটা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমাদের হৃদয়ত বাসনা। সত্য বটে আমাদের (political rights) রাষ্ট্রীয় অধিকার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন দেখাটা বোধ করি সে-জাতীয় অধিকার নহে।

এখন হয়ত কোম ইংরেজ বলিবেন, “তোমাদিগকে স্বপ্ন দেখিতে দিলে তোমরা অসম্ভব স্বপ্ন দেখিবে; সেটা অবৈধ।” কিন্তু সম্ভাব্যতার বা অণ্ড কোন রকমের দ্বাধনে স্বপ্নকে বাধা যায় না। শ্বেতকায়, পীতকায়, কৃষ্ণকায়, প্রভৃতি সকলেরই রক্ত যেমন লাল, সকলের স্বপ্নও তেমনি পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ। “গল্প করি ত অল্প নয়;” স্বপ্নই যদি দেখিব, ত তাহাতে আবার সম্ভব অসম্ভবের বিচার কেন? উপবাসী ভিখারী যদি স্বপ্ন দেখে,

তাহা হইলে, ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘরে মাটির গর্তে লবণ-বিহীন পান্ডা ভাত খাওয়ার স্বপ্ন না দেখিয়া স্বপ্নযোগে প্রাসাদে স্বর্ণপাত্রের পোলাও খাওয়াই ত তাহার পক্ষে প্রশস্ত। অতএব, ইংরেজদের কাছে এই মিনতি, আমাদের ত অনেক সুখই নাই, স্বপ্ন দেখার সুখটা যেন থাকে ; এবং এই স্বপ্নে যদি সকল বিষয়ে, এমন কি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও, আমরা বহু বৎসর পরে তাঁহাদের ঠিক সমান বা তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়াছি, এই রূপ কল্পনা করি, তাহা হইলে আমাদের উপর তাঁহারা যেন রাগ না করেন। স্বপ্ন, স্বপ্ন বই ত আর কিছু নয়।

লর্ড ব্রাইস্ একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। তিনি আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদূত ছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে খেত-অখেত জাতিদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ বাড়িতেছে ; অতএব অখেত জাতিদের বিদেশ-যাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশে থাকাই ভাল। কেননা খেত-অখেতের সংস্পর্শ না ঘটিলে সংঘর্ষও নিবারিত হইবে। পরামর্শটা মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে দুটি ছোট খুঁৎ আছে। একটি এই যে অখেতদিগকে ছাড়িয়া দিয়া খেতকায়দের উপনিবেশসমূহে চাষের ক্ষেত, খনি, কারখানা, কোথাও কাজ চলিতে পারে না ; সুতরাং এই পরামর্শ অনুসারে চলা হুঙ্কর। দ্বিতীয়টি এই, যে, সবাই যদি নিজের নিজের ঘরে থাকিলেই আপদ বালাই দূর হয়, তাহা হইলে কেবল অখেতদের পক্ষেই বিদেশ-যাত্রা নিষিদ্ধ কেন ? খেতকায়েরাও নিজের নিজের দেশে থাকুন না ? সেই বিধিই ন্যায়বিধি যাহা সকলের উপর সমানভাবে বর্তে। যাহা একচোখো ব্যবস্থা, তাহা বিধাতার বিধানে কখনও স্থায়ী বা মঞ্জুলকর হইতে পারে না। আসল কথা এই, যতদিন অখেতেরা দাসের মত পশুর মত খেত উপনিবেশিকদের জন্ত খাটে, ততদিন কোন আপত্তি হয় না ; কিন্তু অখেতেরা সামান্য একটু মাতুষের মত হইয়া খেত উপনিবেশিকদের সঙ্গে চাষ বাস ব্যবস্থা বানিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে গেলেই তাঁহাদের দারুণ ক্রোধ জন্মে।

অতীত ইতিহাসের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া জাতীয়

বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব জাগাইয়া তুলি কাহারও কর্তব্য নয়। আমরাও খেত-অখেতের সংস্পর্শের ইতিহাসের উল্লেখ করিতেছি কেবল তুলনা করিবার জন্ত। অখেতকায়েরা উপনিবেশাদিতে স্থান চাহিতেছে, জীবিকা সংগ্রহ করিতে চাহিতেছে, যুদ্ধ দ্বারা নহে, বল প্রয়োগ দ্বারা নহে ; তাহারা পরিশ্রম দ্বারা, অবলাসিতা দ্বারা, মিতব্যয়িতা দ্বারা, প্রবৃত্তিনিরোধ দ্বারা, জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে চাহিতেছে। ইহাতে আপত্তি করা, ইহাতে বিঘ্ন জন্মান ধর্মসঙ্গত নহে। একরূপ বাধার বাধ ভাঙ্গিয়া যাইবেই যাইবে। যে অধিকতর পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সংযমী, তাহার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। খেতকায়েরা অখেতদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা দূরে রাখিতে চেষ্টা না করিয়া, পরিশ্রমে, বুদ্ধিতে, মিতব্যয়িতায়, সংযমে, তাহা-দিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করুন ; তবেই তাঁহাদের স্থায়ী উন্নতি হইবে। নতুবা এখন ত তাঁহারা অখেত-দিগের নিকট কার্যতঃ হার মানিতেছেন। কোনও জাতিই সর্বগুণাকর নহে, কাহারও সভ্যতা সর্বদা সম্পূর্ণ ও নিখুঁৎ নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির চরিত্র ও সভ্যতার বৈচিত্র্যের কারণ এবং উদ্দেশ্যই এই যে যাহাতে পরস্পরের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে আদান প্রদানাদি দ্বারা সকলেরই উন্নতি হয়।

যে অপরকে অস্পৃশ্য মনে করে, সে নিজেই অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে। আমাদের হৃদয় দেখিয়াও কি খেতকায়দিগের চোখ খুলিবে না ?

বেথুন কলেজ ও স্কুলের উন্নতিসাধনের জন্ত সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার দশ জন বঙ্গমহিলার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, ও তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিরূপ পরামর্শ হইয়াছে, কে কি মত দিয়াছেন, শেষ সিদ্ধান্তই বা কি হইল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কাগজে নানারূপ কথা বাহির হইয়াছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া কিছু লেখা দরকার। কারণ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, আরও হইবে এবং হওয়া আবশ্যিক। এইজন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাবও দেশের সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেথুন কলেজ নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্ত



একমাত্র গবর্ণমেন্ট কলেজ। ইহার উন্নতি না হইলে, কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে, আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা না জন্মিলে, প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইবে না। এইহেতু বেথুন কলেজের উন্নতিতে কেবল কলিকাতাবাসীদের নয়, কেবল ব্রাহ্মদের নয়, কেবল দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের নয়, পরন্তু দেশবাসী সকলেরই স্বার্থ আছে।

দেশীয় বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত, দেশের উন্নতির জন্ত, বেথুন কলেজের উন্নতির চেষ্টা। সুতরাং উপায় নির্ধারণের জন্ত যে দেশবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ডিরেক্টর সাহেব কয়েক জন মহিলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যে-সকল মহিলা কষ্টস্বীকার করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্ত ডিরেক্টর সাহেবের পরামর্শসভায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ষষ্ঠবাদী। কিন্তু দেশের মত জানার পক্ষে এইরূপ পরামর্শসভা যথেষ্ট নহে। কারণ, বেথুন কলেজে তাঁহাদের মেয়েরা পড়িয়াছে বা এখনও পড়ে, তাঁহারা নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, একরূপ সকল শ্রেণীর মহিলাদের মত জানা দরকার। অবশ্য তাঁহারা বা তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা বেথুন কলেজে শিক্ষা পান নাই, তাঁহাদের মত যে অবজ্ঞেয়, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি মনে করা ভুল। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের অভিভাবকদের মতই সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাস্য। হিন্দুসমাজের, ব্রাহ্ম সমাজের ও খৃষ্টিয় সমাজের মত নির্ধারণ অবশ্যকর্তব্য। তাহা না করিয়া ডিরেক্টর একটা কিছু উপায় স্থির করিলে তাহাতে দেশবাসীর আস্থা হইবে না।

শুনা যায় কোন কোন মহিলা এবং ডিরেক্টর নিজে কোন ইংরেজ মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করিবার পক্ষে। ইহাও শুনা যাইতেছে যে এই নিয়োগ অস্থায়ী ভাবে হইবে, ডিরেক্টর এইরূপ কথা দিয়াছেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া কেহ কেহ নিশ্চিত হইয়াছেন। আমরা ডিরেক্টরের অকপটতায় কোন সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও বলিতেছি তাঁহার এই অঙ্গীকারের বেশী কিছু মূল্য

নাই। ডিরেক্টর মহারানী ভিক্টোরিয়ার চেয়ে বড় নন। মহারানী সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ১৮৫৮ খ্রিঃ যে ঘোষণা করেন, তাহা মুখের কথা নয়; তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে মুদ্রিত আছে। তাঁহার পুত্র স্যার সপ্তম এডওয়ার্ড ও পৌত্র স্যার পঞ্চম জর্জ এই ঘোষণা-পত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি, তাঁহাদের কর্মচারী ও ভৃত্যেরা ইহাতে লিপিবদ্ধ অঙ্গীকারসমূহ পালন করিতেছেন, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এমন অবস্থায় মিঃ হর্নের মত একজন অধস্তন কর্মচারী গোপনীয় মন্ত্রণাগৃহে মুখে কি বলিলেন, তাহা প্রতিপালিত হইবে, মনে করিতে হইলে শৈশবমূলক বিশ্বাসপ্রবণতার প্রয়োজন। আমাদের ধারণা, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে একবার ইংরেজ মহিলার দখল জন্মিলে তাহা কাম্য হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা।

ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলে আমরা তাহার বিরোধী হইতাম না। কিন্তু তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। শিক্ষাবিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে বাঙ্গালী মহিলা প্রিন্সিপ্যালের অধীনে কলেজে পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছে, ছাত্রীসংখ্যা বাড়িতেছে, ছাত্রীদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় নাই। শুনা যায়, একজন শিক্ষয়িত্রী এবং অপর এক কর্মচারিণী নিয়মানুগত্যা দেখান নাই; কিন্তু শিক্ষাবিভাগ তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় না দিয়া ত্রীমুখা কুমুদিনী দাসের গ্ৰাম্য কণ্ঠকে বলবৎ রাখিলে এই দোষ লক্ষিত হইত না, আমরা এইরূপ অবগত হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট অনুসন্ধান করিলেই সত্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। আরও শুনা যায়, হিসাবে সামান্য গোলমাল হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অন্যান্য কোন কোন বড় কলেজে বহুসংখ্যক কেরাণী, ও হিসাবরক্ষক থাকি সত্ত্বেও হাজার হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। তাহাতে ত কোন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অপসারিত হন নাই, বা তাঁহাদের যায়গায় ফরাসী প্রিন্সিপ্যাল রাখার কথা উঠে নাই। আর বেথুন কলেজে ১৯০২ হইতে প্রায় ৬ বৎসর একজনও কেরাণী বা হিসাবরক্ষক ছিল না,

একজন বাজার-সরকারের সাহায্যে প্রিন্সিপ্যালকেই হিসাব রাখিতে হইত। তাহার পর ১৯০৮ আগষ্ট হইতে ১৯১২র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একজন মাত্র ৩৫ টাকার কেরাণী ছিল, হিসাবরক্ষক ছিল না। ১৯১২ ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ মাস এই কেরাণীটিও ছিল না, ছাত্রীনিবাসের হিসাবে-অনভিজ্ঞ একজন কেরাণীর দ্বারা হিসাব রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়াকে হিসাবে সামান্য গোলমালের জন্য কোন মতেই দোষ দেওয়া যায় না।

বাকালীর ছেলে বা বাকালীর মেয়ে ঠিক ইংরেজদের মত বাকি উচ্চারণ করিয়া ইংরেজী বলিবে, বা তাহাদের গায়ে ফিকে গোলাপী রং মাখাইয়া দিলে তাহাদিগের চালচলন ও কথাবার্তায় তাহাদিগকে ইংরেজ বলিয়া ভ্রম হইবে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহাকেই চূড়ান্ত আদর্শ আহ্বানকরাই মনে করিতে পারে। হাজার হাজার ছেলে ও বহুসংখ্যক মেয়ে দেশী লোকের কাছে শিক্ষা পাইয়া নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানও বাদ পড়ে নাই। জ্ঞান লাভের জন্য ইংরেজ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। বাকী থাকে, চরিত্র-গঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ, সভ্যতা।

এ বিষয়ে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্র, সমাজ, পরিবার বা সভ্যতার কোন তুলনা করিতে অনিচ্ছুক। প্রত্যেক সভ্য জাতির চরিত্রে, পরিবারে, সমাজে, সভ্যতায় গুণের ভাগ আছে। কিন্তু উন্নতির জন্য কাহারও নিজ আশ্রয়- বা প্রতিষ্ঠা-ভূমি ছাড়িয়া অন্য আদর্শ ধরিতে যাওয়া ভুল, ধরিতে যাওয়া সর্বনাশের হেতু। নিজের যাহা ভাল, তাহা ছাড়িও না; তাহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যের গুণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হও, তাহাকে নিজ অস্থি-মজ্জাগত কর; তবেই উন্নতি, তবেই মঙ্গল হইবে।

পাশ্চাত্য সমাজের নিন্দা করিবার জন্য নয়, কেবল আমাদের মতটি বুঝাইবার জন্য দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যুবকদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজের কতকগুলি দোষের অনুকরণ করিতে

গিয়া ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরুষদের মত নারীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যসন ও কুঅভ্যাস আছে। যেমন—মাতাল হওয়াটা নিন্দনীয় হইলেও, কি নারী কি পুরুষ, উভয়ের মধ্যেই ভদ্র সমাজেও মদ্যপানটার চলন আছে। মেম সাহেবরা পর্যন্ত ধূমপান করাটা হাল-ফ্যাসান মনে করেন। বাকালী-সমাজে খুব নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন স্ত্রীলোক মদ খায়, হকা টানে ও বিড়ি খায় বটে, কিন্তু ভদ্র সমাজের স্ত্রীলোকদের যে এরূপ করা অনুচিত, একথাটা পর্যন্ত তাঁহাদিগকে বলা অনাবশ্যক, বলিতে গেলে তাঁহারা জীব কাটিয়া কানে আঙুল দিবেন এবং রাগ করিবেন। এইখানেই দেখুন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের কত প্রভেদ। অনেক মেম জুয়া খেলে, কিন্তু বাকালী ভদ্রমহিলাদের এই ব্যসন নাই।

এগুলো গেল দোষের কথা। নির্দোষ ব্যাপারেও প্রভেদ দেখাইতেছি।

বাকালীর মেয়েকে অধিকাংশ স্থলে খস্তর শাওড়ী ভাসুর দেবর নন্দা ও তাঁহাদের সন্তানাদি লইয়া ঘর করিতে হয়। ইংরেজ-সমাজে তাহা হয় না। দাম্পত্য প্রেম ও পূর্বরাগের কোন কোন লক্ষণ পাশ্চাত্য সমাজে বিনা নিন্দায় সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে; আমাদের দেশে তাহা হয় না। আমাদের দেশে নারীর পক্ষে আশ্রয় হইয়া মনের ভাব মনের মধ্যে রাখাই শিষ্টাচারের আদর্শ। ইংরেজীতে বলিতে গেলে reserve ও dignity আমাদের নারীদের চরিত্রের ভূষণ। গুরুজনের প্রতি ভক্তি বিষয়ে আমাদের দেশে যে আদর্শ আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পাশ্চাত্য জীবন অপেক্ষা কম জটিল ও অধিক সাদাসিঁদে। টাকা উড়াইবার পন্থা আমাদের দেশে আমাদের মেয়েদেরও পক্ষে ছুরবলনীয় নহে; কিন্তু আমাদের প্রাচ্য ছাঁচের ভদ্র পরিবারের জীবন যাপন প্রয়োজন হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যেরূপ অনাড়ম্বর ভাবে চলিতে পারে, পাশ্চাত্য প্রণালীতে ততটা সাদাসিঁদে ভাবে হয় না।

আমাদের মহিলাদের যে ভক্তি, নিষ্ঠা, তপস্চর্য্যার শক্তি, যে শুচিতা, পরিবারের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা

জীবসেবায়, সমাজসেবায়, জনহিতকর কার্যে প্রযুক্ত হইলে, তাহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শের শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া আমরা মনে করিব। কিন্তু ইহার জন্মও ত ইংরেজ মেম প্রিন্সিপ্যালের প্রয়োজন নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে হয়ত কোন পার্সি মহিলা প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইবেন। ইহাতেও আপত্তি আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যেই পার্সিদের সমান উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছেন; ছাত্রীরা বাঙ্গালী; তাহাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ও তাহাদের মাতৃভাষা ও চালচলন এক রকমের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পার্সিরা বড় বেশী পরিমাণে ইংরেজভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহা আমাদের মেয়েদের অমুকরণযোগ্য ত নহেই, বরং সর্বপ্রযত্নে পরিহার্য। শেষ কথা এই, খরপোড়া গরু যেমন সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়, আমরাও তেমনি ঢাকার ইডেন স্কুলের পার্সি শিক্ষয়িত্রীদের কথা কাগজে পড়িয়া, পার্সি নামেই ভয় পাইতেছি। আমাদের সনির্বন্ধ অমুরোধ, এখানে, যেন ইডেন স্কুলের ব্যাপারগুলির পুনরাবৃত্তি না হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ, সভ্যতার আদর্শ, পুরুষ অপেক্ষা নারীদের দ্বারাই বেশী রক্ষিত হইতে পারে ও হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, পুরুষদের মধ্যে বিলাতী পোষাক পুরাতনায় চলিতেছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তেমন চলিল, না। আমাদের বিলাতী পোষাকের উপর কোন রাগ বা বিদ্বেষ নাই। কিন্তু, বাহুবস্তুর সহিত মনবপ্রকৃতির সঙ্গ আছে বলিয়া, প্রাচ্য ভাবটা রাখার পক্ষে প্রার্চ্য পরিচ্ছদ সাহায্য করে, এবং বিদেশী পরিচ্ছদ না পরিলে দেশের লোক আমাদেরকে আপনার জন মনে করিয়া একটু বেশী গা-বেঁসা ও আশ্রয় হয়, আমাদেরকে উচ্চতর বা স্বতন্ত্র জীব, বা পর মনে করে না। জাতীয়তার পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যিক বলিয়াই বাহিরের খোসাটার উপর ঝাঁক দিয়া থাকি। আমাদের দেশের সাধারণ ও ভদ্রলোকদের দেশী পোষাকও যদি এক ধরনের হইত, তাহা হইলে খুব ভাল হইত।

আদর্শের পালিকা ও রক্ষয়িত্রী নারী। নারীতে ফিরিঙ্গিয়ানার ঘৃণ যাহাতে না ধরে সে চেষ্টা করা কর্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজ শিক্ষকদের সামাজিক

দোষগুলির প্রভাবে এবং ভিন্ন ছাঁচে গড়া সভ্যতার আদর্শে আমাদের ক্ষতি হইয়াছিল। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্ম মেমের একান্ত আবশ্যিক থাকিলে, আমরা অনিষ্টের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাতে মত দিতাম। কিন্তু যখন সেরূপ প্রয়োজন নাই, তখন আশঙ্কার মধ্যে যাই কেন? বেথুন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীনিবাস আছে; অর্থাৎ একটা গৃহস্থালী আছে। তাহা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত চলা নিশ্চয়ই উচিত; কিন্তু বাঙ্গালী ধাঁচেই তাহা হইতে পারে, এবং হওয়া চাই। ভবিষ্যতের গৃহলক্ষীদের অবাকালী হওয়া উচিত নয়। বাঙ্গালীর কর্তৃত্বধীনেই বাঙ্গালী রক্ষার অধিকতর সম্ভাবনা।

বেথুন কলেজ ও স্কুল কোথায় থাকা উচিত এবং একত্র থাকা উচিত কিনা, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করিব। এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণতঃ যাহাদের মেয়েরা বেথুনে পড়ে তাহাদের সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্দেশ করা উচিত। ছেলেদের স্কুল কলেজ এক যায়গায় রাখিলে, ছোট ছেলে ও বড় ছেলে, এক ছাত্রাবাসে রাখিলে, কোন কোন অসুবিধা এবং কুফলের আশঙ্কা আছে। মেয়েদের বেলায় সে-সব আশঙ্কা কম। অধিকন্তু ছাত্রীনিবাসের ছোট ছোট মেয়ের ভার বড় মেয়েদের উপর থাকিলে ছোটগুলির অধিকতর যত্ন হয়, বড়গুলির স্বাভাবিক স্নেহশীলতা রক্ষিত হয়, এবং বাড়ীতে থাকিয়া ছোট ভাইবোনদের জন্ম ঝগড়া সহ করার অভ্যাসটা লোপ পায় না। মেয়েদিগকে ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া পারিবারিক জীবনের অযোগ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াটা ত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই বিষয়টি একটু ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

শুনা যায় যে মেম প্রিন্সিপ্যালকে পরামর্শ দিবার জন্ম ৬জন বঙ্গমহিলাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। কলেজের জন্ম অধ্যক্ষসমিতি (governing body), স্কুলের জন্ম পরিচালক সমিতি (managing committee) এবং তাছাড়া কয়েকজন পরিদর্শক (visitors) আছেন। তাহাই কি যথেষ্ট নয়? আবার পরামর্শ-সমিতির প্রয়োজন কি? ইহা গঠিত হইলেও ইহার পরামর্শ বাস্তবিক লওয়া হইবে কিনা এবং

লইলেও তাহার অনুসারে কোন কাজ হইবে কিনা, বলা যায় না। কেননা, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়কে প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে কুমিল্লার দহকারী ইন্স্পেক্টরের পদে স্থানান্তরিত করিবার মত গুরুতর কাজ ডিরেক্টার হঠাৎ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ-সমিতিতে একবার জিজ্ঞাসামাত্রও করেন নাই। সার্ব আন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও জেদী লোক এই সমিতির সভ্য। তাঁহাদেরই যদি এই দশা, তখন কয়েকটি নিরীহ মহিলাকে লইয়া গঠিত পরামর্শসমিতির কথা কেহ শুনিবে বলিয়া ত বিশ্বাস হয় না। আর ডিরেক্টার যে কিরূপ মহিলাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্ত নির্বাচন করিবেন, তাহাও ত বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, নানা প্রকারে মাণ্ডগ্য কোন কোন বাঙ্গালী-পরিবারে ছেলে-মেয়েরা হয় ইংরেজী বলে, নয় হিন্দী বলে, বাঙ্গালা বলে না। আমরা পাড়াগোঁয়ে মানুষ; তাঁরা ইংরেজীটা কেমন বলেন, সেবিষয়ে মত প্রকাশ করিতে ভয় পাই; কিন্তু হিন্দী উর্দুটা তাঁদের চেয়ে আমরা অনেক ভালই শুনিয়াছি। সুতরাং বলিতে পারি যে তাঁদের হিন্দী শুনিলে খাস হিন্দুস্থানের লোকেরা তারিফ করিবে না। যাহারা ভাষা সম্বন্ধে নিজ নিজ পরিবারে এবিধ ব্যবস্থা করেন, তাহাদিগকে বাঙ্গালী বালিকা-শিক্ষালয়ের পরামর্শদাত্রী মনোনীত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয় কিনা, তাবিবার বিষয়।

গবর্ণমেন্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুসারেই তাহার যোগ্যতার বিচার করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়র উপর অবিচার করা হইয়াছে। কলেজের উন্নতি কি করিলে হয় তাহা যে তিনি বুঝেন না, তাহা ত নয়। তিনি ১৯১২ সালে ১৯০৭ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, এবং যাহা গবর্ণমেন্টের ছাপাখানায় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কলেজকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে এবং উদ্ভিদবিদ্যায় বি, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিতে অনুরোধ করেন; একজন গণিতের অধ্যাপক চান; ইণ্টারমীডিয়েট পর্যন্ত কুগোল পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন;

ছাত্রীদের জন্ত লাইব্রেরীতে পড়িবার যায়গা করিয়া দিয়া অধ্যাপকদের জন্ত স্বতন্ত্র বিশ্রামাগার করার প্রস্তাব করেন; একজন লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করিতে বলেন; কেরানীদের সংখ্যা বাড়াইতে বলেন; মেয়েদের ব্যায়াম ও ক্রীড়ার জন্ত আরো যায়গার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন; কলেজে স্থানান্তরের কথা বলেন; ছাত্রীনিবাসের আয়তন বাড়াইতে বলেন; এবং অধ্যাপিকারা ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইলে কলেজটি যে ক্রমে সাশ্রম শিক্ষাগারে (residential institutionএ) পরিণত হইতে পারিবে, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। কলেজটির উন্নতি করিতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাহার সময়ে না করিয়া তাহাকে এবং প্রকারান্তরে সমুদয় বাঙ্গালী মহিলাকে অযোগ্য বলা, এবং মেম প্রিন্সিপ্যাল আনিয়া ও উন্নতির সমুদয় আয়োজন করিয়া দিয়া ইংরেজ মহিলার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করা, কখনও সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে না। তাহাকে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সমুদয় উন্নতির ব্যবস্থা করিবার মত অর্থ দিয়া, তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রত্যেক আদেশের পশ্চাতে শিক্ষাবিভাগ আছেন, ইহা বুঝিতে দিয়া, তাহাকে শিক্ষালয়টির উন্নতি করিবার অধিকতর সুযোগ যদি দেওয়া হইত, তবেই সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইত।

আমাদের শেষ কথা এই:—বাহারা সম্পূর্ণ অসত্য ও বর্ষর তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার জন্ত ভিন্নদেশীয় ও সভ্য মানুষের শিক্ষকত্ব ও নেতৃত্ব যতটা দরকার, আমাদের জন্ত সেরূপ প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেই আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে মানুষ করিব, বাহিরের সাহায্য যতটুকু দরকার, তাহা আমরাই প্রয়োজন-মত সংগ্রহ করিয়া লইব। আমাদের মঙ্গলের দিকে আমাদেরই ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহা লাভের জন্ত ছেলেমেয়েদিগকে গড়িবার যে গুরুতর দায়িত্ব তাহা অপরকে দিতে পারি না, সে উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চাই না। যার দরদ বেশী সেই ত ঠিক-মত গড়িতে পারে।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে এই তৃতীয় বার লণ্ডনের রয়েল ইন্সটিটিউশন নিজ আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই অসাধারণ সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি ও গৌরব বোধ করিতেছি। উক্ত বিজ্ঞানমন্দির ফ্যারাডে প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার বক্তৃতাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বসু মহাশয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, সম্ভবতঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও, এবং ফ্রান্স ও জার্মেনীর বিদ্বানগুলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

জ্ঞানভিক্ষু হইয়া জগতের সর্বত্র যাহারই দ্বারে যাইতে হউক না কেন, তাহাতে অপমান বোধ করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা চিরকাল সর্বত্র জ্ঞানভিক্ষুই থাকিব, জ্ঞানদাতা হইব না, ইহা কখন সম্মানকর হইতে পারে না, এবং ইহাতে প্রকৃত শক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। সত্য বটে পুরাকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক জাতি ভারতবাসীর নিকট বিদ্যার্থী হইতেন। কিন্তু নিঃস্ব জমিদারতনয়ের পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য স্বরণ করিলে যেমন পেট ভরে না, তেমনি আমাদেরও পুরাকালের জ্ঞানগৌরব ঘোষণা করিলে আমাদের বর্তমান অজ্ঞানতিমির দূরীভূত হয় না। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখন তুমি কি হইতেছ, কি করিতেছ, কি রত্ন সংগ্রহ ও বিতরণ করিতেছ? ইহার উত্তর আমরা অল্প অল্প করিয়া দিতে পারিতেছি, ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু শুধু আনন্দ করিলে তা চলবে না। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণও করিতে হইবে।

আনন্দের সঙ্গে দুঃখের কথাও আছে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বসু মহাশয়কে তাঁহার আবিষ্কৃত বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার ফ্রান্স, জার্মেনী, ইংলণ্ড, ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ইহাকেই বলে, “গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের জন্ম কয়েক জন অধ্যাপক নির্বাচিত হইলেন, কিন্তু পদার্থ-

বিজ্ঞানে ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের উচ্চতম অঙ্গে ভারতে কেহ যাহার কাছ ষ্টিসিতেও পারেন নাই, সেই আচার্য্য বসু মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, একখানা চিঠি দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল কি? ইহার একটা পরিষ্কার উত্তর পাওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্ম বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত সী, ভী, রামন্, এম-এ., শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ, ডি, এম-সী; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, এম-এ, (কলিকাতা); পী, এইচ-ডী, (বার্লিন); এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু, এম, এ, (কলিকাতা), বী, এম-সী, (লণ্ডন), অধ্যাপক নির্বাচিত হইয়াছেন। এখন গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিলেই হয়।



শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

আচার্য্য রায় মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামন্ গবর্ণমেন্টের হিসাব-বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন; তাহাতে তাঁহার বেতন ক্রমে দু হাজার টাকার উপর হইতে পারিত। কিন্তু অর্থের আকর্ষণ অপেক্ষা বিজ্ঞানানুশীলনের আকর্ষণ তাঁহার পক্ষে প্রবলতর হওয়ায় তিনি অধ্যাপকতা গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি তারের কম্পন, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ কাশীর কুঙ্গল কলেজের অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ, ও ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এম্ সী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কেবল গণিতবিদ্যায় উচ্চ সম্মান লাভ করেন, এবং পরে জার্মেনীতে জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতাধ্যাপক ক্লাইনের ( Klein ) নিকট উচ্চতম গণিত শিক্ষা করেন। তিনি উচ্চগণিত বিষয়ে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন, এবং তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন, এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া বালিন বিশ্ব-

লগনের বী, এম্-সী, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বৎসর কেবল আর একজন ছাত্র ঐ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।



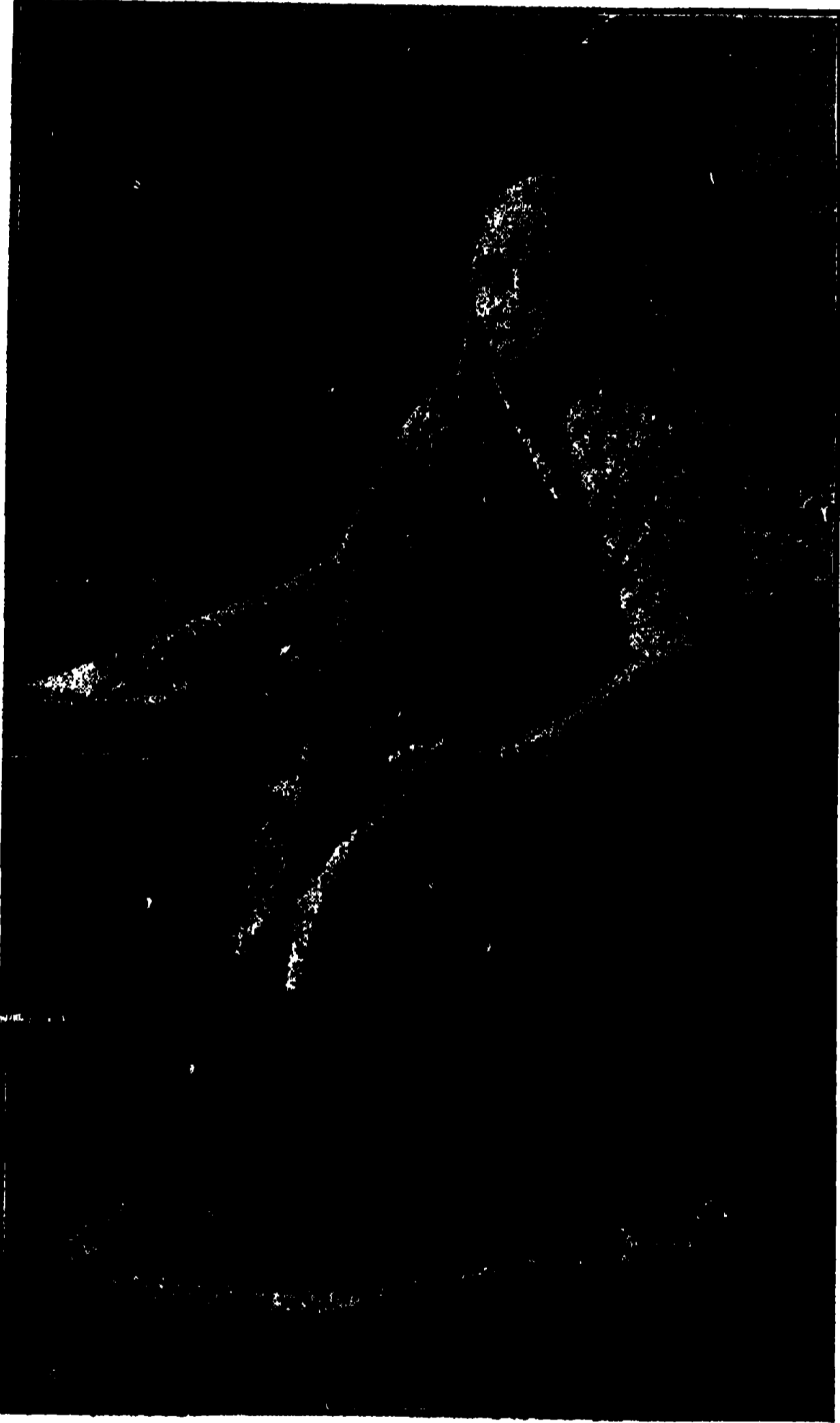
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু।

বিদ্যালয়ে পী এইচ-ডী, উপাধি লভ করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বী, এম্-সী পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়নে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পান, তৎপরে গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত গবেষণা-পত্রি প্রাপ্ত হইয়া কেবল গিয়া তত্ত্বতা বিখ্যাত ল্যাভোরিটরীতে অধ্যাপক সার্ জে, জে, স্মিথের অধীনে গবেষণা করেন, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে



শ্রীমতী ননীবাইদী।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। প্রায় দুই কোটি লোকের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গবাদি পশুর খাদ্যও অত্যন্ত দুপ্রাপ্য ও দুমূল্য হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট মানুষ ও পশুর সাহায্য যথাসাধ্য করিতেছেন। গত ৩১ শে জানুয়ারী নব্বই হাজারেরও উপর লোক নানা ভাবে সরকারী সাহায্য পাইতেছিল। তাহার পর তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট কোন প্রকারে মানুষের প্রাণ রক্ষার মাত্র ব্যবস্থা করেন;



শ্রীমতী যশ্বনাবাই সকাই।

তাহাও আবার পর্দানশীন স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে করিতে পারেন না। অতএব আমাদের এ সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করা কর্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের প্রচারক প্রকাশ্যে অবিনাশচন্দ্র

মজুমদার মহাশয়কে বঁাদা জেলার বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে কয়েক শত টাকা দিয়া পাঠাইয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গত দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একদল উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে এই প্রকার কাজ নিষ্ঠার সহিত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই জীবসেবা কার্য সকল ধর্মের অনুমোদিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সর্ব-সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। যিনি যাহা পারেন, সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়কে কলিকাতার ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ ভবনে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১৯১১ ১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে শ্রীমতী যমুনা বাঈ সকাই, অধ্যাপক গজ্জরের ভগিনী শ্রীমতী ননীবাঈ এবং অগ্ন্যন্ত সন্ন্যাস্ত হিন্দু মহিলা কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, পানাহারনিদ্রা সম্বন্ধে নানু ক্রেশ সহ করিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্তমান দুর্ভিক্ষেও নারীহৃদয় নিশ্চয়ই কাঁদিবে। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত না থাকায় তাঁহারা সর্বত্র অবাধে গিয়া সংকার্য্য করিতে পারেন। উত্তরভারতে বোম্বাইবাসিনীদের মত কাজ করিবার জন্য কোন মহিলারই সাহায্য কি পাওয়া যাইতে পারে না?

## চিত্রপরিচয়

শেষ বোঝা।

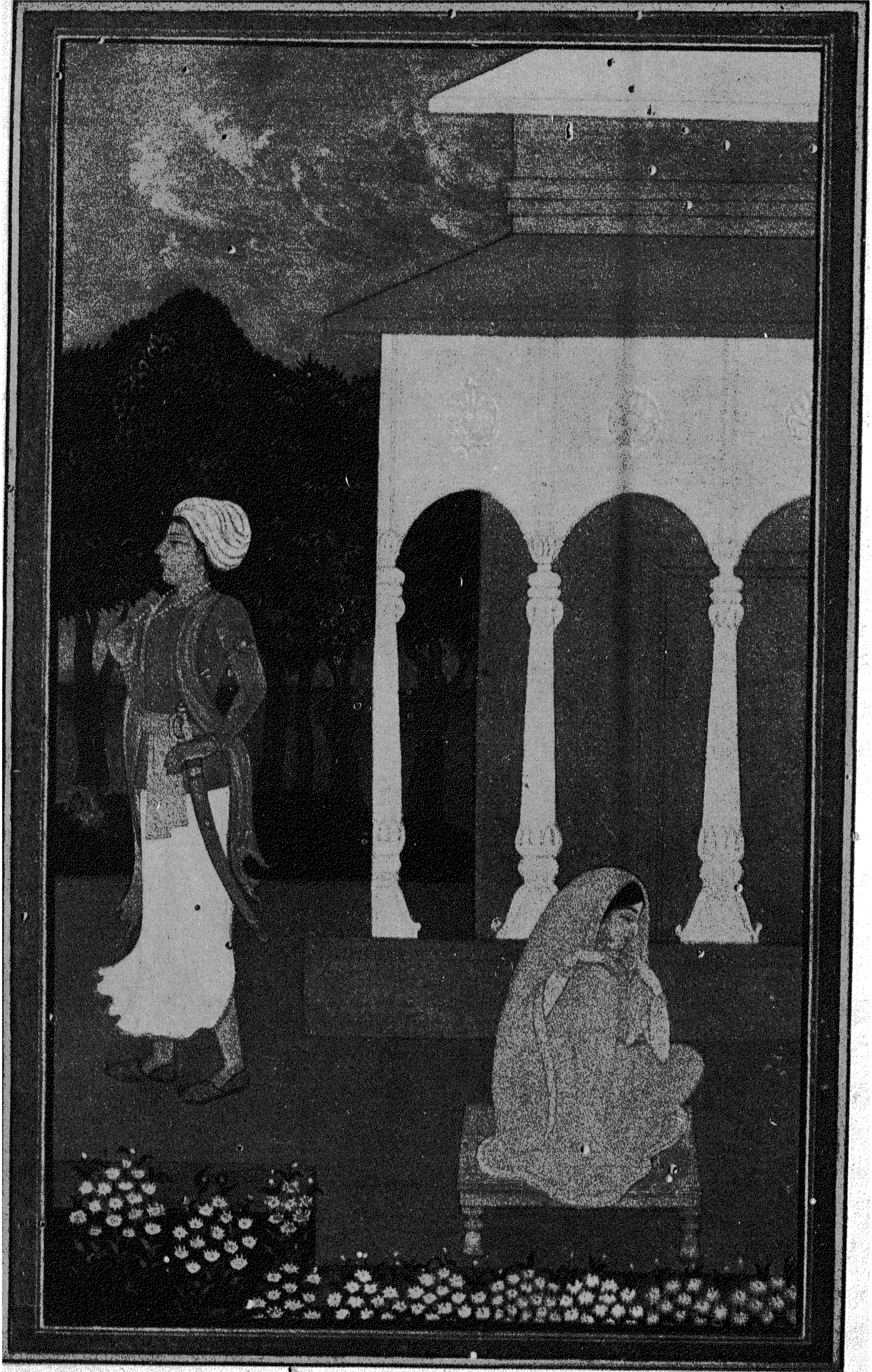
চিত্রকর শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রখানিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা আমাদের অনুরোধে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“চলিয়াছি, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে; আসিতেছ, কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে।

“চলিতে চলিতে ধসিতেছে জীবনের পর-জীবনবন্ধ, আহু নত হইতেছে তোমার আসার পথে বার বার; আকাশ তোমার নেশার রাজিয়া উঠিতেছে দিনের পর দিন; দুই অঁাধি তোমার আসার পথে চাহিয়া খুঁটিতেছে কতনা বিরহে যুগ যুগান্তে।”







• হিরণ্যায়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায় গ্রহণ ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয়েৰ একটি দৃশ্য)

শ্ৰীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কৰ কৰ্তৃক অঙ্কিত চিত্ৰ হইতে ।

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবন্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

• ১৩শ ভাগ

• ২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

কবি বলিয়াছেন—“কি যাতনা বিধে, বুঝিবে সে কিসে, কতু আশীবিধে দংশেনি যারে?” যে-সকল জাতি হৃদিশাগ্রস্ত, তাহারাই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে যে মানবের পক্ষে সকল বিষয়ে উন্নতির কত প্রয়োজন। একটা শহরে যদি একটা পাড়াও অপরিষ্কার এবং রোগবীজের আকর স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেমন সে শহরের অন্ত সমস্ত পাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেও, তথায় সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে; একটা শহরে যদি একটা পাড়াতেও হনীতিপরায়ণ পুরুষ নারী বাস করে, তাহা হইলে যেমন উহার অন্ত পাড়াতে সচ্চরিত্র লোকেরা থাকিলেও, তথায় চরিত্রহীনতার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকে; যেমন কোন পরিবারের লোক কেবল নিজের ছেলেদের নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিশ্চিত হইতে পারেন না; তেমনই পৃথিবীতে একটি জাতিও যতদিন অগ্রস্ত থাকিতেছে, ততদিন সমগ্র মানবজাতির স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে, এরূপ মনে করা যায় না।

ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কেবল বাঙ্গালী বা মরাঠা বা গুজরাটীর উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে না। সকল প্রদেশের লোকের উন্নতি চাই। কেবল হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ানের উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে না, সাঁওতাল, কোল, ভৌল, এবং তাহাদের

চেয়েও অগ্রস্ত যে-সকল জাতি আছে, তাহাদেরও উন্নতির প্রয়োজন। যে-সকল জাতির চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্ম করাই কৌলিক ব্যবসা, তাহাদেরও সংশোধন এবং উন্নতি আবশ্যিক। হিন্দুর উন্নতি বলিলে কেবল ব্রাহ্মণকৃত্রিয়াদির উন্নতি বুঝিলে চলিবে না। যাহাদিগকে “অস্পৃশ্য” মনে করা হয়, যাহাদিগের জ্ঞান “আচ্ছন্নীয়” জ্ঞান করা হয় না, তাহাদেরও উন্নতির প্রয়োজন। একটা দড়ির একটা যায়গাও যদি কম শক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মজবুত বলা যায় না।

ভারতবর্ষের কোন জাতি বা কোন প্রদেশের লোক শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবে, অপরেরা তাহাদের নিম্নস্থানীয় হইয়া থাকিবে, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। কিন্তু যিনি যে জাতির বা যে প্রদেশের লোক, সেই জাতি বা সেই প্রদেশ অপরের নীচে পড়িয়া থাকিলে, তাহাতেও তাঁহার সম্বন্ধে থাকা উচিত নয়।

বঙ্গদেশ সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে এবং অন্ত কোন কোন বিষয়ে ভারতের অন্ত প্রদেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর। অন্ত প্রদেশগুলি এই-সকল বিষয়ে আমাদের মত উন্নতি করুন। আমরাও, অল্প যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া চলি। কিন্তু সকল প্রকার সাহিত্যিক ব্যাপারেই আমরা অন্ত কোন কোন প্রদেশের সমকক্ষও নহি। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা যেসকল বিস্তৃত হিন্দী অভিধান প্রকাশ করিতেছেন, বাঙ্গলা সেসকল কোন অভিধান

প্রস্তুত করিবার সমবেত\* চেষ্ঠা বন্ধে হইতেছে না। বড়োদায় বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাল ভাল বহি অনুবাদ করাইবার যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, বঙ্গ সেরূপ কিছু নাই। বোম্বাইয়ের একখানি মাসিকপত্রের বিশেষ সংখ্যা বার হাজার পর্য্যন্ত ছাপা হয়। বঙ্গের কোনও শ্রেষ্ঠ মাসিক ছয় হাজারের বেশী ছাপা হয় না। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলকের “কেশরী” মত কাট্টি বাঙ্গালা কোন সাপ্তাহিকের হয় নাই। বড়োদায় যেরূপ পাঠের ও পুস্তক ধার দিবার সুবন্দোবস্ত সম্বলিত সেন্ট্র্যাল (অর্থাৎ কেন্দ্রীয়) লাইব্রেরী আছে, এবং নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিনা ব্যয়ে পাঠসৌকর্যার্থ ফ্রী লাইব্রেরী আছে, বঙ্গ সেরূপ নাই। বোম্বাইয়ের সামাজিক সেবা সমিতি (Social Service League) যেমন জন্ম লাইব্রেরী (Travelling Library) স্থাপন করিয়া দরিদ্র লোকদিগকে জ্ঞানালোক দিতেছেন, বঙ্গ সেরূপ ব্যবস্থা নাই। নাগরীতে ছোট বড়, মোটা সরু, সিধা বাঁকা, নানা ছাঁদের যত প্রকারের ছাপিবার অক্ষর আছে, বাঙ্গলা সেরূপ হরফ নাই।

আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রাগ্র প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সূতার ও কাপড়ের কলের জগৎ বিখ্যাত। এই সকল কলের অনেকগুলি দেশী লোকের। বাঙ্গলা দেশ পাটের কারবারের জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু একটিও পাটের কল বাঙ্গালীর নহে। সাক্চীতে তাঁতার লৌহইস্পাতের বিশাল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সাক্চী প্রাকৃতিক দেশবিভাগ অনুসারে বঙ্গের অন্তর্গত। ইহার নিকটবর্তী পার্শ্বভূখণ্ডে যে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যাইবে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববেত্তা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু। কিন্তু কারখানা স্থাপিত হইল বোম্বাইবাসী পার্সি জামশেদজী নসেরবাজী তাতার উদ্যোগে।

বাণিজ্যশিক্ষার জগৎ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে বোম্বাইয়ে, বঙ্গ হয় নাই। বোম্বাইয়ে শিল্পশিক্ষার জগৎ যেরূপ ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট আছে, বঙ্গ সেরূপ কোন শিক্ষালয় নাই

শিক্ষাবিস্তারের জগৎ ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত বঙ্গের

বাহিরে যেরূপ দেখা যাইতেছে, বঙ্গ সেরূপ দেখা যাইতেছে না। পুণ্যাবু ফার্মসন কলেজে পূর্বে বাল গঙ্গাধর টিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, প্রভৃতি মনীষীগণ, অধ্যাপকগণ মাসিক নির্দিষ্ট বেতন ৭৫ টাকা, ২০ বৎসর কাজ করিবার পর মাসিক ৪০ টাকা পেন্সন এবং মৃত্যুর পর অধ্যাপকের পরিবার জীবনবীমা হইতে ৩০০০ টাকা পাইবেন, এই বন্দোবস্তে কাজ করিয়াছেন। এখন, বোধ হয় খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায়, অধ্যাপকদের বেতন মাসিক ১০০ টাকা হইয়াছে। সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও এই বেতনে কাজ করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের একটি কলেজও কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট এইরূপ ত্যাগী অধ্যাপকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না।

সাংসারিক সুবিধা অনুবিধার দিকে দৃষ্টিপার্ত না করিয়া আদর্শ অনুসারে চলিবার শক্তি চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। হরিদ্বারে আর্ধ্যসমাজীদের যে গুরুকুল বিদ্যালয় আছে, তাহা হইতে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া কোন সরকারী চাকরী পাওয়া যায় না, উকীল বা ডাক্তার হওয়া যায় না। বালকগণকে ৭ বৎসর বয়সে তথায় প্রবেশ করিয়া ১৬ বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যার্থীরা বাড়ী আসিতে পারে না। এরূপ বিদ্যালয়ে দুইশত ছাত্র পড়িতেছে! এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী ভাল কিনা, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে; কিন্তু যে প্রদেশের লোকে সাংসারিক অনুবিধা অগ্রাহ করিয়া এরূপ বিদ্যালয়ে এত ছেলে পাঠাইতে পারে, তাহাদের আত্মিক শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না। যেখানে পড়িলে সাংসারিক কোন প্রকার সুবিধা হয় না, এক্ষিণ উক্তরূপ কোনও বিদ্যালয় বাঙ্গলা দেশে আছে কি?

গত ডিসেম্বর মাসে করাচীতে ভারতীয় নানাজাতির এবং আগ্রায় মুসলমানদের নানা সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার একটিতেও বাঙ্গালী সভাপতি ছিলেন না। ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা? না ইহার কোনও গূঢ় কারণ আছে? যদি কোনও কারণ থাকে, তাহা হইলে উহা দুই প্রকারের হইতে পারে

এক এই হইতে পারে যে বাঙ্গালী দেশহিতকর কোন প্রকার প্রচেষ্টারই আর অগ্রনীশ্রেণীভুক্ত নহেন।; দ্বিতীয় এই হইতে পারে যে আমরা কোন কোন বা সর্ববিষয়ে অসঙ্গত প্রদেশবাসীদের সমকক্ষ হইলেও, তাঁহারা আমাদের দৃষ্টিতে পারেন না বলিয়া কোনও সভা-সমিতিরই নেতৃত্বে আমাদের বরণ করিতে চান না। দুটি কারণের কোনও একটি সত্য হইলে, বা উভয়ই অংশতঃ সত্য হইলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা যদি বাস্তবিক অযোগ্য হইয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আর কি ঘুমান উচিত? আমরা যদি যোগ্য হইয়াও, অহঙ্কারের জ্ঞ, অপরকে অপজ্ঞা করার জ্ঞ, তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন বা বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকি, তাহাও কি সাতিশয় পরিতাপের বিষয় নহে? “অন্তেরা আমাদের হিংসা করে”, বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে পরিবারে সৌভ্রাতৃত্ব থাকে, তথায় সকল ভাই সমান গুণী না হইলেও ত কেহ পরস্পরের হিংসা করে না। আমরা বাস্তবিকই যদি শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের সপ্রেম, বিনীত, শিষ্ট ব্যবহারে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকা চাই। বাস্তবিক যাহার মনটা বড়, হৃদয়টা উদার, তিনি কাহাকেও তুচ্ছতাচ্ছল্য করেন না।

কিন্তু আমরা যে বাস্তবিকই, সব বিষয়ে ভারতের সেরা, তার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের পক্ষে মোটের উপর হিতকর কি না, তাহার বিচার এখন করিব না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে শিক্ষাদানে এই দুই আয়োজন দেশের প্রদেশের জ্ঞ হইতেছে এবং সকল প্রদেশের লোকই ইহাতে টাকা দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর বা বাঙ্গালী মুসলমানের নেতৃত্ব ইহাতে নাই। বোম্বাইয়ের পোসিডেন্সী এসোসিয়েশনে যদি যান, সেখানে ভারতের রাজনৈতিক যে-কোন বিষয় অনুশীলন করিতে চান, তথায় তাহার উপযোগী যথেষ্ট উপকরণ পাইবেন।

আমাদের কলিকাতার ভারত-সভার লাইব্রেরী দেখিলে বিস্ময়গণ হাঁসি পাঠবে এবং স্তম্ভিত হইবে। গত

বৎসর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যখন সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়বিবরণ সভ্যগণের বিবেচনার জ্ঞ উপস্থিত করা হয়, তখন শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে অনুপস্থিত থাকায় ভারতগবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব রাজস্বসচিব সারু গাই ফ্রীটউড উইলসন বুলিয়াছিলেন যে সেবারকার তর্ক-বিতর্ক “রামবিহীন রামায়ণের” (the play of Hamlet without Hamlet) মত হইবে। রাজস্বস্বকীয় জ্ঞানে ব্যবস্থাপকসভার কোন বাঙ্গালী সভ্য গোখলের সমান যোগ্যতা লাভ করা দূরে থাক, তাঁহার নিকটেও পৌছিয়া-ছেন কি? গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগে বাঙ্গালী অনেক দিন হইতে প্রশংসার সহিত উচ্চপদে কাজ করিতেছেন। গণিতে বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব খেলে। সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গালীর যে কোন স্বাভাবিক শক্তিহীনতা আছে, তাহা নয়। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই, রাজস্ব ও অর্থনীতি বিষয়ে দাদাভাই নৌরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রাণড়ে, জি. ভি. জোশী, দানশা এহলজি বাচা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুব্রহ্মণ্য আইয়ার, প্রভৃতির মত যোগ্য বাঙ্গালী কেহ নাই। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম এই দলের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। এই কারণে রাজস্ব ও অর্থনীতিবিষয়িত কোন বিষয় সম্বন্ধে বাঙ্গালীর লেখা খুব উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাঙ্গালা দেশের ইংরেজী বা বাঙ্গালা ধবরের কাগজগুলিতে বাহির হয় না। এতৎসদৃশ কারণে পুরাতন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত বাঙ্গালীর পার্চালিত কোন ব্যাঙ্কও নাই।

মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নয় বৎসর পূর্বে যে “ভারতভৃত্য সমিতি” (Servants of India Society) স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমতুল্য বঙ্গদেশে কিছু আছে কি? ইহার সভ্যগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত শক্তি ও সময় ভারতের রাষ্ট্রীয়, শিক্ষাবিষয়ক এবং বৈষয়িক উন্নতির জ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকেন। গোখলে এই সমিতির প্রথম সভ্য। বাঙ্গালা দেশের কেবল একটি যুবক এই সমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

কংগ্রেসের সেক্রেটারীদ্বয় বহু বৎসর ধরিয়া বোম্বাই হইতে নির্বাচিত হইতেন, গত ডিসেম্বরে মাদ্রাজ হইতে

হইয়াছেন। শিল্পোন্নতি সমিতির (Industrial Conference) সম্পাদক প্রথম হইতেই অমরাবতীর রাও বাহাদুর মুখোলকর মহাশয় আছেন। ভারতীয় সমাজসংস্কার সমিতির (Indian National Social Conference) নেতা আগে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণড়ে, এখন হইয়াছেন সারু নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর। উভয়েই বোম্বাইয়ের লোক। জাতীয় জীবনকে নানা দিকে অগ্রসর করিবার চেষ্টায় ব্যাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যে-সকল ব্যক্তির নাম করিলাম, তাঁহারা কেহই অযোগ্য নহেন। কিন্তু আমরা কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বাঙ্গালী কোন দিকেই মাথা উঁচু করিতেছে না, ইহার কারণ কি? অন্তর্গত শ্রেণীর (Depressed Classes) লোকদিগকে শিক্ষা ও অন্যান্য উপায় দ্বারা উন্নত করিবার চেষ্টায় বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে এবং পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লাজপৎরায়ের নাম যেরূপ শুনা যায়, কোন বাঙ্গালী তত বড় কাজ করিতেছেন বলিয়া শুনা যায় কি? পুণায় অধ্যাপক দ্বারকানাথ কাশীনাথ কাবুরে কুড়ি বৎসর ধরিয়া হিন্দুবিধবাস্রমে বিধবাদিগকে শিক্ষাদানপূর্বক স্বাবলম্বিনী ও দেশসেবাসমর্থী করিতে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার সমতুল্য কোন কাজ বাঙ্গলাদেশে হইতেছে কি? ঐ শহরেই উক্ত মহাত্মা মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত “নিকামকর্ম্মঠ” নামক ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদিগের আশ্রম দ্বারা উহার কার্য সম্পাদন করিতেছেন। উহার মত কোন কাজ বাঙ্গলা দেশে হইতেছে কি? পঞ্জাবের জালন্দরে কন্যামহাবিদ্যালয়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগ বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া বালিকাদের শিক্ষাদান এবং তদ্বারা শিক্ষয়িত্রীর অভাবপূরণ যে ভাবে হইতেছে, বাঙ্গলা দেশে কোনও বিদ্যালয়ে তেমন কাজ হইতেছে না। বোম্বাই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সেবা করিবার জন্য কত ক্রেশ স্বীকার করেন। বঙ্গে এরূপ কাজ কোন মহিলা এ পর্য্যন্ত করেন নাই।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে বা থিয়সফিক্যাল সভায় অল্প প্রদেশের লোকদের যেরূপ নেতৃত্ব আছে, বাঙ্গালীর সেরূপ নেতৃত্ব দেখা যায় না। অগ্ণাত কোন কোন প্রদেশে

হিন্দুসভা আছে; বঙ্গদেশে কিন্তু ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা আদি ধর্ম্মিকলেও সমৃদ্ধ হিন্দুর সম্মিলিত কোন সভা নাই।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, রাজস্ব-বিভাগের এন্রোল্ড লিষ্ট (Enrolled List) প্রভৃতির পরীক্ষায় ভারতবাসীদের মধ্যে যে কেবল বাঙ্গালীই উত্তীর্ণ হন, বা বাঙ্গালীই উচ্চ স্থান অধিকার করেন, তাহা আর বলিবার যো নাই। কেবলি কে কোন বাঙ্গালী সীনিয়র র্যাংকার হয় নাই, অগ্ণাত প্রদেশের দুই জন হইয়াছে।

বঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকেরা অগ্ণাত প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের চেয়ে ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রাদি কম পড়েন (আমরা পরীক্ষার পুস্তকের কথা বলিতেছি না), ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি “গৃহস্থ” পত্রেও এই কথা লেখা হইয়াছে। অপর অনেকেরও অভিজ্ঞতা এইরূপ। তাহা হইলে বাঙ্গালীর জ্ঞানপিপাসা কি কম হইয়া গিয়াছে? কারণ শুধু বাঙ্গালী সাহিত্য হইতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের প্রভুত্বানুসন্ধান-কার্যে অগ্ণাত প্রদেশের লোকদের ঠায় বাঙ্গালীরও খ্যাতি আছে; কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালী যে শীর্ষস্থানীয় তাহা বলা যায় না। কারণ বঙ্গের বাহিরে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভাউ দাজী, ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী, প্রভৃতির নাম করা যায়।

ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কণে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্বীকার্য; কিন্তু গণপৎ কাশীনাথ প্কারের মত প্রস্তর-মূর্তি-নির্মাতা বঙ্গে একজনও হই নাই।

জাতীয় জীবনে যতদিকে মানুষের প্রতিভার ও শক্তির পরিচয় পীওয়া যাইতে পারে, তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া, যে যে দিকে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ নহে, তাহার প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালী সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠস্থানীয় নহে। যে-সকল বিষয়ে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তাহাতে অগ্ণাত প্রদেশের লোকদের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। প্রাকৃতিক শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে কম নহি; কিন্তু কুপমণ্ডকতায় অহঙ্কারে,

বিলাসে, ফ্যাশনে, হুকে, কলুষিত থিয়েটার প্রভৃতির আমোদে লম্বুচিত হওয়ায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষায়, নারীকে অবরুদ্ধ ও অশিক্ষিত রাখিয়া তাহাকে অকর্মণ্য রাখায়, বরপণাদি কুপ্রথা দ্বারা নারীর অপমান করায়, ইত্যাদি নানা কারণে বাঙ্গালী বড় হইতে পারিতেছে না। ইহার উপর মালেরিয়া রূপ সর্বনাশী কারণ ত আছেই।

আমরা নৈরাশ্রের ভাব হইতে এতগুলি কথা লিখি নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভায়, শক্তিতে, ও তপঃকমতায় আমাদের বিশ্বাস আছে। তাই জাগিবার ও জাগাইবার ক্ষমতা এই আশোচনা।

পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের পূর্বে বৃষ্টি হওয়ায় কর্মকর্তাদিগকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু একপ বাধা সত্ত্বেও তাঁহাদের উৎসাহ জয়যুক্ত হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহিত হইয়াছে। আতিথ্যে কোন ত্রুটি হয় নাই।

“সঞ্জীবনী” বলেন :—

কর্মকর্তা সেক্রেটারী সীতানাথ অধিকারী মহাশয়ের কন্ঠার সম্ভানসম্ভাবনা ছিল। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চিঠিতে তাঁহার কন্ঠার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে। তিনি দুই দিবস চিঠি খুলিয়া পাঠ করেন নাই, কি জানি কোন মন্দ সংবাদ থাকিতে পারে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা শেষ হইলে চিঠি খুলিয়া তিনি এই মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি চিঠি খুলিতাম তাহা হইলে সভার কাজ কুরিতে পারিতাম না। এইরূপ কর্মবার কয় জন পাবনা সহরে আছেন, তাহা জানি না।

নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অভিভাষণে বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করেন। বঙ্গদেশে ইংরেজের আবির্ভাবের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের কথাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” কেন বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়াছিল, তাহার কারণ তাঁহার মতে এই :—

‘বঙ্গদর্শন’ তখন যথার্থই বঙ্গদর্শন রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ তখন আপন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে দেখিতে পাইল ; এবং আত্মদর্শন করিল বলিয়াই তাহার এই আনন্দ। এতকাল পরের লেখার উপর “মক্‌স” করিয়া কেবল পরকেই চোখের সামনে রাখিয়াছিল, আজ নিজের আনন্দ-প্রকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া, এক মুহূর্তে তাহার হৃদয়ের বন্ধনদশা ঘুচিয়া গেল।

বাঙ্গলাসাহিত্যে কোন্ট দেশী জিনিষ, কোন্ট নয়, তদ্বিষয়ে বক্তার মত প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকে ভাবেন যে, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকল্পণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তরকালে যাহা কিছু হইবে তাহা যদি কৃত্তিবাসী বা কবিকল্পণী ছন্দে না হয়, কিম্বা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশের জিনিষ হইল না ; তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, এবং তাহা দ্বারা আমাদের আত্মপরিচয়ের ধ্বংস ঘটে। জড়বস্তুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে বটে, কারণ যাহা তাহার পূর্বের পরিচয়, তাহার উত্তর পরিচয়ও তাহাই ; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। প্রাণবান্ পদার্থের যথার্থ পরিচয় পরিবর্তনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাব্য-সাহিত্য যদি আবহমান কাল কেবল কৃত্তিবাস ও কবিকল্পণের পুরাতন বুলিই পুনঃ পুনঃ আঙড়াইত, তবে তদ্বারা আমরা প্রাণহীন কলের পুত্রলিকারই পরিচয় পাইতাম, সাহিত্যের সজীব সত্তার পরিচয়ে কখনই নির্মূল আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না। ইংরাজি সাহিত্যের সজ্ঞাতে যখন এমন স্থানে আঘাত লাগিল, যেখানে আমাদের প্রাণপুরুষ বাস করে, তখন সে প্রাণপুরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই জাগরণ জানিলাম কি? দেখিলাম ইংরাজী সাহিত্যরসকে সে সাস্রা করিয়া লইয়াছে। নিজীবের সহিত বাহিরের পদার্থ সংযোগ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু এক করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। জীবিত মনুষ্যই বাহির হইতে পাদ্যরস গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হয় ; মৃতের পার্থে নানাবিধ সুষ্মা পুষ্টি কর আহারীয় রাখিয়া যুগযুগান্ত অপেক্ষা করিলেও সঞ্জীবনক্রিয়া দোষবার আশা করা যায় কি? এই গ্রহণ-ক্ষমতাই আমাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারাই আমাদের রসভোগের তৃপ্তি হয় এবং ইহা দ্বারাই আমাদের প্রাণশক্তি বদ্ধিত হইয়া আত্মপরিচয়ের সহায়তা করে। যতদিন ইংরাজি সাহিত্যকে পাঠশালার ছাত্রের মত গ্রহণ করিতে ছিলাম, ততদিন তাহার সত্তাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতঃ নিজের করিয়া লইতে পারি নাই, ততদিন নিজের প্রাণশক্তির অমুভব করিতে পারি নাই। বাহির হইতে এই সাহিত্যের রসধারা নিজের অন্তরে গভীর তলে সঞ্চিত হইয়া উৎস আকারে যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন নিজের অন্তরের সেই প্রাণবান্ বেগটিকে অমুভব করিতে পারিলাম। সেই জ্ঞানই আমাদের যথার্থ আত্মপরিচয়ের জ্ঞান। প্রাচীন বাঙ্গালীর প্রতিধ্বনিকে যদি চিরদিন বিস্তার করিয়া আনুভূতি করিয়া চলিতাম, তবে নিজের সজীব সত্তার পরিচয় তাহাতে পাইতাম না। সকলেই জানেন ইটালীতে একদিন যখন নব সঞ্জীবন-বেগ (Renaissance) আইসে, এলিজাবেথের রাজত্বকালের ইংলণ্ডও সেই বেগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের নবজাগরণের আবির্ভাব হয়। একপু না হইলে ইংলণ্ডের প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাইতাম না। সেক্সপিয়র যদি তাঁহার পূর্ববর্তী লেখক চমর প্রভৃতির অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গুণিগণপণায় আজ তাঁহার নাম সম্ভবে উচ্চারিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি তদানীন্তন ইটালির সাহিত্য হইতে তাঁহার বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি খাঁটি ইংরাজী কবি নহেন, এ কথা বলিবার সাহস কি কাহারও

হয়। দেশদেশান্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাতে লেখকের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারবাহীর স্বল্পে কাঁকার মধ্যে যে উপকরণ থাকে, তাহা তাহার দৈর্ঘ্যেরই পরিচয় দেয়, কিন্তু সেইগুলিই আবার ধনী গৃহসজ্জায় নিয়োজিত হইয়া তাহার সমৃদ্ধিরই সাক্ষ্য দান করে। উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম তাহা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না; সেই উপকরণ-গুলিকে আপনার করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিলেন, তাহার মধ্যে স্কটের প্রভাব কতখানি সে কথা মুণ্ডাভাবে আলোচনার বিষয় নহে। কাদম্বরী, বাসবদত্তা বা দশকুমারচরিতের ছাঁদে বঙ্কিমের পুস্তক রচিত হইলে সাঁচা ভারতবর্ষের পরিচয় দিত কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির কোন পরিচয় পাইতাম না। যদি দেখিতাম ইউরোপের জীবনবেগের অভিঘাতে ভারতবর্ষ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, আঘাতের পর আঘাত বাহির হইতে আসিতেছে, কিন্তু ভিতর হইতে তাহার কোন জ্বাবই নাই, তাহা হইলে বুকিতাম আমরা নিঃশেষে ও নিরুপায় ভাবে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছি। সে মৃত্যুর পরিচয় ত আনন্দের পরিচয় নহে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের উপস্থাপনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি যে তাহার রস ও ছাঁদকে আপন করিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছে ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। বাহিরের উপকরণকে আত্মসাৎ করার দ্বারাই তিনি আপনার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহার সুললিত ছন্দে আমাদের সাহিত্যও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা যখন এই বার্তা ঘোষণা করিল, তখনই বঙ্গসাহিত্য-লক্ষ্মীর উজ্জ্বলপ্রাণে আনন্দময় মঙ্গলশব্দ বাজিয়া উঠিল।

আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক গবেষণার যে চেষ্টা কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে, তন্মধ্যে বক্তা আনন্দের কয়েকটি যথার্থ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিল না, সেখান বিচার তখন মনে আইসে নাই। তিনি যে সাহসপূর্বক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে লইয়া দেশকে অনুসরণ করিতে ডাকিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট। ইহার মধ্যে যে যৌবনোচিত পৌরুষ ছিল, যে আত্মনির্ভরতা ছিল, যে আত্মশক্তির উপর আস্থা প্রকাশ ছিল, উহাই দেশের পক্ষে ঐক অপরূপ সামগ্রী। এতদিন, আমরা দেশের বিষয়ে মুখের কথায় গৌরব করিব, কিন্তু সেই গৌরব করিবার অধিকার যে তপস্বীর দ্বারা অর্জন করিতে হইবে তাহাতে পরাধীন রহিব, এই অসত্য আশ্বাসিকে বহুকাল ধরিয়া লোকসমাজে লাঞ্চিত করিয়াছে; সে লাঞ্ছনা যাহারা ছুঁ করিয়াছেন, আপনার শক্তির প্রতি যাহারা আস্থা আকর্ষণ করাইয়াছেন, অনুসন্ধানের পথ পুস্তকের মধ্যে নিহিত নহে, উহা দেশের অরণ্যে, কাঙ্কারে, ভূগর্ভে নানাশাখায় নানাদিকে প্রসারিত, সেই পথে অগ্রবর্তী হইয়া যাহারা আমাদের আশ্বাসকে আর্হান করিয়াছেন, অদ্যকার সাহিত্যসম্মিলন সভায় আমরা তাঁহাদের অগ্রকীর্তন করি। সত্য

চেষ্টা দ্বারাই সত্য ফল লাভ করা যায়। সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায়-প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্রঅনুসন্ধান-সমিতিপ্রমুখ সভাসমিতির সমবেত চেষ্টায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেশের সত্য ইতিহাস যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে অতীত গৌরবের চিত্র আমাদের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছে, তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে, মিথ্যার আবরণ শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহা আদৃত করিতে পারিবে না।

দ্রবপ্রমাণশূন্য ইতিহাস হয় কি না বলা কঠিন। যে-সমস্ত ঘটনা চক্ষের উপর খটতেছে, তাহাই বর্ণনা করিতে বসিলে লেখকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবার সর্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহার উপর যেখানে জেতাজিত সম্বন্ধ আছে, সেস্থলে কল্পিত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে, ইহা আশ্চর্যের কথা নহে। আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা মানবমনের একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম, শত্রুর গুণকথন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও সে বিষয়ে উৎসাহ জগতে ছলভ। একরূপ স্থলে পুরাতন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সত্যমূলক করিবার একমাত্র উপায়—পুরাতন ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির আবিষ্কার ও রক্ষা এবং সেই সব উপাদানের সাহায্যে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাসের রচনা। দেশের যে-সকল সুসন্ধান এই পথে অগ্রবর্তী হইয়া নানা ক্রেশ ও বিবিধ অনুবিধা ভোগ করিয়া দেশের চিরন্তন অভাব মোচন করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর ললাট হইতে দুঃপনয়ে চিরকলঙ্ক মুছাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম ভক্তিভাজন। বরেন্দ্রের বনে প্রান্তরে, ভূগর্ভে ভূধরে, যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি শিলালিপি ও তাম্রফলকে অনুশাসন অনুসন্ধান করতঃ বাহির করিয়া রাজসাহীর কলা-ভবনে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে যথার্থই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এলোরা, অজন্তা, সাঁচি ও সারনাথের মূর্ত্তিগুলি যাহারা দেখিয়াছেন, অনুসন্ধানসমিতির সংগৃহীত বাঙ্গালী ভাস্কর ধীমানের গঠিত মূর্ত্তির সহিত তুলনায় সেগুলি সৌন্দর্য্যে হীন বলিয়াই অনুমিত হইবে। এই দেশহিতকর মঙ্গলময়-স্বাস্থ্য কর্ম্ম যাহাদের অক্রান্ত শ্রমে ও অকাতর অর্থব্যয়ে সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাস চিরদিন তাঁহাদের এই অক্ষয়-কীর্ত্তির ঘোষণা করিবে। কেবল ইহাই নহে, ইউরোপীয় মনীষ্য-সম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গালার মধ্যযুগের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধার একরূপ অসাধ্যসাধন বলিয়া নিরাশার সহিত উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁহার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণ বিচারশক্তির গুণে সেই ইতিহাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দুঃস্বপ্ন তপশ্চরণ করিয়া যে-সকল মহানুভব মনীষিগণ দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করতঃ আমাদের চিরলাঞ্ছনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, এই তপস্বীর যথাযথ ফল তাঁহারা এখন না পাইলেও আমাদের উত্তরপুরুষদিগের জীবনের সর্বপ্রকার সফলতার মধ্যে ইহার সাফল্যের বীজ নিহিত হইয়া রহিল।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ যাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁহার কথায় যে দুই চারিটি কথা যোগ করিতে যাইতেছি, ইয়ত তাঁহারই বক্তব্যকে যে স্ফুটতর করিতে যাইতেছি, তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও

শ্রীযুক্ত রত্না প্রসাদ চন্দ মহাশয়দিগকে বিন্দুমাত্রও প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত নহে, কেবল ২৮ টি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত। আমরা প্রত্নতত্ত্বাসক্তানের বিশেষাধিকার রাখি না, কারণ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি। ভ্রম হইলে বিশেষজ্ঞেরা রূপা করিয়া সংশোধন করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তকে ভয় না করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছিলেন বাঙ্গালাদেশে সর্বপ্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি প্রধানতঃ ইংরেজিতে লিখিতেন বটে, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। কালানুক্রম, গুণানুক্রম বা বর্ণানুক্রম না ধরিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যানু-সন্ধান-ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি নাম করা যাইতে পারে; যথা, রত্নমদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শনিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাধেশচন্দ্র শেঠ, শরচ্চন্দ্র দাস, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়-চন্দ্র মজুমদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ইত্যাদি। যদি অনধিকার-চর্চাজনিত ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট হইতে আবার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছি।

গ্রামনির্মাণ সম্বন্ধে শ্রীমতী সুখদামুন্দরী দেবীর লেখা একটি প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে আনন্দিত হইবার দুটি কারণ আছে। নারী দেশের সকল কার্যে যোগ দেন, ইহা সর্বথা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে নারীর মাতৃহৃদয়ের সেবাপ্ররক্তি ও কল্যাণ-চিকীর্ষা যখন নিজ পরিবারের মঙ্গল করিয়া তাহার বাহিরেও কার্যক্ষেত্রে খোঁজে, তখন সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। নারীকে আমরা গৃহেই জননী বলিয়া জানি; যখন তাঁহাকে অধিকন্তু লোকমাতা বলিয়াও জানিব, তখন তাঁহার শক্তির নব পরিচয় পাইয়া সমাজ ধন হইবে। যিনি গৃহস্থালির গৃহলক্ষ্মী, তিনি গ্রামে গ্রামলক্ষ্মী হইল। কিসে গ্রামের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও গুচিতা বাড়ে, তাহার ব্যবস্থা-কার্যে সাহায্য করিবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক।

গত পৌষমাসে শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পাটনা গমন করেন। তদুপলক্ষে তথাকার বাঙ্গালীদের মুদ্রণপরিষৎ তাঁহাকে যে “অভিভাষণ” প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহারা যে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তাহা সকল বাঙ্গালীরাই জানা কর্তব্য। শুধু জানিলে হইবে না, প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহকারিতা ও সহযোগিতা করাও আমাদের কর্তব্য।

বঙ্গবিযুক্ত বিহারের স্কুল কলেজে এখনও বঙ্গভাষার চর্চা চলিতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিহারের সারস্বত-আয়তনসমূহ হইতে আমাদের মাতৃভাষার নিকাশিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি জেলার আদালত হইতে বঙ্গভাষা নির্বাসিত হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি বঙ্গভাষী জেলা বাঙ্গাল হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এই-সকল কারণে এ অঞ্চলে বঙ্গভাষার প্রসার-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। এখন হইতে প্রতীকারের উপায় না করিলে বিবিধ কারণ-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিহারে বঙ্গভাষার চর্চা লুপ্ত হইতে পারে। যে ভাষায় প্রথমে ‘বা’ উচ্চারণ করিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল, সে ভাষা ভুলিলে প্রবাসী বাঙ্গালী থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা আর বাঙ্গালী থাকিব না। সেই শোচনীয় আতিগত যুগের প্রতিবেদককে বিহারের স্থানে স্থানে—

(১) বঙ্গভাষীদের জন্ত স্বতন্ত্র সারস্বত-আয়তনসমূহের প্রতিষ্ঠা,  
(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্ত,—প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যের সহিত সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত, পরিষৎ প্রভৃতির স্থাপন,

(৩) বঙ্গভাষীদের পরস্পর মিলন, সামাজিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা-সাধন প্রভৃতির জন্ত মিত্রগোষ্ঠী, আলোচনা-সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা,

(৪) এবং এইরূপ বিবিধ পথে উপনিবেশী বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রীতি ও সহায়ত্বের সৃষ্টি ও রক্ষা জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও বিবর্তের জন্ত আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

মহারাজ! ‘সুখলা, সুফলা, শশ্যশ্যামলা,’ নারীরাই বিহগকৃজনমুগরা বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালাদেশ বিদ্যমান। Greater Britainর মত Greater Bengal অতীতের স্বপ্ন নহে, সত্য। আজ বাঙ্গালী অক্ষুণ্ণচারী বঙ্গের সহিত উপস্থিত হইতেছে বটে, কিন্তু অতীত যুগে এই বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষগণ ত্রিকলিঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং ‘নীলসিন্ধুজল-ধৌতচরণতল—অনিলবিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল’-কলিঙ্গের ‘তমাল-তালীবনরাজিনীলা’ বেলা হইতে এই বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ী বংশধরগণ সুদূর যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাশ্মীর, শ্রাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিহারের সারস্বত তীর্থ নালন্দার ইতিহাসপ্রথিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মনীষী জগদ্বাসীকে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিতেন। হৃদয় অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজ অধিকারের পূর্বেও বাঙ্গালীরা ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার জন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের প্রচারক



শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে কিছু টাকা দিয়া বাদাজেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ অর্থসংগ্রহের জন্য সর্বসাধারণের নিকট নিয়ে মুদ্রিত ভিক্ষাপত্র উপস্থিত করিয়াছেন।

একগে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে, ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিছুদিন পূর্বে ঐ অঞ্চলের মাননীয় ছোটলাট শ্রীযুক্ত সার্ জেমস্ বেটন মহোদয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ আহৃত সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বহু সহস্র পুরুষ ও রমণী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই সংখ্যা যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সভাতে তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বৎসরে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ১৭০০০ বর্গমাইল স্থানের উপর বাণ্ড হইবে এবং প্রায় ৭৫০০০০ পুরুষ ও রমণীকে সাহায্য করিতে হইবে। সর্বসমেত প্রায় ৩০০০০ বর্গমাইল স্থানে প্রায় ১৪০০০০০ জনকে ভীষণ অন্নকষ্ট হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বাদা এবং জলৌনে সর্বাপেক্ষা ভীষণ কষ্ট দেখা যাইতেছে।

মাননীয় ছোটলাট মহোদয় আরও বলিতেছেন যে এই ভীষণ অন্নকষ্টের সময় সাধারণের দানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেন্ট যাহা দান করিবেন বা করিতেছেন তাহা জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখস্বচ্ছন্দতা আছে, যাহা জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও জীবনকে অনেক পরিমাণে মধুর করে। সেই-সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের জন্য সাধারণের দান একান্ত আবশ্যিক। এমন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রকাশ্য ভাবে দান গ্রহণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞান করেন। ইহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিবার জন্য এই সাধারণ দান ব্যয়িত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই মহৎ কার্য্যে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী কিঞ্চিৎ কাঁচা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া লাহোরপ্রবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বাদাতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর এই সাহায্য দানের ভার অর্পণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইজন্য দেশের সহৃদয় নরনারীর নিকট এই কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাঁহারা স্বদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জাতা ভগিনী, সম্মান সম্ভতির সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করুন। এই জন্য যিনি যাহা প্রদান করিবেন, তাহা নিঃস্বাক্ষরকারী সাদরে গ্রহণ করিবেন এবং প্রকাশ্য পত্রে তাহা স্বীকার করিবেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।  
২৪এ ক্রেস্‌ফোর্স, ১৯১৪।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত  
সম্পাদক,  
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

অবিনাশবাবু বাদায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি বিধবার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এরূপ নিঃস্ব ও বর্গহায় যে দুর্ভিক্ষের সময় কেন, তাঁহাদিগকে চিরদিন সাহায্য দিলে ভাল হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে যত বেশী টাকা পাওয়া

যাইবে, তত অধিক কাজ করিতে পারা যাইবেন আগামী মাসে তাঁহার বাঙ্গীতে আর একটি সাহায্যদানকেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। দুই চারি আনা পরসাদা দিলেও একজন মানুষকে দুই এক দিন অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায়। এই পুণ্যলাভ করিতে সকলেরই ব্যগ্র হওয়া উচিত।

একজন এটর্নী সংখ্যাসংগ্রহ (Statistics) দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জ্বীলৌকের পক্ষে যৌবনপ্রাপ্তির পর বিবাহ অপেক্ষা বাল্যবিবাহ ভাল; কেননা, তাঁহার মতে বাল্য বিবাহিতা মাতার শিশুসন্তান অপেক্ষা যৌবনপ্রাপ্তির পর বিবাহিতা মাতাদের শিশুসন্তান অনেক বেশী মারা পড়ে। কিন্তু বিবাহজাত শিশু বেশী মারা পড়ে, তাহা তিনি কলিকাতার সেন্সদ্রিপোর্ট আদি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তির গোড়াতেই গলদ। তাঁহার যুক্তি এই :— কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক প্রচলিত; কলিকাতাবাসী ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত। সুতরাং যদি হিন্দু মুসলমান শিশু অপেক্ষা কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, খৃষ্টিয়ানদের শিশুগণের মৃত্যু বেশী হয়, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করিবার কতকটা কারণ জন্মিবে, যে, বাল্যবিবাহ অপেক্ষা যৌবনবিবাহই শিশুমৃত্যুর প্রবলতর কারণ। এটর্নী মহাশয় মনে করেন যে কলিকাতার হিন্দু মুসলমান শিশু অপেক্ষা কলিকাতাবাসী ইংরেজ আদি খৃষ্টধর্মাবলম্বী শিশুদের মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাস্তবিক সত্য কথা তাহা নহয়। ১৯১০-১১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপালিটির রিপোর্টের পরিশিষ্টের ১৩৮ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখুন। তাহাতে দেখিবেন—কলিকাতাজাত হিন্দু শিশু হাজারকরা ২৫২ জন মরিয়াছে; কলিকাতাজাত মুসলমান শিশু হাজারকরা ৩৪৩ জন মরিয়াছে; কিন্তু কলিকাতাজাত ইউরোপীয় আদি (Non-Asiatic) শিশু হাজারকরা ১৪১ জন মাত্র মরিয়াছে। সুতরাং এটর্নী মহাশয়ের যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে যৌবনবিবাহোৎপন্ন শিশুরাই বেশী বাঁচে, সুতরাং এইরূপ বিবাহই ভাল!

এটর্নি মহাশয়ের ভুল হইবার কারণ এই :—তিনি কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথমভাগের ১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি মানচিত্রে দেখিয়াছেন যে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী মাণিকতলায়, এবং ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ সংখ্যক অঞ্চলে (ward); এবং তিনি ঐ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আর একটি মানচিত্রে ইহাও দেখিয়াছেন যে কলিকাতার যে যে অংশে খৃষ্টীয়ানেরা প্রধানতঃ বাস করে ১৬ ও ১৭ সংখ্যক অঞ্চল (ward) তাহার অন্তর্গত। তজ্জন্ম তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেহেতু খৃষ্টীয়ানেরা যৌবনবিবাহ করে, যেহেতু তাহারা ১৬ ও ১৭ সংখ্যক অঞ্চলে প্রধানতঃ বাস করে, এবং যেহেতু যে যে অঞ্চলে শিশুরা সর্বাপেক্ষা বেশী মারা পড়ে ঐ দুই অঞ্চল তাহার অন্তর্ভুক্ত, অতএব যৌবনবিবাহ বাল্যবিবাহ অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর প্রবলতর কারণ। কিন্তু এটর্নি মহাশয় ঐ সেন্সস্ রিপোর্ট পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা উন্টাইলেই দেখিতে পাইতেন যে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতি দশহাজারে ৭০৭২ জন হিন্দু ও মুসলমান, বাকী খৃষ্টীয়ান আদি অন্তর্ভুক্ত। এবং ১৭ নং ওয়ার্ডে প্রতি দশহাজারে ৬২৫৯ জন হিন্দু ও মুসলমান, বাকী খৃষ্টীয়ান আদি অন্তর্ভুক্ত। ঐ দুই ওয়ার্ডে যে হিন্দু মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, বেশী শিশু-মৃত্যু তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের জন্ম নয়। পরন্তু খৃষ্টীয়ান আদি যাহাদের সংখ্যা কম, অধিকতম শিশু মৃত্যু তাহাদেরই মধ্যে ও তাহাদেরই জন্ম, একরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত তিনি কোন্ যুক্তির সাহায্যে করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। মাণিকতলায় এবং ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ সংখ্যক ওয়ার্ডে অর্থাৎ জোড়াবাগান, ওয়ার্টালু স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, বামনবস্তী ও ওয়ার্টগঞ্জ শিশুমৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহার প্রত্যেক অঞ্চলেই হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্টের ১ম ভাগের ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ঐ ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রতি দশহাজারে কত তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। মাণিকতলায়—৯৯৬৫, জোড়াবাগানে—৯৮৬১, ওয়ার্টালু স্ট্রীটে—৭১৩৬, পার্ক স্ট্রীটে—৭০৭২, বামনবস্তীতে—৬২৫৯ এবং ওয়ার্টগঞ্জে—৯৮১০। )

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে এটর্নি

মহাশয়, প্রমাণ কাহাকে বলে, বোধ হয় বুঝেন না। সুতরাং তাহার অন্ত্য কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা অনাবশ্যক। তিনি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদগণের এবং প্রাচীন আর্ষ্য ঋষি স্মৃষ্ণতের বিরুদ্ধে যুক্তবোধনা করিয়াছেন। কিন্তু তদুপযোগী যুক্তোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

স্মৃষ্ণত বলেন :—

“উনষোড়শবর্ষীয়াম্ অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।

যদ্যাধস্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥

জাতো বা ন চিরং জীবৎ জীবৎ দ্ব লৈঙ্গিয়ঃ।

তস্মাদতান্তবালয়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥”

(স্মৃষ্ণত, শারীরস্থান, ১০ম অধ্যায়।)

অনেক বৎসর পূর্বে, মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের অন্ততর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তর্জীণ্ ঠা এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন বালিকার, অন্ততঃ ষোড়শ-বর্ষীয়া যত দিন না হইতেছেন ততদিন, বিবাহ দেওয়া কখনও উচিত নয়। আর যদি ইহার চেয়ে বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা নারী ও তাহার ছেলেমেয়ের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ডাক্তার ডি বি স্মিথ মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ষোল বৎসর নিরূপণ করেন। তাহার মতে ষোড়শ বর্ষের পরও দুই তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিলে বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা। ডাক্তার নবীনকুমার বসু অষ্টাদশবর্ষ নারীগণের বিবাহের যোগ্যকাল মনে করেন; কিন্তু যখন এদেশে বহুদিন পর্যন্ত বিপরীত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তখন তাহার মতে অন্যান্য পনের বৎসর বিবাহকাল আপাততঃ নির্ণয় করা কর্তব্য। ৮ কুড়ি বৎসরের পূর্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আশ্রাম পাণ্ডুরঙ্গ কুড়ি ও তাহার কাছাকাছি বয়সকে বিবাহের বয়স বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ডাক্তার এভি হোআইটের মতে আঠার মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, ষোল।

অর্ধ-বা-বারানা-সরকারী যে সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা কয়েক বৎসর হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এবং কোন কোন অধ্যাপক যেরূপ সরকারী অর্থসাহায্য পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীনতা কিছু যে কমিয়াছে, তাহা সম্মতি-আইনের ও বিদেশী-বর্জনের আন্দোলনের সময় বুঝা গিয়াছিল। যাহা হউক, এই বিষয়ে এখন জাতীয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির দিক্ দিয়া কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। টোলের শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি অবনতির কথাই আলোচনা করিব। টোলের শিক্ষার চিরন্তন প্রণালীর আর দোষ যাহাই থাক, পল্লব-গ্রাহিতা ইহাতে প্রশ্রয় পাইত না। যে ছাত্র যাহা পড়িতেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করা এবং ভাসা ভাসা ভাবে কয়েকটা বিষয় জানিয়া পল্লবগ্রাহিতার দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রশ্রয় পায়। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ দোষ টোলে প্রবেশ করিয়া বন্ধমূল না হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। টোলের অধ্যাপকগণ এখন পর্য্যন্ত, কৃতী ছাত্রের বিচ্যাবুদ্ধি ও আচরণে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে উপাধি দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই চিরন্তন অধিকার যেন লুপ্ত না হয়। সকল অধ্যাপকের যোগ্যতা সমান নয়; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত উপাধির মূল্যও সমান নয়। কিন্তু জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানেই সন্তুষ্ট দরিদ্র অধ্যাপকের পরিবারে বাস করিয়া যে সব ছাত্র বিদ্যাল্যে করে, ও তাহার পর উপাধি পায়, তাহাদের সে উপাধির মূল্য কেবল মাত্র পরীক্ষালব্ধ উপাধির অধিক। কি আধুনিক, কি প্রাচীন, উভয়বিধ শিক্ষাপ্রণালীতেই, জ্ঞান এবং জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকের জীবনের প্রভাব, উভয়েরই স্থান থাকা আবশ্যিক। এইজন্য বলিতেছিলাম যে অধ্যাপকদের উপাধি দিবার অধিকার যেন কোন প্রকারে হ্রাস না পায়।

সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষার অধ্যক্ষসভা (Board) এই রূপ একটি প্রস্তাব মঞ্জুরীর জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে

বাঙ্গলা বা হিন্দী সাহিত্যেও পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইহাতে পাশ ফেল হওয়ার উপর উপাধি-লাভাভ নির্ভর করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা উহাতে পাশ হয়, ত, তজ্জন্ম সাটীফিকেট পাইবে। আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। অধিকন্তু ইহাও বলি যে বাঙ্গলা বা হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, ভূগোল, ইতিহাস এবং পাটীগণিত যুক্ত হওয়া উচিত। এই এই বিষয়ে স্বতন্ত্র এক এক খানি বহি হইলেই ভাল হয়। নূনকল্পে, একখানি সাহিত্যিক বহিতেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কতকগুলি পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, অপর একখানি হিসাবের বহি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেই চলিতে পারে। অবশ্য কেবল একজন গ্রন্থকারের বহিই পঠিত হইবে, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত নয়। আদর্শানুযায়ী ভাল বহি যত পাওয়া যাইবে, সবগুলিই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া দরকার।

সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা ভবিষ্যতেও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেগুলি শিক্ষার অঙ্গীভূত থাকা উচিত। কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া এখন আর মানুষ বর্তমান যুগে জীবনযাপনের উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে না। কেবল বুদ্ধির প্রখরতা সাধিত হইলে, বা ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান লব্ধ হইলেই শিক্ষা সর্বান্নসম্পন্ন হয় না; যে যুগে মানুষ বাস করে, সে যুগের মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে বা ঘটতে পারে, সকল ব্যাপার বুঝিবার, এবং শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কোন কোনটিতে যোগ দিয়া সমাজসেবা করিবার ক্ষমতা মানুষের জন্মান উচিত। বর্তমানে টোলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কতকগুলি সংসারানভিজ্ঞ, কোন কোন স্থলে নিজের গৃহস্থালির পর্য্যন্ত হিসাব রাখিতে অক্ষম, মানুষ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। অধ্যাপকেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে মনোরথে আরোহণ করিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাস্তব-জীবন এই কলিযুগে। অধুনা এই পৃথিবীতে কোথায় কি আছে, কি ঘটতেছে, কেন ঘটতেছে, এ সকল জ্ঞান নিশ্চয়ই চাই। হিন্দুসমাজের সামাজিক ও ধার্মিক নেতা

তাহাদেরই হইবার কথা। কিন্তু আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুরা মুখে তাহাদিগকে সমাধিশিরোমণি বলিয়া মানিলেও বস্তৃতঃ তাহাদের প্রতি তাচ্ছল্যই প্রদর্শন করেন। তাহারা যদি আধুনিক পার্থিব ব্যাপারের কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রভাব নিঃসন্দেহই বর্ধিত হইবে।

—•—

পূর্বে কোন কলেজে না পড়িয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষা দেওয়া চলিত। পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, যে কলেজের বি এ সেই কলেজেরই এম্ এ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বিশ্ব-

বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ২১টি মাত্র কলেজের আছে; তাহাও কেবল ২১ বিষয়ে। এই কলেজগুলি আবার অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া থাকেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় শয়ং অনেকগুলি বিষয়ে এম্ এ অধ্যাপনার ভার লইয়া ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রায় এক হাজার ছাত্র নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষা করিতেছেন। ছাত্রসংখ্যা এরূপ অধিক হওয়ায় আরও অধ্যাপক নিয়োগ এবং পূর্ব হইতে নিযুক্ত কোন কোন অধ্যাপক যাহাতে সমস্ত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যেই দিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তাহা করিয়া ছাত্রদের ও দেশের মঙ্গল করিয়াছেন।



অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ।



অধ্যাপক ব্রীজু সী, ভী, রামন্।

বিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম হওয়ার পর আর সেরূপ ভাবে পরীক্ষা দেওয়া চলে না। সুতরাং প্রথমশ্রেণীর অন্ততঃ কয়েকটি কলেজে নানা বিষয়ে এম্ এ পড়াইবার বন্দোবস্ত করা পূর্বাগত আবশ্যিক হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ

সেনেটের সভায় এরূপ বন্দোবস্তে ৩৪ জন ইংরেজ অধ্যাপক আপত্তি করেন। যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সকল বিষয়ে নিখুঁত হয় নাই, তাহা হইলেও একথা বলা অসঙ্গত যে

হয় সম্পূর্ণ নিখুঁত বন্দোবস্ত কর, নতুবা এমএ অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থাই করিও না। বড় বড় অধ্যাপনাকক্ষ, সুন্দর আসবাব, মোটা বেতনভোগী ইংরেজ অধ্যাপক, আর প্রতি শ্রেণীতে উর্দ্ধ সংখ্যায় জন কুড়ি ছাত্র, এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে লেখা পড়া শিখা যায় না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। আমরা যখন এমএ পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তখন কোনও অধ্যাপকের নিকট একদিনও পড়ি নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এইরূপে যঁাহারা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা লেখাপড়া শিখেন নাই, ইহা বলিতে পারি না। আর এখন বিশ্ববিদ্যালয় বহুসংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন; যঁাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত যোগ্য অধ্যাপক কয়েক জন আছেন। যঁাহাদিগকে আমরা চিনি না, তাঁহাদেরও অযোগ্য হইবার কথা নহে। এরূপ বন্দোবস্তে ছাত্রেরা লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না, বলা সঙ্গত নহে।

যে-সকল ছাত্র বিজ্ঞানে উচ্চ পরীক্ষা দিতে চায়, অনেক দিন হইতে তাহাদের বড় অসুবিধা চলিতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার অধিকারপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা কম। তাঁহারা আবার ভর্তি করেন অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র। মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে বেশী ছাত্র লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু, পরে উহার অধ্যাপক কমিয়া যায় নাই, যন্ত্রাদিও কমে নাই, পড়াইবার ঘর এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিও ছোট হইয়া যায় নাই, তথাপি পূর্বাপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়।

এই-সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একচেটিয়া অধিকার থাকায় যঁাহাদের ব্যবহারে সহৃদয়তা ও বিবেচনার অভাব কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হইত, তাঁহারাও সাবধান হইতে পারিবেন।

আজকাল বিবাহের মধ্যে এমন একটা জঘন্য অর্থ-গৃহুতা চুকিয়াছে যে সচরাচর দেখা যায় যে গয়নার ও টাকারই আদর, বধুর আদর যদি হয়ও তাহা ঐ গয়না

ও টাকারই জন্ত। বিবাহের পরও বধুর ও তাহার বাপমার নিষ্কতি নাই। পূজাপার্কণে বরের বাপমার যথেষ্ট প্রাপ্তি না ঘটিলে তাঁহারা বধুর খুব লাঞ্ছনা করেন। তাহার ফলে সেদিন একটি পনের বৎসরের বধু স্বপ্নর বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা পিতৃগৃহে পুড়িয়া মরাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছে। সে গজনা ও উৎপীড়নের উত্তাপ কিরূপ হুঃসহ যাহার তুলনায় আঙুনও সুশীতল!

একটা কৃত্রিম কুপ্রথা মানুষকে ভুলাইয়া দিতেছে যে নারীর যেমন বিবাহের দরকার পুরুষেরও তেমন দরকার। তাহাতেই বালিকাদের এত লাঞ্ছনা হইতেছে।

হিন্দুবিবাহের মন্ত্র দেখিলে মনে হয় যে পুরাকালে বিবাহের আদর্শ এরূপ নীচ ছিলনা। বধুর কি উচ্চ সম্মান ছিল দেখুন। তাঁহাকে বলা হইতেছে—

যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।  
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥  
যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।  
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী স্তথা ত্বং ভব ভর্তৃরি ॥

“ইন্দ্রের শচী যেমন, বিভাবসুর স্বাহা যেমন, চন্দ্রে রোহিণী নলে দময়ন্তী, বৈবস্বতে ভদ্রা, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, এবং নারায়ণে লক্ষ্মী যেমন, তুমি তোমার পতিতে তক্রপ হও।”

তুমি তোমার স্বামীর ও তাহার পিতামাতার অর্থ পিশাচতা চরিতার্থ করিবার যন্ত্ররূপিণী হও, ইহা বলা হইত না।

বধুকে পতিকূলে ধ্রুব করিয়া রাখিবার জন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারিত হইত :—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকূলেভূয়াসম্।”

এখন বধুর ও তাহার বাপমার লাঞ্ছনাই বিবাহের মধ্যে ধ্রুবতম সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাচীন হিন্দুবিবাহের মন্ত্র অনুসারে বর বিবাহান্তে বধুকে গৃহে আনিয়া বলিতেন :—“ওঁ সম্রাজ্ঞী স্বপ্তরে ভব, সম্রাজ্ঞী স্বশ্রবাম্ ভব, ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী অধিদেবু স্বাহা।” বধুর এত বড় উচ্চ সম্মান আর কোন জাতির বিবাহপদ্ধতিতে আছে বলিয়া শুনি নাই;—তাঁহাকে, স্বপ্তর শীতলী ননদ দেবর, সকলের মধ্যে, সকলের হৃদয়ে, সম্রাজ্ঞীর স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা অর্থপিশাচ হইয়া

এক বধূর একরূপ লাঞ্ছনা করি, যে কেহ অশুভনে পুড়িয়া, কেহ জলে ডুবিয়া, কেহ বিষ খাইয়া, কেহ বা গলায় দড়ি দিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারলাভ করে। যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানেও সচরাচর বধূ বলিয়া বধু সম্মানিত ও পূজিত হন না, তাঁর বাপ মা টাকা দিতে পারিলে তবে তিনি বিবাহযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। দেশের এক কলঙ্ক আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। যুবক যুদ্ধ সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, যে, “যত্র নার্যাস্তু পূজ্যস্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ”, “যেখানে নারীগণ পূজিত হন, দেবতারা তথায় আনন্দে বিহার করেন” আমাদের গৃহে গৃহে এই শাস্ত্রীয় বচনের দৃষ্টান্ত অচিরেই পরিলক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ একরূপ অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিতেছেন যে বালিকাদিগকে খুব অল্প বয়সে বিবাহিত করিলে তখন তাহারা মাবাপের দুঃখ বুঝিতে পারিবে না; স্মৃতরাং স্নেহলতার মৃত্যুর মত দুর্ঘটনা আর ঘটিবে না। চমৎকার যুক্তি! যেন দুর্ঘটনা ঘটাটাই একমাত্র দুঃখের বিষয়; যে জঘন্য সামাজিক রীতির জন্ত লোকে সর্ব-প্রান্ত হইতেছে, বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনাস্তর ঘটিতেছে, দায়ে পড়িয়া পণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্ত বা এড়াইবার জন্ত লোকে প্রতারণা করিতেছে, বালিকারা আত্মঘাতী হইতেছে, সেই রীতিটাই যেন ঘোর পরিতাপের বিষয় নয়। তা ছাড়া বাপ-মায়ের টাকার যোগাড় হয় না বলিয়াই ত অনেকস্থলে অবিবাহিতা কন্যার বয়স বাড়িয়া চলিতে থাকে। ফোঁড়া হইলে যদি কোন ডাক্তার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে বলে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিলে তাহাকে আফিং খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিতে বলে, কিন্তু রোগ বিনাশ করিবার কোন চেষ্টা করে না, তাহার ব্যবহার যেরূপ, এই যুক্তির স্রষ্টাদের আচরণও তদ্রূপ।

যাঁহারা মেয়েদের বাল্যবিবাহ অবশ্যকর্তব্য, এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বরপণপ্রথা উন্মূলিত করিতে পারিবেন মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমাদের কোন ঝগড়া নাই। কিন্তু আমাদের নিজের পরিচয় এই যে এই প্রথাকে উন্মূলিত করিতে হইলে, হিন্দী ব্রাহ্মণদের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যেমন অবশ্য-

কর্তব্যতার নিয়ম নাই, বয়স সম্বন্ধেও কঠিন নিয়ম নাই, সকলকেই সেই অধিকার দেওয়া কর্তব্য; ব্রাহ্মণাদি জাতি যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বৈবাহিক আদান প্রদান তাঁহাদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বরকন্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিস্তৃততর করা উচিত; \* কন্যাকে জ্ঞান ও ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থাতে অবিবাহিত থাকিলে তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ, এবং, প্রয়োজন হইলে, অপরের গলগ্রহ না হইয়া নিজের ভরণপোষণ করিতে পারেন; এবং পুত্রের মত কন্যাও যাহাতে পিতৃধনে অধিক্যুরিণী হন, একরূপ ব্যবস্থা পিতার করা উচিত।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে একরূপ সামাজিক মত নাই, জাতিভেদ নাই, অথচ সেখানেও ত টাকার জন্ত অনেকে ধনী কন্যা বিবাহ করে, স্মৃতরাং প্রকারান্তরে বরপণ প্রথা ত সে সব দেশে রহিয়াছে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে টাকার জন্ত বিবাহ আছে, কিন্তু সামাজিক রীতির সাহায্যে পণ-আদান-রূপ উৎপীড়ন নাই। কি আমাদের দেশ, কি অন্য দেশ, টাকার জন্ত বিবাহ ততদিন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে না, যতদিন পর্যন্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ সামাজিক পরিবর্তনের সহিত, পুরুষ ও নারীর ধর্মবুদ্ধি না জাগিবে, আত্মসম্মান-জ্ঞান সজাগ না হইবে, এবং দম্পতির পরস্পরের প্রতি প্রেমই বিবাহের প্রকৃত ভিত্তি বলিয়া গৃহীত না হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি এইরূপও মনে করেন, এত খরচ করিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলাম, কন্যার বাপের কাছে টাকা লইব না? তাহা হইলে এই গুণবানেরা কি মনে করেন যে বাল্যবিবাহের সম্বন্ধেই কাগিদাস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে “পিতরন্তেষাম্ কেবলম্ জন্মহেতবঃ”? সন্তানদের লালন-পালন শিক্ষাদানটা তাঁহাদের কর্তব্য নয়, অতুলোকদের

\* এইরূপ পরিবর্তন অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়াছেন।

কর্তব্য? তাই যদি হয় তাহা হইলে ছেলের বাপ বড়ের বেয়াইরা ছেলের নিকট হইতে ভক্তি, সেবা, বার্কক্যে ভরণ পোষণ আদির আশা করেন কেন? খুঁজাই যদি পাতা ও শিক্ষাদাতা হইলেন, তাহা হইলে তিনিই ঐ ছেলের, শুধু ভক্তিসেবা কেন, উপার্জনেরও অধিকারী।

শিক্ষিত যুবকেরা প্রকারান্তরে পশুর মত বিক্রীত হন, অথচ তাহাতে তাঁহাদের পৌরুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠে না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। যে ক্রয় করে, ক্রীত বস্তুতে তাহার স্বয়ং জন্মে না, ইহাও “উণ্টো রাজার দেশে”র ব্যবস্থা।

কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি যে কলিকাতায় বিস্মৃত-হাতা-যুক্ত একটি বড় বাড়ী লইয়া বাঙ্গালী ছেলেদের জন্ম বিলাতী পাব্লিক স্কুলের মত একটি সাশ্রম বিদ্যালয় (Boarding school) স্থাপিত হইবে। ইহার সম্বন্ধে ঠিক সমস্ত খবর জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, ইহার জন্ম বিলাত হইতে ইংরেজ শিক্ষক আনা হইবে, এবং বালকদিগের নিকট হইতে মাসিক ৫০ কিংবা ৭৫ টাকা হিসাবে ব্যয় লওয়া হইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে জ্ঞানদান, মানুষের অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা বিকশিত করিয়া তুলনা, মানুষের চরিত্রগঠন, এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা জন্মান। আমরা দেখিতেছি যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষকেরা শিক্ষার এই কয়েকটি অঙ্গই আপনাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তকে লিখিত বিদ্যা ছাত্রদের আয়ত্ত করিয়া দিতে বাঙ্গালী শিক্ষকেরা ভাল রকমেই পারেন, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগে আবিষ্কার-ও উদ্ভাবন-ক্ষমতা বিকশিত করিতে ইংরেজ অপেক্ষা বাঙ্গালী বেশী সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বাদ দিলে দেখা যায় যে উকীল ও ব্যারিষ্টারেরা সকলের চেয়ে বেশী রোজগার করেন। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালী উকীল ও বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের মধ্যে যঁাহারা সকলের চেয়ে বেশী টাকা পান, তাঁহারা বাল্যকালে বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকটই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে

তাঁহাদের উপার্জন-ক্ষমতা কম হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকের প্রভাব যে সব ছাত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও সাক্ষ্য দিবার জন্ম জীবিত আছেন। জীবিত শিক্ষকদের নাম করিতে চাই না। কিন্তু ইহা বলাই যথেষ্ট যে সংশিক্ষকের অত্যন্ত অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। মানুষ চিনিবার ক্ষমতা থাকিলে এবং কার্যতঃ গুণের আদর করিলে এখনও পর্যাপ্ত সংখ্যায় সুশিক্ষক পাওয়া যাইতে পারে।

একপক্ষে ক্ষমতা ও অপর পক্ষে ভয়, ইহাতে মানুষ গড়ে না। চরিত্রগঠন এ উপায়ে হয় না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে ছাত্র স্বভাবতঃ শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হয় এবং তাঁহার চরিত্রের সদৃশ-সকলের প্রভাবে ছাত্রের সদৃশ-সকলের বীজ অঙ্কুরিত ও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর দর্শিত্র-শ্রেণী ও অশ্রেণী জাতির পরস্পর মনের ভাব ও সম্বন্ধ যেরূপ, তাহাতে বাঙ্গালী শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে যতটা হৃদয়ের যোগ হইতে পারে, ইংরেজ শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ততটা হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় সাশ্রম বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শিক্ষক রাখাই কর্তব্য।

আমরা ও আমাদের ছেলেরা সকলেই শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, শ্রদ্ধাবান, আত্মিকশুচিতাসম্বিত, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলা বোধ হয় অপ্রকৃত হইবে না যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোমল গুণাবলী অপেক্ষা দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রভৃতি পৌরুষব্যঞ্জক গুণের অভাব বেশী; এবং আমাদের মধ্যে স্বাধীনপ্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমের অভাবই বেশী। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বিবেচ্য এই যে আমাদের বালকদের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময়, অত্যাগত সদৃশ-বিকাশে অবহেলা না করিয়া, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিকশিত করিয়া তুলিবার

নিশ্চয় ব্যক্তি ও চেষ্টা করা কর্তব্য কি না। যদি তাহা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের মনের গতি, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য মনে করেন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন, যে ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে আমাদের এই-সকল সদৃশ বাড়াবার সম্ভাবনা? অতিমানুষ ব্যতিক্রমস্থল ইংরেজ কেহই নাই, বা থাকিতে পারেন না, ইহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সত্য যে ইংরেজেরা আমাদের ছেলেদের মধ্যে বাধ্যতা, সেলামপটুতা, তাঁহাদের সমক্ষে সত্য় ব্যবহার, ইত্যাদি যতটা দেখিতে চান, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম সেরূপ দেখিতে চান না, সহ্য করিতেও পারেন না। স্বদেশে তাঁহারা দৃঢ়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতির বিকৃতি- ও বাড়াবাড়ি-জনিত ঝড়রামি ও ছেলেমানুষি যে চক্ষে দেখেন, এখানে তাহা দেখেন না; বরং তাঁহারা এগুলিকে বিদ্রোহিতা বা তাঁহারা পূর্বলক্ষণ জ্ঞান করেন। সুতরাং ছেলেদের মনের উপর ইংরেজ শিক্ষকের শাসনভয়ের চাপ চাপাইয়া দিলে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেম বাড়িবে বলিয়া ত মনে হয় না। কুফলের আশঙ্কা একেবারেই থাকিবে না একরূপ বন্দোবস্তে কেহ কখন সফল পায় নাই। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া চোট লাগিতে পারে, এমন কি অঙ্গহানি বা প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এটুকু মানিয়া না লইলে, পাকা ঘোড়সোয়ার প্রস্তুত হয় না। আমাদের ছেলেরা পুরুষবাচ্চার মত হয়, ইহা যদি আমরা চাই, তাহা হইলে কেহ কেহ রুদ্ধ হইয়াও যাইতে পারে, এ আশঙ্কার পরিহার একেবারে করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকেরা যদি একরূপ জাতির লোক হন, যাহারা নিজেদের অলঙ্কিতেও ভাবিতে বাধ্য হন, “We must teach them their place”, “তাদের স্থান যে আমাদের নীচে তা তাদের শিখাতে হ’বে,” তাহা হইলে কেমন করিয়া মানুষ তৈয়ার হইবে? আসল কথা এই যে শিক্ষক যদি এইরূপ মনে করিতে পারেন যে “আমার ছাত্র যত বড় পণ্ডিত, যতই তেজস্বী, সাহসী, দৃঢ়চিত্ত হউক

না, তাহাতে আমার বা আমার দেশের লোকদের কোন স্বার্থে বা পড়িবে না, প্রত্যুত তাহাতে আমার ও আমার স্বদেশের গৌরব, শক্তি, ও অধিকার বাড়িবে ও উন্নতি হইবে”, তাহা হইলেই তাঁহারা ছাত্রদের চরিত্র অভীষ্টরূপে গঠিত হইবে; অগুরুপ শিক্ষকদের নিকট হইতে মনুষ্যত্বের অনুপ্রাণনা লাভের আশা সুদূরপর্য্যন্ত।

বিলাতের পরিকল্পন হইতে যে-সব বালক মানুষ হইয়া বাহির হয়, তাহারা বাধা বিঘ্নের মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ উদ্ধার করিতে পারে, সঙ্কটে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, এইজন্য, যে, তাহারা খুব স্বাধীনতা পায়, এবং সে দেশের সামাজিক হাওয়া ও রাজনৈতিক হাওয়া এইরূপ স্বাধীনতার পক্ষে। এই-সকল স্কুলের শিক্ষকদিগকে যদি রুশিয়ায় বা চীনে শিক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে ঠিক বিলাতের ছাত্রদের মত মানুষ তাঁহারা গড়িতে পারিতেন না। বিলাতে এইসব স্কুলের ছাত্রদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় অনেক ছেলে যে বিগড়াইয়া যায় না, তাহা নয়; কিন্তু যাহারা উত্তরায় তাহারা ভারী ভারী কাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে। পাবলিক স্কুলগুলির শিক্ষা-পদ্ধতি বা তাহাদের আদর্শ যে সব দিক দিয়াই ভাল, তাহা নয়। কিন্তু তাহা বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, দেশে দেশী শিক্ষকদের দ্বারা চালিত যে-সব স্কুল আছে, তৎসমুদয়ের দ্বারা বক্ষ্যমাণ আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র গঠিত হইতেছে কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে মোটের উপর তাহা হইতেছে না বটে; কোথাও যে একটুও হইতেছে না, তাহাও নয়। কিন্তু অনেক টাকা বিদেশীর পকেটে ঢালিয়া দিয়া, চরিত্র-গঠন হিসাবে অধিকাংশ দেশী স্কুলগুলিরই মত অথবা তদপেক্ষা অধম আর একটি স্কুল বাড়াইবার কি প্রয়োজন? ইংরেজ শিক্ষক রাখার মানেই এই যে দেশী ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। না পাওয়া দেশের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। দেশী ভাল শিক্ষক পাইবার সম্যক চেষ্টা না করিয়া দেশের একরূপ অগৌরব হইতে দেওয়া কাহারও কর্তব্য নহে।



শিক্ষার মধ্যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া নিভুল ইংরেজী বলা, এবং ভাল ইংরেজী লেখার কথা উঠিতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে স্কুলে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট পড়েন নাই বা শিক্ষা লাভার্থ বিলাত যান নাই, এমন অনেক বিখ্যাত লোক ইংরেজী-বেশ বলেন ও লেখেন। ইংরেজী বলা ও লেখা শিখিবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। তবে, এটা ঠিক বটে যে যাহারা ইংরেজের কাছে না পড়িয়াও ভাল উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারা ইংরেজের কাছে পড়িলে হয়ত আরও ভাল উচ্চারণ করিতে পারিত; এবং ইংরেজের কাছে শৈশবে ইংরেজী কহিতে ও পড়িতে শিখিলে যতটা খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ হয়, দেশী শিক্ষকের নিকট শিখিলে ততটা হয় না। যথাসম্ভব খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ যদি শিক্ষার একটা খুব দরকারী অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য নীচের দু একটি ক্লাসে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী রাখাই কর্তব্য। তাঁহাদের দ্বারাই ইংরেজ শিক্ষক অপেক্ষা ভাল কাজ অপেক্ষাকৃত অল্পবায়ে পাওয়া যাইবে। গ্রামোফোন দ্বারা বিদেশী ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইতেছে। যে-সব স্কুলের অর্থবল নাই, তাহারা এই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

যে ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, সেই ভাষা ঠিক তাহাদের মত উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারা শিক্ষার একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ফাদার লাক্সের উচ্চারণ ইংরেজের মত ছিল না, ডাক্তার থিবর উচ্চারণ ইংরেজের মত নয়। ভারতপ্রবাসী আরও অনেক ফরাসি ও জার্মান পণ্ডিতের উচ্চারণে দোষ আছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কার্যকারিতা কমে নাই, গুণবত্তারও লাঘব হয় নাই। ভারতপ্রবাসী অনেক স্বচ্ছ ও আইরিশ রাজকর্মচারীরও উচ্চারণ ত আদর্শ ইংরেজী উচ্চারণের মত নহে। সত্য বটে ইংরেজী আমাদের রাজভাষা, ফরাসী ও জার্মানদের রাজভাষা নহে। কিন্তু আমাদের দেশী ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রভৃতি কাহার উচ্চারণ ঠিক ইংরেজের মত নহে বলিয়া বিন্দু-

মাত্রও কাজের ক্ষতি হইতেছে? আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধ উচ্চারণে পক্ষপাতী; কিন্তু উচ্চারণটাকে এত উচ্চ স্থান দিতে পারি না যে তজ্জন্য অকারণ অর্থব্যয়, এবং সময় ও শক্তি মিয়োগ করিব, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহেলা করিব।

বিলাতী আদবকায়দা শিখাইবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক রাখা দরকার, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ছেলেবেলা ইংরেজশিক্ষকের কাছে না পড়িলেও যে উত্তরূপ আদবকায়দা শিখা যায়, উদ্যোক্তাদের মধ্যেই তাহার প্রমাণ বর্তমান। বিলাতী ফ্যাশনদুরুস্ত গোষাক পরিতে শিখিবার জন্যও বাল্যে ইংরেজ শিক্ষকের অনাবশ্যকতার অনেক শরীরী প্রমাণ চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও অন্যান্য অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আদবকায়দা ও পোষাকের মধ্যে গুরুতর কথা প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা পাশ্চাত্য আদবকায়দা ও পোষাকের নিন্দা করি না, অন্তরেও কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি না। পাশ্চাত্য লোকদের সঙ্গে মিশিতে হইলে তাহাদের শিষ্টাচার জানা দরকার, তাহাও স্বীকার করি। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে আমাদের নিজের দেশের আদবকায়দা ও পোষাককে আমরা হীন মনে করি না, তাহার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিতও নহি। যদি গায়ের রঙে ও আর সব বিষয়ে আমাদের ইংরেজদের সঙ্গে বেমানাম মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা মিশিয়া যাইতে চাহিতাম না। তাহার কারণ অনেক। প্রথম কথা তা এই যে বাহিরে মিশিয়া গেলেও অন্তরের অনুভূতিটা মরিত না যে আমরা ইংরেজ নহি, আমরা বাহিরে যা বস্তুতঃ তাহা নহি। তা ছাড়া, বিধাতা যে সবাইকে ইংরেজ করেন নাই, ভারতবাসীও গড়িয়াছেন, ইংরেজও গড়িয়াছেন, তাহার কারণই এই যে তাঁহার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিবে; ভারতবাসীর সাধনা ও সিদ্ধি যাহা তাহা ছাড়িয়া সে নকল-জিনিষ কেন সাজিবে, ইংরেজই বা তাহার সাধনা ও সিদ্ধি ছাড়িয়া নকল ভারতবাসী কেন সাজিবে? যে সৈনিক তাহার নির্দিষ্ট স্থান (post of duty) ছাড়িয়া অন্তর য়,

তাহাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না, বরং সে দণ্ডিত হয়। আমরা ভারতবাসী হইয়া জন্মিয়াছি; তাহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, লাঞ্ছনা আছে। ভারতবাসীই থাকিয়া নিজের পৌরুষ দ্বারা আমরা সে সব দূর করিব, কোন রকম সোজা উপায়ে সংগ্রাম পরিহারের চেষ্টা দেখিব না। একজন মানুষ কোথায় জন্মে, তাহাতে তাহার নিজের কোন কৃতিত্বও নাই, অপমানও নাই। একজন শাসকদেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই বড় ও শ্রেয়, আর একজন অধীন দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই ছোট ও অবজ্ঞেয়, ইহা কেন মনে করিব? নিজের জীবনে কে কি করিল, বিধাতা যাহাকে যে দেশে পাঠাইয়াছেন তাহার অবস্থা-বেষ্টনীর মধ্যে সে-মনুষ্যত্বের কি পরিচয় দিল, ইহাই জিজ্ঞাস্য। তদনুসারেই সে ছোট বা বড়।

আমি যে ভারতবাসী হইয়াছি, তাহাতে আমার দোষও নাই, গুণও নাই। আগে হইতে আমি পরাজয় মানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট কেন করি? চিরকালের জ্ঞ, এমন কি একবারও, প্রত্যেক ভারতবাসীর চেয়ে প্রত্যেক ইংরেজের বা ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়া যায় নাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের দেশ ও জাতি পরাজিত বা জয়ী, ছোট বা বড় হইতেছেন। আমাদেরিগকে যদি বড় হইতে হয়, ভারতীয় থাকিয়াই হইতে হইবে; নাহাঃ পছা বিদ্যতে,— অণ্ড পথ নাই। নকল হইতে ও নকল করিতে গিয়া আগে হইতেই আপনাকে ছোট বলিয়া মানিয়া লই কেন?

শুধু প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিদিগের নিকট হইতে নয়, ভারত-বর্ষের সমগ্র ইতিহাস-কাল ধরিয়া নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মীর মিলিত চেষ্টা ও সংবর্ষের ফলে ভারতীয় সভ্যতার একটি আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এখনও বিকাশ পাইতেছে। উহার আভাস আমরা দিতে পারি কি না জানি না; পারিলেও এখন তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এই আদর্শ এত বড় জিনিষ, উহা এত মূল্যবান, যে, কেত্বের গোরবের বিনিময়েও, উত্তরাধিকারসূত্রে উহাতে আমাদের দাবী আমরা ছাড়িতে পারি না। তাহিলে স্ববাক হইতে হয়, যুগপৎ বিবাদ<sup>১</sup>ও হর্ষ মন স্তম্ভিত হয়, য, নানা জাতি দ্বারা ভারত আক্রমণ ও তজ্জনিত জাতি-

সংবর্ষ ও সভ্যতা-সংবর্ষের ভিতর দিয়াও আমাদের জাতীয় সভ্যতা পুষ্টি লাভ করিতেছে।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি তোমরা এই চাও যে চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ থাকিয়া যাক? সব জাতির মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব না হউক? না, আমরা ঐক্য চাই, বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু “আমরা” “তাহারা” হইয়া গিয়াছি বা হইব, এইরূপ ভাগ বা চেষ্টা করিয়া অনৈক্য ও বিরোধ এবং তজ্জনিত অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার পাইতে চাই না। ল্যাংড়া আম ও বোদাই আমের ঐক্য এইখানে যে উভয়েই আম; কেহ ত বলে না যে ল্যাংড়া আম ও বোদাই আমের আত্মত্ব বিষয়ে একতা ততদিন প্রতিপন্ন হইবে না যতদিন ল্যাংড়া বোদাই বা বোদাই ল্যাংড়া না হইতেছে। “বিশ্বমানব” বলিয়া যে একটি ধারণা ও আদর্শ আছে, তাহা এই জগৎ বিরাট ও মহৎ যে কত রকমের কত প্রকৃতির কত বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট মানুষের ধও আদর্শ ও ধারণা তাহার অঙ্গীভূত। প্রত্যেক বিশেষ মানবের মধ্যেই বিশ্বমানবের অভিব্যক্তি; বিশ্বমানব বলিয়া স্বতন্ত্র একটা কোন জিনিষ নাই। একই মানে একদেয়ে অভিন্নই নয়।

এক একটি জাতি বিশ্বমানবের এক একটি বড় অঙ্গ। এই এক এক অপের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্বৈষম্য লুপ্ত না হইলে বিশ্বমানবের ঐক্য সুদূরপরাহত। যাহারা চীন তাহাদের কেহ কেহ ইংরেজ হইয়া যাইতে চাহিলে, বাহিরে ভদ্রতার খাতিরে ইংরেজেরা তাহাদিগকে কিছু না বলিলেও তাহাদিগকে অভিন্ন আত্মীয় বলিয়া কখনই মনে করিবে না। অধিকন্তু চীন জাতির অধিকাংশের সঙ্গেও ঐ চীনদের একটা অমিলের রেখা গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে চীন জাতির চীন থাকিয়া উন্নতি হইলে, তাহাদের পক্ষে ইংরেজের অকপট শ্রদ্ধা লাভ অসম্ভব নহে।

শক্তিশালী ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে হইলে আমাদেরও সমস্ত দেশটা জাতিটা এক হওয়া চাই। আমরা জানি, যে-সকল নিরঙ্কর চাষার অগ্নে অক্ষয়জ্ঞ শুভ্রবসনপরিহিত আমরা প্রতিপালিত, তাহাদের মধ্যে

তাহাদের হৃদয়ের গুণে ভক্তিভাজন অনেক লোক  
আছেন। অথচ আমরা একটু 'লেখা পড়া শিখিয়াছি  
বলিয়া, পা হইতে গলা পর্যন্ত আমাদের শরীরের  
অধিকাংশ আবৃত থাকে বলিয়া, আমাদের ঘরবাড়ী  
চাষাদের ঘরবাড়ীর চেয়ে ভাল বলিয়া, আমাদের কথা-  
বার্তা শহর্যে বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছাসহেও  
যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ইহার উপর পাশ্চাত্য  
পরিচ্ছদ, পাশ্চাত্য আদবকায়দা, পাশ্চাত্য দৈনন্দিন  
জীবনযাত্রানির্কাহপ্রণালী, পাশ্চাত্য গৃহস্থালির ছাঁচ  
আমদানী করিয়া, আর-একটা অমিলের সৃষ্টি করা  
আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। ছোটখাট বিষয়ে পরিবর্তন  
করা চলিতে পারে, একরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকও আছে,  
কিন্তু আসল ছাঁচ, ঠাট বা কাঠামো (যাহাই নাম দাও)  
দেশী থাকা চাইই চাই।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি যেরূপ ব্যয়সাধ্য হইবে, তাহাতে  
ইহাতে কেবল বেশ সচ্ছল অবস্থার লোকদের ছেলেরাই  
পড়িতে পারিবে। তাহার কুফল প্রধানতঃ দুই প্রকার  
হইবার কথা। প্রতিভা ধনীর গৃহে যেমন, গরীবের ঘরেও  
অন্ততঃ সেই পরিমাণে জন্ম গ্রহণ করে। বোধ হয়,  
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের গৃহেই অধিকসংখ্যক প্রতিভাশালী  
লোক জন্মিয়াছে। যত বেশী নানা শ্রেণীর প্রতিভাশালী  
ছাত্রদের প্রতিযোগিতা ও সাহচর্য ঘটে, শিক্ষার ও  
শক্তির ক্ষুরণের তত বেশী সুবিধা হয়। কেবল ধনশালী  
লোকদের ছেলেরা একটি স্কুলে পড়িলে যথেষ্ট পরিমাণে  
এই প্রতিযোগিতা ও সাহায্য ঘটিতে পারে না। জন-  
কতক অনুগ্রহভাজন দরিদ্রতর বৃত্তিভোগী ছাত্র লইয়া  
এই দোষ সংশোধন করা যায় না। কেবল ধনশালী  
ছাত্রেরা এক সঙ্গে পড়িলে তাহাদের পার্থক্যবোধজনিত  
একটা সংকীর্ণ শ্রেণীগত অহঙ্কার জন্মান অবশ্যসম্ভাবী।  
ইহা ভাল নয়।

যে যত বেশীসংখ্যক মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য  
অনুভব করিতে পারে, সে ততঃ মহৎ ও শক্তিশালী হয়।  
ঐক্যের অনুভূতিই বড় জিনিষ। অনৈক্য মানুষকে ছোট  
ও দুর্বল করে। তিনি তত বড় কবি, যিনি যে পরিমাণে  
বিশ্বমানবের হৃদয়ের অনুভূতিকে নিজের করিয়া ব্যক্ত

করিতে পারিয়াছেন। তিনি তত বড় ধর্মপ্রবর্তক, যিনি  
যে পরিমাণে বিশ্বমানবের আত্মার ক্ষুধা নিজে অনুভব  
করিয়া সাধনার দ্বারা তাহার নিবৃত্তির পথ আবিষ্কার  
করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন ঋষিকবি যে বলিয়াছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং

সংবো মনাংসি জানতাম্।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী

সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ

সমানমন্ত্র বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

তাহার মধ্যে জাতীয় শক্তি লাভের অগোচর উপায় নিহিত  
রহিয়াছে।

কাগজে এইরূপ বাহির হইয়াছে যে কালীঘাটে  
সম্প্রতি যে ব্রাহ্মণ মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে  
তাহাতে স্থির হইয়াছে যে যে-সকল ব্রাহ্মণ সমুদ্র পার  
হইয়া বিদেশ যাত্রা করে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও  
তাহাদিগকে পুনর্বার সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবাসীদিগকে তাড়াইয়া  
দিবার জ্ঞতথাকার গবর্ণমেন্ট যে-সব উপায় অবলম্বন  
করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সগণ ভারত হইতে  
ব্যবস্থাপক সভায়, জনসাধারণের সভা সমিতিতে এবং  
সমুদয় দেশী সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। দক্ষিণ-  
আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণ নিরস্ত্র প্রতিরোধের  
(Passive resistance) পথে প্রতিকার খুঁজিতে গিয়া  
দলে দলে জেলে গিয়াছেন। তাহাদের নিরাশ্রয়  
পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষে সর্বশ্রেণীর লোক  
২১ মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর টাকা দিয়াছেন  
ব্যবস্থাপক সভার প্রতিবাদকারী সভ্যদের মধ্যে, প্রতিবাদ  
সভার বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে, প্রতিবাদকারী সংবাদ-  
পত্রসমূহের সম্পাদক, লেখক ও গ্রাহকদের মধ্যে "অতি  
নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অগাণ্ণ জাতির হিন্দু" আছেন।  
দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী হিন্দুদের মধ্যেও বিস্তর ব্রাহ্মণ  
আছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই যে প্রতিবাদ হইল তাহা

ভূয়োঃ এত যে চাঁদা উঠিল তাহা কি, নিরর্থক ? তাহা নয়। দেশের লোকেরা নিশ্চয়ই চান যে, যে দেশে ভারতবাসীর প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হইতেছে, সেই সব দেশে,—দক্ষিণ আফ্রিকায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, মার্কিন সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A.), সর্বত্র, ভারতবাসীর জন্ম দ্বার খোলা থাকে। তাহা হইলে যাঁহারা কালীঘাটে বিদেশযাত্রীদিগকে বর্জন করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের প্রতিনিধি তাঁহারা নহেন। কারণ দেশের লোক আপমা হইতে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিতেছে, “হে বিদেশী ষেতকায় ঔপনিবেশিকেরা, আমাদের জাত-ভাইদিগকে তাড়াইয়া দিও না! তাহাদের জন্ম দ্বার খুলিয়া রাখ। তাহারা তোমাদের দেশে গিয়া, বা যাইবার ইচ্ছা করিয়া, কোন অন্তায় কাজ করে নাই। তাহাদের যাওয়া আবশ্যক।” পক্ষান্তরে কিন্তু কালীঘাটে সম্মিলিত পণ্ডিতেরা পরোক্ষভাবে ইহাই বলিতেছেন, “হে বিদেশী ষেতকায় ঔপনিবেশিকগণ, তোমরাই হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম ঠিক বুঝিয়াছ। যে হিন্দু সমুদ্র ডিঙাইয়া বিদেশে যায়, সে অধর্ম করে। এই অধর্ম যাহাতে আর তাহারা করিতে না পারে, তোমরা তাহার উপায় করিয়া হিন্দুর পরম বন্ধুর কাজ করিতেছ। তোমরা বাঁচিয়া থাক।” আমাদের বিবেচনায় এই পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট একটা দরখাস্ত যাওয়া উচিত যে সরকার বাহাজুর যেন দয়া করিয়া হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, প্রভৃতির গবর্ণমেন্ট যে হিন্দুদিগকে তাড়াইবার নানা ফন্দি খাটিয়াছেন, তাহার সমর্থন করেন।

শিক্ষার জন্ম, বাণিজ্যের জন্ম, নানা দেশের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হৃদয়মনের সংকীর্ণতা দূর ও উদারতা বৃদ্ধি করিবার জন্ম বিদেশযাত্রার প্রয়োজন। যে মানুষ আপনাকে গৃহের বন্ধবায়ুতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, বাহিরের মুক্ত বাতাসে বিচরণ করে না, সে সুস্থ সবল থাকিতে পারে না। যে জাতি, কুপমণ্ডুকবৎ, সমুদ্রয় বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক যথাসম্ভব পরিহার করে, তাহা সতেজ ও সজীব থাকিতে পারে না।

ধর্মের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে বলি, যাহাতে হিন্দুকে শক্তিশালী করে, তাহাই হিন্দুধর্ম। সংখ্যাবৃদ্ধিও শক্তিরূপের একটা পথ এবং শক্তিশালিতার একটা লক্ষণ। মুসলমানের ও খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, হিন্দুর সংখ্যা সেরূপ বাড়িতেছে না। বরং হাজার হাজার হিন্দু ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতেছে। তাহার উপর সমুদ্র-যাত্রার “অপরাধে”, এবং সমুদ্রলঙ্ঘকের সম্পর্করূপ “অপরাধে” যদি পণ্ডিতবর্গ কতকগুলি হিন্দুকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আত্মঘাতী নীতি আর কি হইতে পারে? মানবের হিতকামী চিন্তাশীল ব্যক্তির জগতের নানাদেশে, নরহত্যাকারীদিগকেও ফাঁসী না দিয়া উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা আবার যে তাহাদিগকে সমাজের অঙ্গীভূত করা যায় এবং করা উচিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। সমুদ্রলঙ্ঘকেরা কি নরহস্তার চেয়েও অধম যে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণসভা একেবারে সংশোধনের বাহিরে ফেলিয়া বর্জনের পরামর্শ দিতেছেন? আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা একথরে করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা নিজেই দুর্বল ও একথরে হইয়া পড়িবেন। তাঁহাদিগকে এখনই লোকে অগ্রাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ভবিষ্যতে মোটেই পুছবে না।

অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিবেন। কিন্তু শাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রার সমর্থক বিধিরও অভ্যুত্তাব নাই। তা ছাড়া, শাস্ত্র সমুদ্রবৎ। অমুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষ পাইলেন, দেবতার অমৃত ও নানা রত্ন উদ্ধার করিলেন। শাস্ত্র হইতে যাঁহারা হিন্দুজাতির জীবনীশক্তি নাশের বিষ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর বন্ধু নহেন।

হিন্দু সমুদ্রপারে যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বলীদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। জাপানকে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের গর্ভ করিব, আশার প্রকারান্তরে তাহাদিগকে ও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসারকদিগকে পাতকীও বলিব, এটা কেমন ব্যবহার?

এ বিষয়ে শাস্ত্রিক বিচারও একজন শিক্ষিত হিন্দু বৈশাখের প্রবাসীতে করিবেন। এবার স্থান হইল না।

পূর্বে দামোদরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে বাধ ছিল। তদ্বারা উভয় পার্শ্বের গ্রামগুলি বন্যাহইতে রক্ষিত থাকিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। নদীর দুই দিকে বর্ধমানরাজের জমিদারী থাকায় বাধ রক্ষার ভার বর্ধমানের মহারাজাদের উপরই ছিল। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেন্ট এই ভার লন, এবং তৎকাল বর্ধমান রাজ হইতে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬০,০০১ টাকা খাজনা গ্রহণ করিতে থাকেন। এখন বার্ষিক ৫৭৩২০৥১০ লইতেছেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দামোদরের পশ্চিমতীরের কুড়িমাইল বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। অতিরিক্ত খাজনাটা কিন্তু এখনও গবর্ণমেন্ট লইতেছেন। বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলার উদ্দেশ্য বোধ হয় গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোড নামক রাস্তা ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রক্ষা, এবং দামোদরের বন্যার সহিত বালি আসিয়া কলিকাতার বন্দর যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। কারণ এক দিকে বাধ না থাকায় বন্যার জল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তথাকার মাঠের উপর ঐ বালির স্তর স্তূপীকৃত হইতে থাকে।

গবর্ণমেন্ট যে সর্ব্ব বর্ধমানরাজ হইতে বার্ষিক ৫৭০০০ লন, সেই সর্ব্ব ভঙ্গ করায় প্রধানতঃ বর্ধমান ও হুগলী জেলার আটশত গ্রামে প্রতি বৎসর বন্যার জল ঢুকে। তাহাতে বালি পড়িয়া লোকের ধানের ক্ষেত নষ্ট হয়, ঘর বাড়ী ভাসিয়া বা পড়িয়া যায়, শস্য নষ্ট হয়, উঁচু যায়গায় সাপ আশ্রয় লওয়ায় সর্পাঘাতে অনেকের প্রাণ যায়, পানীয় জলের পুকুরে বন্যার বর্ধমান জল ঢুকায় লোকের ওলাউঠা, আমাশয়াদি হয়, নানা স্থানে জল জমিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করিয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ও প্রাণনাশের কারণ হয়, ইত্যাদি। প্রজাদের এবিধ কষ্ট সম্বন্ধে আবার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদিকের আরও দশ মাইল বাধ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লোকের হুঃখহৃদশার প্রতি দেশের জনহিতকর সভা, জমিদার- ও ব্যবস্থাপকসভার সভ্য কর্তৃক গবর্ণ-

মেন্টের দৃষ্টি অনেক বার আকৃষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেন্টও মধ্যে মধ্যে “সহানুভূতিপূর্ণ” জবাব দিয়াছেন, এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ প্রজাদের দুঃখিত সচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্ত কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নাই। এই সব এবং আরও অনেক কথা প্রমাণপ্রয়োগ সহ এবং গবর্ণমেন্টের চিঠিপত্র প্রভৃতির নম্বর ও তারিখ উল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মৌলবী মজ্জহরুল আনোয়ার চৌধুরী মহাশয় স্পষ্টবাদিতার সহিত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বলেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজও মন খুলিয়া দু চার কথা বলেন। শেষে গবর্ণমেন্ট-পক্ষ হইতে ফিনিমোর সাহেব বলেন যে মিষ্টার এ, উইলিয়ম্‌স্ এই গুরুতর বিষয়টির তদন্ত করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট তাহার রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন; “রিপোর্ট পাইলে যাহা করা সম্ভব, তাহা করিবেন। ফলেন পরিচীয়েতে।

ভারতসাম্রাজ্যের ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেল যে ভারতগবর্ণমেন্ট শিক্ষার জন্ত নয় লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত ছয়লক্ষ টাকা, রেলওয়ে বাড়াইবার জন্ত আঠার কোটি টাকা, সৈনিকবিভাগের জন্ত ত্রিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, এবং দিল্লী নির্মাণের নিমিত্ত এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি গবর্ণমেন্ট কিরূপ দরকারী মনে করেন, তাহা ব্যয়ের বরাদ্দ হইতেই বুঝা যাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী। তাহাও শতকরা আট জন নহে। ভারতবর্ষে লেখা পড়া শিখিবার বয়সের প্রত্যেক এক হাজার বালক ও যুবকের মধ্যে কেবলমাত্র ২৬৮ জন শিক্ষালয়ে যায়, ঐ বয়সের প্রত্যেক হাজার বালিকার মধ্যে কেবল ৪৭ জন বিদ্যাগারে যায়। এইরূপ যে-দেশের অবস্থা তথায় শিক্ষার জন্ত নয় লক্ষ টাকা, একটা অনাবশ্যক রাজধানীর জন্ত এক কোটি টাকা, যুদ্ধবিভাগের জন্ত ত্রিশকোটি-টাকা, এবং রেলের জন্ত আঠার কোটি

টাকা ব্যয় কেমন কেমন শুনায়। অথচ শুনিতে পাই, ইংরেজ রাজভৃত্যেরা আমাদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বড়ই উৎসুক, কেবল টাকার অভাবে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে না। ২১০ বৎসর রেল অল্প অল্প করিয়া বাড়াইলে কি ক্ষতি ছিল? লক্ষ লক্ষ লোক প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে মরিতেছে। তাহার জন্য কেবল ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা কি সম্ভব?

আয়ব্যয়-বিবরণ হইতে একটা বড় চমৎকার খবর পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর ভারত গবর্নমেন্ট প্রাদেশিক গবর্নমেন্টসমূহকে শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগে ব্যয় করিবার জন্য যত টাকা দিয়াছিলেন, প্রাদেশিক গবর্নমেন্টগুলি তাহার সমস্ত ব্যয় করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা দেশে নিরক্ষর বালক বালিকা বা রুগ্ন নিঃসন্দল মানুষ বা অস্বাস্থ্যকর শহর ও গ্রাম আর একটুও খুঁজিয়া পান নাই। আমরা জানিতাম না যে আমরা একপাশী আনালোকে উদ্ভাসিত নিরাময় স্বর্গপুরীতে বাস করি। ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বা তাঁহাদের জন্য গৃহনির্মাণের নির্মিত যদি এই টাকা মঞ্জুর হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই তাহা খরচ করা এত কঠিন হইত না। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় বাহিবু হয়।

আমরা যুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে গিয়া মাঝে মাঝে বড় উভয়সঙ্কটে পড়ি। কখন কখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরেরা বলেন, যে যথেষ্ট টাকার অভাবে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না\*। অথচ দেখিতেছি, প্রাদেশিক গবর্নমেন্টগুলি টাকা পাইয়াও খরচ করেন না। এ রহস্য বুঝা ভার।

আমরা অবগত হইলাম, বর্তমান বিভাগের প্রতিনিধি জন ইন্সপেক্টর মিষ্টার হার্বার্ট এ ষ্টার্ক বোলপুর শান্তি-

\* যথা—“It has been customary at the end of this chapter to utter a jeremiad about the want of funds.” C. P. Public Instruction Report, 1912. “But the attainment of this ideal depends, of course, largely on the extent of the grants that will be available.” Do., p. 1913.

নিকেতন বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া রিপোর্ট উহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। অতীত কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“concreted in this School a scheme of studies which retained the traditional ideals of India without rejecting the best features of English public schools.... The Bidyalyay, removed from the busy haunts of men, is picturesquely set amid groves of shady trees on the healthy uplands of Bolpur. It has 180 boarders—all the sons of Indian gentlemen. They wake in the early morning, get ready for the day, tidy their beds, say their private prayers.....and then assemble to recite together petitions from the Upanishads and other sacred books. The teachers meet for supplication before they enter upon and after they have completed the duties of the day. In addition to their general studies the boys are taught to be self-reliant, to be helpful to one another, to be courteous to all, to attend on visitors, to be dutiful, unselfish and God-fearing. The monitorial system has been introduced with marked success, and the senior boys are given an important share in maintaining discipline and enforcing good conduct, through their own courts of enquiry, from which their lies an appeal to the Council of Masters.....Studies proceed by a self-contained syllabus, which gives a sound and generous education.....Indeed, examinations of all sorts are tabooed, as also everything savouring of cram.....”

Remarkable as is the entire conception and organisation of the school, more striking for Bengal is the attitude of the pupils to agrarian studies. They tend the farm cattle, and take a pride in doing so. They were not ashamed to groom and milk the cows they exhibited at the Annual Exhibition this year at Suri.

And yet, sad to tell, for some time this school was under a political cloud.....&c.

ষ্টার্ক সাহেব শিক্ষাবিভাগের অতীত কোন কোন ইংরেজকে আনিয়া আশ্রয় দেখাইয়াছেন ও যুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের আফিসের অতীত বিদ্যালয়পরিদর্শকদিগকে এস্থান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুকূল ভাব থাকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে এ বৎসর গত বৎসরের মত ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ছেলেরা সহজেই অনুমতি

পাইয়াছে।\* আমরা শুনিয়াছি যে তিনি বীরভূম জেলার অন্তর স্কুলের অধ্যক্ষদিগকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদিগকে পাঠাইয়া তথাকার শিক্ষাপ্রণালী দেখাইয়া আনিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার বিভাগের স্কুলগুলির এবং ছাত্রদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বি এ পর্য্যন্ত পড়াইবার অমুমতি পাইবার জন্ত উহার দরবাড়ী বড় করা এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে উন্নতি করা আবশ্যিক, ভারত গৱর্ণমেন্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সব উন্নতি করিবার জন্ত যত টাকা প্রয়োজন মৈমনসিংহের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি এক কমিটি তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। এ পর্য্যন্ত ছাব্বিশ হাজার টাকা উঠিয়াছে। এ দিকে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বিলম্ব করিলে আগামী জুন মাস হইতে বি এ শ্রেণী খুলিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এইজন্ত কমিটির সভ্যগণ নিজেদের দায়িত্বে বাকী চব্বিশ হাজার টাকা ধার করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া ফেলিয়াছেন। দেশভক্তের মত কাজই ত এই।

এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙালী রচনার প্রশ্নপত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ছিন্ন পত্র” হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে বলা হইয়াছে—“Rewrite the following in chaste and elegant Bengali,” “নিম্নোক্ত বাক্যগুলিকে মার্জিত শুদ্ধ সুন্দর বাংলায় লেখ”। হওয়া করা প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যের আর সমুদয় অংশ যতই সংস্কৃতের মত হইবে, বাংলাটা ততই শুদ্ধ মার্জিত সুন্দর হইবে এই সংস্কার এখনও বন্ধমূল হইয়া আছে। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথিত বাংলায় লিখিয়াছেন, তাহা কেতাবী বাংলায় পরিবর্তিত করিতে হইবে। কিন্তু কথিত বাংলা chaste এবং

\* শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত নহে বলিয়া উহার ছাত্রদিগকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মত অমুমতি লইতে হয়।

elegant হইতে পারে না, কেতাবী বাংলা হইলেই chaste ও elegant হয়, ইহা মনে করা ভুল।

অনেক ছাত্রের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। এক মাসের মধ্যে আরও অনেকের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কি করিবে? পরীক্ষার অতিরিক্ত পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অনেকে দুর্বল হইয়া পড়ে, কাহারও কাহারও নানা প্রকার পীড়া হয়। পরীক্ষিতদের প্রথম কর্তব্য বিশ্রাম চিকিৎসাদি দ্বারা আবার সুস্থ সকল হইয়া উঠা। দ্বিতীয় কর্তব্য দেশকে জানা। যাহারা বেশী কিছু পারিবেন না, তাহারা নিজ গ্রাম বা শহর ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহের উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের বিষয় নিজ পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে চেষ্টা করুন। তথাকার নদীর উৎপত্তি কোথায়, কোন্ কোন্ স্থান দিয়া উহা গিয়াছে, কোথায় পড়িয়াছে, উহার স্রোতের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না, উহার সহিত গ্রামের স্বাস্থ্য, সৃষ্টির সম্পর্ক কি, জানিতে চেষ্টা করুন। গ্রামে বা শহরে বা তালিকটে পুরাতন মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ থাকিলে তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করুন। গ্রামের ও শহরের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী, তত্রত্য বিখ্যাত পরিবার ও লোকদের সন্ধানে গল্পাদি সংগ্রহ করুন। সর্ব্বাগ্রে নিজ পরিবারের পূর্বপুরুষদের সন্ধানে যাহা কিছু জানা যায়, লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলুন; স্থানীয় নৈসর্গিক ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের খবর লউন। তাহার উন্নতি করিবার ও কাটতি বাড়াইবার উপায় চিন্তা করুন। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেমন করিয়া ভাল হয় বা থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, বিশেষতঃ নিরক্ষর গরীব লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অবস্থা জাহান ও তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করুন। এ সকল একটা শুদ্ধ কর্তব্যের তালিকা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। ইহাতে ছাত্রগণ আনন্দ পাইবেন, জন্মভূমি ক নূতন চোখে দেখিতে শিখিবেন, স্বদেশপ্রেম একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবুকতার মত জিনিষ না থাকিয়া স্পষ্ট অমুমতি বিষয় হইবে।

যাহাদের সুবিধা হইবে, তাহারা নিজের জেলা

করিয়া দেখিয়া চিনিয়া লইবেন। যাঁহাদের পার্থক্য এবং অস্বাভাবিক সুরবিধা আরও বেশী তাঁহারা বঙ্গের ইতিহাস স্থানে, কেহ কেহ বা বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা করিবেন। তাহা হইলে প্রদেশে প্রদেশে নানা পার্থক্যের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য-বন্ধনের সন্ধান তাঁহারা নিজে সাক্ষাৎ ভাবে ধরিতে পারিবেন, দেশমাতা তাঁহাদের নিকট মুর্তিমতী হইবেন, ঐতিহাস সজীব হইয়া উঠিবে, শিরায় শিরায় তাহার শক্তি প্রকাশিত থাকিবে। পর্বত আরোহণ ও পর্বতে ভ্রমণে ক্রমশঃ শরীর সুবল ও দৃঢ় হয়, মন যেমন উন্নত ও বিমল স্থানন্দে পূর্ণ হয়, সাহস, বিপদে উপস্থিতবুদ্ধি, এবং পৌরুষও তেমনি বৃদ্ধি পায়। পর্বত বাঙ্গালী ছাত্রদের পরিধিগম্য নহে।

দেবঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতির কথা আমরা শুনিয়াছি। দেশঋণও একটি প্রকৃত ঋণ। ইহা কল্পনা নহে। কেবল ঋণের ঋণই ধরুন। আগে কলেজে শিক্ষার ব্যয়ের কথা বলি। সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে একটি ছাত্রকে কলেজে শিক্ষা দিতে বৎসরে ১৭৫ এক শত পঁচাত্তর টাকা খরচ পড়ে। প্রত্যেক ছাত্রের নিকট গড়ে ৬৮/১০ পাঁচটি টাকা পাঁচ আনা বেতন পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বাকী ১০৭ টাকা আর কেহ দেয়। তাহা সরকারী খাজনাখানা হইতেই আসুক, দেশের লোকের চাঁদা হইতে আসুক, বা ধনীদিগের প্রদত্ত প্রভূত অর্থের স্মৃতি হইতেই আসুক, শেষে গিয়া দাঁড়াইবে এই যে দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকেরা দিতেছে। কারণ বর্গমেন্টের খাজনার অধিকাংশ নিরক্ষর চাষার দেয়, মৌদারের উকীল ব্যারিষ্টারের আঁয়ও এক আধ হাত করিয়া আসে, কিন্তু আসে এই নিরক্ষর চাষাদের নিকট হইতে। সুতরাং আমরা আমাদের শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ের জন্ত ঋণী দেশের নিরক্ষর চাষাদের নিকট।

এই ঋণের কথা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। যাঁহারা কলেজে পড়েন, তাঁহারা ই যে কেবল ঋণী হইতেছেন; যাঁহারা এন্ট্রান্স স্কুলে, মাইনর স্কুলে, ছাত্রবৃত্তি স্কুলে, পাঠশালায় পড়েন, তাঁহারাও প্রত্যেকে ঋণী।

সমস্ত ভারতবর্ষে গড়ে এন্ট্রান্স স্কুলের প্রত্যেক

ছাত্রের শিক্ষার জন্ত বৎসরে ২৬/১০ ছাব্বিশ টাকা পাঁচ আনা খরচ হয়। প্রত্যেক ছাত্র বেতন দেয় গড়ে ১৪/১০। সুতরাং বাকী বার্ষিক ১২/১০ প্রত্যেক ছাত্রের ঋণ।

পাঠশালায় ছাত্র-প্রতি বার্ষিক ব্যয় হয় ৪২/১০, প্রতি ছাত্র বেতন দেয় ৬/১০, বাকীটা ঋণ।

পাঠশালায় ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবং কলেজে ছাত্রদের জন্ত যে মাসিক বেতনের হার নির্দিষ্ট আছে, ধনীরা ছেলেও তার চেয়ে বেশী বেতন দেন না। সুতরাং তিনিও নিজের শিক্ষার সমুদয় ব্যয় নিজে নিজে করেন না। তিনিও নিরক্ষর দরিদ্র চাষার কাছে তাঁহার শিক্ষার জন্ত ঋণী।

ইহাই একমাত্র ঋণ নহে। আমরা সত্যসত্যই দরিদ্রদের শ্রমজাত অর্থে প্রতিপালিত। তদ্বিন্ন কত লোকে বাল্যকাল হইতে আমাদের সঙ্গে মেহ করিয়াছে, কত লোকের নিকট আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কত প্রকার উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

এই দেশঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। যদি সমস্ত দেশের শিক্ষিত লোকেরা ও ছাত্রেরা একপরিবারভুক্ত হইতেন, তাহা হইলে বলিতাম, আপনারা ঋণ পরিশোধের জন্ত আপনারদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পাঁচজনকে দেশের শিক্ষা ও অন্ন প্রকার সেবার জন্ত উৎসর্গ করুন। অথবা প্রত্যেকে শিক্ষা সম্বন্ধ করিয়া অন্ততঃ প্রথম একটি বৎসর শিক্ষাদান কার্যে বা অপূর দেশহিতকর কার্যে নিয়োগ করুন। আমরা সকলে রক্তের সম্পর্কে একপরিবারভুক্ত না হইলেও, স্বেচ্ছায় উক্ত প্রকারে ঋণ-শোধের চেষ্টা করিতে পারি। তাহা করা নিশ্চয়ই কর্তব্য। ঋণী হইয়া থাকা কি ভাল?

যাঁহাদের শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাঁহারা এখন পরীক্ষান্তে ও পুনর্বার শিক্ষালয়ে ভর্তি হইবার পূর্বে যদি কয়েকজন নিরক্ষর বালকবালিকাকেও লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের ঋণ কিছু শোধ করা হইল মনে করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

আমাদের ছেলেরা অর্ধদয় যোগের সময়, গত দামোদরের ভীষণ বন্যার সময়, এবং আরও কত সঙ্কট-



কালে দেখাইয়াছে যে তাহারা সাহসে হীন নয়, আত্মোৎসর্গে পশ্চাৎপদ নয়। সুস্থপ্রকৃতির বালক ও যুবক যখনই সত্য কোন দুঃখ, সত্য কোন অভাবকে সাক্ষাৎ ভাবে সত্যরূপে জানিয়াছে, তখনই তাহা মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহারা এই দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে নিজ অধ্যয়নাদি কর্তব্যে অবহেলা ত করিবেনই না। অধিকন্তু দেশের সত্য অবস্থা,—জগাভাব, পীড়া, অজ্ঞতা,—জানিতে সচেষ্ট হইবেন। সত্যের উপলক্ষি হইলেই আপনা হইতেই তাহাদের কর্তব্যে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা “নোয়াখালী-সম্মিলনী”তে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ বা বিজ্ঞাপন (যাহাই বলুন) দেখিতে পাইলাম।  
“বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কনফারেন্স উপলক্ষে,—  
কৃষি পশু ও সাহিত্য প্রদর্শনী।

সকলেই অবগত আছেন, আগামী ২৮শে ২৯শে মার্চ মোতাবেক ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র ময়মনসিংহ জামালপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত কামারের চরে বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কনফারেন্স বসিবে। সেই বিরাট ব্যাপার উপলক্ষে কনফারেন্স পেণ্ডালের সন্নিহিত স্থানে বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের কৃষি বিভাগের অনুমোদনে  
কৃষি, পশু ও সাহিত্য-প্রদর্শনী

খোলা হইবে এবং প্রদর্শনকারীগণকে তাহাদের প্রদর্শিত বস্তুর শ্রেষ্ঠতা ও উপযুক্ততা অনুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল এবং বিলাতী কৃষিজন্ত্রাদি পুরস্কার প্রদান করা হইবে। বঙ্গের প্রত্যেক দেশহিতৈষী ও কৃষির উন্নতিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণকে উক্ত প্রদর্শনীতে কৃষিজাত জব্বাদি ও পশু প্রদর্শন-করিয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমরা সাধরে ও সম্মানে আহ্বান করিতেছি। আশা করি সকলেই আমাদের এ দেশহিতের কার্যে সহায়তা করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রদর্শনযোগ্য জব্বাদি—

কৃষিজাত—ধান ও ধান হইতে উৎপন্ন জব্বাদি, সরিষা, কলাই, ডাইল, চাউল, তুলা, পাট, শণ, ইক্ষু, শাক, সবজী, তরিতরকারী, নানাবিধ-ফুল, পাতাবাহার ফ্রোটন, পরগাছা, বিবিধ ফল মূল, আয়কর বৃক্ষাদি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রদর্শনযোগ্য ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। কৃষিজাত উৎপন্ন জব্বা-সকল প্রদর্শনী খুলিবার ৭ দিন পূর্বে নাম ঠিকানা লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

পশু পক্ষী—গরু, মহিষ, তৎসংক্রান্ত-উৎপন্ন জব্বাদি, ছাগল, ভেড়া, খচ্চর, গাধা, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী ও মুরগী এবং হাঁসের ডিম, ছানা ইত্যাদি প্রদর্শন ও পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। পশু পক্ষী প্রদর্শনী খোলার পূর্বেদিন ভোরে লোকসহ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত রাখিতে হইবে।

সাহিত্য সম্বন্ধে—কৃষি ও পশু চিকিৎসা ও পশু পালন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রাদি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করা হইবে এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইবে। অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থাদিও প্রদর্শনীতে গ্রহণ করা হইবে এবং তৎসংক্রান্ত পুরস্কারের ব্যৱস্থা থাকিবে। প্রত্যেক গ্রন্থকারকে ৩ তিনখানি করিয়া গ্রন্থ

প্রদর্শনীতে দিতে হইবে। কৃষি ও পশু পালন এবং ঐতিহাসিক নূতন তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদিও গ্রহণ করা হইবে এবং তৎসংক্রান্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে। কৃষক বালকগণের শিক্ষোপযোগী উপযুক্ত গ্রন্থনিচয় পাঠ্য ও আইজলিষ্টভুক্ত হওয়ার জন্য গবর্নমেন্ট সমীচীন পেশ করা হইবে। ঘোড়দৌড় কুস্তি কসরৎ ও কণ্ড এবং যন্ত্র সম্বন্ধেও জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

বাঙ্গালা গবর্নমেন্টের কৃষি বিভাগ অনুগ্রহপূর্বক এই প্রদর্শনীতে কৃষি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি পরিচালন পূর্বক উহার ব্যবহার এবং সুবিধা সর্বসাধারণকে প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরে মাসিক ল্যাণ্টারনের সাহায্যেও যন্ত্রাদি-পরিচালন-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইবে। কৃষক এবং কৃষিকার্যো-অভিজ্ঞতা-লাভ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত। ভরসা করি এ সম্বন্ধে স্বার্থবিগ্নিত ব্যক্তিগণ এইরূপ সুবিধা হেলার উপেক্ষা করিবেন না। প্রদর্শনেচ্ছ ব্যক্তিগণ প্রদর্শনীয় বস্তু এখন হইতে প্রস্তুত রাখুন।

প্রদর্শনীর ২৭শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহকাল স্থায়ী থাকিবে, অতঃপর প্রদর্শিত জব্বাসমূহ প্রদর্শনকারীগণ ফেরৎ পাইবেন। কিন্তু পশু পক্ষী প্রদর্শনীর পরেই ফেরৎ লইতে হইবে।

সরাফৎ আলী খান

মোহাম্মদ আবদুল রহমান

খোস মোহাম্মদ

শ্রীকামিনীকুমার তালুকদার

শ্রীপ্যারীমোহন গুহ রায়

শ্রীমীতানাথ চক্রবর্তী (ম্যানেজার)

মুরুলছোসেন কাশিমপুরী (সম্পাদক)।”

প্রদর্শনীটির উদ্দেশ্য বুঝা সহজ। কিন্তু “বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কনফারেন্স” জিনিষটিকি এবং উহার উদ্দেশ্য কি, লিখিত নাই, অনুমানও করিতে পারিতেছি না। বঙ্গের বোধ হয় এমন কোন জেলাই নাই, যেখানকার সমুদয় কৃষকই মুসলমান। মৌলবীদের সঙ্গে মুসলমান কৃষকদের কনফারেন্সের আবশ্যিকতা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু হিন্দু কৃষকের সঙ্গে, হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতকে বাদ দিয়া, মুসলমান মৌলবীর কনফারেন্স কিরূপ হইবে এবং কেন হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। প্রদর্শনীটি গবর্নমেন্টের কৃষিবিভাগের অনুমোদনেও সাহায্যে খোলা হইবে। কনফারেন্সটিতেও গবর্নমেন্টের যোগ আছে কি না জানা দরকার, এবং থাকিলে কনফারেন্সটির কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা, তাহাও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যিক।

প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনটি হিন্দু নামও দেখিতেছি। তাহারা কনফারেন্সেরও কর্তৃপক্ষ কিনা, বলিতে পারি না।

হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ করা খুবই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মৌলবী ও হিন্দু মুসলমান কৃষক আছেন; অথচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত নাই, ইহাতে জিনিষটা একটু রহস্যাবৃত মনে হইতেছে।



বিশ্বস্ততা ।

জে, বি, গ্রিউজ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

Colour-Blocks and Printing by  
U. RAY & SONS, Calcutta.



## : গান

(১)

ভোরের বেলায় কখন এসে  
 পরশ করে' গেছ হেসে ।  
 আমার ঘুমের ছয়ার ঠেলে  
 কে সেই খবর দিল মেলে,  
 প্রভেগে দেখি আমার আঁধি  
 আঁধির জলে গেছে ভেসে ॥

মুনে হ'ল আকাশ যেন  
 কইল কথা কানে কানে,  
 মনে হ'ল সকল দেহ  
 পূর্ণ হ'ল গানে গানে ।  
 হৃদয় যেন শিশির-নত  
 ফুটল পূজার ফুলের মত,  
 জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে  
 ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে ॥

(২)

গাব তোমার সুরে  
 দাঁও সে বীণায়ন্ত্র,  
 শুন্ব তোমার কণী  
 দাঁও সে অমর মন্ত্র ।  
 করব তোমার সেবা  
 দাঁও সে পরম শক্তি,  
 চাইব তোমার মুখে  
 দাঁও সে অচল ভক্তি ।  
 সইব তোমার আঘাত  
 দাঁও সে বিপুল ধৈর্য্য,  
 বইব তোমার ধ্বজা  
 দাঁও সে অটল স্থৈর্য্য ।  
 নেব সকল বিশ্ব  
 দাঁও সে প্রবল প্রাণ,  
 করব আমার নিঃশ্ব  
 দাঁও সে প্রেমের দান ।

যাব তোমার সাথে  
 দাঁও সে দখিন হস্ত,  
 লড়ব তোমার রণে  
 দাঁও সে তোমার অস্ত্র ।  
 জাগ'ব তোমার সন্তো  
 দাঁও সেই আহ্বান,  
 ছাড়'ব সুখের দাস্ত  
 দাঁও দাঁও কল্যাণ ।

(৩)

বাজাও আমারে বাজাও  
 বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে  
 সেই সুরে মোরে বাজাও ।

যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে  
 শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে  
 জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে  
 সেই সুরে মোরে বাজাও ॥

সাজাও আমারে সাজাও  
 যে সাজে সাজালে ধরুর ধূলিরে  
 সেই সাজে মোরে সাজাও ।

সন্ধ্যা-মালতী সাজে যে ছন্দে  
 শুধু আপনারি গোপন গন্ধে  
 যে সাজ নিজেই তোলে আনন্দে  
 সেই সাজে মোরে সাজাও ॥

(৪)

জানি গো দিন যাবে,  
 এ দিন যাবে এ দিন যাবে ।  
 একদা কোন বেলা-শেষে  
 মলিন রবি করুণ হেসে  
 শেষ বিদায়ের চাওয়া  
 আমার মুখের পানে চাবে ।

পথের ধারে বাজবে বেণু  
নদীর কূলে চরবে ধেনু  
আঙিনাতে খেলবে শিশু  
পাখীরা গান গাবে,  
তবুও দিন যাবে  
এ দিন যাবে এ দিন যাবে।

তোমার কাছে আমার এ মিনতি  
যাবার আগে জানি যেন  
আমায় ডেকেছিল কেন  
আকাশ পানে নয়ন তুলে  
শ্রামল বসুমতী!  
কেন নিশার নীরবতা  
শুনিয়েছিল তারার কথা,  
পরানে চেউ তুলেছিল  
কেন দিনের জ্যোতি!

তোমার কাছে আমার এ মিনতি।

সাজ যবে হবে ধরার পালা  
যেন আমার গানের শেষে  
ধামতে পারি সমে এসে,  
ছয়টি ধাতুর ফুলে ফলে  
ভরতে পারি ডালা!  
এই জীবনের আলোকেতে  
পারি তোমায় দেখে যেতে,  
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়  
আমার গলার মালা!  
সাজ যবে হবে ধরার পালা।

(৫)

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'  
আলোয় আকাশ ভরা।  
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'  
ফুল শ্যামল ধরা।  
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'  
রাত্রি আগে জগৎ লয়ে কোলে,

উষা আসে, পূর্ব ছয়ার খোলে  
কলকণ্ঠস্বর।

সন্ডে ফেসে মিলন-আশা-তরী  
ঘনাদি কাল বেয়ে।

হতকালের কুমুম উঠে ভরি  
বরণডালি ছেয়ে।

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'  
গে যুগে বিশ্বভুবনতলে

পরান আমার বধুর বেশে চলে  
চির-স্বয়ম্বর। ॥

(৬)

আমার মুখের কথা তোমার  
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।

আমার নীরবতায় তোমার  
নামটি রাখ ধুয়ে।

রক্তধারার ছন্দে আমার  
দেহ-বীণার তার

বাজুক আনন্দ তোমার  
নামেরি ঝঙ্কার।

ঘুমের পরে জেগে থাকুক  
নামের তারা তব;

জাগরণের ফালে আঁকুক  
অরুণ-রেখা নব।

সব আকাজক্ষা আশায় তোমার  
নামটি জ্বলুক শিখা;

সকল ভালবাসায় তোমার  
নামটি রছক লিখা।

সকল কাজের শেষে তোমার  
নামটি উঠুক ফলে;

রাখ ব কেন্দ্রে হেসে তোমার  
নামটি বুকে কোলে।

জীবন-পথে সঙ্গোপনে  
রবে নামের মধু।

তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে  
তোমারি নাম বঁধু।

(৭)

প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে,  
ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে ।  
হৃৎককে আজ কঠিন বলে  
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে  
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে ।  
হেথায় কারো ঠাই হবে না  
মনে ছিল সেই ভাবনা,  
হৃয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে ।  
যত্ন করে আপনাকে যে  
রেখেছিলাম ধুয়ে মেজে,  
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে ।

(৮)

মোরে প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে  
আরো আরো আরো দাও প্রাণ ।  
তব ভুবনে তব ভবনে  
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ॥  
আরো আলো, আরো আলো,  
মোর নয়নে প্রভু ঢালো ।  
সুরে সুরে বাঁশী পূরে  
ভূমি আরো আরো আরো দাও তান ॥  
আরো বেদনা, আরো বেদনা,  
দাও মোরে আরো চেতনা,  
দ্বার ছুটায়, বাধা টুটায়,  
মোরে কর ত্রাণ, মোরে কর ত্রাণ ॥  
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে,  
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে ।  
সুধাধারে আপনারে  
ভূমি আরো আরো আরো কর দান ॥

(৯)

প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে  
আঁধার মাঝে  
অমনি কোটে তারা ।

যেন সেই বীণাটি গভীর তানে  
আমার প্রাণে  
বাজে তেমনি ধারা ॥  
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে  
কি গৌরবে  
হৃদয়-অন্ধকারে ।  
তখন সুরে সুরে আলোকরাশি  
উঠবে ভাসি  
চিত্ত-গগন-পারে ॥  
তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি  
ওগো কবি  
আমায় পড়বে আঁকা ॥  
তখন বিশ্বের রবে না সীমা  
ঐ মহিমা  
আর রবে না ঢাকা ॥  
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি  
পড়বে আসি  
নব জীবন পরে ।  
তখন আনন্দ-অমৃতে তব  
ধন্য হব  
চিরদিনের তরে ॥

(১০)

তোমারি নাম বলব, আমি বলব নানা ছলে ।  
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে ।  
বলব বিনা ভাষায়,  
বলব বিনা আশায়,  
বলব মুখের হাসি দিয়ে,  
বলব চোখের জলে ॥  
বিনা প্রয়োক্তনের ডাকে  
ডাকব তোমার নাম ।  
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই  
পূর্বে মনস্কাম ॥  
শিশু যেমন মাকে  
নামের নেশ্যুয় ডাকে,  
বলতে পারে এই সুখেতেই  
মায়ের নাম সে বলে ॥

(১১)

আমার সকল কাঁটা ধন্ব করে' ফুটবে গো ফুল ফুটবে ।  
 আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে ।  
 আমার অনেক দিনের আকাশ-চাঁওয়া  
 আসবে ছুটে দখিন হাওয়া,  
 হৃদয় আমার আকুল করে'  
 সুগন্ধ ধন লুটবে ॥  
 আমার লজ্জা যাবে, যখন পাব  
 দেবার মত ধন ।  
 যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে  
 প্রাণের আরাধন ॥  
 আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে  
 পরশ তারে করবে এসে,  
 ফুরিয়ে গিয়ে দলঙলি সব  
 চরণে তার টুটবে ॥

(১২)

অসীম ধন ত আছে তোমার  
 তাহে সাধ না মেটে,  
 নিতে চাও তা আমার হাতে  
 কণায় কণায় বেঁটে !  
 দিয়ে তোমার রতন মণি  
 আমায় করলে ধনী,  
 এখন ঘারে এসে ডাক,  
 রয়েছি ঘার এঁটে ।  
 আমায় তুমি করবে দাতা  
 আপনি ভিক্ষু হবে ।  
 বিশ্বভুবন মাতল যে তাই  
 হাসির কলরবে ।  
 তুমি রইবে না ঐ রথে,  
 নাম্বে ধূলা-পাথে,  
 যুগযুগান্ত আমার সাথে  
 চলবে হেঁটে হেঁটে ॥

(১৩)

'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে,  
 তুমিই আমার বন্ধু !  
 লও যে টেনে-কঠিন হাতে,  
 তুমি আমার আনন্দ ।  
 হৃৎ-রথের তুমিই রথী,  
 তুমিই আমার বন্ধু !  
 তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি,  
 তুমি আমার আনন্দ ॥  
 শত্রু আমারে করগো জয়,  
 তুমিই আমার বন্ধু ।  
 রুদ্ধ ছুমি হে ভয়ের ভয়,  
 তুমি আমার আনন্দ ॥  
 বজ্র এস হে বক্ষ চিরে,  
 তুমিই আমার বন্ধু !  
 মৃত্যু আমারে লও হে ছিঁড়ে,  
 তুমি আমার আনন্দ ॥

(১৪)

নয় এ মধুর খেলা  
 তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল সন্ধ্যাবেলা ।  
 কতবার যে নিবল বাতি, গর্জ্জ এল ঝড়ের বাতি,  
 সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরি ঠেলা ॥  
 বারে বারে বাধ ভাঙিয়া বন্না ছুটেছে,  
 দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে ।  
 ওগো রুদ্ধ, হৃৎখে স্মৃখে এই কথাটি বাজল বুকে,  
 তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা ॥

(১৫)

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,  
 কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে;  
 যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে  
 তুমি আমার কাছে এসেছ ।  
 কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,  
 কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,  
 তবু চিন্তে যেন এই কথাটি মানি  
 তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ

গো  
আর  
যেন

কভু সুখের কভু দুখের দোলে  
জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,  
চিন্ত আমার এই কথা না তোলে  
তুমি আমায় ভালবেসেছ ।  
মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,  
পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,  
জানিগো সেই অজানা পারাবারে  
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ ॥

যবে  
যবে  
যেন

(১৬)

হিন্দী আরতি

( অমৃতসর গুরুদরবারে গীত )

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর  
তেরো চরণ পর সির নবৈ ॥  
সেবক জনকে সেব সেব পর,  
প্রেমী জনকে প্রেম প্রেম পর,  
দুঃখী জনকে বেদন বেদন,  
সুখী জনকে আনন্দ এ ॥  
বনা বনামে সাবল সাবল,  
গিরি গিরিমে উন্নিত উন্নিত,  
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,  
সাগর সাগর গস্তীর এ ।  
চৌন্দ সুরষ বরৈ নিরমল দীপা  
তেরো অগমন্দির উজার এ ॥

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,  
মস্তক নমি তব চরণ-পরে ।  
সেবক জনের সেবায় সেবায়,  
প্রেমিক জনের প্রেম-মহিমায়,  
দুঃখী জনের বেদনে বেদনে,  
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে ;  
মস্তক নমি তব চরণ-পরে ।  
কাননে কাননে শ্রমল শ্রামল,  
পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,  
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,  
সাগরে সাগরে গস্তীর হে ;  
মস্তক নমি তব চরণ-পরে ।  
চন্দ্র সূর্য্য জ্বালে নির্মল দীপ,  
তব অগমন্দির উজল করে,  
মস্তক নমি তব চরণ-পরে ।

শ্রীধরনাথ ঠাকুর ।

## আঙনের ফুলকি

( ২১ )

যে ডবল গুলির ব্যাপার লইয়া সমস্ত পিয়েত্রানরা গ্রামখানি  
মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহার কয়েক মাস পরে, একজন  
যুবক বিকাল বেলা ঘোড়ায় চড়িয়া বাস্তিয়া শহর হইতে  
বাহির হইয়া কাদেী গ্রামের দিকে যাইতেছিল । এই  
কাদেী গ্রাম তাহার ঝরণার জন্ত বিখ্যাত ; গ্রীষ্মকালে  
সৌখীন শহরে বাবু-লোকেরা সেই গ্রাম হইতে সেই মধুর  
শীতল জল আনাইয়া পান করিত । যুবকটির বাঁ হাত-  
খানি গলার সহিত ঝুলাইয়া বাঁধা । তাহার সঙ্গে একটি  
তথী সুকুমারী অপক্লপ সুন্দরী, একটি কালো রঙের ছোট  
টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল ; ঘোড়াটিও তাহার  
সোয়ারের ঞায় মহিমার শ্রীতে দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু  
দুঃখের বিষয় তাহার বাঁ কানটা একেবারে কাটা ।  
গ্রামে পৌঁছিয়াই সেই তথী তরুণীটি অতি লঘু লম্ফে  
ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং তাহার সঙ্গী বন্ধুকে  
তাহার ঘোড়া হইতে ধরিয়া নামাইয়া, জিনের সঙ্গে বাঁধা  
একটা ভারী ব্যাগ খুলিয়া লইল । ঘোড়া ছটিকে একজন  
চাষার জিন্মা করিয়া দিল । সেই তরুণীটি ওড়নার ভিতরে  
ব্যাগটি লুকাইয়া লইয়া ও যুবকটি দো-নলা একটা বন্দুক  
লইয়া এমন একটা আবড়ো-খাবড়ো রাস্তা ধরিয়া  
পাহাড়ের উপর চলিল যে, সে রাস্তা যে কোনো লোকালয়ে  
লইয়া যাইবে এমন বোধই হয় না । পাহাড়ের একতলায়  
উঠিয়া তাহারা ধামিল, এবং দুজনেই ঘাসের উপর বসিয়া  
পড়িল । বোধ হয় তাহারা কাহারো জন্ত অপেক্ষা  
করিতেছিল, কারণ তাহারা ক্রমাগত পাহাড়ের উপর  
দিকে চোখ তুলিয়া তুলিয়া চাহিতেছিল, এবং তরুণীটি  
ক্লে ক্লে একটি সুন্দর সোনার ঘড়ী বাহির করিয়া  
করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি সময় দেখা  
অপেক্ষা তাহার এই নূতন-পাওয়া গহনাটির সৌন্দর্যের  
দিকেই অধিক নিবিষ্ট মনে হইতেছিল । তাহাদিগকে  
অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না । বনের ভিতর  
হইতে একটা কুকুর বাহির হইয়া আসিল এবং তরুণীটি  
“ব্রিস্কো” বলিয়া ডাকিতেই সে তাহাদের কাছে ছুটিয়া



আসিয়া সোহাগ জানাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দুজন দাড়িওয়ালা লোক হাতে বন্দুক, গলায় কার্তুজ, আর কোমরে পিস্তল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের জামা কাপড় ছেঁড়া, শত-তালি-লাগানো; কিন্তু তাহাদের অঙ্গশস্ত্র ঠিক তাহার উল্টা—চকচকে ঝকঝকে, মজবুত, জবর রকমের, যুরোপের মধ্যে বিখ্যাত কারিগরের হাতের। পূর্বাগত ও আগন্তুক দুই দলের পোষাক পরিচ্ছদে শিক্ষা সহবতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও তাহারা চার জনে বেশ আত্মীয় ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

আগন্তুকদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি বলিয়া উঠিল—ভালা অসেঁ আন্তো! আপনার মকদ্দমা ত চুকে বুকে গেল। একেবারে বে-কসুর খালাস। আমাদের মনটা যে কী খুসি হয়ে গেছে তা আর কি বলব! দারোগা সাহেব দেশ ছেড়ে চম্পট দিলে, তার রাগের গসগসানি আর দেখতে পাব না বলে' ভারী হুঃখু হচ্ছে। ই্যা, তোমার হাত কেমন আছেন?.....

যুবক বলিল—ভালো হয়ে এসেছে। ডাক্তার বলছে আর দিন পনের পরে হাতের বঁধন খুলে দেবে।--ব্রান্দো, বন্ধু, কাল আমি ইটালীতে চলে যাচ্ছি, তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি, আর পণ্ডিতজী আপনার কাছেও।

ব্রান্দো বলিল—এত শীগগির? গেল কাল খালাস পেলে আর আসছে কালই চলে?

ভরুণীটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া বলিল—ওরে বিশেষ জরুরী তলব আছে রে তলব আছে! ... তোমাদের জন্তে আমি কিছু খাবার এনেছি, খেয়ো; আমার বন্ধু ত্রিস্কোকে যেন ভুলে যেয়ো না।

—কলোঁবা ঠাকরুণ, আপনি নাই দিয়ে ত্রিস্কোর মাথা খেয়ে দিচ্ছ; ও কিন্তু সে জন্তে খুব কৃতজ্ঞ আছে, হয় না হয় আপনি দেখে নেও।

তারপর ব্রান্দো তাহার বন্দুক পাতিয়া ধরিয়া বলিল—আও আও ত্রিস্কো, বারিসিনিকো সেলাম কর।

কুকুরটা নড়িল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাক চাটিতে চাটিতে প্রভুর দিকে তাকাইতে লাগিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেলা রেবিয়াকো সেলাম কর। কুকুরটা অমনি দুই পা আবশ্যকেরও অতিরিক্ত উঁচু করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

অসেঁ বলিল—দেখ বন্ধু, তুমি বড় বদ ব্যবসা ধরেছ; হয় ঐ বাস্তিয়ার জেলখানায় কাঁশীকাঠে তোমার মীলা সাজ হবে, তাও যদি হয় ত ভালো—নয় কোনো বনে লজলে পুলিশের গুলিতে সব নাচুনি কুহনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শাস্ত্রীজী বলিল—হলই বা? এও মৃত্যু, ওও মৃত্যু! বিছানায় পড়ে আরে ভুগে ভুগে, নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর সত্য মিথ্যা চোখের-জলের ধরানি দেখতে দেখতে, নাকী কান্নার প্যানপ্যাননি শুনতে শুনতে ঝালা-পালা হয়ে মরার চেয়ে তাজা টাটকা টপ করে মরে' এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে বুকিয়ে যাওয়ারটা ঢের ভালো, ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়। যারা আমাদের মতো মুক্ত হওয়ার স্বাধীন জীব, তাদের পক্ষে জুতো জোমা পরে' মরার চেয়ে আর কিছু কি বেশী রুচিকর আছে?

অসেঁ বলিতে লাগিল—আমার ইচ্ছে তোমরা এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বেশ শান্ত শিষ্ট হয়ে থাক। তোমরা কেন সাডি'নিয়া স্বীপে গিয়ে বাস কর না? তোমাদের মতন অনেক লোকই ত তা করেছে। আমি তার সব জোগাড় যস্তুর করে দিতে পারব।

ব্রান্দো বলিয়া উঠিল—সাডি'নিয়াতে! কথায় না বলে বোকা সার্দো! তারা কেঁই মেই করে' কি যে বলে তা বোঝাই যায় না। তাদের সঙ্গে বাস করা ঝকঝক।

পণ্ডিতজী বলিল—সাডি'নিয়ায় যাওয়া সুবিধা হবে না। আমার কথা বসতে কি আমি সার্দোদের ঘৃণা করি। ফেরারীদের তাড়া করবার জন্তে তাদের একদল ঘোরসওয়ারই আছে; এই থেকেই ত দেশের আর ফেরারীদের অবস্থাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঠিক থাক সার্দোদের! দেখুন মশায় দেলা রেবিয়া, আমার একটা ব্যাপার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে যে, আপনার মতন একজন আক্কেলমস্ত আর সৌধীন লোক একবার বনবাসের মজা নিজের জীবনে সম্ভোগ করিও চিরকালের জন্তে বনবাস স্বীকার না করে' থাকতে পারে কেমন করে!

অসেী হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে পরম মিত্রতায় বাস করার সৌভাগ্য লাভ করিও আমি আপনাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে তেমন কিছু প্রলোভন দেখতে পাই নি। সেই এক রাত্রে আমার বন্ধু ব্রান্দো আমাকে একটা বস্তুর মতো ঘোড়ার খালি পিঠে লেদে যে রকম খাড়া পাহাড় বেয়ে ছুটিয়ে নামিয়েছিল, তা মনে করলে এখনও আমার হৃদয়ের অবস্থাটা বেশ স্বাভাবিক থাকে না।

শাস্ত্রী বলিল—আর অনুসরণকারী শত্রুর কবল থেকে প্রাণে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যাওয়ার সুখটা বুঝি কিছু না? আমাদের মতন মুক্ত স্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার, যে আধুর্ন্য ও আনন্দ আছে তা আপনি কেমন করে ভুলে যাচ্ছেন তাই ভাবছি। এই যে রামসুন্দরী কোঁৎকা (সে বন্দুক তুলিয়া দেখাইল) দেখছেন, যতদূর এর গুলির পাল্লা ততদূর পর্যন্ত আমরা রাজার রাজা, সম্রাটেরও সম্রাট! আমরা এরই প্রতাপে হুকুম করি, বিচার করি, অত্যাচারের প্রতিকার করি। এই যে আমাদের খেলা, এতে মশায়, দুষ্ক কিছু নেই, আমোদ আছে প্রচুর।—এ থেকে আমরা কিছুতেই বঞ্চিত হতে চাইনে। এই যোদ্ধার জীবনের চেয়ে আর কোন জীবন তেমন আনন্দের—যদি সেই যোদ্ধা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ডন-কুইক্সোর চেয়ে একটু বেশী বুদ্ধিমান আর একটু ভালো রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়? ধরুন না কেন, এই সে দিন, আমি খবর পেলাম যে, লীলার বুড়ো কিপটে কাকাটা তার বিয়েতে কিছু যৌতুক দিতে চাচ্ছে না বলে তার বিয়ে হচ্ছে না; আমি অমনি তাকে পরোয়ানা পাঠালাম, কোনো রকম ভয় টর দেখিয়ে নয়, সে রকম আমার প্রতিই নয়, শুধু লুকুম। ভালো তার পরে হ'ল কি জানেন, লোকটা একেবারে কাবু; মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিতে শেষে পথ পায় না। এতে করে আমি ছুটি তরুণ প্রাণকে খুসী করে দিলাম। বিচার করে দেখুন, অসেী মহাশয়, বুনো ডাকাতদের সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে না মোটেই। খুব সম্ভব আপনি আমাদের মূল্যই ভিড়ে যেতেন, কেবল, একজন ইংরেজ সুন্দরী যদি মাঝখানে পড়ে বাগড়া না দিত। তাঁকে দেখতে

পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু বাস্তিয়াতে সকলেই তাঁর শতমুখে তারিফ করে শুনতে পাই।

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমার যিনি বৌ-দি হবেন, তাঁর বনজঙ্গল ভালো লাগে না, বনে জঙ্গলে তাঁর ভারী ভয়।

অসেী বলিল—যাই হোক, তা হলে আপনারা এই-খানেই থাকতে চান? তাই থাকুন। বলুন, আমি যদি আপনাদের কোনো রকম কিছু কাজ করে দিতে পারি।

ব্রান্দো বলিল—আমাদের কিছু চাইনে, কেবল তোমার ব্যবহারের কোনো একটা ছোট খাটো দিনিস আমাদের দিয়ো, আমরা তোমার অরণচিহ্ন রাখব। তুমি ত আমাদের দয়া দিয়ে একেবারে ডুবিয়ে রেখেছ। শিলিনার বিয়ের যৌতুকের খিতি করে রেখেছি, তাতেই তাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা চলবে; এখন আমার বন্ধু পণ্ডিতজী শুধু একখানি ভয় না-দেখিয়ে চিঠি লিখে দিলেই ওর বিয়েটা হয়ে যাবে। আমরা জানি তোমাদের প্রজা পাইকেরা আমাদের দরকার মতন রুটি আর বারুদ জোগাবে। তবে আর তোমার করবার বাকী কি আছে? বিদায়। আশা করি এরই মধ্যে আবার তুমি কসিকায় ফিরে এসেছ দেখব।

অসেী বলিল—টানাটানি কি বিপদের সময় গোটা-কতক সোনার চাকতি কাছে থাকলে চের সুবিধা হয়। আমরা যখন পুরোণো বন্ধু, তখন তুমি এই ছোট্ট প্রলিটা নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না, তোমাদের দরকারী জিনিস জুটিয়ে দিতে এ কিছু সাহায্য করতে পারবে।

ব্রান্দো দৃঢ় স্বরে বলিল—না লেফটেন্যান্ট, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে টাকার বিষ এনো না।

শাস্ত্রী বলিল—টাকা সংসারী লোকের দরকার; বনবাসীদের বুকভরা সাহস আর হাতভরা অস্ত্র ছাড়া আর কিছুর দরকার হয় না।

অসেী উত্তর করিল—তোমাদের কিছু-না-কিছু না দিয়ে চলে যেতে আমার মন সরছে না। বল ব্রান্দো, আমি তোমাদের কি দিতে পারি?

ব্রান্দো মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অসেীর বন্দুকের দিকে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিল—দুর্

হোক গে ছাই! লেফটেন্যান্ট...যদি আমাকে বলতেই হয়...যাকগে, তুমি যা ভালো বোঝ কর।

—তুমি কি চাও? বল।

—না না কিছু না... সে তুচ্ছ জিনিস...সে জিনিস পেতে হলে ব্যবহার করবার হিকমত হিন্মত থাকা চাই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সেই সর্ব্বনেশে ডবল গুলি এক হাতে ছোড়ার কথা।... উঃ! তেমন ঘটনা ছবার ঘটে না!

—সেই বন্দুকটা তোমার চাই?... আমি তোমাকে সেটা এনে দেবো। কিন্তু যত কম পার সেটা ব্যবহার কোরো।

—আমি তোমার কাছে একেবারে স্বীকার করতে পারিনি যে, সেটাকে তুমি যেমন কাজে লাগিয়েছিলে আমি তেমন কাজে মোটেই লাগাব না; কিন্তু নিশ্চিত থেকে, সে আর-একবার ঐ রকম শিকার পেলেই তুমি জানবে যে, ব্রান্দো বন্দুক বা হাতে তুলে রেখেছে।

—আর আপনি, শাস্ত্রী মশায়, আপনাকে কি দেবো?

—যখন আপনি নিতান্তই কোনো স্থিতিচিহ্ন দেবেন ঠিক করেছেন, তখন আমি গৌরচন্দ্রিকা না ফেঁদে সোজাশুজি বলি—আপনি আমাকে একখানা খুব ছোট আড়ার পকেট-এডিশনের ছোরেসের কাব্য পাঠিয়ে দেবেন। এতেই আমার সময় কেটে যাবে আর আমার ল্যাটিন ভাষারও চর্চা থাকবে। বাস্তিয়ার পুলের উপর একটি মেয়ে চুরুট বেচে; তাকেই দিলে আমি পাব।

—পণ্ডিতজী আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ পাবেন; আমি আপনাকে যে যে বই দেবো মনে করেছিলাম তার মধ্যে ঠিক ঐ রকম একখানি বই আছে।  
—আচ্ছা বন্ধু, এখন তবে বিদায় নি। দাঁও, হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় দাঁও। যদি কখনো সার্ডিনিয়ায় যাবার খেয়াল হয় আমায় চিঠি লিখো; আমার উকিলের কাছে আমার ঠিকানা পাবে।

ব্রান্দো বলিল—লেফটেন্যান্ট, কাল যখন তুমি বন্দর থেকে বেরিয়ে যাবে এই পাহাড়ের এইখানটায় একবার নজর কোরো; আমরা এইখানে থাকব, আমাদের রুমাল উড়িয়ে আমরা তোমার শুভযাত্রা কামনা করব।

তাহারা বিদায় লইল; অর্সো ও তাহার ভগিনী কার্দের পথ ধরিল এবং বনবাসী দুজন পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল।

( ২২ )

এপ্রেল মাসের এক সুপ্রভাতে কর্ণেল সার ট্রমাস নেভিল, তাঁহার নব-বিবাহিতা কন্যা লিডিয়া, অর্সো এবং কলোঁবা একখানা গাড়ী চড়িয়া পিজা হইতে ভূগর্ভে নবাবিষ্কৃত একটি প্রাচীন সমাধি-মন্দির দেখিতে রওনা হইলেন। সেই মন্দিরটি সমস্ত বিদেশীরাই দেখিতে যাইতেছিল। সেই মন্দিরের মধ্যে নামিয়া গিয়া অর্সো ও তাহার স্ত্রী দুজনেই পেন্সিল কাগজ বাহির করিয়া সেই মন্দির-দৃশ্যের আবেশন নক্সা আঁকিতে লাগিয়া গেল; কিন্তু কর্ণেল ও কলোঁবা দুজনেই প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তুল্য উদাসীন, তাহারা দুজনে বাহিরে বেড়াইতে গেল।

কর্ণেল বলিলেন—দেখ কলোঁবা, আমাদের খাবার সময়ে আমরা পিজায় ফিরে যেতে পারব তার ভরসা নেই। তোমার খিদে লাগে নি? অর্সো ত তার বোঁকে নিয়ে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় লেগে গেছে; তারা যখন দুজনে একসঙ্গে নক্সা করতে লেগে গেছে, তখন সে নক্সা আর এ জন্যে শেষ হতে হবে না।

কলোঁবা বলিল—হ্যাঁ, সত্যি, ওদের নক্সার শেষ আর হবে না।

কর্ণেল বলিতে লাগিলেন—তাই আমি বলি কি, চল ঐ ছোট হোটেলটার যাই। আমরা রুটি ত পাব, আর চাই কি একটু আঙ্গুরিনা সর্ব্বৎসব মিললেও মিলতে পারে, আর একটু দুধের সর আর ফলটা পাকুড়টা। তা হলেই আমরা আমাদের চিত্রকরদের সঙ্গে নিশ্চিত হয়ে অপেক্ষা করতে পারব।

—ঠিক বলেছেন কর্ণেল। আপনি আর আমি, এই গৃহস্থালীর মধ্যে যদি কারো একটু বুদ্ধি থাকে ত সে আমাদের। ঐ প্রণয়-পাগল দম্পতিটির কাব্য আর প্রণয়সুখা ছাড়া আজকাল আর ত কিছু রোচে না; তাঁদের সঙ্গে আমাদেরও শুকিয়ে মরাটা কিছু নয়। নিন, আমার হাত ধরে নিয়ে চলুন। আমি এখন বেশ শিষ্ট শাস্ত হয়ে শুধরে উঠছি, নয়? আমি এখন লেডির মতন হাত ধরে

না নিয়ে গলে চলতে পারি নে, টুপী পরি, ফ্যাশান-  
দ্রুস্ত পোষাক পরি, গহনাগাঁড়িও হু একখানা গায়ে  
তুলেছি, কত রকম ভালো কথা শিখেছি; আমার মধ্যে  
বহু বর্করতা আর নেই, না? দেখুন এই শালখানা কেমন  
সৌন্দর্যী কারদায় এলোমেলো করে' গায়ে দিয়েছি!  
বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, না?.....সেই যে আপনার  
সৈন্যদলের একজন অফিসার, সেই যে বেশ ফিটফাট  
ছিপছিপে লম্বা ফুটফুটে সুন্দর মতন, যে দাদার বিয়ের  
সময় ছিল.....আ হরি! তার বিকট নামটা আমার  
কিছুতেই মনে থাকে না.....সেই যে যার মাথায় দিবা  
কৌকড়া কৌকড়া, বড় চুল, যে বাবু যোদ্ধাটিকে আমি  
এক ঘুষিতে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারি.....

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—কে, চ্যাটওয়ার্থ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ বটে, ঐ বিদখুটে নাম আমার মুখ দিয়ে  
কখনো উচ্চারণ হবে না। সেই। সে ত আমার প্রেমে  
একেবারে পাগল!

—বা কলোঁবা, তুমি যে বেশ পাকা লীলাবতী মেয়ে  
হয়ে উঠেছ দেখছি.....আমরা শীগ্গিরই তা হলে আর  
একটা বিয়ের তোজ খাচ্ছি!

—বিয়ে! আমার! আমি বিয়ে করব? তা  
হলে আমার ভাইপোকে কে মানুষ করবে?.....দাদার  
খোকাকে কস'ভাষা বলতে কে শেখাবে?.....সত্যি,  
তাকে আমি কস' বলতে শেখাব, আর একটা সূচল টুপি  
পরিয়ে আপনাকে খুব ক্লেপাব।

—আগে তোমার ভাইপোই হোক, তারপর তোমার  
মন হয় তাকে ছোরা খেলতে শিখিয়ে।

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—ছোর, ছুরী বিদায় দিয়েছি;  
এখন লেডির হাতে হাতপাখা উঠেছে, আপনি যখন  
আমার দেশের নিন্দে করবেন অমনি সেই পাখা দিয়ে  
আপনার আঙুলের গিরের ওপর ঠুকে দেবো।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহারা সেই হোটেল  
গিয়া স্বরবৎ সঁর ও ফল পাইল। কর্ণেল যখন সবতের  
গেলাস লইয়া ব্যস্ত, তখন কলোঁবা হোটেলওয়ালীর সঙ্গে  
গিয়া পাছ হইতে গোলাপজাম পীড়িতেছিল। কলোঁবা  
দখিল একটা গলির মোড়ে একজন বৃদ্ধ একটা কশাড়ের

মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতেছিল, দেখিয়া বোধ  
হইতেছিল পীড়িত; তাহার গাল দুটা বসী, চোখ দুটা  
কোটরগত, শরীর তাহার কঙ্কালসার, এবং তাহার নিস্পন্দ  
বিবর্ণ অপলক দৃষ্টি দেখিলে তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে  
হয় না, ঠিক একটা যেন মৃতদেহ। কয়েক মিনিট ধরিয়া  
কলোঁবা তাহার দিকে এমন উৎসুক কোঁতুহলের সঙ্গে  
তাকাইয়া ছিল যে, হোটেলওয়ালী তাহা লক্ষ্য করিল।

হোটেলওয়ালী বলিল—আ মা, ঐ বুড়া বেচারী  
তোমাদেরই দেশের লোক,—তোমার কথা শুনে টের  
পেয়েছি তোমাদেরও বাড়ী কস'কায়। বেচারার সর্ব-  
নাশ হয়ে গেছে; দেশে ওর হু হু বেটা বেঘোরে মারা  
গেছে। তোমাদের দেশের লোকেরা—লোকে বলে মা,  
আমি সত্যি মিথ্যে কি জানি,—নাকি তাদের শত্রুতা সাধ-  
বার বেলা একটুও দয়া দেখায় না। কিছু মনে করো  
না মা, লোকে বলে তাই শুনি। বেচারী বুড়োমানুষ,  
ছেলেদের হারিয়ে একলা পড়ে গেছে, তাই দেশ ছেড়ে  
পিজায় এসে আছে, দূর সম্পর্কের এক কুটুমের বাড়ীতে  
থাকে, এই হোটেল তারই। আহা! বেচারার মাথা খারাপ  
হয়ে গেছে মা, শোকের হুঃখের আক্রান্তের এই কাণ্ড!  
...আমার মুনিবেরই মুন্সিল, তার দোকানে নিত্য নিত্য  
কত দেশের কত লোক আসে; সে ত আর দোকানপাট  
ছেড়ে বুড়োর কাছে সদা সর্বদা থাকতে পারে না, তাই  
ওকেই এই দোকানের কাছাকাছি এনে রেখেছে। বুড়োর  
কিন্তু কোনো হান্সাম নেই; সমস্ত দিনে তিনটে কথা কয়  
কি না সন্দেহ। হপ্তায় হপ্তায় ডাক্তার আসে, তারা  
বলছে যে ওর ভীমরতি হয়েছে, আর বেশী দিন বিলম্ব  
নেই।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—আঃ! তা হলে মরণ ওর  
ঘনিয়ে এসেছে? অমন অবস্থায় মরণই মঙ্গল!

—আহা মা, বুড়া বেচারার সঙ্গে তুমি যদি গিয়ে  
একটু কস'ভাষায় কথা কও তা হলে দেশের ভাষা শুনে  
হয়ত বুড়োর মনটা একটুও খুসী হতে পারে।

কলোঁবা ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, দেখা  
যাক।

কলোঁবা বুড়ার এমন কাছে গিয়া দাঁড়াইল যে,  
তাহার ছায়া বুড়ার গায়ের রোদটুকু কাড়িয়া লইল। তখন

সেই বৃদ্ধ মাথা তুলিয়া কলোঁবার দিকে চাহিয়া রহিল। কলোঁবাও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধ হাত দিয়া কপাল মুছিল, এবং কলোঁবার দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার জ্ঞতা ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদিল। ক্রণেক পরে আবার চোখ খুলিল কিন্তু তাহা ভয়ে বিস্ফারিত বিচঞ্চল; তাহার ঠোঁট খর খর করিয়া কাঁপিতেছিল; সে হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কলোঁবার দৃষ্টির আঘাতে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়া সে মোড়ার উপরে জোড়া লাগিয়া অনড় অচল বসিয়া রহিল, একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির হইল না। অবশেষে তাহার দুই চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু বরিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার বুক খালি করিয়া কয়েকটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

হোটেলওয়ালী বলিল—এই প্রথম ওকে আজ এমন কাতর দেখছি।... ..শুনছেন, ইনি আপনাদের দেশের লোক, আপনাকে দেখতে এসেছেন।

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—কমা দাও ওগো কমা দাও! এখনো তোমার সাধ মেটেনি? সেই খাতার পাতাখানা..... আমি ত পুড়িয়ে ফেলেছিলাম.....তুমি তা কি করে পড়েছিলে?.....কিন্তু দুজনকে কেন নিলে?.....অলান্দিকুসিয়ো, তার নামে তাতে ত কিছু লেখা ছিল না।... একজন, মাত্র একজনকেও যদি আমার থাকতে দিতে!...অলান্দিকুসিয়ো..... তার নামে ত তুমি কিছু পাওনি.....

কলোঁবা গভীর স্বরে কস্ ভাষায় বলিল—দুজন, দুজনই গেছে, ঠিক হয়েছে! শূখা কাটা পড়েছে; শুঁড়িতে এখনো চোপ পড়ে নি, আমি তাকে শুকিয়ে পচিয়ে মারব বলে! যাক, আর দুঃখ করো না; আর বেশী দিন কষ্টভোগ করতে হবে না। আমাদের দু দু বছর কষ্ট পেতে হয়েছিল।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার মাথা তুলিয়া তাহার বকের উপর আসিয়া পড়িল। কলোঁবা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া ধীর পদে হোটেলের দিকে ফিরিতে ফিরিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল।

যখন সেই হোটেলওয়ালী তাড়াতাড়ি বুড়া বেচারার শুক্রবা করিতে বাস্তু, তখন কলোঁবা দীর্ঘ প্রফুল্ল মুখে আঙুন-জালা চোখ ঢইয়া কর্ণেলের সম্মুখে টেবিলে গিয়া খাইতে বসিল।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—অ্যা কি হয়েছে তোমার? তোমার মুখে ও কী ভাব! ঠিক এমনি তোমায় দেখেছিলাম পিয়েত্রানরায়, সেই যেদিন আমরা খেতে বসেছিলাম আর বন্দুকের গুলি এসে থাকার-টেবিলের চটা উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

—এ কসি কার একটি পূর্বস্মৃতি মাথায় জেগে উঠেছে মাত্র। যাক, সব চুকে বুকে গেছে। আমি পিসিমা হ'ব, কেমন কিনা? আমি খোকার খুব ভালো দেখে একটি নাম রাখব—বিলফিকুসিয়ো-তোমাজো-অসেঁলেয়ন!

হোটেলওয়ালী আসিল।

কলোঁবা নিতান্ত সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—কি খবর? মরে গেছে, না শুধু মূর্ছা?

—না মা, ও সব কিছু নয়; আশ্চর্য্য মা আশ্চর্য্য, তোমার স্নেহ দেখা হয়ে ওর খুব ভালো হল বলতে হবে।

—আর ডাক্তারেরা না বলেছিল যে, ওর আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না?

—হ্যাঁ, বড় জোর দু মাস।

—ওর মরণে কারো কোনো ক্ষতি হবে না!

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—কার কথা তোমরা বলাবলি করছ, অ্যা?

কলোঁবা পরম উদাসীন ভাবে বলিল—ও আমাদের দেশের একটা লেলাখেপা, পের্সন নিয়ে এখানে এসে আছে। মাঝে মাঝে তার খবর আমার নিতে হবে।.....কর্ণেল সাহেব, ওকি, দাদা আর বৌ-দির জুথে গোটাকত গোলাপজাম রাখুন।

যখন কলোঁবা হোটেল হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল, তখন হোটেলওয়ালীর দৃষ্টি কিছুক্ষণ নীরবে তাহার অনুসরণ করিল; তার পর সে তাহার কণ্ঠকে বলিল—ঐ যে সুন্দর মেয়েটা দেখছিস, ওর নজর খেন আঙনের ফুল্কি! \* সমাপ্ত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

\* প্রম্প্যার মেসিমে রচিত কলোঁবা নামক উপন্যাসের মূল কল্পনাসী হইতে অনুবাদিত।

## পূর্ণতা

আজিকে চন্দের আলো যেমন করিয়া  
আকাশ পৃথ্বীর শূন্য দিয়াছে ভরিয়া,  
তেমনি তোমার প্রিয় আঁখির আলোকে  
বিরহ ঘুচিয়া যাক মম চিত্ত-লোকে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

## ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ

### অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণসঙ্কর।

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তিও যে দেশের প্রতিভাসংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষে হানিকর তাহা বলিয়াছি। \* এক্ষণে সে বিষয়ের আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। • রসায়ন শাস্ত্রের Reversible Equation মতটা ইতিহাসে প্রয়োগ করিতে আমার বড় ভাল লাগে। আমি দেখি কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ এক সময়ে যেরূপ কাজ করে আর এক সময়ে ঠিক তাহার বিপরীত রূপ কাজ করে। জাতিভেদ এক সময়ে সমাজের উন্নতিসাধন করে, অপর সময়ে আবার উহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়া উঠে। তদ্রূপ সাম্যবাদও এক-কালে জাতীয় মহা উপকার করে, অপর সময়ে উহা আবার জাতির মহা অপকার করে।

বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির কারণ সাম্যবাদ—অর্থাৎ সকল মানব সমান, সমাজের মধ্যে এরূপ একটা জ্ঞানের বিকাশ। সকল জাতীয় লোকে যখন অবাধে পরস্পরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হয় তখনই সমাজে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি এরূপ পরিমাণে হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করের প্রভাবে সমাজের average বা সাধারণ লোকের অনেকটা উন্নতি হইয়া

থাকে। সমস্ত দেশের লোকের শারীরিক গঠন, মনোবৃত্তি প্রভৃতি একই প্রকার হইয়া থাকে; তাহাতে সমাজের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্যই দেখা যায় না। প্রায়শঃ সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এইরূপ অসাধারণ মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীতে যদি এক জাতি ও এক সাম্রাজ্য হইত তাহা হইলে বর্ণসঙ্করের প্রাচুর্য্যে ফলে বোধ হয় সমাজের তত অনিষ্ট হইত না। কিন্তু যতদিন পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন যে-জাতি নিজেদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রশয় দিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রতিভার বৈচিত্র্য বিনাশ করিবে, ততদিন তাহাদিগের অবনতি অপরিহার্য্য। \*

বংশক্রম সত্য বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই কারণেই সকল সভ্য দেশেই জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদের অস্তিত্ব। ইউরোপে জাতিভেদ নাই কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। সেখানেও কেহ নিজের শ্রেণীর বাহিরে বিবাহ করিতে পারে না। † এবং এরূপ করিলেও তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয়। তবে উহা ভারতের জাতিভেদের মত অত কঠোর নহে। ‡

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় একবার সেই দেশের সমাজ-মধ্যে সর্ববিষয়ের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লাভোয়সিয়রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার সময় বিচারকগণ বলিয়াছিলেন,—“সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিভায় কোনও প্রয়োজন নাই।” পরে তাহারা দেশরক্ষার জন্য প্রতিভার কত প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছিল। কার্ণোর নূতন সামরিক প্রণালী, লের্যাস্কর প্রভৃতির রাসায়নিক প্রণালীসমূহ ফ্রান্সের কত উপকার

\* ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলও আদি দেশে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের প্রভাব কম; সুতরাং সে-সব দেশে বর্ণসঙ্কর ভারতবর্ষ অপেক্ষা খুব বেশী হইয়াছে। অথচ তাহারা উন্নত ও শক্তিশালী, আমরা অধনত ও দুর্বল। সুতরাং বর্ণসঙ্কর হওয়া জাতীয় অবনতির কারণ, এরূপ একটা সাধারণ নিয়ম কোন ক্রমেই মানা যায় না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

† ইহা ভারতবর্ষে যেরূপ ব্যাপকভাবে সত্য, ইউরোপে তাহার শতাংশের একাংশ ব্যাপক ভাবেও সত্য নহে।—প্রবাসী-সম্পাদক।

‡ Ribot's Heredity নামক গ্রন্থে উল্লেখ।

\* ঐ অধ্যায়ে সম্পাদকীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—প্রবাসী-সম্পাদক।

করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে ফরাসীজাতির বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বিনাশ করায় দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা ১৮৭০ সালে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এত চেষ্ঠার ফলেও ফ্রান্সদেশে সাম্যবাদ সম্যক প্রচারিত হয় নাই। বর্তমান-কালে প্রতিভাশালী মধ্যশ্রেণীই ফ্রান্স দেশ শাসন করিতেছে। তাহাদিগের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্ত সোসিয়া-লিষ্ট্ৰগণ এখনও সবিশেষ চেষ্ঠা করিতেছে।\*

ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে, এবং মুসলমান ধর্ম বহুপরিমাণে বিবাহে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ উঠাইয়া দিয়া সমর্থ হইয়াছিল। উহাতে যে ঐ দুই সম্প্রদায়ের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান জাতিসমূহের অধঃপতনের উহাই আমি একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করি। কোন মুসলমান জাতি যে-দেশ জয় করিয়াছে সেই দেশীয়দিগের সহিত উহারা অবাধ রক্তসংশ্রমণ করিয়াছে। উহার ফলে বিজিতজাতির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও জেতাজাতির ক্রমশঃ অবনতি অপরিহার্য হইয়াছে।† ঐ প্রথার ফলে যে-মিশ্রজাতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে যে বিজেতাজাতির প্রতিভা থাকিতে পারে না, তাহা আমরা পূর্বে যে-সকল আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। বৌদ্ধধর্মও যে এই কারণে জাতিভেদের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিয়া ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

Chicago University Press হইতে প্রকাশিত Heredity and Eugenics নামক গ্রন্থে বংশক্রম সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।— †

(১ম) ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে বিচার্ড এডওয়ার্ডস নামক

\* Prince Kropotkin's History of the French Revolution দ্রষ্টব্য।

† লেখকের উক্তি যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দেন নাই। ইংলণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে কেণ্ট, এস্সক্স, স্যাক্সন, জুট, ডেন, নর্মান প্রভৃতির রক্তমিশ্রণ বহুপরিমাণে হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ইংলণ্ডে প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী, না প্রতিভাহীন ও শক্তিহীন হইয়াছে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

‡ Heredity and Eugenics—Page 300.

এক সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এলিজাবেথ টুটল নামক এক তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে এক পুত্র ও চারি কন্যা হয় ও পরে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ হয়। কিন্তু ঐ পুত্রের বংশে আমেরিকার প্রায় কুড়িজন বিখ্যাত নরনারী একাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, রাজনীতিক, যোদ্ধা, এবং ব্যবসায়বীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এলিজাবেথ টুটলের কন্যাগণের বংশেও বহুসংখ্যক খ্যাতিমান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

(২য়) বিচার্ড এডওয়ার্ডস পরে মেরী ট্যালকট নামক এক সাধারণ রমণীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বংশে একটাও খ্যাতিমান লোক একাল পর্যন্ত জন্মে নাই; অর্থাৎ ঐ বংশের কোনও ব্যক্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হয় নাই।\*

(৩য়) ঐ গ্রন্থে বহুসংখ্যক অসংলোকের বংশতালিকা উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহাদের বংশে ক্রমাগত অসং লোকই জন্মিয়াছে। এই-সকল লোকের দ্বারা নানাবিধ দুষ্ক্রিয়াই সংঘটিত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থে আমেরিকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বিবাহ না করায় সমাজের কি ক্ষতি হইতেছে ও ভবিষ্যতে কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থ হইতে এ স্থলে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"A Harvard class does not reproduce itself, and at the present rate, one thousand graduates of to-day will have only fifty descendants two hundred years hence. On the other hand, recent immigrants and the less effective descendants of the earlier immigrants still continue to have large families; so that from one thousand Roumanians to-day in Boston at the present rate of breeding, will come a hundred thousand two hundred years hence to govern the fifty descendants of Harvard's sons." Page—309.

\* লেখক কিন্তু পূর্বে বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকিলে বংশের পক্ষে অনুবিধ নাই। তিনি কি মনে করেন যে শিক্ষা দ্বারা তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ে, না কমে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

## নবম অধ্যায়।

## • যুদ্ধ ও ব্যাধি

যুদ্ধ ও ব্যাধি দেশের মধ্যে প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাস করিবার অন্যতম কারণ। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইবে যে, দেশের মধ্যে প্রতিভার অভাব হইলেই উহা দেশের প্রতিভাধ্বংসের বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ জাতিকেই ঐ দুই কারণ আরও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।

বিবিধ নৈসর্গিক কারণ দেশমধ্যে ব্যাধি উৎপাদন করিয়া দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে পারে। কিন্তু প্রায় ঐ-সকল নৈসর্গিক কারণ বা তজ্জাত ব্যাধিসমূহ যে মানুষের চেষ্ঠার ফলে নিরাকৃত হইতে পারে তাহা ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। হলও একটা ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশের অধিকাংশ ভাগ পূর্বে সাগর-জলে প্লাবিত থাকিত। কিন্তু সে দেশের অধিবাসীগণ ধুন্ধি ও শ্রমের বলে সাগরকে দেশমধ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া প্রচুর চাস ও বাসের ভূমি আদায় করিয়া লইয়াছে। স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে পরম প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেশ শুকনা খটখটে জায়গা যেখানে কুমি কীট সড়িতেছে না, জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিতেছে না, যেখানকার জল বর্ণ- ও গন্ধহীন স্বাদহীন ও নির্মল, তাদৃশ স্থানই যে স্বাস্থ্যকর তাহা মনুর সময়েও ঠিক হইয়াছিল। প্রাচীনকালে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না; কোন স্থানে কোন পীড়ার প্রাহর্ভাব হইলে, লোকে অন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গলায়ন করিয়া বসবাস করিত। বর্তমান সময়ে তাহার উপায় নাই; ঐ-সকল স্থানকেই স্বাস্থ্যকর করিয়া লইতে হইবে। ঐ-সকল করিতে পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধির আবশ্যিক। যে জাতির মধ্যে তাহা নাই তাহাদিগকে যে ক্রমশঃ রোগের আক্রমণে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ বিবিধ উপায়ে দেশের প্রতিভাশালীর লোকসংখ্যা হ্রাস করে। ১ম, এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ হইয়া; ২য়, একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ হইলে, যে দেশের প্রতিভাবানের সংখ্যা ও উৎকর্ষ অধিক সেই দেশই জয়লাভ করে। যুদ্ধকালে ও পরাজয়ের পরে বিজিত জাতির বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিনাশ ঘটে, ও পরবর্তী বহু কাল ধরিয়া তাহাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের বংশবৃদ্ধির সুবিধা হয় না। আহাৰাতাবই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া বিজিত জাতির যে কোন কালেই উন্নতি হইবে না, এমন বলা যায় না। পূর্বকথিত দ্বিবিধ কারণে জেতুজাতিরও ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে পারে। অবাধে অন্য জাতির সহিত রক্ত মিশ্রণ করিয়া তাহাদের জাতীয় গুণসমূহ তিরোহিত হইতে পারে। এবং তাহারা বিলাসী ও অলস হইতে পারে। উহার ফলে তাহাদের প্রতিভাশালীদিগের বংশবৃদ্ধি হয় না। এবং তাহারা আমোদে মগ্ন হইবার জন্য নিজেদের অধিকাংশ কার্যের ভার বিজিত জাতির উপর অর্পণ করে। ইহাতে বিজিত জাতি ক্রমশঃ কৰ্মদক্ষ, পরিশ্রমসহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী হইয়া উঠে। এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ জেতুজাতির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লাভ করে।

কিন্তু যখন একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশ পরস্পরের সহিত প্রাণান্তকর যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় তখনই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়। এক শিক্ষিত খাসিয়া ভদ্রলোক একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ কর্তৃক খাসিয়া দেশ জয় হওয়ার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ও বংশের খাসিয়াগণ পরস্পরের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিত। ইহার ফলে তাহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে আসার পর হইতে তাহাদের লোকসংখ্যা এখন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, দেশমধ্যে বহুসংখ্যক স্বাধীন খণ্ডরাজ্য থাকা অপেক্ষা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যস্থাপন দেশের বিশেষ হিতকর। খণ্ডরাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া

\* এই যুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে।—প্রবাসী সম্পাদক



দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে হত্যা করে ও তাহাদিগকে নির্বংশ করে। সাম্রাজ্যে ঐরূপ ঘটতে পারে না।

যুদ্ধ ও ব্যাধি এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাধি অপেক্ষা যুদ্ধই দেশের প্রতিভার অধিক ক্ষতিকর। যুদ্ধ দেশের সুস্থ সবল ও সাহসিক সম্প্রদায়কে নষ্ট করে, ব্যাধি প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দুষ্ক্রিয়-বিত লোককে নষ্ট করে।

### দশম অধ্যায়।

#### পূর্ব কথার আলোচনা।

আমরা ইতিপূর্বে যে-সকল কথা বলিয়াছি তাহাতে ভারতবর্ষের অধঃপতন সম্বন্ধে আমাদের কি মত তাহা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। আমরা এক্ষণে পূর্বোক্ত কথাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

আমরা দেখাইয়াছি যে, কোন জাতির উন্নতি তাহার প্রতিভাশালী লোকদের সংখ্যা ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। যদি পঁচশত সাধারণ লোকের মধ্যে একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি থাকে তবে তাহার কার্য করিবার কোন সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ জন সাধারণ লোকের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তি একজন থাকিলে অর্থাৎ সমস্ত দেশের মধ্যে প্রতিভাবানের সংখ্যা ঐ অল্পপাতে হইলে তদ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

বৌদ্ধধর্মের ফলে নবীন সন্ন্যাসী দলের সৃষ্টি ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিধ্বস্ত হইয়া বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণ বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতিভাবানের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিল।\* চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রতিভায় ভারত-বর্ষে যে বিশাল ও সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে সেরূপ সাম্রাজ্য আর পরবর্তী ভারতে গঠিত হইতে পারে নাই। † বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষে অহিংসামূলক ধর্মের অত্যন্ত বিস্তৃতি হইয়া দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলির অত্যন্ত বিকাশ হইয়া

\* রক্ত-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বে বলিয়াছি। সম্পাদক।

† চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধের প্রায় সপ্তদশত বৎসর পরে সমুদ্রগুপ্তের আবির্ভাব। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ও প্রভাব চন্দ্রগুপ্তের চেয়ে কোন অংশেই নূন ছিল না।—সম্পাদক।

পড়ে। শ্রেষ্ঠ গুণগুলিও সম্যক বিবেচনার সঙ্গিত প্রযুক্ত না হইলে দেশের কি ক্ষতি করে বৌদ্ধধর্মই তাহার জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ। যথাদি স্থিতি আলোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে, প্রাচীন ভারতে দান ও আতিথেয়তা ছিল, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম কর্তৃকই উহা এদেশে প্রচলিত হয়। আতিথেয়তা নিজেরই মত বিপন্ন গৃহস্থকে সাহায্য দান। দানের সময়ে লোকে পাত্র সম্বন্ধে অনেকটা বিচার করে। কিন্তু মুষ্টিভিক্ষার কালে কেহই এরূপ বিবেচনা করে না। এ কারণে মুষ্টিভিক্ষাই বিশেষরূপ ক্ষতিকর। উহাতে দুঃস্থদিগের কিছু কিছু সাহায্য হইলেও অলস ও দুষ্ক্রিয়-শীল ব্যক্তিগণেরই বিশেষ সুবিধা। তাহারা সমাজের কোনওরূপ হিত না করিয়াও এবং অনেক সময়ে অহিত করিয়াও অবাধে নিজের বংশ বিস্তার করিতে পারে। সকল দেশেই দায়িত্বজ্ঞানহীন জনগণেরই বংশবিস্তার অধিক হইয়া থাকে। ভারত-বর্ষে আবার সে বিষয়ের আরও অধিক সুবিধা। এদেশে সামান্য পর্ণকুটীরেই বাস করা যায়; বৎসরের অধিকাংশ সময় অতি সামান্য খাদ্য খাইয়াই জীবন ধারণ করা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। এই-সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলির বংশ ধ্বংস করিবার সহায়তা করিয়াছিল তেমনই উহা আবার সমাজের অপদার্থ লোকগুলির বংশবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম বিদূরিত হইলেও অকাল-সন্ন্যাসবাদ দূরীভূত হয় নাই। উত্তর ভারতে আজিও সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। কাশীর সন্ন্যাসীগণ অল্পকাল মাত্র হইল, শুধু ভেলের জোরে নহে, প্রকৃতই বিদ্যা বুদ্ধিতে অসাধারণ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কান্সরামন স্বামীর বুদ্ধির অসাধারণ প্রাথম্য দেখিয়া Mark Twain প্রমুখ অনেক ইউরোপীয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিদ্বান-নন্দ স্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী আগমন করিত। এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ঐ-সকল লোক যদি বংশরক্ষা করিতেন তবে তাহা

দেশের বংশে দুই তিন শত বৎসর পরে অনেকগুলি প্রতিভা-  
বান ব্যক্তি জন্মিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিত।  
বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে সেখানকার মোহাস্তের কতকগুলি  
চেলার সুকুমার মূর্তি, অল্প বয়স, উজ্জ্বল চক্ষু ও বুদ্ধিমান  
মুখ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহাদের  
একজন বলিল মোহাস্তজীর এরূপ চেলার সংখ্যা সর্বসমেত  
পাঁচ শত। ভাল চেলার সংখ্যা সম্ভবত অত অধিক নহে।  
যে যাহাই হোক, ঐ-সকল লোক যদি সমাজে থাকিত  
তবে তাহারা দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইতে পারিত।  
কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপনের জন্ত  
তাহাদের অনেকেই হয়ত ভণ্ড ও দুষ্ট হইয়া উঠিবে।

পরবর্তী কালের হিন্দু ভারতের প্রত্যেক পরাক্রান্ত  
রাজা, কাহারই অর্থবল ও শৃঙ্খলা-শক্তি অধিক হইয়াছিল,  
তিনিই ভ্রাস্ত্র ধারণার বশবর্তী হইয়া বহুসংখ্যক মঠ  
সংস্থাপন করিয়া কিম্বা পুরাতন মঠগুলির সুব্যবস্থা করিয়া  
দেশে সন্ন্যাস বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিয়া  
দেশের মহা অপকার সাধন করিয়াছেন। যেখানে  
সন্ন্যাস মানেই কোনও কালে প্রভূত ভূসম্পত্তি ও অর্থ-  
শালী মঠের উত্তরাধিকার, অগ্ন্যাগ্নি বিবিধ ক্ষমতা ও  
সম্মান লাভ, বিনা পরিশ্রমে যথেষ্ট আহারের সংস্থান,  
বিবিধ লোককে আজ্ঞা করিবার সুবিধা, সেখানে যে  
বহুসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষাযুক্ত বা শ্রমভীত লোক সন্ন্যাস  
গ্রহণ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! রাজাদিগের  
অনুকরণে দল দল ব্যবসায়ী ও অগ্ন্যাগ্নি অর্থশালী লোক  
সন্ন্যাসীদের হস্তে প্রভূত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অজ্ঞাত-  
পারে দেশদ্রোহ করিয়া আসিয়াছে।

যে-কোনও উপায়ে সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতা দূর  
করা যায় তাহাই যে সমাজের অকল্যাণকর তদ্বিষয়ে  
সন্দেহ নাই। তাহাই যে সমাজের অনেক কর্তব্যভীত,  
শ্রমভীত লোককে কর্তব্য লজ্জনে ও আলস্যে প্রশ্রয় দেয়  
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে সন্ন্যাসের আদর্শ  
কিরূপ কঠোর ছিল তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক  
হইতেই প্রমাণ হইবে।

(১) খাদ্য যদি আপনা হইতে সম্মুখে উপস্থিত না  
হয়, তাহা হইলে মহাসর্প যেমন চুকীভাব অবলম্বনেই

বহুদিবস স্বস্থানেই পড়িয়া থাকে, আহার সংগ্রহার্থ অগ্ন্যত্র  
কোথাও গমন করে না, সেইরূপ উদাসীন যোগীগণও  
এক প্রারব্ধকে মাত্র আহারের প্রতিবন্ধক জ্ঞান করিয়া  
অনাহারেই দিন সমূহ অতিবাহিত করিয়া থাকেন,  
আহারার্থ কোনও চেষ্টা বা উদ্যম করেন না। ভাগবত।  
৩। ৮ অ। ১১ স্ব। শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।

(২) সন্ন্যাসীর সঞ্চয়ী হওয়া উচিত নহে; তিনি যে  
ভিক্ষার একদিনের উপযুক্ত গ্রহণ করিয়া আবার  
পরদিনের জন্ত সঞ্চয় রাখিবেন তাহা যেন কখনই না  
করেন। হস্তই তাহার ভোজনপাত্র এবং উদরই তাহার  
সঞ্চয়স্থালী; পৃথক সঞ্চয়ভাণ্ডার আর আনুশ্রুক করে  
না। সন্ন্যাসী সঞ্চয়ী হইলে মধুমক্ষিকার ঞ্চায় বিনষ্ট হইবেন  
সন্দেহ নাই। ঐ ১। ১৮। ১১।

(৩) অনেকে বসতি করিলেই কলহ জন্মে; এবং দুই  
জনে বাস করিলেও বৃথা কথালাপে কালাতিপাত হইয়া  
থাকে; অতএব কুমারীর কঙ্কণের ঞ্চায় একাকী অবস্থান  
করিলে কলহ বা বৃথা জল্পনায় কালাতিপাতের সম্ভাবনা  
থাকে না।

সন্ন্যাসের ঐরূপ আদর্শ দেশমধ্যে প্রবর্তিত থাকিলে  
প্রকৃত সন্ন্যাসী ব্যতীত বাজে লোকের দল যে সন্ন্যাসী  
সম্প্রদায় হইতে বিদূরিত হুইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত কারণের ফলে হিন্দু ভারতেও উপযুক্ত প্রতিভার  
অভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ঞ্চায় বিরাট সাম্রাজ্য  
গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে তখন বহু ক্ষুদ্র  
রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই-সকল রাজ্য ক্রমাগত  
নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া দেশের যোগ্য লোকদিগের  
বংশের ধ্বংসসাধন করিত।

ধনবৃদ্ধির সহিত বিলুপিতাবুদ্ধি-রূপ কারণ, সকল  
সভ্যদেশেই বিদ্যমান আছে। তবে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা

(১) শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোহমুক্ৰমঃ।  
যদি নোপনমেদ্গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টেভুক ॥

(২) সান্তস্তবং স্বস্তনংবা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতং।  
পাণিপাত্রোদরায়ত্রো নক্ষিকৈব ন সংগ্রহী ॥

(৩) বাসে বহুনাং কলহো ভবেদ্বার্তা য়োরপি।  
এক এব বসেস্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ ॥

\* পূর্বের সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

মাণ্যমান সম্প্রদায়কে দরিদ্র রাখিয়া এ বিষয়ের কতকটা প্রতিবিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। মুদ্রারাক্স প্রভৃতি নাটকে এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়, যে তৎকালেও সমাজ-মধ্যে ধনহীন জনকে বর্তমান কালেরই ঞায় নানাবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত এবং দারিদ্র্য তখনই অপরাধের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভারত বা রামায়ণে কিন্তু দারিদ্র্যের এরূপ কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডের উন্নতির বিষয় পর্যালোচনা করিলেও আমরা পূর্বেক্ত মতবাদের সপক্ষেই প্রমাণ পাই। অ্যাংগ্লোসাকসন ও নর্মান এই দুই পরাক্রান্ত জাতি ইংলণ্ড অধিকার করে ও তথায় অবাধে বংশবিস্তার করিতে থাকে। ইংরেজদিগের মধ্য হইতে সন্ন্যাসবাদ শীঘ্র উঠিয়া যায়, আর উহা তথায় খুব বেশী পরাক্রান্ত হইতেও পারে নাই। ইংলণ্ডের ফৌজদারী আইন অত্যন্ত বর্করোচিত ছিল; অনেক স্বল্প অপরাধেই লোকের প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের দুষ্টি ও অলস লোকদিগের বংশ ধ্বংস করিয়া জাতির উন্নতিবিধানই করিয়াছে। ইংলণ্ডের দারিদ্র্য-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলও তাই। সেখানে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদের প্রাখর্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং এখনও অনেক পরিমাণে আছে। তদ্ব্যতীত ফ্রান্স হলও প্রভৃতি ইউরোপের কতিপয় দেশের ছত্তনোট প্রভৃতি বহু শ্রমপটু ও শিল্প-ও বাণিজ্য-পটু লোক স্বদেশীয় রাজার ধর্মসংক্রান্ত অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে বসবাস করিতে থাকে। তাহাদের বংশধরগণের কর্মপটুতার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে কম সুবিধা হয় নাই। ঐ-সকলের ফলেই ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী লোকদের সংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ইংরেজদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে প্রতিভার প্রাখর্য পূর্বের অপেক্ষা কম পড়িয়াছে বলিয়া একটা প্রকাণ্ড সোরগোল উঠিয়াছে। শুধু ইংলণ্ডে কেন পৃথিবীর সকল দেশেই পূর্বের তুলনায় প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

প্রতিভাতত্ত্ববিৎ পুণ্ডিতগণ (Eugenists) ইংলণ্ডের প্রতিভা হ্রাস হইবার নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেন। অর্থবাহুল্যের ফলে বিলাসবাহুল্য হইয়াছে; আবশ্যিক দ্রব্যাদির মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে; ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ দান করা ও বাসস্থান দান করিবার খরচ এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে অনেক উৎকৃষ্ট নরনারী পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেই পারে না। অথচ ছেলেরা শিক্ষা পাউক নাই পাউক, খাইতে পাউক বা নাই পাউক এসকল ভাবনা যাহাদের নাই তাহাদের বংশবৃদ্ধির কমতি নাই। অনেক ক্ষীণ, কুচরিত্র বা ব্যাধিগ্রস্ত অর্থবান নরনারী অনায়াসে বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। স্বাস্থ্য-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি হওয়ার জন্ত এবং সমাজে দয়ার আতিশয্য থাকাতে নানাবিধ দানের প্রবর্তন হইয়া এবং ফৌজদারী আইনের সংশোধন হইয়া অযোগ্যদিগকে জীবিত রাখিবার পক্ষে ও তাহাদের বংশবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্তমান উন্নতির কথা আলোচনা করিলেও আমাদের পূর্বেক্ত কথাই যথার্থ্য প্রমাণ হইবে। ইংরেজশাসনে দেশমধ্যে প্রগাঢ় শান্তি সংস্থাপিত হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষির সুবন্দোবস্ত হইয়া এই দেড় শত বর্ষের মধ্যে এ দেশের লোকসংখ্যা অসাধারণ রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে কোনও কালে এত অধিকসংখ্যক লোক ছিল বলিয়া বোধ হয় না (অন্ততঃ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে ছিল না ইহা ঠিক)। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সন্ন্যাসের প্রতি লোকের ভক্তি অনেক কমিয়াছে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ অনেক গৃহী, লোকের মনোরাজ্যের উপর অধিকতর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতিভেদ ও কৌলীণ্য প্রভৃতির আর যাহাই দোষ থাকুক উহারা যে ঐককালে হিন্দুজাতির প্রতিভার সংরক্ষা ও বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের যৌথ পরিবার এথাও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ভারতবর্ষ গত শতাব্দীতে কয়েক বার

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুর্ভিক্ষে দেশের প্রতিভাবান সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না, সাধারণ লোকেরই অধিক ক্ষতি হয়। প্লেগ প্রভৃতিও উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

• পূর্বোক্ত কারণসমূহের ফলে ভারতবর্ষে যে এক্ষণে সাধারণ লোকের অল্পপাতে প্রতিভাশালীর সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং উহার উৎকর্ষও হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।\* অতএব রাজনীতিবিদগণকে ভারতের অশান্তির আলোচনার সময় আর্থিক বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় কারণ অপেক্ষা প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধীয় কারণটিকেই ( Biological cause ) সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তদ্বিষয়েই অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে।

### একাদশ অধ্যায়।

শেষ কথা।

• বুদ্ধিমান পাঠকগণ দেখিবেন যে আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা বাকলের “সভ্যতার ইতিবৃত্ত” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক অধ্যায় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ চারিপার্শ্বের অবস্থাকেই জাতীয় উন্নতি বা অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তখন ডারউইন ও তদনুগামী প্রতিভা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা লোকসমাজে প্রচলিত হয় নাই। তাহাদিগের কথা বর্তমান সময়ে লোকমধ্যে বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে। অতএব ইতিহাসেরও তদনুরূপ পরিবর্তন আবশ্যিক। আমরা পূর্বের অধ্যায় সমূহে সে পরিবর্তন কি তাহা নির্দেশ করিয়াছি। জীব-বিদ্যাসম্বন্ধীয় কারণই জাতীয় উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারণ এবং চতুর্পার্শ্বের অবস্থা অপ্রধান কারণ।

কিন্তু যাহুঘের শক্তি, সকল আলোচনাতেই কিছু দূর গিয়া এই অগ্রসর হইতে পারে। এই কিছু দূরের পরই এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের জ্ঞানদৃষ্টির পথ রোধ

করিয়া দণ্ডায়মান। পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিয়া সে পথের কিছু দূর আবিষ্কার করিয়াই কিয়ৎকণ অনন্দে উৎফুল্ল হইয়েন, কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞানরাজ্যের অনাবিষ্কৃত দেশের বিশালতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন। আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতিতে অনেক অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমরা শক্তি কি, প্রাণ কি, পরমাণু কি, এ-সকল কথার কোনও উত্তর জানিনা। আমরা অণুবীক্ষণ যোগে কোন দ্রবোর আয়তন দশ হাজার গুণ বর্দ্ধিত করিলে কিরূপ হয় বলিতে পারি, কিন্তু উহা লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয় তাহা বলিতে পারি না। সেইরূপ ইতিবৃত্ত-বিজ্ঞানেও আমরা জাতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দেশ করিয়াছি কিন্তু সেই কারণের কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের বুদ্ধি বাহত হইয়া ফিরিয়া আইসে।

যে সকল কারণে জাতীয় প্রতিভা উদ্ভূত হয় এবং যে-সকল কারণে জাতীয় প্রতিভার ধ্বংস হয় তাহা অধ্যয়ন করিয়া কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, ঐ-সকল নিয়মের প্রয়োগ করিয়া একটা জাতির উন্নতিবিধান ত সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু কাজটা প্রকৃতই অত সহজ নহে। জাতীয় উন্নতি ও অবনতি এখনও নিয়তির হস্তে। তত্ত্বজগণ বুদ্ধিতে পারেন কোন নিয়মে একটা জাতি উঠিতেছে এবং কি কি কারণের বশেই বা একটা জাতি পড়িতেছে। কিন্তু একটা পতনোন্মুখ জাতিকে উত্থিত করা এবং একটা উপানোন্মুখ জাতিকে পতিত করা এ উভয়ই তাহাদের শক্তির অতীত। একটা জাতি যেন একটা প্রকাণ্ড নদী, মানবগণ যেন এক-একটা জলকণা। নদী যখন চলিতে থাকে তখন এক-একটা জলকণা উর্দ্ধে বা এদিকে ওদিকে ছিটকাইয়া যায়, তাহারা ভাবিতে পারে নদীকে এই দিকেই লইয়া যাইব, কিন্তু তাহা হয় না; তাহাদিগকে নদীর সহিতই যাইতে হয়।

যখন দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ দেশমধ্যে হীন ছিল তখনই দেশমধ্যে কৌলীজপ্রথা চলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন নহে। যে সময়ে সমাজ বর্ধনের ভাবে জাতির অপদার্থদিগের ধ্বংসসাধন করিতেছিল তখন সমাজের

\* লেখক এই উক্তির কোন প্রমাণ দেন নাই। বেশে ২১১ জন কবি ও বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছে বটে; কিন্তু মোটের উপর মানবজীবনের নানা বিভাগে এবং নানা বিদ্যায় প্রতিভাশালীর সংখ্যা বাড়িয়াছে কি?—সম্পাদক।

উন্নতি হইতেছিল এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।\* কিন্তু ঐ-সকল উপায়ে বর্তমান কালে অযোগ্যদিগকে স্তন্যনাশ করিলে যে সমাজের উন্নতি হইবে তাহা খুব কম পণ্ডিতই ভরসা করিয়া বলিতে পারে। যে সময়ে সমাজ নৃশংসতা ও স্বার্থপরতাকে হেয় গুণ ভাবিতে শিখিয়াছে সে সময়ে যদি সমাজ অযোগ্যদিগের ধ্বংসের জন্ত পূর্বোক্তরূপ কঠোর বিধান করে তাহা হইলে সমাজ-মধ্যে যে নৃশংসতা ও স্বার্থপরতার আতিশয্য হইয়া উহার ফলে সমাজ ধ্বংস না হইবে তাহা কে বলিল? দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া দেশের লোকসংখ্যা কমিয়া দেশে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা কমিয়া যায়, জাতির কতকটা উৎকর্ষ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে-ব্যক্তি দেশ-মধ্যে দুর্ভিক্ষের কামনা করে, যে-জাতির মধ্যে তাদৃশ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, সে জাতির অধোগতি যে অনিবার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাই আমার ধারণা জাতীয় উন্নতি ও অবনতি মানুষের বুদ্ধির অতীত এক দুজের শক্তির বলে পরিচালিত হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিকে নিয়তি, এবং ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবান বলিয়া থাকেন।

যখন কোনও পতিত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমন নিয়মিত হয় যে তাহার প্রতিভাশালীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়; তাহার উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

তেমনই যখন কোনও উন্নত জাতি পতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমনই নিয়মিত হইতে থাকে যে তাহাদের মধ্যে প্রতিভা ক্রমাগত কমিতে থাকে ও তাহার পতন কেহ রোধ করিতে পারে না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## রিয়ার চাষ

উদ্ভিদ্ধ হইতে যে-সকল আশ বাহির হয় রিয়া তাহাদের মধ্যে একটি। ইহার অপরা নাম রেমী (Ramie) ইংরেজীতেও ইহাকে রেমী বা রিয়া (Ramie or Rhea) বলে। এই রিয়া গাছকে ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে 'বোমেরীয়া নিভিয়া' (Boehmeria Nivea) বলিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার ঘাস জাতীয় গাছ। ইহার অপরা আর একটি নাম China-grass plant। আমাদের ভারতবর্ষে লোকে ইহাকে 'রিয়া' বলিয়াই জানে। ইহা আরটিকা (Urtica) বংশ হইতে উৎপন্ন। পূর্বে যে বোমেরীয়া বলিয়া একটি উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উপশাখা (Sub-division) হইতে রিয়ার জন্ম। রিয়া বহু প্রকারের দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই প্রকারই সর্বোত্তম। তাহাদের একটির নাম বোমেরীয়া টেনাসি-সিমা (Boehmeria Tenacissima); ইহাই সবুজ-বর্ণের-পত্র-বিশিষ্ট রেমী। দ্বিতীয় প্রকারের নাম বোমেরীয়া নিভিয়া (Boehmeria Nivea)। ইহাই রিয়ার সাধারণ নাম। এই শেখোক্ত রিয়ার পত্র এমত চাকচিক্য-শালী যে ইহার পত্রের নিয়ভাগ পর্য্যন্তও 'যেন রক্তময়' বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই প্রকারের রিয়া অধিকাংশই ভারতবর্ষে, চীন দেশে এবং ফরমোজাদীপে জন্মে। প্রথম জাতীয় রিয়া (Tenacissima) যাবা, সুমাত্রা, বোর্নিয়ো, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং মেক্সিকো দেশে এবং আরও অপরাপর কতিপয় দেশে জন্মিয়া থাকে। এই রিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। ভারতগবর্ণমেন্টের ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্যের অর্থনীতি উপদেষ্টা সার জর্জ ওয়াট এই রিয়ার নাম সম্বন্ধে বলেন—যদি মালয় ও ভারতে জাত রিয়া অথবা রেমীর সূত্র পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে এই দুইটিকে একজাতীয় বলা যায় না। এতদ্বয়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করিলে সূত্রের বিস্তর পার্থক্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু চীনে এই দুইটিকে এক নামেই অভিহিত করিয়াছে তাহাদের ভাষায় ইহাকে "চু-মা" (Tchow-ma) কহে। কোন্ দেশে ইহাকে কি বলে আমরা নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম—

\* এই উক্তির প্রমাণ কি? এবং যোগ্যাযোগ্য নির্ণয়ের মাপকাঠি কি?—সম্পাদক।

দ্রব্যের নাম	দেশের নাম
১। চু-মা— Chu-ma ( Tchow-ma)	চীন
২। কেগাই ও পামা—Cay-gai and Pama.	কোচিন চীন
৩। কানখুরা বা কুকুরা—Kankhura or Kunkhura.	বঙ্গদেশ (সর্বত্র নহে)
৪। কুল— Kund	বগুড়া (বঙ্গদেশ)
৫। কুরকুন্দ— Kurkunda	জলপাইগুড়ি (বঙ্গদেশ)
৬। রীহা, রিসা Reeha (Riha), Risa,	আসাম
৭। রুসা ও সুমসা Rusa and Sumsha,	নাগা (পার্বত্য প্রদেশ)
৮। কঙ্কুরা (গাঙ্গালা নাম) Kankura,	আসাম উপত্যকা (গারো পাহাড়, ও কামরূপ প্রভৃতি স্থানে)

গারো পাহাড় ও কামরূপ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গদেশ-প্রচলিত নামেই উক্ত দ্রব্যের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

বোমেরিয়া নিভিয়া (Boehmeria Nivea) জাতীয় রিয়া ভারতে নিতান্ত কম নহে। এই জাতীয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও তাহার শাখাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ইহার গুঁড়ী কেশের ঞায় কোমল এবং সরস। পত্রগুলি প্রশস্ত, ডিম্বাকৃতি, মস্তক-ভীক্ষধার এবং পার্শ্ব করাতের ঞায় দস্তুর এবং ধারাল। পত্রের নিম্নভাগ কাণ্ডের দিকে কর্ভিত। ইহার নিম্নার্দ্ধ ভাগে তিনটি শিরা দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রের উপরিভাগের সমতলক্ষেত্রে যেন রজতাত পশম ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পত্রের মধ্যে আরও বহু শিরা নয়নগোচর হয় কিন্তু সেগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট। এই বৃক্ষ পুষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকে। রিয়া হইতে যে সূতা বাহির হয় তাহা সর্বোপরি-স্কের নিম্নভাগে অবস্থিত। তথায় সূত্রগুলি আঠা এবং রজন প্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে। রাম্ফ নামে একজন উদ্ভিদ-বিদ্যাপারদর্শী দিনেমার সর্বপ্রথম এই সূত্র রামি-য়াম মেগাস্ (Ramiaum Magus) নাম দিয়া আবিষ্কার করেন। সেই হইতেই ইহার নাম “রেমীসূত্র” হইয়াছে। তিনি অল্পমান ১৬৯০ খ্রীঃ বানোয়া দ্বীপে এই সূত্র আবিষ্কার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার নমুনা ইউরোপ-খণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতে বোমেরিয়া নিভিয়ার বৃক্ষ দেখিয়া ১৮০৭ সালে ডাক্তার বুকানান হামিল্টন তাহার নাম রাখেন কাকুরা।

যত প্রকার সূত্র দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে এই সূত্রেরই স্থায়িত্ব অধিক। ইহা অতিসূক্ষ্ম। ইহা চাকচিক্যে রেশমের

সমতুল্য। পূর্বে যে বোমেরিয়া টেনাসিসিমা জাতীয় রিয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বোমেরিয়া নিভিয়া জাতীয় রিয়াই অধিক উত্তম, ইহা কিন্তু উহা অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। এই সূতা চরকায় কাটা যায়। ইহার সূতা কাটিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারের রিয়ার সূত্রের সঙ্গে শেবোক্তের তুলনা হইতে পারে না। টেনাসিসিমার সূতা কিছু মোটা। সেই জন্য খেতজাতীয় বা নিভিয়া জাতীয় রিয়ার ঞায় উহার সূতা বাহির হয় না এবং ঐ সূতা কাটাও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বা নিভিয়া জাতীয় রিয়ার সূতা তত মজবুত বা স্থায়ী না হইলেও তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা বাহির হয়, কিন্তু সূতা বাহির করিতে কিঞ্চিৎ যত্ন লইতে হয়। এই উভয় প্রকার সূত্রের দৈর্ঘ্যে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। রিয়ার সূত্র সহজেই নমনীয় এবং উহা শনের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। স্থানের জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে উহার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গজের ০৮৮ হইতে ২১০ গজ পর্যন্ত গাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহিঃস্ক পৃথক করিয়া সূত্র বাহির করিতে হইলে কলের সাহায্যেই কাজ ভাল হয়। এই জন্য বর্তমান সময়ে দুই প্রকারের কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেম্যান ও ফাউয়ার (Lehman and Faure) কর্তৃক প্রবর্তিত কল। ইহারা বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই কলের উদ্ভূতি করিয়াছেন। লেম্যান কল দুই প্রকারের। প্রথম কল স্থাবর, কারখানাদিতে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয় কল সচক্র ও সচল। ফাউয়ারের কল ‘রেমী’-প্রধান স্থানে ব্যবহৃত হয়। বিহার প্রদেশে ডালসিংসরাই নামক স্থানে ঐ কল চলিতেছে।

যখন সূতা বাহির করিবার জন্য পত্র হইতে স্ক পৃথক করিয়া বস্তায় বস্তায় মাল কারখানায় আসিতে থাকে তখন সর্বপ্রথম তাহা হইতে আঠা বাহির করিতে হয়। তাহাকে নির্যাস-নিষ্ক্রামণ (Degumming) প্রক্রিয়া বলে। এই কার্য করিবার পূর্বে বস্তাগুলি খুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে উহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির বর্ণ, দৈর্ঘ্য, আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া গুণাগুণ স্থির করিয়া পৃথক পৃথক স্থানে

রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য। যে প্রকারে তুলা পরিষ্কার করিতে হয়, ইহাও সেই প্রকারে রাশীকৃত করিয়া কলের সাহায্যে বাষ্প, জল এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার আঠা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এতদ্বিন্ন কল-সাহায্যে ধৌত করা, চাপ দেওয়া এবং পম্প করা প্রভৃতি বহু ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। আঠা-বাহিরকরণ-প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সামর্থ্য, কোমলতা, ওজ্বল্যের কিঞ্চিৎ মাত্রাও ক্ষতি হয় না—পূর্বের ঝায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ ইহার চট্‌চটে ভাবটা দূর হয়। এই কার্য শেষ হইয়া গেলে অপরাপর কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এই প্রকারে উত্তমরূপে ইহার প্রস্তুতপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেলে এবং সুন্দররূপে সূতাগুলি সজ্জিত বা বিচ্যুস্ত করা হইলে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় দুই প্রকার কার্য সম্পূর্ণ হইল বলিতে হইবে।

আঠা বাহির করা শেষ হইয়া গেলে হস্ত দ্বারা রিয়া-গুলি গিল-স্প্রেডিং ( Gill-spreading ) কলে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ঐ কল হইতে সূতা এলো-মেলো ভাবে বাহির হইতে থাকে। পরে তাহা বহুসংখ্যক গিল-মেসিনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর আঁশ বাহির করিবার কার্য আরম্ভ হয়। কতকগুলি ভ্রাম্য-মান গিল-ড্রাইং ফ্রেমের মধ্য দিয়া সেই বিচ্যুস্ত আঁশগুলি প্রবিষ্ট করাইতে হয়। তথা হইতে ফিতার ঝায় দ্রব্যগুলি রোভিং ফ্রেমের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়। তথায় ফিতা-গুলি ধুমুরি দ্বারা অল্প আকারে পরিবর্তিত হয়। এই কল দ্বারাই সূতা বাহির করা এবং গুটানো হয়। ইহাকে রোভিং প্রসেস বলে। স্পিনিং প্রসেস বা সূতা কাটিবার রীতির সঙ্গে রোভিং প্রণালীর কিয়ৎ পরিমাণে সমতা দৃষ্ট হয়। রোভিং প্রণালীতে সূতা বাহির করা হয় এবং স্পিনিং প্রণালীতে সূতা গুটানো হয়। স্ক্রুগিল রোভিং ফ্রেমে ( Screw gill roving frame ) ৪০টি চরকা থাকে। কোন কোনও কলে ২৪টি দেখা যায়। ডাঙী রোভিং ফ্রেমে ১০০টির কম থাকে না। যাহা হউক, এই প্রকারে রিয়া পরিষ্কার গুটানো এবং বাঙিল প্রস্তুত হইলে সূতা বয়নোপযোগী হইয়া থাকে। রেমী সূতা যে-কোন তাঁতে বয়ন করা যাইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্যকিরণ এই সূতার উপর পতিত হইলে উহার অভ্যন্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সূতা বয়ন করিবার কলঘরের জানালাদিতে পরদা টাঙাইয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে রিয়ার চাষ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কেহই ইহার প্রতি মনোযোগী হন না বা চাষ করিবার জন্য অর্থব্যয় দ্বারা লোক নিযুক্ত করিয়া কৃষিকাৰ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে যত্ববান হন না। এইদিকে কাহারও কাহারও মনোযোগ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

শ্রীপূর্ণপতি রায়।

## ভবিষ্যতের ধর্ম

পুরাতন “সাধনা”র “ভবিষ্যৎধর্ম” শীর্ষক একটি রচনা পাঠ করিতেছিলাম। একজন চিন্তাশীল ইংরেজ ইংরেজী ভাষায় উক্ত রচনাটি লিখিয়াছিলেন; কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধটির সার মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে জাগ্রত হইয়াছে; সেই কথাগুলিই এই রচনার মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে যে রকম জ্ঞানের উন্নতি বিস্তার হইয়াছে, আর কখনকালেও সে রকম হয় নাই। এখন মুদ্রাযন্ত্রের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে; পৃথিবীর যেখানে যে-কোন জ্ঞানের তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, অথবা যে-কোন নূতন সত্য প্রকাশিত হইতেছে, জানীগণ তাহাই সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ছাপাইতেছেন। রেলওয়ে ও ইঞ্জিনিয়ার ঐ-সকল নানা দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষ আঁগনার ঘরে বসিয়া সমস্ত জগতের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে এবং উহা হইতে সত্য সংগ্রহ করিতেছে। সংবাদপত্রের এমনি উন্নতি হইয়াছে যে, প্রত্যহ উহা পাঠ করিয়া জগতের সংবাদ অবগত হইতেছি এবং কোথায় কোন্ জানী কোন্ নূতন তত্ত্বটি আবিষ্কার করিলেন, তাহাও জানিতে পারিতেছি। এই জন্ম দিনের পর দিন মানুষের জ্ঞানের বিকাশ

হইতেছে; চিন্তাশক্তি বর্ধিত হইতেছে, বিচার-বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এবং মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা-বিচার ও সত্যনির্ধারণ করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মত গঠন করিতেছে;—সেই মতানুসারে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্তই বন্ধপরিষ্কার হইতেছে। কাজেই সর্বত্র সর্ববিষয়ে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত দেশের ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, এ সকলেরই আদর্শ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে এবং ঐ-সমস্ত এক নূতন আকারে গড়িয়া উঠিতেছে। পরিবর্তনের একান্ত বিরোধী ও পুরাতনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ এই-সকল দেখিয়া গুনিয়া ক্ষোভে ত্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছেন, সর্বদাই হায় হায় করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই পরিবর্তনের স্রোতকে ফিরাইতে পারিতেছেন না।

বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম এই তিন ধর্মের মধ্যেই পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইবার অগ্রেই ধর্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইল; তিনি জ্ঞান ও ধর্মের মহা শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিস্তর শিক্ষিত লোক ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পঞ্জাবে মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সমাজের সভ্যগণ অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। তন্নিম্ন পঞ্জাবে শিখধর্মের পুনরুত্থান হইতেছে। খালসাশিখগণ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ দূর করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের গত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বর্গীয় মনস্বী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজের মধ্যেও পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকল সমাজেরই সুশিক্ষিত চিন্তাশীল লোকদেশহিতৈষী ধার্মিকগণ ছবছ পুরাতন ধর্ম লইয়া আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ধর্মের অধিকাংশ ধর্মই যে পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভবিষ্যতে যদি অনেক ধর্মই পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করে, তাহা হইলে সেই-সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোন্ কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইবে? কোন্ কোন্ সত্য বিকশিত হইয়া উঠিবে?

এ প্রশ্ন অতিশয় দুঃকর। ভবিষ্যতের কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? তবে এ বিষয়ে কালের একটা ইঙ্গিত আছে। ধর্ম ভবিষ্যতে কি হইবে, আমরা বর্তমান কালের মধ্যেই তাহার একটা অস্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকি। যেমন সৃষ্টিদায়ের পূর্বেই তাহার একটি লোহিত আভা পূর্বাকাশে পরিলক্ষিত হয়; তেমনি ভবিষ্যতে ধর্ম কি আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহারও একটুকু আভাস উদারচিত্ত মানবহিতৈষী ধার্মিকদিগের চিন্তার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি বর্তমান কালের যবনিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করে; তাই তাঁহারা শুধুই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে চিন্তাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; ভবিষ্যতে যে সত্য, যে আদর্শ আসিয়া ধর্ম ও সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিবে, তাঁহারা সেই বিষয়ে চিন্তা করেন এবং চিন্তার অক্ষুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হন। আমরা এই শ্রেণীর ধার্মিক ও মনস্বী ব্যক্তিদিগের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে এবং কালের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হইলে, ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধেও কতকগুলি সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের রচনার প্রথমেই “সাধনা”য় প্রকাশিত “ভবিষ্যৎ ধর্ম” শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে প্রশ্ন করা হইয়াছে “ভবিষ্যতের ধর্মে দেবতা স্থান পাইবেন কি না? দেব দেবী ত প্রতিদিন লোপ পাইতেছে—ঈশ্বর কি থাকিবেন?” মূল প্রবন্ধের লেখক ডাক্তার মোমারি সাহেব বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নিশ্চয়ই একমাত্র ঈশ্বরের অর্চনা ভবিষ্যৎ ধর্মের একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা কালের ইঙ্গিতে এই সত্যই উপলব্ধি করিতেছি। ধর্মজগতের গতিই একেশ্বরবাদের দিকে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বহুদেববাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জন্মিতেছে; চিন্তাশীল ধার্মিকদিগের



অন্তরে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের ভাবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের পরিচিত যে-সকল ধার্মিক ব্যক্তি ইউরোপে ও আমেরিকায় গমন করিয়াছেন এবং মনস্বী ও উদারচিত্ত ধর্মপিপাসু লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন খ্রীষ্টান সমাজের বিস্তার শিক্ষিত লোক আর অবতারবাদের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছেন না। ঐ-সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টকে আদর্শ মানুষ মনে করিয়া তাঁহার চরিত্রের অমুকরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের পূজার পুষ্পাঞ্জলি একমাত্র ঈশ্বরের চরণেই অর্পিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মনস্বী ব্যক্তি উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন।

আমাদের ভারতবর্ষে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? এখানে মুসলমানগণ বহুদেববাদ লুপ্ত করিয়া দিয়া একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপন করিবার জন্যই বন্ধপরিষ্কার। তত্ত্বিন্ন পঞ্জাবে শিখধর্ম রহিয়াছে। শিখধর্মাবলম্বীগণ নিরাকার ঈশ্বরের অর্চনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মধর্ম ও পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের মতাদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম ও আর্য্যসমাজ ভারতবর্ষের সর্বত্র একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতেছেন। এই দুই ধর্মেরই লোকসংখ্যা অল্প বটে; কিন্তু শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। দেশের অনেক সুশিক্ষিত শক্তিশালী ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এই দুই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিস্তার শিক্ষিত লোক এই দুই ধর্মের সঙ্গে অন্তরের যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম ও আর্য্যসমাজ দেশের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য এই উভয় ধর্মের অনেক সত্য, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইতেছে।

বহু হিন্দুসমাজে যে-সকল প্রাচীন ভাবাপন্ন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যঁাহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারাও আর পুরাতন বহুদেববাদ ধর্মর্ধন করিতে পারিতেছেন না। ইংরেজী শিক্ষা, উপনিষদ ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র এবং প্রভুত্ব, একেশ্বরবাদের প্রতিই তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া

দিতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ঈশ্বর কি আর এক ভিত্তি দুই হইতে পারে? তবে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না বলিয়াই দেবমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দু কখনই পৌত্তলিক নহে; হিন্দু, গ্রীকদের মত, বহু দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে পারে না; শুধুই উপাসনার সুবিধার জন্য সম্মুখে কল্পিত মূর্ত্তি রাখিয়া তন্মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করেন। নতুবা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার অর্থ কি?

বর্ত্তমান সময়ে সর্বজনমাণ প্রবীণ স্যার গুরুদায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত বঙ্গীয় সমাজ একজন নিষ্ঠাবান প্রাচীনভাবাপন্ন হিন্দু বলিয়া মনে করেন। তিনি তাঁহার প্রস্তুত “জ্ঞান ও কর্ম” শীর্ষক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের “মূর্ত্তিপূজা নিবারণ” শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—

“কেহ যদি মূর্ত্তিই ঈশ্বর মনে করে, তাহা নিতান্ত ভ্রম। কিন্তু যদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ কঠিন বলিয়া তাহাকে সাকার মূর্ত্তিতে আবিভূত ভাবিয়া তাহার উপাসনা করেন, তাহার কার্য গহিত বলা যায় না। হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা যে একত্ব ঈশ্বরারাধনা ও শিক্ষিত হিন্দুমাজেই যে তাহা সেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু পূজা-প্রণালীতেই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। হিন্দু যখন যে-মূর্ত্তির পূজা করেন তখন সেই মূর্ত্তিই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করেন। \* \* হিন্দুর সাকার উপাসনা যে একত্ব নিরাকার সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, তৎসম্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া এসিক একটা সুন্দর শ্লোক আছে।

“রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং।

স্তত্যানির্কচনীয়তাহ্মিলগুরো দূরীকৃত্য যন্ ময়া ॥

ব্যাপিতঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।

কস্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতা-দোষজয়ং মৎকৃতম্ ॥”

রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার

ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আঁকার তোমার।

বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,

শুবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা।

‘সর্বত্র সর্বদা তুমি আছ সম ভাবে,

অমাগ্ন কদেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে।

কুরেছি এ তিন দোষ আমি মূর্ত্তিমতি

কমা কর জগদীশ, অধিলের পতি।

অতএব হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা বা বহু-ঈশ্বরবাদ-দোষে দূষিত বলা উচিত নহে।”

মহাত্মা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিবার সমস্ত এই উৎকৃষ্ট বচনটি আবৃত্তি করিতেন। আমাদের মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সমাজের একজন আদর্শ হিন্দু হইয়াও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম

যে পৌত্তলিকতা-দোষ-শূন্য ও তাহার লক্ষ্য যে একেশ্বর-বাদ, তাহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন সুশিক্ষিত ও উদারচিত্ত চিন্তাশীল হিন্দুগণ এই বৃকম মতই পোষণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা বাল্যকালে বুদ্ধদিগের মুখে এ বৃকম কথা শুনিতে পাই নাই। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করেন নাই, উচ্চতর দর্শন বিজ্ঞানও পাঠ করেন নাই; কাজেই তাঁহাদের বিশ্বাসও অল্প বৃকম ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও কালী দুর্গাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা ও দেবী বলিয়াই মনে করিতেন। এখনও এ দেশের বিস্তর লোক উক্তরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই দেব-দেবীর অর্চনা করেন ও তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ত পশুবলি প্রদান করেন।

যাশ হউক, বহু দেবতার অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; প্রতিমার মধ্যে শুধুই তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিয়া অর্চনা করা হয়;—এই বিশ্বাসই যদি আপামর সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে বহুদেববাদ ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ মনুষ্যকল্পিত ও মনুষ্যানির্মিত মৃৎময়ী মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করার চেয়ে ঈশ্বরনির্মিত জীবন্ত এবং মনোমুগ্ধকারী বিশ্বমানব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করা সহজ, স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক। তাহা ছাড়া আপনার প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণস্বরূপকে উপলব্ধি করা সর্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার। আমি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তেই এই জীবনের বিবিধ ক্রিয়া ও নানা ঘটনার মধ্যে আমার অতীত এক মহাশক্তি এবং মহাজ্ঞানের কার্য্য অনুভব করিতেছি; এই আমার আত্মার মধ্যেই ত পরমাত্মার সঙ্গে নিগূঢ় যোগ। এই প্রাকৃতিক যোগ উপলব্ধি না করিয়া পরোকভাবে একটি কল্পিত প্রাণহীন মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করা কখনই সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্তই উপনিষদের শিক্ষা স্বীয় আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভাব মানুষের মনে বর্তাই প্রবল হইয়া উঠিবে, ততই যে বহু দেবতার

পূজার প্রতি লোকের অনুরাগ হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্বিত্ত দেব-প্রতিমাকে ঈশ্বর মনে না করিয়া তন্মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাও যে এক বৃকম একেশ্বর-বাদ, সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সর্বত্রই ধর্মের গতি যে একেশ্বরবাদের দিকে, তাহা অতি উত্তম রূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

একেশ্বরবাদই যে ভবিষ্যতে ধর্মের একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে আরও গুটিকয়েক কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের ধর্মধারণার মূলে কি? আমরা ঈশ্বরকে চাহি কেন? কেনই বা শ্রম স্বীকার করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হই? চিন্তাশীল ঈশ্বরবিশ্বাসী পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন? তাঁহারা বলেন—সসীম মানুষ অসীমকে পাইবার জন্ত, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণ পুরুষের মধ্যে গিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্ত, অনন্তের আকাজক্ষা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; নরনারীর অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে অসীমের জন্ত আকুলতা রহিয়াছে; মানবাত্মার স্বাভাবিক গতিই অনন্তের দিকে। অনন্তের আকাজক্ষা হইতেই মানবের ধর্মতাবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই কবি-রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

—“পরায় শান্তি না মানে

ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে।”

পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন—

“অনন্তের ধারণা সকল ধর্মের মূলে লক্ষিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পদার্থের তদানুসন্ধানে ব্যাপ্ত, বিশ্বাসও সেইরূপ সীমাবদ্ধের অধঃস্থিত অসীমের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। \* \* আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, উহা কেবল সীমাবদ্ধের অবিরণের পশ্চাত্তিত্ত অনন্তের বিবিধ নামকল্পনা-চেষ্টার-ইতিহাস মাত্র।” \*

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত চতুর্থ সংস্করণের ৫৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

“রাজা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং

\* পরলোকপত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত “ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি” শীর্ষক গ্রন্থের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা।

ইহা স্বাভাবিক। \* \* \* বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ প্রকার উপাসনা-প্রণালীতে বিশ্বাস শিক্ষার ফল। এ-সকল স্বাভাবিক নহে। জনশ্রুতি, শাস্ত্র ও চতুঃপার্শ্বের অবস্থা দ্বারা এই-সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

সমস্ত মানবের অন্তরাত্মা অনন্তকে পাইবার জন্ম এবং অনন্তের অভিমুখে যাইবার নিমিত্ত কি রকম ব্যাকুল, তাহা আমরা আমাদের জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি। দার্শনিকেরা বলেন, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা এই তিনটি মানবাত্মার স্বরূপ—এই তিন লইয়াই মানবজীবন। এই তিনটির গতি কোন্ দিকে? আমাদের জ্ঞান জগতের রহস্যাবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত সত্যকে জানিবার জন্মই ব্যাকুল হইয়া আছে। দিনের পর দিন কত সত্যই জানিতেছে, কিন্তু তবুও জ্ঞানের তৃপ্তি নাই। ঐ স্রোতস্বিনী যেমন অনন্ত সাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়াই কৃতার্থ হইতে চায়, তেমনি মানবের জ্ঞান পূর্ণ সত্য অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। আবার মানবহৃদয়ের প্রেম, নিরন্তর জগতের স্নেহ প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, তবুও তাহাতে তৃপ্তি নাই; আমাদের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কোন সীমাবদ্ধ বস্তুতেই তৃপ্তিলাভ করে না; হৃদয়ের মধ্যে কেবলই অতৃপ্তি! ইহাতেই বুঝিতে পারি, নরনারীর অন্তরের প্রীতি সেই অসীম প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। আমাদের ইচ্ছাও এক মঙ্গলময়ী মহা ইচ্ছারই অনুসরণ করিতে চাহিতেছে। সুতরাং অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে না পাইলে, কিছুতেই আমাদের কৃতার্থ হইবার উপায় নাই। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যা এই বিষয়ে বলিতেছেন—

“জ্ঞান যেরূপ সত্যের চরম মূলতত্ত্বে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে, ভাবও সেইরূপ অনাদি অনন্ত পুরুষে আসিয়া তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হয়। \* \* \* আসলে আমরা সেই অসীমকেই ভালবাসি। আমরা এতই অসীমে আকৃষ্ট, অসীমে মুগ্ধ, যে, যতক্ষণ না অসীমের অমৃত উৎসে উপনীত হই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তিলাভ করি না। আমরা অসীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের প্রচণ্ড আবেগ-সমূহের অন্তঃস্থলে—লঘু বাসনা-সমূহের অন্তঃস্থলে, এই অসীমের ভাবরস—এই অসীমের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান।” \* \* \*

\* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ভাষান্তরিত “সত্য, সুন্দর, মঙ্গল” গ্রন্থ দেখুন।

মানবের ধর্মধারণার মূলে অনন্তের জ্ঞান; মানবের অনন্তোন্মুখী গতির নামই ধর্ম; মানুষের গুঢ় মর্মস্থানে অনন্তের জন্ম ব্যাকুলতা রহিয়াছে বলিয়াই উপাসনা; উপাসনার মধ্য দিয়া মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উচ্চতর ধর্মধারণাই যদি মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, তবে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই যে ভবিষ্যৎ ধর্মের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভবিষ্যতে ব্রাহ্মত্ব, উদারতা ও সমদৃষ্টি ধর্মের যে আর একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে জ্ঞানীগণ উদার ও উন্নত দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম পৃথিবীর ঞায় বিশাল ও সাগরের ঞায় সুগভীর। পৃথিবী আপনার বক্ষে বৃহৎ বনস্পতিকেও ধারণ করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র তৃণকেও আশ্রয় দান করিয়াছেন; তাঁহার ক্রোড়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নিকৃষ্ট কীটও বাস করিতেছে; সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি ও সুগভীর স্নেহ। সাগরের মধ্যে সামান্য বালুকণা ও মহামূল্য রত্ন উভয়ই রহিয়াছে। সেইরূপ উদার ধর্ম খেতবর্গ, কৃষ্ণবর্গ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকল জাতিকেই আপনার মধ্যে স্থানদান করিবেন এবং সমান ভাবে করুণা বিতরণ ও সমান অধিকার প্রদান করিবেন। নচেৎ ধর্ম যদি খেতবর্গ লোকদিগকে অথবা ব্রাহ্মণজাতিকে আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৃষ্ণবর্গ জাতি অথবা শূদ্রদিগকে দূরে সরাইয়া রাখেন, ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকেন, স্নেহ কাফেরের ভেদ উপস্থিত করেন, তবে আর সে ধর্মকে উন্নত ধলিয়া মনে করিতে পারি না। এইজন্ম বর্তমান যুগের মহাপুরুষগণ ধর্মের মধ্যে আর জাতিভেদ রাখিতে চাহেন না। এ যুগের মহাত্মা রামমোহন রায়, মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জাতিভেদ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্র “উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৮৯১ সালের ১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন—

“আমাদের হস্ত ভারতের পতন ও সুবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।

\* \* প্রাচীন বা অধুনিক তর্কিকগুণ বিখ্যা যুক্তিভাল বিস্তার করিয়া মতই ইহা চাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।”

রাজা রামমোহন রায় তৎপ্রণীত “ব্রাহ্মণ সেবধি” গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

“আমাদের জাতিভেদ বাহা সর্বত্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।”

এই-সকল মহামনা মনস্বী ও মানবহিতৈষী ব্যক্তিদিগের উক্তি পাঠ করিয়া আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ধার্মিকদিগের অন্তরে ভেদবুদ্ধির চেয়ে স্নেহ ও মিলনের ভাবই প্রবল হইয়া উঠিবে। মানুষ যেকোনো কুটরাজনীতি, বিষয় বাণিজ্য ও আপন আপন স্বার্থ লইয়া কলহ ও মারামারি করিতেছে, সেখানে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে ত করুক, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকিতে চায় ত থাকুক; কিন্তু সমস্ত মানুষ যে ধর্মের ঘরে আসিয়া মুক্ত হইবে, স্বাধীনতা লাভ করিবে, শান্তি পাইবে, হৃদয় জুড়াইবে,—সেখানে আবার কুটিল ভেদবুদ্ধি কেন? সেখানে ঘৃণাবিষেব অবজ্ঞা ও অশান্তি কেন? ধর্মের মধ্যে ঘোর বৈষম্য দেখিয়া প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তির ক্ষোভে ত্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহারা ধর্মের এক উদার বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে সকল সম্প্রদায়কে মিলিত করিতে চাহিতেছেন। এই ত কার্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে পড়িতেছিলাম, মনস্বী আবদুল বাহা একখানি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদককে লিখিয়াছেন—

“আমেরিকার বড় বড় সহরে আমি বক্তৃতা দিয়াছি এবং যাহাতে যাতে শান্তি স্থাপন হয়, ঈশ্বরের পুত্র এই সমগ্র মনবজাতি এক প্রেমমূর্ত্তে আবদ্ধ হয় এবং জগতে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তাহার দিকে আমার প্রোতাদের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। \* \* \*

তাঁহারা আমার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। আমেরিকা এবং লণ্ডনে অনেক মহানুভব দেবতুল্য মহাত্মার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং আনন্দের সঙ্গে আমি এই কথা বলিতেছি যে, তাঁহারাও এই পথের যাত্রী এবং জগতের মঙ্গল-কামনাশীল তাঁহাদের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের অন্ত নাই। ধন্য তাঁহারা! ধন্য ঈশ্বরের করুণা!”

• তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধের শেষ কথা এই—

“সমগ্র মনুষ্যজগৎ একটি মহাপরিবর্তনের পথে চলিয়াছে, \* \*

জগৎ জুড়িয়া একোয় মূর অচিরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, নূতন ভাবে জগৎ অনুপ্রাণিত হইবে।”

অতএব ভবিষ্যতে ধর্মের মধ্যে যে ব্রাতৃত্বভাব, উদারতা ও সমদৃষ্টি পরিলক্ষিত হইবে, সে কথা যুক্তকণ্ঠেই বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে ধর্মমত ও ধর্মাসুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে ধর্মজীবনই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। পূর্ব্ব ধর্মমত এবং অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতিই লোকের প্রথর দৃষ্টি ছিল। ধর্মযাজক ও ধর্মরক্ষকগণ চতুর্দিকে বহু মতের ও বহু অনুষ্ঠানের লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অচলায়তন নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আপন আপন ধর্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। পাছে বা কোন নূতন সত্য ও নূতন ভাব আসিয়া পুরাতনের একটি ক্ষুদ্র মত, একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকেও বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতেন। শুধু তাহাই নহে। ধর্মসমাজের কোন লোক অতি সামান্য একটি মতকেও অতিক্রম করিয়া কোন নূতন সত্য গ্রহণ করিলে এবং তাহা প্রচার করিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। এই বিষয়ে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলে একেবারে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মহাত্মা মার্টিন লুথার পোপেরও পুরাতন ধর্মমতের ভ্রমস্তি দেখাইয়া দিয়া ছই একটি নূতন সত্য প্রচার করিলেন এবং নিকট অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা অধর্ম ভিন্ন যে ধর্ম লাভ হইতে পারে না, তাহাও যাজকদিগের চোখে আবুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর কি রক্ষা আছে! এই অপরাধের জন্য পোপের অভিসম্পাত এবং স্পেনের সম্রাটের তলোয়ার তাঁহার মস্তকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার পর ঐ সকল সামান্য সামান্য মতের অনৈক্যের জন্য অসামান্য ধার্মিকদিগকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। অসার ধর্মমত ও অসার ধর্মাসুষ্ঠান রক্ষার জন্য মানুষের এমনই প্রয়াস! এই অল্প দিন হইল, ফরাসীদেশের ধর্মশীলা ও শক্তিশালিনী নারী ম্যাডাম গের্গোর জীবনচরিত পড়িতেছিলাম। তিনি ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাধ্বী নারী কঠোর সাধনার দ্বারা প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ধর্মযাজকদিগের দুই একটা কুসংস্কারপূর্ণ অসার ধর্মমত স্বীকার করিতে পারিলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল। শুধু খ্রীষ্টান সমাজের কথাই বলি কেন? অধিকাংশ ধর্মসমাজেই খুঁটিনাটি মতের উপর এবং অনেক অসার অনুষ্ঠানের প্রতি সমাজরক্ষকদিগের প্রখর দৃষ্টি। জ্ঞানী ও ধার্মিকগণ ধর্মের জন্ত উহা লঙ্ঘন করিলেও কঠোর শাস্তি।

কিন্তু জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অন্তায় গোঁড়ামি কমিয়া আসিতেছে, মানুষ ধর্মমত সম্বন্ধে উদার ভাব পোষণ করিতেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, এ যুগের মূলমন্ত্র আত্মার স্বাধীনতা। এ যুগে প্রাচীন কালের কতকগুলি অনিষ্টকর ধর্মমত ও নিষ্ফল অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়া মানুষের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করিলে, বিবেকবুদ্ধি বিলুপ্ত করিতে চাহিলে এবং উন্নতির পথে বাধা দিলে, মানুষ পুরাতন ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ধর্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

ধর্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি একেবারে যে দৃষ্টি রাখা হইবে না, ইহা নিকোঁধের কথা। পুরাতন ও নূতন বহু মত ও বহু অসার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মকে আচ্ছন্ন করা হইবে না বটে; কিন্তু ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস, সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব, নৈতিক নিয়ম পালন এবং নামকরণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষা করিতে হইবে। সেগুলি সকলেরই মাত্ৰ করিয়া চলা আবশ্যিক। কারণ আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক কয়েকটি গুরুতর নিয়মে মানুষকে বাধ্য না করিলে সমাজ গঠিত হয় না। মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও পাপাচার নিবৃত্ত হয় না। সমাজনিয়ম, মানুষের আত্মার স্বাধীনতা ও নির্মল বিবেকবুদ্ধির উপর হস্তার্পণ করিবে না বটে; কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপকার্য্য নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নচেৎ সমাজের ঘোর অকল্যাণ হইবে। অতএব উদার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সামাজিক ও নৈতিক মূল সত্যগুলিকে ধর্মমত রূপে পরিগণিত করিয়া, উহাতে মানুষকে বাধ্য করা হইবে।

তাহা ছাড়া আর সকল মতেই মানুষের স্বাধীনতা থাকিবে। 'মানুষ কি যাইবে, কোন্ কাজ করিবে, কাহার কণ্ঠকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া লইবে, কোন্ দেশে যাইবে, কোন্ দেশে যাইবে না, কাহাকে ভক্তি করিবে, কাহাকে ঘৃণা করিবে—এ সমস্ত বিষয়ে সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিগণ সকলকে উপদেশ দিতে পারেন; কিন্তু কোন ধর্মমত খাড়া করিয়া বলপূর্বক মানুষকে তৎসঙ্গে বাধ্য রাখিতে চাহিলেই উল্টা উৎপত্তি হইবে—মানুষ সমাজের অন্তায় নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে গিয়া অত্যাশঙ্কক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে।

ঐ-সকল কারণে এবং কালের গতি ও মানুষের মতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, ভবিষ্যতে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অসংখ্য মতের ফাঁদে আটকাইয়া ধর্মের মধ্যে রাখা যাইবে না। তন্নির ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়াও ধর্মের বিচার করা হইবে না। ভবিষ্যতের ধর্ম্ম মানুষকে বলিবেন, তোমার বহু ধর্মমত ও বহু অনুষ্ঠানের বিষয় জানিতে চাহি না; তুমি প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের দ্বারা জীবনকে কতটা উন্নত করিতে পারিয়াছ, তাহাই জানিতে চাহি; তুমি গৃহে ও কর্ম্মক্ষেত্রে, ব্যবহারে ও কার্য্যে, প্রতিদিনের দৈনিক জীবনে যথার্থ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিতে পার কি না, তাহাই জানা আবশ্যিক; তদ্বারাই তোমার ধর্মের নিগূঢ় কথা বুঝিয়া লইতে পারিব।

ভবিষ্যতে ভক্তি, নীতি ও পরসেবাই ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে অধিক কথা বলাই নিম্প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে বিস্তর ধার্মিক লোক ধর্ম্মজীবনের ঐ তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অন্তরের পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, সরল ব্যবহার প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার পরই ধর্ম্মলাভার্থী সাধকের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভক্তির পরে হৃদয়ে মানবপ্রীতি ও পরসেবার ভাব জাগ্রত হয়।

বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক শুধুই নীতি এবং পরসেবাকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু প্রকৃত সাধকেরা তাঁহাদের মতের সঙ্গে একমত হইতে পারেন না। একজন নাস্তিকের জীবনও নৈতিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠে এবং তিনি পরসেবায়ও প্রবৃত্ত হন ; অথচ ঐ নাস্তিকের জীবনকে যথার্থ ধর্মজীবন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি না।

ভাবিয়া দেখিলে ভক্তিই ধর্মের সর্বোচ্চ ভাব। মানুষ যখন অন্তরের স্বাভাবিক ধর্মতৃষ্ণায় আকুল হইয়া গভীর উপাসনায় মগ্ন হয় ও ঈশ্বরকে অসীম সুন্দর রূপে উপলব্ধি করে, তখনই হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; এবং মানুষ ঈশ্বরকে জীবনের স্বামীরূপে বরণ করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মসমর্পণ করে। এই রকম অবস্থাকেই প্রকৃত ভক্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই হৃদয় পরিতৃপ্ত এবং মানবজন্ম সার্থক হইয়া যায়। যে ভাগ্যবান পুরুষ উক্তরূপ ভক্তির অধিকারী হন, তাঁহার চিত্ত সুনির্মল ও প্রাণ মানবপ্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অনেকের এ রকমও ধারণা আছে যে, ভক্তির সঙ্গে পরসেবার কোন সম্পর্ক নাই। বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক, তাঁহার কোমল মন নরনারীর দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না ; তাঁহার অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠে, তাঁহার মর্মস্থান প্রেমে পূর্ণ হইয়া যায় ; তিনি আপনার সুখস্বার্থ ভুলিয়া গিয়া নরনারীর দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন।

বস্তুতঃ ভক্তি, নীতি ও পরসেবাই ধর্মজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। বর্তমান সময়ে প্রকৃত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ উক্তরূপ ধর্মজীবন লাভ করিবার জঁঞ্জাই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। অতএব ভবিষ্যতে ভক্তি, নীতি ও সেবাসমর্ষিত ধর্মজীবনই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

## মিয়াকো ওদোরি

শ্রী দারুণ শীতের অবসানে শ্রামল উত্তরীয় উড়াইয়া পুষ্পাতরণে সজ্জিত হইয়া বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হিমক্লিষ্ট অসাড় ধরণী তাহার স্পর্শনে জাগ্রত

হইয়া উঠিতেছিল—রিক্ত শাখায় হরিৎ পত্র বিকশিত করিয়া পুষ্প মুঞ্জরিত করিয়া নরনারীর প্রাণে আনন্দের লহর তুলিয়া বসন্ত গাহিতেছিল—

“বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,  
তব অবগুষ্ঠিত কুষ্ঠিত জীবনে  
কোরো না বিড়ম্বিত তারে !”

সে গান শুনিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এপ্রেল মাসের প্রথম সপ্তাহ। এই সময়েই জাপান দেশে চেরি ফুলের মেলা। কেবল ফুল, কেবল ফুল, কেবল ফুল! কিওতো আসিয়াছিলাম। জাপানের প্রাচীন রাজধানী—বহু স্মৃতি-বিজড়িত—রূপসী রমণীর জন্ম প্রসিদ্ধ এই কিওতো শহর। আধুনিক সভ্যতার বহু মধ্যও কিওতো আপনার প্রাচীনত্ব বজায় রাখিয়াছে। লোকজন রাস্তায় চলিতেছে—তাহাদের মধ্যে ব্যস্ততা নাই, চাঞ্চল্য নাই—তাহারা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই চলিয়াছে—কিন্তু তাও যেন প্রাচীনের ভিড়ে পড়িয়া আধুনিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ধীর মন্থর গতিতে চলে—একবার দাঁড়াইলে আর সহজে চলিতে আরম্ভ করে না—এমনি ভাব। বিদ্যুৎ তাহার অদ্ভুত চাঞ্চল্য যেন এখানকার অথও অবসরের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে ! অপ্রশস্ত ধূলিধূসর পথ, বিশৃঙ্খল বিপণি-শ্রেণী, প্রাচীন দেবালয়, নদী পাহাড় প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া বেশ একখানি চিত্রের স্থায় এই শহর।

শহরের পূর্বভাগে কামো নদী। তাহারই তীরে একটি থিয়েটার। প্রতি বৎসর এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে এই থিয়েটারে মিয়াকো-ওদোরি নামক নৃত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্বসংখ্যক নর্তকী, যাহারা এই নৃত্য প্রদর্শন করে, তাহারা সকলেই এই পল্লীতেই বাস করে। দেহের সৌন্দর্য্যে তাহারা জাপানের সকল নর্তকীর সেরা—তাহাদের অন্তরও যে সৌন্দর্য্যরসে অবগাহন করিয়া আছে, তাহাদের প্রদর্শিত নৃত্যেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সন্ধ্যার সময় আমরা থিয়েটারে গিয়া পৌছিলাম। টিকিট কিনিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। সেখানে আরো অনেক লোক—নরনারী, তুলাভরা আসনের উপর

জাপানী প্রথায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সম্মুখে এক-একটি আঙনের বাক্স রাখিয়া হাত ভাতাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বের ঘরে আমাদের ডাক পড়িল। বিস্তীর্ণ কক্ষে মুখোমুখি করিয়া দুইসারি আসন পাতা। প্রত্যেকে এক-একখানি আসনে বসিলাম। কক্ষের একটি সুপ্রকাশ স্থানে চানোরু নামক বিশেষ জাপানী প্রথায় চা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম-সকল রক্ষিত। কিছুক্ষণ পরে এক তরুণী নর্তকী আবিভূত হইলেন এবং বিবিধ প্রকারে হস্ত সঞ্চালন করিয়া চা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। সকলে দুই হাতে মুখের কাছে

ঈষৎ বাদামি বর্ণের রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত এ তিতরকার ছাদ হইতে গোলাপী, বাদামি ও শ্বেত ব. ক্ষুদ্র পতাকা ও কৃত্রিম পুষ্প বিলম্বিত।

সাধারণত দিনে পাঁচবার নৃত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এক দল নর্তকী দিনে একবারের অধিক নৃত্য করে। প্রত্যেক বারে নূতন নূতন দল আসে। প্রত্যেক দল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। সামিসেন বাজাইয়া দশজন নর্তকী একত্রে গান করে—ইহারাই হইল ঠিকাতা বা গায়িকার দল। তার পর দশজন ঐক্যতান বাদিকার দল—ইহারাই বাঁশী, ক্ষুদ্রাকার ঢাক ও ডমরু বাজায়।

বাকি বত্রিশ জন নৃত্য করে। রঙ্গমঞ্চের উপর সর্বসুন্দর বায়ান্ন জন স্ত্রীলোক আবিভূত হইয়া

রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণে গায়িকার দল বসিয়া গান আরম্ভ করিল, বামে বাদিকার দল ঐক্যতান বাজাইতে লাগিল, মধ্য দিয়া নর্তকীর দল দর্শকের চোখে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিলিকু হানিয়া একের পশ্চাতে অঙ্গশ্রেণীবদ্ধ হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। মনে হইল যেন এক বিচিত্রবর্ণ সরীসৃপ আসিতেছে! অথবা যেন একটা বর্ণস্রোত রঙ্গমঞ্চের উপর বহিয়া আসিতেছে!



জাপানী চা-উৎসবে চা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম।

পেয়ালা তুলিয়া ধরিয়া তিন চুমুকে পানীয় নিঃশেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিলেন। বলিয়া রাখি, চা দিয়া এরূপে আপ্যায়িত করা হয় কেবল প্রথম শ্রেণীর দর্শকগণকে।

কোন নিগূঢ় কারণে সে রাত্রের তিস্ত জাপানী চা বিশ্বাস লাগিল না তাহা ঠিক বুঝি নাই।

এইবার সকলে নৃত্যের আসরে গিয়া বসিলাম। রঙ্গমঞ্চের তিন দিক শ্বেতবর্ণ সাটিনে আবরিত। রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে একটি দেবদারু বৃক্ষ, দক্ষিণে একগাছি বাঁশ ও বামে একটি “পাম” গাছ। খিলানটি স্বর্ণ, রক্ত ও

প্রায় একঘণ্টা সময় কেমন করিয়া কোথা দিয়া গেল বুঝিতে পারি নাই। সুখ দুঃখ প্রেম; বীরের দেশভক্তের দেশভক্তি ও আত্মবলিদান;—মানবমনের বিবিধ বিচিত্র ভাবলীলাকে নৃত্যে এমন করিয়া রূপদান করা যাইতে পারে এ অভিজ্ঞতা সেদিন প্রথম লাভ করিয়াছিলাম। আর বুঝিয়াছিলাম প্রকৃত নৃত্য উন্মাদের মত লক্ষবন্দ বা জীম্মাষ্টিক নয়—উহা কবিতা ও চিত্রের মতই একটি ললিতকলা—বিখনৃত্যের সৌন্দর্য এবং বিশ্বের গতি বা প্রাণের আনন্দ ও বেদনা প্রকাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। চরম সার্থকতা।



জাপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল



জাপানী নর্তকীর নৃত্যভঙ্গী ।





আপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল।



আপানী নর্তকীর নৃত্যভঙ্গী।

নৃত্যবর্ণিত কথকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করি—“নব-বর্ষের ভূষার,” “রাজসভাসদের পুষ্পচয়ন,” “ফুশিমি হুর্গের মধ্যে পুষ্পবিকাশ,” “নদীতীরে জোনাকি-ধরা,” “চন্দ্রালোকে মন্দির,” “পর্কতে মেপল বৃক্ষ,” “সম্রাজ্ঞীর দরবারে ভূষার-দৃশ্য,” “নদীর তীরে চেরি পুষ্প,” “নদীতীরে শরতের পাতা ঝরা” ইত্যাদি। বিষয় অনুসারে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন করা হয়।

প্রত্যেকটি নৃত্য এক-একটি কবিতার মত। কবিতায় আমরা যেমন কোনো একটি বিশেষ ভাবকে বা ঘটনাকে সরস সুমধুর কথার সাহায্যে মলিত ছন্দে প্রকাশ করি, এ-সব নৃত্যেও তেমনি এক-একটি ভাব বা ঘটনাকে বিচিত্র লীলায়িত ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। আবার এ নৃত্যকে চিত্র বলিলেও ভুল হয় না—এ নৃত্য রঙের খেলাতেও দর্শকের প্রাণ রঙাইয়া তোলে।

প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করিতে করিতে, অভ্যস্ত কর্ম ও অভ্যস্ত আলাপে মগ্ন হইয়া বিশ্বাসগরের তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে যে বহুবিচিত্র ভাবরাশি উছলিয়া পড়িতেছে তাহার দিকে আমরা দৃকপাতও করি না। দেখি কেবল লোকজন গাড়ি ঘোড়া—শুনি কেবল একঘেয়ে কর্ম-কোলাহল—ভাবি কেবল অন্নচিন্তা। সহসা একদিন প্রতিভাবান কবির কবিতা পড়িয়া, শিল্পীর চিত্র দেখিয়া, ওস্তাদের সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শুনিয়া বা নর্তকীর নৃত্য দেখিয়া মনে পড়িয়া যায়, বিশ্বে কেবল ইট চুন সুরকি প্রধান হইয়া নাই, বুদ্ধিতে পারি যে, সকল তুচ্ছতা কদর্যতার উপর বিশ্বের অসীম অধঃ সৌন্দর্য ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এ কথা এক মহুর্কের জন্য বুঝিও পারাতেও আমাদের পরম লাভ—মহৎ সাধনা।

তাই বহুদিন পূর্বে একদা বসন্তের জন্মলগ্নে রঙ্গকালের দেখা সেই অপরূপ নৃত্যের কথা কিছুতেই ভুলিবার নহে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চিকিৎসা

( গল্প )

“নমস্কার মশায়, আপনি অমন ভাবে বসে আছেন কেন?”

আমি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া ছিলাম। বাতের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে একজন ভদ্রলোক আমার কামরায় প্রবেশ করিয়া উক্ত কথা বলিলেন।—লোকটি আমার অপরিচিত।

আমি কষ্টে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলাম, “আরু মশায়, বাতের জ্বালায় গেলাম। প্রাণ ওষ্ঠাগত!”

ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বটে, আপনি বাতে ভুগছেন? কোথা থেকে আসছেন?”

“আজ্ঞে এই সিমলের চাকরী করতুম, সম্প্রতি ফাল্গুনী নিয়ে দেশে যাচ্ছি। চিকিৎসার ত’ ক্রটি করিনি কিন্তু এ পোড়া রোগ ত কিছুতেই সারতে চায় না। এবার ছুটি নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে একবার শেষ চেষ্টা বেয়ে ছেয়ে দেখি!”

“বটে, আপনি চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল পাননি? তা,—না,—থাক!”

“আজ্ঞে?—”

“না না, আমি বলছিলাম বাতের চিকিৎসা করা আমার অভ্যাস আছে, তা আপনি বিশ্বাস ক’রে আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন কি?”

আমি সাগ্রহে বলিলাম,—“বিলক্ষণ, এওকি আবার একটা কথা? তা আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করতে হ’লে কি ধরচ পড়বে?”

“হ্যাঁ, তা আপনার ব্যথাটা কোথায় বলুন দেখি!”

“এই—এই—এই হাঁটুতে, গোড়ালিতে আর এই—পিঠের শিরদাঁড়ায়।”

“হঁ, কোথায় বললেন? পায়ের গোড়ালিতে? ও! মশায় সে কথা আর বলবেন না, আমি কি ওতে কম ভোগানটা ভুগেছি! যাক তারপর হাঁটুতে না? এই—এই এইধানটার? নাকি, এ-এ-এইধামে!”

“উঃ উঃ উঃ—হ্যা—হ্যা, ঐ—ঐখানটায় !”

“আর কোথায় বললেন এই পিঠের শিরদাঁড়ায়, বটে ? আচ্ছা দেখি”—তিনি আমার পিঠ টিপিতে টিপিতে বলিলেন—“এই—এই—এইখানটায় কি ?”

আমি বলিলাম,—“উঁ হঁ, আর একটু—আর—আর—হ্যা ঐখানটায় !”

“হঁ, এ ত’ অতি সহজে আরাম হ’য়ে যাবে।”

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“অতি সহজে সেরে যাবে ?—অ্যা ? বলেন কি মশায় ? তা কত খরচ পড়বে ?”

“হঁ, এ অতি—অতি সহজ রোগ !”

“তা খরচটা কি রকম পড়বে ?”

“—আর অতি অল্প সময়েই আরাম হ’য়ে যাবে !”

“কিন্তু—”

“হ্যা, সবাই বাত রোগটাকে সারাতে পারে না—অর্থাৎ সবাই বাতের চিকিৎসাটা ভাল জানে না। আমিই কি আগে জানতুম না কি ? ওঃ কত জায়গায় গিয়ে যে এ রোগটার চিকিৎসা শিখেছি তা আর বলতে পারিনা !”

“তা আমার চিকিৎসাটা করুন না।”

“তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তার আগে একবার ভাল ক’রে পরীক্ষা ক’রে দেখতে হবে।”

“তা দেখুন না আমার তাত্তে আপত্তি নেই, তবে খরচটা কি রকম পড়বে বললেন না ত ?

“ওঃ খরচের কথা বলচেন ? তা এতে আপনার এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।”

আমি সাগ্রহে উৎসাহের সহিত বলিলাম,—“বলেন কি মশায়—অ্যা ? এক পয়সাও খরচ হবে না ? তার মানে ?”

হাস্ত করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—“তার মানে টানে কিছু নেই, এ আমার সখের চিকিৎসা।”

“তবে আপনি পরীক্ষা করবেন বলছিলেন তা এখনি করুন না, গাড়ীতে ত’ আর কেউ নেই, আপনি আর আমি।”

“বেশ, আমি রাজি আছি, আপনি জুতোটা খুলুন।”

আমি তাহাই করিলাম। তিনি গভীর মুখে ধ্বংস

ধরিয়া আমার বাত পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আপনি বলেন ত’ আমি চিকিৎসা আরম্ভ করে দি। কলকাতায় পৌঁছবার আগেই আমার কাজ হ’য়ে যাবে।”

“বেশ ত, আরম্ভ করে দিন না।”

তিনি উঠিয়া গাড়ীর জানালা দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর গভীর মুখে বলিলেন,—“বেশ এইবার আপনি একে একে সব জামাগুলো খুলে ফেলুন।”

আমি তাহাই করিলাম।

তখন শীত কাল। দারুণ শীতে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু সেদিকে নজর না করিয়া আমার একখানি কাপড় লইয়া অনতিবিলম্বে সেখানি সিক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমার গায়ে সেই সিক্ত বস্ত্রটি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন।

তারপর আমার স্তূপীকৃত বিছানার বস্ত্রা খুলিয়া বলিলেন,—“এইতে শুয়ে পড়ুন।”

নির্বাকভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।

“আচ্ছা, বেশ, এইবার আপনাকে বিছানা চাপা থাকতে হবে। কিছু ভয় নেই, ঘণ্টা দু’য়েক, তার পর আপনার রোগ সেরে যাবে।”

তিনি আমায় বিছানার সম্বন্ধে উত্তমরূপে বাঁধিলেন। গাড়ী তখন পূর্ণ বেগে ছুটিয়াছে।

“আচ্ছা, এইবার হাঁ করুন দেখি !”

আমি তাঁহার আদেশ-মত কার্য করিলাম। তিনি আমার গেম্ব্রিটা ভাল পাকাইয়া আমার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন।

“এই থাকুন, আর চেঁচাতে পারবেন না। আচ্ছা আমি এদিকের কাজটা সেরে নিই।”

তিনি আমার জামার পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিলেন।

“অ্যা ! জাতও গেল পেটও ভরল না ! মোটে পঁচিশ টাকা ! আপনি সিমলয় কাজ করতেন বলেন না। আচ্ছা তোরগটা দেখি।”

জামার পকেট খুঁজিতে খুঁজিতে আমার তোরঙ্গর চাবি বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষিপ্ত হস্তে বাস্ত্র খুলিয়া

টাকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্নায়াসেই আমার পথের সম্বল ২৫০ টাকা বাহির হইয়া পড়িল।

“এই এক্ষণে তবু কিছু পাওয়া গেল। আচ্ছা রমুন, আপনি বোধ হয় নোটের নম্বরগুলো টুকে রেখেছেন। আচ্ছা দেখচি।”

তাড়াতাড়ি তিনি আমার বুক-পকেট হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন। তাহার কয়েকখানি পাতা উন্টাইয়া বলিলেন,—“এই যে পেয়েছি! বা! ঘড়ির নম্বরটাও টোকা রয়েছে যে! বেশ, বেশ!

তিনি পাতাখানি ছিঁড়িয়া দেশলাই জ্বালিয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দারুণ শীতে ভিজা কাপড় গায়ে দিয়াও আমার সর্ব্বদ্বন্দ্ব ঘামে ভিজিয়া গেল।

লোকটা আমার বাক্স খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া জামার পকেটে চাবিটা রাখিয়া দিল। তাহার পর নোট-গুলি ও সোনার ঘড়ি ঘড়ির-চেনটা পকেটে রাখিয়া বলিল,—“দেখুন, আমার চিকিৎসা শেষ হয়েছে। এখন আমি পরের ষ্টেশনেই নেবে যাব। আপনি এখন নিশ্চিত হয়ে বিছানার বাণ্ডিলের মধ্যে ঘুমুন;—হাওড়া না পৌঁছলে আর আপনার মুক্তির আশা নেই। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার ইচ্ছা-মতই কাজ করেছি। দেখুন, চিকিৎসা করবার আগেই আপনি বার বার ক’রে কত ধরচ পড়বে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন আমার ইচ্ছা ছিল অমনই আপনার চিকিৎসা করব। কিন্তু এখন আমার মনের ভাব বদলে গেছে। তাই আমার এই অমূল্য চিকিৎসার পরিবর্তে আমি আপনার ২৭৫ টাকা নিয়ে চললুম। বরুন, ঠিক আপনি যেমনটা চেয়েছিলেন আমি ঠিক তেমনই করেছি। যাক ঐ ষ্টেশন এল, এই বেলা আপনাকে ভাল ক’রে চাপা দিয়ে নি।” —এই বলিয়া লোকটা আমার জামাগুলি লইয়া মাথা ও পায়ের দিকে উত্তমরূপে গুঁজিয়া দিল। আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। এমন সময়ে রেলওয়ে কুলি হাঁকিল—“বাণ্ডিল! বাণ্ডিল!”

পাড়ী থামিতেই আমি দরজা খোলার শব্দ পাইলাম, বুঝিলাম জুয়াচোর ডাক্তার নামিয়া যাইতেছে! আমার শরীর ভয়ে হিম হইয়া আসিল।

ক্রমে বাহিরের অস্তিত্ব আমার নিকট লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রীণ হইতে ক্রীণতর হইয়া ক্রমে তাহা একেবারে থামিয়া গেল। আমার সংজ্ঞা লোপ পাইল!

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম একজন হিন্দুস্থানী কুলি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহার সহকর্মী-দিগকে বলিতেছে,—“আরে ভেইয়া, ইয়ে কেয়া হায়! কিস্ মাফিক্ ইস্কা হাল হৈ দেখো!

সাগ্রহে আমার চতুর্দিকে কুলির দল আগিয়া দাঁড়াইল। আমার সারা অঙ্গে দারুণ বেদনা হইয়াছিল। আমি কষ্টে বলিলাম,—“খোড়া পানি ভেইয়া।”

তাহাদিগের মধ্যে একজন লোটা ভরিয়া এতলোটা জল আনিয়া দিল। আমি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। কাতর কণ্ঠে আবার বলিলাম,—“মুমে খোড়া ঢাল দেও, হামারা হাল একদম আচ্ছা নেই!”

একজন দয়া করিয়া অল্পে অল্পে আমার মুখে জল ঢালিয়া দিল। আমি তৃপ্ত প্রাণ শীতল করিয়া কঁতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম।

কুলির দল আমায় ধরিয়া ধরিয়া সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল কিন্তু তখন আমার অবস্থা এরূপ নহে যে তাহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তি করি।

তাহারা আমাকে অবশেষে রেলওয়ে পুলিশের নিকট উপস্থিত করিল। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সে স্থানে প্রায় তিন চারি দিন থাকিবার পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আশ্চর্যের বিষয় আমার দারুণ বাতের ব্যথা একেবারে অদৃশ হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## হিন্দু-বিবাহে পাত্রী নির্বাচন

সকলকেই জীবনে অন্ততঃ একবারও কাহারও না কাহারও কনে দেখিতে যাইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা দেখেন কি? মেয়েটির রঙ, কাল না ফর্সা, চোখ ছোট না বড়, নাক উচা না বসা ইত্যাদি। বড় জোর কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন মেয়ে পড়িতে জানে কি না এবং হয় ত মেয়ের জেঠা শুনাইয়া দিলেন যে, মেয়েটি গৃহস্থালীর কাজ কর্তৃক শিখিয়াছে। কনে পছন্দ হইবার পর টাকার চুক্তিটা ঠিক হইয়া গেলেই বিবাহ ধার্য হইয়া গেল।

কিন্তু বাস্তবিকই কি অত সহজে পাত্রী নির্বাচন সুসম্পন্ন হইতে পারে? হিন্দুবিবাহে ডাইভোর্স নাই, হিন্দুবিবাহে কোর্টশিপ নাই, কাজেই পাত্রীনির্বাচন করিবার সময় অনেক বিবেচনা করা আবশ্যিক। প্রথমে দেখিতে হইবে পাত্রীর চরিত্র, তার পর তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সর্বশেষে তাহার রূপ। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কেমন করিয়া একটি ক্ষুদ্র অপরিচিতা বালিকার চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির নির্ণয় হইবে? নান্য উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। মানুষের চরিত্র ও বুদ্ধির নিদর্শন তাহার মুখের আকৃতিতে বর্তমান থাকে। প্রত্যেকের উচিত মুখ দেখিয়া লোকের স্বভাব নির্ণয় করিতে শিক্ষা করা। কাহারও উজ্জ্বল চক্ষুর মধ্যে বুদ্ধির জ্যোতি দেখা যায়, কাহারও চক্ষুর ভিতর দিয়া স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি উঁকি মারে, কাহারও চাহনি ও অধর দেখিলেই চরিত্রহীনতার সন্দেহ হয়, কাহারও উন্নত ক্রমুগল, প্রশস্ত ললাট ও অধরোষ্ঠের গঠন দেখিলেই চিন্তাশীলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ভূয়োদর্শন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে মুখ দেখিয়া লোক ঠিক করিতে পারেন, তাঁহার মত লোককেই কনে দেখিতে পাঠাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আর এক উপায়, আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে পাত্রীর সম্বন্ধে খবর লওয়া। অবশ্য খবরগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, কেননা অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে খবর দিবে না। তবে পাত্রীর সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের মত জানিতে পারিলে একটা

সামঞ্জস্য করা যায়। আর এক কথা, অপরিচিতা কন্যা অপেক্ষা পরিচিতা কন্যা নির্বাচন অনেক সহজ। তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীর যে হাস্যমুখী মেয়েটিকে সুশীলা ও বুদ্ধিমতী বলিয়া জান, অপরিচিতা রূপবতী ধনীকন্যা ত্যাগ করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিও, তোমার গৃহস্থজীবন সুখের হইবে।

তৃতীয় হইতেছে পাত্রীর পিতা, ভ্রাতা ও মাতুলগণ কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা অবধারণ করা। পাত্রীর কতকগুলি গুণ বংশানুক্রমিক এবং অপর কতকগুলি যে-সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই তাহার পুরুষ আত্মীয়গণের পরিচয় পাইলেই, তাহার নিজের পরিচয় কতকটা ঠিক করা যায়। যে বাড়ীর পুরুষেরা মুর্থ ও কুচরিত্র সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া, যে বাড়ীর পুরুষেরা সচ্চরিত্র ও বিদ্বান্ সেই বাড়ী হইতে কন্যা আনিবে।

এখন কন্যার রূপ সম্বন্ধে কথা। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Health is beauty, স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। বাস্তবিক স্বাস্থ্যই রূপের প্রধান অবলম্বন। নীরোগ শরীর ও প্রফুল্ল মনের জুগ্ম যে অঙ্গের লাবণ্য তাহা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহার অধিক রূপ থাকিলে ভাল, না থাকিলেও কোনও ক্ষতি নাই। আর আগেই যেমন বলিয়াছি যে, মনের সমৃদ্ধিগুলির নিদর্শন মুখে বিকাশ পাইয়া যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে—কেবল চক্ষুর বিস্মৃতি ও নাগিকার উচ্চতার উপর যে সৌন্দর্য নির্ভর করে না, সেই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিবার উপযুক্ত শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যিক। বুদ্ধিমত্রে তাঁহার বিষয়বস্তু ও রুক্ষকাস্তুর উইলে রূপজ মোহ ও গুণজ প্রেমের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীর রূপ অপেক্ষা গুণের মূল্য কত অধিক। \*

\* আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিয়া প্রায় এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বরণের উৎসাহে একটা উচ্চহৃদয়া বালিকার জীবনবিসর্জনের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়া প্রবন্ধটি অবিলম্বে প্রকাশিত করিলাম। এই পাত্রীটির সহিত যাহারা সম্বন্ধ স্থির করিতেছিল, তাহারা কি নির্বোধ! ভ্রলোককে কষ্ট দিয়া সামান্য দু'এক হাজার টাকা আদায় করিতেই তাহারা ব্যস্ত হইল, কিন্তু এরূপ তেজস্বিনী বালিকা যে বাস্তবিকই একটা রমণীরূপ তাহা তাহারা বিশ্বস্ত হইল। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান হইলে ইনি স্বার্থত্যাগী বীরপুরুষের অননী হইতে পারিতেন।—প্রবন্ধ-লেখক

তার পর পাত্রীর শিক্ষার কথা। শুধু পড়িতে জানিলেই ত আর শিক্ষা হইল না। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছি মিশনরীর বিদ্যালয়ের উপর—সেখানে মেয়েরা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও গৌরবের কথা কিছুই শেখে না, বরং প্রতিদিন “ধুষ্টের রক্তে পরিষ্কাণ হয়,” “আমি বাইবেল ভালবাসি”, প্রভৃতি মুখস্থ করিতে থাকে। আবার অন্য বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পড়াইতে খরচ আছে, কাজেই অনেকে দারিদ্র্যবশতঃ তাহা পারিয়া উঠেন না। অনেকে এমনও মনে করেন যে, মেয়ের বিয়েতে যখন এক কাঁড়ি টাকা লাগিবেই তখন তাহার শিক্ষার জন্য উপরন্তু খরচ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, আজ-কালকার বরেরা সুশিক্ষিতা কন্যাকে অল্প টাকায় বিবাহ করিতে সম্মত হইবে; কাজেই শুধু টাকার দিক দিয়া বিচার করিলেও মেয়ের শিক্ষার খরচটা অপব্যয় নহে।

কিছুপ শিক্ষা বাঙালীর মেয়ের পক্ষে উপযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে মোটামুটি ভাবে এই বলা যাইতে পারে যে, স্কুলে ও বাড়ীতে মেয়েকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে বিবাহের পর সে আদর্শ গৃহিণী হইতে পারে—এক দিকে স্বামী ও অন্যান্য পরিজনদের সেবা ও সাহচর্য্য করিতে পারে, অপর দিকে সম্মানগণকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে লালনপালন করিতে ও শিক্ষিত করিতে পারে। তজ্জন্য তাহাকে কোনও প্রবীণা মহিলার নিকট গৃহস্থালীর কাজকর্ম সুচারুরূপে শিখিতে হইবে, অভিভাবকের নিকট বা পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সাহায্যে বর্তমান কালে যুবকগণের চিন্তাপ্রবাহ কোন প্রণালীতে বহিতেছে তাহার সন্ধান জানিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিশুশিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে সহজ সহজ পুস্তক পড়িতে হইবে এবং সর্বোপরি পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও ত্রুতপরিপালন দ্বারা ধর্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। এরূপ সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিতে অনেক শিক্ষিত বর উৎসুক হইবে সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় হিন্দুদিগের মধ্যে খুব কম লোকই জ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন বা তাহার জন্য কোনও ব্যবস্থা করেন। উপযুক্ত

পুস্তক প্রণয়ন ও আদর্শ-জীবনবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির সম্মত হওয়া অবশ্যকর্তব্য।

পাত্রী পরীক্ষার পর পাত্রীর বংশপরিচয় লওয়া আবশ্যক। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থাটা মোটামুটি গ্রহণ করা যায়। যাহাদের বংশে উন্নাদ, মূর্ছা প্রভৃতি বংশাত্মক ব্যাধি আছে, যে বংশ নিবোধ ও অধাৰ্মিক, এরূপ বংশ ধনী হইলেও তাহাকে বিবাহ বিষয়ে বর্জন করিতে হইবে। যে বংশে অনেক পণ্ডিত ও ধাৰ্মিক ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, বিবাহে সেই বংশই প্রশস্ত, সেই বংশই কুলীন;—কেবল কুলগ্রন্থ দেখিয়া কৌলীন্য বিচার করা বড়ই ভ্রান্তি। পূর্বে কুললক্ষণ নয়টি ছিল, তাহার পর সেই আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি কিছু না দেখিয়া কেবলমাত্র বৈবাহিক আদান প্রদান দেখিয়াই যে কুল নির্ণীত হইতেছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর মেলবন্ধনের নাগপাশ হইতে ব্রাহ্মণসমাজ যে কতদিনে মুক্তিলাভ করিবেন তাহা ভগবানই জানেন।

শেষ কথা—কন্টার যৌতুক। যৌতুকগ্রহণ “মাত্রেই অন্তায় এমন বলা যায় না—যখন হিন্দু-আইনে পুত্র-বর্তমানে কন্যা পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, তখন বিবাহের সময় কন্যাকে কিছু অর্থ দেওয়া পিতার উচিত বলিয়াই মনে হয়। তবে যাহারা দরিদ্র ব্যক্তিকে নির্যাতন করিয়া বরের পণ আদায় করে তাহারা যে নীচাশয় লোক যে বিষয়ে” সন্দেহ নাই। এই বরপণের অভ্যাসের রহিত করিবার জন্য কেবল এই প্রথার নিন্দাবাদ করিলে কোনও বিশেষ ফল হইবে না—একটু নিন্দার ভয়ে লোকের টাকার লোভ ছাড়িবে কেন? ইহার একমাত্র প্রতিকার পাত্রীনির্বাচনের প্রকৃত নিয়মগুলি সাধারণের মধ্যে সুপরিচিত করা। মনে করুন একজন ভাল পাত্রের বিবাহের জন্য দশটি পাত্রীর কথা আসিল। এখন তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে নির্বাচন করিবে? কয়জন পাত্রের পিতা বুঝেনওয়ে, পাত্রীর শারীরিক মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী দেখা কর্তব্য, পাত্রীর শিক্ষা ও তাহার বংশপরিচয় জানা আবশ্যক? ভারী সম্মানের গুণাবলী কিরূপ হইবে

তাহার উপর বংশক্রমের কতদূর প্রভাব রহিয়াছে তাহা কয়জন জানেন ? কয়জনের ধারণা আছে যে, উত্তর কালে তাহার বংশে প্রতিভাবান্-সন্তান জন্মিবে কিম্বা অপদার্থ সন্তান জন্মিবে তাহা এই কণ্ঠার ও কণ্ঠার বংশের গুণ-গুণের উপর আংশিক ভাবে নির্ভর করিতেছে ? এ-সকল কথা তাহারা যদি বুঝিতেন তাহা হইলে কিছু টাকার খাতিরে নির্বোধ বা কুচরিত্র ব্যক্তির কণ্ঠা গ্রহণ না করিয়া দরিদ্র হইলেও বুদ্ধিমান্ ও সচরিত্র গুণলোকের কণ্ঠার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এইজন্য আধুনিক Eugenics বা বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।\*

পরিশেষে পাত্রীনির্বাচনের আর একটা অসুবিধার উল্লেখ করিব। বর্তমান কালে বাংলার কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি জাতিগুলি এত উপজাতিতে (subcastes) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক-একটা উপজাতি সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। একটা উপজাতিকে তাহার নিজের মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়, এজন্য অনেক স্থলে উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। আবার কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর রক্তসম্বন্ধ নিকট হইয়া পড়ে, মমুর নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। এই-সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য সকল হিন্দুরই কর্তব্য এই উপজাতিগুলিকে বিবাহ দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট করা। ইহা দ্বারা সমাজের যে মহা উপকার হইবে বংশোৎকর্ষবিজ্ঞান তাহা প্রতিপাদিত করিতেছে। প্রকাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই সংস্কারকার্যে অগ্রণী হইয়া উন্নতিকামী হিন্দুসমাজেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বারাস্তরে পাত্রীনির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## অরণ্যবাস

[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি. এ. পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে কখনো জড়িত হওয়ার কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্কতা বনভূম গ্রাম জয় করেন ও সেইখানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। পুত্রলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বঙ্গ সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্যসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রকার সহিত ভূস্বামিকারীর ঘনিষ্ঠতা বন্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুমোদন করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বঙ্গ সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ কারবেন দ্বির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্বাদ করিলে, দুই বঙ্গুর মধ্যে কন্যাদানের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুমোদনে ক্ষেত্রনাথ তাহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুত্রলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার আসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বনভূমে একটি পাঠশালা ও পোস্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্ত্তে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন স্বল্প করিলেন। ]

### ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তৎপরে পিতার দুর্ব্বলতার সময়ে সে তাহার সহকারী রূপে তাহার দোকানে বসিত। ক্ষেত্রনাথ নগেন্দ্রকে আরও উচ্চশিক্ষা দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নে সে অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথাপি অল্পসময় মত গৃহে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে তিনি শিপিং-যত্ন করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলিতে পারিত এবং সহজ ধরণের ইংরেজী চিঠিপত্রও লিখিতে পারিত। নগেন্দ্র কার্যদক্ষ ও পরিশ্রমী এবং তাহার স্বভাবও পবিত্র ছিল। সকলের সঙ্গে সে মিলিতে মিশিতে পারিত এবং সেইজন্য অল্পদিনের মধ্যে বনভূমে সর্ব-জনপ্রিয় হইয়াছিল।

\* বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞানের মোট কথামূলক ১৩১৮ সালের বৈশাখের প্রকাশিত "সমাজতত্ত্বের এক অধ্যায়" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রনাথের অবস্থা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে, তিনি নগেন্দ্রকে আরও কিছুদিন স্থলে ও কলেজে পড়াইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে নগেন্দ্রই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। নগেন্দ্র না থাকিলে, তিনি কৃষিকর্মাদি কিছুই একাকী চালাইতে পাবেন না। এই-সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি নগেন্দ্রকে সহকারী রূপে আপনার কাছেই রাখা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে তাহার মনের এবং চিত্তের কর্ষণ হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অমনোযোগী ছিলেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নগেন্দ্র পিতার কাছে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত। ক্ষেত্রবাবু একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন; তাহাও সে পড়িত। এক্ষণে অমরনাথ বল্লভপুরে আসায়, সে তাহার সহিত একত্র পুস্তক পাঠ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইল। উভয়েই অবসর মত বিদ্যার চর্চা করিত।

এই প্রথম বৎসরে, ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র উভয়কেই কৃষিকৌশল অবগত হইবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অতঃপর আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে না। কেবলমাত্র সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিলেই, অল্প পরিশ্রমে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে; কেবল মধ্যে মধ্যে নগেন্দ্রের সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ স্থলে, অল্প কোনও কার্য্য করিবার জন্ত নগেন্দ্রের অবসর থাকিবার সম্ভাবনা।

নগেন্দ্র বল্লভপুরে কোনও একটা কারবার খুলিবার জন্ত জননীকে অনেক বার বলিয়াছে। কিন্তু সেদিন ব্যতীত আর কোনও দিন মনোরমী স্বামীর নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সুযোগ না পাইলেও, ক্ষেত্রনাথ যে কৃষিবিষয়ে কোনও চিন্তা করেন নাই, তাহা নহে। ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু কি কারবার করিলে সুবিধা হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ভূমিতে উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্যসমূহ বিক্রয় করার আবশ্যকতা বৃদ্ধিতে পারিয়া, তিনি মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিলেন। এ দেশের প্রজাবর্গ তাহাদের অতিরিক্ত

শস্যাদি নিজ নিজ গোয়ানে ও শকটে বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যায় এবং সেখানকার আড়তে তাহা বাজার-দরে বিক্রয় করে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের পক্ষে তক্রম করা তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই কারণে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি অতিরিক্ত শস্যগুলি একটা গুদামে রক্ষা করিয়া পরে উচ্চদরে তৎসমুদায় বিক্রয় করিবেন। তদনুসারে তিনি সাহেবদের পরিত্যক্ত গুদাম-ঘর ও বাবুচ্চিখানা প্রভৃতির সংস্কার করাইলেন। আশ্চাবলটি পাঠশালার জন্ত ও খানসামাদের থাকিবার ঘরটি ডাকঘরের জন্ত নির্দিষ্ট হইল।

এই প্রদেশের ব্যবসায়ীরা এবং কলিকাতার মহাজনেরাও সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকগণের নিকট শস্য ক্রয় করেন। ক্ষেত্রনাথের গুদামে শস্য সঞ্চিত আছে, ইহা জানিলে তাঁহারাও তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবেন। এই উপায়ে শস্য-বিক্রয় হইতে পারে বটে; কিন্তু তদ্বারা কোনও ফারবারের সুবিধা হইবে না।

কারবার চালাইতে হইলে, বল্লভপুরে একটা আড়ত খুলিতে হয়। কিন্তু বল্লভপুরে কোনও গঞ্জ বা বাজার না বসাইলে, আড়ত কিরূপে চলিবে? লোফে বিক্রয়ের জন্ত কেন বল্লভপুরে শস্য বহন করিয়া আনিবে? বল্লভপুরে ক্রেতা না থাকিলে আড়ত স্থাপন করা ব্যর্থ হইবে। বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে ইছাকোণা গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসে। অনেকে সেই হাটে শস্য বিক্রয় করিতে যায়। বল্লভপুরে যদি একটা হাট স্থাপন করা যায়, এবং সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তাহা বসে, তাহা হইলে এখানেও বহু লোকের সমাগম ও বহু শস্যের আমদানী হইবে। তখন আড়ত খুলিলে, তাহা চলিতে পারে, এবং এই প্রদেশের লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিলে, একটা দোকানও চলিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বাটার সম্মুখবর্তী বৃহৎ মাঠে একটা হাট বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে এক দিন গ্রামের প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন “আমাদের গ্রামে অনেক অভাব আছে। গ্রামে একটা পাঠশালা ছিল।



না; তা আমি স্থাপন করুণাম। ডাকঘর' নাই; যাতে  
শাপ একটা ডাকঘর হয়, তা'রও চেষ্টা' করছি।' তারপর  
আমাদের গ্রামে কোঁনও হাট' নাই। কিনিষ-পত্র ও মাল  
বিক্রয় করুতে হ'লে, তোমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে, কিম্বা  
ইছাকোণার হাটে তা ব'য়ে নিয়ে যাও। বর্ষাকালে  
কালী নদীতে বান হ'লে, তোমরা ষ্টেশনেও যেতে পার  
না; তখন ইছাকোণার হাটে যেতে হয়। কিন্তু  
ইছাকোণা'যাবার পথও বড় দুর্গম। এই-সমস্ত কারণে  
আমার মনে হয়, এই বনভপুরে যদি একটা হাট স্থাপন  
করা যায়, তা হ'লে সকলেরই বিলক্ষণ সুবিধা হ'বে  
পারে। এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি, তা, আমি  
জানতে চাই।”

জ্ঞানার্গ হাট স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয়  
আনন্দিত হইল। তাহারা বলিল, বনভপুরে একটা হাট  
হইলে, শুধু বনভপুর গ্রামের কেন, নিকটবর্তী অনেক  
গ্রামের লোকের বিশেষ সুবিধা হইবে কিন্তু হাট কোন্  
স্থানে বসিবে ?

ঐশ্বরের উত্তরে, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে কাছারী-বাড়ীর  
সম্মুখবর্তী বৃহৎ মাঠটি দেখাইলেন। সকলেই আহ্লাদ-  
সহকারে সেই স্থানটি অনুমোদন করিল, কিন্তু বলিল যে  
হাটের জন্ত অনেক ছোট ছোট চালাঘর প্রস্তুত করিতে  
হইবে। কেননা, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় এবং বর্ষা-  
কালে বৃষ্টির সময় লোকের আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “পাহাড়ের ও জঙ্গলের কাঠ, বাঁশ,  
উলুখড় দিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমরা সকলে যদি  
সেই-সমস্ত কেটে এনে ঘর বাঁধতে সাহায্য কর, তা হ'লে  
অনায়াসেই চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর প্রস্তুত হ'য়ে যাবে। কিন্তু  
তোমরা সাহায্য না করলে, আমি একাকী এত ঘর  
বাঁধতে পারব না।”

মণ্ডলেরা একবাক্যে বলিল যে, কাঠ, বাঁশ ও উলুখড়  
পাইলে, তাহারা, পরিশ্রম করিয়া ঘর বাঁধিয়া দিবে।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আগামী ১৫ই ফাল্গুন তারিখে  
আমাদের গ্রামে একটা শুভ বিবাহ হবে, তা তোমরা  
অনেকে জ্ঞানে থাকবে। ভট্টাচার্য্য মশায়ের কণ্ঠা  
সৌদামিনীর সহিত আমার বন্ধু পুরুলিয়ার ডেপুটী

সতীশবাবুর বিবাহ হবে। এই বিবাহটি হ'লে, আমাদের  
সকলেরই পরম সৌভাগ্য। এখানে ডেপুটী বাবুর যশুর-  
বাড়ী হ'লে, এই গ্রামের ক্রমশঃ অনেক উন্নতি হবে।  
এই বিবাহটি হ'য়ে গেলে, তোমরা হাটের জন্ত ঘর প্রস্তুত  
করবার উদ্যোগ করবে। উপস্থিত, এই বিবাহের সময়,  
কলকাতা থেকে কয়েক জন ভদ্রলোক আসবেন।  
কিন্তু আমাদের গ্রামের রাস্তা ঘাট বড় খারাপ। তোমরা  
সকলে মিলে যদি রাস্তাটি একটু মেরামত করুতে পার,  
তা হ'লে ভাল হয়।”

লুটন সর্দার বলিল, সরকার বাহাদুর রাস্তা মেরামত  
করিবার ছকুম দিয়াছেন। পুরুলিয়া হইতে ওভারসিয়ার  
বাবু আসিয়া রাস্তা মাপিয়া গিয়াছেন, আর রাস্তার ধারে  
ধারে কাঁকর পাথর ফেলাইতেছেন। গ্রামের অনেক প্রজা  
আজ দুই তিন দিন হইতে কাঁকর পাথর বহিয়া মজুরী  
লইতেছে। সেই বাবুটি বলিল যে, ডেপুটী কমিশনার  
সাহেব রাস্তা মেরামত করিতে ছকুম দিয়াছেন।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তবে ভালই হয়েছে।  
তোমাদের আর কষ্ট করুতে হবে না।”

এইরূপ কথাবার্তার পর সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।  
ডেপুটী বাবুর সহিত সৌদার বিবাহ হইতেছে, ইহা শুনিয়া  
সকলেই আনন্দিত হইল এবং সেই সন্ধ্যাে কথাবার্তা  
কহিতে কহিতে গৃহে গমন করিল।

### চতুর্দ্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুরের প্রাচীর রান্নাঘর ও পায়খানার  
চুন বালির কাজ বাকী ছিল। রাজমিস্ত্রীদিগকে এখন  
সেই কাজে লাগাইলেন। তিনি অপরাহ্নে তাহাদের  
কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নগেন্দ্র  
আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবী-পোষাক-পর্য্য  
একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাইকেলে আসিয়া তাঁহার  
সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। ক্ষেত্রনাথ তৎক্ষণাৎ  
বাহিরে আসিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে সাদর সন্তাষণ  
করিলেন। আগন্তুক বলিলেন “মশায়, আপনারই নাম  
ক্ষেত্রবাবু? আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকলেও  
আপনার নাম আমি শুনেছি। আমার নাম হরিগোপাল

বন্দোপাধায়; আমি পুরুলিয়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। সতীশ বাবু যখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের কৃষি বিভাগে পড়তেন তখন আমিও ঐ কলেজে পড়তাম। তখন থেকেই সতীশের সঙ্গে আমার আলাপ। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশকে সঙ্গে নিয়ে এই বল্লভপুরে এসেছিলেন। বল্লভপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে, এই রাস্তাটি আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার অন্তর্গত নয়; অন্ততঃ এই রাস্তাটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই। কাজেই এর অবস্থা খুব শোচনীয়। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব বল্লভপুর থেকে যেতে যেতে গ্রামের বাহিরে রাস্তার উপর একটা খালের মধ্যে সাইকেল স্ক্রু পড়ে যান। তাতে তাঁর কিছু চোটও লেগেছিল। আমিও সাহেবের সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিলাম; কিন্তু সে দিন আমি তাঁর সঙ্গে এদিকে না এসে অন্যদিকের রাস্তা দেখতে গিয়েছিলাম। সাহেব তো ডাকবাংলাতে এসেই আমাকে তলব করে বলেন ‘বল্লভপুরের রাস্তা ভয়ানক খারাপ; এই রাস্তা মেরামত হয় নাই কেন, তার কৈফিয়ৎ দাও।’ আমি বললাম ‘ঐ রাস্তাটি এর পূর্বে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই। সাহেব কি সে কথা শোনেন? তিনি বললেন ‘পূর্বে কখনও মেরামত হয় নাই বলে যে আর কখনও মেরামত হ’বে না, তার কোনও কারণ নাই; আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না, এক মাসের মধ্যেই আমি রাস্তা মেরামত দেখতে চাই। আমি মার্চ মাসে আবার বল্লভপুরে যাব, তখন যেন রাস্তা ঠিক থাকে।’ সতীশ সে দিন আপনার এখানেই ছিল; কাজেই তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই; কেননা, সেই দিন বিকালেই আমি স্থানান্তরে যাই। তারপর পুরুলিয়ায় গিয়ে সতীশের সঙ্গে দেখা হ’লে সতীশকে সব কথা বললাম। সতীশ বললে ‘চমৎকার হয়েছে; সাহেব তোমাকে এক মাসের মধ্যে রাস্তা তৈরির করতে হুকুম দিয়েছেন; আর আমি তোমাকে হুকুম করছি, তুমি পনের দিনের মধ্যে রাস্তা তৈরির কর।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ‘তোমার এত আড়া কেন হে?’ সতীশ বললে ‘এই ফাগুন মাসে বল্লভ-

পুরে আমার বিয়ে। যদি তার আগে রাস্তা তৈরির না হয়, তা হ’লে সাহেবের কাছে তোমাকে নাজেহাল করা।’ মশায়, সতীশের কথা আমি আদবে বিশ্বাস করি নাই। ‘কিন্তু আজ এখানে রাস্তার কাজ তদারক করতে এসে আপনার প্রজ্ঞাদের মুখে শুনলাম যে, আগামী ১৫ই ফাগুন তারিখে এখানে পুরুলিয়ায় ডেপুটী বাবুর বিয়ে হ’বে। সতীশের কথাটা তবে সত্য না কি, মশায়? আমি মনে করলাম, একবার আপনার সঙ্গে আলাপ করে আসি, আর সংবাদটাও জেনে আসি। ব্যাপার কি, বলুন দেখি?’

কেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন “সতীশ আপনাকে সত্য কথাই বলেছে।”

হরিগোপাল বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন “ক’রে? বলেন কি, মশায়? সতীশ বিয়ে করবে? আর শেষকালে এই বল্লভপুরে?”

কেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “হাঁ, সতীশ এই বল্লভপুরেই বিয়ে করবে।”

“ঘটকালী করলেন কে? আপনি বুঝি?”

“না, আমি করি নাই। সতীশ নিজের ঘটকালী নিজেই করেছে।”

“বটে? যা হোক, ছোকরার যে শেষকালে স্তমতি হয়েছে, এতে আমি বাস্তবিক বড় সুখী হলাম। মশায়, বিয়ে করতে সতীশকে রাজী করবার জন্য এর আগে কত লোকে যে কত সাধ্য সাধনা করেছে, তা আপনাকে বলতে পারি না। শেষকালে ছোকরা নিজেই কাঁদে পা দিয়েছে, দেখছি। চমৎকার হয়েছে—কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে ব’লে রাখছি। আমার অনুমান হচ্ছে, সতীশ ভায়া এখানে চুপি চুপি বিয়ে করতে আসবে। কিন্তু, আমিও রাস্তার তদারককে ঠিক সেইদিনে এখানে হাজির হ’ব; আর তার বিয়েতে কিছু বাদ্য ভাঙেরও ব্যবস্থা করব।”

কেন্দ্রনাথ বলিলেন “মশায় এখানে আসবেন, কে তো আফ্লাদেরই কথা। কিন্তু আমার অনুমান, আপনি বাদ্যভাঙের ব্যবস্থাটা করবেন না। তা হ’লে, সতীশ বিয়ে না ক’রেই পালাবে।”

হরিগোপালবাবু বলিলেন “কেন, মশায়, কাড়ানাগরা আর ঢাক-ঢোল না হ’লে কি আর বাদ্যভাণ্ড হয় না? আমি একদল ব্যাগ-পাইপ পাঠিয়ে দেব। যা খরচ হবে, তা আমার। (এই বলিয়া হরিগোপালবাবু নিজ প্রশস্ত বন্ধের উপর জ্বরে করাঘাত করিলেন)। সতীশ এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করবে, আর বাদ্যভাণ্ড হবে না? আপনি বলেন কি? বাদ্যভাণ্ড আলবাৎ হবে। ব্যাগ-পাইপ আমি আন্বই আন্ব।”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “কাড়ানাগরা ও ঢাকঢোল অপেক্ষা ব্যাগ-পাইপ অবশ্য সভ্য রকমের বাজনা। কিন্তু সতীশের মত না হ’লে, আমি আপনার ব্যবস্থায় মত দিতে পারি না। শেষকালে সে আমার উপর হাড়ে চটে যাবে, আর একটা গোল বাধাবে। আপনি তো সতীশকে চেনেন?”

হরিগোপালবাবু বলিলেন “তা বিলক্ষণ চিনি। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। সতীশকে ঠাণ্ডা করবার ভার আমার উপর রইল। ব্যাগ-পাইপ আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তা হ’লে আপনার ব্যবস্থা আমি সতীশকে জানাব কি?”

হরিগোপালবাবু বলিলেন “আরে মশায়, না-না-না। তা হ’লে আপনি সব মাটা করবেন। আপনি কারেও কিছু বলবেন না। দেখুন, এটা বিয়ের সময় একটা মজা করা মাত্র। মজা না হ’লে বিয়ে কি? সতীশ চুপি চুপি আসবে, আর বিয়ে ক’রে যাবে? আর আমরা কিছু মজা করতে পাব না? তা হ’লেই পারে না।”

হরিগোপালবাবুর তাৎকালিক অবস্থাটি ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং “ব্যাগ-পাইপ সম্বন্ধে আর কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন “আচ্ছা, আপনি কি আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে গ্রামের রাস্তাটি মেরামত করতে পারবেন?”

হরিগোপালবাবু বলিলেন “নিশ্চয়ই না; অসম্ভব— একবারে অসম্ভব; তবে কতকটা রাস্তা মেরামত হ’তে পারে। আপনার বাড়ীর আগে যে একটা মস্ত বড় গর্ত আছে, সেটা আগে মেরামত করিয়ে দিচ্ছি, সতীশ বোধ হয় আপনার এখানেই থাকবে?”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা নইলে এ গ্রামের মধ্যে আর স্থান কোথায়?”

হরিগোপালবাবু বলিলেন “তবে আপনার বাড়ীই তো বিবাহবাড়ী মশায়। আমিও তো আপনার এখানেই এসে উঠছি। বে-আদবী করছি বলে কিছু মনে করবেন না।”

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “এ তো আপনাদেরই বাড়ী। আপনি আজ এখানে অবস্থিতি করুন।”

হরিগোপালবাবু সাইকেল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন “না, ভাই, আজ আর না। সেই দিনেই নিশ্চয় ব্যাগ-পাইপ নিয়ে আসব আর এখানে থাকব। বিয়ে বুঝি ১৫ই ফাল্গুন তারিখে হচ্ছে? তারি চমৎকার, সে দিনটি রবিবার। বাঃ বাঃ। আপনার কাছে আজ চমৎকার সংবাদ শুনলাম। একবার পুরুলিয়াতে সতীশের সঙ্গে দেখা হ’লে হয়! আজ তবে আসি; এখন আমি তার বাজলাতে চললাম।” এই বলিয়া হরিগোপালবাবু সাইকেলে চড়িলেন এবং ক্ষেত্রবাবুর দিকে দ্বিধা মাথা নোড়াইয়া মুহূর্তমধ্যে অদৃশ হইয়া গেলেন।

### পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের মুখে মনোরমা এই আগন্তকের বৃত্তান্ত ও প্রস্তাব অবগত হইয়া বলিলেন “বেশ তো। বিয়ের সময় বাজনা না হ’লে মানাবে কেন?”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তুমি বুঝি সতীশকে এখনও চেন নাই? সে হয়ত পাগলামী করে একটা গোল বাধাবে, আর হয়ত বলে বসবে ‘আমি বিয়ে করব না’।”

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন “হাঁ, অনেক লোক তা বলে। বাজনাই হোক, আর ধরাধানা রসাতলেই যাক, সতীশবাবু সেদিন সৌদামিনীকে বিয়ে না ক’রে কোথাও যাবে না; তা দেখতে পাবে।”

সন্ধ্যার সময় ডাক-পিয়ন সতীশচন্দ্রের একখানি পত্র দিয়া গেল। তাহাতে সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, ১০ই ফাল্গুন হইতে তিনি এক মাসের ছুটি লইবেন। ঐ তারিখেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন এবং ১৩ই তারিখে আহালাদির পর তাঁহার পিসতুতো ভ্রাতা, ছই তিনি জন জ্ঞাতি এবং পুরোহিত ও নাপিতের সহিত বনভূপুস্তিমুখে

যাত্রা করিবেন। ষ্টেশনে তোর রাত্রিতে যেন অন্ততঃ চারিখানা পাক্কীর বন্দোবস্ত থাকে এবং গো-গাড়ীও দুই তিন খানা থাকে। সতীশচন্দ্র সাইকেলেই বল্লভপুরে পঁহুছিবেন। তাঁহারা বল্লভপুরে পঁহুছিয়া গাত্রহরিদার তত্বাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। সুরেন্দ্র ভাল আছে ও মন দিয়া পড়িতেছে। ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে ক্ষেত্রনাথ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পাক্কীর কথা তাঁহাকে বলায়, তিনি বলিলেন “তার জন্ম চিন্তা কি? মাধবদত্তের দুইখানা পাক্কী আছে; আর ময়নাগড়ের জমীদারও আমার যজমান, তাঁকে বলে পাঠালে তিনিও দুইখানা পাক্কী পাঠিয়ে দিবেন।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “বেহারী পাওয়া যাবে তো?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “যথেষ্ট, যথেষ্ট। এদেশে বেহারার অভাব নাই। চারিখানা কেন, দশখানা পাক্কীরও বেহারী পাওয়া যায়।”

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “বেশ কথা; আমি নিশ্চিত হলেম। আপনি তবে পাক্কী-বেহারার বন্দোবস্ত করুন, আর তাদের বায়না দেবার জন্ম এই দশটা টাকা নিয়ে রাখুন। ১৩ই তারিখে বৈকালে এই কাছারী-বাড়ীতে পাক্কীবেহারী উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক। আমি সন্ধ্যার পূর্বেই তাদের ষ্টেশনে পাঠাব।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “তা আপনি নিশ্চিত থাকুন; তারা যথাসময়ে এখানে আসবে।”

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিয়ের যোগাড় কি রকম করছেন?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “কি আর করব, বাবা? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—বুঝতেই পারছি? কেবল মেয়েটিকে আমি কোনও রকমে দান করব মনে করেছিলাম। কিন্তু বরাহভূমের রাজার আমি সভাপণ্ডিত। পুরুলিয়ার ডেপুটী বাবু আমার জামাতা হবেন, এই কথা শুনে তিনি জামাতার জন্ম একজোড়া বেনারসী চেলী, মেয়ের জন্ম একটা বেনারসী শাড়ী ও একছড়া সোনার হার দিয়েছেন। পঞ্চকূট কাশীপুরের মহারাজা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি জামাতার জন্ম একটা

মূল্যবান হীরকাজুবী ও সোনার চেইন ঘড়ী, আর বিয়ের খরচপত্রের জন্ম নগদ দুইশত টাকা দিয়েছেন। গড়-জয়পুর ও বালুদ্যার রাজা নগদ একশত টাকা করে দুইশত টাকা দিয়েছেন। বাঘমুণ্ডীর রাজাও নগদ একশত টাকা দিয়েছেন। এ ছাড়া ময়নাগড়ের জমীদার ও অম্মার অন্ত্য যজমানেরা প্রায় দুইশত টাকা দিয়েছেন। পিতল কাঁসার দানসামগ্রীও কিছু সংগ্রহ করেছি। ইছাগড়ের রাজা জামাতার জন্ম রূপার ডিবে, গ্লাস ও থালা দিয়েছেন এবং মেয়ের জন্ম দুইটা জড়োয়া হুল দিয়েছেন। বাবা, এই অঞ্চলে আমি অনেক দিন আছি, আর সকলেই আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও অমুগ্ধই করেন; তাই এই-সমস্ত দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম। সতীশবাবুর মতন ব্যক্তিকে যে আমি কখনও জামাতা করতে পারব, সে দুরাশা কখনও করি নাই। সকলই হরির ইচ্ছা। তাঁরই উপর সমস্ত ভার। আমি কয়দিন নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি। সবেমাত্র কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেছি। এসে শুন্লাম, আপনি এবৎসর সুর্য্যতী পূজা করেছিলেন, আর এখানে একটা পাঠশালাও স্থাপন করেছেন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমাদের সৌভাগ্যগুণেই এখানে এসেছেন, বিশেষতঃ আমার আর সৌদামিনীর। আপনার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না। আর সৌদামিনী যে বাল্যকাল থেকে নিত্য শিবপূজা করে, তাও তার সফল হবে। বাবা, এখন আপনি দাঁড়িয়ে থেকে যাতে শুভকার্য্য সম্পাদন হয়, আর সকলের মানসম্মত বজায় থাকে, তা করবেন। আমি অক্ষম, কিছুই জানি না, বা করতে পারব না।” এই বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় অশ্রুনয়নে ক্ষেত্রনাথের হাত দুইটা ধরিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন “আঃ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করেন কি? করেন কি? আমি আপনারই আজ্ঞাবহ; আপনি আমায় যা আদেশ করবেন, তাই করব! এখন আপনার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কতগুলি হলে, মনে করেন?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “এই অঞ্চলে আমাদের কুটুম্ব ও পরিচিত ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশজন হবে। অন্ত্য

দ্রলোকও পঞ্চাশ জন হবে ; পাঁচশত লোকের আয়োজন করতে হবে। আমাকে কেবল ময়দা, কিছু ঘৃত আর মিষ্টানের যোগাড় করতে হবে। মিষ্টান্ন বাড়ীতেই প্রস্তুত করব, তার জন্য পুরুলিয়া থেকে একজন ভাল ময়রা আনতে পাঠিয়েছি। উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর, মৎস্য ও তরকারী আমার যজ্ঞমানেরাই দেবেন। মাধবদত্ত মশায় এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সাহায্য করবেন। তাঁর পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে ; আর তাঁর নিজের এবং প্রজাদের ঘরেও যথেষ্ট ছুগ্ন হয়। এইরূপে বাবা, ভিক্ষা করে কোনওরূপে কন্ডাদায় হতে উদ্ধার পাবার আশা করছি।”

ক্ষেত্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, যথার্থ ব্রাহ্মণই থাকিলে, তাহার সমাদর এখনও আছে। ব্রাহ্মণই সমাজের গুরু। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সমাজ এখনও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যজ্ঞমানগণের নিকট চাহিবামাত্র তাহারা ইহার কন্ডা ও ভাবী জামাতার জন্য প্রচুর যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং দরিদ্র ; কিন্তু ধনবান্ লোকের ঋণ ইনি কন্ডার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “অনেক লোকের সমাগম হবে। বিবাহের সভা কোন্ স্থানে করবেন ?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “বাবা, আপনি একবার স্বয়ং গিয়ে এই সকলের ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়। আমার বৈঠকখানার সম্মুখে যে খোলা মাঠটি পড়ে আছে, আমি মনে করেছি, ঐ স্থানের উপরে একটা চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে ও দুইদিক কানাত দিয়ে ঘিরে বিবাহের সভা করুব। নিকটবর্তী উমীদারেরা কেহ চাঁদোয়া কেহ কানাত, কেহ সতরঞ্চ, কেহ ঝাড়লঠন, কেহ অগাণ্ড আবশ্যিক দ্রব্য দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত দ্রব্য এখানে এসে পড়বে। লোকজনকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা এইরূপ করেছি—বাড়ীর মধ্যে উঠানের উপর আর একটা বড় চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে তার তলে ভদ্রলোকদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করব। আর আমার খামারবাড়ীর উঠানে একটা শালপাতার

ছায়া বেঁধে তার তলে ইতর লোকজনকে খাওয়ানো। বাবা, আমি তো এইরূপ ব্যবস্থা করেছি ; এখন আপনি একবার নিজে দেখে শুনুন যা ভাল হয়, তাই করুন।”

বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটা গিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহার সকল ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

## বাল্যবিবাহ ও বর-পণ

ভগবানের সৃষ্টিলালা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন-সকল অদ্ভুত বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় যাহাতে হৃদয় বিশ্বয়রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই যে সৃষ্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়ারূপ একটা ব্যাপার নিয়তই সংঘটিত হইতেছে তাহার তথ্য কি কেহ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? কি জড়, কি জীব, কি চেতন—কি জড়জগৎ, কি মনোজগৎ, কি আধ্যাত্মিক জগৎ, সর্বত্রই এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয়। সৃষ্টি একটি কার্য্যপ্রবাহ। সর্বত্রই কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। যখনই কোন একটা বিষয় তাহার যথার্থ সীমা অতিক্রম করে অমনি তাহার বিপরীত দিকে গতি আরম্ভ হয়। এই গতির উদ্দেশ্য ঐ কার্য্যপ্রবাহকে টানিয়া সীমার মধ্যে আনয়ন করা। এই সীমাকেই প্রাচীন গ্রীক ঋষি এরিস্ততল্ শ্রেয়ঃ মধ্যপথ (golden mean) বলিয়াছেন। ভগবান সৃষ্টিকে এমনই করিয়া গড়িয়াছেন, তুমি কিছুতেই তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না। “স সেতু-বিধ্বতিরেষাং লোকনামসন্তোদায়।” এই লোক-সকল যাহাতে ধ্বংসমুখে পতিত না হয়, সে জন্য তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন। মানুষ কার্য্য করে, তাহার কার্য্যশক্তি রহিয়াছে। কিন্তু সে সর্বশক্তিমানও নয়, সর্বজ্ঞও নয়। স্মৃতরাং গড়িতে যাইয়া তাহার পক্ষে ভাঙ্গিয়া ফেলা আশ্চর্য্য নয়। তাই ধ্বংসের মধ্যে ভগবান্ এমন একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে, ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে হইতে ভুঁকি দেখিতে পাইবে, একটা সময়ে যুধ পরিবর্তন না করিয়াই ঠিক গঠনের নিকটে আসিয়াছে,

যেন গঠন করিতে করিতেই আসিয়াছিল। ধ্বংস করিতে করিতেই গঠন করিয়া ফেলিতেছে। সৃজনই কর আর বিনাশই কর, একই দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে। যতই ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবে, ততই ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ার নিকটবর্তী হইবে, এবং ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া ও গড়ন একই কথা। কোন বস্তুর পরিধির মধ্যগত কোন বিন্দু হইতে পরিধি ধরিয়া যতই দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই যেমন অল্প রাস্তায় ঐ বিন্দুরই নিকটবর্তী হওয়া হয়, প্রতিক্রিয়া কার্যটিও ঠিক সেইরূপ। যে বিন্দু হইতে আপাততঃ দূরে চলিয়া যাওয়া হইতেছে সেই বিন্দুতে আসিয়া উপনীত! ইহা নানা আকারে সর্বদা প্রত্যক্ষ হইতেছে। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, এক প্রকার জৈব বিষ ডিপথিরিয়া রোগ জন্মে। কিন্তু ঐ বিষ কিছুদিন শরীরে কার্য করিলে ঐ বিষ বিনাশের জন্ম শরীরে আর এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়, যাহাতে পূর্বোক্ত ডিপথিরিয়া বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই প্রতিক্রিয়া। সমাজে এইরূপ ঘটনা অহরহই ঘটতেছে। এই যে পণ-প্রথা, উহা কি? ইহার নিদান কোথায়? ইহা আর কিছুই নহে, বাল্যবিবাহ-বিষের প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানুষ, তুমি মনে করিয়াছিলে ভগবানের সৃষ্টি বিনাশ করিবে? কি সাধ্য! তিনি যে লোকরক্ষার জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া সৃষ্টির মধ্যে বাস করিতেছেন। মনে করিয়াছিলে সকল যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ রাখিয়া দিবে, কিন্তু দেখ—বাহির হইতে আসে নাই—বিষের ঔষধ বিষ ভিতরেই প্রস্তুত হইয়াছে। যখন বাল্যবিবাহের নিগড় গলায় পড়িল, কন্ডার বিবাহের উর্দ্ধ বয়স নির্ণীত হইল, তখন পুত্রের পিতা কন্ডার পিতার গলা টিপিয়া ধরিলেন, পণ-প্রথার সৃষ্টি হইল। কন্ডার পিতা সবুর করিতে পারেন না, তাঁহার জাতিকুল মান যায়। কিন্তু পুত্রের পিতার সে দায় নাই। তিনি অর্থোপার্জনের এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন, ইহা যাহারা আশা করেন, তাঁহাদিগকে মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। যাহারা জানেন “চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী”, তাঁহারা ইহাও জানেন, পণ লওয়া অর্থাৎ এই ধর্মোপদেশে পুত্রের পিতা পণ লওয়া

হইতে বিরত হইবেন না। পণ-প্রথা বাল্যবিবাহ-বিষের প্রতিষেধক; বিষ ততক্ষণ বিনষ্ট না হইবে, প্রতিষেধক ততক্ষণ ক্ষেত্র ছাড়িবে না। ইহা, ভগবানের নিয়ম, মানুষের জাতি এখানে খাটে না। পণ প্রথার বিষ অতি তীব্রবিষ, বাল্যবিবাহরূপ সমাজ-বিধ্বংসী বিষকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কন্যাদায়রূপ কাঁশ কন্ডার পিতার জন্ম সমাজ হস্তে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কন্ডার বয়স যখন দশ, পিতার গলায় তখনই এই কাঁশ পড়ে। তারপর এক একটি বছর যায়, আর এই কাঁশ একটু একটু করিয়া আঁটে। পরে যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত, তখন দয়া করিয়া পুত্রের পিতা আসিয়া সর্বস্বের বিনিময়ে কন্ডার পিতাকে উদ্ধার করেন। ইহাই বর্তমান সমাজের বিবাহতত্ত্ব। যিনি জাতি কুল মান দিতেছেন, তিনি তার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ লইতেছেন মাত্র, ইহাতে আপনারা এত বেজার হন কেন? “উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে” চাপাইয়া একজনের দোষের জন্ম অন্ডকে দোষী করিয়া আপনারা আন্দোলনের প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনারা তো চান বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাক। সেই জন্মই না হিন্দুসমাজের এক দল (Marriage Reform League) বিবাহসংস্কার সমিতি গড়িয়া বিদেশীকে আপনাদের স্বদেশী সমাজ সংস্কারের জন্ম হয়রান করিয়া মারিতেছেন। এই বাল্যবিবাহ বিনাশে কে আপনাদের সর্বপ্রধান সহায়? এই বহুনির্দ্দিত পণ-প্রথা,—বিষের ঔষধ বিষ। যখন একটী দশ বছরের মেয়ের বিবাহে ঘরবাড়ী বন্ধক হইল, তখন দ্বিতীয়টীর বয়স চৌদ্দ বৎসর না হইয়া যায় না। ঘরবাড়ী খালাস করিয়া আবার বন্ধক দিতে অন্ততঃ পাঁচ বছর লাগিবে। তাবপর ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও যখন কন্যা দায় যায় না তখন বাধ্য হইয়াই কন্ডার বিবাহের বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই নাম বিষের ঘাঁরা, বিষের নাশ। “একটী কণ্টক বড় হস্তেতে লইয়া, পদবিন্দু কণ্টকে ফেল উপাড়িয়া।” আজকাল যে অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ হইতেছে, তাহা দায়ে পড়িয়া; কোনও উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে বা সংস্কারপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া নহে। অধিকাংশ স্থলেই বাধ্য হইয়া। সম্প্রতি

একটা বাইশ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দেখিলাম। এত বয়স কেন্দ্র বর মিলে না তাই। ভদ্রলোক পাঁচ "ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন, অষ্টাদশবর্ষীয়া ষষ্ঠ এখনও মজুত। কিন্তু সুবিধা হইলে 'গৌরী' দানও বন্ধ থাকে না। একটা শিক্ষিত পরিবারে নবমবর্ষীয়া রোহিণীর বাগদান আমার চক্ষের সম্মুখেই হইয়াছিল। এ বিবাহে পণের কঠোরতা নাই—উভয় পক্ষই জমিদার। তাই বলিতেছিলাম পণপ্রথাই বাল্যবিবাহ বিনাশ করিতেছে। কেন না, গরজ (Necessity) বড় শক্তি পেয়াদা। সে কিছুই মানে না। তাই কণা বড় হইতেছে! একবার যাহা সহিল, দশবার তাহা সহিবার পথ খুলিয়া গেল। ভয় পাইলেও একটা জিনিষ সম্ভব এই সংস্কার অনেক কুসংস্কারদূর করিয়া দেয়। এক জায়গায় যাহা সহিল, বাধ্য হইয়া দশ জায়গায় তাহা সহিতেছে। সুতরাং পণপ্রথা ধীরে ধীরে বাল্যবিবাহের মূল কাটিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত বা ইংরেজী শিক্ষা অপেক্ষা এই পণপ্রথা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সহস্রগুণ অধিক কার্য্য করিতেছে। বিষে বিষক্রয় হইতেছে।

কিন্তু এই ঔষধরূপী বিষেরও প্রতিক্রিয়াব সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সময়ে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর না হইলে সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দেশ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা সতীদাহ অপেক্ষাও কঠিনতর সমস্যা। আমাদের কণারা আর এখন আট দশ বৎসরে বিবাহিতা হন না। তাঁগারা চৌদ্দ পনের, সময়ে আঠার কুড়িও হইতেছেন। সুতরাং পিতামাতার হুরবস্থা তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। তাঁহাদের হৃদয়ও, সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় ইহাও অতি সহজ কথা। কাজেই মা-বাপের দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁহারা আত্মদান করিতে উদ্বৃত হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এ বিপদ হইতে উদ্ধারের পন্থা কি? কেহ কেহ ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, বাল্যেই বিবাহ দিয়া বিবাহের পূর্বে আমাদের মেয়েদের হৃদয় ও মন বিকশিত হইবার পথ বন্ধ করিয়া দাও! আমরা দেখিয়াছি পণপ্রথা দূর্গীভূত না হইলে তাহা হইবে না—আবার পুরাতন পক্ষে নিমগ্ন

হওয়া চলিবে না। ইহার মূল কারণ যতক্ষণ না নিবারণ হইতেছে ততক্ষণ এই কুমারীদাহ নিবারণ অসম্ভব। যে কারণে সতীদাহের প্রসার হইয়াছিল সে কারণ প্রবলতরুরূপে এখানেও বর্তমান। যে তাগের সঙ্গে প্রশংসা আছে এবং যে তাগে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে তাগ সংক্রামক রোগের আয় বিস্তৃত হইবেই। "সতীর" যতই প্রশংসা থাকুক, তাহার কার্য্যের প্রণোদক ছিল পারত্রিক স্বার্থ। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দিয়াছেন ইহা তন্মধ্যে প্রধান। "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কামো কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িত্বাঃ" ( রঘুনন্দন )! কিন্তু কুমারীর উদ্দেশ্য একেবারে নিকাম। যে-দেশে সতীদাহ প্রচলিত হইয়াছিল—সে আশুন এখনও নিভে নাই—সে-দেশে কুমারীদাহ প্রচলিত হইতে সময় লাগিবে না। সুতরাং এ বিষফলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাঠতে হইলে বিষরূক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিরা ফেলিতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই। পণপ্রথাকে এই উৎপাতের মূল কারণ মনে করিয়া সকলে তাহারই বিষাংশ মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক যে-উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার দ্বারা কি ফল আশা করা যায়।

পণ লইয়া অর্থাপার্জন অধর্ম্ম, সুতরাং ইগা পরিশ্রান্ত। এই এক যুক্তি। ইগাতে পণপ্রথা উঠিয়া গাইবে না। যেখানে আইনে বাধে পুলিশে ধরে, অর্থাপার্জনের সেই-সকল পথও মানুষ ছাড়ে নাই। আর এটা তো আইন-সম্মত! কণাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি অনুকম্পা!! এটা একটা ব্যবসা। একজনের ক্ষতি, অপর একজনের লাভ, ইহা ব্যবসায়ের নিয়ম। অমূকের ক্ষতি হইল বলিয়া ব্যবসায় কেহ আপনীর লাভ ছাড়ে না। সংসারে আত্মতাগী নিকাম সন্ন্যাস বেশী নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের কাছে সেটা আশা করাই অন্তায়। ছেলের অধ্যয়নের বায় দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক ধার কর্ত্ত করিয়া ছেলে পড়ায় এই আশ্বাসে যে বিবাহের সময় ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবে। ধর্মে পদে বা নরকের ভয়ে সে পণ্ড বন্ধ হইবে না।, "আয় চাদ" বলিলে যেমন চাদ হাতে আসে না, পণ লইয়া বিবাহ বিবাহই নয় বলিলেও পণপ্রথা রহিত হইবে না। তাই সেদিন এক

সভায় পণপ্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব উঠিবারাত্র পুত্রের পিতাগণ, কখনও বা কখনও কইমাছের বন্ধন খুলিয়া দিলে তাহারা যেমন চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে তেমনই করিয়া সরিয়া পড়িলেন, অতি বড় ভারী ডিষ্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেটের ভারও তাঁহাদিগকে স্বস্থানে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দস্তখৎ করিলেন আহম্মক কন্ডার পিতাগণ। আহম্মক, কেননা কন্ডার বিবাহে পণ দিতে হইবে না, সে পথ তো খুলিলই না। যে একটি আধটি পুত্র আছে, তাহাদের বিবাহে পণ লইবার পথও বন্ধ হইল—অবশ্য যদি শপথ রক্ষা করেন। মানুষ যতদিন কেবল স্বার্থান্বেষী মানুষই আছে—ততদিন ধর্মের দোহাই দিয়া পণপ্রথা রদ হইবে না।

কেহ কেহ সরকারী আইনের দ্বারা পণপ্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন! কিন্তু আইন সতীদাহ নিবারণ করিয়াছে বলিয়া কুমারীদাহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পণপ্রথা আইনতঃ রহিত হইলেও কোন সুসার নাই। কন্ডার পিতাকে কন্ডাদায় হইতে রেহাই না দিলে, সব চেষ্ঠা নিষ্ফল। কন্ডার পিতাকে যখন কন্ডা পাত্রস্থ করিতেই হইবে, তখন প্রকাশ্য ভাবে পণদাননা করিয়া তিনি পুত্রের পিতার সঙ্গে গোপনে রক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। প্রকাশ্যে হইলে হয় তো অল্পে হইত, গোপনে চক্ষুজ্জ্বার খাতির চলিয়া গিয়া একটু বেশীই লাগিবে। কন্ডার পিতার গলার ফাঁস একটু আঁটিয়া যাইবে মাত্র। ঔষধ রোগ বাড়াইবে, সুতরাং কুমারীর আত্মহত্যার প্রেরণা বাড়িবে। যে রোগের যে ঔষধ, তাহা না হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এমন আইন করা তো চলিবে না যে পুত্রের পিতাকে অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে? তিনি তাঁহার সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন। কিন্তু কন্ডার পিতার অপেক্ষা চলেনা। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কুমারীদাহের কারণ কন্ডাদায়, পণপ্রথা উপকারণ মাত্র। মেহলতা আত্মহত্যা করিয়াছেন কেন? বাপের ঘরে তাঁহার আর স্থান ছিল না, তাঁহাকে বাহির হইতেই হইবে।

“যেখানে অন্ধের লেখা ব্যাধাও তথায়” এবং সেইখানেই

ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। নতুবা সবই কি পণপ্রথমে পর্য্যবসিত হইবে না?

কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, কন্ডার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দাও। তাহাতে লাভ কি? এখানেও যে দায়ের সীমা নির্দিষ্ট রহিল। বরের পিতাও আপ্তনার পুত্রের বয়স বাড়াইয়া দিয়া ছেঁ। মারিতে বসিয়া থাকিবেন; তাঁহার দাঁও তো একদিন আসিবেই। কন্ডা যখন দায়, তখন বয়স বাড়াইলেই আপদ চুকিল না। বয়স তো বাড়িয়াছেই, বেশীর ভাগ বাইশ বছরের মেয়েকে চৌদ্দ বছর বলিয়া বিবাহবাসরের শাস্তি নষ্ট করা হইতেছে। কন্ডার বাপের স্বল্পে অন্যায় দায়িত্ব চাপান হইয়াছে, তাহা না নামাইলে এ ব্যথা সারিবে না। বয়স বাড়াইলেও কন্যা যে দায়ই থাকিয়া যাইতেছে। সমাজের যত জঞ্জাল এ একটি কথার উপর আসিয়া বুঁকিয়াছে। এ রোগে অন্য ঔষধ ধরিবে না। এই আন্দোলনে “শকুন্তলার” মাধব্যকে মনে পড়িতেছে—নেত্রমাকুলীকৃত্য অশ্রুকারণঃ পৃচ্ছসি? চোখে খোঁচা দিয়া জল পড়িতেছে কেন ভাবিয়া আকুল। এই খোঁচা বারণ না হইলে জলপড়া নিবারণ হইতেছে না। সমাজ কন্যার পিতার মস্তকে বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। গুরুভারে বেচারীর পিঠ দুমিয়া গিয়াছে, তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ। বোঝা নামাইলেই ঝপাট মিটে। তাহা না করিয়া, দেশসুদ্ধ লোক আহা! আহা! করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে প্রলেপ লাগাইতে লাগিয়া গিয়াছেন। এ দয়ার অস্তিনয় মন্দ নয়!

আর এক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ছাত্রগণের নিকট শপথ গ্রহণ, তাহারা পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। প্রকৃতি অতি গুরুতর। তাহারা পিতামাতার বিনা অনুমতিতে, এমন কি তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অনেকে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিতেছেন। মহা উত্তেজনায় পতিত হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অনেক সময়ে লজ্জার খাতিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া পারিতেছেন না। ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি? অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন এবং জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পড়িবেন। কেহ পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সংকার্য্য করিতে



সমর্থ হইলেও তাহা নিরাপদ নহে। যাঁহাদের জীবনে ইহা পরীক্ষিত সত্য, তাঁহারা হইয় গুরুত্ব সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। "যাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইবেন তাঁহারা নমস্যা। কেননা তাঁহারা প্রজ্ঞাদের বংশধর। কিন্তু যে সমাজে কোন একটা সংকার্য্য সাধন করিতে হইলে বালকগণকে প্রজ্ঞাদের মত বাপকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, সে সমাজ যে একটা অস্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না কেন? এক অস্বাভাবিকতা প্রতিষেধ করিতে যাইয়া আর এক অস্বাভাবিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, সুতরাং হয় সমস্ত আন্দোলন নিষ্ফল হইয়া যাইবে, না হয় সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। পণপ্রথা যে-বিষয়ঙ্কের ফল সেই বৃক্ষ বিমাশ করুন, সব স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। যুবকগণের প্রতিজ্ঞা সমস্যাপূরণ করিতে পারিবে না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। পিতামাতার বিনানুমতিতে বিবাহ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সুতরাং বড় জোর তাঁহাদের বিবাহ স্থগিত থাকিবে। নিজের পায়ের উপর দাড়াইয়া বিবাহ করিবার শক্তি বহু দূরের কথা। তাহাতে কুমারীর কুমারীত্ব ঘুচিবে না। কাজেই এই প্রতিজ্ঞায় কুমারীদাহের কোন প্রতিকার পাওয়া গেল না। পুত্র অনেক দিন অবিবাহিত থাকিতে পারে, কন্যা পারে না, রোগের নিদান এইখানে। বালকগণের প্রতিজ্ঞা রোগ বাড়াইবে। কন্যার পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করিতেই হইবে—নতুবা তাঁহার জাতিকুল মান থাকে না—এই জন্যই স্নেহলতা আত্মহত্যা করিয়াছে। সুপাত্র না পান, তাঁহাকে কুপাত্রেই কন্যা সমর্পণ করিতে হইবে। যে-সকল যুবক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহারা সুপাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং কুমারীগণকে এই সকল সুপাত্র হইলে বঞ্চিত করা হইতেছে অথচ পিতাকেও আসান দেওয়া হইতেছে না। কেননা, বাজারে যখন ভাল জিনিস না থাকে তখন ধারাপ জিনিসই ভাল জিনিসের দরে কিনিতে হয়।" ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বরং যুবকগণের নিকট হইতে এই শপথ গ্রহণ করা হউক

তাঁহারা যখন কন্যার পিতা হইবেন তখন পণ দিয়া কখনও কন্যার বিবাহ দিবেন না, ইহাতে কন্যা চিরকুমারী হইয়া গৃহে থাকে তাহাও স্বীকার! আমি যদি পাঁচ বৎসরে কন্যার বিবাহ দি, তাহাতে দোষ নাই। কন্যা ষষ্ঠ বৎসরে বিধবা হইয়া যদি আজীবন আমার গৃহে থাকে তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমার অবিবাহিতা কন্যা আমার গৃহে দ্বাদশ আতক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিলেই সমাজ আমার গলায় ফাঁশি লাগাইবার জন্ত উপস্থিত। এই কুসংস্কাররূপ মহা রাক্ষস আপনাদের স্নেহলতার বুক চিরিয়া রক্ত পান করিয়াছে। নতুবা পিতার আনন্দ, মাতার আশ্রয়, স্বর্ণপ্রতিমা পুড়িয়া ছারখার হইত না। যদি স্নেহলতার মৃত্যুর কারণ দূরীভূত করিবার জন্ত দেশ উত্তোজিত হইয়া থাকে, যদি কোন কুপ্রথা নিবারণের স্বর্ণমুয়োগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে এই যে অম্লর সমাজের রক্ত পান করিতেছে ইহাকে দূরীভূত করিয়া দিন। পণের দায়ে বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহের বিধদাত এখনও ভুলে নাই। আমি আমার কন্যাকে যতদিন ইচ্ছা পালন করিতে পারিব না, তাহাতে আমার কলঙ্ক, নারীজাতির প্রতি এই যে কঠোর তিরস্কার সমাজ হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, পিতাকে এই দায় হইতে মুক্তি দিন, নারীকে চিরকুমারীত্বের, অধিকার দিন—পুরুষের যেমন আছে—তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের জায় সকল বিপদ দূরীভূত হইবে। পুরুষের অবিবাহিত থাকিবার অধিকার সবেও যেমন একজন পুরুষও অবিবাহিতা থাকে না, তেমনই কোন নারীকেও অবিবাহিত থাকিতে হইবে না। আপনাদের জোখবন্ধি যদি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে তবে এই পাপ পুড়াইয়া ভস্মীভূত করুক। নতুবা হাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া সে বহিঃবুধাই প্রজ্বলিত হইয়া বুধাই নির্দোষ হইবে। পশ্চাৎ কেবল শক্তি ও সময়ের অপচয়-জনিত একটা আক্ষেপ পড়িয়া থাকিবে।

মহর্ষি মনু কন্যার পিতাদিগকে যে অধিকার দিয়াছিলেন, সমাজ সেই অধিকার হরণ করিয়াই তো যত বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। মনু বলিয়াছেন, কন্যা চিরকুমারী থাকে তাহাও স্বীকার তবুও অপাত্রে কন্যা

দান করিবে না। যে আমার কন্যাকে চায় না, টাকা চায়—যে-হৃদয়ে এতটা মমতা 'যে পিতামাতার হৃদয়ে সে আত্মদান করিতে পারে, সে-হৃদয় যে-পণ্ড চায় না, চায় আমার ঘরবাড়ী বেচা-অর্থ, সেই অর্থপিষাচ কি আমার কন্যার সুপাত্র? কন্যার পিতাকে মনু-দত্ত অধিকার প্রদান করুন, আপদ বালাই পালাইবে। আমার একটা বন্ধু সেদিন গল্প করিলেন যে তাঁহার চতুর্দশবর্ষীয়া শ্রালিকার বিবাহের প্রস্তাব হইলে চার হাজার পাঁচ হাজারের রব উঠিল। তখন সে বালিকা বলিয়াছিল, “দাদাবাবু, আপনাদের এই ইতরামি আমরা ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। আমরা যদি বিয়ে না করি, তবে আপনাবা খুব জ্বদ হন।” এই বালিকা হাসিতে হাসিতে যাহা বলিয়াছে, সকল রোগের ঔষধ ঐখানেই নিহিত রহিয়াছে। পিতাকে শুধু বলিবার অধিকার দিতে হইবে—পণ দিয়া কন্যা বিবাহ দিব না, ইহাতে কন্যা কুমারী থাকে তাহাও স্বীকার—আর দেখা যাইবে ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে পণ-প্রথা দূরীভূত হইয়া স্রোত অগ্নি দিকে ফিরিয়াছে। আপনারা যদি শুনেন যে এমন দেশ আছে যেখানে যে বছর যত বেশী ফসল হয় শস্যের দরও সে বছর তত বেশী হয়, তবে নিশ্চয়ই বলিবেন উহা হবচন্দ্র রাজার দেশ—কোন অস্বাভাবিক নিয়ম সেখানে আছেই, নতুবা এরূপ হয় না। অস্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সমাজও হবচন্দ্র রাজার দেশ হইয়াছে। আদম-সুমারী বলে বন্ধে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। তাহাতে আবার একা হিন্দুর মধ্যেই বিধবার সংখ্যা ২৬ লক্ষ। সুতরাং দু'এ দু'এ যেমন চার, তেমনই পুরুষের বিবাহই কষ্টকর হওয়া উচিত। তা না হইয়া হইয়াছে আমাদের কন্যাদায়। ইহা ঐ অস্বাভাবিক নিয়মের ফল। তাহা কি ভীষণ অস্বাভাবিক নিয়ম নয় যাহা ক্ষণকালের জন্তও পিতামাতার মনে এই ভাব আনয়ন করে যে মেয়েটা যদি বালবিধবা হইয়া ঘরে থাকিত বা শৈশবে মরিয়া যাইত তবুও ছিল ভাল? পণের দায়ে বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহের বিষদাত ভাঙে নাই, পূর্বেই বলিয়াছি। এই বিষদাত ভাঙিতে হইবে। বর্ণের গুরু ত্রাঙ্গণ। কুলীন আবার ত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং

গুরুর গুরু। কুলীনের গৃহে কন্যা চিরকুমারী থাকিলে যদি জাতি না যায়, তবে অন্নের যাইবে কেন? সকলকেই এ বিষয়ে কৌলীন্য প্রদান করা হউক। 'কোন বিশেষ বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে না, বাল্যবিবাহের এই বিষদাত ভগ্ন হউক দেখিবেন স্রোত ফিরিয়াছে। যেখানে নারী অপেক্ষা বিবাহার্থী পুরুষ লক্ষ লক্ষ বেশী সেখানে সর্বত্র যাহা স্বাভাবিক নিয়ম তাহাই ফিরিয়া আসিবে। বরের বাপ এই যুহুর্ভেই কন্যার বাপের বাড়ীতে হাজির হইবেন, কেননা, আমাদের পুত্রগণের যেমন “কৌপীনস্তঃ খলু ভাগ্যন্তঃ” বলিয়া শঙ্করাচার্যের অঙ্গুসরণ করিবার মত মেজাজ দেখিতেছি না, তেমনই পিতাগণও পৌত্রমুখ নিরীক্ষণের লোভ ছাড়িয়াছেন বা পিওলোপের ভয় অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে যুহুর্ভে আমাদের কন্যারা” বলিবার অধিকার পাইবেন—

“থাকুক আমার নিয়ে,

কার্পেন্টার নাইটিঙ্গেল ডোরা, লিটল সিষ্টার হব মোরা,  
থাকুক বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়ে,

দেশের হবে সুখ সুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,

নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পণ্ডর গৌরব গিয়ে।”

সেই যুহুর্ভে সকল মেয়ের বর জুটিয়া যাইবে; কেননা বিবাহার্থিনী নারীর সংখ্যা কম। একটা কৃত্রিম উপায়ে নারীর গৌরব হ্রত হইয়াছে, তাই কন্যার বাপ বরের বাপের পায়ের ধরেন। কন্যার বাপকে মনুনির্দিষ্ট অধিকার দেওয়া হউক, অতি সহজ উপায়ে নারীর অপহৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে—পাত্রপক্ষ হইতেই পাত্রীপক্ষের নিকট বিবাহের আবেদন উপস্থিত হইবে। বিবাহকে সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার সত্যতায় সন্দেহ করি না। কিন্তু ভাবের উত্তেজনায় সমাজসংস্কার হয় না। বুদ্ধিজীবী জীব মানবের পক্ষে জ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা উত্তেজনা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইব, যেখানে ছিলাম সেখানেই রহিয়াছি, বেশীর ভাগ একটু অধিক অবসন্ন হইয়াছি মাত্র। দেশের বিবেক

যদি বাস্তবিক জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে এই উৎপাত দুর্নীভূত করিবার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে। বিবেকের অঙ্গুসরণ করুন, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। সকল দোষ বরের পিতার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। পণ গ্রহণ যদি অগ্নায় হয়, পণ প্রদান অগ্নায় হইবে না কেন? উৎকোচ দান ও গ্রহণ উভয়ই দোষ। সকলে জাগ্রত বিবেকের অঙ্গুসরণ করুন, তাহাকে অগ্রাহ্য না করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলুন, ঘুষ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিব না, তাহা অগ্নায়; তাহাতে আমার মেয়ের না হয় বিবাহ না হইবে। বিবেকের আদেশ মস্তকে লইয়া, ফলাফল ভগবানের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইলে, ভগবান্ দেশকে এ সঙ্কটকালে পরিত্যাগ করিবেন না। প্রতিকার কর্তার পিতার হস্তে। কিন্তু এই জাগ্রত বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিলে উদ্ধার নাই। সব ভয়ে ঘৃতাছতি।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে স্নেহলতার মূহুর কারণ পণপ্রথা—কিন্তু একটু প্রনির্দান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে মূল কারণ তাহা নহে। বিষয়ক পুঁতি-য়াছি, তাহাতে বিষকল ফলিয়াছে। তাহার একটা ফল খাইয়া মানুষ মরিল, রাগ করিয়া সব ফল বিনাশ করিলাম। গাছ রহিল। আবার যখন ফসল হইবে তখন এই উত্তেজনা থাকিবে না—তখনও কিন্তু মানুষ মরিবে। একমাত্র উপায় বিষবৃক্ষের উন্মুলন। একজনের পক্ষে আমার কন্যাকে বিবাহ না করিবার শত বাধা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা আমার কন্যার আত্মহত্যার যথেষ্ট কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পণ স্নেহলতার মূহুর আসল বাধা নহে। আমি যে আমার কন্যাকে নির্দিষ্ট বয়সের উপরে আমার বরের রাখিতে পারি না, রাখিলে আমার মাথা যায়, সুতরাং শত আদবের ধনকেও যেমন করিয়া হউক ঘরের বাহির করিতেই হইবে; যে তাহার আদর জানে না, যে তাহাকে চায় না, তাহাই হাতে দিতে হইবে; সর্ব্বশ পণ করিয়াও আমি ইহা করিতে বাধ্য;—বালিকা আত্মবিসর্জন করিয়াছে এই অভিমানে। ইহাই বাল্যবিবাহের নিষদস্ত। এই দস্তাঘাতে স্নেহলতা মরিয়াছে—পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে

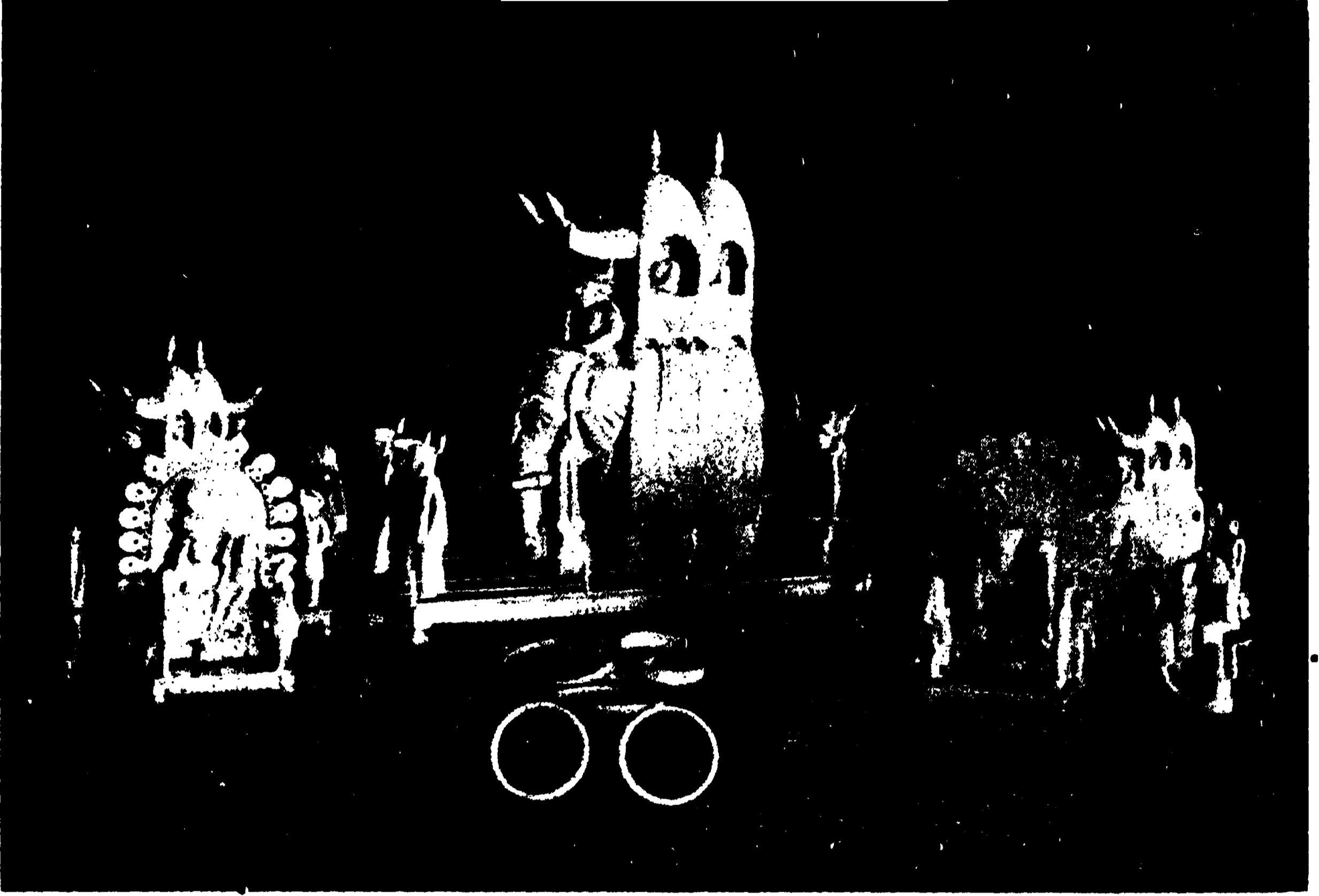
শত স্নেহলতা মরিবে। ইহাই বিষবৃক্ষ! দেশ যদি ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার জন্ত প্রস্তুত না হইয়া থাকেন, তবে, হায়! স্নেহলতা বৃথাই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীবেঙ্গনাথ চৌধুরী।

## হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী

ভারতবর্ষ হস্তীর প্রাচীন জন্মভূমি। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই লোকে হস্তীর ব্যবহার জানিত। ঋগ্বেদ সংহিতায় হস্তীর উল্লেখ আছে এবং রামায়ণ মহাভারতের যুগে লোকে হস্তীর পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে যাইত। হস্তীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় লোকে হস্তী-দন্তের ব্যবহারও শিখিয়াছিল; কারণ রামায়ণে দেখিতে পাই যে ভারতের সঙ্গে যে-সমস্ত লোক রামের অশেষণে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে হস্তীদন্ত খোদাই করিতে দক্ষ লোকও ছিল। রঘুবংশে হস্তীদন্তনির্মিত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতা, হরিবংশ, বাৎসায়নের কামসূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে হস্তীদন্ত-নির্মিত সামগ্রীর উল্লেখ দেখা যায়। এই-সমস্ত গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে হাতীর দাঁত খোদাই করার কারুকৌশল অতি প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল।

কিন্তু বঙ্গদেশে এই শিল্প মুসলমান আমলের পূর্বেও ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির লেখার মধ্যে নানা প্রকারে হস্তীর উল্লেখ আছে এবং গজমতি হারের কথা শুনি সকল পাঠকই জানেন, কিন্তু হস্তীদন্ত-নির্মিত কোন দ্রব্যের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্শ্বদেশসমূহে হস্তী প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং হস্তীদন্তের ব্যবহার এদেশের লোকের খুব প্রাচীনকাল হইতেই জানা সত্য। কিন্তু হস্তীদন্তের বহুল প্রচলন না হওয়ার এক কারণ আছে। প্রচলিত হিন্দু মতে হাড়ের দ্রব্য মাত্রেই অশুচি, সুতরাং হস্তীদন্ত-



গজদন্ত-নির্মিত পুতুল, মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি।

নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি পূজা করা নিষিদ্ধ। ধনীর গৃহের আসবাব অথবা সখের জিনিস বলিয়াই হস্তীদন্তনির্মিত শিল্পদ্রব্যের আদর হইত, সাধারণ গৃহস্থ ইহার কোন অভাব অথবা আবশ্যক বোধ করিত না এবং উহা বহুমূল্য বলিয়া সাধারণ লোকের আয়ত্তেরও অতীত ছিল।

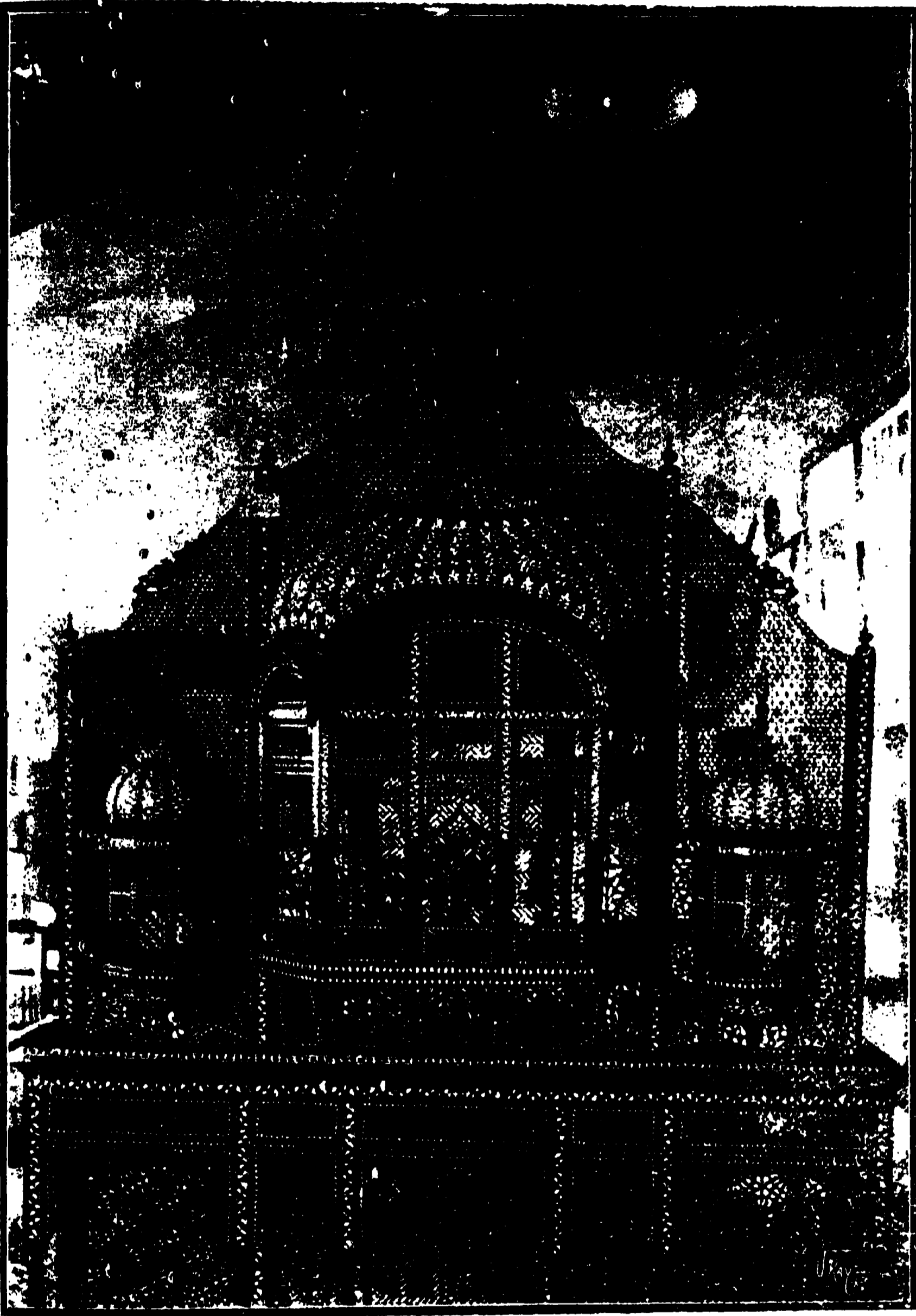
বর্তমান সময়ে এই শিল্প বাঙ্গলাদেশের কেবলমাত্র দুই জেলায় দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ ইহাদের অন্ততম। রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত পাদা গ্রামে মাত্র ৫৬ টি খোঁদকার পরিবারের বাস আছে। পূর্বে নাকি ১০১২ ঘর ছিল। স্থানীয় ভূস্বামী ইহাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে বিহার হইতে আনিয়া লাখেরাজ জমি দিয়া গ্রামে বসাইয়াছিলেন। এখন তাহাদের বংশধরদিগকে সেই জমির খাজনা দিতে হয়। শিল্পের অবস্থাও এখন আশাহুরূপ নহে। সকলেই প্রায় চাষবাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, জমিদার অথবা রাজকর্মচারীর আদেশ পাইলে অবসর মত হস্তীদন্তের কাজ করিয়া

থাকে। কিন্তু এক্ষণে শিল্পদ্রব্যও আর সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না। মিন্দুরমাটি ও মানসকুড়ার মেলাতে ইহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাদার খোঁদকারেরা সকলেই মুসলমান। সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের সহিত ইহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে।

১৮৩৩ সালের কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিমা, বড়বাড়ী প্রভৃতি স্থানেও খোঁদকারদের বাস ছিল। এখন এইসব স্থানে তাহাদের আর কোন চিহ্নই নাই।

মুর্শিদাবাদে এই শিল্প সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত করিয়াছিল। কিরূপে ইহা এই স্থানে প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহা নিম্নলিখিত লোকপ্রবাদে বর্ণিত আছে।

মুর্শিদাবাদের কোন নবাব একবার কান খুঁটিবার দল একটি কাঠি চাহেন। তাহাতে তাঁহাকে একটি ঘাস আনিয়া দেওয়া হয়। নবাব অসন্তুষ্ট হইয়া হস্তীদন্ত



গজদন্ত প্রতিবপন করা দারুশিল্প ।

নির্মিত কানধুন্ধি আনিতে ছকুম দ্রেন । নবাবের আজায় একজন শিল্পী মুর্শিদাবাদে আনীত হয় এবং এই শিল্পীর নিকট হইতে তুলসী খাতুসরের পিতা এই শিল্প শিক্ষা করে ।

তুলসী মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী । এখনও ইহার নাম করিলে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা ভক্তিতে মস্তক অবনত করে । তুলসী একজন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং তীর্থ ভ্রমণে তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল । কিন্তু নবাব তাঁহার শিল্পের এত আদর করিতেন যে তুলসীকে কখনও চোখের আঁড়াল

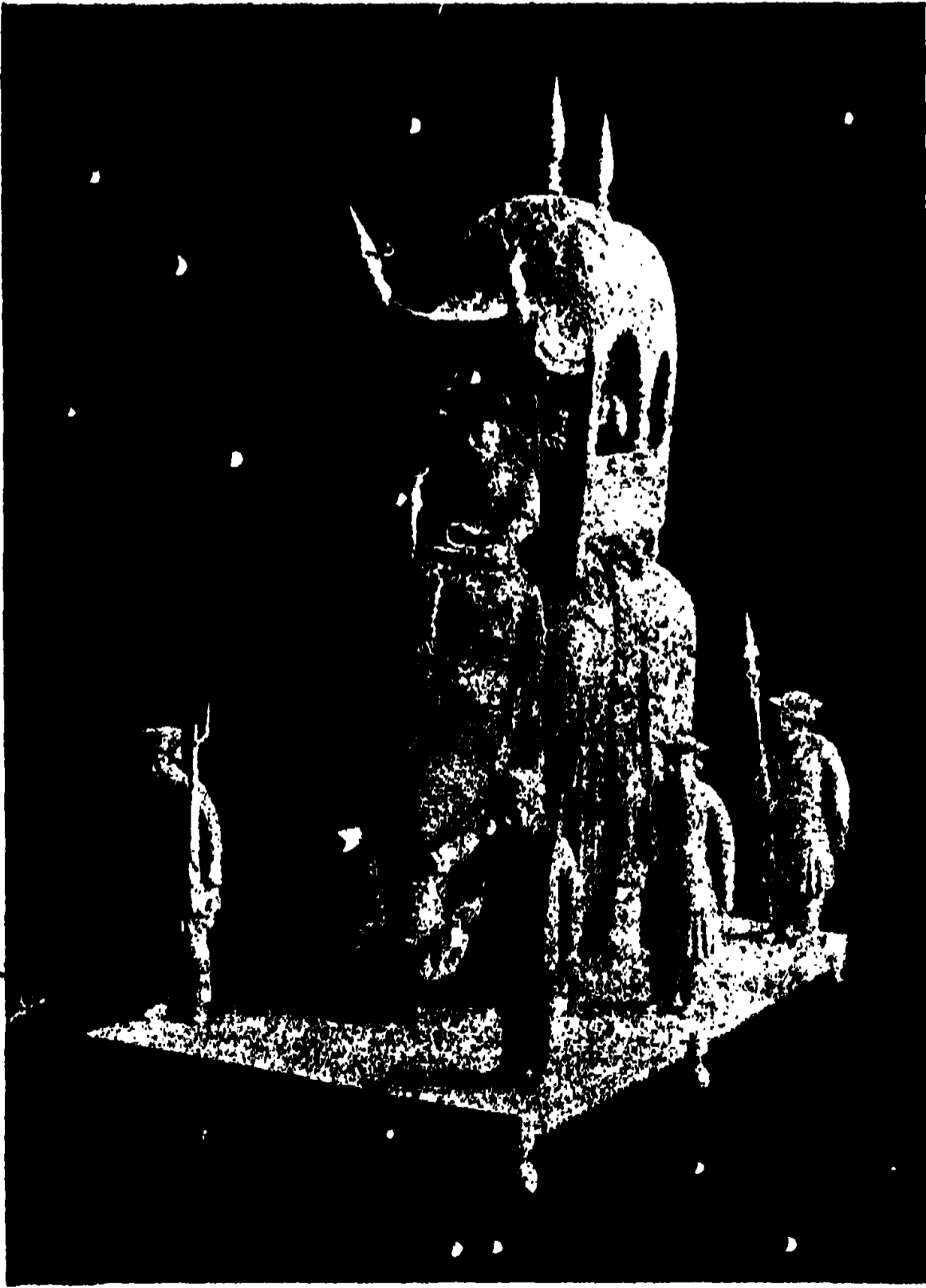
হইতে দিতেন না । তুলসী একদিন সকলের অজান্তসারে ভাগীরথীতে স্নান করিতে গিয়া নদী পার হইয়া রাজমহলে পলায়ন করেন । সেখানে ২১ টা সামান্য সূত্রধরের যন্ত্র ধার করিয়া একটি কাঠের ঘোটক প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহা পাঁচ টাকাতে বিক্রয় করিয়া গয়া যাইবার পথে সংগ্রহ করেন । সেখানেও উপরোক্ত প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করিয়া কাশী তীর্থে যান । কাশী হইতে কিছু হস্তীদন্ত কিনিয়া লইয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং স্থানীয় কার্শকারদিগের নির্মিত ২৪টি যন্ত্র দ্বারা কএকটি দ্রব্য নির্মাণ করিয়া তাহার লভ্যাংশ হইতে জয়পুর যাইতে সমর্থ হন । সেখানে গিয়া জয়পুরের মহারাজকে তিনি যে-সমস্ত দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হয় । জয়পুরে অবস্থানকালে তুলসী মহারাজের একটি পোষা ছাগের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে এত সন্তুষ্ট করেন যে মহারাজ নিজের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া তুলসীকে উপহার দেন এবং

নগদ ২০০০ টাকা পুরস্কার দেন । মহারাজের অনুরোধে তুলসী কিছুদিন জয়পুরে বাস করেন ।

এই প্রকারে ১৭ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তুলসী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তৎকালীন নবাব তাঁহার গুণগরিমার কথা পূর্বেই অবগত থাকায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান । নবাব তুলসীকে ভূতপূর্ব নবাবের প্রতিকৃতি হস্তীদন্তে খোদিত করিতে অনুমতি করেন । প্রতিকৃতি এমনি অবিকল হইয়াছিল যে নবাব তাহা দেখিয়া তুলসীকে গত ১৭ বৎসরের সমস্ত বেতন দিতে

আজ্ঞা দেন এক মহাজনটুলিতে তাঁহাকে বাসগৃহ দান করেন। তুঙ্গসীর ছই শিষ্য—ম্যানিক ভাস্কর এবং রামকিশোর ভাস্কর। রামকিশোর ঝালুচরের সন্নিকট এনায়েৎ-উল্লা বাগের লালবিহারী ভাস্করের খুলতাত ছিলেন। লালবিহারী এখন জীবিত নাই, তাঁহার পুত্র নীলামণিই এখন নিজামতের শিল্পী। এই বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদের শিল্প আধুনিক। কেহ কেহ বলেন যে শ্রীহট্ট জেলাতেই এই শিল্প সর্বপ্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। এই স্থানের হস্তীদন্তনির্মিত পাটা, পাখা প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত শিল্পদ্রব্য বহুদিন হইতে বিখ্যাত। মুসলমান আমলে রাজধানী যখন প্রথমে ঢাকায় ও তারপর মুর্শিদাবাদে নির্ধারিত হয়, তখন শিল্পীরাও রাজধানীতে অর্ধাগমের আশায় গিয়া বাস করিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা সকলেই জাতিতে সূত্রধর এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। ইহারা ভাস্কর বলিয়া অভিহিত। হস্তীদন্তের কাজ শিখিবার পূর্বে ইহারা মাটির এবং পাথরের মূর্তি প্রস্তুত করিত এবং কাঠের উপর খোদাই ও



গজদন্ত-নির্মিত হাওদা-সওয়ারী হাতী।

দেওয়ালে অঙ্কনের কার্য করিত। ভাস্করেরা অল্প জাতির লোককে নিজেদের শিল্প কখনও শিক্ষা দেয় না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইহাদের ধুব সহায়ভূতি আছে। কোন ভাস্কর কাজ শিখিতে ইচ্ছুক হইলে ইহারা তাহাকে শিক্ষা দেয় এবং ব্যবসায় করিতে সাহায্য করে। ভাস্করেরা সাধারণ সূত্রধরদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করে না, তাহারা আপনাদিগকে সাধারণ সূত্রধর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে।

ভাস্করদের আর্থিক অবস্থা ধারাপ নহে। তাহারা মধ্যবিত্ত লোকদের গায় পাকা বাড়ীতে বাস করে; সাধারণ চালচলনেও ইহারা ভদ্রলোকের গায়। ইহাদের বাৎসরিক আয় ৬০০ শত হইতে ৮০০ শত টাকা হওয়া সত্ত্বেও ইহারা কিছুই জমাইতে পারে না; যাহা উপার্জন করে তাহার প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলে। এই শিল্পে নিম্ন মজুরেরাও তাহাদের প্রভুদের গায় অমিতব্যয়ী। ইহাদের আয় মাসিক ১২ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত। ইহা ব্যতীত মজুরেরা নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া কাজ করে এবং তাহা হইতেও তাহাদের বেশ আয় হয়।

কলিকাতার হাড়কাটার গলিতে ২৩ ঘর ভাস্কর ছিল। তাহারাও জাতিতে সূত্রধর, কিন্তু তাহারা বোতাঁম, চেন, চিরুনি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের শিল্পকার্য করিতে অক্ষম। মুর্শিদাবাদের ভাস্করদের গায় ইহারা মজুর দিয়া কাজ করাইত না—নিজেদেরই খোদাই এবং বিক্রয় উভয়ই করিত। এক্ষণে তাহারা কলিকাতার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং স্থানে স্থানে মুসলমান শিল্পীও ব্যবসায় করিতেছে দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদের ভাস্করেরা আসামজাত কৃষা ব্রহ্মদেশের হস্তীর দন্তের উপর খোদাই করিতে পছন্দ করে, কারণ এই ছই প্রকার দস্তই অগ্ন্যস্ত স্থানের হস্তীদন্ত অপেক্ষা নরম। আজিমগঞ্জের রায় মেঘরাজ বাহাদুর ইহাদিগকে দস্ত দিয়া থাকেন এবং বানি দিয়া বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করান; শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইলে শিল্পীদের নিকট ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় পাঠান।

ঋংপুরের খোদকারদের অবস্থা বড় শোচনীয়। হস্তী-

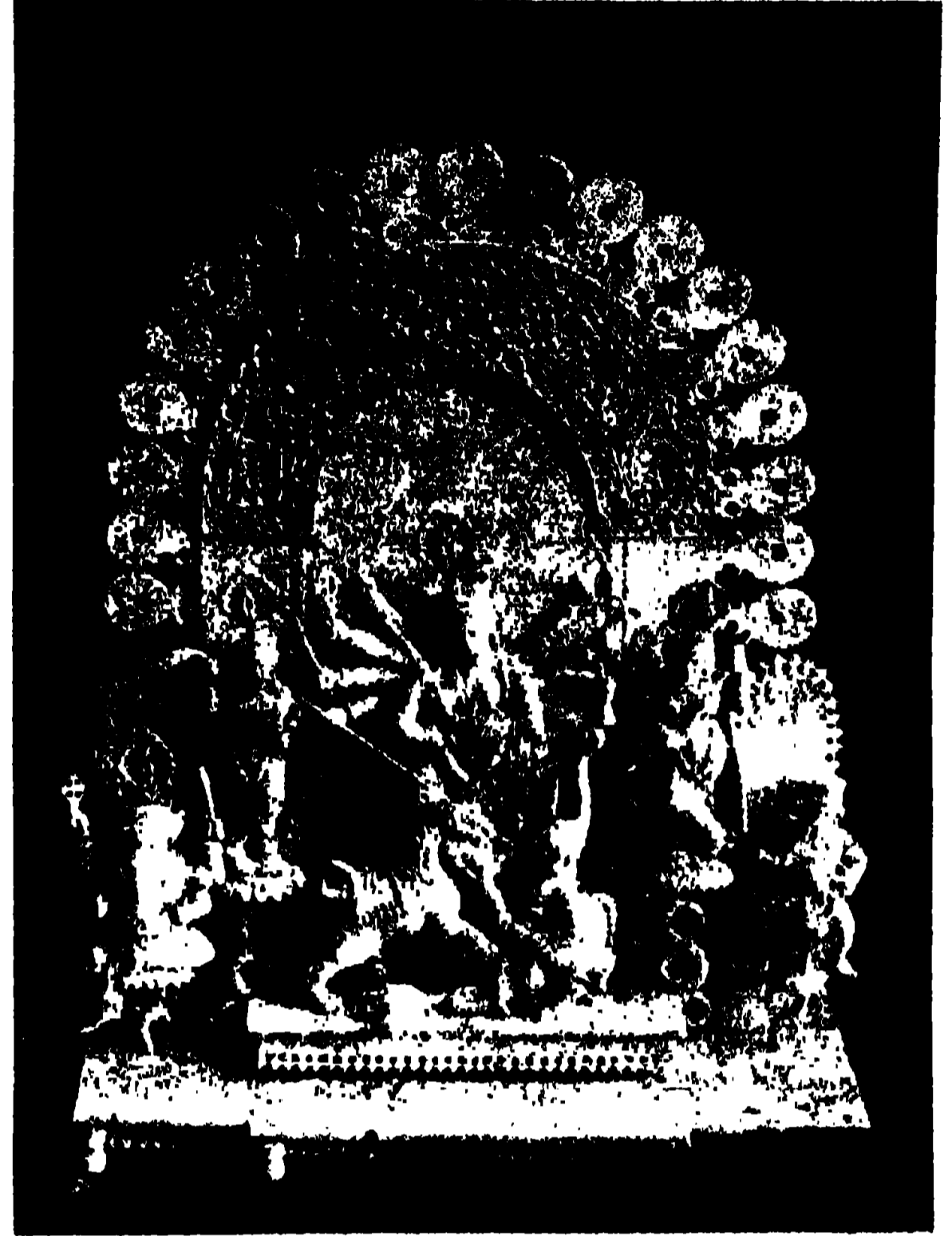
দস্ত কোথায় পাওয়া যায় তাহা তাহারা জানে না এবং আসামের জমিদারগণ ইহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া বানির সহিত পুরস্কার স্বরূপ কখনও কখনও হস্তী-দস্ত দান করিলে ইহারা তাহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। শিল্পদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধেও ইহাদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্থানীয় লোকে হস্তীদস্তের দ্রব্য অল্পই কিনিয়া থাকে এবং গ্রামের বাহিরে গিয়া ক্রেতা অন্বেষণ করিবারও তাহাদের সাহস নাই।

হস্তীদস্ত তিন রকম দরে বিক্রয় হয়। নকসী-দস্ত বা দস্তের অগ্রভাগ, খোন্দী-দস্ত বা মধ্যভাগ এবং গল্প-দস্ত বা কাঁপা শেষাংশ, যথাক্রমে ৮। হইতে ১০, ১৫ হইতে ১৬ এবং ৭ হইতে ৮ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। মূর্শিদাবাদের তাঁস্করেরা এই তিন রকম দাঁতই ব্যবহার করিয়া থাকে। বোম্বাইএ বিদেশ হইতে আমদানী দস্ত দামে ২।৩ টাকা করিয়া কম হইলেও ইহারা তাহা ব্যবহার করে না, কারণ উহা অত্যন্ত কঠিন। মূর্শিদাবাদের তাঁস্করেরা অতি সাধারণ যন্ত্র দিয়া নিজেদের কার্য সম্পন্ন করে। নিম্নলিখিত যন্ত্র দিয়াই তাহারা প্রায় সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারে।

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ১। রেতী বা উখা                    | ৭। কম্পাস।               |
| ২। আড়ি বা করাত                   | ৮। পাক-সাঁড়াশী।         |
| ৩। কুখানি বা ছোটবাটালি            | ৯। কাঠের মুণ্ডর।         |
| ৪। পেঁচকস                         | ১০। টি স্কোয়ার।         |
| ৫। তুরপুণ                         | ১১। ভ্রমিযন্ত্র বা কুঁদ। |
| ৬। কাতুরি ( সাঁড়াশীর মত যন্ত্র ) |                          |

তাঁস্করেরা মাছের আঁশ ও চামড়া দিয়া মূর্শি পালিশ করিয়া থাকে। কাজ করিতে করিতে যদি তাহাদের কোন নূতন যন্ত্রের আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটা নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া ফেলে এবং কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করে।

বর্তমান সময়ে এই শিল্পের অবস্থা ভাল নয়। ইহা কেবল শিল্পীদেরই দোষে নহে। এখনও মূর্শিদাবাদে এখন শিল্পী আছে বাহারা নমুনা দেখিয়া যে-কোন শিল্পের অনুকরণ করিতে পারে। সাধারণতঃ শিল্পী-



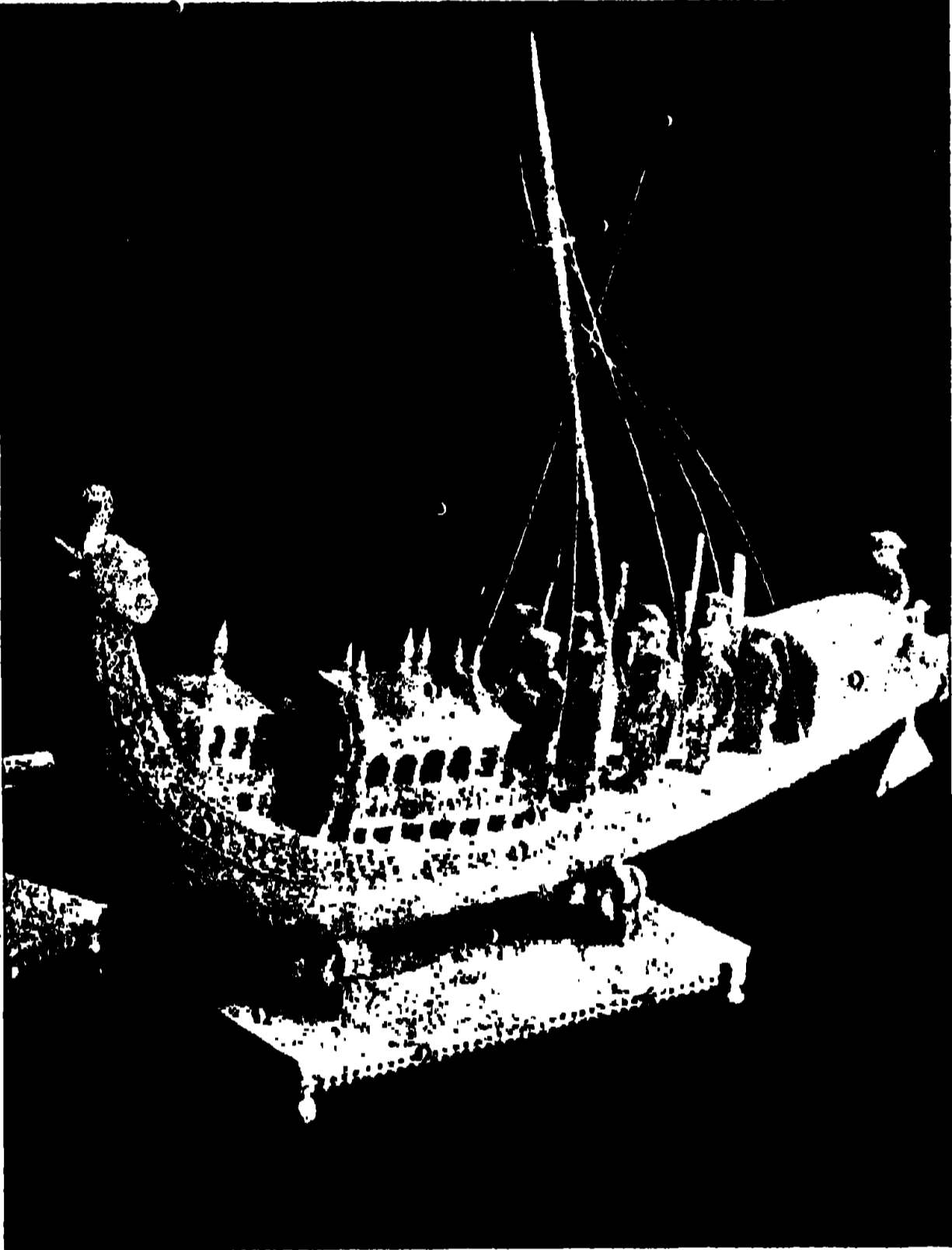
গজদস্ত-নির্মিত দুর্গা প্রতিমা।

দের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহে একটা আড়ম্বল্য, একটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, সব সময়েই শিল্পের অবস্থা এইরূপ ছিল। অধ্যাপক জে. এফ. রয়েল সাহেব "Lectures on the Arts and Manufactures of India" 1852 নামক পুস্তকে বহরমপুরের তাঁস্করদিগের খুব প্রশংসা করেন। তাহার পুস্তকের ৫১১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটি উদ্ধৃত হইল—

"A variety of specimens of carving in ivory have been sent from different parts of India and are much to be admired whether for the size or minuteness, for the elaborateness of detail or for the truth of representation. Among these the ivory carvers of Berhampur are conspicuous. They have sent a little model of themselves at work and using as is the custom of India only a few tools. The set of chessmen carved from the drawings in Layard's 'Nineveh' were excellent representations of what they could only have seen in the above work, showing that they are capable of doing new work when required; while their representation of the elephant and other animals are so true to nature that they may be

considered the "works of real artists and should be mentioned rather under the head of fine arts than of mere manual dexterity."

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে হস্তীদন্তে নির্মিত শিল্পসামগ্রীর যে-সমস্ত নমুনা দেখিয়াছি সে-সমস্তই আকার, ভঙ্গী, সূক্ষ্ম কারুকার্য, স্বভাবানুকরণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাহাদের মধ্যে (মুর্শিদাবাদ) বহরমপুরের নমুনাগুলিই সর্বপ্রধান। সেখানকার শিল্পীরা ভারতশিল্পীর স্বাভাবিক কুশলতায় সামান্য যত্নপাতি লইয়াই অমন সুন্দর শিল্পসামগ্রী গঠন করিতে পারে। তাহারা নূতন জিনিসের ছবছ নকল করিতে সক্ষম; এবং হাতী ঘোড়া প্রভৃতির মূর্তিতে স্বভাবানুকরণ এমন সুন্দর যে সে-সমস্ত মূর্তিকে মলিতকলা বলিতে হয়, কেবলমাত্র হাতের কাজের বাহাদুরী বলা চলে না।



গজদন্ত-নির্মিত মুরপক্ষী।

ইহা হইতে বৈশ বৃদ্ধা যায় যে গত শতাব্দীতে এই শিল্প কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখন আর শিল্পীর সুরূপ আদর নাই। সুতরাং তাহারা জীবিকার জন্য ভাল কলাসম্পন্ন জিনিস না করিয়া সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। বহরমপুরে যখন 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত ছিল তখন এই শিল্পের সাহেব ক্রেতার অভাব ছিল না, সুতরাং শিল্পের অবস্থাও ভাল

ছিল। বহরমপুরের গৌরব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পের অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ সরকার পূর্বে পূর্বে ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য শিল্পীদের দ্বারা অনেক ভাল ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করাইতেন। এখন আর তাহা করেন না। তৎপরিবর্তে রাজা মহারাজাদের নিকট হইতে ভাল ভাল জিনিস চাহিয়া লইয়া কাজ সারেন। ইহা সরকারের গৌরবের কথা নহে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্বে মথুরা দৌলতবাজার রণমাগর প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে অনেক ভাস্কর-পরিবার ছিল। এখন সেই-সমস্ত স্থানে একজন ভাস্করও নাই। অনেকে ম্যালেরিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, আবার কেহ কেহ সে-সমস্ত স্থান ছাড়িয়া বহরমপুর, বালুচর প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে নিম্নে কয়েক জনের নাম ধাম প্রকাশিত হইল—

- ১। গিরিশচন্দ্র ভাস্কর
- ২। নিমাইচন্দ্র ভাস্কর
- ৩। গোপালচন্দ্র ভাস্কর
- ৪। তুল ভচন্দ্র ভাস্কর
- ৫। হরিকৃষ্ণ ভাস্কর
- ৬। নারায়ণচন্দ্র ভাস্কর
- ৭। গোপালচন্দ্র ভাস্কর
- ৮। গোপীকৃষ্ণ ভাস্কর
- ৯। নীলমণি ভাস্কর
- ১০। মুরারীমোহন ভাস্কর
- ১১। গোকুলচন্দ্র ভাস্কর (বড়)
- ১২। উমেশচন্দ্র ভাস্কর
- ১৩। মহেশচন্দ্র ভাস্কর
- ১৪। শ্রীরামচন্দ্র ভাস্কর

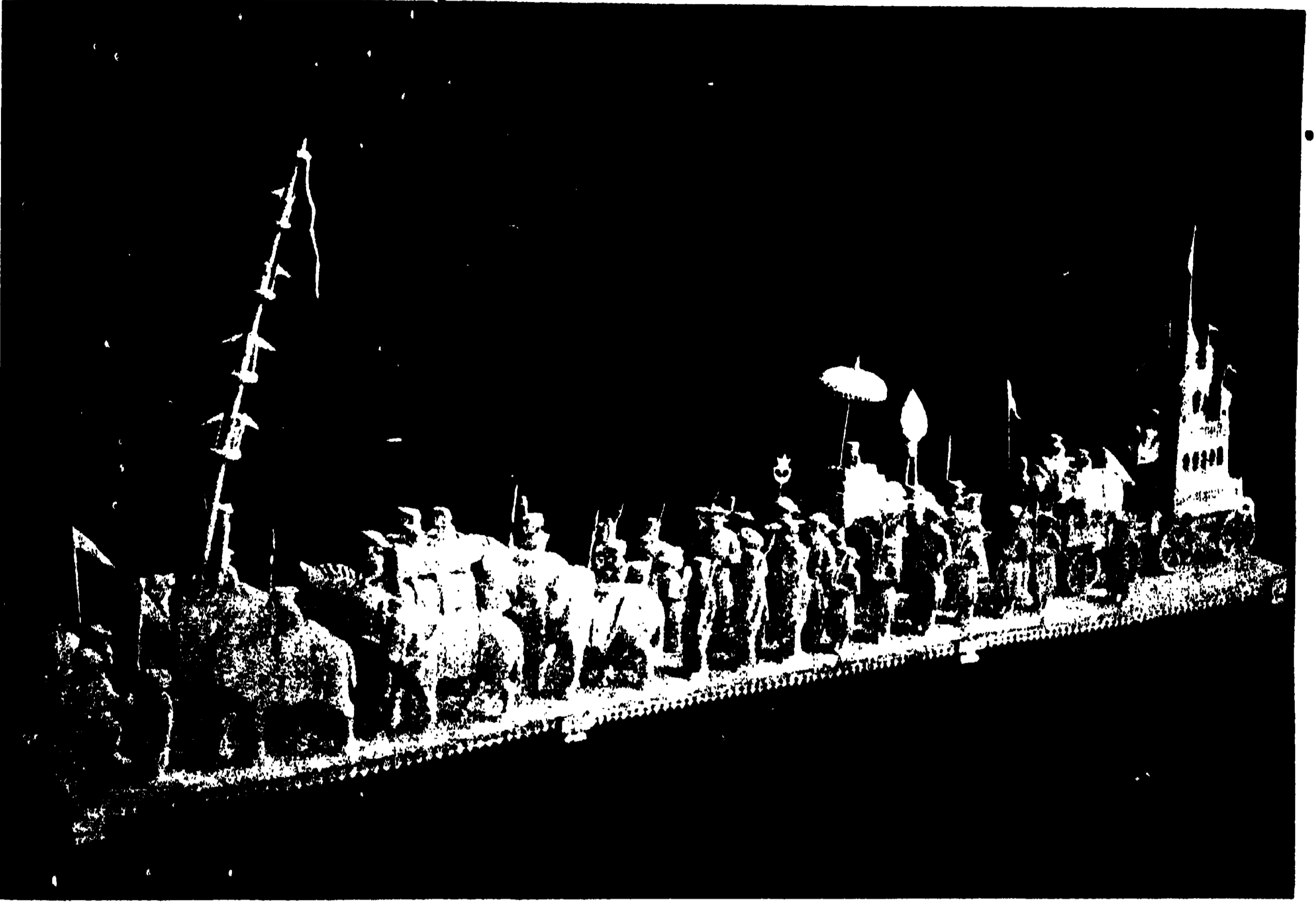
থাগড়া, বহরমপুর

এনায়েৎ-উল্লা বাগ,  
জিয়াগঞ্জ।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুজনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই শিল্পের ভাবী উন্নতির জন্য এখন দুইটি জিনিস আবশ্যিক। মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণ পুরাতন পন্থা ছাড়িয়া এখন নূতন পথে অগ্রসর হউন। বাধা রাস্তা, পুরাতন প্রণালী ছাড়িয়া এখন শিল্পে নূতন আদর্শ আনয়ন করুন। যাহা চিরন্তন কাল হইতে গড়িয়া আসিতেছেন তাহা





গজদন্ত-নির্মিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

ছাড়িয়া এখন স্বভাবের সৌন্দর্য্যে অর্নুপ্রাণিত হইয়া  
নূতন নূতন পস্থা আবিষ্কার করুন।

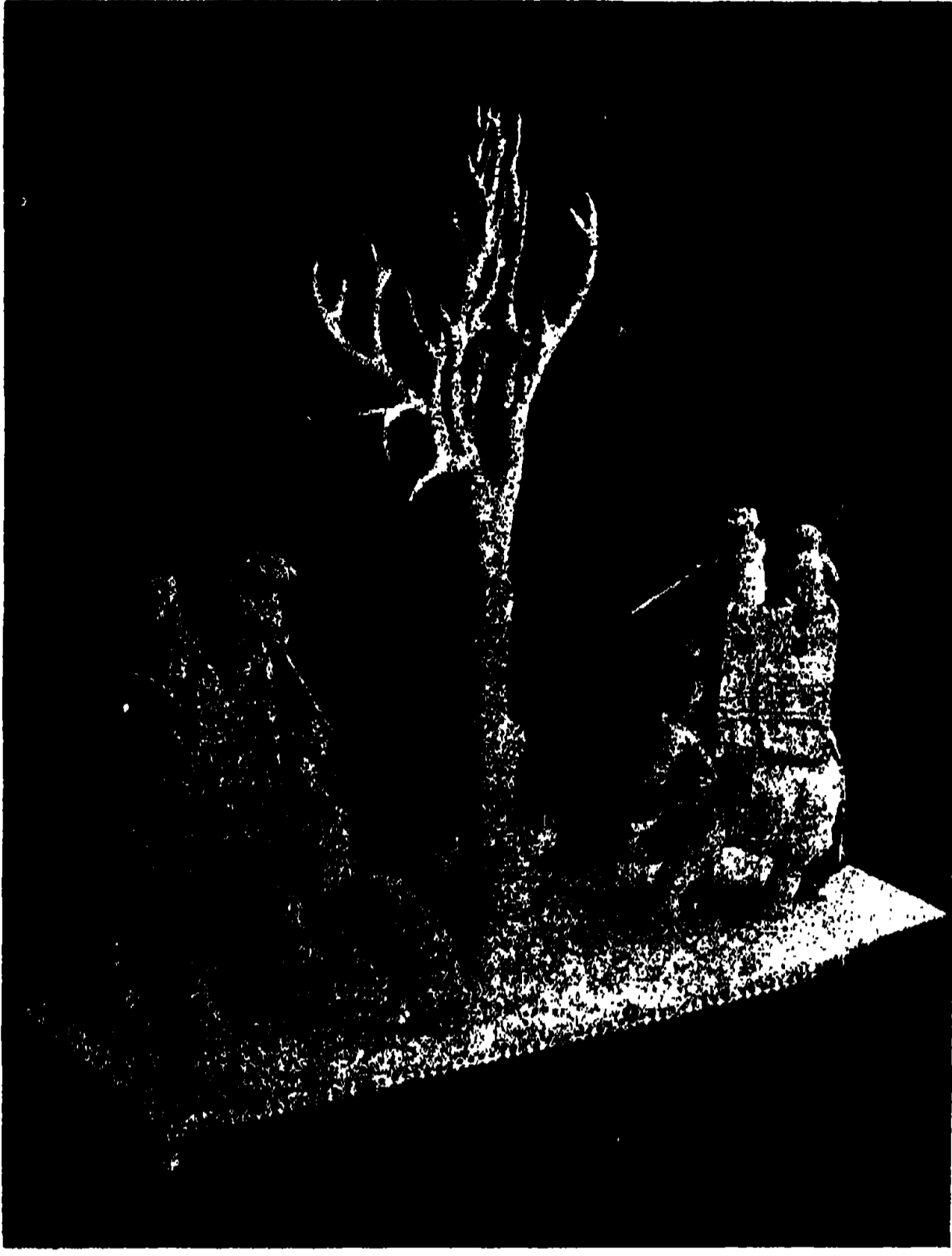
• ইহা করিতে হইলে নূতন ভাব ব্যতীত আরও একটি  
জিনিস আবশ্যিক। আমাদের শিল্পীরা অতি অল্পসংখ্যক  
যন্ত্র দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করেন। ইহাতে কিন্তু আর  
চলিবে না। নূতন যুগের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে  
হইলে তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় যন্ত্র সমূহের ব্যবহার  
শিখিতে হইবে। • তাহাতে কাজ যেমন ভাল হইবে  
তেমনি ক্রম হইবে। জিনিসের মূল্য কমিয়া গেলে  
ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে এবং শিল্পী লাভবান হইতে  
পারিবেন।

মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত হাতীর দাঁতের কতকগুলি দ্রব্যের  
নাম ও আনুমানিক মূল্যের তালিকা দেওয়া হইল—

- ১। বর্ণমালার অক্ষর (প্রতি অক্ষর) /০ হইতে /১০  
২। দুর্গাপ্রতিমা ৫০/- ৩০০/-

এক অঞ্চল হস্তীদন্ত হইতে খুদিয়া  
প্রস্তুত প্রতিমা ১৫০/- টাকা মূল্যেই পাওয়া যায়।

৩। কালী-প্রতিমা	৪০/- ১২০/-
৪। জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা	৫০/- ১২৫/-
৫। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	৫০/- ১৫০/-
৬। পাকী	১৫/- ১০০/-
৭। শতরঞ্জের বন্দ	২৫/- ১২৫/-
৮। বাস্ক	২৫/- ৩০০/-
৯। হাতী	৫/- ১৫০/-
১০। ঘোড়া	২/- ৩০/-
১১। গরুর গাড়ী	৮/- ৫০/-
১২। ময়ূর-পুঞ্জী	১০/- ১০০/-
১৩। উট	৪/- ৪০/-
১৪। গরু	৩/- ২০/-
১৫। কুকুর	২/- ৮/-



গজদন্ত-নির্মিত শিকারদৃশ্য।

১৬। শূকর	২ — ১০
১৭। মক্ষি	২ — ১০
১৮। কুমীর	৫ — ২০
১৯। হরিণ	২ — ১৫
২০। চামার লাঙল দেওয়া	৩ — ২০
২১। ঘড়ীর চেন	৫ — ৫০
২২। কানের ছল	৪ — ১০
২৩। বধু, পুরুত ঠাকুর, ধোবা, ভিল্লি, পিয়ন, পেয়াদা, দর্জি, সিপাহি, ফকির, পুলিশম্যান প্রভৃতির মূর্তি	২ — ৫
২৪। কাগজ-কাটা	১ — ৩০
২৫। বালা, চুড়ি	২০ — উর্দ্ধ
২৬। কার্ড-কেস	৬ — ১৫
২৭। পশম-বোর্না কাঠি	১০ আনায় ৪টি
২৮। কুরস কাঠি	১
২৯। ফটোগ্রাফের ফ্রেম	১৫ — ৬০
৩০। চোঙা	৩০ — ১০০

৩১। ছড়ি ২৫ — ৭৫

৩২। চামর ০.১

৩৩। চিরুণী ১ হইতে উর্দ্ধ

জিনিসের আকার, মূর্তির সংখ্যা, কারুকার্যের সূক্ষতা ও বাহুল্য, বেজোড় অশুভ দাঁতের তৈরী বা খণ্ড খণ্ড জোড় দিয়া তৈরী প্রভৃতি অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়। \*

শ্রীবিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

## বাঙ্গালা শব্দকোষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।

আজ তিন মাস হইতে প্রত্যহ এই শব্দকোষখানি লইয়া যতই আলোচনা করিতেছি ততই ইহার অসাধারণ সংগ্রহ ও সম্পূর্ণতার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইতেছি। একটি সামান্য শব্দেরও যত প্রকার অর্থ থাকিতে পারে তাহা দৃষ্টান্ত সহিত দেওয়া হইয়াছে (যেমন, 'ত' দেখুন); একটি শব্দ বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইলে কত প্রকার বিভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহাও ধরা পড়িয়াছে (যেমন, 'জল', 'ধরা' প্রভৃতি শব্দ); একটি জব্বোর বা বিষয়ের বিভিন্ন আকার প্রকারের ও অংশের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে (যেমন, 'জাল', 'চেঁকি, তাল ইত্যাদি); বঙ্গদেশে পরিচিত পাছগাছড়া, পশুপক্ষী প্রভৃতির নাম, পরিচয়, আকার, স্বভাব প্রভৃতিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে (যেমন, আলু, নেবু ইত্যাদি)। ইহা যোগেশ বাবুর জ্ঞান সুপণ্ডিতের জ্ঞান, জিজ্ঞাসা, অন্বেষণ ও ধৈর্যের উজ্জ্বল পরিচয়। ইহার সবকক্ষ বাংলা অভিধান দেখি নাই, শীঘ্র দেখিবার সম্ভাবনাও দেখি না।

কিন্তু এই সুসংগৃহীত শব্দকোষেও আমার আনা ছই দশটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে; কোনো প্রদত্ত শব্দের অর্থান্তর বা ব্যুৎপত্তি আমার হয়ত অন্তরূপ বলিয়া আনা আছে। তাহারই কয়েকটি বখাজান নিম্নে আলোচিত হইতেছে। তবে খুব সম্ভব আমার প্রদত্ত অনেক শব্দ বা অর্থ শব্দকোষে দেওয়া আছে, আমার চোখ এড়াইয়া যাওয়াতে আমি সেগুলিকেও অধিকন্তু নু. দোষায় বনে করিয়া পুনর্বার লিখিতেছি। সে ক্রটি কোষকার ও পাঠক মার্জনা করিবেন। তবে ইহার অন্ত কোষকারও কতকটা দায়ী; কারণ অনেক শব্দই ঠিক বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয় নাই; অনেক শব্দ এমন ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছে যে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। এবং ইহার অন্ত বাংলা ছাপাখানাও কতকটা দায়ী, — সমস্ত শব্দ, অর্থ, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ, একই রকম রূপে দেওয়াতে কোন্টি যে কি তাহা সহজে পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া যায় না।

\* এই প্রবন্ধটি বাঙ্গালা পত্ৰমেটের প্রকাশিত "বাঙ্গালার হাতীর দাঁত ধোদাই" নামক ১৯০১ সালের রিপোর্ট হইতে সঙ্কলিত।

কতক শব্দ বা কোষকারের ও আমার উচ্চারণ-পার্থক্যে আমার যেখানে খোঁজা উচিত সেখানে খোঁজা হয় নাই বুলিয়া চোখে পড়ে নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কোষকার শব্দের যে রূপ কোষ- ও ব্যাকরণ-সঙ্গত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অর্থ দিয়া অন্তর্গত প্রচলিত রূপও দেওয়া উচিত ছিল; এবং তিনি সেরূপ অনেক স্থলে দিয়াছেনও; এমন কি গ্রাম্য স্ত্রীজনের ব্যবহৃত অতি অপভ্রংশ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। তিনি বাহাকে ভাষা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক শব্দ কোষ-লিখিত উচ্চারণে ব্যবহৃত হয় না; কোষকার বলিতে পারেন যোজনাস্তে ভাষা, কত রকম উচ্চারণ দিব? কিন্তু আমার মনে হয় আজকালকার culture-এর কেন্দ্র কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ দিলেই কাজ চলিতে পারিত। অবশেষে আর একটি কথা নিবেদন করিবার আছে; কোষ বিদেশীর জ্ঞান সঞ্চলন করিতেছি মনে করিয়া শব্দ সজ্জিত করা উচিত, তাহার অর্থ লেখা উচিত। এই কোষে বিদেশী লোক অনেক শব্দ সহজে খুঁজিয়া পাইবে না। প্রত্যেক ইংরেজি অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, ধাতুর মোটামুটি সর্ব কাল ও পুরুষ সম্পর্কে রূপ পরিবর্তন, একবচনের বহুবচন রূপ প্রভৃতি নির্দেশ করা থাকে, এইহাতে বিদেশী লোক অভিধান হইতে ব্যাকরণেরও অনেক বুটিনাটী জটিলতা বুঝিতে পারে এবং একই শব্দের অবস্থা-বিপর্যয়ে কত রকম রূপ-বিপর্যায় হয় তাহা ধরিতে পারে। এই কোষ-ধানিতেও সেরূপ কতকটা আছে; আর একটু বিশদ হইলে অধিকতর উপাদেশ ও উপকারী হইত। যোগেশ বাবু যে বলিয়াছেন তিনি কোন্ ভাষার শব্দ তাহা নির্দেশ করিয়া দিলেই খালাস, তাহা আমার সমীচীন মনে হয় না। আগেকার অভিধানে সঞ্চলন-কর্তারা দাবনিক ও দেশজ বলিয়াই নিশ্চিত হইতেন; যোগেশ বাবু তাহার স্থলে আরবী ফারসী ইত্যাদি নির্দেশ করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে ইতর-বিশেষ কি হইল? প্রত্যেক বিদেশী শব্দের অর্থম ও ধাতুগত অর্থটি দিয়া তাহা ব্যাংলায় কি অর্থে দাঁড়াইয়াছে তাহা নির্দেশ করা উচিত। রুমাল শব্দটি ফারসী, ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে না, রু—মুখ, মাল ( মালিদান )—মোছা, মোট অর্থ মুখ-মোছা বস্ত্রখণ্ড, জানিতে পারা চাই। ইংরেজি যে-কোনো অভিধানে এইরূপ ব্যুৎপত্তি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া থাকে; এমন কি অনেক অভিধানে সমাসবদ্ধ শব্দের প্রত্যেক বীজ-শব্দ বুঝিবার সুবিধার জ্ঞান মধ্যে হাইফেন দিয়া লেখা হয়; বাংলা শব্দকোষেও সেই প্রণালী গ্রহণ করিলে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসুর যথেষ্ট উপকার করা হয়। বরকন্দাজ = বরুক-অন্দাজ, জাগীরদার = জাগীর-দার চুগলীখোর = চুগল-খোর, ছেপায়া = সে-পায়া, পিলা = পিল-পা ইত্যাদি প্রকারে লিখিয়া বীজ-শব্দের অর্থ দিয়া সমগ্র শব্দের অর্থ দিলে ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহা যে-ভাষার শব্দ সেই ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের কর্তব্য বলিয়া অবহেলা করা যায় না; ইহা বাংলা ভাষার অভিধানে না থাকিলে সে অভিধান অসম্পূর্ণ। এত পরিশ্রম করিয়া এত দিন পরে এমন সুন্দর শব্দ-কোষ সঞ্চলন যদি হইতেছে, তবে তাহা সুসম্পূর্ণ নিখুঁৎ না হইবে কেন? শব্দকোষে অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ঐরূপেই দেওয়া হইয়াছে; এবং এত বিস্তারিত বিভিন্ন রকমে দেওয়া হইয়াছে যে সঞ্চলন-কর্তার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; কিন্তু সমস্ত শব্দের দেওয়া হয় নাই, ইহাই আমাদের দুঃখ। সহজে বুঝা পাইবে বলিয়া কোনো কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি ছাড়িয়া যাওয়া কাব্যকারের কর্তব্য নহে।

আমাদের আপশোষ হইতেছে যে যোগেশ বাবু একখানি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার অভিধান সঞ্চলন করিলেন না কেন? বাংলার প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলি জুড়িয়া দিয়া, ইংরেজির ওরেবেটোর কি সেফুরী ডিক্সনারীর জায় একখানি অভিধানের অভাব, এই বাংলা শব্দকোষের ঘারা যোগেশ বাবু দূর করিতে পারিতেন, এবং তিনিই যোগাতম ব্যক্তি। আমাদের সনির্ভর অনুমোদন তিনি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভাষার এই দারুণ অভাব ঘোচন করিয়া নিজের অক্ষয় কীর্তি রাখিবেন ও বাঙালী মাত্রেই ধন্যবাদভাজন হইবেন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে নূতন শব্দ যে দুই দশটা আছে তাহা কলিকাতা ও হুগলির গঙ্গাতীর অঞ্চলে ব্যবহৃত। কয়েকটা শব্দ পূর্ববঙ্গের ও মালদহের যাহা আছে তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। এই সমস্ত শব্দ ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি যোগেশবাবুর বিচারের জ্ঞান উপস্থিত করিতেছি মাত্র।—

অগস্তা-যাত্রা—অগস্তামুনি বিজ্ঞাকে অবনত করিয়া দক্ষিণে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; তাহা হইতে, এমন যাত্রা যে আর ফেরা না যায়।

অয়েল ক্লথ—Oil-cloth.

অফুরন্ত—অ-শেষ।

অল্‌ভেড—অ-পোছালো, হাবলা, লক্ষ্মীছাড়া।

অসামাল—অসাবধান, রক্ষা করিতে অসমর্থ। কাপড়ে অসামাল হওয়া—কাপড়ে বাহে করিয়া ফেলা।

অতিষ্ঠ—থাকিতে অশক্য।

অঠেল—যাহা ঠেলিয়া সরানো যায় না, প্রচুর, অনেক। যথা, অঠেল জিনিস বা কাজ। যাহা অর্থাৎ করা যায় না; যথা, অঠেল কথা।

অসৌরস, অশ্বরস—(অ-সরস?) ঝগড়া, কলহ, মনোমালিন্য।

অবাক্‌ জলপান—যে জলপান খাইলে এমন ভালো লাগে যে বিশ্বয়ে অবাক্‌ হইতে হয়।

অগত্যা—এই শব্দটি সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত স্তব্ধান্তেই অব্যয় রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তুলনীয়—দৈবগত্যা, হঠাৎ, দৈবাৎ, যদিচাৎ।

অভঙ্গ—তুকারামের রচিত শ্লোক।

অমায়িক—( সং ). যে মায়া বা মিথ্যা জলনা জানে না, সরল।

অজু, ওজু,—আঃ, বুজু—স্নান, প্রক্ষালন।

আঁটুল বাঁটুল—ছেলেদের খেলা; পা ছড়াইয়া বসিয়া পায়ে উপর হাত আঘাত করিতে করিতে বলে—আঁটুল বাঁটুল ( ? ) শামলা শাঁটুল, শামলা গেছে হাটে; শামলাদের ছুটি মেয়ে পথে বসে কাঁদে; আর কেঁদনা আর কেঁদনা ছোলা-ভাজা দেবো, আর যদি কাঁদবে বাছা তুলে আছাড় দেবো।

অদুস্তানা—Thimble,

অটুট—স্বভয়।

অটোল—নিটোল।

এই দুটি শব্দ টুট ও টোল শব্দের negative রূপ হইলেও শব্দ দুটি ( বিশেষত অটুট ) বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এজন্য ইহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যিক।

অতুল—তুলনা-রহিত; তাহা হইতে, প্রচুর।

আব্‌জা—( আওজা শব্দকোষে ), ভেজাইয়া দেওয়া, কপাট বন্ধ করা কিন্তু খল না দেওয়া, শুধু দুই বাইল কপাট মুখে মুখে ভিড়াইয়া দেওয়া। শব্দকোষে ইহার বিপরীত অর্থ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ প্রয়োগ কখনো শুনি নাই।

আসন্ন—ফারসী শব্দ। ফারসী কেতাবে (আলিফ, সে, রে বানানের) আসন্ন শব্দ পাইয়াছি, কিন্তু অভিধানে পাইলাম না।

আজ্জা—ধাতু, গৃহের বীজ বা চারা বপন করা।

আবখোরা—ফাঃ আব্ (জল)—খোরা (খুর্দন—খাওয়া), জল • খাওয়ার পাত্র। পাথরের বড় বাটি।

আত্তি—“হেলেকে আত্তি করা” মানে হেলেকে আদর বদ্ধ করা। বোধ হয় আত্তীয়তা শব্দজ।

আবাটা—যাহা বাট নয়।

আঁশ—ধাতু, অন্ন শুষ্ক হওয়া; যথা, কাপড়খানা অন্ন আঁশিয়েছে।

আফলা—যে গাছে এখনো ফল ধরে নাই।

আঁধি—খুলার বড় যাহাতে লোককে অন্ধ করিয়া তোলে।

আপ্‌সা, আফ্‌সা—ধাতু, আফালন করা, রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করা। ফারসী শব্দ? না আফালনের অপভ্রংশ। ফারসী আফ্‌শান— ছড়ানো, বিস্তারিত করা। আরবী আফীদন—হুকুরের খেঁক-খেঁকানি।

আপাস ধাপাস—রুদ্ধ ক্রোধ স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া ইচ্ছিতে আচরণে কাজে কর্ত্তে প্রকাশ করা।

আলপিন—আল বা মাথা-ওয়াল pin বা সূচ।

আলটপকা—আলগোছে সমস্তটা গোটা গিলিয়া ফেলা।

আলাত পলাত, আতারি কাতারি—রোগ-যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করা।

আসাঁ—অপরিষ্কার গলিঘুঁজি স্থান, যেখানে সাপখোপের ভয় আছে। আরবী আসাঁ—স্থান।

আলতারাক—বাল্ম আলমারীতে তাল লাগাইবার জন্য যে আঙ্গুঠা ও কজা দুই বাইল কপাটে লাগানো থাকে। (আঃ, আল-তবুক্—যাহা একদিকে থাকিয়া অপর দিককে বন্ধ করে।)

আঁক-বাড়ি—আঁক (অঙ্ক)-বাড়ি (লাঠি), যে লাঠিতে আঁক কাটিয়া মুখ বেপারীরা রোজের জোগান দেওয়ার হিসাব রাখে।

আদত—আস্ত, গোটা, অখণ্ড; মোট, সমষ্টি।

আদদ—আরবী, সংখ্যা।

আওড়ি—যাহা সময়ের পূর্বে হয়।

আজল, অঁজুলি—আরবী, অত্যন্ত নীচ বা হীন; তাহা হইতে বাংলা অর্থ, ঞ্জাকা, বোঁকা, যে বুঝিয়াও না বোঝার ভান করে।

আদেখলা—যে কিছু দেখে নাই বলিয়া অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়া প্রত্যেক জিনিসই স্বয়ং চাখিয়া দেখিতে চায়; তাহা হইতে অর্থ—লোভী, ক্যাঙলা।

আজর গাজর—যা-তা; যথা, আজর-গাজর কতকগুলো ধৈয়ে পেটের অস্থখ করেছে।

আলাদ—(বোধ হয় আরবী শব্দ) বড়া, মোটা কাছি, (আহাজের মুসলমান মসজিদ বাবহার করে)। মালদহ জেলায় কেউটিয়া সাপের নাম আলাদ; দড়ীর মতো বলিয়া? গোকুর; সাপের নাম মালদহে গোহমা। হিন্দুস্থানীরাও বলে। অর্থ কি? আলগর্দ কোন ভাবার শব্দ?

আছিল—সং আসীৎ। ছিল শব্দের প্রাচীন রূপ, পদ্যে ও মালদহ জেলার কথায় এখনো ব্যবহৃত হয়। আহ ধাতুর অতীত কালের আছিল এখন ছিল, হয় ইহা শব্দকোষে নির্দেশ করা উচিত ছিল।

আড়বাদলা—আড়া-আড়ি তিথ্যক ভাবে কোনো জিনিস বিশ্ব্খলায় পড়িয়া থাকার ভাব; যথা, অমন আড়বাদলা হয়ে গেলে কেন, সোজা হয়ে শোও।

আধক্খী—অধিক পাইতে পারে যে; তাহা হইতে অর্থ—লোভী যথা, অমন আধক্খীর মতো গিল না।

আকচকানো—হঠাৎ ভয় পাইয়া ধতমত ধাওয়া।

আড়ি—ছোট সরু করাত। (ফারসী আব্‌রাহ্,)

আবডাল—আড়াল।

আফর—ধাণ্ডের বীজ।

আফরা, উফরা—ধাণ্ডের রোগ বিশেষ; পোকা লাগা।

আর্ট—Art, আজকাল বাংলায় খুব চলিয়া গিয়াছে।

আগেকার—পূর্ববর্তী, সম্মুখবর্তী।

আসকৎ—হিন্দী শব্দ? আলস্ত, দীর্ঘসূত্রতা।

আস্তর, অন্তর—ফারসী শব্দ The lining of a garment.

আইডিগরে—নাবডিগরে; যে লাফাইয়া ডিঙাইয়া চলে, ছরস্ক।

আক্কাটা, আংঠা—অক্ষার-শকটী আঙুন পোহাইবার • আঙনের যাতুপাত্র, প্রায়ই লোহার হয়, পেটটা হাঁড়ির মতো, উপরে ধরিয়া তুলিবার জন্য একটা বড় আংঠা সংলগ্ন থাকে এবং তলায় তিনটা ছোট ছোট পায়া থাকে। মাটির কলসী ভাঁড়িয়া কানাটা বৈঠক ও খোলাটা স্থালী করিলে যে অক্ষারশকটী হয় তাহাকে বলে “খাপরা”। কাঁচা মাটির “আলগ্-চুলা” বা “তোলা-উননের” গ্রায় অগ্নিপাত্রকে বর্ষী বলে। এই শব্দগুলি মালদহ জেলায় সমধিক প্রচলিত।

আওড়—আবর্ত।

আওরা—ধাতু, inflammation; যথা, কোড়াটা বড় আওয়েছে।

আচমনী—যে খাদ্য খাইয়া আচমন করিতে হয়,—লুচি, রুটি, পুরোটা জাতীয় ও মুন্ডি জাতীয় খাদ্য, যাহা বিধবা ও যতী ব্রাহ্মণের একাধিকবার খাইতে নাই।

আঁজন—অঞ্জন।

আঁজুপাঁজু—কালীপূজার পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে পাটকাঠি আলাইয়া যে উৎসব হয়। মালদহ প্রভৃতি জেলায় ছঁকাছঁকি বলে। উহার মস্তুর প্রথম কথাটি মাত্র মনে পড়িতেছে—ছঁকুঝরে ছঁকিরে। ছঁকা ধাতু মানে আন্দোলিত করা, যথা, পাখা ছঁকানো। শব্দকোষে ইজল-পিঁজল শব্দ দ্রষ্টব্য।

আঁড়ুমাড়ু, আঁড়ুবাঁড়ু—গা বমি বমি করা। পেট আঁড়ুমাড়ু করে, কিন্তু গা বমি বমি করে।

আঁদরসা—চালের গুঁড়া গুড়ে মাতাইয়া জল রিনা কে মালপো আকৃতি পিষ্টক হয়।

আগ তোলা—কোন খাদ্যসামগ্রী খাইবার পূর্বে দেবতার জন্ত উদ্দিষ্ট সামগ্রী অগ্রে তুলিয়া সরাইয়া রাখা।

আগালে—বিশেষ ডগ্‌লা অংশ।

আজনাই—আজনি চক্ষুরোগ।

আহিজে—ফাঃ আহজ্, আকাফা, উদ্দেশ্য।

আটপলা—octagonal.

আটকাল—আন্দাজ; যথা প্রবচনে, তুমি যতই বাচঁ মাজ আমায় হাতের আটকাল আছে।

আটল—মাছ ধরা বিত্তি বা ঘুণী।

আটলা—হাঁড়ি কলসী বসাইবার বিড়ে।

আড় করা—অন্তরাল করা।

আড় হওয়া—শয়ন করা।

আড় ভাঙ্গা—অস্পষ্টতা ঘূর হওয়া; আলস্ত ত্যাগ করা।

আড়াঝোড়া ভাঙ্গা—গা মুড়িয়া আলস্ত ত্যাগ করা।

আড়কাটি—Pilot, যাহারা আহাজের কাণ্ডেন বা লান্ডেকে জগ

চিনাইয়া লইয়া যায়। তাঁতির যন্ত্র বাহা দ্বারা সে পড়েন সূতা ঠিক করে।  
 আড়ং-ছাঁটা—যে চাল আড়ংও বী চাল প্রকৃতির স্থানেই ছাঁটা হইয়াছে; বাহা ঢেঁকি ছাঁটা নহে।  
 আড়পাপড়া—ছোট খাটো লাঠি; খেটো।  
 আড়পার—ঠিক নদীর ওপারে। সালথিয়া কলিকাতার আড়পার।  
 আড়া আড়ি—বাদাবাদী, পরস্পরে বিবাদ; এপার হইতে ওপার পর্যাস্ত বিস্তৃত।  
 আড়ুলি, আড়ুরী—নদীর কাছাড়, অর্থাৎ যে পাড় ভাঙিতেছে সেই ভাঙা পাড়।  
 আদার—সং শব্দ, না আরবী 'আদা' শব্দ? খুব সম্ভব আরবী শব্দ। তুলনীয় 'বিদায়' আরবী 'বিদা'। প্রাচীন সংস্কৃতে বিদায় আছে কি?  
 আঙিল—( অঙল? অণ্ড-ওয়ালা?) প্রায়ই টাকার আঙিল— অতি ধনী।  
 আতেলা—তৈলহীন, অঁতৈল। যথা, আতেলা রান্না বা নাওয়া।  
 আধ আধ, আদ আদ—অর্ধস্কট।  
 আধবয়সী, আধবুড়ো—যে সম্পূর্ণ বয়স পায় নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ বুড়ো নয়।  
 আনাড়িয়া, আনাড়ো—যে লোক আনাড় বা আনাড় ঘাঁটিয়া বেড়ায়, নোংরা, অপরিষ্কার, ম্লেচ্ছ।  
 আধাবিগড়া—আধা খেচড়া, অর্ধেক সম্পন্ন ও অর্ধেক নষ্ট।  
 আনারসী—আনারসের গুায় অল্পমধুর স্বাদযুক্ত।  
 আনী—এক আনা মূল্যের মুদ্রা।  
 আফা, আফানি—মাছ ধরবার বাড়ের কাছে মাছের গাঁধি লাগিলে মাছ বাড় ডিঙাইবার জন্ত লাফাইতে থাকে, সেই লক্ষ্য।  
 আধা—খেলায় খুড়ি, খেলা অল্পক্ষণ বন্ধ রাখিবার সঙ্কী শব্দ, মুখে হাতের তালু ঠুকিয়া ঐরূপ শব্দ করে। আরবী ইবা—নিষেধ।  
 আবুআ—বাহার আব আছে।  
 আমান—Amen, আরবী শব্দ। সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে ব্যবহার আছে।  
 আমড়াগেছে (করা)—খোসামোদ করা। নিফল অর্থে ব্যবহার শুনি নাই।  
 আরবী—আরব সম্বন্ধীয়।  
 আরিশ—আরিশ, অর্শ।  
 আলুনী—লবণশূণ্য।  
 আলগোছী ( দেওয়া )—শিশুর প্রথম ছাঁটিবার জন্ত পা তুলিবার চেষ্টা। যথা, খোকা আলগোছী দিচ্ছে।  
 আজাড়—ফাঃ আজাদ ( মুক্ত ) হইতেও হইতে পারে।  
 আলতো আলতো—উপর উপর, তলার জিনিস না ঘাঁটিয়া বা ঘুলাইয়া উপরের জিনিস তুলিয়া লওয়া।  
 আমেজ—মিশ্রণ, মিশ্রিত।  
 আঞ্জমন—সমিতি, সভা, দল, সমাজ। ( ফারসী )  
 আঞ্জুরজে—( সং + ফাঃ ) স্বার্থপর।  
 আলিয়া—নাঠে বা জলায় বাষ্পসম্মত আলোক।  
 আকারা—ফাঃ প্রকাশিত অর্থেও বাংলায় ব্যবহার আছে। যথা, খুনের আকারা হইয়াছে।  
 ইঁচলা—শব্দকোষে অর্থ দেওয়া হইয়াছে বড় চিংড়ি মাছ বিশেষ।

রবিবারে মাছ নাওয়া নিষেধ; সেই নিষেধ অবহেলা করা হইল কিনা ইঁচলা ধাইয়া। ইঁচা হইতে অর্থ মনে হয় যুসো চিংড়ি।  
 ইঞ্জবন্ধ—যে বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্য দেশে ফিরে।  
 ইঞ্জিল—মুসলমান শাস্ত্রে বাইবেলের নাম।  
 ইটা ভিটা—ভিটার ইট পর্যাস্ত। যথা, ইটা ভিটা উজাড় করে তবে ছাড়ব।  
 ইকড়ি মিকড়ি, ইচকি মিচকি—বালকদের খেলা; দুই হাতের আঙুল উবুড় করিয়া-পাতিয়া এতোক আঙুলের উপর চিমটি কাটিতে কাটিতে যে ছড়া বলিতে হয়—“ইচকি মিচকি” তাহার আদিত্তে আছে বলিয়া খেলারও ঐ নাম হইয়াছে।  
 ইউনানী—ফাঃ Ionian, গ্রীসসম্পর্কীয়। ইকিমী-চিকিংসা।  
 ইনকম ট্যাক্স—Income Tax.  
 ইম্পিরিট—Spirit.  
 ইনিয়ে বিনিয়ে কাদা—নানাবিধ কথা বলিয়া করুণ সুরে কাদা।  
 ইঁদরজালি—যে ফলের কচি অবস্থাতেই ভিতরটা কুরকুটে হইয়া যায়।  
 ইংলিশ—ইরপের আকার-বোধক নাম; পাইকা অক্ষরের ঠিক বড় সাট।  
 ঈষ—তুলনীয় ফাঃ হীশ্, লাঙ্গলের দণ্ড।  
 উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে—প্রবাদের মধ্যে একটি ইতিহাস আছে। বলরাম ঠাকুর ( মুন্সেপাখায় ) বংশীর উদো ও বুধো নামক দুইজনের পিণ্ডের গোলমালে কি একটা বংশগত গোলমাল ঘটয়াছিল। সমস্ত কাহিনীটা মনে পড়িতেছে না; কোনো কুলজী গ্রন্থও এখন কাছে নাই।  
 উদম, উদাম, উদলা—উলঙ্গ, নগ্ন, অনাবৃত, খাড়ু। “তোমার কেবল যোমটা খুলে উদলা করে ফেলা।” ( গোবিন্দচন্দ্র দাস )। লোকটা যেন উদম খাড়ু—এখানে উদম উদাম শব্দের অপভ্রংশ।  
 উরসুনি—বর্ষণ শব্দজ; বৃষ্টির পুর চালের ছাঁইচ দিয়া সে আবিল জল পড়ে; তাহা হইতে রং-করা জল। যথা, দুধ ত নয় বেন উরসুনি জল।  
 উফা—সিদ্ধ চাউল, বাহা উফা করিয়া তৈয়ারী হয়।  
 উলসা—ধাতু, উল্লসিত হওয়া, আনন্দবিহ্বল হওয়া।  
 উঁকি ( মারা ), উঁকিঝুঁকি—গোপনে থাকিয়া চুরি করিয়া খুঁকিয়া দেখা।  
 উজবুক—আহাম্মক, নিবুদ্ধি, বোকা ( উজবক জাতির গুায় )।  
 উথলা, ওথলা—মেঘ পরিষ্কার হইয়া যাওয়া, বাদলা কাটিয়া যাওয়া।  
 উড়ু খুড়ু—উড়ু কুঁ, যে পানীর চানা অল্প অল্প উড়িতে পারিতেছে।  
 উবু চুড়ু চুড়ু, উভুচুভু—পরিপূর্ণ কোনো পাত্র এমন ভরা যে জ্বা পাত্রের কানা ছাড়াইয়া উর্কু হইয়া উঠিয়া যত ধরে তত ধরিয়াছে।  
 উচাটন—উৎকর্ষিত; উন্নত। ( সংস্কৃত উচ্চাটন )।  
 উরুলি বুনুরি—এমন ছোঁড়া ( কাপড় ) যে বালকের গুায় ফালি ফালি হইয়া গিয়াছে।  
 উডন্ত—যে জিনিস উড়িতেছে।  
 উপুড়হস্ত—দানের ভঙ্গা; যথা, লোকটা কখনো উপুড়হস্ত হয় না।  
 উস্কুরো—কোনো চাপ জিনিস শুকাইয়া বুরো হইয়া থাকিলে তাহাকে উস্কুরো বলে; প্রায়ই শুষ্ক বিঠার সম্পর্কে কথিত হয়।  
 উঠে পড়ে লাগা—শরীর পতন কিংবা স্বকাৰ্য্য সাধন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্তব্য করা।

উঠবোস—উঠিয়া বসিয়া কসরৎ বা ব্যায়াম বা শান্তি ।  
 উ-টা বাজি—ডিগ বাজি ।  
 উনকোটি চৌষটি—আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রীর খুঁটিনাটি বড় হইতে ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত । যথা, তোমার উনকোটি চৌষটি জোগাড় করে দেবো তবে তুমি রাখবে, এমনি ত তুমি রাখি ।  
 উকুন-বাড়ি—( উৎকার ) ধান বাড়িবার সময় শস্ত হইতে বড় পৃথক করিয়া লইবার দণ্ড ।  
 উগা—ধাতু, কোনো জিনিসের ঠেলিয়া উঠা ।  
 উটকা—যাহা পরিচিত নহে ; উচকা ; যথা, একটা উটকা বিড়ালে সব দুধ খাইয়া গিয়াছে ।  
 উকড়ি, উড়কি—উড়ি ধান ; যথা, উড়কি ধানের মুড়কি দেবো পথে জল খেতে ।  
 উতলা—তুলনীয় আরবী উতল—নিঃশ্ব ।  
 উড়া-বাও—অসংস্পর্শ-জনিত ব্যাধি বিশেষ ।  
 উতর-ডাকা—সাহের চারের আয়গা ।  
 উতর-ধানা—সরাই ।  
 উনানো—গলানো, দ্রব করা । উনা-ধাতু ।  
 উনুই—উৎস ।  
 উন্দুলু—শশব্যস্ত ।  
 উপর তলা—বাড়ীর উপরের তল ।  
 উস্কা—উক্কে ফুঁড়িয়া তোলা ; যথা, ফোড়ার মুখটা একটু উস্কে দাও না, পুষ বেড়িয়ে যাবে । তাহা হইতে উস্কা খুস্কা—যাহা শুষ্ক এবং উর্ধ্বমুখ ।  
 উস্তং ফুস্তং, উস্তংখুস্তং—উদ্বাস্ত করিয়া তোলা, জ্বালাতন করিয়া তোলা ।  
 এক-জিদ্দি—যে একই বিষয়ে জিদ্দি ধরিয়া থাকে । ( ফারসী )  
 একানে—যাহা একাকা পৃথক হইয়া আছে । ফাঃ এগুনা—এক ।  
 এগু পিগু—নিম্নশ্রেণীর সঙ্কর ফিরিজি ।  
 একেলা—একলা ।  
 এক না এক—অনেকের মধ্যে অন্তত এক ।  
 একনলা—যে ব্যাধি এক নল দিয়া পাখী শীকার করে ; সাতনলা নহে ।  
 একদৃষ্টে—দৃষ্টি এক দিকে স্থির নিবন্ধ করিয়া ।  
 এটর্নি—Attorney, 'সপত্রংশে টর্নি ।  
 এলাকাড়ি—আঁকড়ানো-এলানো ; ঢিল দেওয়া ; মনোযোগ না দেওয়া ।  
 এড়াচে—যাহা এড়াইয়া বা আড় হইয়া পড়িয়া থাকে বা পালাইয়া থাকে ।  
 এরারুট—Arrowroot,  
 এলবার্ট—এলবার্ট কর্তৃক প্রবর্তিত টেড়ি ।  
 এসেস --গনসার ।  
 এসেসার—Assessor.  
 এনভেলাপ—খাম ।  
 এবড়ো খেবড়ো—আবুড়া খাবুড়া ।  
 একুনড়িয়া, একানড়ো—যাহার একটা নড়ি বা লাঠি আছে ; তাহা হইতে এক-ঠেঙ্গুয়া, এক-পেয়ে ভুত ।  
 এঁবে যা—পবাদির ক্ষত ।  
 এক আধ—অল্প স্বল্প ।  
 একধান—এক খণ্ড ।  
 এক-গাছ—এক খণ্ড দীর্ঘ জিনিস ; এক বৃক্ষ ভরা । যথা, এক গাছ আধ ; এক গাছ আম ধরে আছে ।

এক গেয়ে—এক গ্রায়ের ।  
 এক ছুট—এক বস্ত্র ; এক দৌড় ।  
 এক সঙ্গে—একত্র ।  
 এশুঞ্জারী—আরবী, অপেক্ষা, আশা, অধীনতা ।  
 এজা পেজা—( অজ + উপাজ ) নানা প্রকার । এজা পেজা করা—আদর করা ।  
 এড়া—বাসি, ছাড়া, আশোয়া ; যথা এড়া কাপড়, এড়া মুখ ।  
 এদিক ওদিক, এপাশ ওপাশ—একবার একদিকে আরবার অগুদিকে ।  
 এফাঁড় ওফাঁড়—কোনো বস্ত্র এপার ওপার বিদ্ধ (করা) ।  
 এপার ওপার—একবার নদী প্রভৃতির এক পাড়ে আরবার অপর পাড়ে ।  
 এমুড়া ওমুড়া—একবার একদিককার শেষ এবং আরবার অপর দিককার শেষ ।  
 ওর-শোর—শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা দেওয়া, আপাদ মস্তক মুড়ি দেওয়া ; আঁবলোর একশেষ ; যথা, জ্বরে লোকটার ওরঘোর নেই ।  
 ওড়া—কাদাগোবর-লেপা বেতের ঝুড়ি ।  
 ওতে ষাতে চলা—গুপ্ত থাকিয়া শীকারকে আঘাত করিবার চেষ্টায় চলা ।  
 একদম—ফাঃ, এক নিশ্বাস, এক মুহূর্ত ; তাহা হইতে অর্থ, কিছু, অল্প । যথা, তোমার কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না ।  
 এক রা—এক কথা, এক রব । যথা, সব শিয়ালের এক রা ।  
 একসা—ফাঃ একসা—সমান, একাকার ; ফাঃ একমু—এক দিকে ।  
 একলা—তুলনীয় ফাঃ একলু—একক, একমাত্র ।  
 এক কলম—ফারসী ও আরবী, এক সঙ্গে, এক লাগাড়ে ; যথা, লোকটা এক কলমে বিশ বৎসর ঐ আপিসে চাকরী করলে, আজ কিনা তার জবাব হল ।  
 একায়েক—ফাঃ, একে একে, অকস্মাৎ, বরাবর । যথা, আমি বাড়ী থেকে একায়েক তোমার কাছে আসছি ।  
 একা—ফাঃ একা=এক ; এক ঘোড়ার গাড়ী ।  
 ও—সমুচ্চয় অর্থের 'ও' ফারসী শব্দ । নারীর স্বামীর উল্লেখে ।  
 ওসার—আরবী ওসী—বিস্তীর্ণ ।  
 ওয়েষ্টকোট—Waistcoat.  
 ওয়াচ—টেক ঘড়ী ।  
 ওয়াক—বমির শব্দ ।  
 ওপর—উপর ।  
 ওখলা—উখলা, বাদল অপগম ।  
 ওলট পালট উলট পালট ।  
 ওদো—এক প্রকার ধান ও তাহার চাল ।  
 ওসান—চৌকিতে ধান ভানিবার সময় ধান নাড়িয়া দেওয়া ।  
 ওলী—আরবী, বন্ধু, প্রায়ই ওলী অছি যুগ্ম ব্যবহার হয় ; সাধু পুরুষ ।  
 ওস—প্রাকৃত অবস্থায় শব্দজ ; হিম, শিশির ।  
 কচ—বক্রতা, ফারসী কজ ; প্রায়ই ঘর বাড়ীর বক্রতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় । কপাট চৌকাঠ প্রভৃতির বক্রতাকে বলে কনিট । অগ্ৰাণ্য ।  
 জবোর বক্রতা—আড়মাদলা, ক্যারাচে, তেরছা ।  
 কঞ্চি—ফারসী কম্চী—চাবুক ; তাহা হইতে বাঁশের সরু ডাল, যাহা পাড়ারগায়ে ঘোড়ার চাবুক রূপে ব্যবহৃত হয় ।  
 কিটকিট—অতি মিষ্ট স্বাদ ; মিষ্টিতে গলা কিটকিট করে ।  
 কুনকুন—অতি তীক্ষ্ণ অথচ অপ্রবল বেদনার অনুভূতি । এইরূপ

কনকন, পদপদ, টনটন, কটাস কটাস, চিনচিন, চনচন, ঝনঝন, দপাস, দপাস, প্রভৃতি বহু বেদনা-বোধক শব্দে অসুভূতির সূক্ষ্ম তরিতম্য প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহা বাংলা ভাষার একটি লক্ষ্য করিবার বিশেষত্ব।

কটকী—কটক নগর সম্বন্ধীয়; যথা, কটকী জুতা।

কটকী বাড়ী—যে বাড়ীতে কটক বা বহু লোক থাকে, প্রতিবেশীলা।

কটকটিয়া, কটকটো—ব্যাং বিশেষ।

কড়মা—কদমা বা কর্দম শব্দের রূপান্তর; দইকড়মা ফলার, সহচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কং—কলমের মোচ বা কচ। খুব সম্ভব ফরাসী কঙ্ শব্দ; মানে বাঁকা।

কঁত্রা—দোকানী পসারীকে সম্বোধনের শব্দ।

কপাটী আওজানো বা আবজানো—শব্দকোষের মানে 'ঐমৎ মুক্ত করা' ঠিক নহে। ভেজাইয়া দেওয়া, দুই বাইল কপাটী ভিড়াইয়া বন্ধ করা কিন্তু পিল না লাগানো।

কপাল ঠোকা—কপালে যা আছে হইবে মনে করিয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া গোঁ-ভরে কোনো কাজে লাগিয়া যাওয়া, to take a chance; যথা, কপাল ঠুকে করে ত ফেলি তারপর যা হয় হবে।

কফ—জামার হাতার শক্ত সম্মুখভাগ, ইংরেজি cuff, না আরবী কফ হইতে; আরবী শব্দটির অর্থ হাত, হাতের চেটো বা তেলো।

ইংরেজ আমলের পূর্বে যদি এই শব্দ ভাষায় আসিয়া থাকে তবে আরবী হইতেই আসিয়াছে।

কলিচুন—আরবী Alkali শব্দের কলি হইতে হইয়াছে। কলি মানেই Alkali.

কেহিনুর—ফারসী প্রসিদ্ধ হীরক।

কধি—কাঁচা কমপোক্ত আমের আঁঠি।

কাগজ—এই শব্দের প্রসঙ্গে বাংলা পুস্তকে ব্যবহৃত সর্ব প্রকার কাগজের আড়ার নাম ও মাপ দেওয়া উচিত ছিল; ক্রাউন, রয়াল, হুপার রয়াল; ও তাহাদের সকলের ডবল। কাগজী—কাগজ সম্বন্ধীয়, যাহারা কাগজ তৈয়ারী বা বিক্রয় করে। কাগজী বাদাম—যাহার খোসা কাগজের ত্রায় পাতলা।

কাচ—ছল (বিশেষ্য ও ক্রিয়া); ছদ্মবেশ।

কাচপোকায় তেলাপোকা ধরা—(ত্রায়ে) ছোটর দ্বারা বৃহত্তর পরাভূত বা অভিভূত হওয়া; কাচপোকা তেলাপোকায় চোখ কাণা করিয়া দিয়া শুয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যায় এবং নিজের বাসার মধ্যে পুরিয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে; সেই ডিমের ছানা বহির হইয়া আরম্ভলা খইয়া বড় হয় এবং বাহির হইয়া আসে। লোকে মনে করে কাণা আরম্ভলা একমনে কাচপোকায় রূপ ধ্যান করিতে করিতে কাচপোকা হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে একমনে ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্তি (ত্রায়)।

কাছ—কুঁচকি; লেঙ্গট।

কেটেটে—যে কড়াকড়া জবাব মুখের উপর শুনাইয়া দেয়।

কাণ্ডজান—মানে, সাংসারিক ব্যাপার-জান, না ক্রিয়াকাণ্ডের জান? যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডে কোন্ যজ্ঞ কি দ্রব্য দিয়া কি প্রণালীতে করিতে হয় তাহার জান।

কাপা—মালদহের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দুই থানা ছোট ছোট কাপড় পরিত। একনানী কটিকর, একনানী উত্তরীয়। উত্তরীয়ের

নাম কাঁপা; পরিধেয় বস্তুর নাম পোঁথা। কুচবিহারের কোচেরাও বোধহয় এইরূপ পরে ও বলে।

কাবার—ফারসী শব্দ।

কাঁসী—কাঁসার কানা-উঁচু চিটুকে পাত্র। কাঁসার নির্মিত বলিয়া কাঁসী, না আরবী কাসী (কটোরা, বাটি) শব্দ।

কুড়ুল—মালদহের জাতি বিশেষ, যাহাদের কুড়াল দিয়া কাঠ কাটা ব্যবসা; কুঠারকন্দী।

কুচা, কাচা—বোধ হয় ফারসী কুচক (ছোট) শব্দের অপভ্রংশ।

কুলা—সং কুলা, ফারসী কুলাহ—টুপা, টুপীর আকারের সূর্ণ।

কোলা—আরবী কলা—বেড়। যশোর জেলায়, কোলা—পেট-মোটা জালা।

কোদা—কোনো কোনো জেলায় খোকাকে কোকন (রাজসাহী) ও কোদা (যশোর) বলে। ফারসী কুদক—বালক। স্ত্রীলিঙ্গে কুকী, কুদী।

কুলি—যদি ছাইবার পূর্বে খড়ের আঁটি খুলিয়া খুলিয়া মিশ্রিত করাকে খড় গলদানো বলে; ইহাতে খড়ের গোড়া ও ডগা উন্টা-পাটা মিশ্রিত হইয়া সমস্ত গোড়া বা ডগা একই দিকে থাকিতে পায় না। তাহার পর আঁটি বাধাকে খড় গুলি করা বলে।

কুলী—বাবনিক শব্দ, অর্থ শ্রেষ্ঠ, যথা হোসেন কুলী খাঁ, মুর্শীদ কুলী খাঁ। আমাদের প্রাচ্য দেশে Dignity of Labour বুঝাইবার জগ্ন যে যত ছোট কাজ করে তাহার নাম তত উচ্চ, যথা—মেহতর—শ্রেষ্ঠতর, প্রধান, রাজা।

কেবলা—আরবী, Cynosure, পিতৃতুল্য মাগ্ন। তুলনীয়—কেবলা হাকিম (দীনবন্ধু); কিন্তু এই শব্দ বাংলায় বিক্রপাত্মক হইয়া হাবলা (বোকা) শব্দের প্রায় তুল্যার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কোক—Coke, পোড়া কয়লা।

কোনাচ—পিতলের বা লোহার V° আকৃতির right angular পদার্থ, যাহা বাগ্ন পেটরার কোণে বসাইয়া কোণগুলিকে মজবুৎ করা হয়।

কাঁইলা—কপিলী, না কোম্বুলা? কচি বাছুরকে কাঁইলা বাছুর বলে, তা সে স্ত্রী বা পুং বাহাই হোক।

কানট—(ছুতারের পারিভাষিক শব্দ) দরজা জানলার ফ্রেম ঠিক rectangular না হইলে যে কোণ, acute angle হয়, তাহাকে কানট (কানের ত্রায় সরু) বলে; right angle করিয়া ঠিক করাকে কানট মারা বা কানট ভাঙা বলে।

কড়ার কাঠী—শাধ খবার যন্ত্র।

কড়ুয়া—(হিন্দী) কড়া, কাঁঝালো; যথা কড়ুয়া তেল—সন্নিবার তেল।

কলসা—মাছের কানকুধা।

কাঁটালকুশী—মাছ।

কাঁধি—নদীর উচ্চ পাড়। শব্দকোষে কাঁধ দেখুন।

কাঁদাড়ি—চালের ছাঁচের তলে তলে জল যাইবার পথ।

কাঁধালি বাড়ি, কাঁধ নড়ি—কাঁধে বহিয়া লইতে হয় এমন বড় লাঠি।

কাঁধা—নদীর কিনার।

কাঁধাড়ি—পাহাড়ের চূড়া।

কাঁধ ছাড়ানো—পাক্ষীবাহকের বাধিত কাঁধকে বিশ্রাম দিয়া সুস্থ করিয়া লওয়া।

কাঁঠকয়া—(কাঁঠ-কুপ) নৌকার জল সঁচিবার সেউনী।

কাটাই, কাটানি—কাটনা কাটার মজুরী ; কাটনা দ্বারা উপার্জিত ধন ।

কাঠগোলা—কাঠের আড়ত ।

কানখড়কে—যে অল্প শব্দও শুনিতে পায় ।

কানপাটা, কানের পাতা,—কর্ণেল্লিয়ের বহিরবয়ব, বা কানের নীচের মূড়মুড়ি ।

কান ঘোচড়া—কান মলা ।

কানাড়ি পাতা—আড়ি পাতা, লুকাইয়া দেখা ও শোনা ।

কানের খেল—কানের ময়লা ।

কান মাগুর—মাছ ।

কাতলা পড়া—শীকার পড়া । ডাকাতির সংক্ৰান্ত শব্দ ।

কাদা—ধাতু, কাদা করা ; ক্ষেতে বীজ বপনের জন্য কাদা করা ।  
বুধ দ্বিতীয় সংস্কারের সময় কদর্যা অন্নীয় উৎসব, অধুনা প্রায় লুপ্ত ।

কামড়াশ্বে, কামড়-কাটা—যে জন্তুর কামড়ানো রোগ আছে ।

কামড়ানি—কামড়ের ভাব ; যথা, পেট কামড়ানি ।

কালকিষ্টি, কালিকিষ্টি—কালো + কৃষ্ণ, অতি কালো ।

কালচে—ঈষৎ কালো ।

কেলে—(বিশেষ্য) কাল'র অনাদরের ডাক । (বিশেষণ) কৃষ্ণবর্ণ ; যথা, কেলে জিরে, কেলে কুকুর ।

কিচড়—(কচ্ছর) পঁাক, কাদা ।

কিমতে—কেমন করিয়া ।

কিলদাগড়া—কিল খাইয়া খাইয়া যাহ'র গা দাগড়া দাগড়া হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে, কিল-proof, হিজল-দাগড়া ।

কুঞ্জড়া—ভরকারী বিক্রেতা, ফড়িয়া ।

কুঞ্জড়া-পনা, কুঞ্জড়ামি—ফড়িয়াগিরি, অর্থাৎ ফড়িয়ারা wholesale দামে জিনিস লইবার সময় যে রকম বাকাজাল বিস্তার করিয়া চাষার নিকট হইতে ভুলাইয়া অল্প দামে বেশী জিনিস লয় ; বাচালতা ।

কুড়মুড়, কুড়মুড়—কড়মড় শব্দের নূনতাবাচক ; ঈষৎ শব্দ জিনিস চর্ষণ বা ভঙ্গ করিবার শব্দ ।

কুচুর মূচুর, কুচমুচ, কচমচ, মচমচ—পাতলা কড়া জিনিস চর্ষণের শব্দ । চাল ভাজা কুড়মুড় করে ; বড়ী ভাজা কুড় ড করে ; কাঁচা লক্ষা কচমচ বা কচকচ করিয়া চিবায় ; পঁাপর ভাজা কুচুর বা কুচমুচ করিয়া খায় ।

কুঁদবাটালি—অস্বিস্নেহে ধরাদ করিবার বাটালি ।

কুঁচুই কাঁচা—কণ্টক-লতা, অনেকটা বাবলা পাতার মতো পাতা গাছ ঝোপ পারা হয় ।

কুকুর-মাছি—যে মাছি কুকুরের গায়ে থাকিয়া কুকুরকে কামড়াইয়া আলাতন করে ।

কুটকচালে—যে কাজ সম্পন্ন করিতে ভয়কট ; অটল । যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কুট্র আছে, কুটিল, কুচুটে (কুচক্রী) ।

কুটিকুটি—অতি ক্ষুদ্র অংশে ছিন্ন বা কণ্ডিত ।

কুড়—শেষ, ওর । আঃ, কুল—সমস্ত । উরুড় হয়ে যাবে—সমস্ত ওর (শেষ) হইয়া যাইবে, বা সমস্ত উড়িয়া যাইবে । উরুড় যুদ্ধ শব্দ ।

কুমড়াবড়ি—যে বড়িতে কুমড়া-কোরা দেওয়া হয় ।

কুমড়া-সুন্দানি—যে সুন্দাতে কুমড়া দেওয়া হয় ।

কুলুপকাঠি—চাবিকাঠি ।

কুপী—নখের কোণ বসিয়া গিয়া আঙুলের ক্ষত ।

কাছিম-পিঠে—কুর্গপৃষ্ঠ, Convex.

কাইবোচী—যে বাজ দিয়া কাই তৈয়ারী হয়, তেঁতুলের বীজ ।

কলতানি—কোনো জিনিস-খোয়া আঠালো জলস্রাব (শব্দকোষে কতলা ধাতু জড়বা) ।

কেদুরানি—কোনো জিনিস-খোয়া কর্দমাক্ত জলস্রাব ।

কৌকড়-সৌকড়, কৌকড়া-সৌকড়া

কুঁকুড়ি-সুঁকুড়ি }—কুঞ্চিত জড়মড় হইয়া থুকা ।

যথা, শীতেনাহ: কুঁকুড়ি-সুঁকুড়ি মাঘ-মাসে রাত্রী । (উদ্ভট)

কুপকাপ—ক্রমাগত তাড়াতাড়ি অনায়াসে গিলিবার শব্দ ।

কুমারিয়া পোকা }—যে পোকা মুখে করিয়া কাদা বহিয়া  
কুমীরে পোকা } আনিয়া ঘর করে, এবং তাহার মধ্যে খাদ্য-

কীট সংগ্রহ করিয়া নিজেকে অবরুদ্ধ করে এবং সেই সংরুদ্ধ অবস্থায় ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায় ; ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়া সংগ্রহীত কীট খাইয়া বড় হইলে ঘর কাটিয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায় । কুম্ভকারের ছায় মাটি দিয়া গড়ে বাঁসিয়া ঐ নাম ।

কোপাকুপি—পুনঃ পুনঃ অন্ত্রাঘাত করা ।

কেঁউ কেঁউ—কুকুরের পরাজয় স্বীকারের কাতরোক্তি ; যথা, সকলের বেলা ভ্যা ভ্যা, আর আমার বেলা কেঁউ কেঁউ (এক মাতাল ছাগ মনে কুকুর বলি দিতে গিয়া বলিয়াছিল) ।

কোলাৎ—তাল-বালদো-ছেঁড়া দড়ির ছায় দীর্ঘ সক্র অংশ ।

ক্রুশ—Cross, চেরা ।

কুচুটিয়া, কুচুটো—কুচক্রী, কুটিল ।

কাঁহাতক—(হিন্দী) কোন্ পর্য্যন্ত ।

কহতবা—কথনীয় ।

কচলাস্ত—পাঁচাল পাড়া ।

কাঁদকাঁদ—প্রায় কারার জোঁগাড় ।

কপাৎ—বড় জিনিস হঠাৎ গিলিয়া ফেলার শব্দ ।

কাছাকাছি—দুই বস্তুর পরস্পরের নিকটে সংস্থান ।

কোস্তা—কাঁটা, কাঁড়ন ।

কোস্তাকুস্তি—পরস্পরে ধস্তাধুস্তি (শব্দকোষে কস্তাকুস্তি) ।

কনসার্ট—Concert, একতান বাদ্য ।

ক্রিকেট—খেলা ।

কেরা—তালিকার কোনো কথা বা বাব যাহোই হইয়া সওয়াল চিহ্ন তির্ধ্যাকৃ কবি ।

কোরস—Chorus, সাধারণী বাক্য ।

কেদান্ত—কৃতার্থ ।

কেউ-কেটা—সামান্য ।

কারপদাঁজ—(ফাঃ) কর্ম্মচারী ।

কোলকুঁজো—যে কোলের দিকে অবনত ।

কুলুই—কাঁকর ।

করণা করা—সেবা করা ।

কলা করা—(কলা কারসী শব্দ) মুখ করা, বচসা করা ; তাহা হইতে অর্থ হইয়াছে, হাসনা করা, ছেনালি করা । আঃ, কলাশ-ধূর্ত, শঠ ।

কারাচে—তেরছা, তির্ধ্যাকৃ, কোণাকুপি ।

কপনি—কৌপীন ।

কজাই—ঘোড়ার লাগামের কড়িয়ালি । (কারসী)

কাতারি—অগভীর হাঁড়ি ; প্রায়ই দই কীরের হাঁড়ি ।

কাকানিজা—বলনিজা, কপটনিজা ।

কাটহাঁট—আমার কাপড়ের কাটা ও হাঁটা ।



কুপ্তদার—কুলু তোলা ফুলকাটা কড়া দেওয়া (শাড়ী), ফারসী কুপ্ত (কোণ) দার (খাকা), কোণে আঁচলায় কাঁজ-করা কাপড়।

কসব, কছব—আঃ কিসুব, —একান্ত, রকম।

• কবা—আঁট, খাটো। যথা, কবা জুতা জামা। আরবী কসীর্—খাটো, ছোট।

কাজিয়া—আঃ, কাগড়া, মামলা, মোকদ্দমা।

কিম্বা—কাঃ, খাঁৎলা মাংস, খোড়া মাংস।

কাহিনী—আঃ, কাহিন—দৈবজ্ঞ ; কাহিনী—দৈবজ্ঞের কথা, প্রায়ই কল্পিত মিথ্যা বলিয়া শেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে গল্প।

কেতাবতী, কিতাবতী—কেতাব সম্বন্ধীয়। যথা, কেতাবতী ভাষা, কেতাবতী লোক (বিজ্ঞলোক)।

ক্রুস—Crocket ; ছক-ওয়াল কাঠি দিয়া পশমে বোনা বস্ত্রাদি।

• কটকিনা—কাঃ কৎকিনা—খামারের একাংশ ভাড়া দেওয়া, তাহা হইতে অর্থকর্ণণ্য ; কবাকবি, অতি সাবধানতা, কষ্টকর নিয়ম পালন।

• কসবী—আঃ কসব—ব্যবসা, কসবী=পেশাকর।

কফিন—আঃ কফ্ন, ইং Coffin,—শবাধার।

কুঁজা—ফাঃ কুজা—কুজ।

কাচুমাচু—অপ্রতিভ ভাব। মুখ কাচুমাচু করে।

কশাড়—মোটী কাশ জাতীয় তৃণ ; উহার দণ্ডে ইক্ষুদণ্ডের স্থায়মিষ্ট-রস থাকে।

কবাকবি—পরস্পরে কবা।

• কিলাকিলি—পরস্পরে কিল মারা।

কাচি কাপড়—মোটী সূতার ঘন বুনন গপ্পস কাপড়।

কাচামিঠা—(আম) যাহা কাচাতেও মিষ্ট লাগে।

কাগাবগা } —এক স্থানে কালো এক স্থানে শাদা ;

কাগের ছা বগের ছা } যথা, কাগাবগা করিয়া চুল কাটা, অর্থাৎ

কোথাও চুল বড় আছে (কাগা) এবং কোথাও চুল এত ছোট কাটা হইয়াছে যে, মাথার শাদা টামড়া (বগ) দেখা যাইতেছে।

কোনোটা এক আকারের কোনোটা অল্প আকারের ; কাগের ছা বগের ছা লেখা ( খারাপ লেখা )।

ক্লেতি—ক্লেতের কাঁজ ; চাব আবাদ।

ক্লেতখোলু—ক্লেত ইত্যাদি।

ক্লেতার—চাব আবাদ তদারক।

কীরমোহন—কীরের পুর দেওয়া রসপোয়া।

খচখচ—পারে কাটা খচখচ করে ; তাহার অর্থ কি ?

খটমট—ক্রুদ্ধ চাহনির ভাব ; খটমট করিয়া তাকায়।

বদখন—ঐবৎ তরল পদার্থের ফুটিবাক্ত বা মাতিয়া উঠার ভাব ( শব্দকোষের অর্থ 'খাও খাও ধনি' সব আরণায় খাটে না ) ;

যথা, চোখে পিঁচুটি বদখন করছে ; পথে কান বদখন করছে।

খইন, খয়েন, খোয়াই—খদ, গর্ভ, গভীর।

খাঁওয়া দণ্ডওয়া—পূর্ববৎ খাঁওয়া লওয়া।

খাঁটা—বোধ হয় আরবী কফসু ( খাঁটা ) শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী. খপখী আরবী শব্দের খুব নিকট।

খাণ্ডু—বোকা, নিবোধ, নীরস ; যথা, খাণ্ডা গুণা, লোকটা কী খাণ্ডা। কাঃ খাণ্ডা শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; প্রায়ই ধনী ব্যক্তিই সম্ভ্রান্ত হয়, এইজন্য দ্বিতীয় অর্থ ধনী ; ধনীরা প্রায়ই

• খুব, নিবোধ, নীরস হয়, তাহা হইতে বর্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে বোধহয়।

খাণ্ডুপোষ—খাণ্ডা চাকা দিবার বস্ত্র। ( ফারসী )

খড়িকা—তুলনীয় ফারসী খিলাক।

খুনহুটি } —তাক্তবিরক্ত করা ; প্রায়শ শিশুর সহিতই খুনহুটি  
খুনহুড়ি } করা হয়।

খেই—সূত্রের গুটিকার শেষ বা আরম্ভ-প্রান্ত।

খোল—ওয়াড় ; বালিশের লেপের খোল।

খুচুৎ—অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সহজে কিছু কাটার শব্দ।

খুচুর খুচুর—খুচুরা খুচুরা, অল্প অল্প ; ছোট জিনিসের নড়ার শব্দ।

খুপরী, খুবরী—ছোট ছোট ঘর ; ছাদের আলিসায় খুবরী কাটা থাকে।

খেশটা-মারা—অসুন্দর, বিক্রী। ( মালদহে )

খরজালি—রৌজ-তাপোজাল দিয়া জল শুকাইয়া যে মুন পাওয়া যায়।

খড়মপায়া—যে লোকের পা খড়মের মতন আগে পিছে মাত্র ভূমি স্পর্শ করে, কিন্তু মধ্যদেশ ভূমি হইতে উঠে থাকে। অজ্ঞপিয়া।

খড়া—ইটের দেয়ালের ইট গাঁথার দুই ইটের মধ্যে যে ফাঁক খাঁজ বা দাগ থাকে। ডাকাতেরা খড়া বাহিয়া বাড়ীর প্রাচীর ডিঙাইত।

খড়া-কাটা—দাগ কাটা।

খড়া দেওয়া—খড় খড় করিয়া সঙ্কেত করা যেমন করিয়া বাছ ভূমিতে পড়িলে শব্দ করিয়া জানায় যে বাছ পড়িয়াছে। ডাকাইতি সঙ্কেত—খবর পাওয়া।

খড়িকামুঠি—এক মুঠি খড়িকার ছায় বাহার পায়ে ডুব্রে আজি থাকে ; খড়িকামুঠি মাছ ও কাঁপড় আছে।

খড়ী—জ্বালানি কাঠ।

খড়ুর—শুঁদি নারিকেল ; কাঁচা বেলায় পাড়িয়া শুকাইলে জল শুকাইয়া শাঁস মালা হইতে আপনি ছাড়িয়া একটি গোলার মতো হইয়া থাকে।

খ'তো-মারা—ক্ষতপ্রাপ্ত হওয়া বা যাহা ক্ষতচূষ্ট হইয়াছে।

খতো—চক্ষুরোগ। চোখের পাতা খাইয়া যায় ও পিঁচুটি পুড়ে।

খিমচি—চিমচি।

খয়রা—যে মেয়ে বাঁজাল ও চকিল।

খরসা, খরসা-মুখো—ঘে লোক কটুভাষী। সূতা পাকাইবার সময় টাকু যে কিছুকপোলার উপর রাখিয়া ঘুরানো হয় তাহাকেও খরসা বলে।

খোকসা—ডুমুর।

খাকড়ি—কোনো জিনিস রক্তনের পর পাত্রে যে অংশ অতি তাপে অঙ্গারবৎ হইয়া লাগিয়া থাকে ; যথা ঘিয়ের খাকড়ি।

খাকড়া—খাতু, কোনো জিনিসের পায়ে কোনো কিছু লাগিয়া থাকিলে চাঁছিয়া চাঁছিয়া তোলা। দুধের কড়াই খাকড়াইলে চাঁছি, ও ঘি জ্বালিয়া কড়াই খাকড়াইলে খাকড়ি পাওয়া যায়। অসুনারিক উচ্চারিতও হয়।

খাকসীপেটা—গরম ও শ্রমে ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা। এখানে পেটা মানে বোধ হয় ঠোকা (যেমন হাড়ুড়া পেটা), কিন্তু খাকসী কি ?

খাকুই—তুলার বাঁচি ছাড়াইবার বস্ত্র। কাঁকই ( ককতিকা ) শব্দ বোধ হয়।

খাটো করা—অপদস্থ করা।

খাটো হওয়া—অপদস্থ হওয়া।

খাটোদুষ্টি—short sight বা short sighted ; খাটোদরশন ( রজনী সেন )।

খাটুলি—ছোট খাটিল।

খাড়া—সরল, upright, straightforward ; খাড়া লোক।

খাড়াখাড়া, খাড়াক'খাড়া—অতি শীঘ্র; কোথাও গিয়া না বসিয়া

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাজ সারিয়া ফেরা।

খাড়া ছাড়া—বেশ্চিৎ দেখানো মাত্র টাক, শোধ দিতে হয়।

খাতাই—( ফারসী খতা-দোষ ) দোষী, অপ্ৰতিভ।

খামরই—যে খামার রাখে।

খিটকাল—গোলমাল, গুণগোল, কেলেঙ্কার, নোংরা, অপরিষ্কার।

মালদহে খিটাটো।

খালুই—বাখারী শস্য তৈয়ারী মাছ-রাখিবর সরমুখ নোটাপেট  
ঝুড়ি।

খুঁচি—পুরানো খ'ড়ো চালের গড় উঁচাইয়া নুতন করিয়া না ছাইয়া  
নুতন খড়ের গুঁজি দেওয়া।

খুঁটরা—খাতু, খোঁটা, গভীর জিনিসের মধ্য হইতে সরু কিছুসাহায্যে  
খুঁটিয়া কিছু বাহির করা।

খুঁটনি, খুঁচনা—যে কাঠি দ্বারা খুঁটা যায়।

খোন্দল—খোন্দার আকার, খোঁদল।

খেটে—ছোট মোটা লাঠি।

খোআর—( ফারসী ) দুর্দশা। শতেকখোয়ারী, গালি।

খোশখৎ—যাহার হাতের লেখা ভালো ( ফারসী )।

খাম—দোষ-গ্রস্ত। জিনিস খাম হয়।

খাম্বা—স্তম্ভ।

খেনখেন—খেনখেন; ভাঙা কাঁসার বাজশব্দ।

খাজরি—ইট না পাতিয়া খাড়া ভাবে শোয়াইয়া গাঁথা; ইহাতে  
গাঁথনি মজবুত হয়।

খুবি—ছোট ছোট গর্ত ( করিয়া ক্ষয়ের বীজ বপন )।

খোঁড়ো—তরমুজ জাতীয় ফল, রাঢ়ের প্রসিদ্ধ তরকারী।

খর্শামুখো—( খরশাণ-মুখো )—কটুভাষী।

খী: অ:, খু: অ:—খীষ্টান্দ শব্দের সংক্ষেপ লিখন।

খালাসী—সাহারা জাহাজ খালাস করে; আশাদের দেশে মুসলমান  
ঝাল্লা এই কাজ করে বলিয়া মুসলমান নাবিক।

খিজালৎ, খেজালৎ—আ:, গুণগোল, বিরক্তিকর অবস্থা।

খিজলা—( খাতু )—যথা, মনটা ভারী খিজলে আছে। আরবী,  
দুর্কল হওয়া; তাহা হইতে, বিরক্ত হওয়া।

খুনখারাপি, খুন-খারী ( খুন-খোয়ারী )—রক্তপাত ও বিনাশ হওয়া।

খরাদ—আ:, ভ্রমীযজ্ঞ, কঁদ। 'খরাদী—যে খরাদ করে।

খড়ম—ফারসী খরম শব্দের অর্থ গমন-সৌষ্টব (graceful in  
walking), খড়ম পরিয়া হেলিয়া ছলিয়া চলিতে হয় বলিয়া  
খড়মের নাম হইয়াছে (?)।

খিরখিচ—ফা: খরখিবা—গুণগোল, হাঙ্গাম, ধারামারি।

খঞ্জনী—ফা: খঞ্জরী।

খন্দ—আ:, খন্দক—গর্ত।

খুরী—ফা: কুরী—চায়ের পেয়লা। স্তত্রাং খোরার ক্ষুদ্রতাবাচক  
শব্দ না হইয়া কুরী শব্দও হইতে পারে।

খুসী পিঁড়ি—কুসীর ছায় উচু খুরা-ওয়াল পিঁড়ি।

খাল, খালা—মেসো, মাসি। ( মূলমানী ভাষায় )

খুবলা (খাতু)—খাবলা খাতুর অল্পতা-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বড় জিনিসে খাবলায়, সরু জিনিসে খুবলায়।

গাদ (খাতু)—ফারসী গায়দন্ হইতে গাঁদন হয় নাই ত ?

গরান—ফা:, ভারী; যে কাঠ ভারী সেই কাঠ ?

গড়া (খাতু)—ফারসী গরা—প্রবণতা।

গাজর—ফারসী।

গিলা—ফা: গিল—কুর্দম। কুর্দমবৎ আ-তরল।

গু—ফারসী গু—বির্জা।

গৌড়—বঙ্গদেশের নাম। 'দ্বাপুত্তি কি ? , আরবী গৌর—নাঁবাল  
ভূমি। কোন সম্পর্ক আছে কি ?

গম—ফা: গুম—সং গোমু।

গোড়া, গোঁগা—ফা:, গুজ্—বোবা।

গজাজলী—শাড়ী, যে শাড়ীতে শাদা ড়রে গজার চেউয়ের মতন  
থাকে।

গপ্‌স—মোটা খাপী। ঢাকার তাঁতিরা খুব ব্যবহার করে।

যাবনিক শব্দ বোধ হয়। কিন্তু শব্দটি কি ?

গদাই-লস্কর—ভিক্ষকের মল; তাহাদের উদ্দেশ্যহীন জীবনে কোনো  
তাড়া থাকে না, এজন্য মছুরগামী। লস্কর মানে দলু, সৈন্যদল,  
লোকলস্কর শব্দও পাই। গদাধর লস্করের সহিত কোনো  
সম্পর্ক নাই।

গজা—আরবী গিজা—খাদ্য।

গজাল—যে গোঁজের উপরে আল বা মাথা থাকে।

গেঁতো—অলস, দীর্ঘশ্রী, (শব্দকোষে গতুয়া, কলিকাতার আশে  
পাশে গেঁতো বলে)।

গজমাদন আনা—হজ্জমান বলিয়া ইজিতে গালি।

গভীরা—মালদহের প্রসিদ্ধ নৃত্যগীতোৎসব। শিব ঠাকুরের পূজা  
উপলক্ষে গাজলের সময়ে হয়।

গলাবন্দ—শব্দের সমস্তটাই ফারসী, গলুবন্দ শব্দ একটুখানিক সংস্কৃত  
রূপ ধরিয়া ছদ্মবেশে চলিতেছে, গলা এবং বন্দ নহে। গলুই  
শব্দও ফারসী গলু হইতে হইয়াছে। শব্দকোষের গলুই ঠিক  
নহে।

গাবা—খাতু, গর্ভ হওয়া; প্রায়ই গোকু গাবায়।

গাহক—গ্রাহক।

গু জিয়া—ছোট ছোট ক্ষীর-শলাকা পাকাইয়া গোল-করা সন্দেশ।

গুমসা (মুখ)—যে মুখ হইতে কথা বাহির হয় না।

গির্দে—(ফারসী) গোল বালিশ, তাকিয়া।

গিমলেট—Gimlet.

গাঁধি লাগা—(বোধ হয় গাদী লাগা) এক স্থানে অনেক জিনিস  
(প্রায়ই মাছ) জড়ো হওয়া। চারের গজাকুই হইয়া একত্র  
জমা।

গার্ড—Guard, যে রেলগাড়ী চলিবার সময় তত্ত্বাবধান করে।

গার্জেন—Guardian, অভিভাবক।

গোটা—সুস্তা রুখিবর ভাঙ্গা মসলার গুঁড়া।

গুল—বহুবচনের প্রত্যয়; শব্দকোষে ইহার উল্লেখ মাত্র আছে  
গুলি গুলিন, 'গুলান শব্দে; কিন্তু আসল শব্দটি বাদ পড়িয়া  
গিয়াছে।

গা ভারি—গর্ভ হওয়া; অস্থ বোধ করা।

গা ভারী—শরীর ক্ষুণ্ণ হইতে বোধ করা।

গায়ে থাকা—জমা থাকা, কথা বা ব্যবহার বা ঋণ তোলা থাকা।

গা শোঁকাশু কি—কুতুরেরা অপরিচিত কুকুর দেখিলেই ঝগড়া  
করে, আপোষ হইলে পরস্পরের গা শোঁকে। তাহা হইতে  
অর্থ, ভাব করা, to come to an understanding.

গাছে তুলিয়া মই কাড়া—কোনো কাজে কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইয়া  
তাহাকে আর সাহায্য না করা।

গুটালো—যাহাতে গুটাইয়া থাকার ভাব আছে; যথা, গুটালো মতন  
মুখ।

গাবল—বড় গ্লাস ; খাবল। যথা, এক গাবলে দুটা সন্দেশ খাইয়া ফেলিল।

গড়ন-পিটন—make and shape, make and finish.

গোসলখানা, গুসলখানা—আরবী, স্নানের ঘর।

গোসাঘর—আঃ গুসু সা—ক্রোধ, ধনীগৃহীণীর ক্রোধ হইলে যে ঘর আশ্রয় করেন সেই নির্দিষ্ট ঘর।

গু কাটা—গু সাফ করা ; চরম সেবা।

গু ঘাঁটা—পাগল হওয়া। পাগলেরা প্রায়ই গু ঘাঁটে, সেই লক্ষণায়।

গিলা করা—কাপড়ে গিলার ফল দিয়া চুনট করা।

গিদার, গ্যাদার—দস্ত-জনিত অরুচি।

গাড় রপ্তান—গাড়ুরের স্থায় গম্ব বা মোটাসেফটা।

গ্রামভারী—রাশভারী, যাহার গাভীৰ্যা দেখিলে শ্রদ্ধা সম্ভব ও ভয় হয়। গীতের গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

গু-ডিম—পাখীর বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াও কিছুদিন মলত্যাগ করেনা ; এস বাচ্চা যেন বিষ্ঠার ডিম মনে করা হয়। পাখীর অতি কচি ছানা। গুডিম ভাঙ্গা—কচি বাচ্চার বাহে হইতে আরম্ভ হওয়া। অর্থাৎ শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়া।

গলদা—বড় চিংড়ি।

গলদা—ধাতু, ঘর ছাইবার জন্ত ছোট বড় মিশাইয়া ছাইবার উপযুক্ত করিয়া লইবার জন্ত সমস্ত খড়ের আঁটি খুলিয়া মিশাইয়া বাছিয়া পুনরায় আঁটি বাঁধা। গলদ শব্দের সহিত কোনো সম্পর্ক আছে কি? ফারসী গল্লা—দল, গল্লানো—দলে ভিড়াইয়া দেওয়া?

গেঙ্গা, গোংরা—ধাতু, বেদনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করা।

গোঁঙানি, গেঞ্জানি—গোঁ গোঁ শব্দ।

গ্রামফোন—Gramophone.

গুলেল—গুলতি ধমুক।

গর্ভস্থতী—এক রকম কাপড়।

গজগিরি—দেয়ালে বা মেঝেয় বালিচূন ধরানো।

গাড়—হিন্দী গাঢ়া—গর্ভ। এক গাড় হওয়া—এক গর্ভে পড়িয়া মরা।

গম্ (খাওয়া)—নিঃশব্দ (হইয়া থাকে)। আরবী গম্ (হঃখ) খাওয়া (নীরবে হজম করা)?

গর্ভদাস—দায়ীর পুত্র, যে গর্ভে থাকার সময় হইতেই দাস।

গলান্—গোরুর গলার দড়ি। গলাসি। (শব্দকোষে গলানী আছে)।

গলাসি-গেরো—গলাসি দড়িতে যেরূপ গ্রন্থি থাকে ; দড়ির এক দিকে একটা গোল কড়ার মতো ও অপর দিকে একটা বড় গিরা বা গেরো থাকে, সেই গিরাটা গোল ছিদ্রের মধ্যে ঠেলিয়া পরাইয়া দিতে হয়।

গোঁজে—(শব্দকোষে গোঁজিয়া শব্দ দেখিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু গোঁজিয়া ত খুঁজিয়া পাইলাম না।) টাকা পয়সা রাখিবার থলিয়া।

গাঁটা দেওয়া—আড়ি পাতা, লুকাইয়া দেখা বা শোনা।

গাছ-দা—গাছ, কাটিবার দা, চাঁচ দা।

গাছ-কোষের বাঁধা—গাছে উঠিবার সময় যেমন করিয়া কোষের কাপড় জড়াইয়া বাঁধে।

গুঁজরা—ধাতু, অতিরিক্ত নত বক্র বা প্রবিষ্ট হওয়া। যথা—

“পানিমে ডুব গয়া ভসম ভুসুড়ি খায়া, গুঁজড়ি মুজড়ি করি গুপ।”—(বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর)।

গুজুজিয়া, গুজুজু—(বিশেষণ) যে লোক মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না অথচ ভাবে ভিত্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

গুনকার—বেশী লোকে বলে না, গুনাগার শব্দ দেওয়া উচিত ছিল। যেখানে এক শব্দের একাধিক উচ্চারণ আছে সেখানে একাধিক স্থানে শব্দ দিয়া অর্থ একস্থানে নির্দেশ করিয়া দিলেই চলিতে পারে।

গুপো—চোরা আঘাত ; গুপু আঘাত যাহাতে দৃক্ ছিল বা চিহ্নিত হয় না। গুপা—ধাতুও আছে।

গোঘাসি—গোরুর পেটের অজীর্ণ ঘাস।

গোছাল—যে ব্যক্তি সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া সাজাইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পারে।

গোবরা—ধাতু, গোরুর বিষ্ঠা ত্যাগ করা ; লক্ষণায় কর্তব্য পশু করা।

গোলা—মটর কলাইয়ের শস্ত-শুষ্ক সূতা, শুক্ গাছ ইত্যাদি।

গোটা নাল—মুগের ঘন লালা।

গুঁতা—আরবী ঘোঁতা—দুব দেওয়া, ঝাঁপাইয়া পড়া, plunging, diving : এমন আঘাত যে শরীরে আঘাতের দ্রব্য ডুবিয়া যায়।

গোঁড়া দেওয়া, গোঁড়া মারা—গেঁড়ু বা গোলা দিয়া অপর গোলাকে মারিয়া জিতিয়া লওয়া ; ছেলের হাতে গেঁড়ু দিয়া অলঙ্কার তুলাইয়া লওয়া হইতে অর্থ হইয়া থাকিবে ঠকাইয়া লওয়া। তুলনীয়—ছেলের হাতের মোয়া। ভাষার শব্দসম্মেলনের শুচি অর্থ বাহির করিতে পারিলে ভাষার বলপুষ্টি হয় ; অর্থ অশুচি জানিয়া কোনো ভুললোক তাহা ব্যবহার করিতে পারে না, অতএব পারকপক্ষে অশুচি অর্থ না দেওয়াই ভালো।

গাজী—আঃ, যোদ্ধা।

ঘড়ঘড়—আঃ ঘড়ঘড়া—gargle গর্জিতুল্য শব্দ।

গুম—ফাঃ গুমদন্—গুমানো। তাহা হইতে হইয়া থাকিবে।

গুম্টা, গুম্কা, গুম্ড়া (ধাতু)—গোপন স্থানে গুঁজিয়া রাখা। ফাঃ গুমা—কোণ হইতে?

গুম-পাড়ানি মাসি পিসি—ছেলে-ভুলানো ছড়ায় প্রজাত কোনো মাসি পিসি যাহারা ঘুন্ দিয়া যায়।

ঘোপ, ঘোপঘাপ—ঝোপঝাপ, অন্তরাল : সুবিধাজনক স্থান (ডাকাতের)। যথা, ঘোপেঘাপে ফেরা ; ঘোপ দেগিয়া কোপ মারা।

ঘোড়ামুগ—নিকুট বড় আতের মুগ।

ঘোড়ানিম—নিকুট নিম।

ঘোঁচড়া—একগুঁয়ে।

ঘোরাল—গভীর, ঘন। ঘোরালো নিষ্ট ; রং ইত্যাদি।

ঘোরেরঘারে—ঠারেরঠারে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া।

ঘোঙট, ঘুঙট—ঘোমটা।

ঘুরণ জাল—যে জাল মাথার উপর ঘুরাইয়া ফেলিতে হয়।

ঘুরণ পাক, ঘুরপাক—আবর্তন।

ঘাই—আঘাত ; বঁড়শীর পটোপে মাছের ঠোকর।

ঘাড়া—ধাতু, ঘাড় দেওয়া, স্বেচ্ছে ভার বা লালল বা পাণ্ডীর বাণ লওয়া। তাহা হইতে দায়িত্ব গ্রহণ।

ঘুরণি—ঘুরা, ভ্রমণ ; যথা, আজকে কি কম ঘুরণিটা হয়েছে।

ঘিসকাপ—ছোট রান্দা, কাঠ চাঁছিবার যন্ত্র। কি শব্দ?

ঘুঁকা—ধাতু, জলের মধ্যে হাত ডুবানো, নখনি করা।

ঘণ্টামজল—ঘা-তা অম্প্ শব্দের স্থায় মিশ্রিত (ছত্রিশ জাত) অথচ মজল বলিয়া মানিয়া সকলের সংস্পর্শে আসা।

ঘুসড়া—কাঁচা গাছগাছড়া আঙনে সেকিয়া ঔষধের নিমিত্ত রস  
করাকে কবিরাজী ভাষায় ঘুসড়া বলে।

ঘেস, ঘাস—ভাঙা বাড়ীর চুনসুরকী কাঁকর কুল্লই।

খাটিয়া, খেটো—( হিন্দী ) নিকট।

ঘুণ—যে লোক কোনো বিষয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানে।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—আমি ইহার অনুরূপ allusion জানি—  
দুই ভাই ছিল ঘুঘু আর ফাঁদ। ঘুঘু গোবেচারা রকমের ;  
এক গৃহস্থের বাড়ীতে চাকরী করিতে গিয়া চাকরীর সর্ত্ত হইল—  
দাঁড়াইলে ছেলে ধরিবে, বাসিলে পাট কাটিবে, আজ খাইবে  
কাল খাইবে, খাওয়ার আগে এক খোঁরা আমানি খইয়া যত  
পারে ভাত খাইবে। যদি ঘুঘু চাকরী ছাড়ে তবে মনিব তাহার  
কান কাটিয়া লইবে, আর যদি মনিব ছাড়ায় তবে ঘুঘু মনিবের  
কান কাটিবে। অল্প দিনেই ঘুঘু বেচারা খাটিয়া খাটিয়া ও না  
খাইতে পাইয়া কান দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। তখন  
ফাঁদ আসিয়া চাকরী লইল সেই সর্ত্তে। সে দাঁড়াইলেই গিঞ্জি  
ছেলে দেন ; সে ছেলের একটা হাত বা পা ধরিয়া খুলাইয়া  
রাখে, ছেলে কাঁদে ; কোলে করিতে বলিলে ফাঁদ বলে কোলে  
করিবার সর্ত্ত নাই, ছেলে ধরিবার সর্ত্ত আছে মাত্র। বলিলে  
পাট দেয়, ফাঁদ দা লইয়া কুচিকুচি করিয়া কাটে, কেহ কিছু  
বলিলে বলে পাট পাকাইবার সর্ত্ত ত ছিল না, কাটিবার সর্ত্তই  
আছে। খাইবার সময় সে কলাপাত পাতিয়া তাহাতে এক  
খোঁরা আমানি ঢালিয়া দেয়, কারণ খোঁরায় করিয়া পাইতে  
হইবে এমন সর্ত্ত ছিল না ; পাতায় যেটুকু আমানি থাকে তাহাই  
গণ্ডন করিয়া গণ্ডিপিতে ভাঁত গিলে। গৃহস্থ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া  
একদিন বলিলেন—বা, বেইশ্বর হইয়া যা। ফাঁদ অমনি  
একখানি ক্ষুর বাহির করিয়া মনিবের কান কাটিয়া বলিল—  
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখনি। লক্ষণায়, সহজ সরল লোক বা  
অবস্থা দেখিয়াছ, কিন্তু বিপদ ও ভয়ানক লোকও আছে এ জ্ঞান  
যেন থাকে।

ঘুঘুঘু খেলা—শিশুকে পায়ে বসাইয়া ছুলাইতে ছুলাইতে ছড়া  
বলিয়া খেলা—ছড়ার প্রথম শব্দ ঘুঘু হইতে খেলার নাম।

চরকা—ফাঃ চরখ।

চিরকুট—ফাঃ চির্কু—ময়লা, অপরিষ্কার। যথা—ময়লা চিরকুট  
কাপড় ( ছেঁড়া না হইতেও পারে )।

চুপসা, চোপসা—যথা, গাল চুপসে গেছে ; আম চুপসে গেছে।  
এখানে আক্র' হওয়া অর্থ খাটে না ; এখানে অর্থ বাসিয়া গিয়াছে,  
ভুড়াইয়া গিয়াছে। ফাঃ চম্পীদন ধাতুর অর্থ লেগে থাকা ;  
চমপা হইতে চুপসা হওয়া সম্ভব। চোপসা+সা অর্থও বোধ হয়  
ঠিক নয়।

চাকলা—ফাঃ জেলা।

চিনি—ফারসীতে চিনি ( শর্করা ) বাক আছে। চীনী—(চীনদেশীয়)  
শব্দ পৃথক।

চীনা—ফাঃ চীনা—শস্ত্র।

চম—চল ধাতুর মধ্যম পুরুষের অন্তজ্ঞার এক বচনে অনাদর বা স্নেহ  
যনিষ্ঠতা পারচায়ক। তুই চ।

চটাই—বীশ কাঠ অভূতির পাতলা স্তর দিয়া বোনা শয্যা।

চড়াও—আক্রমণ, উপরে গিয়া পড়া।

চড়াচড়া ও সড়সড়ি শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক উল্টা  
হইয়াছে। চড়াচড়া—নীরস বাগুন ; সড়সড়ি—অল্পরসযুক্ত বাগুন।

চোনা—গোক ছাগলের মূত্র। চোনা ধাতু—মূত্র ত্যাগ করা।

চালিশা, চালশে—চল্লিশ সম্বন্ধীয় ; চল্লিশ বৎসর বয়সের দূরদৃষ্টি,  
নিকটের বস্তু দেখিতে না পাওয়া।

চেলা—সম্মত বিছা ( পূর্ববঙ্গে কাঁকড়া বিছাকে বিছী বলে, লম্বা  
বিছাকে বলে চেলা )।

চিনিপাতা দই—দুধে চিনি গিশাইয়া পরে দই জমানো হইয়াছে।

চেকমুড়—দাগিলার যে অংশ দাতার নিকট থাকে, Counterfoil.

চার—ফাঃ শব্দ, সং চত্বারির অপভ্রংশ নহে। তুলনীয় হাজার।  
চার-পায়, চার-পাই—ফারসী সমাসবদ্ধ শব্দ।

চাটনি—ফাঃ চাশনি—স্বাদ।

চর ( শতু )—ফাঃ চরা—to graze ; তাহা হইতে চরা-গাহ...  
pasture, meadow' হইয়াছে। অতএব বাংলার চর শব্দ সংস্কৃত  
অপেক্ষা ফারসীর নিকট জাতি।

চাপ—ফাঃ চাপ।

ছিনালী—ফাঃ চিনালী হইতে কি ?

ছবি—ফাঃ শব্দ—resembling ; চিত্র ; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ছবিই  
আছে।

ছেবলা—ছাবালিয়া, না ফাঃ সিকা—নীচ, মন্দ ?

ছিরকট—ধাতু, কিস্তার বা বিকাশ করা ; যথা দাঁত ছিরকুটে পড়ে  
থাকা।

ছকা—( শব্দকোষে ছবি ) শোভা ( ছগলির গঙ্গার ধারে মালদহে  
কথিত )।

ছাত—( শব্দকোষে ছাক ) হঠাৎ ভয় লাগিলে যে ভীত হয়।  
( কলিকাতা ও ছগলির গঙ্গার ধারে কথিত )।

ছাঁট—বায়, আকার ( মালদহে কথিত )।

ছির—মঙ্গলকক্ষে পিটালি দ্বারা প্রস্তুত ও চিত্রবিচিত্র কারুকার্য-  
বিশিষ্ট কোণাঙ্গার মাত্রলিক জ্বাবিশেষ, শ্রী। ( সর্বত্র কথিত )।

ছুট—( শব্দকোষে ছোট ) কাপড়ের কোঁচার বস্ত্রাংশ।

ছেমড়া—বালক, ছোড়া ( পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত )।

ছুঁকা, ছেঁকা—লোভী, যে ছোক ছোক করিয়া ছুঁচার মত  
সমস্ত জ্ঞানযে নাক দিয়া বেড়ায়।

ছোক ছোক করা—লোভে মন ব্যাকুল হওয়া।

ছাতলা, ছাতলা—কোনো বস্তুতে সঁাতা লাগিয়া যে সাদাটে ভগ্ন  
হয় ; দাঁত না মাজিলে দাঁতে যে ময়লা জমে।

ছান—মেটে ঘরের মেঝের উপর জল মূটি গোঁবর ইত্যাদির প্রলেপ।

ছোটা—বৃক্ষত্বকের দীর্ঘ সরু অংশ ; যেমন কলার ছোটা দিয়া বারুই  
পান বাঁধে।

ছত্রকার—ছত্রকার হইয়া ছড়াইয়া যাওয়া বা ফেলা।

ছত্রছাই—পুড়িয়া ছাই হইয়া ছত্রকার হইয়া, ছড়াইয়া পড়িয়া  
যাওয়া বা ফেলা।

ছোঁ যা—চীল বা সাপ যেরূপে অন্তর্কিতে ছোঁ মারিয়া ঈষৎ স্পর্শ  
করিয়াই আঘাত দিয়া যায় সেইরূপ যা ; লক্ষণায় ঈষৎ স্পর্শ,  
ঈষৎ যানষ্ঠতা : যেমন, লোকটা আর ছোঁ যা দিচ্ছে না।

ছাড়তক—ঘোড়ার উর্দ্ধ্বাস দৌড়।

ছিড়, ছিড়ানু } কোনো কাজের বা বস্তুর লাগাড় সূত্র বা অবশেষ ;  
ছিট (শিষ্ট ) } যেমন, তোমার কথায় যে আর ছিড় মরে না ;  
শব্দ ) } ভোজের ছিড় কবে যে শেষ হবে কে জানে।

এত পিপড়ে আসছে যে মেরে ছিড় মারা যাবে না।

ছোলন, ছোলং, ছোলঙ্গ—নৈবেদ্যের মাথার উপর বসানো কোণা-  
কার চিনী বা সন্দেশ।

হোলদার, হোলদারী—ত্রিভুজাকৃতি তাঁবু বা বস্ত্রগৃহ; ইংরেজী soldier শব্দজ।

ছটো, ছটকো—যাহা কাছেরও সহিত সংলগ্ন নহে।

ছন্ন—শিশুর প্রস্রাব, ছন ছন শব্দ দ্বারা বলিয়া।

• ছিপ—মাহ ধরিবার বংশদণ্ড।

ছিপছিপে—ছিপের স্তায় কৃশ ও দীর্ঘ, ছিপের স্তায় লকলকে।

ছটকাফটকা—কর্কর, বিবিধ-বর্ণ-বিশিষ্ট, বিচিত্র, বাঘা-ভালুকো।

ছড়—দীর্ঘ সরু বংশদণ্ড, বর্শা, বল্লম।

ছিটনী—যে স্ত্রীলোক আফরী বেড়া বুনে।

ছিমড়ী—শিশু শব্দজ, সূঁটী।

ছে—ধাতু, ছে দেওয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, ছেয়ানো।

ছেমো—খেকো, খেকখেকো ভাব। যথা, ছেমো-চাপা ছেলে।

ছোচানি—শৌচ সম্বন্ধীয়; যেমন ছোচানি জল—শৌচের নিমিত্ত জল বা শৌচদ্রষ্ট জল।

ছোড়ান—চানি, যাহা দ্বারা ছাড়ানো যায়।

• জবাব—শেষ উত্তর অর্থাৎ ফারখতি, ত্যাগ; যথা, কাজে জবাব দেওয়া।

জোত্র—সম্পত্তি; জোত্রমন্ত—সম্পত্তিশালী, ধনী।

জল দেওয়া—বিসর্জন দেওয়া; জলাঞ্জলি দেওয়া অর্থাৎ কোনো জিনিসের বিনাশের পর তাহার মরণকৃত্য করা; যথা, এই ব্যবসায়ের আমি দশ হাজার টাকায় জল দিয়েছি।

জলান—পশুর (বিশেষত গাভীর) সন্তান প্রসবের পর যে ফুল (placenta) পড়ে।

জালজালে—জালের ন্যায় সূত্রশূন্য (বস্ত্র)।

জাদা—(শব্দকোষে জাবেতা দেখুন)। যে খাতায় পাঁচমিশালী ধরত দিনকার-দিন টুকিয়া রাখা যায়।

জগদল—(শব্দকোষে জগদল) জগৎ দলন করিতে সক্ষম। রবি বাবু সর্বত্র জগদল ব্যবহার করিয়াছেন, জগদল ব্যবহার কাহারও দেখি নাই।

জঙ্গল—ফারসী শব্দ।

জুস—ফাঃ যুশ—উত্তাপ, সুরুয়া; juice.

জাত—ফারসী জাত শব্দ আছে, অর্থ taste. তবে খুব সম্ভব বাংলায় জাত শব্দের অপভ্রংশ চলিতেছে।

জী, জু—ফাঃ; মহাশয়, প্রভু। প্রভু অর্থে বাংলাতেও ব্যবহার আছে, —যথা, গৌসাঁইজী, গৌসাঁইজু।

জাদা—ফাঃ অর্থ জাত। যথা,—হারামজাদা।

জমজমাট—আরবী জমজমা শব্দের অর্থ murmur; তাহা হইতে?

জওজে—আঃ; স্ত্রী। জওজ—স্বামী।

জীরা—ফাঃ; জীরক সং।

জেরবার—ফাঃ জের (নীচে) বার (বৃদ্ধন-বহন করে যে, ভার)।

জটলা—(শব্দকোষে জটলা), চুলের জটের মতো একত্র অনেকের ভিড় ও মিশ্রণ।

• জিআলা—(শব্দকোষে জাওলা), বড় মাহ ধরিবার জন্য বঁড়শীতে জ্যাস্ত মাহ গাঁথিয়া যে ছিপ জলের ধারে মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া দেয়। জীয়ন্ত মাহ গাঁথিয়া টোপ করে বলিয়া নাম জিআলা বা জীআলা। অপরন্তু ফারসী জাওলা মানে a globular mass of leaven. সেইরূপ টোপ থাকে বলিয়া?

জিওল, জিয়ল, জীওল, জীঅল, জিঅল—জীবন্ত; যথা—পড়শী

• জিয়ল মাহ (চণ্ডীদাস)।

জাগ দেওয়া—(শব্দকোষে জাঁক বা জাঁত দেওয়া), ইহীর অর্থ

• চাপা দেওয়া নয়, জাগ্রত করা। কাঁচাফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানোকে জাগ দেওয়া অর্থাৎ জাগ্রত করা বলে।

জাবড়ানো, জোবড়ানো—ডুবানো, নিমজ্জিত করা; যথা, গরু গামলায় মুখ জুবড়ে ফেন বা জাব পাচ্ছে (শব্দকোষের অর্থ অতিমিত্ত)। ছড়াইয়া পড়া, খাবড়াইয়া যাওয়া; যথা, রুটিং কাগজে লেপা যায় না, কালি জুবড়ে যায়।

জামেয়ার, জামীয়ার—ফারসী জামা-ওয়ার শব্দ।

জারি—যশোর জেলায় প্রচলিত তর্জা শ্রেণীর গান, ফাঃ জারী-বিলাপ, শোক; কাঁহুনে সুরে গীত বলিয়া জারী। একপ্রকার মুখরোগ, জারি যা।

জাসু—চরস বা গুলি খাইবার চিলস বা কক্ষে (মালদহ জেলায় ব্যবহৃত)।

জাহাঁবাজ, জাঁবাজ—ফারসী জাঠা (পৃথিবী) বা জাঁ (প্রাণ)+বাজ (সইয়া গেলা করে যে); দুঃসাহসিক, adventurer, দুর্গম-টারী, প্রাণের মমতাশূন্য; তাহা হইতে, পূর্ন, বদমায়েস।

জিবে গজা, জিবিয়া গজা—সে গজা (আরবী 'জিবিয়া-খাদ্য) আকারে জিবের স্তায়।

জুই—জিয়া বা জিএলি পিপড়া, ঢাকা জেলার নাম।

জিরজিরে—জীরার স্তায় অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র; যথা তেঁতুলের পাতার মতো জিরজিরে। বৃকের হাড় জিরজির করছে, এখানে কি অর্থ? জীর্ণ শব্দজ?

জুড়িদার—পাহারাওয়াল বি সঙ্গী।

জোঠী—জোঠার স্ত্রী, জোঠাই।

জোৎস্না কিনিক ফুটে অনেক জেলাতে বলে। অর্থাৎ জোৎস্না গেন ফিনিকি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিতেছে।

জহরী—শব্দকোষের জোহরী অপ্ৰচলিত, জহরী প্রচলিত।

জনে জনে—প্রত্যেক জনে।

জরদগব—স্ববির বৃষ; পঞ্চভঙ্গের বৃদ্ধ গুপের নাম; তাহা হইতে অতি বৃদ্ধ, অলস, কর্মে অপটু, শ্রথ-শরীর।

জাপটাজাপটি—পরস্পর জড়াওড়ি।

জামুড়া, জামুড়া—পায়ের কড়া (corn); কোনো ফলের ভিতর সমভাবে সুপক না হইলে শব্দ অংশ, দরকচা।

জালী পড়া—মতায় ছোট ছোট ফল ধরা। (শব্দকোষে জালী আছে)।

জি—জিহ্বা।

জীঅ ধাতু,—জিআনো, জীয়ানো—জীবন্ত করা বা সুখা; যথা, মাহ জীয়ানো।

জিগির—(আরবী), Details, বিস্তারিত বিবরণ। যথা, জিগির দিয়া খরচ লেপা উচিত।

জুৎসই, জুতল—সুবিধা মাকিক; উপযোগী।

জুতাজুতি—পরস্পর জুতা প্রহার।

জোঠ—জোঠ; যথা "প্রকৃতি বাহার জোঠ, আকৃতি কনেঠ।" (প্রথম জৌধরী)। জোঠ শব্দের প্রয়োগ যথা—জোঠশুঁর, জোঠশাওড়ী; জোঠাস (জোঠশাওড়ী)।

জার—Jar, বোতল সদৃশ ফাঁদালো মুখওয়াল পাত্র। কৃষিয়ার সম্রাট।

জমাট—দেয়ালের গায়ে বাসি চূনের পলস্তারা।

জালসা—কোনো পদার্থে ঠাণ্ডা লাগিয়া গুলিয়া গেলে তাহাতে যে জালবৎ স্তরা দেখা যায়।

জলে পড়া—অসহায় হওয়া, নিরাশ্রয় হওয়া; কোনো জিনিস  
ন দেবায় ন ধর্মায় নষ্ট হইয়া যাওয়া।

জোটেবুড়ি—জটওয়ালী বুড়ী, শিশুদের ভয় দেপাইবার অশু কাল-  
নিক কুদৃশ্য বুড়ী।

জোকো—জাঁক বা গর্ভ আছে যাহার; দাস্তিক।

জুজ—(আরবী জুজ, অংশ, কোরানের অধ্যায়); অংশ, বইয়ের  
ফর্ম; দপ্তরীদের বই বাধিবার সময় ফর্ম ফর্ম করিয়া সেলাই।

জুজ বাধা বই, জুজ সেলাই।

জুতি—জুতা, পাচুচী।

জুতুয়া—জুতা; যথা, পোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে।

জিন্দা—জীবন্ত (হিন্দী?)

জঞ্জাল—ঐতিহাসিক আর্ভিন (William Irvine) সাহেব রচনা  
করিয়া আরবী যজাইল শব্দ হইতে জঞ্জাল বুৎপন্ন স্থির করিয়া-  
ছেন। যজাইল মানে প্রচুর, প্রাচুর্যের উদ্ভূত অংশ, আর এক  
অর্থ ধনী লোক। ধনী লোকেই প্রায়ই সমাজের জঞ্জাল হয়,  
তাহাতেই কি আবর্জনা অর্থ শেষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে? হওয়া  
কিছুই আশ্চর্য্য নয়, তুলনীয় পাজা—বড় লোক, তাহা হইতে  
বোকা। প্রাচুর্যের উদ্ভূত অংশ হইতে তৎসহজেই আবর্জনা বা  
অকেজো অর্থ পাওয়া যায়।

জিমকিনি—কিমানো।

জুকো বেলা—ভোর বেলা।

কাঁটানি—কাঁটা দ্বারা সমাহৃত আবর্জনা।

কাড়ু—কাঃ, জাক—কাঁটা।

কাব বা কান খাওয়া—দুর্কলতায় মুচ্ছাপন্ন হইয়া নেতাইয়া পড়া।  
(সং খা খাতু অগ্নিসংযোগে?)

কাঁপালো—যাহা ছড়াইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

কাঁমরো—যাহার মাথার চুল লম্বা ও উস্কোখুস্কো।

কাঁনাৎ—অমুকার শব্দ।

কাঁকি—উৎসব।

কালিক—আলোকের অবশ্য্য ও ক্ষণিক তীব্র প্রকাশ; যথা, বিদ্রোহে  
কালিক হানে।

কাঁটকী নড়া, কালিকুট নড়া—শব্দকোষে কালিক নড়া।

কাঁড়ি—কুটি (মালদহ জেলায় কথিত)।

কাঁকরে—পরিচ্ছন্ন। যথা, যখন কাঁকরে করিতেছে। জীর্ণ, যথা,  
পরকাল কাঁকরে হইয়া গিয়াছে। (শব্দকোষে প্রদত্ত উচ্চল অর্থ  
ঠিক মনে হয় না)।

কাঁগা—পলকা-দণ্ড।

কাঁল কাড়া—(কাঁল রাশী করা নহে) কাঁল ত্যাগ করা, উদ্ভা প্রকাশ  
করা, কাঁল কাড়িয়া ফেলা।

কাঁকালো—কাঁক বিশিষ্ট।

কাঁকুরে—খুলার প্যায় স্ক্রু ও লঘু অসংলগ্ন সামগ্রী। যথা কাঁকুরে  
বালি, কাঁকুরে বাতাস।

কাঁকরানো—রসপ্রাচুর্য হওয়া। যথা সর্দি কাঁকরে আসে, লুন লক্ষা  
দিয়া ছেলেরা আম কাঁকরায়।

কাঁকরা কাণা—যে কাণা বিজ্ঞাত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (টপনঃ হেলা  
বিজ্ঞাপণোচরে" অর্থ হইতেই পাওয়া যায়)।

কাঁক—লক্ষ্য, তাগ, যথা, হাতের টিক, বন্দুক বা ধর্মকের টিক—  
টিক (?)।

কাঁলা—আঃ ভলা, ছোট পাহাড়।

কাঁকটিকী (ভূর্জনীর উপর মধ্যমাঙ্গুলি চড়াইয়া বালকের ক্রীড়া-

ভঙ্গি) ও আঙ্গোতে প্রভেদ আছে; বৃদ্ধান্তুরের উপর ভূর্জনী  
তদুপরি মধ্যমাঙ্গুলি, তদুপরি অনামিকা ও তদুপরি কনিষ্ঠাঙ্গুলি  
চড়াইলে অঙ্গুলির যে আকার হয় তাহাকে আদা বলে, এইরূপ  
অঙ্গুলিসংস্থান দেখিতে আদারূচাপের মতো হয় বলিয়া।

টুকনী—জল পানের ছোট ঘটি (মালদহ জেলায় কথিত)।

টেপাটোপা—ফটপুটে. গোলগোল, রসপূর্ণ।

টেপারি—যাহা টেপাটোপা?

টেস—যে ফিরঙ্গী জাতাংশে অতি হীন; শব্দকোষের ব্যুৎপত্তি মনে  
লাগিতেছে না, অথচ উৎকৃষ্টতরও কিছু মনে আসিতেছে না।

টানা হাঁটা—টানার সূতা খাটাইবার জন্য তাঁতির ইতস্তত  
ভ্রমণ; তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ একই স্থানে যাতায়াত।

টুক—খাতু, (১) কোনে কাজের মধ্যে কথা বলিয়া বাধা দেওয়া  
বা ছল ধরা। যথা, মাঝে মাঝে টুকলে তার মুদ্রাদোষ সেদে  
যেতে পারে। (২) অল্প অল্প করিয়া গ্রহণ, যথা, কাণ্ডলা  
ছেলেটা একটা রসগোল্লা এক ঘণ্টা ধরে টুকছে। এই অর্থ  
হইতেই টুকিয়া রাখা মানে অল্প লিখিয়া রাখা হইতে  
পারিয়াছে।

টেসো—কচি ফল শুকাইয়া পাকা।

টুকি টাকি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জব্য।

টুকটুকিয়া, টুকটুকিয়া—যে ধরধর করিয়া চলে, ক্ষুদ্রকায়ের, ব্যস্ততায়  
সহিত চলার ভঙ্গি।

টাক—লক্ষ্য, লোভ। যথা, ঐ ছড়ি গাছটার উপর অনেক দিন  
থেকে আমার টাক ছিল।

টেক—দেমাক, দস্ত। তাহা হইতে টেকধর—অতি দাস্তিক,  
ধর দস্ত যাহার। peevish, যে অল্পেই চটিয়া মুখের সামনে  
জবাব করে।

টুসি—টুসিকি।

ঠাংঠেঙে—যে কাপড় ঠাং ঢাকে না।

ঠাট্টা বটুকিয়া (বাটখারা নহে)—ঠাট্টা ও বৈঠকী রসিকতা।  
যগোহর জেলায় কেবল বটুকিয়া শব্দই ঠাট্টা অর্থে চলিত আছে।

ঠেকার—দেমাক, দস্ত।

ঠমক ঠমক—দহর শব্দ। শব্দকোষে ঠমক দেখুন।

ঠাউকা—দৃষ্টি দ্বারা আন্দাজ পরিমাণ স্থির করিয়া মূল্য নির্ধারণ,  
তুল দাঁড়িতে ওজন না করিয়া মূল্য নিরূপণ। ঠাউর শব্দ  
বোধ হয়। শব্দকোষে ঠাউকা দেখুন।

ডামাডোল—উৎসন্ন যাওয়া; যথা, কলেরায় গ্রামখানা একেবারে  
ডামাডোল হয়ে গেল। ব্যুৎপত্তি কি?

ডড করা—কাতর হইয়া ব্যাকুল শব্দ করা; যথা, ছেলেটা কিদেয়  
ডড করছে।

ডেঁপো—ডিম হইতে সদ্য-জাত সাপের ছানােকে ডাঁপ বলে;  
সেই কচি ছানাও ফণা তুলিয়া আফালন করে। তাহারই  
তুলনায় ডাঁপুয়া—ডাঁপ সদৃশ, বালকের দ্বারা বৃদ্ধের বাক্য-কর্ম-  
আচরণের অমুকরণ ডেঁপোমি, এবং যে ডেঁপোমি করে সে  
ডেঁপো বা ডাঁপুয়া।

ডিবে, ডিবিয়া—উর্দু শব্দমাত্র নয়, উর্দুতে কারসী দক্ষা—তৈলকুপী  
শব্দ হইতেই আসিয়াছে।

ডিপুটী ঘটরান—শব্দকোষে প্রদত্ত কাহিনীটি ঠিক হয় নাই। এক  
ডিপুটীর এজলাসে মুচিরাম নামক একজন ফরিয়াদীর নালিশ  
ছিল: ডিপুটী বাবুর বাংলা-জান চমৎকার, তিনি মুচিরামের স্বপ্নে  
পাড়িলেন ঘটরান। পেয়াদা হাঁকিতে লাগিল ঘটরাম

করিয়া দি। হাজির, ঘটীরাম করিয়া দি। হাজির কেহ সাড়া দিল না। • ডিপুটি বাবু যৌকন্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। তার পর করিয়া দি। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ছজুর আমার নাম মুচিরাম, ঘটীরাম নয়, তাই আমি বুঝতে না পেরে হাজির হইনি, আমার আজি শুনানির ছকুম হোক। কিন্তু ডিপুটি বাবু নিজের prestige বজায় রাখিবার জন্ত বলিলেন—না, তা হতে পারে না, তোর নাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে ঘটীরাম, আর তুই বলিস মুচিরাম। সেই হইতে ডিপুটি বাবু ঘটীরাম ডিপুটি নামে পরিচিত হইলেন। তাহা হইতে অর্থ অকর্মণ্য হুকিম। (দীনবন্ধু মিত্রের সখবার একাদশী দেখুন)।

• ডেহুর—ডেহু (সর্ক)-বৎ ভাব; কোনো জিনিষ ধরনের চেয়ে কিছু বেশি জমা রাখিয়া নিঃশেষ হইবার পূর্বে আবার জোগান দেওয়া।

• ডম্বল—dumb bells. ব্যায়াম-যন্ত্র।

• ডেগ—এক পদবিক্ষেপ যতদূর বিস্তার করা যায়। হিন্দী?

ডিসু—dish, রেকাব।

ডায়ারী, ডায়েরী—diary, রোজনামচা।

ডেমকুলা—কলার বালদো, কলাপাতার মধ্যকার দণ্ড। মালমহে কথিত।

ডিক্কা—পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া দাঁড়ানো। ডেগ শব্দের সঙ্গে সশব্দ আছে কি?

• ডেরি ডামরী—কুসোকাচা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খণ্ড বিখণ্ড।

ডেঙ্গুরা, ডেংরা—ঢেঁচরা, ডকা।

ডিম ডিম—ডিমের স্থায় বহু ক্ষুদ্র সামগ্রী; যথা, জলে ডিম ডিম কি ভাসছে।

ডিক্কা, ঢেক্কা—চাল সিদ্ধ করিয়া ভাত রাখিবার সময় অর্ধেক • ফুটিয়া সুসিক্ত হইয়া গেলে ও অর্ধেক অসিক্ত থাকিলে ঢেক্কা পড়িয়াছে বলে। ঢেক (ঢের, অনেক) চাল?

ডিট—সংশোধন, সমঝানো, জন্ম; যথা, ওর বড় বাড় বেড়েছে, এক দিন এমন মার মারব যে ডিট হয়ে যাবে।

ঢুক ক'রে খাওয়া—অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ এক চোতক পিলিয়া ফেলা; যথা • ওষুটুকু চক করে' পেয়ে ফেল।

ঢোলাই—পাতিত করার বেতন নহে, বহন করার বেতন। হিন্দী চুয়ানা হইতে?

ঢল্ক, ঢলঢলে—কোনো জিনিসের বড় আবরণের ভাব। যথা, ঢল্ক জামা, ঢলঢলে জোকা।

ঢল্কে দেওয়া—কোনো তরল পদার্থ হঠাৎ অনেকখানি ঢালিয়া দেওয়া।

ঢাকে ঢোলে—চড়ক ও দুর্গোৎসবের সময়ে, আশ্বিনে ও ঠৈরে ছয় মাস অন্তর। যথা, তুমি কি ঢাকে ঢোলে স্নান কর নাকি? অর্থাৎ যখন ঢাক বাজে এবং যখন ঢোল বাজে এমন উৎসবে।

ঢস্কা—অশক্ত, কমজোর।

ঢিপলে—শব্দকোষে চির্বরী, nut।

ঢাউস—প্রকাণ্ড; যথা, ঢাউস ঘুড়ি; আজকালকার বাংলা খবরের কাগজগুলো ঢাউস হয়ে উঠেছে। শব্দকোষে ধাউস (?)।

ঢেয়ুয়া—পশ্চিমের অমূল্য পয়সা।

ঢিকপালী—যে ত্রীলোকের কপাল উঁচু ঢিপি পায়া।

ঢাওয়া—কারসী ভাবা—ভাঙ্গনা-ধোলা; ভাঙ্গার উপর ও আঁপনের দীতে যে ধোলা-ধও থাকে।

তাজিয়া—আরবী শব্দের অর্থ শৌক।

তার—ফারসী তার—ধাতুস্তর।

তারাজ—কাঃ, লুট; আরাজ লুট তারাজ যুগ্মরূপে ব্যবহৃত।

তলাও—কাঃ, তলাও—পুকারিণী।

তাছৎ—সেবা-ওগ্রহণ।

ততোর—জতি।

তুকী নাজন—তুকীদের উদ্দাম নৃত্য। যথা, কেউ যে কারে চিনি নে ক সেটা মস্ত বাচন, নইলে সবাই দেখিয়ে দিত বিঘম তুকী নাজন। (দ্বৈতনাথ)।

তকদির—আঃ, বাবিপর্গায়ে তক্কির,—অপরাধ।

তালী—আঃ, উচ্চ; তাহা হইতে গাড়ীর ঘরের উপর থাক।

তকাবী—আঃ, প্রজাকে বীজ ধরনের জন্ত অগ্রিম দান।

তকদির—আঃ, অদৃষ্ট।

তন—কাঃ, তনু। যথা, তনু মন মন দিয়ে চেঁটা।

তামাক—কাঃ, তামাক, ফরাসী Tabac.

তুরস্ত—হিন্দী, শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ।

তন্থী-নিবশ—আঃ, সুপারিটেণ্টেণ্ট।

তুত, তুৎ—আঃ, তুত।

তুতিয়া—কারসী শব্দ।

তোসদান—ফারসী তুসদান।

তীর—ঘরের ছাদের কড়িকঠ অর্থে, ফারসী শব্দ।

তেজ-আব—কাঃ, Aqua fortis.

তিন করা—(হিন্দী তেনী—চিহ্ন) তিরস্বারে কথিত; যথা, ছেলের নেই তিন করেছে।

তুখোড়—কম্পটু, তুঁ, ঢালক।

তুলা—শব্দকোষে 'তুলা' বানান লেখা উচিত বলা হইয়াছে; কিন্তু 'তুলী' তুলনা ও তুলনাড়ি অর্থে ব্যবহৃত হয়; সং তুল হইতে তুলা রূপ রাখিলে তুলা ও তুলার আকারগত পার্থক্য রাখা যায়। তুলার বেলা তুলা লিখিলেও ক্ষতি নাই।

তন্থনিয়া, তন্থনে—তারের বাদ্যযন্ত্রের তার কমিয়া বাধিলে যে ভাব হয় সেইরূপ; যথা—সুন্দিতে মুখ তন্থন করছে, মুখ তন্থনে হয়েছে; ওর গলা তন্থনে।

তন্থন—অতি রসে পূর্ণ হওয়া; যথা সুন্দিতে দুঃস্বপ্ন করছে।

তোবড়া, তুবড়া—তুব শব্দজ? যোড়ার মুখের সঙ্গে সংলগ্ন দানা ভূঁষর ধলিয়া।

তসনস, তসনহ—আরবী তহস (সংগ্রহ, জমা), নস্ক (ছড়ানো) হইতে অর্থ কোনো বস্তুর নষ্ট করিয়া ফেলা।

তবু—কারসী শব্দ, তাজাঃ তাহা হইতে মুক্ত। যথা—তোমায় দেখিলে প্রাণ তবু হইয়া যায়।

তাড়স—sympathetic symptoms of any disease; কোনো রোগের জন্ত আনুষঙ্গিক উপসর্গ। যথা, ফোড়ার তাড়সে জ্বর হয়েছে।

তেপায়া, চেপায়া—Tripod, তিন পদ বিশিষ্ট কাঠের ছোট টেবিল।

তে চে (ফারসী সিহ—তিন) পায়া (নিজীব পদার্থের পদ)।

তড়শা—হিন্দী তড়শা—লাফানো। তাহা হইতে যে রোগে রোগী লাফাইতে থাকে; যুগী, জুপুয়ার, শিশুর Convulsions.

তাহদ—ফারসী তা (পর্যন্ত) আরবী হদ (নীমা), যৎপরোনাস্তি।

তিরজুৎ—হুতারের কাঠে ছিদ্র করিবার তীর ও ধনুক। ফারসী তীর (বাণ) শব্দ (আঘাত করা)—যে বস্তুর দ্বারা তীর বিদ্ধ করা যায়।

তুক্রম—ফারসী Tronc ( উচ্চারণ ত্র ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। মানে গাছের গুঁড়ি, তাহা হইতে ইংরেজিতে যাহাকে বলে stock ( গুঁড়ি )। গাছের গুঁড়ি ( stock বা tronc ) কাটিয়া হাত পা বন্ধ করিবার যন্ত্র তৈয়ারী হয় বলিয়া যন্ত্রেরও ঐ নাম।

তাইরে নাইরে—তাহা এবং তাহা নয় করা, অর্থাৎ মিছাকাছে সময় কাটানো। তা—না—না—না করা। গান গাহিবার কথা না পাইয়া বাজে কথায় সুর জুড়িয়া গাওয়া।

তবলদার—কাঠুরিয়া, কাঠছেদক, যে লোক কাঠ কাটিয়া দেয়। ফারসী তবর্ ( কুঠার ) + দাণ্ডন ( রাখা ) = যে কুঠার রাখে। মালদহে এক জাতি আছে যাহাদের বাবসা কাঠকাটা, তাহাদের নাম কুড়োল, কুড়ালি দ্বারা কাজ করে যাহারা। তবলদার শব্দ ছগলির গঙ্গাধারে খুব প্রচলিত।

তবিয়ৎ—আরবী, স্বাস্থ্য।

তই, তৈ—চিটুকে রন্ধনপাত্র, frying pan, মালপো ভাজিবার পাত্র।

তর—বিলম্ব, যথা, তোমার যে একটু তর সয়না দেখছি। আরবী তরহ = ভিত্তি ( ? )।

তলাসী আলো—search-light.

তাই—তাহাই ; যথা—আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গুণে তুমি তাই গো ( রবীন্দ্রনাথ )। ফাঃ তাই = like, resembling. তোলা আটপৌরে—যে জিনিস তুলিয়া রাখিয়া অনরে সবরে ব্যবহৃত হয় এবং যাহা অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত হয়।

তলাখে—জানলা দরজার নীচে যে পীঠ কার উঁচু অংশ থাকে ; তলানির ভাব—যথা, কাপড়ের তলা দিয়ে যেও না তলাখে লাগবে।

তে-নর—তিন হালি, তিনটি মালাযুক্ত গহনা।

তকমা—ফারসী তকমা = বোতাম, চাকতি, জরির কাজ করা কোনো পদার্থ। তুষমা ( আঃ )—মেডেল।

তৎকথাং—সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত বাংলা অর্থাৎ শব্দ। সেইকণেই।

তক—পর্যাপ্ত। ফারসী তলক শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী তলক।

তামাদী—শুককোষে তমাদী আছে।

তায়ফা—এক অর্থ দল, অপর অর্থ পরিক্রমণ, প্রদক্ষিণ, তাহা হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ। তায়ফাওয়ালী—যে স্ত্রীলোকের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাই বাবসা।

তেড়িয়া—তেড়া ( হিন্দী টেটা ), তাহার ভাব ; বক্রভাব, উগ্রভাব। যথা, তোমার মতন তেড়িয়া মেজাজের লোক ত দেখিনি। এই শব্দটি প্রায় মেজাজ শব্দের সহযোগে ব্যবহৃত হইতে শোনা যায়।

তেলে বেগুনে জ্বলা—মানে কি তেলে বেগুনের মতো ক্রোধে পুড়িয়া মর', না তেলে বেগুন দিলে যেমন সশব্দে জ্বলিয়া উঠে তেমনি হঠাৎ গর্জন করা।

তেমখা—অতি বুদ্ধ। যথা উপকথায়, তেমখার কাছে বুদ্ধি নিয়ে। বুদ্ধের হাঁটু উঁচু হইয়া মাথার সমান হয়, তখন মাথার দুই পাশে দুই হাঁটু দুই মাথার স্থায় দেখায়।

তে-সাঁধি—ত্রিসন্ধি, অতি সঙ্কীর্ণ স্থান।

তে-এঁটে—তিন অঁটিযুক্ত ( তাল )।

তাক—কোলজা অর্থে আরবী ফারসী শব্দও আছে।

ধান—গেটা ; যথা, ধান ইট ; ধান রক্ত ; ধান কাপড়।

ধৈকল, ধরকল—কোমো এক ঔষধসামগ্রীর নাম।

ধাড়—ধাড়া। ধাড়ব্রত—যে ব্রতের সঙ্কল্প যে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত

পর্যাপ্ত থাকে বা ধাড়া ঠাড়াইয়া থাকিব ; সূর্য্যব্রত, মালদহ জেলায় প্রচলিত ছিল।

ধতানো—খতমত খাইয়া যাওয়া, ধ'ইওয়া। খত ধাতু।

খোঁতা মুখ ভোঁতা—অপ্রস্তুত হওয়া, কাহারো নিকট লজ্জা পাওয়া বা অপমানিত হওয়া। পশুর মুখকে খুঁতি বলে ; খুঁতি প্রায়ই সূচালো লম্বা ধরণের হয় ; সেই খুঁতি ভোঁতা বা খর্ক হইয়া যাওয়া মানে মুখের সামনে আঘাত পাওয়া।

থক—ধাতু, শ্রান্ত ক্রান্ত হওয়া।

দাঁড়—দণ্ড, গুণাহগার, গচ্ছা। দাঁড়-মুখা—ধাতু, কাড়িয়া চুরি করিয়া সর্ববিধ উপায়ে লওয়া। দণ্ড করিয়া ও মুখ করিয়া লওয়া। ডাঁর উচ্চারণও হয়।

দেখ—ধাতুর অর্থান্তর, অপেক্ষা করা ; যথা, আটটা পর্যাপ্ত আনি তোমাদের সঙ্গে দেখব, তার পর চলে যাব।

দং—দক্রণ শব্দের সংক্ষেপ লিখন। ( শব্দকোষে দক্রণ শব্দের সঙ্গে আছে, পৃথকও থাকা উচিত ছিল। পরিশিষ্টে সমস্ত সংক্ষেপ লিখন একত্র করিয়া দিলে আরো সুবিধা হয় )।

দমদম পাকের বালা বা মল—যে বালা বা মলের জোড়েন খুব দূরে দূরে এলানো মতন অখচ পাকের মোড়তুলার ধার খুব উঁচু। ফারসী-দমদমা—উঁচু জোলা দুর্গপ্রাচীর।

দম্বল—কেবলমাত্র কলিকাতার শব্দ নয় ; ছগলির গঙ্গার ধারে, মালদহে প্রচলিত শুনিয়াছি। রাত্‌ বলিতে যোগেশ বাবু বর্তমান কোন্ কোন্ জেলা বুঝেন জানি না।

দর—দাম, আরবী দরাহিম ( মুদ্রা ) বা ফারসী দিরাও ( ফসল ) শব্দ হইতে আসে নাই ত ?

দশকোশী—যে গানের সুর এমন চড়া যে দশ ক্রোশ পথ পর্যাপ্ত গৌণা যায়। আধুনিক কীর্তিনয়ারা এই অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার করে।

দিলাসা—ফারসী সালুনা অর্থেও ব্যবহার হয় ; ঘোড়ার গলায় থাপড় মারাকে দিলাসা দেওয়া বলে।

দুধ—স্তন ; বীরভূম, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় ব্যবহৃত, আধেয় অর্থে আধার।

দুলদুল—মহম্মদ-জামাতা আলীর প্রসিদ্ধ ঘোটক। ফারসী শব্দ।

দেয়া—মেঘ ; যথা, গুরু গুরু দেয়া ডাকে ( রবীন্দ্রনাথ ), রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি কিমি শব্দে বরিশে ( জ্ঞান-দাস )। দেবা শব্দজ ?

দোতলা, দোতলা—দ্বিতল গৃহ।

দোমনা—দ্বিমনা, দ্বিধাবিত। ( শব্দকোষে দুমনা আছে এবং সমাসে দু = দো তাহাও আছে )।

দুলমা, দোলমা—যে নারিকেলের মধ্যে নরম শাঁস হইয়াছে। দোমালা শব্দের বর্ণবিপর্যয়ে ?

দাদী—দাদার ( ঠাকুর দাদা ) স্ত্রী, মাতামহী।

দোহর—দোহার শব্দজ। গাত্রবস্ত্র, দোলাই। মালদহে কীথিত।

দাঁতাল—দস্তুর, দস্তবিশিষ্ট ; যথা, দাঁতাল হাতী, দাঁতাল আর মাতাল।

দাঁত থামাটি মারা—অধর কামড়াইয়া উপরের দস্তপংক্তি বিকাশ করা ক্রোধে বা ভয় প্রদর্শনে।

দমসম—শব্দকোষে দম শব্দের অন্তর্গত 'সমেদম' দেখুন। দমসম প্রচলিত, সমেদম শুনি নাই।

দারুণ—ভয়ানক। সং

দৃষ্টিদেওয়া—( প্রায়ই ) কুদৃষ্টি দেওয়া, মজর দেওয়া, লুক্ক দৃষ্টি দেওয়া।

চমনি—কপাটের হাঁসকল যে কীলক আশ্রয় করিয়া বলে।



দাঙি—দাঁড়ী-সংযুক্ত চেয়ারের আকারের পকেটের অল্পরূপ মনুষ্যবাহ  
• শান ।

দাম্পানো, ধাম্পানো—দামানো, পা দিয়া খেঁৎলানো ; যথা, বিছানা  
ধাম্পানো না বলছি ।

দিয়ারা—আরবী দিয়ার, নদীর কিনার, চর জমি ।

দাপ্পানো—দাপনা ধাতু, দর্শ প্রকাশ করা, আফালন করা ; তুং—  
আপ্পানো ।

দই-কড়মা—শুভকর্মের আত্মস্থানিক চিঁড়া মুড়কি ও দধির ফলার ।  
প্রতিমাপূজার বিসর্জনের দিন, বিবাহের পূর্বেদিন ও প্রতিমা বা  
বরকনেকে দইকড়মা খাইতে দেওয়া হয় । দই+কড়মা ( কড়মা  
বা কর্দম ? )

দলুয়া, দলো—দল সম্বন্ধীয় ; যেমন এই পুকুরের জলে দলো গন্ধ ;  
এ লোকটা ভয়ানক দলো অর্থাৎ দল বাঁধিতে ওস্তাদ ।

দাঁতে দড়ি—দাঁতে দড়ি বাঁধিয়া থাকা যেন কিছু খাইতে না পারা  
যায় ; তাহা হইতে অর্থ অনাহার, যথা, লোকটা আজ তিন  
• দিন দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে' আছে ।

দৌড়ঝাপ—ধাবন ও লক্ষন ।

দাদুয়া, দেদো—দক্ষ রোগগ্রস্ত ; যথা, দেদো জানে দেদোর মর্শ্ব ।

দাঁতি লাগা—মুছাঁবহুয় দাঁতে দাঁত জুড়িয়া যাওয়া ।

দখলাত্তি—দখল+আয়ত্ত । অনধিকারে স্বাধিকারীর ত্রায়  
উপজীব ।

দেধান—একপ্রকার শস্ত ; তাহা ভাজিয়া খেই হয় ।

দীন—ধর্ম্ম । আরবী শব্দ । যথা, ছুটিল মোগল রক্ত-পাগল দীন দীন  
গরজ্বনে ( রবীন্দ্রনাথ ) ।

দারচিনি—ফারসীতে ছবছ এই শব্দ আছে, সুতরাং দারুচিনির অপ-  
ভাংশ না হওয়াই সম্ভব ।

দাই—ফারসী দাই—ধাত্রী, পরিচারিকা ।

দুর্দমুগ্ন—আরবী দবুস—নাদনা, মোটা লাঠি ।

দমাদম—যথা, দমাদম মারতে লাগল—মুছমুছ মার ; ফারসী দম-  
আ-দম—প্রতি নিখাসে ।

দানাদার—ফা; যাহাতে দানা বা বীজ আছে ; বিশেষ করিয়া কড়া  
• পাকের রসগোল্লা নাম ।

দোবারা—ফারসী শব্দ ।

দুবীন—ফারসী শব্দ ।

দৌড়—তুলনীয়া, আরবী দৌরাহ্—circuit.

দিহাত, দেহাত—গ্রাম, শহরের দূরবর্তী স্থান । ফারসী শব্দ । দিহাতী  
—পাড়ার্গেয়ে ।

ধরা (হাতে)—মিনুতি করা ; যথা, তাহাকে হাতে ধরিয়া বলি-  
• লাম তবু সে শুনিল না ।

ধরা (হাত)—বশীভূত, আয়ত্তের মধ্যে ; যথা, লোকটা আমার  
• হাতধরা ।

ধানী—ধানের তুলা, যথা, ধানী রং, ধানী লক্ষা ।

ধোকড়—মোটা বস্ত্র ; যথা—মাকড় মারিলে ধোকড় হয় । তাহা  
হইতে বিশেষণ ধোকড়া=মোটা, গপ্পস । মালদহে ধোকড় বাপ  
• step father, ধোকড় বেটা—step-son, কিন্তু 'ধোকড় মা'  
শুনি নাই, কিংবা বাপ ও বেটা শব্দের সহিত ছাড়া অর্থ  
প্রয়োগও শুনি নাই । ধোকড় মোকর শব্দের রূপান্তর ।

ধিল—কোনো স্থানে বা বিষয়ে উপস্থিত হইয়া নিজের দাবী ব্যক্ত  
করিয়া আসা ।

ধিম—ধাতু, ধীর হওয়া ; যথা, আঁধা ধিমছে, লোকটা ধিমিয়ে পড়েছে ।

ধড়মড়—বাস্ত হওয়া ; যথা, ঘুমের ঘোরে আঁচকা ডাক শুনে  
লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ।

ধরধরিয়া—অতি উজ্জ্বল, যীহা সমস্তকেই ধরিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া  
ফেলে ; যথা—ধরধরে আঁচ, অর্থাৎ যে আঙুন সমস্ত ইকনে ধরিয়া  
উঠিয়াছে তাহার আঁচ ; ধরধরিয়া বাহো, যাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত  
• ছড়াইয়া পড়ে ।

ধরাট—নৌকার খোলের উপর বাশের বাপানীর বাঁধা পাটাতন-পণ্ড ।  
নয়-ছয়—নষ্ট ।

নাগরী—মানে খেজুর গুড় নহে ; গুড় যে কলসীতে থাকে, ডাবরী ।  
যথা, এক নাগরী গুড়—এক কলসী বা ডাবরী গুড়, তা সে  
খেজুরো বা এখো দুই হইতে পারে ।

নাদ—ধাতু, পশুর বিষ্ঠাতাপ ।

নাদী—পশুর বিষ্ঠা ।

নিখেকো—যে ব্যক্তি অধিক খাইতে পারে না । স্ত্রীলিঙ্গে নিখাকী ।

নিজ—নির্দিষ্ট, proper ; যথা, নিজ গুলিতে ( অর্থাৎ in Hugly  
proper ) আমার বাড়ী ।

নেজড়া, নে'ড়া—খঞ্জী ফাঃ লক্ষ, হিন্দী লক্ষরা ।

নেজচা, নেজটা—লক্ষা আকারের পাখিয়া মিষ্টান্ন ।

নেজা, নেজা—যে বী হাতে সকল কাজ সহজে করে, নেটা' ।

নেজার—গঙগোল, জঙাল, যাহা মাস্তমকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিয়া  
কর্মে অগ্রসর হইতে বাধা দেয় । লক্ষর, লেজুড় শব্দের সহিত  
সম্পর্কিত ? ফাঃ হাজার—বিরক্তি, তাহার সহিত যোগ সম্ভব নয় ।

নকুলো, নকলিয়া—যে নকল করিতে দক্ষ, যে রহস্যে পটু ।

নিমকী—লেবুর আচার, হোণতা জিনিষ ।

নেকার বাঁত—সহচর শব্দ ।

নিকেল—nickel ধাতু ।

নেতা বা নাতাজোবড়া—নাতা বা নেতা ছবড়াইয়া বা ভিজাইয়া রাখা,  
অর্থাৎ ধরনিকানো শেষ না করিয়া গোলার হাঁড়িতে নাতা রাখিয়া  
দেওয়া ; তাহা হইতে লক্ষণায়, কাজ শেষ না করিয়া ফেলিয়া  
রাখা ।

নেপানে, ছাপানে—( লিপ্ত শব্দ ? ), যে গায়ে পড়িয়া স্নান কর  
• বা জানায় । চব্বিশ পরগণায় কথিত । • শব্দকোষে নাপানি  
শব্দের সহিত অভিন্ন হইতেও পারে ।

নিশান সহি—চেড়া সহি, লিপিতে অশিক্ষিত লোকের নাম সহি করিবার  
বন্দে কোনো চিহ্ন অঙ্কন ।

নতুন খাতা—কারবারের বৎসরান্তে নূতন খাতা প্রবর্তনের উৎসব ।  
প্রায় ১লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হয়, কদাচিত্ত রাশ-  
নবমীতেও হয় ।

না-ওয়ারিশ—বাহার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী নাই । ফার্সী শব্দ ।

নিশ্চিন্তপুর—ঘরের বাড়ী খেপানে গেলে লোক নিশ্চিন্ত হয় ;

নির্নিমিত্ত—নির্নিমিত্ত ।

নাস্তি—ন+অস্তি, নাই ।

নেজে গোবরে—গৌরুর নেজ গোবরে সিন্ত হইলে যেরূপ হয়, অর্থাৎ  
• অপরিষ্কার ।

নেজে খেজা—মাছ যেমন সময়ে সময়ে পাখা না নাড়িয়া, কেবল মাত্র  
নেজ নাড়িয়া নিজেকে ভাসাইয়া ছিন্ন হইয়া থাকে, তেমনি, অর্থাৎ  
গোপনে গোপনে কাজ করা—কর্তৃতার লক্ষণ ।

নেজুর, লেজুর—ল্যাজ, লেজুড় । যথা, বানরের মতো আকার প্রকার  
• নেজুর দিতে ডুলেছে ( অজ্ঞাত রচয়িতা ) ।

নিটপিটে—(শৃঙ্খলাহীন বা চুস্তোষনার্নন নহে) ; অলস, মন্থরকর্মা,  
 যাহার কাজে বিলম্ব হয়, লিড়বিড়ে । • লটপটে শব্দজ ?  
 নাড়া ( মুখ, নাক, নথ, হাত )—খোঁটা দেওয়া, তিরস্কার করা ।  
 নায়েহাল পেশমাল—প্রায় এই শব্দ একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।  
 নাভিগুরে—দুরন্ত, চঞ্চল, যে লাফাইয়া ডিক্কাইয়া চলে ।  
 ননদপামী—নববধু কর্তৃক ননদের তুষ্টি বিধানের জন্ত দেয় দক্ষিণ ।  
 ননদ + ক্ষেম সম্বন্ধীয় ।

মনদপেটারী—নববধু কর্তৃক ননদকে দেয় বস্ত্রাভরণের পেটারী ।  
 নবাত—আরবী নবাৎ—উত্তিষ্ক । তাহা হইতে ?  
 নঙ্গর—ফার্সী লঙ্গর, নৌকা আটকাইবার কাঁটা-যন্ত্র ।  
 নাকে কাঁদা—নাকি সুরে খুঁৎখুঁৎ করা ।  
 নিকামাইয়া, নিঙ্কামাইয়া—যাহার সময় নিষ্কর্মে কাটে ।  
 নাস্তা খাস্তা—ফাঃ না-খাস্তা, না চাওয়া, দরকার না থাকা । তাহা  
 হইতে, নষ্ট ও বিকৃত করিয়া ফেলা । নাস্তা নাবুদের সাদৃশ্যে  
 বা অমুপ্রাসে না-খাস্তা নাস্তা খাস্তা হইয়া গিয়াছে ।  
 নাকচ—ফাঃ না-কস—অপদার্থ ; বাতিল, অগ্রাহ্য । শব্দকোষে  
 নাখচ ; কিন্তু নাখচ বলিতে কাহাকেও কখনো শুনি নাই ।  
 নাও—ফাঃ ; সং নৌ, নৌকা । নাও অনেক জেলায় প্রচলিত শব্দ ।  
 নইচা—ফাঃ, নলচে, ছকার জাঠ ।  
 নাকাল—আরবী নকাল—শান্তি, কাহাকেও এমন শান্তি দেওয়া যে  
 সে আর সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে ।  
 নওরোজ—ফাঃ, নব বৎসরের উৎসব ।  
 নেওয়ার—আরবী শব্দ, হিন্দীতে পরে আসিয়াছে ।  
 নিক, নেক—ফাঃ, উত্তম, সদয়, যঁথা, নেকনজর ।  
 নেতা, নাতা—যন্ন নিকাইবার বস্ত্রখণ্ড । নেতি, নেতি, লেত্তি—শ্লেট  
 মুছিবার সিক্ত বস্ত্রখণ্ড ; লাটু ঘুরাইবার দড়ি । cf. H. লতা, P.  
 লংরা—টুকরা ।  
 নোল—লোল ; আলগা, চলকো । টানটান বাধা সূতা প্রভৃতিতে  
 নোল দিলে স্লতা ঝুলিয়া পড়ে ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## মৃত্যু-স্বয়ম্বর

নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চলল রে,  
 মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল দেশে জ্বল রে ।  
 কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ তয়স্কর,  
 বঙ্গ-গেহের কুমারীদের হুঃখহারী রুদ্র বর ।  
 মামুষ যখন হয় অমামুষ, আগুন তখন শরণ-ঠাই,  
 মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়ি বন্ধু নাই ।  
 মামুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,  
 ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময় ।

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে,  
 একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে ।

আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুব,  
 মরেছে সে ; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ । •  
 অগ্নি তুমি পাবক'শুচি, আজকে তুমি রত্নবা,  
 পরম পুণ্যে লাভ করিছ নারীকুলের এই স্বধা ।

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য ক'রে মায়ের কোল,  
 চলে গেছে স্বরূপ ক'রে পণ্য-পণের গণ্ডগোল ।  
 বাপের ভিটা রইল বজায়, হ'ল না সে বেচতে আর,  
 দায় আপনি বিদায় হ'ল জীবন-লীলা সাক্ষ্য তাঁর ।  
 না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাণ্ডব শূন্য হাওয়ার প্রাস গিলেছে,  
 (আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতার ভাগ্যে ক্ষোভের  
 ক্ষার মিলেছে ।

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্ধ-পিশাচ হৃদয়হীন  
 করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন ।  
 পুত্রবস্ত্র বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,  
 বামন অবতারের মত বার করেছ তে-পায়া ।  
 ধার করেছেন পুত্রবস্ত্র উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,  
 অকর্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ !  
 এদের নিশাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি ;  
 চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি ।  
 স্নেহ যাদের দেহের ধার, মমতা যার প্রাণের কথা,  
 সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষুহেরে নিঃশ্বাস ।  
 মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,  
 স্বস্তুর খোঁজেন বাপের মান-স্বাপের গলায় চরণ রেখে ।

ক্ষীণ যে পুরুষ সেই অমামুষ, হৃদয় তাহার নিষ্করণ,  
 উদারতার ধার ধারেন না, বীর্যবিহীন সে নিগুণ ।  
 অক্ষমে কি জানবে ক্ষমা ? চির-কৃপার পাত্র সে,  
 প্রত্যাশী সে,—পর্গাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে ।  
 কন্যা ঘরের আবর্জনা !—পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,  
 “পালনীয়া শিক্ষণীয়া”—রক্ষণীয়া মোটেই নয় !  
 তদ্র ধাণ্ডু আছেন দেশে করেন যারা সদর্পিত,  
 কামড় তাঁদের অর্ধ রাজ্য,—পরের ধনে লাখপতি ।  
 হায় অভাগ্য ! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,  
 কুলচাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই ।

বিয়ে ক'রে কিন্বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,  
জামাই যেন জড়পদার্থ,—শুভ্রকে চাই 'পুশ' দিতে ।  
• খুদ রেবে সব আছে জুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,  
আসবে শুভ্র সোনাপাখী, সোনাল দেবে দাঁত বাঁধিয়ে ।  
চাই শুভ্রের সোনার কাঠি সুপ্রভাগ্য চিয়তে,  
চাই মালুমের বকের রুধির জেঁকের ছানা জীয়াতে ।



শ্রীমতী শ্ৰেহলতা দেবী।—(দম্পতী হইতে)

কিশোর'যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,  
হায়' কি পাপ রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি ?  
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—  
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—  
• পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—  
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্মে যারা উৎসাহ,—  
• যাদের পুজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জন,—  
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি হুঃখ-তোলা যাদের মন,

উচ্ছে তাদের করবে বহন, উদ্বাহ' নাম সফল যায়,  
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ ? কৈব্যা পরের প্রত্যাশায়

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত না'ক ভিখ মাগি,  
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি ।  
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,  
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শুভ্র-বাড়ীর মৌরুশে ।

যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মালাদান,  
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;  
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,  
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী • কুগ্রীহ ।

বাংলা দেশের আশার জিনিস ! ওগো তরুণ সম্প্রদায় !  
জগৎ আজি তৌমা-সবার উজল মুখের পানে চায় ;  
হাতে তোমার রাখীর সূতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,  
জগৎজুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান ;  
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,  
কিন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে ।  
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,  
তীর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষন্ন ?  
তোমরা তরুণ ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক  
• মিলাও হাত,

জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত !  
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সন্তোজ মন,  
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জন ।  
পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট'  
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাটা  
তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্ব জনে দিচ্ছে চাপ,  
পিতার সত্য'পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা'  
পোষণ—পাপ ।'

সত্বীদাহ গেছে উঠে কন্যাদাহ থাকবে কি ?  
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,  
রাজপুতানার কিষণ-কুয়ার আজকে তাহার সন্দিনী ।  
অথবা তাহার চুখে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—  
যুদীয়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি ।  
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার  
ফুরিয়ে গেছে মর্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার,  
নারীর মান্য কর্তে বজায় গেছে মরণ পায় দলি  
দেশের দেশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি ।

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,  
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময় ।  
মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,  
জট-পাকানো সঙ্করের নাগপাশে সে ছিন্ন করে ।  
হায় বালিকা ! তোমার কথা জাগবে দেশের অন্তরে,  
তোমার স্মৃতি লজ্জা দিবে পরপীড়ক বর্ষরে ।  
দেশাচারের জাতার তলে জীবন দেহ কল্যাণী !  
টল্ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি ।  
দেশের মুখে ধর্ম আজি তাইতে জেগে উঠল রে !  
টনক্ নড়ে' উঠল জাতির, পাপের প্রভাব টুটল রে !  
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা ! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,  
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দূরক দেশের অকল্যাণ ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

## বরপণ

( গল্প )

মহেশ বাবুর একমাত্র পুত্র সতীশ যখন এম-এ পাশ করিয়া  
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইল তখন মহেশ বাবু পুত্রের  
বিতাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

ঘটকেরা কত মেয়ের সংবাদ লইয়া আসেন, মহেশ বাবু  
কত মেয়ে দেখিলেন, কিন্তু কোনটিকেই তাহার আর  
পছন্দ হয় না । ছেলে তাহার এম-এ পাশ করিয়া হাকিম  
হইয়াছে, তাহার যোগ্য মেয়ে হওয়া চাই ত । মেয়েটি

প্রথমত নিখুঁত সুন্দরী হইবে, নতুবা ছেলের মনে ধরিতে  
কেন ? তাহার বেশ লেখাপড়া জানা চাই, নতুবা সে  
এম-এ পাশ করা হাকিম স্বামীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে পারিবে  
কেন ? তাহার পিতার মেয়েকে গা-ভরা অলঙ্কার এবং  
অস্তুত পক্ষে হাজার পাঁচেক বরপণ দিবার সঙ্গতি থাকা  
চাই, নতুবা তাহার পুত্রের বিদ্যার উপযুক্ত সম্মান হইবে  
কেন ?

এমন রাজঘোটক মেয়ে শীঘ্র মেলা হুঙ্কর ; সুন্দরী হয়  
ত লেখাপড়া জানে না ; লেখাপড়া-জানা সুন্দরী হয় ত  
তাহার বাপ গা-ভরা অলঙ্কার এবং পাঁচ হাজার টাকা  
পণের দাবী শুনিয়া পিছাইয়া যায় ।

সতীশ একদিন আশ্বে আশ্বে পিতার কাছে আসিয়া  
বলিল—“বাবা, বিয়েতে পণটন কিছু দিয়ো না ।”

মহেশবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-  
লেন—“কেন ?”

সতীশ লজ্জিত সম্মুখে মাথা নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল  
—“পণ নেওয়া মানে ত ছেলে বেচা !”

মহেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“যা যা, আর  
জ্যাঠামি করতে হবে না । বেচা ত বেচা ! তোর ওপরে  
ত আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তোকে আমি বেচেই  
টাকা নেবো । তোকে পড়াতে যে একগজা টাকা জলের  
মতন খরচ হয়ে গেছে, সে আমি আদায় করে নেবো না ।  
চিরটাকাল পণ নেওয়া চল আসছে আমাদের কুলিনের,  
এখন উনি দুপাতা ইংরিজি পড়ে বাপপিতামর চাল  
সব একদিনে পাণ্টে দেবেন ! তোর সঙ্গে শুধু বিয়ে করার  
সম্বন্ধ । যে দিন বলব, টোপের পরে বাপের সুপুত্র  
হয়ে বিয়ে করতে যাবি । আর কোনো কথা আমি  
তোর শুনতে চাইনে ।”

সতীশ মাথা নত করিয়া আশ্বে আশ্বে সেখান  
হইতে চলিয়া আসিল ।

তাহার বন্ধুরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল—“কি  
হে সমাজ-সংস্কারক ভায়া ! লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে শেষে  
রাঁতারাত্তি পাঁচহাজারী মনসবদার হবার চেষ্টা ! বক্তৃতার  
চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো—লোকে বলে । দৃষ্টান্তের বেলায় পঞ্চ-  
হাজার, বক্তৃতাতেও বাক্য দেদার !”

সতীশ অত্যন্ত অপতিত হইয়া বুলে—“কি করব বল! বাবার ওপরে ত আমি কথা বলতে পারিনে। আমার যখন ছেলে হবে তখন আমি কথায় কাজে মিল থাকে কিনা দেখিয়ে দেবো!”

সুকলে তাহাকে পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া দম্বর মতো লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

কিন্তু সতীশ পিতাকে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মা নারা যাওয়ার পর পিতায়ে কী কষ্টে তাহাকে মন্থন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তাহা ত সে জানে। বাহিরের লোক ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার উপর তাহার পিতার যে ষোল আনা স্বয় আছে তাহা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহার মায়ের সমস্ত গহনা একে একে বন্ধক পড়িয়াছে; প্রায় দু হাজার টাকা তাহার পিতার ঋণ। তিনি যদি পুত্রকে বিক্রয় করিয়াও ঋণমুক্ত হইতে চাহেন তবে তাহার আপত্তি করা শোভা পায় না। সতীশ নীরবে বন্ধুদের সকল বিক্রয় সহ করিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর মহেশবাবুর মনের মতন একটি মেয়ে মিলিল। তাহারই সহিত সতীশের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়া গেল।

২

বিবাহের পরদিন সতীশের ঋণরবাড়ীতে মেয়ে জামাই বিদায় করিবার ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সতীশের বাড়ী যাইবার জন্য কোনো রকম ইচ্ছা বা উদ্যোগ প্রকাশ পাইতেছিল না—সে চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াই ছিল।

পাকীতে বোঁ তুলিয়া মহেশবাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন—“সতীশ, সতীশ কৈ?”

সতীশকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। সতীশকে খুঁজিতে চাবিদিকে লোক ছুটিল। দেখিল সতীশ বিছানায় শুইয়া পায়ের উপর পা চড়াইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে পা নাড়াইতেছে—যাহারা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে যেন বলিতেছিল, না, না, না।

তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার ঋণর ব্যস্ত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বাবা, অশুখ। বিষুখ কিছু করেনি ত?”

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল—“আজ্ঞে না।”

ঋণর বলিলেন—“তবে এস; তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন।”

সতীশ দিব্য প্রশান্ত সহজ ভাবেই বলিল—“তাকে বলুন গে আমি ত এখন বাড়ী যেতে পারছি। আমার কিছুদিন এখন এখানেই থাকতে হবে।”

এই কথা শুনিয়া সতীশের ঋণর মনে করিলেন জামাই ও বেহাই দুজনে কিছু ঋণড়া ঋণটি হইয়া থাকিবে বোধ হয়। তাই তিনি জামাতাকে আর কিছু না বলিয়া বেহাইকে গিয়া বলিলেন—“বেয়াই মশায়, সতীশ বলছে সে এখন বাড়ী যেতে পারবে না।”

মহেশ বাবু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন?”

সতীশের ঋণর বলিলেন—“কেন, তা ত জানি নে, জিজ্ঞাসাও করলুম না। মনে করলুম হয় ত আপনার সঙ্গে কোনো রকম ঋণড়া টগড়া করে’ অভিমান করেছে; তাই আপনাকে বলতে এলুম।”

মহেশ বাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—“ঋণড়া? না! আমার সঙ্গে ঋণড়া করবার মতন ছেলে ত নেই নয়। কি হয়েছে চলুন ত দেখি। কোথায় সে?”

মহেশ বাবু বৈবাহিকের সঙ্গে সতীশের নিকট আসিয়া বলিলেন—“সতীশ, বোঁমা পাকীতে বসে রয়েছেন, আর তুই এখানে বসে রয়েছিস? রকম কি! বাড়ী চ।”

সতীশ বলিল—“আমি ত এখন কিছুদিন বাড়ী যেতে পারছি। তুমি তোমার বউ নিয়ে বাড়ী যাও, আমি কিছুদিন পরে যাবি।”

মহেশ বাবু অতিমাত্রায় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—“কিছুদিন পরে যাবি কি? হয়েছে কি তোর?”

সতীশ মাথা নত করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—“আমি এঁদের জীতদাস হয়েছি—তুমি ত আমায় পাঁচ হাজার টাকায় এঁদের বেচে গলে। আমি রোজগার করে’ এঁদের পাঁচ হাজার টাকা সুদ সমেত শোধ করব আগে; তারপর এঁরা আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে

আমি তোমার কাছে ফিরে যাব। তার আগে ত আমার যাবার জো নেই।”

মহেশ বাবু অবাক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; সতীশের কথা শুনিয়া তাহার স্বপ্নের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেশ বাবু মনে মনে একবার কল্পনা করিলেন তাঁহার সেই নিরানন্দ নির্জন পুরী— সেখানে তাঁহার পত্নী নাই, সতীশ নাই; একা তিনি আর তাঁহার বৌমাটি! এই বালিকা বধুকে যত্ন করিবার ও সজ্জ দিবার কেহ নাই, তাঁহার সতীশ পরের বাড়ীতে দাসত্ব স্বীকার করিয়া খাটিয়া খাটিয়া মাসে মাসে অল্পে অল্পে তাহার পণের ঋণ শোধ করিতেছে! মহেশ বাবুর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। একবার সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সতীশের স্বপ্নকে পাঁচ হাজার টাকার তোড়া ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—“বেয়াই মশায়, আপনার টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, সতীশকে আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে অনুমতি করুন!”

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## বিংশশতাব্দীর বর

( ১৩০৮ সালের “প্রবাসী” হইতে পুনর্মুদ্রিত )

“উলু, উলু, উলু, উলু!” উলুর ফোয়ারা  
মুখে ছোট্টে, বিন্দি দাসী হেসে হ’ল সারা!  
সে হাসি-নিঝরৈ ভাঁসি যত দাসদাসী  
দেয় উলু।—রাঙা দিদি, মহাক্রোধে আসি,  
রাঙাইয়া ছই আঁধি, কহেন, “সাবাসি  
তোদের উলুর কাণ্ড! হারাইলি জ্ঞান,  
ওলো বিন্দি! বহাইয়ে আনন্দ-ভূফান,  
বহাইয়ে দিবি কি লো সমস্ত কাটরা \* ?  
সাবাসি বুকের পাটা! হাসির কি গরুরা!  
কোথা বিয়ে! কোথা বর! কিছু মাহি ধার্য!  
হ্যা দেখ হাসির ঘটা, উলুর ঐধর্য!”  
দস্তজা ( বাড়ীর কর্তা ) সে মধ্যাহ্নকালে  
অস্তঃপুরে নিজকক্ষে, আলুবোলা গালে

\* কাটরা এলাহাবাদ সহরের একটি পাড়া।

পুরি, ছিলেন আরামে। তাত্রকুট-ধুম  
আনিত মুহূর্ত-পরে আনন্দের ধুম!

এ উলু-চীংকার শুনি নাগিকার ডাক  
গেল ধামি; ধায় বুড়া, হইয়া অবাক!

“কি হয়েছে? কি হয়েছে?”

“বর আসিয়াছে।”

গৃহিণী রাগিয়া ক’ন, “যমে কি ধরেছে  
তোদেরে লো বিন্দি দাসী?” বিন্দি হাসি কয়,  
“বাহিরে এসেছে বর,—এসেছে নিশ্চয়!—  
উলু, উলু, উলু, উলু!—কত্যা তব ধন্য!—  
এমন সুন্দর বর!”

“এ হাসির বন্যা

ধামাইব কাঁটা পিটি!” রাঙা দিদি রাগি  
ছুটিলেন গৃহকোণে, সম্মার্জনী লাগি!  
গৃহিণী হাসিয়া ক’ন, ধীরে কাঁটা কাড়ি,  
“ছোট খুড়ি! বিন্দি দাসী এত বাড়াবাড়ি  
করিতেছে, আছে কিছু ইহার ভিতর!  
চল জানেলার কাছে, চল মা সত্বর!”

এখনো বিবাহ-দিন হয় নাই ধার্য।  
এখনো টাকার পণ ( আসল যা কার্য )  
হয় নি জোগাড়। কর্তার ভাবী বেয়াই  
( ম’রে যাই ল’য়ে তাঁর গুণের বলাই! )  
চাহিয়াছিলেন পূর্বে বিংশ হাজার মুদ্রা!  
দস্তবাবু-চক্ষু হতে পলাইল নিদ্রা  
সে প্রস্তাব শুনি; বহু বাক্যব্যয়,  
বহু পত্র-লেখালেখি করিল উত্তর  
পক্ষ। লক্ষ কথা পরে হইল নিশ্চয়,  
বরকর্তা লইবেন দশহাজার মুদ্রা  
কর্তাকর্তা-ভাণ্ডার হইতে। এবে নিদ্রা  
মাঝে মাঝে দেখা দেয় দস্তবাবু-চক্ষে;  
চিন্তা-রাক্সসীটি কিন্তু দিবানিশি বন্ধে  
শুবিছে রুধির! বাপু, টাকাটা কি কম?  
বনের বেয়াই! তুমি মানুষ?—না যম?



বিংশশতাব্দীর বর ।

“উলু, উলু, উলু, উলু!” সে আনন্দধ্বনি  
ঘটাইল অন্তঃপুরে রঙ্গ-রঙ্গ-রঙ্গি !  
না হইতে ‘আশীর্বাদ’ আসিয়াছে বর—  
বধু ও কন্যার দল ভাবিয়া কাঁফর ।  
তবু এ উলুর নেশা ধরিল সবারে ।  
পাড়ার রূপসীদল কাতারে কাতারে  
ছুটিল গবাক্ষারে, জানেলার ধারে ।

এ মধ্যাহ্নকালে তারা বিস্তি, গ্রাবু, পাশা,  
খেলিতে আসিয়াছিল । হেরিতে তামাসা  
ছুটিল সকলে ! বল কোন্ বাঙ্গালিনী  
নীর্বে বসিতে পাবে, শুনি উলুধ্বনি  
কাহারো মোহন খোঁপা হইয়া চঞ্চল  
ধরিল ভুজঙ্গবেশ ! কাহারো অঞ্চল  
ভূমিতে লুটায় পড়ি’, মুখা খুঁড়ি বলে,  
“হে সুন্দরি, ধূলি পরে তুমি যাবে চ’লে ;—

তাও কভু হয় ? পাদপদ্ম দয়া করি  
মহিমাগৌরবে রাখ, হে বর-সুন্দরি,  
এ দেহ-উপরি ! মম এ ক্ষৌম-জীবন  
হউক সফল, ধরি ও রাঙা চরণ !”  
কোনো ধনী, স্বামীর বিনামা হস্তে ধরি’,  
ধূলি ঝাড়ি’, রাখিতেছিলেন যত্ন করি’  
সজ্জা-গৃহে। অকস্মাৎ উলুধ্বনি শুনি’  
( হরিণী শুনিল যেন বাশরীর ধ্বনি ! )  
অগ্ৰমনা হ’য়ে ধনী, মাথায় বহিয়া  
জুতাঝোড়া, তীরবেগে চলিল ছুটিয়া !  
কোন বধু তৎক্ষণাৎ সাজিয়া যতনে  
আনিতেছিলেন হর্ষে, দিতে সখী জনে।  
কোথা সখী ? অকস্মাৎ উলুর মুরলী  
শুনি ধনী, শিষ্টাচার সব গেল ভুলি !  
পুঁরি দিয়া সাজা পান আপন অধরে  
অগ্ৰমনে উদ্ধাবেগে ছুটিল সত্বরে !  
কোনো ধনী আনিবারে ল্যাভেণ্ডার-জল,  
কক্ষে পশি, উলুধ্বনি শুনিয়া চঞ্চল,  
ছুটিল বগলে করি কালীর বোতল !  
তনয়খৎসলা কোমো লজ্জাশূল  
মুখে পুরি (হর্ষে, আকুলি ব্যাকুলি,  
শুনি’ সে উলুর ধ্বনি ! ) চলিল ছুটিয়া !  
পিছে ক্ষুদ্র শিশু ধায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া !

বাহিরে অদ্ভুত দৃশ্য ! লোকে লোকারণ্য !  
উপস্থিত তথা কত গণ্য আর মাণ্ড  
বন্ধের কৃতী সন্তান ! একি এর তায়াসা !  
সকলে অবাক, কারো মুখে নাই ভাষা !  
কর্তা ক’ন হাত বুড়ি, “ভায়া অবিনাশ,  
কর দেখি ডায়েগোস্ ! একি সর্বনাশ !  
ভবিষ্য জামাই মম, হ’ল কি পাগল ?  
দড়াদড়ি দিয়ে এর প্রত্যক্ষসুকল

বোধেছে কি ল’য়ে যেতে বাতুল-আগারে ?”  
সহাস্ত্রে ডাক্তার ক’ন, “এ মন্ত ব্যাপারে  
নাহি মম হস্ত ! Your son-in-law is sound.  
Can’t guess why” with ropes he is bound.”  
ছিল। বসি মধ্যস্থলে শ্রীরাম দারোগা।  
কৌতুক-বিষাদে ক’ন, “আমি কি অভাগা !  
এত দড়াদড়ি, তবু মাথায় টোপর !  
অপরের করত্বত, তবু নহে চোর !”

‘এতক্ষণ চূপ করি, সব রসিকতা  
লোকটি শুনিতেছিল, বিনা কোন কথা।  
সহাস্ত্রে পিয়ল কহে, “ডাকের পেয়াদা  
আমি। বাবু, আপনারা নূতন কায়দা  
শোনেন কি ? এ বৎসর হইয়াছে জারি।  
আমারে বকুশিশু দাও, যাই অগ্ৰ বাড়ী।  
সক্যা হবে ; লও এই নূতন দুলাহা \*।  
তুষায় বরের মুখ শুকায়েছে, আহা !  
দশহাজার টাকা দিয়া, ভি-পি প্যাকেট  
লও বাবু ; আমি যাই, হইতেছে লেট।”  
পিয়নের কথা শুনি’ হাসিল সকলে  
উচ্চশব্দে ! অনেকেই ভি-পি পার্শেলে  
শুধাইল, “ওহে বর ! দ্বিতীয় পিকুইক,  
ওহে ডন কুইক্সোট, অদ্ভদ রসিক,  
কথা কও, শুনি অঙ্গদের রায়বার,  
কেমনে লাঙ্গুলদণ্ডে, লোভেভেৎ কলার,  
অপার সমুদ্র লজ্জি’, আইলে ‘এ পার ?’  
পাশে ছিল। বসি’ লক্ষ্মী সাহিত্য-আনন্দ,  
“প্রবাসী”র সম্পাদক, বন্ধু রামানন্দ।  
তাহারে বলিলু আমি, “এত দিন পরে  
তোমার ভবিষ্যবাণী, অক্ষরে অক্ষরে,  
ফলিয়াছে ! তুমি যারে “সঞ্জীবনী”-পত্রে †  
কল্পনায় হেরেছিলে, এ প্রয়াগক্ষেত্রে

\* দুলাহা—বর।

† ১৩০৮ সালের কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবাসীর সম্পাদক সঞ্জীবনীতে ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে বর প্রেরণ সম্বন্ধে একটি নক্সা লিখিয়াছিলেন।

\* এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ডাক্তার বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো-  
পাধ্যায়।



এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর,  
 • ভি-পি পার্শেলেতে মরি, সর্ব্বজসুন্দর।”  
 বহু ক’ন, “ধন্য এই postal invention !  
 Truth is surely stranger than fiction.”

• বালকেরা দিল সবে মহা হাততালি।  
 বরের কানের কাছে গিয়া শত গালি  
 দিল কেহ—“বর, তুমি বড়ই উল্লুক,  
 বিংশ শতাব্দীর তুমি কেনুয়া ভুল্লুক।  
 কোন্ মুল্লকের “জু”র কোন্ জানোয়ার  
 বর তুমি? কানমলা খাও দশহাজার।”  
 “উলু, উলু, উলু, উলু!” একি গণ্ডগোল !  
 অদ্ভুত পার্শেল দেখি সবাই পাগল !  
 এত উলুউলুধ্বনি, এত যে আনন্দ,  
 গৃহকর্তা রামদত্ত তবু নিরানন্দ।  
 ছেলেটি কার্তিক যেন, বড়ই সুন্দর,  
 পুষ্পসম সুপ্রফুল্ল, হাস্ত মুনোহর,  
 এমু-এ পাশ, ওকালতী অতি শীঘ্র দিবে—  
 এইহেন জামাই-রত্ন ভাগ্যে কি ঘটবে ?  
 দীর্ঘশ্বাস ফেলি কর্তা, কহিলা গস্তীরে  
 ডাকের পেয়াদাটিরে স্নাত্তি ধীরে ধীরে,  
 “প্যাকেটে জামাই আসা, এ বড় অদ্ভুত !  
 পাঁচটি হাজার টাকা কেবল প্রস্তুত  
 আছে আজ ; কালি দিব ধারণার করি ;  
 জামাঝেরে খুলে দাও, কাটি দড়াদড়ি।”  
 ডাকের পিয়াদা ছিল ইংরাজি-নবিশ।  
 সে বলিল, “দেখ বাবু কি strict notice.  
 “To your address the bridegroom is sent,  
 Can’t be delivered without full payment.” ”

কণা শুনি কর্তাটির সুদীর্ঘ নিশ্বাস  
 বাহিল। আমর! তাঁর মাথায় বাতাস  
 করিয়া, কহিলু চুপে, “লিখুন ‘refused’ ;  
 কাশীর কসাই তব বেয়াই কি goose !  
 নালিশ করিবে যবে, দেখে লব সবে,—  
 মশা করে গোসাঞি, এবে ভাবিয়া কি হবে ?”

এত বলি ক্ষুদ্র এক কাগজ উপরে  
 লিখিয়া Refused কথা, বৃহৎ অক্ষরে,  
 গঁদ দিয়া আঁটি দিহু বরের কপালে।  
 হাসিয়া উঠিল সবে।

বাতায়ন-জ্বালে

( হেরিহু ) কণার মাতা কাঁদিলা নীরবে ;  
 মূর্ত্তিমতী কাতরতা সে হাসি-উৎসবে।  
 বৈঠক হইল খালি, সবে গেল চলি।  
 বিন্দি দাসী, চুপে চুপে, হ’য়ে কুতূহলী  
 রাণ্ডায় ধরিল গিয়া ডাক-পেয়াদায়।  
 কহিল সহাস্তে বিন্দি, বাকোর ছটায়।  
 ভুলাইয়া পেয়াদায়, “এই দুটি টাকা  
 লও বাপু—সোজা কথা,—বিন্দি আঁকাবাঁকা  
 কথা নাহি জানে—একবার ঙগুদ্বার  
 দিয়া, খিড়কির দ্বার দিয়া, একবার  
 জামাতারে দেখাইয়া যাও। শান্তুড়ির  
 বড় সাধ দেখিবারে তাঁর জামা’য়ের  
 চাঁদমুখ।”

ধন্য ওহে রূপার চাকুতি !

আকাশে পাতালে মর্ত্ত্যে অব্যাহত গতি !  
 তোমার ডাকিনী মগ্নে কেন্নার ফাটক  
 যায় খুলি। যাও দেবি, কে করে আটক ?  
 পোষ্ট-দূত হইল রাজি ; প্যাকেট লইয়া  
 খিড়কির দ্বার দিয়া, দুইজনে গিয়া  
 উপস্থিত অন্তঃপুরে। মুখ ফিরাইয়া,  
 কিছু দূরে, পোষ্টদূত রহিল বাসিয়া।  
 রাঙা দিদি মুহূহাস্তে নাতিনীরে টানি  
 আনি কহিলেন-রুদে, যোড় করি পাণি,  
 “ওহে চোরচুড়ামণি ! প্রাচীর লঙ্ঘিয়া  
 সিন্ধকাটি হাতে করি, কার ঘরে গিয়া  
 পাইলে সুন্দর শাস্তি ? দড়াদড়ি দিয়া  
 বাধিল তোঁমার দেহ, আদরে আঁটিয়া।  
 এই মোর নাতিনীর মন করি চুরি  
 যাও যদি, তবে বুঝি তব বাহাছুরি।”  
 লাজনতনেত্র বাল্য চঞ্চল চরণে  
 পলাইল—যুবা চাহে আকুল নয়নে।

প্রেম বিশ্বনাথ কিন্তু লভিলা বিজয় ।  
 সে শুভমুহুর্তে, মরি উভয়ে উভয়  
 বাসিল রে ভাল, হ'ল চিত্ত-বিনিময় !  
 কতক্ষণ পরে ফিরি, দৃষ্টা রাঙা দিদি  
 আইলেন, গৃহিণীয়ে লয়ে ;—যথবিধি  
 দধি, চিনি, খালে করি ! মঙ্গল-আচার  
 সারিয়া চিবুক ধরি ভাবী জামাতার,  
 কহিলা গৃহিণী—“বাছা, রাগ করিও না ;  
 টাকা নাই, তাই হ'ল এ ঘোর লাঞ্ছনা ।  
 তুমিই জামাই হবে, ইহাতে অশ্রুধা  
 নাহি হ'বে । আহা বাছা পাইয়াছ ব্যথা !  
 মা বলিয়া ডাক, বাবা, জুড়াক পরাণ ।  
 আহা কি মধুর বাণী !—তোমার কল্যাণ  
 হোক বাছা, থাক তুমি চিরজীবী হ'য়ে ।”  
 “কার্ত্তিক এসেছে বটে, দড়াদড়ি ব'য়ে ।”  
 রাঙা দিদি হাসি কন । “ধাকিতে ময়ূর  
 কেন এত হাঁটাইটি ? এত ঘোড়দৌড় ?”  
 তারপর, একরাশ ফল আর মিষ্টি  
 আইল । জামাই ভাবে, একি সুধাবৃষ্টি !  
 পার্শ্বলের-রূপ-ধারী বলে সে জামাই  
 মনে মনে “কত ছাড়া কিছুই না চাই !  
 সৃষ্টিছাড়া আজগুবি বাবার ব্যাভার ।  
 আমি চাই ঐ কত । ড্যান্ দশ হাজার ।”

সেই রাত্রে পোষ্ট্যাল নিয়ম অনুসারে  
 জামাই-ব্যারাকে বর, দিব্য কারাগারে  
 রহিলেন বন্দী । কিন্তু যবে প্রাত্রে শেষে  
 প্রহরী ও সাজী সব, দ্বারদেশে এসে,  
 নেহারিল, নাহি তথা সে পোষ্ট্যাল বর !  
 খোঁজ ! খোঁজ ! প্রহরীরা ভাবিয়া কাঁফর ।  
 ছিন্ন শুধু দড়াদড়ি মাটির উপর  
 প'ড়ে আছে । একি কাণ্ড ! পলায়েছে বর !  
 চূড়ান্ত মাতাল এক, সুরার পয়সা  
 না থাকিত যবে হস্তে, রক্তে নিজ পোষা

( দুঃক্ষেণনির্ভুবর্ণ, যুক্তাসম আভা ;  
 টগর পুষ্পের মত লাবণ্যের প্রভা )  
 বিলাতী বিড়ালটিকে রাখিয়ে বন্ধক  
 কিনিত মদিরা ! কিন্তু হ'য়ে পলাতক  
 বিদায়-মুহুর্তে, দুঃপাত্রে মুখ দিয়া,  
 চতুর মার্জ্জারবর যাইত ফিরিয়া  
 স্বামিগৃহে । সেইরূপ কারেও না বলি,  
 বিংশ শতাব্দীর বর গেল কিরে চলি ?  
 কোতওয়ালি, চৌকি আর থানায় থানায়  
 প'ড়ে গেল ছুলস্থূল । কোথা সে ? কোথায় ?

বুড়ুকু শিকার-হারা ব্যাঘ্রের মতন  
 লোহিত নকলযুগ, করিয়া বম্পন,  
 বরের মহৎ পিতা, কাশীর বেয়াই,  
 ল'য়ে সঙ্গে দশজন গুণ্ডা আর চাঁই,  
 আক্রমিল বস্তগৃহ । কিন্তু তথা একা  
 বিন্দু দাসী উড়াইয়া বাঁটার পতাকা,  
 হইল রে বিজয়িনী ! গুণ্ডারা মলিল,  
 “মহিষমর্দিনী পুনঃ প্রয়াগে কি এল ?”

তার পর মহাক্রুদ্ধ বনের দেয়াই,  
 উড়ায়ে বুদ্ধির ঘুড়ি, ঘুরায় লাটাই,  
 বুঝাইতে গেল কেস্ সতীশ ডাক্তারে \* ।  
 “ড্যান্‌মেকের নালিশ হইতে কি না পারে  
 হাইকোর্টে, on the original side ;  
 যে হেতু ইহাতে আছে bridegroom, bride.  
 ডাক্তার সতীশ কন, “শুন মহাশয়,  
 বুদ্ধিতে তুমিই বড় ঐকথা নিশ্চয় ।  
 আমি কত পরিশ্রমে দশটি হাজার  
 পাইলাম । তুমি প্রতিভার অবতার  
 তুমি বিংশ শতাব্দীর প্রেমচাঁদ ছাত্র !  
 হেরি তোমায়, হিংসায় দহিছে এ'গাত্র ।  
 একেবারে এক প্যাকেটে দশটি হাজার মেরে  
 নিতে প্রভু, মারাত্মক প্রতিভার জোরে !

\* এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ. এল্ এল্ ডী, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ।

Tush! I have no time to attend to your pranks.  
Take away those silver coins! Declined with thanks.

অলস্ত ফুলিঙ্গ সেই বন্ধের বেয়াই,  
জ্বের সে অবতার, মহাধূর্ত চাই,  
সদরামীনের কোটে “দশ হাজার চাই”  
বলিয়া করিল রুজু ড্যামেঞ্জের কেস।  
অগ্নিশিখা হইলা শেষে ভস্ম-অবশেষ!  
যথাকালে জজ্‌মেন্ট হইল বাহির  
একেবারে বেয়াইয়ের চক্ষু হ’ল স্থির।  
“বাদী” পাঠাইল এই অপূর্ণ প্যাকেট  
প্রতিবাদী-পাশে বটে, কিন্তু এই ভেট  
প্লঠানর পূর্বে, কেন না দিল নোটিশ?  
এই হেতু মোকদ্দমা সমূলে ডিসমিস  
হইতেছে। বাদী দিবে সমস্ত খরচা।”  
বিন্দু দাসী হাসি বলে, “আচ্ছা হ’ল বাছা।”  
চারিধারে হাস্তরোল! সবে বলে, “উল্লু  
কোথা হ’তে এল হেথা? এ যে মহামল্ল!  
বিংশ শতাব্দীর এ যে অপক্লপ কল্প!”

বর কোথা? বর কোথা? লুকায়ে কাশ্মীরে,  
ছয়মাস মহানন্দে বরগার, নীরে  
স্নান করি, পাহাড়ের দৃশ্য হেরি নানা,  
খাইতেছিলেন বর আঙুর বেদানা।  
যবে পাইলেন টের পিতৃ-রোষাঘ্নির  
নাহি অবশেষ, পুত্র-হইলা হাজির।  
শালি শালাজেরা হেরি আক্লান্দে অস্থির।  
বলে তারা, “বন থেকে হইল বাহির  
সোনার টোপর মাথে বিহঙ্গ রুচির।”  
কঙ্কর বেয়াই, তব কুলাপানা চক্র  
কোথা গেল? কোথা গেল চাল তব বক্র?  
“বিনা পণে দিব বিয়া।” হায় কি উদার!  
কোথা গেল সেই শব্দ “দশটি হাজার”?  
বর এল! বর এল! বাজিছে সাহানা  
সানাইতে, কলহাস্তে ধায় পুরাঙ্গনা।

বিংশ শতাব্দীর বর আবার এসেছে।  
এবার পার্শেল নয়, মানুষ সেজেছে!  
পড়ে গেল হুলস্থূল!—উৎফুল্ল নয়ন  
দত্তজায়া জামাতারে করিলা বরণ।  
খোলা হতে নামে লুচি, টগবগ্‌ তাঙ্গা,  
জিবেগজা, পানতুয়া, ছানাবড়া, খাজা,  
মোতিচূর, সরপুলি, আর সরভাজা।  
বিবাহ-উৎসব তুই পার্কণের রাজা!  
রাঙা দিদি হাসিছেন বদনে অঞ্চল;  
কহিছেন, “ধাম কবি, মুখে আসে জল।”  
“উল্লু, উল্লু, উল্লু, উল্লু!” উল্লুর ফোয়ারা  
মুখে ছোটে। বিন্দু দাসী হেসে হ’ল সারা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

## একটি মন্ত্র

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে, অসংখ্য। এই  
অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন? সে  
কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে? সে কত পূজার  
অর্ঘ্য, কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে? তাই মানুষ  
অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে, কত  
যাদুমন্ত্র পড়েছে, তুর ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকুরো  
টুকুরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে  
এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যং। অর্থাৎ যা-কিছু  
দেখ্‌চি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখিনি কেন? কেননা, সে যে কিছুই  
সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে  
আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে  
যদি হ’ত “একটি,” তাহলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে  
কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে  
হ’ল “এক,” তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ  
করে দেখবার জো রইল না।

এত বড় আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে  
নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ

হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কি? বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ। তাতে বল্চে, জগতে কোনো জিনিষ একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করচে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয়, এ কথা বার বার চিন্তা করে কোন লাভ নেই। কিন্তু যেগুলি মানুষের অমৃত বাণী, সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে। মানুষের সেই রকম একটি অমৃতমন্ত্র কোন এক ভুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল “সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।”

কিন্তু মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে? কোথাও কিছুই ত স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই-সমস্ত অরণ্য শ্বেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজি-বিজির মত কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে যাচ্ছে। পাহাড় পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব, কিন্তু সেও যেন রক্ত-মঞ্জের পট, এক এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য্য তারাও যেন আলোকের বুদ্ধদের মত অন্ধকার-সমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এই জন্তই ত সমস্তকে বন্ধি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোনখানে?

সত্যের ত প্রকাশ এমনি করেই, এই চির চঞ্চলতায়। সত্যের কোনো একটি ভঙ্গীও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলি তা নানা-ধাণা হয়ে উঠে। তবু যে দেখতে সে আনন্দিত হয়ে বল্চে আমি লাচ দেখছি। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গীই তাতে মানে বাধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করচে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গীকেই মুখ্য করে দেখছি নে, আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে,

তাই খুসি হয়ে উঠি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে, সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পুড়ে থাকে, কিন্তু যে গাড়ি চল্চে, তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়ত প্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার করে' তাদের যুক্ত করে' তাদের অতিক্রম করে' যদি সত্য না থাকে, তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলি বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বল্চে সমস্তই স্বপ্ন, নয় বল্চে সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ অতি ভীষণ। সে, হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্তে ব্যগ্র হয়েছে, নয় ভীষণ বিশ্বের দ্বেবতাকে দারুণ উপচারে খুসি কুরবার আয়োজন করচে। কিন্তু যে লোক সমস্ত স্রষ্টার ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গীর ভিতরকার নাচটি, সমস্ত স্রষ্টার ভিতরকার সঙ্গীতটি দেখতে পাচ্ছে, সেই ত আনন্দের সঙ্গে বলে উঠে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ বাবসা যখন চলে তখনি বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে হেঁউলে হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনি তা সম্ভব। সংসারে সমস্ত কিছু চলচে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্টো কথা; আসল কথা—সত্য বলেই সমস্ত চল্চে। তাই আমরা চারিদিকেই দেখছি—সত্য আপনাকে স্থির রাখতে পারচে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেচে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে? এ ত তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না, এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখছি। সত্যের রহস্য সবচেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায়, পশুপাখীতে। সত্য যে প্রাণিস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্র পত্র দেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত, তবে তার এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে ত একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই প্রাসটুকুর মধ্যে আমরা কি দেখি? যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বহু অক্ষর ধ্রুপদ গান চলেছে; চোতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করচে, মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক একটি ছোট ছোট তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্বে ঢাকা আছে—ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখা দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখীতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মত ছুটে ছুটে বেরয়, সে হচ্ছে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের ভাবটি কি তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটে আটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সুবে চেষ্টা শুরু যাকে আমরা সবচেয়ে সহজে বুঝি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেই জন্তে তাকে ঘোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। একদিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল, আর একদিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না-থাকা এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ত্রায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ত্রায়শাস্ত্রেই আছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে স্মৃতি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমরা কেউ অহল্যার মত পাথর করে স্থির করে রাখে, তবে বুঝি যে, সেটা আমাদের অভিলাষ। আবার যদি আমাদের প্রাণের যুদ্ধগুলিকে কেউ চক্রমকি-

ঠোকা স্মৃতির মত বর্ষণ করতে থাকে, তাহলে সে প্রাণকে আমরা একধাঁনা করে পাইনে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনিশ্চিনীয় অথচ সূনিশ্চিত; যা আপনাকে আপনি কেবলি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে; যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারি। বুঝতে পারি, এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সঁকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলি চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এই জন্ত জগতে স্থির হই হচ্ছে বিনাশ—কেননা স্থির হই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এই জন্তই বলা হয়েছে; যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কল্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ, আর অপ্ৰাণ কোথাও নেই? অপ্ৰাণ আছে, কেননা স্বন্দ ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সেই অপ্ৰাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্ৰাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা-ফেলা একটা বাধায় ঠেকে, কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও একদিকে বাধা, আর একদিকে বাধামোচন; সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়;—সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে পেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যে দিন এই কথাটি আমরা ঠিক-মত উপলব্ধি করতে পেরেছি, সে দিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিজ্ঞান দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছ্বাল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সে দিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সে দিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু সত্যের পূজা ত কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে ত বর

পাবার জো নেই। সত্য প্রাণীময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বুর পাছে, তার দৈত্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি? যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়; যেখানে তার নব নব উদ্যোগ; যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি; যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছে দৈত্বির হয়ে বসে নেই; যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে যুক্ত রাখবার জন্তে মানুষ সর্বদাই সচেতন। আলানি কাঠ যখন পূর্ণ তেজে জ্বলে না, তখন সে ধোঁয়ায়, কিছা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে; তেমনি দেখা গেছে যে-জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলি বাঁধতে চেয়েছে, তার সত্য সকল দিক থেকেই স্তান হয়ে এসে তাকে নিজ্জীব করে; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম; চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে, তখন বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারিদিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরঙ্গী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সঙ্কটের মধ্যে না পেতে থাকে বটে, কিন্তু সৃষ্টির ঘা খেয়ে করণার কলগান যেমন আরো জেগে ওঠে, তেমনি ন্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর যারা মনে করে, স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলি জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটা-ক্ষেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম; নিজের দুর্গতির জন্তে তারা পুরকে অপরাধী করতে চায়; একথা ভুলে যায় যে, যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল, সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কি, তবে কোন্-খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগতে পারলে না, সেই-

খানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কি, তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাঁঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয়, সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে। কেননা, চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই—কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড় করে দেখায়,—যেখানে আজও সে পৌঁছয়নি সেখান-টিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্যতাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্ঞান লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ, সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জ্ঞানের বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে। সেই জন্তেই মনে আছে সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ সত্য যার বাহিরের বিকাশ, জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলি হয়ে উঠছে মাত্র, অথচ সেই হয়ে ওঠা আপনাকেও জানচে না, কাঁউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমন জ্বলে, অমনি যা কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারেনি বলেই মানুষ বলেছে, সত্যং জ্ঞানং, সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলি জ্ঞানকে ফল দান করচে, জ্ঞান কেবলি সত্যকে সার্থক করচে, এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে স্মৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপদিষদে ব্রহ্ম সধক্বে বলেছে তাঁর “স্বাভাবিকা জ্ঞানবলক্রিয়া চ।” অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই ত হল যা কিছু—এই ত হল জগৎ। চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি—বল কাজ করছে,—স্বাভাবিক এই কাজ—

অর্থাৎ আপনার জ্বরেই আপনার এই কাজ চলচে। এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কি জিনিষ তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য! তারি সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমার বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলচে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করচে। “স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়াচ” মানুষ এমন কথা বলতেই পরতনা যদি নিজের মধ্যে এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ, একান্ত অনুভব না করত। এই জন্মই গায়ত্রী-মন্ত্রে একদিকে বাহিরের ভূভুবঃ স্বঃ এবং অণু দিকে অন্তরের ধী, উভয়কেই একই পরম শক্তির প্রকাশ-রূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোট শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ, তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ; তেমনি আমার জ্ঞানও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর গোলার মত, আকারটি আমাদের চোখে সমতল বলে ম্যেঁকে; তেমনি বৃহত্তের মধ্যে যে জ্ঞান বিরাজ করচে, আমাদের কাছে তার চেতন ছোট, আমার মধ্যেই চেতনার পরিচয় সহজ। কিন্তু সেটি যদি সমগ্রের না হত তবে সে আমার হতে পারত না।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্য্যকে ওজন করচে এবং বলচে আমার জ্ঞানের জ্বরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত, তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারচে। মানুষ অহঙ্কার করে বলে, আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দুর্ভেদ্য বাধা কাটাচ্ছি—কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেই জন্মে যে দিন মানুষ বলে সত্য, সেই দিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরের সর্বত্র দেখতে পেল। যে দিন বলে জ্ঞান, সেই দিন সে

বুঝলে যে, সে যা-কিছু জানুচে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে, সমস্তই একটি বৃহৎ জ্ঞানের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এই জন্মই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে, তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবল বেড়ে চলবে, কোথাও সীমায় যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ বাহুমন্ত্র পৌরো-হিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়—অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা কর, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মালিত হতে থাক।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে—অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখতে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানতে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলেছে—অনন্তং ব্রহ্ম।

কোথায় সেই পরিচয়? আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি, সেইখানেই আমাদের দুরিদ্ধ্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা রূপণ; কিন্তু দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেইখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্য্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি, তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপ-করণকে তখন হাতে আঁকড়ে ধরি, মনে করি বস্ত-পুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড় হব। আর, যখন কোনো বৃহৎ প্রেম, বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখন আমাদের রূপণতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আশ্বাদ পাই। এই জন্ম মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্যের পরিচয় ঐরাগো, আসক্তিতে নয়; আমাদের সমস্ত নিত্য কীর্ত্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই, মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং—ভূমাই আমার সুখ; ভূমৈব

বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকেই আমার জানতে হবে ; নাহলে সুখমস্তি—অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে, তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না ; এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে, তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে-সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায়, সে-সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না ; এই জগতই সে-সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি, যখন তাকে আমরা ছোট করে জানি—মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেখানে কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত, সেখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে রূপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে লজ্জা বোধ করে না ; সত্যকে মতে মানি কিন্তু কাজে করতে পারিনি, এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সঙ্কোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল অহুষ্ঠানও বাহু-আচারগত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জগতই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না ; সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে, তখন মানুষ, আনন্দরূপ-মমতং আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মত আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্ত স্বরূপকে বলেছে “আত্মদা” তিনি আপনাকে দান করছেন—সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের সমস্ত মস্তিষ্ক একবার দেখে নিই। সত্যং জ্ঞানমনস্তং।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্য সত্য গতিবান। সত্য আপনার গতির দ্বারা

কেবলি আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে। কোনো সীমায় এসে সে একেদারে থেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন—এই জগতই ব্রহ্মের এক প্রান্তে সত্যং, আর একপ্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম—তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে—কিন্তু সে-বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই ; তাই সীমা কেবল অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম, সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলি সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হতেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরোধ করছেন না। এই-জগত ব্রহ্ম, সীমা এবং সীমাহীনতা, দুইয়েরই অতীত—তাঁর মধ্যে রূপ এবং অরূপ দুইই সঙ্গত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে “বলদা,” তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে ;—আবার আত্মদা—সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটেনি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন—এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের অপরূপ মিলন ঘটে গেছে,—সত্যং এবং অনন্তং অনির্কচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একইকালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ-মিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে—এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্য যোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজ-স্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা পরমাঙ্গার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবমধৈতং রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠেছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত কাঞ্চল্যের



মর্মান্বিত শাস্তি ; এই মঙ্গল বন্দবিহীন নিজীব মঙ্গল নয়, সমস্ত বন্দমহনের আলোড়নজর্জরিত মঙ্গল ; এই অদ্বৈত একাকারিত্বের অদ্বৈত, নক্ষ, সমস্ত বিরোধ-বিচ্ছেদের সমাধানকারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি “বলুদা আত্মদা”, সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলি আপনাকে দান করেছেন।

সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি ত কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কি ? আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাক।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগধেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সঙ্গীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তিকে পাইনে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে, এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যংজ্ঞান-মনস্তং ব্রহ্ম,—অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলচে অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করচে, তাদের সেই চলা, সেই বল-ক্রিয়া কলুর বলদের চলার মত, তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিম্বা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায়, তাদেরও এই ধ্যানের কিম্বা রসের সাধনা বন্দ্য। তাদের চেষ্টা, হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে, নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতর বলে মনে করে! , যাদের জীবন সত্যের চির-বিকার-পথে চলবে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগ-বিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করচে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যংজ্ঞানমনস্তং এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাকলা ও অহঙ্কারের ঊর্দ্ধতা

থেকে নিম্মুক্ত করবার ক্ষমতা একান্ত চেষ্টা করতে হবে— তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে' আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে সজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে, তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু—তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যখন সুখ-দুঃখের চাকলা আমাদের অভিভূত করবে, তখন এই শান্তিমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যখন মান-অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকবে, তখন এই মঙ্গলমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আস্থানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে, তখন এই অভয়মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে, তখন এই শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ার আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে, তখন এই অমৃতমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে সত্যংজ্ঞান-মনস্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক, তাহলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে মত্ততা হতে অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নুদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসঙ্গীত বাজে, আমাদের জীবন তেমনি প্রতিক্ষণেই স্ক্রিটার পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃত বাণীটি সঙ্গীতের মত বাজতে থাকে সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করেছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দমন্ত্রটি হোক সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। আর আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক অসতো মা সদৃশময়, তমসো মা জ্যোতির্-গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—জড়তা হতে আমাদের সত্য নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও। অবিরাম

হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরম আনন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জানে প্রেমে কর্ণে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক, জয় হোক তোমার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## পুস্তক-পরিচয়

### অনুপ্রাস—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত, প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ও পুত্র। ডঃ ক্রাঃ ১৩৭ পৃষ্ঠা মূল্য আট আনা। মুখপাতে একখানি রঙিন ছবি আছে—বাগধের ছায় সংযুক্ত পার্বতী পরমেশ্বরের।

এই পুস্তকে অনুপ্রাস বিষয়ক ১২টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) ধর্মকর্মে অনুপ্রাস, (২) বিদ্যানন্দিরে অনুপ্রাস, (৩) দেবভাষায় অনুপ্রাস, (৪) মুসলমানী শব্দে অনুপ্রাস, (৫) সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৬) খাঁটি সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৭) স্থানীয় সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৮) নরনারীর নাম নির্বাচনে অনুপ্রাস, (৯) অনুপ্রাসের অধিকার বিচার, (১০) প্রবাদবাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাস, (১১ ও ১২) অনুপ্রাসের অট্টহাস।

অনুপ্রাসে বাক্য সরস ও শ্রুতিমুগ্ধ হয়; একত্র ভাষার কোঁক অনুপ্রাসের দিকে। ললিত বাবু অত্যাস্বর্ষ্য ধীরতা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুপ্রাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সংগ্রহ কেবল মাত্র শব্দের তালিকা নয়; ললিত বাবু বিচিত্র শব্দকে সংলগ্ন ভাবের মালায় গাঁথিয়া রসিকতায় সরস করিয়া তুলিয়াছেন; ইহাতে যাহাদের ভাষাতত্ত্ব রূপ জটিল গহনে প্রবেশ করিতে একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক আছে তাহারাও এই অনুপ্রাস আলোচনার যোগ দিতে প্রস্তুত হইবে।

তথাপি একই বিষয়ের এত দীর্ঘ আলোচনা পাঠকের একঘেয়ে লাগিতে পারে এবং রসিকতা কষ্টকর কসরৎ মনে হইতে পারে, মনে করিয়া লেখক ভূমিকায় বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকদের জন্য উপায় ও বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। “প্রবন্ধগুলি একটানে পড়িলে কতকটা একঘেয়ে লাগিবে। তজ্জন্য ‘পাঠকবর্গকে অনুপ্রোধ করিতেছি, তাহারা যেন একটানে একটির বেশী না পড়েন; .....যাঁহারা তরলপ্রকৃতি, শুদ্ধ মজা লুটিবার জন্য পুস্তক-পাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারা যেন কেবল ‘অনুপ্রাসের অট্টহাস’ মনোযোগ দান করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা গভীরপ্রকৃতি, কাণের কথা শুনিতে চাহেন,.....তাঁহারা যেন কেবল ‘অনুপ্রাসের অধিকার বিচার’ লইয়া নাড়াচাড়া করেন। আর যাঁহারা ব্যঙ্গ-বাণীশ.....তাঁহারা যেন ‘সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাসে’ বা ‘প্রবাদ-বাক্যপ্রবচনে অনুপ্রাসে’ একবার চোখ বুলায়। বলা বাহুল্য, যথার্থ

বিচারক পাঠক, ষোল্ল মাসে ষোল্ল রাশিতে সংক্রমণশীল সূর্যের ছায়, ষোল্লটি প্রবন্ধে যথাক্রমে বিচরণ করিবেন।”

অনুপ্রাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই পুস্তকে এত খাঁটি বাংলা শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে যে কোষকার, ব্যাকরণকার, ভাষার অন্তর্নিহিত ধাঁচা অনুসন্ধানকর্তা ইহার মধ্যে অনেক মসলা পাইবেন। যাঁহারা উপরে উপরে, না তলাইয়া নাহিত্যরসসম্ভোগ করিতে চান, তাঁহারাও অল্প অল্প করিয়া চাখিলে অনুপ্রাসে প্রচুর রস পাইবেন।

### বাণান-সমষ্টি—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত, প্রকাশক বঙ্গবাসীকলেজ-স্কুল বুক-ষ্টল। ৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা।

বাংলা শব্দের বাণান লিখিতে সচরাচর কি কি ভুল হয় এবং লেখকের মতে কি প্রণালীতে বাণান লেখা উচিত তাহাই এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। (১) হসন্ত চিহ্নের আবির্ভাব তিরোভাব হওয়ার্তে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানে বিঘ্ন জন্মে। বহু উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় সংস্কৃতের খুঁটিনাটি চলা উচিত কিনা বিচার্য্য। (২) বিসর্গ বিসর্জন শব্দে অভিযোগের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য—বাংলায় পদান্তের বিসর্গ লোপ হওয়াই নিয়ম; অধিকন্তু বাংলা শব্দ যদি সংস্কৃতের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া স্ব-রূপে দেখা দেয় তাহাতে তুঁহাকে নিন্দা না করিয়া সম্বাদর-করা উচিত; বাংলায় ধনুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ, যশঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ওকালতির জোরেও চলিবে না। সুন্ধি ও সমাসের বেলাও বাংলা ভাষার ধাত মানিয়া চলাই আমাদের মত। তবে, যে-সমস্ত সন্ধিনিম্পন্ন বা সমাসনিম্পন্ন সংস্কৃত পদ সমগ্রভাবে চলিয়াছে তাহার বেলা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। (৩) আকার গ্রহণ। অনেক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আকারান্ত হইয়াছে দেখিয়া লেখক ক্ষুব্ধ। এ-ক্ষেত্রেও আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বাংলা সংস্কৃতের কথা হইতে পারে কিন্তু দাসী নহে, তাহার সজীব স্বাধীনতা মানিয়া লইয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু লেখক এমন-সমস্ত উদাহরণ দিয়াছেন যেগুলি অঙ্গ লোকের জিহ্বার জড়তার দৃষ্টান্ত, যেমন পরমন্ন, দুরাবস্থা, ভয়াঙ্কর প্রভৃতি। ইহা সাহিত্যের অন্তর্গত রূপ নহে। তবে চলিত কথার শব্দবিকার যদি ঐ ভাবেই স্থায়ী হইয়া যায় তবে কালে উহাই আবার সাহিত্যের আসন্ন ও অবরদখল করিবে ইহা নিশ্চিত; এবং কোনো বিদ্যারত্ন বৈয়াকরণের চোখরাঙানি সে মানিবে না। (৪) চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়। এ বিভাগেও লেখক প্রাদেশিক কথার বিকৃতিকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়া খুঁত ধরিয়াছেন। তথাপি চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম ও তদন্তর্গত উদাহরণগুলি সকল লেখকেরই সাবধানে অধ্যয়ন করা কর্তব্য। (৫) হ স্বদীর্ঘ জ্ঞান। উচ্চারণের দোষে আমরা সংস্কৃত শব্দের হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান হারাইয়াছি। কেবল ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হয়। এ ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশের বেলা কিরূপ বাণান লেখা উচিত ইহা একটা সমষ্টি। আমাদের মতে উচ্চারণ অনুযায়ী বাণান লেখাই সঙ্গত ও ভাষাতত্ত্বের সম্মত পদ্ধতি। স্থানে স্থানে প্রচলিত রীতি মানিয়া লইয়া রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। (৬) অকার ওকারে গৌলযোগ। এই প্রসঙ্গে লেখকের সহিত একমত হইয়া আমরা কুমার চালাইবার পক্ষপাতী; তাহা হইলে য-এর সংস্কৃত উচ্চারণ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে কাজে লাগিতে পারে; আমরা বায়ু, আয়ু, যুরোপ প্রভৃতি শব্দে য-এর যথার্থ উচ্চারণ পাই, অশ্বত্থ অ চালানোই বিধি। (৭) ক ও রি রী। ক শব্দের যে কি উচ্চারণ কেহ বলিতে পারে না; সংস্কৃত শব্দের খাতিরে ঐ

বাহ্যল্যট্ট্বীকার না করিয়া রি বী দিয়া কাজ শীরাই উচিত বলিয়া মনে হয়। (৮) ব ব। বর্গ্য ব ও অন্তঃস্থ ব আকারে পৃথক হইলে ওয়া দিয়া বানান, লেখার ঝগাট অনেকটা সহজ হইয়া আসিতে পারে। (৯) জ য। অপভ্রংশের বৈলম্ব ব্যুৎপত্তি স্বরণ করিয়া জ হইবে কি য হইবে স্থির করাই সঙ্গত আমাদেরও মনে হয়; তবে সমস্ত জ একশা করিয়া ফেলিতে পারিলে কোমো ল্যাঠাই থাকে না, কারণ জ ও উচ্চারণে আমাদের নিকটে কোনো পার্থক্য নাই। পদ-বধ্যস্থ বা অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ য হয়; এজন্য ব্যুৎপত্তি-অনুসার বানান রক্ষা করা সব সময় সুবিধাজনক নহে। (১০) র ড। এই দুই অক্ষরের উচ্চারণে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় ভুল করেন; তাহাদের শব্দে র ও ড নির্ণয়ের নিয়মগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে। (১১) ঙ ক। সংস্কৃত ক বাংলায় ঙ, লেখায় এবং উচ্চারণে। (১২) সংযুক্তবর্ণ। য-ফলা ও ব-ফলা, ত ও ত্ব, ক ও ক্র, ম ম্ ও য প্রভৃতির পার্থক্য বাংলা উচ্চারণে নাই, ম-ফলা প্রায়ই উচ্চারিত হয় না, ম-যুক্ত অক্ষর স্বিত্ উচ্চারণ হয় মাত্র। প্রাকৃত-সংস্কৃতের মতো বানান উচ্চারণানুযায়ী একবিধ করিয়া ফেলিলে সকল লেঠাই চুকিয়া যায়। বতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ব্যুৎপত্তির দিকে নজর রাখিয়া বর্ণাশুদ্ধি বাঁচানো ছাড়া উপায় নাই। (১৩) ণ ন। (১৪) শ ব স্। বহু গহ্ব জ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের মত—মূল শব্দের বহু গহ্ব দেখিয়া অপভ্রংশের বানান লিখিব তা সেখানে বহু গহ্ব বিধানের অবসর থাকুক আর না থাকুক। এত বড় জুলুম দেখিতেছি; এক বাংলা ভাষা শিথিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষাও নিয়ত অর্থাৎ compulsory। বাংলায় বহু গহ্ব, বিধান যে খাটে না তাহা লেখক পিসি মাসি রাণী কোরাণ প্রভৃতি শব্দ বিচার করিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বাংলায় বানানের বালাই সহজ করিয়া আনাই সঙ্গত মনে হয়। অবশ্য “ভাষায় বানানের একটা নিয়ম ও সুসঙ্গত শৃংখলা থাকা উচিত।” (১৫) বর্ণবিপর্যায়। আমরা অনেক শব্দ লিখি একরকম, উচ্চারণ করি অল্প রূপ, কোনা কোনো শব্দের আদিম বর্ণপর্যায় পাঠাইয়া ফেলি। (১৬) অকারের ‘ও’-উচ্চারণ। ইহা বাংলা উচ্চারণের দোষ হইলেও বিশেষত্ব। অনেকে মতো কালো লিখেন দেখিয়া লেখক শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার জায় বিচক্ষণ পণ্ডিত যে, কারণটা ঠাহর করিয়াও করিতে পারেন নাই ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। বাংলায় এক বানানের কতকগুলি জোড়া জোড়া শব্দ আছে, যাহাদের রূপ এক, অর্থ ভিন্ন, তাহাদের একটি হলন্ত, অপরটি ওকারের টানযুক্ত অকারান্ত উচ্চারণ হয়। অর্থবিলাট ও পাঠব্যতিক্রম নিবারণের জন্ত কোনো কোনো লেখক ওকারের টানযুক্ত অকারান্ত শব্দে ওকার যোগ করেন, যেমন—কাল কালো, ভাল ভালো, স্তম্ভ মতো, কখন কখনো, কোন কোনো, বার ধারে, বল বলো, ইত্যাদি। কাল শব্দ কৃষ্ণত্ববাচক সংস্কৃত হইলেও এখন বাংলা, তাহার বাংলা রূপপরিবর্তনে আপত্তি টিকিতে পারে না। বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করাও যে চম্বে না, তাহা অল্প অনুধাবনেই লেখক স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিবেন। (১৭) ‘এ’র ‘র্যা’ উচ্চারণ। এ সমস্তার মীমাংসা কি? আমাদের মনে হয় জমা চালানো উচিত, নয় ত কোনোরূপ নূতন অক্ষর উদ্ভাবন করা উচিত। (১৮) উচ্চারণানুযায়ী বানান। ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের বিষয় ঘটিবে বলিয়া উচ্চারণানুযায়ী বানানের বিরুদ্ধে লেখক কোমর কমিয়া ওকালতী করিয়াছেন; কিন্তু তাহার যুক্তি টেকসই মনে হইতেছে না। “ভাষায় একটা কৃত্রিমতা থাকিবে কেন? যাহা সহজ, যাহা স্বচ্ছন্দ, তাহাই ত ভাষা, তাহাতেই ত ভাষার প্রাণ। ভগবানকে ভাষা নিবেদন করিবার বেলা সংস্কৃত,

করিয়া বলিবার মতো গ্রহসন্মত আর নাই, অথচ লেখক তাহার উপটা পক্ষকেই ঠাট্টা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি নিজের রসজ্ঞতা ও রসিকতার পরিচয় দেন নাই। এ সম্বন্ধে বীরবল ওরফে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং পুনরুক্তি নিস্পয়োজন।

পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে চিত্রার ধোরাক পুঞ্জিত হইয়া আছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ ও বিচার করিয়া দেখা উচিত।

### শব্দ শিক্ষা—

শ্রীবিবেকচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। নবদ্বীপ। ডিমাই ১২ অং ১৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

ভাষার শব্দ-বিশেষের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে জাতির আচার ব্যবহার ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, শব্দ-পরম্পরার মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও জাতীয় প্রকৃতির ছাপ লুকায়িত থাকে। এই পুস্তকে বাংলা ভাষার বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি ও দোহাতনা নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। পুস্তক-খানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) শব্দশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ভাষার প্রাধান্য, (২) শব্দে কবিদ, (৩) শব্দে নীতি, (৪) শব্দে ইতিহাস, (৫) বৈদেশিক ও অপভ্রষ্ট শব্দ, (৬) শব্দের ব্যবহার (৭) নূতন শব্দের অভ্যুদয়, শব্দসূচী। সমস্ত পুস্তকখানি ভাষার বিচিত্র লীলা প্রকৃষ্টে কোতুককর ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। বিশেষত এইরূপ চেষ্টা বাংলা ভাষায় একরূপ নূতন ও প্রথম বলিলেও চলে। বহু শব্দের মূল নির্ণয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার ও তদন্তগত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শব্দবিচার যাচাই করিয়া দেখিতে না পারিলেও বহুস্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইল। ‘কাওজান’ মানে বৃক্ষকাণ্ডের জ্ঞান নহে, ক্রিয়াকাণ্ডের জ্ঞান; ফলকর্মে কোন্ যজ্ঞে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, কি কি জ্বা আবশ্যিক, তাহার জ্ঞান। ‘উড়ানি’ যাহা দ্রুত যাইবার সময় উড়ে তাহা নহে, যাহা উর্টা (হিন্দী শব্দ, অর্থ ঢাকা বা গায়ে জড়ানো) যায় তাহা। ‘মেরে’ কি মায়ী শব্দজ? টাকা পাইলে লোকে মুদিত বা আফ্লাদিত হয় বলিয়া টাকা ‘মুদ্রা’ নহে, মুদ্রিত বা ছাপা হয় বলিয়া মুদ্রা; অগঠিত ও অলিখিত চেবুয়া পরমা মুদ্রা নহে। ‘চাকব’ শব্দের মূল চাক্ষুষ না চক্ষুমান না হিন্দী চৌবর্গ-সহি (square)?

যাঁহারা শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ভাষার দীতি-পদ্ধতি আনিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকে প্রচুর আনন্দ শিক্ষা ও উদাহরণ সংগৃহীত পাইবেন। বিভিন্ন শব্দের সহযোগে বাংলা ভাষার ক্রিয়া-পদের অর্থব্যতিক্রম লক্ষ্য করিবার জিনিস, যথা, খাওয়া (জল, হাওয়া, মার, গাল, হেঁচট, হুন্ডি, ডিগবন্দী, বকুনি, দোল, মাথা); দেওয়া (সাঁতার, হামাগুড়ি, গাল, শাপ, হাত, হিসাব, বাতাস, বেদনা, বলি, চোখ, দুয়ার, মাথা); তোলা (গা, মাথা, চাঁদা, রাগ, ননী, ছাত, ফুল, পটল, নাক, দাদ); মারা (ভাত, পাক, পথ, খাবড়া, পাড়ি, গুড়ি, লাক, ফাঁক, লাভ, ডুকা)। চিহ্নটি কাটা, পাশ ফেরা, দাঁত খিঁচান ভাষার idiom, সুতরাং তাহার ক্রিয়া অপরিবর্তন নহে। ত, গো, কেন, না প্রভৃতি ভাষার বিশেষ ভঙ্গি লক্ষ্য করিবার জিনিস। পদসমষ্টি (phrase), সমার্থক যুগ্মশব্দ (মাথা মুণ্ড, হাসিখুসি, খোঁজখবর), এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ (গণ, গুণ, দণ্ড, পক্ষ, পদ, ভেদ) প্রভৃতির ব্যবহারপ্রণালী ও দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন ভাষা হইতে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে সংস্কৃত হইতে কত নূতন শব্দ যে আমদানী

ও উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার পরিচয়ও বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও আনন্দজনক। শক্তিমান কবিদিগের দ্বারা নূতন শব্দ উদ্ভাবন ও প্রচলনের দৃষ্টান্তও বাদ পড়ে নাই। এই গ্রন্থখানি ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে।

### কুবলয়—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড এম-এ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও পুত্রগণ। ডঃ ক্রাঃ ২৪ অং ১০০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য আট আনা।

এখানি ঋগ্বেদকবিতার পুস্তক। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কবিতাগুলি প্রায়ই আড়ষ্ট। চন্দ, সরসতা, ভাববৈচিত্র্য এবং কবিত্ব অতি অল্পই আছে।

### বিষদল—

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্তী ও চট্টোপাধ্যায় কোম্পানী। ৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। ঋগ্বেদকবিতার বই। বইখানি তিনটি পর্বে বিভক্ত; প্রত্যেক পর্বেই অনেকগুলি করিয়া কবিতা আছে। কবিতাগুলি ভাষা বিষদলের মতো সরস ও সুন্দর; কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের তরলতা ও ভাবের সূক্ষ্মতা মিলিয়া কবিতাগুলিকে যে একটি পল্লবপেলবতা দান করিয়াছেন তাহা রমণীয় ও উপভোগ্য। কবিতাগুলি তাহাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্য-স্বপ্নমার বারিশ্রীকর চমকাইয়া শীর্ণা পিরিনদীর মতো লগ্ন অথচ ত্বরিত গতিতে বহিয়া গিয়াছে। ইহা অতিমাত্রায় 'লিরিক', শুধু একটু সুর, মুগ্ধ করে কিন্তু বেশী কিছু দেয় না বলিয়া পড়িয়া মন ভরে না, ছুঁতি হয় না।

### 'মালধঃ'—

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত, চুঁচুড়া আলোচনা-সমিতি হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অংশিত ১১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ ভালো নয়।

ঋগ্বেদকবিতার বই। প্রথমে সুরস্বতী বন্দনা হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, সমগ্র কাব্য ও কবিসমাজের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পয়ারছন্দে' প্রদত্ত হইয়াছে। অবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা পয়ার ও কৃপদী ছন্দে লিখিত।

### জাপানের অভ্যুদয়—

খিদিরপুর একাডেমীর হেডপণ্ডিত শ্রীহরিন্দাস ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এখানি পদ্যপুস্তক। পাঁচটি সর্গে জাপানের ইতিহাস পদ্যে বিবৃত হইয়াছে; কোনো বিশেষ ঘটনা ইহার কেন্দ্র নহে; বিশেষ করিয়া রুশজাপানের যুদ্ধের লড়াইপরম্পরা তালিকার মত বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। রচনার ভাষায় অনেক আভিধানিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে হয়ত গাভীর্ঘ্য বাড়িয়াছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রসাদগুণ নষ্ট হইয়াছে। ইহাকে 'ঋগ্বেদকাব্য' নামে চিহ্নিত করা গ্রন্থকারের সমীচীন হয় নাই; পদ্যে বিবৃত হইয়াছে ছাড়া কাব্য-লক্ষণ ইহার মধ্যে কিছুই নাই; কবিত্ব এ পাড়া দিয়া হাঁটে নাই।

### আত্মদেবতা—

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ খন্দ্যোপাধ্যায় এম-ও. প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৫৪ পৃষ্ঠা। এটিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, কাপড়ে বাঁধা মলাট। মূল্য বারো আনা মাত্র।

লেখকের অভিমত যে মাতৃভক্তিই চরিত্রগঠনের প্রধান উপকরণ। সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি মাতৃমাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক ও আধুনিক মাতৃভক্ত বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও রমণীর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে মাতৃভক্তি হইতেই সম্ভব চরিত্র কেমন করিয়া ক্রমশ পুণ্য ও ধর্ম্মের আদর্শ গঠিত হইয়া উঠে। এই গ্রন্থে এগারটি পরিচ্ছেদ—মা, মাতৃমাহাত্ম্য, মাতৃপ্রভাব, মাতৃ-আরাধনা, মাতৃস্নেহ, মাতৃভক্তি, মাতৃসেবা, মাতৃ-আশীর্বাদ, মাতৃপ্রসাদ, মাতৃ-অর্চনা, মাতৃশোভা—বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে পৌরাণিক আধ্যাত্মিক অনৈসর্গিক যুক্তিতর্কবহির্ভূত এমন অনেক কথা আছে যাহা বালকদিগকে পূর্বাঙ্কে সাবধান না করিয়া পড়িতে দেওয়া উচিত নয়; আমাদের দেশের মহামুহূর্ত্ত পণ্ডিতেরাও যুক্তিতর্কের বিষয়ে এমনই অন্ধ ও কুসংস্কারাগ্রস্ত যে যেমন-তেমন যুক্তিতর্কবিরুদ্ধ অনৈসর্গিক উদ্ভট কল্পনা প্রাচীন শাস্ত্রে থাকিলেই তাহারা তাহা বিনা বিধায় বিনা প্রমাণে বিনা আলোচনার স্বীকার করিয়া বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লন। সেই কুসংস্কারের কুয়াসা আমাদের দেশের যুক্তিতর্ক আচ্ছন্ন করিয়া ছাওয়ায় ভাসিতেছে; আমাদের সম্ভাবনার তাহার প্রভাবে নিমজ্জিত হইয়া আছে; তাহার উপর যদি আধুনিক ছাপার বই ও লেখক সেই শিক্ষাই দিয়া বালকবালিকাদের যুক্তিতর্কের মূল উচ্ছেদ করিতে থাকেন তবে—বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! প্রাচীন পৌরাণিক অনৈসর্গিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া ছাড়া একালেরও যে-সব মাতৃভক্ত-মনীষীদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহারও মধ্যে তর্ক ও যুক্তির সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় নাই। অধিকন্তু পল্লবিত উচ্ছ্বাসে এবং ধীরতার ও শৃঙ্খলার অভাবে বইখানি সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। ভাষাও অত্যন্ত কৃত্রিম ও নীরস।

তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, অনেক মনীষী ব্যক্তির জীবনকাহিনী হইতে তাহাদের বিশেষত্ব ও উন্নতির মূলসূত্র বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা একটু বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে পাঠ করিতে দিলে তাহারা ইহা হইতে অনেক উপকার পাইবে।

### নারীজীবনের কর্তব্য—

শ্রীবসন্তকুমারী বসু প্রণীত, ৪৮২ উইলিয়মস্ লেন হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৩০ পৃষ্ঠা; পাইকা অক্ষরে ছাপা; কাপড়ে বাঁধা মলাট; মূল্য বারো আনা।

প্রকাশক গ্রন্থভূমিকায় আশা দিগকে জানাইয়াছেন যে এই পুস্তকের লেখিকা বালবিধবা, কোনো স্কুল বা কলেজে পাঠাভ্যাস করেন নাই, নিজ হ্রদৃষ্টবশত: স্বামীর কাছেও শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। চিরদিন রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় লেখকের রচনার মধ্যে অকণ্ট আন্তরিকতা ও স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিচয় ছাড়া পরবীর ভাষা ও বর্ত্ত অধিক স্থান পাওয়ার কথা নয়। এজন্য লেখিকা স্বীকার

অনুভূত বলিয়া যে ব্যথা পাইয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজেরই ব্যথা, তাহা সংস্কারকের উচ্চাসনে দাঁড়ীয়া পাজীগিরি নহে। সুতরাং আমাদের দেশের যে একনল স্নাতনপন্থী লোক নিজেদের যাতা কন্যা ভগিনী ভাৰ্য্যাকে অশিক্ষিত রাখিয়া বাঁদীর কাজ করাইয়া মুখে দেবী মঙ্গী প্রভৃতি বড় বড় কথা বলেন, তাঁহারা শুধু একজন অস্বঃপুত্রিকা নিজের মনের ভাব কি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন—

“অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজ ও বিজ্ঞান দর্শনের অনেক অমূল্য সত্য আবিষ্কৃত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং স্ত্রীজাতিরও নানা প্রকারের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। অগ্ৰাণু সমস্ত বিষয়ে যাহাই ইউক, কিন্তু দুই চারিটা সুশিক্ষিত স্ত্রীলোক ব্যতীত স্ত্রীজাতির যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে, ইহা শুধু অশুভবই হয় না। স্ত্রীজাতি আজিও সেই চরিত্র গঠনের অসামঞ্জস্যতাকারিণী। সেই স্বাভাবিক বিমল স্বাধীনতার অপব্যবহারকারিণী। সেই—সাংসারাতীত কার্যে পুরুষের সহায়তা প্রদানে অনধিকারিণী। সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ, ও আত্মোন্নতিতে উদাসিনী। সেই—সাধ্য সত্ত্বেও অগতের প্রতি কর্তব্যপালনে বিমুখিণী। সেই—অল্প-শিক্ষার অনিষ্টকারিতায় অনিষ্টবিধায়িনী। সেই—জ্ঞানের অসীমতা ও অতলস্পর্শ গভীরতা ধারণে অপারদর্শিনী। সেই—সাবলম্বনতায় পরমুখাপেক্ষিণী ইত্যাদি। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীজাতির হিতৈশী মহাত্মাগণের আশা পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অবশ্য, জ্ঞানের গভীরতার অভাব-নিবন্ধনই তাঁহাদের উক্ত শোচনীয় অবস্থার অপনয়ন হইয়াও হইতেছে না। তন্নিমিত্ত অধুনা যাহারা শিক্ষার্থিনী হইয়া জ্ঞানরূপ পরম রত্ন লাভের জন্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহারা জ্ঞানালোকে পশ্চাদ্বেষ্টিণী ভগিনীগণকে শ্রেয় পথ সত্য পথ দেখাইয়া চলিতে সমর্থ হইবেন, এবং যাহারা চরিত্রের সামঞ্জস্যতা, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বনতা প্রভৃতির সুদৃষ্টান্তরূপিণী হইবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ ও উত্তর কালের ভগিনীগণের উন্নতির পথ বিশেষভাবে প্রমুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া যাহাদের দিকে ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণনয়নে চাহিয়া আছে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই জন্ত এই পুস্তকখানি রচিত হইলেও আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে সমস্ত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যাহা সুযুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল। এই পুস্তকখানি দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভগিনীগণের করকমলে সাদরে সমর্পণ করিলাম।”

এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

স্ত্রীজাতির অল্প শিক্ষার অনিষ্টকারিতা, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা, স্ত্রীজাতির দৈনিক কর্তব্য, স্ত্রীজাতির ধর্মপরায়ণতা, স্ত্রীচরিত্রের সামঞ্জস্য ও স্ত্রী-প্রকৃতিগত তেজস্বিতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাবলম্বন, স্ত্রীজাতির বর্তমান শিষ্টাচার, স্ত্রীজাতির সমিতির আবশ্যিকতা, স্ত্রীজাতির বিশ্বসেবা-ব্রতে সহকারিতা, স্ত্রীজাতির ধর্মে উদাসীনতা, মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়া, বৈরাগ্য, সাজারে দাঁড়াই বা আর একবার, ধ্যানমগ্না গৃহস্থ রমণী। শেষের তিনটি পদ্যে রচিত।

এই পুস্তকের ভাষা একটু সেকেলে ধরণের কৃত্রিমতাপূর্ণ হইলেও তাহাতে প্রবাহ ও গাভীর্য আছে এবং বক্তব্য সুপ্রকাশ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণভুল রহিয়াছে, তাহা উপরের উক্ত অংশ হইতেই জানা যাইবে।

এই পুস্তকখানির মধ্যে সুগৃহিণী ও পুরুষের সহধর্মিণীর শিক্ষার উপযোগী বহু কথা আলোচিত ও পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা রমণীগণ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং তাঁহাদের মন উদার বহু ভাবে পূর্ণ হইবে।

### নারী পঞ্চ-চত্বারিংশ—

শ্রীশরৎকুমারী সিংহ কর্তৃক বিরচিত। কানপুর ২৪।৩৯ নং মল-রোড শান্তিআশ্রম হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য বাবো আনা।

হিন্দু নারীর মধ্যে সচরাচর যে যে গুণ ও দোষ দেখা যায়, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক কত দিকে, তাহা একে একে বর্ণনা করিয়া, কি করিলে গুণ বৃদ্ধি ও দোষ পরিহার করিয়া নারী পরিবারে ও সমাজে মঙ্গলরূপিণী রূপে সমাদৃত ও সম্মানিত হইতে পারেন তাহার উপায় পদ্যে ও পদ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। রচনার মধ্যে বিশেষ কোনো কারুকাথা না থাকিলেও বিবিধ উপদেশের সমাবেশে ও সরল ভাষার গুণে বালিকাদের সুখপাঠ্য মনে হইবে। লেখিকা স্বয়ংশিক্ষিতা, স্কুলের শিক্ষা পান নাই, সুতরাং “নারীজীবনের কথা”-রচয়িত্রীর জ্ঞান ইহাও রচনা আন্তরিকতা ও নিজের মনের অভিজ্ঞতার পূর্ণ। ইহারও ভাষারচনাপদ্ধতি সেকেলে ধরণের কৃত্রিমতাপূর্ণ কিন্তু বিশুদ্ধ।

এই পুস্তকের নাম যে “নারী পঞ্চচত্বারিংশ” কেন হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না।

### আকাশের গল্প—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত। প্রকাশক সাধনা লাই-ব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৯৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা মলাট। সচিত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা সহিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—“তন্ত্রিণ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যাহা রচিত হইত, এখন আর যেন তাহা হয় না। অথচ সেকালের চেয়ে একালে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। পাঠকের সংখ্যা, ছাপাখানার সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। ছাপিবার ধরতও সম্ভবতঃ বিস্তর কমিয়াছে।...পঞ্চাশৎ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল এখন তাহাও নাই কি?”

বাস্তবিকই নাই। আগেকার দুই একখানি, সম্প্রতি দুপ্রাপ্য, ভূতবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক বই যাহা আমি দেখিয়াছি তেমন বই আজকাল কৈ দেখিতে পাইতেছি? নূতন বই প্রস্তুত হওয়া ত দূরের কথা পুরাতন বইগুলিরও পুনর্মুদ্রণ হয় না। আগেকার বইগুলির মধ্যে দেখিতে পাইয়া যায় লেখক আগে লিপিতব্য বিষয়টি বেশ করিয়া হজম করিয়া লইয়া আমাদের নিত্য পরিচিত ঘরোয়া জিনিষের দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্য সুপরিষ্কৃত করিয়াছেন আর আজকালকার স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানপাঠগুলি প্রায়ই অব্যবসায়িক গরহজম উদ্গিরণ এবং অধিকাংশই ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ বলিয়া বিলাতী দৃষ্টান্ত উদাহরণে অধিকতর অটল-করা। আমাদের দেশের পাঠক পাঠিকারা হইয়াছেন সৌধীন ও বিলাসী—শিক্ষার জন্ত তাঁহারা পাঠ করেন না, অবসর কালটা একটু ক্ষুণ্ণিতে কাটাইবার জন্ত তাঁহারা বাংলা গ্রন্থ দয়া করিয়া স্পর্শ করেন, কাজেই এম-এসসি পাশকরা বৈজ্ঞানিক এবং এম-এ পাশকরা দার্শনিক গল্প

লেনেন, সমালোচনার চেষ্টায় রণিকতা করেন, কিন্তু যে কর্ণ যাহাকে সাজে সে কর্ণ তিনি কিছুতেই করেন না। স্কুল পাঠশালার কয়েকজন মার্কামারা লোক ভিন্ন অপরের রচিত বই যতই কেন ভালো হোক না পড়ানো হয় না; সেই মার্কামারা লোক কয়টি একা হাতে সাহিত্য বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস অঙ্কশাস্ত্র স্বাস্থ্যতত্ত্ব সব লিখিবেন—তাহারা সবজ্ঞাতা! কাজেই ছাত্রপাঠ্য বইগুলি অপাঠ্য এবং বিশেষজ্ঞেরা বেকার হইতেছে। এমনতর অনাদর ও উপেক্ষা সম্মুখে করিয়াও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন বিষয়ে, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও যোগেশচন্দ্র পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে বহুকাল পূর্বে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সম্প্রতি জগদানন্দ বাবু অক্সফোর্ড ভাবে নিরবচ্ছন্দে আসের পর মাস ধরিয়। বিভিন্ন মাসিকপত্রে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকী প্রকাশ করিয়াছেন; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত প্রবাসীর প্রথম বয়সে বৈজ্ঞানিক, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষিক, প্রবন্ধ লিখিতেন; তাহার লেখনী ক্ষান্ত হইয়াছিল মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি জানিলাম তাহার একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। সংখ্যায় অল্প অথচ বিদ্যা ও কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠদিগের এই দলে আজ একজন নূতন লেপককে তাহার রচিত অর্থাৎ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

এই গ্রন্থের নামেই প্রকাশ যে ইহাতে আকাশের গল্প বলা হইয়াছে। আমাদের আকাশের সঙ্গে অপরিচয় লইয়া অল্পদিন পূর্বেই প্রবাসীতে আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি সেই পরিচয় সাধন করিতে নকতক পরিমাণেও সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা ইহাকে অভিনন্দন করিতেছি। ইহাতে সৌরজগৎ অর্থাৎ সূর্য, নবগ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, প্রভৃতির প্রকৃতি, গতিনিয়ম, পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদি এবং প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিচয় খুব সহজ ভাবে আনাড়িরও বোধগম্য হইবার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যুরোপীয় জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্যোতিষেরও পরিচয় দেওয়াতে গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থবর্ণিত বিষয় বুঝাইবার জন্য ৪২ খানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে; চিত্রগুলি খুব ভালো না হইলেও কাজ চলিবে। এই গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

**শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—**

শ্রীচুনীলাল বসু, এম্-বি, এফ্-সি-এস প্রণীত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৩২৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য দেড় টাকা। ছাপা কাগজ বাঁধাই উত্তম।

এই পুস্তকখানির সমস্ত বিষয় ধারাবাহিক ভাবে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরাও প্রতি মাসে কষ্টিপাথর বিভাগে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিয়া আসিয়াছি। স্মরণ্য পাঠকেরা ইহার উপাদেয়তা সম্যক অবগত আছেন। এই পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম প্রাকৃতিক হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্পর্কে অতি বিশদ ও সহজ ভাষায় সংস্কারবিমুক্ত স্বাধীন ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সংক্রামক ব্যাধির কারণ ও নিবারণের উপায় ও সহজ চিকিৎসা প্রকরণটি বিশেষ ভাবে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। শরীরমাদাং ধলু ধর্মসাধনং—অতএব শরীররক্ষার উপায় জানা সকলেরই কর্তব্য, তাহা ধর্মের অঙ্গ, ধর্মসাধনের প্রথম সোপান। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয়

এমন বিশদ ও সম্পূর্ণ পুস্তক বাংলা ভাষায় আর বোধহয় নাই; স্মরণ্য এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যই হওয়া উচিত—ইহা লেখকের প্রতি অমুকম্পার বশে নহে, নিষেদের আত্মরক্ষার জুই।

**পল্লীসেবক—**

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি হইতে প্রকাশিত। ৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮০ আনা।

পল্লী ভারতের সভ্যতা সমাজ ও প্রাণের কেন্দ্র ছিল; যুরোপীয় সভ্যতার আঘাতে সেই পল্লী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের আর ভদ্রস্বতা নাই। তাহা রক্ষার জন্য পল্লীসেবকের প্রয়োজন; তাহার। কৃষক ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, যৌথ ঋণদান সমিতি গঠন করিয়া কৃষকদিগকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, এবং শহরের ঘূর্ণীপাক হইতে পল্লীকে দূরে বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

রাধাকমল বাবু এই মত নানা প্রবন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়ই প্রচার করিতেছেন। তাহার এই মত যে সমীচীন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

**বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ—**

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্তী চাটুখো কোম্পানি। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৮৯ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে এন্টিকু কাগজে পরিষ্কার ছাপা। স্বামীজীর চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ১০।

ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের কথা, মডু, শিক্ষা, উপদেশ প্রভৃতি সংক্ষেপে স্থূল ভাবে লিখিত হইয়াছে। স্বামীজীর গায় মহাপুরুষের জীবন কথা যাহারা মোটামুটি জানিতে চান তাহার। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন। এই গ্রন্থের লভ্যাংশ বঙ্গা-পীড়িতের সেবা ও বেলেড়মঠে স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হইবে। অতএব এই গ্রন্থ ক্রয় করিলে সকলে মহৎ জীবনের আলোচনা ও পুণ্যকর্মের সাহায্য করিতে পারিবেন।

**এমাস'ন সন্দর্ভ---**

শ্রীবহুনাথ মণ্ডল বি-এ কর্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক মিনার্ভা লাইব্রেরী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২২২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

জগতের দু'চার জন শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ-লেখকের মধ্যে আমেরিকার মহামনীষী এমাস'নের স্থান অতি উচ্চে। তাহার গভীর ভাষা, গভীর ভাব, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, এবং বিষয়ের পূর্বাগ্রে সমদৃষ্টি ও অনুপ্রবেশ, প্রচলিত সংস্কারবিমুক্তি ও জানা কথাও নূতন করিয়া বলিবার শক্তি অসাধারণ। তাহার কতিপয় সন্দর্ভ অনুবাদ করিয়া লেখক বঙ্গভাষার মৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু লেখক নিজের ভাষা এমাস'নের ভাষার স্তায় গভীর করিতে গিয়া কৃত্রিম সংস্কৃতশব্দবহুল রচনারীতি অবলম্বন করিতে তাহা এমন দুর্বোধ ও কঠিন কর্কশ হইয়াছে যে অনেক স্থলে মনে হয় যে ইহার চেয়ে ইংরেজিতে বুঝা যায় ঢের সহজে। ভাষার নমুনা-স্বরূপ দুই একটি পদ যেখান-সেখান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—“কি ঘটনির্মাণ, কি কাব্যপ্রণয়ন, কি মূর্ত্তিসমুৎকিরণ, ইত্যাদি যাবতীয় কর্ণই স্বস্থ পরিপক্ববৃত্তি মানবের সমুচিত অর্পণ সম্বন্ধে-কটির এবং নিসর্গরম্য হইত; সর্বকালে এই-সমস্ত সুকুমার কর্ণের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সমুচিত দেহবিধান যেখানে

অধুনাও অনপচিত অবস্থায় বর্তমান, সেখানে তাহা অদ্যপিও অক্ষয়মান।” “কোন বন্ধক, ঋণহর, বা পুতনিষ্ঠ কারুজনের সাধু-মহাপরিশ্রমশ্রদ্ধা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক, জ্ঞান বলপূর্বক হরণ করিতে সক্ষম।” “সাধারণতঃ তুলাবিপর্গাস্ত যুনে তন্নিনীত বিধিমালা অচিরেই দেবর লাভ করে; এবং লঘু পর্যাবসায়, উপাদানস্থলে অভ্যর্থিত ফলরূপেই পরিগৃহীত হয়।” ইত্যাদি। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ; দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন “এবার অনেক দুর্গম স্থান পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এবং একটা দীপিকাও যোগ করা হইয়াছে। আশা করি এবার পুস্তকখানি সকলেরই সুগম হইবে।” না জানি প্রথম সংস্করণের ভাষা কিরূপ দুর্গম অপরিষ্কার ছিল! গ্রন্থে একটি সূচীপত্রের অভাব আছে।

### সাধনা—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক চক্রবর্তী চাটুয্যে কোম্পানি। ১৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত ভূমিকা সহিত। গ্রন্থের মূল্য প্রথম সংস্করণের অর্ধেক করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলি আছে—বঙ্গ নবযুগের শিক্ষা, হিন্দু ও মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর অধিকার, সমাজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব, আমাদের কর্তব্য, নেতৃত্ব, আধুনিক বঙ্গসমাজ ও মালদহ, আমাদের জাতীয় চরিত্র, ভাবুকতা, আলোচনা প্রণালী, ধর্মের প্রকৃতি, অসীমের উপলব্ধি, ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্যসেবী, সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব, হিন্দুসাহিত্য-প্রচারক।

যুবক লেখকদিগের মধ্যে সকলেই আজকাল গল্পলেখক; সন্দর্ভ-লেখক প্রায়ই কাহাকেও দেখা যায় না। বিনয়বাবু সেই সর্বপরিত্যক্ত পথ অবলম্বন করিয়া সাহস ও সঙ্গিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা একটু জটিল, পদরচনা দীর্ঘ, তথাপিও তাঁহার স্বাধীনচিন্তা দ্বারা সমাহৃত ভাবপরম্পরা সমস্ত সন্দর্ভগুলিকে সুখপাঠ্য করে। আজকাল ভাবুক লোক দেখা যায় খুব কম, কিন্তু বিনয় বাবু দেশের অবস্থা ও সমস্ত সমাধানের উপায় ভাবিয়াছেন, বিভিন্ন মত নিজের প্রজ্ঞা ও মতের আলোকে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং নিজের ধারণাগুলি পাঠকের বিচারের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন; ইহাতে পাঠককেও ভাবিতে হইবে, ফাঁকি দিয়া উপর উপর ভাসিয়া গেলে চলিবে না। তারপর নিজে ভাবিয়া পরের মত মানা না-নানা তাঁহার নিজের হাতে; ভাবিতে পারাটাই মস্ত লাভ। আমরা এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রচার ও নব নব আবির্ভাবসর্বাস্তুরূপে করণে কামনা করি।

### নানানু নিধি—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, ৪০।১এ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২১৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য এক টাকা।

বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই সমাহার এই বইখানি। বঙ্গবাসীর ভাষাপদ্ধতি পল্লবিত আভিগম্যের জন্য প্রসিদ্ধ, ভাবরস তাহাতে থাকে এক কণা কিন্তু ভাষার ফেনা হাঁড়ি ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়ে, তাড়িও হার মানে। পরম ভাগবৎ গণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়ও সেই পদ্ধতি বজায় রাখিতে দিয়া এমন ভাষার মুদ্রাদোষ আয়ত্ত করিয়াছেন যে তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁহার রচনা সহ্য করা কঠিন। যে পরিমাণে

বাঁজে কথা লইয়া উণ্টা পাণ্ডা করা হইয়াছে, সে পরিমাণে ভাব বা তথ্য বা সত্যমীমাংসা ইহাতে না পাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

### সচিত্র আরব ইতিহাস—

শ্রীহাফিজল হাসান প্রণীত। ৪২নং মেটকাফ স্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। ডঃ ক্রাঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে সুন্দর বাঁধা, এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার চাপা। একখানি মানচিত্র ও ৬১ খানি নক্সা, অঙ্গুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নগর, ফলফুল প্রকলণ, ইমারত প্রভৃতির চিত্র আছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ইতিহাসখানি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) আরবদেশ ও জীবজন্তুর বিষয়; (২) আরবদেশের বিভাগ ও প্রধান প্রধান নগরের বিষয়; (৩) আরব-অধিবাসী; (৪) ইসলামের পূর্বে আদিম অধিবাসীর আচারবাবহার; (৫) হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বাভাস।

এই পুস্তকখানি ঠিক ইতিহাস নহে, আরবদেশের 'দিগ্‌দর্শন পুস্তক (Guide Book) বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যাপার ও ঘটনা অপেক্ষা শহর মসজিদ প্রভৃতির বর্ণনা, কুসংস্কারমূলক কিংবদন্তী ও প্রবাদগল্প প্রভৃতির মুসলমান-ধর্মবিশ্বাস-অনুযায়ী বৃত্তান্ত অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান হজ তীর্থযাত্রা করিতে আরবদেশে যাইয়া থাকেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ দক্ষ পাণ্ডার কাজ করিবে; এবং অমুসলমান ইহা পাঠ করিয়া আরবদেশের বহু তথ্য ও মুসলমান ধর্মসম্পর্কীয় কিংবদন্তী ও প্রবাদবাক্য অবগত হইয়া আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। বিশেষত চিত্রগুলি অতি সুন্দর; আরবদেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের দৃষ্টব্য কীর্তিগুলির সহিত পরিচয় চিত্র দেখিয়া খুব সহজেই করা যায়।

হজরত মহম্মদ যোর্তর পৌত্তলিক দুর্দান্ত আরবজাতির মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক নিয়মের সংস্কার সাধন করিতে গিয়া বহু বিষয়ে রক্ষা বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার দুর্দশী বিচক্ষণতারই নিদর্শন। যথা, যিহুদিদিগের গংনা করা রীতি, আরবের বহুবিবাহ, রীতি এবং কাবা মন্দিরের হেজরল আশ্রয়াদ নামক উজ্জ্বল মসজিদে পবিত্র জ্ঞানে রক্ষা ও পূজা। তিনি একেবারেই আরবদের সমস্ত কুসংস্কার একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারেন না হইলিয়া তাহা যতদূর পারিয়াছিলেন কমানিয়া আনিয়াছিলেন;—অগণিত বিবাহের স্থলে চারিটি বিবাহ, জড়মুর্ধি পূজার অবশেষে কাবা প্রস্তরের পূজা-স্বীকার, প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। কিন্তু হজরত মহম্মদ শেখ পরগণার বালিয়া স্বীকৃত হওয়ায় সেই অবশিষ্ট কুসংস্কারও আর নিরাকৃত হইতেছে না; এবং বাঁহারী ইতিহাস-লেখক মুসলমান তাঁহারাও নানাবিধ আজগুবি অতিপ্রাকৃত ও অবিখ্যাসা গল্প সাঝাইয়া সত্যের অমর্যাদা করিতেছেন। মুসলমানী গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় এই বইখানি কিছু তথ্যপূর্ণ ও চিত্রব্যাখ্যাত আরবদেশের সুন্দর পরিচয়-পুস্তক হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রচনার ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম ও আড়ষ্ট; এবং ব্যাকরণভুল ও যথেষ্ট আছে।

### লালসিংহ—

বা পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়। শ্রীহরিনাথ বোস বি-এল প্রণীত। পুন্ডলিয়া হুইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ১২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

বাহাদিগকে আমরা রেঢ়ো, জঙ্গলী, বুনা, চোয়াড় বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করি তাহার একদিন বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে বহু

স্বাধীন-রাজ্য, ও প্রজার ভোট অনুসারে যত্নসিক রাজ্যশাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মানভূম জেলার অন্তর্গত অঙ্গল-মহলের বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত সন্তেরখানি মৌজার সর্দার লালসিংহের বীরত্বকাহিনী ও দিগ্বিজয়-বৃত্তান্তের সহিত আনুসঙ্গিক ভাষে অঙ্গলমহলের ভূমিজ রাজাদিগের বীরত্ব ও রাজ্য সম্পর্কীয় বহু তথ্য এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই-সমস্ত স্বাধীন রাজ্যকে বশতা স্বীকার করাইতে ইংরেজদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং বিনা যুদ্ধে কোনো রাজ্য ইংরেজকে সূচ্যগ্র মেদিনীর অধিকার ছাড়িয়া দেন নাই। এই ইতিহাসখানি পাঠ করিলে সেই স্বাধীনচেতা বীর জাতির পরিচয় লাভ করা যায়। গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। স্বদেশের বীরত্বকীর্তিঅজ্ঞান ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গের অবজ্ঞাত একাংশের সহিত পরিচয় দ্বারা স্বদেশপ্ৰীতি বাপ্ত ঘনিষ্ঠ ও উৎসুক করিয়া তোলা উচিত।

### জীবনের সুখ—

শ্রী ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক চক্রবর্তী চট্টোপাধ্যায় কোম্পানি, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১২ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য আট আনা।

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়টের Scenes of Clerical Life নামক পুস্তকের অন্তর্গত তিনটি ছোট গল্পের প্রথম গল্পটি The Sad Fortunes of the Rev. Amos Burton এই গ্রন্থে অনুবাদিত হইয়াছে। জর্জ ইলিয়ট মনস্তত্ত্বচিত্রণে ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অগ্রণী ও সর্বপ্রধান; তাহার রচিত এই ছোট গল্পটির মধ্যেও সেই মনস্তত্ত্বের লীলা প্রচুর করুণরসভিষিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পটি অতি মধুর এবং এমন স্বাভাবিক যে পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

গল্পটির অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে। কিন্তু যথাযথ অনুবাদ করিবার চেষ্টা করাতে রচনা ঠিক বাংলাধাতসঙ্গত ও বিচশূণ্য হয় নাই, অনুবাদে আড়ষ্টতার অনেকটা থাকিয়া গিয়াছে। অথচ অনুবাদের ভাষা খুব বাংলা-ঘেঁষা, প্রায় সংস্কৃতগঙ্গশূণ্য, বরং। তথাপি যে অনুবাদ বেশ সরস ও বাংলা হয় নাই, তাহার কারণ অনুবাদক নিজেই নির্দেশ করিতেছেন—

“An elegant translator who brought something to his work besides mere dictionary knowledge যখন বর্তমান উপন্যাসখানির অনুবাদ আরম্ভ করি তখন ডিকশনারি ঐ উক্তি মনে হইয়াছে এবং সর্বদাই ঐ উন্নত আদর্শের কাছে পরাজয় অনুভব করিয়াছি। ভাবকে যখন ভাবান্তরের কলমে (prism) মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হয় তখন তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হয়, তাহার উপর যদি অনুসরণ বা ভাবার্থ প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে মূল হইতে সে অনেকটা দূরে গিয়া পড়ে। এই দূরাবস্থানের দ্বারা একটা স্বাধীন সৌন্দর্য্য বা শিল্পোত্ত্বের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু মূলটি যে চিত্রকরের প্রাণপরিচয় আনয়ন করে আমরা ইহাতে তাহার সেই সমগ্র পরিচয় হইতে বঞ্চিত হই। কলার হিসাবে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আদরের সামগ্রী হইলেও শেবোক্ত কারণে অনুবাদের পরিসরকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলা চলে না। বস্তুতঃ অনুবাদের সপক্ষে ইহা একটি প্রধান যুক্তি স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুবাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকও উপেক্ষণীয় নয়; অনেক স্থলে অনুবাদের পরিবর্তে অনুসরণ ভাবান্তরী-করণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দেয়; দেশের জ্ঞান বুদ্ধির পক্ষে

সহায়তা না করিয়া অজ্ঞানতাই বাড়াইয়া তুলে; এইরূপ অনুসরণ আমোদ বা কোতূহল চরিতার্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহা মূর্খ বর্ণিত সমাজ, রীতিনীতি লোকচরিত্র ও দেশপ্রকৃতির জ্ঞানকে ফুটিয়া উঠিতে দেয় না। অনুসরণ না করিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিবার পক্ষে ইহা আর একটি প্রধান যুক্তি।”

এই যুক্তি আংশিক সত্য। ছবছ নকল করিলে মূলের খুঁটিনাটি, বিদেশের রীতিপ্রকৃতি, কথাবার্তার চং প্রভৃতি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা অনুবাদিত ভাষার সাহিত্য হয় কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় মূলানুগত করিয়াও অনুবাদ নিজের ভাষার ধাতে গড়িয়া তুলিতে পারাতেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। এজন্য স্থানে স্থানে ভাব সম্প্রসারণ ও সংকোচন করিতে হয়, স্থানে স্থানে কথা ছাড়িতে ও কড়িতে হয়, বিদেশী প্রকাশভঙ্গিমা স্থানে স্থানে বদলাইয়া দেশী করিয়া লইতে হয়। ইহাতে যে পরিবর্তন ঘটে তাহা সহ্য করিতেই হইবে; কেবল শব্দানুসরণে অনুবাদ নীরস ও আড়ষ্ট হয় বলিয়া তাহা যথাযথ হইলেও অসহ্য।

কিন্তু অনুবাদক শব্দানুসরণ করিয়াও অনুবাদে যতটুকু সরসতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহাতে নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থপ্রারম্ভে জর্জ ইলিয়টের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও চিত্র-পরম্পরায় গল্পটি বুঝিবার ও উপভোগ করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

### ঘনরামকাহিনী—

শ্রী অ-কথিত ছন্দচিত্র। পত্য ঘটনা অবলম্বনে। প্রকাশক সেন ও লাহিড়ী ২৭৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য চার আনা।

পর্যায়হলে দৃশ্যচিত্র মাতালের চিত্র। কুৎসিত।

### গুরুদক্ষিণা—

শ্রীমহিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। একলব্যের গুরুদক্ষিণা ব্যাপীর অবলম্বনে ছাত্রগণের অভিনয়ো-পযোগী দৃশ্যকাব্য। গিরিশ-ছন্দে রচিত।

### উদ্ধার—

শ্রীতরণিকান্ত দাস প্রণীত। মূল্য তিন আনা। উপন্যাস।

### আর্ষরামায়ণে বাল্মীকি—

শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ প্রণীত ও হেডমাষ্টার, রাখুরা বাল্লব হাইস্কুল, বানিয়াজুড়ি ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০ আনা।

বাল্মীকি রামায়ণের বিষয়, চরিত্র, ঘটনাসংস্থান প্রভৃতির বিচার, বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত বৃক্ষ, পক্ষী, পশু ও মৎস্যের নান্য প্রভৃতির পরিচয় ও বিচার ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি রামায়ণ ও বাল্মীকির প্রতিভা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

### মতীর বাঁধন—

প্রফুল্লকৃষ্ণ ও ভক্তিমতীর পরিণয়ে রচিত কবিতাগুচ্ছ। বঙ্গবাক্য আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, আশীর্বাদ ও আনন্দ বিবিধ কবিতার প্রকাশ পাইয়াছে। প্রফুল্লকৃষ্ণের ও অপূর্বের রচিত কবিতাদুটি কবিত্ব হিসাবে মন্দ নয়।



**মিলন মঙ্গল—**

গৌরচন্দ্র রায় ও সুরচিৎবার শূভপরিণয়ে রচিত কবিতা ও গদ্য রসরচনা।

ইহার প্রায় সকল রচনাই রসমধুর ও স্বপাঠ্য। কেবল কতি পোকাখুকির ভাষায় যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বয়স্ক লোকের উপযুক্ত ভাব দেওয়াতে কবিতাটির রসহানি হইয়াছে। বুড়ো মানুষে যেন ত্রাকামি করিয়া আদ-আদ কথা বলিতেছে। যেমন ভাষা তাহার অনুরূপ ভাব না থাকিলে সে রচনা ব্যর্থ হয়।

**স্নেহলতা—**

শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য চার আনা। ১নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীগুরুদাস কৰ্তৃক প্রকাশিত।

বিবাহপণের বলি স্নেহলতা দেবীর জীবনের পরিচয়।

**কন্যা দায়—**

শ্রীমদেবপ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৩০ তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তকে কন্যা দায়ের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় আলোচিত হইয়াছে। দায়ের কারণ (১) অস্বাভাবিক বিবাহপ্রথা, বিবাহপ্রস্তাব বরণপক্ষ হইতেই হওয়া বিধাতার নিয়ম। (২) পাঠ্য-বহু বিবাহ হওয়াতে পাত্র স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতে পারে না এবং নিজে উপার্জন করিতে পারে না বলিয়া পরের ধনে লোভ করে। (৩) কন্যার বিবাহ নির্দিষ্ট বয়সেই দিতে হয়। এই-সমস্ত কারণের নিরাকরণ করিলে কন্যা আর দায় হইবে না।

**অজ্ঞতা—**

শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ও পুত্র। মূল্য এক টাকা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, ছবি, সৌষ্ঠব শিল্পী গ্রন্থকারের উপযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন।

চিত্রশিল্পী অসিতকুমার অজ্ঞতায় গিয়া অজ্ঞতার শিল্প এবং ভাস্কর্য্য-ও চিত্ররচনাপদ্ধতির পরিচয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেই অভিজ্ঞতা চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া সহজ সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় আর্ট সম্বন্ধে পুস্তক নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এই পুস্তকখানি বিশেষ সমাদর লাভের যোগ্য। বাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অন্তরের পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক অধ্যয়ন করিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

**বিচারস্তু—**

শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চিত্র-সম্বলিত। মূল্য চার আনা।

পর্যায় ছন্দের ছড়ার ছেলের হাতেখড়ি হইতে বিবিধ শিক্ষার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

**অর্থী—**

শ্রীমুনোমোহন চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসরস্বতী সেন। ৬ নং হুঃ ১৬ অং ৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা।

বরিশালের শ্রীঅগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন।

এই পুস্তকে ৪০টি কবিতা ও গান আছে; সকলগুলিই উৎকৃষ্ট-বিশয়ক। লেখক প্রসিদ্ধ গায়ক ও বক্তা। তাঁহার রচনায় উৎকৃষ্টতা ও সূভাব যথেষ্টই আছে। কবিদেরও নিতান্ত অসঙাব নাই। ছন্দ সব স্থলে রক্ষা পায় নাই; তবে এগুলি প্রায়ই গান বলিয়া কবিতার মানন্যে মাপ করা চলে না।

**সাগর-সঙ্গীত—**

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ফুলকাপ অষ্টাংশিত ১০২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকে সাগর সম্বন্ধে ৩২টি সনেট আছে। বইখানি আগা-গোড়া অতি উৎকৃষ্ট পুরু আর্ট কাগজে ছাপা; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাগরের দৃশ্য আভাস ভিন্ন ভিন্ন রঙে ছাপিয়া সেই জমির উপর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৪ লাইন বা ৬ লাইন করিয়া কবিতা ছাপা হইয়াছে। সাগরভাসগুলি কবিতার ভাবের অধিকার করিয়া স্নিকিত ও যথাস্থানে মুদ্রিত; কোথাও জ্যোৎস্নালোকের স্রাবন, কোথাও রৌদ্রোজ্জ্বল ইম্পাতের বর্ণ; কোথায় কুঞ্জবৃষ্টি ঢাকা বৃসরতা, কোথাও সঙ্গার আভাস, কোথাও উষ্ম পূর্ণরাগ কুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও সাগরের অনন্তবিস্তারী নীল আর নীল আর শুধু নীল দেখানো হয় নাই; কোথাও সমুদ্র শান্ত স্বর, কোথাও ঈষৎ ঢঞ্চল, কোথাও ঝটিকা-বিজুক উত্তাল। সাতখানি বিচিত্র বর্ণের সাগরের ছবি আর্ট কার্ডে ছাপা; টাইটেল পেজ ও ভূমিকাও বিচিত্র রঙিন জমির উপর ছাপা; সুচী, মলাটের ভিতর বাহির, মলাট-আচ্ছাদনের কাগজখানা পর্যন্ত সাগরের দৃশ্যে মুদ্রিত। আঠে পৃষ্ঠে ছবি, রং, সৌন্দর্য্য ও বাহার; অকাতরে পরমা স্মরণ করিয়া এবং সুরচিৎ ও সুর সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা নিয়মিত হইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যতদূর উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। বইখানি হাতে পড়িলেই বলিতে হয় বাঃ!

এমন বাহ্যমোষ্ঠবসম্পন্ন বইখানির মূল্য দশ টাকা হইলেও অসম্ভব হইত না; কিন্তু বিক্রয় হইতেছে বোধ হয় দুই টাকায়,—বোধ হয় বলিলাম, কারণ পুস্তকের কোথাও মূল্যের উল্লেখ নাই। এই সূদৃশ্য নয়নরঞ্জন বইখানি কাহাকেও উপহার বা পুরস্কার দিবার যোগ্য—দিয়াও সুখ, পাইয়াও আনন্দ।

কিন্তু একরূপ ভাবে বাহ্য মৌষ্ঠবে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দর্শকের মন-ভুলানো বই বাহির করা আর বসনে ভূষণে আপাদমস্তক মুড়িয়া মেঘে দেখানো সমান; দর্শক ভূষণের চটকেই মুগ্ধ হইয়া থতাইয়া যায়, তাহার মন পূর্ন হইতেই চোখের নেশায় অনুকূল ও পক্ষপাতী হইয়া উঠে, যাহা আসল—সেই অন্তরের দোষগুণ বিচারের নিরপেক্ষতা আর থাকিতে পায় না। এমন করিয়া সমালোচকের চোখে সোনার খুলা দেওয়া উচিত কিনা বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিবার কথা।

চিত্তরঞ্জনের বই নয়নরঞ্জন একশবার। চিত্তরঞ্জন কিনা তাহা বলা সুতরাং বড় শক্ত। প্রথমেই ত দেখিতে পাই তাঁহার বই আরম্ভ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গানের প্রায় অবিকল পংক্তি দিয়া—

‘আজিকে পাতিয়া কান শুনিছি তোমার গান।’

তার পরও অনেক পংক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনা স্মরণ করাইয়া দেয়; তাহারও মধ্যে দুটি স্থান স বিশেষ—

‘জগা সব মনে নাই, শুধু মনে হয়

তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।—’

ইহা রবীন্দ্রনাথের ‘স্বপ্ন’ নামক কবিতাটি স্মরণ করায়।

‘আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলালে।’

রবীন্দ্রনাথের ‘আমার পরাণ লয়ে ক্রীক খেলা খেলাবে’ পংক্তিটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, double বলিলেও চলে। “সন্ধ্যা আসে ওই শান্তিময়ী” রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা কবিতাটি স্মরণ করায়। এমনি করিয়া অনেক পংক্তিই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি বলা যাইতে পারে। অনেক অক্ষীণ লেখক আছে যাহারা রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইয়া বড়াই করে যে ইহা তাহাদেরই স্বোপার্জিত ধন, তাহাদের বই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পরে প্রকাশ হইয়া থাকিলেই বা কি, তাহাদের বই রচিত হইয়াছিল অনেক পূর্বে। চিত্তরঞ্জন বাবু সেরূপ ধরণের লোক নহেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের অকপট অনুসরণী; রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি-আলোচনার ফলে তাঁহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত হইয়াছে হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই। তা হোক, তথাপিও স্বীকার করিতে হইবে চিত্তরঞ্জন বাবু কবি; তাঁহার কবি-হৃদয় বহু পংক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সে প্রকাশে নূতনত্ব ও নিজস্বের ছাপ-মারা।

“সূর্য্যকররাশি

তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,  
উজ্জল উজ্জল জলে কুসুম ফুটায়।”

চমৎকার কবিত্বময় ছবি। একরূপ ছবি অনেক আছে।

সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে,  
সব দুঃখ আজি মোর গীত হয়ে উঠে।

\* \* \*

আমার পরাণে আজি কাঁপিছে কেবল,  
জ্যোৎস্না-তরঙ্গে শত স্মৃতি-পুষ্পদল।

\* \* \*

সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,  
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।

\* \* \*

অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি-শতদল,  
আপনারি সুখ দুঃখে করে টলমল।

\* \* \*

অধরে নয়নে ভাঁসে জীবন-ইঙ্গিত।

প্রভৃতি বহু পংক্তি কবির কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই কাব্যখানি একই সাগরের বিভিন্ন রূপের আয়তি হইলেও, ইহাতে একতারার সুরই বাজিয়াছে, ভাবের ভাষার ছন্দের বৈচিত্র্য ইহাতে নাই; একসঙ্গে সমস্ত বইখানি পড়িতে অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে। দুচার দিন অন্তর অন্তর একটি একটি করিয়া কবিতা পড়িলে তবে তাহার সসম্মোগ করিতে পারা যায়। ইহা সাগর-সঙ্গীত বটে কিন্তু ছবিতেও যেমন সাগরের অনন্ত নীল বিস্তারের ভাব ফুটে নাই, কবিতাতেও তেমনি সাগরের বিরাট গভীর অনন্ত লীলা নাই—সমস্তটা একটানা মিয়ানো সুরে ক্ষীণধারা নদীর মতো ঝর ঝর করিয়া বহিয়া গিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনবাবু সুদক্ষ ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। তিনি যে নীরস আইনচর্চাও মক্কেলের অর্থাৎ পরমার্থ জ্ঞান না করিয়া সাহিত্য-চর্চারও অবসর করিতে পারেন ইহা পরম সুখের ও আনন্দের বিষয়। এবার তিনি একতারা বাজাইয়াছেন; ভবিষ্যতে সপ্ত সুরের বিচিত্র রাগিণী শুনিত্তে পাইব আশা করি।

সন্তানের চরিত্র গঠন—

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল প্রণীত। প্রকাশক ফ্রেডস ইউনিয়ন, ৭ নং কণ্ঠওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬৫২ ২৮

পৃষ্ঠা। এষ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে নীল কালিতে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য আট আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধানো দশ আনা। এই পুস্তকের লভ্যাংশ কোনও সৎকার্যে ব্যয়িত হইবে।

কেমন করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন আদর্শের অনুকূল করিয়া সংগঠন করিতে পারা যায় তাহারই উপদেশ ক্রমো, স্পেনসার, ফোবেল, লক প্রভৃতি গাণ্ডাত্য শিক্ষানীতিবিদ পণ্ডিতদিগের সু-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ হইতে সংকলন করিয়া সন্তানের পিতা মাতা ও অভিভাবকদিগের জন্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সূচী এই:—সূচনা, আত্মসংগঠন, বাধাতা, প্রভূত্বের অপব্যবহার, আকস্মিক ঘটনা, অজ্ঞানতা ও অসতর্কতাঙ্কিত অপরাধ, লঘুশাস্তি, তিরস্কার, আদর ও প্রশ্রয়, কায়িকদণ্ডের আবশ্যিকতা, কায়িক দণ্ডের অপকারিতা, সাধারণ ব্যবহার, স্পেন্সারের উদ্ভাবিত দণ্ড—প্রকৃতির শাসন, প্রকৃতির শাসনের বিশেষত্ব, স্পেন্সারের মতের সমালোচনা, স্বাধীন ইচ্ছা, অভ্যাস, ভাঙ্গিবার অভ্যাস, নির্দয়তা, অভিযোগ, কান্না, মিথ্যাকথা, বিলাসিতা, প্রশংসা, পুরস্কার, প্রতিযোগিতা, গুণ প্রদর্শন, বঞ্চনা, ভয়, অনুসন্ধিৎসা, কর্ম-প্রবৃত্তি, আত্মনির্ভরতা, ত্যাগাভ্যাস, শিষ্টাচার, মাতার প্রতি সম্মান, ভালবাসা, সঙ্গ, গল্প, বিন্দু ধারণ, ধর্ম শিক্ষা, দেশ-প্রেম, উপসংহার।

যাহারা সন্তানের হিতচিন্তা করেন তাহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে একত্র অনেক পণ্ডিতের চিন্তালব্ধ ফল সমাহত দেখিতে পাইবেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবুক ব্যক্তির অভিমত অনুসন্ধান করিয়া পাঠ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং এই পুস্তকখানি যে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইয়াছে তাহা সন্দেহ নাই। এই পুস্তক সকলেরই পাঠ করিয়া সন্তানের প্রতি নিজ নিষ্ঠ কর্তব্য অবধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

মুদ্রারক্ষক।

## শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান

### বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত

( দ্বিতীয় প্রস্তাব )

বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে আমরা “শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধে কলিকাতা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান বিখ্যাত স্থানসমূহের বহুশাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকবর্গের সম্মতি-ও স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ব্যবস্থাপত্র ছিল। ঐ ব্যবস্থাপত্রের “সিদ্ধান্ত” নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

“সাত্বিকী পূজা কেবল জপ, হোম এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা বিধেয়।

রাজস্বী এবং তামসী পূজায় পশুবলির বিধি থাকিলেও অনেক শাস্ত্রকার উহার নিন্দা ও নিবেদন করিয়াছেন, অতএব উহা কর্তব্য নহে।”

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যভারতের অনেক মহানুভব ব্যক্তির নানা-প্রকার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে ঐ-সকল পত্র উদ্ধৃত হইল না। তন্মধ্যে ১৮৩২ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত ও তুলোটকাগজে দেবান্দরে মুদ্রিত হয়। তাহার পর, বিখ্যাত অধ্যাপক মহোদয়গণের স্বাক্ষরিত হইলে নানাস্থান হইতে অনেকে উহা চাহিয়া পাঠান। গত তিন বৎসরের মধ্যে দুইশত খণ্ডের অধিকাংশ বিতরিত হইয়াছে, সামান্য কয়েক খণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ছিল—ছাগাদি বলি ব্যতীত শক্তিপূজা হয় না। এই ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর, সে কুসংস্কার তিরোহিত হওয়ায় অনেক স্থান হইতে ছাগবলি উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব-কালের লোকেরা যেমন নির্বিচারে চিরাচরিত সংস্কার পালন করিয়া আসিতেন, এখন আর সে দিন নাই, এখন জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচার-শক্তি তীক্ষ্ণ হইতেছে সুতরাং যাহারা অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাহারাও দেবীর আরাধনা-স্থলে অতি অসহায় রৌরুদ্যমান ছাগশিশুর গলদেশে খড়্গাঘাত করিবার পূর্বে পরম্পরবিরোধী শাস্ত্রাদেশসমূহের কোন পক্ষ সমীচীন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। তবে দেবীর অর্চনায় ছাগাদি বলির ব্যবস্থাদাতা এবং ঐরূপ কার্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণেরও যে একান্ত অভাব হইয়াছে, তাহা নহে।

বিগত ১লা আশ্বিন তারিখে প্রবাসী পত্রে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর, কয়েক দিন পরেই “শান্তী” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসিদ্ধ বাগ্মী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় “জগদম্বার প্রধান-আহার” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি “রুধিরই যে জগদম্বার প্রধান আহার” তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি শান্তী পত্রিকা পাই না, সুতরাং উহাতে কি প্রকাশিত হইয়াছে জানিতাম না। বিগত কার্তিক মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি

আমাকে বলেন, “শান্তী পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।” তাহার পর, আমি ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিবার জন্য শান্তী পত্রিকার অনু-সন্ধান প্রবৃত্ত হই কিন্তু কোন স্থানেই উহা পাওয়া গেল না। একজন সাহিত্যসেবীর মুখে শ্রুত হইলাম ‘রিপন-কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি আধিকারী এম্, এ, মহাশয় উহার একজন লেখক।’ তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম, তিনিও দিতে পারিলেন না। অবশেষে মাঘ মাসের অর্ধাংশ গত হইলে আমার পুরাতন বন্ধু এবং কাশীমবাজারের অনারেলব্ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের স্টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শান্তী-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের কুটুম্ব, কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত পত্রিকাখানি সংগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি শান্তী পত্রিকায় প্রকাশিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম; যদিও ঐ প্রবন্ধে আমাদের প্রবন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহাতে যে-সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা আমাদের প্রবন্ধোক্ত মূল বিষয়েরই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ আমাদের প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। এত বিলম্বে প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হওয়ার কারণও পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“জগন্মাতার ভোগের উপহার বিষয়ে শ্রুতির পর্যালোচনা দ্বারা আমরা যতদূর বিদিত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে রুধিরই যে উৎকৃষ্টতম এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ্য, ইহা বিদ্যমান করিতে হইতেছে। অস্তিত্ব নৈবেদ্যাদি যে-সকল ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করা হয়, তাহা তাহার আপেক্ষিক নিকৃষ্ট এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ভোজনীয় পদার্থ, ইহা বুঝিতে পারা যায়।” (আশ্বিন—শান্তী ৩৭৯ পৃঃ)

অন্য এক স্থলে তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“অতএব জগন্মাতা কথার মধ্যেও জগৎপিতা অস্তিনিহিত থাকেন; আবার জগৎপিতা কথার মধ্যেও জগন্মাতা অস্তিনিহিত থাকেন, অতএব একটিকে আর একটির উপলক্ষণ বলা যায়। কাজেই এখন বুঝিতে হইল, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বা নারায়ণ নারায়ণী উভয়েরই মূখ্যতম ভোগের দ্রব্য শোণিতরাশি, আর অস্তিত্ব দ্রব্যমাত্রই উভয়ের নিকৃষ্ট ভোগ্য

জব্য, ইহাই শ্রুতিক্রমের সম্রাট বা সর্বশ্রুতির খনিরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে অবগত—‘ইন্দ্রোহবৈ’ নাম এষ যোহয়ং দক্ষিণে-  
হক্ষন্ পুরুষতঃ বা এতমিহং সন্তমিত্ত ইতচ্চক্ষতে পরোক্ষণৈব পরোক্ষ-  
শ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিঃ। অথৈতদ্বামে অক্ষিণি পুরুষরূপমেবশ্চ  
পত্নী বিরাট তয়োরেব সংস্তাবো য এষোহস্তর্দয়ে আকাশোহথৈনয়োরেত-  
দম্নঃ য এষোহস্তর্দয়ে লোহিতপিণ্ডঃ, অথৈনয়োরেতং প্রাবরণং যদেতৎ  
অস্তর্দয়ে জালকমিব” ইত্যাদি।

পাঠক! শ্রুতির সুদারূপ সিদ্ধান্ত তো শুনিতো পাইলে, লোহিত  
(শোণিত) নারায়ণীর অন্ন এ কথা শ্রুতিমুখে বিদিত হইলে, এখন কি  
করিবে? প্রসন্নচিত্তে ছাগাদি বলিদান করিয়া নারায়ণ নারায়ণীকে  
কবে ক্রুধির দান করিতে পারিবে কি? ক্রুধির উপহারের অপবিত্রতা  
ভ্রম অপনোদিত হইবে কি? হৃদয়ের দৌর্বল্য বশতঃ পশুহিংসায়  
পপেব অশঙ্কা দূর করিতে পারিবে কি? তাহা তোমাকে অবশ্য করিতে  
হইবে; যদি না কর তবে তুমি বেদ বিশ্বাস করিতে পারিলে না, বেদে  
বিখ্যাতীকে আশ্রিতক বলে, “আশ্রিত্যং বেদবিখ্যাতঃ;” আর তাহা না  
হইলে নাস্তিক বলে। বেদে অবিখ্যাতী হইলে তুমি চার্কাক বৌদ্ধাদির  
শ্রায় নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইবে, অহিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইবে।  
এরূপ তিরস্কার কখনই কোন হিন্দুসম্প্রদানের পক্ষে সহনীয় নহে।

কোন কোন পুরাণে “সাত্বিকী জপযজ্ঞায়ে নৈবেদ্যে নিরামিষঃ”  
ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মাংস-শোণিত-বর্জিত উপহারকে সাত্বিক বলিয়া  
নির্দেশ করা হইয়াছে এবং “রাজসী মাংস শোণিতঃ” ইত্যাদি উক্তির  
দ্বারা মাংস শোণিত রাজস পূজার উপহার বলা হইয়াছে, ইহা সত্য;  
কিন্তু ঐ উক্তি সম্ভবতঃ জ্ঞানী উপাসকের নিমিত্ত নহে, উহা সাধারণ  
লোকের সহজজ্ঞানের অনুবাদমাত্র।” আশ্বিন--শাখতী ৮০পৃ, ৮১ পৃ:

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রধান প্রধান অংশ  
উদ্ধৃত হইল। এখন ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা বলিব্য  
আছে, তাহা বিবৃত করিতেছি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের  
উক্তি পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম, তিনি  
পুরাণের প্রমাণ মানেন না; কারণ পুরাণে যাহা সাত্বিক  
উপহার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মতে তাহা  
সাত্বিক উপহার নহে। একমাত্র ক্রুধিরই তাহার মতে  
সাত্বিক উপহার। এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত  
করিয়াছেন। আমরাও বলি “তথাস্তু”, শ্রুতির দ্বারাই তিনি  
প্রমাণ করুন, ‘ক্রুধিরই একমাত্র সাত্বিক উপহার এবং  
তাহা না প্রদান করিয়া সৃষ্টিকীর্জী সম্পন্ন হয় না।’  
এই বার আমরা তাহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্রুতির প্রমাণটি  
পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উহা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের  
মতের অনুকূল কি না? কিন্তু অতীব হ্রঃখের সহিত  
বলিতে হইতেছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাহার উদ্ধৃত  
শ্রুতি হইতে “শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদানের অবশ্য  
কর্তব্যতা” বিষয়ে কোনই সাহায্য পাইতে পারেন না।

এমন কি শ্রুতির অর্থ দ্বারা সাত্বিকী পূজায় সৃষ্টিক্রুধির  
কিংবা অশ্রু কোন প্রাণীর ক্রুধির দেবীকে প্রদান করিতে  
হইবে, এরূপ কোন আভাসও পাওয়া যায় না। ঐ শ্রুতির  
প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যদি ঐ শ্রুতিটি  
উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিম্নে উহার ভাষ্য এবং টীকা  
সম্মিবেশিত করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃতজ পাঠকগণ  
অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়  
কি? কিন্তু বুদ্ধিমান তর্কচূড়ামণি মহাশয় এখানে বিলক্ষণ  
চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়া  
উহার কোনরূপ ব্যাখ্যা না করিয়াই একেবারে বলিয়া  
বসিয়াছেন,—

“পাঠক! শ্রুতির নিদারূপ সিদ্ধান্ত তো শুনিলে।”

কি আশ্চর্য্য! পাঠকগণ যেন সকলেই উপনিষদ্বিদ্যার  
পারগামী, পাঠমাত্র ঐ শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে  
পারিয়াছেন! একে বৈদিক সংস্কৃতভাষা লৌকিক সংস্কৃত  
ভাষা অপেক্ষা দুর্ভ্রহতর, তাহাতে যে প্রসঙ্গে ঐ শ্রুতিটি  
কীর্জিত হইয়াছে, সে অতি দুর্ব্বগাহ তত্ত্ব, মূলশ্রুতি  
পাঠমাত্র অর্থবোধ দূরের কথা, গুরুর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া  
এবং ভাষ্য টীকার সাহায্য লইয়াও বহু বিলম্বে উহার  
মর্ম্ম হৃদয় হইয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক “লোহিত-  
পিণ্ডঃ” পদ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন “উহা ছাগ বা  
তাদৃশ কোন পশুর শোণিত,” কিন্তু আমরা উপনিষদ্বিদ্যার  
ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রাচীন গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য  
এবং আনন্দগিরির টীকা ও আধুনিক বেদ-বেদান্তবিৎ  
বিখ্যাত অধ্যাপকগণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া বলিতেছি  
“তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্রুতিতে যে “লোহিত-  
পিণ্ডঃ” পদ আছে, উহার অর্থ ছাগাদির ক্রুধির নহে। ইহা  
নিশ্চয়। যে প্রসঙ্গে ঐ শ্রুতি পরিকীর্জিত হইয়াছে, তাহার  
ইতিহাস সহ ঐ শ্রুতি, তাহার শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির  
টীকা ও তদনুযায়ী বাঙ্গাল্য ব্যাখ্যা এখানে সম্মিবেশিত  
করিলাম। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের  
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে তর্কচূড়া-  
মণি মহাশয়ের উল্লিখিত শ্রুতিটি আছে। পাঠকগণের  
সুবিধার জন্য আমরা ঐ ব্রাহ্মণটি সম্পূর্ণ ও উহার ব্যাখ্যা  
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

( অথ চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ )

• জনকঃ কুর্চান্নপাশ্বসর্পনু বাচ নমুন্তে হস্তি যাজ্ঞবল্ক্যামু  
মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈসম্বর্ণ মহাস্তম্ভানমেঘানু রথং বা নাং  
বা সমাদদৌতৈব মে বৈতাভিরূপনিষন্তিঃ সমাহিতান্নাহংস্তেব বৃন্দারক  
আচ্যাঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎকে ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যামিতি  
নাহঃ তত্ত্বগবন্ বেদ যত্র গমিগামীত্যথ বৈতেহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমি-  
ষ্যামিতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥১॥

বিদেহরাজ জনক ( যখন দেখিলেন তাঁহার পরিজ্ঞাত নিখিল ব্রহ্মই  
যাজ্ঞবল্ক্যের অপরিজ্ঞাত নহে, তখন তিনি ) কুর্চ ( একপ্রকার আসন )  
হইতে উঠিলেন এবং ( ঋষির ) চরণে পুত্ৰিত হইয়া বলিলেন ; — “হে  
যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে উপদেশ  
করুন ।” • তিনি ( যাজ্ঞবল্ক্য ) বলিলেন, “হে সম্রাট্ যে প্রকার সংসারী  
লোক-সকল হৃদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলে রথ বা নৌকা সংগ্রহ  
করে, সেইরূপ আপনিও এই-সকল উপনিষদ্ দ্বারা সমাহিতান্না হইয়াছেন,  
আর আপনি ( সাধারণের ) পূজা ও প্রভু হইয়াছেন । আপনি বেদ-  
সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ( আচার্যগণ ) আপনাকে উপনিষৎ-সক-  
লের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । আপনি দেহত্যাগের পর কোথায়  
গমন করিবেন ?” ( জনক উত্তর করিলেন ) “হে ভগবন্ ! কোথায় গমন  
করিব, তাহা আমি জানি না ।” ( যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ) “যেখানে গমন  
করিলে আপনি কৃতার্থ হইবেন, আমিই আপনাকে সেই স্থান বলিব ।”  
( জনক বলিলেন ) “যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন বলুন ।”  
( যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ) “শ্রবণ কর ॥” ১ ॥

ইকো হবৈ নামৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তঃ বা এতমিচ্ছঃ সন্তমিল  
ইত্যচক্ষতে পচে ক্লেবে পরোকপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিঃ ॥২॥

যিনি পূর্বে ( আদিত্যাস্তর্গত-পুরুষ উক্ত হইয়াছেন ) যাহাকে এখন  
সত্যনামক চক্ষুরূপে বলিয়া নির্দেশ করা হইল । জাগরাবস্থায় যিনি  
দক্ষিণ চক্ষুতে ইক্ষ নামে অবস্থিতি করিতেছেন, দীপ্তিগুণত বশতঃ যাহার  
ইক্ষ এই প্রত্যক্ষ নাম হইয়াছে, তাহাকেই পরোক্ষে ইক্ষ বলা হয় ;  
কারণ দেবগণ পরোকপ্রিয় ব্যক্তিগণের স্থায় প্রত্যক্ষদেবী ॥২॥

অথৈতদ্বামেহক্ষণি পুরুষরূপমেঘান্ত পত্নী বিরাট্ তন্নোরেষ  
সংস্তাবো য এবেহস্তহৃদয় আকাশোহথৈনয়োরেতদন্নঃ য এবেহস্তহৃদয়ে  
লোহিতপিণ্ডোহথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদস্তহৃদয়ে জালকর্মিবাতৈন-  
য়োরেবা স্মৃতিঃ সঃচরণী যৈবা হৃদয়াদুর্ধ্বা নাভ্যচ্ছরতি যথা কেশঃ  
সহস্রধা ভিন্নঃ এবস্টৈস্ততা হিতা নাম নাভ্যোহস্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্য-  
তাভির্বা এতদাশ্রবাশ্রবতি তন্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্য-  
স্মাচ্ছারীরাদাশ্রবঃ ॥৩॥

( ভাষ্য ) অথৈতদ্বামেহক্ষণি পুরুষরূপমেঘান্ত পত্নী যং হং বৈশ্বানর-  
মান্নানং সম্পন্নোহসি তস্তাশ্চেন্দ্রশ্চভেদে ভৌগ্যেণা পত্নী বিরাড়্রং  
ভোগাতাদেব । তদেতদন্নং চান্তা চৈব মিথুনং স্বপ্নে । কথং । তন্নোরেষ  
ইল্লাণা ইল্লন্ত চৈব সংস্তাবঃ সংভূয় যত্র সংস্তবং কুর্কীতে অশ্লোন্তং স এব  
সংস্তাবঃ । কোহসৌ । য এবেহস্তহৃদয় আকাশো হস্তহৃদয়ে হৃদয়স্ত  
মাংসপিণ্ডস্ত মধো । অথৈনয়োরেতদন্নমাগমন্নং ভোজ্যং স্থিতিহেতুঃ ।  
কিং তৎ । য এবেহস্তহৃদয়ে লোহিতপিণ্ডো লোহিত এব পিণ্ডাকারাপন্নো  
লোহিতপিণ্ডঃ । অন্নং জঙ্ঘং যেষা পরিণমতে যৎ স্থূলং তদধোগচ্ছতি  
যদস্তৎ তৎপুনরয়িনা পচ্যমানং যেষা পরিণমতে । যোমধ্যমো রুসঃ স  
লোহিতাদি ক্রমেণ পাকভৌতিকং পিণ্ডঃ শরীরমুপচিনোতি । যোহপিঠো  
রুসঃ স এব লোহিতপিণ্ড ইল্লন্ত লিঙ্গায়নো হৃদয়ে মিথুনীভূতস্ত । যৎ  
তৈজসমাচক্ষতে সত্তরোরিল্প্রোগ্যা হৃদয়ে মিথুনীভূতয়ো স্মান্নাস  
নাড়ীভূতঃ স্থিতি হেতু ভবতি । তদেতদ্ব্যচ্যতে হথৈনয়ো রেতদন্ন

মিতাদি । কিং চান্তা । অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্ । ভুক্তবতোঃ স্বপ্ন-  
তোশ্চ প্রাবরণং ভবতি লোকে তৎসামাচ্চ হি কথয়তি স্মৃতিঃ । কিং  
তদিহ প্রাবরণম্ যদেতদস্ত হৃদয়ে জালকর্মিবাতৈনক-  
বহুলতা জ্বালকর্মিব ।

টীকা । এবস্তৈব বৈশ্বানরশ্চোপাসনাগঃ প্রঃস্মিকাক্ষণেশ্চ বা  
চেতি মিথুনং কথয়তি অথৈতাদিন । স্যামিগামানাবিকার-  
ইথ শব্দঃ । যদেতমিথুনং জাগরিতে বিশ্বশক্তি হৃদয়েইকং স্বপ্নে  
তৈজসশব্দবাচামিত্যাহ—তদেতদিতি । অচ্ছকিতং তৈজস-  
পৃচ্ছতি—কথমিত্যাদি । কিং তস্য স্থানং পৃচ্ছতে হং বা প্রাবরণং  
বা মাগোবেতি বিকরাদানং প্রত্যাহ তয়োদিতি । সংস্তবং সংগতিমিতি  
যাবৎ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ অথৈতি । স্নানাহিরেকেন স্তিতেরসস্তবং  
তস্য বক্তব্যাদিত্যথ শব্দার্থঃ । লোহিতপিণ্ডঃ স্মান্নবসং বাধাতুঃ  
ভক্ষিতস্য অন্নস্য তাবদ্বিশাগমাহ অন্নমিতি । যদন্যং পুনর্নতি যোক্তনীয়ম্ ।  
তদেতাব্যক্তং যো মধ্যম ইত্যাদি গৃহ্যে যোজ্যঃ । উপাখ্যাপহিতয়ো  
রেকম মশ্রিত্যহ—যং তৈজসমিতি । স্যামিগামানুপাদয়তি সত্তয়ো-  
রিতি । ব্যাখ্যাতেহর্থো বাক্যস্যামিগামানুসংহৃত্য হৃদেতদিতি । যদি  
প্রাবরণং পৃচ্ছতে তত্রাহ কিংচানাদিতি । ভোগস্বাপানুগামথ  
শব্দার্থঃ । প্রাবরণপ্রদর্শনস্য প্রয়োজনমাহ ভুক্তবতোরিতি । ইহেতি  
ভোক্তৃভোগ্যোরিল্প্রোগ্যোরিত্যিঃ । সদয়জালকয়োরাধারাদেয়জ মবি-  
বক্ষিতং তসৈব তস্তাবাৎ ।

ভাষ্যম্ । অথৈনয়োরেতৎ স্মৃতিমর্গঃ সঃচরণী যৈবা হৃদয়াদুর্ধ্ব  
দেহাঙ্গাগরিত দেহাগমনমর্গঃ । কা সা স্মৃতিঃ । যৈবা হৃদয়াদুর্ধ্ব  
দেশাদুর্ধ্বাভিমুখী নাভ্যচ্ছরতি নাড়ী । তন্মাতঃ পরিমাণমদমুচ্যতে ।  
যথা লোকে কেশঃ সহস্রধা ভিন্নোহস্তহৃদয়ো ভবতোবঃ স্থল্লা অস্ত  
দেহস্য সংবন্ধিগো হিতা নাম হিতা ইত্যেবং থাতা নাভ্যস্তাশ্চাস্তর্গদেষ  
মাংসপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিতা ভবতি হৃদয়াদিপ্রকটাত্যঃ সন্নদ্র কদথকেশ-  
বদেতাভির্বাভির্বাশ্রবতাশ্রবন্ত্যস্তিরেতদন্নমাংসবদাচ্ছদপ্রবতি গচ্ছতি ।  
তদেহদেবতা শরীরমনেনাশ্রবন দামভূতেনোপচীয়মানং তিষ্ঠতি । তন্মাদ  
যন্মাতঃ স্থলেনারেনোপচিতং পিণ্ডইদং তু দেবতাশরীরং লিঙ্গং স্মান্নমাং  
নোপচিতং তিষ্ঠতি । পিণ্ডেপচয়করস্যাপি প্রবিবিক্তমেব মূবপূরীষাদি  
স্থূলমপেক্ষ্য লিঙ্গস্থিতিকুরং হৃদয়ং ততোপি স্থূলতরম্ । অতঃ  
প্রবিবিক্তাহারঃ পিণ্ডঃ । তন্মাতঃ প্রবিবিক্তাহারাদপি প্রবিবিক্তাহারতর  
এষ লিঙ্গায়ৈবৈবভবতাস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরমেব শরীরঃ তন্মাত্ছরীরাৎ  
আহ্ননোইবানরাইতৈজসঃ স্মান্নোপচিতো ভবতি ॥৩॥

টীকা । মাংসেৎ পৃচ্ছতে তত্রাহ অথৈতি । নাড়ীভিঃ শরীরং  
ব্যাগস্যাপ্নস্য প্রয়োজনমাহ—তদেতদিতি । তন্মাদিত্যাদি বাক্যাদায়  
ব্যচষ্টে—যন্মাদিতি । তথাপি প্রবিবিক্তাহার ইত্যেব বক্তব্যে প্রবি-  
বিক্তাহারতর ইতি কন্মদদ্ব্যচ্যতে তত্রাহ পিণ্ডেতি । যন্মাদিত্যাপক্ষিতঃ  
কথয়তি—অত ইতি । শরীরাদিতি স্মৃতে কপং শরীরাদিত্যচ্যতে  
তত্রাহ শরীরমেবতি । উক্তমর্থং সঙ্কিপ্যোপসংহরতি—আশ্রব ইতি ॥৩॥

এই বাম অঙ্কিতে যে পুরুষাকার দৃষ্ট হয়, ইনি সেই বৈশ্বানরের  
পত্নী । তুমি যে বৈশ্বানর আশ্রমে সম্প্রাপ্ত হইয়াছ, ইনি তাঁহার পত্নী ।  
বৈশ্বানর পুরুষ ভোক্তা, ইনি তাহার ভোগ্য অন্ন । জাগ্রদবস্থায় এই  
ভোক্তৃ ভোগ্য রূপ মিথুন স্বপ্নাবস্থায় একীভাবে তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত  
হয়েন । ঐ ইল্ল ও ইল্লাণী যে স্থানে পরস্পর স্নেহ করেন, তাহাকেই  
তদ্বস্তয়ের সংস্তাব বলা হয় । এই হৃদয়াখ্য মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ  
আকাশই সংস্তাব । এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পিণ্ডাকার শোণিতখণ্ড  
ইহা উঁহাদের অন্ন । এই অন্ন স্থূল ও স্থূলভেদে দ্বিবিধ । ভুক্ত অন্নের  
মূলভাগ স্থূল এবং রসভাগ স্থূলঃ ঐ রসভাগই শোণিত এবং উহাই  
উঁহাদের স্থিতিকারণ অন্ন । এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জালবৎ নাড়ী-সকলই

উঁহাদের গাত্রাবরণ। হৃদয় হইতে উর্দ্ধমুখে উখিত নাড়ী-সকলই উঁহাদের স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরণাবস্থায় সঞ্চারণের পথ। ঐ-সকল নাড়ীর নাম হিতা এবং উঁহারা শতধা বিভক্ত কেশের স্থায় সূক্ষ্ম। উঁহারা হৃদয়-মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। কদম্বকেশরের স্থায় সূক্ষ্ম ঐ-সকল নাড়ী দ্বারা ভুক্তানের রসভাগ সর্বশরীরে গমনাগমন করে। শরীর আত্মা বৈশ্বানর পূর্বোক্ত শোণিত রূপ অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকেন। তৈজস আত্মা বৈশ্বানর হইতে সূক্ষ্মতর; অতএব তিনি যে অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়েন, তাহা ঐ শোণিত রূপ সূক্ষ্ম অন্ন হইতেও সূক্ষ্মতর ॥৩॥

তন্ত্র প্রাচী দিক্ প্রাণঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্‌দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যক্ষঃ প্রাণা উত্তীচী দিগ্‌দক্ষঃ প্রাণা উর্ধ্বা দিগ্‌দক্ষাঃ প্রাণা অবাচী দিগ্‌দক্ষাঃ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বা প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাশ্চাৎগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে হনীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতে হসিতো ন ব্যথতে নরিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঃ সীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোহভয়ং ভা গচ্ছতাদযাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তে হস্তিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥৪॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

“এই হৃদয়ভূত তৈজস আত্মা প্রাণ দ্বারা বিধৃত হইলে বলিয়া স্বয়ংও প্রাণস্বরূপই প্রাপ্ত হইয়েন। এই প্রাণাত্মার পূর্বদিক্ পূর্ববর্তী প্রাণ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণপ্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণ, উর্দ্ধদিক্ উর্দ্ধপ্রাণ, অধোদিক্ অধঃপ্রাণ এবং সকল দিক্ সকল প্রাণ। এইরূপ প্রাণাত্মার বা প্রাজ্ঞের উপাসক সর্বাঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়েন। বিশ্বান্ বাক্তি এইরূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে যাহাকে প্রাপ্ত হইয়েন, তিনিই নেতি নেতি শব্দ দ্বারা নিবেদনমুখে নিবেদ্য তুরীয় আত্মা, এই আত্মা অগ্‌হ, অতএব ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অনীর্ঘা, অতএব শীর্ঘ হইয়েন না। ইনি অসঙ্গ; অতএব কোথাও সঙ্গ পান না। ইনি অবক্ষ, অতএব বাধিত হন না। ইনি হিংসিত হন না। হে রাজন্ জনক! তুমি জন্ম মরণাদি ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছ।” রাজা বলিলেন “যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি যখন আমার অভয় আত্মা জ্ঞাপন করিলেন, তখন ঐ অভয় আপনারও উপস্থিত হইল। আমি ভবদুস্ত নিষ্ঠার নিষ্করার্থ আর কি প্রদান করিব? আপনাকে নমস্কার করি। এই বিদেহ রাজা আপনার এবং আমিও আপনার আজ্ঞামুবর্তী ॥৪॥”

( চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ )

উর্দ্ধিত শ্রুতির দ্বারা বুঝা গেল জীবমাত্রেরই ভুক্তান্ন পরিপাকজাত শরীরস্থ শোণিত দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বৈশ্বানর আত্মা কি? এ বিষয়ে বেদান্তসার-প্রণেতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র লিখিয়াছেন;—

“ভূরাদি চতুর্দশভূবনান্তর্গত চতুর্বিধ স্থূলশরীরসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্তের নাম বৈশ্বানর বা বিরাট। যে-হেতু তিনি সর্ব নরাভিমানী অর্থাৎ সকল প্রাণীতেই তাঁহার ‘অহংজ্ঞান’ আছে সেই-হেতু তিনি বৈশ্বানর এবং তিনি বিরাট; কেননা বিবিধভাবে প্রকাশমান। চতুর্দশ ভূবনান্তর্গত যাবতীয় চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ,

উদ্ভিজ্জ) স্থূল শরীরসমষ্টিই সেই বৈশ্বানর আত্মার স্থূল শরীর (১)।

অতএব যদি কোমি একটি প্রাণিহত্যা করা হয়, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মার (তৃপ্তি দূরে থাকুক) পুষ্টির ব্যাঘাত করা হয়। যেমন আমাদের স্থূল শরীরের কেমন অংশের ধ্বংসসাধন করিলে আত্মার ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর আত্মার চতুর্দশ ভূবনস্থিত জীবময় স্থূল শরীরের অন্তর্গত কোন একটি প্রাণীর বিনাশ করিলে সেই বৈশ্বানর আত্মার সেই পরিমাণে পুষ্টির ব্যাঘাত করা হয়। কেননা সেই প্রাণী জীবিত থাকিলে তাহার ভুক্তান্ন-পরিপাকজাত শোণিত হইতে তাঁহার আরও অনেক দিন পুষ্টি হইতে পারিত। শ্রুতি বলিতেছেন, জীবশরীরের শোণিত হইতে বৈশ্বানর আত্মার পোষণ হয়, অতএব জীবশরীরের শোণিতপাতজনক ছেদনব্যাপার শ্রুতিবিরুদ্ধ কার্য্য। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, পশুবধ করিয়া তাহার শোণিত বৈশ্বানর আত্মার নামে উৎসর্গ করা শ্রুতির অভিপ্রেত; কেননা শ্রুতিতে পশুবধ করিয়া শোণিত উৎসর্গ করিলে বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হইবে, এ কথা নাই। যদি ঐরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে দুই একটি পশুবধ করিলে চলিবে না, চতুর্দশ ভূবনান্তর্গত যাবতীয় জীব ও নিজেকে পর্য্যন্ত বলি দিতে হইবে, কারণ চতুর্দশভূবনান্তর্গত নিখিল জীবসমষ্টিই বৈশ্বানর আত্মার স্থূল শরীর। বলির যে দুই চারিটি পশু, তাহার শোণিত হইতেই বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়, ইহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে শ্রুতি প্রাণিমাত্রের শরীরের শোণিত হইতে বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়, এ কথা বলিতে নাই। এতদ্ব্যতীত ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, বিশুদ্ধ পুষ্ট দেহেই আত্মার উন্নততর বিকাশ লক্ষিত হয়। অতএব প্রাণিগণের দেহ বিশুদ্ধ এবং পুষ্ট রাখিলেই বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করা হয়। এই জন্যই “মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি”—কোন প্রাণীকেই হিংসা করিও না, ইত্যাদি শ্রুত্যস্তর দৃষ্ট হয়।

(১) এতৎ সমষ্টাপহিতং চৈতন্তং বৈশ্বানরো বিরাট ইতি চোচ্যতে সর্বনরাভিমানিহাং বিধিৎ রাজমানহাচ্। অসৌবা সমষ্টিঃ স্থূলশরীরম্।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রুতির মেরুপ ব্যাখ্যা করিতে চান, অর্থাৎ যে শুধু দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিমূর্তির নিকটেই পশুবলি দিতে হইবে এবং ছাগাদি পশুই বলির একমাত্র উপকরণ, এইরূপ নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈশ্বানর আত্মার সহিত সর্ব দেব দেবীর অভিন্নতা স্বীকার করিয়া ঐরূপ নিয়ম স্থির করিতে গেলে সকল দেব দেবীর পূজাতেই ছাগাদি বলির অতি-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু আর্বহমানকাল হইতে প্রচলিত কালীর বিদ্যেধর অন্নপূর্ণার পূজায়, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের পূজায়, রন্দাবনে গোবিন্দজীর পূজায়, দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্তির পূজায় এবং আরও ভারতবর্ষময় অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় ছাগাদি বলি হয় না। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, ভারতীয় মনীষিগণ উল্লিখিত শ্রুতির পশুবলি দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করিতে হইবে এরূপ অর্থ করেন নাই! আর এক কথা এই যে, চতুর্দশ ভুবনাস্তর্গত চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) যাবতীয় প্রাণীর সমষ্টিময় (বৈশ্বানর আত্মার) স্থূল শরীরাস্তর্গত একটি ছাগের বিনাশের দ্বারা তাহার প্রীতি হয়, এরূপ যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ শরীরাস্তর্গত একখানি ইক্ষুদণ্ড (উদ্ভিজ্জ) দ্বারাই বা কেন তৃপ্তি হইবে না? আর জগতে এত প্রাণী থাকিতে ছাগই বা বলির উপকরণ হয় কেন? বস্তুতঃ জীব বিনাশ করিয়া তাহার কৃধিরাদি দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতি সাধন করিতে হইবে, এরূপ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, যে প্রাণী যেখানেই থাকুক, তাহার জঙ্ঘ অঙ্গের পরিপাকক্রান্ত মধ্যম রস পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপচয় সাধন করে এবং ঐ অণিষ্ঠ রস তাহাই লোহিতপিণ্ড-পদবাচ্য এবং উহাই ইন্দ্রইন্দ্রাণী অথবা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করে। পূর্কোক্ত শঙ্কর-ভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ অণিষ্ঠরস সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানর আত্মার স্থিতি-হেতু হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাণিবধ করিয়া ঐ অণিষ্ঠ রসকে সূক্ষ্ম নাড়ীতে অল্পপ্রবিষ্ট হইতে না দিলে শ্রুতিবিরুদ্ধ কার্য করা হয়।

এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অনেক হইতে পারে কিন্তু সরল-

ভাবে শ্রুতির অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায় উল্লিখিত শ্রুতি হইতে পশুবলির বিধি কোন প্রকারেই উপলব্ধ হয় না। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বর, আনন্দগিরি প্রভৃতি ঋষিকল্প মনীষিগণ ঐ শ্রুতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব, যদি তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রতিভাবলে কোন নূতন ব্যাখ্যা করেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে বাধা নাই এবং অগ্ৰান্ত শাস্ত্র-বাবসায়িগণও তাহা গ্রহণ করিবেন না। কেননা প্রয়োজন অনুসারে যদি শ্রুতির নূতন নূতন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে ব্যাখ্যার অনন্তই উপস্থিত হয়, শাস্ত্রার্থের কোন স্থিরতা থাকে না, হৃদয়গা ক্ষেত্রবিশির বিলাপ ঘটতে পারে।

৩০শে মার্চ,  
১৩২০ সাল।

} শ্রীশরণচন্দ্র শাস্ত্রী।

পঞ্চশস্য

তামাক ছাড়াইবার চিকিৎসা (Current Opinion)

অমেরিকার শিকাগো শহরে, একটি চক্রট-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ডাক্তার ক্রেস তামাক ছাড়াইবার চিকিৎসার মূদক্ষ জানিয়া তাহারা তাহাদের আপিসের সহিত একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ডাক্তার ক্রেসকে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছে। এবং ডাক্তার ক্রেসও (Dr. D. H. Kress, General Secretary of the Anti-Cigarette League, Chicago, U. S. A.) তাহার বিস্তৃত ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া লোকহিতকর এই পূর্ণাঙ্গত আন্দোলনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যহ এত তামাকখোর আবাল-বৃদ্ধ-বমিতা চিকিৎসার জন্ম আসিতেছে যে ডাক্তারের পক্ষে সকলের চিকিৎসা করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; চার্বৎসরের শিশু, স্কুলের বালক-বালিকা, যুবক যুবতী, অভিনেত্রী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকল বয়সের ও সকল অবস্থার নরনারী এই অনাবশ্যক ও ক্ষতিকারক ব্যসন হইতে মুক্তি লাভের জন্ম সমিতির শরণাপন্ন হইয়াছে। ডাক্তারের চিকিৎসায় ২৫।৩০ বৎসরের পাকা তামাক-খোরও নিষ্কৃতি পাইয়াছে, যে-সমস্ত স্ত্রীলোক গোপনে চক্রট খাওয়া অভ্যাস করিয়া স্বামীর নিকট সেই অভ্যাস গোপন রাখিবার জন্ম সর্বদা সমস্ত ও কুঠিত ছিল, তাহারা পুনরায় নিজেদের আত্মসম্মান ও অসঙ্কোচ সরলতা ফিরিয়া পাইতেছে।

চিকিৎসার প্রণালী অতি সহজ।—তামাকের মধ্যে নিকোটিন বিধ আছে; তাহা শরীরের মধ্যে গিয়া সেই বিষের পিপাসা হৃদমনীয় করিয়া তুলে, এবং তাহার ফলে মানুষকে মুহূর্ত তাবাক সেবা করিতে হয়। ডাক্তার ক্রেস দেখিয়াছেন যে সিল্ভার-নাইটেট দ্রাবণ (silver nitrate solution) নিকোটিন বিষের

সহিত মিশ্রিত হইলে নিকোটিন বিষের বিরুদ্ধে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়; তখন নিকোটিন-বিবাক্ত শরীরে নিকোটিন আর সহ হয় না। সুতরাং তামাক-খোঁসি যদি মাঝে মাঝে সিলভার-নাইটেট দ্রাবণ দিয়া কুলকুচা করে, তবে চুরুট, সিগারেট, শুড়ুক, দোস্তা, যে-কোনো প্রকারের তামাক খাইতে গেলেও তাহা তাহার অত্যন্ত বিষাদ লাগিবে; অভ্যাসবশত খাইতে গেলেই এক টানের বেশী খাওয়া তাহার পক্ষে রুচিকর বোধ হইবে না। এইরূপে কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তামাকের লালসা দূর হইয়া মানুষ আবার স্ব-অধীন হইতে পারে।

এই চিকিৎসা-প্রণালী ডাক্তার ক্রেসের উদ্ভাবন নহে। ইহা ১৯০৮ সালে প্রচারিত হইলেও কেহ ইহার প্রতি মনোযোগ করে নাই। পরে একদিন ডাক্তার ক্রেস একজন রোগীর মুখের খা চিকিৎসা করিতে গিয়া কষ্টিক লোসন বা সিলভার-নাইটেট দ্রাবণ দিয়া তাহার মুখ ধুইবার বাবস্থা করেন। তাহার ফলে তিনি লক্ষ্য করেন যে সেই লোকটার তামাকে ভয়ানক বিতৃষ্ণা



তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার চিকিৎসা।

জন্মিয়া গিয়াছে। সেই হইতে তিনি তামাক ছাড়াইবার সহজ উপায়ের হৃদিস পাইয়াছেন। ডাক্তার ক্রেস আরো দেখিয়াছেন যে তামাক-খোঁসের চা, কাফি, ও মাংস প্রভৃতি গুরুপাক মসলা-দার খাদ্যের বড় ভক্ত; সেই-সব লোককে যদি দুধ, মটরকলাই সিদ্ধ, ফলমূল প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য খাওয়াইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহাদের তামাকের তৃষ্ণা অনেক কম থাকে। সেই জন্ত ডাক্তার ক্রেস তাহার চিকিৎসার সময় পিথানিয়মন করিয়া অধিকতর ফলপ্রসূত করিয়াছেন।

ডাক্তার ক্রেস একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা কোনো তামাক-খোঁসের মণিবন্ধে নাড়ীর উপর ধরিলে ভূষাখণ্ড কাগজে

আঁক কাটিয়া জানাইয়া দেয় সে লোক কতখানি তামাক খেয়েছে। তিনি বলেন যে তামাক সেবনের যত রকম প্রণালী আছে তাহাদের মধ্যে সিগারেটই অপকৃত্তম। সিগারেট খুব ঠাস পীকানো হয় না বলিয়া উহার মধ্যে যে বাতাস থাকে তাহা সিগারেট পুড়িবার সময় কার্বনিক অক্সাইড গ্যাস ও অপরাপর গ্যাস উৎপন্ন করে; সিগারেটের কাগজ পুড়িয়া এক্রোলেইন (Acrolein) বিষ উৎপন্ন করে, তাহাতেই সিগারেটের খোঁসার স্বাদ কিটকিটে হয়; এই সমস্ত বিষ নিকোটিন বিষ অপেক্ষাও অধিক অপকারী; ফুসফুসের মধ্য দিয়া রক্তে গিয়া মানুষের শরীর জীর্ণ করিয়া তোলে; বিশেষতঃ বালক ও যুবকদের স্নায়ুশুলী কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল ও অমনোযোগী করে।

এখন আমেরিকার সকল ষ্টেটেই ক্রমে ক্রমে ক্রেসের চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্তিত হইতেছে; বিদেশের বড় বড় ডাক্তারেরা ক্রেসের তামাকনিবারণের প্রণালী অবগত হইবার জন্ত তাহাকে পত্র লিখিতেছেন। ইহার সহকারীরূপে সরকারী এক আইন হইয়াছে। তাহাতে ১৮ বৎসরের নূনবয়স্ক বালকদিগের সিগারেট খাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ; এজন্য স্কুলের ছেলেরা সিগারেট ছাড়িতে বাধ্য হওয়াতে শিকাগোর সিগারেট ব্যবসা শতকরা দশভাগ (অর্থাৎ দৈনিক ৮৫০০ সিগারেট বিক্রয়) কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও গভর্নমেন্টের ও ডাক্তারদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

### পরাদীন জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ (Literary Digest) :—

পরাদীন জাতি যদি নিজের চেষ্টায় জানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে উদ্যমে কর্মে চেষ্টায় সাহসে বলে বিজ্ঞতা জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে তবে বিজ্ঞতা স্তুতি কখনই সেই জাতিকে আর অধীন করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক অন্তত সমকক্ষ পদবী দিয়া তাহার খন্ডন তাহাকে সবহমানে স্বীকার করিতেই হয়। আমেরিকা এককালে ইংরেজের অধীন ছিল; তাহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত সাম্য ও অধিকার প্রার্থনা করিয়া করিয়া যখন অধৈর্য হইয়া উঠিল তখন তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের সাহস বীরত্ব ত্যাগ দেখিয়া ইংলণ্ড তাহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইংরেজের অধীন উপনিবেশ-রাজ্য, ক্ষমতায় দক্ষতায় ইংরেজের সমকক্ষ, ইংরেজ সরকার তাই তাহাদের মুখ চাহিয়া তাহাদের অসন্তোষ বাঁচাইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা করেন এবং সেই ভয়ে-ভক্তিকে নাম দেন Diplomacy বা রাজনীতি। দক্ষিণআফ্রিকার বোয়ারেরা অবশেষে পরাজিত হইয়াও ইংরেজকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল যে ইংরেজ সরকার সানন্দে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া অস্ত্রতম শত্রু-সেনাপুত্রিকেই সেই দেশের প্রথম অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করেন এবং নামে মাত্র ইংলণ্ডের রাজাকে সম্রাট স্বীকার করিয়া বোয়ারেরা পূর্ণ পরাদীনতা ভোগ করিতেছে। বোয়ারদের সহিত যুদ্ধ করার কারণ এই দেখাযায় হইয়াছিল যে, বোয়ারেরা তাহাদের দেশে উপস্থিত ভারতবাসীদিগের প্রতি বর্ষের নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া থাকে; এখন তা বোয়ারেরা ইংরেজেরই অধীন, তথাপি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে





ফিলিপিনোদিগকে ব্যাটবল খেলা শিখানো হইতেছে।

ভারতবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিকার হইতেছে না। কিন্তু তাহারও শুভসূচন্য দেখা দিয়াছে, ভারতবাসীর পক্ষে গান্ধী ও গোখলের শ্রায় নেতা এবং লর্ড হার্ডিঙের শ্রায় শ্রায়বান নির্ভীক পৃষ্ঠপোষক অধিনায়ক ভারতবাসীকে শ্রায়া দাবী আদায় করিয়া লইবার মহামন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। প্রকৃতির নিয়মই এই যে অভাববোধ উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিকার আসন্ন হয় না; অধীন জাতি যদি শ্রায়া দাবী জোর করিয়া করিতে পারে তবে বিজেতা ইচ্ছায় না হোক দায়ে পড়িয়া সে দাবী সম্পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। নতুবা অক্ষম ও অযোগ্য যদি দয়ার দান কুড়ইয়া মনুষ্য ক্লম্ব করে, অন্তরের স্রুক্ষে সঙ্কচিত করে, তবে কোন পক্ষেরই কল্যাণের কারণ হয় না।

কিন্তু বিজেতা জাতি যদি স্বেচ্ছায় অধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিবার জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশ করে, যদি অক্ষম অধীন জাতিকে শিক্ষা দিয়া নিজেদের সমকক্ষ হইবার পক্ষে সাহায্য করে তবে, সেই বিজেতা জাতির মহত্ত্ব প্রকাশ পায় যথেষ্ট। এইরূপ মহত্ত্ব ইংরেজ জাতি কার্যে না হোক কথাতো আশাদের সম্বন্ধে বহুবার প্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশ বাহুবলে জয় করে নাই। বাদসাহদের শাসনপ্রণালী যখন বিশৃঙ্খল ও অশ্রায় অত্যাচারে পরিণত হইল, যখন স্বেচ্ছাচারী কুরাজাদিগের সংশোধন অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন দেশের লোক স্বেচ্ছায় বিদেশীর হাতে রাজ্য-ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল। সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষেরা জানিতেন যে তাহারা চিরকালের জ্ঞান এদেশ অধিকার করিয়া থাকিলে জ্ঞান আসেন নাই। ভারতবাসীকে সমস্ত বিশ্বের চিন্তা ও কর্মের সহিত পরিচিত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে নিজের পায়ে দুর দিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিলেই এদেশে তাহাদের কর্তব্য শেষ হইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই লর্ড মেকলে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরাও অকপটে ইংলণ্ডের দাঁড়াইবার মূল উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়া স্বীকার করেন। ভারত-

বর্ষের অন্তিম অধিনায়ক মাকুইস হেষ্টিংস উহার রোজনামচার স্পষ্ট করিয়া লিপিয়াছেন যে, সেদিন ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষকে জ্ঞানে শিক্ষায় দক্ষতায় আপনাদের সমকক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিতে পারিবে সেদিন ১৮৫৭ ও ইংরেজ জাতির স্মৃতি পৌরকের দিন; অতোক সফল ইংরেজ উৎসুক হইয়া সেই দিনের প্রতীক্য করিতেছে। ঠিক এই কথাই প্রতিপন্ন করিয়া সংগ্রহী একজন ইংরেজ (Edwyn Bevan, *Indian Nationalism*, Macmillan & Co., 2s. 6d.) বলিয়াছেন "I should like the end to be that Indians stood up strong and free among nations: I don't think any consummation could be more honorable to my countrymen, than that." অর্থাৎ, আমি চাই ভারতবর্ষ জগতের মহাজাতির গোষ্ঠিতে স্বাধীন ও সমর্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে; ইহা অপেক্ষা আর কোনরূপ ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা আমার স্বদেশীয়দের পক্ষে অধিক পৌরকের কারণ হইতে পারে না।

সেকালের রাজপুরুষদের শ্রায় একালের রাজপুরুষদের মধ্যে কিন্তু তেমন অকপট উদার লোক বেশী দেখা যায় না। লর্ড মলের শ্রায় মনীষী ব্যক্তিও বলিয়া ফেলিলেন—তদূর ভবিষ্যতে বতদূর কল্পনা চলে কোনো কালেই ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র কল্পনা করা যাইবে না। কিন্তু মানুষের স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিগত, এবং কল্পনা বা অনিচ্ছা অগ্রাহ করিয়া মানুষ সেই দিকেই জ্ঞান অগ্রসর হইতে থাকে। পুষ্পপুটের উপর সূর্যালোক-সম্পাতের মতো মানুষের হৃদয়পুটে জ্ঞানালোক প্রতিক্ষিত হইলেই তাহা আপনা হইতেই ধীরে ধীরে আপনার সকল দলগুলি মেলিয়া ধরে, তখন তাহাঁই আশা-আকাঙ্ক্ষার সচিত্র গন্ধ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অতএব আমরা বিশ্বচিন্তা, বিশ্বের ইতিহাস, স্বাধীনচিন্তাপ্রণালীর সহিত যতই পরিচিত হইয়া উঠিতেছি, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাও ততই একটা নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিয়া আমাদের দাবী

করিতে শিখাইতেছে। এবং আমরা দেখিতেছি ঠিক বিধিসম্মত  
'করিয়া চাহিতে জানিলে পাওয়াও কঠিন হয় না।

কিন্তু ন চাহিয়াও পাওয়ার দ্বারা জগতে বিরল নহে।  
আমেরিকা স্পেনের অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া দখল  
করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকা ইংলণ্ডের ত্যায় সাম্রাজ্যবাদী নয়,  
স্বাধীনতা তাহাদের রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র, এজন্য তাহারা নিজেদের  
দেশকেও যেমন সম্পূর্ণরূপে ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, চিন্তায়, কর্মে  
স্বাধীন করিয়া তুলিতে চায়, অপরকেও তেমনি স্বাধীন দেখিতে  
ইচ্ছা করে ; পরের ছেলে মাকড় মারিলে ছ-কাহন কড়ি ব্রাহ্মণকে  
অর্থাৎ স্বয়ং ব্যবস্থাপক পুরোহিত-ঠাকুরকে দিবার দণ্ড ব্যবস্থা  
করিয়া নিজের ছেলের বেলা মাকড় মারিলে ধোকড় হয় বলিয়া  
উড়াইয়া দেওয়া স্বাধীনতা-বাদীদের সাজে না, তাহারা জগৎবাসী  
প্রত্যেক পৃথক জাতিকে স্বাধীন দেখিতে চায়, ইহাই তাহাদের  
ব্রত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের নিজের দেশের বেলা, যে নিয়ম,

of the people of the Philippines. Every step we take  
will be taken with a view to for that, independence of  
the islands and as a preparation for that independence.

“The Administration will take one step at once.  
It will give to the native citizens of the islands a  
majority in the appointive commission, and thus in  
the upper as well as in the lower house of the legis-  
lature.

“We place within your reach the instruments of  
redemption. The door of opportunity stands open,  
and the event, under Providence is in your hands.”

“The triumph is as great for us as it is for you!”

অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্যের দ্বার তোমাদের সম্মুখে আমরা  
উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম, শক্তি থাকে  
তোমরা জয় কর। এই জয় আমাদের  
ও তোমাদের উভয়ের পক্ষেই ডুলা  
গৌরবের।

কিন্তু যে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধী-  
নতার এই অমৃত প্রসাদ বিতরণ কর  
হইতেছে তাহারা সভ্যতায় ভব্যতায়  
শিক্ষায় শক্তিতে উন্নত নহে। এবং সেই  
অছিলায় অনেক সঙ্কীর্ণচেতা আমেরিকান  
ফিলিপিনোদিগের মনে স্বাধীনতার জ্বাশ  
জাগৃত করিয়া তোলা নবুদ্ভিত্তার পরি-  
চায়ক বলিয়া ধূয়া ধরিয়াছে। তথাপি  
প্রেসিডেন্ট উইলসনের গভর্ণমেন্ট অদম্য  
উৎসাহে ফিলিপিনোদিগকে নানা উপায়ে  
শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রপরিচালনে শক্তিমান  
করিয়া তুলিতেছে।

### মুক্তির মহোৎসব (The Crisis) :—

পঞ্চাশ-বৎসর হইল আমেরিকায়  
কাক্রিরা দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।

সেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঞ্চাশৎ-তম বার্ষিক উৎসব বা জুবিলি  
আমেরিকায় কাক্রিরা দাসত্বের আড়ম্বর ও উল্লাসের সহিত সম্পন্ন  
করিয়াছে। তাহার নাম দিয়াছে তাহারা মুক্তির উৎসব (Emancipation  
Exposition)। ইহা কাক্রি-ইতিহাসের একটি স্মরণীয়  
ঘটনা। ইহাতে চারলক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। উৎসব  
উপলক্ষ্যে আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শহরে কয়েকটি  
মেলা হইয়াছিল। সেই-সকল মেলায় মধ্যে মহানগরী পঠন  
করিয়া কাক্রি জাতির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতদূর  
উন্নতি হইয়াছে ; অধিকতর উন্নতির জন্য কি করা উচিত ; তাহার  
আলোচনা হয়। তাহারা কাক্রিজাতির আদিম অবস্থা হইতে বর্ত-  
মান সময় পর্যন্ত সর্বাঙ্গীন উন্নতির ইতিহাসের অভিন্ন কল্পনা  
সাত দল মিছিল বাহির করিয়াছিল ; তাহাতে এবং বায়কোট  
আক্রিকার বস্ত্র জীবন, আমেরিকায় দাসত্ব এবং পরে তাহা-মুক্তিতে  
স্বাধীনতার স্বর্গস্থল, সবতই ক্রমপরম্পরায় প্রদর্শিত হয়। সেই সর্গে



ফিলিপিনোকে কলের গান ওমাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পরের দেশের বেলা ঠিক জীয়া পালন করা শক্ত। ফিলিপাইন  
দ্বীপপুঞ্জ জয় করার পরেই আমেরিকা প্রচার করিল যে বিজিত  
জাতিকে স্বাধীনতা-রক্ষার শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া  
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে  
আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে রাষ্ট্রব্যবহারে নানা উপায়ে শিক্ষিত  
করিয়া তুলিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই  
আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় সর্বহলতা  
(majority) দান করিয়াছে এবং ফিলিপিনোরা যে স্বাধী-  
নতা লাভের উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা-  
দিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পুণ্যমন্ত্রের দীক্ষায়  
উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপের শাসনকর্তা স্পষ্ট  
বলিয়াছেন—

“We regard ourselves as trustees, acting not for  
the advantage of the United States, but for the benefit

মেলায় কাফিরজাতির দ্বারা প্রস্তুত কলাসামগ্রী, শিল্পসজ্জার, সাহিত্য, বস্ত্রপাতি, ও নব নব ক্ষেত্রে নব নব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ইতিহাস ও নমুনা প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

সেই প্রদর্শনীতে তেরটি বিভাগ ছিল। (১) আফ্রিকা মহাদেশে কাফিরদের অবস্থান; তাহাদের দেশীয় ও জাতীয় ইতিহাস-সম্বলিত মানচিত্র, কারিগরী, শিল্প। (২) কাফির জাতির জগতের দেশে দেশে বিস্তার লাভের ও বিশেষ করিয়া আমেরিকায় উপনিবেশের ইতিহাস। (৩) স্বাস্থ্য ও শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কাফিরপ্রচেষ্টা। (৪) কাফির ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির দৃশ্য চলন্ত ছবির দ্বারা উদাহৃত। (৫) বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন। (৬) শিক্ষা সম্পর্কে কাফির উন্নতি ও প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত। (৭) ধর্ম। (৮) নগর ও গ্রামে বাস করিবার বিবিধ ব্যবস্থা, কর্তব্য, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় প্রভৃতি। (৯) কাফির নারীদের কর্ম ও প্রচেষ্টার নমুনা ও ইতিহাস। (১০) কাফিরদের প্রস্তুত চিত্র, ও তক্ষণ-শিল্প। (১১) কাফির লেখকদের রচিত সাহিত্য—পুস্তকাদি, সাময়িক পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির একটি লাইব্রেরী। (১২) স্থাপত্য ও বাস্তববিদ্যায় কাফিরদের পারদর্শিতার নমুনা ও নকসা প্রভৃতি। এই বিভাগের সমস্ত নমুনা মেলায় মধ্যস্থলে কাফির স্থপতির পরিকল্পিত নকসা-অনুসারে কাফির মিত্রের তৈয়ারী একটি মন্দিরে প্রদর্শিত হইয়াছিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহসজ্জার জগৎ আবশ্যিক যাবতীয় জবা, দেওয়ালচিত্র, ছবি, প্রভৃতিও, সংগৃহীত ছিল। (১৩) সঙ্গীত—কণ্ঠ, যান্ত্রিক,—আনন্দ ও তন্ত্রীক—সকল প্রকারের।

কাফিররা প্রাচীন ঐতিহ্যহীন অসভ্য বর্বর দাসের জাতি হইলেও মাত্র এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতার মুক্ত সুস্থ আব-হাওয়ায় মানবজীবনের সকল প্রকার আবশ্যকের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রচুর দক্ষতা ও মৌলিকতা দেখাইয়াছে। কাফিররা কবি, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, তক্ষণশিল্পী, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ব্যবসাদার, রাষ্ট্রশাসক, রাষ্ট্রব্যবস্থাপক প্রভৃতি সমস্তই হইয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা বিশেষ দক্ষতা, বিশেষত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছে। সর্বোপরি, নিয়ম ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার সহিত কোনো ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়া পরিচালনা করার অসাধারণ শক্তি তাহাদের সঞ্চিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতায় অসভ্য দাসের জাতি যদি এমন অদ্ভুত সফলতা দেখাইতে পারে, তবে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যে পরমধনী, একটু সুবিধা পাইলে না করিতে পারি কি। সেই সুবিধা আমাদের জোগাড় করিয়া লইতে হইবে—এই দিকেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার মুখ ফিরাইতে হইবে। আমাদের মানুষ হইতে হইবে, মানুষের মধ্যে মাথা তুলিয়া সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে,—এই হইবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

কাফিররা এই মেলায় অনুষ্ঠান করিয়া প্রেক্ষাগৃহে আসিয়া দিগকে দেখাইলেন যে তাহারা আমাদের অক্ষয় ঘৃণা অপদার্থ নহেন; জগৎকে মানব-সমাজকে দিবার মতন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য তাহাদেরও আছে, তাহা-দিগকে বাদ দিয়া খেতাজদের চলিবে না। ভগবানের রাজ্যে তাহারা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহারা মানুষ হইয়াই সকল মানুষের সমকক্ষ হইয়াই থাকিবেন। তাহারা এই মেলায় আপনাদের চিত্রা ও কার্শ্ব, চেষ্টা ও সাধনার সাফল্য ও সজ্জাবাতা দেখাইয়া জগৎজয়, বিশেষ ভাবে খেতকায়ের, শ্রদ্ধা সন্তুষ্ট সহানুভূতি বন্ধুই লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। পায়ে চামড়া কালো হইলেই যে সে অপদার্থ হয় না, সে খেতাজের চেয়ে অপকৃষ্ট হয় না, তাহা কাফিররা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে প্রাচীন ঐতিহ্যহীন কাফিরজাতিকে আমাদের জ্ঞান জাতিও ত্রের মনে করিয়া কৃপার চক্রে দেখে তাহার্য্যও আজ অগৎকে জানের ও কর্তব্যের

সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতেছে, তাহারা সকলের সমকক্ষ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আর আমরা পিতৃধনে অশোক ধনী হইয়াও আজ দেউলিয়া হইয়াছি বলিয়া কি হাল ছাড়িয়া দিমা, বসিয়া থাকিব? নষ্ট পিতৃধন কি উদ্ধার করিয়া আবার মানুষের মতো মানুষ হইব না? চেষ্টার অসম্ভবও সম্ভব হয়।

### আসমান-ঝোলায় কাশ্মীর-যাত্রা (Literary Digest) : —

ভূস্বর্গ বলিয়া যে কাশ্মীরের খ্যাতি সেই সুন্দর শোভাময় দেশে যাওয়াটা কিন্তু বিশেষ সহজ ও সুপের ব্যাপার নয়। হিমালয় পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তবে কাশ্মীরের বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় উপত্যকার উপস্থিত হইতে হয়। ১৮৮৬ সালে হিমালয় পর্বতের পায়ে পায়ে ২০০ মাইল দীর্ঘ এক পথ প্রস্তুত করা হয়; এই পথ পথপ্রস্তুত করিতে ৫৪ জন মজুর পাথর-চাপা পড়িয়া মারা পড়ে এই পথটি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকর্তৃশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট ও আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত বলিয়া সম্বাদার লোকেরা বিশেষ তারিফ করিয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়ের উপর ২০০ মাইল হাঁটাপথে চলা বিশেষ কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ, তা সে পদব্রজেই হোক, কিংবা ঘোড়া, দাগী প্রভৃতি যান বাহনে চড়িয়াই হোক। সেইজগৎ কাশ্মীর-রাজসরকার হইতে এই পথে কলের গাড়ী



কাশ্মীরে যাইবার আসমান-ঝোলার নমুনা।

ইলেচি ট্রাক বা মোটর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু কুমৌদের পাহাড়ে আলগা মাটির মধ্যে বড়, বড় পাথরের খণ্ড থাকায় এই সমস্ত ভারী গাড়ী চালানো নিরাপদ নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ আলগা মাটিতে ভারী গাড়ী চলার নাড়া ও দমক লাগিয়া শিলাখণ্ড বসিয়া পথের উপড় ধস পড়িতে পারে কিংবা পথই বসিয়া যাইতে পারে। তার পর ব্রেন্ন (Brennan) যখন এক-রেল (monorail) কলের-গাড়ী উদ্ভাবন করেন, তখন কাশ্মীর-রাজসরকার আশাশ্রিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে এইবার কাশ্মীরের পথকষ্ট দূর হইবে; এবং সেই

আশ্রয় রাজ-সরকার বের্নাকে তাঁহার আবিষ্কার সম্পূর্ণ করিবার অল্প মুক্তহস্তে-বধেই অর্থ-সাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে এক-ঘের কলের-গাড়ী কাশ্মীরের পথে চালানো সম্ভব হইবে না, কারণ একরেল কলের-গাড়ী মোড় ফিরিবার সময় ধূঁ ধুঁ কোণ করিয়া মোড় ফিরে, বহুদূর হইতে ক্রমে ক্রমে ঝুঁকিয়া ঘুরিয়া মোড় ফিরিতে পারে না। সেইরূপ পথ পাহাড়ো দেশে হওয়া শক্ত। এবং তাহারও বেলা পাহাড় ধসিয়া পড়ার সম্ভাবনা সমানই আছে। অবশেষে কানাডা গভর্নমেন্টের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারকে কাশ্মীর রাজ-সরকার আনাইয়া কাশ্মীরে যাইবার সুবিধা উদ্ভাবনে নিযুক্ত করেন। এই ইঞ্জিনিয়ারের প্রস্তাব অনুসারে পাহাড়ের চূড়া ডিঙাইয়া তার টাঙাইয়া সেই তার বাহিয়া দোলা চালাইবার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এক বে-সরকারী ইংরেজ কোম্পানী এই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে মাত্র ৭৫ মাইল পথ সোজা তার টাঙাইলে হিমালয় ডিঙাইয়া একেবারে কাশ্মীরের কোলে গিয়া পড়া যাইবে; এবং তাহাতে খরচও বেশী হইবে না—মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে। তারে বুলাইয়া দোলা চালাইতেও খরচ বেশী পড়িবে না; কাশ্মীরের বেগবতী নদীর স্রোত হইতে তাড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া দোলা টেলিয়া চালানো হইবে। সেই তাড়িৎ-প্রজনন-ক্ষেত্র স্থির হইয়াছে রামপুরের নিকটে; আমেরিকা হইতে তাড়িৎ-বস্ত্র আমদানী হইবে বলিয়া আমেরিকার রপ্তানুত সিমলা শৈল হইতে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিয়া আমেরিকার সংবাদ পত্র হইয়াছেন।

আস্মান-ঝোলায় আকাশ-লম্বিত তার ১০০ ফুট উচ্চ বড় বড় লোহার আফরী-বোনা ধামের মাথায় মাথায় বাধিয়া টাঙানো হইবে; এবং এক ধাম হইতে অপর ধাম পর্যন্ত তারের বিলম্বিত ব্যবধানের বিলম্ব হইবে প্রায় ৮০০ গজ বা ১৬০০ হাত। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর এক একটা স্টেশন বা ঘাঁটি থাকিবে, এবং যাত্রারাতের অল্প দুই প্রান্তে তারপথ ৯ ফুট ব্যবধানে পৃথক থাকিবে, ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকিবে না। আস্মান-ঝোলা টাঙাইবার তারের স্থলতা হইবে দেড় ইঞ্চি ব্যাস। এই তার হইতে প্রতি মাইলে ৩০ পানি করিয়া কোম্পানী গাড়ী চলিবে, এবং প্রত্যেক গাড়ীর বোঝাই লইবার শক্তি হইবে ৪ মণ হইতে ৫ মণ ২৫ সের পর্যন্ত। এই সমস্ত গাড়ী গভীর খদ ও উত্তম খাঁড়ী পাহাড়ের মাথায় উপর দিয়া যাইবে, এবং স্থানে স্থানে আস্মান-ঝোলা হইতে ভূমিপৃষ্ঠ ১২০০ ফুট নিচে থাকিবে। এক স্টেশন হইতে অল্প স্টেশনে গাড়ী চালান হইবে আগনা-আপানই, তাহাতে এক ঘূঁটির এপার হইতে গাড়ীর আঁকড়া খুলিয়া গাড়ী ঘূঁটি প্রদক্ষিণ করিয়া ঘূঁটির অপর পৃষ্ঠের তারে দিয়া আবার আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবে এমন স্বয়ংক্রিয় কলের ব্যবস্থা থাকিবে। ধাতু গরমে বড় হয়, ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়; তজ্জন্ম তার গরমের সময় বড় হইয়া বুলিয়া পড়িয়া নোল হইয়া যাইতে পারে; এবং শীতের সময় সঙ্কুচিত হইয়া টান টান হইয়া ছিঁড়িয়া যাইতেও পারে। এই অসুবিধা প্রতিকারের জন্য গভর্নমেন্টের মধ্যে মানাবিধ-অটল প্লান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার বিলম্বিত থাকিবে, এবং

তাহাতে তার, বারাস সকল ঋতু ও আবহের অবস্থায় সমান থাকিবে, বাড়িবে না, কমিবে না।

এই তার বিলম্বিত উপর দিয়া বরাবর যাইবে এবং ঘাঁট মাঝে ঘাঁট উত্তীর্ণ হইয়াও বিলম্বিত থাকিবে এবং তন্তুগুলি যেখানে যেখানে ধস পড়িবার সম্ভাবনা নাই এমন নিরাপদ স্থান দেখিয়া প্রোথিত থাকিবে। তার খদ ও পাহাড়ের মাথায় উপর দিয়া বিলম্বিত থাকিতে পাহাড়ের ধস হইতে ঝোলায় কোনো স্থিতির সম্ভাবনা থাকিবে না।

সম্প্রতি এই আস্মান-ঝোলায় মানুষ যাত্রী লওয়া হইবে না; কেবলমাত্র মাল আমদানী রপ্তানী চলিবে। বৎসর দুই ঝোলা নিরাপদে চলার পর মানুষ বহনের ব্যবস্থা করা হইবে।

এখন পাহাড়ের ২০০ মাইল হাঁটা পথে এক টন (২৭ মণ) জিনিস লইয়া যাইতে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় ও ৪৫ টাকা খরচ হয়। আস্মান-ঝোলায় ৭৫ মাইল মাত্র পথ ঘণ্টায় ৫৬ মাইল চলিয়া ১৫ ঘণ্টায় কাশ্মীরে পৌঁছানো যাইবে। এবং খরচও খুব কম পড়িবে।

চক্র।

## দোল

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত

হল উতলা।

বুকের পরে দোলেরে তার

পর্যায়-পুতলা।

আনন্দেরি ছবি দোলে

দিগন্তেরি কোলে কোলে,

গান ছুলিছে, নীলাকাশের

হৃদয়-উতলা।

আমার ছুটি মুগ্ধ নয়ন

নিদ্রা ভুলেছে।

আজি আমার হৃদয়-দোলার

কে গো ছুলিছে।

ছুলিয়ে দিল সুখের রাশি,

লুকিয়ে ছিল যতকুঁহাসি,

ছুলিয়ে দিল জনম-ভরা

ব্যথা অতলা ॥

ঐ বীজনাথ গুপ্ত।















